লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

—০—

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

—০—

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

চিত্রসূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭০

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭০

গরমে ছিমছাম বাটার স্যাণ্ডাল

গরমের পথে ঘোরাফেরা সবচেয়ে ভালো স্যাণ্ডালে। স্যাণ্ডাল কেমন না-জুতো, না-চটি। পা-ঢাকা নয়, আবার পা-খোলাও নয়। গরমের তেজ থেকে বাঁচাবে, আবার হাওয়াও খেলাবে। পথিকের প্রিয় তাই বাটার স্যাণ্ডাল। হাজার রোদেও তাজা, ফিটফাট গঠন, উৎকৃষ্ট উপাদানে বাটার স্যাণ্ডাল।
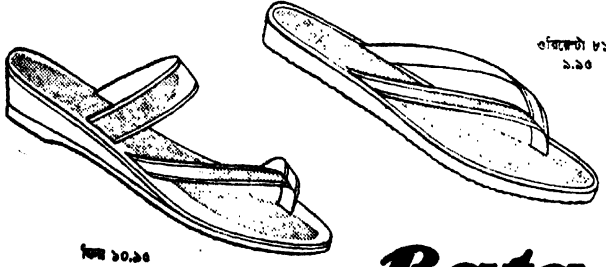
সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭০

— রঙীন চিত্র —

মালব সর্দার

অজন্তার প্রাচীর-চিত্র হইতে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক পুনরঙ্কিত

Works of

DR. KALIDAS NAG

1. GREATER INDIA	Rs. 40.00
2. DISCOVERY OF ASIA	Rs. 30.00

P-26, Raja Basanta Ray Road,
CALCUTTA-29

ভাষায় ভাবে বর্ণনাবৈচিত্র্যে অনুপম অনবদ্য
যুগোপযোগী এক অভিনব উপহার

বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্যের

বিবেকানন্দের রাজনীতি

(শতবর্ষপূর্তি স্মারক শ্রদ্ধার্ঘ্য)

২.৫০ ন.প.

: প্রাপ্তিস্থান :

প্রবাসী প্রেস, প্রাঃ লিঃ
১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

কুষ্ঠ ও ধবল

৬০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে **হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর** হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা, সোরাইসিস্, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্ম-রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭, হাওড়া
শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

বিনা অস্ত্রে

অর্শ, ভগন্দর, শোষ, কার্ব্বাঙ্কল, একজিমা, গ্যাংগ্রীন প্রভৃতি ক্ষতরোগ নির্দ্দোষরূপে চিকিৎসা করা হয়।

৪০ বৎসরের অভিজ্ঞ
আটঘরের ডাঃ শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল
৪৩নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা-১৪
টেলিফোন—২৪-৩৭৪০

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড্

রেজিঃ অফিস—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

—১নং মিল—	—২নং মিল—
কুষ্টিয়া (পাকিস্থান)	বেলঘরিয়া (ভারতরাষ্ট্র)

এই মিলের ধুতি শাড়ী প্রভৃতি ভারত ও পাকিস্থানে ধনীর প্রসাদ হইতে কাঙ্গালের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত।

নববর্ষের
প্রীতি ও
শুভেচ্ছা
পূর্ব রেলওয়ে

দলের সর্দার

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

১ম সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৭০

প্রতিরক্ষা ও প্রস্তুতি

বিগত ৩১শে মার্চ্চ, কোইম্বাটুরের পৌরকর্ত্তাদিগের সম্বর্দ্ধনা ভাষণের উত্তরে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত-চীন সংঘর্ষের মীমাংসা শান্তির পথে হইবে কিন্তু সেই আশা প্রকাশকালে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন "কিন্তু শান্তির পথে মীমাংসা হইলেও আমাদের অনেক (সামরিক) শক্তিবৃদ্ধি করিতেই হইবে। উহাই আমাদের একমাত্র ভরসা। উহা আমাদের প্রতিবেশীদের সম্ভ্রম অর্জ্জন করিবে এবং দেশের জনগণের মনে আস্থা দিবে।"

আমাদের নিরাপত্তার জন্য সামরিক শক্তি এবং সামর্থ্যের পর্য্যাপ্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন, "যুদ্ধ হোক্ বা না হোক, আমরা আক্রান্ত হই বা না হই, এ দেশের উপর শত্রু অভিযান চালিত হোক্ বা না হোক্, আমরা পুনর্ব্বার যাহাতে অসতর্ক ও অসহায় অবস্থায় মার না খাই সেই ব্যবস্থা অতি অবশ্যকরণীয়। আমাদের শক্তি রক্ষা করিতে হইবে। (অতীতে) আমাদের দেশ দুর্ব্বল ছিল। ভবিষ্যতে তাহার প্রতিকার প্রয়োজন।

পণ্ডিত নেহরু ত প্রস্তুতির প্রয়োজন বিষয়ে নানাস্থানে সদা সর্ব্বদাই বলিতেছেন। অন্য অনেকেই বলিয়াছেন যে, আমাদের নিরাপত্তার বিষয়ে এখন "প্রস্তুতিই" বীজমন্ত্র। এই প্রস্তুতির অর্থসঙ্গতির জন্য অর্থমন্ত্রী ত দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের সাধ্যের সীমা পর্য্যন্ত—এবং মধ্যবিত্তদিগের ক্ষেত্রে তাহাদের সামর্থ্যের সীমা ছাড়াইয়া—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আদায় করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তিনি ভবিষ্যতে আরও অধিক চাহিবেন।

এই সকল কথার ও সকল ব্যবস্থার সহজ ও সরল অর্থ এই যে, জাতির সমস্ত সামর্থ্য, ও সঙ্গতি আমাদের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও যুদ্ধ আয়োজনে নিয়োজিত করা প্রয়োজন, আমাদের ক্ষমতার শেষসীমা পর্য্যন্ত।

অন্যদিকে নানা প্রকার গুজব ও জল্পনা-কল্পনার প্রচারে দেশের লোকের মনে কিছু বিভ্রান্তি আনিয়াছে। নয়াদিল্লীর মন্ত্রীসভার অধিকারিবর্গ এবং তাঁহাদের মুখপাত্র মহাশয়গণ অনেক প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেক কথাও বলিয়াছেন, যাহার পরস্পরবিরোধী সংজ্ঞা হয়। সুতরাং অনেক চিন্তাশীল লোকেও প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন "প্রস্তুতি" বলিতে কি বুঝায় তাহা এখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন নয় কি? অর্থাৎ শক্তিবৃদ্ধি কিভাবে কতদূর

পর্য্যন্ত করা হইবে এবং তাহার কতটা হইয়াছে এবং বাকী যাহা তাহা কবে,কোন্ কোন্ সময়ে কতটা হইবে? লোক-সভায় ত এ কথাও বলা হইয়াছে যে, বিদেশীরা আমাদের প্রস্তুতি-ব্যবস্থার বিষয়ে আমাদের—অর্থাৎ লোকসভার সভ্য-দের অপেক্ষা অনেক বেশী জানে এবং মন্ত্রীসভার প্রতিনিধি-গণ বিদেশে সমানে মুখ খোলেন, শুধু দেশের লোকের কাছেই যত "মন্ত্রগুপ্তির ভড়ং।" লোকসভার সভ্যদিগের এই কথাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রথা অনুযায়ী উড়াইয়া দিবারও উপক্রম করিয়াছিলেন কিন্তু লোকসভার স্পীকার শ্রীহুকুম সিং তাঁহার রায় দিয়া বলেন যে, যে তথ্য লোকসভায় "গোপন ও সাধারণের স্বার্থে অপ্রকাশ্য" বলিয়া প্রকাশ করা হয় নাই তাহা বিদেশে প্রকাশ করা গর্হিত। ফলে মন্ত্রীসভার ভাবভঙ্গি কিছু অন্যরূপ দাঁড়ায়।

যাহাই হউক লোকের মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে যে, কেবল কথাই বলা হইতেছে এবং জনসাধারণের উপর করভার অসম্ভব বৃদ্ধি ও তাহাদের স্বাধীনতা নানা দিকে ব্যাহতই করা হইতেছে। সরকারী দপ্তরগুলি তাহাদের সেই গড়িমসি ও সময় এবং অর্থ অপচয়ের পথেই চলিতেছে। প্রতিরক্ষা এখন কি অবস্থায় আছে এবং তাহার প্রস্তুতি কি ভাবে কতটা অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, সে বিষয়ে সব কিছুই অনিশ্চিত ও আবছায়া, সুতরাং সে-সকল তথ্য জানাইবে কে? এই সকল সন্দেহ এখন শুধু লোকের মনেই নাই, এ বিষয়ে কথা-বার্ত্তাও চতুর্দ্দিকে চলিতেছে—আমরা জানি না ইহার কতটা পঞ্চম বাহিনীর কীর্ত্তি।

যাহাই হউক সম্প্রতি (৮ই এপ্রিল) কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন (ইঁহার নাম চৌহানের অপভ্রংশ এবং উচ্চারণ চওয়ন এরূপ শোনা যায়) লোকসভায় প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত বিতর্কের উত্তরে এই "গোপন তথ্যের" যবনিকা ক্ষণেকের জন্য তুলিয়া লোকসভার সভ্যগণকে—এবং দেশবাসীদিগকে—এক পলকের মত "প্রস্তুতির" দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দিয়াছেন। ইহাতে লোকসভায় উৎসাহের সৃষ্টি হয় এবং দেশবাসীও অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। তাঁহার কথার ধরন সহজ ও সরল এবং দম্ভহীন হওয়ায় যেটুকু তথ্য আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে তাহাতে মনে হয় এতদিনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে একজন "কাজের লোক" আসিয়াছেন এবং ঐ দপ্তরের কাজ হয়ত এবার ক্রমে যথাযথভাবে চালিত হইবে।

তথ্যের মধ্যে আমরা পাইয়াছি যে, এই বৎসরের মধ্যেই পাঁচটি পার্ব্বত্য ডিভিসন গঠন করা হইবে। সৈন্যদলের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম হিমালয়ের উচ্চ অঞ্চলে যুদ্ধ-চালনার উপযোগী এবং সেইমত ঐরূপ অঞ্চলের আবহাওয়ায় তাহাদের অভ্যস্ত করা হইতেছে; বর্ত্তমান সৈন্যসংখ্যাকে দুই বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ করা হইবে এবং সেনাবলের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রবলও যথাযথভাবে বৃদ্ধি করা হইবে।

অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ছয়টি অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপন করা হইবে। একজন স্পেশাল অফিসার এই কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে সকল বিমান ও অস্ত্রশস্ত্র এ দেশে এখনই প্রস্তুত করা যাইবে না সেইগুলি সংগ্রহের চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণমাচারী শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাইবেন। সেই সঙ্গে নূতন অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানা (অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী) স্থাপনে সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টাও তিনি করিবেন। তাঁহার নিজের ও রাষ্ট্রপতির মার্কিন দেশ সফরের উল্লেখ তিনি করেন নাই। বিমান ঘাঁটি ও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন যে, যে সকল স্থানের সামরিক গুরুত্ব আছে সেখানে ঐ কাজ সমানে চলিতেছে।

নেফায় যে ভুল করা হইয়াছিল তাহার পুনরভিনয় যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা হাতে লওয়া হইয়াছে এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর পুনর্গঠনের কাজেও হাত দেওয়া হইয়াছে। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থারও দ্রুত উন্নতি সাধন চলিতেছে।

যুদ্ধবিগ্রহের পরিচালনা-সম্পর্কিত কার্য্যপন্থা পূর্ব্ব হইতে সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় ও নির্দ্ধারণ—যাহাকে পাশ্চাত্য যুদ্ধবিজ্ঞানে logistics বলে—পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতভাবে করার প্রয়োজন দেখা গিয়াছে এবং ঐ বিষয়ের কাজও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার অনেক কিছু প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। বিমানবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যোগস্থাপন এবং পরস্পরকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রতিরক্ষা ও প্রস্তুতির জন্য দেশকে প্রচুর আর্থিক ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও করিতে হইবে একথাও তিনি বলেন, অর্থাৎ বর্ত্তমান বাজেটে প্রতিরক্ষা দপ্তরের যে ৮৭৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ আছে—এবং যাহা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উত্তরদানের পর মঞ্জুর হয়—সেইরূপ আগামী বৎসরেও হইবে। তিনি বলেন—

"১৯৬২ সন কিউবা সঙ্কট এবং চীনের ভারত আক্রমণের জন্য উল্লেখযোগ্য। এই দুই ঘটনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে

যে, আদর্শগত সঙ্ঘাত ও শত্রুতা সত্ত্বেও কোন কোন দেশ সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দেশগুলি সহাবস্থানের নীতির বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একমাত্র এই দেশেই আদর্শগতভাবে যুদ্ধের অপরিহার্য্যতার কথা বড় গলায় বলিয়া থাকে। চীন এমন এক দেশ, যেখানে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করা হইতেছে এবং অন্যান্য দেশ যুদ্ধ এড়াইবার জন্য এক নূতন আদর্শ খাড়া করিয়াছে। তিনি বলেন, ভারতকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চীন তাহার প্রতিবেশী, যাহার মৌলিক নীতি হইল 'যুদ্ধং দেহি'।

"শ্রীচ্যবন বলেন যে, দেশের সংহতি রক্ষার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালান একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, চীন যদি কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভারত সুখী হইবে। কিন্তু মনে হয় যে সমস্যা সমাধানের পথে কিছু অসুবিধা দেখা দিতেছে। সেই জন্য দেশকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে হইবে।"

কিন্তু একদিকে যেমন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কণ্ঠে সতর্কীকরণ এবং প্রস্তুতির জন্য কঠোর ব্রতপালনের আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে, অন্যদিকে সেই দিনই নয়াদিল্লীতে আর একজন বক্তা যিনি বর্ত্তমানে চীন ভারত সঙ্ঘর্ষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলিয়া খ্যাত—ঐ বিষয়েরই আর এক দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। সেই বক্তৃতা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সতর্কবাণী কতকটা ব্যাহত করে মনে হয়। সংবাদপত্রে সেই বক্তৃতার সারাংশ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা এইরূপ :—

"নয়াদিল্লী, ৮ই এপ্রিল—উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক আজ রাত্রে এখানে বলেন যে, কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা চীনের পক্ষে আর হয়ত সম্ভব নয়।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গয়ার-হল ইউনিয়নের বার্ষিক ভোজসভায় শ্রী পট্টনায়ক বলেন, 'সম্ভবতঃ খুব শীঘ্রই আমরা আলোচনার জন্য মিলিত হইতে পারি।'

তিনি বলেন যে, প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করার কথা ঘোষণা না করিয়াও, চীন একটির পর একটি কলম্বো প্রস্তাব কার্য্যকরী করিয়াছেন।

তিনি বলেন, একটি বিপদের ঝুঁকি লইয়াই আমি একথা বলিতেছি যে, সামরিক অর্থে চীন হয়ত আবার আক্রমণ করিবে না। আমি বরং বলিব, তাহাদের সামরিক আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে।"

ঐ বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন যে, চীনের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে অপরাজেয় ও প্রচণ্ড বিক্রমশালী দৈত্যের ভূমিকায় দেখাইয়া আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত ও হতবল করা। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতেই চীন পিছু হঠিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে—নিজের মুখ রক্ষার জন্য কলম্বো প্রস্তাবের সর্ত্তগুলি অনুযায়ী কাজ করিতেছে। শ্রীপট্টনায়ক নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার বক্তৃতায় বিপদের ঝুঁকি আছে। অর্থাৎ, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিতে নাও পারে। কিন্তু এইরূপ বক্তৃতায় অন্য এক বিপদ্ আছে। যাহারা যুদ্ধ প্রস্তুতি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে ব্যস্ত, ইহাতে তাহাদের পথ কিছু সুগম করিতে পারে।

সব শেষে বলি, যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য কি করা হইতেছে সে সম্বন্ধে অতি সামান্য তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যেও অনেক কিছুই দূর ভবিষ্যতের (আপৎকালীন সময়ের হিসাবে) ব্যবস্থা মনে হয়। বিদেশ হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি ও পাইতেছি সে সম্বন্ধে অতি সামান্য তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ তথ্যই বাকী অংশ যে গোপন রাখা হইয়াছে তাহা যথাযথ। কিন্তু অত্যাধুনিক অস্ত্র—যথা, মিসাইল-জাতীয় সুদূর ক্ষেপণ-উপযোগী অস্ত্র-সম্পর্কে এবং অত্যাধুনিক "ফাইটার" বিমান সম্বন্ধে নানা পরস্পরবিরোধী সংবাদ বাহির হইয়াছে—এদেশে ও বিদেশে। ইহাতে সাধারণের মনে বিভ্রান্তি আনয়ন করে। লোকের মনে একটা ধারণা নানা কারণে আবার বলবৎ হইতেছে যে, আমাদের উচ্চ অধিকারীবর্গ জনসাধারণের স্কন্ধে সবকিছু চাপাইয়াই নিশ্চিন্ত। তাঁহাদের নিজেদের দপ্তরে সেই পূর্ব্বেকার "গদাইলস্করি" চালই চলিতেছে। যে কাজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সাতদিনে হয় তাহা ব্রিটিশ আমলের সরকারী দপ্তরে সাত সপ্তাহে হইত এবং কংগ্রেসী সরকারের আমলে—মন্ত্রীর ও পার্টির "পালের গোদা"-বর্গের কুপোষ্যে-ছাওয়া দপ্তরগুলিতে—সেই কাজ সাত মাসেও হয় কি না সন্দেহ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন যদি বলিতেন যে, ঐ দুইটি অত্যাবশ্যক অস্ত্র এবং অন্য অতিপ্রয়োজনীয় সামরিক সজ্জা-সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তবে আমরা আশ্বস্ত হইতাম।

দমকল বাহিনী

নাগরিক জীবনের নানাপ্রকার বিপদ্-আপদের মধ্যে "আগুন লাগা" একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পল্লীগ্রামে যে এই বিপদের ভয় নাই তাহা নয় কিন্তু সেখানের অগ্নিকাণ্ড সাধারণতঃ ব্যাপকভাবে ক্ষতিকর হয় না এবং অগ্নিকাণ্ডের কারণও শহরের মত এত নানাপ্রকার হয় না। সেই কারণে শহরের অগ্নি-নির্ব্বাপণের ব্যবস্থা নাগরিক জীবনের এই বিষম ক্ষতিকর বিপদ্ নিবারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সংস্থা। সেই সঙ্গে একথাও বলা চলে যে, নগরের অত্যাবশ্যকীয় অন্য বিধি-ব্যবস্থার মত সেখানের দমকল বাহিনীর অবস্থা-ব্যবস্থা, সেখানের নাগরিক জীবনের মান এবং সেই নগরের যাবতীয় পরিচালন ব্যবস্থার অধিকারিবর্গের বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের নির্দ্দেশক। পৌর প্রতিষ্ঠান, রাজ্যের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগ, পৌর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সকল প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্ব এ বিষয়ে সমান।

সাধারণ অবস্থায় যদি দমকল বাহিনী বিশেষ প্রয়োজনীয় হয় তবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় উহা নাগরিক জীবনে নিরাপত্তার অন্যতম সহায়। বিমান আক্রমণ দ্বারা নগরের নানাস্থলে অগ্নিসংযোগ করিয়া নগরের বিষম ক্ষতিসাধন ও নাগরিক-দিগের সকল কাজকর্ম্ম ও জীবনধারণ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করাই বর্ত্তমান কালের যুদ্ধচালনার রীতি। সেইভাবে আক্রান্ত নগরের দমকল বাহিনী যদি সুষ্ঠুভাবে চালিত ও পূর্ণরূপে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, সাজসজ্জা এবং সকলপ্রকার ও পর্য্যাপ্ত সংখ্যক দমকলে সজ্জিত না হয় তবে সে অগ্নিকাণ্ড ব্যাপক ও সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিকর হওয়াই সম্ভব।

কলিকাতায় নাগরিক জীবন ত চতুর্দ্দিকেই অব্যবস্থায় সমাকীর্ণ। উপরন্তু সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় দমকল বাহিনীর উপর আলোকপাত হওয়ায় দেখা যাইতেছে যে, সেখানেও সব-কিছুই অব্যবস্থার মধ্যেই চলিতেছে—শুধুমাত্র দমকলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও কর্ম্মিগণের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ব পালনের চেষ্টা অটুট রহিয়াছে।

কলিকাতা নগরে দমকল বাহিনীকে সকল প্রকার দুরূহ কাজের জন্যই ডাকা হয়। বিপদ্গ্রস্ত ও অসহায় লোকের উদ্ধার হইতে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করার জন্য অসহায়ের সহায় একমাত্র দমকল বাহিনী। আনন্দবাজার বিগত ১০ই এপ্রিল বুধবারের সংখ্যায় সেই সপ্তাহের সোমবার মধ্যরাত্রি হইতে মঙ্গলবার রাত্রি ৭-২০ পর্য্যন্ত ঘটনার একটি নির্ঘণ্ট দিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে মঙ্গলবারের হাজিনগর কাগজ কলের আগুন-সংক্রান্ত বিবরণে জানাইয়াছেন যে, মঙ্গলবার সারাদিন সারারাত্র ১৮টি দমকল—যাহার মধ্যে কলিকাতা বাহিনীর ১৪খানি দমকল ছিল—এবং প্রায় একশত জন দমকল-কর্ম্মী প্রাণপণ যুদ্ধ চালাইয়াছেন। সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, একজন কর্ম্মী আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে। নির্ঘণ্টটি এই সঙ্গে উদ্ধৃত করা হইল :

"দমকলের ব্যস্ততা সুরু হয় সোমবার শেষ রাত হইতে। একের পর এক ছোট-বড় নানা ঘটনার খবর আসিতে থাকে এবং দমকলের লোকেরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যান। ঘটনাগুলি ধারাবাহিকভাবে এইরূপ :—

সোমবার। রাত ১২-৫৪ মিঃ। দমদম রোড এবং সিঁথি রোডের মোড়ে কয়েকটি দোকান-ঘরে আগুন। দমকল-কর্ম্মীরা ছুটিয়া গিয়া আগুন নেভান।

সোমবার। রাত ৪-১৮ মিঃ। ব্রাইট ষ্ট্রীটের এক খাটালের ছাদ হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গরু-মহিষ আটক। দম-কলের লোকেরা ওইগুলিকে উদ্ধার করেন।

মঙ্গলবার। সকাল ৬-১৮ মিঃ। বিবেকানন্দ রোডের এক গুদামের ছাদের উপর কাগজ ও বস্তায় আগুন। নিভাইতে ছোটে তিনখানা দমকল।

সকাল ১০-২০ মিঃ। থিয়েটার রোডের এক বন্ধ দোকান হইতে মার্জার উদ্ধার। দোকান-মালিক বাইরে থাকায় গত তিন-চার দিন ঘর বন্ধ ছিল। পাড়া-প্রতিবেশীরা শুনিতে পান, ঘরের ভিতর এক বিড়াল কাঁদিতেছে। দমকলের লোক টিনের বেড়া ভাঙ্গিয়া বন্দী বিড়ালকে মুক্তি দেন।

দুপুর ১-১৫ মিঃ। হাজিনগরের কাগজের কলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড।

দুপুর ১-৩৮ মিঃ। ডালহৌসী পাড়ায় কালেক্টারেট অফিসের ভিতরে বিজলী বাতির সার্কিট বন্ধে হঠাৎ আগুন এবং অফিস-কর্ম্মীদের মধ্যে আতঙ্ক। অবস্থা আয়ত্তে আনিতে ছোটে ৩ খানা দমকল।

অপরাহ্ণ ২-১৪ মি: হাজরা রোডের এক বাড়ীর ছাদে ত্রিপলে আগুন এবং দুইখানা দমকল গাড়ীর ঘটনাস্থলে যাত্রা।

অপরাহ্ণ ২-১৭ মিঃ। ক্যানাল ষ্ট্রীটে এক ল্যাবরেটরিতে বিলাস ও রাসায়নিক দ্রব্যের বিস্ফোরণে কতকগুলি পাত্র চূর্ণ-

বিচূর্ণ। ১ জন অজ্ঞান ও ১ জন জখম। দমকল তাঁহাদের হাসপাতালে পাঠায়।

অপরাহ্ণ ২-৩৪ মিঃ—গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেনের এক বস্তির কিনারে প্লাইউড কারখানায় আগুন।

বিকাল ৪-৩৫ মিঃ—আন্দুল রোডে এক বড় কারখানায় কাঠের বাক্সে আগুন।

বিকাল ৫-৩৬ মিঃ—হাওড়া জে, এন, মুখার্জি রোডে রাস্তার পাশের কিছু পাটের গুঁড়ায় আগুন।

রাত ৮-২০ মিঃ—বেলুড়ে এক এলুমিনিয়াম কারখানার এসবেস্টসের ছাদের উপর চটের বস্তায় আগুন।

রাত ৮-৫০ মিঃ—বালী স্কট কার রোডে পাটের গুঁড়ায় আগুন। দুখানা দমকল রাত ১২টায়ও আগুন নিভাইতে ব্যস্ত।

রাত ৯-৮ মিঃ—মৌলালির মোড়ে ঝড়ের দাপটে বৃক্ষ পতন। সদর রাস্তা হইতে গাছ সরাইতে দমকলের লোক নিয়োগ।

রাত ৯-১৫ মিঃ—গোরাচাঁদ রোডে আর একটি বৃক্ষ পতন এবং আবার দমকলের সাহায্য।

রাত ৯-২০ মিঃ—ইণ্টালি শীল লেনে নারিকেল গাছ ভূপতিত এবং দমকলের সাহায্য।"

নির্ঘণ্ট হইতে সহজেই বুঝা যায়, নাগরিক জীবনে নিরাপত্তার ব্যাপারে দমকল বাহিনীর ভূমিকা কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে এই অতি-প্রয়োজনীয় সংস্থা এবং তাহার কর্ম্মীবৃন্দ কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার একটি চিত্র আমরা পাই বিগত মঙ্গলবার ৯ই এপ্রিলের যুগান্তরে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে, যাহা নীচে উদ্ধৃত হইল।

"পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান দমকল বাহিনীর যে সমস্ত যন্ত্রপাতি রহিয়াছে তাহাও খুব পুরাতন এবং যে লোকবল রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প। ইহা ছাড়া, দমকল কর্ম্মীদের চাকুরির অবস্থাও শোচনীয়। আজ পশ্চিমবঙ্গ দমকল কর্ম্মী ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীনেপাল রায় এম-এল-এ দমকল বাহিনীর কর্ম্মচারীদের চাকুরির উন্নতির দাবী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উল্লিখিত কথা জানান। শ্রীরায় ফায়ার সার্ভিসের পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি কমিটি গঠন, দমকল কর্মীদের সাপ্তাহিক ছুটি, ঘরভাড়া ও বাসভবনের ব্যবস্থা, সিফট ডিউটি প্রথার প্রচলন, বেতনের হার সংশোধন, সমস্ত কর্ম্মচারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের দাবী জানাইয়া বলেন যে, কিছুদিন আগে বিকানীর ভবনে অগ্নি নির্ব্বাপণে ষ্টেশন অফিসার মিঃ জেমস; ফায়ারম্যান শ্রী জে, এন, দত্ত; শ্রীমতিলাল এবং শ্রী পি, সি, সরকার যে অপূর্ব্ব সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করার প্রস্তাব করেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে জানান যে, দমকল বাহিনীর কর্ম্মী ও অফিসারদের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তব্য পালনে আহত হন তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য এবং যাঁহারা পঙ্গু হন অথবা মারা যান, তাঁহাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন যে, মিঃ জেমস্ আগুন নিভাইতে গিয়া মারা গেলেও তাঁহারা চিকিৎসার জন্য সরকার কোন অর্থ ব্যয় করেন নাই। সমস্ত অর্থই দমকল বাহিনীর কর্ম্মী ও অফিসারগণ দিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক দমকল কর্ম্মীর জন্য বাধ্যতামূলক ইনসিওরেন্স ব্যবস্থা প্রচলনের দাবী জানান।"

দাবী-দাওয়ার মীমাংসা কর্ত্তৃপক্ষ যাহাই করুন, বর্ত্তমানে যে অবস্থায় এই অত্যাবশ্যকীয় বাহিনীগুলিকে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের—তিনি বা তাঁহারা কে আমরা সঠিক জানি না—অবহেলা ও কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। এরূপ অবস্থার প্রতিকার আশু প্রয়োজন।

এই দমকল বাহিনীগুলি কোন্ বিভাগের অধীন এবং উহার সুব্যবস্থা ও পরিচালনা-সংক্রান্ত সকল বিষয় কোন্ উচ্চ প্রশাসনিক অধিকারের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে খট্‌কা লাগিয়াছে আর একটি সংবাদের দরুন। ঐ মঙ্গলবার ৭ই এপ্রিলে একটি ইংরেজী দৈনিকে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"দার্জ্জিলিং—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এই পত্রে তিনি রাজ্যের দমকল বাহিনীর এক ষ্টেশন অফিসার মিঃ এণ্টনি জেমসের মৃত্যু-সংক্রান্ত কথা লিখিয়াছেন। মিঃ জেমস্ বিগত ২৪শে মার্চ্চ কলিকাতায় বিকানীর বিল্ডিংয়ের অগ্নিকাণ্ডে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও অগ্ন্যুৎপাতে সাংঘাতিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় পরে মৃত্যুমুখে পড়েন। শ্রীমতী রাষ্ট্রপতিকে লিখিত এই পত্রে আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে মৃত কর্ম্মচারীর পরিবারের জন্য যথাযথভাবে আর্থিক ব্যবস্থা করা হইবে। মিঃ জেমসের পরিবারে বৃদ্ধা মাতা, তাঁহার বিধবা পত্নী ও পাঁচটি নাবালক সন্তান আছে। শ্রীমতী নাইডু আরও বিশেষ

ভাবে জানাইয়াছেন যে, মিঃ জেমসের মৃত্যুতে এই দমকল বাহিনীকে আধুনিক যন্ত্র সরঞ্জামযুক্ত করা আশু প্রয়োজন।"

বন্ধ গুদামে ঢুকিবার চেষ্টা করার সময় যে ভীষণ বিস্ফোরণ হয় মিঃ জেমস্ তাহাতেই পড়িয়াছিলেন। পরে ঐ গুদামের জানালা গ্রিনেড (বোমা) ছুঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

মিঃ জেমস্ যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের আদর্শ দেখাইয়া বীরের মত মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাহার কি পুরস্কার দেশ অর্থাৎ দেশের অধিকারিবর্গ তাঁহার পরিবার-পরিজনকে দিবেন, তাহা আমরা জানিতে চাহি।

আর একটি প্রশ্ন আমাদের মনে আসিয়াছে। এই বিকানীর বিল্ডিংয়ে ইতিপূর্ব্বে (বোধহয় দুই বৎসর পূর্ব্বে) এক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। সে সময়েই দমকল বিভাগ ঐ ইমারতের গুদাম ও গুদামজাত দ্রব্যাদি বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি। এবারের অগ্নিকাণ্ড যে শুধু পুনরাবৃত্তি তাহাই নয়, এবারের বিস্ফোরণ ও অগ্ন্যুৎপাত অতি আশ্চর্য্য ব্যাপারের সামিল।

আমাদের দেশের আইনকানুনে কি এই সকল ব্যাপারের প্রতিরোধ-বিষয়ক কিছু নাই? আইনকানুন কি শুধু সজ্জনের পীড়ন ও দুর্জ্জনের পোষণের জন্য? যদি তা না হইত তবে ঐরূপ অগ্নিকাণ্ডের দায়িত্ব গুদামের মালিকের উপর পড়িত এবং মিঃ জেমসের মত বীরকর্ম্মী তাহার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিত।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দুই দিনব্যাপী অধিবেশন (৬ই ও ৭ই এপ্রিল) হয়। পূর্ব্বেকার দিনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এদেশের শুধু উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের দুই অঙ্গই ছিল না, উপরন্তু জনসাধারণের জীবন শাসনতন্ত্রের পরিচালকবর্গের অনাচার ও অত্যাচারে দুর্ব্বহ হইলে প্রতিকারের পথ এক ঐ সংস্থাদ্বয়েই পাওয়া যাইত এবং সকল ক্ষেত্রে সেজন্য সত্যাগ্রহ বা ব্যাপক আন্দোলনেরও প্রয়োজন হইত না।

আজ সেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জীবন্ত সত্তা নাই। যাহা আছে তাহা কংগ্রেসী সরকারের প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যদি কোন কারণে কোনও কংগ্রেসী উচ্চ অধিকারী—"উচ্চতমের" ত কথাই নাই—ঐরূপ অধিবেশনে কিছু "আপ্তবাক্য" ছাড়েন তবে সদস্যবৃন্দের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়, কে তাহার উচ্ছ্বসিত ভাষায় সমর্থন আগে করিবে। আলোচনা বিতর্ক বা বিরূপ মন্তব্যের স্থানই নাই এই "তামাশা" জাতীয় অধিবেশনে। বিদেশীর আমলাতন্ত্র ও "নোকরশাহি" এখন নাই, কিন্তু কংগ্রেসী সরকারের প্রতিষ্ঠিত "আধিকারিক"-গণের কর্ত্তব্যজ্ঞান বা দায়িত্ব পালন আরও অনেক নীচের স্তরে নামিয়া যাওয়ায় জাতীয় জীবন যেভাবে বিকার ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হইয়াছে, সে বিষয়ে ঐ সকল অধিবেশনে কোনও মহাশয় ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তাও করেন না। অনাচার ও অত্যাচার ও দুর্নীতির প্লাবন ত দেশকে ডুবাইতে চলিয়াছে। কই, সে বিষয়েও ত একটি কথাও উচ্চারিত হয় না! উৎকোচ গ্রহণ ত আর কিছু দিন পরে প্রকাশ্য ভাবে হাটে-ঘাটে লওয়া আরম্ভ হইবে। গ্রহণকারী যদি উচ্চ অধিকারী হয়—মন্ত্রী বা "পালের গোদা হইলে ত কথাই নাই, তবে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কোন দিন প্রমাণিত হইবে না। কারণ, যেভাবে এবং যেরূপ গতিবেগে তাহার তদন্ত হইবে তাহাতে "দুষ্কৃতকারী" অতিবড় মূর্খ না হইলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেই—যেমন হইয়াছিল শ্রীদেশমুখের অভিযোগের তদন্তের ফলে। অবশ্য মাঝে মাঝে পরিসংখ্যান্ প্রকাশিত হয় যে, কতগুলি ঐরূপ অভিযোগের তদন্ত হইয়াছে এবং কতজন সরকারি কর্ম্মচারী দণ্ডিত বা চাকরি হইতে বরখাস্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ "পরিসংখ্যান"—যাবতীয় ভারতীয় পরিসংখ্যানেরই মত—কত মূল্যবান সে কথা ত সকলেই জানে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা তাহার ওয়ার্কিং কমিটি এ সকল বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজনও মনে করে না, কেননা, তাহার সদস্যবর্গ অন্য জগতে বাস করেন, যেখানে যথাস্থানে, যথাসময়ে ও যথাযথভাবে, উপযুক্ত পাত্রের শ্রীচরণে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে আশু ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। সুতরাং নিষ্ফল চিন্তায় বা বাজে কথায় কালক্ষয় কে করিবে?

যাহাই হউক দুই দিন রথী-মহারথীবর্গ সম্মেলনে মিলিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অমূল্য উক্তি এবং ততোধিক মহামূল্য প্রস্তাবরাজি সংবাদপত্রে বিরাট শিরোনামাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার কিছু সামান্য চর্চা নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কেননা যতই বিকার বা দৈন্যগ্রস্ত হউক, এই সংস্থা

আমাদের সকলের। এবং ইহার বিকার আমাদেরই অবহেলা ও চিন্তাশীলতার কার্পণ্যে হইয়াছে।

অধিবেশনের আরম্ভে, ভারতের সীমান্ত-রক্ষার্থে যে-সকল সেনানী ও জওয়ানগণ আত্মদান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য, সদস্যগণ দুই মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন। সংবাদপত্রের চিত্রে দেখা যায় পণ্ডিত নেহরু নত-মস্তকে দণ্ডায়মান। ইহা যথাযথই হইয়াছে।

প্রথম দিনের প্রধান প্রস্তাবের খসড়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু রচনা করিয়া তাহার পূর্ব্ব দিনে (৫ই এপ্রিলে) ওয়ার্কিং কমিটিতে উপস্থিত করেন এবং উহা অনুমোদিত হইলে পরে এই অধিবেশনে প্রেরিত হয়। ইহা লইয়া সামান্য কিছু বিতর্ক হইয়াছিল, বিশেষে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার প্রশ্নে, কিন্তু মহারথিগণ সকলেই সমর্থন করায় উহা গৃহীত হয়। অবশ্য খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নূতন কিছুই নাই, সবকিছুই লোকসভার আলোচনার চর্ব্বিতচর্বন। প্রস্তাবে বলা হয়, চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ সংগ্রাম যতই কঠিন ও দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হউক না কেন তাহা চালাইয়া যাইতে হইবে এবং এজন্য দেশবাসীকে সর্ব্বপ্রকার বিপদবরণ ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই সঙ্গে চীনা আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা সমর্থন করা হয় এবং সমাজতান্ত্রিক পথে দেশকে গড়িয়া তোলার ও দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সঙ্কল্প ঘোষিত হয়। বলা বাহুল্য এই সকল কাজে মন্ত্রীমণ্ডল ও উচ্চ অধিকারীবর্গের এবং তাঁহাদের সাঙ্গ-পাঙ্গ অনুচরবৃন্দের ভূমিকাই বা কি এবং দেশের আপামর সাধারণজনের ভূমিকাই বা কি সে বিষয়ে কোন কথার উল্লেখ কোথাও পাইলাম না। সম্পর্কটা ক্রমেই উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িতেছে বলিয়া একথা লিখিতে হইল।

প্রস্তাবের সমর্থনে পণ্ডিত নেহরু যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার সামান্য কিছু নীচে উদ্ধৃত হইল:—

"শ্রীনেহরু বলেন, ভারতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন দেশে স্বল্পমূল্যে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সামরিক যন্ত্রকে শক্তিশালী করা। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, প্রতি-রক্ষার দিক হইতে দেশের অর্থনীতিকে গড়িয়া তোলা। দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার ব্যবহার করা উচিত।

শ্রীনেহরু বলেন, জনগণের পূর্ণ সমর্থন ছাড়া আমরা পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি এবং দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করিতে পারি না। ভাবাবেগের দিক্ হইতে জনগণ আমাদের সমর্থন করিতে পারে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করার ব্যাপারে তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে হইবে। জনগণই হইতেছে প্রতিরক্ষা শক্তির মূল উৎস। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য জনগণকে সংহত করার ব্যাপারে কংগ্রেস ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। ভারতের গত চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস কংগ্রেসের দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছে। কংগ্রেস এখনও নিঃশেষিত হয় নাই—নূতন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছে। বহু দেশে বিপ্লব ঘটিয়াছে, সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, হত্যা হইয়াছে—কিন্তু কংগ্রেসের জন্যই শান্তিপূর্ণ ভাবে ভারতের অগ্রগতি হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য এই সকল কথা বহুবার বহুস্থলে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন কিন্তু তাহাতে এই সকল উক্তির মূলবস্তু যথার্থ ও সত্য হইলেও, অন্য সকল কথায় তর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

দ্বিতীয় দিনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষি ও শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা-সম্পর্কিত। এই আলোচনার কিছু অংশ রুদ্ধদ্বার-কক্ষে করা হয়। রুদ্ধদ্বারে আলোচ্য বিষয়টি ছিল পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের কৃষিশিল্প উৎপাদন সম্পর্কে একটি নোট। এই নোটটি সম্পর্কে আলোচনা রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে চার ঘণ্টা ও প্রকাশ্য অধিবেশনে দুই ঘণ্টা হয়। এই নোট সম্পর্কে সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত তথ্য পাই:

"রুদ্ধদ্বার-কক্ষে আলোচনাকালে শ্রীনেহরু নাকি বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের ন্যায় কোন কোন রাজ্যে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে কেন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে এবং অন্যান্য রাজ্যে কেন হয় নাই, সে সম্পর্কে একটা তুলনামূলক পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে। সরকারী শিল্পগুলিতে কার্য্যপরিচালনা কিরূপ হইতেছে এবং কিভাবে ইহার উন্নতি করা যায় তাহা পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে একটি পৃথক 'সেল' গঠন করা প্রয়োজন।

বিতর্ককালে বেশির ভাগ সদস্যই বলেন যে, প্রশাসন-যন্ত্রকে শিল্প এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুতর কর্ত্তব্য

সম্পাদনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হয় নাই। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় নাই এবং চাষীরা যাহাতে সময়মত চাষের জিনিস পায় তাহা দেখিবার মত উপযুক্ত সংস্থাও নাই।

বিতর্কের সমাপ্তি-ভাষণে শ্রীনন্দ সদস্যদের এই সমালোচনার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া বলেন যে, এই সকল ত্রুটি দূর করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। পরিকল্পনার অন্তর্গত কর্ম্মসূচীগুলি যাহাতে দ্রুত রূপায়িত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উপদেশ দানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কয়েকটি দল বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে ক্রমাগত সফর করিয়া বেড়াইতেছেন।

শ্রীনন্দ বলেন যে, তিনি একটি বিষয়ে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিতে চান যে, পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি বাধা এই যে, প্রশাসন-ব্যবস্থা রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে। একদল কংগ্রেসকর্ম্মী আর এক দল কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে—এমন কি মন্ত্রী পর্য্যায়েও এইরূপ ঘটিতেছে।

বিতর্কের মধ্যে প্রশাসন-যন্ত্রের যে দোষ ধরা হয় তাহা অতি সমীচীন হইলেও আসল জায়গায় পৌছাবার চেষ্টা করে নাই। প্রশাসন-যন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহার যোজনা, চালনা যাঁহাদের হাতে—অর্থাৎ মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ—তাঁহাদের অধিকাংশেরই কর্ত্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞানের এত অভাব যে, কোন কিছুই যথাযথভাবে বা যথাসময়ে হইতে পারে না। ইহাদের "আক্কেল দেওয়ার" ব্যবস্থা যতদিন না হইবে, অর্থাৎ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যপালনে অবহেলার জন্য দণ্ডদানের সম্যক্ ব্যবস্থা যতদিন না হইবে ততদিন এই অবস্থা চলিবেই। এবং এই দণ্ডদানের ব্যাপারে মন্ত্রীমণ্ডলের কোন দিকে কোনরূপ কারসাজি না থাকা উচিত। কেননা, আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে মন্ত্রীমাত্রেই শুধু নিজেকেই সকল আইনের আওতার বাহিরে মনে করেন না, তাঁহাদের "পেটোয়া" অসৎ ও দুরাচারী অথবা অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ কর্ম্মচারী ও অনুচর-বর্গকেও ঐ ভাবে দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ হইতে তাঁহারাই রক্ষা করেন। এবং এইরূপ মন্ত্রী ও তাঁহাদের চেলাচামুণ্ড ও অনুগত দক্ষিণ ও "বামহস্ত"বর্গই দেশের যত অনাচার ও দুর্নীতির উৎস।

শেষদিনের অধিবেশনে কয়টি "বেসরকারী" প্রস্তাবও গৃহীত হয়, সেগুলি নীচে দেওয়া হইল। এখানে "বেসরকারী" বিশেষণটি দ্রষ্টব্য, কেননা, প্রস্তাবগুলিকে ঐ ভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কি দুর্দ্দশা কংগ্রেসের ?

"আজ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গোড়ার দিকে দুইটি বেসরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উহার একটিতে প্রত্যেক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বৎসরে 'কমপক্ষে কি কাজ করা চাই', তাহা নির্দ্ধারণ করার জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে একটি কমিটি নিয়োগ করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবাবলী কতটা কার্য্যকরী করা হইল, তৎসংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইয়াছে।

ইহার পর এ-আই-সি-সি আরও একটি বেসরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বিরোধী সদস্যদের কংগ্রেস পরিষদ দলে প্রবেশ অধিকার দিতে হইলে কি নীতি অনুসরণ করা হইবে, কংগ্রেস সভাপতিকে সেই সম্পর্কে একটি কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।"

হলদিয়া বন্দর ও ফরাক্কা বাঁধ

অনেকদিন টালবাহানায় কাটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের এই দুইটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। যদি যথাযথ ও নিরপেক্ষভাবে এই দুইটি প্রকল্পের বিষয় বিচার ও পরীক্ষা করা হইত এবং যদি উচ্চতম অধিকারীদিগের মনে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালী সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন বিরোধ না থাকিত তবে এই কাজ বহু পূর্ব্বেই মঞ্জুর হইত এবং কাজও অনেক অগ্রসর হইত। মঞ্জুর হইবার পরও সেই বিপরীত মনোবৃত্তি বাধা-স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে এবং অতি "ঢিমে তেতালা" গতিতে কাজের আয়োজনপর্ব্ব চলিতেছে। যেভাবে কাজ চলিতেছিল এতদিন তাহাতে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনার অন্তেও এ দুইটি শেষ হইত কি না সন্দেহ—অন্ততঃ নয়াদিল্লীর চেষ্টা ছিল সেইরূপ। অবশ্য বলা হইয়াছিল যে ১৯৭০ সনের মধ্যে দুইটিই শেষ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

অথচ এই দুইটির উপর শুধু কলিকাতা বন্দরের ও বৃহত্তর কলিকাতার প্রাণশক্তি নির্ভর করিতেছে না, কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মাল রপ্তানীর উপর সারা ভারতের কল্যাণ ও প্রগতি নির্ভর করে। এমনিতে কলিকাতা বন্দরের আমদানী ও রপ্তানী সারা ভারতের সমগ্র আমদানী-রপ্তানীর শতকরা ৪৫ ভাগ। কিন্তু যদি শুধু রপ্তানী ধরা যায়—এবং এদেশের

অর্থনৈতিক অস্তিত্বের প্রাণবায়ু এই রপ্তানীই—তবে এক কলিকাতায় বোধহয় সকল রপ্তানীর শতকরা ৭৫ ভাগ কিংবা ততোধিক কারবার হয়।

এই বন্দরের এবং সমস্ত বৃহত্তর কলিকাতার শিল্প-অঞ্চলে জীবন-রুধির স্রোত বহন করে যে গঙ্গানদী, তাহার প্রাণস্রোত পুনর্ব্বার সতেজ করিতে হইলে ফরাক্কায় বাঁধ দিয়া গঙ্গার মূল প্রবাহ হইতে অনেকখানি জলস্রোত এদিকে ফিরাইতে হয়। এবং সেই সঙ্গে এই কলিকাতা বন্দরের সহিত সহযোগের জন্য হলদিয়ায় একটি নূতন বন্দর স্থাপন করিতে হয়। এ দুই বিষয়ে কোনও বিশেষজ্ঞ ভিন্ন মত দেন নাই এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন অংশে মতদ্বৈধও ছিল না। অথচ কাজ চলিতেছিল গড়িমসি করিয়া, পাছে বাংলার ও বাঙ্গালীর কোনও উন্নতির পথ দ্রুত খুলিয়া যায়।

যাহাই হউক, চীনের এই আক্রমণের ফলে অন্য অনেক জরুরী কাজের মধ্যে এই দুইটির উপরও নজর পড়িয়াছে নয়াদিল্লীর বুদ্ধিমানগণের। এতদিনে তাহাদের খেয়াল হইয়াছে যে, এই দুইটি কাজের উপর সারা ভারতের প্রতিরক্ষা ও কল্যাণ অনেকটা নির্ভর করে। শোনা যায়, সেই জন্য নয়াদিল্লী জরুরী নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, হলদিয়া বন্দর চালু করিতে হইবে ১৯৬৭ সনের মধ্যে এবং ফরক্কা বাঁধ শেষ করিতে হইবে ঐ বৎসরেই।

হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

ভারতের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতীক হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেডের ; যাহার তিনটি ইস্পাতের কারখানা রাওরকেলা, দুর্গাপুর ও ভিলাই-এ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত তিনটি কারখানার বৈষয়িক পরিস্থিতি বিশেষ আশাপ্রদ হয় নাই। ঐ বৎসরে হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ-এর লোকসানের পরিমান ১৬ কোটি টাকা। ২৪ কোটি টাকা পরিমাণ কোম্পানীর যন্ত্রপাতির মূল্যহানি হইয়াছে। ইহাকে হিসাবে ডিপ্রিসিয়েশন বলা হয়। এই মূল্যহ্রাসের টাকা ফণ্ডে জমা রাখার কথা এবং ইহা না করিতে পারিলে তাহাও লোকসান। অর্থাৎ মোট লোকসান এক বৎসরে ৪০ কোটি টাকা হইয়াছে।

অডিটর যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, দুই বৎসরে প্রায় ৭০ কোটি টাকার কাঁচা মালের কোন পরিষ্কার হিসাব নাই। এই জিনিসটি অস্বাভাবিক বলিয়া অডিটর বলিয়াছেন। তৈয়ারী মালেরও পরিষ্কার হিসাব নাই ৮৭ কোটি টাকার দ্রব্যের। কারখানা চালু করিতে অসম্ভব বিলম্ব করা হইয়াছে বলিয়া অডিটরগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যাহা আর্থিক লোকসান হইয়াছে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় নাই। কর্ম্মচারীদিগকে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা আগাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার আদায় বা কাটান দিবার কোন কথা জানা যায় নাই।

ভারত সরকার পরিচালিত আরও ২৮টি প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধন ২৮০ কোটি টাকা ছিল ৩১ মার্চ্চ, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের। এই কোম্পানীগুলি ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দের শতকরা ৪½ টাকা হারে লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে করিয়াছিল ৫$\frac{1}{10}$ শতকরা অনুপাতে। এই ২৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টির লোকসানের পরিমাণ মোট ২০ লক্ষ টাকা।

হিন্দুস্থান ষ্টীলের মোট মূলধন ৬৬৪ কোটি টাকা। সাধারণের অর্থে অথবা সাধারণের নামে কর্জ্জ করিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের চালনা-কার্য্য যদি ভারত সরকারের ডিপার্টমেণ্টগুলির মত হয় তাহা হইলে সাধারণের আর্থিক ভবিষ্যৎ কি প্রকার হইবে তাহা গভীর চিন্তার বিষয়।

অ.

চীনের বন্ধু ও দেশের শত্রু

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে বহু লোকের পরদেশপ্রীতি-দোষ আছে বলিয়া মনে হয়। কারণ নিজ দেশের জন্য স্বার্থ-ত্যাগ বা পরিশ্রম করিয়া দেশবাসীর সহায়তা করা সচরাচর ততটা প্রকট ভাবে লক্ষিত হয় না যতটা দেখা যায় পরদেশের সহিত বন্ধুত্বের আয়োজনের মধ্যে। বাংলা অথবা অপর ভারতীয় ভাষা শিক্ষার অথবা ভাষার উন্নতি প্রচেষ্টা দেশের বুদ্ধিমান সমাজে ততটা প্রবল ভাবে চালিত হয় না যেমন হয় ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান, রুশিয়ান কিম্বা আরবি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থায়। নিজ দেশ অথবা নিজ দেশের কৃষ্টি সম্ভবতঃ আধুনিকতা-সাপেক্ষ নহে বলিয়া ভারতের আধুনিকতাকাঙ্ক্ষার সহিত পূর্ণ ও ভেজালবর্জ্জিত জাতীয়তার মিলন সহজে সম্ভব হয় না। জাতীয়তার সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রতীক রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রের পণ্ডিতজনের বিদেশীপ্রীতি ভারতের শিক্ষিত মহলে হাস্যকর বলিয়া দৃষ্ট হয়।

এই পরদেশপ্রীতি পূর্ব্বযুগের শ্বেতাঙ্গের পদলেহন প্রবৃত্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে ভারত বিভাগ করিয়া দুইটি রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছে তাহাও আমাদিগের ইংরেজ-আমেরিকানদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফল। চীনের প্রতি যে "হিন্দি-চীনি ভাই ভাই" আবেগ, তাহার উৎসও রুশ ও রুশীয় কম্যুনিজম আদর্শের প্রেরণার মধ্যে। পরে চীন ভারতের উপর আক্রমণ করিলে ভারত শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং যাঁহারা চীনের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিয়া ভারতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাঁহারা হয় সেই পথ ছাড়িয়া অপর মত ও পথ অবলম্বন করিলেন, নয়ত নিজ দেশদ্রোহদোষে কারাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু চীনের প্রতি সদ্ভাব ত্যাগ করিলেও, রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা হয় নাই। এখনও পরের সাহায্যে দেশরক্ষা, পরের সাহায্যে দেশগঠন ও "পরের মুখের ঝাল খাওয়া" রাষ্ট্রীয় দপ্তরগুলিতে প্রবল বন্যায় বহমান রহিয়াছে। সকল "পরিকল্পনা"ই বিদেশীর অনুকরণে ও সাহায্যে চালিত হইতেছে। সর্ব্বক্ষেত্রেই বিদেশীর অর্থাৎ ইংরেজ, আমেরিকান ও রুশীয়ের সহিত মিলিত হইয়া চিন্তা ও কার্য্য করা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ "স্বাদেশিকতা" একটা উৎকট রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র কুসংস্কার, প্রগতি-বিরুদ্ধতা ও অসংস্কৃত ব্যবহারকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। উচ্চ ও আত্মনির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া "নীচু নজর" সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ এই যে, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে কিছু লোক বুঝিয়া লইয়াছেন যে, দলবদ্ধ ভাবে আত্মপ্রশংসা ও নির্গুণের গুণ প্রচার করিয়া এই মহাদেশের উপর সম্পূর্ণরূপে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। ভাষা, জাতি প্রভৃতি বিষয়ে যে কোন মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করা সম্ভব। এই সকল মিথ্যার মধ্যে হিন্দি ভাষা সম্বন্ধে যে সকল মিথ্যা প্রচার করা হয়, সেইগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কয়েক দিন পূর্ব্বে গোবিন্দদাস মহাশয় একটা সংবাদপত্রে লেখেন যে, ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৪২জন হিন্দি বলেন। ইহা অতিবড় মিথ্যা। হিন্দি বলিয়া যে সকল ভাষা চলে সে-গুলির অনেকগুলিই হিন্দি নহে। যথা—মৈথিলি, ভোজপুরী, মাঘধি, অর্দ্ধ-মাঘধি, রাজস্থানী, মেওয়ারী ইত্যাদি, ইত্যাদি। কয়েক বৎসর হইল পাঞ্জাবীকেও হিন্দি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। বস্তুতঃ "রাষ্ট্রভাষা" যে হিন্দি তাহা কাহারও ভাষা নহে। সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম ভাষা মাত্র। দেশের একতা নষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেসদল যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হিন্দির ব্যাপারটা সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্জনক। বাহিরে পরমুখাপেক্ষিতা ও ভিতরে নানান প্রকার গণ্ডি ও দলের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, এই দুইয়ে মিলিয়া ভারতের বিশেষ ক্ষতির পথ খুলিয়া দিতেছে। দেশের প্রতিরক্ষার কার্য্যে অতি বড় কথা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা ও ভারতীয় মানবের মূল অধিকারগুলির সংরক্ষণ। দেশদ্রোহ নানান রূপ ধারণ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করে। এই সকল ছদ্মবেশী দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে স্বাধীন মানুষকে দাঁড়াইতে হইবে।

অ.

কংগ্রেসের সুনীতিবাদ

কংগ্রেসের সভাপতি বলিয়াছেন যে ভিভিয়ান বোস রিপোর্টে যে সকল দুর্নীতির কথা আলোচিত হইয়াছে, কংগ্রেস বেসরকারী ব্যবসাদারদিগের সেই সকল অন্যায় আচরণ নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। উত্তম কথা। কিন্তু দুর্নীতি কর্কটিকা ব্যাধির মতই সমাজের অঙ্গে অঙ্গে নিজ শিকড় বিস্তার করিয়া এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যাহাতে কোন অঙ্গবিশেষে অস্ত্র চালনা করিয়া ব্যাধির নিবৃত্তি হয় না। অপর অঙ্গে ব্যাধি জাগ্রত হইয়া উঠে ও ক্রমশঃ দেহকে নাশ করে। ভারতের সরকারী ও বেসরকারী উভয় ভাগেই অর্থ ও রাষ্ট্রনৈতিক দুর্নীতি গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ঘুষ, বকশিস, চেনাজানা লোকের সাহায্যে ব্যবস্থা করাইয়া লওয়া, সুপারিশ প্রভৃতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চাকুরি পাওয়া, অর্ডার বা কন্ট্রাক্ট পাওয়া, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া, কালোবাজারে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি লাভ, বেআইনী ভাবে জিনিষ আমদানি করা, বিশিষ্ট লোকেদের "উপহার" গ্রহণ ও পরের খরচে ভোগের আনন্দ-লাভ; ইত্যাদি ভারতে সুপ্রচলিত। ভারতে এমন একটা সময় ছিল যখন নীতিবান্ লোকেরা পুত্রের চাকুরীর জন্যও অপরকে অনুরোধ করা অন্যায় মনে করিতেন। বর্ত্তমানে ক্রমশঃ অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, রেলে স্থান লাভ, স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হওয়া, পরীক্ষা পাশ করা, চাকুরি পাওয়া বা অর্থোপার্জ্জনের অপর উপায় করা; কোন কিছুই "সুপারিশ" ব্যতীত হইতে পারে না। পরীক্ষককে মাষ্টার রাখা অথবা

অন্যায় উপায়ে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি জানিয়া লওয়াও হইয়া থাকে। পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতিও অন্যায় উপায়ে নির্দ্ধারিত করা হয়। এক কথায় দুর্নীতি সর্ব্বক্ষেত্রে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং কংগ্রেসের সভ্যগণও যে দুর্নীতির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে কদাপি কালাতিপাত করেন না, এ কথাও কংগ্রেসের সভাপতি বলিতে পারিবেন না। উপদেশ ও আদর্শ দান ও উপস্থিত করা সহজ, কিন্তু কার্য্যতঃ সেই সকল নীতিজ্ঞাপক কথাকে বাস্তবে ব্যবহার করা ততটা সহজ নহে। কারণ, তাহা হইলে অনেক দেশনেতার বাম-হস্তের রোজগার বন্ধ হইয়া যাইবে। "ওহে, অমুককে এত টন সিমেণ্ট দিয়ে দাও।" কিংবা কাহাকেও লাইসেন্স বা অর্ডার দিয়া দিবার ব্যবস্থা না করিয়া দিলে দেশসেবা বন্ধ হইয়া যাইবে। উপদেশ ও নীতির প্রস্তাবনা প্রয়োজন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সকল অন্যায় ও দুর্নীতির যে জড় ও আরম্ভ যেখানে সেই মানব-চরিত্রকে শুদ্ধ করা কঠিন কাজ। বিশেষতঃ যদি উপদেষ্টাদিগের নিজেদের আখড়াতেই দুর্নীতির প্রাবল্য লক্ষিত হয়। অনধিকার চর্চ্চা মহাপাপ। উপদেশ দিবার অধিকার শুধু তাঁহাদিগেরই থাকে যাঁহারা অন্যায়ের সহিত জড়িত নহেন। কংগ্রেসের সভ্য ও নেতাদিগের মধ্যে অনেকেই অন্যায়ে নিমজ্জিত। সুতরাং তাঁহাদিগের সদুপদেশে সাধারণের চরিত্রের উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমত, কংগ্রেস হইতে যাঁহারা অন্যায় উপায়ে নিজেদের সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন। করিতে যাইলে হয়ত ঠগ বাছিতে গ্রাম উজাড় হইবে, কিন্তু না করিলেও কংগ্রেসের পক্ষে গুরুগিরি করা চলিবে না। এ অবস্থায় বড় বড় আদর্শ ও নীতিমূলক বাক্য ব্যয় করিয়া ফল অল্পই হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ফল না হইলেও উপদেশের বন্যা থামিবে না। ধর্ম্ম অপেক্ষা ধর্ম্মের আস্ফালনেরই জোর বেশী।

অ.

কংগ্রেসের জয়

সম্প্রতি যে সকল নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেস জয়লাভ করিয়াছে। এই সকল নির্ব্বাচনে জনসাধারণের বিশেষ কোনও উৎসাহ দেখা যায় নাই। মৃত ও অপ্রাপর বয়স্ক? ভৌতিক ব্যক্তিদিগের ভোটও শুনা যায় অনেক পড়িয়াছিল। তা সত্য কিনা তাহা ধর্ম্মভীরু কংগ্রেসদলের অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। কম্যুনিষ্টদলের আদেশে অনেক কম্যুনিষ্ট-সমর্থক ব্যক্তি কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছিলেন। শতকরা কত লোক ভোট দিয়াছেন তাহা বলা কঠিন, কারণ ভোটের অধিকারী বহু লোকেরই ভোটের খাতায় নাম থাকে না অথবা থাকিলেও ভুল ভাবে বর্ণনা করা থাকে। তাহা হইলেও নিকট আন্দাজে মনে হয়, শতকরা ৪০ জন মাত্র ভোট দিয়াছেন ও ইহার মধ্যে কিছু লোক কাল্পনিক ও তাঁহাদিগের ভোট "ভূতে" দিয়াছে। সুতরাং বলা যায় যে যথার্থ ভোটের অধিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা ২৫।৩০ জন মাত্র ভোট দিয়াছে। এই সকল নির্ব্বাচনে প্রমাণ হয় যে, কম্যুনিষ্টদলের সমর্থকের সংখ্যা এতই কমিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা নিজ দলের লোক দাঁড় করাইতে আর ভরসা পাইতেছেন না। তাঁহারা কংগ্রেসদলকে নিকট-কম্যুনিষ্ট বলিয়া ভিতরে ভিতরে প্রচার করিয়া নিজেদের মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেস দলেরও অবস্থা লোকের চক্ষে বিশেষ উত্তম নহে। কংগ্রেসের "আদর্শ"বাদের ফলে, ভারত চীনের হস্তে নাস্তানাবুদ হওয়াতে কংগ্রেসের ইজ্জত বৃদ্ধি হয় নাই এবং তৎপরে শ্রীমোরারজির অর্থনীতির ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যুর ব্যবস্থাতেও কংগ্রেস জনপ্রিয় হইয়া উঠে নাই। নির্ব্বাচনে জিতিয়া কংগ্রেসের আনন্দের বিশেষ কারণ নাই। কারণ, দেশবাসীর মনে আর কংগ্রেসের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভরশীল ভাব নাই। এবং ইহা ক্রমশঃ আরও কমিয়া যাইতেছে।

অ.

চীন আবার লড়িবে

চীন কেন ভারত আক্রমণ করিয়াছিল তাহা আমরা এখনও ঠিক ভাবে জানি না। উদ্দেশ্য ছিল, সত্যই ভারত দখল অথবা হিমালয় অঞ্চলে চীনের অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপন। কিংবা অপর জাতিদিগের প্ররোচনায় রুশের পরীক্ষার জন্যই ভারতকে বেইজ্জত করিয়া চীনের প্রবল শক্তিশালী রূপ জগতকে দেখান হইল; এই সকল কথার উত্তর কে দিতে পারে? বর্ত্তমানে চীনের সহিত যে পাকিস্থানের সৌহার্দ্দ্য তাহারও প্রকৃত কারণ কোথায়, তাহা আমরা জানি না। পাকিস্থানের শত্রু ভারত না রুশ, ইহা কে বলিবে? অন্তরে অন্তরে ভারতই কিন্তু পাকিস্থান আমেরিকা ও ইংলণ্ডের হুকুমের চাকর সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে হুকুম তামিল করাই

পাকিস্থানের কর্ত্তব্য। আমেরিকা ও ইংলণ্ড রুশের দমনের জন্য চীনকে বাড়াইয়া তুলিতে অনিচ্ছুক নহেন। সেইজন্য তাঁহারা পাক-নেতা আয়ুবকে না পাক্-পন্থা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মদ্রোহী, ইসলামের শত্রু, চীনের সহিত বন্ধুত্বে মিলিত হইতে হুকুম করিয়াছেন কি না, ইহাই বা কে জানে? বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে সকল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় সকল রাষ্ট্রই নির্ব্বোধ ও দুষ্ট লোকের দ্বারা চালিত ও শাসিত। উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রচালনায় কোনও সুবিধার সৃষ্টি করে না। এই কারণে রাষ্ট্র-'নীতির' সারকথা হইল বড় বড় কথার সহিত ছোট ছোট অপকর্ম্মের সমন্বয় স্থাপন করা। ইহা যাহারা কার্য্যকরী ভাবে করিতে পারে তাহারাই রাষ্ট্রশাসনে সফলকাম হয়। ধর্ম্ম, নীতি ও রাষ্ট্র এক তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে কি না তাহা বিচার্য্য। তবে ইতর সাধারণের মধ্যে সে বিচার-চেষ্টা সচরাচর লক্ষিত হয় না।

অ.

পরলোকে ডাঃ জীবনরতন ধর

এই কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকজনের পরলোকগমনে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। যেমন, গত ১৯শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্ম্মী ডাঃ জীবনরতন ধর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৮৯ সনে যশোহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যশোহর ও খুলনার দৌলতপুর কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে এম. বি পাস করিয়া সামরিক-বাহিনীতে চিকিৎসক হিসাবে যোগ দেন। ইহার পর তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন ও জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সনে লবণ সত্যাগ্রহ ও ১৯৩২ সনে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি কারাবরণ করেন। ডাঃ ধরের রাজনৈতিক জীবন ও তাঁহার জনসেবার প্রধানকেন্দ্র ছিল যশোহর। যশোহরের জীবনের সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে যশোহরে তাঁহার খ্যাতি অসাধারণ ছিল।

পাকিস্থান হওয়ার পর তিনি বনগ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ১৯৫১-৫২ সনে তিনি প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার কারা-মন্ত্রী হন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পূর্ণ সদস্য।

ডাঃ ধরের পরলোকগমনে উনবিংশ শতকের সহিত আর একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইল। কর্ম্মজীবনে কীর্ত্তি ও খ্যাতি পশ্চাতে রাখিয়া তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার নিরলস কর্ম্মজীবন বহু ধারায় প্রবাহিত হইলেও, দেশপ্রীতি ও জনসেবার আন্তরিকতাই তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

পরলোকে শিল্পী পঞ্চানন রায়

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, তরুণ চিত্র-শিল্পী পঞ্চানন রায় গত ৯ই পৌষ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে তিনি তাঁহার শিল্প-প্রতিভার অনেক পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

আর্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত চিত্রকর স্বর্গীয় হীরালাল দুগারের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার অঙ্কিত বহু ছবি প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। তাঁহার ছবিগুলির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে মর্য্যাদা দান করিয়াছে। এদিক দিয়া তাঁহারও যেমন অনেক কিছু দিবার ছিল, আমাদেরও অনেকখানি আশা ছিল তাঁহার উপর। তাঁহার এই অকালমৃত্যু আমাদের ব্যথিত করিয়াছে।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

গত ২০শে জানুয়ারী বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক, আইনজীবী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একান্ত সচিব অধ্যাপক ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক ডঃ দাশগুপ্ত বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্বরূপে পরিচিত ছিলেন।

ডঃ দাশগুপ্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। তিনি ১৯২২ সনে কারাবরণ করেন। বিশিষ্ট আইনজীবী হিসাবে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ খ্যাত ছিলেন এবং ৫০ বৎসর ওকালতি করার জন্য আলিপুর বার এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক তিনি ১৯৬২ সনে সম্বর্দ্ধিত হন। ইহা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ডঃ দাশগুপ্তের দান অবিস্মরণীয়। সাহিত্যে তিনি জাতীয়তাবাদের জাগ্রত সমর্থক ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যরস দেশে ব্যাপকভাবে প্রচারই তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল। নাটক ও নাট্যকলা এবং নাট্যালয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যেমন সুগভীর ছিল, এই বিভাগে তাঁহার রচনাও তেমনি ছিল অজস্র। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন নিরতিশয় বন্ধু-বৎসল, সদালাপী ও নিরভিমান। পূর্ণ বয়সে লোকান্তরিত হইলেও, তাঁহার আসনটি তাই কোনদিন পূর্ণ হইবে না।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ্চা

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

প্রায় পঞ্চকাল পূর্ব্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তরফ হইতে টেলিফোনযোগে আজিকার এই প্রতিষ্ঠাদিবসে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটু কৌতুকও হইয়াছিল—ইহা ভাবিয়া যে, যদিও আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পরিষদের সভাপতি এবং সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরকাল হইল ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তথাপি এই পরিষদের সহিত এ যাবৎ আমার কোন যোগাযোগই হয় নাই। আমি অবশ্য জানিতাম যে, বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই পরিষদ্ বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাই আমি সাগ্রহে পরিষদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম; এবং তদনুসারে অদ্যকার অনুষ্ঠানে "প্রধান অতিথি"রূপে আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। আমাকে এই সুযোগ প্রদানের জন্য পরিষদের কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে দুই-চারিটি কথা আমি নিবেদন করিতে চাই। বিশেষতঃ দুইটি দিক্ দিয়া আমি আলোচনা করিব। প্রথম কথা, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টা এই নূতন নহে; বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; বিজ্ঞান পরিষদের ন্যায় যাঁহারা এই বিষয়ে বর্ত্তমানে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উচিত আমাদের পূর্ব্বসূরিগণ এই বিষয়ে কতটা কাজ করিয়াছেন, তাহার খোঁজ রাখা। আর দ্বিতীয় কথা হইতেছে, বর্ত্তমানে কি ভাবে এবং কি উপায়ে বাঙ্গালার তরুণ-সমাজে বিজ্ঞান-বিদ্যাকে জনপ্রিয় এবং চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা যায়, তাহার আলোচনা করা।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ব্রিটিশ রাজত্ব এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, পাশ্চাত্য শিক্ষা ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে লাগিল, এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কি প্রকারে বিজ্ঞানের সাহায্যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতিলাভ করিয়াছে, ইহা বাঙ্গালার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন, তখন হইতেই আমাদের দেশে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তখন পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—সূচনা হইয়াছে মাত্র। এই প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে যে মনীষীর কথা সর্ব্বাগ্রেই মনে পড়ে, তিনি হইলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এখন হইতে এক শতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা রাজেন্দ্রলাল উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মনীষী; আর্য্য-সভ্যতা-সম্পর্কীয় তাঁহার গবেষণা, ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার রচনাবলী, এই সকল বিষয়ে বাঙ্গালার প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে তাঁহার নাম অবিস্মরণীয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এক হিসাবে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় বটে, কিন্তু তাহা ছাড়াও যাহাকে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলে, তাহাতেও তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নাম "বিবিধার্থসংগ্রহ"; তাহাতে মাসের পর মাস নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা থাকিত। তা ছাড়া "প্রকৃতি ভূগোল" নামে পুস্তকও একখানি লিখিয়াছিলেন। তারপর মনে পড়ে খ্যাতনামা লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের কথা। তিনি প্রধানতঃ ছিলেন ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে পারদর্শী; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া তিনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক হন; কিন্তু এই সব তত্ত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বালকবালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি রচনা করিলেন, "চারুপাঠ" (তিনভাগে সম্পূর্ণ); আমরাও বাল্যকালে "চারুপাঠ" পড়িয়াছি; তাহাতে বর্ণিত পুরুভুজের কথা এখনও মনে আছে। সুন্দর সুললিত ভাষায় চিত্তাকর্ষকভাবে তরুণদিগের নিকট বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করাই ছিল অক্ষয়কুমারের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, "পদার্থবিদ্যা" নামে খাঁটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একখানি পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন। উঁহার প্রায় সমসাময়িকই ছিলেন মনস্বী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়; তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি চিন্তাগর্ভ গ্রন্থগুলি ত বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তা ছাড়াও খাঁটি বিজ্ঞান ও গণিত

সম্পর্কেও বাঙ্গালাতে গ্রন্থ লিখিবার আগ্রহও তাঁহার কম ছিল না; ফলে তিনি লিখিলেন একখানি জ্যামিতির বই, নাম "ক্ষেত্রতত্ত্ব"; আর লিখিলেন "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।" এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে সব মনীষী বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই বিজ্ঞান-চর্চ্চায় উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন—মাতৃভাষার মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্রেও ইহার অন্যথা হয় নাই। তাঁহার অমর উপন্যাসরাজি ও ধর্ম্মবিষয়ক রচনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে "বিজ্ঞান-রহস্য"ও তিনি লিখিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও এই ধারা অব্যাহত রহিল। মনে পড়ে পুণ্য-শ্লোক পণ্ডিতপ্রবর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা; তিনি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor (প্রথম ভারতীয় উপাচার্য্যই ছিলেন তিনি); কিন্তু তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ এবং প্রথম জীবনে গণিতের অধ্যাপক; তাই গণিতই ছিল তাঁহার First-love—ইহাকে জীবনে ক'নও ভুলিতে পারেন নাই। ইংরাজীতে তিনি "Modern Geometry" লিখিয়াছিলেন—কলেজে আই. এ. ক্লাসে উহা আমরা পড়িয়াছি। কিন্তু তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; তাই মাতৃভাষায় তিনি লিখিলেন বীজগণিত ও জ্যামিতির বই। আপনারা অনেকেই হয়ত জানেন যে, পুরাতন পুস্তক যোগাড় করা আমার একটা ব্যসন বিশেষ—পুরাণো বইয়ের পোকা বলিলেই হয় আমাকে। স্যার গুরুদাসের এই বাঙ্গালা গণিতের পুস্তক দুইখানি আমি পুরাণো পুস্তকের দোকান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। দেখিতে পাইলাম যে জ্যামিতির চিত্রাঙ্কনে ও বীজগণিতের প্রতীক ব্যবহারে তিনি ইংরাজী A, B, C, বা x, y, z-এর পরিবর্ত্তে বঙ্গাক্ষর ক, খ, গ, ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন; তাছাড়া, অনেক নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দও তিনি চয়ন করিয়াছেন। ইহারও বহু পূর্ব্বে—১৮৭১-৭২ সনে—খ্যাতনামা শিক্ষক ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় বাঙ্গালাতে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাহাতেও এই প্রকারই বঙ্গাক্ষর ব্যবহার। আমাদের নিজেদের মাতৃ-ভাষা, বর্ণমালা ও জাতীয় ধারার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে যেন এই সব রচনা ভরপুর। দুঃখের বিষয়, আজকালকার বাঙ্গালাতে রচিত বিজ্ঞান-পুস্তকাদিতে সেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পরিচয় খুব কমই মিলে।

তারপর মনে পড়ে বাঙ্গালার বিজ্ঞান-সাহিত্যের বিরাট্ পুরুষ প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা। আমার পরম সৌভাগ্য যে এই দেবতুল্য জ্ঞানতপস্বীর সাহচর্য্যের সুযোগ আমি লাভ করিয়াছিলাম। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল (১৯১৪-১৯) ধরিয়া রিপণ কলেজে তাঁহার সান্নিধ্যে ছিলাম। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়—নানা বিষয়ে—ধর্ম্মে, দর্শনে, রসায়নে, পদার্থবিদ্যায়, জীববিদ্যায়, শব্দতত্ত্বে, বৈদিক সাহিত্যে। এই মনীষীর অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ; আচার্য্য রামেন্দ্র-সুন্দর যখন শেষশয্যায় শায়িত তাঁহার ৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, ১৩২৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে—তখন রবীন্দ্রনাথ সেই বাড়ীতে গিয়া শেষবারের মত তাঁহাকে দেখিয়া আসেন। যাক্। রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যান্য অবদানের কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে চাই না; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাতে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যে ভাবে তিনি আলোচনা করিয়াছেন ও আলোকপাত করিয়াছেন—তাঁহার "প্রকৃতি", "জিজ্ঞাসা" প্রভৃতি গ্রন্থে—তাহা বাঙ্গালী চিরদিন স্মরণ রাখিবে। বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, চিন্তার গভীরতায় ও ভাষার লালিত্যে ও প্রাঞ্জলতায় এই গ্রন্থগুলি অপূর্ব্ব—বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে জীবন-মধ্যাহ্নেই—মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে—১৩২৬ সালে এই প্রগাঢ় মনীষার দীপ্তি চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও তাঁহার বহু মৌলিক আবিষ্কার, তত্ত্ব ও তথ্য বাঙ্গালাতে গ্রথিত করিয়াছিলেন তাঁহার "অব্যক্ত" গ্রন্থে। এ স্থলে উল্লেখ-যোগ্য যে, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের ছাত্র; হয়ত গুরুর নিকট হইতেই শিষ্য বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও আলোচনার প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন। লোকোত্তর প্রতিভা-সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের কথা ত ছাড়িয়াই দিলাম; তাঁহার অসংখ্য কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার মধ্যেও তিনি বিজ্ঞানালোচনায় আকৃষ্ট হইয়া "বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন।

সুন্দর সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচয়িতাদিগের প্রসঙ্গে আরও দু'এক জনের নাম মনে পড়ে। বোলপুর শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ছিলেন জগদানন্দ রায় মহাশয়, তাঁহার রচিত "গ্রহ-নক্ষত্র", "পোকা-মাকড়", "পাহপালার কথা" ইত্যাদি তরুণ-সমাজে এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আর্টিষ্ট হিসাবে বিখ্যাত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নামও আশা করি অনেকেই জানেন; তাঁহার রচিত "ছেলেদের রামায়ণ", "ছেলেদের মহাভারত", প্রভৃতি পুস্তক আমাদের শৈশবে বড় আনন্দের সামগ্রী ছিল।

কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে, তিনি "আকাশের কথা" নামে জ্যোতিষ সম্বন্ধে একখানি সুন্দর সরল পুস্তক এবং প্রাণিজগৎ সম্বন্ধেও একখানি উপভোগ্য বই লিখিয়াছিলেন—সেটির নাম ছিল, "সেকালের কথা"; এই বইখানিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সমস্ত জীবজন্তু পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল কিন্তু পরে নির্ব্বংশ হইয়া extinct হইয়া গিয়াছে—Fossil-রূপে যাহাদের অস্থিপঞ্জরমাত্র কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে—Mammoth, Mastodon, Dinosaur, Ichthyosaurus, Pterodactyl প্রভৃতি—সেই সমস্ত প্রাণীর বিবরণ অতি সহজ ভাষায় চিত্র-সহযোগে বর্ণিত ছিল সেই বইখানিতে, তাই বালক-বালিকাগণের খুবই প্রিয় ছিল সেই বইখানি। আমাদের শৈশবে জীববিদ্যা বিষয়ে আর একখানি বই দেখিয়াছি মনে পড়ে—বইখানির নাম "জীবজন্তু", লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু: চিত্রবহুল ও তথ্যপূর্ণ ছিল সেই বইখানি। বড় হইয়া এই সব বইয়ের অনেক খোঁজ আমি করিয়াছি Old Book Shop-এ; কিন্তু পাই নাই—বোধ হয় এক্ষণে এই সব বই পাওয়াই যায় না; অন্ততঃ দুষ্প্রাপ্য যে সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। অথচ, এই সব বই লোপ পাইয়া গেলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনার পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। এই প্রসঙ্গে তাই একটা কথা আমার মনে হয়—বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ্ যদি এই সমস্ত লুপ্তপ্রায় গ্রন্থগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়; পূর্ব্বসূরিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞানালোচনার প্রসার যুগপৎ সম্পন্ন হয়।

এখন আর এক দিক্ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতে চাই। তরুণ-সমাজে—বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজে—বিজ্ঞান-আলোচনা তথা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রসার কিছু এক বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের একক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ে প্রধান agency বা কার্য্যকারক হইল আমাদের বিদ্যালয়গুলি—স্কুল ও কলেজগুলি, কারণ, লক্ষ লক্ষ ছাত্র তাহাতে অধ্যয়ন করে। সুতরাং বিজ্ঞানের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যসূচী (বা Syllabus) ও নির্ব্বাচিত পাঠ্যপুস্তকাবলী (Text-books) যদি সুষ্ঠুভাবে রচিত হয়, তবেই পাঠরত তরুণসম্প্রদায়ের চিত্ত বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। সাধারণ ভাবে আজকাল অবশ্য খুবই শোনা যায়, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। নানা রকম Optional বা Elective Course, Humanistic Studies, Science, Technology-ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হইয়াছে; তদনুযায়ী নানা পাঠ্যপুস্তকও রচিত হইতেছে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে, কারণ আমার মনে যথেষ্ট সংশয় আছে যে, ঠিক পথে এই সমস্ত প্রচেষ্টা চালিত হইতেছে কি না—বিজ্ঞানালোচনার অনুকূলে লোকের মন আকৃষ্ট হইতেছে কি না।

আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই এ বিষয়ে দুই-চারিটি কথা বলিব। আমরা যখন স্কুল-কলেজে পড়ি—সে আজ প্রায় ৫০-৬০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—তখন স্কুলের অধ্যয়ন সমাপনান্তে আমাদিগকে যে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহার নাম ছিল "Entrance Examination" বা "প্রবেশিকা পরীক্ষা"; অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের দ্বার বা তোরণস্বরূপ। নামটা উচ্চারণ করিতেই কেমন যেন একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার উদয় হইত। পরে এই স্তরের পরীক্ষার অনেক নামান্তর ঘটিয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের last batch-এ ছিলেন বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ বসু—তিনি ১৯০৯ সনে Entrance Examination পাস করিয়াছিলেন। সেই শেষবার—কারণ তাহার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯১০ সন হইতেই, পরীক্ষার নামান্তর হইল। আমি Entrance পরীক্ষা পাস করিয়াছিলাম সত্যেনের পূর্ব্ব বৎসর (১৯০৮ সনে)। যাক্, নাম পাল্টাইয়া পরীক্ষার নাম হইল "Matriculation"; আমি ইংরাজী অভিধান খুলিয়া দেখিয়াছি যে, এই শব্দটির অর্থ, শুধু তালিকাভুক্ত করা বা registration—একেবারে colourless নাম, কোন শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের লেশমাত্র নাই নাম লিষ্টিভুক্ত হওয়াতে। এই নাম চলিল বহু বৎসর ধরিয়া—বোধ হয় বছর চল্লিশেক। তারপর আবার নামান্তর হইল, "School Final", বিদ্যালয়ের অন্তিম পরীক্ষা—অর্থাৎ বিদ্যার যেন অন্তিমদশা উপস্থিত। সর্ব্বশেষে আর একটি নামের আমদানী হইয়াছে—"Higher Secondary"; এই নামটির বঙ্গীকরণ করা যাইতে পারে "উত্তম-মধ্যম" —কারণ Higher যে উত্তম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, আর Secondary Education ও মাধ্যমিক শিক্ষা বলিয়া ঘোষণাই করা হইয়াছে; সুতরাং নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, এতদিন পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য "উত্তম-মধ্যম" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মন্দ কি?

যাক্ রহস্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আসল প্রসঙ্গে আসা যাউক—বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে। আমাদের সময়েও Entrance পরীক্ষায় বিজ্ঞান পঠিত হইত। মনে পড়ে, আমরা পড়িয়াছি Thmoas Huxley-র Science Primer, Sir Archibald Geikie-র Physical Geography Primer, আর

C. B. Clarke-এর Class-Book of Geography। চমৎকার ছিল সে সব বই—অবশ্য লেখা ইংরাজীতে—তাহাতে যে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি বা অসুবিধায় পড়িয়াছি, এমন ত মনে হয় না। কারণ Huxley বা Geikie-র বই ছিল অতি সুন্দর ও সহজ ভাষায় লেখা; আর তাহাতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মোটা মোটা কথাগুলি বা মূল তত্ত্বগুলিই প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত ছিল—Mechanical Mixture ও Chemical Combination-এর কি পার্থক্য; Atoms ও Molecules কাহাকে বলে; Inertia বা Specific Gravity বলিলে কি বুঝায়; Dew, Frost, Snow flakes, Volcano প্রভৃতি কি প্রকার এবং কি কারণে উৎপন্ন হয়—ইত্যাদি বর্ণিত ছিল। C. B. Clarke-এর ভূগোলখানিতে অবশ্য অনেক জিনিষই থাকিত, তবে সবটা আমাদের পড়িতে হইত না; এবং যেটুকু আমাদের পাঠ্য ছিল, তাহা সুন্দর পরিপাটী ভাবেই রচিত ছিল। স্কুলের ছাত্রদিগের বয়স খুব বেশী নহে; কিশোর বয়সে ১৪।১৫।১৬ বৎসর বয়সেই সচরাচর Entrance Class-এ পড়া হইত, তাই তরুণ-মনের উপযোগী করিয়া ও চিত্তাকর্ষক ভাবেই এই গ্রন্থগুলি রচিত হইত; আর লেখকগণও ছিলেন সব মহারথী—Huxley, Geikie-র নাম ত বিজ্ঞানজগতে বিখ্যাত। ফলে হইত এই যে ছাত্রদিগের মনে বিজ্ঞানের দিকে একটা আকর্ষণ বা ঝোঁক ও ভাল করিয়া জানিবার আগ্রহ জাগিত। তদুপরি, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর পড়িতে হইত First Arts Course (F. A.)—তাহাতেও সব ছাত্রদিগেরই English, Sanskrit, Logic, History-র সঙ্গে সঙ্গে Mathematics, Physics, Chemistry পড়িতে হইত। সুতরাং সব ছাত্রই মোটামুটি F. A. Standard পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শিখিতে পাইত। পরবর্ত্তী যুগের মত, অকালে Bi-furcation বা Specialization বা Option-এর ফলে ছাত্রদিগের শিক্ষা একপেশে (বা lop-sided) হইয়া পড়িত না। অসময়ে অতি তরুণ বয়সে এই প্রকার Option বা Specialization-এর ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে যাহারা Humanities বা Arts-এর দিকে যায় তাহারা Science বা বিজ্ঞানের প্রায় কিছুই জানে না; অপরপক্ষে, যাহারা Science বা Technology-র দিকে যায়, তাহারা History বা Logic বা Literature-এর কোনই খবর রাখে না। সত্য কথা বলিতে এবংবিধ dichotomy-র ফলে আজকাল যাহাকে প্রকৃত সুশিক্ষিত বা cultured মানুষ বলা যায় তাহাই দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষাবিষয়ে যাঁহারা কর্ণধার—নিত্য নূতন plan বা পরিকল্পনা শিক্ষাজগতে আমদানী করিয়া বাঙালী সমাজকে প্রায় হতবুদ্ধি ও দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহাদিগের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক মনে করি।

এখন, স্কুলে যেভাবে বিজ্ঞান পঠিত হয়, এবং বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। নামতঃ—কার্য্যতঃ কতটা হয় জানি না—বিজ্ঞান অধ্যাপনাতে বাহ্যাড়ম্বর যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তোড়যোড় হাঁকডাক যথেষ্ট। কিন্তু যে রকম বিজ্ঞান পুস্তক School Final প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য রচিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ত আক্কেল গুড়ুম। Huxley, Geikie-এর শত পৃষ্ঠা পরিমিত Primer-এর পরিবর্ত্তে এ যেন এক একখানি Encyclopædia বা বিশ্বকোষ—পাঁচ ছয় শত পাতার কম আয়তন হইবে না; এবং ইহাতে না আছে কি? Astronomy, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Physiology, Geology, আরও কত কি? কিশোরবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ না করিয়া ছাড়া হইবে না। আর, এতগুলি বিষয় একখানি বইয়ে সন্নিবেশিত হওয়াতে কোন বিষয়েরই আলোচনা বিশদভাবে হইতে পারে না—সবই প্রায় সংক্ষিপ্ত তথ্য-তালিকার মত হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ Cramming-এর চূড়ান্ত। না বুঝিয়া তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা ছাড়া বেচারা ছাত্রদিগের কোন গত্যন্তর থাকে না। ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকও দেখিয়াছি—প্রকাণ্ড চারি পাঁচ শত পাতার বই—তাহাতে Mathematical Geography, Physical Geography, Economic & Commercial Geography, Flora and Fauna, ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়াবলী আলোচিত হইয়াছে—অবশ্যপাঠ্য Political Geography এবং বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ সাগর-মহাসাগর নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত নগর-রাজধানী ইত্যাদির বিবরণ ছাড়াও। নানান্ দেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি চা, কাফি, পাট, ধান, গম, তুলা ইত্যাদি বিষয়ে এত বহুমূল্য তথ্য ও সংবাদ এই সব স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে পরিবেশন করা হইয়া থাকে যে, বাঙ্গালার মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বা শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরাও ইহা হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারেন। কিন্তু ছাত্রদিগের নিকট ভূগোল হইয়া দাঁড়ায় এক নিদারুণ বিভীষিকা। এই প্রকার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ফলে—বিজ্ঞান-শিক্ষায় ও বিজ্ঞান-

গ্রন্থ রচনায়—ফল হয় এই যে বিজ্ঞানের দিকে চিত্তের আকর্ষণ জন্মান দূরে থাকুক, জন্মায় একটা বিকর্ষণ (বা repulsion)—তিক্ত ঔষধ গলাধঃকরণে যে প্রকার হয়। আপনারা বলিতে পারেন, তবুও ত বিজ্ঞান ও Technical Education-এর দিকেই অধিকাংশ ছেলে ঝুঁকিতেছে—ইহার কারণ কি? আমি বলিব, অবশ্যই ইহার কারণ আছে; কিন্তু সেই কারণ বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বা আসক্তি নহে, নেহাৎই অর্থনৈতিক কারণ—"অন্নচিন্তা চমৎকারা।" ছেলেরা ভাবে (এবং অভিভাবকেরাও স্বভাবতঃই ভাবেন) যে বিজ্ঞান লইয়া পাস করিতে পারিলে হয়ত অন্ন জুটিবার সম্ভাবনা কিছু বেশী হইতে পারে—মুদ্রা-সঞ্চয়ের পথ হয়ত একটু সুগম হইতে পারে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে বিজ্ঞান পড়িবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে তাহার আসল কারণ বিজ্ঞান-প্রসক্তি নহে, আসল কারণ হইল "মুদ্রাদোষ।"

এ ত গেল বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচনার একদিক্। আরও একটা অদ্ভুত দিক্ আছে; বর্ত্তমানে এই দিক্‌টাই বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষতঃ গণিত-পুস্তকে। আপনারা ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না; কিন্তু আমাকে বাধ্য হইয়াই জানিতে হইয়াছে, কারণ আমি বহুদিন ধরিয়া গণিতের অধ্যাপনা করিয়াছি এবং বহু গণিত-পুস্তক আমাকে লিখিতে হইয়াছে। সে অদ্ভুত ব্যাপারটি এই। বই লেখা হইতেছে মাতৃভাষা বাঙ্গালাতে; কিন্তু সে সমস্ত বইয়ে আমাদের বাঙ্গালা বর্ণমালা চলিবে না বা বাঙ্গালা অঙ্কচিহ্ন (digit) ব্যবহার করা চলিবে না; অর্থাৎ জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কণে ক খ গ ইত্যাদির পরিবর্ত্তে A, B, C ইত্যাদি, বীজগণিতের অঙ্কে x, y, z ইত্যাদি চালাইতে হইবে, আর ১, ২, ৩ প্রভৃতি ত চলিবেই না, সর্ব্বত্রই চালাইতে হইবে 1, 2, 3 ইত্যাদি। এমন কি অঙ্কের বইতে page ও article numbering-এ ও ১, ২, ৩-এর ব্যবহার লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফলতঃ, এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিলে স্কুল-কলেজের ত্রিসীমানার মধ্যে বাঙ্গালা হরফের ১, ২, ৩ ইত্যাদির প্রবেশ নিষেধ। দু'দিন পরে বোধ করি বাঙ্গালীর বাচ্চা বাঙ্গালা ১, ২, ৩ হরফ চিনিতেই পারিবে না। স্বরাজ প্রাপ্তির অপূর্ব্ব পরিণতি বটে! পণ্ডিতেরা অবশ্য বলেন, ইহাতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন? 1, 2, 3 প্রভৃতি ত আমাদের পুরাতন ম্লেচ্ছ যবন ইংরাজদেরই হরফ নহে, উহারা হইল International Numerals—সুতরাং সর্ব্বজনমান্য ও সর্ব্বদেশগ্রাহ্য; উহাদের ব্যবহার এদেশে চালু না করিতে পারিলে আধুনিক সভ্য-সমাজে যে মুখ দেখান ভার হইবে। হইবেও বা—কারণ দেখাই যাইতেছে যে আমরা বর্ত্তমানে, অন্ততঃ ভারতবর্ষে, একটা International বা আন্তর্জ্জাতিক ভাবালুতার (বা Obsession-এর) পরিবেশের মধ্যে বাস করিতেছি। আমাদের এই ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধার যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহাদের ত ভারতের জন্য বিশেষ কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না—ভারতবর্ষ বাঁচুক বা মরুক তাহাতে তাঁহাদের কিছু আসিয়া যায় এমন ত মনে হয় না—তাঁহাদিগের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিলেই হইল—আন্তর্জ্জাতিক বা বিশ্বশান্তি রক্ষার গুরুভার যে তাঁহাদেরই সুবিশাল স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে। যাক্, সুতরাং পাটীগণিত পুস্তকে ১ টাকা ৫ আনা ৪ পাই লেখা চলিবে না, লিখিতে হইবে 1 টাকা 5 আনা 4 পাই; এখন ত আবার আর এক উপদ্রব উপস্থিত—নয়া পয়সার—সুতরাং এখন আর উহাও চলিবে না। ১৸০ আনা ত উঠিয়াই গিয়াছে—1টা. 12 আ.ও অচল—একমাত্র সচলরূপ জল্ জল্ করিতেছে টা. 1.75। যে শুভঙ্করীর আর্য্যার সাহায্যে শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ বিষয়কর্ম্ম অতি সুষ্ঠু ও দ্রুতভাবে চালাইয়াছে, তাহা ত আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনার ন্যায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—কারণ আধুনিক নব্যদিগের মতে শুভঙ্করী ত obsolete মধ্যযুগীয় কুসংস্কার মাত্র। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশীয় রীতির প্রতি দরদের নিদর্শন বটে! আর "আধুনিক" সাজিবার উৎকট উৎসাহে ফরাসী কিলোগ্রাম, কিলোমিটার প্রভৃতির আমদানী হওয়ায়, হাটে-বাজারে রাস্তায়-ঘাটে ত কিলোকিলি সুরু হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসিল। বলিয়াই ফেলি—আশা করি কিছু মনে করিবেন না। ভরসা করি সত্যেন ভায়াও মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না—কারণ বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেই কিছু মন্তব্য করিতেছি। পরিষদ্ হইতে একখানি সুন্দর মাসিক পত্রিকা—নাম "জ্ঞান ও বিজ্ঞান"—প্রকাশিত হইয়া থাকে; পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার বৎসর হইতেই এই পত্রিকাটির আরম্ভ; বর্ত্তমানে ইহার ষোড়শ বর্ষ চলিতেছে। কিন্তু পত্রিকার প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই একটা জিনিষ আমার বড় বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু ঠেকিল। পত্রিকাটি হইল বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা; উদ্দেশ্য মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার; কিন্তু উপরেই লেখা দেখিলাম যে এই সংখ্যাটি জানুয়ারী ১৯৬৩-র।

এ কি কথা? বাঙ্গালা দেশ হইতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ লোপাট হইয়া গেল নাকি? বাঙ্গালা মাসিক—বাঙ্গালা মাস অনুসারে বাহির হইবে ইহাই ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ইহার মধ্যে আবার জানুয়ারীর উৎপাত কেন? আরও একটু বলি। আজিকার এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপিতে তারিখ লেখা দেখিলাম ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩। কেন? ১০ই ফাল্গুন, ১৩৬৯ কি দোষ করিল? বাঙ্গালা তারিখ লিখিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত? ফাল্গুন অপেক্ষা ফেব্রুয়ারী যে শ্রুতিমধুর বা প্রিয়দর্শন, আশা করি এমন কথা কেহ বলিবেন না, আর ১, ৩, ৬, ৯ ত ১, ৯, ৬, ৩ অঙ্ক সংখ্যাগুলির পুনর্বিন্যাস বা permutation মাত্র।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসিল। আপনারা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ব্যক্তিটির নাম শুনিয়াছেন। আচ্ছা, তাঁহার জন্মদিনটি কবে? ২৫শে বৈশাখ, তাহা ত সকলেই জানেন। কিন্তু যে মাসের কোন্ তারিখে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহা বোধ করি অনেকেই জানেন না। দেশীয় বাঙ্গালা সন তারিখই আপনাদের জানা আছে। কিন্তু আর একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নাম করিতেছি—সুভাষচন্দ্র বসু—"নেতাজী" নামে আজকাল তিনি সর্বজন পরিচিত। তাঁহার জন্মদিনটি কবে? আপনারা বলিবেন, ২৩শে জানুয়ারী। সকলেই এ তারিখটা জানেন; বিশেষতঃ যখন এই তারিখটিতে বাঙ্গালা সরকার ছুটি ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু কতই মাঘ সুভাষের জন্ম হইয়াছিল বলুন ত? অনেকেই হয়ত জানেন না—সুভাষের জন্ম-তারিখ ১১ই মাঘ, ১৩০৩ সন। আজকাল অবশ্য ১১ই মাঘ ইংরাজী তারিখ ২৩শে জানুয়ারীতে পড়ে না; পড়ে সাধারণতঃ ২৫শে জানুয়ারীতে। এ রকম তারতম্য হয় পাশ্চাত্য সায়নপদ্ধতি ও ভারতীয় নিরয়ণ পদ্ধতিতে বর্ষগণনার সামান্য বৈষম্যের জন্য। যাক্, সেটা জ্যোতিষ-ঘটিত ব্যাপার—সেজন্য এই প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করি নাই। আমার উদ্দেশ্য এই কথাটি আপনাদিগের সমক্ষে তুলিয়া ধরা, যে রবীন্দ্রনাথের যুগে ও সুভাষচন্দ্রের যুগে—অর্থাৎ মাত্র দুই পুরুষের তফাতে—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কতটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে বাঙ্গালীর জন্ম-মৃত্যু-বিবাহাদির তারিখ, ক্রিয়া-কর্ম-আমন্ত্রণাদির তারিখ ইত্যাদিতে বাংলা সন-মাস-তারিখই ব্যবহৃত হইত; আর বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই এবং সর্বদাই ইংরাজী সন মাস তারিখই ব্যবহৃত হইতেছে। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পত্রাদিতেও এই প্রকার—অর্থাৎ অতি কচিৎ কদাচিৎ বাঙ্গালা সন তারিখ ব্যবহার করা হয়। মাতৃভক্তি ও আত্মমর্য্যাদা বোধের নিদর্শন বটে!

আমার মনে হয় কি জানেন? ইংরাজ রাজত্ব চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরাজী-পণা পুরাপুরি রহিয়া গিয়াছে। বোধ হয় আমি একটু কম করিয়াই বলিলাম —কারণ চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি যে সাহেবেরা সাগরপারে চলিয়া যাইবার পর সাহেবিয়ানা এদেশে দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু লেখায় পড়ায় কথায় বার্তায় নহে, অশনে বসনে বেশভূষায় পর্য্যন্ত। আমাদের পঠদ্দশায় স্কুল কলেজে কচিৎ কদাচিৎ কোট প্যান্ট পরিহিত ছাত্র দেখা যাইত, সকলেই প্রায় ধুতি পরিয়া আসিত। আর আজ-কাল? আজকাল স্কুল-কলেজে ধুতিপরা ছাত্রই ব্যতিক্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাদর বা উত্তরীয় ত উঠিয়াই গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে দেশভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথের সত্যবাণী স্বতঃই মনে উদিত হয়:—

"রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষা-ভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারই উত্তরীয়।"
"পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন
যদি হই দীন না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।"

সেই যুগ আর এই যুগ—মাত্র অর্দ্ধশতাব্দীর তফাৎ—ইহারই মধ্যে প্রগতির নামে মনোবৃত্তির কি শোচনীয় অধোগতি! অথচ শোনা যায় যে আমাদের দেশ নাকি স্বাধীন হইয়াছে—বিদেশীর নাগপাশ বন্ধন হইতে আমরা নাকি মুক্ত হইয়াছি। কেহ কেহ অবশ্য বলেন, এইপ্রকার পরিবর্তনের আসল কারণ অর্থনৈতিক—কোট-প্যান্ট-টাই নাকি ধুতি-পিরান-চাদর অপেক্ষা সস্তা। বলিতে পারি না—কারণ এ বিষয়ে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। সম্ভবতঃ ইহা একপ্রকার Economic Interpretation of Costumes বা Sartorial Marxism!

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িল। আপনারাও নিশ্চয় জানেন। Lewis Carroll-এর বিখ্যাত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ Alice's Adventures in Wonderland-এ এই গল্পটি আছে। একদিন Alice খুকী বেড়াইতে বেড়াইতে একটা গাছের ডালে বিকটদর্শন এক মার্জ্জারপুঙ্গবকে (Cheshire Cat) দেখিতে পায়; সেই মার্জ্জারটি খুকীকে দেখিয়া অদ্ভুতভাবে হাসিতে থাকে। সেই হাসি বা grin দেখিয়া খুকী Alice ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে হইল এক অবাক্ কাণ্ড। সেই Cheshire Catটি ধীরে ধীরে অন্তর্দ্ধান করিল, কিন্তু তাহার বিকট হাসি বা grin-টি লাগিয়াই রহিল, মিলাইয়া গেল না। ইংরাজ-রাজত্বের অবসানের পরও ইংরাজীয়ানার এই প্রাদুর্ভাব যেন সেই Cheshire Cat and its grin-এরই অনুবৃত্তি।

যে সমস্ত লক্ষণ আপনাদের সমক্ষে আমি উদ্‌ঘাটিত করিবার সামান্য একটু চেষ্টা করিলাম—হয় ত আপনাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চার আলোচনার আসরে কতকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এই সমস্ত লক্ষণই আমাদের জাতীয় মানসে যে দুরারোগ্য ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কয়েকটি Symptom মাত্র। ব্যাধি হইতেছে জাতীয় মর্য্যাদাবোধের অভাব —পরাসক্তি (বা parasitism), পরবশতা এবং পরানুকরণপ্রিয়তা। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকতার দোহাই দিয়া এই মানসিক পঙ্গুতা ঢাকিবার চেষ্টা করা হয় ; কিন্তু সেই যুক্তি একেবারেই অচল। ১৯৬৩ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী আর ১৩৬৯ সনের ১০ই ফাল্গুন, এতদুভয়ই তুল্যমাত্রায় বিজ্ঞানসম্মত—মাস-বর্ষ-গণনার বিভিন্ন রীতি মাত্র ; ইহাদের মধ্যে একটির পরিবর্ত্তে আর একটিকে গ্রহণ করার মধ্যে আর যে যুক্তিই থাকুক, বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি নাই। এই যে মানসিক বিকৃতি—বিষম ব্যাধি বলিলেই হয়—জাতীয় মানসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সাহেবিয়ানা প্রবেশ করিয়াছে, শুধু "আংরেজী হটাও" বুলির দ্বারা ইহার প্রতিকার সম্ভব নয় ; প্রতিকার বাস্তবিক করিতে গেলে আরও অনেক গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে—"আংরেজীয়ানা হটাও" মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। গোলামী মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরবশতা, পরাসক্তি, পরানুচিকীর্ষা বর্জ্জন করিতে হইবে—দাস-মনোবৃত্তি Slave mentality আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের প্রগতিপন্থীদিগের ধরণধারণ রকমসকম দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহারা যে বাঙ্গালী হইয়া জন্মিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা সাতিশয় লজ্জিত, সঙ্কুচিত, পরিতপ্ত ; দেশীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার মনে মনে তাঁহারা ঘৃণা করেন, অবজ্ঞা করেন ; পুরাপুরি সাহেব না হইতে পারিলে যেন তাঁহাদের ক্ষোভ মেটে না। কিন্তু বিধি যে বাম, বর্ণ যে শ্যাম। এই দাস-মনোবৃত্তি, এই হীনম্মন্যতা (বা inferiority complex) পরিহারপূর্ব্বক জাতীয় মর্য্যাদা এবং দেশাত্মবোধের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে সসম্মানে ও সগৌরবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ইহাকে উৎকট স্বদেশীয়ানা বা উগ্র স্বাদেশিকতা আপনারা বলিতে চাহেন ত বলুন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দেশভক্তির উপরে, স্বদেশের ও স্বজাতির আত্মসম্মানবোধের উপরে, জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমরা আজ সকলে সমবেত হইয়াছি, প্রার্থনা করি যে সেই বিজ্ঞান পরিষদ্ মাতৃভাষার প্রতি, দেশ-জননীর প্রতি, বাঙ্গালার গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও অবিমিশ্র ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তদীয় সংকল্পিত মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অগ্রসর হউন।*

* বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রামমোহন লাইব্রেরী হলে প্রধান অতিথিরূপে বক্তৃতা (১০ই ফাল্গুন, ১৩৬৯)।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

কলিকাতা বড়বাজারে একটা তেলের দোকান। নারকেলের আর সর্ষের তেল পাইকারী বিক্রী হয়।

পাথরের ইঁট-বাঁধানো একটা নোংরা রাস্তা। ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি, ঠেলা আর রিক্সাতে সর্বক্ষণ ভর্তি। পথ চলা দুষ্কর।

তারই ধারে দোকান : হীরালাল এণ্ড কোং।

উঁচু দাওয়া-ওলা বাড়ী। বাড়ীটা যখন তৈরি হয়েছিল তখন রাস্তা থেকে ওঠবার জন্যে একটা সিঁড়িও নিশ্চয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তেলের পিপে ওঠান-নামানর প্রয়োজনে সেটা ভেঙে ঢালু করা হয়েছে। পিপেগুলো রাস্তা থেকে গড় গড় ক'রে গড়িয়ে উপরে তোলা যায়।

তার ফলে ব্যবসার সুবিধা হয়েছে বটে, কিন্তু তৈলাক্ত পিচ্ছিল পথে, বিশেষত বর্ষার দিনে, মানুষের ওঠা-নামায় অসুবিধা হয়। তবে বার বার আসা-যাওয়ার ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের আর অসুবিধা হয় না।

সিঁড়ি, অর্থাৎ ওই ঢালু পথটা উঠতেই বাঁ-দিকে উঁচু বারান্দা, তিন দিকে লোহার মোটা শিক দিয়ে ঘেরা। সেখানে সর্বক্ষণ মাদুর বিছান। দোকানের কর্মচারীরা ভিতরে অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠলে ওখানে ব'সে (কিংবা শুয়ে) বিশ্রাম করে, লোক-চলাচল দেখে।

ঢালু পথ দিয়ে উঠতেই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রশস্ত একখানা ঘর। বাঁ-দিকে উঁচু তক্তাপোশের উপর চিত্রিত অয়েল-ক্লথ। সেইখানে একখানা কাঠের হাতবাক্স নিয়ে ম্যানেজার বসে। তার পাশে মুহুরী খাতা লেখে।

ম্যানেজারের মাথায় প্রশস্ত টাক। বিপুল লোমশ কলেবর। গায়ে একখানি মলিন ফতুয়া। তার বোতাম কখনও লাগান হয় না। গলায় তুলসীর মালা।

পাশের মুহুরীটি শীর্ণকায়। চোখে নিকেলের চশমা নাকের ডগায় নেমে এসেছে। লোকজন এলে তার ফাঁক দিয়ে একবার চেয়ে দেখে আর খেরো-বাঁধানো মোটা মোটা খাতায় মনোনিবেশ করে।

এদিকে একটা প্রকাণ্ড দাঁড়িপাল্লা। তাতে তেলের পিপে ওজন করা হয়।

কাছেই একটা টুল। সেইখানে ব'সে থাকে রামকিঙ্কর।

সেই ঘরটার কোলেই আর একটা ওই মাপেরই ঘর। কোনোটার মেঝেই সিমেণ্ট বাঁধানো নয়। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ইটের মেঝে। তফাতের মধ্যে এই ঘরটা অনেকটা অন্ধকার। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে চোখ অভ্যস্ত হ'লে তবে দেখা যায়। হাত-দুই একটা রাস্তা রেখে সমস্ত ঘরটাই তেলের পিপের বোঝাই।

তার পরে উঠান। সেখানে একটা প্রশস্ত চৌবাচ্চা আর কল। অবশিষ্ট স্থানটুকু তেলের পিপের দখলে।

ওপাশে আরও একখানা ঘর আছে। সেটা একেবারেই অন্ধকারে। আলো না জ্বাললে কিছু দেখা যায় না। এটাও তেলের পিপেয় ভর্তি।

আলো জ্বালার পরেও এ ঘরে কর্মচারীরা ঢুকতে ভয় পায়। এটা ইঁদুরের রাজত্ব। বেড়ালের মত কেঁদো কেঁদো ইঁদুর। মানুষকে মোটেই ভয় করে না। বরং পায়ের ফাঁক দিয়ে এমন ক'রে ছুটে চ'লে যায় যে, মানুষই আঁৎকে লাফিয়ে ওঠে।

সংখ্যায় এরা এত বেশি যে, এদের তাড়ান অসম্ভব বিবেচনা ক'রে মানুষ এদের সঙ্গে একটা আপোষ ক'রে নিয়েছে। কলহ-বিবাদ করে না।

দোতলায় রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর এবং কয়েকখানি শোবার ঘর। একখানিতে ম্যানেজার হরেকৃষ্ণ থাকে। সেটা রাস্তার দিকের ঘর। একটু আলো-হাওয়া আছে। অন্য ঘরগুলিতে অন্যান্য কর্মচারীরা থাকে। তাতে আলো অবশ্য আসে, কিন্তু হাওয়া নেই বললেই চলে।

শোবার জন্যে প্রত্যেকের একখানা ক'রে মলিন মাদুর, আর একটি ক'রে তৈলাক্ত বালিশ। মেঝে কদাচিৎ ঝাঁট দেওয়া হয়। চারিদিকে বিড়ির পোড়া টুকরো ছড়ান। আর ছারপোকার রক্তে দেওয়াল বিচিত্রিত।

তবু সমস্ত দিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পরে কর্মচারীরা এই বায়ুহীন ঘরে, ছারপোকাপূর্ণ মাদুরেই অঘোরে নিদ্রা যায়। অভ্যাসে কি না হয়?

সকলের আগে ঘুম থেকে উঠতে হয় রামকিঙ্করকে। সূর্যোদয়ের আগে বিছানা থেকে উঠে, মুখ হাত ধুয়ে তাকে দোকান খুলতে হয়। চৌকাঠে জলের ছিটে দিয়ে দোকানে ধূপ-ধুনা দিতে হয়।

অন্য কর্মচারীদের কেউ তখন ওঠে, কেউ ওঠে না।

নিজের কাজ সেরে রামকিঙ্কর বাইরের শিক-দিয়ে-ঘেরা বারান্দার মাদুরে এসে বসে।

বড়বাজার সবে তখন জাগছে।

খট্ খট্ শব্দ ক'রে একটির পর একটি দোকান খুলছে। কর্পোরেশনের লোক সবে রাস্তা ধুয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় সেই জল এখনও জ'মে আছে। দু'একটা রিক্সা এবং ছ্যাকরা গাড়ি সবে শব্দ ক'রে চলতে আরম্ভ করেছে।

অবগুণ্ঠিতা মহিলারা এবং কিছু কিছু পুরুষও লোটা হাতে কেউ স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ বা স্নান ক'রে ফিরছে। তাদের কণ্ঠ থেকে স্তোত্র গান উৎসারিত হচ্ছে। গুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি হীরার কুচির মত চারিদিকে ঝিলিক মারছে।

সদ্য নিদ্রোত্থিত কলিকাতাকে রামকিঙ্করের ভালো লাগে। এ ত যৌবনমদমত্তা নাগরীর নিদ্রাভঙ্গ নয়, এ যেন পল্লীর গৃহস্থবধূ ধীরে ধীরে চোখ মেলছে। তখনও চোখে ঘুম জড়ানো আছে। কিন্তু দৃষ্টিতে প্রথম প্রভাতের হাসিরও যেন ছোপ রয়েছে।

তার পরে ধীরে ধীরে সেই শান্ত প্রসন্ন রূপ যেন কোথায় মিলিয়ে যায়। কোথা থেকে নেমে আসে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য। ইস্পাতের ফলার মত তার ধারালো দাঁত থেকে থেকে ঝিলিক মারে। লোভে রক্তবর্ণ দুই চোখ। বৈশাখের খর-রৌদ্রের মত তার গাত্রবর্ণে চোখ ঠিকরে যায়।

সমস্ত দিন ধ'রে দৈত্যটা তার প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে এখানকার জিনিস ওখানে ছুঁড়ে ফেলছে, ওখানকার জিনিস এখানে। আর মধুর লোভে যেমন পিঁপড়ের সারি লাগে, তেমনি ক'রে অসংখ্য লোভার্ত মানুষের সারি তার পায়ের নীচে দিয়ে বয়ে চলে। তাদের ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি এবং ব্যস্ততার যেন শেষ নেই। মধুর গন্ধে বিভ্রান্ত মাতাল মনুষ্য-পিপীলিকা চলেছে ত চলেছে, ছুটেছে ত ছুটেছে, কোথায় তা সে নিজেও জানে না।

তাল তাল সোনা আর লোহা বৃষ্টি হচ্ছে আকাশ থেকে। দুমদাম, দুড়্দাড়্। কানে তালা ধ'রে যায়। দুজনে নিরিবিলি কথা বলার উপায় নেই। সে মনও কারও নেই। সবাই ছুটছে, সবাই চীৎকার করছে, তাও কেয়া? কত দর, কত দর? কত দর লোহার, কত দর পাটের, কত দর চটের, কত দর মানুষের?

ঘুমিয়েও শান্তি নেই। মাথার কাছে টেলিফোন। থেকে থেকে ক্রিং ক্রিং করছে: কত দর? তাও কেয়া?

মনে মনে রামকিঙ্কর তুলনা করে তার গ্রামের সঙ্গে।

নদীয়া জেলার ছায়া-ঢাকা একখানি ছোট গ্রাম। অপ্রশস্ত গ্রাম-পথের দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ শতখানেক খড়ে-ছাওয়া ঘর। বাড়ীর সামনে রাংচিতার বেড়া। এখন সেখানে প্রজাপতি আর ফড়িঙের মেলা বসেছে।

পথের ধুলায় পাখীর পায়ের আলপনা।

পাথর-বাঁধানো পথে ছ্যাকরা গাড়ির গড়গড় ঘরঘর কর্কশ আওয়াজ নয়, তাদের গ্রামের ঘুম ভাঙে অজস্র পাখীর কাকলীতে। এই ভোরে এতক্ষণ চাষীরা গোয়াল থেকে গরু-বাছুর বের করেছে। পল্লীবধূরা কোমরে কাপড় জড়িয়ে উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। ভট্টচায মশাই পথের ধারে তাঁর ঘরের দাওয়ায় ব'সে তামাক টানছেন। আর রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে তার কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। কেউ কেউ সেখানে ব'সে প্রসাদী তামাক 'ইচ্ছা করছে'।

অশ্বত্থতলায় ছেলেরা একে একে জমতে আরম্ভ করেছে। এখনই তাদের খেলা সুরু হবে। সকাল, দুপুর, বিকেল, স্নানাহারের সময় ছাড়া গ্রামের ছেলেদের খেলা কখনও বন্ধ থাকে না। একটা খেলা শেষ হ'লে আরেকটা, তার পরে অন্য একটা।

এখানে খেলা নেই। শুধু কাজ, কাজ, আবার কাজ।

তার পরে আর আনন্দ করার মেজাজ থাকে না। শাদা চোখে আনন্দ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। জীবনের একঘেয়েমিতে যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন দূষিত আনন্দের দিকে ঝোঁকে।

যেমন সুবলবাবু।

সুবল এই দোকানেরই একজন কর্মচারী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র সবই আছে। কিন্তু দোকানের কর্মচারীর বাড়ী যাওয়ার ফুরসুৎ কোথায়? তিন মাস চার মাস অন্তর বাড়ী যাওয়া।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পরে কোথায় যেন সে যায়। রাত্রে যখন ফেরে দুই চোখ জবা ফুলের মত লাল। ম্যানেজারকে ভয় করে। নিঃশব্দে দুটি খেয়ে নিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে পড়ে।

কোথায় গিয়েছিল, সকালে জিজ্ঞাসা করলে কিছু কিছু ক'রে হাসে। উত্তর দেয় না।

আর ওই সাততলা বাড়ীটা।

রামকিঙ্কর ভেবেই পায় না, কৌটোর মত ওই ছোট ছোট খুপড়ির মধ্যে মানুষ বাস করে কি ক'রে? ঘরের পর শুধু ঘর। কোথাও একটুখানি স্থান নেই, যেখানে মানুষ খোলা আকাশের দিকে চেয়ে একটু নিশ্বাস নিতে পারে।

এ কি একটা জীবন!

পেটের ধান্ধায় সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। সন্ধ্যায় ফিরে এসে এই কৌটোর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ! তাদের গাঁয়ে যারা দীনতম ব্যক্তি, পাতার ঘরে বাস করে, তাদেরও কুটিরের সামনে ঝকঝকে তকতকে খানিকটা উঠান আছে। সামনে অবারিত মাঠ, মাথার উপর খোলা আকাশ। সারাদিনের পরিশ্রমের পর তারা সেই উঠানে গোল হয়ে ব'সে ঢোল বাজিয়ে গান গায়।

তাদেরও অনন্ত দুঃখ। পেটে অন্ন নেই, দেহে বস্ত্র নেই। জলের কষ্ট আছে, রোগের কষ্ট। কিন্তু সে দুঃখ দেহের, আত্মার নয়। কলিকাতা শহরে একদিকে গগনস্পর্শী বাড়ী আর অন্যদিকে ঘিঞ্জি বস্তি, এই দুয়ের চাপে মানুষের আত্মা প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে।

সুবল নিঃশব্দে পাশে এসে বসল।

অন্যমনস্ক ভাবে রামকিঙ্কর ভেবে চলছিল। সুবলের আসা টের পায় নি।

হঠাৎ সুবল ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্রাদার, কি ভাবছ?

রামকিঙ্কর চমকে উঠল। বললে, কিছু ভাবি নি।

—তা হ'লে? মেয়েছেলে দেখছ?

রামকিঙ্কর হেসে ফেললে: যা:!

সুবল বললে, তোমার ঘুমটি বাপু সাধা। শুলে কি ঘুমুলে। মড়ার মত ঘুম।

রামকিঙ্কর হাসল: কেন, কি হয়েছে?

—সিংহি মশায়ের কাণ্ড ত জান না।

—না।

সিংহি মশাই মফস্বলের লোক। এই দোকানের একটা মোটা খদ্দের। মেয়ের বিয়ের বাজার করতে এসেছে আজ সকালেই।

সুবল বললে, মেয়ের গহনা, বরের আংটি ঘড়ি আরও কিছু টাকাকড়ি ক্যাম্বিশের ব্যাগে ক'রে ফির-ছিলেন। পাশের গলি থেকে সবে বড় রাস্তায় পড়বেন এমন সময় দু'তিন জন গুণ্ডা ছোরা দেখিয়ে ভদ্রলোকের সর্বস্ব কেড়ে নেয়।

রামকিঙ্কর লাফিয়ে উঠল: কি সর্বনাশ!

—ভদ্রলোক দোকানে পৌঁছেই অজ্ঞান হয়ে ধুম্ ক'রে প'ড়ে গেলেন। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, পাখার বাতাস ক'রে বহুক্ষণ পরে জ্ঞান হ'ল। তখন কি কান্না!

—তার পরে?

—হরেকেষ্টবাবু ওপর থেকে ছুটে এলেন। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার? ভদ্রলোক কথা বলতে পারেন না। শুধু হরেকেষ্টবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদেন। সবাই মিলে বার বার শুধোতে ঘটনাটা কোনও মতে বললেন।

—তার পরে?

—'কাঁদবেন না। দেখি, ব্যবস্থা করতে পারি কি না। উঠুন।' ব'লে হরেকেষ্টবাবু সিংহি মশায়ের হাত ধ'রে ওঠালেন। কেশবকে সঙ্গে নিলেন। ওটা তাগড়া আছে। নিয়ে গাড়ি ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

—কোথায়?

—রাজামিঞার কাছে।

—তিনি কে?

সুবল চোখ পিট পিট ক'রে জিজ্ঞাসা করল, জান না?

—না।

—মহল্লার গুণ্ডাদের তিনিই ত সর্দার। তা রাজা বটে বাপু! টকটকে করছে রং আর তেমনি লম্বা চওড়া। ঠিক পূজোর আগে প্রকাণ্ড বড় একটা গাড়ি নিয়ে প্রতি বৎসর ওইখানে আসেন।

—কি জন্যে?

সুবল হাসল: পার্বণী আদায়ের জন্যে।

রামকিঙ্কর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, পার্বণী কিসের?

—তা জানি না। সবাই দেয়। যত দোকান আছে সবাই। কেউ পঞ্চাশ, কেউ একশো, কেউ দুশো, কেউ বা আরও বেশি। আমাদের দোকান থেকে দেওয়া হয় দুশো।

—তার পরে?

সুবল বললে, তার পরে হরেকেষ্টবাবু রাজামিঞার দরবারে হাজির হলেন। রাজামিঞা জিগ্যেস করলেন, কি ব্যাপার? হরেকেষ্টবাবু বললেন ব্যাপারটা। বেচারীর মেয়ের বিয়ের গহনা। সমস্ত শুনে রাজামিঞা

চারিদিকে যারা ছিল তাদের দিকে চাইলেন। চোখের ইসারায় তারাও কি যেন বললে। রাজামিঞা হরেকেষ্টবাবুকে বললেন সিংহি মশাইকে নিয়ে একটি লোকের সঙ্গে যেতে। ঘরের ভিতর ঘর, তার পরে আবার ঘর। কোন ঘরে মিটমিট ক'রে আলো জ্বলছে, কোন ঘর একেবারেই অন্ধকার। শেষে একটা ঘরে গিয়ে সবাই পৌঁছুল। প্রকাণ্ড বড় হলঘর। অনেক টেবিল পাতা। প্রত্যেক টেবিলের ওপর কত যে জিনিষ তার ইয়ত্তা নেই।

লোকটি জিগ্যেস করলে, এর মধ্যে আছে আপনার জিনিষ?

আছে। সিংহি মশায়ের মার্কা-মারা ক্যাম্বিশের ব্যাগ। তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক ব্যাগটা দেখিয়ে দিলেন।

লোকটি ব্যাগটা হাতে ক'রে ওদের নিয়ে আবার ফিরে এল রাজামিঞার ঘরে।

রাজামিঞা জিগ্যেস করলেন, কি কি আছে এর মধ্যে?

সিংহি মশাই মুখস্থর মত ব'লে গেলেন যা আছে।

রাজামিঞা মিলিয়ে দেখে ব্যাগটা সিংহি মশাইকে হাসতে হাসতে দিয়ে দিলেন। সবাই সেলাম ঠুকে বেরিয়ে এল।

দোকানে ফিরে সিংহি মশাই বললেন, বাবা! এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল।

কেন?

কোথায় গিয়েছিলাম? সরু গলি, তারপরে আরও সরু গলি, তারপরে আরও সরু গলি। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কি রকম সব লোক ব'সে। তারা সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল, যা যাবার তা ত গেছেই, এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

সুবল হাসল।

কিন্তু রামকিঙ্কর অল্পদিন হ'ল গ্রাম থেকে এসেছে। চোখ বড় বড় ক'রে সে গল্প শুনছিল। গল্প শেষ হতে তার বুকের ভিতর থেকে মস্তবড় একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল।

স্বস্তির নিশ্বাস।

বেচারা কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক খুব বেঁচে গেল।

এতক্ষণে হরেকৃষ্ণ নেমে এল।

কালকের ব্যাপার নিয়ে অনেকেরই ঘুম ভাঙতে বিলম্ব হয়েছে। সিংহি মশাই ত এখনও ওঠেই নি। গহনাগুলো ফিরে পেয়ে হিহ্নি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তার ত দোকানে বসার তাড়া নেই? বাকি বাজার আজ দুপুরে সেরে নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে হয় ত দেশে ফিরবে।

হরেকেষ্ট অপাঙ্গে ওদের দুজনের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আজ বাজারে কে যাবে?

কর্মচারীদের মধ্যে বাজারে যাওয়ার পালা আছে।

আজ রামকিঙ্করের পালা। সে এগিয়ে এল।

—তোমার পালা?

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে। হরেকৃষ্ণকে সে ভীষণ ভয় পায়। তার সন্দেহ, হরেকৃষ্ণ তাকে দেখতে পারে না। অকারণে তিরস্কার করে। তিরস্কারের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ওর দিকে চেয়ে হরেকৃষ্ণ হাসলে: তুমি বাজারে যাবে? তবেই আজ খাওয়া হয়েছে! ক'জন খাবে?

নিজেই আঙুলে ক'রে খাওয়ার লোক গুণলে। দশ জন। তা হলে পাঁচ পয়সা হিসেবে সাড়ে বারো আনা।

এইটেই ওদের বাঁধা বরাদ্দ। যে দিন যত লোক থাকবে, তত পয়সা।

পয়সা আর বাজারের থলি নিয়ে রামকিঙ্কর বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তখনও তার চোখের সামনে ঘুরছে, সরু গলি, আরও সরু, আরও সরু। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক ব'সে আছে। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ লোক। কিন্তু তা নয়। সকল পথচারীর দিকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি। সন্দেহ-ভাজন লোক দেখলেই হয় তাকে শেষ ক'রে ফেলবে, নয় কেল্লায় খবর চ'লে যাবে। পুলিস গিয়ে দেখবে কেল্লা খালি। না লোক, না মাল।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, ব্যাগের মধ্যে সব জিনিষ ঠিক ঠিক ছিল! একটিও হারায় নি!

যেতে যেতে দু'জনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে রামকিঙ্কর তিরস্কৃত হ'ল। একটা গরুর গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

মাথায় তখন ওর একটিমাত্র চিন্তা। এবং বাজারটা রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে দিয়েই সে সুবলকে ধরল।

—আচ্ছা সুবলদা, সিংহি মশায়ের ব্যাগে সব জিনিষ ঠিক ঠিক ছিল?

—ছিল বই কি!

—একটাও হারায় নি?

—না।

—কি আশ্চর্য! যে গুণ্ডারা ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়েছিল

তারা ত দু'একটা জিনিষ স্বচ্ছন্দে সরিয়ে রাখতেও পারত। কে আর জানতে পারত বল।

কথাটা সুবলের মাথায় আসে নি। বললে, তা ত পারতই।

—কিন্তু দেখ, রাখে নি। বোধহয় রাখেই না।

—নিশ্চয়। চোর হ'লে কি হয়, ধর্মভয় আছে।

সুবল হো হো ক'রে হেসে উঠল।

রামকিঙ্কর কিন্তু হাসল না। বললে, তাই হবে ওদেরও একটা সমাজ আছে। তার নিয়ম ওরা মেনে চলে।

॥ ২ ॥

রামকিঙ্করের বাপেরা দুই ভাই। দেবকিঙ্কর আর শিবকিঙ্কর। দেবকিঙ্কর বড়, শিবকিঙ্কর ছোট। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জনের চেষ্টায় গ্রামের একটি লোকের সঙ্গে অল্পবয়সেই কলিকাতায় আসে এবং এই দোকানে একটি চাকরি পায়।

সামান্য বেতন। খাওয়া-থাকা আর দশ টাকা। কিন্তু দশ টাকা তখন নিতান্ত সামান্য টাকা নয়। একটি টাকা নিজের হাত-খরচের জন্যে রেখে বাকি নয়টি টাকাই বাবার কাছে পাঠিয়ে দিত। কিছু জমি-জায়গা ছিল, তার উপর এই দশটি টাকা। সংসার চ'লে যেত মন্দ নয়।

সততা ও কর্মদক্ষতার জন্যে দোকানেরও যেমন শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগল, দেবকিঙ্করেরও তেমনি উন্নতি হতে লাগল।

কিছুকাল পরে বৃদ্ধ পিতা মারা গেলেন।

কনিষ্ঠ শিবকিঙ্কর কোনদিন কিছু করে নি। দেশে থেকে জমি-জায়গা দেখত আর যাত্রাদলে অভিনয় করত। বাড়ীতে একজন থাকাও দরকার, আর কনিষ্ঠ পুত্রকে বাপ-মাও বাইরে পাঠাতে চান নি।

আরও কিছুকাল পরে দেবকিঙ্কর দোকানের ম্যানেজার নিযুক্ত হ'ল। দোকানের যিনি মালিক তিনি দোকান দেখাশোনা করতেন না। তিনি ধনীপুত্রের যে সমস্ত উপসর্গ তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

ভদ্রলোক অলস এবং বিলাসী ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিহীন ছিলেন না। ব্যবসা বুঝতেন এবং মানুষ চিনতেন। তার প্রমাণ পাওয়া গেল, হঠাৎ একদিন দোকানে এসে হিসাব পরীক্ষা করতে বসলেন। এবং একটানা পাঁচ ঘণ্টা হিসাব পরীক্ষার পর দেখা গেল, তদানীন্তন ম্যানেজার প্রায় হাজার দশেক টাকা তহবিল তছরূপ করেছে।

এর জন্যে ম্যানেজার প্রস্তুত ছিল না। বিলাসী, ব্যসনপ্রিয় তরুণ মালিক যে কোনদিন স্বয়ং হিসাব পরীক্ষায় লেগে যাবেন এবং তার জন্যে একটানা পাঁচঘণ্টা পরিশ্রম করতে পারেন, এ সে কল্পনাও করে নি।

মালিক দশ হাজার টাকা মাফ ক'রে দিলেন। কিন্তু ম্যানেজারকে তৎক্ষণাৎ দোকান ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ল।

ব্যাপারটা এমনই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক যে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, বাদে হরেকৃষ্ণ। তহবিল তছরূপের ব্যাপারটা সে-ই মালিকের কাছে লাগিয়েছিল। একবার নয়, অনেকবার। মালিক প্রথম প্রথম গ্রাহ্য করেন নি। আলস্যবশতই করেন নি। আবার কে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা পোহায়। কিন্তু একটা বিশেষ মুহূর্তে আবার যখন শুনলেন, তখন আলস্য ঝেড়ে ফেলে সোজা দোকানে চ'লে এলেন।

এক-একটা বিশেষ মুহূর্তে এমন হয়।

পুরাণো ম্যানেজার যখন বিদায় হ'ল তখন হরেকৃষ্ণর মন নাচছে। পুরাণো ম্যানেজারের পরেই তার স্থান। শুধু সে নয়, সকলেই স্থির নিশ্চিত ছিল যে, হরেকৃষ্ণই নতুন ম্যানেজার।

কিন্তু মালিক সকলের গভীর বিস্ময়ের মধ্যে দেবকিঙ্করকে নতুন ম্যানেজার ব'লে ঘোষণা করলেন। এবং তার হাতে দোকানের চাবি দিয়ে চ'লে গেলেন।

তিনি চ'লে যাওয়ার পর মিনিট-পাঁচেক সমস্ত দোকান স্তব্ধ হয়ে রইল। কারও মুখে কথা নেই। দেবকিঙ্কর ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। হঠাৎ হরেকৃষ্ণ হেসে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে চ'লে গেল।

তখন সকলের চমক ভাঙল।

যে কর্মচারীটি সকাল-সন্ধ্যা ধূপধুনা দেয় সে ধূপ দিতে আসতে সকলের সম্বিৎ ফিরে এল।

—তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হে দেবকিঙ্কর। কর্তার নজর প'ড়ে গেছে তোমার ওপর। আর ভেবে কি হবে? ব'সে যাও নতুন জায়গায়।

কথাটা ভালভাবেই বললে, না ব্যঙ্গভরে বললে বোঝবার মত অবস্থা তখন দেবকিঙ্করের নয়। চাবিটা হাতে নিয়ে সে স্থাণুর মত আড়ষ্টভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

সংসারে ভালো-মন্দ দু'রকম লোকই আছে।

হরেকৃষ্ণ লোকটি বড় সুবিধার নয়। অনেকেই তাকে ভালবাসত না বটে, কিন্তু ভয় করত। পক্ষান্তরে দেবকিঙ্করের উপর কারও অপ্রীতি ছিল না। কলহ-বিবাদ

সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলত। কারও অনিষ্ট করার চেষ্টাও কখনও করে নি।

সুতরাং সে যখন ম্যানেজার হয়েই গেল, হরেকৃষ্ণ ছাড়া দোকানের অন্যান্য কর্মচারী তাকে মেনে নিলে। এবং আরও কিছুদিন পরে হরেকৃষ্ণকেও মেনে নিতে হ'ল, মালিক অযোগ্য হস্তে দোকানের ভার অর্পণ করেন নি।

হরেকৃষ্ণর চোখের সামনেই দেবকিঙ্করের কর্মদক্ষতায় দোকানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। বিক্রি বাড়তে লাগল, দেনা অনেক পরিশোধ হ'তে লাগল এবং বিলাত-বাকিও ধীরে ধীরে আদায় হতে লাগল।

সকলেই বুঝল, এবং তাদের সঙ্গে হরেকৃষ্ণও বুঝল, বয়স অল্প হলেও এই স্বল্পভাষী লোকটি ব্যবসা বোঝে। এত বড় একটা দোকান চালাবারও ক্ষমতা রাখে।

দেবকিঙ্করের বেতন বাড়ল, পদমর্যাদাও বাড়ল কিন্তু তার পূর্বের মেজাজটি অব্যাহত রইল। সকলের সঙ্গেই সে আগের মত বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহৃদয় ব্যবহার করে, সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে, কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হ'লে সকলের মতামত নেয়। সবাইকে নিয়ে সে ম্যানেজারী করতে লাগল।

পাশে গুম্ হয়ে ব'সে থাকে হরেকৃষ্ণ। তাকে সে ভাল ক'রেই চেনে। ভীষণ লোক। কোন প্রমাণ অবশ্য তার হাতে নেই, কিন্তু দেবকিঙ্করের দৃঢ় বিশ্বাস, পুরাণো ম্যানেজারকে তাড়ানোর মূলে হরেকৃষ্ণ। সেই শুধু জানত তহবিল তছরূপের ব্যাপারটা।

এখনও হরেকৃষ্ণই তার পাশে ব'সে থাকে খাতা নিয়ে। তাকে তার ভয়ানক ভয়, কখন কি করে। মনিবের কাছে তার যাতায়াত আছে। ভুল-ত্রুটি সকলেরই হয়, দেবকিঙ্করেরও হওয়া অসম্ভব নয়। সে সকল সময় সতর্ক থাকে। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে, হরেকৃষ্ণের সঙ্গেও। হরেকৃষ্ণকে বিশেষভাবে তোয়াজও করে। এমনি ক'রে নানা ভয়, ভাবনা ও সতর্কতার মধ্যে সে বছর বারো চাকরি করেছিল।

তার মধ্যে রামকিঙ্করের জন্ম এবং পিতার মৃত্যু—এই দুটোই সবচেয়ে বড় ঘটনা।

শিবকিঙ্কর সংসার দেখে আর যাত্রার দলে মহড়া দেয় আর গ্রামের পাঁচটা কাজে-অকাজে মাতব্বরী করে। রামকিঙ্কর মনের আনন্দে পাঠশালা পালিয়ে গাছে গাছে উৎপাত ক'রে বেড়ায়। স্কুলের ছুটির সময় মাঝে মাঝে বাপের সঙ্গে কলকাতা এসেছে। এই দোকানেই এসে উঠেছে। চিড়িয়াখানা দেখে, যাদুঘর দেখে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখে দিনকয়েক পরে দেশে ফিরে গেছে।

ছেলেবেলার কথা যতদূর রামকিঙ্করের মনে পড়ে, বাপের সঙ্গে সেজেগুজে কলকাতা আসার উৎসাহও তার যত ছিল, দেশে ফিরে যাবার জন্য আগ্রহও তেমনি ছিল।

কলকাতা তখনও তার ভাল লাগত না। দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে যাবার সময় ছাড়া অবশিষ্ট সময় তার শিক-দেওয়া খাঁচার মত ঘেরা বারান্দায় কাটত। সেইটেই ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক। যতক্ষণ দোকানে থাকত, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত তার মন ক্রমাগত পাখা ঝাপটাত।

সে অবস্থা এখনও আছে।

তারপর হঠাৎ তার বাপের মৃত্যু হ'ল। পিতামহের মৃত্যু যখন হয় তখন সে নিতান্ত শিশু। কিছুই মনে পড়ে না। বাপের মৃত্যুও সে চোখে দেখে নি। তার চোখের সামনে বাপের যে মূর্তি ভাসছে, সে হচ্ছে এই দোকানে যেখানে হরেকৃষ্ণ ব'সে আছে, ওইখানে উপবিষ্ট শান্ত, সৌম্য, স্নিগ্ধ মূর্তি।

পিতৃবিয়োগ সে অনুভব করেছিল মায়ের শোকাহত মূর্তিতে। গাছের উপর বজ্রপাত হ'লে গাছ যেমন ক'রে শুকিয়ে যায়, তার মাও যেন তেমনি ক'রে শুকিয়ে যেতে লাগল।

তারপরে একদিন মা-ও চ'লে গেল।

এই মৃত্যু আকস্মিক নয়। তাদের সকলের চোখের সামনেই একটু একটু ক'রে শুকিয়ে শুকিয়ে মারা গেল। তবু যেন অপ্রত্যাশিত। বালকসুলভ খেলাধুলায় মত্ত রামকিঙ্কর মাকে দেখেও যেন দেখে নি। একদিনও মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসে নি, গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে নি, মা, তুমি যেও না, থাক।

এখন এতদিন পরে ঘেরা বারান্দায় ব'সে যখন ভাবে তখন মনে হয়, ওকথা যদি সে বলত, মা বোধ হয় তাকে ছেড়ে অত শীঘ্র চ'লে যেত না।

কিন্তু চ'লে যাওয়া ছাড়া বোধ হয় মায়ের আর কোন পথও ছিল না।

তাদের সংসারের যা কিছু শ্রীবৃদ্ধি, তার বাপেরই জন্যে। দেবকিঙ্কর কখনই নিজের ব'লে একটি পয়সাও রাখে নি। শেষ কপর্দক সংসারের উন্নতির জন্যেই ব্যয় করেছে। নিজের জন্যে, স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কিছুই রাখে নি। অনেকের ধারণা ছিল, অত যার বাপের রোজগার, নিশ্চয় তার মায়ের হাতে অনেক টাকা রয়েছে। তার কাকা এবং কাকীমার মনেও এই সন্দেহ ছিল।

মৃত্যুর পর মায়ের বাক্স খুলে দেখা গেল, কয়েকটি

তামার পয়সা ছাড়া আর কিছুই তাতে নেই। না সোনা-দানা, না কাপড়-জামা।

কিন্তু, বাপের উপার্জনের জন্তে নয়, বড়-বৌ ব'লে মা-ই ছিল সংসারের কর্ত্রী। সে যা বলত তাই হ'ত। তার উপর কেউ কখনও কথা বলত না।

কিন্তু সেখানেও একটা মস্ত বড় ভুল হয়েছিল। বড় বৌ-এর মর্যাদা যে নিতান্তই মেকি, দেবকিঙ্করের মৃত্যুর পর সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সংসার দেবকিঙ্করের পয়সায় চলত ব'লেই বড় বৌ-এর মর্যাদা। দেবকিঙ্করের মৃত্যুর পর সেই মর্যাদার আসন থেকে বড় বৌ সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল।

বালক হলেও রামকিঙ্কর অনুভব করেছিল, বাপের মৃত্যুতে ততটা নয়, যতটা মায়ের মৃত্যুতে, পৃথিবীটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে একবার দুলে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল বটে, কিন্তু আগেকার মত আর রইল না। কোথায় যেন চিড় খেয়েছে, উঁচু জায়গা নিচু হয়েছে, নিচু জায়গা উঁচু।

রামকিঙ্কর খেলাধূলা করে। গাছে চড়ে, সাঁতার কাটে, স্কুলেও যায়। কিন্তু দিনের খেলা সেরে সন্ধ্যার পরে খেয়ে-দেয়ে যখন শোয়, তখন বেশ উপলব্ধি করে, পৃথিবীটা যেন বদ্‌লে গেছে। এই পরিবারে তার আর তার কাকার ছেলেমেয়েদের মর্যাদা যেন আগের মত সমান নয়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধিটা ক্রমেই স্পষ্টতর হ'তে লাগল।

রামকিঙ্কর সপ্তম শ্রেণী থেকে প্রমোশন পেলে না। শিবকিঙ্কর স্কুলে গেল খবর নিতে। মাষ্টারেরা হেসে বললেন, ও ইতিহাস ছাড়া কোন বিষয়ে পাস করতে পারে নি। ইতিহাসেও টায়ে-টোয়ে পাস।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তবু কোনক্রমে উঠিয়ে দেওয়া যায় না? সামনের বার যদি একটু খেটে পড়াশোনা করে?

মাষ্টাররা হো হো ক'রে হেসে বললেন, শুধু সামনের বার নয়, পরের দশ বছরও যদি চব্বিশ ঘণ্টা ক'রে খাটে, তা হ'লেও ওর কিছু হবে না।

—বলেন কি? এমন অবস্থা!

—এই রকম অবস্থা। এ জীবনে, আর যাই হোক, পড়াশোনা ওর হবে না। ওর মাথায় কিছু নেই।

স্কুল থেকে গুম হয়ে শিবকিঙ্কর ফিরল। সারারাত কি যেন ভাবল। সকালে উঠে রামকিঙ্করকে বললে, আজ থেকে তোকে আর স্কুলে যেতে হবে না।

এক মুহূর্ত আগেও স্কুলের আবহাওয়া রামকিঙ্করের যেন বিষ মনে হ'ত। মনে হ'ত যেন জেলখানা। এই জেলখানা থেকে কবে সে পরিত্রাণ পাবে, এই ছিল তার সবচেয়ে বড় চিন্তা।

কিন্তু সেই জেলখানা থেকে কাকা যখন তাকে পরিত্রাণ দিলে তখন সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

স্কুলে যাবে না? কি করবে তবে?

করবার অনেক কিছু আছে। সময় অঢেল। অবাধ মুক্তি।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, গাছের মগডালগুলির আহ্বানের আর যেন তেমন মোহ নেই। সাঁতারে আর তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না।

বন্ধন ছিল ব'লেই অত আনন্দ।

তার সঙ্গীদের দু'তিন জন মাত্র পড়া ছেড়েছে। বাকি সকলেই স্কুলে যায়। এই দু'তিন জন মাত্র সমস্ত দিন অপেক্ষা ক'রে থাকে অন্যদের ফেরার পথ চেয়ে তারা না ফিরলে আনন্দ জমে না।

স্কুল জেলখানা সত্যি, কিন্তু স্কুলের বাইরেটাও কম নয়। মাস খানেকের মধ্যেই রামকিঙ্কর হাঁপিয়ে উঠল।

ফের স্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়ার কথাটা কাকাকে কি ভাবে বলা যায় মনে মনে রামকিঙ্কর তারই মহলা করছে এমন সময় শিবকিঙ্কর একদিন তাকে ডাকলে।

বললে, তোর জামা-কাপড় কি আছে, সাবান দিয়ে রাখ। কাল কলকাতা যাব।

—কলকাতা! সেখানে কি? বাবা ত নেই। বাবা না থাকলে আর কলকাতা কিসের?

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে বিস্মিত দৃষ্টিতে কাকার গম্ভীর মুখের দিকে চাইলে, কিন্তু কোন জবাব পেলে না।

কিন্তু কুলুঙ্গীতে একখানা চিঠি তার চোখে পড়ল। যে দোকানে তার বাবা কাজ করত সেই দোকানের মালিকের চিঠি। মনে হ'ল, শিবকিঙ্কর সংসারের দুরবস্থা জানিয়ে তাঁকে একখানা চিঠি লিখেছিল।

তার উত্তরে মালিক দেবকিঙ্করের ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে আসবার জন্তে লিখেছেন।

এক বছর হয়ে গেল। কিন্তু সেই মর্মান্তিক দিনের স্মৃতি যেন এখনও জলজল করছে। দ্বীপান্তরের কয়েদীর মত তার মনের অবস্থা। ট্রেন যখন ছাড়ল, গ্রামের দিকে চেয়ে তার মনের ভিতরটা হু হু ক'রে উঠল। চোখ জলে ভ'রে এল।

কিন্তু তা গোপন করতে হ'ল। পাশেই কাকা, পুলিস কনেষ্টবলের মত কঠিন ও নির্বিকার।

কলকাতায় এল। এই দোকানেই এসে উঠল, যেমন তার বাপের আমলে এসে উঠত। তফাতের মধ্যে হরেকৃষ্ণর চশমার ফাঁক দিয়ে সেই কুটিল সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

এদের আসার কথা মালিক বোধ হয় আগেই জানিয়েছিলেন। দোকানের কর্মচারীরা মনে হ'ল প্রস্তুতই ছিল।

বিকেলে শিবকিঙ্কর রামকিঙ্করকে নিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মালিককে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করার ব্যাপারটা রাস্তাতেই শিবকিঙ্কর শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

অত প্রণাম-টনাম রামকিঙ্করের ভাল লাগে নি। কিন্তু কাকাকে সে বাঘের মত ভয় করত। সুতরাং কাকার দেখাদেখি কাকার সঙ্গে মালিককে সেও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। এবং করযোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

রামকিঙ্কর চেয়ে চেয়ে দেখলে। এর আগে কতবার দোকানে এসেছে-গেছে, কিন্তু মালিককে দেখার সৌভাগ্য কখনও হয় নি। পুরুষের এত রূপ কখনও সে দেখে নি। সে অবাক্ হয়ে গেল।

মালিকও রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলেন।

শিবকিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলেন, নিতান্ত ছেলেমানুষ। কতদূর পড়াশোনা করেছে?

—আজ্ঞে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত।

—আচ্ছা। আমি দোকানে ব'লে দিয়েছি। ও কাল থেকেই কাজ করবে।

ওরা প্রণাম ক'রে দোকানে ফিরে এল। দেখলে, কাল থেকে যে রামকিঙ্কর কাজ করবে, এ খবর দোকানের সবাই জানে। ও কোন্ ঘরে থাকবে, কি কাজ করবে, সব বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল।

রাত্রের মধ্যেই কর্মচারীদের সঙ্গে মোটামুটি ভাব হয়ে গেল। তাদের মন্দ লাগল না। কিন্তু হরেকৃষ্ণর দৃষ্টিটা তার কেমন ভাল ঠেকল না। কিন্তু সে তার মনের মধ্যেই রইল।

এই ঘটনার সবচেয়ে যা বড় দৃশ্য সে হচ্ছে, তার কাকার বিদায়-দৃশ্য।

কাজ হয়ে গেছে। শিবকিঙ্করের থাকবার আর কোন আবশ্যক নেই। বাড়ী ছেড়ে কখনও সে থাকে না, থাকতে পারেও না। সকালের ট্রেনেই সে বাড়ী ফিরবে।

রামকিঙ্করকে একটা নিরিবিলি কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে তার হাতে একখানা পাঁচটাকার নোট গুঁজে দিলে।

বললে, তোর যখন যা দরকার হবে কিনিস্।

তার পর একটু ইতস্তত ক'রে ওকে বুকে টেনে নিলে। বললে, মন দিয়ে, বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করিস্। এখানে ভাল-মন্দ নানা রকমের লোক আছে। মন্দ লোকদের চটাস্ না, কিন্তু এড়িয়ে চলিস্।

বাহুবন্ধন থেকে রামকিঙ্করকে সে মুক্ত ক'রে দিয়ে বললে, সপ্তাহে অন্তত একখানা ক'রে চিঠি দিবি।

আবেগে রামকিঙ্কর তখন ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। কাকার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আর যেন সে উঠতে পারছে না, এমনই তার অবস্থা।

নিজের কথা এখন আর মনে পড়ে না। কিন্তু কাকার কথা যখনই ভাবে, অবাক্ হয়ে যায়। কাকার এরকম অবস্থা আগেও কখনও দেখে নি, পরেও না।

॥ ৩ ॥

রামকিঙ্করদের যে দোকান, তার পিছনেই প্রকাণ্ড বড় একটা চারতলা বাড়ী। এদিক্‌টা বাড়ীর পিছন দিক্। রামকিঙ্করের শোবার ঘরের জানালা খুললে যে অংশটা দেখা যায়, সেটা খাঁচার মত শিক দিয়ে ঘেরা। প্রথম প্রথম বাড়ীটার দিকে চাইলে রামকিঙ্করের খুব হাসি পেত। মনে হ'ত যেন একটা খাঁচা। তার মধ্যে মানুষ-পাখী ঘোরাঘুরি করছে।

মানুষ-পাখীও যে সব সময় দেখা যেত তা নয়। কোথাও ভিজে শাড়ি-কাপড় ঝুলছে। কোথাও চটের আড়াল। কিন্তু নারী এবং পুরুষ কণ্ঠের চীৎকার সকল সময়ই শোনা যেত।

একতলাটা বোধহয় গুদাম-ঘর, কি কোন কারবারের গদি হ'তে পারে। প্রবেশ-পথটা ওদিক্ দিয়ে। কিন্তু উপরের তলাগুলি সব টুকরো টুকরো ফ্ল্যাট। তাতে নানারকম প্রদেশবাসীর বাস।

দোতলার একটি ফ্ল্যাটে, যে ফ্ল্যাটটা রামকিঙ্করের শোবার ঘরের দিকে, শোবার ঘর থেকে দশ-বারো হাত দূরে, একটি বাঙালী পরিবার থাকে। তাদের মুখ সে কখনও দেখে নি। কিন্তু ভাষা থেকে বোঝা যায় ওরা বাঙালী।

আর বোঝা যায়, ঐ ফ্ল্যাটের একটি ছেলের উচ্চ-কণ্ঠের অধ্যয়নে। বোঝা যায়, ছেলেটির পড়াশোনায় উৎসাহ আছে। সামনেই পরীক্ষা। ছেলেটি রাত

চারটেয় উঠে চীৎকার ক'রে পড়া মুখস্থ করে : ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভুগোল।

রামকিঙ্কর শুয়ে শুয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করে ছেলেটি কোন্ ক্লাসের ছাত্র। ক্লাস সেভেন অবধি সে পড়েছে কিন্তু বই ত বড় একটা খোলে নি। ঠিক বুঝতে পারে না বইগুলো কোন্ ক্লাসের। কিন্তু কেমন যেন মনে হয় ক্লাস সেভেনেরই বই। মনে হয়, ওই সমস্ত যেন সে মাষ্টারের মুখে কিংবা ক্লাসের ছেলেদের মুখে শুনেছে। হয় ত ক্লাসের বইতে পড়েওছে।

যেন জানা কথা।

ছেলেটির চীৎকারে যেদিন ঘুম ভেঙে যায়, এবং প্রায়ই ঘুম ভাঙে, শুয়ে শুয়ে একমনে তার পড়া শোনে। শুনতে ভাল লাগে। বুঝতেও কষ্ট হয় না।

আকবর আর ঔরঙ্গজেবের তুলনা। ক্লাসে কিছুতেই সে বুঝতে পারত না। যেটুকু বুঝত, কার্যকালে তাও মনে থাকত না। ওখানে ছেলেটি পড়ছে, এখানে শুয়ে সে শুনছে। বেশ বুঝতে পারছে। নিচে অবসর সময়ে দোকানে ব'সে রোমন্থন করার চেষ্টা করে। দেখে বেশ মনে আছে। এমন কি 'ক্লাউড' কবিতাটিও আর দুর্বোধ্য ঠেকছে না।

রামকিঙ্করের যেন নেশার মত দাঁড়িয়ে গেল : রোজ ভোরে উঠে মন দিয়ে ছেলেটির পড়া শোনা।

কে ছেলেটি? ওর সঙ্গে আলাপ করা যায় না?

কিন্তু কি ক'রে আলাপ করবে? ওকে ত দেখা যায় না। ওর মুখ কোনদিন দেখে নি। কে জানে কি নাম।

একদিন কথায় কথায় সুবলকে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, ওই বাড়ীতে কারা থাকে জান?

সুবল হেসে ফেললে : কি ক'রে জানব?

—না। তুমি ত অনেক দিন আছ। জানতেও ত পার।

সুবল বললে, এ কি তোমার গাঁ পেয়েছ! এখানে এই দরজা থেকে ও দরজা বিশ ক্রোশ!

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, কেন বল ত? প্রেম?

—না, না। ও বাড়ীতে একটি ছেলে পড়ে, ক্লাস সেভেনের বই। ভারী ইচ্ছে ক'রে ওর সঙ্গে আলাপ করি।

—তা ক'রে এস না একদিন।

রামকিঙ্কর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে?

—সটান উঠে যাবে দোতলায়। ছেলেটিকে ডেকে বলবে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—তা কি হয়?

—কেন হবে না। ওরা চোর ব'লে তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। হরেকেষ্টবাবু তোমাকে ছাড়িয়ে আনবেন।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল : ওরে বাবা! আবার থানা-পুলিশ আছে নাকি?

—আছে বই কি! চোর ছাড়া আর কোন্ অচেনা লোক গেরস্ত-বাড়ীতে ঢুকতে চায়?

—বাবা:!

রামকিঙ্কর অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আজব শহর কলকাতা! এখানে ভাল মনে মানুষের সঙ্গে পরিচয় করতে যাওয়াও বিপজ্জনক।

প্রত্যহ ভোরে ছেলেটি উঠে পড়া করে। প্রত্যহ ভোরে রামকিঙ্কর শুয়ে শুয়েই ওর পড়া শোনে। শুনতে শুনতে যেন ওর নিজেরও পরীক্ষার পড়া তৈরি হয়ে যায়। এবং এমনি ক'রে চোখের দেখার বাইরেই রামকিঙ্করের দিক্ দিয়ে ওদের জানা-শোনা হ'তে থাকে।

কবে ওর পরীক্ষা কে জানে। খাটুনি দেখে মনে হচ্ছে, আর বেশী দেরি নেই। তাদের গ্রামের ছেলেদের মধ্যেও বোধ হয় এমনি পড়ার ধুম প'ড়ে গেছে।

রামকিঙ্কর কোনদিনই পরীক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহিত ছিল না। পড়াশোনাও বিশেষ করত না। এখন তার মনে হচ্ছে, সে যদি গ্রামে থাকত, এবার নিশ্চয় খুব মন দিয়ে পড়া করত, ওই অদৃশ্য ছেলেটির মত, অমনি ক'রে ভোরে উঠে।

কিন্তু তা আর হবার নয়।

ভাবতে গিয়ে রামকিঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এমনি ক'রে একটা মাস চলল।

ছেলেটি যে শুধু ভোরেই পড়ে তা নয়। অন্য সময়েও পড়ে নিশ্চয়। কিন্তু সে-পড়া রামকিঙ্কর শুনতে পায় না। তখন সে দোকানে থাকে। উপরে শোবার ঘরে থাকলেও চারিদিকের হট্টগোলে ভোরের মতন অমন পরিষ্কার ভাবে প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে পারত না।

ভোরের সময় যেটুকু পড়া রামকিঙ্কর শোনে, অন্য সময় দোকানে ব'সে তা রোমন্থন করে। সব হয়ত মনে করতে পারে না, কিন্তু অনেক পারে। ভরসা জাগে, যদি সে পরীক্ষা দিত, হয়ত পাস ক'রে যেত।

ইচ্ছা জাগে, বাড়ী থেকে তার পড়ার বইগুলো আনিয়ে নেয়। দিনের বেলা তার সময় নেই। দোকানে

কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু ভোরে উঠে ওই ছেলেটির মত পড়তে পারে। অত চীৎকার ক'রে নয়, তা হ'লে হরেকৃষ্ণ রেগে যাবে হয়ত। কিন্তু মনে মনে পড়া করলে কে বাধা দেবে?

কিন্তু কাকাকে বইগুলো পাঠাবার জন্যে লিখতে কয়েকবার চেষ্টা ক'রেও পারলে না।

কাকা নিশ্চয় লিখে পাঠাবে, এতদিন খুব পড়লে! সব বিষয়ে ফেল! এখন দোকানে কাজে ঢুকে আর পড়তে হবে না। পড়া হবে অষ্টরম্ভা। লাভে-মূলে চাকরিটিও যাবে।

নতুন করে বই কিনতে পারে।

কিন্তু তাতেও অসুবিধা আছে। কাকা হরেকৃষ্ণের কাছে ব্যবস্থা ক'রে গেছে মাইনে সম্বন্ধে। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া রামকিঙ্কর মাইনে পায় পনরটি টাকা। তার মধ্যে তের টাকাই মাস-পয়লা হরেকৃষ্ণ মানিঅর্ডার ক'রে কাকার কাছে পাঠিয়ে দেয়। অবশিষ্ট জলখাবারের জন্যে যে দু'টাকা থাকে, তাও রামকিঙ্কর একবারে পায় না। পয়লা তারিখে এক টাকা পায় আর পনর তারিখে আর এক টাকা।

কলকাতা শহর প্রলোভনের জায়গা। রামকিঙ্করের বয়স কম। দোকানের সঙ্গ খুব সন্দেহজনক। ছেলে-মানুষের হাতে টাকা দেওয়া সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক।

সুতরাং বই-এর যে রকম দাম তাতে বই কেনা ওই দু'টাকার কাজ নয়।

তা হ'লে আর কি করতে পারে সে?

রামকিঙ্কর ভাবে, যখনই অবসর পায় তখনই ভাবে। কিন্তু ভেবে কোনও কূল-কিনারা পায় না। শুধু তার পড়বার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। বাধা পেলে স্রোতের জল যেমন প্রচণ্ড হয় তেমনি। অথচ দুর্বল স্রোতের পক্ষে বাঁধ ভাঙা সহজ নয়।

ইতিমধ্যে একদিন ভোরে আর ছেলেটির পড়া শোনা গেল না।

রামকিঙ্করের ঘুম যথারীতি ভেঙে গেছে। শুয়ে শুয়েই ও অপেক্ষা করছে: পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনর মিনিট, আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা……

কি দুঃসহ মুহূর্ত! ভাদ্রের গুমোটের মত।

কলকাতার রাস্তা জাগছে। পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে একটি-দু'টি গাড়ি ঘর্ঘর শব্দে চলতে শুরু করেছে। গঙ্গায় যারা স্নান করতে যায় তাদের স্তোত্রপাঠ শোনা যাচ্ছে। রামকিঙ্করকে উঠতে হবে। তার চাকরি শুরু হওয়ার সময় এল।

রামকিঙ্কর উঠল। কিন্তু ভারী মনেই উঠল।

কি হ'ল ছেলেটার?

অসুখ-বিসুখ কিছু নয় ত? পিছনেই বাড়ী। কিন্তু এই আজব শহরে গিয়ে জেনে আসবার উপায় নেই।

পরের দিন ভোরেও ঘর নিস্তব্ধ। অধ্যয়নের কোন সাড়া নেই। তার পরের দিনও।

রামকিঙ্কর অস্থির হয়ে উঠল।

তার পরের দিনও একই অবস্থা।

রামকিঙ্কর আর পারলে না। সুবল রাত্রে তারই ঘরে শোয়। তাকেই জিজ্ঞাসা করলে।

—কি ব্যাপার বল ত? ছেলেটা ক'দিন থেকে পড়ছে না।

সুবল অবাক্: কোন্ ছেলেটা?

আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে রামকিঙ্কর বললে, ওই যে, ওই ঘরে যে ছেলেটা রাত থাকতে উঠে পড়ে। অসুখ-বিসুখ কিছু হ'ল নাকি?

সুবল হেসে ফেললে: পরীক্ষা হয়ে গেছে বোধ হয়।

তা হতে পারে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আর পড়া থাকে না।

তার মনটা সুস্থ হ'ল, কিন্তু অস্থিরতা একেবারে গেল না। ভোরের বেলা মনটা একটু চঞ্চল হয়। তখনই মনকে প্রবোধ দেয়।

একদিন একটি ছেলে তার দোকানের সামনের রাস্তা দিয়ে চ'লে গেল। এমন কত ছেলেই ত যায়। কিন্তু এই ছেলেটিকে দেখে তার মনে হ'ল, ওই পাশের বাড়ীর ছেলেটি।

তাকে দেখে নি কোনদিন। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে একটি ছবি সে এঁকেছিল। সেই ছবির সঙ্গে ছেলেটির অনেকখানি যেন মিল আছে।

একবার মনে হ'ল, দোকান থেকে ছুটে নেমে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে, সে সেই ছেলেটি কি না। কিন্তু সঙ্কোচে পারলে না। কি জানি কি মনে করবে সে। হয়ত হাসবে, বিদ্রূপ করবে।

প্রায় তার বয়সী ছেলে। কিছু ছোটই হবে, বড় নয়। মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। শীর্ণ মুখে বড় বড় দুটি চোখ। যেতে যেতে একবার চাইলেও রামকিঙ্করের দিকে। চলতে চলতে মানুষ অন্যমনস্কভাবে যেমন ক'রে চায়।

তা ছাড়া আর কি! রামকিঙ্কর ভাবলে, ও ত আর জানে না, রামকিঙ্কর প্রত্যহ ভোরে ওর পড়া শোনে। তার ফলে রামকিঙ্কর ওর সঙ্গে একটা সংযোগ অনুভব

করে। কিন্তু ও কেন করবে? ওর ত করার কথা নয়।

রামকিঙ্কর যতক্ষণ দোকানে থাকে, একটি চোখ পথের উপর পেতে রাখে, যদি আর কোনদিন এ পথে ছেলেটি যায়-আসে। কিন্তু আর কোনদিন তাকে দেখা গেল না। হয় এ পথে আর কোনদিন সে যাওয়া-আসা করে নি, কি হয়ত করেছে কিন্তু কর্মব্যস্ততার মধ্যে রামকিঙ্করের চোখ এড়িয়ে গেছে। বিচিত্র নয়।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

বড়বাজারে অন্ধকার নেমে এসেছে। ওদের দোকান ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলেছে। রামকিঙ্কর ঘরে ধুনা দিচ্ছে।

এমন সময় একটি ভদ্রলোক এলেন।

গায়ে পাঞ্জাবীর উপর চাদর। চোখে চশমা। গোঁফ-দাড়ি কামান। হাতের ছাতাটি জড়ান। বয়স ৩০,৩৫ হবে। দেখলেই বোঝা যায় দোকানের খদ্দের নয়।

তাঁকে দেখে হরেকৃষ্ণ স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা জানালে: এস, এস, ভাই এস। অনেক দিন পরে এলে।

কুণ্ঠিত হাস্যে ভদ্রলোক বললেন, একেবারে সময় পাই না। দশটা-পাঁচটা স্কুল, তার উপর ছেলে-পড়ান আছে সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে। রবিবারের দিন আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

—যা বলেছ! দেশে গিয়েছিলে নাকি?

—কি ক'রে যাই? পরীক্ষা শেষ হ'ল, তার খাতা-দেখা আছে। সেগুলো শেষ ক'রে ভাবছি একবার বাড়ী ঘুরে আসব। দেশের খবর কিছু পেয়েছেন?

—পেয়েছি। খবর সব ভাল।

আরও কিঞ্চিৎ কুশল-প্রশ্ন বিনিময়ের পর ভদ্রলোক উঠলেন।

হরেকৃষ্ণ এতক্ষণ চায়ের কথা বলে নি। এখন ভদ্রলোককে উঠতে দেখে ব্যস্তভাবে বললে, এরই মধ্যে উঠছ কি! বস, একটু চা খেয়ে যাও। ওরে হরি!

মাষ্টারমশাই হাত জোড় করলেন, আজ থাক হরেকেষ্টদা। আপনার পিছনের বাড়ীতেই ছেলে পড়াই। আর একদিন এসে চা খাব। চায়ের জন্যে কি!

হরেকৃষ্ণ আর বাধা দিলে না। বললে, আচ্ছা। বাড়ী যাবার আগে আর একদিন আসবে।

—আচ্ছা।

মাষ্টারমশাই দোকান থেকে নেমে দু'পা যেতেই রামকিঙ্কর সামনে এসে দাঁড়াল: স্যার!

—কি?

—আপনি পিছনের বাড়ীর ছেলেটিকে পড়ান? ও কোন ক্লাসে পড়ে?

—সেভেনে। কেন বল ত?

হাত কচলে রামকিঙ্কর বললে, ওর সঙ্গে স্যার, আমার আলাপ নেই। ভোর রাত্রে উঠে ও পড়ত, আমি শুনতাম। আমিও সেভেনে পড়তাম স্যার।

—তা পড়া ছাড়লে কেন?

—বাবা মারা গেলেন স্যার।

এ দোকানে হরেকৃষ্ণর সূত্রে মাষ্টারমশাই মাঝে মাঝে আসেন। প্রবীণ কর্মচারীদের সকলেই তাঁর চেনা।

বললেন, তুমি কি দেবকিঙ্করবাবুর ছেলে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার। আপনি কি বাবাকে চিনতেন?

—খুব চিনতাম। তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে, রামকিঙ্কর।

—ও। তুমি কি পড়াশোনা করতে চাও? প্রাইভেটে পরীক্ষা দিতে পার।

রামকিঙ্কর খুব খুশী হয়ে উঠল। যে কথা সে কোন দিন কাউকে বলতে পারে নি, মাষ্টারমশাই তার মনের নিভৃতে লুকান সেই কথাটিই টেনে বার করেছেন।

—খুব ইচ্ছে স্যার। কিন্তু একা-একা ত হবে না। আমার বই নেই, বই কেনার পয়সাও নেই। ভাবছিলাম, ওই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হ'লে ওর সঙ্গে—

মাষ্টারমশাই ওকে আর কথাটা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, সে আর এমন কি। আমি কাল-পরশুর মধ্যে ওকে এই দোকানে এনে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তুমি সন্ধ্যাবেলায় থাক ত?

—আমি সব সময়ই থাকি স্যার।

—আমি নিয়ে আসব ওকে। ছেলেটি ভাল। পড়াশোনাতেও বটে, ব্যবহারেও বটে। ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে তুমি খুশী হবে।

মাষ্টারমশাই চ'লে গেলেন, রামকিঙ্কর নাচতে নাচতে দোকানে ফিরল।

কি সৌভাগ্য! কি আশ্চর্য সৌভাগ্য! ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হবে,—খাস কলকাতার ছেলে, কলকাতার প্রকাণ্ড বড় স্কুলে পড়ে। শুধু পড়াশোনাতেই নয়, ব্যবহারেও ভাল।

কিন্তু আলাপ মানে ত কথাবার্তা। নইলে ছেলেটিকে ত সে চেনেই। এই পথে ওর সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। ওর দিকে চেয়ে দেখেছেও। পরস্পর মুখ চেনা। দেখা হ'লেই অনর্গল স্রোতে গল্প আরম্ভ হবে।

কিন্তু সে কবে?

আজ রাত্রিটা যাবে, কালকের দিনরাত্রি, পরশু দিনটাও যাবে। সে এখনও অনেক দেরি।

কিন্তু অনেক দেরিও এক সময় শেষ হয়।

নির্দিষ্ট দিনে মাষ্টারমশাই ছেলেটিকে নিয়ে এসে রামকিঙ্করের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন, তোমরা গল্প কর। আমি হেডমাষ্টারের সঙ্গে দুটো কাজের কথা বলি।

ছেলেটি খুব লাজুক। মুখ নিচু ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

রামকিঙ্করও হতবাক্।

যে ছেলেটিকে রাস্তায় দেখেছিল, এ সে নয়। এমন কি মাথার কোঁকড়া চুল ছাড়া তার কল্পনার ছেলেটির সঙ্গেও কোন মিল নেই। রং কালো। শীর্ণ, খর্ব দেহ, ছোট ছোট তীক্ষ্ণ দু'টি চোখ, মুখে বসন্তর দাগ। প্রথম দৃষ্টিতে মনের উপর কোন ছাপ কাটে না।

অনেকক্ষণ পরে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নামটি কি ভাই?

—বিশ্বনাথ। তোমার?

—রামকিঙ্কর। পরীক্ষা কেমন হ'ল?

ছেলেটি হাসলে: মন্দ নয়।

রামকিঙ্কর বললে, আহা! তুমি ত খুব ভাল ছেলে।

ছেলেটি হাসলে: কি করে জানলে? মাষ্টার মশাই বলেছেন?

—তিনিও বলেছেন, তাছাড়া আমি নিজেও জানি।

—কি ক'রে?

—রোজ ভোরে তোমার পড়া শুনতাম। পড়া শুনলেই বোঝা যায় কেমন ছেলে।

—তাই বুঝি?—ছেলেটি আবারও হাসলে। সব কথাতেই তার হাসি।

সেদিন এই পর্যন্ত।

॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথদের ক্লাস-প্রামোশন হয়ে গেছে। বই কেনাও অনেক হয়ে গেছে। খানকয়েক বই সেদিন রামকিঙ্করকে দেখাতে এনেছিল। কয়েকদিন পরেই ক্লাসে রীতিমত পড়াশোনা আরম্ভ হবে।

মাঝে মাঝেই বিশ্বনাথ আসে। দু'জনে গল্প করে। বিশ্বনাথ গল্প করে তার ক্লাসের বন্ধুদের কথা। কবে কার সঙ্গে কি হয়েছে। শিক্ষকদের গল্প করে। কে কেমন পড়ান। কে রাগী, কে শান্ত।

রামকিঙ্কর গল্প করে তাদের গ্রামের কথা। এখানকার ছেলেরা খেলা করতেও জানে না। শুধু পড়ে আর সিনেমা-থিয়েটার দেখে। নয়ত খেলার মাঠে খেলা দেখতে যায়। গ্রামে কত খেলা। সমস্ত দিন খেললেও ফুরোয় না।

গল্প চলে পিছনের অন্ধকার ঘরটায় একটি ছোট বেঞ্চে দু'জনে পাশাপাশি ব'সে। কোনদিন, কাজ না থাকলে, উপরের শোবার ঘরেও গল্প হয়।

ছুটি পেলে দু'জনে হয়ত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। নয়ত কাছাকাছি কোন পার্কে গিয়ে বসে, একটি অন্ধকার কোণে ঘাসের উপর। পড়ার গল্পও হয়। কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা।

একদিন বিশ্বনাথ এসে বললে, রাম, মা তোমাকে ডেকেছেন।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: মা! তোমার মা!

—হ্যাঁ। তোমার গল্প প্রায়ই মায়ের কাছে করি। আজ বললেন, হ্যাঁরে, ছেলেটির গল্পই শুধু শুনি। একদিন আনতে পারিস্ না? বললাম, এখনই নিয়ে আসছি। চল।

মেয়েদের কাছে যেতে রামকিঙ্কর বড় সঙ্কোচ বোধ করে—সে মেয়ে মায়ের মতই হোক্ আর দিদির মতই হোক্।

বললে, কালকে গেলে হয় না?

—না। এখনই যেতে হবে। আমি মাকে ব'লে এসেছি।

বিশ্বনাথ জেদ করতে লাগল। আরও বার কয়েক আপত্তি জানিয়ে অবশেষে রামকিঙ্করকে উঠতে হ'ল। শার্টটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

শার্টটা খুব ফর্সা নয়। রামকিঙ্করের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই। দ্বিতীয় শার্টটি ধোপার বাড়ী। যেতে যেতে মনকে প্রবোধ দিলে, তা হোকগে। মায়ের কাছে যাচ্ছি, ফর্সা জামা-কাপড়ের কি দরকার!

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। বিশ্বনাথ জোরে কড়া নাড়তে লাগল: মা, দরজা খোল। দেখ, কাকে এনেছি।

দরজা খোলা হ'তেই রামকিঙ্করের চোখে পড়ল, সৌম্যদর্শন একটি মহিলা। শাড়ির লাল পাড় মাথার মাঝখান পর্যন্ত। চোখে-মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

—এস বাবা, এস।

ওরা প্রথম ঘরখানিতে গিয়ে বসল। সেটি ওদের

বসবার ঘর। ঘরের মাঝখানে একটি সোফা-সেট আর টিপয়। এক কোণে একটি ছোট টেবিল। তার ছ'পাশে ছ'টি চেয়ার। দেয়ালে অল্প কয়েকখানি ছবি ঝুলছে।

ঘরখানি বড় নয়। কিন্তু বেশ ঝকঝকে-তকতকে।

রামকিঙ্কর বিশ্বনাথের মাকে প্রণাম ক'রে হাসল।

তিনি বললেন, একটু বোসো বাবা। আমি এখনই আসছি।

তিনি চ'লে যেতে একটি সোফায় ছ'জনে পাশাপাশি বসল।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, এটি বুঝি তোমার পড়ার ঘর?

—না। সকালে মাষ্টার মশাই এসে এখানেই পড়ান। অন্য সময় ওদিকের ঘরে পড়ি। ওখানেই পড়ি, ওখানেই শুই।

—সেইটে বোধ হয় আমার ঘরের পাশে। না?

—হ্যাঁ।

রামকিঙ্কর আর একখানা ডিস্টেম্পার-করা দেয়ালের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললে, বাঃ! বেশ চমৎকার ঘর!

কলকাতার ভদ্র গৃহস্থগৃহের বসবার ঘরের সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়। সোফাটা বেশ নরম। ওদের দোকানের মত তেলের গন্ধ নেই। নিচের সিঁড়িটা অন্ধকার বটে, কিন্তু উপরটা তেমন নয়।

জিজ্ঞাসা করলে, ইঁদুর আছে?

—ওরে বাবা! ইঁদুর নেই! রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন পুলিস আসছে!

ছ'জনে হেসে উঠল। খুব উচ্চ কণ্ঠে। কলকাতায় আসার পর রামকিঙ্কর এত জোরে কখনও হাসে নি। হাসতে ভুলেই গিয়েছিল।

বিশ্বনাথের মা সুলোচনা এলেন ছ'জনের জন্যে খাবার নিয়ে। বিশ্বনাথের বোন মিণ্টুর হাতে জলের গ্লাস।

টিপয়ের উপর খাবার নামিয়ে সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন, হাসি কিসের?

বিশ্বনাথ বললে, ইঁদুরের কথা হচ্ছিল।

সুলোচনা বললেন, ওরে বাবা! তোমাদের ওখানেও ইন্দুর আছে বুঝি?

—আর বলবেন না মাসীমা।—রামকিঙ্কর হেসে বললে, ও ত ইন্দুরেরই রাজ্য। আমরা পাশ কাটিয়ে কোন রকমে বাস করি। একদিন তাড়া দিলাম একটাকে, পালান দূরে থাক, ঘুরে দাঁড়িয়ে এমন ক'রে দাঁত দেখালে যে, আমিই পালাতে পথ পাই না।

সবাই হাসতে লাগল।

সুলোচনার কথায়, তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহারে এমন একটি সহজ ভাব আছে যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রামকিঙ্করেরও আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল। সে যেন এই বাড়ীর ছেলে। এদের সঙ্গে যেন দীর্ঘকালের পরিচয়। তার স্বভাবসুলভ সঙ্কোচের কোন অবকাশই রইল না।

বিশ্বনাথের বোন ওদের সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনে হাসছিল। রামকিঙ্কর হাত বাড়িয়ে তাকে সামনে টেনে নিয়ে এল।

জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কি?

—লীনা।

—বাঃ! বেশ চমৎকার নামটি ত? কোন্ ক্লাসে পড়?

—ফাইভে উঠলাম।

বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। তার দেখা পল্লীগ্রামের মেয়ের মত জবুথবু নয়, আড়ষ্ট নয়।

সুলোচনা বললেন, ওদের আবার সকালে স্কুল।

—সকালে কেন?

বিশ্বনাথ বললে, আমাদের স্কুলেরই বালিকা-বিভাগ। ওদের আলাদা বাড়ী নেই। আমাদের স্কুলেই সকালে ওদের ক্লাস হয়। ওরা চ'লে গেলে আমাদের ক্লাস বসে।

এখানকার স্কুলের এত কথা রামকিঙ্কর জানত না।

বললে, তাই নাকি! বারো মাসই সকালে ক্লাস হয়? শীতকালেও?

—হ্যাঁ। গ্রীষ্মকালে পৌনে ছ'টায়, শীতকালে সাড়ে ছ'টায়।

লীনার দিকে চেয়ে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, শীতকালে অত ভোরে যেতে তোমার কষ্ট হয় না?

কষ্ট বোধহয় হয়। কিন্তু একটুখানি দ্বিধা ক'রে লীনা ঘাড় নাড়লে: না।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবা কি দেশে থাকেন?

ঘাড় নিচু ক'রে রামকিঙ্কর বললে, না। তিনি এই দোকানেরই ম্যানেজার ছিলেন। বছর কয়েক হ'ল মারা গেছেন।

—মা?

—তিনিও নেই। বাবার পরে তিনিও মারা গেছেন।

—তাই!—সুলোচনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর দৃষ্টিও যেন কোমল হয়ে এল।—তাই।

অর্থাৎ বাপ-মা নেই ব'লেই এই সুখের ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, দেশের বাড়ীতে কে আছেন?

—কাকা আছেন, কাকীমা আছেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা আছে।

—তোমার আর ভাই-বোন নেই?

—না।

বিশ্বনাথ বললে, জান মা, রামের ইচ্ছা প্রাইভেটে স্কুল ফাইনালটা দেয়।

সুলোচনা বললে, ভালই ত। তোর বই রয়েছে। দু'জনে একসঙ্গে পড়াশোনা করবি।

রামকিঙ্করকে বললেন, অল্প বয়স তোমার। এর মধ্যে পড়াশোনা ছেড় না বাবা। এখনও তিন-চার বছর সময় রয়েছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে নিশ্চয় পাস ক'রে যাবে। এমন ত কত ছেলে করে।

—সেই রকমই ত ইচ্ছে। কিন্তু আমি ত বিশ্বনাথের মত ভাল ছেলে নই। পাস করতে পারব কি না জানি না।

রামকিঙ্কর হাসলে।

সুলোচনা বললে, কেন পারবে না? মন দিয়ে পড়াশোনা করলে আবার পাস করতে পারে না?

রামকিঙ্কর বললে, বেশির ভাগ ছেলেই ত ফেল করে মাসীমা।

সুলোচনা বললে, কি জানি বাবা, কেন ফেল করে! বোধ হয় তারা মন দিয়ে পড়াশোনা করে না।

বিশ্বনাথ বললে, জান রাম, মা কবে পড়া ছেড়েছিলেন তার হিসেব নেই। এই সংসারের সমস্ত কাজ করতে করতে নিজের চেষ্টায় স্কুল ফাইনাল পাস করেছেন। এবার আবার আই. এ. দিয়েছেন।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: তাই নাকি?

সুলোচনা বোধহয় লজ্জা পেলেন। উঠে বললেন, তুমি পালিও না রাম। আমি এখনই আসছি।

বিশ্বনাথ বললে, মা আমাদের খুব গৌরবের জিনিষ। ঠিকে ঝি একটা আছে। দু'বেলা ছুটো বাসন মেজে যায়। বাকি সব কাজ মা নিজে করেন। ভোরে ওঠেন আর রাত এগারটায় শোন। তার মধ্যে কখন্ পড়া করেন, কেউ টের পায় না। তাই ক'রে ছুটো পরীক্ষা দিলেন!

বিস্ময়ে রামকিঙ্করের চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। পল্লীগ্রামে মেয়েদের লেখাপড়ার পাঠ নেই। পাস-করা মেয়ে সে জীবনে কখনও চোখে দেখে নি। গৃহস্থ মেয়ে সংসারের সহস্র কাজের ফাঁকে পড়াশোনা ক'রে পাশ করতে পারে, এ তার কল্পনাতীত। কিছুক্ষণ তার গলা দিয়ে স্বর বার হ'ল না।

তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তা হ'লে তুমি প্রাইভেট মাষ্টার রেখেছ কেন? মায়ের কাছে পড়লেই ত পার।

বিশ্বনাথ হাসলে: মায়ের কি একটা কাজ! তাঁর সময় কই?

তা বটে। এইটুকুনের মধ্যে তাঁকে দু'বার উঠতে হ'ল। রান্না-বাড়া আছে। আরও কত কাজ আছে।

কিন্তু এখান থেকে ওঠবার সময় রামকিঙ্কর এই ধারণা নিয়ে এল যে, যা বিশ্বনাথের মায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তা তার পক্ষেই বা অসম্ভব হবে কেন? মাসীমা ঠিকই বলেছেন, মন দিয়ে পড়া করলে কেউ ফেল করে না।

আশ্চর্য মেয়ে সুলোচনা। তাঁর কথা, ওই সুন্দর পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে রামকিঙ্কর যখন দোকানে ফিরল, তার দুই চোখ তখন স্বপ্নভরা।

সামনেই হরেকৃষ্ণ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখলে:

—কোথায় গিয়েছিলে?

—একটু ঘুরে এলাম।

—সন্ধ্যের পরে আজকাল একটু বেশি ঘুরছ যেন। অত ঘোরাঘুরি ভাল নয়।

হরেকৃষ্ণ ব্যঙ্গভরে হাসল।

কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্যে তা বোধ হয় রামকিঙ্করের চোখে পড়ল না।

বললে, না। একটি বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম।

—কলকাতার বন্ধু ত?

—হ্যাঁ।

হরেকৃষ্ণ বললে, ওহে ছোকরা, ভাল চাও ত ওদের সঙ্গ ছাড়। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। ওদের সঙ্গে আমাদের পোষায় না। ওদের চালে চাল দিতে গিয়ে মারা পড়বে।

এ কথার আর রামকিঙ্কর জবাব দিলে না। উপরে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

সুবল জানত বিশ্বনাথের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের কথা। ওকে ফিরতে দেখে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল।

জিজ্ঞাসা করলে, কি খাওয়ালে?

—অনেক কিছু। জান সুবল, একটি আশ্চর্য পরিবার

দেখে এলাম। বড়লোক নয়। ছোট ফ্ল্যাট বাড়ী। বোধ হয় দু'খানা শোবার ঘর আর একটা বসবার ঘর। কিন্তু অল্প ক'টি আসবাব নিয়ে কি সুন্দর সাজান। ওরা বাস করতে জানে। ওখান থেকে ফিরে এসে এটাকে মনে হচ্ছে নরককুণ্ড।

বিরক্ত ভাবে শার্টটা খুলে রামকিঙ্কর পেরেকে ঝুলিয়ে রাখলে। ওদের আলনার বালাই নেই। কাপড় থাকে দড়িতে ঝোলান। জামা, ছাতা, এমন কি জুতা পর্যন্ত পেরেকে টাঙান থাকে।

সুবল বললে, ওসব পয়সার খেলা রে ভাই, পয়সার খেলা।

রামকিঙ্কর অস্বীকার করলে না: বটে! কিন্তু খুব বেশী পয়সার খেলা বোধ হয় নয়। আসলে ভদ্রভাবে থাকবার বাসনাও থাকা চাই। জানলে?

সুবল চুপ ক'রে রইল।

রামকিঙ্কর বললে, বিশ্বনাথের মা এই বয়সে সংসারের কাজকর্মের মধ্যেও আই. এ. দিয়েছেন, জান?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আমাকে বললেন, মন দিয়ে পড়াশোনা করলে সবাই পাস করতে পারে। বিশ্বনাথের ব্যাপার জান?

—না।

—সে এবার ফার্ষ্ট হয়েছে। বরাবরই ফার্ষ্ট হয়। আর ক'দিন বাদে ওদের ক'জনের জন্যে স্কুলে স্পেশাল ক্লাস হবে। ও স্কুল ফাইনালে জলপানি পেতে পারে।

—তাই নাকি? বোঝা যায় না ত।

—হ্যাঁ। বর্ণচোরা আম। ওর ছোট যে বোনটি,—

সুবল পট ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, বয়স কত?

—ন'দশ বৎসর হবে। ফাইভে পড়ে। কি চমৎকার মেয়েটি! আমার কি মনে হচ্ছে জান?

—কি?

—আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন! আমার যদি একটি বোন থাকত!

—কি হ'ত তা হ'লে?

—খুব ভাল হ'ত।

এর বেশী সে ভাবতে পারলে না। ভাল হ'ত। কি ভাল হত, কেন ভাল হ'ত, তা সে জানে না। শুধু জানে ভাল হ'ত। অনেকদিন পরে মায়ের অভাব আজ সে বোধ করলে, সুলোচনাকে দেখে। বোনের অভাব লীনাকে দেখে।

বললে, একটি বোন থাকা খুব ভাল। না রে সুবল?

সুবলের বোন আছে। প্রায় বিবাহযোগ্যা হয়ে এসেছে। প্রতি পত্রে তার বাবা একবার ক'রে সেকথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেন।

বললে, কি ভাল? বিয়ে দেবার সময় প্রাণান্ত।

—না, বিয়ের কথা নয়। কিন্তু ভাল। কাছে একটি বোন থাকবে, ভাল। বোনেরা ভারি মিষ্টি হয়। বিশ্বনাথের বোনটি ভারি মিষ্টি মেয়ে।

—খুব সুন্দর দেখতে?

—না, খুব সুন্দর নয়, কিন্তু বেশ মিষ্টি। ভারি মিষ্টি কথা, ভারি মিষ্টি হাসি। বেশ বুদ্ধিমতী। চমৎকার সব লোক হে সুবল। মাসীমার ত কথাই নেই।

বাইরে যাবার পথ না পেয়ে রামকিঙ্করের দৃষ্টি গোটা ঘরটা একবার ঘুরে এল।

[ক্রমশঃ

—০—

পুনর্ভ্রাম্যমাণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

জয়পুরে গেলাম একদিন অম্বর প্রাসাদে। ১৯২৪এ যাইনি, কারণ ঐতিহাসিক ঔৎসুক্য আমার আদৌ নেই, তুমি জানো নিশ্চয়ই। তবু অম্বর প্রাসাদে এবার গেলাম, শুনলাম ব'লে যে সেখানে একটি মন্দিরে মীরা এসেছিলেন। মন্দিরটির নাম জগৎশিরোমণি মন্দির। এই সূত্রে অম্বর প্রাসাদও দেখতে হ'ল বৈ কি। শুনলাম, রাজা মানসিংহ ছিলেন এই বিরাট্ প্রাসাদে। কি আশ্চর্য কারুকাজ—বিশাল অঙ্গন প্রাচীর ছাদ কত কি! সব জড়িয়ে একটি মহিমময় অট্টালিকা মানতেই হবে। কেবল মন খুঁৎ খুঁৎ করে ভাবতে—একটি রাজার সুখের জন্যে কি বিপুল শ্রম ও অর্থব্যয়? তবে এ ত সার্বভৌম ও সার্বকালিক অপকর্ম: সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবই ধনীদের জন্যে, দুর্গতদের কথা ভাবে কে—কার প্রাণ কাঁদে তাদের জন্যে? স্বামী বিবেকানন্দের মতন প্রাণ সাধুদের মধ্যেই বা ক'টা?

যাই হোক, এখানে আমাদের মস্ত বাঁচোয়া এই যে, আমরা রাজারাজড়া নই, মধ্যবিত্ত। পরে উদয়পুরের মহারাজার আরো বিশাল প্রাসাদ দেখে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম কিন্তু এই ভেবে যে, অন্তত: আমরা এভাবে বিলাসে গা ভাসিয়ে দিই নি। তবু মানতেই হবে যে আমরাও (মানে মধ্যবিত্তরাও) দুর্গতদের কথা বেশি ভাবি না। সত্যিকার সাধুদের কথা অবশ্য আলাদা, কারণ তাঁরা স্বভাবে বিলাসী হ'তেই পারেন না, যেহেতু অনাসক্ত ও নিরভিমান না হ'লে খাঁটি সাধু হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে বিবেকদংশন হয় বৈকি: সত্যিই ভগবান্‌ই আমার একনাথ বটে ত, না নিজেকে ঠকাচ্ছি, আরাম পেয়ে তারই মধ্যে বিশ্রাম চাইছি না ত? ভরসা এই যে, এ পর্যন্ত অন্তত: এই চাওয়ার ক্ষেত্রে কোন আত্মপ্রতারণার খবর পাই নি। কিন্তু পরে কবে কি নব আত্ম-আবিষ্কার ক'রে অনুতাপে তনু দগ্ধ হবে—কে জানে? —বহুবিহারীর কোন্ চালটা বাঁকা নয় বল? ডাকেন তিনি বাঁশির ডাকে, ঘরছাড়া ক'রে বসান পথে—পরে দেখা দেবার নামটি নেই! প্রতিষ্ঠা দেন, ধনমানও দেন অনেক সময়েই, পরে বলেন মুচকে হেসে, "বেশ বেশ! এইসব নিয়ে যখন খুশী আছ তখন আমার আর কি দরকার? একটু শান্তি; একটু আনন্দ একটু ভক্তিতেই মন নেচে ওঠে, বলে: বা রে আমি!—করুণা পাই, কিন্তু তাকে ভাঙিয়ে খেতে না খেতে সেও গায়েব! বলিহারি!

জয়পুরে কতরকম লোকের সঙ্গে যে আলাপ হ'ল দু'টিমাত্র গানের আসরের পরে সে কি বলব? কাউকে মনে হ'ল দরদী, কাউকে বা সুদূর—যেমন হয় জীবনের পথ চলায়। কেবল গানের গুণীর ক্ষেত্রে একটি অভিনব অভিজ্ঞতা হয়—বলতেন প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ—যে, যার সঙ্গে কোন মিলই নেই চলনে, বলনে, চিন্তায়, দৃষ্টিতে—গানের আসরে মনে হয় অনেক দিনের চেনা যেন! পরে এরাও অবশ্য দূরে স'রে যায়—জীবন চলমান, কোন কিছুই দাঁড়ায় না—প্রায় জলে দাগ টানার মত, তবু দাগ যখন পড়ে তখন তাকে ত দাগই বলতে হবে।

এম্‌নি একটি মানুষ জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায় শ্রীমোহনসিং মেতা। দেখতে ভাল লাগে, কথা কইতে মন চায়, কাছে এলে প্রাণ খুশী হয়। আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন জয়পুর কলেজে ভাষণ দিতে। গিয়ে দেখি হাজারখানেক ছাত্রছাত্রী মাটিতে ব'সে, আর সিঁড়ির উপরে চাতালে আমার, ইন্দিরার ও মেতা মহোদয়ের চেয়ার। বললাম বাধ্য হয়ে যা মনে এল; কম্যুনিষ্ট চীনের পরস্বাপহারী, হিংসার পথে চিরজীবী স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার হাঁকডাক; দেশের দুর্দিনের কথা; নিজের নিয়তি, জাতির নিয়তি এখন আমাদের নিজের হাতে আমার কথা; মানুষের মানুষের কাছে আসার কথা; দুঃসাহসের প্রতিমূর্তি তেজস্বিতার মূর্ত বিগ্রহ সুভাষের কথা। ওরা সাড়া দিল মহোৎসাহেই। সবশেষে বললাম: "কিন্তু এবার বলতে চাই একটু ধর্মের কথা—কারণ, ভারত বেঁচে আছে আজও এই জন্যে যে, আমাদের বহু গ্লানি সত্ত্বেও ধর্ম এখনও এদেশে জীবন্ত। তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ মন তার সমস্ত প্রাণশক্তি ঢেলে ধর্মের বীজকে আজও লালন করে গহন অন্তরে। এই কথাই শিখেছি আমি এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দের চরণে। তাই জেনেছি যে ধর্ম ধারণ করে এই উপলব্ধিই আমাদের কাছে বরণীয়—সব আগে। আমরা বিদেশ থেকে শিখব অনেক কিছু,

রাণা প্রতাপ সিংহ, শক্ত সিং, খোরাসানা, মুলতানী ও প্রভুভক্ত অশ্ব চৈতক।
উদয়পুর মহারাণার সৌজন্যে প্রাপ্ত

অনুবাদ আমার মুখে শুনেছিলেন লণ্ডনে। সেটিও রেকর্ড করা হ'ল তাঁর অনুরোধে।

জয়পুরের শেষ অধ্যায় এল ১১ই তারিখে সকালে বড় মনোরম পরিবেশে—বাঙালীদের দুর্গা-বাড়ীতে সেখানে গাইলাম পিতৃদেবের চিরনবীন আনন্দগীতি—"ধনধান্যপুষ্পভরা"—বাংলায়, ইংরেজীতে, হিন্দীতে ও সংস্কৃতে। গাইতে গাইতে আবেশ এসে গেল। ধরলাম শ্যামাসঙ্গীত ইন্দিরার একটি হিন্দী ভজনের অনুবাদ :

শ্রীচরণে লুটিয়ে ডাকি, কোলে
তুলে নে মা এসে।
বল্ মা তারা, মাকে ছেড়ে থাকে
শিশু কোন্ বিদেশে!

সাঙ্গ হ'ল দিনের খেলা,
শরণ দে মা সন্ধ্যেবেলা,
কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান শোনা মা মধুর রেশে।...

দীর্ঘ গান—সবটুকুর উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য হবে। এটুকু উদ্ধৃত করলাম শুধু এই কথাটি জানাতে যে, গানটি শুনে শুধু বাঙালী নরনারী নয়, অবাঙালী অনেকেও চোখের জল ফেলেছিলেন—বলেছিলেন গাঢ়কণ্ঠে : "এমন আনন্দ আমরা দুর্গাবাড়ীতে কখনও পাই নি।" এরি ত নাম চিরন্তন নিত্যানন্দের আবাহন। অথচ লোকলস্কর ধুমধাম যুদ্ধবিগ্রহ কেঁপে উঠে আড়াল ক'রে এই শাশ্বত উপলব্ধিটিকে যে আমাদের অন্তরাত্মা আশ্রয় পায় জাঁক-জমকে নয়, আরাম বিলাস যশমান ধনজনের প্রসাদে নয়, তার শেষ শিথান জগন্মাতার কোলেই বটে—ভক্তি ও শান্তিই হ'ল জীবনের শেষ ঠাঁই—আলোর আলো, যার ক্ষয় নেই, ভয় নেই, আছে শুধু জয়জয়কার—বিন্দুর সমাপ্তি সিন্ধুবুকে, ফুলিঙ্গের মজ্জন চিরশিখায়, জীবের শরণ চাওয়া শিবের পায়ে। ওঁ শান্তিঃ।

এর পরে এলাম উদয়পুরে নবনির্মিত সার্কিট হাউসে। ১৯২৪-এ উদয়পুরে ছিলাম তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্যে। এবার উঠলাম রাজভবনেই বলব—অর্থাৎ সার্কিট হাউসে।

একটি পাহাড়ের চূড়ায় এই সুরম্য সুদৃশ্য বিলাস-ভবনটি আসীন। এখানেই সাহেবরা এসে থাকেন যাঁরা

জানব অনেক কিছু, কিন্তু মানব সব আগে ধর্মকে—অর্থাৎ আত্মিক ইষ্টার্থকে—spiritual values; এ যদি না মানি তবে আমরা বড়জোর হয়ে দাঁড়াব নাজি, চীন বা রুশদের মতন সিংহনাদী হিংসাবাদী রণদৃপ্ত জাতি—অস্ত্র শানাব, গর্জন করব, লোভ ও শক্তির মদে মাতোয়ারা হয়ে ধুমধাম করব দু'দিন—তার পরে যাবই যাব নিভে, যেমন সব ঐহিক গর্বী জাতিই নিভে গেছে দু'দিন হাঁক-ডাক ক'রে। আর ধর্ম বলতে বোঝায় চিরন্তন-প্রীতি। সাময়িক অনেক কিছু যে আমাদের মাতিয়ে তোলে, অল্পের মোহ যে অনল্পকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে—এরই ত নাম মায়া, কারণ যা ক্ষণায়ু তাকে চিরায়ু মনে করার অন্তে আসেই আসে অবসাদ। খতিয়ে শুধু সত্যই হয় জয়ী—মিথ্যা যায়ই যায় লীন হয়ে। আর মানুষ সত্যের সত্য ব'লে বরণ করে শুধু তাকেই যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অব্যয়।" ব'লে শেষে গাইলাম একটি বিখ্যাত ইংরেজী স্তোত্র Abide with me: "এতে দু'টি চরণ আছে আমার অতি প্রিয়"—বললাম আমি—

"Change and decay in all around I see:
O Thou who changest not abide with me"...
ইত্যাদি।

ছাত্ররা শুধু যে সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিল তাই নয়, পর দিন এল রাজভবনে আমাদের গাওয়া "হম ভারতকে" ও Abide with me গানটি টেপরেকর্ড করতে। শ্রীমেতা পিতৃদেবের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটির ইংরেজী

ছাড়পত্র পান। আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীসম্পূর্ণানন্দ। তাঁর জয় হোক্। এমন অনিন্দনীয় আলোভরা আরামনিলয় কমই দেখেছি। বারান্দা প্রশস্ত—সকালে রোজ বেড়াই প্রায় এক ঘণ্টা, দু'দিকে হ্রদ ও পাহাড়ের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে। রাজরথ হাজির—কোথায় না বেড়ালাম বল? গেলাম হ্রদের মধ্যে অবস্থিত দু'টি রাজপ্রাসাদে মোটর বোটে। একটিতে এখন হোটেল রচনার কাজ চলেছে। চারদিকে জলের ও পাহাড়ের বেষ্টনীর মাঝে এই দ্বীপ হোটেলটি হবে একটি আশ্চর্য বিলাসনিকেতন—অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হোটেলটি থেকে দেখা যাবে বিশাল রাজপ্রসাদ, যেখানে মেবারের রাণারা রাজত্ব ক'রে গেছেন। কি বিরাট প্রাসাদ—দরবার গৃহ চাতাল প্রাচীর, সে বর্ণনা ক'রে লাভ কি? সুন্দরী রমণীরূপ বর্ণনার মত বিশালতার স্তবগান পণ্ডশ্রমই বটে। উপমা দিয়ে একটু-আধটু আভাস দেওয়া যায় মানি, কিন্তু তার জন্যেও চাই বিকশিত প্রতিভা বা বিশিষ্ট নৈপুণ্য। তাছাড়া প্রাসাদ অট্টালিকা

রাণা প্রতাপ সিংহ, উদয়পুর রাজপ্রাসাদের মূল চিত্র থেকে ফটো নেওয়া

স্মৃতিসৌধ জাতীয় ঐতিহাসিক আলোকস্তম্ভে আমার মন কোনদিনই সাড়া দেয় নি। তাই শুধু বলি যাতে আমার মন সাড়া দিয়েছিল: দু'টি ছবিতে। একটি রাণা প্রতাপের ছবি—রণতুরঙ্গ চৈতক তাঁকে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে প্রভুর প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু প্রভুকে বাঁচাল সে নিজের প্রাণ দিয়ে। অকরুণে যে মরণাপন্ন চৈতকের সে কি করুণ চাহনি! দেখে চোখে জল আসে। অন্য ছবিটি বিখ্যাত হলদিঘাটের যুদ্ধের। কত যানবাহন অশ্ব গজ রথাদি! প্রকাণ্ড তৈলচিত্র। কেবল মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে—বীরত্বের ছবি বটে, কেবল হায় রে, এই বীরত্ব সাহস তেজ যদি বিশ্বপ্রেমের সেবার উপচার হ'ত, হ'ত যদি ভগবানের চরণার্থী নৈবেদ্য! দেশভক্তির আমি বিরোধী নই। অহিংসবাদী নই। গীতায় বাণীতেই আমার মন সাড়া দেয়: ধর্ম্মযুদ্ধ শুধু যে সমর্থনীয় তাই নয়, করণীয় বরণীয়ও বটে। তাই ত মিথ্যা ও নিষ্ঠুরতার পুরোহিত কাপালিক চীনের আক্রমণের পর থেকে প্রত্যহই পিতৃদেবের বাঁধা স্বদেশী গান ও ইন্দিরার রচিত সৈন্যদের মার্চ-সঙ্গীত "হম ভারতকে হৈ রখবালে" গেয়ে বেড়াচ্ছি, যাতে আমাদের সবার মনেই দেশভক্তির উদ্দীপনা চারিয়ে যায়। রাজস্থানে এসে সুবিধা হ'ল এই যে, এখানকার বহু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এবার গান করার সুযোগ মিলল ঠাকুরের দয়ায়। প্রথম জয়পুর কলেজে—যার কথা বলেছি, তারপরে উদয়পুরে মহারাজা ভূপাল কলেজে গাইলাম—আমার এক গুরুভাই ভীমসেন—সেখানকার প্রিন্সিপাল—তাঁর সাদর নিমন্ত্রণে। সবশেষে গাইলাম ও বক্তৃতা দিলাম ভূপাল নোবুল্স কলেজের প্রিন্সিপালের নিমন্ত্রণে। দু'টি আমারই পিতৃদেবের

"ভারত আমার" ও "হম ভারতকে" জমেছিল আমাদের দ্বাদশী কোরাসে। জয়পুরেও বহুলোক সাড়া দিয়েছিল যার ফলে জয়পুর রেডিওর কর্তা রেকর্ড করলেন গানগুলি ও পরে আমাকে লিখলেন প্রতাপভূষণ ষ্টেশন ডিরেক্টর—১৪ই নভেম্বরে: "We wish to use a few of your songs recorded during your stay at Jaipur for broad-cast purposes. They would suit the mood and temper of the present time." তারপরেই অনুমতি চাওয়া ও আমাদের তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে অনুমতি দেওয়া। এইই ত আমি চাইছি, গান গেয়ে শুধু সৈন্যদের জন্যে টাকা তুলতে নয়—"বাপকা বেটা সিপাইকো ঘোড়া" মন্ত্র জপতে জপতে কিছু অন্তত: উদ্দীপনা জাগাতে দেশভক্তির তথা ভগবদ্ভক্তির।

উদয়পুরে ভূপাল মহারাজের বিরাট্ কলেজে এক নতুন ধরনের প্রেক্ষাগৃহ দেখলাম: গায়ক ছাউনির নিচে মঞ্চাসীন, আর শ্রোতারা খোলা আকাশে গড়ানে-মাঠে চেয়ারে শোভমান। প্রায় পাঁচ-ছশো ছাত্রছাত্রী এসেছিল। কাজেই গাইলাম দুর্দান্ত প্রতাপে, প্রাণের মায়া ছেড়ে এই ৬৬ বৎসর বয়সেও। আমার এক বন্ধু দিল্লীতে সেদিন বলেছিলেন: "করছ কি দিলীপ, এতক্ষণ ধ'রে গাওয়া! মরবে যে!" অর্থাৎ কোনমতে টিমটিম ক'রে বেঁচে থাকাই পন্থা—যেহেতু আপনি বাঁচলে বাপের নাম—শাস্ত্রেই রয়েছে, অকাট্য! যাহোক যা বলছিলাম: গাইলাম পিতৃদেবের 'ভারত আমার' ইংরাজি ও হিন্দীতে। ইংরাজি অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দের, হিন্দী ইন্দিরার। ধরতে না ধরতে গান জমে উঠল। সবাই সাগ্রহে নীরবে শুনলেন—যাকে বলে "পিনপড়া নৈঃশব্দ্যের মাঝে।" শেষে গাইলাম ইন্দিরার বাঁধা "দীপক জল না সারী রাত"—মীরাভজন এরা ইন্দিরার মীরাভজন শুনে এত মুগ্ধ হয়েছে যে নোবল্‌স কলেজের প্রিন্সিপাল চাইলেন তার ভজনাবলী। এঁর কথা একটু না বললেই নয়।

ইনি ধার্মিক মানুষ। আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি ভাগবতের মহাভক্ত, এখন গুরু খুঁজছেন··· ইত্যাদি। অতএব আলাপে মন ব'সে গেল দেখতে দেখতে। শেষে বন্ধুবর আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের কলেজেও ভাষণ দিতে, তথা গান করতে। আমি বললাম, তথাস্তু। কিন্তু তারপরেই তিনি বললেন যে, তাঁর কলেজে এসে কিন্তু গাইতে হবে ক্ল্যাসিকাল গান—খেয়াল ও ঠুংরি। আমি বললাম, আমি স্বদেশী গান ও ভজন ছাড়া আর কোনও গান গাই না। তিনি নাছোড়বন্দ, বললেন: "আপনি চমৎকার খেয়াল ঠুংরি গাইতেন—কেন গাইবেন না শুনি।" আমি বিরক্ত হয়ে তাঁকে পরদিন শ্রীকান্তকে দিয়ে টেলিফোন করালাম যে, আমি গুরুদেবের কাছে যোগদীক্ষা নেওয়ার পর থেকে খেয়াল ঠুংরি গজল জাতীয় নিছক শিল্পসঙ্গীত বা জাঁকালো ওস্তাদী গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, আমি আজকাল চাই শুধু সেই সব গান গাইতে যা ভগবান্‌কে নিবেদন করতে পারি সহজেই—অর্থাৎ কি না ভক্তি-সঙ্গীত। তাঁকে পাঠাতে ইচ্ছা হ'ল পুস্তিকাটি যা ছাপিয়েছেন সদাশয় শাস্ত্রী। কিন্তু ভাবলাম তিনি আমাকে বিপন্ন করলেও তাঁকে অপ্রতিভ করা আমার পক্ষে অশোভন হবে—আরও এই জন্যে যে, মানুষটি সত্যিই সদাশয়, তাছাড়া পীড়াপীড়ি করেছিলেন ওস্তাদী গান ভালবাসেন ব'লেই ত। এ প্রীতিকে কিছু অপরাধ বলা চলে না, এক সময়ে আমিও ত সত্যিই গভীরভাবে ভালবাসতাম ওস্তাদী গান। মরুক গে, বলি তারপর কি হ'ল।

নোবল্‌স্ কলেজের এই প্রিন্সিপালটির নাম—শ্রীশ্যাম-সুন্দর চতুর্বেদী—আমার টেলিফোনের পরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে লোক পাঠালেন—কিছু মনে করবেন না, ক্ষমা করবেন···ইত্যাদি। অগত্যা রাজি হ'তে হ'ল। পরদিন গিয়ে পড়লাম তাঁর কলেজের হলে—প্রায় দু'তিনশো ছাত্রের মধ্যে। গানের আগে বললাম ভারতের দেশাত্মবোধের কথা। যা বললাম তার সারমর্ম এই যে, আমাদের দেশপ্রীতি মাতৃপূজা—অপরের রাজ্য জয় করার বিক্রমভিত্তিও নয়, ঐহিক রাষ্ট্রবাদও নয়। আমাদের মন্ত্র হ'ল—দেশ শুধু দেহধাত্রী নয়—প্রাণদেবী, জগন্মাতা। ব'লে গাইলাম বন্দেমাতরম্—ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমলদল-বিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, গাইলাম সকলের অনুরোধে পিতৃদেবের বিখ্যাত,

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর
বিরাট্ দৈন্যে দুঃখে তাহার শৃঙ্গের সম, অটল স্থির।

রাণা প্রতাপের দেশ ত, ওরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল—অবশ্য আমি অর্থটা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আগে। তার পর গাইলাম ইন্দিরার "হমে ভারতকে।" ওদের গীতি-শিক্ষক চাইলেন স্বরলিপি। আমি বললাম, "পরশু মহারাজ ভূপাল কলেজে ওরা এ গানটি টেপ রেকর্ড ক'রে নিয়েছে।" তবু ছাড়ে না ওস্তাদজি। বলেন: আমি স্বরলিপি ক'রে নেব·· ইত্যাদি। আমি বললাম: "টেপ রেকর্ড থেকে শিখে নেবেন, আমরা আজই প্রস্থান করছি।

কাজেই সময় নেই।" এ বাদানুবাদের উল্লেখ করলাম ওদের আগ্রহের খবর দিতে। ইন্দিরাকে শেষে বললাম: "এবার আমাদের রাজস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ছয়টি: এখানে সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকা তোলা; ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশভক্তির উদ্দীপনা জাগানো; 'হম ভারতকে' গানটি প্রচার; জয়পুরে শ্রীরাধার সুন্দর প্রতিমা সংগ্রহ; সর্ব্বোপরি উদয়পুরে মারার মন্দির দর্শন ও মীরার ভক্তির কিছু ছিটেফোঁটা পাওয়া এ-পুণ্য আবহে। এই ছয়টি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে।" এ ছয়টির মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যটি অবশ্য শেষেরটি—অর্থাৎ মীরার দেশে এসে তাঁর পুণ্যস্মৃতিজড়িত পরিবেশে কিছু ভক্তির প্রেরণা পাওয়া নতুন ক'রে।

যদি বলি উদয়পুর রূপে অতুলন মানসমোহন রাজধানী, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। জল স্থল প্রাসাদ ও শৈলমালার সৌন্দর্য্য সমন্বয়ে উদয়পুরের জুড়ি মেলা ভার—বটেই ত। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য চিত্তচমৎকারী, হ'লেও আমাদের—মানে, অন্ততঃ আমার ও ইন্দিরার—মনপ্রাণ দুলে উঠেছিল শুধু মীরার কথা ভেবে। তাই তাঁর কথা কিছু বলা অবান্তর হবে না এ প্রসঙ্গে।

ক্রমশঃ

চীনের অহমিকার বুনিয়াদ

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

চীনা দস্যুগণ তাহাদিগের যে সাম্রাজ্য-বিস্তার কার্য্য ভারত ধর্ষণ করিয়া আরম্ভ করিল, তাহাতে বিভিন্ন জাতির আনুকূল্য কি কারণে তাহারা লাভ করিল ইহার আলোচনায় দেখা যায়:

১। রুশীয়গণ চীনের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য-রক্ষার দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইলেই চীনের সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক সম্পদে টান পড়িয়া অভাবের সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে করে। চীন যত অধিক বিভিন্ন দেশের সহিত সংঘাতে আসিয়া পড়িবে, চীনের শক্তি ততই বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়িবে ও তুলনামূলক ভাবে রুশ যুদ্ধশক্তিতে অধিক সংগঠিত হইয়া থাকিবে। চীনের জনবল ও উৎপাদনী শক্তি যত অধিক যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে, তাহার অবস্থা ততই অভাব ও অপ্রতুলতা দ্বারা আক্রান্ত হইবে। ইহাতে রুশের সুবিধা। গায়ের জোরে মত প্রচারের যে অখ্যাতি ও সর্ব্বজন-শত্রুতা তাহাও চীনের হইলে রুশীয়ার সুবিধা।

২। আমেরিকা চীনাদিগকে সেই মনোভাবের আবেগে জড়াইয়া ফেলিতে চাহেন, যাহাতে তাহাদিগের অহঙ্কার ক্রমশঃ বাড়িয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পড়ে, যেখানে তাহারা রুশের প্রাধান্য আর সহ্য করিতে চাহিবে না। রুশীয়ার সহিত চীনের শত্রুতা বৃদ্ধি আমেরিকার কাম্য। পাকিস্তান আমেরিকার দাস এবং পাকিস্তান যে চীনাদিগকে সিং-কিয়াং-এ সবলতর হইতে সাহায্য করিতেছেন ইহা নিশ্চয়ই আমেরিকার অনুমোদিত। চীন-পাক সন্ধি আপাতদৃষ্টিতে ভারতের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত তাহা রুশের সহিত চীনের শত্রুতা বাড়াইবার জন্যই করা হইয়াছে। চীন নিজেকে অদম্য ও অপরাজেয় কল্পনা করিয়া অবশেষে রুশের সহিত সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়িবে ইহাই আমেরিকার আশা।

৩। ব্রিটেনের আশা আমেরিকার মতই এবং ব্রিটেন বরাবরই চীনকে মহাবলশালী বলিয়া তাহাদিগের অহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। চীন যদি গর্ব্বস্ফীত হইয়া রুশের সহিত লড়িয়া যায় তাহা হইলে ব্রিটেনের আনন্দের সীমা থাকিবে না। চীনকে এরোপ্লেন বিক্রয় প্রভৃতি এই চীনের আত্মাভিমান বৃদ্ধির চেষ্টা মাত্র। নেপাল ও চীনের সখ্যও এই জাতীয় অনুপ্রাণনার ফল।

৪। ভারতের অনিচ্ছাকৃত দোষে চীনের অহঙ্কার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতীয় সেনাগণ যদি চীনের সৈন্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে তাহা হইলে চীনের বিশ্বাস হইবে যে তাহাদিগের ন্যায় যোদ্ধা জগতে আর নাই।

দুই যাত্রী

শৈবাল চক্রবর্তী

এরপর লেক রোডকে পেছনে ফেলে স্কুটার মোড় বেঁকলে সাদার্ণ এভিনিউর দিকে। একটা ঝাঁকুনি লাগার সঙ্গে সঙ্গে নমিতা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

স্কুটারের চালকটি মাথা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, কি হ'ল?

—কিছু না।

—হাসলে যে? বাংলা পরিষ্কার নয়, একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

—আহা, কি একটা প্রশ্ন! হাসি পেল তাই হাসলাম।

স্কুটারের স্পীড বাড়ল অকারণেই, এখন দুপুর তিনটের রাস্তা এমনিতেই ফাঁকা আর লেকের এই অঞ্চলটা প্রায় সব সময়েই জনহীন। এক-এক সময়ে মনে হচ্ছিল গাড়ি যেন শূন্যে উড়ছে। স্পীডোমিটারের কাঁটা থরথর ক'রে কাঁপছে, প্রায় জনশূন্য লেকে দু'টি একটি উদ্দেশ্যহীন পথিক ছাড়া আর কেউ নেই। রাস্তার কাগজ-কুড়ুনে ছেলেটা একবার বোঁ ক'রে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ই বাস রে, যেন রকেট!

—কি হচ্ছে? ধমকের সুরে বলল নমিতা আর সামনের পিঠে একটা কিল মারল। একটা এ্যাকসিডেণ্ট না বাধিয়ে বুঝি সুখ হচ্ছে না?

—শাট্ আপ। রাও গর্জ্জন ক'রে উঠল আর হঠাৎ এক মোচড় দিয়ে ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। আচমকা বাঁক নিল গাড়ি, টাল সামলাতে না পেরে নমিতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর পিঠে। নমিতার বুঝতে বাকি রইল না যে খ্যাপা খেপেছে। এখন ওকে যতই ডাকা যাক ও শুনবে না। এখন ওর রুক্ষ চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে আর চোখের দৃষ্টি হয়েছে তীক্ষ্ণ। বারণ করলে ও অবাধ্য হবেই। তার চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকা যাক। দুরন্ত হাওয়া এসে খেলা করুক দেহ আর মন নিয়ে। নমিতা স্নিগ্ধ মুখে ব'সে থাকে, তার দৃষ্টি থাকে সামনে পথের দিকে। রোদ জ্বলছে, বাড়ীর সামনে কোথাও গাছের ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। প্রায়-নির্জ্জন ফুটপাথে হঠাৎ হাওয়া বয়ে গেল, শুকনো পাতাগুলো ছড়িয়ে পড়ল এদিক্-সেদিকে। চেনাপ্পার চুল উড়ছে, নমিতার আঁচলও আজ উড়ু উড়ু। ওদের এই যুগলযাত্রা দেখছে ভিখিরি ছেলে আর শহুরে পাখীর দল।

কি অবিশ্বাস্য দিন! নমিতা ওপর দিকে তাকায়। কি অকৃপণ আকাশ! সৃষ্টিকর্ত্তা নিজের খেয়ালে এক-একটা দিন কেমন অপরূপ ক'রে সাজান। সে দিনগুলোর এত রং থাকে আর থাকে এত আলো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

একটা লরী ছুটে গেল প্রায় গা ঘেঁসে। না, লোকটাকে এবার থামানো দরকার। এভাবে চললে আর বেশিক্ষণ নয়।

—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস ক'রে বলল সে, একটু জল না খেলে আর বাঁচব না।

—ও, জল খাবে? চেনাপ্পার হাত আল্গা হয়ে আসে। এদিক্-ওদিক্ তাকায় সে। ওই যে মোড়ে টিনের ছাউনির নিচে একটা লোক মস্ত একখানা কেটলি নিয়ে ব'সে। সাধারণতঃ রিক্শাওয়ালারাই এখানকার এক আনাওলা চায়ে গলা ভিজিয়ে নেয়। চেনাপ্পা গিয়ে ছাউনির পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। লোকটা অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকায়। তার দোকানে এমন ধোপদুরস্ত সাহেব-মেমসাহেবের পদার্পণে সে ঘাবড়ে যায়। চেনাপ্পা রুমাল দিয়ে বেঞ্চিটা ঝাড়তে থাকে আর জিজ্ঞেস করে ভেইয়ার কাছে গরম চা পাওয়া যাবে কি না। 'বহুৎ খুব' ব'লে চা-ওলা তার টিকিসুদ্ধ মাথাটা নাড়ায় এবং সবচেয়ে ভাল চায়ের কৌটোটি খুঁজে খুঁজে বার করে। এরা ততক্ষণে কলসী থেকে জল এবং 'জার' থেকে বিস্কুট নিয়ে মহানন্দে খেতে লেগেছে। এই হ'ল এদের বিশ্রাম আর আনন্দ—এরা বড় জায়গায় গিয়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলে না, ছোট কোণটুকু ভরিয়ে দেয় প্রাণের প্রাচুর্য্যে। চা-ওলা এক মগ থেকে আর এক মগে চা ঢালে আর আড়চোখে এদের লক্ষ্য করে। সাহেব-মেম যে খুব খেয়ালি-প্রকৃতির তা আর তার বুঝতে বাকি নেই। লেকিন, এদের দিল খুব বড়, তা নইলে আর তার দোকানে ঢুকে এইভাবে আনন্দ করছে? নমিতা এতক্ষণ তার মুখের ঘাম মুছছিল, ঘাড়ে, গলায় ধুলো লেগেছে সযত্নে আঁকা সুর্মা কখন মুছে গেছে কিন্তু ফুটে উঠেছে অন্য এক লাবণ্য। রোদলাগা কচি পাতার মত চক্‌চক্ করছে তার মুখ।

উঃ, তুমি একটা পাগল—নমিতা বলে। এভাবে কেউ গাড়ি চালায়? চেনাপ্পা হাসে, বলে, গাড়ি এইভাবেই চালায় নমি, তার স্বভাবই হচ্ছে ছোটা। ইজিচেয়ারে হাত-পা গুটিয়ে রাখতে হয় আর গাড়িতে চাপলে তাকে ছোটাতে হয়।

—ও, গাড়ি চালানো মানেই বুঝি প্রাণের মায়া ত্যাগ করা? নমিতা ভুরু নাচায়।

—চা নাও, ব'লে চেনাপ্পা ওর দিকে একটা ভাঁড় এগিয়ে দেয়। চা খেয়ে ঠাণ্ডা কর নিজেকে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নমিতা ওর দিকে তাকায়। মনে মনে বলে, তুমি এক সৃষ্টিছাড়া জীব। সবার মত চললে তোমার চলবে কেন? এমন বেপরোয়া স্বভাবের লোক নমিতা আর দু'টি দেখে নি। একবার কি এক সামান্য কথায় জেনারেল ম্যানেজারের টাই ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়েছিল, আর একবার বাড়ীতে ঝগড়া ক'রে সারা রাত গড়ের মাঠে শুয়ে কাটিয়েছিল। অদ্ভুত! এ লোকটির সঙ্গে আর একটি লোকেরও মিল খুঁজে পায় নি নমিতা। নাহোনেল কোম্পানীর রিসেপশনিষ্ট হিসেবে অগুণতি লোককে সে দেখেছে। পুরুষমানুষ কত রকমের হয় তার একটা ছক তৈরি আছে তার মনে মনে। কতটুকু হাসলে কার গাম্ভীর্য্যের মুখোস খ'সে যাবে, কে একটু কথা বললেই গ'লে পড়বে—এ সে একনজর দেখেই ব'লে দিতে পারে। কিন্তু চেনাপ্পা এই সাধারণ সমষ্টি থেকে এক মূর্ত্তিমান ব্যতিক্রম। আশ্চর্য্য! সে নমিতার সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিল তার চোখের দিকে তাকিয়ে। এরকম কাণ্ড নমিতা কখনও দেখে নি। পুরুষের দৃষ্টি প্রথমে চোখ থেকে মুখে এবং তারপর শরীরের অন্যত্র কিভাবে বিচরণ করে তা সে জানে। এসব তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। কিন্তু চেনাপ্পার দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে ছিল শুধু তার চোখে। সেখানে সে কি মধুপান করেছিল কে জানে।

কিন্তু সেসব কথা অনেক পুরনো। অগোছালো মনের সব ভাবনা আজ স্তরে স্তরে ভেসে উঠতে চায়। নমিতার মনের মতই আকাশটা আজ খুশিতে উজ্জ্বল। ছুটিটাও পাওয়া গেল বেশ আচমকাই—অফিসের আজ প্রতিষ্ঠা দিবস। এই হঠাৎ-পাওয়া ছুটির সঙ্গে চেনাপ্পার যোগাযোগ, বলবার আর কিছু বাকি থাকে না।

—আজ ডায়মণ্ড হারবার যাবে? হঠাৎ চেনাপ্পা ব'লে বসে।

—ডায়মণ্ড হারবার কেন? নমিতা মুখভঙ্গি করে। সমুদ্র পেরোলেই ত হয়।

—না না, ঠাট্টা না, চল—রাও যেন আবদার ধরে।

নমিতা গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, তোমার মত আমার ত আর মাথা খারাপ হয় নি।

—বা রে! রাও ভারী অবাক্ হয়, মাথা খারাপের কি হ'ল?

—না, তা আর হ'ল কৈ, নমিতা ঠোঁট উল্টোয়, ডায়মণ্ড হারবার যেতে ক'টা বাজবে শুনি? আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে না, না? তুমি জান, একটু দেরী ক'রে ফিরলে দিদিমা কিরকম চেঁচামেচি করে।

—আহা, একটা ত দিন, রাও যেন মিনতি করে, একটা দিন দেরী করলে আর কি হয়েছে?

নমিতার মুখে হাসি ফোটে। অদ্ভুত এক দীপ্তি সে

হাসিতে। মনে মনে সে বলে মন ভোলাতে তোমার জুড়ি নেই, তোমার কল্পনাগুলি ভারী সুন্দর। বিবাগীর মত আমাকে পথে পথে নিয়ে বেড়াতে চাও, তাই না? ওদের চা খাওয়া হয়ে যায়, আবার ওরা গাড়ীতে চড়ে। গর্জ্জন ক'রে স্কুটার ছুটে যায়। না, ডায়মণ্ড হারবার যাওয়া হবে না। সমুদ্রে মন আরও অস্থির হয়। একটা নাচের জলসা আছে মালয়ালম ক্লাবে, সেখানে ঢুঁ মারবে ওরা, তার পর নমিতাকে তার গলির মোড়ে ছেড়ে দেবে রাও। আজকের পরিক্রমা সেইখানেই শেষ হবে।

নমিতা ব'সে আছে। এখন রোদ ক'মে রাস্তায় একটু ছায়া-ছায়া ভাব। বকুল গাছে জটলা করছে চড়ুইয়ের দল। হঠাৎ যেন গান ধরতে ইচ্ছে করল নমিতার। এই বিকেলবেলার করুণ রংএ যেন তার হৃদয়ের রং মিশে গেছে, তার বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে আর বাতাসে।

আজ তারা কত কাছাকাছি। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মনে প্রশ্ন জাগে, ওদের এই সম্পর্কের ভিত্তিটা কি? কোন্ অজুহাতে ওরা এত কাছে আসে? কোন্ সুবাদে একজন জোর খাটায় আর একজনের ওপর?

কোন উত্তর পায় না। আশ্চর্য্য দুর্বোধ্য এই মন আর তার ক্রিয়া। কাছে থাকতে ভাল লাগে, তাই কাছে থাকে। অত তলিয়ে আর খুঁটিয়ে দেখে কি লাভ? যেটুকু এমনি পেলাম তাই অনেক-পাওয়া হয়ে থাক।

তবু এভাবে চলতে যেন ভাল লাগে না। বাঁচবার জন্যে চাই কঠিন বাস্তবতা, নমিতা তা জানে। এই কল্পনাবিলাসে দিন কাটান—এতে তার ক্লান্তি আসে। জীবন নানা বস্তু থেকে রস আহরণ করে, সেই পরিপূর্ণ জীবনকে পাবার জন্যে নমিতার মন হাহাকার ক'রে উঠেছে। তার মধ্যে ঘুমিয়ে-থাকা নারী আজ জেগে উঠেছে—এত অল্পে তার তৃপ্তি হয় না।

পরিণতি ভাবতে গিয়ে মন্দটাই আগে মনে পড়ে। ভাবে, একদিন যদি হুড়মুড় ক'রে এই তাসের ঘর ভেঙে পড়ে? চোখের সব নেশা যদি কেটে যায়—তবে? পুরুষের জীবন এক রকমের, তারা সব অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু মেয়েদের যেন তারপর আর কিছু নেই, খালি অন্ধকার। মেয়েদের এ ইতিবৃত্ত বড় দুঃখের, অন্ততঃ একটি মেয়ের ব্যাপার ত নমিতা নিজের চোখে দেখেছে। আরতি মৈত্র—এসব কথা যখনই নমিতা ভাবতে যায় তখন আরতি মৈত্রের মুখখানা তার স্মৃতিতে ঘুরপাক খায়। বৃষ্টিতে ভেজা ফুলের মত করুণ সে মুখ।

আরতি মৈত্রের গল্প পুরণো নয়, এই সেদিনের ঘটনা, চোখ বুজলেই আগাগোড়া সব ঘটনা ছবির মত স'রে স'রে যায়। নমিতা অবাক্ হয়ে ভাবে, একটি মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়া কত সহজ। এই বিরাট্ শহরের আনাচে-কানাচে এ রকম কত প্রাণ যে প্রতিদিন গুমরে উঠছে, তা কে জানছে।

আশ্চর্য! নমিতা ভাবে, আরতির ব্যাপারটা নিয়ে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য জাগল না, অন্যায়কে শাস্তি দিতে কেউ উঠে দাঁড়াল না। আর তড়িৎ যে এমন একটা কাজ করবে তাই বা কে ভেবেছিল! আরতির চেহারাটি ছিল ভারী মিষ্টি। তড়িৎও ছিল খুব স্মার্ট। একটা পেণ্ট কোম্পানীর সেলসম্যান ছিল সে। লিফ্টে ওঠানামার মধ্যে ওদের আলাপ হয়। তড়িৎ সখের থিয়েটারে অভিনয় করত। মাঝে মাঝে তাদের থিয়েটারের পাশ দিত সে। আরতিও থিয়েটার দেখতে যেতে ভুলত না। অভিনয়ের শেষে তড়িৎ ছুটে আসত আরতির কাছে, আগ্রহভরা গলায় জিজ্ঞেস করত, কেমন লাগল আমার পার্ট? মোটামুটি রকমের অভিনয় করত তড়িৎ কিন্তু প্রতিবার প্রশ্নের উত্তরে আরতি ঘাড় হেলিয়ে লাজুক লাজুক মুখে বলত, খুব ভাল। শুনে তড়িৎ কৃতার্থ হয়ে যেত। আরতি আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকাত। তড়িতের মুখে অমন তৃপ্তির ছবি দেখে তার বুক আনন্দে ভ'রে উঠত। এইভাবে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হ'ল তারা, তার পর একদিন ওদের খেয়াল হ'ল যে এক অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছে তারা, দুজনে দুজনকে জেনে ফেলেছে সম্পূর্ণরূপে।

কাউকে কিছু না জানিয়ে ওরা বিয়ে করাই ঠিক করল। ভেবেছিল একেবারে রঙীন চিঠি দিয়েই সকলকে জানাবে, কিন্তু কেমন ক'রে তার আগেই ব্যাপারটা অফিসে জানাজানি হয়ে গেল। কলরবে মুখর হয়ে উঠল তিনতলা, চারতলা। অনেকদিন এই রকম একটা ঘটনা ঘটে নি। হলের মধ্যেই দু'চারটে মেয়ে উলু দিয়ে ফেলল, টাইপ-রাইটারের আড়ালে মুখ লুকাল আরতি। ওরা ছাড়ল না, নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল তাকে। সে চাকরি ছেড়ে দেবে কি না, বিয়েতে তড়িতের বাবার মত আছে কি নেই, এই রকম হাজারো প্রশ্ন। তড়িতের অবস্থাটা অতটা সঙ্গীন হ'ল না। তার বন্ধু হরজীন্দর, গোপাল মেহতা তাকে অভিনন্দন জানাল। এরপর সবাই সেই মধুর সমাপ্তির

দিকে তাকিয়ে ছিল কিন্তু এমন সময় এক বিপর্যয় ঘটল। আরতি হঠাৎ অফিসে আসা বন্ধ করল আর সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের কাণাঘুষো ছড়িয়ে পড়ল, হাওয়ায়। নমিতা এসব শুনে প্রতিবাদ করেছিল 'থামো তোমরা'। সে ব'লে উঠেছিল, আরতি মোটেই সে রকম মেয়ে নয়। দেখ, এই মাসেই ও জয়েন করবে একেবারে মাথায় সিঁদুর নিয়ে।

জয়েন অবশ্য করল আরতি কিন্তু সিঁদুর নিয়ে নয়, মাথায় কলঙ্কের বোঝা নিয়ে। কালি শুধু তার দেহে লাগে নি, স্পর্শ করেছে তার আত্মাকেও। ক'দিন না আসায় কাজ জমে উঠেছে। সব শেষ ক'রে ফেলা চাই।

দুঃখকে অনুভব করবার অবসর কই? সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ঘর থেকে ঘন ঘন তাগিদ আসছে। ওর সহকর্মীরা নির্ব্বাক্ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তড়িতের স্মৃতি এখন একটা দুঃস্বপ্নের মত, সব ছাপিয়ে আরতির কানে আসছে তার দাদা আর বৌদির কথাগুলো। তাতে যেমন ধার, তেমনি জ্বালা। তড়িৎ যে এত বুদ্ধিমান্ তা কে জানত। কি আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতায় নিজের বদলি করিয়ে নিল কাণপুরে।

এই হ'ল আরতি মৈত্রের কাহিনী। এখন সবাই তাকে করুণা করে। তার বেদনায় ভরা মুখখানি এখনও নমিতার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। এতবড় অন্যায়কে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। তড়িতের মত সুন্দর, শিক্ষিত ছেলের মন এত ছোট? সে ভেবে অবাক্ হয়। এতদিন ধ'রে সে তা হ'লে অভিনয় ক'রে এসেছিল আরতির সঙ্গে? অর্থাৎ, আরতি তাকে চিনতে পারে নি, তড়িতের ভদ্রচেহারার মধ্যে যে লোভী শয়তান লুকিয়েছিল তাকে সে দেখতে পায় নি কোনদিন। সেই কি দেখতে পেয়েছে? নমিতা ভাবে। চেনাপ্পার অন্তর-বাহির সবটুকুই কি তার জানা? ভালবাসা দৃষ্টিকেই শুধু অন্ধ করে না, বুদ্ধিকেও দেয় ভোঁতা ক'রে। প্রথম যেদিন চেনাপ্পা তার হাত ধরেছিল সেদিনের সেই অনুভূতির কথা তার আজো মনে আছে। সর্ব্বাঙ্গ শিরশির ক'রে উঠেছিল তার। কি রকম শিথিল হয়ে উঠেছিল সমস্ত দেহের ভার। তখন আরতির কথা একবারও মনে পড়ে নি, মনে হয়েছিল, এই যে পুরুষ, এই তার সব। এই দুর্দ্দম বিজয়ীর হাতে তার সব কিছু সমর্পণ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে।'

কিন্তু তার পর বাতাস স্থির হ'ল। রক্তের কণায় কণায় যে আগুন জ্ব'লে উঠেছিল তা নিভে এল। শান্ত মনে তখন ভাবনা এল অজস্র। হাজারো প্রশ্ন এসে বিক্ষত করল মনকে। কে এই লোকটা? ভাল না মন্দ? চটকটাই কি এর সব?

কিন্তু পরের দিন যখন দেখা হয় তখন এই দ্বিধা আর থাকে না। নিঃসঙ্কোচে নিজেকে ছেড়ে দেয় ওর কাছে। তর্জ্জনী তুলে কেউ ওকে সাবধান করতে আসে না। নমিতা হাসে, কথা বলে, অজস্র আনন্দে।

ভারী সন্দিগ্ধ মন তার; রাওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তড়িতের চেহারার সঙ্গে কোথাও মিল আছে কি না তার। চিবুকের কাছটা একেবারে এক রকম নয় কি? কে জানে, তড়িৎও হয়ত এমনি ভাবেই হাসত।

পুরুষজাতকে চেনে নমিতা। সে জানে তারা ভালমানুষীর মুখোসে মুখ ঢেকে আসে, তারপর দু'দিনের মজাটুকু লুটে নিয়ে গা ঢাকা দেয়। তাদের সবার ভেতর একটি ক'রে তড়িৎ মজুমদার লুকিয়ে আছে।

তবু কেন চেনাপ্পা ওকে টানে? এত পূর্ব্বধারণা আর সাংসারিক জ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে তার হৃদয়ে এমন দু'কূলভরা জোয়ার আসে কোথা থেকে? একি তার মনের ভুল, না ঘুম-ভাঙ্গা প্রেম? নমিতা উত্তর পায় না। কি একটা অনাস্বাদিত মাদকতা আছে লোকটার মধ্যে, পাশে এসে দাঁড়ালেই নমিতা যেন অন্য লোক হয়ে যায়। হাসিমুখে তার সহযাত্রী হয়, স্কুটার ছোটে আর পেছনে ওড়ে তার ময়ূরপঙ্খী আঁচল।

নমিতা বোকা নয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন ক'রে সে জেনেছে যে, ভিন্ন প্রদেশের মেয়ে বিয়ে করতে রাওয়ের আপত্তি নেই আর এ ব্যাপারে বাড়ী থেকে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এত জেনেও, মনের দিক্ থেকে এত নিশ্চিত হয়েও তার সংশয় ঘোচে নি, সে আকাশ-পাতাল ভেবেছে দিনরাত আর ক্যালেণ্ডারের পাতার রং বদ্‌লে বদ্‌লে গেছে।

বাইরে কেউ তার মনের খবর জানে না। সেখানে যে কি ভাঙ্গাগড়া চলছে তা সে-ই জানে। বন্ধুরা নানা মন্তব্য করে, তা' শুনে কখনও সে হাসে, কখনও সে চুপ ক'রে থাকে। একদিন স্বপ্না এসে ওর হাত ধ'রে ঝাঁকিয়ে দেয়, বলে, 'কনগ্রাচুলেসেন্স', খুব ভাল। একটা নতুনত্বের স্বাদ পাবি।

নমিতা হাসল। স্বপ্না ওই রকম। মেয়েমহলে ওর নাম ঝটিকা। কথাটা ব'লেই আবার তখুনি বেরিয়ে যায় সে।

তা' যেন হ'ল, স্বপ্নার কথায় সে যেন হেসে চুপ করল। কিন্তু ভেতরে যে একজন নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে তাকে কি ক'রে থামাবে নমিতা? কোন্ মন্ত্রে

'কনগ্রাচুলেসেন্স', খুব ভাল। একটা নতুনত্বের স্বাদ পাবি।

বশ করবে তাকে? নমিতা ছটফট্ করে—রাওয়ের মুখের পাশে তড়িতের মুখ ভেসে ওঠে আপনা থেকে।

এই রকম দোটানায় যখন মনটা দুলছে তখন সে একটা ভারি সাহসের কাজ ক'রে ফেলল; পরে সে নিজেই অবাক্ হয়ে গেল তার নিজের কীর্ত্তিতে। রাওকে না ব'লে একদিন দুপুরে তাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ঠিকানা সে ফাইল থেকে উদ্ধার করেছিল। রাওয়ের মাকে দেখবার ইচ্ছে ছিল তার। বাড়ী খুঁজে পেতে দেরি হ'ল না—দোতলার ছোট ফ্ল্যাট, বেল টিপতেই রাওয়ের মা এসে দরজা খুলে দিলেন। বৃদ্ধার মাথার সব চুলগুলি সাদা, পরণে বিচিত্র রংএর কাপড়। নমিতা ভান করল যেন সে রাওকে খুঁজতে এসেছে। রাওয়ের মা জানালেন যে, সে নেই, তারপরেই নমিতাকে ভেতরে এসে বসতে বললেন। নমিতার নাম তিনি রাওয়ের কাছে শুনেছেন। একটু ইতস্ততঃ ক'রে নমিতা ভেতরে ঢুকল। তাকে শোবার ঘরের খাটের ওপর বসালেন রাওয়ের মা, তারপর নিজের হাতে কফি করতে বসলেন। নমিতা বাধা দিতে গেল, বৃদ্ধা মিষ্টি ক'রে হাসলেন। তাঁর বাড়ীতে যে আসুক্ তিনি তাকে এক পেয়ালা কফি খাওয়াবেনই। নমিতা এদিক্-ওদিক্ চোখ বোলাতে লাগল: কি পরিচ্ছন্ন সংসার, সর্ব্বত্র সুন্দর রুচির পরিচয় রয়েছে। টেবিলের ওপর একটি নটরাজের মূর্ত্তি, দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি ঝুলছে। রাও-এর মত তার মাও বেশ বাংলা শিখেছেন, নমিতাকে বললেন, আমাদের বাড়ীতে বাংলা বইও আছে—দেখবে? এই ব'লে আলমারী খুলে দিলেন। নমিতা অবাক্ হয়ে দেখল, অন্যান্য বইয়ের মধ্যে সেখানে গল্পগুচ্ছ আর শরৎ-বাবুর কয়েকখানা বই রয়েছে। তারই একটা নিয়ে সে পাতা উল্টাতে লাগল, ইতিমধ্যে কফি হয়ে গিয়েছিল, কফি খেতে খেতে রাওয়ের মা'র সঙ্গে গল্প এগিয়ে চলল।

একটু পরে এল রাওয়ের ভাই। সে সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ে। লম্বায় প্রায় রাওয়েরই মত, একটু রোগা।

ভারী লাজুক, একবার দেখা ক'রেই কোথায় পালিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামে। পথে-ঘাটে আলো জ্ব'লে ওঠে। আকাশে ফোটে তারা। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নমিতা, কি জন্যে যে সে গিয়েছিল আর কি সে পেল কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

পরের দিন রাওয়ের সঙ্গে ক্যান্টিনে দেখা হয়। দূর থেকেই মিটি মিটি হাসতে থাকে ও। চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসে দু'জনে মুখোমুখি। নমিতা যেন ধরা প'ড়ে গেছে, সে কোন কথা বলতে পারে না। রাও হাসে, বলে, কাল মা খুব তোমার কথা বলছিলেন। নমিতা পেয়ালায় চামচে নাড়ে, তার যেন কিছু বক্তব্য নেই। টুং টুং আওয়াজ হয়, রাও বলে, নমি একটা কথা, গলা কেঁপে ওঠে তার, অনেক দিন ত হ'ল…। আর কিছু বলতে পারে না—এত স্মার্ট আর দুর্দান্ত ছেলের মুখেও এমন কথা হারিয়ে যায় কি ক'রে, ভেবে অবাক্ হয় নমিতা।

এসব ঘটনাও পুরণো। তারপর দিন কেটে চলেছে ত। নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, নতুনতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জীবনের দিগন্তে, ছক-বাঁধা নয় ব'লেই জীবন এত বিচিত্র। অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনার আবির্ভাবে জীবনের গতিপথ যায় বদ্‌লে। নতুন প্রয়োজনে আসে নতুন চিন্তাধারা।

ওদের চলমানতায় এমনি একটা দমকা হাওয়া এল। হঠাৎ একটা উঁচু পোস্টে প্রমোশন পেল রাও। মাইনেটা গিয়ে দাঁড়াল হাজারে, এ ছাড়া সে বম্বেতে কোয়ার্টার পাবে আর কোম্পানীর গাড়ি।

রাওয়ের পক্ষে এ ছিল আশার অতীত। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ওর খিটিমিটি লেগে থাকতই, কিন্তু শোনা গেল, বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স ওর কাজের বিচারে ওকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছে।

পাঁচতলা বাড়ীটায় খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মত। ঘরগুলো গম্ গম্ করতে লাগল এই আলোচনায়। শুনে নমিতা পাথরের মত হয়ে গেল। তার কথা হারিয়ে গেল, অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইল সাদা দেয়ালের দিকে। স্বপ্না তাকে একটা ঝাঁকুনি দিল, কি রে? তোর ত লাফ দেওয়ার কথা! কথায় বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন…। নমিতা যেন কিছুই শুনতে পেল না, ওর কানের কাছে ঝিম ঝিম করতে লাগল দুর্ব্বোধ্য, অস্পষ্ট আওয়াজ সব। তার দেহে যেন প্রাণ নেই, মনে হচ্ছে সে যেন কতদূরে স'রে যাচ্ছে আর রাওকে দেখাই যাচ্ছে না। সব কিছু ধোঁয়াটে আর ধূসর, আর তার মধ্যে রাও হাসছে—তাকে ঘিরে হাসছে আরও কত ছেলে আর মেয়ে।

সব স্বপ্ন অবাস্তব, সব কিছু ভ্রম। কান্নায় ভ'রে উঠল নমিতার বুক। কাজের মধ্যে সারাদিন ডুবে রইল সে, ভাবল, শক্ত ক'রে বাঁধতে হবে নিজেকে। কোথা থেকে এসেছিল, আজ সব সুখ ডানা মেলে উড়ে চ'লে গেল তার মনকে নিঃসঙ্গ রেখে। রাওকে একবারও দেখতে পেল না সারাদিনের মধ্যে। দিন শেষ হ'ল, বাইরে সন্ধ্যা ছড়াল। শেষ বেয়ারাটাও হাই তুলতে তুলতে যখন বাড়ীর পথ ধরল তখন নমিতা উঠল। ব্যাগে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল। সমস্ত অফিস-বাড়ীটা খালি, তার জুতোর শব্দ উঠছে, ঠুক্ ঠুক্ ক'রে। কে বলবে একটু আগে এই ঘরগুলোয় এত কথা ছিল, এত হাসি ছিল। এখন খাঁ খাঁ ঘরগুলো যেন কার হৃদয়ের মত শূন্য। সিঁড়ির শেষ বাঁকটায় ঘুরে নমিতা রাওকে দেখতে পেল। একেবারে সিঁড়ির গোড়ায় লিফ্‌ট্-ম্যানের টুলের ওপর বসে আছে সে। সিগারেট টানছে এক-মনে। জুতোর আওয়াজ শুনে সিঁড়ির দিকে তাকাল রাও। তারপর উঠে দাঁড়াল। সিঁড়ির ওপর থেকে নমিতা ওর দিকে তাকাল। যেন নতুন ক'রে দেখল আজ। কি লম্বা ও আর কি বলিষ্ঠ প্রত্যয় সমস্ত চেহারায়—যেন কত বড় নির্ভয়! একটু হাসল রাও। সিঁড়ির ওপরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নমিতা। দুই চোখ মেলে দেখতে লাগল এই সিঁড়ি আর বাইরে যাবার দরজা। এই সিঁড়ি চ'লে গেছে ওপরে আর রাস্তা ছুটেছে বাইরে। নমিতার জীবন যেন এই দুই পথের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে—একদিকে তার এতদিনকার মায়া তাকে ডাকছে, সহস্র অবিশ্বাস চোখ পাকিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, অন্যদিকে রাও দাঁড়িয়ে আছে শহরের কুটিল চোখ থেকে তাকে আড়াল দিয়ে নিয়ে যাবে ব'লে। নমিতা হাসল—তার সেই চোখে আলো-জ্বলা হাসি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, রাওয়ের পাশে এসে দাঁড়াল, তার দিকে মুখ তুলে বলল, চল।

আজ স্কুটার আনে নি—পাশাপাশি ভীড়ের মধ্যে ওরা হাঁটতে থাকে।

—•—

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করিয়াছেন যে, নানা অভাব সত্ত্বেও "পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ নাই, দুর্ভিক্ষ হ'তে দেব না এবং অনাহারে এ রাজ্যে একটি লোককেও মরতে দেব না—এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" বলা বাহুল্য—মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি "এইচ-এম-ভি" কংগ্রেসী এম. এল. এ-গণ কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। হইবারই কথা। রাজ্য সাহায্য ও ত্রাণ-মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতিও রাজ্যমন্ত্রী-প্রধানের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলেন যে, এ রাজ্যে যত বিষম খাদ্য সঙ্কটই হউক বা বিদ্যমান থাক, আমরা পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইতে 'দিব না, দিব না, দিব না,' এই তিন-সত্য করেন! অতএব আমাদের আর কাহারও পক্ষে খাদ্য বিষয়ে কোন চিন্তার কোন সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণ কিছুতেই থাকিতে পারে না, থাকা উচিতও নহে! মন্ত্রীদ্বয়ের প্রতিশ্রুতি এবং কথার যদি কোন মূল্য থাকে এবং তাঁহারা যদি দয়া করিয়া সত্য রক্ষা এবং প্রতিশ্রুতি পালন করেন, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করিব যে, এ-রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে না এবং সেই কারণে কোন লোক বিনা অন্নে প্রাণত্যাগ "করিবে না, করিবে না, করিবে না!"

কিন্তু বাস্তবে এ-রাজ্যে কি দেখা যাইতেছে? রাজ্য সরকারের খাদ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েকদিন পূর্ব্বে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৬২ সালের মার্চ্চ মাসের তুলনায় ১৯৬৩ সালের মার্চ্চ মাসে এ-রাজ্যে কিলোগ্রাম-প্রতি চাউলের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে বার নয়া পয়সা—অর্থাৎ মণ-প্রতি প্রায় সাড়ে চার টাকা বাড়িয়াছে। কিন্তু এ হিসাবে কোথাও একটা কিছু বিভ্রান্তি আছে বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ, কাগজে-কলমে চাউলের বর্দ্ধিত মূল্য যাহা দেখান হইয়াছে, বাজারে চাউলের দোকানে লোককে ইহা অপেক্ষা বেশী মূল্য দিয়া চাউল ক্রয় করিতে হইতেছে। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর চাউলের মূল্য সরকারী হিসাব অপেক্ষা অধিকতরই দেখা যাইতেছে।

সরকারী হিসাব-মত চলতি বৎসরে সর্ব্বপ্রকার ধান (আউস, বোরো এবং আমন) মিলাইয়া মাত্র ৪৩ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে—অথচ এ-রাজ্যে বৎসরে কম পক্ষে ৫১ লক্ষ টন চাউলের একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ হিসাব-মত চাউলের ঘাটতি দাঁড়ায় ৮ লক্ষ টন। পূর্ব্বে উড়িষ্যা এ-রাজ্যকে বৎসরে ৩ লক্ষ টন চাউল যোগান দিত, এবং চাউলের বাকি ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গে গম দিয়া পূরণ করা হইত। এ বৎসর উড়িষ্যার ধানের ফলন ভাল না হওয়াতে উক্ত রাজ্যে চাহিদার তুলনায় চাউল উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছে মাত্র আড়াই লক্ষ টন। উড়িষ্যাতে ইতিমধ্যেই চাউলের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এখনও বৃদ্ধিমুখেই রহিয়াছে। এমত অবস্থায় উড়িষ্যা পশ্চিম-বঙ্গকে চাউল দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ, ঐ রাজ্য হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী করিলে উড়িষ্যাতে চাউলের দর বিষম বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। উড়িষ্যা পশ্চিম-বঙ্গকে জানাইয়াও দিয়াছে যে, তাহার পক্ষে বাহিরে চাউল পাঠান সম্ভব হইবে না।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপা-অনুমতি লাভ করিয়া উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাব হইতে কিছু চাউল আমদানী করিতেছেন, কিন্তু এই আমদানীর পরিমাণ অতি সামান্য এবং প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নহে বলা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, অন্যান্য রাজ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গ যে চাউল ক্রয় করিতেছে, তাহার মূল্য ঐ সকল রাজ্যের বাজার চলতি মূল্য হইতে বেশী দিতে হইতেছে। ইহার উপর ঐ চাউলের বহন খরচাও বেশী কিছু পড়িতেছে। মোটের উপর পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশ হইতে সংগৃহীত চাউল পশ্চিমবঙ্গের চাউলের বাজারে বিশেষ কিছু সুরাহা করিতে সক্ষম হয় নাই।

আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে:

মুর্শিদাবাদের চাউলের কলগুলি বীরভূম হইতে ধান আনিয়া চাউল উৎপাদন করিয়া সেই চাউল এমন সব পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করিতেছে যাহারা নিয়মিতভাবে গোপনে পদ্মানদীর অপর পারে

পূর্ব্ব পাকিস্তানে চাউলের চোরা চালান দিয়া থাকে। সংবাদদাতা বলেন যে, এই অবস্থার ফলে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও অন্য অনেক অঞ্চলে চাউলের মূল্য চড়িয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করিবারও কারণ আছে যে, এই রাজ্যের চাউল-ব্যবসায়ী এবং ধান-চাউল উৎপাদনকারীর স্তরে অনেক লোক ভবিষ্যতে অধিক লাভের আশায় বাজারে যথোপযুক্ত পরিমাণে ধান-চাউল ছাড়িতেছে না।

অথচ পুলিসের এত প্রচণ্ড প্রশংসা এবং ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজ্য-পুলিস চাউল এবং অন্যান্য পণ্যের পাকিস্তানে চোরা-চালান বন্ধ করিতে পারিতেছে না—কেন, বলা কঠিন নহে। চাউলের এই চোরা চালানের পরিমাণ কি, তাহা বলা শক্ত, কিন্তু ইহা অবশ্যই বলা যায় যে, পাকিস্তানে চাউলের এই চোরা চালান রোধ করিতে পারিলে, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের চাহিদার বেশ একটা মোটা অংশ পূরণ হইত।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং তাহা সত্ত্বেও চাউলের যে ঘাটতি থাকিবে তাহা মিটান হইবে গম দিয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাস কতখানি কার্য্যকরী হইবে জানি না। তবে অন্যান্য রাজ্যের প্রয়োজন এবং চাহিদা মিটাইয়া তাহার পর আসিতে পারে পশ্চিমবঙ্গের পালা—বরাবর ইহাই দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা চাউল এবং গম সম্পর্কে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি যদি রাখেন ভাল, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির উপর একান্ত-প্রত্যয় এবং পূর্ণভরসা না করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন ভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধান চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। প্রয়োজন বোধে:

রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেও রাজ্যের কম লোকই উহার সুযোগ-সুবিধা পাইবেন। ফলে রেশন এলাকার বহির্ভূত অঞ্চলে রাজ্যের অধিবাসীদের অধিক মূল্যে চাউল কিনিয়া খাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে রেশনের আওতায় দেশে যে কালোবাজার গড়িয়া উঠে এবং অন্যবিধ যে সব দুর্নীতি প্রসারলাভ করে তাহাও বিবেচ্য। তাহা হইলে কর্ত্তব্য কি? আমরা মনে করি, বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গবাসী যদি চাউলের সর্ব্বপ্রকার অপচয় বন্ধ করেন এবং যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে গম দিয়া চাউলের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হইবে। বর্ত্তমানে যাহাতে কেহ চাউলের চোরাকারবার, মজুদদারী ও মুনাফাবৃত্তি-প্রসূত ব্যবসায়ে লিপ্ত না হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসীর কর্ত্তব্য। এই সম্পর্কে সরকারের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন যেন এই রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে—অথবা পূর্ব্ব পাকিস্তানে চাউলের চোরাচালান না হয় এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে যাহাতে কেহ ধান-চাউল মজুদ করিয়া বাজারে একটা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি না করিতে পারে। এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যদি দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করেন তাহা হইলে দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা পাইবেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

কিন্তু 'আমরা' মনে করিলেও রাজ্য সরকার জনগণের সহযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করিবেন কি না জানি না। জনগণ বলিতে আমরা—বিশেষ এক দলীয় ব্যক্তিদের বাদ দিতেছি—সেই দলের কথা বলিতেছি যাহারা দুর্ভিক্ষের সময় 'গণ-নাট্য' ক'রে দেশের ঐতিহ্য মানে না, ইতিহাসকে বিকৃত করে, রুশ-চীনের মুখ চাহিয়া থাকে।

এই বিশেষ দলটি আবার সক্রিয় হইতেছে—মানুষের সহজ এবং স্বাভাবিক দুঃখ-কষ্টের সুযোগ লইয়া নূতন করিয়া আসর জমাইতে 'গোপন' প্রচেষ্টা প্রকাশ্যেই সুরু করিয়াছে।

খাদ্য-সমস্যা আসলে যতটা ভীষণ হইবে, বা হইতে পারে, এই চীনা-প্রেমিকের দল, তাহাকে শতগুণ স্ফীত করিয়া সাধারণ মানুষকে ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত করিয়া দেশে আবার একটা অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস পাইবেই। এই একটি মাত্র বিপদ্-সম্ভাবনার প্রতিরোধকল্পে রাজ্য সরকারের সবিশেষ অবহিত থাকার প্রয়োজন আজ সর্ব্বাধিক।

'অনাহারে কাহাকেও মরিতে দিব না'—কেবল এই প্রতিশ্রুতি মাত্র দিলেই চলিবে না, সত্যই যাহাতে কেহ অনাহারে না মরে সেই বিষয়েও যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এ-বিষয় পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

"অনাহারে মরা নিষেধ এবং বে-আইনী"—এরূপ কোন আপৎকালীন অর্ডিনান্স জারি করিয়া সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব নহে।

মোরারজীর সর্ব্বমারী 'কর'-প্রহার

পরম গান্ধীভক্ত, সর্ব্ববিলাস ব্যসনত্যাগী, প্রায়-নিরাহারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যে প্রকার শ্বাসরুদ্ধকারী করভার এবার ভারতের সাধারণ জনগণের পৃষ্ঠে চাপাইয়াছেন, ইতিহাসে তাহা চির-প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। কোন দেশে, বিশেষ করিয়া আমাদের মত বিষম দরিদ্রদেশে এ প্রকার কর-ভারের কথা কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই! বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া, মানুষের আর্থিক শক্তি-সামর্থ্যের কোন প্রকার খোঁজ না লইয়া কোন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ যে দরিদ্রজনকে করের চাপে এমন করিয়া তিল তিল করিয়া নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইবার চিন্তা করিতে পারে, তাহা

আমাদের ইতিপূর্ব্বে জানা ছিল না! এবারের মোরারজী-ধার্য্য করকে প্রকৃত পক্ষে নীল আকাশ হইতে হঠাৎ বজ্রপাতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতিকে যদি মহামারী বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে মোরারজীকে 'সর্ব্বমারী' বলিতে দোষ কি?

সাধু, পরমবিজ্ঞ গান্ধীভক্ত মোরারজী কেবল কর-ভার চাপাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, গরীবজনকে করের চাপে মারিবার প্রয়োজন কেন হইল, সেই বিষয়ে নিত্য নবনব নানা ব্যাখ্যা—কাটা ঘা'য়ে নুনের ছিটার মত—দিল্লীর মসনদে বসিয়া বিতরণ করিতেছেন! দেশের জনগণের উপর মোরারজীর এই দ্বি-বিধ অত্যাচার—মানুষকে একেবারে স্তম্ভিত, হতবাক্‌ করিয়া দিয়াছে। মোরারজীর প্রথম কথা—দেশের উপর চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে এবং দেশকে চীনা-বিপদ্‌-মুক্ত করিতে অর্থের প্রয়োজন আজ সর্ব্বাধিক, কাজেই দেশবাসীকে সর্ব্বসুখ আরাম বিলাসব্যসন পরিত্যাগ করিয়া যেমন করিয়াই হউক প্রয়োজনীয় অর্থ দিতেই হইবে। দেশের উপর চীনা-আক্রমণের প্রথম দিন হইতেই দেশবাসী মোরারজী-নেহরু প্রভৃতি নেতাদের আবেদনে সাড়া দিয়া সকলেই সাধ্যাতীত অর্থ এবং স্বর্ণদান করিতে কোন কার্পণ্য করে নাই। অনেক দরিদ্র এবং মধ্যবর্ত্তী অবস্থার লোক অসম্ভব-অতিরিক্ত দান করিয়াছে, এখনও করিতেছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি আপৎকালে কর্ত্তব্য পালন করিতে কেহই কোন প্রকার দ্বিধা করে নাই এবং করিবেও না। কিন্তু দেশবাসী কখনও মনে করে নাই যে ত্যাগের প্রবলতম চাপ কেবল তাহাদেরই উপর এমন জোর করিয়া নির্ম্মম ভাবে আরও চাপান হইবে! নূতন ট্যাক্সের বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হইবে। আমরা নূতন ট্যাক্সের কল্যাণে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হইয়াছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে আরো কতখানি সঙ্গীন হইবে, সেই বিষয়েই দু'চার কথা বলিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ এবং হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গবাসী নিপীড়িত বাঙ্গালীদের কথাই আমাদের বিশেষ আলোচনার বস্তু। কংগ্রেসী সরকারী এবং বেসরকারী নেতারা জনগণকে কৃচ্ছ্রসাধনে প্রত্যহ প্ররোচিত করিতে লজ্জাবোধ করেন না, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পরম কৃচ্ছ্রসাধনের মাত্র এক বিষয়ে যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে সাধারণ দেশবাসী পরম উৎফুল্ল হইবে। কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধিতে হাজার হাজার শহর এবং লক্ষ লক্ষ গ্রামে 'ব্ল্যাক-আউটের' মহড়া আরম্ভ হইয়া গেলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী মহোদয়গণ কি ভাবে ইলেক্‌ট্রিক এবং জল খরচার ব্যয় কন্‌ট্রোল করিয়াছেন দেখুন:

গত ছয় মাসে মন্ত্রীদের বাসভবনে বিদ্যুৎ ও জলের মাসিক গড়পড়তা খরচের নিম্নলিখিত হিসাব শ্রীখান্না লোকসভায় পেশ করিয়াছেন গত ১৬ই মার্চ:—

মন্ত্রীদের নাম	বিদ্যুতের খরচ	জলের খরচ
১। শ্রীজগজীবন রাম	৪৭৪-৩৬	৫০-৭৫
২। শ্রী গুলজারীলাল নন্দা	৩১২-৪১	৫৩-০০
৩। শ্রীকৃষ্ণমাচারী	২২১-৪৯	৪৫-৭৫
৪। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী	৫৮০-৯৩	১২০-৬৯
৫। সর্দ্দার শরণ সিং	২৫১-৩৪	৪৮-৮৭
৬। শ্রীকে সি রেড্ডী	৪৭০-৮৬	৬০-৯২
৭। শ্রীএস কে পাতিল	৫০৩-৫৮	৮৫-২৫
৮। হাফিজ মহঃ ইব্রাহিম	৪৬৭-৭৯	৮২-০০
৯। শ্রীঅশোককুমার সেন	৫৫৮-৪৭	৬২-০০
১০। শ্রীওয়াই বি চ্যবন	বিল পাওয়া যায় নাই	৪২-৩৮
১১। শ্রী কে ডি মালব্য	২০৪-৫০	৫৩-১৭
১২। শ্রীগোপাল রেড্ডী	২২৩-৩৫	১০৮-৮২
১৩। শ্রী সি সুব্রহ্মানিয়ম	৩৫৪-০০	বিল পাওয়া যায় নাই
১৪। শ্রীহুমায়ুন কবীর	১৮৮-৪৭	৪৫-৩৫
১৫। ডাঃ কে এল শ্রীমালী	২৫০-৪১	৩৩-৪২
১৬। শ্রীসত্যনারায়ণ সিং	৩০০-২২	১১৮-৯০
প্রতিমন্ত্রী		
১। শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না	১৭০-৬৯	৩১-২২
২। শ্রীমনুভাই শাহ	৬৫-৯৮	৪১-৯০
৩। শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো	২৭৫-২৩	১৩২-১৭
৪। শ্রীরাজ বাহাদুর	১৯৯-৩৮	৬৬-৭৫
৫। শ্রীএস কে দে	১৬৬-৭০	১৯-০৮
৬। ডাঃ সুশীলা নায়ার	৯১-৭৮	৮৭-৬৭
৭। শ্রীজয়সুখলাল হাতী	১৬৪-০৮	৮৩-৪২
৮। শ্রীলক্ষ্মী মেনন	৬৫-৬৭	৩৪-৪৬
৯। শ্রীরঘু রামায়া	৩২২-৪৫	৭৮-৪১
১০। শ্রীআলগেসান	২১২-২৩	৪৩-৫০
১১। ডাঃ রামসুভগ সিং	২৩১-৭৬	৪৭-৬০
১২। শ্রীআর এম হাজারনবিশ	১৮২-৬০	২৯-৪২
উপমন্ত্রী		
১। শ্রীবলিরাম ভগত	১৫৭-১২	২৩-৪১
২। ডাঃ মনমোহন দাস	১০৬-৭৮	২৯-৭৯
৩। শ্রীশাহনওয়াজ খান	১০২-৯৭	৪১-৩৩
৪। শ্রী এ এম টমাস	১৯৭-৬১	৪০-৪৬

৫ ।	শ্রী এস ভি রামস্বামী	১০৪-০৬	৮৭-০০
৬ ।	শ্রীআহমদ মহীউদ্দিন	৩১৬-৯৭	১৬-৬২
৭ ।	শ্রীতারকেশ্বরী সিংহ	১৪১-৩১	৩১-১৭
৮ ।	শ্রী পি. এস নস্কর	২০১-৭৮	৪৩-১৩
৯ ।	শ্রী বি এস মূর্তি	২৭৬-৪৮	৭৬-০৮
১০ ।	ডাঃ শ্রীমতী টি এস রামচন্দ্র	১২১-৭৯	৪১-২৫
১১ ।	শ্রী ডি আর চ্যবন	১৩৮-৬১	৬১-৩৭
১২ ।	শ্রীপট্টভি রমণ	১৫৭-৫৫	৩২-৭৫
১৩ ।	শ্রীমতী এস চন্দ্রশেখর	১৪৭-৫০	৩৬-৪৬
১৪ ।	শ্রীশ্যাম নাথ	৫৫-২১	১৮-৭৮
১৫ ।	শ্রীজগন্নাথ রাও	১০৭-৯৪	৮৮-৭৮
১৬ ।	ডাঃ ডি এস রাজু	১৪০-৪১	৪২-৪৪
১৭ ।	শ্রীদীনেশ সিং	১৮০-০০	৮৭-১৩
১৮ ।	শ্রীবিভূধেন্দ্র মিশ্র	২১৮-৫৪	৭১-৫০
১৯ ।	শ্রী বি ভগবতী	১২৬-১৫	৪১-৩৩
২০ ।	শ্রীশ্যামধর মিশ্র	১৯০-০০	৮০-৩৫
২১ ।	শ্রী পি সি শেঠী	৬৩-২৬	৩১-৭৫

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার রাষ্ট্র এবং উপ এই উভয় প্রকার মন্ত্রীর মোট সংখ্যা মাত্র ৫২ জন। মন্ত্রীরা মোটা বেতনভোগী (গান্ধীজীর "সর্ব্বাধিক বেতন ৫০০৲ টাকা হইবে" এ উপদেশ তাঁহার চিতাতেই সমাপ্তি লাভ করিয়াছে) এবং ইহার উপর সংসদীয় বিধান ব্যবস্থায় ইঁহারা বিনা-ভাড়ায় মূল্যবান্ আসবাব সজ্জিত বাসভবন পাইয়া থাকেন। ইহাই শেষ নহে। মন্ত্রীদের পদ অনুসারে প্রত্যেকের জন্য ছয় (৬) হইতে ষোল (১৬) জন করিয়া পরিচারকের ব্যবস্থাও আছে—পরিচারকদের (পরিচারক হইলেও সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বহুগুণে ভাগ্যবান ইহারা!) থাকিবার জন্য পাকা কোয়ার্টার্সও আছে। বলা বাহুল্য বিদ্যুৎ এবং জলের ব্যবস্থা ইহাদের জন্য বিনামূল্যেই হইয়া থাকে। মন্ত্রিত্ব লাভের পূর্ব্বে যাঁহাদের গৃহে ১ জন পরিচারক পোষণ করিবার আর্থিক সামর্থও হয়ত ছিল না —তাঁহাদের জন্য আজ ৬ হইতে ১৬ জন পরিচারক ব্যবস্থা এমন বেশী কি?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ দরিদ্র দেশের দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধি। সর্ব্বত্যাগী জনদরদী মন্ত্রীগণ যাহাতে সর্ব্বপ্রকার চিন্তামুক্ত হইয়া দেশের এবং দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন সেই কারণে তাঁহাদের সামান্য আরামের জন্য দরিদ্র ভারতবাসী যে এইটুকু মাত্র ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে, তাহার জন্য আমরা আজ প্রভূত গর্ব্ববোধ করিতেছি!

মোরারজীর নূতন বাজেটের ইঙ্গিত—কৃচ্ছ্রতার দিকে, কারণ প্রতিরক্ষার জন্য অর্থের যথোপযুক্ত যোগান দিতে হইলে, দেশের লোককে সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতেই হইবে—মোরারজীর অমূল্য ভাষণে এই তথ্য বারবার ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু কৃচ্ছ্রতা কেবল কি দরিদ্র এবং নির্ম্মম-করভার-প্রপীড়িত, অর্দ্ধমৃত দেশবাসীদের জন্যই বরাদ্দ করা হইল? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বড় বড় উচ্চ-বেতনভোগী কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসারগণ এখন পর্য্যন্ত নিজেদের জন্য (অনেকে সেই সঙ্গে আত্মীয় কুটুম্বদের জন্যও) দরাজ হস্তে যে প্রকার মোষ্‌লাই ব্যয় করিতেছেন, তাহা দেখিলে সত্যই চমৎকৃত হইতে হইবে! আপৎকালীন অবস্থার চাপটা দেখা যাইতেছে—সাধারণ মানুষেরই মনোপলী, উপর মহলে এই জরুরী অবস্থার চাপ এবং তাপ কাহাকেও স্পর্শ করে নাই, কখনও করিবে কি না গভীর সন্দেহের বিষয়। অপূর্ব্ব চাপ-তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইহাকেই বলে!

গত পনেরো বছর ধরিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আরাম বসবাসের এবং নবাবী জীবন যাপনের খরচ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আজ এমন একটা অঙ্কে ঠেকিয়াছে যাহা সত্য সত্যই অকল্পনীয়! 'ভারত আবিষ্কর্ত্তা' পণ্ডিতপ্রবর নেহরু দেশের লোককে অহরহ বিনামূল্যে (?) নানা হিতকর কথা শুনাইতেছেন, দেশের লোককে সাধু সংযমী আরও কত কি হইবার প্ররোচনা দান করিতেছেন। ভাবিতে অবাক্ লাগে—এই দিব্যজ্যোতি এবং বিষম দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষের চক্ষু নিজেদের ঘরের দিকে ক্ষণকালের জন্যও পড়ে না। নানা বিষয় প্রয়োজনীয় কাজে সদা ব্যস্ত বলিয়া কি নেহরুজী তাঁহার আজ্ঞাধীন 'কেন্দ্রীয় গৃহস্থালীর' প্রতি ক্ষণেকের দৃষ্টি দিতেও অবসর পান না? 'কর'-কমল বনে উন্মত্ত-করী মোরারজীর তাণ্ডব নৃত্যেও নেহরুজীর নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইতেছে না?

আরও আছে। মন্ত্রী মহারাজদের আবাস-বিলাসের জন্য তাঁহাদের কুঠী বাড়ীগুলিতে তেরো (১৩) লক্ষ টাকার আসবাবপত্র এবং বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামও ক্রয় করা হইয়াছে! এ সবই দীন-দরিদ্র অসহায় করদাতাদের রক্তের টাকায়! যে দেশের শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোকই এক বেলা আধপেটা খাইতে পায় না, বছরে যাহাদের একখানা ধুতি শাড়ীও জোটে কি না সন্দেহ, অসুখে-বিসুখে যে দেশের শতকরা ৯০ জন লোকই এক ফোঁটা ঔষধ পায় না, যে দেশের শতকরা ৮৫ জন শিশু, বালক-বালিকা শীর্ণদেহ এবং মলিন মুখে পথে-ঘাটে হা হা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সেই দেশের জনপ্রতিনিধি

মন্ত্রীদের রাজকীয় চালচলন এবং বিলাস-ব্যসনের বিরাট্ আয়োজন কংগ্রেসী ভারতেই সম্ভব।

লজ্জার কোন বালাই থাকিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোরারজী দেশের লোককে কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলিতে পারিতেন না, মানুষের এই চরম দুঃখময় অবস্থার কথা জানিয়া তাহাদের উপর আরও পাহাড়প্রমাণ করভার চাপাইবার কথা তাঁহার মনে আসিত না। দিল্লীর রাজতক্তে বসিয়া দু'চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজেদের একজন আলমগীর বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের চালচলনে এবং বেপরোয়া কথাবার্ত্তায় ইহাই প্রমাণ করে। সভ্যদেশে সরকারের শাসনব্যবস্থা চালু রাখিতে জনগণকে অবশ্যই কর দিতে হয়, কিন্তু, আজ পর্য্যন্ত কোন দেশে এমন ভাবে 'হাঁস মারিয়া ডিম খাইবার' কর-ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। সাধারণ মানুষ বাঁচুক, মরুক, ব্যবসায়ীর ব্যবসায় চলুক না চলুক, সে কথা ভাবিবার দেখিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহাশয়ের নহে। তাঁহাদের টাকা চাই অতএব গরীবকে টাকা দিতেই হইবে।

বুদ্ধিমান্ শাসকের দল যদি চক্ষু মুদিয়া অলস আরামে নিদ্রা না দিয়া ১৯৫৬ সালের সীমান্ত-পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন, আজ এ বিষম অবস্থার উদ্ভব হইত না। পঞ্চশীল এবং হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই লেখা গাধার টুপী মাথায় না দিয়া যদি ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে হইতে চীনা-আপদ্ দমনে তৎপর হইতেন আমাদের পরম বিজ্ঞ মন্ত্রী-প্রধান, তাহা হইলে আজ দেশকে এমন বেকুব এবং অসহায় হইত না। বেকুবী করিবেন শাসকগোষ্ঠী আর তাহার খেসারত দিতে হইবে দেশবাসীকে! অন্য দেশ হইলে এমন অবস্থায় অচিরে গবর্ণমেণ্টের পতন হইত—নেতাদের বিচার ব্যবস্থাও (Impeachment) হইত। একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্যকে করিতে হইবে কেন?

সার্থক স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ : ধন্য মোরারজী !

প্রথমে জলপাইগুড়িতে, তাহার পরে কলিকাতায় স্বর্ণশিল্পীর আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে :

রবিবার (১৭ই মার্চ্চ) সকাল সোয়া এগার ঘটিকার সময় নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শ্রীসুনীলকুমার কর্ম্মকার নামক ২৭ বৎসর বয়স্ক স্বর্ণশিল্পীর নাইট্রিক এসিড পানের ফলে মৃত্যু হয়। শ্রীসুনীল এই দিন প্রত্যুষেই নাইট্রিক এসিড পান করেন তাঁহার বেকার জীবনের অবসান ঘটাইবার জন্য।

হতভাগ্য স্বর্ণশিল্পী পিছনে রাখিয়া গেল মাতা এবং ১৪ বৎসর বয়স্ক এক নাবালক ভ্রাতাকে। মোরারজীর স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণের ফলে, যে স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে এই হতভাগ্য চাকুরি করিত, তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সুনীল বেকার হয়। গত প্রায় দুই-তিন মাস সপরিবারে সে প্রায় অনাহারে ছিল। কষ্ট এবং ভাবনা-চিন্তার হাত হইতে সহজে মুক্তিলাভের জন্য সে অবশেষে আত্মহত্যা করিল! কেবল বাঙ্গলা দেশেই নহে, সমাজ-সংস্কারক মোরারজীর স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে ভারতের অন্যান্য স্থান হইতেও স্বর্ণ-শিল্পীদের বহু আত্মহত্যার সংবাদ আসিতেছে—বাঙ্গালোর হইতে ২১শে মার্চ্চ পি. টি. আই সংবাদ দিয়াছেন :

আজ সকালে এখানে একজন স্বর্ণশিল্পী, তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি সন্তানকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। স্বর্ণশিল্পীর বয়স ৩০ বছর, তাঁর স্ত্রীর বয়স ২০ বছর আর সন্তান দুইটির মধ্যে একজনের বয়স ৫ বছর অপরটির মাত্র ৫ মাস। পুলিশ ইহাকে পরামর্শ করিয়া বিষপানে আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। স্বর্ণশিল্পীর বিছানায় যে চিঠি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়াই তিনি সপরিবারে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পুলিশী সূত্রের সংবাদে আরও প্রকাশ যে, স্বর্ণশিল্পীর বিছানায় কিছু মিষ্টি, কাগজের টুকরো, একটা কাচের গ্লাস ও তাহাতে কিছু তলানি পাওয়া গিয়াছে।

সাধারণ মানুষ স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই যে, নব-ভারতের পরিকল্পনা-প্রাণ এবং উদ্ভট অবাস্তব কল্পনা-বিলাসী ভাগ্যবিধাতাদের অমোঘ বিধানে কর্ম্মক্ষম এবং নিজ-পেশায় নিযুক্ত স্বর্ণ-শিল্পীদের একের পর একে এমন করিয়া নিজের হাতে নিজেদের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিতে হইবে।

এ-কথা আমরা জানি যে, দিল্লীর আলমগীর বাদশাদের এই সব শোক সংবাদ কোন প্রকারেই বিব্রত করিবে না। এই সকল দয়াময় ব্যক্তিদের শ্রীমুখ হইতে এই সব হতভাগ্যদের জন্য একটি সান্ত্বনা বাক্যও নির্গত হইবে না। যে-নিয়ন্ত্রণের ফলে ৫।৭ লক্ষ লোক বেকার হইল এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ লোকের মুখের গ্রাস অন্তর্হিত হইল, মসনদে উপবিষ্ট জীবনের সর্ব্ববিধ আরাম-বিলাসে নিমগ্ন হঠাৎ-নবাবদের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ইহাতে হইবে না! ৪৪ কোটি লোকের ভাগ্যবিধাতা আজ যাঁহারা, সামান্য কয়েকজন লোকের মৃত্যুতে তাঁহাদের কি আসিয়া যাইবে?

নব-ভারতের দয়াময় ভাগ্যবিধাতারা মনে রাখিবেন—স্বর্ণ-শিল্পীদের আত্মহত্যা এবং অকাল-মৃত্যুর সূচনামাত্র হইয়াছে। এই সকল হতভাগ্যদের শতকরা একশত জনই আজ বেকার। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধাতা স্বর্ণশিল্পীদের সঙ্কটময় অবস্থার কথা জানিয়াও—তাঁহার স্বভাবগত পরিহাসপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বেকার

স্বর্ণশিল্পীদের সরকার হইতে সাময়িক আর্থিক সাহায্য দানের প্রস্তাবে তিনি পরিহাস করিয়া অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "সকল বেকার ব্যক্তিকে সাহায্য দিবার মত অবস্থায় সরকার বাহাদুর এখনও উপনীত হয়েন নাই!" —হয়ত তিনি সত্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কর্মনিযুক্ত ব্যক্তিদের বেকার করিবার যোগ্যতা সরকার অবশ্যই অর্জন করিয়াছেন। লোকসভায় আজ এমন একজনও নাই যিনি মোরারজী, নেহরু এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারেন, কিংবা দাঁড়াইবার সাহস রাখেন। পশ্চিমবঙ্গের এম. পি.গণ বাঙ্গালী হইয়াও তাঁহারা যে বাঙ্গালী নহেন তাহা পদে পদে প্রমাণ করিতেছেন। লোকসভায় বাঙ্গালা কংগ্রেসী সদস্যদের কেরামতি বুঝা গিয়াছে, এমন কি তাঁহাদের রাখাল শ্রীঅতুল্য ঘোষকেও হিসাবে ধরিয়া লাভ নাই। ইঁহারা সকলেই সকল সময় শ্রীনেহরুর শ্রীমুখের প্রতি সভয়-সজল নেত্রে চাহিয়া আছেন। অন্যান্য দলের বাঙ্গালী এম. পিদের চাল-চলনও বিকারগ্রস্ত। ব্যক্তি এবং দলগত স্বার্থ ইঁহাদের কাছে দেশ এবং জাতি হইতে বড়!

আজ বড় দুঃখে শরৎ বসু, শ্যামাপ্রসাদ এবং পরম-বৈজ্ঞানিক নেহরুর মতে অবৈজ্ঞানিক-মেঘনাদ সাহার কথা মনে পড়িতেছে। বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—"শরৎ, শ্যামাপ্রসাদ, মেঘনাদ! আজ যদি তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে। বাঙলা এবং বাঙ্গালীর আজ তোমাদের বড় প্রয়োজন!" লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সকল অবিচার অনাচার বর্তমান বাঙ্গালী সদস্যগণ যেমন নীরবে সহ্য, তথা সমর্থন করিতেছেন, স্বর্গত শরৎ বসু, শ্যামাপ্রসাদ এবং মেঘনাদ তাহা ক্ষণেকের জন্যও করিতেন না। বাঙলা এবং বাঙ্গালীর অপমানে বাঙলার প্রকৃত সন্তান শরৎচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু হায়! আমরা কিসের সহিত কিসের তুলনা করিতেছি। মানুষের আদর্শনিষ্ঠা আত্মসম্মানবোধ, দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ, যাহার-তাহার কাছে আশা করিলে অবশ্যই নিরাশ হইতে হইবে। বাঙলার স্বর্ণশিল্পী মহল বাঙ্গালী এম. পি-দের দ্বারস্থ হইয়াও কোন ফললাভ করেন নাই!

নেহরু-মোরারজী গোষ্ঠীকে একটা কথা স্পষ্ট বলা দরকার। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ৫।৭ লক্ষ লোককে বেকার এবং সেইসঙ্গে আরও প্রায় ৩৫।৪০ লক্ষ লোককে অনাহারের মুখে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের কেবল অকালমৃত্যুর ব্যবস্থা করেন নাই, এই ৪০।৫০ লক্ষ লোককে সরকারবিরোধী হইতে বাধ্য করিলেন এই ভীষণ আপৎকালে। এই 'রোগটা' বড় বিষম সংক্রামক —৫০ লক্ষ সরকারবিরোধী মানুষের মনের বিষ আরও লক্ষ লক্ষ লোকের মনকে বিষাক্ত করিতে বাধ্য। বড় বড় ভূয়ো আদর্শের কথা বলিয়া মানুষকে দীর্ঘকাল ধাপ্পা দেওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় কর্তাদের কথায় এবং কাজে কত তফাৎ তাহা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রতিভাত। এখনও সাবধান হইবার সময় আছে। কর্তারা অবহিত হউন—দেশভক্ত, সর্বপ্রকার ত্যাগে উদ্বুদ্ধ, আপৎকালে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত লক্ষ লক্ষ মানুষকে জোর করিয়া বিপথগামী করিবেন না—ইহাই আমাদের কাতর নিবেদন। জানি না, অবিরত তোষামোদ এবং প্রশংসা বাক্য-শ্রবণে-অভ্যস্ত আজিকার কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় কর্তাদের কর্ণে সামান্য ব্যক্তির আবেদন পৌঁছিবে কি না।

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের চিতাভস্ম

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজেন্দ্রপ্রসাদের পূত চিতাভস্ম হায়দরাবাদের পথে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছায় বৃহস্পতিবার ২১শে মার্চ। হাওড়া ষ্টেশনে দুইজন রাজ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য কয়েকজন চিতাভস্মাধার গ্রহণ করেন।

যাঁহার পূত-চিতাভস্ম পরম শ্রদ্ধায় মাথায় গ্রহণ করিবার জন্য সমগ্র কলিকাতা এবং হাওড়ার জনগণের উপস্থিতি অবশ্যকর্তব্য ছিল, তাহা সামান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল!

মহাত্মা গান্ধীর একমাত্র এবং শেষ উত্তরসাধক রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন মানুষ হিসাবে খাঁটি, ব্যবহারে সহজ সরল, ব্যক্তিগত জীবনে সদা-নম্র সদালাপী। পদ-গৌরব তাঁহার চিত্তকে করে নাই বিকৃত, মনকে করে নাই কোনপ্রকারে গর্বিত। পার্থিব সম্পদ্ তাঁহার চিত্তকে বিকৃত কলুষিত করিতে পারে নাই। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মানুষ ছিলেন তিনি। রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়াও তিনি রাষ্ট্রের একান্ত নগণ্য ব্যক্তিকেও পরম আত্মীয়বৎ মনে করিতেন। দর্শনপ্রার্থী সামান্যতম মানুষও কখন রাষ্ট্রপতি-ভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত নিরাশ হইয়া ফিরে নাই। তাঁহার ভবন প্রহরীসঙ্কুল হইয়াও সকলের জন্য সদামুক্ত ছিল।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বর্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস হইতে

চিরতরে সর্ব্বশেষ সৎ, ভদ্র, কর্ত্তব্যে কঠোর, সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টে একান্ত দরদী, আদর্শনিষ্ঠ—এক কথায় দেশের অদ্বিতীয় মনের-গঠনে-পূর্ণাবয়ব মহা-মহামানবের অবসান ঘটিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ চলিয়া গেলেন, রাখিয়া গেলেন এমন সকল কংগ্রেসী নেতাকে যাঁহাদের সহিত জনগণের আর কোন সম্পর্কই নাই, যাঁহাদের অনাচার, অবিচার এবং স্বেচ্ছাচারিতা আজ সীমাহীন পর্ব্বতপ্রমাণ।

কলিকাতা হইতে রাজেন্দ্রপ্রসাদের পূত-চিতাভস্ম হায়দরাবাদ চলিয়া গিয়াছে। এই চিতাভস্মের সহিত বিগতকালের কংগ্রেসের যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু উচ্চ আদর্শ, দেশপ্রেম, চরিত্রনিষ্ঠা, ভদ্রতা, সৌজন্য—সবকিছুই চিতাভস্মে পরিণত হইল।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরলোকগমন করিয়া ইহলোকের স্বার্থান্বেষী, অসৎ, স্ফীতমস্তক কংগ্রেসী নেতাদের পরম কল্যাণ করিলেন! সর্ব্বসময় সম্মুখের সাধু চরিত্রের কাঁটা আর তাঁহাদের গলায় বিঁধিবে না। তাঁহারা নিষ্কণ্টক হইলেন।

সীমাহীন কম্যু-কামনা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সাধারণ শাসন ও আরও দুইটি খাতে ব্যয় বরাদ্দের আলোচনাকালে সভাকক্ষে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যায়। কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট, বিরোধী সদস্যগণ বিভিন্ন সময়ে পৃথকভাবে প্রচণ্ড হট্টগোল ও বিক্ষোভধ্বনির মধ্যে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

কম্যুনিষ্টদের অভিযোগ ছিল ভারতরক্ষা আইনে আটক 'রাজনৈতিক' বন্দীদের প্রতি 'অমানুষিক' আচরণ এবং তাহাদের পদমর্যাদা (?) অনুসারে শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা না হওয়া।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কারামন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি উভয়েই বন্দীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেন। শ্রীমতী মুখার্জি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে যাহাদের আটক করা হইয়াছে, সরকার তাহাদের রাজনৈতিক বন্দী বলিয়া গণ্য করিবেন না। তাহাদের উচ্চতর শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হইবে না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলেন, আদালতে নির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত বন্দীদের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ ম্যাজিষ্ট্রেট করেন: সরকার করেন না।

কম্যুদের দাবীর জবাব যথাযথই হইয়াছে বলিয়া মনে করি। আমরা ভাবিয়া অবাক্ হই, জাতি এবং দেশদ্রোহী চীনা-প্রেমিকের দল কোন্‌মুখে দেশের নিকট হইতে ভদ্র মনুষ্যজনোচিত ব্যবহার আশা করে!

এই প্রসঙ্গে আমরা সরকারকে, কম্যুদের প্রকৃত পরিচয় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের যথাযথ দমন ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে বলিব। সামনে বিপদ্ রহিয়াছে, এখন কম্যুদের প্রতি কোমল মনোভাবের কোন অবকাশই নাই। যথার্থ কথা:

> কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা বহুরূপী, কিন্তু স্বরূপ সকলেরই এক। শ্যাম ও কুল রাখিতে রাজনীতির আসরে কম্যুনিষ্ট নেতারা নানাজন নানারূপে অভিনয়ের ভূমিকা লইয়াছেন। কেহ ডাঙ্গেপন্থী মস্কোর মক্কার দিকে মুখ রাখিয়া ভজনায় ব্যস্ত, কেহ পিকিংয়ের সঙ্গে চকিত চাহনি বিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে দেশপ্রেমের বাঁধাবুলি শুনাইয়া মানসম্মানরক্ষার ফিকির খাটাইতে ওস্তাদ। অভিনয়ে বাহাদুরি থাকিতে পারে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং পার্টির বহুরূপী নেতাদের স্বরূপ দেশবাসীর চিনিতে বাকী নাই। চিনাইয়া দিয়াছেন কম্যুনিষ্ট নেতারাই, যাঁহারা দেশের চরম সংকটকালে প্রথমে মুখ খোলেন নাই, যখন ঠেলায় পড়িয়া খুলিয়াছেন তখনও একবার মস্কো, একবার পিকিংয়ের দিকে তাকাইয়া উল্টাপাল্টা কথা বলিয়াছেন। পিকিংয়ের চর-অনুচর হিসাবে তলায় তলায় পঞ্চম-বাহিনীসুলভ ক্রিয়াকলাপ চালাইতেও কিছুমাত্র লজ্জা ঘৃণা সংকোচ হয় নাই।

আজ জনকয়েক কম্যুনেতা হঠাৎ দেশভক্ত হইয়া গিয়াছেন! বলা বাহুল্য নেহাৎ প্রাণের দায়েই ইঁহাদের এই ভেক বদল। 'দুরাত্মার ছলের অভাব নাই'—দায়ে পড়িয়া ভেকবদলও ছল মাত্র।

নেহেরুর প্রতি অচলা ভক্তি এবং তাঁহার আদর্শের(?) প্রতি নিষ্ঠার আড়ালে কম্যু-নেতারা নিজেদের পাপকর্ম্ম সফল করিবার ভাল মতলব করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা আদর্শপ্রাণ নেহরুও কম্যুদের নিছক প্রশংসা বাণীতে পরম বিগলিত হইয়া আছেন। বর্ত্তমানে—

> এই কম্যুনিষ্ট নেতাদের অতিভক্তি যে কিসের লক্ষণ তাহা বুঝাইয়া বলার দরকার হয় না। রাজ্যসভা, লোকসভা ও বিধানসভায় এই শ্রেণীর কম্যুনিষ্ট নেতারা কথাবার্ত্তায়, বক্তৃতায় এমন ভাব দেখাইতেছেন যেন ইঁহারাই কংগ্রেসের আদর্শের রক্ষাকর্ত্তা; শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্রনীতির পাহারাদারি করিবার ভারও যেন ইঁহাদেরই! ইঁহারা কি এবং কে দেশপ্রেমীমাত্রেরই তাহা জানা আছে। তবুও পাকেচক্রে অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, এই বহুরূপী কম্যুনিষ্টরাই দেশপ্রেমের অভিনয়-কৌশলে সকলের উপর টেক্কা দিতেছে। ইহাদের স্পর্দ্ধা কম নয়; মস্কো অথবা পিকিংয়ে যাহাদের টিকি বাঁধা তাহারাই কিনা কংগ্রেস এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলকে দেশপ্রেম শিখাইবার জন্য ছড়ি ঘুরাইতেছে!

কম্যু-নেতা ভূপেশগুপ্ত কয়েকদিন পূর্ব্বে চীনা-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে মার্কিন এবং ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য হিসাবে গ্রহণ সম্পর্কে যে-সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা চীনের স্বার্থে ওকালতী এবং দেশের পক্ষে পরম ক্ষতিকর। ভূপেশ গুপ্ত 'চীনারা আমাদের শত্রু নহে', তাহার পক্ষে নেহরুর দোহাই দিয়া বলিয়াছেন—(নেহরুর মতে)

"ভারতের বিরোধ চান সরকারের সঙ্গে, চীনের সহিত আমাদের কোন শত্রুতাই নাই।" অর্থাৎ কি না চীনের প্রতি আমাদের ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য—পরম বন্ধুর মত! ভূপেশ গুপ্ত যতই প্রয়াস করুন—চীন-সরকার এবং চীন-দেশ দুটি স্বতন্ত্র বস্তু—এই কথা লোককে বুঝাইতে তিনি পারিবেন না। কথার মারপ্যাচে কঠোর সত্যকে ঢাকা দেওয়ার প্রয়াস বৃথা।

সঙ্কটসময়ে কোন্ নীতি ভাল, ভারতের নিরাপত্তা এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধির অনুকূল তাহা বিচার করিবে দেশপ্রেমী জনসাধারণ; প্রয়োজনমত নীতি নির্দ্ধারণ এবং পরিবর্ত্তনের দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের। চীনকে শত্রু বলিলেই যে-সকল দেশপ্রেমীরা বুক চাপড়াইতে থাকে, সঙ্কটকালে মার্কিন অস্ত্রসাহায্য লাভের চেষ্টাকে যাহারা বানচাল করিতে চায় নেহরু-নীতির দোহাই দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশা গ্রাস হইতে দেশকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতেই হইবে। ভুলিলে চলিবে না যে, এই মেকী দেশপ্রেমী কম্যুনিষ্টরা চৈনিক কম্যুনিষ্টদের অপেক্ষাও সাংঘাতিক।

আটক কম্যু-বন্দীদের প্রতি প্রথম শ্রেণীর বন্দীর মত ব্যবহার করা হইতেছে না, এই দুঃখ এবং অপমান পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় কম্যু-সদস্যদের বিচলিত করিয়াছে। আবদারের একটা সীমা আছে। অন্য দেশ হইলে সম-শ্রেণীর বন্দীদের নারিকেল ছোবড়ার প্যান্ট এবং কুর্ত্তা পড়াইয়া ঘানি টানার ব্যবস্থা হইত। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের কারাগারে দেশদ্রোহী কম্যু-বন্দীরা ত রাজকীয় আরামে আছেন ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কম্যুদের দাবী যদি জোরদার হইয়া উঠে—তাহা হইলে রাজ্যসরকারের কর্ত্তব্য হইবে কম্যু-বন্দীদের দ্বারা সরিষা হইতে তৈল নিষ্কাশন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তন।

কম্যু বন্দীরা নাকি অনশনের হুমকি দিয়াছেন। ইহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই। মহাত্মা গান্ধী অনশন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং অন্যের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। কম্যু বন্দীরা যদি সত্যই অনশন করে তাহা হইলে তাহাদের স্বকৃত মহাপাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হইবে—কিন্তু তাহাদের চিত্ত শুদ্ধির কোন আশা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

বর্ত্তমান অবস্থায় কম্যুদের সম্পর্কে সরকারকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয় কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচ আত্মহত্যার সামিল হইতে বাধ্য। কম্যুদের মধ্যে "জাতি"-বিচারের অবকাশ নাই, এই সকল শৃগালদের রা এক। বিধান সভায় কেবল "শেম্ শেম্" বলিয়া ধিক্কার ধ্বনি দ্বারা কম্যুদের লজ্জা দিবার প্রয়াস বৃথা। এই লজ্জা নামক জিনিষটি কম্যুনিষ্ট অভিধানে লোপ পাইয়াছে বহুদিন পূর্ব্বেই।

'সর্ব্বমারী' মোরারজীর বিচিত্র পরিহাস

মোরারজীর স্বর্ণ-বোর্ডের চেয়ারম্যান পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকোটাক বেকার স্বর্ণ-শিল্পীদের মুস্কিল আসানের জন্য এক অভিনব প্রস্তাব (হুকুম?) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অভিজ্ঞ স্বর্ণ-বোর্ডের মতে বেকার স্বর্ণ-শিল্পীগণ অতঃপর চাষ-আবাদ এবং মোটর চালানো শিক্ষা করিলেই তাহাদের দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটিবে। মোরারজীর বিশ্বস্ত শ্রীকোটাকের দায়িত্বমুক্তি কেবল প্রস্তাব পাঠাইয়াই। বেকার স্বর্ণ-শিল্পীদের জন্য আবাদী জমির এবং মোটর-ড্রাইভিং শিক্ষার ব্যবস্থা (ষ্টেট্ ট্রানস্‌পোর্টের মাধ্যমে) পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে! এত বড়ো একটা সমস্যার এমন সহজ সমাধান সাধারণ জনের এমন কি রাজ্যসরকারের মাথায় কেন ইতিপূর্ব্বে উদয় হয় নাই ভাবিয়া পাই না! পশ্চিমবঙ্গে জমির অভাব নাই, লক্ষ লক্ষ একর আবাদী জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে—(সেই কারণেই বিনোবাজী এত ভূমি এবং গ্রামদান পাইতেছেন!)—এক জোড়া করিয়া বলদ (কংগ্রেসী জোড়া-বলদ সহজলভ্য) এবং একটা করিয়া লাঙ্গল প্রত্যেক বেকার স্বর্ণ-শিল্পীকে ব্যবস্থা করিয়া দিলেই সমস্যার অবসান ঘটিবে। আর মোটর-ড্রাইভিং শিক্ষা? ইহা অতি সহজ ব্যাপার। কলিকাতার পথেঘাটে ষ্টেট-বাসের চোটে প্রতিদিন কত লোক আঘাত পাইতেছে, অপঘাত মৃত্যুও সুলভ। অনাহারে দুর্ব্বল, চিন্তায় বিকৃত মস্তিস্ক স্বর্ণ-শিল্পীদের ড্রাইভিং শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতার রাস্তায় করিতে পারিলে এই শহরের বিপুল জনসমস্যার কিছুটা সুরাহা হইবে।

স্বর্ণ-শিল্পীদের চাষা এবং মোটর ড্রাইভার করিতে আশা করি দু-তিন বছর অন্ততঃ সময় লাগিবে। এই দু-তিন বছর অবশ্য এই হতভাগ্যদের দেশের এবং জাতির কল্যাণের কারণে এবং নিজেদের "ফিউচার প্রস্‌পেকটের" উজ্জ্বল চিত্রের কথা মনে করিয়া অনাহারেই থাকিতে হইবে। উচ্চ মহলে তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে গভীর চিন্তা-মগ্ন পণ্ডিতদের এই পরিহাস-প্রিয়তা সত্যই আমরা উপভোগ করিতেছি। এই বিশিষ্ট দয়াময় ব্যক্তিদের নিকট এইমাত্র অনুরোধ—স্বর্ণশিল্পীদের মারণ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, এইবার তাহাদের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপরেই দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন। ঘা-এর উপর নুনের ছিটার মত অমূল্য এবং পরম অবাস্তব উপদেশাবলী বিতরণ করিয়া স্বর্ণ-শিল্পীদের অকাল মৃত্যুর জ্বালা আর বৃদ্ধি করিবেন না। ফাঁসীর হুকুম যখন হইয়া গিয়াছে, তখন আর চিন্তা কি?

দণ্ডিত ব্যক্তির মৃতদেহ লইয়া যেন পথেঘাটে হট্টগোল না হয়, কর্তারা এখন এই বিষয়ে শেষ একটা অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া কর্তব্য শেষ করিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। এ-রাজ্যের বেকার সন্তানদের কর্ম-সংস্থানে রাজ্য সরকারের অক্ষমতার কথা বার বার বলিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু এই বেকার সমস্যার ফলে আজ এ-রাজ্যে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা এবং কাছাকাছি অঞ্চলে আর একটি সমস্যা যে কি ভীষণ হইয়াছে তাহার প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি বোধ হয় উপর মহল এখনও দিবার সময় পান নাই। বেকারত্বের ফলে আজ হাজার হাজার মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ভদ্রসন্তান বিবিধ প্রকার সমাজবিরোধী অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছে—যাহার ফলে শান্তিপ্রিয় নাগরিক জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

সমাজবিরোধী বিবিধ অনাচার-অপকর্মে লিপ্ত বালক এবং যুবকদের বয়স সাধারণতঃ দেখা যাইতেছে ১৬ এবং ২৬-এর মধ্যে, দু'এক ক্ষেত্রে সামান্য ইতর বিশেষও হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে লেখাপড়া-জানা, ম্যাট্রিক, স্কুল-ফাইন্যাল, আই-এ, আই-এসসি এবং বি-এ, বি-এসসি পাশ যুবকের সংখ্যাও প্রচুর। ভদ্রঘরের শান্তিপ্রিয় মাতা-পিতা এবং ভদ্রপল্লীর সন্তান হইয়াও আজ ইহারা কেন এমন বিপথগামী, বিকৃতচিত্ত এবং অনাচারী হইল? আজ তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকার পন্থা আবিষ্কার করা দেশের সমাজ এবং বাঙ্গালী জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

সরকার হয়ত বলিবেন যে, তাঁহারা কর্ম-সংস্থান সংস্থা খুলিয়া দিয়াছেন, সেখানে নাম লিখাইলেই বেকারদের বেকারত্বের অবসান ঘটিবে। কিন্তু কর্ম-সংস্থান সংস্থায় (Employment Exchange) যে-সব বাঙ্গালী বেকার নাম রেজেষ্ট্রী করে, অন্ততঃ তাহাদের শতকরা ৫০ জনই সামান্য শিক্ষিত, ম্যাট্রিক পাশ। আই-এ, বি-এ পাশ শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাই এখানে সর্বাধিক। কর্ম-সংস্থানে মহিলা বিভাগও আছে, এখানে মহিলা বেকারদের নামের রেজিষ্টারে অন্ততঃ কয়েক হাজার শিক্ষিতা মহিলাদের নাম পাওয়া যাইবে, সকলেই প্রায় শিক্ষিত এবং বহুজনের শিক্ষকতার এবং টাইপিষ্ট হইবার যোগ্যতা আছে।

কিন্তু মুশকিল হইতেছে যে, কর্ম-সংস্থান কার্য্যালয়ে নাম লিখাইলেই সমস্যার সমাধান হয় না। বছরের পর বছর অপেক্ষা করিয়াও শতকরা ৬০।৭০ জনের কোন সুবিধাই হয় না দেখিয়া এখন বহু বেকার এবং সদ্য পাস-করা যুবক আর কর্ম-সংস্থানের দরজা মাড়ায় না। কর্মসংস্থান কর্তৃপক্ষের কাহাকেও কোথাও চাকুরি দিবার কোন ক্ষমতা নাই—কলকারখানা, সংস্থা, সরকারী এবং বেসরকারী বিবিধ আপিস, হাসপাতাল প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত চাহিদা অনুযায়ী কর্মপ্রার্থীদের নামের তালিকা পাঠান পর্য্যন্তই তাঁহাদের কর্তব্যসীমা। কে চাকুরি পাইবে, কাহাকে চাকুরি দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবেন কলকারখানার মালিক এবং সংস্থা বিশেষের কর্তৃপক্ষ। প্রায় সর্বত্রই শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রে "নিজেদের লোক" বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহারাই চাকুরি পায়। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে রাজ্য এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং অফিসারগণও বহু ক্ষেত্রে বিবিধপ্রকারে সংস্থা কর্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করেন এমনও শুনা যায়। যাহার ফলে কর্তা-জানিত কর্মপ্রার্থীর ভাগ্য প্রসন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানা এবং সওদাগরী আপিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে, সেই হারের সঙ্গে সমতা রাখিয়া যদি বাঙ্গালী সন্তানদের অধিকতর কর্মের সংস্থান হইত তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গালার বেকার সমস্যার এমন ভয়াবহ তীব্রতার কিছুটা কমতি দেখা যাইত। বাস্তবে কিন্তু বিপরীতই ঘটিতেছে। হিসাবে পাওয়া যায়:

১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে তালিকাভুক্ত কারখানার সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৪১টি। ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ হাজার ৪ শত ৯৬টি। এই তিন বৎসরের মধ্যে তালিকাভুক্ত কারখানার কর্মরত ব্যক্তির সংখ্যা ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার হইতে ৭ লক্ষ ১৮ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ১৯৫৯ সালে কলকারখানায় পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের চাকুরির হার ছিল মাত্র শতকরা ৩৯.৪১ জন। বর্তমানে এই হার আরও হ্রাস পাইয়াছে। বীমা কোম্পানী, সওদাগরী অফিস ইত্যাদিতেও এই অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা ও বাণিজ্য-সংস্থাগুলি পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের লোকদের করায়ত্ত বলিয়া এই রাজ্যের কলখানায় চাকুরি খালি হইলে এবং যে-সব নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহার কাজে পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের উপযুক্ত সংখ্যায় নিযুক্ত করা হয় না। এই সম্বন্ধে শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র বিধানসভায় একটি চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কলিকাতার এক শ্রেণীর অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী নিজেদের অধীনে মাসিক ৩৫০ টাকার অধিক বেতনের চাকুরি খালি হইলে তাহা

পূরণের জন্য একমাত্র বাঙালার বাহিরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। এই প্রকার প্রতিষ্ঠানে বাঙালীর চাকুরি জোটে না। একমাত্র চাকুরির ব্যাপারেই পশ্চিমবঙ্গের অবাঙালী পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বাঙালার সন্তানদের প্রতি অবিচার হয় না, প্রমোশনের ব্যাপারেও বহু ক্ষেত্রে এইরূপ অবিচার হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যসংস্থাসমূহের চাকুরির সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যসংস্থাসমূহের পরিচালকগণ নানা প্রকার অপকৌশলও অবলম্বন করিয়া থাকেন।

বিহার, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য রাজ্যসরকার স্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য সর্বাধিক কর্মসংস্থান রাজ্যস্থিত কলকারখানা এবং অন্যান্য প্রায় সর্ব্ব-সংস্থায় বহুপূর্ব্বেই করিয়াছেন, কিন্তু এ-বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাধা এবং দ্বিধা কোথায় জানি না। পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের কর্মসংস্থান রাজ্যসরকারের প্রধানতম দায়িত্ব—যে-দায়িত্ব পালনে তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়াছেন। কেবল বিপথগামী বাঙালী যুবকদের গালি বা নিন্দা করিয়া লাভ নাই এবং ইহাও বেকার।

মানুষ প্রয়োজনের সময় সুখাদ্য না পাইলে অখাদ্য খাইতে বাধ্য এবং ক্রমে অভ্যস্তও হয়। বাঙালী বেকারদের সু-কর্মের অভাব বা সংস্থান না থাকিলে তাহারা কু-কর্ম করিবেই এবং কালক্রমে পাকা দাগী কুকর্মী হইবে। যুবজনের প্রকৃতিগত এবং স্বাভাবিক প্রাণশক্তিকে যদি ঠিকপথে চলিবার অবকাশ দেওয়া না হয় বা অবকাশ না থাকে, তবে সেই অদম্য এবং জাতি ও দেশের পক্ষে মহামূল্য প্রাণ ও কর্মশক্তি বিপথগামী হইয়া সমাজদেহকে সর্ব্বভাবে আক্রান্ত এবং বিষাক্ত করিবেই।

রাজ্যসরকার এবং সমাজের নেতৃগণকে আজ পশ্চিম বঙ্গের এই বসন্ত-কলেরা-অপেক্ষাও ভয়াবহ মহামারী বেকার সমস্যার প্রতি সবিশেষ অবহিত হইতে অনুনয় করিতেছি। অবস্থার আশু প্রতিবিধান না করিলে আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিদ্বেষ সবেগে জ্বলিয়া উঠিতে বাধ্য।

আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, বর্ত্তমানে বিপথগামী বাঙালী বেকার যুবজন এখনও চিকিৎসার বাহিরে যায় নাই। তাহাদের অন্তরের শুভবুদ্ধি এবং মানবতা এখনও প্রাণরসে পূর্ণ আছে। কর্মসংস্থানদ্বারা তাহাদের বেকারত্ব দূর করিতে পারিলে অবস্থার উন্নতি হইতে বাধ্য। তবে তাহাদের শুভবুদ্ধি এবং শুভ কর্মশক্তি বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বেই যাহা করিবার তাহা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব খুব কম নহে। ভূতপূর্ব্ব শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার মহাশয় বাঙালা বেকারদের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা সাধ্যমত করেন, ব্যক্তিগত ভাবে এ-কথা জানি। বর্ত্তমানে তিনি মন্ত্রী থাকিলে হয়ত ভাল হইত। কিন্তু একদা-জমিদার বর্ত্তমানে রাজ্য শ্রমমন্ত্রী বাঙালী সন্তানদের বেকারত্ব দূরীকরণে কি করিয়াছেন জানা নাই। যদি কিছু করিতেন, তাহা প্রকাশ পাইত বলিয়া মনে হয়। শ্রমমন্ত্রীর কাজ এবং কর্ত্তব্য কেবলমাত্র দপ্তরের শোভা বর্দ্ধন এবং হুকুম-নির্দ্দেশ জারীতে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

—•—

সোনা ছাড়া চলতে পারি
স্বাধীনতা ছাড়া চলতে নারি

ঘূর্ণী হাওয়া

শ্রীসীতা দেবী

১

গরম পড়ব পড়ব করছে, তখনও ভাল ক'রে পড়ে নি। এখনও নিজের ভাল গাড়ী থাকলে ভোরে উঠে কলকাতার ধারে-কাছে অনেক দূর অবধি বেড়িয়ে আসা যায়। একটু বেশী ভোরে উঠলে প্রখর রোদ ওঠার আগেই দেড়শো, দুশো মাইলের কাছাকাছি যে কোনও জায়গায় পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে গাড়ী খারাপ হ'লে বিপদ্, গরমে সেদ্ধ হয়ে যেতে হয়, মাথায় রক্ত উঠে যায়।

মানসীদের গাড়ীটা নিতান্ত মন্দ নয়। খুব বড় না হ'লেও চার-পাঁচজন হাত-পা মেলে বসা যায়। লগেজ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ভালই আছে। গাড়ী হয়ে অবধি মানসীর সখ কোথাও একটু ঘুরে আসে, কিন্তু স্বামীর অফিস ছুটি সম্বন্ধে অতি কৃপণ, কাজেই হয়ে আর ওঠে না।

এবারে হঠাৎ ঈষ্টারের সময় তার কপাল খুলে গেল। ছেলের ত চারদিন ছুটি, প্রণবও জোড়াতালি দিয়ে চারদিন ছুটি ক'রে নিল। মানসী ত আনন্দে দিশাহারা, নিতান্ত পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স হয়ে গেছে, না হ'লে একপাক নেচেই নিত। খুশিতে চোখ বড় বড় ক'রে বলল, "কোথায় যাওয়া যায় বল ত গো।"

প্রণব কিছু বলবার আগেই খোকা বলল, "বা রে, ও আবার নূতন ক'রে বলতে হবে নাকি? ঠিক আছে না কতদিন থেকে, যে আমরা গাড়ী ক'রে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাব? একেবারে মেজকাকার বাড়ী গিয়ে উঠব।"

"গরমে পারবি অতদূর যেতে?" তার বাবা প্রশ্ন করল।

খোকা নাক তুলে বলল, "হ্যাঁ, আমি আবার পারব না? ওসব গরম-টরমে আমার কিছু হয় না। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় হয় মেয়েরা, নয় অত্যন্ত ন্যাকা ছেলেরা।"

মানসী বলল, "আচ্ছা, চলই ত, তারপর দেখা যাবে কে আগে মূর্চ্ছা যায়। মনে রেখ, ছোট বেলা পশ্চিমে মানুষ আমি। সে রকম গরম তোমরা স্বপ্নেও কোনদিন দেখ নি।"

গোছগাছ হ'তে লাগল। বেশী কিছু নিতে হবে না, শুধু পরণের কাপড়-চোপড়। খোকার মেজকাকার রাণীগঞ্জের বাড়ীতে এলাহি কারখানা, কোন জিনিষেরই অভাব নেই। তবে এই প্রথম যাচ্ছে তাদের বাড়ী, কিছু ভাল আম আর সন্দেশ তাদের জন্যে সঙ্গে ক'রে নেওয়া যাবে।

ভোর রাতে উঠে বেরোতে হবে, ড্রাইভারকে বার বার ক'রে ব'লে দেওয়া হ'ল। লোকটার ঘুম সজাগ, কাজেই তাকে তুলবার জন্যে ঠেলাঠেলি করতে হবে না। মানসীর ঘুম ভয়ানক হাল্কা, সকালে কোথাও যাবার থাকলে আগের রাতে তার ঘুমই হয় না। প্রণবের ঘুমও অসাধারণ কিছু নয়, ঘরে যদি মানসী আলো জ্বালে বা ঘুরে বেড়ায় তা হ'লেই তার ঘুম ভেঙে যায়। বিপদ্ হবে খোকাকে নিয়ে। সারাদিন হুড়োহুড়ি ক'রে একবার যখন সে ঘুমোতে আরম্ভ করে, তখন কুম্ভকর্ণও তার কাছে হার মানে। যা হোক্ ক'রে তাকে তুলতেই হবে। কারও ঘুমের জন্যে এতকালের প্ল্যান-করা বেড়ান মানসী ভেস্তে যেতে দেবে না।

স্যুটকেস গুছিয়ে রেখে, সকালে কে কি প'রে যাবে সব ঠিক ক'রে আল্‌নায় ঝুলিয়ে তবে মানসী শুতে গেল। আম আর সন্দেশ এবং খানিকটা খাবার জল সকালে ঠিক ক'রে নিলেই হবে।

যেমন ভেবেছিল, তাই হ'ল। সারারাত চোখে-পাতায় এক করতে পারল না। প্রণব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে লাগল। আর খোকার ঘুম ত খণ্ড প্রলয়েরও বাধা মানে না, সুতরাং সে ঘুমোচ্ছে কি না, সে খোঁজও মানসী নিল না।

ভোরের আলো দেখা দেবার বেশ কিছু আগেই মানসী বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। সুতরাং প্রণবেরও ঘুম ভাঙল। ড্রাইভারও যে উঠেছে তার সাড়া পাওয়া যেতে লাগল নীচ থেকে।

প্রণব পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় ডাকল, "খোকা!"

আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রথম ডাকেই খোকা সাড়া দিল। এ রকম ব্যাপার ত খোকার চোদ্দ বৎসরের জীবনে কখনও ঘটে নি!

মানসী বলল, "ওর বেড়ানর সখটা যে কত প্রবল তা এতেই বোঝা যাচ্ছে।"

প্রণব বলল, "এ বয়সে ইচ্ছা জিনিষটা বড় বেশী প্রবলই থাকে।"

সবাই উঠেছে। মানসী ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ জেলে চা-এর ব্যবস্থা করতে লাগল। চা না খেয়ে কি আর এত ভোরে বেরোনো যায়? চাকর কখন উঠে উনুন ধরাবে তার আশায় ত আর ব'সে থাকা যায় না? খোকা সচরাচর চা খায় না বাড়ীতে, কিন্তু এখন আর তার জন্যে আলাদা ক'রে কি করা যাবে, চাই খাক্।

চায়ের সঙ্গে শুধু বিস্কুট দেখে খোকা নাক সিঁটকে বলল, "শুধু এই বাজে বিস্কুট?"

মানসী বলল, "দেখ একবার! এই সাত সকালে তোমার জন্যে কে পোলাও কালিয়া রাঁধতে বসবে?"

খোকা বলল, "গাড়ীতে উঠলেই আমার ভীষণ ক্ষিদে পাবে কিন্তু।"

মানসী বলল, "বর্দ্ধমানে ত খাবেই?"

খোকা বলল, "ও বাবা, সে ত কত পরে।"

মানসী বলল, "নাও, এখন এই রাক্ষসের জন্যে ভোর রাতে কি ব্যবস্থা করা যায়? এখন ত কোন দোকান খোলে নি, আজেবাজে যা তা খাওয়াও উচিত নয়।"

খোকা বলল, "আম সন্দেশের কিছু ভাগ তাহলে আমাকে দিতে হবে কিন্তু।"

মানসী বলল, "দোহাই বাবা, ওগুলির দিকে নজর দিও না। ওগুলো মেজকাকার বাড়ীতে নিরাপদে পৌঁছতে দাও।"

প্রণব বাধা দিয়ে বলল, "মাসের গোড়ায় ক'টা যেন tinned fruit কিনেছিলাম, সব শেষ হয়ে গেছে?"

খোকা লাফিয়ে উঠল, "হ্যাঁ মা, হ্যাঁ, দেখ না, pineapple-টা বড্ড ভাল ছিল।"

খুঁজে-পেতে একটা টিন বেরোল, তবে pineapple-এর নয়, apricot-এর। মানসীর এ ফলটা ভাল লাগে না, কাজেই এটার কথা সে ভুলে বসেছিল। খোকার মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। পাওয়াই গেল যখন, তখন আনারস একটা পেলেই ত হ'ত?

কিন্তু এদিকে যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। মানসী তাড়াতাড়ি টিফিন বাস্কেটে আম, সন্দেশ, ফলের টিন সব ভ'রে তালা বন্ধ করল। একটা বড় কুঁজোয় খাবার জল নিল। তারপর পাশের ঘরে ছুটল কাপড়চোপড় বদ্‌লে নেবার জন্যে। খোকা আর প্রণবও তৈরি হয়ে নিল যথাসম্ভব হাল্‌কা কাপড়চোপড় প'রে। পথে দারুণ গরম হবার সম্ভাবনা।

ড্রাইভার নীচের থেকে হর্ণ দিচ্ছে। চাকর বাদলও চোখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল, এবং টিফিন-বাস্কেট ও জলের কুঁজো বহন ক'রে নীচে নেমে গেল। মানসীর বিয়ের পর থেকেই বাদল তার বাড়ীতে আছে, ওর বাবাও মানসীর বাপের বাড়ীতে বুড়ো বয়স অবধি কাজ করেছে। বাদল এখন বাড়ীর ছেলের মতই হয়ে গেছে। তাকে রেখে যখন বাড়ীর আর সবাই বেরিয়ে যায়, তখন মানসী ঘরে তালাও বন্ধ করে না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাদলকে নানা রকম উপদেশ দেওয়া চলল খানিক, তারপর মানসী গাড়ীতে গিয়ে বসল।

রাস্তার আলো তখনও জলছে। ফুটপাথ জুড়ে পাড়ার যত হিন্দুস্থানী গোয়ালা আর ধোবা ঘুমোচ্ছে। কেউ বা সবে উঠে ব'সে মাদুর-বালিশ গুছিয়ে তুলছে। দূরের মোড়ের কাছে hosepipe হাতে কর্পোরেশনের উড়িয়া কর্ম্মী দেখা দিয়েছে, যথাকালে স'রে না গেলে গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে চ'লে যাবে।

গাড়ীতে ব'সে প্রচণ্ড একটা হাই তুলে খোকা বলল, "আবার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

মানসী বলল, "বাবাঃ, গেলাম তোমার ঘুম আর ক্ষিদের জালায়! বাড়ীতে থাকলেই ত পারতে। যত খুশি খেতে পারতে, যত খুশি ঘুমোতে পারতে।"

খোকা গাল ফুলিয়ে বলল, "নিজেরা বুড়ো হয়ে গেছ ব'লে ছোটদের ক্ষিদে, ঘুম সব দেখলেই তোমাদের খারাপ লাগে।"

মানসী একটু ধমকের সুরে বলল, "থাক্, আর জ্যাঠামি করতে হবে না।"

প্রণব বলল, "নিজের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স না হ'লে তুমি একেবারেই বুঝতে পারবে না যে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মানুষ একবিন্দুও বুড়ো হয় না।"

কথাটা শুধু খোকাকে বলা নয়, খোকার মাকেও বলা। ছেলে মুখটা হাঁড়িপানা ক'রে রইল। ছেলের মা মুচকে হাসল।

ভোরবেলার আবছা আলো আর স্নিগ্ধ বাতাসের একটা আশ্চর্য্য গুণ আছে। এ সময়ে কলকাতার রাস্তা-ঘাটও যেন ভাল লাগে। দিনের চড়্‌চড়ে রোদে যে জায়গাগুলো নরককুণ্ড ব'লে মনে হয়, তাই যেন তখন স্বপ্ন-পুরীর রূপ ধরে। কলকাতা ছাড়িয়ে গেলে ত কথাই নেই। কলনাদিনী গঙ্গা যেন তাদের সঙ্গে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলছে। গাছপালা,

ঝোপঝাড়ের আড়ালে চ'লে যাচ্ছে, আবার দু'চার মিনিটের মধ্যেই পাশে ছুটে আসছে নাচতে নাচতে। ছোট ছোট গ্রামগুলি এখনও ভাল ক'রে জাগে নি, কদাচিৎ দু'-একটি গ্রামের মেয়েকে দেখা যাচ্ছে কলসী নিয়ে জল আনতে চলেছে। কত রকম বুনো ফুল ঝলমল্ করছে ঘন সবুজের গায়ে, মানসী তাদের নামও জানে না। সুগন্ধও ভেসে আসছে কত রকম। কতক চেনা, কতক অচেনা। মানসী অতি নীচু গলায় আবৃত্তি করল, "নমো নমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।"

খোকার চোখ প্রায় বুজে এসেছিল, হঠাৎ ড্যাবা-ড্যাবা চোখ ক'রে বলল, "কি আবার কবিত্ব সুরু করলে, আঃ।"

মানসা বলল, "আমি ত কবিত্ব করবার জন্যেই বেরিয়েছি, নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার জন্যে ত নয়?"

প্রণব বলল, "আড়াল থেকে যদি কেউ তোমাদের কথা শুধু শোনে ত ভুলেও মনে করবে না যে, তোমরা মা আর ছেলে। চোখে দেখলে অবশ্য সাদৃশ্যটা ধরাই পড়বে।"

খোকা বলল, "তবু যদি মায়ের রংটা পেতাম।"

তার বাবা বলল, "পুরুষ মানুষের আবার ফরসা রং দিয়ে কি হবে রে? এই দেখ না আমি ত কালো, আমার কিসের অভাব আছে?"

খোকা বলল, "ফরসা হ'লেও কোন অভাব থাকত না। ওটা ত একটা ত্রুটি ব'লে ধরে না কেউ?"

মানসী বলল, "যা হোক্ বাক্যবাগীশ হয়েছ তুমি বাছা।"

এরপর রোদটা ক্রমে চড়া হ'তে আরম্ভ করল। চোখের মায়াঅঞ্জনও মুছে গেল। ভাঙ্গা রাস্তা, পানায় ঢাকা পুকুর, ভেঙ্গেপড়া বাড়ী, অতি নোংরা কাপড় পরা, বা কাপড়-না-পরা গ্রামের ছেলেমেয়ে আবার বিশ্রী লাগতে লাগল। প্রণব মাসিকপত্র পড়তে লাগল, খোকা খাবার জন্যে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করল। ফলের টিন খোলা হ'ল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানসীকে গোটা দুইচার সন্দেশ হস্তান্তর করতে হ'ল।

রোদ ক্রমেই বাড়ছে, মানসীর আর ভাল লাগছে না। তার সকাল সকাল স্নান করা, খাওয়া অভ্যাস। স্বামী এবং ছেলে দশটার মধ্যেই খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যায়, সেই-বা একলা ব'সে থেকে কি করবে? সেও খেয়েদেয়ে বই হাতে ক'রে শুয়ে পড়ে। ছুটির দিন অবশ্য একটু-আধটু অনিয়ম হয়ই, তার আর কি উপায়?

গাড়ীটাও তেতে উঠছে, ছাদ ফুঁড়ে গরম নামছে, আবার পায়ের কাছেও যেন গাড়ীর মেঝে ভেদ ক'রে গরম উঠছে। মানসী বলল, "বর্দ্ধমানে গিয়ে আমরা ত চান করব, গাড়ীটাকেও চান করিয়ে নিতে হবে, না হ'লে সারাগায়ে ফোস্কা প'ড়ে যাবে।"

প্রণব বলল, "দু-চার বালতি জল চালের উপর ঢালা যেতে পারে।"

যা হোক্, বর্দ্ধমান এসে পড়ল খানিক পরে। রেল-স্টেশনের পিছনে এসে নামল সবাই। মানসী বলল, "জলের কুঁজো আর খাবারের বাস্কেটটা সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু।"

প্রণব বলল, "থাক্ না গাড়ীতেই, অত লটবহর নিয়ে কি হবে? লছমন্ ত গাড়ীতেই রইল?"

মানসী বলল, "আমি এখানের খাবার-ঘরের জল খাই না। তা ছাড়া বাস্কেটের মধ্যে আমার দই আছে, ভাতের শেষে সেটা না খেলে আমার পেট ভরে না। পান সেজেও এনেছি গোটা কয়েক।"

খোকা বলল, "এই না তুমি খাওয়ার ভাবনা কিছু ভাব না, খালি কবিত্বের কথা ভাব?"

প্রণব বলল, "নামাও তবে বাস্ক প্যাঁটরা। সাধে কি আর বলে 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা'।"

টিফিন বাস্কেট আর জলের কুঁজো নিয়ে মানসী মেয়েদের ওয়েটিং রুমে গিয়ে ঢুকল। ঘরটা খালিই প'ড়ে আছে দেখে আরাম বোধ করল। একপাল মানুষ থাকলে বড় আড়ষ্ট বোধ হয়। আয়া একজন সব সময়েই হাজির থাকে, রেলের যাত্রী নয় ব'লে তাকে মোটা বখ্‌শিশের লোভ দেখিয়ে জিনিষ আগলাতে রেখে মানসী স্নানের ঘরে ঢুকল। তোয়ালে সাবান সঙ্গের ছোট হাতব্যাগেই কোনমতে ঠুসে এনেছে। প্রায় তিন-চার বাল্‌তি জল মাথায়-গায়ে ঢেলে তবে যেন একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আবার চুলটা ঠিক ক'রে বাঁধল। কাপড়ের অবস্থা ভালই আছে, আর বদলাবার দরকার হবে না। দরজার কাছে এসে দেখল, প্রণব আর খোকা প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করছে। মানসীকে দেখে খোকা বলল, "বাবাঃ, কি করছিলে এতক্ষণ! ক্ষিদেয় আমার পেটের নাড়ী হজম হয়ে গেল।"

মানসী বলল, "তোমার জগতে আছে খালি ঘুম আর ক্ষিদে, আমার একটু স্নানটানও করতে হয় ত?"

প্রণব বলল, "আচ্ছা, চল ত এখন রিফ্রেশমেণ্ট রুমে, আমি খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।"

তিনজনে গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল। একটি টেবিল ঘিরে তিনখানি চেয়ার। প্লেট ইত্যাদি সাজানই আছে। তারা এসে বসতেই পরিচারকের দল নুন, মরিচ, পানীয় জল সব এনে গুছিয়ে রাখতে লাগল। ভাত ডালও এসে গেল।

মানসী ডাল তুলে নিতে নিতে বলল, "আর কি আছে?"

প্রণব বলল, "একটা নিরামিষ তরকারি, আর মুর্গীর ঝোল। এখানে আর যা সব রাঁধে তা তোমাদের চলবে না।"

মানসী ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল, "তোমার চলে বুঝি?"

প্রণব বলল, "তা চলেই না যে, এমন কথা বলতে পারি না। এখানে ত সব মা গোঁসাই-এর দল কাজ করে না, আর ভিন্নরুচির লোকের খাবার এদের জোগাতে হয়।"

ডাল ভাত তরকারি সব এল এবং খাওয়াও হয়ে গেল। মুরগীর ঝোলটা আর আসেই না। খোকা ব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। বেশী ক'রে মুরগীটাই খাবে ব'লে সে পেটে জায়গা অনেকটাই রেখে দিয়েছে, অথচ এ অকর্ম্মা-গুলো আসল জিনিসটা আনতেই খালি দেরি করছে।

বর্দ্ধমান স্টেশনে দু'দিক্ দিয়ে গাড়ী কেবল আসছে যাচ্ছে। খাবার ঘরে একটা চেয়ার খালি হ'তে না হ'তে দু'জন ক'রে আহারার্থী মানুষ হাজির হচ্ছে। বেয়ারা-গুলো ছুটোছুটি ক'রে আর যেন পেরে উঠছে না। ব'সে ব'সে এই জনস্রোত দেখতে মানসীর মন্দ লাগছে না।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক ওদের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মানসী তাঁর দিকে তাকাতেই সস্মিতমুখে নমস্কার ক'রে বললেন, "বাঃ, কতকাল পরে আপনাকে আবার দেখলাম! চোদ্দ-পনের বছর হ'ল, না? এদিক দিয়ে কোথায় চলেছেন?"

প্রণব বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল। কই এ ভদ্র-লোককে কখনও ত সে দেখে নি? মানসীর চেনা কেউ নাকি? মানসীর দিকে চেয়ে দেখল, তারও মুখে বিস্ময় ছাড়া আর কোন কিছুর চিহ্ন নেই।

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে আধ মিনিটখানিক সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর একবার মানসীর দিকে ভাল ক'রে তাকালেন, তারপর অত্যন্ত দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

খোকা বলল, "কি ক্যাবলা রে! চেনে না, শোনে না, হঠাৎ এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে লেগে গেল। বাবাও ত ওকে চেনে না।"

প্রণব বলল, "কোন জন্মেও দেখি নি। মানসীও দেখ নি যতদূর মনে হচ্ছে!"

মানসী বলল, "না ত, আমারও চেনা নয়।"

প্রণব বলল, "অন্য কারও সঙ্গে confuse করেছে আর কি।"

খোকা বলল, "মায়ের চেহারাটা যা খোট্টা-মার্কা, দেখলে বাঙালী ব'লে মনেই হয় না।"

প্রণব বলল, "বাঙালী না ভাবলে, বাংলায় কথা বলবে কেন?"

মুরগীর ঝোল এসে পড়ায়, তিনজনে আবার খাওয়ায় মন দিল। মানসীর খেতে তত ভাল লাগছিল না। দু'চার গ্রাস খেয়ে সে কাঁটা-চামচ নামিয়ে রাখল।

প্রণব বলল, "রান্না ভাল হয় নি বুঝি?"

মানসী বলল, "আমাদের বাদল এর চেয়ে ভাল রাঁধে।"

যা হোক্, মানসী না খেলেও খোকা আর প্রণব খেতে ত্রুটি করল না। আর আট-দশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ ক'রে, বিল চুকিয়ে দিয়ে তারা উঠে পড়ল।

রিফ্রেশমেণ্ট রুম থেকে বেরিয়ে প্রণব বলল, "আমি আর খোকা এবার গিয়ে গাড়ী আগলাই, ড্রাইভারটাকে নাইতে খেতে কিছুক্ষণ ছুটি দিতে হবে। এর পর ত দারুণ রোদের ভিতর দিয়ে একটানা ড্রাইভ। ওর খাওয়া হয়ে গেলেই আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।"

মানসী, বলল "আচ্ছা।" প্রণব আর খোকা চ'লে গেল। মানসী ফিরে এল মেয়েদের ওয়েটিং রুমে। যাত্রিনী আর কেউ আসে নি। আয়া টিফিন বাস্কেটের পাশে ব'সে ঢুলছে।

মানসী কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক্ ঢক্ ক'রে খানিকটা জল খেল। দই খাওয়া বা পান খাওয়ার কথা তার যেন মনে পড়ল না। দরজার পরদাটা ফাঁক ক'রে একবার সমস্ত প্ল্যাটফর্ম্মটার উপরে চোখ বুলিয়ে নিল। কই, তাঁকে ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না? বেচারা খেতে ঢুকেছিলেন, হঠাৎ এই অঘটনে খাওয়ার চিন্তা বোধ হয় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

মানসী মিথ্যা কথা বলেছে, না ব'লে উপায় ছিল না। বলছে এঁকে সে চেনে না। প্রথমটা চেনেনি তা ঠিকই তাছাড়া হ্যাঁ চেনে না পরিচিত অর্থে। এঁর নাম জানে না, কার ছেলে, কোথায় বাড়ী, কি করেন কিছুই, জানে না। ইনি যে এতদিন বেঁচে আছেন তাই

কি মানসী জানত ? সহজেই না বেঁচে থাকতে পারতেন। কত বছর হয়ে গেছে, তাঁর কথা মানসীর ক'বার বা মনে পড়েছে ?

কিন্তু বুকের ভিতর থেকে তাঁর ছবি ত মুছে যায় নি ? প্রথম তাকিয়ে সে চিনতে পারে নি, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চিনেছে। সেই ধব্‌ধবে ফরশা রং, চৌকো মুখের কাট, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ চোখ। চুলগুলি খানিক উঠে গেছে ব'লে কপালটা আগের চেয়ে আরও চওড়া দেখায়। গলার স্বর ? হ্যাঁ, তেমনিই আছে, কিছু বদ্‌লায় নি।

প্ল্যাটফর্ম্মে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। একপাল যাত্রী ছুটল সেই দিকে। মানসীর বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ ক'রে উঠল। ঐ ত ! এই ট্রেনেই কোথাও যাবেন বোধ হয়। তাঁর পাশে পাশে আর একজন হাঁটছেন। বন্ধু কেউ হবেন। মানসী আরও ভিতরে ঢুকে গেল, পরদার প্রায় সম্পূর্ণ আড়ালে।

সামনে দিয়ে যেতে যেতে অচেনা ভদ্রলোক বললেন, "না খেয়ে ত চললে, এখন অন্ন জুটবে কতক্ষণে তা কে জানে ?"

চেনা ভদ্রলোক বললেন, "সময়ে নাওয়া-খাওয়ার সুযোগ আমার কবেই বা ছিল ? ও সব সয়ে গেছে। আচ্ছা, আমার ট্রেন এসে গেছে, চলি তবে।"

অন্য ভদ্রলোক তাঁর হাত ধ'রে ঝাঁকিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন। যিনি ট্রেনে যাবেন, তিনি একটা কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মানসী ছুটে গিয়ে তার টিফিন বাক্সেট খুলল। চারটে আম আর গোটা চার-পাঁচ সন্দেশ একটা পরিষ্কার ঝাড়নে বেঁধে আয়াটাকে ঠেলে তুলল। বলল, "এই, দরজার কাছে এস।"

আয়া এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। মানসী তার হাতে খাবারের পুঁটলি দিয়ে বলল, "ঐ যে ভদ্রলোক ট্রেনের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে, ঐ ফরশা লম্বা ভদ্রলোক, তাঁকে এই পুঁটলিটা দিয়ে এস।"

আয়া বলল, "তিনি যদি জানতে চান যে কে দিল ?"

মানসী বলল, "তাঁকে ব'লো, এখনি যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে খাবার ঘরে দেখা হয়েছিল, তিনি দিয়েছেন।"

আয়া চ'লে গেল। মানসী পরদাটা তুলে দেখতে লাগল।

ঐ ফাষ্ট´ বেল্ পড়ল। আয়া দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে তাঁর হাতে পুঁটলিটা তুলে দিল। বিস্মিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করতেই আয়া মানসীর শেখান জবাবই দিল, উপরন্তু আঙুল বাড়িয়ে ওয়েটিং রুমটা দেখিয়ে দিল।

ভদ্রলোক ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকালেন। দেখতেই পেলেন মানসীকে। কিন্তু ট্রেন ন'ড়ে উঠল। ভদ্রলোক ডান হাত শূন্যে তুলে মানসীকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে গাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলেন। ট্রেন ছেড়ে দিল।

মানসী ঘরের ভিতর ফিরে গেল। বুকের কাঁপুনিটা অনেকটা কমে এসেছে, তবু এখনও স্বাভাবিক হয় নি।

কতকাল আগের কথা। মনে হয়, পূর্ব্বজন্মের একটা টুকরো যেন হঠাৎ তার সামনে উড়ে এসে পড়ল। এঁর কথা সে ছাড়া ত আর কেউ এখন জানে না ? তার জীবনের সবখানি যারা এখন জুড়ে আছে, তার স্বামী, তার ছেলে, কেউ এঁকে চেনে না। তার প্রথম যৌবনের দিনে যাদের মধ্যে সে ছিল, তারা কি এঁকে চিনত ? না, তার বাবা ছাড়া এঁর কথা কেউ কোনদিন জানে নি। তিনিও ত আর এখন ইহজগতে নেই। এই ক্ষণিকের অতিথির ছায়া আছে এখন শুধু মানসীর কম্পমান হৃদয়ের মধ্যে। সে ভুলে থেকেছে, কিন্তু ভুলে যায় নি।

২

মানসী তার মা-বাবার একমাত্র কন্যা। ভাই একজন জন্মেছিল, তার জন্মের আট-ন' বছর পরে, সেও বেশীদিন বাঁচে নি। বাবা পূর্ব্ববঙ্গের এক জমিদারের ছেলে, কিন্তু কলকাতাতেই থাকতে ভালবাসতেন। দেশে যেতেন কালেভদ্রে। অন্য ভাইরা দেশেই থাকতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁরা মানসীর বাবাকে কখনও ঠকাতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর যা পাওনা তা তিনি কলকাতায় ব'সেই পেতেন।

মানসী পড়াশুনো খুব ভালবাসত। পড়ায় বেশ ভালও ছিল। যদিও বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, বিয়ে দিতে চাইলে তার তখনই বিয়ে হ'ত, তবুও সে ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজে ঢুকল। দেশ থেকে কাকা, জ্যাঠারা তাড়া দিতে লাগলেন, কিন্তু মানসীর বাবা কোনই উৎসাহ দেখালেন না। এক ত তিনি বাল্যবিবাহ দেখতে পারতেন না, তার উপর একমাত্র সন্তানটিকে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দেবার চিন্তাতেই তিনি যেন মৃতপ্রায় হয়ে যেতেন। মানসী চ'লে গেলে তাঁরা থাকবেন কাকে নিয়ে ? তখন আর সংসার করার কি মানে হবে ?

বালীগঞ্জের একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত পাড়ায় মাঝারি একটা দোতলার ফ্ল্যাটে তাঁরা বাস করতেন। স্বামী, স্ত্রী ও এক কন্যা। ঝি এবং চাকর মিলিয়ে আরও দু'জন। মানসীর বাবার প্রয়োজন ছিল না, তবু তিনি একটা

শখের চাকরি করতেন। দুপুরে ঘণ্টা দুই-তিন একটা প্রাইভেট কলেজে ইংরেজী পড়িয়ে আসতেন। কিছু একটা নিয়ে ত দিন কাটাতে হবে? বাকি সময় বই পড়তেন এবং মানসীকে পড়াতেন। মা ঘরকরণা দেখতেন, ইচ্ছে হ'লে রান্নাঘরে গিয়ে মিষ্টি বানাতেন, বা আত্মীয়স্বজনের বাচ্চাদের জন্যে উল বুনতে বসতেন। মানসী নিজের পড়াশুনো নিয়ে থাকত। বন্ধুবান্ধব খুব বেশী ছিল না, কলেজের বন্ধুরা ছাড়া লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখত তবে সেগুলি কোনদিনই কাউকে দেখাত না। গলা খুব মিষ্টি ছিল, সপ্তাহে একদিন পাড়ার গানের স্কুলে গান শিখতে যেত।

ভোরবেলা ওঠা তার চিরদিনের অভ্যাস। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়েই সে কলেজের পড়া আরম্ভ করত। ঘরে টেবিলের সামনে চেয়ার নিয়ে ব'সে তার পড়বার ব্যবস্থা করা ছিল, কিন্তু ওরকম ক'রে পড়তে তার ভাল লাগত না। বাড়ীর দক্ষিণ দিকে লম্বা টানা বারান্দা ছিল, সেইখানে বই হাতে ক'রে টহল দিতে দিতে সে পড়া করত। ঝির্ ঝির্ ক'রে মিষ্টি হাওয়া দিত, পাখীর ডাকও মাঝে মাঝে কানে আসত। তখন সে পাড়াটা বিরাট শহরের অংশ হয়েও যেন একটুখানি গ্রামধর্মী ছিল। রাস্তার ধারে ধারে কত সুন্দর গাছ ছিল, কত নাম-না-জানা ফুল ফুটত সেগুলিতে। খোলা জমি কত প'ড়েছিল এখানে-ওখানে। ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট খেলত, নয়ত গরু চ'রে বেড়াত।

সামনের সরু রাস্তাটা দিয়ে সকাল থেকেই লোকজন হাঁটত। তবে ট্রামবাসের রাস্তা বেশ খানিকটা দূরে, কাজেই কোলাহল ছিল না কিছু। মাঝে মাঝে সাইকল্ যায়, দু'চারটে রিক্শা যায়, মোটরকার যায় কচিৎ, কদাচিৎ। পাড়ার গুড়গুড়ে বাচ্চার দলও নির্ভয়ে খেলা ক'রে বেড়ায় রাস্তায়।

পড়তে পড়তে যখনই ক্লান্ত লাগে, তখনই মানসী দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে। কত লোক যায়-আসে। অনেকেই চেনা হয়ে গেছে। পাড়ার লোকগুলি ত চেনাই, আবার পাড়ার নয়, এমনও কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ রোজ এই রাস্তা দিয়ে যায়। বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও থাকে। মোটা-সোটা এক ভদ্রলোক রোজ এই দিক দিয়ে সাইকল্ চালিয়ে যান, অফিসেই যান হয়ত। মানসীর দিকে বেশ ভাল ক'রে তাকিয়ে যেতে তাঁর কোন দিন ভুল হ'ত না। আর একটি অত্যন্ত রোগা মেয়ে বিরাট্ ব্যাগ নিয়ে সাড়ে আটটা ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যেত, ফিরত প্রায় সন্ধ্যাবেলা। আর-একজন প্রৌঢ়া বিধবা ছোট দু'টি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে যেতেন। হয়ত স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, মেয়ে দু'টি বইখাতা বহন ক'রে চলত স্কুলের ব্যাগে।

মানসী সুন্দরী মেয়ে, সে স্বভাবতঃই সকলের চোখে পড়ত। তার চোখেও সবাই পড়ত, তবে বেশীর ভাগ পথিক সম্বন্ধেই সে খুব সচেতন ছিল না। মেয়ে যারা যেত তারা চেহারার দিক্ দিয়ে খুব দ্রষ্টব্য কেউ নয়। তবে কে কোন্‌দিন কেমন পোশাক ক'রে যায় সেটা সে লক্ষ্য করত। কে এক শাড়ী দু'দিন পরে, কে প্রতিদিনই শাড়ী বদ্‌লায়, তা মানসীর নজর এড়াত না। সুন্দর দেখতে বাচ্চা নিয়ে কেউ গেলে সে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে প'ড়ে দেখত। পুরুষ পথিকদের দিকে সোজাসুজি বিশেষ তাকাত না।

কিন্তু একজনের দিকে না তাকিয়ে উপায় ছিল না, এতটাই সুদর্শন সে বাঙ্গালী ছেলের পক্ষে। বেশ লম্বা, ছ'ফুটের কাছাকাছি হবে, ধবধবে ফরশা রং, টানা উজ্জ্বল চোখ এবং একমাথা কাল কোঁকড়া চুল। রোজই যায় দ্রুতপদে হেঁটে ট্রামরাস্তার দিকে। হয়ত অফিসে কাজ করে। কলেজের ছেলে হবার পক্ষে বয়সটা বেশী, দেখলে ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের হবে ব'লে মনে হয়। স্কুল মাষ্টার নয়, তা হ'লে কি এত স্মার্ট হ'ত? কোথায় যায় কে জানে? কি কাজে যায়? মানসী নিজের অজ্ঞাতেই যেন তার আসবার সময়টায় বারবার রাস্তার দিকে তাকায়। যুবকটি ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় সর্ব্বদাই একবার চোখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে। এক-একদিন দৃষ্টিবিনিময় হয়ে যায়, এক-একদিন হয়ও না।

মানসী যে তার সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে যাচ্ছিল, তা নয়। কিন্তু তাকে সকালবেলা দেখতে পাওয়াটা যেন ওর কাছে নিত্য প্রয়োজনের জিনিষ হয়ে উঠেছিল। কোনদিন যদি ছেলেটিকে না দেখত, সেদিন মানসীর কাছে দিনটা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। অবশ্য বিরহ-যন্ত্রণা কিছুই সে অনুভব করত না।

কত দিন ধ'রে যুবকটিকে সে দেখছিল তা তার ভাল ক'রে হিসাব ছিল না। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ, বর্ষাকালটা শেষ হ'য়ে আসছে। সামনের বছর সে. বি. এ পরীক্ষা দেবে। অনার্স নিয়ে পড়ছে, তার আশা আছে সে প্রথম পাঁচ-ছ'জনের মধ্যে হ'তে পারবে। কাজেই পড়ার দিকে বেশী ক'রে মন দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে বর্ষা এখনও জানান দিচ্ছে। শিবতলা

দিন মেঘে আকাশ ঢাকা, মাঝে মাঝে খানিকটা ক'রে বৃষ্টি হয়ে রাস্তাঘাট কর্দ্দমাক্ত ক'রে তুলছে। রাস্তায় লোক কম। সেই ছেলেটি যে সময় এখান দিয়ে যায়, সে সময়টা পারই হয়ে গেল। হ'ল কি তার? বৃষ্টি দেখে বেরোয় নি নাকি? কিন্তু বৃষ্টির জন্যে আটকে থাকতে হ'লে ত এ শহরে বছরে ছ'মাস ঘরে ব'সে থাকতে হয়।

খবরের কাগজ হাতে ক'রে মানসীর বাবা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। মানসীর দিকে তাকিয়ে বললেন "বৃষ্টির ছাটের মধ্যে কেন ঘুরছ? কাপড়-চোপড় ভিজে যাবে, সর্দ্দি লাগবে।"

মানসী বলল, "না বাবা, কিছু হবে না। ঘরের মধ্যে আমার পড়া একেবারে হয় না। আকাশ দেখতে না পেলে আমি অস্থির হয়ে যাই।"

তার বাবা বললেন, "আকাশ আর কই যে, আকাশ দেখবে? একেবারে মেঘে ঢাকা। এমনি আকাশেও মেঘ, আমাদের ভাগ্যাকাশেও মেঘ।"

মানসী বলল "কেন বাবা?"

তার বাবা বললেন, "দেখছ না দেশে কি নিদারুণ অশান্তি, কি নির্ম্মম অত্যাচার? আসলে ত এটা রাষ্ট্র-বিপ্লবই হচ্ছে, কিন্তু খবর বাইরে বেরোতে দিচ্ছে কই?"

মানসী একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল, "আমরা সাধারণ লোকেরা কিন্তু কিছুই করছি না দেশের জন্যে।"

তার বাবা বললেন, "আমি,-তুমি কিছু করছি না বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে করছে বৈ কি? মেদিনীপুরের খবর পড় ত মাঝে মাঝে? তুমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হ'লে হয়ত বেরিয়ে পড়তে। আকাশ দেখতে হয়ত অনেকদিন পেতে না।"

তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। বৃষ্টিটা চেপে আসাতে মানসীকেও বারান্দা ত্যাগ করতে হ'ল।

তার পর দুটো দিন এইরকম মেঘলা চলল। মানসী এ দু'দিনও উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল, কিন্তু যাকে দেখতে চায় তাকে দেখতে পেল না। সে কি চ'লে গেছে কলকাতা ছেড়ে?

তিন দিনের দিন মেঘটা কেটে গিয়ে রোদ উঠল। তবুও পথিকের দেখা নেই। মানসীর মনে একটা অশান্তি ক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

তাদের ফ্ল্যাটে দু'খানা শোবার ঘর, একটা খাবার ঘর, একটা বসবার ঘর। রান্নাঘর, চাকরদের ঘর ছাদের উপর। মানসীর ঘরে সে একলাই শোয়, বারো তেরো বছর থেকে সে এই অভ্যাসই করেছে। পাশের ঘরে বাবা-মা থাকেন। মানসীর বাথরুমও আলাদা। ফ্ল্যাটের তিন্‌দিক্ ঘিরে টানা বারান্দা, বাকি দিক্‌টায় নীচে নামবারা সিঁড়ি।

সেদিন শুতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু এসে ব'সে গল্প ক'রে বেশ রাত ক'রে দিলেন। শুতে গিয়েও প্রথম ঘুম এল না। শোবার ঠিক আগেই বেশী কথাবার্ত্তা বললে মানসীর ঘুম হ'তে দেরিই হয়। বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও পাশ করতে করতে, কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে ঠিক জানে না, হঠাৎ কি একটা শব্দে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। কে যেন মৃদুভাবে বাথরুমের দরজায় টোকা দিচ্ছে। ভয়ে মানসীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। এ আবার কি? তার কল্পনা নয় ত?

কিন্তু না। ঐ ত আবার শব্দ। মানসী এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাবাকে ডাকবে না কি? না, নিজে একটু সাহস ক'রে খোঁজ ক'রে দেখবে? সে বাথরুমে গিয়ে আলোটা জ্বালল।

বাইরের থেকে অস্ফুটস্বরে কে বলল, "দরজাটা দয়া ক'রে খুলে দিন। নিতান্ত প্রাণের দায়ে এ অনুরোধ করছি।"

বাথরুমের বাইরে বেরোবার দরজাটায় মানসী তালা বন্ধ ক'রে দেয় শোবার আগে। কিন্তু দরজার পাশে একটা ছোট জান্‌লা আছে। মানসী তখন ভয়ে কাঁপছে কিন্তু জান্‌লা খুলে তাকে দেখতেই হ'ল।

কে যেন তার বুকের ভিতর আগেই আগন্তুকের পরিচয় ব'লে দিল। সেই ত! ওকে আলো বা আঁধারে কোথাও চিনতে ভুল হবে না মানসীর।

সেও গলা যথাসম্ভব নীচু ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে?"

যুবক বলল, "শাসকদের আইন অনুসারে আমি কঠিন দণ্ড পাবার যোগ্য! চরম দণ্ডও হ'তে পারে। তবু চেষ্টা করছি প্রাণ বাঁচাবার। একটুক্ষণ যদি আমাকে লুকিয়ে থাকতে দেন। পুলিস এ রাস্তা থেকে স'রে গেলেই আমি চ'লে যাব।"

মানসী কম্পিত হাতে দরজা খুলে দিল। যুবক ভিতরে ঢুকে বলল, "আলোটা নিভিয়ে দিন, বাইরের থেকে দেখা যেতে পারে।"

মানসী তখন যেন কলের পুতুল হয়ে গেছে। সে আবার তালা বন্ধ করল, বাতি নিভিয়ে দিল। যুবককে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় রাস্তায় একটা কোলাহল শোনা গেল, এবং তাদের সদর দরজায় ঘা পড়ল। প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে মানসী

মুহূর্ত্তকাল কি যেন ভাবল। কোণের দিকে একটা বড় চৌকির উপরে একরাশ বাড়তি তোশক, লেপ গাদা করা ছিল। উপর থেকে গোটা দুই লেপ তুলে নিয়ে মানসী বলল, "ঐখানে শুয়ে পড়ুন, আমি আল্গা ক'রে চাপা দিয়ে দিচ্ছি।" যুবক কথা না ব'লে তৎক্ষণাৎ লেপ-তোশকের গাদায় ঢুকে গেল, মানসী একটা লেপ পাট ক'রে হাল্কা ভাবে গাদার উপর বিছিয়ে রাখল।

তার বাবা-মা ততক্ষণে উঠে পড়েছেন, চাকর ছাদের ঘর থেকে নেমে এসেছে। সদর দরজা খোলা হয়েছে, কথা বলতে বলতে উপরে উঠে আসছে তিন-চারজন লোক। মানসী নিজের খাটের উপর একেবারে যেন অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে।

তারই দরজার কাছে এসে সবাই দাঁড়াল। ইয়ুনিফর্ম্ম-পরা একজন বলল, "এই দিক্ দিয়ে দৌড়ে যেতে তাকে দেখা গেছে। এই তিন-চারটা বাড়ীর কোনটাতে সে লুকিয়েছে। সোজা পালাতে পারে না, রাস্তার ওদিকের মাথায়ও আমাদের লোক আছে। একবার ঘুরে দেখতে চাই। এই বাড়ীতে ওঠা সহজ, চারিদিকে প্রায় বারান্দা।"

মানসীর বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, "দেখুন যা দেখতে চান।" মেয়ের নাম ধ'রে ডাকলেন, "মানু, মানু!"

মানসী কোনমতে উঠে ব'সে বলল, "কি বাবা?"

তার বাবা বললেন, "ভয় পেয়ো না, আমরা সকলেই এখানে রয়েছি। দরজাটা খোল একটু।"

মানসী প্রায় অসাড়-হাতে দরজা খুলে দিল। দিয়ে লেপ-তোশকের গাদার উপর একেবারে এলিয়ে পড়ল।

পুলিস অফিসার ঘরে ঢুকে, টর্চ্চ ফেলে এদিক্-ওদিক্ ও খাটের তলা দেখলেন। মূর্চ্ছিত-প্রায় সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, নিতান্ত কর্ত্তব্যের দায়ে আসা। চলুন, আপনাদের অন্য ঘরদুটো দেখে যাই। পাশের ঘরটা কি বাথরুম?"

মানসীর বাবা বললেন, "হ্যাঁ। তবে সন্ধ্যা হ'লেই ভিতর থেকে চাবি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। চাবি আমার কাছেই থাকে।"

কথা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন অন্য শোবার ঘরটার দিকে। মিনিট পাঁচ-সাত পরেই কথা বলতে বলতেই তাঁরা নেমে গেলেন। মানসী বারান্দায় বেরিয়ে এল। কোন্‌দিকে যাবে এরা এরপর?

তাঁরা অগ্রসর হয়েই চললেন। এ রাস্তার আলোগুলি দুটো যদি জ্বলে ত তিনটে নেভান থাকে। খানিকদূর এগিয়ে যাবার পর পুলিসের দল ছায়া হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মানসীর বাবা সদর দরজা বন্ধ ক'রে উপরে উঠে এলেন। মানসীকে বললেন, "যাও মা শোও গিয়ে। বেশী ভয় করছে কি?"

মানসীর তখন ভয়কে মারা মার খাওয়া হয়ে গেছে। স্থির গলায় বলল, "না বাবা।" ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। তার বাবার ঘরের দরজাও বন্ধ হ'ল।

লেপের গাদার কাছে এসে মানসী বলল, "এবার মুখ বার করতে পারেন।"

যুবক মুখ বার করল। তার প্রশস্ত গৌর কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। ফিস্ ফিস্ ক'রে প্রশ্ন করল, "ওরা কোন্‌দিকে গেল?"

মানসী বলল, "এগিয়ে চ'লে গেল পূবদিকের মোড়ের দিকে। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। মা-বাবা খুব শীগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়বেন, তারপর সদর দরজা খুলে দেব।"

পাঁচ মিনিটের বদলে দশ মিনিট অপেক্ষা করল তারা। তারপর মানসী দরজা খুলল। সব ঘর অন্ধকার, রাস্তার থেকে সামান্য একটু আলো আসে।

অতি সাবধানে তারা নেমে চলল। সদর দরজা খুলতেই মানসী উপরে আর একটা দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। যুবককে বলল, "শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ুন, বাবা বোধ হয় উঠে পড়েছেন।"

যুবক তার দিকে তাকাল। বলল, "আমি ভুলব না, এ রাতটা আমার মনে থাকবে।" সে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মানসী দরজা আর ছিট্‌কিনি বন্ধ ক'রে ফিরে দাঁড়াতেই দেখল তার বাবা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

মানসী অকম্পিত পায়ে উঠে এসে বাবার সামনে দাঁড়াল। তিনি বললেন, "একে কি তুমি আগে চিনতে?"

মানসী বলল, "না বাবা, তবে বহুদিন থেকে এই রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখেছি। উনি কে?"

"বিপ্লবী বোধ হচ্ছে। গুরুতর কোন ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। ওকে সাহায্য ক'রে ভালই করেছ।"

মানসী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার বাবা বললেন, "কিন্তু দেখ মা, একথা শুধু তুমি জানলে আর আমি জানলাম। আর কারও কাছে যেন কোনমতে প্রকাশ

না পায়। মা'কেও জানিও না। বাইরের জগতে একথা ছড়ালে, শুধু যতটা ঘটেছে, তাই রটবে না, অনেক বেশী রটবে। তাতে তোমার খুব ক্ষতি হ'তে পারে। যাও, শোও গিয়ে।"

মানসী চ'লে গেল শুতে, অবশ্য ঘুমোতে নয়। সকাল হ'ল আবার, কিন্তু তারপর অনেক দিন আর মানসী বারান্দায় পড়তে গেল না।

পরীক্ষা দিল, অবশ্য তাতে আশানুরূপ ফল হ'ল না। তার বাবা পরীক্ষার পর তার শরীর সারাবার জন্যে অনেক দেশ বেড়িয়ে নিয়ে এলেন।

মানসীর জীবনস্রোতে সেই রাত বড় একটা আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তরঙ্গগুলি মিলিয়ে এল। তারপর এল প্রণব। মানসী নিজের পূর্ব্ব জীবনকে হারিয়েই ফেলল যেন।

—•—
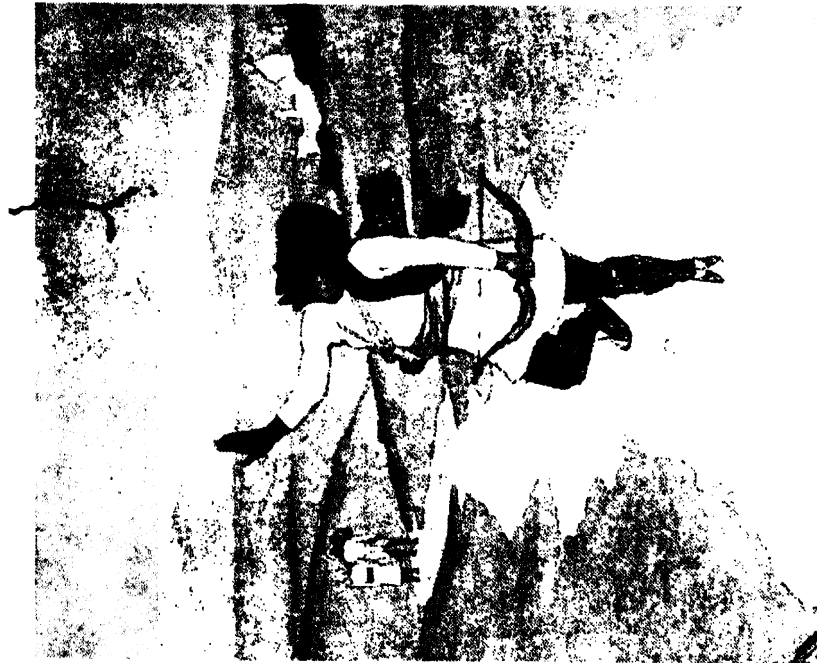
ক্ষীণদৃষ্টি চৌদ্দ বৎসর আগে ছোঁড়া তীর হাজার মাইল উপর
হইতে পড়িতে দেখিতেছে।

'হিন্দুস্থানী উপকথা'র চিত্রায়ণ,—শিল্পী, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

নাপিত আরসোলার ঠ্যাং ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—
'আমি কিছু পেয়েছি গো।'

শ্রীমতী শান্তা দেবীর সৌজন্যে

চাষার প্রপিতামহ গ্রাম মাথায় করিয়া পৃথিবীময় বৃষ্টি
ধরিয়া বেড়াইতেছেন।
'হিন্দুস্থানী উপকথা'র চিত্রায়ণ—শিল্পী, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

কম-আক্কেলকে হুঁশিয়ার খাঁ বলিতেছেন, "তিন হাজার টাকায়
তিনটি কথা বিক্রি করব।"
—শ্রীমতী শান্তা দেবীর সৌজন্যে।

সোবিয়েত সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পালাম এয়ারপোর্টের ৩,৪ দফা হার্ডল্‌ পার হয়ে লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি ইলুসিয়ানের জন্য : চা খাচ্ছি, গল্প করছি। সহযাত্রীরা সিগারেট টানছেন—এখনি ফেলে দিতে হবে···। এমন সময় মাইকে আওয়াজ দিল, তাস্‌কন্দ যাত্রীরা প্রস্তুত হন—ইলুসিয়ান ছাড়বে।··· অনেকখানি দূরে প্লেন। ছেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে খোঁয়াড়ে ঢুকবার আগেই ; পিছন ফিরে দেখি সে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। জানি নে তার মনে কি হচ্ছে —বুড়ো বাবা সত্তর বৎসর পেরিয়ে বিদেশে চলেছেন।

পক্ষকাল পূর্বের কথা।—কলকাতায় এসেছি। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় এসেছি। বিশেষ কোন কাজ নিয়ে যে কলকাতায় আসা, তা নয়। স্বখাদ রুটিন-বাঁধা কাজ থেকে মুক্তি—খানিকটা বিশ্রামের জন্য আছি।

সেদিন সন্ধ্যায় ষ্টার থিয়েটারে যাবার কথা—দেবনারায়ণ গুপ্ত ফোনে নিমন্ত্রণ করেছে 'শেষাগ্নি' দেখবার জন্য। কিন্তু কারা যেন এলেন—প্রুফও কিছু এল ; তাই সন্ধ্যাটা ঘরেই কাটল। কাজ করছি, পাশের ঘর থেকে নাতনী বলল, 'দাদাই, তোমার নামে ট্রাঙ্ক কল আসছে, ডাকছে'। রিসিভার তুলে হ্যালো করতেই ওদিক্‌ থেকে বড়ছেলের গলা শোনা গেল—শান্তিনিকেতন থেকে ফোন করছে। বলছে,—"একটু আগে দিল্লী বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে টেলিগ্রাম এসেছে : যা লিখেছেন তা আমি প'ড়ে দিচ্ছি—

"In connection with Tagore Celebrations, Soviet Government invited scholars for two weeks to visit U.S.S.R. from first October. All expenses will be shared by Indian and Soviet Governments. Propose nominate you. Intimate immediately telegraphically if willing. Kichlu Dept. Search."

সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করছে, "কি উত্তর দেব।" আমি বললাম, আমি ত কালই বোলপুরে ফিরছি, ফিরে গিয়ে কথাবার্তা হবে। এদিকে বার্তা শুনে ছেলে বউমা নাতি নাতনীরা খুব উৎফুল্ল। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিনে।

ইতিপূর্বে সোবিয়েত থেকে প্রাচ্যবিদ্যার কন্‌গ্রেসে উপস্থিত হবার জন্য দু'বার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, গা করি নি। দ্বিতীয়বার রেজিষ্টারী চিঠি আসে। তখন জানিয়ে দিই, ওরিয়েণ্টালিস্ট বলতে যা বোঝায়, আমি তা নই। তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যদি কখনও আলাপ-আলোচনা হয়, যেতে পারি। ব্যস্‌। তার পর বৎসরকাল কেটে গেছে। ১৯৬১ সালে মার্চ মাসের শেষে দিল্লীতে যে শান্তি বৈঠক বসে, তার রবীন্দ্র শাখায় উপস্থিত হবার জন্য গিয়েছিলাম। তখন রুশীয় ও মধ্য এশিয়ার নানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। ট্রাভাংকোর হাউসে সোবিয়েত দেশের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চিত্রাদির প্রদর্শনী, ব্যবস্থা করেছেন ভারত-সোবিয়েত সভা। আয়োজনকর্তা রুশী ভদ্রলোক, নাম সেরিব্রেকোভ। এঁর সঙ্গে মস্কোতে পরে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হয়। সেদিনকার সভায় বাণারসীদাস চতুর্বেদী সভাপতি ছিলেন ; ইনি ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য। সভায় গিয়ে দেখি, আমাকে অনেকেই চেনেন নামে, বোধ হয় আমার বই থেকে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সোবিয়েত রুশ কি বিরাট্‌ আয়োজন করেছে দেখে ত অবাক্‌। একদিন সোবিয়েত দূতাবাসে সন্ধ্যাপার্টিতে যোগ দিই—বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। মধ্য এশিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

তার পর গত নভেম্বর মাসে নয়া দিল্লীতে আবার যেতে হয়—রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সভার জন্য ; রবীন্দ্র পুরস্কার সেবার প্রদত্ত হয়। সেবার নোবিকোভা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হয়। নোবিকোভা ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনে আসেন, আমার সঙ্গে বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিলেন। বেশ বাংলা বলেন। তার পর ভারতে আসেন চেলিসফ ; ইনি মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যার প্রধান। শান্তিনিকেতনের এক সভায় তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্র মেডাল পেয়েছিলাম। ফিরে যাবার পথে আমার সঙ্গে বাড়ীতে এসে দেখা ক'রে যান। এই সব কথা ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই স্থির করতে পারছি নে কি করব। এ বয়সে অত দূর পাড়ি দেব ?

ইতিপূর্বেও চীন থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল ১৯৬১

সালে ৭ই মে, কবির জন্ম শতবার্ষিকীতে উপস্থিত হবার জন্য। কিন্তু সময় এত কম ছিল এবং পূর্বাহ্নে এত জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এবং গ্রহণ করেছিলাম যে, সে-সব ফেলে পিকিং যাত্রা করা সম্ভব হ'ল না। তাঁদের লিখেছিলাম এত অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু কলকাতার বন্ধুমহল থেকে কেউ কেউ বলেছিলেন, 'চলে যান মশায়।' কলকাতার চীনা কন্সলেটে ফোন করি—তারা কিছু জানত না এবং যা বললাম তার এক বর্ণও বুঝল না। যাওয়া মুলতবী হ'ল। তাঁদের লিখে দিলাম, ভবিষ্যতে যদি কখনো সুযোগ হয় আসব। কিন্তু আজ দেখছি সে সুযোগ সুদূর-পরাহত।

পঁচিশে বৈশাখের উৎসবের দিন রাত্রে কলকাতা থেকে বোলপুর আসছি—স্পেশাল'গাড়ী দিয়েছিল উৎসব যাত্রীদের জন্য। হাওড়া ষ্টেশনে দেখি—হুমায়ুন কবীর—সেই গাড়ীতেই বোলপুরে আসছেন। তাঁকে চীনের টেলিগ্রামের ব্যাপারটা বললাম। পরদিন উত্তরায়ণে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নেহরুর সঙ্গে দেখা। চীনের কাথাটা তাঁকেও বললাম এবং আমি যে জবাব দিয়েছি, তাও জানালাম। তিনি বললেন, "ভালই করেছেন; They are so casual." হুমায়ুন বললেন—"ভবিষ্যতে আমরাই ব্যবস্থা ক'রে পাঠাব। অন্যের নিমন্ত্রণে, অন্যের অর্থ নিয়ে যাওয়াটা আমরা বন্ধ করছি।"

চীন থেকে আর কোন খবর পাই নি, তবে তারা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর চীনা অনুবাদ দশ খণ্ড পাঠিয়েছিল। চীনের সঙ্গে আমার যোগ ছিল একদিন। তবে সে এ চীন নয়। শাশ্বত চীনকে জানতাম। কুংফুৎসু, লাওৎসু, বুদ্ধ, মেংৎসু (Mencius), হুন্‌ৎসু (Huntzu-র) চীনকে জানতাম। বিশেষ ক'রে জেনেছিলাম সেই চীনকে, বুদ্ধের বাণীকে যে বরণ ক'রে নিয়েছিল। আজ তাদের জীবনে বোধিচিত্ত নির্বাপিত, তার স্থান নিয়েছে 'মার'।

গত বৎসর আরেকবার ভারত সরকার নিউজীল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া সফরের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান। কিন্তু সেবারও কি একটা অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এইভাবে তিন-চার বার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ গ্রহণ করি নি। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করার কারণ বোধ হয় দৈহিক অস্বাস্থ্য, মনের দুর্বলতাপ্রসূত ভীতি। সেটা কেটে গিয়েছে ব'লেই বোধ হয় এবার রাজী হলাম—টেলিগ্রাম করলাম যাব ব'লে।

তার পর সুরু হ'ল দিল্লী দপ্তরের সঙ্গে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ইত্যাদির পালা। কথা ছিল, পয়লা অক্টোবর যাত্রার দিন, সেটা প্রথমে বদ্‌লে হ'ল ৫ই, তার পর সর্বশেষে টেলিগ্রামে জানা গেল যে ৯ই অক্টোবর যাত্রা নিশ্চিত। এদিকে আমি ত কিছুই জানি নে কি করতে হবে। দিল্লী থেকে লিখলেন—হেল্‌থ্ সার্টিফিকেট চাই। আমি কলকাতায় ফিরে এসে হদিস করবার চেষ্টা করছি। সাহিত্যিক বন্ধু যাঁরা আগে গিয়েছেন—তাঁরা ফোনে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু কি কি করণীয় এবং কি ভাবে কোন্‌টা সফল করা যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ করতে ভুলে গেলেন। হেল্‌থ্ অফিস কাছে, সুকিয়া ষ্ট্রীটে, সেখানে টীকা দেওয়া হয়। দিল্লীর পত্রে লিখেছেন, টীকার সার্টিফিকেট দরকার। ভাবলাম, এঁরা ফুঁড়লেই হবে। গেলাম সেখানে, একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল; দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করাতে দু'টি ছেলে বের হয়ে এসে বলল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে, তিনটার সময় আসবেন। আবার তিনটার সময় গেলাম। তাঁরা বৃত্তান্ত শুনে বললেন, এখানে ত হবে না; আপনি শ্যামবাজারে কর্পোরেশনের হেল্‌থ্ অফিসে যান। সৌভাগ্যের বিষয় এই অফিসের একটি ভদ্রলোক সঙ্গে যেতে রাজী হলেন; সময় কম, চারটে বেজে গেছে, অফিসের ঝাঁপ একটু পরেই পড়বে—ছোট্, ছোট্—।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছে দেখি, ডিরেক্টর নেই, এবং তাঁর কাজ করতে পারেন এমন বিকল্প লোকও নেই। অফিসের একজন বাবু বললেন, আপনাকে সেক্রেটারিয়েটে যেতে হবে, International Health Certificate সেখান থেকে ইস্যু হয়। আমি বললাম, ফোনে একটু খোঁজ নিতে পারি কি? উত্তরে শুনলাম, এখানে পাবলিককে ফোন করতে দেওয়া হয় না;—নিয়ম—নেই।

'চল আইন মতে!' বের হলাম। সেক্রেটারিয়েটে পৌঁছলাম। কোথায় হেল্‌থ্ ডিপার্টমেন্ট! চিনতাম ত শিক্ষা বিভাগ। যাই হোক্, দোতলায় উঠে খোঁজ করাতে একজন ভদ্রলোক একটি বেয়ারাকে দয়া ক'রে সঙ্গে দিলেন স্বাস্থ্যদপ্তরে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য। তার পর ঘরের পর ঘর পেরিয়ে, টেবিলের ধাক্কা বাঁচিয়ে কেরাণী-রাজ্যের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আর এক প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে ডিরেক্টর খুব সজ্জন, অল্প সময়ের মধ্যে ফুঁড়েফাঁড়ে সার্টিফিকেট করিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে আমি বোলপুর ম্যুনিসিপালিটি থেকে ও বিশ্বভারতী থেকে সার্টিফিকেট আনিয়ে নিয়েছিলাম। সে সব কাজে লাগল না—এঁদের লোক ফুঁড়বে, তবেই তা গ্রাহ্য হবে।

একটা হার্ড্‌ল্ পার হওয়া গেল। তার পর পাসপোর্ট।

দিল্লী থেকে যদি পরিষ্কার ক'রে লিখতেন যে, তাঁরাই পাসপোর্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা করছেন—তা হ'লে অনেক হাঙ্গামা থেকে বাঁচতাম। পাসপোর্ট অফিসে গেলাম। সময়ের আগে অর্থাৎ দশটায় গিয়েছি ব'লে গেটের কাছে দরোয়ানের টুলে ব'সে থাকতে হ'ল। তার পর উপরে গিয়ে বেঞ্চে বসা গেল। সেখানে একটি বালিকা ব'সে; তিনি কাগজপত্র সই করিয়ে প্রধানের কাছে পাঠাচ্ছেন। দেখা করলাম, তিনি বললেন—দিল্লী থেকে ত কোন খবর তাঁরা পান নি; যাই হোক্, তিনি টেলিগ্রাম করছেন। ভদ্রলোক তখনই স্টেনোকে ডেকে ডিক্টেট্ করলেন—আমার কাছে যে টেলিগ্রাম এসেছিল সেটাও উদ্ধৃত করলেন। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ইতিমধ্যে সোবিয়েত এমবেসিতে যাই—তাঁরা কিছু জানেন না। তবে কিছু বই দিয়ে বললেন—গরম কাপড় চোপড় ভাল ক'রে নেবেন। একটা ওয়াটার প্রুফ চাই এবং ছাতা থাকলেও ভাল।

দিল্লী থেকে খবর এল, পাসপোর্ট প্রভৃতি দিল্লী থেকেই হবে—অবিলম্বে ফটো তিনকপি যেন পাঠান হয় এবং International Health Certificate সেই সঙ্গে দরকার। চল ফটোর দোকানে, বস আলোর মুখে, তোল ফটো। পরদিন সন্ধ্যার মুখে ফটো পাওয়া গেল—পাঠাতে হবে দিল্লী। ডাকঘর ত এখন বন্ধ। হ্যাঁ, এখন ত শ্যামবাজারের ডাকঘর খোলা—রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ভাগ্যে সেজছেলের কনিষ্ঠ শ্যালক উপস্থিত ছিল। সে তদ্বিরী ছেলে। তাকে টাকা দিলাম, রেজিষ্টারী চিঠি পাঠাবার জন্য। আমার আকৃতি ও প্রকৃতি অর্থাৎ আমার ফটো ও হেলথের খবর দিল্লী দপ্তরে চ'লে গেল। এটা না হ'লে উড়োজাহাজে উঠতেই দেবে না। দুই নম্বর হার্ডল্ পেরনো গেল। এবার ট্রেনের ব্যবস্থা। পূজার মুখে হাজার হাজার লোক চলছে পশ্চিমে—কেউ ছুটিতে যাচ্ছে বাড়ী, কেউ বেরিয়েছে বেড়াতে। কিছুকাল থেকে বাঙালী দেশভ্রমণে যাচ্ছে—আগে তাদের পিতৃপিতামহরা যেতেন তীর্থদর্শনে।

পূজোর মরশুম! ট্রেনে টিকিট পাওয়া যে যাচ্ছে না। রাত থাকতে উঠে সার দিয়ে দাঁড়াতে হয়—শেষ পর্যন্ত অনেককেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় সেদিনের মত। দশদিন আগে টিকিট সংগ্রহ না করলে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। কত লোককে, কত ছোট বড় মাঝারি কর্মচারীর কাছে অবস্থাটা জানালাম। একজন বললেন, তাঁর এক আত্মীয়কে টিকিট নেবার লাইনে কে একজন হাত কামড়ে দিয়েছিল। সংবাদটা কাগজেও বের হয়েছিল। দিল্লীতে লিখলাম—ট্রেনে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, কি করব। টেলিগ্রাম এল, না পাওয়া গেলে প্লেনে আসুন। ইতিমধ্যে টিকিটের চেষ্টা চলছে। একজন আশ্বাস দিলেন, তাঁদের জানাশুনা লোক আছে, ব্যবস্থা হবে। বুঝলাম, সদর দরজা ছাড়া খিড়কির দরজা আছে। শুনেছি, অনেক বড় বড় কাজকর্ম খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে হাঁসিল ক'রে আনা যায়। তগ্‌দির ও তদ্‌বির ছাড়া কাজ হয় না। অদৃষ্টে যদি থাকে তবে হয়, আর সুপারিশ করার লোক যদি উপরতলায় থাকে, তবে কাজ হাঁসিল হয়। এত হাঙ্গামা হ'ত না, যদি সরকার থেকে একটা কোটা (Quota) বাঁধা থাকত—আমাদের মত আনাড়ীদের হয়রানি কম হ'ত। মানসিক উদ্বেগের জন্য যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি।

অবশেষে ৫ই অক্টোবর যাওয়া স্থির হ'ল। বিকালে দিল্লী মেল-এর একটা স্পেশাল দিয়েছে—তাতে আসন পাওয়া গেল। মজার কথা, হাওড়ায় এসে দেখি, আমাদের কামরায় একটা সিট খালি প'ড়ে আছে। অথচ স্থান নেই শুনছি রোজ। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম—৮ই রবিবার ছুটি; অতএব একটা ঠিকানায় যেন পৌঁছে খবর দিই। ৮ই কেন, ৭ইও ছুটি দশহরার উৎসব—সেটার খেয়াল ছিল না বোধ হয়; দিল্লীতে গিয়ে টের পেলাম। বৃহৎ কর্মে দুই-একটা ভুল হয়! তা না হ'লে পয়লা থেকে ৫ই, ৫ই থেকে ৯ই দিন পরিবর্তন হবে কেন?

৫ই অক্টোবর, ১৯৬২।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। বিদেশে যাচ্ছি, সকলেই এলেন বিদায় দিতে। পুত্র পুত্রবধূদের উৎসাহ বেশী, বাবা সোবিয়েত দেশে যাচ্ছেন—তারা গর্বিত। কিন্তু ঘরের লোকটির মুখে হাসি নেই; এরোপ্লেনে ত দুর্ঘটনা লেগেই আছে—যদি—। যাওয়ার কথাবার্তা যখন চলছে তখন মৃদু আপত্তি ক'রে বলেছিলেন—সত্তর বৎসর বয়সে অতদূর যাওয়া···। কিছুকাল থেকে আমি যেখানে যাই তিনি সঙ্গে যান। কিন্তু এবার তা হবে না। আমি কলকাতা থেকে একবার লিখেছিলাম, "কত লোক ত আসছে-যাচ্ছে কোন দুর্ঘটনা ত এ লাইনে হয় নি; তা ছাড়া রুশ পাইলটরা খুব হুঁশিয়ার ব'লে শুনেছি। তবে যদি কিছু ঘটে ত আর দেখা হবে না, তখন বেয়াল্লিশ বৎসরের স্মৃতি বহন ক'রো···" মোট কথা, আমার মনে এতটুকু সংশয় বা উদ্বেগ হয় নি।

স্টেশনে এসে দেখি ট্রেনে রিজার্ভেশন হয়েছে। আমার শোবার জায়গা উপরে দিয়েছে। এ বয়সে প্যারালাল বারের মত ক'রে অথবা আরও অঙ্গভঙ্গি ক'রে হাঁচড়ে-মাচড়ে বাংকে চড়া আমার সাধ্য নয়। একজন ভদ্রলোক

কানপুর যাচ্ছেন, তিনি বললেন, "আমি উপরে যাব, আপনি নিচেই থাকুন।" প্রথমে মনে হয়েছিল, লোকটি বাঙালী, পোশাক-পরিচ্ছদ বাঙালীর মত, কথাবার্ত্তায় বোঝা যায় না যে, তিনি মাড়োয়ারী। বললেন, তিন পুরুষ হয়ে গেল কলকাতায়। ঘর-বাড়ী এখানেই। সঙ্গে বাংলা 'দেশ' পত্রিকা ও হিন্দী ফিল্মের পত্রিকাও। রঙের ব্যবসায়ী; ব্যবসা উপলক্ষ্যে কানপুর যাচ্ছেন। আমার পাশের জনটি পাঞ্জাবী, কলকাতায় ক্যাবিনেটের দোকান আছে। ব্যবসায়ে উন্নতি করেছেন। তবে ব'লে ফেললেন, ধনী একশ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন—তাঁদের নিয়েই মুশ্‌কিল। আসেন মোটরে ক'রে, নিয়ে যান নূতন বাড়ীতে—তার জন্য ফার্ণিচার চাই। বড় বড় কথা। কাজ ত করলাম, তারপর টাকা নিয়ে হ'ল হাঙ্গামা। প্রথমে ঠিকমত হয় নি ব'লে ছুতো, তারপর পাঁচ হাজারের জায়গায় এক হাজার দিলেন, বললেন, পিছে হবে। কি হয়রানি! আমি এখন ঐ জাতের সঙ্গে কারবার বন্ধ ক'রে দেব ভাবছি। কিন্তু কি করব, তারাই ত কলকাতার বার-আনির মালিক। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এক কাঠা জমি কিনতে তাদের বাধে না। বাঙালী কোথায়! ইত্যাদি।

বর্দ্ধমানে পৌঁছলাম সন্ধ্যার পর। স্টেশনে দেখি, বড়ছেলে, বউমা, নাতি ও আরও অনেকে উপস্থিত। সুমন্ত্র চুপচাপ থাকে। সে বলে, দাদাই বাড়ী থাকলে বাড়ী গম্‌গম্‌ করে, আর দাদাই না থাকলে বাড়ী ছম্‌ছম্‌ করে।

গাড়ী ছেড়ে দিল। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা ধুলো আর শব্দ, কয়লার গুঁড়ো আর ঝাঁকানি। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে এ রকম ঝাঁকানি হয় জানতাম না। আমি হেসে সহযাত্রীদের বললাম, আমরা rocking horse-এ ব'সে আছি মনে হচ্ছে। বুঝলাম, স্পেশাল ট্রেন এটা। পায়খানা-তথা স্নানাগারে ঢুকে ভাবলাম স্নানটা ক'রে নিই। ঝাঁঝরা আছে, জল পড়ে না। একটি স্টেশনে জানালাম, লোক এল, ঠুক্‌ঠাক্‌ ক'রে চ'লে যাচ্ছে। বললাম, শাওয়ার খোল; ঠিক হয়েছে কি না দেখি। দেখা গেল, জল পড়ছে না। তখন আবার হৈ চৈ করাতে মিস্ত্রী উঠে রীতিমত মেরামতি সুরু ক'রে ঠিক ক'রে দিল। ট্রেন চলেছে। কাজ শেষ হ'লে মিস্ত্রী কাগজে লিখে দিতে বলল। লিখলাম, 'আশ্চর্য লাগছে, এ ট্রেন যেখান থেকে আসছে সেখানে যথাবিধি দেখা হয় নি।' সহযাত্রীরা খুশী,—আনন্দচিত্তে স্নান ক'রে এলেন। একজন বললেন, "এ ত ট্রেনের কামরা; মনে নেই—ভাঙা ইঞ্জিন জোর ক'রে পাঠানো হয়েছিল—ড্রাইভার চালাবে না, তাকে চার্জশীটের ভয় দেখিয়ে ট্রেন চালাতে বাধ্য করা হয়! পথে ইঞ্জিন ধ্বংস হ'ল, সেও ম'লো তার সঙ্গে ম'লো অনেক রেলযাত্রী। মশায়, এরোপ্লেনের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী পাইলট না গ্রাউণ্ড-ইঞ্জিনীয়ার? বলতে পারেন?"

৬ই সন্ধ্যায় দিল্লী পৌঁছলাম। কনিষ্ঠ পুত্র স্টেশনে এসেছে নেবার জন্য। মালপত্র নিয়ে স্টেশনের বাইরে গেলাম—ট্যাক্সি আর পাই নে। মনে হ'ল, শিয়ালদহ স্টেশনে ফিরে গেছি—ট্যাক্সি ধরার জন্য ছোট্‌ ছোট্‌, ধর্‌ ধর্‌ [এখন বন্ধ হয়েছে]। বিশ্বপ্রিয় ছুটছে ট্যাক্সি ধরার জন্য; অবশেষে অনেকগুলো ফস্‌কে যাবার পর একটা পাওয়া গেল। মনে হ'ল imperial village বটে! কিন্তু শহরের ভিতর এমন অবস্থা নয়। সেখানে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গাড়ী থাকে; টেলিফোন আছে গাছে টাঙানো; ফোনে ডেকে ব'লে দাও, গাড়ী চাই অত নম্বর বাড়ীতে,—পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ী দরজার কাছে এসে হুঙ্কার ছাড়বে! কিন্তু স্টেশনে কোনও নিয়ম নেই ব'লেই ত মনে হ'ল। আর নিয়ম থাকলেও তা প্রতিপালিত হবার ব্যবস্থা শিথিল।

ট্যাক্সি মিলল, যেতে হবে বহুদূর—ইস্ট পাটেলনগর। পুরাণো দিল্লী ভেদ ক'রে দরিয়াগঞ্জের মধ্য দিয়ে চলেছি। মনে পড়ল, প্রথম যেবার দিল্লী আসি—সে কি আজকের কথা! ১৯১৬ সালের দিল্লীতে এসেছি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিয়ে। দিল্লী ও জয়পুরের ছাত্র ছিল, তাদের গার্জেন হয়ে আসি। অভিভাবকরা খুশী হয়ে খরচ দিতেন যাওয়া-আসার; এমন কি বলতেন, থেকে যান, স্কুল খুললে নিয়ে যাবেন। সেবার উঠেছিলাম দিল্লীর চক্‌-বাজারে—হেম সেনের দাবাইখানাতে। এই দাবাইখানা ছিল বিখ্যাত। তাঁরা দোকানের পিছনেই বাস করতেন। তাঁদের বাড়ী এখন কোথায় জানিনে। মনে আছে, সে বাড়ীর কাছেই ছিল সেই বিখ্যাত চাঁদনী চকের মসজিদ, যেখানে ব'সে নাদিরশাহ দিল্লীর নরহত্যার হুকুম দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে, চখতাই-এর ছবি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ত্রিশ বছরের মধ্যে এক দস্যু-সর্দারের আক্রমণ রু'তে পারার শক্তি ভারতীয়দের লোপ পেয়েছিল। আর মনে পড়ছে—দিল্লীর ট্রাম ম্যুজিয়মে রাখার মত পদার্থ; একদিন সখ ক'রে উঠেছিলাম সেবার। নূতন দিল্লীতেও সেবার ছিলাম দিন দুই। সেক্রেটারিয়েটের বড় চাকুরে মিঃ সেনের বাসায়—তাঁর দুই ছেলে ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্র; তারাও এসেছিল আমার সঙ্গে। নূতন দিল্লী বলতে নয়াদিল্লী বুঝায় না। ১৯১৬ সালে নয়াদিল্লীর পত্তন হচ্ছে মাত্র, অস্থায়ী রাজধানী গড়া হয়েছে সম্পূর্ণ

অন্যদিকে—সেখানে আজ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে উঠেছে। সেই সময়ে তৈরি বড়লাটের প্রাসাদ পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে পরিণত হয়।

সেবারই দেখি কুতবমিনার, উপরেও উঠি। পুরাণো কথা, ভুলে-যাওয়া ঘটনা চকিতে মনের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে—স্বপ্নের এক মুহূর্তে বহুকালের ঘটনাপুঞ্জ যে বেগে চলে, তার গতি বোধ হয় আলোকের গতি থেকেও বেশী, তা না হ'লে মনের উপর দিয়ে এত ছবি, এত কথা কেমন ক'রে ভেসে যায়। ট্যাক্সি চলেছে। এই না কুইন্‌স্ গার্ডেন! মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ দিল্লীতে এলে মিউনিসিপালিটি অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা করে, সাহেব চেয়ারম্যান অনুমতি দেন নি, এই কুইন্‌স্ গার্ডেনে তাঁরা কবির সম্বর্ধনা করেন। আসফ আলি, দেশবন্ধু গুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন উদ্যোগী। আসফ আলি স্বাধীন ভারতে গবর্ণর পর্যন্ত হন; আর দেশবন্ধু গুপ্ত কলকাতার কাছে এরোপ্লেনে দুর্ঘটনায় পুড়ে মারা যান।

ট্যাক্সি চলেছে দরিয়াগঞ্জের ভিতর দিয়ে। ১৯৪৮এ আসি দ্বিতীয়বার। এখানে থাকি ভাইপোর বাসায়—সে তখন শ্রীরামের সেবক। এখন রাজস্থানের বড় চাকুরে। তখনকার রাস্তা কি সরু ছিল। এখন বড়ওয়ে, দোকানে-হোটেলে জল জল করছে। সেবার লালকিল্লা প্রথম দেখি ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথম-বার ঢুকতে পাই নি। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। পুলিসের হুকুম ও পাস ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। দূর থেকে দেখেছিলাম, গেটের কাছে লালমুখো সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে টহল দিচ্ছে। তখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলছে—বাঙালীর উপর সন্দিগ্ধ চোখ! তারা বিপ্লবী। এবার স্বাধীন ভারত। সে সব হাঙ্গামা নেই, তাই নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে দেখে এলাম মোগল গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন—

"ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়।"

মোটর চলেছে—ভিড় বাঁচিয়ে, পাশ কাটিয়ে, অন্যমনস্ক পদচারীকে চমক লাগিয়ে মোটর চলেছে হাঁক দিতে দিতে। ইস্ট পাটেলনগরে পৌঁছলাম—একটা বাড়ীর পিছনে। বিশ্বপ্রিয় নেমে উপরে গেল—ফিরে এল, জিনিষপত্র নিজেই তুলল দোতলায়। আমি ভাবছি তারই বাসায় উঠছি। কিন্তু সে বললে, "মিসেস কো…র বাসায় তোমায় ওঠাচ্ছি। এঁদের বাসায় আমরা পূর্বে ছিলাম।" অল্পক্ষণের মধ্যে দেখি, একটি ক্ষীণাঙ্গী শ্বেতকায়া বিদেশিনী এসে আমাকে অভ্যর্থনা করছেন। মহিলার স্বামী বাঙালী—অসুখ ব'লে লণ্ডনে গেছেন চিকিৎসার জন্য। ফরাসী স্ত্রী তাঁর ছোট ছেলে নিয়ে এই বাড়ীতে থাকেন। আলায়েঁস ফ্রাঁসেতে সন্ধ্যায় ফরাসী ভাষা পড়ান, তাতে তাঁর চ'লে যায়। মিসেস্ কো—যখন বিকালে ক্লাস নিতে যান, তখন অনসূয়া নামে একটি বাঙালী মেয়ের উপর ছোট ছেলেটিকে দেখাশোনার ভার দিয়ে যান। মেয়েটি সকালে কলেজে পড়ে—বিকালে এই কাজ করে। ভালই মনে হ'ল, এ ধরণের কাজ ক'রে খরচ চালাচ্ছে।

দুইদিন এখানে থাকলাম, বাড়ীর মতই লাগল। ছেলেটি বিশ্বপ্রিয়র খুব ন্যাওটা; আংকূল্ তাকে শোকোলাৎ দেয় ব'লে খুব খুশি। ওর শোকোলাৎ কিন্তু চকোলেট নয়, আমসত্ত্ব। বিশ্বপ্রিয় আমার সঙ্গে থাকছে– তার নিজ বাসা খুব দূরে নয়।

এ বাড়ীর মালিক ডাঃ বিন্দ্রা, পাঞ্জাবী শিখ – সপরিবারে একতলায় থাকেন। বিন্দ্রাকে দেখলাম—সকালবেলায় স্নান ক'রে কাপড় মেলছেন। পরে পরিচয় হয় সবার সঙ্গেই। ছেলেদের একজন মিলিটারীতে আছে, অপর জন মিলিটারী শিক্ষানবীশ। এরা জাত-লড়িয়ে। গুরুগোবিন্দ সিংহ শুধু ধর্মসংস্কার করেন নি, তিনি একটা বিচ্ছিন্ন জনতাকে যোদ্ধজাতে পরিণত ক'রে গিয়েছিলেন। মুঘল বাদশাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে লড়াইটাই হয়ে উঠল নেশা ও পেশা। জোনাকির আলোর মত রণজিৎ সিংহকে দেখা গেল, তারপরেই ঘোর অন্ধকার। অচিরকালের মধ্যে সুরু হ'ল নিজেদের মধ্যে ঝুটোপুটি। তার পর পঞ্জাবটাকে একদিন ব্রিটিশের হাতে তুলে দিয়ে—শিখরা নিশ্চিন্ত মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ফৌজে ঢুকে পড়ল। ইংরেজ নিশ্চিন্ত। শিখেরা এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে একজন শিখ সর্দারকে বিপ্লব-পন্থী হ'তে দেখা গেল না; আট বছরের মধ্যে মহিষ মেষ হয়ে গেল, তার পর একদিন লড়াইএর নেশায় পাগলরা সরকার সালাম ক'রে কৃতার্থ হয়ে ব্রিটিশ সেনাপতিদের বেত্রসঙ্কেতে কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে—সিঙ্গাপুরে, সাংহাইতে, কলোম্বোতে।

ভারত-পাকিস্তান পার্টিশনের পূর্বে শিখদের মুরুব্বী তারা সিংহ ভেবেছিলেন, ইংরেজ পাঞ্জাব পেয়েছিল শিখ-দের কাছ থেকে—মুসলমানদের কাছ থেকে নয়। তাই ভারত ছাড়বার সময় তারাই হবে ইংরেজের উত্তরাধি-কারী! এই নিয়ে লাহোরে কি তড়পানিই চলেছিল—১৯৪৭-এর পূর্বে। বুদ্ধিমান্ লোকেরা তারা সিংহকে শান্ত হতে উপদেশ করেন; কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন, ধর্মের

জিগির তুলে জিন্না পাকিস্তান আদায়ের চেষ্টায় আছেন, আমিই-বা ধাপ্পা দিয়ে শিখস্থান না পাব কেন ? মুসলমানরা সাতশ' বছর ভারতে আছে—রাজনীতি কাকে বলে, তা তারা ভাল করেই জানে। দাবা খেলবার সময় হাতী ঘোড়া রাজা মন্ত্রী মারা পড়ে বোড়ের চালে। সেই বোড়ের চালে পাকা খেলোয়াড় জিন্না সাহেব জয়ী হলেন—শকুনি মামার কান-ফুসফুসানি ছিল সাগরপার থেকে। তারা সিংহ সেই পথ ধ'রে ভেবেছিলেন, তুলোভরা গদা ঘুরিয়ে ব্রিটিশকে ভয় দেখাবেন, মুসলমানকে কাবু করবেন! তা হ'ল না—দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ল। আশ্রয় পেলেন ভারতে—কিন্তু লড়াই-এর নেশা গেল না; তাই এ দেশে এসেই রব তুললেন, পাঞ্জাবী সুবা চাই।

পাঞ্জাবীরা ভারতে এসে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে—কেউ বেকার নেই। শিয়ালদহ স্টেশনে হা-ঘর, হা-ঘর ক'রে ফুটপাতে ঘর (?) বানিয়ে দিন কাটাচ্ছে বাঙালী উদ্বাস্তু। সমস্ত ভারতময় শিখেরা ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তর ভারতে Motor Transportকে শিখরা নিয়ন্ত্রণ করছে। পাঞ্জাবের বাইরে তারা এসে ব্যবসায়, ঠিকেদারিতে লেগে গেছে—সরকারী ডোল পাবার জন্য ব'সে নেই। দেশের বাইরে এসে ভাষা সংস্কৃতি তাদের নষ্ট হয় নি। গ্রন্থসাহেবকে মোটরে চাপিয়ে যখন তারা কলকাতা শহরে মিছিল করে খোলা তলোয়ার কাঁধে ক'রে—তখন কি মনে হয় যে, তারা তাদের সংস্কৃতি ও ধর্ম হারিয়েছে ? যত ভয় বাঙালীর !

৭ই অক্টোবর, দিল্লীতে।

বিশ্বপ্রিয় যে বাসায় থাকে—তার দোতলায় থাকেন ডক্টর তারেশ রায়। ইনি এককালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ছিলেন। এঁর বাড়ী থেকে মিস্ কিচ্‌লুকে ফোন করলাম তাঁর ফ্ল্যাটে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে পাওয়া গেল ফোনে। আগমনবার্তা ঘোষণা করলাম। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, পাসপোর্ট প্রভৃতি সব ঠিক আছে, ৯ই সকালে সওয়া ছটার মধ্যে পালাম বন্দরে পৌঁছতে হবে, সেখানে কাগজপত্র সব দেবেন। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সেদিন দুপুরে বাইরে লাঞ্চ করলাম, বিশ্বপ্রিয় সঙ্গে ছিল। সকালে চা খেয়েছিলাম এক আর্মেনিয়ানের দোকানে, ভোজ্যপদার্থ গরম ও ঠাণ্ডা রাখার দু' রকমের বন্দোবস্ত আছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। বিশ্বপ্রিয় শুধাল, "আর্মেনিয়ান কোথা থেকে এদেশে এল ?" বললাম, এরা জাত-ব্যবসায়ী। ভারতে বহুকাল আছে, আকবরের এক রাণী ছিলেন আর্মানী খ্রীষ্টান। আর্মানী-টোলা রাস্তা আছে ঢাকায়, কলকাতায়। এককালে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কলকাতায় তাদের চার্চ আছে। বহরমপুরেও পুরাণো ভাঙা গীর্জা এখনও দেখা যায়। বিশ্বপ্রিয়কে বললাম, তোমার মনে আছে কি, একবার চাকদহ গিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেগ্‌লার সাহেবের পোড়ো বাড়ী দেখতে যাই। ইনি আর্মেনিয়ান ছিলেন। এই বেগ্‌লার সাহেবকে ছোটবেলায় দেখেছিলাম। বাবার কাছে আসতেন মামলা-মকদ্দমা নিয়ে। ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামতেন টলতে টলতে, ভীষণ মদ খেতেন। আমাদের দেশের বাড়ী থেকে বেগ্‌লারের বাড়ী আধ ক্রোশের মধ্যে। দাদা ও আমি যেতাম মাঝে মাঝে, তাঁর বিরাট্ লাইব্রেরী ছিল। দাদা একটা বই এনে সেই গল্পটা নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলেন। বিশ্বপ্রিয় বললে, "ইনি কি সেই বেগ্‌লার, যিনি বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করেন ?" আমি বললাম, ঠিক ধরেছ। ছোটবেলায় বেগ্‌লারের বিদ্যাবত্তার কথা জানতাম না, তবে তাঁর বাড়ী ও বাগানের চারিদিকে বুদ্ধের মূর্তি ও স্থাপত্যের নিদর্শন দেখেছিলাম, তা মনে আছে। বড় হয়ে তাঁর কথা জানতে পারি। ইনি কানিংহাম সাহেবের সহকারীরূপে কাজ করতেন, তারপর কি ক'রে যে তাঁর পতন হ'ল জানিনে। আজ বেগ্‌লারের অস্তিত্বের কথা বোধ হয় চাকদহবাসীরা ভুলে গেছে। এই প্রথম আর্মানী দেখি। আর আজ এই দোকানী আর্মানীকে দেখলাম।

সেদিন বিকাল বেলায় শ্রীযুক্ত দাসের বাসায় গেলাম, পুরাণো পরিচয়। সেখানে গিয়ে শুনলাম, আমেরিকা থেকে প্রফুল্ল মুখুজ্জে ও তাঁর ভাই এসেছেন বহু বৎসর পরে। দিল্লীতে কেমব্রিজ স্কুলের স্বত্বাধিকারী অধ্যক্ষ অলোক দেবের বাড়ীতে তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা মিলিত হবেন তাঁদের স্বাগত করবার জন্য। আমি এঁদের জানতাম। তাই চললাম শ্রীদাসের সঙ্গে তাঁদের গাড়ীতে। বহু পরিচিতের সঙ্গে সেখানে দেখা হ'ল। সোবিয়েত দেশে যাচ্ছি ব'লে সকলেই অভিনন্দিত করলেন। গল্পগুজব হাসিগানে সন্ধ্যাটা কাটল। প্রফুল্ল মুখার্জিরা আমেরিকা থেকে লণ্ডন ও মস্কো হয়ে আসছেন। রাশিয়া সম্বন্ধে শোনা গেল কিছু কথা, তবে খুব বেশী নয়।

শ্রীদাসের গাড়ীতে ফিরছি। কালীবাড়ীতে বাংলা পুস্তক প্রদর্শনী হচ্ছে। সময়টা ভাল বাছা হয় নি। পাড়ায় পাড়ায় দুর্গাপূজা; বাঙালীদের সকলেরই মন প'ড়ে আছে পূজামণ্ডপের হৈ চৈ ও তামাসায়। মন্ত্রী দিয়ে প্রদর্শনী উদ্বোধন করালেও মন কি পাওয়া যায় ? শুনেছি প্রদর্শনীতে তেমন লোক ও বেচাকেনা হয় নি।

উৎসবমুখরিত নগরের শোভা দেখতে দেখতে বাসায় ফিরলাম—তখন বেশ রাত হয়েছে। ক্রমশঃ

রায়বাড়ী

(সেকালের পল্লীচিত্র)

শ্রীগিরিবালা দেবী

পূজা আসন্ন। রায়বাড়ীতে কোলাহল ও ব্যস্ততার সীমা-সংখ্যা নাই। পল্লীগ্রামে পূর্ব্ব হইতে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিতে হয়। গ্রামের পূজার প্রধান উপকরণ চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, মোয়া, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের তক্তি, মুক্তাবর্ধীর নাড়ু, নারিকেলের চিড়া, জীরা, শিউলি ফুল ইত্যাদি। পূজার জলপানির যাহা কিছু অত্যন্ত শুদ্ধাচারে বাড়ীর মেয়েদেরই করিবার নিয়ম। কাজেই মাসাবধিকাল পর্য্যন্ত অন্তঃপুরিকাদের বিরাম-বিশ্রাম নামক পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে না।

রায় ভবনে অসংখ্য দাসদাসী এবং পাচকের অভাব নাই, কিন্তু জলপানি প্রস্তুত ও ভোগ কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। কোন মান্ধাতার আমলে যাহা এখানে প্রচলিত হইয়াছিল, আজও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বর্ত্তমান গৃহিণী মনোরমা অতিশয় আচার-পরায়ণা। তাঁহার সদাসর্ব্বদা আতঙ্ক, কি জানি কোথা হইতে কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে অনাচারের বাতাস লাগিয়া সৃষ্টি একাকার হইয়া যাইবে। দেবতার প্রতি তাঁহার ভক্তি অপেক্ষা ভয়টাই প্রবল। মা'র চেয়ে মায়ের বাল্য-বিধবা মেয়ে সরস্বতী 'বাঘের ওপর টাগের মত' এককাঠি সরেস। বেচারার স্বামী-পুত্র নাই, সংসার নাই। শ্বশুরালয়ের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া সে নিশ্চিন্ত নিরাপদে পিত্রালয়ে আসিয়া শুচিতার আরাধনা করিতেছে। তাহার আচারের অত্যাচারে রায়বাড়ী থর-হরি কম্পিত। কিন্তু ইহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া উচিত নহে। যাহার জীবনের সব শেষ হইয়াছে, একমাত্র শুচিতাই তাহার অবলম্বন।

বর্ত্তমান জমিদার মহেশবাবুর মাতা শিবসুন্দরী এখনও গয়ার পাপ গঙ্গায় বিদায় হইতে পারেন নাই। ঈষৎ খোঁড়া পা লইয়া কোমর বাঁকাইয়া বিচিত্র নৃত্যের ভঙ্গিতে অন্দর-বাহির মুখর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস, তিনি স্মরণ করাইয়া না দিলে এই বিরাট্ পূজা-পার্ব্বণে ত্রুটিবিচ্যুতি অনিবার্য্য। তাই আগমনীর দূরাগত আগমনের নূপুর-ধ্বনিতে পঁচাত্তর বছরের বুড়ীর আহার-নিদ্রা সুখ-দুঃখ সমস্ত মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া থাকে ওই এক চিন্তা, এক কল্পনা আর রসনা।

সেকালের প্রথা অনুযায়ী এখনও তিনি মুখের ঘোমটা তুলিতে পারেন নাই। দন্তহীন, তোবড়ান কোঁচকান, চাঁদমুখখানি আজও তিনি সযত্নে ঘোমটা ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। অতীত কালের রূপের আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহাকে বোধ হয় এ গৃহে আনা হইয়াছিল। আঁটোসাঁটো বেঁটে গড়ন। গোলগাল মুখ, অতসী ফুলের মত গায়ের রং, শরীর জরাগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ, তবু গায়ের রং-এর কি বাহার। শুধু কি রং, কি চপল গতিভঙ্গি। শরীরের অবনতি নাই, আলস্য নাই। চরকিবাজির মত কেবলই ঘুরিতেছেন, খোঁড়া পায়ের বিক্রমে সারা বাড়ী বিকম্পিত। তাঁহার ডানপায়ের দোষটুকু জন্মগত নহে, নিজেরই রচনা। ননদিনী-প্রীতির নিদারুণ নিদর্শন।

রায়বাড়ীর নীচে গ্রাম্যপথ, নিম্নভূমি, বর্ষায় জল জমিয়া যায়। বর্ষার কয়েক মাস নৌকা চলাচল করে। ইহার নাম কেহ বলে জোলা, কেহ বা বলে গলি। গলির এক পাড়ে শিবসুন্দরীর প্রাসাদ-অট্টালিকা, অপর পারে স্বর্গগত কর্ত্তার ভগিনী চন্দ্রমুখী দেবীর গুটিকতক খড়ের কুটির।

স্বামীর মৃত্যুর পর শিবসুন্দরীর কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ হইল প্রত্যহ চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণের। সে বর্ষা হোক্, শীত হোক্, সন্ধ্যা হোক্, সকাল হোক্, তিনি সেখানে একবার না গিয়া থাকিতে পারিতেন না।

বছর দশেক পূর্ব্বের ঘটনা, এমনি এক শরৎকালের প্রারম্ভে, বর্ষা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু গলির বুকে তখনও তাহার চিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও পায়ের পাতা-ডোবা জল গভীর কাদার উপরে টল টল করিতেছে। সারাদিন সুযোগ-সুবিধার অভাবে সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে ননদিনীর উদ্দেশে রায় গৃহিণী গোপন অভিসারে বাহির হইয়াছিলেন। জলের নীচে ছিল গাছের গুঁড়ি। গুঁড়ির আঘাতে জন্মের মত তাঁহার ডান পায়ের হাড় সরিয়া গিয়াছে। পাকা হাড় অনেক যত্নে-চেষ্টায় আর জোড়া লাগে নাই। ইহার অল্পকাল পরে চন্দ্রমুখীও চন্দ্রলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

সে রামও রহিল না, সে অযোধ্যাও উধাও হইয়া গেল, শুধু রহিল শিবসুন্দরীর ভাঙ্গা পায়ের প্রলয় নাচন। তাঁহাদের সময় গণ্ডগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন না থাকায় তিনি ছিলেন নিরক্ষর। বুদ্ধিশূন্যা, বিবেচনাশূন্যা, সত্যযুগের সরলা গোপের বালা। এতটা বয়স পর্য্যন্ত একদিন দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিতে পারেন নাই। ম্যাচ বাক্সে তাঁহার ছিল বিষম ভীতি। ছোট্ট কাঠিটুকু বাক্সের গায়ে ঘষা-মাত্র সাপের মত ফোঁস করে, বিষ না থাকলেও যাহার কুলোপানা চক্র আছে, সাধ করিয়া কে তাহা স্পর্শ করিবে? অতএব এই সুদীর্ঘ জীবনে তিনি তাহা সযত্নে পরিহার করিয়াই আসিতেছেন। যাহার মধ্যে এ হেন জ্ঞানের দীপ্তি, তাঁহারও হৃদয়নিভৃতে ফল্গুর প্রচ্ছন্নধারার মত কবিত্বের এক ক্ষীণ প্রবাহ ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। তাঁহার প্রতি কথায় ছড়া-পাঁচালির ফুলঝুরি বার বার করিয়া ঝরিয়া পড়িত। সে ছড়ার কতক প্রচলিত, কতক স্বরচিত।

ইহাদের গ্রামের নাম হরিণহাঠি। হরিণহাঠির ক্রোশখানেক ব্যবধানের মধ্যে দুইদিকে দুই বন্দর। এক বন্দরের নাম নাকালিয়া, অন্যটি বেড়া। শনি ও মঙ্গলবারে বেড়ার হাট, রবি ও বুধবারে নাকালিয়ার হাট।

সেদিন বেড়ার হাট হইতে এক নৌকা বোঝাই নারিকেল আনা হইয়াছিল, তিন-চারজন চাকর ঝাঁকা ভরিয়া ভরিয়া নৌকা হইতে নারিকেল আনিয়া রায়বাড়ীর অন্তঃপুরের বৃহৎ অঙ্গনে স্তূপ করিতেছিল।

শিবসুন্দরী অধুনা ঠাকুমা, দালানের হাতীমুখো সিঁড়িতে বসিয়া গলা-সমান ঘোমটার মধ্য হইতে জানকী সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয় কুড়ি নারকোল আনলে জানকি? এক হাজার হয় কত কুড়িতে বাপু, আমি অতশত বুঝি না, আমি জানি কুড়ি।"

সরকারের হাজার নারিকেলের ব্যাখ্যা করিবার অবকাশ ছিল না, ভোরে যাহা হোক্ দুটো নাকেমুখে গুঁজিয়া সে গিয়াছিল হাট করিতে। দিনমান হাটে ঘুরিয়া প্রত্যেক জিনিষের দরাদরি করিয়া তাহার চিত্ত হইয়া ছিল নিতান্ত অপ্রসন্ন। এখনও দুই নৌকা বোঝাই হাটের বেসাতি নামে নাই, ফর্দ্দ মেলানো হয় নাই, মুখে জল দেওয়া হয় নাই, উদরে খাদ্য পড়ে নাই। সে রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "হাজার কয় কুড়ি, এখন সে হিসাবের আমার সময় নেই মা, এক কথায় আপনি তা বুঝতে পারবেন না।" বলিতে বলিতে ব্যস্তসমস্ত ভাবে সরকার সরিয়া গেল।

ঠাকুমা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "অবুঝরে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে, ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্যি ধান ভানে।" নারিকেলের হর হর শব্দে এ বাড়ীর ছোট মেয়ে তরুবতী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। তরু যেমন বাপ-সোহাগিনী, তেমনি ভোজন-প্রিয়া। বয়স তাহার বছর দশ, কিন্তু ইহারই ভিতরে দিব্য পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে। তরু নারিকেলের সামনে উপনীত হইয়া কোন্ কোন্ নারকেলে ফোঁপড়া গজাইয়াছে নিবিষ্টমনে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। ঠাকুমা নাতনীকে নিকটে পাইয়া পরম উৎসাহে কহিলেন, "ও তন্তি, হাজার নারকোলে কয় কুড়ি হয় লো?"

তরু তখন ফোঁপড়াযুক্ত নারিকেল পৃথক্ করিয়া রাখিতে আগ্রহান্বিত, তাঁহার প্রশ্ন কানে তুলিল না, তিনি মনে মনে বিরক্ত হইয়া তরুর প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পরে মুখের ঘোমটা তুলিয়া আপনার মনে বিড়বিড় করিতে লাগিলেন, "কার কথা কে কানে শোনে, লাফ দেয় আর তুলো ধোনে।"

২

ঠাকুমা যেমন নারকেলের হিসাব লইয়া উন্মুখ হইয়াছিলেন, তেমনি গৃহিণী মনোরমা হবিষ্যি-ঘরে মেয়েদের লইয়া কর্ম্মের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। আজ মুড়কি, মোয়া, ছাতুর নাড়ু, গুড়ের কাজ সারিয়া রাখিতে হইবে। আগামীকাল হইতে ক্ষীরের ও নারিকেল পর্ব্বের সূচনা। দুই কাঠের উনুনে বিরাট্ পিতলের কড়ায় টগ্‌বগ্ করিয়া গুড় ফুটিতেছে। ঘন গুড়ের সুবাস বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে, মুড়কি শেষ হইয়াছে। এবার চলিতেছে মোয়ার সমারোহ। মুড়ির মোয়া, চ্যাপের মোয়া, ভাজা চিড়ার মোয়া, চালভাজার মোয়া, খইয়ের মোয়া। যতরকম মোয়া হইতে পারে তাহার কোনটা মনোরমা বাদ দিবেন না। বৎসরান্তে মহামায়ার আগমন, তাঁহার সম্মুখে যতরূপ পদ সম্ভব, থরে-বিথরে সাজাইয়া দিতে না পারিলে তৃপ্তি হয় না। এত বাহুল্যের জন্য মেয়েরা মায়ের সহিত অবিশ্রান্ত খাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, বিরক্তি দমন না করিয়া মা'কে দশ কথা শুনাইয়াও দেয়, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। এ এক বিষম বাতিক।

বড়মেয়ে ভানুমতীকে লইয়া মা গুড়ের কড়ায় বসিয়াছেন। মেজমেয়ে সরস্বতী এ নিয়মের রাজ্যের মহারাণী, রাজ্যের পাকা হাঁড়ি-কলসীতে, যাহা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাই সযত্নে তুলিয়া রাখিতেছে। সেজমেয়ে মধুমতী একমুখী এক ধামা লইয়া চিড়ার মোয়া

টিপিতেছে। মধুমতীর পাশে রহিয়াছে রায়বাড়ীর নববধূ বিনু। কোণে বসিয়া কর্ত্তার দূর সম্পর্কের কাকীমা তুলসী ঠাকুরাণী ভাজা মুগের ডালের পাট করিতেছিলেন। বিনু বুক-সমান ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ভয়ে ভয়ে অপটু হস্তে মোয়া পাকাইতেছিল। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পরে নববধূ এই প্রথম আসিয়াছে ঘর-বসত করিতে।

সে সাধারণ গৃহস্থের কন্যা, জমিদারী চাল, বনেদী কর্ম্ম-পদ্ধতিতে অনভিজ্ঞা। ইহাদের হিসাবে তাহার বয়সের গাছ-পাথর না থাকিলেও আসলে তাহার বয়স বারো উত্তীর্ণ হইয়া তেরয় চলিতেছে। পল্লীগ্রামের বিচারে বয়সটা তেমন কাঁচা বলা চলে না। সাধারণতঃ এ বয়সের মেয়েরা ইঁচড়ে পাকিয়া ঝানু হইয়া যায়, কিন্তু বিনু তেমন নহে, কেমন যেন ছিটগ্রস্ত। ঠাকুমা'র অতিরিক্ত আদরে, মায়ের অপরিসীম সোহাগে ঘাটে-মাঠে উদ্দাম বেড়াইয়া তাহার প্রকৃতি হইয়াছিল অন্য ধরণের। সে না জানিত সংসারের কাজ, না জানিত লোকের সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার। তাহার মস্তিষ্ক যেমন নিরেট, বুদ্ধিও তেমনি মোটা। ধার নাই, পালিশ নাই। বিদ্যার মধ্যে কর কর, খর খর, পাতা নড়ে জল পড়ে এই পর্য্যন্ত। রূপের মধ্যে থাঁদা নাক, ছোট চোখ, শ্যামবর্ণ। হাঁ, থাকিবার ভিতরে আছে নামের বাহার 'বনলতা', কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। এহেন রূপবতী গুণবতী রায়-বাড়ীর প্রথম বধূর আসন অধিকার করিল কেমন করিয়া, সেই হইল আশ্চর্য্যের বিষয়।

হরিণহাঠি হইতে বধূর পিত্রালয় পাথরকুচি গ্রাম বেশী দূর নহে। দুই গ্রামবাসীরা সকলের সঙ্গে সকলে পরিচিত, ঘনিষ্ঠ। উৎসবে, আনন্দে, আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে আসা-যাওয়া চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

রায়বাড়ীর বর্ত্তমান কর্ত্তা মহেশবাবু ফাল্গুনের এক স্নিগ্ধ অপরাহ্নে পাল্‌কী চাপিয়া যাইতেছিলেন নাকালিয়ার বন্দরে। পথের মাঝখানে পাথরকুচি গ্রাম। পথ-সংলগ্ন লাহিড়ীবাড়ীর বিরাট্ বিখ্যাত কুলের গাছ। বিনুর অত্যন্ত লোভনীয় স্থান। নিজেদের বাগানে কুলগাছের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা লাহিড়ীদের কুলের মত মুখরোচক নহে। কুলের মরশুমে বিনুর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত সেই কুলতলায়।

আধময়লা শাড়ী কোমরে জড়াইয়া, রুক্ষ চুলে বুক মুখ ঢাকিয়া বন্যভাবাপন্ন মেয়েটা সেদিন কুলতলায় দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে ঘন-পল্লবে লুক্কায়িত বুলবুলি পাখীটিকে তারস্বরে স্তুতি মিনতি করিতেছিল, "বুল-বুলিরে ভাই, একটা বড়ই (কুল) ফেলে দে, বাড়ী চ'লে যাই।"

পালকিতে আসীন মহেশবাবু দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার পালকি আসিয়া কুলতলায় থামিয়া গেল।

বয়স্ক মহেশবাবু ভূমিতে পদার্পণ করিয়া বিনুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মা?"

মুখচোরা বিনু সবিস্ময়ে তাঁহার পানে তাকাইয়া জবাব দিতে ভুলিয়া গেল। কই, ইহার পূর্ব্বে কোন পথের পথিক ত তাহার নাম জিজ্ঞাসা করে নাই? বেহারাদের বিচিত্র গানের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া এক পাল বালক-বালিকা পালকির অনুসরণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্য হইতে মণ্ডলদের পেমো বলিল, "ওর নাম দুলালী।"

দুলালী নামটি ঠাকুরদাদার আদরের হইলেও বিনু আদৌ পছন্দ করিত না। তাই তড়িৎস্পর্শের মত সচকিত হইয়া সে উত্তর করিল, "আমার নাম বনলতা।"

মহেশবাবু সহাস্যে কহিলেন, "বেশ সুন্দর নাম বনলতা। আচ্ছা, তোমার বাবার নাম কি?"

এবার জবাব দিতে বিলম্ব হইল না, "বাবার নাম শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

মহেশবাবু সস্নেহে বালিকার এলোচুলে হাত রাখিয়া বলিলেন "আজ যাই মা, সন্ধ্যে হ'ল।"

সেদিন বেলাশেষের গোধূলি আলোয় কি মায়া ছিল কে জানে। সুন্দরের অপরূপ পরিবেশে ভুবন হাসিতেছিল। বসন্তের হরিৎবর্ণ বন-বনান্তর হইতে উদাস স্বরে ঘুঘু কি গান গাহিয়াছিল? গ্রাম্যলক্ষ্মী হীরাসাগর নদীটিও ঘুঘুর স্বরে সুর মিলাইয়া তান তুলিয়াছিল কুলু কুলু। কি জানি কিসে কি হইয়া গেল।

পরের দিন জমিদার-বাড়ীর ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল বিনুদের কুটিরে। লক্ষ কথার কমে নাকি হিন্দুর বিবাহ হয় না। তা বিনুর বিবাহে লক্ষ কথা হইয়াছিল বৈ কি।

রায়বাড়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসাদ তখন কলিকাতায় ছাত্র-নিবাসে থাকিয়া এফ-এ পড়িতেছিল। বয়েস সবে উনিশ উত্তীর্ণ। স্বাস্থ্যবান্ সুদর্শন। হুঁকা ছোঁয় না, পান খায় না। জমিদার বংশের বদখেয়ালের ধার ধারে না। এমন সুপাত্রকে বিনুর অভিভাবকরা লুফিয়া লইলেন।

বিবাহের পরে বধূ বরণ করিয়া রায়-অন্তঃপুরিকারা

কিন্তু প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। যেমন রূপের ধুচনী মেয়ে গছাইয়া দিয়াছে, তেমনি দিয়াছে দান-সামগ্রী। "প্রসাদ আমার সোনার ছেলে তার কপালে ছার কপালে।" "বৌয়ের বাবা কলিকাতার পাকা জুয়াচোর। জুয়াচুরি করিয়া সরল গেঁয়ো ভদ্রলোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়াছে।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিন্থর বিবাহের কথা হইয়াছিল তাহার ঠাকুরদাদার সহিত। বিবাহের কয়েকদিন পুর্ব্বে বাবা প্রবাস হইতে কন্যা সম্প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন। কন্যাপক্ষের কর্ত্তাকে বাদ দিয়া পিতাকে লইয়া টানাটানি, ইহাই হইল বাংলা দেশের মেয়ের বাপের চিরন্তন দণ্ড!

এই হইল রায় বংশের এক অধ্যায়।

৩

রায়বাড়ীর সেজমেয়ে মধুমতী পান-দোক্তার পরম ভক্ত। মুড়ি মোয়ার আধিক্যে বেচারার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল। সে মোয়া টিপিতে টিপিতে মেজদিদির পানে আড়চোখে চাহিয়া বিন্থর কানে কানে কহিল, "যাও ত বৌ, মোটা ক'রে একটা পান সেজে দোক্তা দিয়ে নিয়ে এস, আঁচলের তলায় ক'রে লুকিয়ে এন। মেজদিদি যেন দেখতে না পায়।"

মেজদিদির বিধানে পূজার কাজকর্ম্মে কথা বলা নিষেধ, পাছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়া থুতু ছিটিয়া সমস্ত জিনিষ অশুচি হইয়া যায়। পান আনিতে বিন্থ হাতীমুখো সিঁড়ি অবধি পৌঁছা মাত্র, ঠাকুমা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন, "ও পেসাদের বৌ, ও বুঁচি, শোন্ একটি কথা, হাজার নারকোল কয় কুড়ি হয় লো?"

যাহার দুলালী নাম অপছন্দের, তাহাকে বুঁচি বলিলে সে কিছু খুশী হইতে পারে না। বিশেষত বিন্থর ছিল নাকের দোষ। কাণাকে কাণা বলিলে যেমন তাহার অসহ্য, বিন্থরও তাই, কিন্তু এখানে সহ্য-অসহ্যের কেহ ধার ধারে না। সাগরে শয্যা পাতিয়া কুমীরের ভয়।

বিন্থ অপ্রসন্নচিত্তে চুপে চুপে উত্তর করিল, "আমি ত তা জানি না ঠাকুমা।"

ঠাকুমা গালে হাত দিলেন "কি কইচিস্ বুঁচি, তোরা কলিকালের লিখুনে-পড়নে মেয়ে হয়েও জানিস নে? নেকাপড়া, না ছাই করেছিলি, কথায় বলে মাছ মারব খাব ভাত, নেখাপড়া উৎপাত।"

বিন্থ ঠাকুমার পাশ কাটাইয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু পান লইয়া ফেরামাত্র বাধিয়া গেল বিষম গোলমাল।

সরস্বতী হবিষ্যি ঘরের বারান্দায় অগ্রসর হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল, "ওমা, দেখে যাও, ঠাকুমাকে ছুঁয়ে-নেড়ে নিয়মের কাজের ভেতরে নাচতে নাচতে আসা হচ্ছে। দুপুরে ঠাকুমা ভাত খেতে ব'সে কাপড়-চোপড় এঁটো ক'রে সেই কাপড়েই রয়েছে, এই খানিক আগে আঁস্তাকুড় ঘুরে এসেছে। ধেয়ে ধেয়ে তার কাছে গিয়ে, তার সাথে বৌ মানুষের কথাই বা কিসের?"

বিন্থ হতবুদ্ধি। ছোট দুই দেবর ক্ষিতি, সুমন্ত ও তরু ভিন্ন এখানে আর কাহারও সহিত তাহার কথা বলা বারণ, মুখের ঘোমটা খোলা বারণ। ঠাকুমা'র সস্নেহ আহ্বানে সে আজ নিষেধের বেড়ি ভাঙ্গিয়া সাড়া দিতে গিয়া মহা অপরাধ করিয়া বসিল। এ সংসার হইতে বাতিল, অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বৃদ্ধার কথার উত্তর দেওয়া যে এতবড় দোষের সে তা ভাবিতে পারে নাই।

পানের আশায় মধুমতী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলেছে, এখন আর কি করা যাবে, মেজদি? তুমি ত জান, কারোকে সামনে পেলে তাকে দিয়ে কথা না বলিয়ে ছেড়ে দেবার বান্দা ঠাকুমা নয়। বৌ হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসুক, গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ ক'রে নাও।"

ভানুমতী গুড়ের কড়া নামাইয়া বলিল, "এবার চাল-ভাজা ছাতুর মোয়া করতে হবে, তা দু'এক হাতের কর্ম্ম নয়, অনেক হাতের দরকার। এটা-সেটার ভেতরে এখানে ছিল বেশ, তা ওর আবার লাফিয়ে ঠাকুমার কাছে যাওয়া কেন? আসুক হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে।"

সরস্বতী সবেগে মাথা নাড়িল, "ঠাকুমাকে ছুঁয়ে চান না করলে এঘরে ঢুকতে পারবে না। তোমার ফিরিঙ্গিপনা রেখে দাও, দিদি। কোন কাজের যদি প্রত্যাশা ক'রেই থাক, তা হ'লে পুকুর থেকে চট্ ক'রে দুটো ডুব দিইয়ে নিয়ে এসগে।"

এতক্ষণে মনোরমা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আশ্বিন মাস ভর-সন্ধ্যায় বৌ পুকুরে ডুব দেবে কি? ওকে আর এদিকে আসতে হবে না, বাইরেই থাকুক।"

মধুমতীর দোষেই যে এ বিপত্তি, সেটা সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া প্রস্তাব করিল, "বৌ বারান্দায় ব'সে সুপুরি কাটুক। তোমাদের পুজোর সব সুপুরি ত কাটা হয় নি?"

সরস্বতী বলিল, "ঠাকুমাকে ছোঁয়া কাপড়ে পুজোর সুপুরি কাটা চলবে না।"

মধুমতী হাসিল, "তোমার সুপুরি ধাঁকায় ক'রে কারা এনে দেয় মেজদি? তারা না মুসলমান?"

মেজদি রুষ্টস্বরে বলিল, "কাগজের ঠোঙায় বাঁধা

জিনিষ নৌকোয় জলের ওপর দিয়ে আনলে দোষ হয় না।"

এমন সময় নবীন চাকরের কোলে এ বাড়ীর ছোট ছেলে সুমন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতার হেপাজতে দুই বছরের শিশু সারাদিন বাহিরে বাহিরেই কাটায়। পূজার ধূমধাম লাগিবার পর হইতে দিন-মানে শিশুর মায়ের সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না। সন্ধ্যা-সমাগমে শিশু-চিত্ত মা'র জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আজ মহেশবাবু জমিদারী-সংক্রান্ত কাজে আবদ্ধ হইয়াছেন। সুমন্তকে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইতে পারেন নাই। তাই নবীন তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিয়াছে।

মনোরমা ছেলের নিদ্রাবিজড়িত আঁখিপল্লব নিরীক্ষণ করিয়া বধূকে বলিলেন, "তুমি সুমুকে নাও ত বৌমা, একটুখানি কোলে ক'রে দোলালেই ও ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমুলে মধ্যের ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিও, আমার বিছানায় মশারী ফেলা রয়েছে, তুমি শোয়াতে নিয়ে মশা ঢুকিয়ে ফেলবে।"

মধুমতী বলিল, "যাক্, এতক্ষণে বৌয়ের একটা হিল্লে হ'ল, সুমু ওকে যা ভালবাসে, দু'জনাই-দু'জনকে পেয়ে বাঁচল।"

সত্যই অবোধ বিনু অবোধ শিশুকে বুকে চাপিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া বাঁচিল। অল্পদিনেই ভ্রাতৃহারা বিনু সর্ব্বান্তঃকরণে শিশুটিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। ইহার সঙ্গে তাহার সেই হারানো ভাইটির যেন অনেক অনেক মিল আছে। তেমনি সুবোধ-শান্ত, ডাগর চোখ, পাতলা ঠোঁটের মিষ্টি মিষ্টি হাসি। সেই ডান চোখের সুবৃহৎ তারকার পাশে—এক ফোঁটা কৃষ্ণ তিল, গোল-গাল মুখখানি। হয়ত সেই আবার দিদির মায়া কাটাইতে না পারিয়া দিদির স্নেহের আশায় শাশুড়ীর কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে না হইলে এতটুকু ছেলে বিনুকে এত ভালবাসিবে কেন? বিনুর কাছে থাকিতে চাহিবে কেন?

ঠাকুমা আধ-হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া থাকিলেও তাঁহার অনুভূতি ছিল প্রখর, দৃষ্টি-শক্তি তীক্ষ্ণ। তিনি নিঃশব্দে বধূর অনুসরণ করিয়া তাহার পাশে আরামে পা ছড়াইয়া বসিলেন। বসা মানে বাক্যের অবিরাম ধারা-বর্ষণ।

"শোন্ বৌ, তোরে বুঝি নিয়মের কাজে ওরা হাত দিতে দিলে না? দেবে কেনে, তুই যে আমার কাছে এসেছিলি তখন, আমার যে জাত গেচে লো, যত জাত আছে তোর ঐ আচারী মেজ ননদের, ও হ'ল গে—'আচারী বামনি বচনে মিঠে, দশ কাঠা চালের এককাঠা পিঠে'।

"দেখ্, ওরা যে ভুষোর নাড়ু বানাচ্ছে তাতে কর্পূর-এলাচের গুঁড়ো দিয়েছে ত? ভুরভুরে বাস না ছাড়লে আবার ভুষোর নাড়ু কিসের? আমি ত দুয়োর-গোড়ায় থেকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে, বলে-কয়ে দিতে পারি, তা আবার তোর শাশুড়ী ভালবাসে না। বাসবে কেনে, দু'জন যে দুই-জনারে বিষ-নজরে দেখেছিলাম। বিষ-নজর কি কম কথা, তোরে আমার সে আদিকাণ্ডের রামায়ণ কইতে হচ্ছে। তোর সব শুনে রাখা ভাল, তুই হলি আমার ঘরের লক্ষ্মী, পেশাদের বৌ।"

বিনু চকিত নয়নে একবার চারিদিকে তাকাইয়া লইল—না কোথায়ও কেহ নাই, গৃহ নির্জ্জন। প্রখরা এবং প্রধানারা সকলেই কর্ম্মে আবদ্ধ। আহা, সকলের অনাদৃতা বুড়ো মানুষটা কাছে বসিয়া কথা বলিতে কত ভালবাসেন, কেহ তাঁহার সাথে সামান্য একটা কথাও বলে না। চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইলেও উত্তর দেয় না। বিনুর মায়া হয়—বড় মায়া হয়—

৪

কোলের দোলানিতে, সুমুর চোখের পাতায় ঘুমের আমেজ নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে সযত্নে বাহুর ডোরে বাঁধিয়া বিনু ঠাকুমার কাছে ঘনিষ্ঠ হইয়া সরিয়া বসিল। 'বিষ-নজর' শব্দটা ইতিপূর্ব্বে তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। বিষ-নজরের বৃত্তান্ত জানিতে সে মনে মনে উৎসুক হইয়া ফিসফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিষ-নজর কাকে বলে ঠাকুমা?"

ঠাকুমার তোবড়ানো দুই গণ্ডে বন্ধনমুক্ত আনন্দ রাশি রাশি হইয়া যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তবু একজনা আজ তাঁহার নিকটে পুরাতন কাহিনী শুনিতে উন্মুখ হইয়াছে। সে এ গৃহে তাঁহারই মত অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, মূল্যহীনা। হোক্ মূল্যহীনা, কিন্তু মানুষ ত? যাহার কালো চোখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জমা হইয়া কর্ণযুগল অপেক্ষা করিতেছে, ঠাকুমা তাহাকে পাইয়াই তন্ময় হইয়া গেলেন।

"বিষ-নজর জানিস্‌নে বুঁচি? প্রথম দেখায় কারোর সাথে চোখাচোখি হ'লে কারো হয় সু-দৃষ্টি, কারো কু-দৃষ্টি। যেমন সরি তোরে বিষ-দৃষ্টিতে দেখেছে। আমিও তেমনি তোর শাশুড়ীকে—আমার সোনার মহেশের বৌকে বিষ-নজরে দেখেছিলাম। সেও দেখে-ছিল আমাকে তাই।"

বিনুর চক্ষু বিস্ফারিত হইল, সে সুমুকে বিছানায়

শোয়াইয়া দিতে ভুলিয়া গেল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা কেমন ক'রে হ'ল ঠাকুমা, মা যে আপনার একমাত্তর ছেলের বৌ, আপনি অমন করলেন কেন?"

"আমি কি সাধ ক'রে করেছিলাম লো, আমার ললাটে করিয়েছিল। বৌয়ের বাপের নাম ছিল কেষ্ট কবরেজ, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, মস্ত লোক। বছর পনেরো-ষোল বয়সে হঠাৎ ধরল আমার মহেশের ম্যালেরিয়া জ্বর। কত ডাক্তার-বদ্যি ওষুধপত্তর—কিছুতেই জ্বর থামে না। দেখতে দেখতে সোনার বরণ ছেলে আমার সাদা কাগজ হয়ে গেল, সারা শরীল শুকিয়ে কাঠ, পেট জয়-ঢাক। শিবরাত্রের এক সলতে ছেলের হেনেস্তায় কর্ত্তা হয়ে গেলেন পাগলের মতন, তখন সকলে বুদ্ধি দিলে যমুনা পার থেকে কেষ্ট কবরেজকে আনতে।

"সরকার ছয়-মাঝিওয়ালা ছাঁদির নৌকো নিয়ে ছুটল যমুনা পারে। তিনদিন পরে কবরেজ এসে জমল বাড়ীতে। মহেশকে নেড়েচেড়ে দেখে-শুনে কইল, ছেলেরে আমি ভাল ক'রে দেব,ভয় নেই, কিন্তক্ আমারে একটা কথা দিতে হবে রায়মশাই, আপনার ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কবরেজ আমাদের পালটি ঘর। কত তালুক-মুল্লুকের মালিক। কর্ত্তা তারে অমান্য করতে পারলেন না, কথা দিলেন।

"ছেলে সারলে, কর্ত্তা কথার নড়-চড় হ'তে দিলেন না, মেয়ে না দেখেই বিয়ের দিন ঠিক করলেন। এক মহেশ, তার বিয়ের কি ঘটাপটা, গাঁয় গাঁয় থেকে বাজনাদার আনা হ'ল, মিঠাই-মণ্ডার ছড়াছড়ি। কত হাজার টাকা বাজী পুড়ল, রোসনাই হ'ল। গেরামের কারোর বাড়ীতে সাতদিন হাঁড়ি চড়ল না, এমনি ধুম-ধামের কাণ্ড-কারখানা।

"বিয়ের পরের দিন বরকনের পাল্কি এসে থামল, সিং-দরজায়। কুটুম-কাটুম সাথে নিয়ে আমি গেলাম বৌ নামাতে। যেয়ে দেখি, ওমা, আমার চাঁদের কাছে একটা শেওড়া গাছের পেত্নী। আমি ডুগরে কেঁদে উঠলাম, বৌ নামিয়ে কোলে করলাম না। মহেশের মাসী-পিসীরা বৌ আনল নামিয়ে। কর্ত্তা আমারে কত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বৌ বরণ করালেন।

"বরণ-টরণ সারা হ'লে মহেশ আমার গলা জড়িয়ে কত কান্নাই কাঁদল। কে কারে বুঝ দেবে। মায়ে-ছায়ের এক দশা। সেই কু-দৃষ্টির জ্বালায় জন্ম গেল আমার দগ্ধে দগ্ধে। এখন আর কি, চোখ বুঁজলেই শান্তি, 'কিসের আমার পরিপাটি, কোনরূপে দিন কাটি'।"

ঠাকুমা চুপ করলেন। অতীত কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে তাঁহার কোটরগত চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। এই অবকাশে বিনু খুমুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল, কোলেই তাহার পাকা ঘুম হইয়া গিয়াছিল, নাড়া পাইয়া সে উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। বিনু সাদরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহকর বুলাইতে বুলাইতে শুইয়া ঠাকুমার কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে পড়িতেছিল নিজের স্নেহময়ী করুণাময়ী ঠাকুমায়ের কথা। ইঁহার মত এত না হইলেও তাঁহারও বয়স হইয়াছে। কিন্তু এখনও তিনি সেখানকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। স্বজনদের কাহারও সাধ্যে কুলায় না তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে, আচার-ব্যবহারে তাঁহাকে অবহেলা করিতে। ইহারা এমন করে কেন? যিনি সর্ব্বপ্রধান, তাঁহারই স্থান হইয়াছে সর্ব্ব-নিম্নে। ইনি কাজকর্ম্ম করিতে পারেন না, আবোল-তাবোল বকিয়া কান ঝালাপালা করিয়া দেন সত্য, কিন্তু বুড়ো হইলে আর কি কেউ এমন করে না? সেই কারণেই কি এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, এত অনাদর-অবহেলা? ঠাকুমার মতনই তাহাকেও এ বাড়ীতে কেহ দেখিতে পারে না। শাশুড়ীর বিমুখতা, আপনার রূপহীনতার অভাব বধূ আনিয়া পূরণ করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। আরও কারণ, নববধূ তাঁহার অমানুষিক শ্রমের অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সকলেই কি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতে জানে? শিখিতে, দেখাইতে কি সময় লাগে না? সে সংসারের কাজকর্ম্ম জানে না, ইহাই তাহার প্রধান অপরাধ। সে হইয়াছিল বাড়ীর প্রথম মেয়ে, মাতাপিতার প্রথম সন্তান, আদরে সোহাগে লালিত পালিত। বাপের বেশী বেশী টাকা না থাকিলে তাহাদের সন্তানদের কি আদর হইতে নাই? তাহার পিঠের ছোট ভাইটির অকালমৃত্যুর পর হইতে বিনুর সামান্য হাঁচি-কাশিতেও সকলে অস্থির হইয়া উঠিতেন। সদাসর্ব্বদা এক আশঙ্কা, এও বুঝি ভাই-এর অনুসরণ করিবে। তাই অপার স্নেহে-মমতায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার কত না প্রয়াস ছিল। বিনু বাঁচিয়া বড় হইবে, একদিন শ্বশুরঘর করিতে যাইবে, ইহা তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন নাই। সেইটা হইয়াছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

"ওমা, কি কাণ্ড, ওদিকে আমরা মরছি নাকুনি-চুবোনি খেয়ে, এদিকে নবাব-নন্দিনী নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছেন। ঘুমের বলিহারি, বাপ-মা কি শেখায় নি বৌমানুষের সবার আগে ঘুমুতে নেই?"

সরস্বতীর কঠিন কর্কশ স্বরে বিনুর সুখনিদ্রা অকস্মাৎ

অন্তর্হিত হইল। সে ধড়ফড় করিয়া বিছানায় বসিয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিল। সত্যি, তাহার অন্যায় হইয়াছে। সুমন্তর পাশে শুইয়া কেনই বা সে মরিতে ঘুমাইয়াছিল। লজ্জায় সঙ্কোচে বিনু মরমে মরিয়া গেল, কিন্তু তাহার অনুতাপের সন্ধান কে লইবে?

দিনভোর অগ্নির উত্তাপে ভানুমতীর মেজাজ শান্ত ছিল না। সে মেজবোনের উক্তিতে সায় দিয়া বলিল, "বাপ-মা ঠিক শিক্ষাই দিয়েছিল সরি, কেবল শিকে দিয়ে ছেড়ে দেয় নি, পুণ্যিপুকুর ব্রত করিয়ে বর চেয়ে নিয়েছিল, দশরথের মত শ্বশুর চাই, কৌশল্যা শাশুড়ী চাই, লক্ষ্মণ দেওর চাই, রামের মত স্বামী চাই আর দাসীর মত ননদ চাই। আমরা করচি দাসীপনা, রাজকন্যে সোনার খাটে গা দিয়ে রূপোর খাটে পা দিয়ে সুখের স্বপ্নে বিভোর। তোরা এইবার 'শ্বেত চামরের বা' দিয়ে পদসেবা কর্!"

মধুমতীর বয়স অল্প, দুই বছর হইল বিবাহ হইয়াছে। তারুণ্যে রসে এখনও হৃদয় পরিপূর্ণ। দুই দিদির উগ্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সে ম্রিয়মাণ হইয়া কহিল, "কাছে লোক না থাকলে সুমু এতক্ষণ জেগে মা'র কাজ পণ্ড ক'রে দিত। সেদিক্ দিয়ে বৌ কাছে থেকে ভালই করেছে। এখন রাগ-রঙ্গ রেখে চল বড়দি, ভাত খেতে যাই, ঠাকুর ভাত বেড়ে ব'সে রয়েচে।"

সরস্বতীর রাত্রে ভাত খাওয়া নাই, সে জলযোগ সারিয়া শয়নগৃহে আসিয়াছিল। ভানুমতী কথার জবাব না দিয়া, কাহাকেও না ডাকিয়া বাহির হইয়া গেল।

মধুমতী বিনুর সম্মুখীন হইয়া চাপা গলায় কহিল,"বৌ, চোখেমুখে জল দিয়ে চল ভাত খেতে যাই।" উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে বিনুর বুক হইতে গলা অবধি ভরিয়া গিয়াছিল, সে না পারিল উঠিতে, না পারিল নড়িতে, কাহার যাদুমন্ত্রে সে যেন সহসা পাথর হইয়া গিয়াছিল।

মধুমতী স্থির পাষাণগাত্রে একটা ধাক্কা দিয়া খিল্ খিল্ শব্দে হাসিতে লাগিল, "কি আশ্চর্য্য বৌ! ব'সে ব'সেই ঘুমুচ্ছে! কি ঘুম বাবা, কুম্ভকর্ণ হার মেনে যায়। আর ঘুমোয় না, চল খেয়ে-দেয়ে আসি।"

কোমল করস্পর্শে পাষাণে প্রাণ সঞ্চার হইল, বধূ মাথা নাড়িল, সে যাইবে না।

মধুমতী বলিল, "তোমার আবার হ'ল কি, খাবে না কেন?"

সরস্বতী মশলা চিবাইতে চিবাইতে টিপ্পনি কাটিল, "হবে আবার কি? রাগ হয়েছে, আরগুণ নেই ছারগুণ আছে।"

আচম্‌কা নিদ্রাভঙ্গে সত্যই বিনুর শরীর ভাল লাগিতেছিল না, তাহার পরে আকণ্ঠ বচনামৃত পান করিয়া আহারের স্পৃহা তাহার এতটুকুও ছিল না, অক্ষুধার কথা সে জানাইবে কিরূপে? ঝিদের সহিত যদিও বাক্যালাপের মনও ছিল না, কিন্তু বাড়ীর সব ক'টি ঝি এসময় রান্নাঘরে যাইয়া যে যাহার ভাত বাড়া লইয়া ব্যস্ত ছিল। তরু নিদ্রিতা, মনোরমা আসিয়া তাহার মুশকিলের আসান করিয়া দিলেন। বধূর শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "গা ত গরম হয় নি, তবে যাবে না কেন বৌমা?" তাঁহার একটুখানি ছোঁয়ায় একবার 'বৌমা' ডাকে বিনুর রুদ্ধ অশ্রুজলের ধারা দুই গণ্ডে ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

তিনি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "রাত ঢের হয়েচে, খেতে ইচ্ছে না থাকে খেয়ে কাজ নেই। তুমি আর ব'সে থেকো না, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক ত।"

বিনুর কি শান্তি, কি মুক্তি! সে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া চারিগাছা লিচুকাটা মলের জলতরঙ্গ বাজাইয়া ছুটিয়া চলিল তাহার শয়নগৃহে। তাহার গমনপথে সুতীব্র কটাক্ষ হানিয়া সরস্বতী ঝঙ্কার দিতে লাগিল, "দেখ না, বৌ-মানুষের হাঁটার ছিরি, মাটি কাঁপিয়ে কোন বাড়ীর নতুন বৌ এমন ক'রে দৌড়য়?" মনোরমা উত্তর দিলেন না।

৫

রায়বাড়ীর অন্দরে প্রশস্ত আঙ্গিনা। ভিতরে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা, সারি সারি শয়ন গৃহ। অট্টালিকা দুই মহল—বাহিরের অংশ দক্ষিণমুখী। পুবে বড় হবিষ্যি ঘর, নিয়মের কর্ম্মভূমি। পশ্চিমে নিত্যকার রন্ধনশালা, সেখানেও সমারোহ ও আড়ম্বরের সীমা নাই। দক্ষিণের ভিটায় মহেশবাবু ছেলে-বৌয়ের জন্য আর একখানা নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নিরালা ঘরের পেছনে ফলের বাগান। ফলগাছের ফাঁকে ফাঁকে দুই-চারিটা ফুলগাছও শিকড় গাড়িয়া জায়গা করিয়া লইয়াছিল।

বিনু সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া দিল। তাহার ঘরের একপাশে বিবাহের খাট পাতা, অন্যদিকে দুইখানা চেয়ার-টেবিল, আল্না, তাকের উপর দুই-চারিটা কাঁচের ও মাটির খেলনা বিনু সাজাইয়া রাখিয়াছে। তাহার পাহারাদার হইয়া এক খাট অধিকার করিয়াছেন ছোট ঠাকুমা, তুলসী ঠাকুরাণী আর এক খাটে তাহার শুভ্র শয্যা প্রতীক্ষা করিতেছে।

ঠাকুমা অপেক্ষা ছোট ঠাকুমা বিশেষ ছোট নহেন। শরীরের বাঁধুনী আশ্চর্য্য মজবুত। দুই পাটি ঝকঝকে দাঁত, কদমছাঁটা চুলের বেশীর ভাগ কালো। কৃষ্ণবর্ণের উপরে বড় বড় চোখ, উঁচু নাক, পাতলা ঠোঁট আজও দিব্য গঠনের প্রমাণ দিতেছে। ছোট ঠাকুমা সন্তানহীনা, বালবিধবা। মহেশবাবুকে ও তাহার দিদি পরমেশ্বরী দেবীকে—সন্তানতুল্য স্নেহে লালন-পালন করিয়াছিলেন। ঠাকুমা গর্ভধারিণী মাত্র, সন্তান পালনের গুরু দায়িত্বভার একদিনের জন্যও তিনি লইতে পারেন নাই। সেইজন্য এ বাড়ীতে যশোদা-মা'র মান-সম্মান ঠাকুমার। তিনি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি-বিবেচনা, অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার জন্য আশ্রিতা হইয়াও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বাড়ীর সাধারণ দাসদাসী হইতে ছেলেমেয়েরা সকলেই ছোট ঠাকুমার বাধ্য, অনুগত। আনুগত্যের আর এক প্রধান কারণ—তিনি ছিলেন রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। গৃহ-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের নিত্যনৈমিত্তিক ভোগের ভার ছোট ঠাকুমা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোগের উপকরণ তিনটি বিধবার মত অল্প-সল্প রান্না করিতে তিনি ভালবাসিতেন না। গোটা সংসারের যাবতীয় নিরামিষ ডাল তরকারি, ঝাল-ঝোল, শুক্ত তিনি সানন্দে রান্না করিতেন। সে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন দৈবাৎ কাহারও পাতে না পড়িলে সেদিন তাহার অন্ন রুচিত না।

ছোট ঠাকুমা বিনুকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "আমি ঘুমিয়ে থাকলে তুমি ঘরে ঢুকে ধীরে সুস্থে চলাফেরা ক'রো, মলের ঝমর ঝমর শব্দ ক'রো না। বুড়ো মানুষের ঘুম একবার চ'টে গেলে ফের আসতে চায় না।"

লণ্ঠনের সলতে কম ক'রে রাখা হইয়াছিল। বিনু পায়ের মল হাঁটুতে গুঁজিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় গেল।

আজ আর তার পায়ের দিকের জানালা বন্ধ করা হইল না। প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বে সে চোখ বুঁজিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিত। তাকাইয়া বন্ধ করিতে সাহসে কুলাইত না। গাছপালার ভিতর হইতে না জানি কি ভয়াবহ দৃশ্য দৃষ্টিপথে পড়িবে। আজ তার ভয়ভীতির চিহ্ন নাই, বালিকার সুকুমার হৃদয়ে কিসের এক বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে।

সে বিছানায় শুইয়া মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। পূজার আর বিলম্ব নাই, রজনীর গাঢ় অন্ধকার ক্রমে ফিকা হইয়া আসিতেছে। আধ-আলো আঁধারে বৃক্ষশ্রেণী দেখাইতেছে অস্পষ্ট ছবির মত। ঘন বনে একটানা-সুরে ঝিল্লি বাঁশী বাজাইতেছে। মৃদু বায়ু-হিল্লোলে পাতা দুলিতেছে। শাখা নড়িতেছে। গবাক্ষগায়ে হেলিয়া-পড়া কুটরাজ ফুলের গাছ সাদা সাদা থোকা থোকা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। কি সুমিষ্ট সুবাস তাহার।

ফুলের সৌরভে বিনুর পেট ভরিল না। ক্ষুধার উদ্রেক হইল। দ্বিপ্রহরে ভাত খাইবার পরে সে আর কিছু খায় নাই। বৈকালে মনোরমা তাহাকে কয়েকটা গৃহজাত মিষ্টি খাইতে দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা খাওয়া হয় নাই। পাশের বাড়ীর জ্ঞাতিসম্পর্কে তাহার পিস-শাশুড়ী লবঙ্গকে সে ধরিয়া দিয়াছে।

কিশোরী লবঙ্গের সহিত সে সখিত্ব স্থাপন করিতে অতিশয় ব্যগ্র। তাহার সঙ্গেও নববধূর কথা বলা নিষেধ। তবু সময়-সুযোগ পাইলেই মেয়েটি লুকাইয়া তাহার কাছে আসে, আলাপ করে।

না, পেটের জ্বালায় বিনু আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া সে মেঝেয় নামিয়া পিতলের ছোট কলসী হইতে এক গেলাস জল ঢালিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। শূন্য উদর কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল দেয়ালে রক্ষিত বৃহৎ আয়নার সামনে। মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোয় ঘর আবছা আবছা, দর্পণের প্রতিবিম্বও মোছা মোছা, তবু তাহার চোখে পড়িল মোটা নাক, ছোট চোখ। সে আয়নাকে ভেংচি কাটিয়া মনে মনে ভাবিল, এরা আমাকে দেখিতে যত মন্দ বলে আসলে আমি কিন্তু তা নই। খুব খারাপ হইলে শ্বশুর নিজের চোখে দেখিয়া আদর করিয়া ঘরে আনিবেন কেন? এরা আবার রূপের বড়াই করে, তার মায়ের কাছে বড় রূপসীরও রূপের গৌরব খর্ব্ব হয়।

বিনু পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়া শয়ন করিল বটে কিন্তু তার নয়ন-সম্মুখে ভাসিতে লাগিল মায়ের অপূর্ব্ব মুখচ্ছবি। স্নেহে মমতায় বিগলিত কণ্ঠে মা যেন ডাকিতেছেন, "বিনু, মা আমার, তুই না খেয়ে শুয়ে পড়লি কেন? চল্, আমি তোকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে নিয়ে আসি।"

বিনু অভিমানে ঠোঁট ফুলাইল, "না।"

ঠাকুরদাদা নিকটে ছিলেন, সহাস্যে বলিলেন, "আমার দুলালী দিদির রাগ হ'ল কিসে? কার গর্দ্দান নিতে হবে?"

ঠাকুরদাদার রাগের ইঙ্গিতটুকু ঠাকুমা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন—"তোমরা কেন ওকে এত বিরক্ত করছ? এবেলা ভাল মাছ নাই ব'লে বিনু ভাত খেতে

চাইছে না। আমি ওর জন্যে ক্ষীর ক'রে রেখেছি, কলা দিয়ে, মুড়কি দিয়ে ও আমার কোলে ব'সে খাবে।"

মা ক্ষীরের বাটি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বিনু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল, "মা, মা, মা।"

ছোট ঠাকুমা তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া ডাকিলেন, "ও বৌ, অমন করছ কেনে? স্বপ্ন দেখছ, স'রে এসে আমার কাছে শোও। আজ বড্ড গুমোট হয়েছে, আমি হাওয়া করচি। আর একটা কথা তোমায় কয়ে রাখি, মন দিয়ে শোন। তুমি রাতে আমার কাছে থাক, আমার সাথে রাতে কথা ক'য়ো। সাবধান, দিনের বেলায় ক'য়ো না কিন্তু। শুয়ে শুয়ে কথা ক'য়ো।"

বিনুর সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে ছোট ঠাকুমার কোলের কাছে সরিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, "দিনের বেলা কথা বলব না ছোট ঠাকুমা?"

"না, তা হ'লে ওরা রাগ করবে। নতুন বৌ-এর বড়দের সাথে কথা কওয়া নিন্দের।"

শ্যামল বনান্তর হইতে ক্ষুদ্র পাখীটিকে ধরিয়া আনিয়া সোনার খাঁচায় আবদ্ধ করা হইয়াছে। পিঞ্জরের সুতীক্ষ্ণ শলা তাহার সর্ব্বাঙ্গে খচ্‌ খচ্‌ করিয়া বিঁধিতেছে। তবু এই অন্ধকার পিঞ্জরে এক হীরকপ্রদীপ মৃদুমধুর জ্বলিতেছে, সে হইল প্রসাদ, যাহার করপল্লবে এক দিন বিনুর বাবা তাহার কম্পিত হস্তখানি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ভাষা ভারতীয় চলিত ভাষাগুলির অন্যতম। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলার যে সম্বন্ধ, হিন্দী মারাঠী, গুজরাতী, পার্ব্বতীয়, পাঞ্জাবী প্রভৃতি বহুসংখ্যক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির চলিত ভাষার সেই সম্বন্ধ। সকলগুলিই সংস্কৃতবহুল। তবে কি ঐগুলি মৃত ভাষাটির ভস্মরাশি হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে? যেন তাহাই হইল, সংস্কৃতই যেন এগুলির জননী। কিন্তু ভারতে কি আদিকাল হইতে কেবল নিছক আর্য্যজাতির বাস? অনার্য্য বলিয়া, আদিমনিবাসী বলিয়া কোন জাতি ছিল না? তাহাদের কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা ছিল না? না, তাহারা তাহাদের ভাষার সহিত সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে? আমাদের বিশ্বাস আর্য্য অনার্যের সংমিশ্রণে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলার ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছে মাত্র।—বঙ্গভাষা ও বাঙ্গলা অভিধান, প্রবাসী—১ম ভাগ, ১৩০৮ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বিপ্লবে বিদ্রোহে

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

যুগযুগের আত্মবিস্মৃত জাত পশ্চিমের সঙ্গে সংস্পর্শে সংঘাতে নিজের দিকে তাকাতে সুরু করল। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধ'রে সাধনা চলেছে নবজাগরণের—চিন্তাজগতের, জাতীয় আর সমাজ জীবনের সর্বদিকে। চিন্তা ও কর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে কত মনীষী, কবি, লেখক, বক্তা দেখা দিলেন। এঁদেরই কথায়, লেখায়, বক্তৃতায় ফুটে উঠতে রইল পরাধীন জাতের মর্মবেদনা। আমরা গোলামের জাত। সর্বপ্রকারে পতিত জাতের মানুষ সব অমানুষ হয়ে রয়েছে। জাতকে স্বাধীন করতে হবে। পথ কি? নানা উপায়ের কল্পনা এসেছে। নানা রকমের প্রবর্তনা দেখা দিয়েছে।

তাঁদেরই উদ্যমে প্রবর্তিত শিক্ষাদীক্ষায় যাঁরা গ'ড়ে উঠেছেন তাঁদের প্রেরণা অনেক ক্ষেত্রে এসেছে এক ভিন্ন দিক্ থেকে। জাতির প্রতি নির্যাতনে, লাঞ্ছনায়, অনেক সময় নেতৃস্থানীয়দের ব্যক্তিগত লাঞ্ছনায় একটা অন্ধ আক্রোশ দেখা দিয়েছে। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিদেশী বুটের লাথিতে এদেশের কুলির দুর্বল পিলে ফেটে গেছে; বুটধারীর বিশ টাকা জরিমানা হয়েছে। আবার কোন দেশী মানুষ সঙ্গত কারণে বিদেশীকে আঘাত করলে সাত বছর দ্বীপান্তর হয়েছে। লর্ড কার্জনও এই বৈষম্যের ক্রুরতায় আর নির্বুদ্ধিতায় ক্রুদ্ধ হতেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি।

এটা বোঝা গেছে, পরাধীন দেশে এ অনিবার্য। পরাধীনতা ঘুচাতে হবে। স্পষ্ট প্রচার করতে সুরু করলেন গত শতাব্দীর শেষ দশকে, অরবিন্দ, লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক। অরবিন্দ তখন বরোদায়। এঁরা কেউবা স্তরের পর স্তর বিপ্লবের ছক ফুটিয়ে তুললেন, কেউবা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নগ্ন ছবি আঁকতে চেষ্টা করলেন আইন বাঁচিয়ে, কেউবা ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী আর শিবাজীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনার ছলে জাতকে স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান করলেন। সরকারী চাকরিতে ব'সে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীন সেন, যোগেন বিদ্যাভূষণও এই কাজ করলেন। এঁরা ছাড়াও আরো অনেকে।

কিন্তু দু'দশজন পাঠকের মুগ্ধ প্রশংসার বাইরে দেশের মনের কতখানিকে স্পর্শ করতে পারলেন তাঁরা? এঁরা ছাড়া—হয়ত এঁদেরই কাছ থেকে সাক্ষাৎ, পরোক্ষ প্রেরণা পেয়ে, হয়ত স্বাধীনভাবে—কত সন্ন্যাসী পরিব্রাজক দেখা দিলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতে—যাঁরা চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্ ছেলেদের পথে-ঘাটে দেখতে পেলে ডেকে বলতেন, মানুষ হতে হবে, চরিত্র গড়তে হবে, আত্মপরায়ণতা ভুলতে হবে, দেশ স্বাধীন করতে হবে। শিক্ষাব্রতী শশীভূষণ রায় চৌধুরী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ঘুরে ঘুরে ছেলেদের শিখিয়েছেন, আদর্শ শিক্ষক হতে হবে—যারা শিখাবে, পরাধীন জাতকে স্বাধীন করাই জীবনের ব্রত।

এঁদের শিক্ষায় অনেকে ভাবতে সুরু করলেন, কি ক'রে পরাধীনতা ঘুচান যায়। আবার অনেকের কাছে সমস্যা—কাকে নিয়ে এই পরাধীনতা ঘুচাবার সংগ্রাম। জাত ত অসাড়, ঘুমন্ত। তাঁদের সামনে সমস্যা, কি ক'রে জাতকে জাগান যায়।

দেশকে স্বাধীন করার সমস্যা, আর দেশের লোককে জাগানর সমস্যা এক নয়। ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে বা অপরের লাঞ্ছনা দেখে তার প্রতিশোধ নেবার যে আকাঙ্ক্ষা, সেটাও পরে রূপ পেয়েছে স্বাধীনতা পাবার আকাঙ্ক্ষাতে। কিন্তু তখন পর্যন্ত তা দেখা দিতে লাগল দৈহিক বলের অনুশীলনে। এই কলকাতা শহরেই পল্লীতে পল্লীতে গ'ড়ে উঠল শরীরচর্চার সব আখড়া। তারই কয়েকটির মিলনে প্রথম গড়ল অনুশীলন সমিতি ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের নেতৃত্বে। দেখা দিল আত্মোন্নতি, শক্তিসমিতি এবং পরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঐ ধরণেরই আরো অনেক সমিতি। অনুশীলন সমিতি শাখা বিস্তার করল বিভিন্ন জেলায়, বাংলার বাইরেও। এসবের বিপুল প্রসার প্রধানতঃ ঘটে ১৯০৬-৭ সালে স্বদেশী আন্দোলনের অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যসৃষ্টির পর। গোড়াতে ছিল শুধু অনুশীলন আর আত্মোন্নতি এবং অনেকগুলি আখড়া বা ব্যায়াম সমিতি।

যাঁদের কাছে প্রথমেই দেখা দিয়েছিল দেশ স্বাধীন করার সমস্যা, তাঁরা কেউ কেউ দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদলভুক্ত হয়ে সমরবিদ্যা শিখতে লাগলেন। পরে যতীন ব্যানার্জি (স্বামী নিরালম্ব), ব্রহ্মবান্ধব মত পরিবর্তন করেন। তাঁদের ধারণা হয়, যুদ্ধের সমস্যা, সমরবিদ্যা

শিক্ষা প্রয়োজন হ'লে আসবে পরে। তার আগের সমস্যা দেশের মানুষকে জাগানোর সমস্যা। এই সমস্যার পূরণে দুইজন ধরলেন দুই ভিন্ন পথ। সহযোগিতা, সহানুভূতি, সমর্থনের কিন্তু অভাব রইল না পরস্পরের।

জাতের চমক লাগাতে হবে। শক্তির বিদ্যুৎ না চমকালে, বজ্রের নির্ঘোষ না ফুটলে কি যুগ যুগের অসাড়তা ভাঙে? ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে বরোদা থেকে কলকাতা এলেন যতীন ব্যানার্জি সৈনিকের কাজ শেখা উপস্থিত ছেড়ে দিয়ে। যাঁরা শুধু শরীরচর্চায় মেতে ছিলেন অথচ মন ভরছিল না তাতে, তাঁরাও এগিয়ে এলেন অনেকে, এসে তাঁর সাথে হাত মিলালেন। যতীন ব্যানার্জির সাথে অবাধ সহযোগিতা সংঘটিত হ'ল কলকাতা অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি এবং পরে মফঃস্বলেরও অনেক সমিতির। শরীরচর্চা ছেড়ে অস্ত্রপাতি ব্যবহারের কথা উঠলেই প্রথমদিকে পাঠান হ'ত যতীন ব্যানার্জির সার্কুলার রোডের বাসায়। পরে মানিকতলা বাগানে।

সুযোগ এসে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন আত্মপ্রকাশ করতে রইল, বিদেশী শাসক অধৈর্য হয়ে উঠল। জাতের প্রতি লাঞ্ছনার ভাষা ব্যবহার ক'রেই সে নিরস্ত হ'ল না, জাতের জাগরণের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে নানারকম পরিকল্পনা গ্রহণ করল। প্রথমেই বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করল। উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। উত্তেজনা দমনকল্পে এল লাঠি আর বন্দুক, জেল আর নির্যাতন। ফলল উল্টো ফল। উত্তেজনা গভীরে পৌঁছাল। বক্তৃতামঞ্চ আর খবরের কাগজ তাতে ইন্ধন যোগাল। জাতির জাগরণের এই প্রথম স্তর।

পাশাপাশি চলল সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, বন্দেমাতরমের বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার। এই জোয়ারের সঙ্গে মিশে গেল প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি। এরই আত্মপ্রকাশ ১৯০৮ সালে মানিকতলা বাগানে। অরবিন্দ আর বারীণের নাম ফুটল এর পুরোভাগে। বরোদাতেই এঁদের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। সেখানে অরবিন্দ তিলকের সহকর্মী। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগও গোপন বিপ্লব মন্ত্রেরই যোগাযোগ—যেমন কলকাতার যোগেন বিদ্যাভূষণের বাড়ীর যোগাযোগ।

এঁদের সবার সম্মিলিত কণ্ঠের ভাষা—আঘাতসংঘাত চলুক, নির্যাতন জাত বরণ করতে শিখুক। তার ভিতর দিয়েই আসবে বিশালতর জাগরণ। কথাটাকে পরে স্পষ্ট ভাষা দিলেন যতীন মুখার্জি: একটি ক'রে প্রাণ আত্মদান করবে, জাতের চমক লাগবে, ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ে জাত জাগবে।

প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাইয়ের পরের স্তরে আসবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দেশের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দেওয়া—"আমরা মরব, জাত জাগবে।" আঘাতের পরে আঘাতে জাগবে সারাদেশ। তখনই কেবল সম্ভব হবে স্বাধীনতার যুদ্ধ।

অদ্ভুত সহ-সংঘঠন (co-incidence)! জাতির নবজাগরণের পুরোহিত তিলক, অরবিন্দ। উভয়েই গীতার বাণী নতুন ক'রে শুনিয়েছেন জাতকে। গীতার বাণীর মূর্ত প্রতীক যতীন্দ্রনাথ যার সংস্পর্শে এসেছেন, তাকেই শুনিয়েছেন: প্রাণ দিয়ে প্রাণ জাগাতে হবে জাতের জীবনে, আগে কে প্রাণ দেবে, তারই জন্যে কাড়াকাড়ি ক'রে জাতের জীবনে প্রাণের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। যতীন মুখার্জি মিষ্টি হেসে চোখের দিকে চেয়ে যার কাঁধে হাত রেখেছেন, প্রাণ বাঁচাবার চিন্তা তার যেন মন্ত্রের বলে উবে গেছে। সংক্রামক হয়ে উঠেছিল এই কাড়াকাড়ি এদেশে তিনটি দশক ধ'রে।

এর ভিতর এসে পড়েছিল আর এক ধারার চিন্তা ও চেষ্টা। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার ভিতর অনুশীলন সমিতি প্রসারলাভ করে। ঢাকা শাখার ভারপ্রাপ্ত হলেন পুলিনবিহারী দাস। আশ্চর্য সংগঠন-শক্তি দেখালেন তিনি। পূর্ব ও উত্তর বাংলার অনেক জায়গায় এর শাখা গ'ড়ে তুললেন। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ লক্ষ্য। এঁরা কাজেই জোর দিলেন এককেন্দ্রিক সুনিয়ন্ত্রিত দলের দিকে। সামরিক শক্তির উদ্বোধনে সহায়ক ব'লে লুণ্ঠনও সমর্থনযোগ্য। পূর্বে যাঁদের কথা বলেছি, বিপ্লবের আয়োজনে অর্থের প্রয়োজন তাঁদেরও এসেছে। লুণ্ঠনের পথ সাময়িক ভাবে তাঁদেরও নিতে হয়েছে। কিন্তু নীতি হিসাবে এই পথকে বর্জন ক'রেই তাঁরা চলতে চেয়েছেন। সাময়িক প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এ পন্থা ত্যাগ করার কঠোর নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অনুশীলন সমিতির ঢাকা শাখার কথা স্বতন্ত্র। অর্থের প্রয়োজন ছাড়াও লুণ্ঠনকে তাঁরা সামরিক প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে নিয়েছেন। সামরিক প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে গঠিত এই দলের নিয়ামক হয়েছে প্রতিজ্ঞাপত্র ও গঠনবিধি। এ দলেরও কর্মীরা প্রাণ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার লক্ষ্য আর ক্ষুদিরাম আর কানাইয়ের লক্ষ্য এক নয়। দল করবার জন্যে, অস্ত্রসংগ্রহের জন্যে অর্থের প্রয়োজন—অর্থ লুণ্ঠন করা হয়েছে। পুলিস পেছনে

লেগেছে। তাদের হত্যা ক'রে প্রাণ দিতে হ'লে দিতে হবে। সুযোগ পেলে স'রে যাবে কর্মীরা জীবন বাঁচাতে, দুর্লভ অস্ত্র বাঁচাতে। মদনলাল ধিংড়া বা বীরেন দত্ত গুপ্তের মত দাঁড়িয়ে মরব, ম'রে দেশকে জাগাব—এ এঁদের কথা নয়।

জীবনকে তুচ্ছ করার শিক্ষা সব দলের কর্মীমাত্রকেই নিতে হয়েছে। কিন্তু ঢাকা অনুশীলন দলের ধারণা ও বিশ্বাস—ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তার জন্যে গোপনে দেশময় দল গড়তে হবে, অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। এমনি এক সশস্ত্র দলের লড়াইয়ের ফলে দেশের স্বাধীনতা আসবে। দেশকে জাগানর সমস্যা এঁদের চিন্তায় তেমন বড় স্থান পায় নাই। অথবা গোপনে ছাপা পত্র এবং পুস্তিকাই এঁরা সে-কাজের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন।

দু'টি চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ক'রে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এক সময়ে এঁদের (দলকে নয়, চিন্তাধারাকে) দুই নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। এক ধারা বিপ্লবী, অপর ধারা বিদ্রোহী। এই দু'টি ধারার সংঘর্ষ আর মিলন বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

যুগান্তর অনুশীলন দু'টি নাম প্রায়শ: পাশাপাশি চলেছে। চলেছে, তার কারণ, দু'টির চরিত্র এবং উৎপত্তির হেতু তেমন ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা হয় নাই। দু'টির মিলন-চেষ্টা ও তার ব্যর্থতাও বার বার এসেছে ঐ একই কারণে। ভাসাভাসা ভাবে দেখে অনেকে দুঃখও করেছেন—একই আদর্শ দু'টি দলের, তবু তাদের বিরোধ কেন?

এখানে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন—অনুশীলন আর ঢাকা অনুশীলন এক নয়। শেষোক্ত সমিতি কলকাতা সমিতির শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ১৯০৮ সাল থেকে ধর-পাকড় এবং সমিতিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হবার পর কয়েক বছরের ভিতর কলকাতা অনুশীলন, আত্মোন্নতি এবং বাংলার অন্যান্য সমিতির পৃথক্ অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং পূর্বেকার যুগান্তর কাগজ থেকে একটা সাধারণ নাম পায় যুগান্তরের দল। কেবল এককেন্দ্রিক ঢাকা অনুশীলন সমিতি তার প্রতিজ্ঞাপত্র এবং গঠনবিধি নিয়ে গুপ্তসমিতি হিসাবেও পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখে। এইটিই সাধারণত: অনুশীলন আখ্যায় পরিচিত।

অপর দিকে যুগান্তর দল গড়তে চেষ্টা পায় নাই, জাতের জাগরণকে অভিব্যক্তির ধারা ধ'রে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। বিপ্লবের প্রয়োজনে স্তরে স্তরে দল গ'ড়ে উঠেছে—প্রতিজ্ঞাপত্র, নিয়মকানুন, সদস্য-তালিকা কিছুই ছিল না এঁদের—আবার বিপ্লবেরই প্রয়োজনে দল ভেঙেও গেছে, কখনও বা ভেঙে দেওয়াও হয়েছে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে। এ ধরণের রাজনৈতিক সংস্থার কথা সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না। তার হেতু নিহিত রয়েছে এর সৃষ্টি ও শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর। সেকথা পরে আসবে।

ঘর পর অনেকে অনেক সময় একে দেখেছে, যেমন ক'রে অপর কোন রাজনৈতিক বা বিদ্রোহী দলকে দেখতে অভ্যস্ত, তেমনি ক'রে। আদি যুগে যেমন এটা তিলকের, ওটা অরবিন্দের, সেটা লাজপত রায়ের দল এই সব নাম শোনা গেছে, ইদানীংও ঐরকম নামের সঙ্গে অনেকে জড়িয়ে রয়েছেন। আবার বিদ্রোহী দলের সংস্পর্শে, সংঘাতে যাঁরা বিশেষ পরিচয়ের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, তাঁরা রাতারাতি কোথাও একটা নতুন নামের অবতারণা করেছেন। বিদেশী রাষ্ট্রও নিজের স্বার্থে কখনও বা এক রাজসাক্ষীর মুখে প্রথম দু'দিন যুগান্তরের, তার পর থেকে অপর এক নাম প্রচার করেছে। ক্রমশ:

—•—

ঢেউ

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

ঝাউবনটা শেষ হ'তেই বিশাল রূপটা চোখে পড়ল। এতক্ষণ মনেই হয় নি কারো। ঝাউবনটার ওপারেই সেই দুরন্ত ভয়ঙ্কর বিশাল আকারে অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। সকালে বাতাস বইছিল এলোমেলো। ঝাউবনের পাতায় পাতায় শিরশিরানি। সূর্যের আলো ঠিক্‌রে পড়ছে এখানে-সেখানে।

শ্বেতা অস্ফুটে ব'লে উঠল, 'উঃ, কি ভয়ঙ্কর রূপ, দূর থেকেই ভাল বাবা। কাছে যেয়ে কাজ নেই আর।' ওর স্বামী প্রশান্তর বাঁ-হাতের আঙুলটি আঁকড়ে ধরল সে।

সস্নেহে প্রশান্ত হাসল। বলল, 'পাগল নাকি? জলের ধারে না যাও, অন্ততঃ বীচে গিয়ে বসবে চল খানিকটা।'

এসেছে ওরা চারজন। প্রশান্ত, শ্বেতা, ওদের তিন বছরের ফুটফুটে মেয়ে কাজলী আর ভৃত্য হরিপদ। মাত্র তিন দিনের ছুটিতে বেরিয়েছে ওরা। কলকাতার ঘিঞ্জী গলির দোতলার বাসা থেকে খোলামেলা কোন জায়গায়, তা সে যেখানেই হোক্। চারিপাশে অবারিত মাঠ, বন-ঝোপ আর গাছগাছালি। মাথার উপর নীল আকাশের চাঁদোয়া। পাখী ডাকবে পিড়িং পিড়িং সুরে। সরল গ্রামীণ লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে এটা-সেটা কিনবার সময়। ঝোপেঝাড়ে জোনাকী জ্বলবে সন্ধ্যে হ'লেই। নানা জ্যামিতিক রেখার আকৃতিতে পরী-রাজ্যের সৃষ্টি করবে ওদের বিমুগ্ধদৃষ্টির সামনে।

শ্বেতা ঘাড় দুলিয়ে বলেছিল, 'তিনদিন হোক্ আর যাই হোক্, বেরিয়ে পড়ি চল বাপু। শতখানেক টাকা না হয় খরচই হবে। সে আমি ম্যানেজ ক'রে দেব তোমায়।'

প্রশান্ত লোকটা ভালমানুষ। স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মত দুঃসাহস তার কোনদিনই নেই। নির্বিরোধী শান্ত-প্রকৃতি। এ ব্যাপারে নামটা তার সার্থক। সে বলেছে, 'বেশ ত, চল না বেরিয়ে পড়ি। বিয়ের পর কোথায় আর গেলাম আমরা? লোকে কত হিল্লী-দিল্লী ক'রে বেড়াচ্ছে'—

টাইম-টেবিল পেতে নানা চিন্তা। খরচের হিসেব, থাকবার জায়গা, তার উপর যাতায়াতের ব্যাপারটা, চিন্তা কি একটাই? সাত সতের, অশুন্তি। মিছিলের মুখের মত শেষ হতে চায় না যেন।

শ্বেতাই ঠিক করল জায়গাটা। দীঘা, সেই ভাল হবে। কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়, অথচ সম্পূর্ণ অভিনব পরিবেশ। সমুদ্র আছে, গ্রাম আছে। আবার যাতায়াতের সুবিধা, থাকবার জন্য গোটা একটা বাড়ী পাওয়া যায় শুনেছে। চেয়ার, টেবিল, খাট-বিছানা, চাদর-বালিশ সবকিছু প্রস্তুত। তুমি শুধু পেটের ক্ষিধে আর পকেটের মনিব্যাগটি নিয়ে এলেই হবে। বাসন-কোসন, কাপ-ডিশ মায় একটা জনতা কুকার পর্যন্ত। জল তুলে দেবে টিউবপাম্পে ছাদের উপরকার ট্যাঙ্কে। বাথরুমে ধারাস্নানেরও ব্যবস্থা আছে। শ্বেতা শুনেছিল অনেকের কাছে, আজ বেড়াতে এসে মিলিয়ে দেখে, সব ঠিক। কথার আর বাস্তবের ফারাক নেই একটুও।

ঘাড় দুলিয়ে প্রশান্তকে বলেছে, 'দেখেছ, কি সুন্দর সব ব্যবস্থা। আসতে হয় ত এমনি জায়গাই ভাল। ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই। অথচ কেমন সব ঠিকঠাক, বন্দোবস্ত'—

প্রশান্ত বেচারা বাসের ঝাঁকুনিতে বেশ একটু কাবু। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে সে একটু হাসল। বলল, 'এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা কর দেখি। আর সমুদ্র-দর্শন ক'রে আসবে চল। ঐ ঝাউবনটা পেরুলেই সমুদ্র।'

কাজলী বাইরের মাঠে ছুটোছুটি সুরু করেছে। কলকাতার ঘিঞ্জী গলিতে মানুষ হয়েছে এতদিন। খোলা-মেলা অবারিত মাঠ, গাছপালা, বুনোফুল আর প্রকৃতির সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে পরিচয় হয় নি আগে। হরিপদ ওর পিছনে ছুটে ছুটে হয়রান। মেয়ে যেন মাঠের ফড়িং। হাল্কা দু'টি পায়ে ছুটে চলেছে এদিক্ থেকে সেদিকে—

চা খেয়ে সমুদ্র দেখতে গিয়েছিল ওরা। ঝাউবনটা পেরিয়েই বিশাল ভয়ঙ্কর রূপ। নতুন যারা আসে, প্রথম দর্শনেই তাদের বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই কোন। ঢেউ আর ঢেউ, একের পর এক! সাদা ফণা-তোলা সাপের মত অবিচ্ছিন্ন গতিতে গড়িয়ে পড়ছে তীরের বুকে।

সামনে তাকালে কোন চিহ্নই পড়ে না চোখে। দূরে ধোঁয়া-ধোঁয়া রেখা।

প্রশান্ত বলল, 'তবু ত দীঘার সমুদ্র অনেকটা শান্ত। খালি বীচটাই সুন্দর যা'—

—'তার মানে? এই তোমার শান্তশিষ্ট সমুদ্র? কি ঢেউ রে বাবা! দু'তিন হাত উঁচু উঁচু ঢেউ সব। একে কি শান্তশিষ্ট বলে নাকি?'

—'এই ব্রেকার দেখেই ঘাবড়ে যাচ্ছ তুমি। পুরীর সমুদ্রের ঢেউ এর চেয়ে অনেক বেশী।'

—'আর বেশী দেখে কাজ নেই আমার। এতেই সন্তুষ্ট আমি। এর চেয়েও উঁচু উঁচু ঢেউ! তাতে কি আর ধীরেসুস্থে চান করতে পারে নাকি?'

সময়টা ঠিক বেড়াতে আসার মত নয়। আর মাস-খানেক পরেই পুজো। ভিড় হবে তখন। ঠাঁই পাবার এতটুকু উপায় থাকবে না। গোটা আট-দশ বাড়ী আছে ভাড়া নেবার মত। তার মধ্যে মাত্র তিনটে লোকজনে ভর্তি। বাকীগুলো খালি এখন। সন্ধ্যামণি ফুলের লতা উঠেছে ছাদে। সামনের মাঠে ফুলের গাছ। ঝোপঝাপ। চওড়া পীচের রাস্তা চ'লে গেছে সামনে দিয়ে। ঝাউবনের পাশ কাটিয়ে, সমুদ্রের কোল ঘেঁষে।

কি ভেবে বেরিয়ে পড়ল শ্বেতা। দুপুরের প্রায় শেষ। খেয়েদেয়ে প্রশান্ত ঘুমোচ্ছে ঘরে। বড্ড ঘুমকাতুরে মানুষটা। দুপুরে একবার গড়িয়ে নেওয়া চাই-ই। আর মেয়েও হয়েছে তেমনি। বাপের কোল ঘেঁষে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। ছুটির দিনে বাপের গলা জড়িয়ে ওর ঘুমোনো চাই—

পীচঢালা পথটা গিয়েছে সামনে। ওধারে কোথায় সুবর্ণরেখার মোহনা। তার পরেই উড়িষ্যার সুরু। রামনগর থানার এই এলাকাটা উড়িষ্যারই মত। কথার সুরে উড়িয়া টান। শ্বেতা লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। খানিকটা এগিয়ে বেশ ফাঁকা। লোকজন নেই, ঘরচালের সন্ধান নেই। শুধু বনজঙ্গল আর গাছগাছালি। সমুদ্রের ধারে ঝাউবনটা নির্জন, নিবিড় সুষমায় ভরা।

কে একজন এগিয়ে আসছে ওপাশ থেকে। শ্বেতা সাহস পেল একটু। মনে মনে কখন যে আশঙ্কার মেঘটা নিবিড় জমাট হয়ে দেখা দিয়েছে বুঝতে পারে নি শ্বেতা। লোকটাকে দেখে যেন হাল্কা হয়ে এল মনটা। পায়ে ভারী জুতো, চোখে সানগ্লাস, এলোমেলো উড়ু উড়ু চুল। পরণে খাকী রঙের ট্রাউজার্স। শ্বেতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মানুষটাকে, যেন একটু চেনা চেনা, যেন পরিচিত মনে হয়। অথচ আগে কোথায় দেখেছে ঠিক স্মরণ হয় না তার।

ওকে দেখে মানুষটাই এগিয়ে এল লম্বা লম্বা পা ফেলে।—'আরে, শ্বেতা না? কি আশ্চর্য বলো দিকি। শেষটা তোমার দেখা পাব দীঘায় এসে, আগে কখনও ভাবি নি।' চিনতে পেরেছে শ্বেতাও। কলেজের নীলাঞ্জন মিত্রকে এখন অবিশ্যি চেনা যায় না আর। তার পর দশটা বছর গড়িয়েছে দেহটার উপর দিয়ে। ভারী মেদসর্বস্ব হয়েছে চেহারাটা। চোখের সানগ্লাস, কাঁধের ক্যামেরাটা আরও অচেনা ক'রে তুলেছে মানুষটাকে। কিন্তু সিগারেট খাওয়ার সেই ভঙ্গিটা? নীলাঞ্জন বলত সেটি ওর নিজস্ব। কবে কোন্ যুগে ফরাসী দেশে এক ভদ্রলোক নাকি প্রবর্তন করেছিলেন ওই বিশেষ ভঙ্গিটির। নীলাঞ্জন বই প'ড়ে আয়ত্ত করেছে সেটি। কলেজের ছেলেরা ঠাট্টা ক'রে বলত সব। নীলাঞ্জন গায়ে মাখত না সে কথা। বলত, বিশিষ্টতার নাম যদি স্নবারি হয় তবে সে বেচারী নাচার।

সেই নীলাঞ্জন মিত্র। দশ বছর পরে আবার যে দেখা হবে, শ্বেতা ভাবতে পারে নি। কলকাতায় ব'সে এর চিন্তাও করে নি কোনদিন। জানতে পারলে দীঘা আসতে রাজী হ'ত কি শ্বেতা? নিজের মনটাকে খুঁচিয়ে দেখল সে। কোন সদুত্তর পেল না। হয়ত আসত না, কিংবা হয়ত আসত। কি জানি কি করত। শ্বেতার হাসি পেল হঠাৎ।—

নীলাঞ্জন বলল, 'কথা পরে হবে। আগে দাঁড়াও দিকি, একটা স্ন্যাপ নি তোমার। বোধ হয় একটাই আছে আর।'

সভয়ে শ্বেতা ব'লে উঠল, 'আরে, আরে, করো কি! মাথার দিকে চেয়ে দেখছ না? অত চট্ ক'রে ছবি নেওয়া যায় নাকি? তখন ছিলাম কলেজের বান্ধবী, নিজেই নিজের অভিভাবক। এখন আর একজনের অনুমতি নিতে হবে যে'—

—'অনুমতি যদি নিতে হয়, বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসব। এখন তুমি শট্‌টা নিতে দাও দিকি'—

নীলাঞ্জন নাছোড়বান্দা। কলেজের স্বভাব একটুও বদলায় নি ওর। শ্বেতাকে দাঁড়াতে হ'ল। ঝাউবনের পটভূমিকায় নীলাঞ্জন ছবি নিল, একটা নয়, দুটো। মিথ্যে বলেছিল নীলাঞ্জন। ক্যামেরাতে ওর দুটো ফিল্মই অবশিষ্ট ছিল।

—'বিকেলে আসছ নিশ্চয়? আলাপ করবে না ভদ্রলোকের সঙ্গে?'—একটু হেসে বলল শ্বেতা।

হাসল নীলাঞ্জন। 'নিশ্চয় যাব। আলাপ করিয়ে দিও ভদ্রলোকের সঙ্গে। কত নম্বরে আছ তোমরা? ক'দিন থাকছ?'—

পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। নীলাঞ্জন থাকে সরকারী হোটেলে। একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে। এখন ভুবনেশ্বরে আস্তানা ওর। ছবি আঁকার নেশা আছে, ক্যামেরাতে ছবি তোলারও। কোন্ একটা কোম্পানীতে কি যেন কাজ করে। বিয়ে-থা দূরের কথা, এখন চালচুলো নেই কোন। সংসারে আপন বলতে প্রায় সকলকেই হারিয়ে ব'সে আছে বেচারী। পুরোপুরি বোহেমিয়ান মানুষটা। ওর উড়ু উড়ু চুল, আর বড় বড় চোখে যেন ঝড়ের সঙ্কেত। বৈশাখী নয়, চৈত্রের ধুলোঝড়। পাতা উড়ে বেড়ায়, কোথাও স্থির থাকে না।

—'তুমি কতদিন থাকছ এখানে? নিশ্চয় ভাল লেগেছে জায়গাটা?'—

নীলাঞ্জন মিষ্টি ক'রে হাসল। বলল, 'এখন লাগছে। মনে হচ্ছে আর কিছুদিন থাকি। নইলে চ'লে যাওয়া ত প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছিলাম।'

—'এদিকে কোথায় গিছলে?'

—'ছবি আঁকতে। ছবি তুলতেও বলতে পার।'—নীলাঞ্জন ওর পিঠের দিকে ইসারা করল। ঝোলান ব্যাগটার মধ্যে তুলি, রং আর কিছু হয়ত থাকবে। কাঁধের ক্যামেরাটা ত ছবি তোলারই জন্য।

—'কালকে এস না দুপুরে। ওই ঝাউবনটায় পাবে আমাকে। আমার আঁকা ছবি দেখাব। ভদ্রলোকের অসুবিধে হবে না নিশ্চয়'—নীলাঞ্জন বাঁকা হাসল।

শ্বেতা বলল, 'ভদ্রলোক ঘুমুবেন দুপুরে। তখন বৌকে না হ'লেও চলবে। বেশ ত, আসব'খন। তুমি কিন্তু বিকেলে আসছ ত?'

বাড়ী ফিরে আর প্রশান্তকে কিছু ভাঙ্গল না শ্বেতা। ভাবল, বিকেলেই সারপ্রাইজ দেবে একটা। নীলাঞ্জনকে কেমন লাগবে প্রশান্তর? এমনিতে বেশ ছেলে নীলাঞ্জন। তবে ঐ দোষ। ঝোঁকটা একটু বেশী। যা চাইবে, নাছোড়বান্দার মত আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু প্রশান্তর তাতে কি এসে যায়? ওকে ত আর বিরক্ত করতে আসছে না নীলাঞ্জন?

বিকেলে কিন্তু এল না সে। শ্বেতা চুল বাঁধল, প্রসাধন সেরে নিল। উজ্জ্বল আকাশী রঙের একটা শাড়ীও পড়ল। দু'একবার পথের দিকে উঁকিঝুঁকিও দিল সে। কিন্তু কই? নীলাঞ্জনের দেখা নেই।

অগত্যা বীচেই বেড়াতে যেতে হ'ল। প্রশান্ত ঠাট্টা ক'রে বলল,—'এত সাজগোজ ক'রে বীচে যাচ্ছ। দেখো, সমুদ্র আবার না প্রেমে প'ড়ে যায়।'

চোখ পাকিয়ে বলল শ্বেতা, 'মুখের একেবারে আগল নেই তোমার। দেখছ না, হরিপদ সামনে। আর সমুদ্র তোমার ভাল লাগতে পারে, অত ঢেউ আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না।'

বীচেও নীলাঞ্জন নেই কোথাও। ঘুরে-ফিরে দেখল শ্বেতা। যা খামখেয়ালী। হয়ত তুলি আর রং নিয়ে আনমনা হয়ে ব'সে আছে কোথাও দূরে। ছবি আঁকছে কিংবা সমুদ্র-চিলের পাক খেয়ে উড়ে বেড়ান দেখছে।

বীচে ভীড় কম। জেলেরা মাছ ধরছে জাল ফেলে। গাংচিল উড়ছে মাথার উপর। সূর্য অস্ত যাচ্ছে ঝাউ-বনের ওপারে। বালির উপর লাল লাল ছোট ছোট কাঁকড়া। কাজলী তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। হরিপদ ওর পিছনে ছুটে ছুটে হয়রান—

পরদিন দুপুরে বেরিয়ে পড়ল শ্বেতা। কি একটা আকর্ষণ। কতবার ভেবেছে সে। যাবে না এমন ক'রে লুকিয়ে। কোথায় কোন্ ঝাউবনের ভিতর এমন ক'রে দেখা করতে যাওয়া উচিত নয়। কলেজে পড়তে ক্লাস পালিয়ে দুজনে যা করেছি, তা কলেজেই মানায়। কিন্তু তবু পায়ে পায়ে কিসের যেন সাড়া। শ্বেতা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না।

ঝাউবনের ভিতর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই একটা কি পেতে বসেছে নীলাঞ্জন। মনোযোগ দিয়ে তুলি টানছে। শ্বেতার পায়ের শব্দ যেন ওর কতকালের চেনা। মুখ না ফিরিয়েই বলল সে, 'আসতে কিন্তু দেরি হয়েছে তোমার। আমি কতক্ষণ ব'সে'—

তুলিটা ফেলে দিয়ে তাকাল নীলাঞ্জন। আজ আর সাদামাটা পোশাকে আসে নি শ্বেতা। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন, কপালে খয়েরী টিপ, পরণে ঢাকাই শাড়ী।

দু'জনে মুখোমুখী বসল। তুলির টানে একটি মেয়ের প্রতিচ্ছবি এঁকেছে নীলাঞ্জন। কয়েকটি কালো কালো রেখার সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়েছে নারীমূর্তি। সমুদ্রের ধারে এলোচুলে দাঁড়িয়ে মেয়েটি। যেন চেনা-চেনা। ঠিক শ্বেতার মতই। হ্যাঁ, অবিকল।

—'আমার ছবি আঁকলে যে বড়?' কৃত্রিম কোপ এনে ওর দিকে তাকাল শ্বেতা।

—'দোষ করেছি?'

—'হ্যাঁ, করেছ। তা ছাড়া কাল বিকেলে যে গেলে না বড়?'

—'ইচ্ছে ক'রেই গেলাম না আর। ভাবলাম, কি দরকার ভদ্রলোককে বিরক্ত ক'রে? তুমিও বিব্রত হবে হয়ত'—

শ্বেতা হাসল। বলল, 'বুঝেছি। তুমি আসলে ভীরু।'

—'যা ইচ্ছে অপবাদ দাও।'

কথায় কথায় পুরাণো দিনের ইতিহাসই ভেসে এল। কলেজের কথা, বান্ধবীদের কথা, নীলাঞ্জনদের বাড়ীর কথা। পুরাণো স্মৃতির ঘনত্ব বেশী। তাই ওর আমেজ কাটতে চায় না। বর্তমানটাই জোলো আর পানসে।

বীচে বেড়াল দু'জনে। থার্মোফ্লাস্কে ক'রে আনা চা খেল। আরও একরাশ ছবি তুলল নীলাঞ্জন। প্রায় একডজন, বেশীও হ'তে পারে। শ্বেতার বেশ কয়েকটা। কোনটা বসা অবস্থায়, কোনটা কোণাকুণি, কোনটা একটা বিশেষ ভঙ্গিমায়। প্রতিবারেই বাধা দিয়েছে শ্বেতা। কিন্তু নালাঞ্জন নাছোড়বান্দা। এমন করুণভাবে চাইবে যে কিছুতেই ওকে ফেরাতে পারে নি শ্বেতা।

একসময় বলল নীলাঞ্জন, 'ক'দিনের জন্য পুরী বেড়িয়ে আসবে চল না। মন্দিরের দেশ। কোণারক দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি। আর কি ঢেউ সমুদ্রে—যাবে?'

সত্যি, ছেলেমানুষ নীলাঞ্জন। শ্বেতার মনে হ'ল, সেই কলেজের পর আর এতটুকু বয়স বাড়ে নি ওর। তার পর কত শীত-গ্রীষ্ম এল-গেল। কিন্তু নীলাঞ্জন তেমনি আছে।

শ্বেতা বলল, 'চলি আজকে। ঘুম থেকে উঠে হয়ত খোঁজাখুজি করবে। বিকেল হয়ে এল প্রায়।'

কাল আসছ ত? আমি কিন্তু অপেক্ষা ক'রে থাকব'—

আজ ভোরেই চ'লে যাবে প্রশান্তরা। সেই ব্যবস্থাই ঠিক। মাত্র তিন দিনের ছুটি। দু'দিন ত এখানেই কাটল। কিন্তু সে কথা ওকে বলল না শ্বেতা। একটা নারীসুলভ ভঙ্গি ক'রে হাসল। বলল, 'এলে খুশী হও খুব?'

নীলাঞ্জন মুখ উজ্জ্বল ক'রে উত্তর দিল, 'খুউব'—

—'বেশ আসব তা হ'লে। ঠিক এই সময়।' শ্বেতা ফিরে চলল।

সন্ধ্যের পর প্রশান্তকে বলল শ্বেতা, 'আর দু'দিনের জন্য থেকে যাবে? তোমার ছুটি বাড়ান চলে না?'

—'কেন চলবে না? কালই তা হ'লে লিখে দিই একটা'—

অমাবস্যার রাত। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রেস্তরাঁর খোলা ছাদে বসল। মাথার উপর ছাতার মত ছোট্ট আবরণ। এখান থেকে বেশ দেখা যায় সমুদ্র। ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে তটে। একের পর এক বিরাম নেই, যতি নেই, ছেদ নেই—

অনেক রাতে কি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল শ্বেতার। কোথায় যেন চ'লে যাচ্ছে সে। কাজলী কাঁদছে, প্রশান্ত উদাসমুখে বসে। ওকে কেউ বাধা দিচ্ছে না ওরা। ঢেউ-তোলা সমুদ্রের পাশ দিয়ে, ঝাউবনটার মধ্যে কোথায় যেন চলেছে সে।

প্রশান্তকে একটা ঠ্যালা দিয়ে ঘুম ভাঙাল শ্বেতা। 'এই, ওঠো না। কি হচ্ছে, শুনছ?'

ঘুমভাঙা চোখে প্রশান্ত বলল, 'কি ব্যাপার? ভয় পেলে কেন?'

—'কিসের শব্দ?'

—'সমুদ্রের ঢেউ এসে পড়ছে। আজ অমাবস্যা না? সমুদ্র আজ ভীষণ রূপ নেবে'—

শ্বেতা ওর বুকে মুখ লুকিয়ে রইল।

—'যাবে দেখতে সমুদ্র? চল না, এই রাতে একবার দেখে আসি।'

দু'টি ছায়ামূর্তি বীচে এসে দাঁড়াল। এখন বীচ আর নেই প্রায়। সমুদ্রের জলে সব একাকার। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুধু। তীরে এসে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। অবিরত, অবিরাম।

শ্বেতা বলল, 'আর ছুটি বাড়িয়ে কাজ নেই তোমার। আজ ভোরেই চল ফিরে যাই'—

—'কেন? ভাল লাগছে না আর?'

—'একদম না, চল তাড়াতাড়ি, গোছগাছ করতে হবে আবার।'

ভোরের বাস ছাড়ল। তখনও অন্ধকার কাটে নি ঠিক। একটা আলো-আঁধারি ভাব। সবে কাক ডাকছে। লোকজন উঠতে দেরি আছে—

শ্বেতা ভাবল, এখন ঘুমুচ্ছে নীলাঞ্জন। কিংবা স্বপ্ন দেখছে হয়ত। ভুবনেশ্বরে ফিরে গিয়ে স্বপ্নই দেখবে বেচারী। ওর ছবিগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখবে কতবার। ভাগ্যিস্, কলকাতার ঠিকানাটা দেয় নি শ্বেতা। কি লোভাতুর অনুজ্জ্বলে হয়েছিল নীলাঞ্জনের দৃষ্টিটা, শ্বেতা সভয়ে শিউরে উঠল।

কাজ নেই শ্বেতার। সর্বনাশা ঢেউ আর সমুদ্রের তীর থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে সে। কলকাতার গলিই ভাল। জীবন সেখানে নিস্তরঙ্গ। এমন ঢেউ নেই শত শত। ভয় নেই সবকিছু হারিয়ে বসার। ঢেউ এসে কোনদিন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না ওর সাধের নীড়টুকু।

কাজলীকে বুকের কাছে নিবিড় ক'রে টেনে নিল শ্বেতা।
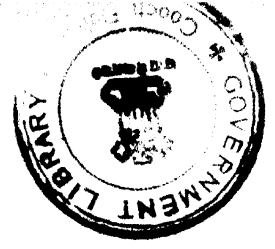
জাতীয় আয়ের কথা

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

ইয়োরোপ-আমেরিকাতে যে-স্থলে মাথাপিছু আয় ১২,০০০ টাকা, ভারতে সেইস্থলে হয় ১২০।২৪০ টাকা। ইয়োরোপ-আমেরিকায় যে-স্থলে আয়ের শতকরা ১২ ভাগ মাত্র খাদ্যের উপর খরচ হয়, আমাদিগের সেইস্থলে হয় শতকরা ৯০ ভাগ। অর্থাৎ ইয়োরোপ-আমেরিকার মানুষ তাহার ব্যবহারের জন্য যে-স্থলে হাজার রকম দ্রব্য ক্রয় করে, আমরা সে-স্থলে ক্রয় করি শুধু চাল, আটা, ডাল, লবণ, লঙ্কা, তেঁতুল, ফোড়নের মশলা ও কালেভদ্রে এক-আধটা ঘটি, বাটি, বালতি ও লণ্ঠন। দড়ি, বাঁশ ও খড়পাতা হইল আমাদিগের শতকরা ৬০ জন ভারতবাসীর গৃহ-নির্ম্মাণের মালমশলা। এমত অবস্থায় যদি সহস্র সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করিয়া মানুষের কর্ম্মশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে যে অর্থ নৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা আমরা সর্ব্বত্র দেখিতেছি। রাওরখেলার কারখানা গঠনে জাতীয় মূলধন (ধারকর্জ্জ-সমেত) ২৫০ কোটি টাকার অধিক খরচ হইয়াছে; দুর্গাপুর ও ভিলাইয়ে হইয়াছে কাছাকাছি ২০০ কোটি হিসাবে। এই সাড়ে ছয়শত কোটি টাকা দিয়া তিনটি কারখানা গঠন করিয়া ভারতের এখন অবধি শতকরা বার্ষিক ১॥০ টাকা প্রমাণ লাভ হইতেছে। অর্থাৎ ৪।৪॥০ টাকা সুদে টাকা ধার করিয়া লোকসানই হইতেছে বৎসরে ১৫।২০ কোটি টাকা প্রমাণ। এই তিনটি কার-খানায় সাক্ষাৎভাবে ৩০ হাজার লোক কার্য্যে নিযুক্ত আছে ও পরোক্ষভাবে ধরা যাউক আরও ৩০ হাজার ব্যক্তি নিযুক্ত আছে। প্রথম ৩০ হাজার মাসে মোটামুটি ১৫০ টাকা করিয়া রোজগার করে ও দ্বিতীয় ৩০ হাজার করে ৭৫ টাকা মাসিক। অর্থাৎ মাসে ৬৫ লক্ষ টাকা বেতন বণ্টন করা হয়। বৎসরে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। এই সকল কর্ম্মীর পরিবারবর্গের সংখ্যা যোগ করিলে ২ লক্ষের অধিক হইবে। সুতরাং মাথাপিছু এই ২ লক্ষ ৬০ হাজার লোক বৎসরে পাইয়া থাকেন ৭৮০০০০০০÷২৬০০০০=৩০০ টাকা মাত্র। এই ঐশ্বর্য্যের তহবিল হইতে রাজস্ব কিছুটা বাদ যাইবে, বাকি ভোগে লাগিবে। এক ব্যক্তি যদি দৈনিক ১ টাকা প্রমাণ খাদ্যে খরচ করে তাহা হইলে উপরোক্ত রোজগার হইতে তাহার খরচ মিটিবে না। দৈনিক ৷৹ আনা খাইলে ১৮২॥০ টাকা ব্যয় হইবে। ইহা সম্ভব কি না বিচার্য্য। সে যাহা হউক সাড়ে ছয়শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যদি লাভও না হয় এবং কর্ম্মিগণ উপযুক্তভাবে পরিবার প্রতিপালন করিতেও না পারে, তাহা হইলে ঐ জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল্য কি? কারখানা স্থাপন করিয়া যদি মানুষের জীবনযাত্রা উচ্চ উন্নততর না হয় তাহা হইলে কারখানা বাড়াইয়া লাভ কি? কারখানার শ্রমিকদিগের জীবন-যাত্রা কারখানার বস্তিতে গিয়া বাস করিলে উন্নততর হয়ই না, বরং নিকৃষ্টই হয়। মদ্যপান, জুয়াখেলা, স্ত্রীলোকঘটিত অপকর্ম্ম এবং এই সকলের খরচের জন্য চুরি, উচ্চসুদে কর্জ্জ করা ইত্যাদি সর্ব্বত্রই কারখানার শ্রমিক জীবনের অঙ্গ। খাদ্যদ্রব্য ধারে ক্রয় করিয়া ওজনে, ভেজালে ও মূল্যে প্রতারিত হওয়াও শ্রমিকদিগের জীবনের একটা অতি সাধারণ কথা। ধূম্র, ধূলা, আবর্জ্জনা ও সংক্রামক ব্যাধিসকলও এই জীবনযাত্রার মধ্যে সর্ব্বদা লক্ষিত হয়। সকল আনুষঙ্গিক ধরিয়া বিচার করিলে কারখানা খাড়া করিয়া বহু লোককে একত্র করিয়া কাজ করাইলে জাতীয় উন্নতি হয় বলিয়া মনে হয় না। এক-একটি লোকের কাজের জন্য ৫০ হাজার হইতে ২ লক্ষ টাকা মূলধন লাগে ও ঐ হিসাবে ২০ কোটি লোকের কাজ সৃষ্টি করতে হইলে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হইতে পারে। ভারত সরকার ও ভারতের ধনপতিগণের মিলিত চেষ্টায় ৫০ বৎসরেও ঐ পরিমাণ অর্থের $\frac{১}{২০}$ ভাগও ভারতে জমা হওয়া সম্ভব নহে। অর্থাৎ কারখানা খাড়া করিয়া ২ কোটি লোকের কাজের ব্যবস্থা করাও ভারতে সম্ভব হইবে না। কিন্তু ভারতে যে পরিমাণ পতিত জমি বিনা চাষে পড়িয়া থাকে সেগুলি চাষের ব্যবস্থা করিতে বিঘাপিছু ৫০০ টাকা খরচ করিলেই হয়ত বহু কোটি বিঘা জমি চাষের উপযুক্ত করিয়া ফেলা যায়। গোপালন, মেষ, ছাগ ও শূকর পালন; মুরগী ও হাঁসের কারবার, মাছের, ফলের, বৃক্ষের ও অন্যান্য ভূমিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থা করিলে একটি কর্ম্মীর নিয়োগের জন্য ১০০০-৫০০০ টাকা মূলধনই যথেষ্ট। এই হিসাবে ৩০ কোটি লোকের কাজের

ব্যবস্থা করিতে ৩০০০০-১৫০০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। ভারতের জাতীয় আয় যদি আগামী ২৫ বৎসরে মোটমাট বাৎসরিক ২৫ হাজার কোটি টাকা হয় ও যদি তাহার শতকরা ১৫ টাকা মাত্র জমান সম্ভব হয় তাহা হইলে ২৫ বৎসরে ৬০-৭০ হাজার কোটি টাকা প্রমাণ মূলধন জমা করিয়া সকল ব্যক্তির শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। এই চেষ্টা না করিয়া বিদেশে কর্জ্জ করিয়াও উচ্চ মূল্যে বিদেশী যন্ত্র ক্রয় করিয়া কারখানা স্থাপনের ফলে আমাদিগের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া অতলে যাইতে বসিয়াছে। ভিক্ষুক, উন্মাদ, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, শীর্ণকায় শিশু ও বালক-বালিকা, চোর, ঠক ও নিষ্কর্ম্মা সমাজদ্রোহীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বাড়িয়া চলিতেছে মিথ্যা আড়ম্বর, উন্নতির ভড়ং এবং লোক-দেখান প্রগতির বিফল অভিনয়। ভিতরটি যদিও সম্পূর্ণ ফাঁকা। ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল হইত, নিজের শক্তিতে নিজের উন্নতি ও প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা গড়িয়া তুলিতে পারিলে। এবং তাহা সম্ভব হইত, যদি না আমাদিগের নেতাগণ স্বাদেশিকতার ভণ্ডামিতে মগ্ন হইয়া বিদেশীর সান্নিধ্য সন্ধানে ও অনুকরণে মশগুল হইয়া থাকিতেন। বর্ত্তমান জগতে যে কয়টি বিশেষ বিশেষ উদাহরণ পাওয়া যায় জাতীয় সমৃদ্ধি সাধনের, তাহার মধ্যে জার্ম্মানীর ও রুশিয়ার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই জাতির মধ্যে কোনটিই বিদেশের সাহায্যে কলকারখানা স্থাপন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করে নাই। ভারতের পরমুখাপেক্ষী ভাব তাহার সকল দুর্ব্বলতা, দারিদ্র্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা পরস্পর নির্ভরশীল। আমাদিগের নেতাগণের সে ইচ্ছাও নাই, ক্ষমতাও কখন গড়িয়া উঠে নাই।

———

ইংরাজ শাসনে এই অল্পকালের মধ্যে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের ব্যবধান সত্ত্বেও অনেক ইংরাজি শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং অপেক্ষাকৃত অধিককালব্যাপী মুসলমান শাসনে শত শত আরবী ফারসী শব্দ বঙ্গভাষায় পুষ্টিসাধন করিয়াছে। এই হিসাবে বঙ্গভাষা যে সংস্কৃত ভাষার বিশাল উদরে ডুবিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!—বঙ্গভাষা ও বাঙ্গলা অভিধান, প্রবাসী—১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা ১৩০৮ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

"ক্ষুধিতের অন্ন"
(Freedom from Hunger)

গত বছর আমেরিকা গবর্নমেন্ট ঘোষণা করেন যে, সেদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হবার ফলে যে বিপুল অপচয় ঘ'টে চলেছে সেটি বন্ধ করার জন্য কুড়ি বছরে মোট পাঁচ কোটি একর জমিতে চাস বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে :

"Action must be taken to end the drift toward a chaotic, indifferent, and surplus ridden farm economy and to adjust product on which is far outrunning the growth of domestic and foreign demand for food and fibre."

আমাদের দেশে সম্প্রতি হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দেও, অর্থাৎ দশটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হবার পরেও, এদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোককে অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকতে হবে।

"প্রাচুর্যের মধ্যে অভাব"-এর এই বিচিত্র পরিস্থিতি দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) যুদ্ধোত্তর পর্বে "Freedom from Hunger" আন্দোলন সুরু করেছেন। সম্প্রতি এই আন্দোলনকে কার্যকরী করবার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলি এই বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা-সাপেক্ষে অনাহারক্লিষ্ট দেশগুলিকে উদ্বৃত্ত খাদ্য পাঠাতে সুরু করেছেন; দরিদ্র দেশগুলিও আপ্রাণ চেষ্টা করছেন জমির উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যথাযথ সামঞ্জস্য বিধানের।

আজ সারা পৃথিবীর সামনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মূলই বা কোথায়, সমাধানই বা কি? আমাদের মত দরিদ্র দেশে আজ যখনি খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা থেকে গম আসছে, তেমনি যাচ্ছে অন্যান্য সব ঘাটতি অঞ্চলের দেশে; এইভাবেই কি বরাবর চলবে? ১৯৫১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে ভারতবর্ষে পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল সেটি নিয়ে বহু বাগ্-বিতণ্ডা হয়ে গিয়েছিল; ১৯৬১-র আদমসুমারীতে দেখা গেছে যে, দশ বছর আগেকার ভবিষ্যৎবাণী নেহাৎ ভুল ইঙ্গিত করে নি। আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তার জন্য যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ ও সময় দেওয়া দরকার, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যা দ্রুততর গতিতে বেড়ে চলেছে। খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা ত বরাবরকার মত চলতে পারে না! আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যদি দেনা-পাওনার হিসাবে খাদ্য আমদানী চালিয়ে যেতে হয় তা হ'লে দেখা যাবে "উন্নত" এবং "অনুন্নত" এই দুই ভাগে বিভক্ত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য যে কারণে ব্যাহত হয়েছে এবং "অনুন্নত" দেশগুলির পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে, সেই কারণেই ভবিষ্যতেও বাণিজ্য ব্যাহত হবে। শিল্পোন্নতির যাবতীয় উপকরণের জন্য আমরা যাদের মুখাপেক্ষী, তারা আমাদের যতই সাহায্য করুক, আমাদের "কাঁচামালের সরবরাহকারী" দেশ হিসাবেই গণ্য করতে চাইবে। ইউরোপের দেশগুলি একজোট হয়েছে, আমেরিকা শুধু যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তাই নয়, দরিদ্র দেশগুলিকে যন্ত্রপাতি ও খাদ্য দিয়ে সাহায্য করছে; আর আমরা দেখছি, যেসব কৃষিজ পণ্য পাঠিয়ে আমরা বিদেশী অর্থ রোজগার করি, তার চাহিদা স্থিতিশীল অথবা মূল্য নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি ক্রেতার হাতে। যুদ্ধপূর্ব কয় বছরের সঙ্গে তুলনা ক'রে কৃষিজ পণ্যের আন্তর্জাতিক লেন-দেনের কয়েকটি হিসাব উল্লেখ করছি :

(ক) পৃথিবীর মোট রপ্তানীর হিসাব (মিলিয়ন মেট্রিক টন)

রপ্তানী	১৯৩৪-৩৮ (গড়)	১৯৪৮-৫২ (গড়)	১৯৫৪	১৯৫৭	১৯৬০
পাট	০·৭৯	০·৮৫	০·৯০	০·৮১	০·৮৩
চা	০·৩৬	০·৪১	০·৫০	০·৪৮	০·৪৯

(খ) কৃষিজ পণ্যের মূল্য—মূল্যসূচক (১৯৫২-৫৩=১০০)

	১৯৩৪-৩৮	১৯৪৮-৫২	১৯৫৪	১৯৫৭	১৯৬০
মোট কৃষিজ পণ্য	৩৪·০	—	৯৯·৪	৯৩·৭	৮৫·৩
কৃষিজ কাঁচামাল	৩[illegible]·৫	—	৯২·২	৯৪·৭	৭৯·৫
চায়ের মূল্য(মেট্রিক টন ডলার)	১৫·৮	—	১৩২৭·৩	১২২৮·৩	১২১৪·৪
পাটের মূল্য "	৬৩·৯	—	১০৫·১	২০৯·৫	২২৩·৭

(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কৃষিজ পণ্যের মূল্যসূচক ও পরিমাণসূচক (১৯৫২-৫৩=১০০)

(১) কাঁচামাল আমদানীর পরিমাণ

	(গড়)	(গড়)			
পঃ ইউরোপ	১১৬	৯৬	১০৭	১২৩	১১৭
উঃ আমেরিকা	৯৪	১১০	৭৭	৭৪	৬৬
সুদূর প্রাচ্য	১২১	৭৫	১০৩	১৩৩	১৭৭
পৃথিবীর মোট	১১০	৯৬	১০২	১১৫	১২০

(২) কাঁচামাল আমদানীর মূল্যের পরিমাণ

পঃ ইউরোপ	৩৮	৯৯	৯৬	১১০	৯৩
উঃ আমেরিকা	৩৪	১১১	৬২	৬৯	৬৪
সুদূর প্রাচ্য	৩৮	৮৪	৯৫	১১৭	১৩৫
পৃথিবীর মোট	৩৬	৯৯	৯০	১০৩	৯৫

(৩) কাঁচামাল রপ্তানীর পরিমাণ

পঃ ইউরোপ	১৮৩	৮৬	১০৩	১৩৮	১৫৯
উঃ আমেরিকা	১৫৮	১৩১	১৩০	২১১	২২২
সুদূর প্রাচ্য	১১৩	৯৫	৯৬	৯৮	৯৬
পৃথিবীর মোট	১০৬	৯৮	১০৫	১২০	১৩০

(৪) কাঁচামাল রপ্তানীর মূল্যের পরিমাণ

পঃ ইউরোপ	৫৯	৯২	১০০	১৪১	১২৮
উঃ আমেরিকা	৪৭	১২৮	১১৮	১৬১	১৪৫
সুদূর প্রাচ্য	৪০	১০৯	৭৯	৯৯	১১৫
পৃথিবীর মোট	৩৪	১০৫	৯৬	১[illegible]২	১১০

যুদ্ধ-পূর্বকালের তুলনায় দেখা যাচ্ছে সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির কাঁচামাল রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ে নি বরং কমেছে; মুদ্রার অঙ্কে যে বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, তার থেকেও দেখা যাচ্ছে কাঁচামাল রপ্তানী ক'রে মূল্য খুব বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। ইউরোপের দেশগুলি বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বল্পতর কাঁচামাল দিয়ে শিল্পদ্রব্য তৈরী করছে অথবা স্থানীয় উপজাত দ্রব্য বেশী পরিমাণে ব্যবহার করছে, যেমন তুলোর বদলে man-made fibre-এর প্রচলন উল্লেখ করা যেতে পারে।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ যাবৎ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চালিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর ক'রে দরিদ্র দেশগুলি তাদের খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে পারবে না। তাদের নির্ভর করতে হবে নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর। (প্রস্তাবিত 'এশিয়ান কমন মার্কেট' করতে গেলে যে ঐক্য দরকার তা এই মহাদেশে অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যাবে না।) এই সূত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিভিন্ন অঞ্চলে কি হারে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে সেই তথ্য দেখা যেতে পারে।

বিভক্ত হয়ে পড়ল, কৃষির ক্ষেত্রেও উভয় অঞ্চলে আমূল পরিবর্তন ঘটল। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে একদিকে যেমন বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন প্রয়োগে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি-নির্ভর লোকের সংখ্যা হ্রাস হ'তে লাগল, তেমনি কৃষিজ পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হ'ল; কৃষি হ'ল একান্ত ভাবে শিল্প ও বাণিজ্যের অনুগামী। বাণিজ্যিক কৃষির মূল কথা হ'ল লাভ-ক্ষতির হিসাবে দেনা-পাওনা; বেশী উৎপাদন হ'লে দাম কমবে, কম উৎপাদন হ'লে দাম বেশী পাওয়া যাবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই দেখা গেল, একদিকে 'উদ্‌বৃত্ত' পণ্য 'উপযুক্ত' ক্রেতার (effective demand) অভাবে বিক্রী হচ্ছে না এবং দাম প'ড়ে যাচ্ছে, আরেক দিকে একান্ত ভাবে কৃষি-নির্ভর দেশগুলিতে অনাহার ও দুর্ভিক্ষ সমানে লেগে রয়েছে। লড়াই বেধে যাওয়াতে তখনকার মত সমস্যা সমাধান হ'ল, তারপর দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী-কালে সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্যাটির পুনরাবির্ভাব ঘটল; দরিদ্র দেশগুলিও সেই ঢেউ থেকে অব্যাহতি পেল না।

পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা (মিলিয়ন)

	১৬৫০	১৭৫০	১৮০০	১৮৫০	১৯০০	১৯৩৬
ইউরোপ	১০০	১৪০.০	১৮৭.০	২৬৬	৪০১	৫৩৩.০
উত্তর আমেরিকা	১	১.৩	৫.৭	২৬	৮১	১৪০.৩
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা	১২	১১.১	১৮.৯	৩৩	৬৩	১২৭.৫
ওসানিয়া	২.০	২.০	২.০	২.০	৬.	১০.৫
এশিয়া	৩৩০	৪৭৯.০	৬০২.০	৭৪৯.	৯৩৭	১১৫৩.৩
আফ্রিকা	১০০	৯৫.	৯০.	৯৫	১২০	১৫১.২
মোট	৫৪৫	৭২৮.৪	৯০৫.৬	১১৭১	১৬০৮	২১১৫.৮

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনীয়। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রধানতঃ ঘটেছে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে।...১৯৬০-এ পৃথিবীর জনসংখ্যা ৩০০০ মিলিয়ন। বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকায় যে শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান যেভাবে উন্নত হচ্ছে তাতে আগামী চল্লিশ বছর পরে, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, অনুমান করা হচ্ছে যে, আফ্রিকার জনসংখ্যা ২৫০ মিলিয়ন ও এশিয়ার জনসংখ্যা ১৯০০ মিলিয়নে দাঁড়াবে।

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে যেমন পৃথিবী শিল্পোন্নত ও ধনশালী দেশ এবং কৃষি-প্রধান ও অনুন্নত—এই দুই ভাগে

মূল্য বা বাজার দর স্থির রাখার জন্য 'উদ্‌বৃত্ত' দেশগুলিতে চলল নিয়মিত ভাবে শস্য ধ্বংসের পালা; আমেরিকার আলু, গম; ব্রেজিলের 'কফি' কত যে নষ্ট হ'ল তার ইয়ত্তা নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল; তখনকার মত সমস্যাটি চাপা পড়ল।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর কয় বছর ধ'রে চলল বিধ্বস্ত দেশ-গুলিকে খাদ্য জোগানোর পর্ব। তারপর গত দশ বছর ধ'রে উন্নত দেশগুলিতে, বিশেষতঃ আমেরিকায়, উদ্‌বৃত্ত শস্যের প্রাচুর্য যে হারে বেড়ে চলল, তাতে উত্তরোত্তর শস্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা বাড়িয়ে এবং দেশে-বিদেশে ঋণ বা দানের খাতে শস্য বিতরণ ক'রেও সমস্যা মিটছে না। ১৯৫৪-৫৫-তে আমেরিকা ৮৬৬ মিলিয়ন ডলারের কৃষিজ পণ্য বিদেশে পাঠিয়েছে, তার

মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগই হচ্ছে 'বিশেষ ব্যবস্থানুযায়ী' ঋণ বা দানের খাতে। ১৯৬০-৬১-তে মোট রপ্তানীর অঙ্ক দাঁড়ায় ১৫৪১ মিলিয়ন ডলারে, তার মধ্যে শতকরা ৩১ ভাগ হচ্ছে 'বিশেষ ব্যবস্থা মত। অপর দিকে ১৯৫২-র শেষে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়ার হাতে মোট গম ছিল ১৩.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ১৯৬১-তে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় ৫৬.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন; তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই ছিল যথাক্রমে ৭ মিলিয়ন ও ৩৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বার্মা, থাইল্যাণ্ড ও ভিয়েটনাম-এ রপ্তানীযোগ্য চাল ছিল যথাক্রমে ০.৭ মিলিয়ন মেট্রিক ও ০.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

এখন একদিকে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করছে কতকগুলি শস্য উৎপাদন কমাবার, অপরদিকে পশ্চিম ইউরোপের দেশ-গুলিও এক জোট হয়ে যেমন শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও মিতব্যয়িতা ও একক ব্যবস্থার চেষ্টা করছে, কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রেও এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ক'রে পরমুখাপেক্ষিতা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছে। কৃষিজ কাঁচামাল, যা এতদিন এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলি থেকে আসছিল, অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপের দেশগুলি কম আমদানী করবে, তার সূচনা এখনই দেখা দিয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে "অনাহার থেকে মুক্তি" আন্দোলন সুরু হয়েছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন (United Nations Conference on the Application of Science and Technology in the Less-Developed Areas) হয়ে গেল, তার আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে যে, বর্তমানে বিজ্ঞান যতদূর অগ্রসর হয়েছে, তাতে লোক-সংখ্যা ৬০০০ মিলিয়ন হলেও সবাইকে উপযুক্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর খাদ্য দেওয়া চলে।

অনিবার্য ভাবে প্রশ্ন আসে, উপযুক্ত খাদ্য বলতে কি বোঝায়; কারা সেই খাদ্য উৎপাদন করবে; অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য যে অর্থ বা মূলধন প্রয়োজন, তা কোথা থেকে আসবে; ঘাট্‌তি অঞ্চলে যে পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে সেই খাদ্যের মূল্য কারা কতদিনের জন্য জোগাবে, ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দেশের লোকের স্বাস্থ্য, জল-হাওয়া, স্থানীয় উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য বা উপযোগিতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ ক'রে, কোন্ খাদ্য কি পরিমাণে খাওয়া উচিত তার হিসাব করেছেন। চাল বা গম-এর সঙ্গে কতটা পরিমাণ দুধ, মাখন, মাছ, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল খাওয়া স্বাস্থ্য-সম্মত এবং সেই পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করতে গেলে কতটা চেষ্টা করতে হবে, সে গবেষণাও হয়েছে।...প্রকৃতির কাছ থেকে বিজ্ঞানের সাহায্যে কতখানি আদায় করা যেতে পারে তার হিসাব হয়েছে, কিন্তু হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে মানুষের ইচ্ছা এবং মানুষেরই তৈরী আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোটি। সবাইকে খাওয়াতে গেলে যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যম দরকার, তা কি ঘ'টে উঠবে? যদি তা ঘটিয়ে তোলা সম্ভব হয়, ধনী দেশগুলিকে গত দেড়শো বছর ধ'রে সযত্নে রক্ষিত অনেক অভ্যাস, প্রথা ও লোভ ত্যাগ করতে হবে; দরিদ্র দেশগুলিকে শুধুমাত্র দান ক'রে ভিখারী বানিয়ে দিলে চলবে না, তারা দারিদ্র্য, অনাহার ও কৃষি-উৎপাদনের স্বল্পতার যে দুষ্ট-চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার থেকে টেনে বার করতে হবে। এই দীর্ঘমেয়াদী কাজটিতে হাত না দিয়ে উদ্বৃত্ত দেশগুলি এখন পর্যন্ত দান বা ঋণ এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য স্থির রাখার জন্য Subsidy, Price Support, ইত্যাদির মধ্যে স্ব স্ব চেষ্টা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষিসংস্থা যে প্রচেষ্টায় লিপ্ত তা যদি সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পায় তা হ'লে বিকল্প প্রস্তাব কি? লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা? বহু-নিন্দিত "ম্যালথাস" মতবাদের পুনঃস্বীকৃতি? অথবা জীবনযাত্রার মান আরও খাটো ক'রে আনা?

দরিদ্র দেশগুলি নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে নেই; সব দেশেই "পরিকল্পনা"র যুগ এসেছে; বিদেশী অর্থসাহায্যও নানান ভাবে আসছে। দেশে অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের খাদ্য-তালিকা বদ্‌লাচ্ছে, যেমন আর সব দেশেই বদ্‌লেছে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের চাহিদার কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসূচী পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৯০৯ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যতালিকা কিভাবে বদ্‌লেছে তা নিম্ন-লিখিত হিসাব থেকে আমরা পাচ্ছি

	পরিমাণ	১৯০৯	১৯৪৭
দুগ্ধজ খাদ্য (মাখন ছাড়া)	কোয়ার্ট	১৬৯	২৫২
ডিম	সংখ্যা	২৮৪	৩৬৩
মাছ, মাংস	পাউণ্ড	১৬৪	১৬৭
চর্বি, মাখন ইত্যাদি	,,	৫৯	৬৫
বাদামজাতীয় খাদ্য	,,	১২	২০
আলু ও অন্যান্য কন্দজাতীয় খাদ্য	,,	২০৮	১৩৩
লেবু, কমলা, টমেটো ইত্যাদি	,,	৪৪	১১৭

ফল ও সব্জী	,,	৭৭	১২২
অন্যান্য ফলমূল	,,	২১১	২৪১
খাদ্যশস্যাদি (গম প্রভৃতি)	,,	৩০৯	১৯৩
শর্করাজাতীয় খাদ্য	,,	৮৬	১১১
চা, কফি, কোকো	,,	১০	১৯

পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ধরণের খাদ্যের ব্যবহার কি ভাবে বেড়েছে বা কমেছে তার একটা আন্দাজ এই তালিকা থেকে পাওয়া যায়। গমজাতীয় শস্যের (cereals) এবং আলু ও সেই গোত্রের শিকড়জাতীয় খাদ্যের চাহিদা একদিকে যেমন কমেছে, তেমনি অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষিসংস্থা বিভিন্ন দেশের খাদ্যতালিকা যা প্রকাশ করেছেন, তার থেকেও একই রকম ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে অষ্ট্রিয়াতে খাদ্যশস্যের (cereals) ব্যবহার জনপিছু প্রতি বছরে ১৩০ কিলোগ্রাম থেকে ১০৮ কিলোগ্রামে নেমেছে, মাংসের ব্যবহার ৩০ থেকে ৫৭ কিলোগ্রামে উঠেছে, ফলমূলের পরিমাণ ৬১ থেকে ৯৯ কিলোগ্রামে এসেছে। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সব দেশেই একই রকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের (cereals) পরিমাণ ১১২ থেকে ১৪০ কিলোগ্রাম, মাংস ১ থেকে ২ কিলোগ্রামে এসেছে, মাছ ১ কিলোগ্রামেই আছে, দুধ-মাখনের অঙ্ক যৎসামান্য। ক্যালোরীর এবং প্রোটিনের হিসাবে দেখা যাচ্ছে :

	ক্যালোরী	মোট প্রোটিন (গ্র্যাম)	প্রাণিজ প্রোটিন (গ্র্যাম)
অষ্ট্রিয়া (১৯৬০-৬১)	৩০১০	৮৮	৪৭
পঃ জার্মানী ,,	২৯৫০	৮০	৪৮
বৃটেন ,,	৩২৭০	৮৭	৫২
যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬০)	৩১২০	৯২	৬৫
ভারতবর্ষ(১৯৬০-৬১)	১৯৯০	৫৩	৬

আমাদের দেশের সকলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, মাখন, মাছ, মাংস উৎপাদন করতে হ'লে আরও কতটা উৎপাদন বাড়াতে হবে তা এই তালিকা থেকে অনুমান করা যায়।

আমাদের যা নিজস্ব সম্পত্তি, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির যা হার, তাতে কি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে যা প্রয়োজন, তা আমরা নিজেদের চেষ্টায় জোগাতে পারব ?

এই সূত্রে খাদ্যোৎপাদনের একটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে হয়। মানুষের ব্যবহারের জন্য যে খাদ্য উৎপাদন করা হয় তাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন "primary foodstuff", আর যে শস্য উৎপাদন করা হচ্ছে পশুপালনের জন্য তাকে বলা হচ্ছে, "secondary foodstuff"। বিজ্ঞানীরা হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, পশু-খাদ্য হিসাবে যে শস্য খরচ হচ্ছে তাতে যে "original calorie" তখনকার মত মানুষের ব্যবহারের বাইরে চ'লে যাচ্ছে তার মাত্র এক-সপ্তমাংশ "derived calorie" হিসাবে দুধ বা মাংসের আকারে মানুষের খাদ্যরূপে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে। সেই হিসাবে যুদ্ধপূর্ব যুগের আমেরিকার এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি লোকের জন্য, primary foodstuff বাবদ ২২০০ ক্যালোরী ও derived foodstuff-এর জন্য ৭ × ৮৭০ = ৬০৯০ ক্যালোরী, মোট ৮২৯০ ক্যালোরী উৎপাদন করতে হচ্ছে। শুধু যদি কৃষিজ শস্যাদি থেকেই খাদ্য সংগ্রহ হ'ত তা হ'লে জনপিছু ০·৬৬ একর জমিতে চাষ করলেই চলত, derived calorie পাবার জন্য মোট ১·৭২ একর জমিতে চাষ করতে হয়েছে। আমাদের দেশে ১৯৫১ সালেই জনপিছু কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ০·৯৭ একর মাত্র ; গত দশ বছরে জমির উৎপাদিকা শক্তিও যেমন বেড়েছে জনসংখ্যাও বেড়েছে। নিম্নলিখিত তালিকাটি (১৯৫১ সালের) এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য।

	পৃথিবী	ভারতবর্ষ	রাশিয়া	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	ইউরোপ (রাশিয়া ছাড়া)
জনসংখ্যা (কোটি)	২৪০	৩৬·১	১৯·৪	১৫·১	৩৯·৬
মোট এলাকা (কোটি একর)	৩২৫১	৮১·৩	৫৯০·৪	১৯০·৫	১২১·৮
জনপিছু মোট জমি (একর)	১৩·৫৪	২·২৫	৩০·৪৬	১২·৬৪	৩·০৭
" কর্ষণযোগ্য ও চারণভূমি (একর)	৩·৫১	০·৯৭	৪·৪৮	৭·৪১	১·৫৩
" কর্ষিত ও কর্ষণযোগ্য জমি (একর)	১·২৬	০·৯৭	২·৮৭	৩·০২	০·৯২
বর্গমাইল-পিছু জনসংখ্যা	৪৬	৩১২	২৫	৫৪	২০০

আমাদের দেশের মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য ও চারণ-ভূমি এবং কর্ষিত/কর্ষণ-যোগ্য জমির পরিমাণের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা তুলনীয়। আমাদের ভরসার কথা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত আমাদের জমির উৎপাদিকা শক্তি এত কম যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে এর মধ্যেই মোট উৎপাদন অনেক বাড়ান যায়; অপর দিকে, চারণ-ভূমি বলতে আমাদের দেশে প্রায় কিছুই নেই।

জনপিছু মোট যত 'ক্যালোরী' উৎপাদন করা দরকার, তার জন্য হয় খুব প্রগাঢ় চাষ (intensive cultivation) দরকার, নয়ত প্রচুর জমি দরকার। এই সূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনপিছু উৎপাদন-শক্তির এক তুলনামূলক তথ্য দেখা যেতে পারে।

	জনপিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ (একর)	একরপিছু original calorie	জনপিছু original calorie
উত্তর আমেরিকা	৪·০	২৫০০	১০,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	১·৫	৪৭০০	৭০৫০
পশ্চিম ইউরোপ	০·৭	৭৫০০	৫২৫০
রাশিয়া	২·০	২০০০	৪৬০০
পূর্ব এশিয়া	০·৫	৫৫০০	২৭৫০
দক্ষিণ এশিয়া	০·৮	৩৬০০	২৯০০

দেশভেদে এবং উৎপাদন পদ্ধতির তারতম্য মেনে নিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করতে হ'লে জনপিছু প্রায় আড়াই একর জমি প্রয়োজন; পূর্বোক্ত তালিকা থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের জনপিছু জমির যে হিসাব পাচ্ছি তাতে "অনুন্নত" অঞ্চলগুলির জন্য কোন উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন কাজ।

কিছুদিন পূর্বে আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা (FAO) পুষ্টির উপযোগী খাদ্য এবং মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির যথাযথ হিসাব নিয়ে যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় বর্তমানে মোট উৎপাদন যতটা বাড়ানো দরকার মনে করেছিলেন, তার হিসাবটি হচ্ছে: খাদ্যশস্য (cereals) ২১%; আলু ও অন্যান্য সমূল বৃক্ষ বা কন্দ (roots & tubers) ২৭%; শর্করা ১২%; চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তৈল (fats) ৩৪%; ডালজাতীয় খাদ্য (pulses) ৮০%; ফল ও সবজী (fruits & vegetables) ১৬৩%; মাংস ৪৬% এবং দুধ ১০০%।—১৯৩৪-৩৮-এর গড়ের সঙ্গে ১৯৬১-৬২র মোট উৎপাদন তুলনা করলে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তা উল্লেখ করছি:

(মিলিয়ন মেট্রিক টন)	১৯৩৪-৩৮ (গড়)	১৯৬১-৬২
গম	১৪৮·৭	২০১·০
চাল	৬৫·৭	৯৯·৬
চিনি	২৪·৯	৫১·৪
লেবুজাতীয় ফল	১১·১	২০·৬
দুধ	২২১·০	৩৪৪·৯
মাংস	২৯·৪	৫২·২
ডিম	৬·৩	১২·৭

মোট উৎপাদনের বেশির ভাগই অবশ্য উন্নত দেশ-গুলির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে, দরিদ্র দেশগুলির কোন কোনটিতে যদিবা মোট উৎপাদন বেড়েছে, মাথাপিছু উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই হয় সমান থেকে গেছে নয়ত কমেও গেছে। ১৯৫২-৫৩—১৯৫৬-৫৭র গড়কে ১০০ ধ'রে হিসাব করলে বিভিন্ন অঞ্চলের মাথাপিছু উৎপাদনের সূচক-সংখ্যা নিচে দিচ্ছি:

	১৯৫২-৫৩	১৯৫৬-৫৭	১৯৬০-৬১
পশ্চিম ইউরোপ	৯৫	১০১	১১৫
পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া	৯২	১১২	১২৩
উত্তর আমেরিকা	১০৩	১০১	৯৯
ওসানিয়া	১০৪	৯৬	১০৪
ল্যাটিন আমেরিকা	৯৮	১০৩	১০২
সুদূর প্রাচ্য	৯৫	১০৩	১০৬
মালয়	৯৬	১১০	১১২
জাপান	৯৯	১০৮	১১৯
ভারতবর্ষ	৯৩	১০৩	১০৬
আফ্রিকা	৯৮	১০১	৯৮
পৃথিবীর গড়	৯৭	১০৩	১০৭

দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত "অনুন্নত" দেশগুলি "উন্নত" দেশগুলির তুলনায় উৎপাদন হার বজায় রাখতে পারে নি অথবা কম অগ্রসর হ'তে পেরেছে।

আজ যুক্তরাষ্ট্র নিতান্ত বিব্রত হয়ে কৃষি উৎপাদন কমাতে সুরু করেছে; অন্যান্য অগ্রণী দেশগুলিও ঘরের সমস্যা মেটাতে ব্যস্ত, আর যদি বা দরিদ্র দেশগুলিকে সাহায্য করতে চায়, বিনিময়ে তারাও মূল্য আদায় ক'রে নেবে বৈকি! তা হ'লে "অনুন্নত" দেশগুলির খাদ্য সমস্যা মেটাবার ভার কার উপর পড়ছে?

আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) তাঁদের বাৎসরিক বিবরণীতেও এই প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন।

আজ একদিকে মানুষ মাটি ছেড়ে অন্য গ্রহে পাড়ি দেবার আয়োজন করছে, আরেক দিকে যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সভ্য মানুষের মূল দায়িত্ব পালন করবার প্রশ্নেই দেখা যাচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্রিত হয়ে সমস্যাটি সমাধান করতে পারছে না। বিজ্ঞান যা সম্ভব করতে পারছে, মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও লোভ তার প্রতিবন্ধক হচ্ছে। শুধু দান ক'রে বা দান গ্রহণ ক'রে সমস্যা মিটবে না, সে কথা ধনী দরিদ্র দুই রকম দেশই বুঝতে পারছেন, কিন্তু কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থার কোন আন্তর্জাতিক নীতি গৃহীত হচ্ছে না।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক কৃষি ও খাদ্য সংস্থার (FAOর) সর্বময় কর্তা এই "অনুন্নত" দেশ থেকেই গেছেন; "অনাহার থেকে মুক্তি"র প্রশ্নটি তাঁর কাছে যত স্পষ্ট, যত বেদনাদায়ক, ধনী দেশগুলির কর্তাদের কাছে অবশ্যই ততটা নয়। তাঁরা যদি এক হাতে দান করেন, আরেক হাতে মূল্য উশুল ক'রে নিতে ব্যস্ত। দু'টি মহাযুদ্ধের পর যদি তাঁদের অন্তরের ইচ্ছা ও মনোভাব পরিবর্তিত না হয়ে থাকে তা হ'লে কি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে?

—১—

হয়ত সংস্কৃত ভারতে কখনই সাধারণের কথিত সুতরাং জীবন্ত ভাষা ছিল না। পূর্ব্বে যেন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিয়া একণে মৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সে সংস্কৃতে কথোপকথন, হাস্যকৌতুক, বিবাদবিসম্বাদ, সুখদুঃখজ্ঞাপন করিত না—চিঠিপত্র লিখিত না। সাক্ষাতার আমলে কি ছিল কে জানে। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যলেখকবর্গের কাব্য-নাটকাদিতে স্ত্রীলোক বালক এবং সামান্য জনগণে প্রাকৃত পৈশাচিক প্রভৃতি অপভাষায় কথা কহিতে দেখা যায়, আর রাজা পণ্ডিত প্রভৃতি সুশিক্ষিতগণের ভাষা সংস্কৃত। সহজ বুদ্ধিতে বলে সাধারণের সহিত বাক্যালাপ করিতে, বালক ও স্ত্রীলোকগণকে বুঝাইতে সুধীগণেরও অপভাষা প্রয়োগের আবশ্যক হইত। এবং সংস্কৃত যে সাধারণের কথিত ভাষা ছিল, ইহা বিশেষ প্রমাণপ্রদর্শন না করিয়া বলা যায় না। বঙ্গভাষা ও বাঙ্গলা অভিধান, প্রবাসী—১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা, ১৩০৮, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

১৩

কেষ্টগঞ্জ এমনই একটা জায়গা যেখানে সচরাচর কোনও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে না। এখানে ইছামতী নদীর মতই একঘেয়ে জীবন একটানা স্রোতে বয়ে চলে। এখানে জীবন যেমন মন্থর, মৃত্যুও তেমনি ম্রিয়মাণ। হঠাৎ যদি কোনও দিন ইছামতীর জলে কুমীর ভেসে ওঠে ত তাই নিয়েই এখানকার মানুষ এক মাস সময় বেশ কাটিয়ে দেয়। হঠাৎ যদি কোনও বছর বৃষ্টি হয়ে রাস্তা-ঘাট-মাঠ-ক্ষেত ভাসিয়ে দেয় ত সেই বৃষ্টি নিয়েই লোকে সারাটা বর্ষাকাল সময় কাটাবার খোরাক পায়।

কিন্তু রোজ-রোজ ত এমন ঘটনা ঘটে না?

নদীতে কুমীর উঠেছিল কবে সেই পঞ্চাশ বছর আগে। কুমীর এসে নন্দ হাজরার বউকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নদীর গর্ভে। নন্দ হাজরার বউ বাঁচে নি। কিন্তু বেঁচেছিল পেতলের ঘড়াখানা। কাঁকালে ঘড়া নিয়ে নন্দর বউ নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। তারপর স্নান সেরে পেতলের ঘড়ায় জল ভর্ত্তি ক'রে কাঁকালে ঘড়াখানাকে নিয়ে ডাঙায় উঠছিল, এমন সময় কুমীরটা সোজা টিপ্ ক'রে ঘড়ায় দিয়েছিল এক কামড়। ঘড়ার সঙ্গে সঙ্গে বউটাও প'ড়ে গিয়েছিল ডাঙার ওপর। তারপর কুমীরটা বউটাকে নিয়ে চ'লে গেল, কিন্তু রেখে গেল দাঁত-বসান ঘড়াটাকে। নন্দ হাজরার ছেলেরা এখনও সেই ফুটো ঘড়াটাকে রেখে দিয়েছে যত্ন ক'রে। লোককে দেখায় এখনও। বলে—এই দেখ, সেই ঘড়ায় কুমীরের দাঁতের ফুটো—

তারপর যেবার বর্ষা হ'ল উপর্য্যুপরি, সেও অনেক দিনের কথা। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ে কতখানি জল উঠেছিল, রেলের পুলটা কতখানি ডুবে গিয়েছিল, মালোপাড়ার মালোরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে কেমন ক'রে ইছামতীর বাঁধের ওপর গিয়ে রাত কাটিয়েছিল, সে-সব গল্প রসিয়ে রসিয়ে অনেক দিন ধ'রে অনেক লোককে বলেছে কেষ্টগঞ্জের লোকেরা।

এ-সব কচিৎ-কদাচিৎ!

ওই যেমন দুলাল সা'র বাড়ীতে সাধু আসা। সাধু এসে ভূত-ভবিষ্যৎ বলা। সে-ও বলতে গেলে কেষ্টগঞ্জের লোকের কাছে বাসি হয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন আর কোনও কিছুই তেমন ঘটে নি যা নিয়ে কেষ্টগঞ্জের লোক বেশ গোল হয়ে ব'সে জাবর কাটতে পারে। যা নিয়ে আলোচনা করতে পারলে ভাত হজম হয়।

কিন্তু এবার তাই-ই হয়েছে। এবার কেষ্টগঞ্জের মানুষ আবার আলোচনা করবার মত মুখরোচক খবর পেয়েছে।

তা খবর শুধু শুনেই তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সরেজমিনে না দেখলে আর মজাটা কি হ'ল!

আর লোকও কি একটা? দলে দলে সব আসে আর উঁকি মেরে দেখে। একটুখানি দেখলে আশ মেটে না। বাপ দেখে ত ছেলে দেখে যায় পরে। ছেলে দেখে ত বোনও দেখতে আসে। তারপর এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে তাদের আত্মীয়-কুটুম্বরা পর্য্যন্ত দেখতে আসে। গরুর গাড়ি ভাড়া ক'রে গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে দেখতে আসে। ভট্টাচার্য্যি-বাড়ীর সামনে মেলা ব'সে যায় দর্শনার্থীর।

কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্যির বাড়ীতে অনেক কাল আগে এমন আনাগোনা ছিল লোকের। আবার এতকাল পরে সেই রকম হয়েছে।

দোতলার বড় ঘরখানাতেই হরতনের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্য নিজের ঘরখানাই ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন বিছানা, নতুন চাদর, নতুন বালিশের ওয়াড়—সবই নতুন। বিছানার পাশে হরতনের ওষুধ-পত্র, ফল-মূল রাখবার জন্যে টেবিল রেখে দিয়েছেন।

লোকেরা ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওই ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই অপলক-দৃষ্টিতে দেখে।

বলে—আহা—

সাধারণতঃ ওই একটা শব্দই বেশির ভাগ লোকের মুখে বেরোয়। যাকে এতদিন হিসেবের বাইরেই রেখে দিয়েছিল তারা, তার পুনরাবির্ভাবে আনন্দ-উৎসব করা যেন বড় গর্হিত কাজ। এতদিন পরে তাকে পাওয়া যাওয়াতে, পাওয়ার আনন্দের চেয়ে হারিয়ে যাওয়ার বেদনাটার কথাই যেন সকলের মনে বেশি ক'রে পড়ছে। কর্ত্তামশাইও সকলের বেদনার সঙ্গে নিজের বেদনা

মিলিয়ে-মিশিয়ে দিয়ে নাতনীকে ফিরিয়ে পাওয়ার আনন্দ যেন ডবল ক'রে উপভোগ করছেন।

কেউ কেউ বলে—দেখি, ভাল ক'রে দেখি মা তোমাকে?

নিবারণ সরকারও বাধা দেয় না আজ। আহা! দেখুক্! সবাই দেখুক্ হরতনকে। সবাই মন খুলে হরতনকে আশীর্ব্বাদ করুক্। কর্ত্তামশাই-এর আনন্দের অংশ ভাগ ক'রে ভোগ করুক্ সবাই। তবেই আবার ভট্টাচার্য্যি বংশের মঙ্গল হবে। তবেই আবার কেষ্টগঞ্জে কর্ত্তামশাই-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে। এই পনের বছর বড় হেনস্থা হয়েছে কর্ত্তামশাই-এর। এই পনের বছরে দুলাল সা আর নিতাই বসাক, দু'জনে মিলে বড় অপমান করেছে কর্ত্তামশাইকে। মনে বড় আঘাত পেয়েছেন কর্ত্তামশাই। অকারণে কর্ত্তামশাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে নতুন মোটর-গাড়ি চড়েছে। কারণে-অকারণে গ্রামসুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন ক'রে গাওয়া-ঘি-এ ভাজা লুচি খাইয়েছে। যাতে সেই গন্ধ এসে কর্ত্তামশাই-এর নাকে লাগে। ছেলের বিলেত যাবার সময় কলকাতায় গিয়ে খবরের কাগজের লোকদের পয়সা দিয়ে সেই খবর ছাপিয়েছে। এর কোনও প্রতিকারও ছিল না তখন। প্রতিকার করবার ক্ষমতাই ছিল না কর্ত্তামশাই-এর। কেবল কান পেতে সব শুনেছেন, চোখ মেলে সব দেখেছেন, আর মনে মনে সব সহ্য করেছেন।

কিন্তু এখন? এবার?

—এখন কেমন লাগছে মা? কেমন বোধ করছ? একটু হাওয়া করব?

কর্ত্তামশাই জীবনে কখনও কাউকে নিজের হাতে পাখার বাতাস করেন নি। বরাবর অন্য লোকের হাতে পাখার বাতাস খেয়ে এসেছেন। অথচ আজ আর কোনও কষ্টই হচ্ছে না। কলকাতা থেকে ট্রেনে চ'ড়ে এখানে আসার পর এতদিন কেটে গেল তবু এতটুকু বিশ্রাম করবার অবসর পান নি। অথচ যেন ক্লান্তিও নেই তাঁর। সেই যে কলকাতায় একদিন নাতনীকে খুঁজে পেয়েছেন, তার পর থেকেই ক্লান্তি কাকে বলে তাও জানেন না, বিশ্রাম কাকে বলে তাও জানেন না।

নিবারণ বললে—আপনি সরুন কর্ত্তামশাই, আমি বাতাস করছি—

—তুমি সরো—

ব'লে হটিয়ে দিয়েছিলেন নিবারণ সরকারকে। বললেন—তুমি সরো ত, পাখার বাতাস কি সবাই করতে পারে? দেখছ জ্বর রয়েছে—

হরতন বললে—আপনার কষ্ট হবে দাদু—

—দূর্ পাগলী,—কর্ত্তামশাই হেসে উঠলেন—নাতনীকে বাতাস করতে কি দাদুর কষ্ট হয়? হয় না। তোর আবার যখন নাতনী হবে, তখন দেখবি—

ব'লে যেমন বাতাস করছিলেন, তেমনি বাতাস করতেই লাগলেন।

তারপর নিবারণকে বললেন—তা তুমি এখানে হাঁদার মতন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে, তুমি যাও না, তোমার কাজ নেই? তোমাকে বলেছিলাম যে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা করতে—তা করেছ?

শুধু ইলেকট্রিক নয়, অনেক কিছুরই ব্যবস্থা করতে হবে। হরতন যখন এসে গেছে তখন ত আর এই ভাঙা-চোরা বাড়ীতে আর থাকা চলবে না। সমস্ত বাড়ীখানাই রং করতে হবে। চুণ-বালি খ'সে গেছে আগা-পাছু-তলার। বাড়ী ত ছোট নয়। এখন না হয় লোকজন নেই। কিন্তু এককালে ত লোকজন দাস-দাসী ঘোড়া-হাতী সবই ছিল। তখন যেমন পূজো ছিল, তেমনি ছিল নৈবিদ্যি। বড় বড় থাম-খিলেন বারবাড়ী অন্দর মহল সবই সেই রকমই আছে। শুধু বে-মেরামত অবস্থা। তা সব আবার হবে। আবার এই দালানে-দালানে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলবে। এবার তেলের ঝাড়-লণ্ঠন নয়, ইলেকট্রিকের। ইলেকট্রিকের পাখা হবে। যেমন-যেমন আছে দুলাল সা'র বাড়ীতে, সবই তেমনি হবে। সুইচ টিপলে আলো জ্বলবে, সুইচ টিপলে বন্-বন্ ক'রে পাখা ঘুরবে।

এসব পরিকল্পনা সেই কলকাতা থেকেই ক'রে ফেলেছেন কর্ত্তামশাই।

তাই এসেই নিবারণকে পাঠিয়েছিলেন ইলেকট্রিক-মিস্ত্রীর কাছে। কেষ্টগঞ্জের রেল-বাজারে নতুন ইলেকট্রিকের দোকান খুলেছিল। তাদেরই ডেকে এনেছিল নিবারণ।

তারা মাপ-জোপ করলে, দেখলে চারদিক্ ঘুরে ঘুরে। কর্ত্তামশাই ব'লে দিলেন কোথায় আলোর ঝাড়-লণ্ঠন বসবে, কোথায়-কোথায় পাখা বসবে। সব বুঝিয়ে দিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

শেষে বললেন—পারবে ত তোমরা ঠিক, না কলকাতা থেকে মিস্ত্রী ডেকে আনব, খুলে বল—

—আজ্ঞে পারব না কেন? পয়সা দিলে আমরাও কলকাতার মিস্ত্রীদের মত কাজ করব, আর আমরাই ত সা' মশাইএর বাড়ীতে কাজ করিছি—সা'মশাই, নিতাই বসাক মশাই আমাদের কাজ দেখে খুশী হয়েছেন—

দুলাল সা'র নাম শুনেই চ'টে গেলেন কর্ত্তামশাই।

বললেন—তবেই হয়েছে, তোমাদের দিয়ে ত কাজ হবে না বাপু—

—আজ্ঞে? কেন? পছন্দ না হ'লে আপনি দাম দেবেন না, কথা রইল—

কর্ত্তামশাই বললেন—আরে না না, তা নয়, দুলাল সা'র বাড়ীর কাজ আর আমার বাড়ীর কাজ কি এক হ'ল? এই ত সেদিনও দুলাল সা' রাস্তায় রাস্তায় ধুনসী ফিরি ক'রে বেড়াত, আমিই ত ওকে জমি দিয়েছি হরিসভা করতে, সেই জমির ওপরেই বাড়ী করেছে ও! ওরকম কাজ হ'লে আমার চলবে না হে! এ বনেদী বাড়ী, এ বাড়ী কেদারেশ্বর ভট্টচার্য্যির তৈরি, তিনি হাতীতে চ'ড়ে রাজ-বাড়ীতে নিত্য-পূজো করতে যেতেন —তুমি এ বাড়ীর সঙ্গে দুলাল সা'র বাড়ীর তুলনা করলে?

—আজ্ঞে, তুলনা ত আমি করি নি!

—তুলনা করলে, আবার বলছ তুলনা কর নি? তুমি ত বড় বেয়াদপ লোক দেখছি হে—তোমার বাড়ী কোথায়? দেশ? কি জাত? মাহিষ্য, না সদ্‌গোপ?

হেন-তেন সাত-সতেরো নানা কথা শুনিয়ে দিলেন তাকে কর্ত্তামশাই। ভদ্রলোকের ছেলে, নতুন দোকান খুলেছিল ইলেকট্রিকের। ভেবেছিল, একটা নতুন মোটা-দরের কাজ পেয়ে গেল বুঝি! কিন্তু সামান্য কথার বেচালে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।

তার সামনেই নিবারণের দিকে চেয়ে কর্ত্তামশাই বললেন—কি সব যা-তা লোক তুমি আমদানী কর বল দিকি নি, ছাগল দিয়ে কি আর ধান-মাড়ান হয়? তুমি কলকাতায় যেতে পারলে না? কলকাতা থেকে মেকার-মিস্ত্রী আনতে পারলে না? মেকার-মিস্ত্রী না হ'লে আমার বাড়ীতে কাজ হয় কখনও? এ কি দুলাল সা'র বাড়ী পেয়েছ যে দুটো ফন্‌-ফনে বাহারে জিনিষ দিয়ে চোখ ভুলিয়ে দিলাম? জান এ বনেদী বংশ—

এর পরে আর ভদ্রলোকের ছেলের দাঁড়ান চলে না। বেচারী সামনে থেকে চ'লে গিয়ে মানসম্ভ্রম যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু বাঁচাল।

নিবারণ সরকার বললে—আজ্ঞে, কলকাতার মিস্ত্রীরা অনেক টাকা চাইবে—

—তা, চাইলে দেব! টাকার জন্যে কি কীর্ত্তীশ্বর ভট্টচার্য্যি কখনও পেছ-পা হয়েছে? কত টাকা নেবে, শুনি? হাজার, দু'হাজার, তিন হাজার, পাঁচ হাজার, না তারও বেশি?

—আজ্ঞে, তা ঠিক বলতে পারি নে—

—টাকার জন্যে তুমি কাজটি খারাপ করবে না নিবারণ, এইটি তোমায় আজ আমি ব'লে রাখলাম! তুমি যাও, কলকাতায় গিয়ে সেরা মেকার-মিস্ত্রী সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে!

—আজ্ঞে, টাকা ত···

কর্ত্তামশাই ধমকে উঠলেন—টাকা নেই?

—ত'বিলে কিছু সামান্য টাকা ছিল, সেই দুলাল সা কলকাতায় যাবার সময় দিয়েছিল···

কর্ত্তামশাই বললেন—তা তাই নিয়েই যাও এখন, টাকার জন্য কাজ খারাপ করবে না। মিস্ত্রী সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে, সে দেখে যাবে আমার বাড়ী। আমার পছন্দমত কাজ করবে, তখন আমি খুশী হয়ে টাকা দেব! আমার কি টাকা নেই ভেবেছ? দুলাল সা'র একলারই টাকা আছে? আমার নেই? তুমি কত টাকা চাও?

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়ত কর্ত্তামশাইএর বকুনি শুনতে হ'ত, কিন্তু তার আগেই ওপর থেকে ডাক এল। হরতন দাদুকে ডাকছে। বঙ্কু এসে খবরটা দিতেই কর্ত্তামশাই থেমে গেলেন।

আর থাকতে পারলেন না। আজকাল হরতন-হরতন ক'রে যেন পাগলের মত হয়ে গেছেন। হরতনের নাম শুনলেই আর মাথার ঠিক থাকে না। সোজা ভেতর-বাড়ীতে গেলেন।

তা তাই-ই হ'ল। রাজমিস্ত্রী আগেই লেগেছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকার কাজ তাদের। দিন-রাত কাজ করে।

কর্ত্তামশাই ব'লে দিয়েছিলেন—পনের দিনের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই, বুঝলে বাপু?

—আজ্ঞে পনের দিন না হোক্, ভেতরটা আপনার পনের দিনের মধ্যেই শেষ ক'রে দেব।

—আর বাইরেটা?

—বাইরেটা আরও ধরুন গিয়ে এক মাস।

—একমাস ত সময় দিতে পারব না বাপু, আমার হরতন এসেছে, তার অসুখ, এই অসুখ এইবার সারো-সারো, তখন যদি বাড়ীর মেরামত শেষ না হয় ত কোথায় সে থাকবে? এই অসুখের পর উঠে ধুলো-বালি সহ্য হয় কারও? বল না, তোমরাই বল না—

তা সেই কথাই পাকা হ'ল। দেরি করলে চলবে না কর্ত্তামশাই-এর। কর্ত্তামশাই-এর চললেও হরতনের

চলবে না। হরতনের অসুখ ত এই সেরে গেল বলে। আর ধর দিনদশেক। জ্বর এখন আছে বটে। তা জ্বর থাকবে না? এতদিন পেটে কি ওষুধ-বিষুদ কিছু পড়েছে? ফল-মূল কিছু খাইয়েছে চণ্ডীবাবু? এই দামী-দামী ওষুধ যোগাবে কোত্থেকে সে মানুষটা? তার কিসের দায়? সে মানুষটা যাত্রা-গান ক'রে খায়। পেশা তার সেটা। দেখ না, মেয়েটাকে এতদিন না-খাইয়ে দাইয়ে কোথায় কোথায় ঘুরিয়েছে! কোথায় জোড়হাট, ডিব্রুগড়, কুচ-বিহার, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান। এক জায়গায় স্থিতু হয়ে বসতে পায় নি, বিশ্রাম করতে পায় নি, নিয়ম ক'রে খেতে পায় নি পর্য্যন্ত। কেবল রাত জেগে জেগে গান গেয়েছে আর শরীর খারাপ করেছে।

—ভগবানের দয়া মা, নইলে তোমাকেই বা আবার পনের বছর পরে খুঁজে পাব কেন আর কোথা থেকে এক সাধুই-বা এসে তোমার কুষ্ঠি দেখবে কেন? ভগবান্ই বাঁচিয়েছেন—

বড়গিন্নী সেই প্রথম দিনই দেখেছিলেন। যেদিন প্রথম নিয়ে এলেন কেষ্টগঞ্জে। গাড়ি তৈরী ছিল স্টেশনে। অসংখ্য মানুষের ভিড়।

—দেখ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, চিনতে পারছ?

বাড়ীতে নিয়ে আসার পর প্রথমে আর কাউকে ঢুকতে দেন নি কর্ত্তামশাই। একে নাতনীর শরীর খারাপ, তায় অত ভিড়। গাড়ি থেকে নামিয়ে পাঁজা-কোলা ক'রে তুলতে হয়েছিল দোতলায়। বড় দুর্ব্বল ছিল তখন হরতন। নিবারণ সরকার একদিকে ধরেছিল, আর একদিকে বঙ্কু।

বঙ্কুও সঙ্গে এসেছিল কলকাতা থেকে।

তা আসুক্, দলে একজন জোয়ান ছোকরা থাকলে সুবিধেই হয়। ফাই-ফরমাস, দেখা-শোনা করতেও ত লোকের দরকার—

—ও কে?

বড়গিন্নী চিনতে পারেন নি নতুন মুখ দেখে।

কর্ত্তামশাই বলেছিলেন, ওর সামনে তোমায় লজ্জা করতে হবে না, ও ওদের যাত্রার দলে এ্যাক্টো করে—

বঙ্কুও সুযোগ বুঝে বড়গিন্নীর পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে ঢিপ্ ক'রে একটা প্রণাম করেছিল।

—আজ্ঞে, মা-ঠাকরুণ, হরতনের অসুখ হবার পর আমিই রূপ-কুমারীর পার্টটা করতাম, আমাকে আপনি আপনার নাতির মত দেখবেন। দিন্, শ্রীচরণের ধুলোটা দিন্—

ব'লে বঙ্কু বড়গিন্নীর দু'পায়ের তেলো থেকে ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে হাতটা মাথায় মুছে ফেলেছিল—

কিন্তু কর্ত্তামশাই তখন বড়গিন্নীকে তাড়া দিচ্ছেন।

বললেন, চল চল, ওসব কথা পরে হবে, এখন নাতনীকে দেখবে চল—বাইরে ভিড় হয়ে গেছে, তারাও দেখতে আসবে—

হরতনকে তখন বিছানার ওপর শোয়ানো হয়েছে। দুর্ব্বল শরীর। ভাল ওষুধপত্র কিছু পেটে পড়ে নি। চিৎপুরের অন্ধকার ঘুপচি ঘরের ভেতর থেকে তুলে এনেছেন। চণ্ডী অধিকারীবাবু না দিয়েছে একখানা ভাল শাড়ি, না একখানা ভাল জামা। মাথায় মাখবার মত ভাল তেলও দেয় নি কখনও। একখানা ভাল সাবানও দেয় নি। মাথা ভর্ত্তি চুল হরতনের। সারা মাথায় যেন জটার মতন ছড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে একখানা কচি ফরসা মুখ। আর সেই মুখের ওপর কালো কুচকুচে এক জোড়া চোখ।

—তুমি সেই বলতে বড্ড চুল মেয়েটার, সেই চুল এখন কি রকম হয়েছে দেখ। তবু যদি এক কৌটো তেল পড়ত ত আর দেখতে হ'ত না।

—আর দেখেছ কি রকম হাড় জিরজিরে ক'রে দিয়েছে মেয়েটাকে, খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে কাহিল ক'রে দিয়েছে—

বঙ্কুও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

সে বললে, আজ্ঞে, চণ্ডীবাবু ত খেতে দিত না আমাদের, শুধু খেসারির ডাল আর ভাত খেয়ে দিন কাটিয়েছি, সঙ্গে কোনও দিন আলুভাতে…

—খেসারির ডাল? খেসারির ডাল খাইয়েছে হরতনকে? তা আগে বল নি ত তুমি আমাকে?

—আজ্ঞে খেসারির ডাল দিলে তবু ত কথা ছিল, তার সঙ্গে আবার ফ্যান্ মিশিয়ে বাড়িয়ে দিত! চণ্ডী-বাবুকে কি আপনি কম কঞ্জুস ভেবেছেন? আমরা যদি বলতে যেতাম ত চণ্ডীবাবু বলতেন, তোরা সব জমিদারের নাতি নাকি যে খেসারির ডাল খেতে পারিস্ না?

কর্ত্তামশাই রেগে গেলেন। বললেন, তাই বল! ওই খেসারির ডাল খাইয়ে-খাইয়েই এই দশা করেছে মেয়েটার। কি সর্ব্বনাশ! মুগের ডালের আর কতই বা দাম, মুগের ডাল দিলেই হ'ত—

—হ্যাঁ, মুগের ডাল দেবে! মুগের ডালের দর কত তা জানেন?

কর্ত্তামশাই বললেন, তা দরটা বড় হ'ল, না শরীরটা?

এই যে এখন এতগুলো টাকার ওষুধ কিনতে হচ্ছে, এখন? এখন কত খাবে খেসারির ডাল, খাও! এখন আমিও তোমাদের খেসারির ডাল খেতে দেব, খাবে?

বঙ্কু বললে, আজ্ঞে, খেসারির ডাল আর এ জন্মে খাব না। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে আমার—

কর্তামশাই বললেন, ছোটবেলায় আমি হরতনকে রোজ এক সের ক'রে দুধ খাইয়েছি, তা জান? তখন আমার ঘরে গরু ছিল—

—দুধের কথা বলছেন, সেই যেবার উনিশ বছর আগে জোড়হাটে আশ্বিনে-ঝড় হ'ল, সেইবার ওখানকার জমিদার-বাড়ীতে শেষ দুধ খেলাম, তারপর দুধ আর চোখে দেখি নি—

কর্তামশাই বললেন, যা খেলে শরীর ভাল হয় তা ত খাবে না তোমরা, কেবল যত সব খেসারির ডাল, তেলে-ভাজা, কচু-ঘেঁচু এই সবই খাবে—

—আজ্ঞে, তেলে-ভাজা আমরা খুব খেয়েছি। হরতন আলুর-চপ, বেগুনি, ফুলুরি খেতে খুব ভালবাসত—

—তাই নাকি? ওই সব খেয়ে-খেয়েই ত এই হয়েছে!

তারপর নিবারণের দিকে ফিরে বললেন, নিবারণ, এই আজ থেকে নিয়ম ক'রে দিলাম: তেলে-ভাজা এ বাড়ীর ত্রি-সীমানায় ঢুকতে পাবে না। তেলে ভাজা যদি বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখেছি ত তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন, খবরদার—

নিবারণ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, আজ্ঞে কর্তামশাই, আমার কি মাথা খারাপ, রুগীকে কি আমি তেলে-ভাজা খাওয়াতে পারি?

—আরে তা নয়, এখনকার কথা বলছি না। রোগ ত দু'দিন বাদেই সেরে যাচ্ছে! আর দুটো মাত্র দিন! তারপর সেরে উঠে হরতন যে তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে তেলে-ভাজা কিনে আনতে বলবে আর তুমিও আদর ক'রে সেই বিষ কিনে আনবে, তা চলবে না!

—আজ্ঞে না, তাই কখনও আমি করতে পারি?

—না, এই তোমায় আমি ব'লে রাখলাম, তা চলবে না। আমার হুকুম। আমি যা কিনে আনতে বলব শুধু তাই কিনে আনবে।

—আজ্ঞে, তাই কিনে আনব।

—কিনে আনব বললে চলবে না, আগে শোন কি কি কিনে আনবে। এই ধর আঙুর, বেদানা, পেস্তা, বাদাম, আপেল, কলা, ভাল পুরুষ্টু মর্তমান কলা—

বঙ্কু বললে—আপেলের এখন খুব দাম—

কর্তামশাই রেগে গেলেন—তা দাম ব'লে কি মনে করেছ আপেল খাবে না হরতন? আপেল না খেলে গায়ে রক্ত হবে কি ক'রে? তুমিও আপেল খাবে, বুঝলে? তোমারও ত রোগা-প্যাটকা শরীর, তুমিও আপেল খাবে, আঙুর খাবে, বেদানা খাবে, দুধ-ঘি-মাখম খাবে—বুঝলে?

বলতে বলতে হঠাৎ নজর গেল বড়গিন্নীর দিকে। বড়গিন্নী তখন হরতনের বিছানার ওপর ব'সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর তার চোখ দিয়ে গড়-গড় ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে।

—এ কি? কেঁদে ফেললে নাকি? কাঁদছ কেন বড়গিন্নী? এতদিন পরে নাতনী ফিরে পেলে, কোথায় আনন্দ করবে, তা নয় কাঁদছ? কেঁদে কি হরতনের অকল্যেণ করবে নাকি? চোখ মুছে ফেল, হাসো—

বড়গিন্নী আর থাকতে পারলে না। কথাটা শুনে বোধহয় আরও জোরে কান্না আসছিল। শাড়ির আঁচলটা দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে ফেললে। একদিন বড়গিন্নীর চোখের সামনেই নিজের পেটের যোয়ান ছেলে চ'লে গেছে, ছেলের বউও চ'লে গেছে। সেদিন সেই চূড়ান্ত শোকের সময়ও বোধ হয় এত জল গড়ায় নি চোখ দিয়ে। আজ এই আনন্দের দিনে সেই চোখের জল তার সুদসুদ্ধ উশুল ক'রে নিচ্ছে।

—বেশ ভাল ক'রে দেখ, চিনতে পারছ ত নাতনীকে?

বড়গিন্নী চোখ থেকে আঁচল খুলে আবার হরতনের মাথায় হাত বুলোতে লাগল, আবার ভাল ক'রে চোখ মেলে দেখতে লাগল।

—তখন তুমি বলতে হরতনকে লেখাপড়া শেখাবে, এখন শেখাও। এখন তোমার মনের যত সাধ সব মিটিয়ে নাও। ভাল ভাল জামা-কাপড় পরাও, ভাল ভাল খাবার-টাবার খাওয়াও, যা মনে সাধ হয় সব মিটিয়ে নাও। যত টাকা লাগে সব আমি দেব—টাকার কথা ভেব না। আর হরতন যখন একবার এসে গেছে, তখন হুড় হুড় ক'রে টাকা আসবে—বড় বাড় বেড়েছিল দুলাল সা'র, বেটা চামারের একশেষ, ভেবেছিল, চিরকাল বুঝি আমার এই রকম দশা থাকবে—ওরে, তুই জানিস্ না, মুরগীর পেটে তেল হ'লে মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা! তোকে একদিন এই মোল্লার দরজাতেই আসতে হবে, এই ব'লে রাখলাম—

তার পর হঠাৎ বাইরের সিঁড়ির দিকে নজর পড়তেই বললেন—কে? কে ওখানে? কারা?

নিবারণ সরকার বললে—আজ্ঞে, মালোপাড়ার লোকজনরা এসেছে, হরতনকে দেখবে—

—তা দেখুক্, এক-একজন ক'রে দেখুক্, বেশি ভিড় করে না যেন কেউ। সরো বড়গিন্নী, এখান থেকে সরো, তোমার নাতনী ফিরে এসেছে ব'লে গাঁ-সুদ্ধ সবাই আনন্দ করতে এসেছে, আর তুমি কি না কাঁদছ। হাসো, এখন থেকে ত তোমার হাসবার দিন এল গো—প্রাণ ভ'রে হাসো—

তা সেই কলকাতা থেকেই ইলেক্‌ট্রিকের মেকার-মিস্ত্রী এল। বাড়ী-মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এখন আর চেনা যায় না ভট্টাচায্যি বাড়ীকে। যারা বুড়ো লোক, এই আশি-নব্বই বছর যাদের বয়েস, তারা চিনতে পারলে। ঠিক কর্ত্তামশাই-এর দাদার আমলে এই রকম চেহারা ছিল এ-বাড়ীর।

কর্ত্তামশাই বললেন—তোমরা মেকার-মিস্ত্রী ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের চৌত্রিশ বছরের ফার্ম!

নিবারণ সরকার সঙ্গে ছিল।

বললে—আজ্ঞে, এরাই লাটসাহেবের বাড়ীতে কাজ-টাজ করে—

—তা ভাল! কর্ত্তামশাই বললেন—আমার এ বাড়ীও এককালে লাটসাহেবের বাড়ীর চেয়ে বড় বাড়ী ছিল—এখন আবার সারিয়েছি সত্তর হাজার টাকা খরচ ক'রে। আমি চাই লাটসাহেবের বাড়ীতে যেমন সব ইলেক্‌ট্রিকের কাজ আছে, সেই রকম কাজ হবে আমার বাড়ীতে—

—তা একবার দেখি জায়গাগুলো। কোন্ কোন্ জায়গায় আলো-পাখা বসবে—

—সব দেখাচ্ছে আমার সরকার। এই নিবারণ সরকারই আমার ম্যানেজার। লাটসাহেবের যেমন ম্যানেজার থাকে, এও আমার তাই। এই তোমাদের সব দেখিয়ে দেবে, দর-দস্তুর সব ম্যানেজারের সঙ্গেই হবে!

—বেশ!

—আর দেখ বাপু, টাকার জন্য যেন কাজ খারাপ না হয়। টাকা তোমাদের যত লাগবে সব আমি দেব। মানে, কাজটা আমার পছন্দ-মাফিক হওয়া চাই—

—সে আপনি দেখে নেবেন। কাজ আমাদের ফার্মের খারাপ হয় না।

নিবারণ তাদের নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঘরগুলো দেখাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে গাড়ির আওয়াজ হ'ল। গাড়ির আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারা যায়। গাড়ি আর ক'জনেরই বা আছে কেষ্টগঞ্জে। এক দুলাল সা'র গাড়ি আর সুকান্ত রায়ের অফিসের জিপ গাড়ি। আর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি কখনও এদিকে আসেন ত তাঁর গাড়ি!

—কে এল? যাকে-তাকে আসতে দিও না ভেতরে। ব'লো আমি ব্যস্ত আছি, বুঝলে?

কিন্তু না। দুলাল সা'ই এসেছে। শুধু একলা নয়। সঙ্গে নিতাই বসাকও আছে। আর নতুন-বৌ।

দুলাল সা'র নাম শুনেই কিন্তু কর্ত্তামশাই কেমন চিন্তায় পড়লেন।

বললেন—ও বেটা আবার এল কেন মরতে?

—কি বলব ওদের, বলুন।

কর্ত্তামশাই কি ভেবে বললেন—আচ্ছা ডাক, ভেতরে ডেকে নিয়ে এস—

ব'লে কর্ত্তামশাই চেয়ারখানাতে হেলান দিয়ে বসলেন। ব'সে পায়ের ওপর পা তুলে দিলেন। তার পর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সত্যিই তিন জনে ঢুকল। দুলাল সা প্রথমে, তার পর নিতাই বসাক। তার পর নতুন-বৌ।

ক্রমশঃ

—০—

পাঞ্চশস্য

গ্যালিলিও কি পিসার হেলানো স্তম্ভে উঠেছিলেন ?

এ সম্বন্ধেও সংশয় দেখা দিয়েছে। গ্যালিলিও কি পিসার বিখ্যাত হেলানো স্তম্ভে উঠে বল্ ফেলে পরীক্ষা করেছিলেন ? দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ওজনের জিনিষ যদি একই সঙ্গে ফেলা হয় তবে আরিষ্টোটলের ধারণামত ভারী জিনিষটি আগে আর হাল্‌কা জিনিষটি পরে মাটিতে পড়ার কথা। লোকশ্রুতি আছে, গ্যালিলিও-ই সর্ব্বপ্রথম দু'হাজার বছরের পুরাণো এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করেন। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা গুণীদের সামনে হেলানো স্তম্ভ থেকে দু'টি ভিন্ন ওজনের জিনিষ একসঙ্গে মাটিতে ফেলে তিনি বিষয়টি হাতেনাতে পরীক্ষা ক'রে দেখান। এতদিন পর্য্যন্ত এ ঘটনা আমরা সত্য ব'লে জেনে এসেছি। কিন্তু ১৯৩৫ সালে অধ্যাপক লেন কুপার এ বিষয়ে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে বলা হয়েছে—গ্যালিলিও যে সত্যসত্যই এ পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন তা তাঁর কোন চিঠিপত্র কি কোন ধরণের রচনায় উল্লেখ নেই। এমন কি, সমসাময়িক কালে কারো লেখাতেই তার প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় না। হেলানো স্তম্ভটি থেকে পরীক্ষা করার কথা প্রথম প্রকাশ পায় গ্যালিলিওরই একটা জীবনীতে—ভিভিয়ানির লেখা এই জীবনীটি গ্যালিলিও-র মৃত্যুর ৬৪ বছর পরে ১৬৫৫ সালে প্রথম বের হয়েছিল। এমন একটি ঘটনা কি ক'রে সমসাময়িক যুগে সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল—এ এক আশ্চর্য্য ঘটনা। অধ্যাপক কুপার তার উপর ভিত্তি ক'রেই এ সিদ্ধান্ত টেনেছেন। সম্প্রতি এ কথাও জানা গেছে—গ্যালিলিও যে ধরণের পরীক্ষা করেছিলেন ব'লে সাধারণের বিশ্বাস আছে, সে ধরণের একটা পরীক্ষা হল্যাণ্ডের সাইমন ষ্টেভিন করেছিলেন ব'লে নাকি প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাঁর এই পরীক্ষার ফল ১৫৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

পিসার লিনিং টাওয়ার থেকে গ্যালিলিও কি এই ভাবে দুটি ভিন্ন ওজনের বল্ নীচে ফেলেছিলেন ?

এই কলকাতা

এই কলিকাতা কালিকাক্ষেত্র,
কাহিনী ইহার সবার শ্রুত;
বিষ্ণুচক্র ঘুরিছে হেথায়, মহেশের পদধূলি এ পূত।
সত্যেন্দ্রনাথের আমরা প্যারোডি করেছি।

এই কলিকাতা শিল্পক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত;
যন্ত্রের চাকা ঘুরিছে হেথায়,—ধূম ও ধূলিতে পরিপ্লুত।

কবির কল্পলোক এখনো সেই একই রয়েছে, কলকাতা আমাদের চোখে আজো 'কালিকাক্ষেত্র', কিন্তু বাস্তবে অবস্থার পরিবর্ত্তন এসেছে এই পরিবর্ত্তন জনজীবনে সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে।

কলকাতায় আজ অন্যূন যাট লক্ষ লোকের বাস। তার মধ্যে

করপোরেশন এলাকাতেই প্রায় ত্রিশ লক্ষ। খুবই ঘন লোকবসতি—প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৭৫ হাজার জন। এর উপর রয়েছে কয়েক লক্ষ বহিরাগত, নানা কাজে প্রতিদিনই যাদের মহানগরীতে আসতে হচ্ছে। এ সবের চাপে প'ড়ে নগরের সুখ-সুবিধাগুলি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। সবার জন্য নেই শুদ্ধ পানীয় জলের সন্ধান। শতকরা ৫৫ জন লোকেরই নিজস্ব পায়খানার অভাব। শহরের মা· এলাকার ছ'ভাগের এক ভাগ হ'ল বস্তির কবলিত।

পরিবহন আর এক নিদারুণ সমস্যা। এক হাওড়া ব্রীজ দিয়েই প্রতিদিন পাঁচ লক্ষ লোক এবং চল্লিশ হাজার গাড়ী যাতায়াত করছে। শহরে সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা সমস্যাটিকে অলৌকিক গোলকধাঁধাঁয় পর্যবসিত করেছে। এর বলি গত বছর মোট ২৭৫টি দুর্ঘটনা।

রাজপথের নিত্যস্বাধীন ষাঁড়গুলির মত কলকাতার অপরিচ্ছন্নতাও খ্যাতি অর্জন করেছে। দায় অবশ্য বড় দুরূহ। প্রতিদিন ৪২০ মাইল কাঁচাপাকা নর্দমা এবং আরো ৪০০ মাইল পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখতে হয়। ষোল কোটি গ্যালন পাঁক উদ্ধার করতে হয়, আর সে সঙ্গে দরকার বাইশ শ' টন ক'রে ময়লা অপসারণ করা।

আপাতত যা নিরীহ মনে হয়, সেই ধূম আর ধূলার পরিমাণও কম নয়। শীতের বিবর্ণ সন্ধ্যায় তার চোখ-জ্বালান উপস্থিতি ধূম আর কুয়াশা মিলে বিচিত্র 'ধূমাশার' সৃষ্টি করে। পরিমাপ ক'রে দেখা গেছে কলকাতার বর্গমাইল পরিমিত জায়গায় বৎসরে ধুলো জমে গড়ে প্রায় চার শ' টন। টালা ইত্যাদি জায়গায় আরো বেশি—১১০০ টন!

তার পর সেই জ্যান্ত উপদ্রব মশা ও মাছি। তার পরিমাণ অবশ্য কম হয় নি। ঈশ্বর গুপ্তের সেই বিখ্যাত কবিতা আরো বিখ্যাত হয়েছে—

রাতে মশা দিনে মাছি।
এই নিয়ে কলকাতায় আছি॥

এই কলকাতা—পশ্চিম বাংলার রাজধানী ভারত ও পৃথিবীর এক বহুশ্রুত জনস্থান।

মহানগরীর সর্বাত্মক পূর্ণ বিন্যাসের জন্য পশ্চিম বাংলা ছাড়াও পূর্ব ভারতের আরো পাঁচটি রাষ্ট্র কলকাতা মেট্রোপলিটান অরগানিজেশনের নগর পরিকল্পনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মানুষ ও শক্তি

বিজ্ঞানের ফসল হ'ল শক্তি আর তার বহু বিচিত্র প্রয়োগ-পদ্ধতি। মানব সভ্যতা নামে যে এই যে অতিকায় রথটি, তা চলছে মূলত বিজ্ঞানেরই বলে। তা না হ'লে মানুষের আর শক্তি কতটুকু। বারোটা মানুষ যা করবে, একা একটি ঘোড়া তা করতে পারে। বিদ্যুতের হিসাবে মানুষের যা ক্ষমতা তাতে একটা টেবিল ল্যাম্পের আলো মিটিমিটি জ্বালান যায় মাত্র। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যখন ছিল না—সেই ১৫৮৬ সালে, রোমের পঞ্চম সিকসাস ইতালীদেশের স্থপতি ফোনটানা-কে গির্জার একটি স্তম্ভ সরাবার নির্দেশ দেন। জিনিষটি ছিল ওজনে ৩২৭ টন, তাই মস্ত এক সমস্যা। অনেক আটঘাট বেঁধে দড়িদড়া কষে শেষপর্যন্ত অবশ্য তা সরানো গেল। তবে লাগল পুরো আট দিন, আর লোকজন লাগল প্রায় হাজার জন, সঙ্গে ৭৫টি ঘোড়াও ছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার—আজকের দিনে ঠিক কল্পনা করা যায় না। নাগরিকদের কাজ আগে ক্রীতদাসে করত। ১৯৫৬ সালে জার্মান অধ্যাপক ফ্রেডরিখ ডেশার প্রশ্ন করছেন, জীবনযাত্রার এই বর্তমান ঠাট বজায় রাখার জন্য পৃথিবীর ছ'শ কোটি লোকের জন্য কত ক্রীতদাসেরই না প্রয়োজন?—অন্তত আড়াই শ কোটি—নিজেই উত্তর দিচ্ছেন: অধ্যাপক ওটো ক্রেমার লিখেছেন, আজকের দিনে আমাদের ক্রীতদাসেরা আসছে দেওয়ালের দাগের মধ্য থেকে। রোমান নাগরিক—যাদের প্রত্যেকের ত্রিশ কি চল্লিশ ক'রে ক্রীতদাস ছিল, তাদের তুলনায় আজকের যে কেউ আমরা অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছি, কারণ বেশি পরিমাণ শক্তি আমাদের হাতে রয়েছে।

যে শক্তির কথা আমরা বলছি—কয়লা, তেল, জলপ্রবাহ, প্রাকৃতিক গ্যাস, কাঠ বা অন্যান্য জ্বালানী থেকে তা আসছে। অবশ্য পৃথিবীর জনসংখ্যার একটি প্রধান ভাগ—যারা চাষী, নিজের গায়ের শ্রম আর পশুশক্তির উপর আজও নির্ভর করছে। সেই আদিযুগের মোষ, ঘোড়া, গরু, উট ইত্যাদির উপর তাদের অর্থনীতির বনিয়াদ গড়া আছে। শক্তির একটা প্রধান ভাগ শিল্পদ্রব্য তৈরির জন্য ব্যয় হয়—এ খাতে দরকার মোট উৎপাদনের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ; গার্হস্থ্য প্রয়োজনে চাই এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

শক্তিকে সম্ভব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎরূপে গ্রহণ করাই সবচেয়ে সুবিধা। এতে নষ্টের পরিমাণ কম, তাছাড়া এই বিদ্যুৎকে সহজেই অন্য যে কোন শক্তিতে রূপ দেওয়া চলে। পৃথিবীর মোট যা শক্তির উৎপাদন তার আট ভাগের এক ভাগ এভাবে বিদ্যুৎ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে—ইউনিটের হিসাবে তা প্রায় বিশ লক্ষ ইউনিট। মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার জনপড়তা বাৎসরিক প্রায় ৬৫০, নরওয়ে সুইডেনের মত দেশে তা ১০০০ ইউনিটের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার শোচনীয়ভাবে কম, গড়ে প্রায় ৫০ ইউনিট মাত্র! এ অবস্থা আমাদের শিল্পে অনগ্রসরতারই পরিচয় দিচ্ছে। অন্ন-বস্ত্রের অভাব, রোগ, দারিদ্র্য—সবকিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আগেভাগে শক্তির বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে।

একটি প্রস্তাব

"শান্তিবাদী আইনষ্টাইন তাঁর চিরসঙ্গী গণিত, পদার্থবিদ্যা ও বেহালা নিয়ে যুদ্ধমত্ততার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম নীরবে ক'রে গেছেন, তাতে শান্তির জয় সূচিত হয়েছে।"

—ক্যাপেহিন ক্ষেপার-কৃত অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জীবনীর বাংলা অনুবাদটির সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীসূর্যেন্দ্রবিকাশ কর এই সুন্দর মন্তব্যটি করেছেন (দ্রঃ জ্ঞান ও বিজ্ঞান-মার্চ্চ ১৯৬৩)। বইয়ের সমালোচনা আমাদের দেশে একটি অবহেলিত দিক্, বিশেষ এই বই যদি বিজ্ঞানের বিষয়ে হয়ে থাকে। বিজ্ঞান বইয়ের পাঠক এমনিতেই কম—সে ক্ষেত্রে সমালোচকের দায়িত্ব আরো অধিক। আমরা অনুরোধ করব, বিজ্ঞানের বই সম্পর্কে একটি বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা প্রকাশ সম্ভব কি না 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা তা বিবেচনা ক'রে দেখবেন। এমন একটি সংখ্যায় বাংলা ও ইংরেজী বইয়ের সমালোচনা ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের বই সম্বন্ধে নানা খবরা-খবর দেওয়া যেতে পারে। এ জাতীয় একটি প্রকাশ একসঙ্গে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধন করবে।

দূর থেকে কাছে

অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আজ পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। মানুষের অনেক আশা-ভবিষ্যৎ এই পরমাণু-শক্তির উপর নির্ভর করছে। রাদারফোর্ড পরমাণু বিজ্ঞানের একজন প্রকৃষ্টজ্ঞানী। শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিনি এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা আজ নিশ্চয়ই আমাদের কৌতূহলের কারণ হবে।

তিনি বলেছিলেন, পরমাণু-শক্তির সাফল্য যাঁদের কল্পনায় আসে তাঁরা নিশ্চয়ই চাঁদে বাস করছেন।

রকেটের পুচ্ছ

ময়ূরের পুচ্ছ কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে, আর 'পুচ্ছটিকা' ধূমকেতু, তার লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ পুচ্ছের তাড়নায় সৌরজগতে প্রবেশ ক'রে বিজ্ঞানীর পর্য্যবেক্ষণকে আরো তীক্ষ্ণ ক'রে তুলেছে। রকেটের অগ্নিময় পুচ্ছ যেন এ দুয়ের মিলন স্থল। তার পিছনের দিকে যে আগ্নেয় বিস্ফোরণ, তাই রকেটকে গতিময় ক'রে আকাশের পানে ছুটিয়ে চলে।
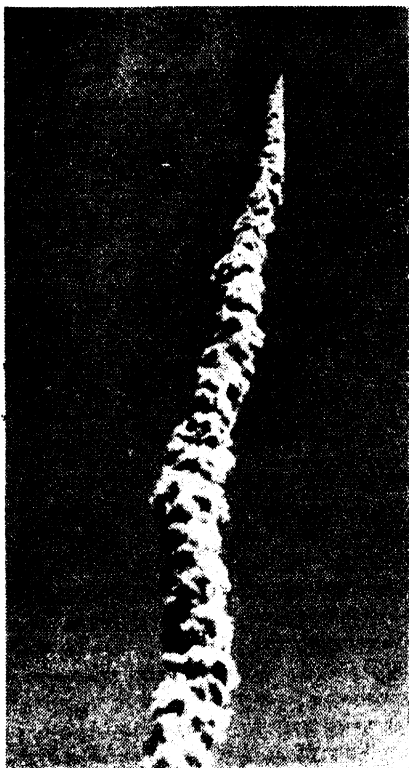
রকেটের পুচ্ছ।

বিজ্ঞানী তার প্রয়োজন বুঝেই এই অগ্নিময় পুচ্ছ রচনা করেছেন। কিন্তু তার চলার পথে প'ড়ে থাকে যে ধূমচিহ্ন মহাশূন্যের থেকে তাই আবার আলপনা হয়ে কবির চোখে এসে ধরা দেয়।

চিত্রে দ্রষ্টব্য স্কাইলার্ক রকেটের ধূমপুচ্ছ।

এ. কে. ডি.

লাদাখ

চতুষ্পার্শ্বের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্পর্করহিত লাদাখ পৃথিবীর বিচ্ছিন্নতম অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম। আর হয়ত সেই কারণেই লাদাখীরা পৃথিবীর দরিদ্রতম একটি জাতি।

হিমালয়ের এই পার্ব্বত্য অঞ্চলটির গড়পড়তা উচ্চতা ১২০০০ ফুট। পাশেই ঐশ্বর্য্যবান্ কাশ্মীর, যার সঙ্গে লাদাখের যোগাযোগ জোজী গিরিবর্ত্ম দিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনবিরল লাদাখ তার অধিবাসীদের দুবেলা পেট ভ'রে খেতে দিতে পারে না।

বহু শতাব্দী ধ'রে লাদাখীরা বহন ক'রে এসেছে এই দারিদ্র্য। একটি স্ত্রীর ভরণপোষণ বেশীর ভাগ লাদাখী পুরুষের সাধ্যসীমার বাইরে।

রকেটের পুচ্ছ।

সে জন্যে এ অঞ্চলে polyandry বা বহুস্বামিত্বের উদ্ভব হয়। বাড়ীতে তিন ভাই থাকলে এক ভাই বিয়ে ক'রে বৌ ঘরে আনত, অন্য দুই ভাইও সেই বৌয়ের ভোগদখলিকার হ'ত। কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে এদের তফাৎ ছিল এইখানে যে, তিনেতে এরা সীমারেখা টানত। পাণ্ডবরা কিছুকাল আগে লাদাখে জন্মালে, নকুল আর সহদেবকে সন্ন্যাসব্রত নিতে হ'ত। যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুন, এই তিনজনের মন জুগিয়ে চলতে পারলেই দ্রৌপদীর দাম্পত্য-কর্ত্তব্য করা হয়ে যেত।

এইসব নকুল-সহদেবের সংখ্যাবাহুল্য থেকে লাদাখে আর একটি জিনিষের উদ্ভব হয়েছিল, সেটি হচ্ছে monastery বা সন্ন্যাসীদের আখড়া। লাদাখের ভূমির অধিকাংশ এই আখড়াগুলির অধিকারে এবং এই আখড়া-

গুলির বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লামারাই ছিল এতকাল আসলে লাদাখীদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। অল্পকাল আগে পর্যন্ত প্রত্যেক লাদাখী পরিবারের অবশ্য-কর্তব্য ছিল, একটি অন্ততঃ ছেলেকে এইসব আখড়ায় সন্ন্যাসী ক'রে দেওয়া, এবং একটি অন্ততঃ মেয়েকে আখড়ায় 'চোমো' বা সন্ন্যাসিনী ক'রে দেওয়া।

লাদাখীরা নিজেদের বলে 'বোতো'।

যেন তেন প্রকারেণ কয়েকটি 'বোতো' সাম্প্রতিক কালে লেখাপড়া শিখে বুঝতে পেরেছে, জীবনটা কেবলমাত্র দারিদ্র্য এবং দাসত্বের বোঝা বহন ক'রে চলার জন্ম নয়। তবে তারা যদিও পরিবর্তন চায়, সন্ন্যাসীদের আখড়াগুলিকে অপরিবর্তিতই রাখতে চায় তারা। কারণ, এগুলিকে উঠিয়ে দিলে ত তাদের অধিকারস্থ জমিগুলির ফসল উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে যাবে না? দেশের জমিই যে তার প্রতিবন্ধক। কাজেই, প্রয়োজন হচ্ছে, অনুর্বর জমিগুলিকে জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে উর্বর ক'রে তোলা।

এ কাজ কে করবে? ভারত, না চীন?

ব'লে রাখা উচিত—যে, পরিবর্তন নানা দিকেই এসেছে। বহুস্বামিত্ব এখন আইনবিরুদ্ধ। সন্ন্যাসীদের আখড়াগুলোয় আগেকার সেই প্রভাব প্রতিপত্তি এখন আর নেই। এই আখড়াগুলোই লাদাখীদের ব্যাঙ্কের স্থান গ্রহণ ক'রে এতকাল তেজারতির ব্যবসা চালাত। কাশ্মীর গভর্নমেন্ট সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। লামা-প্রভাবিত তিব্বতের সঙ্গে এদের লেন-দেন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে লাদাখী লামাদেরও প্রভাব অনেকাংশে খর্ব হয়ে গিয়েছে।

ভারত-চীন যুদ্ধের আবহাওয়ায় এই প্রভাব আরও দ্রুতগতিতে অবসিত হয়ে যাচ্ছে।

লাদাখীরা অত্যন্তই দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু এতকাল তাদের জীবনে দু'টি জিনিষ খুব বেশী পরিমাণেই ছিল,—শান্তি আর সুখ্যা। অতঃপর?

আজ থেকে পঁচিশ বৎসর পরে

আমরা যারা এখন থেকে পঁচিশ বছর আরো বাঁচব না, তারা একটি জীবনে যা দেখে গেলাম তাকে বিনা দ্বিধায় বলা যায় পর্য্যাপ্ত। যাঁরা পঁচিশ বছর আরো বাঁচবেন তাঁরা আরো অনেক কিছু দেখে যাবেন। তাঁরা দেখবেন:

ঠাণ্ডাঘরে না রেখেও খাদ্য তাজা রাখা যাবে। আর সে খাদ্য তাঁরা হ্যাণ্ড-ব্যাগ বা পকেটে ক'রে নিয়ে বেড়াতে পারবেন। এই খাদ্যের অনেকগুলি হবে রাসায়নিক, কিন্তু পরিচিত সাধারণ খাদ্যগুলিকেও de-hydrate বা নির্জলা ক'রে শুকিয়ে সেগুলির গুঁড়ো শিশিতে ভ'রে নিতে পারবেন।

বাড়ীঘর তৈরি হবে বেশীর ভাগ প্লাষ্টিক দিয়ে। সে বাড়ীর দেয়াল-গুলোই হবে বিদ্যুৎবহন, আলাদা ক'রে বিজলীবাতির ব্যবস্থা রাখতে হবে না।

আল্‌ট্রা-ভায়োলেট বা অতিবেগুনী আলোর ব্যবস্থা থাকবে ব'লে মশামাছি, আরশোলা, টিকটিকি, চামচিকে সে-সব বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না।

কোট-প্যান্টলুন এমন কাপড়ে তৈরী হবে যাতে তাদের একবারকার করা ভাঁজগুলো কিছুতেই নষ্ট হবে না, বাড়ীতেই অতি সহজে সেগুলিকে কেচে নেওয়া যাবে, ডাইংক্লিনিং-এ পাঠাতে হবে না। অতিশব্দ বা ultrasonic শক্তির সাহায্যে কাপড় কাচা ও কাচা কাপড় শুকোনো চলবে।

আপনার ঘরের দেয়ালে, আপনি ইচ্ছে করলেই, পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদ ইত্যাদি সম্বলিত টেলিভিশনের ছবি এসে পড়তে থাকবে। টেলিফোনের তার থাকবে না। আপনি যখন বাড়ীতে থাকবেন না তখন টেলিফোনে কেউ আপনাকে ডাকলে তাঁর নাম-ঠিকানা, কি তাঁর বক্তব্য এ সমস্তই টেলিফোনে রেকর্ড হয়ে থাকবে; এই টেলিফোন আপনার ইচ্ছামত ঘরের দরজা খুলবে, বন্ধ করবে, এমনকি যাকে আপনি যা বলতে চান, আপনার পূর্ব্বনির্দ্দেশিত সময়ে তাদের ডেকে সে কথাগুলি ব'লে দেবে।

সমুদ্রের জল আর নোনা থাকবে না। আণবিক শক্তিতে মস্ত বড় বড় জলের পাম্প চলবে।

ক্যান্সার রোগ আর দুরারোগ্য থাকবে না।

স্যাটেলাইট বা মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহদের সাহায্যে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করা হবে।

মহাকাশ-যাত্রী এরোনটরা চাঁদে গিয়ে উত্তীর্ণ হবেন, এবং সম্ভবতঃ চাঁদে মানুষের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হবে।

আপনার পকেটের দেশলাই বাক্সটির মধ্যে আপনার রেডিও সেটটি ঢুকিয়ে নিয়ে পছন্দমত গান শুনতে শুনতে আপনি নিজের ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারবেন।

ক্রঙ্গোদের গৃহ

ছবিটির থেকে কিছু কি বুঝতে পারছেন? খুব চট্‌ ক'রে বুঝতে পারবেন না, কারণ, এ ধরণের ব্যাপার ত ঘটছে না সারাক্ষণ?

সুদানের ক্রঙ্গো নামক উপজাতীয়রা তাদের বাসগৃহে প্রবেশ ও তার

ক্রঙ্গো পুরুষের গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণ।

থেকে নিষ্ক্রমণের জন্তে দরজার ব্যবস্থা রাখে না, সাপ-খোপ, ছুঁচো-ইঁদুর ইত্যাদির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্তে। মেঝে থেকে আড়াই-তিন

হাত উঁচুতে তৈরী, জাহাজের পোর্টহোলের মত, গোলাকার ছিদ্রপথে গৃহকর্তা সান্ধ্যভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসছেন, সেই অবস্থার ছবি এটা।

গৃহনির্মাণের এই রীতিটি ক্রজো নারীদের নাকি খুব পছন্দ। স্বামীদের সান্ধ্য অভিযানের উৎসাহ এতে একটু দমিত থাকে। এতে তাঁদের আরো একটা সুবিধা এই যে, স্বামীরা খাওয়া নিয়ে বেশী গোলযোগ করলে নিষ্ক্রমণের সঙ্কীর্ণ পথটির সঙ্গে মেদবৃদ্ধির কি সম্পর্ক সেটা বোঝাবার জন্যে তর্ক উত্থাপন করতে পারেন।

রাখীবন্ধন

কলকাতায় বা অন্যান্য শহরে যাঁরা গাড়ী চ'ড়ে যাওয়া-আসা করেন তাঁরা সবাই জানেন, আড়াই-তিন বৎসর থেকে ছ'সাত বৎসরের ছেলে-মেয়ে প্রতিদিন আচম্কা তাঁদের গ'ড়ীর সামনে এসে পড়ে। এর ফলে দুর্ঘটনা যত হয় তার চেয়ে ঢের বেশী হ'তে পারত, হয় না যে তার কারণ,

নৌকাগৃহে রাখীবদ্ধ শিশু।

আমাদের দেশের ড্রাইভাররা, কিছুসংখ্যক লরী-ড্রাইভারদের বাদ দিলে, মদ্যপান প্রায় করে না বলা চলে। তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা যখন ঘটে, নির্দোষ ড্রাইভাররা মার খায়, কিন্তু ঐসব ছেলেমেয়ের মা-বাবাদের কেউ কিছু বলে না।

চীনেরা এখন আমাদের মনোজগতে অপাংক্তেয়। তা সত্ত্বেও বলব, চীনেদের কাছ থেকে আমাদের দেশের মা-বাবারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা গ্রহণ করুন। হাউস-বোট বা নৌকাগৃহে বহু চীনেরা বসবাস করে। ছেলে-মেয়েদের সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে গেলে কাজকর্ম কিছু হয় না, তাই তাদের কোমরে দড়ি জড়িয়ে কোন একটা খুঁটির সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে তারা খেলাধুলো, ছুটোছুটি বেশ খানিকটা করতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই নৌকোর বাতা ছাড়িয়ে—নদীর জলে গিয়ে পড়ে না।

টিনের খাবার কতদিন অবিকৃত থাকে

১৯০১ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্কট্ এবং শ্যাকল্টনের দক্ষিণ মেরু অভিযানের সময় পরিত্যক্ত টিনের খাবার পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, দু'-একটি টিন ছাড়া অন্যগুলির ভিতরকার খাদ্যদ্রব্য অবিকৃত অবস্থাতেই রয়েছে। পরীক্ষা হয় ১৯৫৮ সালে, তার মানে, টিনের খাবার অর্দ্ধশতাব্দী ও তার চেয়ে বেশী সময় পর্য্যন্ত আহারযোগ্য ছিল।

স. চ.

ব্রিটেনে হোমিওপ্যাথি

ব্রিটেনে ব্যাপকভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালু হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যাঁরা গোঁড়া নন সেই সব ডাক্তাররা পুরাপুরি নিয়মমাফিক শিক্ষা নিয়ে এবং নাম রেজিষ্ট্রী ক'রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নেমে পড়েছেন।

এই চিকিৎসা আরও গুরুত্বলাভ করেছে, এর পেছনে রাজকীয় সমর্থন আছে ব'লে। রাণী মেরী, ষষ্ঠ জর্জ্জ এবং বর্তমান রাণী এর পৃষ্ঠপোষক। রাজবৈদ্যদের মধ্যে স্যার জন উইয়ার, এম-বি-বি-এস-এর নামও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কারণ ইনিও ফ্যাকাল্‌টি অব হোমিওপ্যাথির একজন সদস্য।

হোমিওপ্যাথির আসল নিয়ম ওষুধ দিয়ে রোগ তাড়ান নয়, রোগের কারণ অনুসন্ধান করা এবং দেহের যে স্বাভাবিক বৃত্তি রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় তাকে শক্তিশালী করা। এর সঙ্গে বসন্তরোগের টীকা দেওয়ার পদ্ধতির তুলনা করা যেতে পারে। কেবল পার্থক্য এখানে যে, হোমিও-প্যাথিতে কেবল আগে থেকেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন নয়, রোগ হবার পরেও চিকিৎসা চলে।

দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে, রোগীর দেহের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা, যে পর্যন্ত না রোগী সুস্থ হয়। অবশ্য এ নিয়ম সকল চিকিৎসা সম্পর্কেই প্রযোজ্য, কেবল তাঁদের বেলায় নয়—যাঁরা রোগীর ভিড়ে চোখেমুখে পথ দেখেন না এবং পেনিসিলিন দিয়ে রোগ তাড়াবার তাড়াহুড়ো পদ্ধতিতে বিশ্বাসী।

ব্রিটেনে ৩০০ পাশ-করা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আছেন এবং শত শত লোক রোগ হ'লে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের কল দেয়। এ ছাড়া ব্রিটেনে কতকগুলি অনুমোদিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার হাসপাতাল আছে এবং এর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রাণীও আছেন।

যদি কোন হাতুড়ে ডাক্তার সাংঘাতিক কোন ওষুধের প্রেসক্রিপশন দিয়ে বসেন সে কথা আলাদা। তা না হ'লে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ তৈরী ক'রে দিতে ব্রিটেনের সমস্ত ওষুধের দোকানওয়ালারা বাধ্য।

মেক্সিকোতে প্রাচীন 'এ্যাজটেক' সভ্যতার পুনরুজ্জীবন

স্পেনীয়রা যখন প্রথম মেক্সিকোয় অবতরণ করে তখন তারা দেখে যে, অধিকাংশ স্থানীয় লোক এ্যাজটেক শাসনাধীন এবং সেই থেকে সেখান-কার সমস্ত আদিবাসীরা ছিল এ্যাজটেক ব'লে পরিচিত। তারপর ১৫২১ সালে এ্যাজটেকদের পরাজয়ের পর চার শ' বছর ধ'রে তাদের সংস্কৃতিও আস্তে আস্তে ক্ষয়িষ্ণু হ'তে থাকে। কিন্তু বর্তমানে শিল্পকলা

প্রাচীন পালকের পোশাকে আধুনিক লাল মানুষ।

প্রাচীন এ্যাজটেক নৃত্যের পোশাকে আধুনিকা।

সঙ্গীত ও নৃত্যে সেই প্রাচীন সভ্যতা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

কয়েক শতাব্দী আগে যে দামামা ও মাটির তৈরী ফ্লুট বাঁশী নৃত্যের সঙ্গে বাজনা হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত, এখন আবার তার অভ্যুদয় হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদে, এমন কি বর্ণাঢ্য পাখীর পালকের শিরোভূষণ পর্যন্ত সেই পুরাণ দিনের নকসা অনুসরণ ক'রে নির্মিত হচ্ছে। নৃত্যসভার বীণাবাদক যে শিরোভূষণ পরিধান করে তাও সেই 'এ্যাজটেক'দের অনুকরণে নির্মিত।

মেক্সিকোয় টলটেক, মিক্সটেক, জ্যাপোটেক, চিচিমেক প্রভৃতি উগ্র উপজাতীয়েরা পর্যন্ত কতকটা 'এ্যাজটেক' জাতীয় সংস্কৃতির বাহক ছিল।

আজকের দিনের বিবাহ সভায় দম্পতিদের নাচের ভঙ্গিমায় সেই পুরাণ দিনের চিচিমেকদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছবিতে মুখোস পরিহিত নৃত্যশিল্পীর পোশাকটি সম্পূর্ণরূপে পাখীর পালক দিয়ে তৈরী এবং প্রাচীন এ্যাজটেকদের কোয়েজলকোয়াটল্ নামে যে শক্তিমান্ দেবতা পাখীর পালক পরিহিত সর্প নামে অভিহিত, তাঁর পোশাকের সঙ্গে ঐ পোশাকের বিশেষ সাদৃশ্য।

বর্তমানে খুব কমই খাটি 'ইণ্ডিয়ান' রক্তের মানুষ মেক্সিকোয় দেখা যায়। কারণ ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে পরস্পর বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার পর মিশ্রিত রক্তের নতুন মানুষদেরই প্রাধান্য আধুনিক মেক্সিকোয়, যারা সংখ্যায় শতকরা প্রায় ৮০ জন এবং এদের বলা হয় মিস্টেজো।

'ইণ্ডিয়ান' ঐতিহ্য, যা তারা ভুলতে বসেছিল, আবার তা ফিরে আসছে। এখনকার ব্যালে নৃত্য প্রাচীন নৃত্যের ছাঁচে ঢেলে সাজা, অঙ্কনশিল্প প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণে। এমন কি স্থাপত্যশিল্প পর্যন্ত প্রাচীন শিল্পরীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আজকের মেক্সিকো বুঝতে পেরেছে যে, এ পর্যন্ত উপেক্ষিত তাদের যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি তা সত্যিই গর্বের জিনিষ। জনসাধারণের বৈচিত্র্যহীন জীবনে পুরাতন 'এ্যাজটেক নৃত্য' নূতন রং ধরায়।

ভাঁজকরা গারাজ

হারমোনিয়ামের বেলোর মত একরকম নতুন গারাজ উঠেছে যেগুলিকে বাইরের দেওয়ালের গায়ে এঁটে রাখা যায়। যখন প্রয়োজন

ভাঁজ করা গারাজ।

হয় না তখন এই গারাজ ভাঁজ ক'রে গুটান থাকে এবং প্রয়োজনে ভাঁজ খুলে মোটর গাড়ী ঢাকা যায়। এই গারাজ বিনা পরিশ্রমে উঠান নামান যায়।

ধ. ম.

বিশ্বামিত্র

শ্রীচাণক্য সেন

কোশল মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছে।

তিনদিন আগে এই দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক সংবাদপত্রে তারস্বরে বিঘোষিত হয়েছে। এমন কোনও সংবাদপত্র নেই যার সম্পাদক এ বিষয়ে গুরুগম্ভীর ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেন নি। মন্ত্রীসভার যখন নাভিশ্বাস, তখন প্রদেশের রাজধানী এই শহরে বড় বড় দেশনেতাদের আগমনে আবহাওয়া হঠাৎ নিদাঘতপ্ত মরুভূমির ন্যায় জ্বালাময় হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সভাপতি স্বয়ং তিনবার উপস্থিত হয়ে মুমূর্ষু রোগীর দেহে প্রাণ সঞ্চারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। দিল্লীতে বারংবার নেতাদের জরুরী বৈঠক হয়েছে; এই প্রদেশের দলপতিগণ দিল্লীপথে ধাবিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি হস্তক্ষেপ না করায় গুরুত্বপূর্ণ জল্পনার দমকা হাওয়া উত্তেজিত আলোচনাকে বার বার বিভ্রান্ত করেছে।

দীর্ঘদিন ধ'রে প্রদেশের রাজনৈতিক জীবনে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল; স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও এ চাঞ্চল্যের অংশ পর্যন্ত দেখা যায় নি। বিধানসভার তিনশ' ছাব্বিশ জন সদস্য, কংগ্রেসী এবং অকংগ্রেসী,—বার বার এই শহরে এসে সকাল থেকে রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত গোপন আলোচনায়, বিতর্কে, লেনদেনে নিমগ্ন হয়েছেন; তাঁদের গোপন সলাপরামর্শের বেশিটাই অবশ্য সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। কংগ্রেসের দলনেতাগণ—প্রাদেশিক পর্যায় থেকে জিলা পর্যায় পর্যন্ত—অপূর্ব তৎপরতার সাংঘাতিক প্রমাণ দিয়েছেন। সাধারণত নির্জীব এই প্রদেশ হঠাৎ যেন কোন্ যাদুবলে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

অনেক চেষ্টা ক'রেও মন্ত্রীসভাকে বাঁচান যায় নি।

অবশেষে, ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে. ডি. কোশল তিনদিন আগের এক ম্লান দিবসের বিষণ্ণ দুপুরে গবর্ণরের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন।

যেমন হয়ে থাকে, নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের অপেক্ষায় গবর্ণরের অনুরোধে তিনি প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব বহন করতে রাজী হয়েছেন।

এদিকে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের আয়োজন চলছে।

যে প্রদেশের কথা বলছি তার নাম উদয়াচল। জনসংখ্যার শতকরা ষাটজন হিন্দীভাষাভাষী, ত্রিশজন মারাঠী; বাকী দশজন দশমেশালী। হিন্দীওয়ালারা যেহেতু সংখ্যায় প্রধান, রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের, অর্থাৎ তাদের নেতাদের হাতে। মারাঠীরা সংখ্যালঘু হ'লেও হেয় নয়; রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ন্যায্য অংশের কিছু বেশি তারা দাবী করে, পেয়েও থাকে। অন্যান্য লোকেদের মধ্যে রাজধানী বিলাসপুরে বঙ্গসন্তান নেহাৎ কম নয়; ডাক্তারী, আইন, শিক্ষকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা প্রাচীন এবং কুলীন। বেশ কয়েক হাজার তামিলনাদ-নিবাসী সরকারী নোকর; কিছু গুজরাতী ব্যবসা-বাণিজ্যে তৎপর; প্রদেশের শিল্প বলতে যা বোঝায় সেই কাপড়ের কল তিনটির মালিক তাঁরা। কিছু শিখ সর্দার ট্যাক্সি ও বাস চালায়, সদর বাজারে ব্যবসা করে; কিছুদিন হ'ল কনট্রাকটারীর উর্বর ভূমিতেও তাদের চ'রে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

উদয়াচল নাম হ'লেও প্রদেশটি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর আয়তনে সবচেয়ে বড় তিনটি প্রদেশের অন্যতম; খাদ্যশস্যের অভাব ত নেই-ই, বরং কিছু বাড়তি উৎপন্ন হয়ে থাকে; কিন্তু শিল্প বিশেষ নেই, যা আছে তাও অন্য প্রদেশের মানুষের কব্জায়। বস্তুতপক্ষে, অনেকে বলেন, উদয়াচলের সবটুকু সম্পদ্, তার সঙ্গে শাসনক্ষমতা, যাদের হাতে তারা প্রায় সবাই বাইরের মানুষ। হিন্দীভাষী জনসাধারণ ছত্রিশগড়ী, কিন্তু ভদ্রলোকেরা উত্তর প্রদেশ থেকে বহুপুরুষ আগে চ'লে এলেও জনতার সঙ্গে এক হ'তে পারেন নি, বা হন নি। মারাঠী সমাজের অধিকাংশ 'গোঁদ' উপজাতির বর্তমান ধোলাই সংস্করণ; অথচ যাদের হাতে ক্ষমতা তারা প্রায় সকলেই মহারাষ্ট্র-বিচ্যুত ব্রাহ্মণ। হাইকোর্টের জজ, বড় ডাক্তার, ভাল অধ্যাপক বেশ কয়েকজন বাঙালী; তাঁরাও উদয়াচলী নামে পরিচিত হ'তে চান না। ফলে, উদয়াচল প্রদেশ ঠিক কারুর নয়, একমাত্র জনসাধারণ ছাড়া, যারা এখনও না শাসন করে, না শাসন করায়।

এহেন উদয়াচলে ছয় বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব—

অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রিত্ব—ক'রে এসেছেন কে. ডি. কোশল। ছয় বছর পর তাঁর মন্ত্রীসভা বর্তমানে ভূপতিত।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

এ প্রদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে বহু লোক তাঁকে চেনেন। নামে, প্রতিষ্ঠায়, সংবাদপত্রে বহুবার প্রস্ফুটিত মুখচ্ছবিতে।

প্রস্ফুটিতই বটে। অমন সুগঠিত দেহ কম পুরুষের দেখতে পাওয়া যায়। ধবধবে ফর্সা রং, সটান ছ' ফুট দৈর্ঘ্য, নির্লোম সতেজ শরীর।

মুখের দিকে তাকালে প্রথমে চোখে পড়ে নাক। কপাল থেকে হঠাৎ গজিয়ে কোনও কিছুর তোয়াক্কা না ক'রে ঋজু বলিষ্ঠতায় গ'ড়ে উঠে হঠাৎ ঈষৎ বেঁকে ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাক দেখলে বোঝা যায়, কেন তাঁর এত দুর্নাম, এত সুনাম। নাকের দু'পাশে চোখ দু'টি কোটরগত; কপাল দীর্ঘ হ'লেও সামান্য চাপা; গালের ওপর বেমানান দু'টি ভাঁজ। এসব মিলে নাককে যেন আরও জোরাল চোখাল ক'রে তুলেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে নাকের প্রভুত্ব বাদ দিলে আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই অনেকে বলেন, কে. ডি. কোশলকে বোঝবার উপায় নেই; নাকের আড়ালে সবকিছু ঢাকা পড়েছে।

উদয়াচলে কে. ডি. কোশল "শক্ত মানুষ" নামে পরিচিত। রাজনীতিকে শাসনকার্যের উত্তীর্ণ অবস্থায় জমিয়ে তুলতে হ'লে অন্তত একজন শক্ত মানুষের দরকার, এই হ'ল প্রচলিত ধারণা। যেমন সর্দার প্যাটেলকে বলা হ'ত নয়া দিল্লীর কঠিন মানুষ। বাস্তবক্ষেত্রে এই শব্দ দু'টির ঠিক অর্থ যে কি তা কিন্তু সহজে জানবার উপায় নেই। যদি বলা যায়, শক্ত মানুষ জনমতের পরোয়া করেন না, জনসাধারণ যা চায়, পছন্দ করে, তার বিপরীত কাজে পিছুপা হন না, তা হ'লে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ক্ষেত্রে এ বিশেষণ প্রযোজ্য নয়। কারণ, যাদের ভোটে রাজত্ব করেন তাদের খুশী রাখবার জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি থাকে না।

যদি বলা যায়, শক্ত মানুষের অসীম দুঃসাহস, তিনি যে-কোনও বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষের সম্মুখীন হ'তে ভয় পান না; বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর পুলিসকে গুলী চালাবার হুকুম দিতে তাঁর কণ্ঠস্বর একবারও কেঁপে ওঠে না, তা হ'লেও কে. ডি. কোশলের ক্ষেত্রে এ বিশেষণ অপব্যবহৃত। একথা সবাই জানে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরুদ্ধশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সম্মুখ সমরে বিশ্বাস করেন না; যদিও অনেকে জানেন না, পুলিসকে গুলী চালাবার হুকুম একবারও তিনি নিজে দিতে পারেন নি।

অথচ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উদয়াচলের রাজনীতিতে শক্ত মানুষ নামে পরিচিত।

এ নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নালিশ আছে। কেননা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল কবি; হিন্দী কাব্যসাহিত্যে তাঁর রচিত "কৃষ্ণলীলাকাহিনী" স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতির বাইরে অবকাশ পেলে, এবং উপভোগ-আনন্দের অভ্যাস-উত্তপ্ত উত্তেজনায় জড়িয়ে না পড়লে, মনের মত নিরাপদ্ মানুষ পেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এখনও মাঝে মধ্যে কবি হয়ে ওঠেন, জীবনের নিগূঢ় রহস্য নিয়ে আলোচনায় নিমগ্ন হ'তে পারেন। তখন তাঁকে কদাচ বলতে শোনা যায়, "সবাই বলে আমি শক্ত মানুষ। আমার মন যে কত দুর্বল তা কেউ জানে না। গাছের পাতা নড়লে পর্যন্ত আমার মনে শিহরণ লাগে।"

একটু থেমে, ম্লান হেসে যোগ দেন, "যখন আমি রাজনীতি করি না। যখন আমি কবি।"

বিলাসপুর প্রাচীন শহর, ভারতবর্ষের সুদূর অতীতের চিহ্ন বহন করছে। মারাঠাদের সঙ্গে মোঘলের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ একদা এ শহরে হয়েছিল; পুরাতন মারাঠা দুর্গ এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে। তার বহু বছর পরে এ দুর্গ থেকেই অন্য এক মারাঠা নৃপতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সে যুদ্ধও দুর্গের ডান দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হয়েছিল। পরবর্তীকালে সমস্ত প্রান্তর ও দুর্গ ঘিরে নিয়ে ইংরেজ সরকার এক বিরাট্ ছাউনির পত্তন করেছিল। ছাউনির নাম সিংহগড়।

সিংহগড়ের অনতিদূরে ইংরেজের হাতে নির্মিত লেজিস্লেটিভ্ অ্যাসেম্বলির ভবন, বর্তমান নাম বিধান-সভা। বড় বাড়ী, বিস্তীর্ণ উদ্যানে ঘেরা। যে রাজপথের ওপর বিধানসভা ভবন, তার দুই সীমান্তে ট্রাফিক পুলিস মোতায়েন। তাদের পেরিয়ে এসে আবার একবার দুই ফটকের সামনে সশস্ত্র পুলিসের সামনে দাঁড়াতে হয়। তারা পাস দেখে পথ ছাড়লে তবে সাধারণ মানুষ বিধানসভা ভবনে ঢুকতে পারে।

রাজপথের নাম ভীমরাও রোড। যে মারাঠা রাজা ইংরেজকে লড়েছিলেন তাঁর নাম। ইংরেজ নাম রেখেছিল ওয়াটসন রোড; কর্নেল ওয়াটসনের হাতে ভীমরাও পরাজিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে নাম পাল্টে রাখা হ'ল। এজন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাহবা পেয়েছিলেন। নতুন নামকরণের জন্যে মনোরম অনুষ্ঠান হয়েছিল। বক্তৃতায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন,

"এ নাম পরিবর্তন সাধারণ ব্যাপার নয়। পরাধীন ভারতবর্ষের রূপ বদ্‌লে স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ উদ্ভাসিত। ইতিহাস যাই বলুক্‌ না কেন, ভীমরাও কোনদিন হারেন নি। হারতে পারেন না। আমাদের মন চিরদিন বলেছে, তিনি জিতেছেন।"

নিমন্ত্রিত জনসভা হাততালিতে ভেঙে পড়েছিল।

মন্ত্রীসভার পতন হ'লেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল আজও তাঁর পরাজয় মেনে নেন নি। যে চতুর নৈপুণ্যে বহু ভাগে বিভক্ত দলের ওপর ছয় বছর তিনি নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন, বিধাতার কঠিন অবিচারে তা আজ সাময়িক ভাবে অকেজো হয়েছে মাত্র। কেননা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উদয়াচলের রাজনীতির নাড়ীনক্ষত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ জানেন, এমন কোন দলীয় নেতা, উপনেতা নেই যার সবটুকু পরিচয় তাঁর আয়ত্ত নয়। একে ত সুদীর্ঘকাল তিনি এ প্রদেশে রাজনীতি করেছেন, এ ক'রে চুল পেকেছে, হাত পেকেছে, কুমার-হৃদয়ে একটি অর্ধস্ফুট উত্তপ্ত আদর্শ ক্রমে ক্রমে শাসন-শিল্পে পরিণত রূপ পেয়েছে। তা ছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তাঁর নিজস্ব গুপ্তচরেরা প্রত্যেক নেতা, উপনেতা, নেতৃত্বাভিলাষীর ওপর সতর্ক নজর রেখে তাঁকে রীতিমত রিপোর্ট দিয়ে এসেছে। সুতরাং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল জানেন, যার যত উচ্চাশা থাক্‌ না কেন, যে যতই না করুক্‌ চেষ্টা, হাই-কমাণ্ডের তাঁবেদারী, দলকে একসঙ্গে বেঁধে রেখে শাসন চালিয়ে যাবার ক্ষমতা কারুর নেই।

শুধু আছে একজনের। তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

আছেন, শুধু একজন আছেন। কম্পিত বক্ষে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আজকাল প্রায়ই তাঁর কথা ভাবেন। কিন্তু ছ' বছরে উদয়াচলের রাজনীতি যে মোহমুদ্গর রূপ ধারণ করেছে, এর মধ্যে সেই অনিশ্চিত আগন্তুক স্থান পাবেন না ব'লে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। স্থান যাতে না পান সে ব্যবস্থা করাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের বর্তমান প্রধান কাজ।

কেয়ার-টেকার মন্ত্রিত্বের মাথায় ব'সে এ কাজ হাসিল করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

ভীমরাও রোড বিধানসভা ভবন পেরিয়ে ডান দিকে মোড় খেয়ে সোজা ধাবিত হয়েছে। আধ মাইল পরে এসে মিলেছে জওহরলাল এ্যাভিনিউর গায়ে। জওহরলাল এ্যাভিনিউ পুরাতন রাস্তার নতুন নাম। ইংরেজ আমলে পরিচয় ছিল কার্জন রোড।

জওহরলাল এ্যাভিনিউর একটা প্রাইভেট নামও আছে। কে. ডি. এ্যাভিনিউ। এ রাস্তাতে মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের সরকারী নিবাস।

মস্ত বড় বাড়ী। পুরো ছ' একর জমি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বড় বড় গাছের ছায়ায় শান্তশ্রী। আম, বকুল, জাম, ইউকালিপ টাস, অর্জুন, নিম, গুলমোহর, কৃষ্ণচূড়া। চারদিকে সবুজ মসৃণ প্রশস্ত লন। মাঝখানে দোতলা বাড়ী, সঙ্গে মাত্র চার বছর আগে তৈরি মুখ্যমন্ত্রীর অফিস-ব্লক। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রোজ ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে সেক্রেটারিয়েটে যান; বাকী সময় বাড়ীতে, অর্থাৎ আপিস-ব্লকে, ব'সে কাজ করেন।

ব্লকটি তিনি নিজের খুশি ও সুবিধামত তৈরী করেছেন। নিচের তলায় কর্মচারীদের ঘর। প্রাদেশিক প্রশাসনে বারোটি বিভাগের চারটি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিজস্ব পোর্টফোলিও। সুতরাং খুব বাছাই বাছাই কয়েকজনকে বাড়ীর আপিসে কাজ করতে আনলেও সংখ্যা একেবারে কম নয়। দোতলায় উঠে সিঁড়ির সঙ্গে আগন্তুকদের বসবার, অপেক্ষা করবার ঘর; পশ্চিমী কায়দায় সুসজ্জিত। দেওয়ালে দেশনেতাদের ছবি। এই ঘরের সঙ্গে তিনখানি ছোট ঘর, তাতে মুখ্যমন্ত্রীর পার্সোনাল ষ্টাফ বসেন। তারপর প্রাইভেট সেক্রেটারী অম্বিকা-প্রসাদের কক্ষ। একটু দক্ষিণে চীফ সেক্রেটারীর জন্যেও একখানা ঘর নির্দিষ্ট রয়েছে। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দপ্তরঘর।

বিরাট্‌, কিন্তু একেবারে নিখুঁত সাবেকী ভারতীয়। মির্জাপুরী সতরঞ্চিতে মেঝে আবৃত। তার উপর ধবধবে সাদা চাদর। চাদরের ওপরে অনেকটা স্থান জুড়ে মির্জাপুরী কার্পেট। মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে মাঝখানে পার্সিয়ান কার্পেট। তিনটি তাকিয়া সুন্দর ক'রে সাজান। মুখ্যমন্ত্রী কার্পেটের ওপর সোজা হয়ে বসেন, সামনে চৌকিতে তাঁর কাগজপত্র, ফাইল থাকে। মাঝে মাঝে তিনি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেন। লোকজনের সঙ্গে কথা বলার সময় কখনও-সখনও তাকিয়ায় গা ছেড়ে দেন। দর্শনপ্রার্থীকে লক্ষ্য ক'রে বলেন, "আরাম ক'রে বসুন। চেয়ারে ব'সে লোকে যে কি সুখ পায় জানি না। ছোট বেলা থেকে আমার মাটির ওপর সোজা হয়ে বসা অভ্যাস। এখন বুড়ো হয়েছি, মাঝে-মধ্যে একটু আরাম চায় দেহ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দপ্তরঘরের সংলগ্ন বাথরুম, পায়খানা;

আর, অন্য পাশে আর একখানা ঘর। বিশ্রাম ঘর। পালঙ্কে শয্যা পাতা, সঙ্গে দু'খানা আরাম-কেদারা, টেবিল, শেল্‌ফ্‌। কাঠের ছোট আলমারীতে কিছু কাপড়-জামা। রিফ্রিজেরেটরে আহারের ফল, পানীয়।

এমন অনেক রাত এসে যায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আর আসল বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন না। তখন এ বিশ্রাম ঘরেই তিনি রাত্রি যাপন করেন।

দপ্তরঘরের অন্যদিকে মন্ত্রীসভার বৈঠক-কক্ষ। এ ঘরটাও বিরাট্‌; সুসজ্জিত। মস্তবড় গোলাকার মেহগনি কাঠের টেবিল, চতুর্দিকে মন্ত্রীদের জন্য পুরু ডানলোপিলো-মোড়া চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে বৃহদাকার চীনে 'ভাস', মালী তাতে রোজ ফুল রাখে। সাধারণত প্রতি শুক্রবার এ ঘরে মন্ত্রীসভার বৈঠক বসে। তা ছাড়া কখন-সখন জরুরী বৈঠক আহ্বান করতে হয়।

যেদিন এ কাহিনীর সুরু, সেদিনও শুক্রবার। মন্ত্রী-সভার বৈঠক হবে বেলা এগারটায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রোজ চারটে বাজতে শয্যা ত্যাগ করেন; আজও করেছেন। বনে পুরো এক ঘণ্টা তিনি বড় বড় পা ফেলে হাঁটেন; সঙ্গে সঙ্গে মনে রোজকার রাজনীতি-খেলার ছকটা তৈরী ক'রে নেন। আজ সকালে বেড়াবার সময় মন্ত্রীসভার বৈঠকের কথা বার বার মনে হয়েছে; এ বৈঠকের গুরুত্ব যে কতখানি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অজানা নেই। মন্ত্রীসভায় তিনটি দল; একটি তাঁর নিজের। অন্য দু' দল হঠাৎ তাঁর বিরুদ্ধে একত্র হয়ে যাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এখনও এই আকস্মিক ঐক্যকে তিনি ভাঙতে পারেন নি; তবে বহুমুখী চেষ্টা তাঁর চলছে; আজ মন্ত্রী-সভার বৈঠকে সে চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে, হবার সম্ভাবনা আছে, তা বোঝা যাবে। বৈঠকের আগে আটটার থেকে একের পর এক মানুষ আসবেন দেখা করতে, তাঁরা সবাই রাজনীতিতে হাত-পাকা। বারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে সাতজনের সঙ্গেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূর্বাহ্নে কথা বলবেন। সকালে এক ঘণ্টা বেড়াবার সময় এ সব আসন্ন সংঘাতের ছক মনের মধ্যে কাটা হয়ে গেছে।

প্রাতঃভ্রমণ শেষ হ'লে গৃহে ফিরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক গ্লাস সান্তরার রস পান করেন। তারপর স্নান সেরে পূজায় বসেন। পূজার ঘরে তার সঙ্গে সারাদিনের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকাল দেখা হয়—ভগবানের সঙ্গে নিশ্চয় নয়—এক অতি সুন্দর বৃদ্ধার সঙ্গে—যাঁর চুল পেকে মুখের রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, যাঁর শীর্ণ দেহে গরদের লাল-পাড় শাড়ী, আয়ত চোখে উদাসীন নিস্তেজ বেদনা, যিনি কথা বলেন খুব কম, অথচ যাঁর দৃষ্টি এত সবাক্‌ যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেন না। কৃষ্ণ-পাথর হরিহরের মূর্তির সামনে চোখ বুজে আধ ঘণ্টা ধ্যান করবার সময় দেশ-শাসনের জটিল সমস্যা যেমন জুলুম ক'রে বিস্তারিত হয়ে পড়ে, তেমনি দৃষ্টিপথে বার বার অদূরে উপবিষ্টা মুদিত-আঁখি নারী বারংবার এসে দাঁড়ায়।

তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ হিন্দুর অন্তরে যে ধর্মভাব জাগে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভজন-পূজন তার চেয়ে কিছু বেশী। একে ত তিনি ধর্মপ্রাণ পিতামাতার পুত্র; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম, এবং সে কারণে ধর্মে স্বাভাবিক অনুরাগ সম্ভব। তা ছাড়া ধর্মের সঙ্গে রাজ-নীতির ওতপ্রোত সম্বন্ধ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভাল ক'রে জানেন। যে রাজনৈতিক নেতা ধার্মিক নন, অর্থাৎ পূজা না করেন, দেবদ্বিজে ভক্তি না দেখান, মন্দির স্থাপনে উৎসাহী না হন, মাঝে-মধ্যে প্রকাশ্যে কপালে তিলক না কাটেন, সাধুসন্তদের সঙ্গে সময় যাপন না করেন এবং বক্তৃতার সময় গীতা, মহাভারত ও রামায়ণ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করতে না পারেন, ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করা তাঁর পক্ষে কঠিন। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল অনেক বেশী বুঝতে পেরেছেন, ধর্মের প্রভাব কত গভীর, কত ব্যাপক ভারতবাসীর মনে। এ প্রভাবকে যে ব্যবহার করতে জানে না সে ব্যর্থ রাজনীতি করে। এ জন্যেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিদিন এক ঘণ্টা পূজার ঘরে কাটান; চন্দন-চর্চিত গৌর কপাল, পরণে পবিত্র রেশমের ধুতি, গ্রীষ্মে অনাবৃত দেহ, শীতে মাত্র রেশমের চাদর: পূজার পর তাঁকে অপূর্বকান্ত দেখায়।

এই কান্তি নিয়েই কদাচিৎ তিনি দু'-একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হ'লে চাপড়াশী বৈঠকখানায় বসায়। পণ্ডিতজী পূজাঘরে আছেন। পূজার পরই দেখা করবেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বৈঠক-খানায় চ'লে আসেন। অমলিন হাসি ঝরতে থাকে তাঁর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। নাকের দাপট যেন একটু স্তিমিত হয়ে আসে।

সাক্ষাৎপ্রার্থী বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। এ কি সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যাঁর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, যাঁর কুৎসায় বহু মানুষ মুখর!

কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অনেক উঁচু, একটু যেন মহান্‌, অনেকখানি রহস্যময় মনে হয়।

আজও পূজায় ব'সে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্থিরমনে দেবভজন করতে পারেন নি। শুধু এ জন্যে নয় যে, অনেকখানি অচেনা এক নারীর ধ্যানরত মুখখানা আজও তাঁকে বার বার বিচলিত করেছে। তার চেয়েও বেশী বিচলিত হয়েছেন সারাদিনের সংঘাত ও সঙ্কটের কথা প্রতি মুহূর্তে মনে হওয়ায়। হরিহরের কাছে তিনি বহুবার মার্জনা চেয়েছেন সবকিছু স্খলন-পতন ত্রুটির জন্যে; প্রার্থনা করেছেন সংগ্রামে জয়লাভের।

পূজাশেষে প্রণাম সেরে উঠতে যাবেন এমন সময় আজকার দিনের প্রথম অঘটন ঘটল।

নারীকণ্ঠ থেকে ধ্বনি এল: "তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। কখন সময় হবে?"

মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খেই হারিয়ে ফেললেন। হঠাৎ জবাব এল না।

বললেন: "আজ বড় কাজের চাপ।"

"তা হোক্। দুপুরে বাড়ী এসে খেয়ো। তারপর কথা হবে।"

বিস্ময়ে হতবাক্ হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। আজ তিন বছর হয়ে গেছে এ ভাবে জোর দিয়ে একটা কথাও এই বিশীর্ণা রমণী বলেন নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন টের পেলেন, এ হুকুম অমান্য করা চলবে না। সহজে মানবার পাত্র তিনি নন। বললেন, "চেষ্টা করব। সময় বড় কম।"

পূজার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন। প্রথম মার্চের সকাল। শীতের আমেজ এখনও লেগে আছে, বার্ধক্যে লাজুক কামনার মত জড়সড়, পলাতক। ইউকালিপটাস গাছগুলির পাতা ঝরছে, গায়ের চামড়া উঠতে আরম্ভ করেছে। ঝিরঝিরে মোলায়েম হাওয়া বইছে, প্রভাতকে আরও মনোরম, স্নিগ্ধ ক'রে। আকাশ মাত্র রঙিয়ে উঠছে। জওহর অ্যাভিনিউ যেখানে ভীমরাও রোডে মিশে গেছে সেই অবধি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দৃষ্টি চ'লে গেল। দেখতে পেলেন কালো রং-এর একখানা গাড়ী আসছে।

এ গাড়ীর অপেক্ষায় ছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

গাড়ী এসে ফটকে ঢুকল। নিষ্ক্রান্ত হ'লেন খদ্দরের ধুতি-কুর্তা পরিহিত মাঝবয়সী ছোটখাট্ট এক ভদ্রলোক। মাথা-ভরতি টাক; শুধু কপালের ওপর হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় একগুচ্ছ লালচে চুল। দেহে ছোট হ'লে কি হবে, লোকটির মুখখানায় সবকিছুই একটু বড়, একটু বেশি। কপাল একটু বেশি চওড়া, চোখ দু'টি খুব বড় বড়, নাক একটু বেশি মোটা, গাল দুটো একটু বেশি ভরা ভরা, চিবুক বড় বেশি চ্যাপটা, ওষ্ঠাধর একটু অতিরিক্ত মোটা, দাঁতগুলি বড় বেশি ধবধবে। এসব মাত্রাধিক্যের ফলে লোকটির চোখে-মুখে অসাধারণ তৎপরতা সর্বদা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেন তিনি অনেক বেশি দেখছেন, জানছেন, বুঝছেন; অনেক বেশি গন্ধ পাচ্ছেন, অনুভব করছেন। মুখোমুখি ব'সে কথা বলতে কেমন অস্বস্তি লাগে।

গাড়ী রাস্তায় দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূজার ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। গিয়েই তাকিয়েছিলেন, চোখ বুজে তখনও ধ্যানরতা রমণীর শীর্ণ মুখের বিদ্রূপের বিশীর্ণ বক্র রেখা দেখতে পাবেন ভেবে।

গাড়ী থেকে যিনি নামলেন তাঁর নাম সুদর্শন দুবে। চাপরাশী বেয়ারা সেলাম ক'রে তাঁকে সম্বর্ধনা করছে, এমন সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূজার ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলেন। মুখে তাঁর হরিহরের দশাবতার স্তোত্র: "কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে।"

সুদর্শন দুবেকে জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"আসুন, আসুন। কৃষ্ণপূজার পরই সুদর্শন-দর্শন। দিন যাবে আজি ভাল।"

হাসতে হাসতে সুদর্শন দুবে বললেন, "ক্ষমা করবেন। একটু দেরি হয়ে গেল। দেখতে পেলাম আপনি অপেক্ষা করছিলেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনে মনে দ'মে গেলেন। প্রথম সংঘাতে তাঁর হার হ'ল। এ লোকটার চোখ বড় বেশি দেখে।

হাসতে হাসতে বললেন, "কিছুমাত্র দেরি হয় নি। আজ অনেক কাজ। একটু তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করতে হ'ল।"

দু'জনে গিয়ে বসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিভৃত নিজস্ব মন্ত্রণা-ঘরে। এ ঘরে প্রবেশাধিকার খুব কম লোকের।

সুদর্শন দুবে প্রথম কথা বললেন।

"আপনার সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের; কিন্তু পূজার পরে সকাল বেলা এই বেশে এই ভাবে আপনাকে প্রথম দেখলাম।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "নিশ্চয় হতাশ হন নি।"

"হতাশ হবার কথা কেন তুলছেন? পূজারী ব্রাহ্মণ হিসেবে আপনার কাছে আমরা কেউ কোনও দিন কিছু আশা করি নি।"

"আমার ঠাকুরদা পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

"আমার পিতামহও নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি বা কম কিছু ছিলেন না।"

"কম ছিলেন না নিশ্চয়। কি খাবেন বলুন। চা খাবেন নিশ্চয়।"

"চা খেয়ে বেরিয়েছি। আসুন, কাজের কথা হোক্। আপনার ত আজ অনেক কাজ।"

"তা বটে। বলুন।"

"কি শুনতে চান?"

"অবস্থা কি রকম বুঝছেন?"

"এখনও নিশ্চিত আশাপ্রদ নয়।"

"হরিশঙ্কর ত্রিপাঠী কি বলছেন?"

"সর্ত আছে।"

"কি সর্ত?"

"স্বরাষ্ট্র বিভাগ।"

"অসম্ভব।"

"নিরঞ্জন পরিহার মন্ত্রিত্ব পেলে দশজনকে সঙ্গে আনতে পারে।"

"পুরো মন্ত্রিত্ব?"

"তাই ত বলছে।"

"মাধব দেশপাণ্ডে?"

"অর্থমন্ত্রিত্ব।"

"মহেন্দ্র বাজপাঈ?"

"বাণিজ্য-শিল্প।"

"প্রজাপতি শেউড়ে?"

"তার বিরুদ্ধে যে ক'টা নালিশ এসেছে সব তুচ্ছ করতে হবে। সে যা আছে তাই থাকবে।"

"দুর্গাভাই?"

"অনড়।"

উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। একবার মেঝেয় পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ সুদর্শন দুবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন:

"আর আপনি?"

সুদর্শন দুবে এ প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিলেন না। তাঁর মুখের প্রত্যেকটি অতিরিক্ত অঙ্গ যেন একসঙ্গে চম্‌কে উঠল। হঠাৎ তিনি উত্তর দিতে পারলেন না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কণ্ঠস্বরকে তিক্ত-কষায় ক'রে ব'লে গেলেন:

"বলুন আপনি কি চান? যে-ক'জনের দাবী আমার কাছে পেশ করলেন এ ত কেবল তাঁদের দাবী নয়, এ আপনারও দাবী। হরিশঙ্কর ত্রিপাঠীকে হোম-মিনিষ্টার করবার জন্যে পাঁচ বছর ধ'রে আপনি চেষ্টা ক'রে এসেছেন। নিরঞ্জন পরিহার মন্ত্রী হ'তে চাইছে কিসের জোরে তাও আমার অজানা নেই। মাধব দেশপাণ্ডে অর্থমন্ত্রী হ'লে প্রদেশের সর্বত্র অনর্থ বাধবে। তবু তার উচ্চাশায় আপনি ইন্ধন জোগাচ্ছেন। মহেন্দ্র বাজপাঈ শিল্প-বিভাগ পেলে আপনার কি সুবিধে হবে আমার জানা আছে। প্রজাপতি শেউড়েকে আপনি বাঁচাতে চান। তা হ'লে দেখুন, এদের সম্মিলিত দাবী আপনারই দাবী। এগুলো সব মেনে নিলে আপনি খুশী, না এর ওপরে আপনার আরও কিছু হুকুম আছে?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কথা বলছিলেন তখনই সুদর্শন দুবে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি যখন জবাব দিলেন তখন তাঁর মুখে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি।

"আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, কোশলজী। এ না হ'লে ভারতবর্ষের অন্যতম ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা ব'লে আপনার খ্যাতি হ'ত না। আপনি যখন সাফ্ কথাবার্তা বলছেন, আমিও তাই করব। আপনি ঠিক বলেছেন, এসব দাবী আমি সমর্থন করি। যদি আপনি এগুলো মানতে পারেন, পার্টি আপনাকে অধিকাংশ ভোটে পুনরায় দলপতি নির্বাচন করতে পারে। পুরো কথা আমি আজও দিতে পারছি না। তবে সম্ভাবনা নিশ্চয় আপনার পক্ষে হবে।"

একটু থেমে আবার বললেন, "আমার নিজের কোনও দাবী আছে কি না জানতে চাইছেন? দেখুন, আপনি আমি প্রায় একই সঙ্গে রাজনীতিতে ঢুকেছিলাম। আপনার বয়স কিছু বেশি ছিল। সেকালে আমরা একে রাজনীতি বলতাম না, স্বদেশী বলতাম। তখনকার জেলে যাওয়া, চরকায় সুতা কাটা, আবগারী দোকানে পিকেট করা, মিছিল ক'রে ইংরেজের পতন দাবী, এসব যে একদিনের শাসনকার্যের পায়তাড়া, তা আমাদের কারুর মনে হয় নি। দেশ যখন স্বাধীন হ'ল, আমরা যখন দেশসেবক থেকে শাসকে উত্তীর্ণ হলাম, তখন নতুন কর্তব্যের আহ্বান এল। এ প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করবার যোগ্যতা সত্যিকারের যাঁর, তিনি নির্লিপ্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একেবারে স'রে দাঁড়ালেন। বাকী রইল দু'জন: সুদর্শন দুবে আর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।"

সুদর্শন দুবে উঠে জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বাইরের দিকে মুখ রেখে ব'লে চললেন, "যদি কর্তারা আমাদের লড়বার স্বাধীনতা দিতেন, আপনাকে হারতে হ'ত। কিন্তু আপনার কলকাঠি নড়ল ওয়ার্ধায়, দিল্লীতে। জিতলেন আপনিই।

"জিতলেন বটে, তবে পুরোপুরি নয়। মুখ্যমন্ত্রিত্ব

পেলেন আপনি, কংগ্রেসের নেতৃত্ব রইল আমার হাতে। এ অবস্থায় চলল ছ' বছর।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "এ ছ' বছরে আমি প্রতিপদে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে এসেছি।"

সুদর্শন দুবের গলা চড়ল।

"একথা পার্কে বক্তৃতা করবার সময় বলবেন। এ ছয় বছর আপনি আমার ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছেন, আমি আপনার ক্ষমতা খর্ব করতে চেষ্টা করেছি। দু'বছর আগে আপনি প্রায় জিতে গিয়েছিলেন। নির্বাচনে আমি এক চুলের জন্যে জিতেছিলাম। আজ আপনি হেরে গেছেন। দলের অধিকাংশ সভ্য আপনার ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে। তাদের আস্থা ফেরৎ পেতে হ'লে আমার সঙ্গে আপনাকে হাত মেলাতে হবে।"

"কোন্ সর্তে? আপনি মন্ত্রীসভায় আসতে চান?"

"না। সুদর্শন দুবে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল এক মন্ত্রীসভায় থাকতে পারে না। এক মন্ত্রীসভার দু'জন নেতা হ'তে পারে না। তা ছাড়া, আমি এই বেশ আছি। রাজত্ব করি না, রাজা তৈরী করি। দায়িত্ব নেই, সমালোচনার অধিকার রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হবার চেয়ে এ অনেক আরামের। আমার সর্ত অন্য।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নীরব দেখে সুদর্শন দুবে ব'লে চললেন:

"সর্ত এমন কিছু নয়। আপনি এবং আমি একসঙ্গে বিবৃতিতে ঘোষণা করব যে, এর পরে প্রাদেশিক শাসনের বড় বড় ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন।"

"অর্থাৎ আপনি আমাকে পরিচালিত করবেন!"

"অত বড় স্পর্ধা আমার নেই, কোশলজী। ক্ষমতাও আমার সামান্য। এই সামান্য ক্ষমতা আমি প্রদেশের কল্যাণে বিনিয়োগ করতে চাই। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার পরামর্শ গ্রহণ করলে আপনি লাভবান্ বই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।"

সুদর্শন দুবে উঠলেন। জোড় হাতে নমস্কার ক'রে বললেন, "প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন। আজ সন্ধ্যায় বা কাল সকালে আপনার টেলিফোন প্রত্যাশা করব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্বারপথ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন সুদর্শন দুবেকে।

গাড়ীতে ব'সে, গাড়ী ছাড়বার আগে, সুদর্শন দুবে ব'লে উঠলেন, "ভুলবেন না, কোশলজী, আমাদের পিতামহ দু'জনেই পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

প্রাতঃকালীন আহারের আগে বেশ বদল করতে হবে। নিজের ঘরে যাবার সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে সুদর্শন দুবের শেষ কথা কয়টি বেজে উঠল।

মনে মনে তিনি ব'লে উঠলেন, "আমরা দু'জনে বিশ্বামিত্র।" ক্রমশঃ

—•—

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীশান্তা দেবী

এই ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দেই স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শতবার্ষিকী হবে। উপেন্দ্রবাবু তাঁর ছবির ব্লক তৈরীর কর্মক্ষেত্রে U. Roy নামে পরিচিত ছিলেন। প্রবাসীর জন্মকাল হ'তেই ইউ. রায়ের সঙ্গে তার যোগ। প্রথম বৎসরের বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্য্যন্ত যে ছবিগুলি প্রবাসীতে ছাপা হয় তাতে ইউ. রায়ের নাম চোখে পড়ে না। কিন্তু আশ্বিন-কার্ত্তিকের যুক্ত সংখ্যায় রাজা রবি বর্ম্মার অনেকগুলি ছবির প্রতিলিপি প্রবাসীতে যখন সম্পাদক প্রকাশ করেছিলেন, তখন ওই চিত্রগুলিতে ইউ. রায়ের নাম প্রথম চোখে পড়ে। এ সময়ে রবিবর্ম্মার ছবি ছাপবার অনুমতি আর কেউ পান নি। প্রবাসী-সম্পাদক এই অনুমতি প্রথম সংগ্রহ ক'রে ছবির প্রতিলিপি যথাসম্ভব সুন্দর করবার জন্যই উপেন্দ্রকিশোরের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই মাসের পর থেকে অন্য অনেক সাধারণ ব্লকেও ইউ. রায়ের নাম আছে। সে প্রায় ৬২ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

উপেন্দ্রবাবু এদেশে এবং বিশেষতঃ ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর হাফটোন এবং লাইন ব্লক সম্পর্কিত নানা আবিষ্কারের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেশে তাঁকে এ জন্য কোনও অভিনন্দন দেওয়া হয় নি বা বড় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ব'লে তাঁর নাম প্রচার করা হয় নি। আজকাল এর চেয়ে অনেক সামান্য কীর্ত্তির জন্যও মানুষ প্রচুর অর্থ ও উপাধি সম্মান পেয়ে থাকে। একখানা মাত্র চলতি-রকম বই লিখেও কোন কোন লোকের ভাগ্যে যে সম্মান আজকাল লাভ হয় উপেন্দ্রবাবুর যুগে তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভা নিয়েও তিনি সে রকম কোন পাবলিক সমাদর পান নি।

উপেন্দ্রবাবুকে আমরা শৈশবে চিনি, কিন্তু ভারতে হাফটোন ব্লকের প্রবর্ত্তক বা উদ্ভাবক ব'লে নয়। তাঁর পরিচয় আমরা শিশুকালেই পেয়েছিলাম তাঁর শিশু চিত্ত-

উপেন্দ্রকিশোর

হরণ করার নানা বিদ্যার জন্য। আমাদের শৈশবে অথবা জন্মের কিছুকাল আগেও ব্রাহ্ম-সমাজের কয়েকজন কর্মী 'সখা', 'সাথী' ও 'মুকুল' প্রভৃতি শিশুসুলভ মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 'মুকুল' প্রকাশের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন আমার পিতৃদেব। এই সময় উপেন্দ্রবাবুও এই সকল কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাবার কাছে শুনেছি, শিশুদের কাগজে রঙীন ছবি দেবার জন্য তাঁরা আর্টিষ্ট দিয়ে রঙীন ছবির উপর সারা রাত ধ'রে রং লাগাতেন সেকালে। সেই যুগে উপেন্দ্রবাবু শিশু-সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ছেলেদের জন্য গল্প ত তিনি লিখতেনই, আবার সেগুলির জন্য ছবিও আঁকতেন। কিন্তু সেই সব ছবির প্রতিলিপি মনের মতন তখন করা যেত না ব'লেই তাঁর বড় দুঃখ হ'ত। 'উডকাট' বা 'ষ্টীলপ্লেটে' তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ত না। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি নূতন উপায়ে তামার পাতে ব্লক তৈয়ারীতে মন দেন। এই কাজের শিক্ষার জন্য তাঁকে বিদেশে কেউ পাঠায় নি। তিনি বিদেশী বই প'ড়ে এবং নিজের শিল্পীমন ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সহায়তায় হাফটোন ব্লক তৈরীর নানা উন্নত উপায় আবিষ্কার করতে থাকেন। তাঁর পন্থাগুলি বিদেশের বৈজ্ঞানিকরাও সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। দেশে ত তাঁর মত কেউ ছিলই না। তাঁরই শিষ্যরা তাঁর কাছে কাজ শিখে তাঁর জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে নূতন নূতন ব্লকের কারখানা করেন। আজ সেই সব কারখানাওয়ালারা ধনী, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর ঋণজালে জড়িত হয়ে পৃথিবী হ'তে বিদায় নেন।

ছেলেবেলা প্রথম কখন উপেন্দ্রবাবুর লেখা পড়ি মনে নেই। কিন্তু ১৪।১৫ বৎসর বয়সে ছোট ভাইদের গল্প বলবার জন্য তাঁর রচিত 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'ছেলেদের মহাভারত' নিয়ে যে সর্ব্বদাই বসতে হ'ত, তা আজও মনে পড়ে। আমার ছোট ভাই মুলু এই রামায়ণের অনেক জায়গা মুখস্থ ক'রে ফেলেছিল। বাংলা দেশে বাঘ, ভাল্লুক, শেয়াল, কাক, বক, চড়ুই প্রভৃতির নানা গল্প চলিত আছে। সেগুলি হিতোপদেশের গল্প নয়, ঠাকুমা-দিদিমাদের মুখে মুখে বংশানুক্রমিক ভাবে চলিত গল্প। নানা কথকের মুখে তার রূপেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়, কোন কোন গল্প কথকের রসানুভূতির নূতনত্ব অনুসারে অনেকটাই নূতন হয়ে যায়। এই জাতীয় অনেক গল্প এবং সম্পূর্ণ স্বরচিত শিশুমনোরঞ্জক গল্প লেখায় উপেন্দ্রবাবু তাঁর যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর লেখা 'টুনটুনির বই' আমরা পড়েছি, আমার নাতিরাও পড়ে, কেউবা শুনেই মুখস্থ বলে। আমরা ছেলেবেলায় উপেন্দ্রবাবুর আর একখানি বই পড়তাম, তার নাম 'সেকালের কথা'। তাতে ইগুয়ানোডন প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক জীবদের কাহিনী ও ছবি ছিল। ছবিগুলিও বোধ হয় তাঁরই আঁকা।

বছর পঞ্চাশ আগে আমাদের দেশে ছোটদের ভাল মাসিকপত্রের আবার অভাব হয়। এই সময় তিনি 'সন্দেশ' নামে একটি চিত্তাকর্ষক কাগজ প্রকাশ করেন। 'সন্দেশে'র লেখক তিনি এবং তাঁর পুত্র সুকুমার রায় এই দুইজনই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। অবশ্য তাঁদের পরিবারে লেখকের অভাব ছিল না। উপেন্দ্রবাবুর কন্যা এবং উপেন্দ্রবাবুর ভাইরাও এই কাগজে প্রায়ই লিখতেন। সুকুমারবাবুর অনেক হাসির কবিতার সৃষ্টিই 'সন্দেশে'র জন্য।

আমার পিতৃদেব যখন এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতায় চ'লে আসেন তখন আমি উপেন্দ্রবাবুকে প্রথম দেখি। তার আগে একবার তাঁর নামে একখানা চিঠির খাম আমাকে লিখে দিতে হয়, মনে পড়ে। উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রবাসীর ছবির জন্য বাবার প্রায়ই চিঠিপত্র চলত। কোন কারণে বাবার একবার সন্দেহ হয় যে, তাঁর চিঠি অন্য কেউ খোলে। বাবার হস্তাক্ষর ইউ. রায় কোম্পানীর সকলেই চিনত। তাই বাবা আমাকে বললেন, 'তুমি এই খামটির উপরে বাংলায় উপেন্দ্রবাবুর নাম ও ঠিকানা লিখে দাও।' আমি লেখার পর বোধ হয় চিঠি যথাস্থানে ঠিক ভাবেই পৌঁছেছিল।

যাই হোক্, আমরা কলকাতায় আসবার পর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসবের সময় কিংবা তার কিছু আগে উপেন্দ্রবাবুকে চাক্ষুষ দেখি। সেকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ভাল গানের সঙ্গে উপেন্দ্রবাবু বেহালা বাজাতেন। সে যুগে ত মাইক ছিল না, অনেকে তাঁর বেহালা শোনবার জন্য গানের জায়গার কাছাকাছি বসতেন। তখন ১১ই মাঘ সকালে উপাসনার আগে উপেন্দ্রকিশোর রচিত "জাগো পুরবাসি, ভগবত প্রেম পিয়াসি" গান হ'ত। এখনও প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ এই গানটি হয়, এটি না হ'লে যেন উৎসবের অঙ্গহানি হয়। তবে আজকাল আগে ও পরে গানের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়াতে এই গানটির বিশেষত্ব ঠিক আগের মত নেই।

আমরা এলাহাবাদে থাকতে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব 'শেখ চিল্লি' হয় নামে ওদেশে প্রচলিত কতকগুলি উপকথা লেখেন। সেই উপকথাগুলি প'ড়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে **Review of Reviews** পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা ষ্টেড অভিমত

প্রকাশ করেন যে, গল্পগুলি আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত মনোহর। আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন ১৯১২ কি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গল্প গুলি দুই বোনে 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নামে বাংলায় অনুবাদ করি। বাবা উপেন্দ্রবাবুকে উপকথাগুলির জন্য ছবি এঁকে দিতে বলেন। উপেন্দ্রবাবু প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তাঁর আঁকা ভাল ভাল রঙীন ছবি আছে। আমাদের বইটির জন্য কালি দিয়ে তিনি অনেকগুলি ছবি এঁকে দেন। তার মধ্যে কোন কোন ছবি এতই সুন্দর হয়েছিল যে, তিনি যদি অন্য কোন ছবি কখনও না আঁকতেন তবু তাঁর শিল্পী নাম স্থায়ী হয়ে যেত। হাস্যরসাত্মক ছবিগুলিই আশ্চর্য্য ভাল উৎরেছিল।

বেহালা-বাদন-রত উপেন্দ্রকিশোর

উপেন্দ্রকিশোরের পিতামাতার পাঁচ পুত্রের মধ্যে উপেন্দ্রবাবু ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি সব ভাইদের মধ্যে সুন্দর ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের একজন নিঃসন্তান ধনী আত্মীয় তাঁকে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁর অন্য ভাইদের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর নামকরণ হয় কামদারঞ্জন। বড়র নাম সারদারঞ্জন ছিল কিন্তু দত্তক গ্রহণ করার পর নূতন পিতা-মাতা ছেলের নাম রাখলেন উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোরের বহুমুখী প্রতিভা ছিল এবং টাকা-পয়সার জন্য চিন্তা করতে হ'ত না। এই কারণে তিনি গীতবাদ্য, চিত্রাঙ্কন, আলোকচিত্র গ্রহণ ও সাহিত্য-চর্চ্চাতে যথেষ্ট সময় দিতে পেয়েছিলেন।

তিনি পঠদ্দশায় কলিকাতায় আসায় ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং বিখ্যাত সমাজসেবী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের উল্টা দিকে যখন ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় ছিল এবং তাহারই কোন অংশে দ্বারিকবাবু বাস করতেন, তখন বিবাহের পর উপেন্দ্রবাবুও সেই বাড়ীর এক অংশে ছিলেন। উপেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ে গান শেখাতেন এবং শিশুদের আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদি করবার জন্য স্বয়ং কবিতা ও গান রচনা ক'রে দিতেন। একজন বিখ্যাত সংখ্যাতাত্ত্বিকের বিষয়ে গল্প আছে যে, তিনি শিশুকালে অন্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উপেন্দ্রবাবুর গানের ক্লাসে ভর্ত্তি হন। বালককে অনেক চেষ্টা ক'রেও সুরের মর্ম্ম বোঝাতে না পেরে উপেন্দ্রবাবু বলেন, "খোকা, তুমি বাগানে খেলা কর গিয়ে।"

উপেন্দ্রকিশোরের কিছু বয়স হবার পর দত্তক পুত্র বিচারে মাতার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেইজন্য পরে উপেন্দ্রবাবু জমিদারীতে তাঁর স্বীয় অংশের অধিকার ত্যাগ ক'রে স্বাধীন ব্যবসায়ের উপর নির্ভর ক'রেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকেন।

পিছনের সারি : নগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ।
সম্মুখের সারি : বৈকুণ্ঠনাথ দাস, প্রিয়নাথ সেন, উপেন্দ্রকিশোর।

আমরা উপেন্দ্রবাবুকে সপরিবারে সুকিয়া ষ্ট্রীটের একটি ভাড়াবাড়ীতে বাস করতে দেখেছি। তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যারা ছাড়া তাঁর ভাই, ভাইপো, ভাইঝি, অনেকেই সে বাড়ীতে বাস করতেন। পরে উপেন্দ্রবাবু গড়পারে নিজস্ব বাড়ীতে উঠে যান। এই বাড়ীতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আমরা যখন কলেজে পড়ি, কি আমি সবে বি.এ. পাশ করেছি তখন উপেন্দ্রবাবু সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বাড়ীতে একটি গান-বাজনার ক্লাস খোলেন। সেই গানের ক্লাসে আমি উপেন্দ্রবাবুর ছাত্রী ছিলাম। সঙ্গীত-শাস্ত্রবিশারদ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট ভাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন শিক্ষক ছিলেন সেখানে। সুরেনবাবু আসার আগে উপেন্দ্রবাবু একলাই আমাদের শেখাতেন। তাল মাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। তাঁর শিক্ষণ-প্রণালীও একটু বিশেষ রকম ছিল। তিনি সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক ব'লে ব'লে প্রথম শিক্ষা দিতেন। মনে আছে উপেন্দ্রবাবু হাতে তালি দিয়ে দিয়ে বলতেন,

"অভূন্নৃপঃ বিবুধসখঃ পরন্তপঃ
শ্রুতান্বিতঃ দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ।" ইত্যাদি।

এক বৎসর গান ও বাজনা শেখার পর আমাদের ক্লাসের একটি উৎসব হয়েছিল। তাতে ছাত্রছাত্রীরা গান করে এবং উপেন্দ্রবাবু সঙ্গীত-বিষয়ে বলেন।

উপেন্দ্রবাবু কথা বলার সময় প্রত্যেক কথায় একটা ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বলতেন, শুনতে ভারী মিষ্টি লাগত।

তাঁর হাতের লেখারও একটা বিশেষত্ব ছিল। মনে হচ্ছে তিনি একটা বড় লাইন লেখবার সময় আগে সমস্ত অক্ষরগুলি লিখে যেতেন, তারপর া, ি, ী, ইত্যাদি

যথাস্থানে বসিয়ে দিতেন। পুরো একপাতা লেখার সময় এইরূপ করতেন কি না জানি না, তবে ছোট ছোট লাইন এই ভাবে লিখতেন।

'প্রবাসী' কলিকাতায় চ'লে আসার পর ইউ. রায়ের ব্লকের সাহায্যেই বহুদিন প্রবাসীর ভাল ছবি ও রঙীন ছবি ছাপা হ'ত। তার অনেক আগেও, ১৩০৯ কি ১৩১০ সন থেকে রঙীন ছবির হাফটোন ব্লক করার জন্য পিতৃদেব উপেন্দ্রবাবুর সাহায্য নিতেন।

উপেন্দ্রবাবু এবং পিতৃদেব স্বদেশী ছবি প্রচারে পরস্পরের সহায় ছিলেন। তখন এদেশে আর কারুর এ বিষয়ে উৎসাহ ছিল না। ১৩০৯ সালে অবনীন্দ্রের "সুজাতা ও বুদ্ধ" এবং "বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী"র একরঙা প্রতিলিপি প্রবাসীতে বাহির হ'ল। তখনও নানা বর্ণে রঞ্জিত ছবি ছাপার উপায় কলিকাতায় ছিল না। কিন্তু পিতৃদেবের উৎসাহে এবং অর্থে ও উপেন্দ্রবাবুর কার্য্যক্ষমতায় প্রবাসীর রঙীন ছবি ছাপার কাজ হাফটোনের দ্বারা কলিকাতায় অল্পদিনেই সুরু হয়ে গেল। এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে ঘরে। এই যে ইণ্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচার—এ এক তিনি ছাড়া কারুর দ্বারা সম্ভব হ'ত না। রামানন্দবাবু একনিষ্ঠ ভাবে এই কাজে খেটেছেন—টাকা ঢেলেছেন—চেষ্টা করেছেন—পাবলিকে ছবির ডিমাণ্ড ক্রিয়েট করেছেন।"

এই যে ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রচার, এতে উপেন্দ্রবাবুই পিতৃদেবের বড় সহায় ছিলেন।

উপেন্দ্রবাবুর গৌরবর্ণ শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি আজও মনে পড়ে। তাঁর যখন মৃত্যু হয় তখনও তিনি দেখতে কিছুমাত্র জরাগ্রস্ত হন নি। তাঁর কালো চুল কালো দাড়িতে খুবই অল্প বয়স মনে হ'ত তাঁর।

তিনি আশ্চর্য্য বিনয়ীও ছিলেন। মনে হয়, একবার তাঁর কোন বন্ধু সুকুমার রায়ের প্রশংসা ক'রে বলেন, "পিতার উপযুক্তই পুত্র।" উপেন্দ্রবাবু বললেন, "না, না, আমার চেয়ে আমার ছেলে অনেক ভাল।"

আজ উপেন্দ্রবাবুর জন্মের শতবর্ষ পরে তাঁর দেশবাসী এই শতবার্ষিক উৎসব উপযুক্ত ভাবে উদ্‌যাপন করলে দেশের গৌরববৃদ্ধি হবে। গুণীজনদের বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেতে দেওয়ার এদেশের যে বিশিষ্টতা, সেটি ভুলে সজাগ হয়ে নূতন পথে চলবার সময় এসেছে। দেশের অনাদৃত মনীষীদের সম্মান ক'রে আমরা নিজেরাই সম্মানিত হব।

—•—

বিদেশী মূলধন কি আর আসিবে ?

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

মোরারজি আজ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছেন ; কারণ সংবাদপত্র পাঠ করিলেই তিনি ও নেহরু কি বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। বিশেষ মূল্যবান্ কথাই যে সর্ব্বসময়ে থাকে, তাহা নহে ; কিন্তু সংবাদপত্রের সংবাদদান নীতি একটা প্রতিষ্ঠিত ধারা অনুসারেই চলে এবং এই নীতি হইল দেশের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সামান্যমাত্র কথাও বড় হরফে ছাপিয়া দেওয়া। ইহাতে সংবাদপত্রকারের কোন লাভ হয় কি না আমরা জানি না ; পাঠকের সংবাদের বিশেষত্ব ও মূল্যজ্ঞান ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যায়, ইহা কিন্তু আমরা জানি। মোরারজির কথাগুলির জ্ঞানের ও কার্য্যকারিতার দিক দিয়া মূল্য না থাকিলেও কথাগুলি মুখরোচক ও অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনকারী, সন্দেহ নাই। যথা, "মানুষ অলঙ্কারের সৃজন করিয়াছে স্ত্রীলোকদিগকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য"। কথাটা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হইলেও সচরাচর স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সরবরাহ করিতে গিয়া পুরুষগণ নিজেরাই ফাঁদে আট্‌কা পড়িয়া থাকেন। কখন কখন ফাঁদ অতিক্রম করিয়া জেলখানাতেও কোন কোন পুরুষকে আটকা পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। অপরক্ষেত্রে ভারতীয় মানব নিজ কন্যাদিগকেই অলঙ্কার দিতে বাধ্য হয় ও নিজ কন্যাকে ফাঁদে ফেলিবার কথা মোরারজি নিশ্চয়ই কখনও বলেন নাই। কন্যা সম্প্রদানের অলঙ্কার গড়াইলে তাহার ভিতরে কোনও নীচ মতলব আছে কেহ বলিবে না এবং পত্নী যদি অলঙ্কার আদায় করিয়া লন তাহাতে স্বামীই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন ; পত্নী নহে। সুতরাং মোরারজির অভিজ্ঞতাতে যদি অলঙ্কারের সাহায্যে শুধু স্ত্রীলোকদিগকেই ফাঁদে ফেলিতে মানুষে সক্ষম হইতেছে তিনি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে তিনি ভাগ্যবান্ পুরুষ ও তাঁহার সম্ভবত কখনও সেরূপ কাহারও সহিত মুলাকাৎ হয় নাই, যাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায় "বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা"। আমাদিগের এই গরীব দেশে মানুষ নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করায় ও গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে অলঙ্কার পরাইয়া সমাজে বিচরণক্ষম করে। ফাঁদে ফেলিবার সৌভাগ্য ও সাহস অল্পসংখ্যক গুণীজনের মধ্যেই হয়ত থাকিতে পারে; তবে মনে হয় মোরারজির বাক্য কংগ্রেসী আস্ফালন মাত্র, অভিজ্ঞতাজাত সত্য নহে ; আসলে ভিতরে ভিতরে শ্রীচরণের ছুছুন্দর সকলেই, লঘুগুরু নির্ব্বিশেষে। মোরারজির ধারণা ভারতের স্ত্রীলোকগণ তাঁহার বাক্যে ভুলিয়া বলিবেন, "আর আমরা অলঙ্কার পরিব না !" কিন্তু এ আশা তাঁহার স্বপ্নমাত্র। স্ত্রীলোকের অলঙ্কার, বসন, প্রসাধন ও রাজনীতি ক্ষেত্রের মহাষণ্ডদিগের স্বতঃ উৎক্ষিপ্ত বাক্যের বন্যা কেহ কখনও রদ করিতে পারে নাই, এখনও পারিবে না। ১৪ ক্যারেট স্বর্ণে হীরামোতি বসাইয়া গহনার মূল্য চতুর্গুণ হইবে মাত্র। এবং ১৪ ক্যারেট স্বর্ণও বেআইনী রীতিতে আমদানি হইতে থাকিবে, রাজকর্ম্মচারীদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া। কারণ মোরারজি আন্তর্জ্জাতিক মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

স্বর্ণের কপালে যাহাই থাকুক এবং ভারত-নারী কোন্ অলঙ্কারে সজ্জিতা হইবেন একথার বিচার না করিয়া অপর একটি বিষয়ের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা হইল ভারতের রাজস্বসচিবের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতে নিযুক্ত মূলধনের উপর শতকরা ছয় টাকার উপর কাহাকেও লাভ করিতে না দেওয়া। এই লাভের উপর সীমা নির্দ্দেশ এবং সীমা এতটা নিচে নির্দ্ধারণের ফলে ভারতে মূলধন গঠন ও বিদেশের মূলধনের এদেশে আগমন বিশেষ ভাবে অচল হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়। সকল কারবারে খরচ বাড়াইয়া লাভের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়াই অতঃপর ব্যবসার পদ্ধতি হইবে এবং ইহা সহজেই সম্ভব হইবে, কারণ খরচ মোরারজির দৌলতে সর্ব্বক্ষেত্রেই বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু বিদেশীরা এই অবস্থায় এদেশে মূলধন লাগাইতে ইচ্ছুক হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বিদেশের মূলধন যেটুকু ধার করিয়া পাওয়া যাইবে সেটুকু আসিবে এবং তাহার অধিকাংশ সরকারী পরিকল্পনাতে সরকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠান গঠনে ব্যয় করা হইবে। কিছু কিছু রাজদরবারে প্রভাবশালী বণিক্‌দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারবারে আসিবে ; কিন্তু সাধারণতঃ বিদেশী মূলধনের অভাব

ভারতে সর্ব্বত্র অনুভূত হইবে। ইহাতে যে সকল বিদেশী কারবার এদেশে গঠিত হইয়া ভারতীয় মানবের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য (ঔষধ প্রভৃতি) প্রাপ্তি সুগম হইতেছিল সেইগুলির গঠন আর হইবে না। এই সকল বেসরকারী কারখানাগুলির লাভ ও কর্ম্মীদিগের বেতন ইত্যাদি সরকারী কারখানার তুলনায় অনেক উচ্চহারে নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহাতে সরকারী বেতনভোগীদিগের মধ্যে বিক্ষোভের সূচনা হয় এবং সরকারী কারবার লোকসানে চলিলে তাহার সমালোচনার সূত্রপাত হয়। এই সকল কারণে যদি বেসরকারী কারবারে লাভ অধিক না হইয়া খরচ অধিক হয় এবং বিদেশী মূলধন শুধু ধারের মূলধন হিসাবে সরকারী কারবারেই প্রধানত নিযুক্ত হয় তাহা হইলে যাহারা বেহিসাবি চং-এ জাতীয় কান্ড-কারবার চালাইয়া থাকেন তাঁহাদিগের সুবিধা। রাজস্ব অধিক আদায় হইবার সম্ভাবনা এই ব্যবস্থাতে কমই হইবে, কারণ বেসরকারী ব্যবসাদারগণ রাজস্ব দিবার জন্য লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশা করা যায় না এবং সরকারী কারবারে ত লাভ হয়ই না প্রায়। ভারতের সাধারণের এই ব্যবস্থায় সর্ব্বৈব ক্ষতি, কারণ তাঁহারা প্রথমত অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আর পাইবেন না এবং যাঁহারা কারবারের অংশীদার তাঁহারা আগের মত আর লাভের ভাগ পাইবে না। মোরারজির লাভ ইহাতে কিছু বিশেষ হইবে না রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে; তবে জনসাধারণের অবস্থা খারাপ হইলে তাঁহার যে সকলকে ত্যাগ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার আগ্রহ সে আগ্রহ কিছুটা পূর্ণ হইবে। পরের দুঃখে যাঁহাদের সুখ হয় তাঁহারা সাধু মহাপুরুষ হইতে পারেন কিন্তু জনপ্রিয় হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

—•—

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাবলী

শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায় — কলিকাতা ২১ ভাদ্র ১২৯৮

পূজনীয় অগ্রজ

প্রণাম নিবেদনমিতি।

আপনার ১৪ ভাদ্র তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। কার্য্য বশত ও পথ দূরস্থ হওয়াতে আমি একবার বই দুইবার চারুবাবুকে দেখিতে যাইতে পারি নাই। কিন্তু তাহার কোন কুটুম্ব আমাদের কলেজের science Professor J. Choudhuriরির assistant থাকাতে তাহার নিকট হইতে সমাচার পাইয়া থাকি। তিনি বলেন যে চারুবাবু এক্ষণে অনেক ভাল আছেন। দিনর কথা আর কি লিখিব দিননাথ সাংসারিক ও শারীরিক অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। আবার শুনিতেছি যে বারম্বার ২ কামাই হওয়াতে দত্তপুকুরের ইস্কুলের কর্ম্ম থাকিবেক না। সেজ বৌ এক্ষণে আরগ্য লাভ করিয়াছে কিন্তু বড় বধূঠাকুরাণীর অসুখের বিষয় শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। তিনি এক্ষণে বিজয়রত্নের চিকিৎসায় আছেন। অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র তাহার আরগ্য লাভের বিষয় শুনাইয়া পরম বাধিত করিবেন। ঈশ্বর করুন তাহার যেন অগ্রে তাহার মৃত্যু না হয় কেননা অগ্রে তাহার মৃত্যু হইলে সংসারডা মাটি হইয়া যাইবেক। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা কই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের will বাহির হইয়াছে। willলের মর্ম্ম কি তাহা এক্ষণে বাহির হয় নাই। তবে এই তিনজন তাহার সম্পত্তির Executor হইয়াছেন। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালিচরণ ঘোষ আলিপুরের Deputy magistrate ও ক্ষিরদচন্দ্র সিংহ M. A. B. L Pleader Tumlook Courts এই তিনজন তাহার সম্পত্তির Execeutor হইয়াছেন। তিনি যে কি লোকই ছিলেন তাহা আর কত লিখিব। পদ্য যেন তাহার মৃত্যুর পর লিখিবার জন্যই ছিল। এত পদ্যতে শোকাঞ্জলি লিখিবার প্রমতি কখন দেখি না। আজ পর্য্যন্ত কি তাহার শেষ হইল না। এখন পর্য্যন্ত তাহার শোকোচ্ছাস পদ্যতে লিখা হইতেছে। ষ্টার থিয়েটার তাহার বিলাপ তয়ারি করিয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। তাহার মৃত্যুর সুযোগে মুদ্রাযন্ত্রওয়ালারা কাগজওয়ালারা ও থিয়েটারওয়ালারা কিছু পাইয়া গেল। সহরে নগরে ও পল্লিগ্রামে সভা হইতেছে ও তাহার স্মরণার্থ চিহ্ন রাখিবার জন্য উদযোগ করিতেছে। আমাদের কলিকাতা সহরে নানাস্থানে ও নানা ইস্কুল কলেজে সভাসমিতি হইয়া গিয়াছে তাহা আপনি খবরের কাগজে দেখিযা থাকিবেন। তাহার মধ্যে টাউনহলে যে সভা হইয়া গিয়াছে সেই হইতেছে প্রধান সভা। আমাদের ছটলাট বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহাতে যে Committee গঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রায় তিন শত লোকের নাম আছে। তাহারা অনেক স্থান হইতে চাঁদা আদায় করিবেন। সেই চাঁদাতে বিদ্যাসাগর নামক একটি হাঁসপাতাল হইবেক এই জনরব উঠিয়াছে। কি যে হইবেক তাহা এখন কিছুই স্থির হয় নাই। যেমন চাঁদা আদায় হইবেক তদনুযায়ী স্মরণার্থী চিহ্ন হইবেক। কিন্তু আমাদের কলেজে একটি তাহার প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার কথা হইতেছে। Professors & Teachers are prepared to pay their one month's full salary not only in the main school & college but all the branch institutions are prepared to pay according to that rate. আমি কাগজে দেখিয়াছি যে বৈদ্যনাথে একটি সভা হইয়াছিল তাহাতে আপনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বড় বধূঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম ও ছেলেদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

একান্ত স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমদনমোহন বসু।

ওঁ

Office of Comptroller
Post office
১৬ই শ্রাবণ ১৮০৩ শক

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু

পরম পূজনীয় দেব!

গতকল্য আপনার কন্যার উদ্বাহক্রিয়া অতি পবিত্র ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বস্তুত

আমার জীবনে এ প্রকার সুন্দর সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন ও পবিত্র বিবাহ কখন দেখি নাই। আমি আপনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া একথা বলিতেছি না। কিন্তু অনেকের মুখে এপ্রকার শুনিলাম। অনেকে আপনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে "আজ যদ্যপি সেই……এই মহাসভায় উপস্থিত থাকিয়া এই নয়ন-তৃপ্তিকর দৃশ্য দেখিতেন, তবে না জানি তাঁহার কি আনন্দই হইত!" বস্তুতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রশস্ত "হল" লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কিঞ্চিৎমাত্র গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। সকলে নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। সকলেরই মুখে প্রভূত আনন্দের চিহ্ন। রবিবাবু দুইটি অতীব হৃদ্য ও মনোহর সংগীত রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্র-বাবুর সুমধুর ধ্বনিতে গীত সে সংগীতগুলি সকলের মনে পবিত্র ও গাম্ভীর্য্য ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ বাবুর মধুর উপাসনাও অতীব সময়োপযোগী হইয়াছিল। বর ও কন্যার প্রতি তাঁহার উপদেশ সকলের হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে বিবাহের পর বর ও কন্যা ও নিমন্ত্রিত আত্মীয়বর্গ সকলে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সেখানে আহারাদি করিলেন। এখানে একটি কৌতুককর ব্যাপার হইয়াছিল। দুইটী সাহেব ফুলের মালা গলায় দিয়া দুই হস্তে লুচী সন্দেশ আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ করিয়া লুচী ও সন্দেশ খাইতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু সন্দেশ অপেক্ষা নিমকি সাহেব-দিগের অধিক মুখরোচক হইবে এই ভাবিয়া যেমন নিমকি তাঁহাদিগকে দিতে লাগলেন, তাঁহারা নগেন্দ্রবাবুকে "thanks" দিতে লাগিলেন। অবশেষে পান পর্য্যন্ত ছাড়িলেন না। যাহা হউক কন্যাকার ব্যাপার অতি সমারোহের সহিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর সমাজগৃহের মধ্যে বিবাহ এই প্রথম হইল।

ভক্তিভাজন উমেশবাবু আমাকে বলিলেন "যে তোমার প্রতি তাঁহার (অর্থাৎ আপনার) এতদূর স্নেহ ও অনুগ্রহ যে তাঁহার পত্রে তোমাকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিতে লিখিয়াছেন।" আমি একথায় আর কি বলিব। যোগীনবাবু বলিলেন যে তিনি দিন ছ-সাত বাদে যাইবেন।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন ও মাতাঠাকুরাণীকে দিবেন। আশা করি আপনার পরিবারস্থ সকলেই ভাল আছেন।

প্রণত ও আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু

Mahisadal
The 9th March 1894

অশেষ ভক্তিভাজন
শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মহাত্মন্,

ভাষার মধ্যে অসংখ্য ও অশেষবিধ পুস্তক সকল সময়েই প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল পুস্তক পাঠ করিয়া ভাল ২ গুলি নির্ব্বাচিত করা সকলের সাধ্য নহে। আবার, বাছিয়া না পড়িলে অনেকের পক্ষে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট হইয়া থাকে। "জীবন পরীক্ষা" নামক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে অবগত হইলাম যে আপনি সদ্‌গ্রন্থা-বলীর একটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ ফর্দ্দের অমূল্যত্ব বোধ করিয়া মহোদয়ের নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে কৃপা করিয়া এ দাসকে একখণ্ড নকল প্রদান পূর্ব্বক বহু-সংখ্যক লোকের উপকার সাধন করেন—শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

পুত্রস্থানীয়
শ্রীরাধানাথ মাইতি
গড় কমলপুর
পোঃ মহিষাদল (মেদিনীপুর)

পুঃ 'পুত্রস্থানীয়' এইরূপ সগর্ব্ব বিশেষণ দানের স্বত্ব এই যে আমি আপনার সহোদর (পিতৃতুল্য) শ্রীযুক্ত অভয়-বাবুর ছাত্র। বিশেষতঃ, প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি একবার যখন মেদিনীপুরে আগমন করিয়া এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত বালকগণকে তত্রত্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-মন্দিরে সাধারণতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি কথা উপদেশ দিয়াছিলেন তাহারই দুই একটি কথা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মের আভাস পাইয়াছি। সেই সূত্রে নিজেকে উক্ত গৌরবান্বিত বিশেষণে স্বত্ববান্ বিবেচনা করিয়া থাকি। ইতি

বেজি

শ্রীকালিদাস রায়

ফুলায়ে লোমশ লেজ দুলাইছ, বেজি,
গারুড়ী, গরুড়ে স্মরি তোমারে প্রণাম।
মনসারে মান না ক' এত তুমি তেজী,
তোমার নয়ন দু'টি অমৃতের ধাম।

ঘুরিতেছ শ্যেনদৃষ্টি শাখায় শাখায়
নির্ভীক চরণে যেন নিঃশব্দ প্রহরী।
সর্পেরা কোটরে ভয়ে কুণ্ডলী পাকায়।
বিষে বিশেষজ্ঞ তুমি যেন ধন্বন্তরি।

যাহারা গড়িছে দেশে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
ইন্দুরে ভরিবে তা যে তা কি তারা বোঝে?
দুধকলা দিয়ে চাই পোষণ তোমার
আসিবে যে পীত সর্প ইন্দুরের খোঁজে!
সর্বাগ্রে চাই যে বেজি, তোমার আদর,
মর্যাদা বুঝিত তব চাঁদ সদাগর।

বসন্ত-বিদায়

শ্রীকৃষ্ণধন দে

এলে না যে কাল?
—শুকতারা বলে গেল: 'চৈত্র হল শেষ,'
এল আজ বৈশাখী সকাল!
শেষনিশি জেগেছিল পথ চেয়ে বকুলের বন,
শেষ কথা বলেছিল চুপিচুপি উদাস পবন,
শেষ পদ্মে ধরেছিল অর্ঘ্য তার নিঃশেষ যৌবন—
একটি মৃণাল!
—এলে না যে কাল?

চৈত্র যাক্ চ'লে,—
বসন্তের শেষ গান, কী যে তার অভিমান,
কানে কানে কী যে গেল ব'লে!
সে-বাণী কি লিখে গেল বৈশাখের নূতন খাতায়?
সে-তৃষা কি রেখে গেল পীত শীর্ণ মালঞ্চ পাতায়?
সে-স্বপ্ন কি এঁকে গেল ধরণীর নিঃস্ব মমতায়
শেষ অশ্রুজলে?
—চৈত্র যাক্ চ'লে।

অয়ি অনামিকা,
বসন্ত ফুরায়ে গেছে, ব্যর্থ এ বাসর,
—জেল না জেল না রূপশিখা!
মাটির কামনাস্বর্গে পেয়ে থাক যদি ভালবাসা,
পাণ্ডুর অধরপ্রান্তে জাগে যদি হারানো পিপাসা,
আবার ফেরার পথে তুলে নিও ঝ'রে-পড়া আশা
হে অভিসারিকা,
চির-বাসন্তিকা!

খাতা

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তুমি যে ছিলে নতুন খাতা
কী গান দিয়ে ভরাই বল সে-সব শাদা পাতা ?
কেমন করে ভরতে হয় গানে
মন্ত্র তার আকাশখানি জানে
সকাল বেলার শিউলি তার বলে গোপন কথা।

তোমার চোখের তারার দিকে যখন আমি চাই
নানা গোপন অতল গানের আভাস যেন পাই।
কেমন করে তাদের লিখি বল ?
হৃদয় ভাঙার হৃদয় গড়ার স্বপ্ন এলোমেলো।

তোমার খাতা আমার কাছে শাদা হয়েই রইলো
শাদার মধ্যে সাতটি রঙের ময়ূর কথা কইলো।
চোখের তারা কালো তোমার, শাদা খাতার পাতা।
মনের মধ্যে মন মেলালেই ঘুচবে ব্যাকুলতা ?

অপরিচিতা

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

'জায়গা আছে' বললো যেন রক্তে অমোঘ ছড় টেনে কে।

গভীর রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটেছে, নম্র আলোয়
মুখের রেখা আবছা…কে…ওই ট্রেনের চাকার ঝম্ ঝম্ ঝম্
শব্দে যেন সুর দিল সে—
বুকের তলে বাজতে থাকে : 'জায়গা আছে, জায়গা আছে'।

অন্ধকারের হয়তো মায়া ; ভোরের আলোয় ট্রেন থেমে যায়—
ব্যস্ত সবাই…নামতে থাকে…মিলিয়ে গেলো…মিলিয়ে গেলো…
মিলিয়ে গেলো মুখের রেখা…
অন্ধকারের সেই সে-মায়া আলোয় তবু মুখ লুকিয়ে
বুকের তলে বাজতে থাকে : 'জায়গা আছে, জায়গা আছে'।

পথের মতো ছড়িয়ে যাওয়া, ছড়িয়ে যাওয়া আমার ভুবন
শব্দে ফেরা তৃষ্ণা ছুঁয়ে ভর দিতে চায় সুদূর শিখর।

অদেখা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

জানি, ও যে ভয় পায়
একলা আঁধার ঘরে শুতে।
আঁধারে উঠোনটুকু
একা পার হ'তে ভয় পায়।
ভয় তার আঁধারকে নয়।
দুপুরের খটখটে রোদে
মাঠের ওপারে ঐ হিজলের গাছে ঘেরা
নিরালা বিলের ধারে
আঘাটাতে যেতে ভয় পায়।
ভয় তার নিরালাকে নয়।
নিরালা নিরালা নয়,
একা সে যখন
তখনো সে একা নয়,
এই তার-ভয়।
কেউ একজন
থাকে যেন আর কেউ যেখানে থাকে না,
অজানা, অদেখা কে সে, তাকে তার ভয়।
বলে ভুত, বলে জীন, আরো কত কিছু বলে,
শত নাম সেই অজানার।

ঐ মেয়েটিকে ভাবো।
গলির ওপারে বাড়ীটির
তেতলার মাঝবরাবর,
কড়িডর থেকে দূরে, চারদিকৃ চাপা ঘরটায়
দেরাজ-আয়নাটাতে
যে মেয়ে নিজের মুখ দেখে।
যখনই সময় পায়, দেখে।
ভাল ক'রে তার দিকে কেউ যে দেখে না
রূপহীনা জানে সেটা,
নিজেকে নিজেই তাই দেখে।
দে'খে তার ভাল লাগে।

দেখে ব'লে বেঁচে থাকে
বিরূপ এ পৃথিবীতে
রূপহীনতার গ্লানি নিয়ে।
নিরালা ঘরের
আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে
কখনো উদাস করে বাহুমূল।
চুল গোছাবার ছলে
কখনো বা পীনবক্ষ করে পীনতর।
নিজের ভ্রূভঙ্গ দেখে।
কোমল কটাক্ষ হানে নিজেকেই।

নিজেকে কি হানে?
ওকে কি বাঁচিয়ে রাখে
নিজেকে নিজের তার ভাল লাগা শুধু?
তার চোখ দিয়ে তাকে দেখে আরো কেউ,
অজানা, অদেখা একজন,
এ রূপহীনার বুক ভ'রে রাখে যার ভাল লাগা,
রূপহীনা জানে না তা।

ব'লো না সে কথা কেউ ওকে।
ব'লো না যে, ওর চোখ দিয়ে
অজানা, অদেখা কেউ
আরো একজন ওকে দেখে।
হয়ত ও ভয় পাবে।
হয়ত বা আর কোনোদিন
এমন সহজে এসে দাঁড়াবে না আয়নার কাছে,
এমন সঙ্কোচ ভুলে নিজেকে সে আর
দেখবে না, দেখাবে না।
অদেখার দেখা বাধা পাবে।

ভারতীয় গল্পসংকলন—শ্রীবোম্মানা বিশ্বনাথম। প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। আগষ্ট, ১৯৭২। মূল্য চার টাকা।

১৪টি ভারতীয় ভাষায় (তামিল, তেলেগু, কান্নাড়া, মালয়ালম, হিন্দী, উর্দু, গুজরাতী, মারাঠী, কাশ্মিরী, মৈথিলী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, অসমীয়া এবং ওড়িয়া) লিখিত সুনির্বাচিত গল্পের সু-অনুবাদ সঙ্কলন এই মনোহর পুস্তকখানি।

ভারতের ভাষা এক এক প্রদেশে ভিন্নতর হইলেও, একটি বিচিত্র সমষ্টিগত ঐক্য এই সকল ভারতীয় ভাষার মধ্যে লক্ষণীয়। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র ভারতবর্ষ—এই ভিন্নতা সত্ত্বেও এই সংস্কৃতিগুলির মধ্যে একটি বিচিত্র ঐক্যের বন্ধন রহিয়াছে।

আলোচ্য অনুবাদ-সঙ্কলনে যে চৌদ্দটি গল্প সন্নিবেশিত করা হইয়াছে—তাহার সবকয়টিকেই ভারতের যে-কোন প্রদেশের পাঠক নিজ প্রদেশের গল্প বলিয়া মনে করিতে পারেন। গল্পগুলিতে মানুষের একই আনন্দ বেদনা, একই অভাব-অভিযোগ, একই জীবন এবং অন্তর-সংগ্রামের বিচিত্র আস্বাদ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইবে।

বিভিন্ন ভাষা হইতে অনূদিত প্রত্যেকটি গল্পের পূর্ব্বে লেখক সেই ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে একটি ভূমিকা দিয়াছেন, এই সব ভূমিকাতে বিশেষ প্রদেশের সাহিত্য এবং গল্পলেখকদের সম্পর্কে মোটামুটি একটা পরিচয় প্রকাশ করা হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে এই পরিচিতির মূল্য অনস্বীকার্য্য। এই সঙ্কলনের সবকয়টি গল্পই সহজ সুন্দর বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়াছে—কোথাও আড়ষ্টতা নাই। সব কয়টি গল্পই ভাল এবং অনুবাদের যোগ্য।

হিন্দী গল্পের ভূমিকাটি মূল্যবান্। এই ভূমিকাতে হিন্দী ভাষা এবং সাহিত্যের জাগরণ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের অবদান কি এবং কতখানি, তাহার একটা পরিচিতি প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দী সাম্রাজ্য যে-সব উগ্র হিন্দীওয়ালাদের আজ জীবনব্রত এবং বাঙ্গলাকে কোণঠাসা করিতে যে-সব হিন্দী-পণ্ডিত আজ বদ্ধপরিকর—তাঁহাদের জানা এবং মনে রাখা উচিত যে, বাঙ্গলার প্রভাবই হিন্দীকে সমৃদ্ধ করিয়াছে—এবং এই প্রভাব ব্যতিরেকে হিন্দীর বর্ত্তমান সমৃদ্ধি সম্ভব হইত না।

এই গল্প-পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকমাত্রকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত। প্রকাশক: বিশ্বভারতী, ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ৮'০০ টাকা।

ছন্দ পুস্তকখানির প্রথম প্রকাশকাল জুলাই, ১৯৩৬: আষাঢ়, ১৩৪৩। আলোচ্য সংস্করণটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত।

'ছন্দে'র প্রথম সংস্করণে ১৩২১ সালের পূর্ব্ববর্তী আলোচনাগুলি ছিল না, পরবর্তীকালেরও কিছু কিছু আলোচনা বাদ পড়িয়াছিল। আলোচ্য সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক সমগ্র আলোচনা গ্রন্থভুক্ত করার প্রয়াস করা হইয়াছে। সম্পাদক নিজেই বলিতেছেন, "১৩২১ সালের পূর্ব্ববর্তী এবং গ্রন্থ-প্রকাশের (১৯৩৬) পরবর্তী অনেক রচনাই প্রথম সংকলিত হ'ল। অনেকগুলি চিঠিপত্রও প্রথম প্রকাশিত হ'ল…।" বর্ত্তমান সংস্করণটিই যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিষয়ক আলোচনার সম্পূর্ণ রূপ—এ-কথা অবশ্যই বলা চলে। 'ছন্দে'র এই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সম্পাদনা এবং প্রকাশনায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে যে প্রভূত পরিশ্রম এবং বহু অভিজ্ঞজনের সহযোগিতাও গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহা সম্পাদকের নিবেদনেই সুপ্রকাশ। বাঙ্গলা ছন্দের সকল দিক্ সম্বন্ধে 'ছন্দে'র মত এমন জ্ঞানগর্ভ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং মূল্যবান্ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

এই প্রকার একখানি গ্রন্থ সম্পাদন এবং সেই সঙ্গে তাহা পাঠক-সাধারণের পক্ষে সুগম করা অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সম্পাদক এই বিষয় কষ্টসাধ্য কার্য্যে সম্যক্ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। বিবিধ পাদটীকা, বিস্তারিত গ্রন্থ-পরিচয় এবং নির্দ্দেশিকার সাহায্যে পুস্তকখানিকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং জিজ্ঞাসু-পাঠকের সহজ বোধগম্য করার সকল প্রচেষ্টাই সম্পাদক পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে পালন করিয়াছেন।

বাঙ্গলা ছন্দের বিবিধ দিক্: সঙ্গীত ও ছন্দ, ছন্দের অর্থ, ছন্দের হসন্ত হলন্ত, সংস্কৃত-বাঙ্গলা ও প্রাকৃত-বাঙ্গলার ছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের প্রকৃতি, চলতি ভাষার ছন্দ, নাম ছন্দ, কাব্য ও ছন্দ, বাঙ্গলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ, বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ, বিহারীলালের ছন্দ, সন্ধ্যাসঙ্গীতের ছন্দ, বাঙ্গলা ছন্দে যুক্তাক্ষর, বাঙ্গলা ছন্দে অনুপ্রাস, কৌতুককাব্যের ছন্দ, ছড়ার ছন্দ, বাঙ্গলা ছন্দে স্বরবর্ণ এবং গদ্যকবিতা ও ছন্দ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের—প্রমথ চৌধুরী, দিলীপকুমার রায়, ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লিখিত কয়েকখানি চিঠিপত্রও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষণ, গ্রন্থপরিচয়, সম্পূরণ এবং নির্দ্দেশিকা অধ্যায়গুলি পাঠকের নিকট অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের নিজহস্তে লিখিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপির চিত্র গ্রন্থের সৌষ্ঠব ও মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কোন ছন্দস্রষ্টার আবির্ভাব বিশ্বে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এমন এক এবং অদ্বিতীয় মহাছন্দস্রষ্টা এবং শিল্পীর রচনা যে-প্রকার শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, লেখক তাহা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের সম্পাদনার কাজে ব্রতী হইবার প্রথম দিন হইতেই সম্পাদককে এ-কার্য্যের দুঃসাধ্যতা উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। দীর্ঘকাল তাঁহাকে বিবিধপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কিন্তু সুখের কথা, তিনি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সম্পাদক যাঁহাদের

নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন, তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন কার্পণ্য করেন নাই।

'ছন্দে'র নূতন এই সংস্করণটি বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ গ্রন্থাগারেও শ্রদ্ধার সহিত ইহা রাখা উচিত। এই অমূল্য পুস্তকের মূল্য মাত্র আট টাকা, বর্ত্তমান কালের বিবেচনায় অতি সামান্য স্বীকার করিতে হইবে।

হ. চ.

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্য (প্রথম খণ্ড)

—শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক, বঙ্গীয় কবি পরিষদ, ৩৫, ব্যারিষ্টার পি, মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২৫ নঃ পঃ।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রথম খণ্ডে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, সতীশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্র দেব কালিদাস রায়,—এই কয়জন প্রখ্যাত কবির রচনাবলীর কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের কাব্যসম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক নিজে একজন সুকবি, বাংলাসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি যে ভাবে এই পুস্তকে রবীন্দ্রোত্তর কবিদিগের কাব্যালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে একদিকে যেমন তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার বিচার-প্রণালী ও বিশ্লেষণ-শক্তির সুনিয়ন্ত্রিত ধারা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। আমরা রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্যের অন্যান্য খণ্ডগুলির আশায় উৎসুক রহিলাম।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

অলখ-ঝোরা—শ্রীশান্তা দেবী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রবাহ যে সব লেখিকার সাহিত্যকর্মে পুষ্ট, শান্তা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই প্রবীণা লেখিকার লেখনী যে কত প্রাণবান্ 'অলখ-ঝোরা' পাঠে সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটির উৎস-মূল পল্লী বাংলা, আর তার কেন্দ্র চরিত্র সুধা। সুধার গ্রাম থেকে সহরে আসা আর কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার ইতিহাসই বক্ষ্যমান উপন্যাসটির উপজীব্য। পটভূমিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাহ্ন।

সাঁওতাল পরগণার একটি গ্রাম নয়ানজোড়। বাবা মা পিসীমা আর ছোট ভাই শিবুকে নিয়েই সুধাদের সংসার। বাবা আদর্শনিষ্ঠ, গ্রাম্য শিক্ষক—লেখাপড়ার চর্চায় তাঁর দিন কাটে। মা পিসীমা থাকেন সংসার নিয়ে। সুধার সঙ্গী ছোটভাই শিবু আর শ্যামল প্রভৃতি। সুধার আর একটি ভাইয়ের জন্মের পর মা দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসা আর সুধাদের লেখাপড়ার জন্যে বাবা চন্দ্রনাথ কলকাতার একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিলেন। সুধার জীবনে পল্লী মিলিয়ে সহর দেখা দিল। তার সঙ্গে মায়ের সেবা আর ছোটভাইয়ের লালন-পালন। ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসে পল্লীজীবনের মায়াময় স্বপ্ন। সুধা এখানে অন্য এক জগতের সঙ্গে পরিচিত হ'ল। স্কুলে হৈমন্তীকে সুধা পেল একান্ত বন্ধু হিসেবে। সহরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে সুধা কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করল। ইতিমধ্যে আলাপ হয় আদর্শবাদী যুবক তপনের সঙ্গে। মুখচোরা লাজুক সুধা যেমন আকর্ষণ করে তপনকে; আবার সে নিজেও তেমনি তার ফুটনোন্মুখ হৃদয় তপনকে কোন অসাধে সমর্পণ ক'রে ফেলে। এদিকে হৈমন্তীও তপনের প্রতি অনুরক্ত। তপনের কাছে সুধা আপন মনের কথা জানাতে না পেরে দীর্ঘদিন পরে ফিরে এল নয়ানজোড় গ্রামে। কিছুদিন পরে সুধাকে লেখা তপনের চিঠিতে সমস্যার সমাধান হয়।

মোটামুটি উপন্যাসের এই কাঠামোর মধ্যে লেখিকা নিপুণভাবে গল্পের স্বাভাবিকতা রক্ষা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বহু-ব্যবহৃত সেই ত্রিকোণ-প্রেম আলোচ্য উপন্যাসে উপস্থিত থাকলেও, লেখিকা তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টি-ভঙ্গির গুণে কিঞ্চিৎ অন্য স্বাদ এনেছেন। সুধা-তপন-হৈমন্তীর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা জটিলতার সৃষ্টি না ক'রে সেই ত্রিকোণ-প্রেমের সহজ আলেখ্য এঁকেছেন। উপন্যাসটির আকস্মিক পরিণতিতে যে অস্বাভাবিকতার সম্ভাবনা ছিল, লেখিকার ঘটনা-বুনন-কৌশলে তা দূরীভূত।

'অলখ-ঝোরা'র সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র সুধা। গ্রাম্য বালিকা সুধার প্রকৃতির প্রতি সহজাত আকর্ষণ এবং ছোটভাই শিবুকে খেলার সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা—'পথের পাঁচালী'র দুর্গা অপুকে একটু ভিন্নরূপে স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্রাম্য কিশোরী বেগ-চঞ্চল সুধার সহরে আসার পর সুপটু গৃহিণীর ন্যায় ব্যবহার—এই পরিবর্তনটুকু বেশ স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে। হৈমন্তীর চোখেই সুধা প্রথমে আপন সত্তা আবিষ্কার করে। সুধার এই আত্ম-আবিষ্কার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অপূর্ব ভাবে ধরা পড়েছে। মনে মনে তপনের প্রতি আকর্ষণ ও তাকে সে কথা বলার লজ্জায় সুধার গ্রামে ফিরে যাওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। সুধার বান্ধবী হৈমন্তীর চরিত্রটিও স্বল্প পরিসরে সুন্দর চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তপনের চরিত্রের মধ্যে একটু যেন অসাম্ঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক্ দেবতার মত কান্তিবিশিষ্ট বিদ্বান্ যুবক তপন, এম-এ পাশ ক'রে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সুধা ও হৈমন্তী। ত্রিমুখী প্রেমেরও সূচনা হয়েছিল সেখানে। তপনের এই আদর্শের পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত মনোবিশ্লেষণ বা ঘটনা জড়িত নেই। তারপর হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে তপনের বোম্বাই যাওয়ার মধ্যেও কোন কার্যকারণগত সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বোম্বাই থেকে সুধাকে চিঠি লেখার মধ্যে পাঠক একটু আকস্মিকতা দেখতে পাবেন। উপন্যাসটির অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পর্কে বলা যায় মোটামুটি পরিবেশ-অনুযায়ী। নয়ানজোড়ের গ্রাম্য মেয়েদের সংলাপে যে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে তা বিশেষ ভাবে স্বীকার্য।

কাহিনীর মধ্যে সুরেশ মিলির উপকাহিনীর প্রয়োজন যৎসামান্য। সুদূর বর্মায় গিয়ে মিলির তপস্যার কাহিনী ও পরে তাদের বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি আঁকা হয়েছে, সে চিত্র আর একটু সংক্ষিপ্ত করলে, উপন্যাস গতি পেত ব'লে মনে হয়।

লেখিকা কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রকার জটিলতা পরিহার করেছেন ব'লে, তাঁর ভাষাও সর্বত্র স্বচ্ছ ও সাবলীল। গ্রামের চিত্রাঙ্কনের মধ্যে লেখিকার মুন্সিয়ানার পরিচয় দুর্লভ নয়। সবচেয়ে বাস্তব চিত্র তিনি এঁকেছেন তৎকালীন সহর কলকাতার।

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

প্রকাশিত হল

আমাদের গুরুদেব

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে সসম্ভ্রম ও অন্তরঙ্গ আলোচনা। সচিত্র। মূল্য ৩·৫০ টাকা

॥ পূর্ব প্রকাশিত ॥

আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সরল স্বচ্ছ সশ্রদ্ধ এবং মাঝে মাঝে মৃদু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শান্তিনিকেতনের কাহিনী। মূল্য ৫·০০ টাকা

কাব্যপরিক্রমা ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, রাজা, ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ধর্মসংগীত, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য গ্রন্থের আলোচনা। মূল্য ২·২৫ টাকা

ব্রহ্মবিদ্যালয় ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রারম্ভ-যুগের ইতিহাস ও আদর্শ। মূল্য ১·৮০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিষয়ক প্রথম রীতিমত সমালোচনা। মূল্য ২·০০ টাকা

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। মূল্য ৫·০০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

চলিত কথায় যাকে গান-ভাঙা বলা হয় দৃষ্টান্ত-সহ তার আলোচনা। মূল্য ১·০০ টাকা

রবীন্দ্রস্মৃতি ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্মৃতির কাহিনী। মূল্য ২·০০ টাকা

নির্বাণ ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী

কবিজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মূল্য ১·০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সুন্দর গদ্যে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সনাথ শান্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ। মূল্য ৪·০০ টাকা

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ

জীবনের শেষ সাত বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথাবার্তা-আলোচনাদি করেছেন তার আংশিক সংকলন। মূল্য ৩·৫০ টাকা

গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ

রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। মূল্য ৫·০০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য ৭·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

সূচীপত্র— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

সূচীপত্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

— রঙীন চিত্র —

— রামায়ণ রচনাকালে বাল্মীকি —

শিল্পী : উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রামায়ণ রচনাকালে বাল্মীকি

শিল্পী : উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::
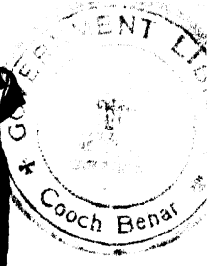
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

২৫শে বৈশাখ

কবিগুরুর জন্মের পর ১০২ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এবারেও তাঁহার শুভ জন্মদিবস ২৫শে বৈশাখ এদেশবাসী, বিশেষে বাঙালী, উৎসবে আনন্দে প্রতিপালন করিয়াছে। সেই সকল উৎসব তাঁহার লিখিত নানা কবিতা পাঠে ও তাঁহার রচিত নানা সঙ্গীতের গানে মুখরিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কি গাহিয়াছিল সেই দিনে তাঁহার স্বদেশীযুগের গান, কেহ কি ভাবিয়াছিল তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় "সোনার বাংলার" কথা? ঐ জন্মদিবসের পূর্ব্বের রবিবারে কলিকাতার এক বাংলা দৈনিকে এক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয় যাহার বিষয়বস্তু ছিল "বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল" ইত্যাদি।

ঐ চিত্রে নির্দ্দয় সত্যকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকট করা হইয়াছিল। বাঙালীর সর্ব্বহারা নিরুপায় অবস্থাকে এভাবে চোখের সম্মুখে ধরা সত্ত্বেও কয়জন প্রতিকারের কথা ভাবিয়াছে জানিতে ইচ্ছা করে।

দেশের শাসনতন্ত্র ও গঠনতন্ত্রের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা এখন বড় মুখে "দেশাত্মবোধ"কে বাঙালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করার কথা বলিতেছেন। দেশের সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদিগকে বলা হইতেছে যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য দেশের ও দশের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্য লেখনী ধারণের প্রয়োজন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক তাহাদের ক্ষমতার শেষ পর্য্যন্ত সকল প্রয়াস একাজে নিয়োগ করিবে সন্দেহ নাই—অন্ততঃপক্ষে সেই সাংবাদিক ও সেই সাহিত্যিক, যাহার মধ্যে দেশপ্রেম ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের লেশমাত্র আছে। কিন্তু যাঁহাদের হাতে বাঙালী সাধারণ তাহাদের ভবিষ্যৎ তুলিয়া দিয়াছে, দেশের নিয়ম নিয়ন্ত্রণ-জনকল্যাণ ও শাসনের সকল অধিকার ও ভার যাঁহাদের আয়ত্তে, সেই অধিকারীবর্গ, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী মহাশয়গণ, কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেশপ্রেম ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের মূলাধার কোথায়? তাঁহারা কি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, "গতগৌরব হৃত আসন নতমস্তক লাজে" যে বাঙালী তাহার কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে তাঁহারা কি করিয়াছেন ও করিতেছেন?

ছিন্নমূল বাস্তুহারার "দেশাত্মবোধ" আসিবে কোথা হইতে সে কথা অধিকারীবর্গ চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছেন? যেভাবে সারা বাংলা দেশের সকল কিছু হইতে বাঙালী অধিকারচ্যুত হইতেছে তাহাতে এ দেশ ও জাতি কোথায় চলিতেছে সে কথা তাঁহাদের বুঝাইবে কে, সে কথাই আজ মনে ভাবি, রবীন্দ্রস্মৃতি স্মরণকালে।

ভারতে বৈশ্যরাজকের রূপ

বহুকাল পূর্ব্বে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভকালে, রবীন্দ্রনাথ "লড়াইয়ের মূল" নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন

সবুজ পত্রের প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যায়। তাহাতে তিনি ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে যে দুই শক্তিযূথ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাদেরও প্রকৃতি রাজ্য গঠন ও শাসনের লক্ষ্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদ বাণিজ্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া তাহাদের তিনি "বৈশ্য" শ্রেণীভুক্ত করেন এবং জার্ম্মানীতে তখনও সামরিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল এবং জার্ম্মান সাম্রাজ্যেও তাহাদের প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল বলিয়া জার্ম্মানদলকে তিনি ক্ষত্রিয়ের আসন দিয়াছিলেন। এই যে রাজশক্তিতে ও শাসনতন্ত্রে বণিক সম্প্রদায় ও সামরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব ও প্রতাপের অনুপাত বৃদ্ধি ও লাঘব ঐ সময়ে ইউরোপে ঘটে তাহার বর্ণনা তিনি নিজের অনুপম ভাষায় এই ভাবে দিয়াছিলেন :

"এদিকে ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের ফলা তৈরি হইল। তাই ক্ষত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বৃথা গোঁফে চাড়া দিতেছে। তাহারা শেঠ্‌জির মালখানার দ্বারে দারোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সবচেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।" ...

"এখন সেই ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে 'অন্তযুদ্ধত্বয়াময়া'।"

প্রভুত্বমূলক সাম্রাজ্যবাদ ও বাণিজ্যমূলক সাম্রাজ্যবাদের প্রভেদ দেখাইয়া ও তাহাদের প্রবর্ত্তনের সময় কাল নির্দ্দেশ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন :

"ইতিপূর্ব্বে মানুষের উপর প্রভুত্ব চেষ্টা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল—এই কারণে তখনকার যত কিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।"

"সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।"

"এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাৎ কি তাহা বুঝিয়া দেখা যাক্‌। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেই-খানেই—জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।"

যে দু'টি বৈশ্যধর্ম্মী পাশ্চাত্ত্যশক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতে তাহা-দের অর্থাৎ ব্রিটিশ ও ফরাসীর, সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার উপর যবনিকা পতন হইয়াছে। এদেশে ও এশিয়া ভূমিখণ্ডে তাহারা এখন রাজবেশ ছাড়িয়া বণিকের বেশেই ফিরিতেছে।

ভারতে সম্প্রতি যে, "বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন" হইয়াছে তাহার রূপ বর্ণনা করিবার সামর্থ্য কার আছে জানি না, আমাদের ভাষায় কুলাইবে কি না সন্দেহ। উহা এমনই অসৎ, পাপাচারে ও অনাচারে কলুষিত এবং দেশের ও দেশবাসী জনসাধারণের পক্ষে উহা এরূপ অনিষ্টকারী ও ক্ষতিকর দাঁড়াইতেছে যে, ব্রিটিশ কোম্পানীর আমলের শকুনি ও শিবাদলের অধিকারও বোধ হয় ততটা অহিতকারী হইতে পারে নাই। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বলিতে এখন যাহাদের বুঝায় তাহাদের অধিকাংশই এখন ঠগী বা পিণ্ডারীগণের সমগোত্রীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এক সর্ব্বভারতীয় ব্যবসায়ী সম্মেলনে শ্রীরামস্বামী মুদালিয়ার ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়া-ছিলেন যে, এখন ব্যবসায়ী বলিতে যেন শুধু প্রবঞ্চক ও দুষ্কৃতকারীই বুঝায়। তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানচালকদিগের মধ্যে সৎলোকও আছেন।

সৎলোক অল্প কয়জন আছেন নিশ্চয়, নহিলে বলিতে হইবে দেশে বিদ্রোহবিক্ষোভের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সৎ তাঁহারা অসৎ ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দেন কেন? ভেজাল ও কালোবাজারের মালিক যাহারা বাণিজ্যে ও শিল্পে দুর্নীতি, মেকী ও ভেজাল চালাইয়া অসহায় ক্রেতাবর্গকে প্রবঞ্চনা করে যে কলুষিত প্রতারক-গণ, তাহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে তাঁহারা বসেন কেন?

যে "বৈশ্যরাজক" এখন এ দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের নীচতা ও কলঙ্কিত স্বভাবের পরিচয় ভারতের জনসাধারণ নিত্য-নিয়ত প্রতি মুহূর্ত্তে পাইতেছে। তাহাদের কার্য্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ দিতে হইলে বিরাট বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থমালা লিখিতে হয়। শুধু একটি ঐরূপ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান—ডালমিয়া জৈন সম্পর্কে আংশিক তদন্তের বিবরণ দুইটি বড় খণ্ডের পুস্তক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আছে শুধু মাত্র সরকারী শুল্ককর ইত্যাদি বিষয়ে ও ঐ প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে স্থিত শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগের অংশীদারের টাকাকড়ি সম্পর্কে উহার কার্য্যকলাপের উপর তদন্তের কথা। ক্রেতা সাধারণ—অর্থাৎ যাহাদের শ্রমার্জ্জিত অর্থ ই এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি শোষণ করিয়া লয় সেই অসহায় জনগণ—ইহাদের কাছে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছে সে বিষয়ে এই তদন্তের বিবরণে কিছু আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

অথচ অসৎ প্রতিষ্ঠান মাত্রেই সরকারকে যতটা ঠকায় বা তাহাদের অংশীদারগণকে যতটা ঠকায় তাহার বহু

শতগুণ অধিক ঠকায় সাধারণ জনকে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অংশীদার প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন এবং তাহাদেরও অনেকেরই টাকা জুয়া বা জুয়াচুরিলব্ধ, সুতরাং ক্ষতি সহিতে তাহাদের অনেকেরই ক্ষমতা আছে। আর, "সরকার?" আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইলেই সরকার সন্তুষ্ট, তা সে আয়ের টাকা যতই না অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত হউক। সেই নির্দ্দিষ্ট অংশের যদি অধিকাংশই ফাঁকি দিয়া সরাইয়া ফেলা হয় এবং যদি কোনও ভ্রম প্রমাদের ফলে সেই ফাঁকির কথা জানাজানি হইয়া পড়ে—যেমন হইয়াছিল মুন্ধ্রার বেলায়—তবেই সরকারের টনক নড়ে। নহিলে সরকারী আয়কর ও শুল্ক হিসাবে কিছু ও উচ্চ অধিকারীবর্গকে কিছু নিবেদন করিয়া লাভের নয়-দশমাংশ বা ততোধিক মুনাফা হিসাবে সরাইয়া ফেলিলে সরকারী মহল হইতে কোনও উচ্চবাচ্য হয় না। অংশীদার পারে ত নালিস করিয়া তাহার প্রাপ্য আদায় করুক্। এবং ক্রেতা সাধারণ? তাহারা ত বঞ্চিত শোষিত ও অবহেলিত হইতেই রহিয়াছে, তাহাদের রক্ষকই বা কে, পালকই বা কে?

রবীন্দ্রনাথ ক্ষত্রিয়ের বিষয়ে লিখিয়াছেন, "তাহারা শেঠ্‌জির মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র।" আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে একটা ধারণা দাঁড়াইতেছে যে যাহাদের হাতে রাষ্ট্রশাসন চালন ও পোষণের কাজ আমরা অর্পণ করিয়াছি এবং যাহারা ঐ অধিকারের দরুণ ক্ষত্রিয়ের আসনে অধিষ্ঠিত, সেই উচ্চতম অধিকারীবর্গ ও প্রায় ঐ মালখানার দরোয়ানের সমপর্য্যায়ভুক্ত, তবে শেঠজি তাহাদের প্রাপ্য দিয়া থাকেন গোপনে এবং সেই প্রাপ্যের বদলে শেঠজির প্রতিষ্ঠান বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইবার ব্যবস্থাও হয়—কিছুটা প্রকাশ্যে, কিছুটা গোপনে।

দেশের লোকের এইরূপ ধারণা হইয়াছে নানা কারণে। প্রথমতঃ এতদিন জাল, ভেজাল, কালো-বাজার, কৃত্রিম সহায়তা ইত্যাদি অবাধে চলিতে দিয়াছেন সরকার। অত্যাচার-জর্জ্জরিত দুর্নীতি-প্রপীড়িত জনসাধারণের দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য কি কেন্দ্রীয় কি রাজ্য সরকার এতদিন কোনও তাপ উত্তাপ প্রদর্শন করেন নাই। যাহা-কিছু ঐদিকে হইয়াছে ও হইতেছে সে-সকলই সম্প্রতি করা হইতেছে এবং তাহারও ফলাফল অনিশ্চিত।

অথচ এই সকল প্রবঞ্চকঠগীর দল বিরাট বাড়ীঘর করিতেছে নির্ব্বিবাদে ও প্রকাশ্যে তাহাদের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখাইয়া দম্ভের সহিত বলিয়া বেড়াইতেছে "অমুক আমার পকেটে, অমুক ঐ শেঠের অনুগত।" ইহা আমাদের জনশ্রুতি নয়, বহুবার ঐরূপ দম্ভোক্তি আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার একটির বিবরণ এখানে দিই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফেডারেটেড চেম্বার্স অব কমার্স নামক ব্যবসায়ী সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এক কলিকাতাস্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বড় অংশীদার। নির্ব্বাচনের কয়দিন পরে এই পত্রিকার আপিসে তিন মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন বাঙালী ও অন্য দুইজন অন্য প্রান্তের, তবে তিনজনেরই বেশভূষা বিদেশী। তাঁহারা আমাদের ইংরেজী মাসিকে ঐ নূতন প্রেসিডেণ্টের পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিকৃতি এবং তাঁহার কৃতিত্বের ও জীবনের বিস্তারিত বিবরণ ছাপিতে চাহেন বলায় তাঁহাদের বলা হয় যে, আমরা ঐরূপ বিবরণ ইত্যাদি ছাপি না, কেননা উহা সাময়িক ঘটনা, যাহা দৈনিক ও সাপ্তাহিকে দেওয়া হয়। তাহাতে বাঙালীটি বলেন যে, দৈনিক ইত্যাদির ধরা-বাঁধা রেট আছে সুতরাং সে-সকল ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন, এখন প্রেসিডেণ্টের বিশেষ ইচ্ছা যে, ঐ ইংরেজী মাসিকে ঐ চিত্র ও বিবরণ প্রকাশিত হউক। তাহাতে আমরা বলি যে, অতি অসাধারণ লোক না হইলে জীবিত লোকের ঐরূপ বৃত্তান্ত আমরা ছাপি না। তাহাতে ভিন্নপ্রান্তীয় একজন বলেন যে, এই প্রেসিডেণ্ট মহাশয় অধিকারী হিসাবে ও মর্য্যাদা হিসাবে ভারতে তৃতীয় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

উচ্চতম অধিকারী ও দ্বিতীয় স্থানীয় কে কে প্রশ্ন করায় ইনি সদর্পে ও উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন এক শেঠজীর নাম যিনি সর্ব্বঘটে আছেন। দ্বিতীয় নাম হয়—কিছু কৃপামিশ্রিত কণ্ঠে—পণ্ডিত নেহরুর। তৃতীয় অবশ্য এই নূতন প্রেসিডেণ্টই।

আমরা তাহাতে বলি যে, এই "গুণীগণনা" বা অধিকার ভেদ যদি প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের নামাঙ্কিত কাগজে লিখিত, ও তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া আমাদের দেওয়া হয় তবে আমরা তাঁহার কৃতিত্ব বিবরণ ইত্যাদি ছাপিব বিনামূল্যে ও বিনা শুল্কে। দুঃখের বিষয় তাহা আসে নাই। উপরন্তু প্রেসিডেণ্ট মহাশয় টেলিফোনে জানান যে, ঐ তিন ব্যক্তি যাহা বলিয়াছে তাহা তিনি নিজের মতামত বলিয়া স্বীকার করেন না।

যাহাই হউক্ সম্প্রতি লোকের মনে ঐরূপ ধারণার কারণ রাজির সঙ্গে আরও দুইটি যুক্ত হইয়াছে। সে দুইটি দুই "শেঠজীর" ব্যাপারের দরুণ। প্রথমটি হইল ডালমিয়া-জৈন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তদন্তের রিপোর্ট লইয়া ও দ্বিতীয়টি হইল সিরাজুদ্দিন বলিয়া আর এক

বৈশ্য সামন্তরাজ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ লইয়া। এইখানে বলা প্রয়োজন যে, ভারতে যে বৈশ্য-রাজকের পত্তন সম্প্রতি হইয়াছে তাহার সামন্তগণ নানা জাতি ধর্ম্ম ও শ্রেণী উদ্ভূত, যদিও পেশা এক ও কার্য্য-প্রকরণও প্রায় এক, যদিও উপলক্ষ্য বা ব্যবসা নানাপ্রকার ও নানান ধরণের।

ডালমিয়া-জৈন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তদন্তের রিপোর্ট দুই অংশে পেশ করা হয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলের কাছে। ঐ তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও তথ্য এবং সেই তদন্তের বিষয় সম্পর্কিত কমিশন প্রদত্ত মতামতের উপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-মণ্ডলী দুইজন বিশিষ্ট ব্যবহার-জীবীর মত গ্রহণ করেন। এবং পরে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সংসদে তীব্র বিতর্কের পর স্থির হয় যে, কমিশনের রিপোর্ট, কমিশনের মতামত ও সুপারিশ ইত্যাদি সংসদে আলোচিত হইবে। কিন্তু ঐ বিষয় উপস্থাপনের সময় রিপোর্টের প্রথম অংশ ও দুই ব্যবহারজীবীর মত প্রকাশ করা হয় নাই। উহা গোপন রাখার কারণ হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডল বলেন যে, উহার প্রকাশ জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কাজ হইবে, তাঁহাদের মতে। সে যাহাই হোক্ লোকসভায় ঐ বিষয় চর্চ্চার অল্প পূর্ব্বেই কে বা কাহারা ঐ গোপন অংশ ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ অংশ নকল করাইয়া বহু সদস্য এবং রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি উচ্চ অধিকারীবর্গের মধ্যে ডাকযোগে বিলি করাইয়া দেয়। মন্ত্রীমণ্ডল হইতে প্রথমে বলা হয় যে, ঐ নকল সঠিক কি না সে কথাও তাঁহারা বলিবেন না। পরে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, উহা সঠিক এবং উহার প্রকাশের পর রিপোর্টের প্রথম অংশ ও ঐ মতামত গোপন রাখার কোন অর্থ হয় না এবং সে কারণে তাহাও প্রকাশিত হইবে। সেই সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, কে বা কাহারা এই গোপন তথ্য ফাঁস করিল এবং কি ভাবে তাহা সম্ভব হইল সে বিষয়ে কঠোর তদন্ত চলিবে।

সে তদন্তে যাহাই হউক সাধারণের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে সে বিষয়ে কিছু চর্চ্চা প্রয়োজন আমরা মনে করি। প্রথমতঃ, এই তদন্তে যাহা-কিছু নির্ণয় করা হইয়াছে এবং সে-সম্বন্ধে কমিশন যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন সে সকলকে আংশিক ভাবে প্রকাশ ও আংশিক গোপন রাখা কেন হইয়াছিল সে বিষয়ে সংসদে সবিশেষ আলোচনা চলিতে দেওয়া হইবে কি না, অর্থাৎ "পার্টি হুইপ" নামে যে বিদেশী অস্ত্র মন্ত্রীমণ্ডলের হাতে আছে তাহার জোরে সংসদের আলোচনায় গরিষ্ঠ দলের মুখ বাঁধিয়া ভোটের জোরে আলোচনাকে ব্যাহত ও ব্যর্থ করিতে দলের ওজন ব্যবহৃত হইবে কি না। যদি তাই হয়, অর্থাৎ আলোচনা পুরাদমে চলিতে না দেওয়া হয়, তবে প্রথম অংশ জনসাধারণের স্বার্থেই গোপন রাখা হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে কোনও নিষ্পত্তি হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, যে ভাবে আইনের ফাঁকে, ন্যায়ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ উপায়ে এই প্রতিষ্ঠান অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া অধিকারীদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করাইয়াছে সে ভাবের অপকর্ম্ম বন্ধ করিবার জন্য নূতন আইন-কানুন প্রণয়ন করা যদি হয় তবে সে-সকল আইন-কানুনের প্রভাব অতীতের অপকীর্ত্তির উপর পড়িবে কিনা অর্থাৎ সে সকল আইন পূর্ব্বব্যাপ্তিযুক্ত (retrospective) হইবে কি না। যদি না হয় তবে লোকের মনে সন্দেহ আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির পথে যাহারা বিপুল পরিমাণে লাভবান হইয়াছে, যদি তাহাদের বিচার আইন-আদালতের মাধ্যমে উন্মুক্তভাবে ও পূর্ণরূপে না হয়, তবে দেশের লোকে কর্ত্তৃপক্ষের বিষয়ে কি ভাবিবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

সিরাজুদ্দিন প্রতিষ্ঠানের খাতায় এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্পর্কিত যে সকল উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে সে বিষয়ে তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছেন একজন সুপ্রীম কোর্টের জজ। সুতরাং সে তদন্তের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে মন্তব্য করা অসমীচীন। আমরা শুধুমাত্র বলিব যে, এই সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকাশের পর নানাপ্রকার উষ্মা ও অজুহাত-মিশ্রিত তর্জ্জন-গর্জ্জন না করিয়া যদি সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে এই ভাবে তদন্তের কথা আমাদের উচ্চতম অধিকারীবর্গ বলিতেন তবে লোকে এ কথা মনে করার অবকাশ পাইত না যে, তাঁহারা জনমতের চাপে এই পথ ধরিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এদেশের জনসাধারণ যাঁহাদের হাতে দেশের শাসন-তন্ত্রের ও রাষ্ট্রচালনার সকল অধিকার তুলিয়া দিয়াছে তাঁহারা সময়ে-অসময়ে, সকল কাজে-কর্ম্মে ও যে-কোন অজুহাতে দেশের লোককে নানা উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞান বিষয়ে কোন কথা কেহ বলিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা বক্তার অপরাধ, ন্যূনকল্পে অনধিকারচর্চ্চাই ধরা হয়। এই চীন-ভারত যুদ্ধে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্য্যয়ের দায়িত্ব যে শতকরা ৯৮ ভাগ, ঐ কেন্দ্রীয় মহাধুরন্ধরদিগের সে কথাটা তাঁহারা বাক্যের ধূলিজালে ঢাকিয়া এখন আমাদের—অর্থাৎ সাধারণজনের—ত্রাণকর্ত্তার ভূমিকায় ভাষণ ও উপদেশ দিয়া ফিরিতেছেন। যদি কেহ কোন প্রশ্ন করে তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ সম্পর্কে, তবে হয় প্রথমে লম্ফঝম্প ও তীব্র

মন্তব্যে প্রশ্নকারীকে অপদস্থ করিয়া তাহার প্রশ্ন চাপা দিতে চেষ্টা করিয়া শেষে দীর্ঘ তদন্ত ও তদন্তের শেষে আরও দীর্ঘকাল নানা তর্কে ও ফিকির ফন্দীতে অতিবাহিত করা হয়, যেমন হইতেছে উপরোক্ত দুইটি ক্ষেত্রে। নহিলে—সেরূপ বেগতিক দেখিলে—অতি সাধু সজ্জনের মত প্রশ্নের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান কাল সেরূপ প্রশ্ন বিচারের উপযোগী নয় এই অজুহাতে, "যথাসময়ে সে বিষয়ে তদন্ত হইবে" এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়—যেরূপ করা হইয়াছে নেফায় ভারতীয় সেনার পরাজয় বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে।

বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনের পর সর্দ্দার পাটেল প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মাখনলাল সেনকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁহার গুজরাট বিদ্যাপীঠ দেখিতে। মাখনবাবু বলেন, তিনি সেবাগ্রামে গান্ধীজীকে দর্শন করিতে যাইবেন মনস্থ করিয়াছেন। সর্দ্দার পাটেল হাসিয়া বলেন "ক্যা, কৈলাস যাওগে মহাদেব দর্শন করনে কে লিয়ে? হাঁ যাও। দেখো মহাদেব কো অওর দেখো যায়কে উনকে চারোওর নন্দী, ভৃঙ্গী ভূত পিরেত পিচাশ কায়সা ঘেরা ডাল রখ্‌খা হুয়!"

ঐ ভূতপ্রেত পিশাচের দলই ত নয়াদিল্লীতে মহাদেবের মানসপুত্রকে লইয়া "দশচক্রে ভগবান ভূততাপ্রাপ্ত," এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা প্রকট করিয়াছে। মহাদেব স্বয়ং চাটুকারদিগের স্তোকবাক্য শুনিতেন কিন্তু তাহাতে ভুলিতেন না, বরঞ্চ শুনিবার পর হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "আচ্ছা, অব অসল্ বাত তো বতলাইয়ে?" অর্থাৎ এই স্তুতির পিছনে মূল উদ্দেশ্য কি? আমরা নিজকর্ণে ইহা শুনিয়াছি এবং অন্য অনেকেই এ বিষয়ে জানেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই চাটুকার নিরোধমন্ত্র তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে দিয়া যাইতে পারেন নাই।

মূল্যবৃদ্ধি ও জাল-ভেজাল নিরোধ

স্বাধীনতা লাভের পর এই দেশের কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে যে কংগ্রেসী সরকারগুলি গঠিত হয় তাহাদের লক্ষ্য কি, সে বিষয়ে অধিকারীদিগের মুখপাত্রগণ নির্ব্বাচনকালে নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে যে কথা বলিয়া তাঁহাদের মনে যে আশ্বাস-বিশ্বাস সৃজনের চেষ্টা প্রতিবারই করিয়াছেন, কার্য্যতঃ শাসনতন্ত্রে ও রাষ্ট্রচালনায় অধিকার স্থাপিত হইয়া গেলে পরে সে-বিষয়ে তাঁহাদের কোন চেষ্টা বা চিন্তার লক্ষণ এতদিন দেখা যায় নাই। একথা শুধু কংগ্রেস-বিরোধী দলের মন্তব্য নহে কংগ্রেসের মধ্যেও যাঁহারা ভাগ্যান্বেষী পেশাদার রাজনৈতিক নহেন এরূপ বহু লোকে এ কথা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন এবং প্রায় সকল চিন্তাশীল কংগ্রেসপন্থীর মনে এ বিষয়টি ক্ষোভ ও লজ্জার আধার হইয়া আছে।

কংগ্রেস সরকারগুলির উদ্দেশ্য ও আদর্শবাদ সম্পর্কে উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব পরিবেশন না করিয়া সহজভাবে বলা যায় যে উহার উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য জনকল্যাণ ও জাতীয় প্রগতি। কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, এই পনের-ষোল বৎসরে এ দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা পথ উত্তরোত্তর সঙ্কীর্ণতর ও অধিক দুর্গম হইয়া চলিতেছে। এ বিষয়ে অনেক তর্ক ও অনেক অজুহাত সরকারী মহল হইতে প্রসারিত করা হয় এবং সেগুলি যে সবই মিথ্যা ও সবই ভুল তাহাও নহে এবং ইহাও সত্য যে, এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট্ স্তর মনুষ্যজীবনের ও মানবত্বের নিকৃষ্টতম পর্য্যায়ভুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে আপেক্ষিক উন্নতি হইয়াছে। অন্যদিকে ইহাও সত্য যে, ভারতের সর্ব্বত্রই সমাজের যে সকল শ্রেণী ও স্তর সভ্যতা, প্রগতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমাপে উন্নততম ছিল এবং এই স্বাধীনতালাভ যাহাদের অক্লান্ত প্রয়াস, ত্যাগ ও আত্মবলিদানেরই ফল, তাহাদের, জীবনযাত্রার মান দ্রুত নামিয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে জাতি হিসাবে আমরা মনুষ্য সমাজে নামিয়া যাইতেছি। একদিকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন চলিতেছে অন্যদিকে নৈতিক ও ব্যবহারিক অধঃপতনের জন্য সমস্ত জাতি সভ্যজগতে অপাংক্তেয় হইতে চলিয়াছে।

ইহার কারণ, একদিকে জাল, ভেজাল মেকির ও অকারণ ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির অবাধ প্রসার ও অন্যদিকে দুর্নীতি ও অনাচারের অপ্রতিহত বিস্তৃতি। কংগ্রেস সরকারের দুরপনেয় কলঙ্ক এই যে, উক্ত দুইটি মহাপাতক নিরোধ ও উচ্ছেদে সরকার এতদিন অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য এই অক্ষমতার কারণ হিসাবে অনেক অজুহাত এতদিন দেখান হইয়াছে ও এখনও নানা "শয়তানের উকিল সরকারী অক্ষমতা বা গাফিলতিকে তর্কজালে উড়াইয়া দিতে চেষ্টিত আছেন কিন্তু যাঁহাদের মনে—মুখে নয়—কংগ্রেসের আদর্শ এখনও উজ্জ্বল আছে তাঁহাদের মন এ কলঙ্কে বিষণ্ণ ও শঙ্কিত হইয়াই আছে। বস্তুতঃ পক্ষে জনকল্যাণ বলিতে হইয়াছে অধিকারীদিগের ও তাহাদের অনুচরবর্গের অর্থসঙ্গতি বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে হইয়াছে, জুয়াচোর জালিয়াৎ, ঠগ ও তস্করের অগাধ

ঐশ্বর্য বৃদ্ধি। জাতীয় জীবনের মান নামিয়াই গিয়াছে, নৈতিক পরিমাপে ও আর্থিক হিসাবেও।

এতদিনে, চীনা আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে এ বিষয়ে কংগ্রেসী দলের মধ্যেও চেতনার উদয় হইয়াছে। কংগ্রেসী সংসদ ও বিধানমণ্ডলী সদস্যদের অনেকেরই হুঁশ হইয়াছে যে, এই যুদ্ধের কারণে সরকার যে কঠোর ও দুর্ব্বহভার জনসাধারণের স্কন্ধে চাপাইতেছেন তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে। যদি না জাতীয় জীবনে এই দুই বিষের প্রয়োগ রোধ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সবল করা যায়।

সেই কারণে আমরা দেখিতেছি কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়িয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদ দুইটি তাহারই পরিচয়। প্রথমটি পরিবেশন করিয়াছেন আনন্দবাজার :

নয়াদিল্লী, ১০ই মে—ভারত সরকার এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে চাউল কল হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বাধ্যতামূলক ভাবে চাউল সংগ্রহ করা হইবে, এমন কি প্রয়োজন হইলে চাউল কলগুলি দখল করা হইবে।

আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ সরকারের ঐ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। শ্রীনন্দ খাদ্যশস্যের মূল্য সম্পর্কে সরকারী নীতি বর্ণনাকালে খাদ্যশস্য সংগ্রহের কথা বলেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'লেভি' ব্যবস্থা কোন্ সময় হইতে এবং কোন্ অঞ্চলে বলবৎ করা হইবে, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় তাহা ঠিক করিবেন। খাদ্যশস্য সংগ্রহের বিশদ ব্যবস্থাও তাঁহারাই করিবেন। সরাসরি গম ও ধান সংগ্রহের কর্ম্মসূচী একটানা তিন বৎসর অনুসৃত হইবে। কৃষকরা যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ন্যায়সঙ্গত মূল্য পায়, সেই উদ্দেশ্যেই উহা করা হইবে।

তিনি বলেন, চাউলের দাম বাড়িতেছে। গত দেড় মাসে চাউলের দাম শতকরা ছয়-সাত ভাগ বাড়িয়াছে। কোন কোন স্থানে চাউলের দাম শতকরা ২০ হইতে ২২ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে চাউলের দাম শতকরা ১৬ হইতে ২২ ভাগ বাড়িয়াছে এবং দক্ষিণাঞ্চলে উহা শতকরা ৪ হইতে ৫ ভাগ বাড়িয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য মজুত করার উদ্দেশ্যে মাঠ হইতে শস্য গোলায় তোলার সময় উহা সংগ্রহ করিতে হইবে।

তিনি বলেন, সরকার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল-কল হইতে চাউল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে কলে উৎপন্ন সমুদয় চাউলই সংগ্রহ করা হইবে। বা উৎপন্ন চাউলের শতকরা ৫০।৬০ ভাগ সংগ্রহ করা হইবে।

দ্বিতীয় সংবাদে এইরূপ :—

নয়াদিল্লী, ১০ই মে—ভেজাল ও ভুল পণ্যচিহ্নসহ ঔষধ প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের জন্য শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দশ বৎসরের কারাদণ্ডের ব্যবস্থাসহ একটি সংশোধনীয় বিল আজ রাজ্যসভায় প্রবর্ত্তিত হয়। ঐরূপ ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সম্পত্তি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থাও এই বিলে আছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ঔষধ যাহাতে বাজারে ঢুকিতে না পারে তাহার ব্যবস্থাও এই বিলে করা হইয়াছে।

দি ড্রাগস এ্যাণ্ড কসমেটিকস্ (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল ১৯৬৩ বলিয়া পরিচিত এই বিলের আওতায় আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত এবং ইউনানি মতের ঔষধগুলিও পড়িবে। ঐসব ঔষধ এখন আর কেবল বৈদ্য ও হাকিমগণ প্রস্তুত করেন না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ঐগুলি প্রস্তুত করিতেছে।

অংশতঃ আধুনিক ও অংশতঃ আয়ুর্ব্বেদ এবং ইউনানি ঔষধ একসঙ্গে মিশাইয়া আয়ুর্ব্বেদ অথবা ইউনানি ঔষধের নামে কতিপয় প্রস্তুতকারক বাজারে ঔষধ ছাড়িতেছে। এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে দি ড্রাগস এ্যাণ্ড কসমেটিক এ্যাক্ট ১৯৪০ অনুযায়ী ঐসব ঔষধের উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। ভেজাল ঔষধ বলিয়া এক পৃথক শ্রেণীর ঔষধ এই আইনের আওতায় পড়িবে। ঐরূপ ঔষধ আমদানি, প্রস্তুত ও বিক্রয় নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থাও ঐ বিলে আছে। দৈব ও অন্যান্য ঔষধের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে আজ একটি বিল প্রবর্তন করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট ঐ আইনে কতিপয় গলদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলি অপসারণের উদ্দেশ্যেই এই বিল প্রবর্ত্তিত হয়। কোন কোন অবস্থায় এবং রোগে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহারের সুপারিশসহ যেসব বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহা ঐ বিলে নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলের সহিত যুক্ত একটি নূতন তপশীলে কয়েকটি রোগের কথা নির্দ্দিষ্টভাবে বলা হইয়াছে। উহাদের প্রতিষেধক হিসাবে ঔষধের বিজ্ঞাপন ঐ বিলের এক নূতন ধারায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া বিজ্ঞাপন দিলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে উহা বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

এই সঙ্গে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ব্যাপকভাবে ক্রেতা-সমবায়গুলিকে খাদ্যশস্য সুতীবস্ত্র ও কেরোসিন ইত্যাদি আবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিক্রেতাদিগের উপর লাইসেন্স স্থাপনের ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এবং সেই সঙ্গে প্রশ্নও করা যাইতে পারে, এই সকল ব্যবস্থা এতদিন করা হয় নাই কেন?

পাকিস্তান ও ভারত

কয়েক মাস পূর্ব্বে চীনের ভারত আক্রমণ-সম্পর্কিত প্রসঙ্গে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, আমাদের ধারণা এই চীনা আক্রমণের আয়োজনের পূর্ব্বে পাকিস্তানের সহিত একটা গূঢ় বন্দোবস্ত হইয়াছে। একথাও আমরা লিখিয়াছিলাম যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নয়াদিল্লীস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, চীনের সহিত যুদ্ধ বাধিলে ভারতের শক্তিতে কুলাইবে না, কেননা ভারতকে লড়িতে হইবে দুই শত্রুপক্ষের সহিত—অর্থাৎ চীন ও পাকিস্তানের সহিত। সম্প্রতি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট ভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ইন্দোর, ১১ই মে—পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরণ গতকাল রাত্রে এখানে বলেন, পাকিস্তান ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করিয়াছিল এবং চীনাদের ভারতভূমি আক্রমণের পরে আক্রমণ করার দিনও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল।

শহরে কংগ্রেস কর্ত্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দ্দার কাইরণ বলেন, তাঁহার সরকার পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ পাইতেছেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে তিনি পরিকল্পিত আক্রমণের সঠিক তারিখ বলিতে পারেন না।

সর্দ্দার কাইরণ বলেন, আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ করিয়া সামরিক অবস্থার অবনতি ঘটিবার জন্যই পাকিস্তান তাহার 'অসৎ উদ্দেশ্য' চরিতার্থ করিতে পারে নাই। ছয় ডিভিশন সৈন্যের মধ্যে পাকিস্তান যদি আফগান সীমান্তে নিযুক্ত দুই ডিভিশন সৈন্য সরাইয়া আনিত তবে দুই দিনের মধ্যেই পাখতুনিস্তানের সৃষ্টি হইত। তাহার ষষ্ঠ ডিভিশনটি "জনসাধারণকে দমন করার জন্য" সব সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অবস্থার জন্য পাকিস্তান তাহার পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে পারে নাই।

নিরাপত্তার কারণে সে কাশ্মীর সীমান্ত হইতে তাহার দুই ডিভিসন সৈন্য ও পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে এক ডিভিসন সৈন্য সরাইয়া নিতে পারে নাই।

শ্রীকাইরণ বলেন, সেই সময় (চীনা আক্রমণের পর) পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে ঢেঁড়া পিটাইয়া পাকিস্তানীদের বলা হইত, ভারতের শক্তি অথবা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাহাদের ভীত হইবার কিছুই নাই, কারণ চীনাদের হাতে ভারতীয় বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে।

চীনের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতে অন্য এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত আয়ুবশাহী পাকিস্তান নূতন চক্রান্ত বিস্তারের চেষ্টায় ব্যস্ত, এ সংবাদ কয়দিন পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল সংবাদ প্রচার আরম্ভ হইয়াছে পাকিস্তানের ছত্রপতি আয়ুব খাঁর নেপাল সফরের সঙ্গে। সে সকলের মধ্যে আনন্দবাজার নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদটিও দিয়াছেন :

"নেপালের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্য ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর এক্ষণে পাকিস্তান ভারত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তান পূর্ব্ব পাকিস্তান সীমান্ত হইতে ভারতের অভ্যন্তরে ২৬ মাইল নূতন পথের দাবী তুলিয়াছে।

হিমালয়ের এই প্রাচীন হিন্দু রাজ্যটির সঙ্গে পাকিস্তানের 'দোস্তির' ব্যাপারে চীনের অদৃশ্য হস্তের উৎসাহকর ইঙ্গিত ছিল বলিয়া রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক-মহল মনে করেন। প্রকাশ, কাঠমাণ্ডুর সহিত ঢাকা ও রাওয়ালপিণ্ডি ও করাচীর মধ্যে বিমানযোগ স্থাপনের অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ব পাকিস্তানের উত্তরখণ্ড হইতে নেপাল সীমান্ত পর্য্যন্ত ভারতের ভূভাগ চিরিয়া ২৬ মাইল পথ তৈরীর নূতন আবদার তোলা হইয়াছে। এই আবদারের মধ্যে কূটনৈতিক চীনা চালবাজির রহস্য নিহিত আছে বলিয়াও অনেকে মনে করেন। এই কার্য্যে ভারত সরকারের অনুমোদন অপরিহার্য্য বলিয়া পাকিস্তান বর্ত্তমানে নানা অছিলায় ভারত সরকারের শুভবুদ্ধি ও মানবতাবোধের দোহাই দিয়া কার্য্য হাসিলে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

পাকিস্তান মনে করে যে, এই ২৬ মাইল পথ তাহারা তৈরী করিতে পারিলে সড়কপথে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সহিত কাঠমাণ্ডুর যোগাযোগ স্থাপন সহজতর হইবে।"

অবশ্য "ভারত সরকারের শুভবুদ্ধি ও মানবতাবোধ" বলিতে পাকিস্তান সরকার নেহরু সরকারের বুদ্ধিভ্রম ও ভাবোচ্ছ্বাস বুঝেন। অন্ততঃপক্ষে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এতদিন যে পাকিস্তান প্রতিপদে ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নিজের কাজ গুছাইয়াছে তাহা প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বুদ্ধি-ভ্রংশের দরুন। কিন্তু সম্প্রতি, ভারত-পাকিস্তান "মৈত্রী" বৈঠকে পাঁচদফা আলোচনার পর পণ্ডিত নেহরুর চোখ কিছু খুলিয়াছে

মনে হয় কেন না কাণপুরে ভাষণ দেবার সময় (১২ই মে) নানা কথার মধ্যে ভারত-পাকিস্তান সম্বন্ধ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তাহার সুর ও স্বর কিছু অন্য প্রকার। মন্তব্য এইরূপ—

"ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, চীনা আক্রমণের সুযোগ লইয়া পাকিস্তান যে ভারতের উপর চাপ দিতে চাহে ভারত তাহাতে নতি স্বীকার করিবে না। শ্রীনেহরু বলেন, 'আমাদের যত বিপদই আসুক না কেন, যাহা আমাদের নীতিবিরোধী তাহা আমরা কখনও মানিয়া লইব না'।

তিনি পাকিস্তানের অদ্ভুত নীতির সমালোচনা করিয়া বলেন, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান পশ্চিমী দেশগুলির সহিত চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু সেই পাকিস্তানই আজ চীনের সহিত দস্তী পাতাইয়াছে, তাহাদের কিছু জমি উপঢৌকনও দিয়াছে এবং পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি এখন চীনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত।"

আমরা জানি না পণ্ডিত নেহরুর এই সচেতন অবস্থা—পাকিস্তান সম্পর্কে কতদিন থাকিবে এবং একথাও আমরা নিশ্চিত জানি না যে, ভারতরাষ্ট্রের ভিতর দিয়া ২৬ মাইল "করিডর" স্থাপনের এই উদ্ভট কল্পনা সত্যসত্যই আয়ুবর্খার মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছে কি না। তবে ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে পাকিস্তান যে সকল দাবী করিয়াছে ইহা সেগুলির চাইতে অধিক উদ্ভট নহে।

দেশের লোকের কাছে অনেক-কিছুই দাবী জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী ঐ ভাষণের মধ্যেই। দেশের লোক সে-সকল দাবীই পূরণ করিবে, কেননা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশ সকল স্বার্থ বলি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু যে ভাবে এই এতদিন একদিকে দেশের সাধারণ লোককে কৃচ্ছ্রসাধন করাইয়া বিপুল অর্থরাজি আদায় করা হইয়াছে এবং অন্যদিকে তাহার অপচয়ে ও অপব্যয়ে জুয়াচোর ও মুনাফাবাজের উদরস্ফীত করা হইয়াছে তাহারও ইতি শেষ হওয়া প্রয়োজন।

চীন এভাবে আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল তাহার কারণ, চীন বুঝিয়াছিল ভারতের জনসাধারণ কিরূপ ক্লিষ্ট ও পেষিত এবং এদেশে অসন্তোষের আগুন ধূমায়মান, উপরন্তু জানিত এদেশের সামরিক বিভাগের অব্যবস্থার কথা। তবে চীন ভাবিয়াছিল এখানে তাহার পঞ্চমবাহিনী বিদ্রোহ-বিপ্লবের পথে তাহার কাজ সহজ করিয়া দিবে। ভারতবাসী সাধারণজনের স্বদেশ ও স্বাধীনতা প্রেম যে কত প্রবল সেকথা তাহার জানা ছিল না।

পাকিস্তান ত জন্মলাভই করিয়াছে পাকেচক্রে ও চক্রান্তে। সেখানে ত সুবিধাবাদই একমাত্র রাষ্ট্রনীতি। সেকথা এতদিনে বুঝিয়াছেন নেহরু। মার্কিন দেশ ও ব্রিটেন বুঝিবে, কবে কে জানে?

পরলোকে সুকুমার সেন

ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব নির্ব্বাচন কমিশনার এবং দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান সুকুমার সেন গত ১৩ই মে কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

সুকুমার সেন ১৮৯৮ সনের ২রা জানুয়ারী ঢাকা জেলার সোনারং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অক্ষয়কুমার সেন বাংলার সরকারী প্রশাসন বিভাগে একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। গত ৩১শে মার্চ তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। সুকুমারবাবু কলিকাতা হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এ পাস করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে আই সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সরকারী চাকরিতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি ভারতের প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ইহার পর ১৯৫০-৬০ সনে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগে তাঁহার কৃতিত্বের কথা সকলেই অবগত আছেন। পদাধিকারবলে পরে তিনি শিক্ষা-দপ্তরের সচিবও হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বর্দ্ধমান, কল্যাণী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তিনটির খসড়া বিল রচনা করেন। এই বিল তিনটি পরে আইনসভায় পাস হইয়া আইনে পরিণত হয়। ১৯৬০ সনে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, তিনিই হন তার প্রথম উপাচার্য্য।

যখন পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহীত দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থ হইতে বসিয়াছিল, যখন অবাঙালীর অত্যাচারে বাঙালীর প্রবেশাধিকার প্রায় বন্ধ হইয়া যাইতেছিল .তখন আসিলেন সুকুমার সেন সংস্থার চেয়ারম্যানরূপে। একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় বাঙালীর সেখানে সুষ্ঠুভাবে পুনর্ব্বাসন সম্ভব হইল। তিনি ছিলেন এই উদ্বাস্তুদের দরদী বন্ধু। তাঁহার এই আগমনকে তাহারা দেবতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া জানিয়াছিল। ইহার জন্য মাঝে মাঝে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার মতবিরোধও দেখা দিয়াছে, কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থা ত্যাগ করেন নাই।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল, বিশেষ করিয়া দণ্ডকারণ্য আজ অন্ধকার হইয়া গেল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

বিক্রয়কর বৃদ্ধি ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ী

বর্ত্তমান বৎসরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে যে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অন্যতম হইল কতকগুলি পণ্যের উপরে বিক্রয়কর বৃদ্ধির ব্যবস্থা। এই বৎসরের বাজেট প্রস্তাবে এ পর্য্যন্ত বিক্রয়কর হইতে অব্যাহতি-পাওয়া কতকগুলি পণ্যের উপর নূতন বিক্রয়কর ধার্য্য করা হইয়াছে। যথা, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট ইত্যাদি সংস্থার রান্না খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপরে টাকা-প্রতি ৫ নয়া পয়সা ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। দেড় টাকার অধিক রান্না খাদ্যদ্রব্য কোন একজনের নিকট একবারে বিক্রয় করিলে এই হারে বিক্রয়কর দিতে হইবে।

এ ছাড়া কতকগুলি পণ্যের উপরে পাইকারী প্রথম বিক্রয়সূত্র হইতে (first point of wholesale sales) নূতন বিক্রয়কর ধার্য্য ও আদায় করা হইবে। যথা দিয়াশলাইয়ের দামের উপরে টাকা-প্রতি ৫ নয়া পয়সা হারে, কিংবা গেঞ্জির সুতোর উপরে টাকা-প্রতি ২ নয়া পয়সা হারে, এই প্রথম বিক্রয়সূত্র বিক্রয়কর ধার্য্য ও আদায় করা হইবে।

ইহা ছাড়াও বঙ্গীয় অর্থ (বিক্রয়কর) সংশোধনী আইনের দ্বিতীয় তপশীলের অন্তর্ভুক্ত ১৫ দফা বিলাস-দ্রব্যের উপর বর্ত্তমান বিক্রয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা, রবার ফোমে প্রস্তুত কুশন, ম্যাট বা বালিশ ইত্যাদির উপর বর্ত্তমানে দেয় শতকরা ৭ টাকা হিসাবে বিক্রয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ১০ টাকা করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত বিস্কুট, সুপারি, গোলমরিচ, হলুদ ইত্যাদি অনেকগুলি প্রায় অবশ্যভোগ্য পণ্যের উপর বর্ত্তমানের শতকরা ৩ টাকা হারে বিক্রয়কর বাড়াইয়া শতকরা ৪ টাকা করা হইয়াছে।

এই সকল সরাসরি নূতন বা বাড়ান হারের বিক্রয়কর ছাড়াও কতকগুলি বিক্রয়কর হইতে অব্যাহতি-পাওয়া পণ্যের প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি তাঁহাদের উৎপাদনের কাজে যে-সকল কাঁচা মাল প্রয়োজন হয়, তাহার উপরে যদি কোন বিক্রয়কর ধার্য্য করা থাকিয়া থাকে, তবে তাহা হইতেও অব্যাহতি পাইতেন। বর্ত্তমান বৎসরের রাজ্য বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী এখন হইতে তাঁহারা এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রীর বাজেটে আরও একটি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করা হয়। তাহা এই যে, রাজ্য অর্থ মন্ত্রণালয় এখন হইতে নোটিফিকেশন (বা বিজ্ঞপ্তি) দ্বারা যে কোনও পণ্যের উপরেই বিক্রয়করের হার ধার্য্য করিবার অধিকারপ্রাপ্ত হইবেন। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, এই বিশেষ প্রস্তাবটির তাৎপর্য্য এই যে, এখন হইতে অর্থমন্ত্রীকে প্রত্যেকটি পণ্যের উপরে বিক্রয় করের হার বিধান সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে না। নোটিফিকেশন বা তাঁহার মন্ত্রণালয় হইতে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারাই এই সকল করের হার ধার্য্য করা চলিবে।

বিক্রয়কর খাতে এই সকল নূতন ধার্য্য-করা কর বাবদ বর্ত্তমান বৎসরে অতিরিক্ত আনুমানিক ৩॥০ কোটী টাকা আমদানী হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গত ১২।১৩ বৎসরে শুল্ক-জনিত আয় কি প্রচণ্ড হারে বাড়িয়াছে তাহা অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা হইতেই জানা যায়। এই আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৯৪৮-৪৯ সনে মাত্র ১৯ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা; ইহা বাড়িয়া ১৯৫০-৫১ সালে হয় ২৩ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা; এবং ১৯৬০-৬১ সনে উহার আয়তন ১৯৪৮-৪৯ সনের তুলনায় তিনগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৫২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকায়। বর্ত্তমান বৎসরের নূতন ট্যাক্সের ভার ইহার সহিত যোগ করিলে মাথাপিছু রাজ্য-ট্যাক্সের পরিমাণই হয় ভারতের অন্যান্য যে-কোন রাজ্য হইতে অনেক বেশী। এ তথ্যটি তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গ অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার উপর কেন্দ্রীয় ট্যাক্সসমূহের মাথাপিছু প্রচণ্ড বোঝা ত আছেই। নূতন ট্যাক্সের অজুহাত হিসাবে অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, রাজ্যে উৎপাদনের সাংখ্যিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে উৎপাদনও অনুপাতে অনেক বেশী বাড়িয়াছে। তাহা সত্য হইলেও একটা অনস্বীকার্য্য তথ্য এই প্রসঙ্গে উহ্য রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা এই যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উৎপাদন সংস্থাগুলির কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য রাজ্যবাসী প্রবাসী বা বিদেশীদের অধীন। রাজ্য-ট্যাক্সসমূহের গতি ও প্রকৃতি যাহা, তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সবচেয়ে বেশী চাপ আসিয়া বর্ত্তায় রাজ্য-বাসিন্দাদের উপরে, কিন্তু চাকুরি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই রাজ্যে অবস্থিত উৎপাদন সংস্থাগুলি

হইতে আনুপাতিক অধিকাংশ সুবিধাগুলি হইতেই বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার দ্বারা ধার্য্য করা ট্যাক্সসমূহের মাথাপিছু প্রচণ্ড চাপের সত্যকার কোন অজুহাত নাই।

কিন্তু ইহা ছাড়াও এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য, তাহা এই যে ভূমি-রাজস্ব ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় ব্যতীত, রাজ্যের অধিকাংশ ট্যাক্সই মানুষের নিত্য ভোগ্যবস্তুর উপরই শুল্ক ধার্য্য করিয়া আদায় করা হইয়া থাকে। ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে ট্যাক্সের ঠিক পরিমাণটির চেয়েও অনেক বেশী ভোক্তাকে দিতে হয়, সেকথা নিশ্চয় অর্থমন্ত্রী নিজেও জানেন। উদাহরণ হিসাবে অনেকগুলি এইরূপ শুল্কেরই উল্লেখ করা যাইতে পারে। যতদিন মিল-বস্ত্রের বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত ছিল ততদিন বস্ত্রের উপরে আবগারী শুল্কের পরিমাণে বিশেষ কোন অংশ হয়ত যোগ করা সম্ভব হয় নাই, কেননা পাইকারী ও খুচরা দরের হার এবং শুল্কের পরিমাণ, সকলই তখন প্রত্যেকটি গাঁটের উপরে ছাপিয়া রাখার বিধি ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সকল মিলবস্ত্রের উপর অনুরূপ ছাপ সর্ব্বদা দেখা যায় না। তাহা ছাড়া যে সকল গাঁটের উপরে এরূপ ছাপ দেওয়াও হয়, তাহার মধ্যে খুচরা দর উল্লিখিত থাকে না, ফলে বহু ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতা ছাপা মিল দরের উপরে ইচ্ছামত তাঁহাদের খুচরা দাম ধার্য্য করিয়া লন। সরিষার তৈলের উপরে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ধার্য্য-করা একটি কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক আরও একটি বিশেষ উদাহরণ। কেন্দ্রীয় সরকার তখন মণপ্রতি সরিষার তৈলের উপরে ৷৷০ আনা (বা ৫০ নঃ পঃ) আবগারী শুল্ক ধার্য্য করেন, কিন্তু ইহার ফলে সরিষার তৈলের খুচরা বাজার দর ন্যূনাধিক সের-প্রতি ।০ আনা (বা ২৫ নঃ পঃ) অথবা মণপ্রতি প্রায় ১০৲ টাকা সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পায়। মনে আছে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় লোকসভায় বিতর্ক প্রসঙ্গে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী উপদেশ বিতরণ করেন যে, জনসাধারণ যেন সরিষার তৈলের জন্য অত বেশী মূল্য দিতে অস্বীকার করেন। উপদেশটি ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা মানিয়া চলা প্রায় সকলেরই পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।

বস্তুতঃ বিক্রয়কর বা আবগারী শুল্ক রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার প্রকৃষ্ট বা সমীচীন উপায় নহে এই তথ্যটি বুঝিয়া দেখা দরকার। এই উভয় ধরনের শুল্কই ভোগ-সঙ্কোচের প্রয়োজনে ব্যবহার করাই বৈজ্ঞানিক রীতি। উদাহরণ স্বরূপ মাদক-দ্রব্যের উপরে আবগারী শুল্কের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মাদক দ্রব্যের ভোগ-সঙ্কোচ ঘটান সকল সভ্য-জাতিরই অনুসৃত নীতি। এই শুল্ক হইতে প্রভূত রাজস্ব আদায় হয় সত্য, কিন্তু তাহা মাদকের ভোগ-সঙ্কোচ ঘটাইয়া আমদানী হয় বলিয়াই ইহা গ্রহণযোগ্য নীতি। সামাজিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এই নীতিটি অনুসৃত হইয়া থাকে। বিক্রয়কর দ্বারা অর্থনৈতিক কারণে অন্যান্য ভোগ্য-পণ্যের ভোগ-সঙ্কোচের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য কিংবা অবশ্যভোগ্য পণ্যসমূহের অনুচিত সঞ্চয় বন্ধ করিবার জন্য ইহা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সেই কারণে অবশ্যভোগ্য পণ্যের উপরে যদি আদৌ বিক্রয়কর ধার্য্য করিতেই হয়, তবে তাহার পরিমাণ যাহাতে এই সঞ্চয় প্রবৃত্তি নিরোধ করিবার মত সামান্য মাত্র হয়, ততটুকুই হওয়া প্রয়োজন। অন্যপক্ষে সামাজিক জীবনমান ও ভোগবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন ইচ্ছাভোগ্য পণ্যাদির উপরে বিভিন্ন হারে বিক্রয়কর ধার্য্য করিয়া ভোগসঙ্কোচ ঘটাইবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন নীতি ও বিধি।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ইহা এমন ভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন যাহাতে শুল্কের অঙ্কের অতিরিক্ত কোন চাপ শুল্কশাসিত পণ্যাদির উপরে কোনক্রমেই না বর্ত্তাইতে পায়। বর্ত্তমানে দেশলাইয়ের উপরে যে টাকা-প্রতি ৫ নয়া পয়সা হিসাবে প্রথম বিক্রয়সূত্রের ক্ষেত্রে বিক্রয়শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে তাহার চাপ কি ভাবে অন্তিম বিক্রয়-সূত্র ধরিয়া সাধারণ ভোক্তার উপরে বর্ত্তাইবে তাহা বিবেচনার বিষয়। অবশ্য রাজ্য অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, যাহাতে অন্তিমভোক্তার (end-consumer) উপরে এই শুল্কের চাপ না বর্ত্তায় সেই কারণেই তিনি এই ভাবে এই শুল্কটি ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ভোগ্য-পণ্যের উপরে সকল শুল্কেরই চাপ শেষ পর্য্যন্ত অন্তিমভোক্তাকেই বহন করিতে হয়। ইহা নিরোধ করিবার কি উপায় তিনি রচনা করিয়াছেন এবং তাহা করিলেও তাহার কার্য্যকারিতা কতদূর নির্ভর-যোগ্য, এ সকল প্রশ্ন থাকিয়া যায়। যদি অন্তিম-ভোক্তাকেই এই অতিরিক্ত ভার বহন করিতে হয়, তবে সে ভার কি ভাবে এবং কি পরিমাণে তাহার উপর বর্ত্তাইবে, ইহা ভাবিবার কথা। এই শুল্ক ধার্য্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক টাকায় ১৬-১৭ বাক্স দেশলাই খুচরা হারে বিক্রয় হইত। কিন্তু কেহই প্রায় এক সঙ্গে ১ টাকা মূল্যের দেশলাই খরিদ করেন না। অতএব খুচরা একটি দেশলাই খরিদ করিতে গেলে বিক্রেতা তাহার টাকা-প্রতি ৫ নয়া পয়সার শুল্কের দায় মিটাইতে হয়ত ১৬-১৭

নয়া পয়সা আমদানী করিবে। গেঞ্জির সুতা বা অন্যান্য পণ্যাদির সম্বন্ধেও অনুরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। বস্তুত: এভাবে সরকারী শুল্কের অজুহাতে বহু ব্যবসায়ীই গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আপনাদের অন্যায় এবং প্রভূত পরিমাণ বেআইনী মুনাফা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে আমরা ঘোরতর আপত্তি করি। দেশের এবং রাজ্যের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য নিজেরা অর্দ্ধাহারে, কখনও কখনও অনাহারে পর্য্যন্ত থাকিয়া দেশের জনসাধারণ যে শুল্ক দিতেছেন, তাহার মধ্য দিয়া বিবেকহীন চোরাকারবারীরা যে এভাবে নিজেদের লুক্কাইত মুনাফা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ স্বষ্টি করিয়া লইবে, ইহা কেবল যে ঘোরতর অন্যায় তাহাই নহে—ইহা সরকারী অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতারও নিঃসন্দেহ পরিচয়। গত ১০ই মে হইতে এই সকল নূতন শুল্ক কার্য্যকরী হইয়াছে। ইহার দ্বারা রাজস্বের অতিরিক্ত একটি নয়া পয়সাও কাহারও ব্যক্তিগত তহবিল বৃদ্ধি না করিতে পারে, সে বিষয়ে এখনই এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনিবার্য্য প্রয়োজন।

বস্তুত: কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলি দ্বারা প্রয়োগ-করা নিজ নিজ শুল্ক-নীতির একটা সামগ্রিক এবং সুসমঞ্জস কাঠামো-মাফিক আমাদের সামগ্রিক শুল্কবিধি নিয়ন্ত্রিত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তাহা অনেকদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। রাজ্যসরকারগুলির শুল্ক-ব্যবস্থার পরিধি ও আয়তন এমনিতেই বিস্তৃত নহে। কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ আর্থিক স্বয়ং স্থিতিস্থাপকতার (economic viability) প্রয়োজনে রাজস্বের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে অবশ্য ইঁহারা নিজ নিজ অংশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু এই অংশের পরিমাণ সম্পূর্ণই কেন্দ্রীয় সরকার-নিয়োজিত ফাইন্যান্স কমিশনের অভিরুচির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। গত ফাইন্যান্স কমিশন অন্যান্য রাজ্যগুলি সম্বন্ধে জনসংখ্যার অনুপাতে অংশ বণ্টনের নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বেলায় তাহার অন্যথা করা হইয়াছে। ট্যাক্সেশন ইন্‌কোয়ারী কমিশনের সুপারিশও এই সামঞ্জস্য সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ফলে পরোক্ষ শুল্কের চাপে সাধারণ লোক পিসিয়া যাইতেছে। ইহার আশু প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শুল্কনীতি পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রচিত হওয়া উচিত এবং পরোক্ষ শুল্ক যাহাতে সরাসরি ট্যাক্সের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ না অতিক্রম করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে মূল্যমানের সমতা (Price stability) রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হইবে না।

বোখারো ইস্পাত পরিকল্পনা

সরকারী আয়োজন ও পরিচালনায় বোখারো এলাকায় একটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানার প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকাল হইতেই বিচারাধীন ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালেই যে মার্কিন অর্থসাহায্যানুকূল্যে এই পরিকল্পনাটির রূপায়ণের কাজ সুরু হইবে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনাটিকে ভারতের ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতার আবশ্যিক সম্প্রসারণ আয়োজনের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং স্থির হয় ইহার মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ লক্ষ টন হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিকী উন্নয়ন সাহায্য-দপ্তর কিছুকাল পূর্ব্বে এই ভারতীয় বৃহত্তম ইস্পাতশিল্প সংস্থাটির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইউনাইটেড চীপ কর্পোরেশনকে একটি রিপোর্ট দাখিল করিতে ভার দেন। সম্প্রতি ৭টি খণ্ডে তাঁহারা এই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন এবং তাহার সংক্ষিপ্তসার আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা লইয়া সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় কিছুটা আলোচনাও হইয়া গিয়াছে এবং সরকারী প্রযোজনায় এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য মার্কিনী অর্থানুকূল্য দেওয়া সমীচীন কি না এরূপ প্রশ্নও উঠিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই আনুকূল্যের স্বপক্ষে তাঁর জোরদার অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং বলেন যে ক্যানাডাকে যদি তাহার সরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার সাহায্য করা যায়, তবে ভারতের বেলায় এই অতি প্রয়োজনীয় শিল্পসংস্থাটির রূপায়ণের জন্য ইহা সরকারী নিয়ন্ত্রণে গঠিত হইবে বলিয়াই কেন করা যাইবে না, তিনি বুঝিতে পারেন না।

অতএব বোখারো পরিকল্পনার কাজ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকাল মধ্যে সুরু করা আদৌ সম্ভব হইবে কি না তাহা এখনও অনিশ্চিত। এ বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর জোরদার সুপারিশ যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস গ্রহণ করিলেই তবে ইহা সম্ভব। তবে ভারত সরকার যদি তাহাতে রাজী হন, তাহা হইলে ভারতীয় বৃহৎশিল্প সম্বন্ধীয় সরকারী নীতির মূল ভিত্তিটিই নড়িয়া যাইবার আশঙ্কা।

ইউনাইটেড ষ্টীল কর্পোরেশনের রিপোর্ট অবশ্য এ বিষয়ে কোন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার হয় নাই। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, তিনটি ক্রমিক পর্য্যায়ে ১৯৭১ সনে ১৪ লক্ষ টন, ১৯৭৫ সন পর্য্যন্ত ২৫ লক্ষ টন ও ১৯৮০ সনে ৪০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতায় পরিকল্পিত কারখানাটি রূপায়িত হইতে পারে। অর্থাৎ

আগামী বৎসরের মধ্যে যদি ইহার কাজ সুরু করা সম্ভব হয়, তবে প্রথম পর্য্যায় সম্পূর্ণ করিতে ৭ বৎসর সময় লাগিবে এবং ইহার উর্দ্ধতম ৪০ লক্ষ টন পর্য্যন্ত রূপায়ণ সম্পূর্ণ করিতে লাগিবে মোট ১৬ বৎসর। প্রথম ধাপ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিতে মোট খরচ হইবে প্রায় ৯১ কোটি ৯১/২ লক্ষ ডলার, অথবা মোটামুটি ৪৬০ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে বৈদেশিকী মুদ্রার ব্যয় ধরা হইয়াছে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ডলার বা প্রায় ২৫৬ কোটি টাকা এবং অন্তিম পর্য্যায় পর্য্যন্ত মোট বরাদ্দ পরিমাণ হিসাব করা হইয়াছে ডলারে ৪৪৬ কোটি টাকা এবং ভারতীয় মুদ্রায় ৩০৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ৭৫২ কোটি টাকা।

দুর্গাপুর, রাউরকেলা ও ভিলাই এই তিনটি সরকারী কারখানার প্রাথমিক ১০ লক্ষ করিয়া ৩০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে কারখানায় ও আনুষঙ্গিকে মোট ব্যয় হইয়াছে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকার কিছু কম। মোটামুটি গড়ে যদি এই প্রতিটি কারখানার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত ২০০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই কারখানাগুলির উৎপাদন ব্যয়ের ক্যাপিটাল ডিপ্রিসিয়েশনের অংশ টন প্রতি দাঁড়ায় প্রায় ৬৬·৬ টাকা। ইহা ছাড়া শতকরা ৬৲ হিসাবে পুঁজির উপর সুদ ধরিয়া লইলে চল্‌তি পুঁজি সমেত (working capital) এই খাতে টন প্রতি ব্যয় দাঁড়ায় ৫০৲ টাকা করিয়া, অর্থাৎ এই খাতে এই কারখানাগুলিতে ইস্পাত উৎপাদনের মোট ব্যয়ের অংশের পরিমাণ দাঁড়ায় টন-প্রতি ৭১·৬ টাকা।

ইউনাইটেড ষ্টীল কর্পোরেশনের হিসাব মত অনুরূপ ব্যয় হইলে ন্যূনপক্ষে দাঁড়াইবে টনপ্রতি অন্ততঃ ১০৫·৪ টাকা। কারখানার প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ব্যয়ের অনুপাতে স্বল্পপরিমাণ উৎপাদন সম্ভাবনার কথা ধরিয়া লইলেই এই অঙ্কটি আরও বাড়িয়া যাইবে। এটি বিশেষ বিবেচনার বিষয়। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় ১০।১১ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম ছিল। গত কয়েক বৎসরে এই ব্যয় ক্রমিক পর্য্যায়ে বৃদ্ধি পাইয়া আজ প্রায় বিশ্বমানের সমান উচ্চতায় পৌঁছিয়াছে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে ভারত কোনকালেই যে ইস্পাত বা ইস্পাতজাত পণ্যাদির রপ্তানী বাজারে কোন বিশেষ অংশ দখল করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে কেবলমাত্র পুঁজি-খাতেই উৎপাদন ব্যয় যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। তবে রপ্তানী-বাণিজ্যে দূরে থাকুক, এমন কি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও ভারতে উৎপাদিত ইস্পাত বা ইস্পাতজাত শিল্পগুলির চাহিদা রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি না, ইহা গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টীল কর্পোরেশনের রিপোর্টে এইটিই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে। এই রিপোর্টের একটি বিশেষ সুপারিশ এই যে, কারখানাটির পরিচালনাধিকার প্রথম চালু হইবার পর অন্ততঃ ১০ বৎসর কাল ধরিয়া মার্কিনী নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিতে হইবে এবং এই সময়ে মার্কিনী কর্ম্মচারীদের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা (১৯৬৮ সন পর্য্যন্ত) ৬৭০ জন এবং ১৯৭৭ সন পর্য্যন্ত কমিয়া ৪০ জন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। মার্কিনী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং মার্কিন কর্ম্মচারী নিয়োগ, চালু হইবার ৪ বৎসরের মধ্যে পুরা উৎপাদনের (capacity production) একটি অনিবার্য্য প্রয়োজন বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতে ইস্পাত শিল্প সংস্থা পরিচালনা এত স্বল্প যে প্রাথমিক অবস্থায় কেবল যে উৎপাদনের প্রয়োজনে তাহাই নহে, কারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার প্রয়োজনেও প্রভূত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মার্কিন পরিচালক ও শিল্পকর্ম্মী অবশ্যই প্রয়োজন হইবে এবং ক্রমে কারখানায় মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীনে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে তবেই ভারতীয়েরা ইহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণে সমর্থ হইবেন। প্রথমতঃ, এই সুপারিশ মানিয়া লইলে এই কারখানায় চল্‌তি উৎপাদন-ব্যয় কিরূপ অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া দেশে এখন ৫টি সরকারী ও বেসরকারী ইস্পাত কারখানা চলিতেছে, বোখারোর জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি-অনুযায়ী ও নিয়ন্ত্রাধীনে এই সকল কারখানায় এখন হইতেই কর্ম্মী প্রস্তুত করিবার আয়োজন না করিলে এই কারখানা চালু হওয়া পর্য্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয় কর্ম্মীর ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নহে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে রাজী নই। কিছু সংখ্যক মার্কিনী বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উপযুক্ত আয়োজন করিলে যে মোটামুটি ভারতীয়েরাই এই কারখানার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ অবশ্যই হইবেন, ইহা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এবং তাহা হইলেই চল্‌তি উৎপাদন-ব্যয়ও যে ন্যায্য গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইবে ইহাও অনিবার্য্য। ইস্পাত এবং অন্যান্য আধুনিক বৃহৎ শিল্প, সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয়েরা তাঁহাদের দ্রুত-অর্জ্জিত পরিচালন-ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বোখারোর বেলায় যে তাঁহারা অসমর্থ প্রমাণিত হইবেন এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন সমীচীন কারণ নাই।

ঈশোপনিষৎ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

উপনিষৎগুলির নাম উল্লেখ করিবার সময় সর্বপ্রথমে ঈশোপনিষদের নাম করা হয়। এজন্য ঈশোপনিষদের প্রথম দুইটি শ্লোককে সমগ্র উপনিষদের প্রারম্ভিক বাণী (opening message) বলা যায়। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে, মনুষ্যের স্বাভাবিক ভোগপ্রবৃত্তিকে কিরূপে সংযমিত করা উচিত। দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে, কোন্ প্রণালীতে জীবনযাত্রা পরিচালিত করা উচিত। প্রথম শ্লোক এইরূপ:

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্॥

"আমাদের মনে রাখিতে হইবে এই পরিবর্তনশীল জগতের প্রত্যেক বস্তুই চলিয়া যাইতেছে, মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তু অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। এইরূপ মনে রাখিয়া আমাদিগকে ত্যাগের দ্বারা ভোগকে নিয়মিত করিতে হইবে, কাহারও ধনের প্রতি লোভ করা অন্যায় হইবে।"

আচার্য শঙ্কর ইহার যে ব্যখ্যা করিয়াছেন তাহা যেন শ্লোকগুলি হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি 'ত্যক্তেন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন সংসার ত্যাগ করিবে, 'ভুঞ্জীথাঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'পালন করিবে'—আত্মাকে পালন করিবে,—মিথ্যা সংসার ত্যাগ করিয়া সর্বদা ব্রহ্ম বা আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। নিজের বা পরের কাহারও ধন "কস্যস্বিৎ ধনম্" আকাঙ্ক্ষা করিবে না। কারণ সকল ধনই মিথ্যা। আত্মা বা ব্রহ্মই সত্য। শঙ্করের মতে যাহার ব্রহ্ম উপলব্ধি হইয়াছে তাহার জন্য এই উপদেশ। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই তাহার কি কর্তব্য তাহা দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে।

রামানুজ শঙ্করের ন্যায় উপনিষদগুলির ধারাবাহিক ব্যাখ্যা লেখেন নাই। তাঁহার মতানুযায়ী নারায়ণ নামক আচার্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, জগতের বিবিধ বস্তুকে আমরা ভোগের বিষয় বলিয়া মনে করি, ইহাই আমাদের ঈশ্বর লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে, ভোগাকাঙ্ক্ষা দূর করিবার জন্য আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে জগতের সকল বস্তুই অল্পকালস্থায়ী, তাহারা দুঃখের মূল; অধিকন্তু আমরা দেহকে আত্মা বলিয়া ভ্রম করি এ জন্যই বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা হয়, এই সকল চিন্তা করিয়া ভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে ('ত্যক্তেন')। ভগবদুপাসনার উপযুক্ত দেহ ধারণ করিবার জন্য যে অন্নপানাদি প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে ('ভুঞ্জীথাঃ')। বন্ধু বা শত্রু কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিবে না ('মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম')। আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষয় ভোগ করিবে। বিষয়ভোগে আসক্তি থাকিলে অন্যায় কর্ম করিবার আশঙ্কা থাকে। এজন্য আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত।

মধ্বাচার্য 'তেন ত্যক্তেন' ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছেন (তেন ঈশ্বরেণ) তাহার দ্বারা ভোগ সম্পন্ন করিবে। সকল বস্তু ঈশ্বরের অধীন, তিনি তোমাকে যাহা দিয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, তিনি অন্যকে যাহা দিয়াছেন তাহা আকাঙ্ক্ষা করিও না, করিলে তাঁহার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মধ্বাচার্য্য দেখাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে! "তদ্দত্তেনৈব ভুঞ্জীথাঃ অতো নান্যং প্রযাচয়েৎ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে।" অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে যে ঈশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছেন তাহাতেই ভোগ সম্পাদন করিবে, তাহা ছাড়া অন্য কিছু চাহিবে না।

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোক এইরূপ:

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

"কর্ম করিয়াই শত বৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে। এই ভাবে (জীবন যাপন করিলে) তোমাতে কর্ম লিপ্ত হইবে না। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই।"

শঙ্করের মতে যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই তাহার জন্য এই উপদেশ। মনুষ্যের সাধারণ পরমায়ু শত বৎসর। এজন্য বলা হইয়াছে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে এবং কর্ম করিয়াই বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে। তিনি কর্ম শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম।" মনুষ্যের স্বভাব এইরূপ যে, কোনও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি যাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ (গীতা ৩।৫)

"কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না।" যদি ভালকর্মে নিজকে ব্যাপৃত না রাখা যায়, তাহা হইলে স্বাভাবিক ভোগপ্রবৃত্তির বশে মন্দ কর্মে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। এজন্য সর্বদা ভাল কর্মে—শাস্ত্র-বিহিত কর্মে,—ব্যাপৃত থাকা উচিত। তাহা হইলে মন্দ কর্ম কাছে আসিতে পারিবে না।

রামানুজ মতের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এই শ্লোকে আসক্তি ও ফলাকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া সর্বদা শাস্ত্র-বিহিত কর্ম করিতে বলা হইয়াছে। কারণ এই ভাবে কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই দুইটি শ্লোকের শঙ্করের ব্যাখ্যা অপেক্ষা রামানুজ মতের ব্যাখ্যা অধিক সন্তোষজনক মনে হয়। শঙ্কর মতে দুইটি শ্লোক দুইটি বিভিন্ন অধিকারীর জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকের "এবং" শব্দ হইতে মনে হয় দুইটি শ্লোকে একই অধিকারীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "এবং" অর্থাৎ "এই ভাবে"—পূর্বের শ্লোকে যে ভাবের কথা বলা হইয়াছে, জগতের সকল বস্তু ক্ষণস্থায়ী ইহা মনে করিয়া বিষয়ভোগের আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। বার্দ্ধক্যে জীবনের আনন্দ থাকে না, তথাপি শত বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা করা উচিত এজন্য যে, যত বেশী দিন বাঁচা যায়, তত বেশী উত্তম কর্ম করিবার সুযোগ পাওয়া যায়, তত বেশী চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিক উপযোগিতা হয়।

দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানা যায়, উপনিষদ কর্মের বিরোধী নহেন, প্রত্যুত সর্বদা কর্ম করিতে বলিয়াছেন। উপনিষদ যখন বেদের অন্তর্গত* তখন বেদ যে-সকল কর্ম করিতে বলিয়াছেন উপনিষদ যে সেই সকল কর্ম করিতে বলিবেন ইহাই স্বাভাবিক। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন (বৃঃ উঃ ৪।৪।২২)

অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা অনাসক্তভাবে সম্পাদন করিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন। এই সকল কর্ম অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠান করিলে চিত্তবৃত্তি সংযত করা অভ্যাস হয়, চিত্তবৃত্তি সংযত হইলে চিত্ত শুদ্ধ এবং ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করিবার উপযোগী হয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ আদেশ দিয়াছেন,

"দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্" (তৈঃ উঃ)

"দেব"কার্য্য হইতেছে যজ্ঞ এবং "পিতৃ"কার্য্য হইতেছে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। এই সকল কার্য্য অবহেলা করা উচিত নহে।

উপনিষদের প্রারম্ভিক বাণী এবং বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের পূর্বোদ্ধৃত বাক্য হইতে ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ, এবং তাঁহাদের অনুকরণকারী কতকগুলি আধুনিক পণ্ডিত যে বলিয়াছেন যে, উপনিষদ কর্মের বিরোধী, বিশেষতঃ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহা সত্য নহে। উপনিষদ যে কর্মানুষ্ঠানকে অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করেন তাহা ঈশোপনিষদের "বিদ্যা" ও "অবিদ্যা" বিষয়ে তিনটি শ্লোক হইতেও সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। শ্লোকগুলি এইরূপ :

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে হবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যেনস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

ঈশোপনিষৎ ৯, ১০ ও ১১

অনুবাদ: "যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারময় স্থানে যায়। যাহারা বিদ্যার উপসনা করে তাহারা আরও অন্ধকারে যায়।

"বিদ্যার দ্বারা অন্য স্থান পাওয়া যায়, অবিদ্যার দ্বারা অন্য স্থান পাওয়া যায়। যাঁহারা আমাদিগকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন সেই সকল জ্ঞানী লোকের নিকট আমরা ইহা শুনিয়াছি।

"যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের উপাসনা করে, সে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে।"

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে এখানে "অ-বিদ্যা" মানে বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম, "বিদ্যা" মানে ঐ যজ্ঞে যে দেবতার উপাসনা করা হইয়াছে। কেবল কর্ম করিলে পিতৃলোকে যাওয়া যায়। কেবল দেবতার চিন্তা করিলে দেবলোকে যাওয়া যায়। দেবতার চিন্তা করিয়া কর্ম করিলে দেবতার সহিত এক হওয়া যায়। তাহাকেই "অমৃত" বলা হইয়াছে। রামানুজ বলিয়াছেন "অবিদ্যা"

---

* বেদের সংজ্ঞা এইরূপ: "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" (আপস্তম্ব প্রণীত যজ্ঞ পরিভাষা সূত্র)। অর্থাৎ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের নাম বেদ। অধিকাংশ উপনিষদ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত। কয়েকটি উপনিষদ বেদের মন্ত্র ভাগের অন্তর্গত। এ জন্য সকল উপনিষদই বেদের অন্তর্গত।

শব্দের অর্থ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম, বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা। যাহারা কেবল কর্ম করে (ব্রহ্ম চিন্তা করে না) তাহারা স্বর্গ লাভ করে বটে, কিন্তু স্বর্গভোগ শেষ হইলে আবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। তখন অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। যাহারা কর্ম করে না, কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কারণ কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। অপর পক্ষে কর্ম করে না বলিয়া তাহারা স্বর্গেও যাইতে পারে না। এ জন্য তাহাদের গতি যাহারা কেবল কর্ম করে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট "ততো ভূয় ইব তে তমঃ"। যাহারা কর্ম করে এবং ব্রহ্ম চিন্তা করে, তাহাদের কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এবং সেজন্য মোক্ষ হয়।*

শঙ্করের ব্যাখ্যা অপেক্ষা রামানুজের ব্যাখ্যা ভাল বলিয়া মনে হয়। কারণ কিরূপে মোক্ষ লাভ করা যায় তাহারই উপদেশ আমরা উপনিষদের নিকট আশা করি। দেবত্ব-লাভের উপদেশ অপেক্ষা তাহা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নবম শ্লোকে "অমৃত" লাভের কথা বলা হইয়াছে। তাহার মুখ্য অর্থ মোক্ষলাভ। গৌণভাবেই দেবত্ব লাভকে অমৃতত্ব লাভ বলা যায়। অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যাহারা কেবল "বিদ্যা"র উপাসনা করে তাহাদের গতি, যাহারা কেবল "অবিদ্যার" উপাসনা করে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কেন নিকৃষ্ট, শঙ্করের ব্যাখ্যাতে তাহা দেখান হয় নাই। বরং তাঁহার ব্যাখ্যাতে কেবল বিদ্যার উপাসনা করিলে, কেবল অবিদ্যার উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গতি পাওয়া যায়। কারণ (তাঁহার মতে) কেবল বিদ্যার উপাসনা করিলে দেবলোকে যাওয়া যায় এবং কেবল অবিদ্যার উপাসনা করিলে পিতৃলোকে যাওয়া যায়। পিতৃলোক অপেক্ষা দেবলোকই শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১।১ এর অন্তর্গত "ধর্ম্মং চর" (ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর) এই বাক্যের ভাষ্যে শঙ্কর একটি স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন** যাহার অর্থ : তপস্যারূপ কর্ম্মদ্বারা পাপ বিনষ্ট করা যায় এবং (তাহার পর) ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়। অতএব রামানুজ এই তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্কর অন্যত্র সে মত গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে সে মত গ্রহণ না করিবার কারণ দেখা যায় না। এই সকল কারণে মনে হয়, রামানুজের ব্যাখ্যাই সঙ্গত। এবং সে ব্যাখ্যা অনুসারে কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্ম চিন্তা করা অপেক্ষা বরং কেবল কর্ত্তব্যকর্ম্ম করাও ভাল। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যে বলিয়া থাকেন যে, উপনিষদে কর্ম্মের কথা নাই, অথবা কর্ম্মের নিন্দা আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মত।

প্রসঙ্গক্রমে এই তিনটি শ্লোকের দুইটি আধুনিক মনীষিকৃত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "অবিদ্যা"র অর্থ অজ্ঞান (Ignorance), "বিদ্যা"র অর্থ জ্ঞান (Knowledge)। তাঁহার মতে এখানে অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়কেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।১)। অজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করা যুক্তি-বিরুদ্ধ। উপনিষদে কোথাও অজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতে বলা হয় নাই। এখানেও অবিদ্যার উপাসনার কথাই আছে—অবিদ্যাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবার কথা নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "অবিদ্যা" শব্দের অর্থ "বস্তু-বিদ্যা" (আধুনিক Science বা বিজ্ঞান), এবং বিদ্যা শব্দের অর্থ অধ্যাত্ম বিদ্যা।* তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে বস্তুবিদ্যার অবহেলা করিয়া কেবল অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছে বলিয়া তাহার অবনতি হইয়াছে। অপর পক্ষে পাশ্চাত্ত্যদেশে অধ্যাত্মবিদ্যার অবহেলা করিয়া কেবল বস্তুবিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে বলিয়া তাহাদের সাধনা সার্থক হয় নাই। বস্তুবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিদ্যা উভয়ের একত্র অনুশীলন হইলেই মানব জাতির উন্নতি হয়। কিন্তু বোধ হয় উপনিষদের এই শ্লোকগুলিতে ব্যক্তিগত সাধনার কথাই আলোচিত হইয়াছে, জাতীয় উন্নতির কথা নহে। অধিকন্তু শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রভৃতি ভারতীয় সাধুগণ অথবা যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ বস্তুবিদ্যার (Science) চর্চ্চা করেন নাই।

এই সকল কারণে রামানুজের ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

---

* "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ব্রহ্মসূত্র ১।১।১ এর ভাষ্যে রামানুজ ঈশোপনিষদের এই তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

** "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"। প্রধান কর্ম তিনটি যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা। গীতা ১৮।৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে এই তিন কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে। গীতা ৫-১১ শ্লোকে (এবং অন্য শ্লোকেও) বলা হইয়াছে যে কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।

* ১৩২৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "শিক্ষার মিলন" নামক প্রবন্ধে এই মতের উল্লেখ দেখা যায়।

রায়বাড়ী

(সেকালের পল্লীচিত্র)

শ্রীগিরিবালা দেবী

৬

"কা-কা-কা—তিতে বাড়ী থেকে মিঠে বাড়ী যা,
গোয়াল বাথানে যা, দই-দুধ খা।"

ঠাকুমার কাক-কলরবে বিনুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে ত্রস্তে বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল।

ছোট ঠাকুমা তাহাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার পরে সে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পোড়া চোখে কি এত ঘুম জড়াইয়া থাকে; কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না? ইহারা বোধ হয় নিদ্‌হারার ঔষধ খায়; তাহাকে দিলে সে এক-ঢোক খাইয়া লইত।

ঠাকুমা স্নানান্তে সিঁড়ির আসনে সমাসীন হইয়াছেন। এক ঝাঁক কাক খাদ্য অনুসন্ধানে উঠানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তিনি কাকের উদ্দেশে ছড়া কাটিতেছেন।

সরস্বতী বড় হবিষ্যি ঘর মার্জ্জনা করিয়া বারান্দা ধুইতেছিল, এক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন জাতি ও-গৃহের ত্রিসীমানায় ঘেঁষিতে পারে না।

নিমের দাঁতন, ধোয়া কাপড় হাতে লবঙ্গ যাইতেছিল পুকুরে মুখ ধুইতে। লবঙ্গদের বাড়ীতে পুকুর নাই। তাহাদের স্নান, গা-ধোওয়া যাবতীয় কাজ ইহাদের পুকুরেই সম্পন্ন করিতে হয়। সেই জন্যে ওদের বাড়ীর সবগুলি প্রাণীর এ বাড়ীতে আনাগোনার বিরাম থাকে না। মাতৃপিতৃহীনা লবঙ্গের এখনও বিবাহ হয় নাই। তাহার দাদারা বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। সুন্দরী না হইলেও মেয়েটি দেখিতে ভাল। চলনে বলনে মনোহারিণী। লেখাপড়া জানে, ইংরেজীতে নাম লিখিতে পড়িতে পারে। সূচি কাজে, উলের কাজে অদ্বিতীয়া। মেয়ে-মহলে লবঙ্গের ভারী সুখ্যাতি, চারিদিকে ধন্য ধন্য। এহেন লবঙ্গের সঙ্গলাভের আশায় বিনু আগ্রহান্বিত হইয়া প্রতীক্ষা করে।

সেই কামনার ধনকে প্রভাতের অরুণালোকে নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত বিনু ত্বরিতপদে অগ্রসর হইল লবঙ্গের সামনে। তাহার হাত ধরিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "পিসীমা, আপনার সাথে আমার অনেক কথা আছে।"

কথা মানে—গত রজনীর ঘটনাবলী সে প্রাণের সখীর নিকটে সালঙ্কারে ব্যক্ত করিবে। এই শত্রুপুরীর মধ্যে তাহাকেই সে একমাত্র মিত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছে। শ্বশুরালয়ের অপ্রিয় প্রসঙ্গ সত্য মিথ্যায় অতিরঞ্জিত করিয়া সুযোগ সুবিধা পাওয়া মাত্র আজকাল সে লবঙ্গের কর্ণকুহরে ঢালিতে আরম্ভ করিয়াছে।

লবঙ্গ বিনুর মত বোকা নয়, অদূরে সরস্বতীর অবস্থিতিতে বিব্রত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "সাত-সকালে তোমার আবার কিসের কথা, বৌ? এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গল নাকি? অকর্ম্মার ধাড়ী; তোমার ছাই-ভস্ম বাজে কথা শোনার এখন আমার সময় নেই, ঢের কাজ রয়েছে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া লবঙ্গ চলিয়া গেল। ঠাকুমা তাহার গমন পথের দিকে তাকাইয়া বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, "ছলাদারি বলার বৌ, কত ছলা জান, কলাবনে নাগর রেখে ডাগুর ধ'রে টান।"

লবঙ্গের বিমুখতায় বিনু ক্ষুণ্ণ হইলেও ঠাকুমায়ের উক্তি তাহার ভাল লাগিল না। মেয়েটি অত্যন্ত হাসে বলিয়া ঠাকুমা তাহাকে তেমন পছন্দ করেন না। না করুন, তাই বলিয়া যা-তা বলিবেন নাকি?

বিনু মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া হবিষ্যি ঘরের বারান্দায় উপস্থিত হইল। সরস্বতী বঁটি পাতিয়া তরকারীর ঝুড়ি লইয়া বসিয়াছে। সে চক্ষু তুলিয়া চাহিল না, কোন কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া বিনু চলিল চায়ের আসরে। সে সময় রায়বাড়ীতে প্রথম চায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাও বাহির-মহলে, অন্তঃপুরে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

মনোরমা রূপার থালার উপরে কাঁচের পেয়ালায় চা ঢালিয়া বাহিরে পাঠাইতেছিলেন। চায়ের চাট-স্বরূপ কাঁচের ডিশে সরভাজা, ক্ষীরের নাড়ু ও ট্যাপের-মোয়া সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্ষিতি, তরু ঘুমন্ত-মাকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছিল।

বিনু সসঙ্কোচে চায়ের ঘরের দ্বারের অন্তরালে আশ্রয় লইল।

মনোরমা কাঁসার বাটিতে ছেলেমেয়েকে খাবার ভাগ

করিয়া দিলেন। বধূও এক বাটি ভাগ পাইল। কিন্তু যেখানে সেখানে যার তার সামনে তাহার খাদ্য গ্রহণের অনুমতি ছিল না। সাধারণতঃ পাচক-ঠাকুর দুইবেলা ভাত বাড়িয়া তাহার শয়ন গৃহে রাখিয়া আসিত। পাচক পুরুষ-মানুষ রান্নাঘরে তাহার সম্মুখে বুক সমান ঘোমটা দিয়া নূতন বৌ গব্ গব্ করিয়া গিলিবে কি? তাই শাশুড়ী কোন খাবার দিলে তাহাও ঘরে লইয়া খাইতে হইত।

নিভৃতে একাকিনী খাইতে বিনুর ভাল লাগিত না। সে কতক কতক খাইত, কতক পাতে পড়িয়া থাকিত। এক-একদিন লবঙ্গ আসিয়া খাইতে বসিত তাহার সঙ্গে। আজ মনোরমা খাবার ধরিয়া দিয়া 'খাও' বলিলেন। আড়ালে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন না। সেও গেল না; তরুর পাশে বসিয়া খাইতে লাগিল।

চায়ের পাট মিটাইয়া দিয়া মনোরমা অন্য কাজে গেলেন। ক্ষিতি গেল মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়িতে। সুমন্ত চাপিল নবীন চাকরের স্কন্ধে। পাড়া-বেড়ানী তরু পাড়ায় পাড়ায় টো টো করিতে বাহির হইল।

কেবল বিনুরই কোন কাজ নাই। সে যে কি করিবে জানে না। কেহ বলিয়া দেয় না। আপনা হইতে কোন কিছুতে হাত দিতে তাহার সাহস হয় না।

ক্ষণেক পরে বিনু চলিল, ছোট ঠাকুমার উদ্দেশে। দক্ষিণদ্বারী ঘরের ডাইনে বাগান ঘেঁষা যে গৃহ সেইখানা হইল প্রকৃত হবিষ্যি ঘর। সেখানেই বিগ্রহের নিত্য ভোগ রান্না হয়, বিধবারা হবিষ্যি করেন। এখানকার প্রধানা ছোট ঠাকুমা। তাঁহার টুকিটাকি জিনিষপত্র এখানেই সংরক্ষিত। সারাদিনের বিরাম বিশ্রাম এই কক্ষে।

ছোট ঠাকুমা পৈঠায় বসিয়া এক বাটি সরিষার-তেল লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছিলেন।

বিনু তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিল, "আমিও আপনার সাথে চান করতে যাব ছোট ঠাকুমা?"

তিনি সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া চাপাস্বরে কহিলেন, "এ কি কাণ্ড, দিনমানে সবাইয়ের সামনে তুমি আমার সাথে কথা কইতে এলে কেনে? আমি না পই পই ক'রে তোমারে মানা ক'রে দিয়েছিলাম? না বাবু, আমার সাথে তোমার নাইতে যেতে হবে না। আবার একঘাট লোকের ভেতরে পট পট ক'রে কথা কয়ে ফেলবে? তোমার কি, তুমি ত 'কানে দিয়েছ তুলো, পিঠে বেঁধেছ কুলো।' হেনেস্তা আমাকেই হ'তে হবে।"

অপ্রতিভ বিনু সেখান হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল।

ঠাকুমা তাঁহার সাধের সিংহাসন হইতে নিয়মের কুয়োর পাড়ে আসিতেছিলেন, পথে বিনুকে পাইয়া ডাকিলেন, "কি লো পেসাদের বৌ, ঘুর ঘুর ক'রে বেড়চ্ছিস কেনে? ক্ষিদে পেয়েছে? এতটা বেলা হয়েছে, গিন্নী ত সিন্নী বেঁটে বেড়াচ্ছে। পরের মেয়ের যতন আত্তি কি ও জানে? 'যেই না আমার কালো-জিরে, তার আবার মাথার কিরে।' নিজের পেটের ছা-গুলানকে রাত না পোয়াতেই খোরায় খোরায় গিলতে দিচ্ছে। 'ঘিয়ের চাঁছি দুধের সর, তাতেই বুঝি আপন পর।' ওরে চিনতে আমার বাকী নেই, কাল-সাপ, আস্ত কাল-সাপ।"

বিনু নির্ব্বোধ হইলেও ঠাকুমার কালসাপের উল্লেখে স্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু সে যাইবে কোথায়? কেহ ডাকে না, কাছে গেলে কথা বলে না। সর্ব্বত্র একটা অবহেলার ভাব। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মধ্যে আগাইয়া যাইতে তাহার দ্বিধা হয়, সঙ্কোচ হয়। তাই পিছাইয়া লুকাইয়া থাকে নিরালা গৃহ-কোটরে।

৭

কামিনীর মা রায়বাড়ীর পুরাতন দাসী। সে এক রাশি ছাড়া কাপড় লইয়া বিনুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌমা, তুমি কাপড়-ছেড়ে রাখলে কমনে? হারাণী ধুতে নিয়ে গেচে—পোড়ারমুখীর কাজের ছিরি ত্যাখ, কতকগুলান নিয়েছে, কতকগুলান রেখে দিইচে আমারি নেগে। তুমি কি এখন চান করবে? যদি কর, চল নিয়ে যাই ঘাটে?" বলিতে বলিতে কামিনীর মা কাঁকালের কাপড় বোঝাই প্রকাণ্ড বেতের ধামাটা সেখানে নামাইয়া পা ছড়াইয়া আরাম করিতে বসিল।

বৌমানুষের একা পুকুর ঘাটে যাইতে নাই। দাসীরা কেহ না কেহ বিনুকে স্নান করাইয়া আনে। সে অধিকাংশ দিন কামিনীর মার সঙ্গে যায়। বিনু তাহাকে খুব পছন্দ করে, সে পাথরকুচি গ্রামের মেয়ে বলিয়া। তাহার ছোট বোন যামিনী আজও বিনুর বাপের বাড়ীতে কাজ করিয়া খাইতেছে। পূজার হট্টগোলে সে কামিনীর মাকে নিভৃতে পায় না। ওদিকে নিয়মের যেমন আড়ম্বর, এ দিকেও অনিয়মের তেমনি সমারোহ। সেই মুড়ি খই ভাজা, চিড়া কোটা, মুড়কি মোয়া, মশলার গুঁড়া, চালের গুঁড়া। এ সবের ভার পুরাতন দাসীর উপরে।

এখন গৃহিণী কন্যাদের লইয়া দল বাঁধিয়া স্নান

করিতে গিয়াছেন, তাই কামিনীর মা বসিয়াছে বিনুর কাছে।

বিনু কহিল "আমি তোমার সাথে চান করতে যাব, তুমি আমাকে একটু তেল মাখিয়ে দাও না?"

চুলে তেল দিতে গিয়া কামিনীর মা চমকিত হইল। "এ কি করেছ বৌমা, চুলগুলান যে শিবের জটা বানিয়েছ? ভদ্দনোকের মেয়ের এমন চুলের হাল জন্মে দেখি নি বাপু, তেল মাখ নি কতকাল, চুল বাঁধ নি কতকাল?"

বিনু অম্লান বদনে উত্তর দিল "রোজ চানের সময় ত তেল মাখি, আমি চুলের জটা ছাড়াতে জানি না, চুল বাঁধতেও পারি না।"

"এত বড় মেয়ের এমনি ধারা কেনে বৌমা? তরু ঠাকুরজি যা পারে তুমি যে তাও পার না? তুমি পাথরকুচি গেরামের অখ্যাতি করবে। শাশুড়ী ননদের সাথে ব্যাভার জান না। কাজ কাম জান না। বাড়ীর লোকেরা খেটে খেটে অস্থির, আর তুমি দিব্যি ব'সে থাক। তোমার ব্যাভার দেখে আমি নজ্জায় খুন খুন হয়ে মরি। নোকে কইতে কইবে, পাথরকুচি গেরামের মেয়ে। একজনারে মন্দ কইলে আর জনারে ভাল কইবে কে?"

বিনু কামিনীর মায়ের তেল-মাখা হাতদুটি সহসা চাপিয়া ধরিল, তাহার চোখে জল আসিয়াছিল, সে জলভরা চোখে মিনতি করিতে লাগিল, "আমি যে এখানকার কিছুই জানি না। তুমি অতদিন আমাকে শিখিয়ে দাও নি কেন?"

"ক্যামনে শেখাব বৌমা, একে মুল্লুকের কাজ কামে সময় পাই না, তাতে আমরা হলাম গে এক গেরামের মুনিষ্যি। ডর লাগে শিখিয়ে মিখিয়ে দিতে গেলে ওরা কইবে, ঝির অত দরদ কেনে? তা না হলে তোমাগরে কি আমি জানি না, আমার বুনডা ত তোমাগরে খেইয়ে পইরে পরাণ ধ'রে রইচে। এখন ভাবছি, আমি তফাতে থকে ভাল কাম করি নি, তোমার ঠাকুমা মার সাথে দেখা হ'লে তেনারা আমারে কি কইবে? যদি কয়, মেয়েডারে তুইও কি দেখিস নি? শেখায়ে পড়ায়ে দিতে পারিস নি? আমি কি কইব তেনাগরে?"

ক্ষোভে দুঃখে কামিনীর মা চুপ করিয়া খাবলা খাবলা তেল দিয়া বিনুর চুলের জটা ছাড়াইতে লাগিল।

বিনু অনুনয় করিতে লাগিল, "তোমার বোন যামিনীকে আমি মাসী ব'লে ডাকি, তোমাকেও তাই ডাকব। কোন্ সময়ে কি করতে হবে, তুমি আমাকে ব'লে দিও। ওদের আড়ালে চুপি চুপি ব'লো, তোমার কাছ থেকে সব শিখে নেব, মাসী।"

বলিতে বলিতে বিনুর আঁখিপল্লব বাহিয়া অশ্রুজল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

কামিনীর মা সবিস্ময়ে গালে হাত দিল, "ওমা, কি কাণ্ড, তুমি কানতে লাগলে বৌমা? আমারে মাসী কইলে, আমি তোমার মাসীর কাম করব পেতিজ্ঞে করলাম। আমারে যে মাসী কয়েছো তা মনে রেখে দিবা, কারোর কাছে ফাঁস ক'রে দিও না। এ আমাগরে সোনার পাথরকুচি গেরাম নয়, এডা হ'ল গে জমিদারের জমিদারি, রাজা আর পেজা। এরা নিজের গুষ্টিছাড়া আর কাউকে দাদা দিদি মাসী পিসী কয় না। বাড়ীর ঝিকে মাসী ডাক। শুনলে ছি: ছি:কার করবে। —শোন, আগে-ভাগে তোমারে তালিম দিয়ে নি। চান সেরে ওনারা আবার ফিরে আসবে এই দণ্ডে। তুমি নাইয়ে ধুইয়ে সরাসরি চলি যাবে ওই কামের ঘরে, শাশুড়ীর ননদদের সাথে কামে হাত দিবা। ওনারা ঘরের বার না হ'লে তুমিও বার হবে না। সগলের খাওয়া হ'লে হাতে হাতে পান দিবে। চানের সময় হ'লে মাথায় তেল দিয়ে দিবে। নবনে পালঙ্কের বিছান পাতে; সকলের শোবার সময় পাতা বিছানা আঁচল দিয়ে ফের ঝেড়ে দিবা। কাছে কাছে রইবে, সময়ে হাত পা টিপে দিবা। তরুরে ক'য়ে দিও আগে ভাগে ঠাকুর যেন তোমার ভাত না দেয়, ক'য়ো 'আমি মার কাছে ব'সে ভাত খাব।' সকলে যখন শোবে, তখন তুমিও শোবে, আগে শুয়ো না। এমন ধারা না করলে লোকে ভালবাসবে কেনে? এক গাছের বাকল আর এক গাছে নাগাতে গেলে যতন চাই, চেষ্টা চাই। আচ্ছা, তোমার মা-ঠাকুমা কি কিছুটি শেখায়ে দেয় নি?"

"দিয়েছিলেন মাসী, এদের ভেতরে এসে আমার সব গুলিয়ে গেছে। ওদের দেখলেই ভয় করে তাই পালিয়ে থাকি।"

"মেয়ে মুনিষ্যির কি ভয় করলে চলে মা? তা-গরে বশ ক'রে নিতে হয়। তুমি এত হাবা বোকা কেনে? তোমার বয়েসীরা কেমন সেয়ানা চতুর। তুমি লগ ঠাকুরঝির কাছে এনাগরে নিন্দা বান্দা করেছ কেনে? সে তোমার পেটের কথা টেনে বের ক'রে নাগিয়ে দিচে মাজান ঠাকুরঝির ঠাঁই। একেই উঁই মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। কি দাপাদাপি করচে। শুনলে গাছের পাতা ঝ'রে পড়ে। জলের ঢেউ থামি যায়। লগ

ঠাকুরঝির মুখের মিঠে বুলিতে মজে যাবা না। ও হলগে মিনমিনে ডাইনি, ছেলে খাবার যম।"

বিনু শিহরিয়া অধোমুখী হইল। তাহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। না—মিছে নয়, সত্যই সে ইহাদের সম্বন্ধে লবঙ্গের কাছে লাগাইয়াছে একটু আধটু। পাঁচটা সত্যর মধ্যে মিথ্যা যে নাই, তাহা বলা যায় না।

বিনু কম্পিত হৃদয়ে শুধাইল, "কারা রাগ করেছে মাসী? কে শুনেছে?"

"কে আবার? যেনার কুটকুটে চরিত্তির। মাজান শুনে এই যে বড়রে নাগিয়ে দিচে। বড় বাঘের নাগাল নাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এখন সুস্থির হইচে। ওনার রাগব্যাগ জবর থাকলেও এত ঘোর প্যাঁচ নাই। যারে যা চোপা নাড়ে ঠাস ঠাস। আর মাজানের হ'লগে ইন্দুরের মতন কুটুর-কুটুর সুরঙ্গ কাটা। তুষের ছাই চাপা আগুন ধিকিধিকি জ্বলে গুমরে গুমরে।"

৮

স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া বিনু বড় হবিষ্যি ঘরে উপস্থিত হইল। নামে হবিষ্যি ঘর হইলেও ইহাতে সে নামের সার্থকতা নাই। প্রকৃত পক্ষে রায়-রঙ্গিনীদের এ একটা একচ্ছত্র কর্ম্মশালা।

চণ্ডীমণ্ডপ বাহির মহলে। ভিতরের দিকে দ্বার থাকিলেও অন্তঃপুর হইতে অনেকটা দূরে। সেইজন্যে গৃহবিগ্রহ বারমাস এখানেই অবস্থান করেন। পাল-পার্বণ উপলক্ষে যাত্রা করেন মণ্ডপে। এক ভোগ রান্না ভিন্ন যত নিয়মের কাজের এই হইল কেন্দ্রস্থল। এ গৃহে যে কত প্রকারের আচার আচরণ কর্ম্মপদ্ধতি সংঘটিত হইতে পারে তাহার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন নারায়ণ শিলা।

রৌপ্যের সিংহাসনে বিগ্রহ বিরাজিত। পূজারী নিত্যপূজা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। পুষ্পচন্দনের সৌরভে দেবমন্দির সৌরভাকুল।

আজ হইতে পূজার নারিকেল পর্ব্বের সূচনা। খোসা ছাড়ানো নারিকেল পাচক ব্রাহ্মণ শুদ্ধাচারে ঝাঁকা ভরিয়া পুকুর হইতে ধুইয়া আনিয়া রাখিয়াছে। মেঝেয় কলাপাতা বিছাইয়া সারি সারি নারিকেল কুরুনী লইয়া বসিয়াছে। ছোটঠাকুমা এখনও ভোগশালায় যান নাই, খানিকটা নারিকেল কুরিয়া দিয়া পরে যাইবেন।

মনোরমা কুরুনী হইতে উঠিয়া ঘরের অন্যপ্রান্তে কাঠের উনুন ধরাইতে উঠিয়া গেলেন। বিনু সসঙ্কোচে শাশুড়ীর পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিল। সরস্বতী ভ্রূ বাঁকাইয়া বধূর প্রতি বিষদৃষ্টি হানিতে লাগিল। ভানুমতী, মধুমতী কথা কহিল না। মনোরমা কিন্তু প্রসন্ন হইলেন।

একদিকে নারিকেল কোরান হইতেছে, আর দিকে ভানুমতী শিলে বাঁটিতেছে। প্রকাণ্ড পিতলের কড়ায় বাঁটা নারিকেলে দুধ চিনি মিশাইয়া মনোরমা উনুনে চাপাইয়া দিলেন।

হঠাৎ সরস্বতী সগর্জ্জনে কহিল, "ওর নাম নাকি নারকেল কোরানো? জিরে জিরে না হয়ে ডুমো ডুমো হয়ে পড়ছে পাতায়। গোরুর বদলে ভেড়া দিয়ে ধান মারাই করলে যে দশা হয়, এও হচ্ছে তেমনি ধারা।"

মনোরমা কাঠের খুন্তি দিয়া নারিকেল নাড়িতে নাড়িতে মুখ ফিরাইলেন, "ওখানা শুকনো খুঁদি, কোরানো যাবে না। ওটা রেখে দিয়ে অন্য মালা নাও, বৌমা।"

ছোটঠাকুমা কুরুনী কাত করিয়া উঠিয়া সায় দিলেন, "আমিও তিনটে মালা খুঁদি পেয়েছি। নিয়ে যাই, নারায়ণের ভোগে ভেঙে দেব। বেলা হয়েছে, আমি ভোগ চড়াইগে।"

ছোটঠাকুমা উঠানে পা দিবামাত্র ঠাকুমা তাঁকে আক্রমণ করিলেন, "ও ছুটকি, ক'কুড়ি নারকেল ভাঙ্গলে? ক' চাড়া তক্তি নামল? নারকেল কিন্তু মিঠে মিঠে জ্বালে পাক করতে হয়। দপদপে জ্বাল দিলেই চিত্তির। কয় কুড়ি নারকেলের আজ ছোব্‌ড়া ছাড়ান হয়েছে?"

"কি জানি দিদি, আমি তা জানি না।" বলিয়া ছোটঠাকুমা ত্বরিত পদে চলিয়া গেলেন।

কি কাজে জুড়ান চাকর অন্দরে আসিয়াছিল। ঠাকুমা হাঁক দিলেন, "শোন ত জুড়ান বাবা, আজ কয় কুড়ি নারকেল ভাঙ্গা হ'ল রে?"

জুড়ান হাসিল, "তা মুই ক্যামনে কইবো মা'ঠান? নেড়েল ত আপুনিই গে-ভাঙ্গিছেন?"

"কইবো ক্যামনে কইলেই হ'ল কি না, তুই নারকেলের ছোব্‌ড়া ছাড়াস নি?"

"না মাঠান, আমি লয়, কোড়কা আর মিয়াজান নেড়েল ছুলিছে।"

এ কথার পরে ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তখনই ছুটিলেন বাহিরের মণ্ডপের আঙ্গিনায় ছাড়ান নারিকেলের হিসাব নিকাশ করিতে।

দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গেলে নারায়ণের ভোগের পরে সরস্বতী ও ঠাকুমা খাইতে বসিলেন।

ঠাকুমা নিত্য-নৈমিত্তিক প্রাতঃস্নান করিয়া গুটিকতক

বাতাসা সংযোগে এক ঘটি জল পান করিয়া ভোগশালার আশেপাশে ঘুরঘুর করিয়া ঘুরিতে থাকেন। ভোগ শেষের প্রত্যাশায়। সকালে ও বৈকালে তাঁহাকে কোন কিছু খাইতে দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহার হজম হয় না। তিনি একাহারী।

আমিষ রান্নাও হইয়া গিয়াছিল। হারাণী আসিয়া খবর দিয়া গেল, "ঠাকুরের রাঁধন বাড়ন হইচে, ঠাঁই পিঁড়ি করিচি, বাবুগরে ডাকতি যাইচি। তোমরা এখন আঁধার ঘরে যাও ঠাকুরজিরা।"

ভানুমতী ও মধুমতীকে তখনই আরব্ধ কাজ রাখিয়া উঠিতে হইল। সাধারণতঃ বাড়ীর ঝিয়ারী মেয়েরাই বাপ ও ভাইদের খাবার তদ্বির করিত।

অদ্যকার মতন নারিকেল কোরান শেষ হইয়াছে। বিনু কোরা নারিকেল বাঁটিতেছে। বড় বড় কাঠায় কাঠের চৌকা তক্তায় তক্তি বেলিয়া রাখা হইয়াছে। শুখাইয়া শক্ত হইয়া গেলে ছুরি দিয়া কাটিয়া পাত্রে তুলিয়া রাখা হইবে। এখন নাড়ুর চারা বসিয়াছে উহুনে। নাড়ুতে কড়া পাক দিতে হয়।

এমন সময় ব্যস্ত সমস্ত ভাবে মধুমতী আসিয়া মাকে ডাকিল, "ওদিকে আবার বিষম কাণ্ড বেধেছে মা, ঠাকুমার মুখ থেকে ভাত প'ড়ে কাপড়চোপড় এঁটো হয় গিয়েছিল, ছোট ঠাকুমা তাই বলেছিল ব'লে ঠাকুমা তাকে গাল দিয়েছে 'খায় বাউনি খড়ি ধুয়ে, শোয় বাউনি তুরুক নিয়ে।' এমনিধারা আরও কত কি। ছোট ঠাকুমা কেঁদে কেটে না খেয়ে ডালিম তলায় ব'সে আছে। তুমি শিগগির চল।"

মনোরমা কড়ার পাক করা নারিকেলের রাশি কাঠের গামলায় ঢালিয়া সখেদে কহিলেন, "আমার হয়েচে নানান দিক্ দিয়ে নানান জ্বালা। ভরা দুপুরে আবার কুরুক্ষেত্র বাধলো। তুমি নাড়ুগুলো পাকিয়ে বারকোসে রাখ বৌমা, আমি দেখে আসি।"

তিনি প্রস্থান করিলে বিনু মুখের ঘোমটা তুলিল। নাড়ু পাকাইতে পাকাইতে নারিকেলের মালা গণিতে লাগিল। গণনায় মিলিল পঞ্চাশটা নারিকেলের মালা। আরও যে কত মালা ইহার সহিত যোগ হইবে তাহা কে জানে? এখানে যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ, বিনুর পিত্রালয়েও তেমনি, কিন্তু এত আড়ম্বর, প্রাণান্ত পরিশ্রম সেখানে নাই। জমিদার বাড়ীর সমস্তই যেন বাড়াবাড়ি। ইহার নাম কি তক্তি নাড়ু তৈরী, না নারিকেলের লঙ্কা-কাণ্ড? এক বেলাতেই বিনুর কচি হাত দুইখানি ঝিম ঝিম করিতেছে, হাতের তালু লাল হইয়া ফোস্কা পড়িয়াছে।

ক্ষণেক পরে মনোরমা অপ্রসন্ন মুখে ফিরিয়া আসিলেন। বাকী কাজ সারিতে সারিতে বলিলেন "আমি এসব গোছগাছ ক'রে রাখছি। তুমি খেতে যাও বৌমা, মেয়েরা খেতে বসেছে।"

বধূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে এখন খাইবে না, তাঁহার সঙ্গে খাইবে।

আহারাদির পর ঘণ্টাখানেক কর্ম্মের বিরতি। কামিনীর মা অন্যের অগোচরে বিনুকে উপদেশ দিয়াছে—তাহার শয়ন গৃহের পশ্চিমের বারান্দায় ভেজাচুল শুখাইয়া লইতে। ভেজাচুলে থাকিলে কেবল জটই পাকায় না, গলা ফুলিয়া জ্বর হয়। জ্বরে বার্লি খাইতে বিনুর ভারী ভয়। সে বার্লি খাইতে পারে না।

পশ্চিমের বারান্দা অঙ্গনের দিকে দেয়াল দিয়া আড়াল করা। সামনে দুই ঢেঁকিশালা। ধানভানুনীরা, দুই ঢেঁকিতে ধপর ধপর শব্দে ভোগের আতপ চাউল ভানিতেছে। ঠাকুমা বারান্দায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছিলেন। যাঁহার এত বড় রাজ অট্টালিকা, মূল্যবান্ আসবাবপত্র থরে বিথরে সজ্জিত, তাঁহার ধূলায় শয়ন দেখিয়া বিনু সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি এখানে শুয়েছেন কেন, ঠাকুমা?"

"ভোগের চাল পাহারা দিচ্ছি রে, কেউ না দিলে বাড়ানিরা ঝোল অম্বলে এক করবে। নিয়মের দ্রব্য মহামায়ার ভোগের চাল শুদ্ধ ভাবে বানতে হয়। তাই রয়েছি এখানে প'ড়ে।"

"আমি আপনাকে মাদুর পেতে দিচ্ছি, মাদুরে শুয়ে দেখুন। বারান্দায় বালি কিচ কিচ করছে।"

"তা করুক বুঁচি, এই আমার বেশ। 'বাড়ী না ঘর আমি থাকি ডোয়ার পর'। আমার কাছে একটু স'রে আয় না লো, তোরে একটা কথা কই। ভরা দুপুরে ছোট ঠাকরুণ কি ঢং করল দেখেচিস তো? আমার মুখ থেকে নাকি ভাত পড়েছিল। পড়েছিল, তাতে ওর অত মাথাব্যথা কেন রে? 'যো পেলেই জোলায় বোনে', 'যারে সোয়ামী করে হেলা, তারে রাখালে দ্যায় ঠেলা।' আমার কি তোর মতন দুই পাটি কড়কড়ে দাঁত আছে বাপু? যদি ভাত পড়তে দেখলিই তবে সরির কাছে ফর ফর ক'রে লাগাতে গেলি কেনে? সে শোনালে আমারে পঞ্চ কাহন। লোকে যে কয় 'বসতে জানলে সরে না, কইতে জানলে মরে না'। আমি কইতে জানিই

না, তাইতেই হাড়ির হাল আমার—'দেশে দেশে যার গোলা, ভাতে মরে তার পোলা'। কি এমন মন্দ কথা কইচি যার জন্মে অত তাণ্ডব। কথার মধ্যে কয়েছি 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছে'। তাই শুনে কেঁদে ককিয়ে ছোট ঠাকরুণ ভাসিয়ে দিল। তোর শাশুড়ী যেয়ে ওর গোসা ভাঙিয়ে ভাতের পাতে বসায়। ওর যে কত গুণ তা তো তুই জানিস নে, জানবি ক্যামনে নতুন বৌ? ওই যে বটগাছের গায়ে চুড়োওয়ালা চিলেকোঠা দেখছিস, ওইটে হ'ল গে ওর শ্বশুরবাড়ী, এখন খসে গলে পড়ছে, আগে খুব জাঁকজমক ছিল। কাঁচা বয়েসে বিধবা হলে দেওররা ওকে ফাঁকি দেবার তালে রইল। ও আসত তোর দাদাশ্বশুরের কাছে যুক্তি বুদ্ধি নিতে। কর্ত্তা ছিলেন দশখানা গাঁয়ের মাথা। যাকে যা হুকুম দিতেন সে নিত মাথা পেতে। কর্ত্তার কি রূপ ছিল, আহা মরি! শতেকে অমন সোন্দর একজনাও হয় না। সাক্ষাৎ মহাদেব যেন। যেমন রূপের ছিরি ছাঁদ, তেমনি দান ধ্যান, ধর্ম্মে কর্ম্মে মহা-পুরুষ। সমস্ত দেশের মোড়ল ছিলেন তিনি। দিনরাত হাজার হাজার লোক আসত। তাঁর কাছে নালিশ-মালিশ নিয়ে। তখনকার কালে সকলের থানা পুলিশ ছিলেন তোর দাদাশ্বশুর। তাঁর আবার সখ ছিল ফুল বাগিচার, কত মুল্লুক থেকে ফুলের চারা আনিয়ে বাগান করেছিলেন। বাগানের কি ফুলের শোভা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। ছোট ঠাকরুণ ভোর না হতে নিত্য আসত সাজি নিয়ে পুজোর ফুল নেবার ছুতোয়। আসলে ফুল নয়, কর্ত্তার সাথে শলা পরামর্শের জন্মে। দেখেশুনে একদিন আমি কইলাম, 'ফুল তুলতে আসে বউ, ফুল ত নাতা পাতা, ফুলের নামে খোঁজ নাই তার বঁধুর সাথে কথা।' আমার শোলোকে কর্ত্তা রেগে অস্থির। আমিও ছাড়ার বান্দা নই, শুনিয়ে দিলাম—'অনাদরের ধন নয় কেষ্ট দয়াময়, স্বভাবের দোষে তার অনাদর হয়'।"

সহসা ঠাকুমা থামিয়া গেলেন। তাঁহার চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল। সুদূরে ঠেলিয়া-ফেলা, মুছিয়া-যাওয়া অস্পষ্ট ঝাপসা অতীতের ছবিখানি হৃদয়ের নিভৃতে বারেক উদয় হইয়া পতিহারাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিহ্বল বিমনা করিয়া তুলিল।

আশ্বিনের স্বল্পায়ু বেলা তখন যাই যাই করিতেছে। অপরাহ্নের শ্যামচ্ছায়া সুক্ষ্ম উত্তরীয়ের ন্যায় তরুশিরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। রায়বাড়ীর সিংহদরজার দুই দিকে কর্ত্তার স্বহস্তে রোপিত দুইটি দীঘল দেওদার গাছের মাথায় অস্তগামী সূর্য্যদেব আবীর মাখাইয়া দিয়াছেন। তাহার উর্দ্ধে, আরও উর্দ্ধে জলভরা মেঘ খণ্ড খণ্ড আকারে ভাসিয়া যাইতেছে। বর্ষা বিদায় মাগিলেও হরিণহাটির খাল বিল, গলি জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। গলির দুই পাশে ঘন অরণ্য ও তটভূমি গভীর জলের তল হইতে আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে শরতের উদাম বাতাস ভারাতুর।

মানবজীবনের ভুলভ্রান্তি, স্খলন পতনের জটিল রহস্যের সহিত সরলা বিনুর পরিচয় নাই। ঠাকুরমার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের ভাবার্থ সে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও রায় বংশের অতীতের অধ্যায় তাহার মন্দ লাগিতেছিল না। সে কেশগুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পরে কি হ'ল ঠাকুমা; ছোট ঠাকুমা এবাড়ীতে কবে এলেন?"

ঠাকুমা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বার কতক কাশিয়া ধরাগলা পরিষ্কার করিয়া সুরু করিলেন, "সে ওসবের অনেক পরে। দেওরদের সাথে মামলা ক'রে টাকাকড়ি আদায় ক'রে নিয়ে ওর বাপের বাড়ীর গাঁয়ে নতুন বাড়ীঘর বানিয়ে সেখানে ছিল অনেক কাল। পরমাকে, মহেশকে ওই মানুষ করেছিল। আমি পেটে ধরেছিলাম মাত্তর। আমার ছেলেমেয়ের সত্যিকারের মা হল ছোট ঠাকরুণ। কর্ত্তা স্বর্গে গেলে ও কাশীবাসের জন্মে ক্ষেপে উঠল। মহেশ, পরমা কিছুতেই ছাড়ল না। মহেশ কইল, 'তুমি আমার মা, ছেলে ছেড়ে কোথায় যাবে? আমার কাছে এস। তুমি এতকাল মার কাজ করেছ কাকী, এখন ছেলের কাজ আমাকে করতে দাও। কাশী মহাতীর্থ হলেও বিদেশ বিভুঁই, কে তোমাকে দেখা শোনা করবে? আমি তোমার সন্তান, কাশী গয়া বৃন্দাবন।' এই সব কয়ে ব'লে মহেশ এখানে আনল মন্দোদরীকে। এখন ত দেখছিস? 'যে ব্রতের যেমন ফল, ঘটে দাও ফুল জল'।—"

৯

ঠাকুমার অবিশ্রান্ত বাক্যের ধারা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না বিঘ্নস্বরূপ কামিনীর মা আসিয়া, চাপা-স্বরে বিনুকে তাড়া দিল, "ওনারা ঘাটে গেল গা ধুতে, তুমি চল, এগিয়ে দিয়ে আসি। জলে নেমে আধঘুখান চুলগুলান যেন ফের সপ্‌সপে ক'রে এন না বাপু। গা ধুয়ে ওনাগরে সাথে কামে হাত দাও গে।"

"অনভ্যাসে চন্দনের কৌটায় কপাল চর চর করে" প্রবাদের মত বিনুর শরীর দুর্ব্বল অবসন্ন লাগিতেছিল,

পুকুরে যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু কামিনীর মায়ের কথা সে অমান্য করিতে পারিল না। অজানা অন্ধকার পথযাত্রায় সেই তাহার একমাত্র প্রদীপশিখা।

ঢেঁকিশালার অদূরে পুকুরের রাস্তা। ছোট ঠাকুমা স্কন্ধে গামছা ও হাতে লোটা লইয়া গা ধুইতে যাইতেছিলেন।

ঠাকুমা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অস্থির হইয়া সকরুণ কণ্ঠে মিনতি করিতে লাগিলেন, "ও ছোট, মহেশের কাকী, এধারে একটু এগিয়ে আয় দিদি। একটা কথা শুনে যা।"

অনিচ্ছায় ছোট ঠাকুমা তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার মুখ আষাঢ়ের মেঘতুল্য থম থম করিতেছে, চোখের পাতা ঈষৎ স্ফীত।

ঠাকুমা খপ্ করিয়া ছোট ঠাকুমার একখানা বাহু চাপিয়া ধরিয়া কাছে বসাইলেন। স্নেহে করুণায় বিগলিত হইয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন—

"সারাদিন শতেক ঠ্যালা-ঠেলে, আবার এক্ষুণি চললি আর এক ঠ্যালা-ঠেলতে? খেটে খেটে পরাণটা দিবি নাকি, ছুটু? এখন গা ধুতে হবে না। যা, একটু শুয়ে জিরিয়ে নে গে। যাদের করনা তারা করুক; তোর কিসের দায়? আমার যদি কাম না ক'রে দিন যায়, তোরই বা যাবে না কেনে? আমি যেমন মহেশের মা, তুইও তেমনি তার ছোটমা।"

"তুমি অশক্ত দিদি, আমি এখনও শক্ত আছি। যা সাধ্যি ক'রে ক'র্ম্মে ভবসিন্ধু পার হয়ে যাই। তোমার সার্থে কি আমার মিল থাকতে পারে, 'কিসে আর কিসে'?"

"হ্যাঁ, 'ধানে আর তুষে' না রে তা নয়। আমি যেমন তুইও তেমনি। দুপুরে আমি কি কইতে তোরে কি কয়েছিলাম তাতে রাগ করেছিস? আমার কথায় কেউ রাগ করে নাকি? 'পাগলে কি না কয়, ছাগলে কি না খায়।' তুই আছিস ব'লেই না আজও আমার পরাণটা বার হয়ে যায় নি? মায়ের মতন যতন করে রেঁধে বেড়ে খেতে দিস। বৌ ঘরে এলে ছেলে পর হয়ে যায়, জামাই এলে মেয়ে পর হয়ে যায়। আমার আপনজন তুই ছাড়া কে আছে ছুটু? তাই কইচি—'অভাগীর লগনে চাঁদ নাই গগনে'।"

ঠাকুমা চোখে অঞ্চল দিলেন।

ছোট-ঠাকুমা এবার বিচলিত হইলেন, "ষাট, কেউ নেই ওকথা বলতে নেই দিদি, তোমারই ত সর্ব্বিস্বি। নিজে কিছুই নিতে শেখো নি, অন্যের দোষ কি? আমি তোমার কথায় রাগ করি নি, এখন হ'ল ত?"

ঠাকুমা চোখ মুছিয়া ফিক্ করিয়া হাসিলেন, "যা কইলি ছুটু, সত্যি কথা। একদিন তোরে আমি কয়েছিলাম 'নিম তিতা, গিমা তিতা, আর তিতা ঘর, তার চেয়ে বেশী তিতা দুই সতীনের ঘর।' এখন আমার সে কথা আমি ফিরিয়ে নিচি। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। যে মনিষ্যি পাওনা-গণ্ডা নিতে পারে না তারে সকলেই হেনেস্তা করে। শোন্ ছুটু, আর এক কথা—তোর পরেমেশ্বরী পূজোয় আসতে পারবে না?"

"তাই শুনলাম দিদি, তার ছেলে বৌরা ষষ্ঠীতে বাড়ী আসবে।"

"এ আবার কেমন ধারা বিধান রে? মা'র ছানা বছরকার দিনে মার কাছে আসবে না? এখানে কি পরমার ব্যাটা-বৌ, নাতি-পুতিদের থাকার জায়গা নেই? না, ভাত নেই? আমি সকালে মহেশকে কইতে গিয়েছিলাম, 'পরমার শ্বশুরবাড়ী ত দূরে নয়, নায়ে যাওয়া, নায়ে আসা, কতটুকু পথ। লিখন দিয়ে লোক না পাঠিয়ে ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে দাও। ভাল মতে আদর না করলে জামাই কুটুম আসতে দেবে কেনে?' মহেশ তখন কাছারীতে পেজা-পত্তর নিয়ে বিচার আচার করছিল, আমার কথায় কটমট ক'রে তাকিয়ে হুকুম দিল, 'তুমি ভেতরে যাও, মা।' কি করব, লজ্জায় খুন খুন হয়ে চ'লে এলাম। যুগ্যি ব্যাটার চোপার পরে কি চোপা নাড়তে পারি? আমার হইচে 'ছা-কর্ত্তা বৌ-গিন্নী, সংসারে উজাড়ের চিহ্নি'।"

"এতই যদি জান দিদি, তা হলে রাতদিন বক্ বক্ ক'রে মর কেনে?"

"যা কইলি ছুটু, 'স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে'।"

এদিকে যখন দুই জায়ের সুখ-দুঃখের আলাপ আলোচনা চলিতেছিল তখন ওদিকের কর্ম্মশালায় কর্ম্মের রণডঙ্কা বাজিতেছিল।

সারি সারি তক্তায় নারিকেল তক্তি বেলিয়া দাগ কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। এইবার সেগুলিকে মাটির পাকা চ্যাপ্টা হাঁড়িতে থাকে থাকে সাজাইয়া তোলা হইল।

সরস্বতী গোছগাছের কাজের ওস্তাদ, তাহার কর্ম-কুশলতা, নৈপুণ্য পরিপাটি। সে খড়ি দিয়া প্রত্যেকটা হাঁড়ির গায়ে বাঁকা চোরা অক্ষরে লিখিয়া রাখিল পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী। তিনদিনের নারিকেলের জলপানি হইয়াছে। এখন বাকী রহিল পরের কয়েক দিনের।

দিনকে রাত, রাতকে দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ইঁহারা নারিকেল পর্ব্ব মিটাইয়া রাখিতে অপারক নহেন, কিন্তু তক্তি নাড়ু বেশী দিন ঘরে রাখা যায় না, গন্ধ হইয়া যায়।

প্রায় সারাটা দিন মনোরমা অগ্নির উত্তাপে প্রায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। সরস্বতী অম্বলের রোগী, আগুনের তাপ সহ্য হয় না। মধুমতী ফর্ ফর্ করিয়া হাল্কা কাজ করিতে ভালবাসে। ধরা-বাঁধার মধ্যে সহজে আবদ্ধ হইতে চায় না। ভানুমতী কোন কিছুতে পশ্চাৎপদ নহে। যেমন মুখের দাপট, তেমনি হাত-পায়ের প্রলয় নৃত্য। তাহার সপ্তম স্বর এ বেলা একেবারে খাদে নামিয়াছে। ভানুমতীর স্বামী হেমন্তের চিঠি আসিয়াছে, সে আগামী-কাল এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। হেমন্ত কলিকাতায় ডাক্তারী পড়ে।

মনোরমা দুধের উহুনে কাঠ ঠেলিয়া দিতেই ভানুমতী বলিল, "দুধ জ্বাল আমি দিচ্ছি মা, তুমি স'রে এস।"

দুধ জ্বাল দেওয়া মানে মণখানেক দুধ মারিয়া ক্ষীর করা। পল্লীগ্রামে প্রভাতে বাজার, বৈকালে দুধ মেলান কঠিন। যাহাদের গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী আছে তাহাদের ব্যবস্থা পৃথক্। যদিও রায়বাড়ীতে এক গোয়াল গরু, তবু ক্ষীর, সর, ছানা, ননী তৈরি করিতে তাহাতে কুলায় না।

একমুণী লোহার কড়ায় দ্বিপ্রহরে দুধ জ্বাল দিয়া উহুনের উপরে রাখা হয়। মৃদু কাঠের আঁচে সেই দুধ অল্প অল্প শুখাইয়া যায়। তার উপরে পড়ে মোটা চাদরের মতন একখানা শক্ত সর। সেই সর দিয়া প্রস্তুত হয় সরের পাটিসাপটা, সরভাজা, সরের নাড়ু ইত্যাদি।

অকর্ম্মা অলস প্রকৃতি বিনুর মধ্যে আজ সহসা সজাগ হইয়াছিল কর্ম্মপ্রবৃত্তি। সে উৎসাহ ভরে শাশুড়ীকে উহুনের পাড় হইতে উঠাইয়া দিয়া নিজে বসিয়া গেল দুধ জ্বাল দিতে।

মনোরমা বলিলেন, "এত দুধ তুমি কি ক্ষীর করতে পারবে? ভাল ক'রে না নাড়লে নিচে ধ'রে যাবে।"

ভানুমতী বলিল, "পারবে না কেন মা? ওকে সব ত শিখে নিতে হবে? তুমি দইয়ের দুধ, চায়ের দুধ, সুমন্তর পাতলা দুধ ভাগে ভাগে তুলে দাও। ও ব'সে নাড়তে থাকুক।" তাহাই হইল। বাটিতে বাটিতে দুধ হাতা কাটিয়া তোলার পরে মনোরমা বধূকে আদেশ করিলেন, "বেঞ্চির ওপরে বয়ামে দোবরা চিনি রয়েছে। বড় কৌটোর বাটির এক বাটি চিনি এনে দুধে ঢেলে দাও। দুধ ঘন হয়ে এসেছে, এখন ভাল ক'রে নাড়তে হবে।"

বিনু হাতা দিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া দুধ নাড়িতে লাগিল। কিন্তু এ কি? সমস্ত দুধ ছানা হইয়া দলা পাকাইয়া যাইতেছে কেন?

মধুমতী ছোট ভাই-এর দুধ লইতে আসিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কড়াভরা দুধ যে ছানা কেটে গেল, মা?"

মার সঙ্গে ভানুমতী ছুটিয়া আসিল, "তাই ত, দলা দলা ছানা কেটেছে। কি পড়ল দুধে? চিনির সাথে কোন টোকো জিনিষ ছিল নাকি? বড় বয়ামের চিনিই কি তুমি দুধে দিয়েছিলে?"

চিনি দিবার নির্দ্দেশের সময় গৃহিণী বড় বয়ামের উল্লেখ করেন নাই। বিনু কম্পিত অঙ্গুলি তুলিয়া বড় ননদকে ছোট বয়াম দেখাইয়া দিল।

শান্ত স্তব্ধ গম্ভীর জলাশয়ের বক্ষে বিরাট্ ঢিল নিক্ষিপ্ত হইল। চঞ্চল জলরাশি যেন উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভানুমতী ঝঙ্কার দিল, "বৌ চিনির বদলে দুধে সুজি দিয়েছে।"

মা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন—"সুজি-চিনি তাও চেনে না দেখছি। যেমন ঘর, তেমনি মেয়ে। জন্মে যে ঘন দুধের স্বাদ পায় নি, সুজি চোখে দেখে নি, আমি কেন মরতে তার হাতে দুধ ছেড়ে দিয়েছিলাম? এখন কি করব? এক বাটি দুধ না হলে আর একজনার যে রাতের খাওয়াই হবে না।"

সরস্বতী চীৎকার করিতে লাগিল, "সৃষ্টি এঁটো কাটায় একাকার হ'ল। উহুনের চারদিকের জিনিষপত্র নষ্ট হয়ে গেল। মার যেমন আক্কেল 'ভালুকের হাতে খন্তা' দিয়েছিল। এবার ঠেলা সামলাক। নিয়মের কাজ কি জন্তু-জানোয়ার দিয়ে হয়? কি কেলেঙ্কারী, কি ঘেন্না!"

রজনী প্রভাতে হেমন্ত আসিতেছে, তাই ভানুমতীর হৃদয়ে বসন্তের দক্ষিণা-বাতাস বহিতেছিল। সে শান্ত স্নিগ্ধ হইয়াছে। মেজ বোনকে ধমক দিল, "চেঁচাস নে সরি, যা দৈবাৎ হয়ে গেছে চেঁচালে তা সারবে না। উহুনের গায়ের সাথে লাগান ত কিছুই নেই। লাগান না থাকলে এঁটো হবে কেন? নারায়ণের ইচ্ছে হয়েছিল সুজির পায়েস বৈকালীতে খাবার। তাই অঘটন ঘটিয়েছেন। দে মুঠো কত কিস্‌মিস্ ফেলে, ক'খানা তেজপাতা ফেলে। ছোট এলাচের গুঁড়ো, কর্পূরের শিশি আন।"

"কাঁচা সুজির আবার পায়েস, না পুলি পিঠের কাই! ওতে আবার ভালমন্দ মসলা-পাতি? আমি বাপু এঁটো কাঁটার ভেতরে এগোতে পারব না। যা নেবার তুমি নাও গে। পায়েসের আহ্লাদে যে আটখানা হচ্ছ, বাবার

দুধের কি হবে? এক বাটি ঘন দুধ না হলে তাঁর যে খাওয়াই হবে না?"

"কাজলীকে দুইতে গেছে, সেই দুধ আর হাতা-কত দইয়ের দুধের থেকে দিলেই বাবার হয়ে যাবে।"

মনোরমা ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "ওঁর যেন হ'ল, কিন্তু সরির হবে কি? দুধ খোয়া ক'রে না দিলে ওর যে পেটে সয় না? উনি পায়েস খাবেন, দুধ কম হলেও চলবে, কিন্তু সরি ত দুপুরের ভাতের পাত ভিন্ন পায়েস খেতে পারবে না? দই-এর দুধ কমালে কাল আবার দই সকলের পাতে ঘুরবে কেমন ক'রে?"

ভানুমতী কহিল, "কাল দুপুরের জন্যে বড় দুই হাঁড়ি দই-এর ফরমাইস দিয়ে এক্ষুণি গয়লা পাড়ায় লোক পাঠিয়ে দাও মা। অনেক দিন গয়লার খাসা দই খাই না। তোমার দইয়ের পেটে যে দুধ রয়েছে তাতে বাবার ওসরির হয়ে বেঁচে যাবে?"

মধুমতী হাসিয়া অস্থির, "কালকে হঠাৎ তোমার খাসা দই খাবার সখ হ'ল কেন, বড়দি? ওর মানে আমরা বুঝি।"

ভানুমতী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে ক্ষীণ প্রতিবাদ করিল।

দুই ভগিনীর হাস্যকৌতুক বিনু উপভোগ করিতে পারিল না। এক কড়া দুধে এক বাটি সুজি দিয়া সে যে পাপ করিয়াছিল তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে গায়ের জোরে হাতা চালাইতেছিল। তাহার এত পরিশ্রমের মধ্যে দুঃখের সীমা ছিল না। স্বল্পালোকে সে সুজি চিনি লক্ষ্য না করিয়া সত্যই অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু যাহারা দোবরা চিনির পাশে সুজি রাখিয়া দেয় তাহারা কেমন গৃহিণী? বড় বয়ামের উল্লেখ না করিয়া 'বয়াম হইতে আন' বলার মধ্যে কি ত্রুটি ছিল না? সে কি উদয়-অস্ত এখানে খুট খুট করিয়া সমস্ত দ্রব্য মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে? সুজি, চিনি, ঘন দুধ ইহারা ভিন্ন আর যেন কেহ চোখে দেখে নাই, খায় নাই। যত খাওয়া ইহারাই যেন খাইতে জানে। ইহাদের মত তাহাদের তালুক-মুলুক নাই বটে, কিন্তু তাহারা তাহাদের শ্রমের অন্ন বিলাইতে কখনও কাতর হয় না। এ অঞ্চলের একমাত্র ষ্টীমার-ঘাট তাহাদের গ্রামে, হীরাসাগর নদীর তটে। কত দূরদূরান্ত হইতে ষ্টীমারের যাত্রীর দল আসে যায়, তাহারা অতিথি হয় তাহাদের গৃহে। সেখানকার সকলে যাত্রীদিগকে কত আদরযত্ন করিয়া আশ্রয় দেয় গৃহে। কত প্রকার রান্না হয়, পাতা পড়ে সারি সারি।

সেখানে যেন দুধের অভাব! লালমণি, ধলামণি, আদরিণী, সোহাগিনী চারটি গাভী কলসী ভরিয়া দুধ দেয়, সে দুধের যেমন স্বাদ তেমনি সুঘ্রাণ। এখানকার দুধের মত ঘাস ঘাস গন্ধ, টল্‌টলে নয়।

ক্রমশঃ

—০—

পুনর্ভ্রাম্যমাণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভারতবর্ষে ভগবানের জন্যে মানুষ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গৃহ পরিজন ছেড়েছে অগুন্তিবার। সাধু-সন্ত মুনি-ঋষি যোগী যতি অবধূত কাপালিক শৈব শাক্ত বৈষ্ণব—আরও কত সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মপন্থী সংসার ছেড়ে বৈরাগী হয়েছে, অচিনের টানে অদেখার অভিসারে চলতে চেয়ে। কিন্তু মীরার সর্বস্ব ছাড়ার মধ্যে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রোমান্স আছে। পর্দানশীন মহারাণী। তিনশ' দাসী ছিল তাঁর। থাকতেন বিশাল অট্টালিকায় অসূর্যম্পশ্যা সুন্দরী সুরকন্যা। এ হেন মহীয়সী সব ছেড়ে হ'লেন কি না পথের ভিখারিণী চীরধারিণী! তাঁকে দেবর ও ননদ দিল বিষ, সে-বিষে তাঁর প্রাণ ছুটে গেল না, ছুটে গেল শুধু সংসার-বন্ধন—লোকলজ্জা কুলমর্যাদা কলঙ্কের ভয়। তিনি গাইলেন সোচ্ছ্বাসে:

সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঈ
অব তো বাত ফৈল গঈ জানৈ সব কোঈ।

সাধুদের সঙ্গ ক'রে লোকলজ্জা খুইয়েছে—সবাই জেনেছে মীরা কলঙ্কিনী, আর কিসের ভয়?

কিন্তু কেন তিনি ছাড়লেন এ-বিলাস, ধুমধাম—কেন গাইলেন:

মেরে তো গিরিধর গোপাল দূসরো না কোঈ
মাতা ছোড়ী পিতা ছোড়ে ছোড়ে সগে সোঈ।

গোপালকে বরণ করার ফলে মাতা পিতা ভাই সব হারালাম। কেন হারালেন? না,

সন্ত সদা সীস পর নাম হৃদে হোঈ
দাসী মীরা লাল শ্যাম হোনী থী সো হোঈ।

সাধুকে রাখলাম মাথায়, হরিনামকে হৃদয়ে—মনে হ'লাম শ্যামের দাসী, তিনি হলেন আমার নাথ—এই-ই যে মীরার নিয়তি।

কিন্তু এ হেন একনাথকে বরণের পর লাভ কী হ'ল? না, কাঁটাপথ—আর অন্ধকার। দুঃখকষ্ট অনশন নিরাশ্রয় পদযাত্রা ভিক্ষা। শুধু তাই নয়, যার জন্যে সব ছেড়েছেন সেই গিরধর নাগরও হলেন অদৃশ্য। তখন শুধু কোথা কৃষ্ণ, কোথা নাথ ব'লে কান্না:

প্যারে দরসন দীজো আয়!
তুম বিন রহো ন জায়।

জল বিন কমল, চন্দ বিন রজনী,
ঐসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী,
আকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈন দিন
বিরহ কলেজো খায়।
মীরা দাসী জনম জনমকী পড়ী তুমহারে পায়।

এ কি দিব্য প্রেমোন্মাদ—সর্বজনপূজ্যা মহারাণীর প্রেমাদর্বাণী হওয়া—শুধু পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়ানো
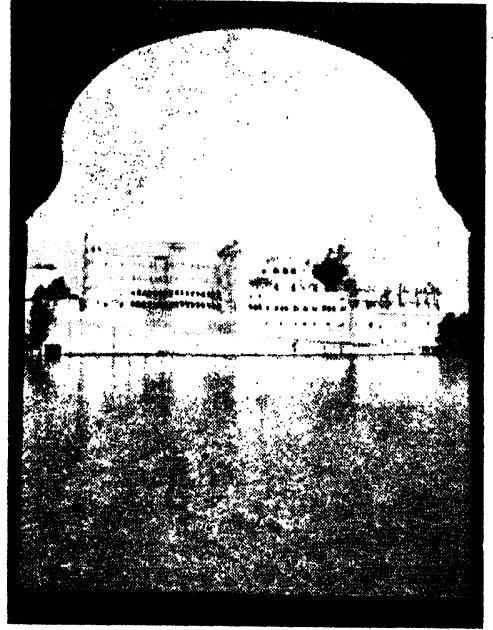
উদয়পুর প্রাসাদ

প্রিয়তমের দর্শনের পিপাসায়! এ রোমান্সের কি তুলনা আছে? না, শুধু কান্নাই নয়, সেই কান্নার প্রকাশ তাঁর অবিস্মরণীয় বিরহের গীতাঞ্জলিতে:

তুমার কারণ সব সুখ ছোড়্যা অব মোহে কূঁ তরসাও?
বিরহ বিথা লাগী ঔর অন্দর সো প্রভু আয় বুঝাও।

মীরার হ্রদ-মন্দির—উদয়পুর

অব ছোড়ো নহি বনে প্রভুজি চরণকে পাস বুলাও
মীরা দাসী জনম জনমকী অঙ্গসে অঙ্গ লগাও।

এহেন অপরূপার আবেশ বুঝি জড়িয়ে আছে উদয়পুরে—সর্বত্রই যেন তাঁর স্মৃতি। মহারাণার বিরাট্ প্রাসাদে পূজারী দেখাল মীরার সোনার গোপালকে, বলল, এই বিগ্রহই তিনি পূজা করতেন তাই হ্রদমন্দির থেকে এখানে আনা হয়েছে—রোজ তাঁর পূজারতি হয় এখনও। এই বিরাট্ প্রাসাদের অন্দরমহলেই ত তিনি থাকতেন দাস-দাসী সহচরী নিয়ে। পরে এককথায় সব ছেড়ে রাণী হলেন প্রেমদিবানী—প্রেমের ভিখারিণী, গোপালের সেবাদাসী। পথে পথে গেয়ে বেড়ালেন তাঁর অবিস্মরণীয় গান—সে কত গান, বিরহমিলন ব্যথায় ভরা, প্রেমের আকুলতায় উদ্বেল। শুধু বিলাসকে বিদায় দেওয়াই ত নয়, সুনামকে বিসর্জন দিয়ে কুলত্যাগিনী উপাধি বরণ করা, অসূর্যম্পশ্যা রাণীর দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে গান গেয়ে বেড়ান,—কোথায় গোপাল, দেখা দাও, দাও রাঙা পায়ে ঠাঁই :

অঁসু অন জল সীঁচ সীচ প্রেম বেল বোঈ
মীরা প্রভু লগন লগী হোনী হী সো হোঈ।

এই ছিল তাঁর নিয়তি- রাণীর হওয়া পথের ভিখারিণী, বিলাসিনীর হওয়া চীরধারিণী। এ-রোমান্সের কি জুড়ি আছে কোথাও এ-জগতে? বলতে পারা—

তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোঈ
মেরে গিরধর গোপাল দুসরো ন কোঈ।

শুধু তুমি প্রভু, শুধু তুমি—আর কেউ নয়, শুধু তুমি।

মীরা কহে : লগন লগী ঐসী যে ন টুটে
রূঠে না গোপালজী তু জগ রহে যা ছুটে।

তুমি এমন প্রেম দিলে প্রভু, যার বাঁধন কখনও ছিন্ন হবার নয়—জগৎ যায় যাক্, শুধু তুমি মুখ ফিরিয়ো না গোপাল!

শেষদিনের আগের দিন সকালে গেলাম সবাই মিলে সাত আট মাইল দূরে আর একটি হ্রদতটে। এ যে হ্রদের প্রাসাদের দেশ—এখানে ওখানে সেখানে গিরিমালার মাঝে হ্রদ ও প্রাসাদ। এ-হ্রদটির ঠিক উপরেই ফের একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ। শুনলাম, রাণা প্রতাপ সিংহ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতেন। এখানে প্রতাপ সিংহেরও কত যে স্মৃতিচিহ্ন! সব কিছুর সঙ্গেই তাঁর স্মৃতি জড়াতে ভালবাসে এরা মনে হ'ল। তাই ঠিক বিশ্বাস হ'ল না, এত দূরে নির্জন বনস্থলীতে তিনি এসে থাকতেন মাঝে মাঝে। কারণ, এ প্রাসাদটির কাছাকাছিও
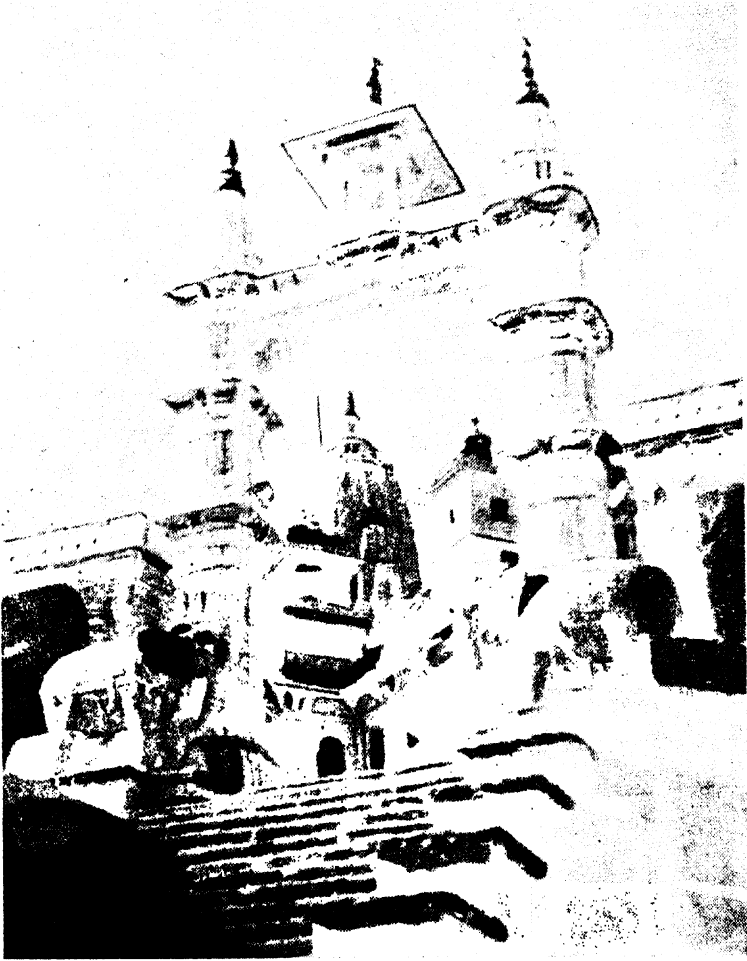
মীরাবাঈয়ের মন্দির—অম্বর—রাজস্থান

কোন বাড়ী কি কুটির নেই। অথচ কি সুন্দর পরিবেশ! শৈলমালা পাহারা দিচ্ছে চারদিকেই—ধূসর সন্ন্যাসী প্রহরী। সামনেই নীল হ্রদ। যোগী তপস্বীর ধ্যানের স্থান।

বললাম ইন্দিরাকে: "আমি যদি রাজা হতাম ত এখানে একটি মঠ বসাতাম। যোগী তপস্বীরা এসে থাকতেন এখানে ইচ্ছামত।"

এ যুগ নৈঃশব্দ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাই হয়ত এ মৌন বিজন প্রাসাদটির পরিবেশ এত ভালো লাগল। মনে হ'ল, কে জানে, হয়ত মহারাণী মীরা মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন—হয়ত তাঁরই ইচ্ছায় এ-প্রাসাদটি ভোজরাজ নির্মাণ করেছিলেন এহেন নির্জন বনস্থলীতে। সেদিন সন্ধ্যায় উদয় সাগরের ধার দিয়ে তিন মাইল পরিক্রমা করতে করতেও এই কথাই মনে হচ্ছিল অস্তসূর্যের রাঙা আলোয়।

এক-একটা সন্ধ্যা হঠাৎ এসে দেখা দেয় অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে। জয়পুর ও উদয়পুরে রোজই গান করার সূত্রে লোকের ভিড় জমত সকাল-সন্ধ্যা। উদয়পুর থেকে বিদায় নেওয়ার আগের দিনে গোধূলি লগ্নে হঠাৎ এ

আশ্চর্য নির্জনতার ভাব হয়ত তাই এত অভিভূত করেছিল ইন্দিরা আর আমাকে। আকাশে গলা সোনার দীপ্তি ঝলমল করছে। স্তরে স্তরে টানা মেঘের মুখে সেই অপরূপ আভা...হ্রদের জলে সাঁতার দিয়ে চলেছে হাজারো সোনার ঝালর। এক সার পাখী উড়ে যায়... দেখতে দেখতে মনে হয়, দূর দিগন্তে যেন একটি উড়ন্ত সাপ উধাও হয়েছে হেলে দুলে। এক-আধজন স্নানার্থী স্নান করছে। মন উদাস হয়ে যায়...কে জানে, এখানে হয়ত মহারাণী মীরা ভোরবেলা বেড়াতে আসতেন। তিনি ত পর্দা মানতেন না? ছিলেন স্বভাববিদ্রোহিণী। অন্তত: কল্পনা করতেও ভাল লাগে। লাগবে না-ই বা কেন? যাঁকে ভক্তি ক'রে এসেছি আকৈশোর—যাঁর গান আজ ভারতবর্ষে দীনদুঃখীর মুখেও শোনা যায়—(আজমীড়ে ট্রেনে বিনোবা ভাবের শিষ্যরাও একদিন গাইছিল তাঁর বিখ্যাত "চাকর রাখো জি") সেই মহীয়সী যোগিনী কবি, ভিখারিণী রাজকন্যার সঙ্গে এ-উদাস মধুর দুঃখের যোগ কল্পনা ক'রেও মন ওঠে আর্দ্র হয়ে। মনে হয়—কিসে থেকে কি হয় জীবনে কেউ কি জানে? রাজবালা মীরা শৈশবে গুরু সনাতনের কাছে পেয়েছিলেন একটি কৃষ্ণবিগ্রহ। বিবাহ হ'ল তাঁর মহারাণা ভোজ-রাজের সঙ্গে। ভোজরাজ তাঁকে ভালবাসতেন কিন্তু বুঝতে পারেন নি—যে কাহিনী লিখেছি আমি আমার "ভিখারিণী রাজকন্যা" নাটকে। ভোজরাজ যুদ্ধে নিহত হওয়ার পরে মীরা মন্দিরে গোপালের পূজায় আরও উজিয়ে উঠলেন, সুরু করলেন নাচ গান: "ময় গিরধর আগে নাচুঙ্গি"। যোগী যতি সাধু সন্তদের সঙ্গে মেলামেশা সুরু করলেন। কলঙ্কিনী নাম রটল। ননদ উদাবাঈ ও দেবর বিক্রম সিং তাঁকে বিষ দিল শাস্তি দিতে। সে বিষ তিনি পান করতে না করতে গোপালের বিগ্রহ হয়ে উঠল নীল—বিক্রম উদাবাঈ ভয়ে কম্পমান। মীরার প্রাণরক্ষা ক'রে গোপাল বললেন: "আর নয় এখানে, যাও এক কাপড়ে বেরিয়ে বৃন্দাবনে, তোমার গুরু সনাতনের কাছে।" মীরা তথাস্তু ব'লে করলেন বৃন্দাবন পদযাত্রা—"কুঞ্জ গলী বন প্রেমদিবানী গোবিন্দ গোবিন্দ গাউঁ"—গেয়ে কেঁদে কেঁদে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে করতে। কেউ তাঁকে রুখল না—মুরলীধরের অভি-সারিকার পথ আগলে দাঁড়ায় কার সাধ্য?

আজ সখী, ফির কহাঁসে আঈ নূপুরকী ঝনকার?
হরি মিলনকো চলী হৈ মীরা, কোই ন রোকনহার।
আজ সখী ভেসে আসে কোথা হ'তে নূপুরের ঝঙ্কার?
হরির মিলনে বাহিরায় মীরা—কে রুধিবে পথ তার?

নিয়তিকে বাধা দেয় কে? মীরাকে যে যেতেই হবে আজ:

গিরিধরকে ঘর জাউঁ সখী, ময় মোহনকে ঘর জাউঙ্গি।
বো তো মেরো সাঁচো প্রীতম উন বিন ঔর ন চাহূঙ্গি॥
গিরিধারী মনোমোহনের ঘরে যাব সখী অভিসারে।
চাই না সে বিনা আর কারে, জানি প্রিয়তম শুধু তারে।

পথদিশা দেবে কে? বাহন কোথায়? না,
ভব সাগরমে জীবন নৈয়া, প্রেম বনে পতবার,
পিয়ামিলনকো চলী বাবরী স্থখে আর ন পার।
এ-ভবসাগরে জীবন তরণী প্রেমই কর্ণধার,
প্রিয়ের মিলন-পাগলিনী আমি চাই না কারেও আর।
কাঁটাবনে অভিসার? পায়ে রক্ত ঝরবে? বেশ ত:
চুভতে কাঁটে লাল রঙ্গুঙ্গি, পথমে দুঙ্গি বিখার
দেখকে কোঈ প্রেম পুজারী রাহ পায়ে কিসিবার
আপ চলে আয়ে পী মিলনে—ঐসী প্রীত লগাউঙ্গি।
গিরিধরকে ঘর জাউঁ সখী, ময় মোহনকে ঘর জাউঙ্গি।
বিঁধিলে কাঁটা সে রক্তে আঁকিব পায়ের ছাপ আমার,
দেখি যারে পরে প্রেমের পান্থ দিশা পাবে পথে তার।
বেসে ভালো তারে আনিব টানিয়া, আড়াল
মানিব না রে!
গিরিধারী মনোমোহনের ঘরে যাব সখী অভিসারে।

কলঙ্ক? সে তো পুরস্কার:
মিলো কলঙ্কসো ঝুমর বনয়ো মাথেকা সিঙ্গার,
মোহকি বেড়ী ঝাঁঝর হো, বজি নূপুর কী ঝঙ্কার।
কলঙ্ক হ'ল সিঁথির সিঁদুর, মাথার মণি শোভার,
মোহশৃঙ্খলও হ'ল কিঙ্কিণী, পায়ে পায়ে ঝঙ্কার।

এমনি কত মীরাভজনেরই চরণ যে ভেসে আসে অস্তরাগের রাঙা আলোয়! লিখলাম সোচ্ছ্বাসে—"মীরা অবিস্মরণীয়া"র অভিসারের কাহিনী—যার জুড়ি নেই কোনো দেশের ইতিহাসেই:

কোন্ সে অচিন টানে কুল-ভয়
ধন জন মান দিয়ে বিদায়
গেয়েছিলে গান, প্রেমের চারণী,
চেয়ে ঠাঁই তারি চরণছায়.
যে তোমারে গৃহহারা ক'রে গেল
মিলায়ে বারিদে বিজলি সম?
কোন্ সে অপার অশ্রুব্যথায়
ডেকেছিলে তারে: "হে প্রিয়তম!
শুধু তোমারেই জেনেছি আপন;
তোমারি স্বপন জপিয়া প্রাণে
এ-জগৎ মনে হয় স্বপনের
মায়া-মরীচিকা সাঁঝবিহানে।"

মীরার প্রাসাদ—উদয়পুর

অপরূপ হ্রদবক্ষে যে-বালা
মণি-মন্দিরে পূজিত নিতি
ইষ্ট গোপাল বিগ্রহে—শুধু
তারে বরি' হৃদয়েশ অতিথি.
সে-অতুল নিকেতনে প্রাঙ্গণে
সখীদের নিয়ে গোলাপজলে
স্নানলীলা যার নিত্যবিলাস
ছিল উল্লাস রংমহলে ;
প্রজাবন্দিতা রাজবাঞ্ছিতা
হ'ত যে উছলা সুখনিলয়ে
আরাবল্লীর শৈল চূড়ায়
দিনমণি নিশানাথ-উদয়ে ;
মেবারের সেই মহীয়সী রূপে
ইন্দিরা, গুণে সরস্বতী,
আলোপদ্মিনী কবিতামালিনী
গানে কিন্নরী ভাগ্যবতী—
কেমনে সে-পতিসোহাগিনী হয়ে
প্রেমপাগলিনী গাহিল : "আমি
দাসী গোপালেরি শুধু—তারি পায়
দিয়েছি এ-তনুমন প্রণামী ;
সে আমার পানে হাসিলে ফুটিব
গরবিনী তার চরণতলে :
না বাসিলে তবু তারি তরে গান
বাঁধিব, গাহিব নয়নজলে।
তার সাথে নয় আঁখি-বিনিময়
এক জীবনের—তাহারি সুরে
প্রতি বুকে রাধাহিয়া হয়ে আমি সাধি
তারে তারি বাঁশী নুপুরে।"
আমরা অন্ধ, পড়ি বাঁধা হায়
কত কামনায় ! একটু সাড়া
দিয়ে মুরলীর ডাকে ফিরে চাই,
পুছি—করিবে কি সে ঘরছাড়া
অচিনের অভিসারে "আয় আয়"
মধুমূর্ছনে আকুল স্বরে ?
যদি সংসার প্রিয়পরিজন
হারাই—কী হবে তাহার পরে ?—
চকিতেও ভয়ে কেঁপে উঠি, তাই
একটু উছসি' অকূল তানে
বলি : "সাবধান ! সোনার হরিণ
ভ্রান্তিরঙিন—পান্থ জানে।"

তুমি হে মহিমময়ী, একবার
ক্ষণতরেও ত কর নি ভয়—
যার তরে সব ছেড়েছিলে তার
পাবে কি প্রসাদ ? হবে কি জয় ?
একটি ভাবের ভাবী ছিলে দেবী !
একটি চিন্তা অনুক্ষণ :
চিন্তামণির দরশন—শুধু
তারি তরে করে মন কেমন !
গাহিলে : "জনমে মরণে আমার যি
সে-ই পিতা মাতা বন্ধু স্বামী ;
জানি না—সে ভালোবাসে কি না, শুধু
জানি—তারে ভালোবেসেছি আমি।
সে বিনা আমার আপন বলিতে
নাই ত্রিভুবনে কেহ গো আর :
সে আমারে দেখা না দিলেও র'ব
পথ চেয়ে যুগ যুগ তাহার—
কোনো একদিন লবে সে চরণে
টেনে, সে-লগনে হবে আমার
জীবন সফল, জনম সফল—
প্রতি রোম নাম গাহিবে তার।"

রাজার দুলালী ঘরণীর মুখে
কেমনে রটিল এ কীর্তন ?
সম্পদের হে আদরিণী, হলে
কেমনে পলকে অকিঞ্চন ?
কেমনে ঘটিল হেন অঘটন ?
প্রসাদ যাহার বহু সাধনে
যোগী কবি মুনি ধনী জ্ঞানী গুণী
পায় না, শুনিলে বালা কেমনে
দেববাঞ্ছিত বাঁশী-সুর তার ?
ঋষিবন্দিত চরণে তার
কেমনে'লভিলে আশ্রয়—গেয়ে :
তুমি বিনা নাই কেহ আমার,
ধ্যান গান তপ ভজন পূজন
জানি না ত, শুধু নাম গোপাল,
জানি—তোমা বিনা নাই গতি, জানি—
আমি দীনা, তুমি দীনদয়াল।
(উদয়পুরে মীরার প্রাসাদ,মন্দির ও গোপালবিগ্রহ দেখে)
নভেম্বর, ১৯৬২।

—•—

সংস্কৃতের আবার অন্য নাম দেবভাষা। দেবতার ভাষা যাহা, তাহা মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হওয়া ত সোজা কথা নহে ! সেই জন্যই মনে হয়, এই দেবভাষা বহুকাল হইতে জন্মগত হইয়া কল্পতরুর ন্যায় সমুন্নত শিরে সকলের পূজ্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আর বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ভাষাগুলি তাহার নাগাল না পাইয়া কল্পতরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধ্য ও আবশ্যক মত পত্র পুষ্প ফল আহরণ করিয়া নিজ নিজ অঙ্গ পুষ্ট করিতেছে মাত্র। সংস্কৃতকে শ্রুতিমধুর জননী আখ্যা না দিয়া বঙ্গভাষার পূজনীয়া ধাত্রী বলিলে অধিক সঙ্গত বোধ হয়। আমরা বলি ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন চলিত ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষা সংস্কৃতবহুল বিভিন্ন বৈদেশিক শব্দপুষ্ট একটি মূলভাষা। খাস আর্য্যাবর্ত্তে তাহার জন্ম হইয়াছে।—বঙ্গভাষা ও বাঙ্গলা অভিধান, প্রবাসী—১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, ১৩০৮, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ ৫ ॥

বিকেল পাঁচটা থেকে বৃষ্টি নামল।

সে কি বৃষ্টি! ছ'টা পর্যন্ত একটানা। মুষলধারে বৃষ্টি। তার আর ছেদ নেই। পাঁচটাতেই যেন সন্ধ্যা নেমে এল। রাস্তা-ঘাট ভাসতে লাগল। ট্রাম-বাস বন্ধ। লোক চলাচল থেমে গেছে। কচিৎ দু'-চারটে লোক হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে জল ভেঙ্গে চলেছে। ও বৃষ্টি ছাতায় আটকায় না। দু' একটা রিক্সাও যাত্রী নিয়ে ঠুং ঠুং ক'রে চলেছে। এর মধ্যে আপিস-ফেরতের দলই বেশী। আর অপেক্ষা করতে পারছে না, বাড়ী ফেরার তাড়া রয়েছে, ট্যাক্সি এই বৃষ্টিতে বন্ধ, সুতরাং অগতির গতি রিক্সাই এই বৃষ্টিতে একমাত্র ভরসা।

এ ছাড়া দোকানে দোকানে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টি ছাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। বৃষ্টিটা একটু ধরলেই নিজের নিজের গন্তব্য স্থানে চ'লে যাবে।

মুশকিল হয়েছে রামকিঙ্করের। তার মনটা ছটফট করছে। বাইরে বেরুনো অসম্ভব। এই অন্ধকার ঘরে থাকা আরও মুশকিল। সে ঘর-বার করতে লাগল।

সুবলকে ডেকে বললে, কলকাতায় বর্ষার মজা নেই।

সুবল সায় দিলে: না। না দেখা যায় মেঘ, না খোলা মাঠ। শুধু অন্ধকারে ঝাঁপ ফেলে ব'সে থাকা।

রামকিঙ্কর বললে, হ্যাঁ। না দেখা যায় গাছের ডালের ঝাপ টাঝাপ্‌টি, না কিছু।

দু'জনেরই মন এই বৃষ্টিতে দেশের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। উভয়েই উৎসাহিত হয়ে উঠল।

সুবল বললে, যাই বল ভাই, খড়ের চালের ওপর বৃষ্টি পড়ার শোভাই আলাদা। নতুন-ছাওয়া ঘর বৃষ্টির জলে যেন সোনার মত ঝক্‌ঝক্ ক'রে ওঠে। নয়?

—হ্যাঁ। আর খোলা মাঠে বাঁকা হয়ে তীরের মত বৃষ্টি নামে। ঝড়েয় ঝাপটায় বৃষ্টি যেন নাচে। নয়?

—হ্যাঁ।

একটু পরে বৃষ্টি ধ'রে এল। লোকজন দোকান থেকে পথে নামল। পা বাড়াল বাড়ীর দিকে। কিন্তু রাস্তায় সেই হাঁটু জল। ট্যাক্সি এখনও চলছে না, কিন্তু লরীগুলো স্টীমারের মত ঢেউ দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে।

কর্পোরেশনের লোক বেরিয়ে পড়েছে রাস্তার ম্যানহোলগুলো খোলবার জন্যে।

সুবল বললে, এইটেই কেবল সুবিধা।

—কোন্‌টা?

—পাড়াগাঁয়ে বৃষ্টি হ'ল ত এক-হাঁটু কাদা। পথ চলে কার সাধ্যি! এখানে ওইটে নেই বাবা। বৃষ্টি হয়ে গেল, তার পরে জুতো প'রে গট্ গট্ ক'রে হেঁটে যাও, কাদার চিহ্ন নেই!

কলকাতার উপর যত রাগই থাক্, সুবলের এই কথাটা তাকেও স্বীকার করতে হ'ল। এখানকার রাস্তা বাঁধান। যত বৃষ্টিই হোক্, জল জমে বটে, কিন্তু জল চ'লে গেলেই আবার খটখটে রাস্তা।

বললে, তা বটে।

সুবলের গ্রামের কথা জানে না, একই রকম হবে নিশ্চয়, তাদের গ্রামে ত ভয়ঙ্কর কাদা। বিশেষ ক'রে ষষ্ঠীতলার কাছে ত মোষ ডুবে যায়। একবার পড়লে আর উঠতে পারে না।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঝুপ্ ঝুপ্ করতে করতে বিশ্বনাথ এসে উপস্থিত।

—কি সাংঘাতিক! এই বৃষ্টিতে কোথায় বেরিয়েছিলে।

রামকিঙ্কর প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল।

হেসে বিশ্বনাথ উত্তর দিলে, বেরুই নি। বেরুব। যাবে?

—কোথায়?

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিশ্বনাথ চুপি চুপি বললে, আজ আই. এ.-র ফল বেরুচ্ছে। খবরের কাগজের আপিসে মাইকে ঘোষণা করছে। যাবে?

—যাব। ছাতাটা নিয়ে আসি দাঁড়াও।

রামকিঙ্কর দৌড়ে উপর থেকে ছাতা নিয়ে এল। এবং হন্তদন্ত হয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল।

কি ভিড়! কি ভিড়!

বড় রাস্তা থেকে গলির মোড়ে ঢোকে কার সাধ্য। গলির সমস্তটাই জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ। ছাতা খোলবার উপায় নেই। বৃষ্টি মাথায় ক'রে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে শুনছে মাইকের ঘোষণা।

এরা সবাই যে পরীক্ষা দিয়েছে তা নয়। পরীক্ষার্থীর বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনই বেশী। ফলাফল কি হয়, কি হয়, অনেক পরীক্ষার্থীই নিজে আসতে সাহস করে নি। বন্ধু-বান্ধবকে পাঠিয়ে আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করছে। তাদের উৎফুল্ল মুখভাব দেখলে বেরিয়ে এসে জেনে নিচ্ছে।

অনেকে নিজেও এসেছে। তাদের কঠিন উৎকণ্ঠিত মুখভাব থেকে চিনতে পারা যায়। কারও দিকে চাইছে না তারা। বুক কাঁপছে দুরু দুরু। উৎকর্ণ হয়ে শুনছে মাইকের ঘোষণা।

এদের চাপে খবরের কাগজের আপিসের লোহার ফটক নাকি ভেঙ্গে গিয়েছিল। আপিসের পিওন দারোয়ান মিলে দুর্গের সেই ভাঙ্গা ফটক রক্ষা করতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে।

মাইকের ঘোষণা অবিশ্রান্ত চলেছে: রোল ক্যাল ওয়ান, থার্ড-ডিভিশন, থ্রি-সেকেণ্ড ডিভিশন, টেন-থার্ড ডিভিশন...

যারা পাস করেছে শুধু তাদের রোল নাম্বার আর ডিভিশন। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একবার হাঁকা হচ্ছে, আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তার পর ছেদ।

যারা শুনছে, তারা দু'বার না শুনে, সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে বেরিয়ে আসছে না। সুতরাং ভিড় খুব ধীরে ধীরে কমছে। বোঝাই যাচ্ছে না যে, ভিড় কমছে। ভিড়ের সময়কার ট্রাম গাড়ির মত। একজন নামছে ত তিনজন উঠছে।

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে কলহও হচ্ছে। মাইকের ঘোষণা পরিষ্কার শোনা গেল না। তার জন্যেও অনেককে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে পুনরাবৃত্তি শোনবার জন্যে।

গলির মুখেই বিশ্বনাথ আর রামকিঙ্কর আটকে গেছে। আর ভিতরে ঢুকতে পারছে না। পিছন থেকে ধাক্কা খাচ্ছে: এগিয়ে চলুন না মশাই! হাঁ ক'রে সঙের মত দাঁড়িয়ে কেন?

—তা ছাড়া করি কি বলুন? এগিয়ে যাবার কি রাস্তা আছে?

দুটো বলিষ্ঠ ছেলে হাঁক দিলে: তা হ'লে স'রে দাঁড়ান। আমরা ভিতরে যাব।

—স'রে দাঁড়াবারও জায়গা নেই।

সামনে থেকেই ঠিক সমান ধাক্কা: সরুন না মশাই, রাস্তা দিন, আমরা বেরিয়ে যাই।

—তারও রাস্তা নেই।

একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতে গিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবীটা একেবারে ফর্দাফাঁই।

—দেখুন ত মশাই, কি করলেন?

দেখবে কে? সবাই উৎকর্ণ। সকলের সমস্ত চৈতন্য কানের মধ্যে সংহত। সবাই মাইকের ঘোষণা শুনছে।

বিশ্বনাথরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেও শোনা যায় যদি জনতা নিস্তব্ধ থাকে। কিন্তু তা হচ্ছে না। তার উপর মাঝে মাঝে যখন ট্রাম গাড়ি যাচ্ছে তখন ত কথাই নেই।

চুপি চুপি বিশ্বনাথ রামকিঙ্করকে বললে, রোল ক্যাল এফ পি ৩১২। খেয়াল রেখ।

—৩১২?

—হ্যাঁ। এফ পি।

কিন্তু খেয়াল রাখবে কি! একে এখান থেকে ভাল শোনা যাচ্ছে না, তার উপর ট্রাম-বাসের ঘরঘরানি!

অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রে রামকিঙ্কর বললে, তুমি ভেতরে ঢুকতে পারবে না। এইখানে দাঁড়াও। আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। ৩১২, না?

—হ্যাঁ। এফ পি।

রামকিঙ্করের গায়ে বেশ জোর। ধীরে ধীরে সে ভিতরে ঢুকতে লাগল। এক হাত, দু'হাত, তিন হাত ...তার পরে বিশ্বনাথ আর তাকে দেখতে পেলে না।

একটা জায়গায় পৌঁছে রামকিঙ্কর আর অগ্রসর হ'ল না। অগ্রসর হওয়া কঠিনও বটে, নিষ্প্রয়োজনও। এখান থেকে মাইকের ঘোষণা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

রোল ক্যাল এফ ৫১৮ দ্বিতীয় বিভাগ, ৫২২ তৃতীয় বিভাগ, ৫৩০ তৃতীয় বিভাগ...

এটা নয়, এফ পি।

রোল ক্যাল এফ পি ওয়ান তৃতীয় বিভাগ, ১১ দ্বিতীয় বিভাগ...

একজন বললে, বাবা: ওয়ান থেকে একেবারে ইলেভেন! পাস আর কেউ করে নি!

সকলে নিঃশব্দে হাসলে। কাষ্ঠ হাসি।

রোল ক্যাল এফ পি ১১২ তৃতীয় বিভাগ, ১১৫ তৃতীয় বিভাগ...

রামকিঙ্কর উৎকর্ণ।

রোল ক্যাল এফ পি ২৩৮ প্রথম বিভাগ, ২৪২ দ্বিতীয় বিভাগ…

রামকিঙ্করের নিশ্বাস বন্ধ। শুনে যাচ্ছে:

রোল ক্যাল এফ পি ২৯৮ তৃতীয় বিভাগ, ৩০১ তৃতীয় বিভাগ, ৩১০ তৃতীয় বিভাগ, ৩১২ দ্বিতীয় বিভাগ ··

রামকিঙ্করের মনে হ'ল একটা লাফ দেয়। কিন্তু লাফ দেবার জায়গা নেই। সে প্রাণপণ বলে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। দু'পা এগোয়, আবার একটা ধাক্কা খেয়ে এক পা পিছোয়।

এমনি ক'রে যখন গলির প্রান্তে এল, তখন ঠিক যেখানটিতে তারা দু'জনে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটিকে খুঁজে পেলে না। যখন খুঁজে পেলে, সেখানে বিশ্বনাথ নেই!

কোথায় গেল?

সে কি বাড়ী চ'লে গেল? বাড়ী যাবার ত কথা নয়। হয়ত ভিতরে ঢুকে গেছে।

৩১২—দ্বিতীয় বিভাগ।

রামকিঙ্কর কি ওর জন্যে অপেক্ষা করবে? কি হবে অপেক্ষা ক'রে? তার চেয়ে গিয়ে মাসীমাকে খবরটা দেওয়া আরও বেশী দরকারী। তিনি নিশ্চয় এর জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

একবার মনে হ'ল চীৎকার ক'রে বলে, রোল ক্যাল এফ পি ৩১২ দ্বিতীয় বিভাগ। বিশ্বনাথ কাছাকাছি কোথাও থাকলে শুনতে পাবে। কিন্তু অন্যেরা যারা তাদের নিজেদের ফল একমনে শুনছে তারা বিরক্ত হ'তে পারে ভেবে সে প্রলোভন সম্বরণ করলে।

সামনেই একখানা ট্রাম আসছিল। রামকিঙ্কর ছুটে গিয়ে সেইটেতে উঠে পড়ল। তখন তার কানে বাজছে রোল ক্যাল এফ পি ৩১২ দ্বিতীয় বিভাগ!

একবার নয়, দু'বার শুনেছে। দু'বার।

খবরের কাগজের অফিস থেকে বিশ্বনাথের বাড়ী খুব দূরে নয়। এটুকু পথ সে হেঁটেই আসতে পারত। আসবার সময় তাই এসেছিল। এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। রাস্তার জলও অনেক কমে গেছে। দিব্যি হেঁটেই আসতে পারত। কিন্তু তাড়াতাড়ি সুসংবাদটা দেবার আগ্রহে দমকা ট্রাম-ভাড়ার ক'টা পয়সা খরচ ক'রে ফেললে।

তিনি এখন কি করছেন? মাসীমা? জানেন আজ ফল বেরুবে। ফল জানতে বেরিয়েছে বিশ্বনাথ। রামকিঙ্করের কথা নাও জানতে পারেন। কি জানি কি খবর নিয়ে আসবে বিশ্বনাথ এ চিন্তায় নিশ্চয় তিনি অধীর-আগ্রহে ঘর-বার করছেন। কাজে মন বসছে না। কি জানি কি খবর নিয়ে আসে!

এইটে কল্পনা করতে রামকিঙ্করের ভারি আমোদ বোধ হচ্ছিল। যে পাস করেছে, পাস করার আগে তার দুশ্চিন্তা দেখতে ভারি মজা লাগে।

ট্রাম থেকে নেমে রামকিঙ্কর প্রায় দৌড়তে লাগল মরি-বাঁচি জ্ঞান নেই। ওদের বাড়ীর সেই অন্ধকার সিঁড়িই দুটো ক'রে টপ্‌কে উঠতে লাগল।

ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্।

কি জোর কড়ানাড়া। সুলোচনা জানেন, কে কেমন ক'রে কড়া নাড়ে। কড়া নাড়া শুনলেই তিনি বুঝতে পারেন কে কড়া নাড়ছে। স্পষ্ট বুঝলেন, এ কড়া-নাড়া বাড়ীর কারও নয়। একটি বৃদ্ধা ভিখারিণী এমনি জোরে কড়া নাড়ে বটে, কিন্তু সে ত সকাল বেলায়। সন্ধ্যের পরে তার হামলা করার কথা নয়।

বললেন, কে?

—আমি। দরজা খুলুন। তাড়াতাড়ি।

রামকিঙ্করের কণ্ঠস্বর।

দরজা খুলে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে! এমন ব্যস্ত হয়ে কোত্থেকে?

সুলোচনার মনের গভীরে কোথাও যদি অধৈর্য এবং উদ্বেগ থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বাইরে তার চিহ্ন-মাত্র নেই। প্রতিদিনের সেই হাস্যময় মুখের প্রসন্ন সম্ভাষণ।

রামকিঙ্কর অবাক্ হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, কি করছিলেন?

—রান্না। যা করি।

—আজ আই. এ.'র রেজাল্ট বেরিয়েছে জানেন?

সুলোচনা নিশ্চিন্ত হাস্যে বললেন, শুনছি। বিশ্বনাথ গেছে।

ব'লেই বললেন, আমার পাস-ফেলের কি আছে বল্। সখের পরীক্ষা। পাস করলে ভাল, না করলেও ক্ষতি নেই।

সুলোচনা হাসতে লাগলেন।

রামকিঙ্কর বললে, আপনি সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করেছেন। রোল ক্যাল এফ পি ৩১২।

খবরটা শুনে সুলোচনা কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি ক'রে জানলি?

রামকিঙ্কর ছটফট্ করছিল। উত্তর দিলে, গিয়ে-

ছিলাম যে। আমি আর বিশ্বনাথ। ভিড়ের মধ্যে সে যে কোথায় হারিয়ে গেল, আর তাকে খুঁজে পেলাম না।

—খুব ভিড় হয়েছিল ?

—অসম্ভব !

এতক্ষণে সুলোচনার দৃষ্টি পড়ল : তোর শার্টটা ছিঁড়ল কি ক'রে ?

—শার্ট !

রামকিঙ্কর শোকার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, তার শার্টের ডান হাতের আস্তিনটা ছিঁড়ে প্রায় খুলে গেছে।

বললে, সেই হারামজাদার কাজ !

—কোন্ হারামজাদা ?

—আপনি দেখেন নি। গুণ্ডার মত একটা ছেলে। বেরুবার সময় তারই সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিল।

রামকিঙ্কর ক্ষুব্ধভাবে ছেঁড়া শার্টের দিকে চাইলে।

এইটিই বেচারার অদ্বিতীয় শার্ট। রবিবারে সাবান দিয়ে সপ্তাহটা চালায়। কালই আর একটা শার্ট কেনে সে সামর্থ্য নেই।

মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো কথা রামকিঙ্কর চিন্তা করলে। এবং এত বড় একটা আনন্দের মধ্যেও তার মনটা ক্ষুব্ধ হ'ল।

কিন্তু কি আর করা যায় !

পিছনের দিকে চেয়ে চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু বিশ্বনাথ এখনও ফিরল না কেন ? আমি দু'বার শুনলাম মাসীমা : রোল ক্যাল এফ পি থ্রি হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড টুয়েলভ, সেকেণ্ড ডিভিশন। দু'বার শুনলাম।

রামকিঙ্কর সগর্বে সুলোচনার দিকে চাইলে। যেন সুলোচনার পাস করার চেয়েও দু'বার শোনাটাই অধিকতর গৌরবের বস্তু।

সুলোচনা হাসলেন : সে বোধ হয় এখনও শুনতে পায় নি। তাই অপেক্ষা করছে।

—বোধ হয়। রামকিঙ্করের চোখে গর্বের স্ফুলিঙ্গ—শোনা কি সোজা ব্যাপার মাসীমা ! ওই ভিড় ঠেলে যাওয়া আর আসা। জামার অবস্থা ত দেখলেন। তার জামার অবস্থা কি হয় কে জানে !

রামকিঙ্কর সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করছে।

সুলোচনা বললেন, বোঝা যাচ্ছে, একই অবস্থা হবে। আমি চায়ের জল চড়াই বাবা। সে এর মধ্যে এসে পড়ছে ত ভালই। তুই আমার সঙ্গে রান্নাঘরে চল্। সেইখানে ব'সে ব'সে গল্প করা যাবে। ভাল খবর এনেছিস্, একটু মিষ্টিমুখ ক'রেও যেতে হবে। কিন্তু চাকরটা পালিয়েছে, ঝিরও এখন আসার সময় নয়।

রামকিঙ্কর ব্যস্তভাবে বললে, সে আর একদিন হবে মাসীমা। মিষ্টি ত আর পালাচ্ছে না।

—পালাচ্ছে বই কি ! আজকের মত এমন মিষ্টি আর কোনদিন লাগবে না।

একগাল হেসে বললে, তা যা বলেছেন মাসীমা। আজকের মিষ্টির স্বাদই হবে আলাদা।

—তবে ?

—তা হ'লে আমাকেই টাকা দিন, আমিই মিষ্টি কিনে আনি। বিশ্বনাথ এসে খবরটা বলামাত্র তার মুখে একটা মিষ্টি পুরে দোব। কিন্তু লীনাকে দেখছি না মাসীমা। সে গেল কোথায় ?

সুলোচনা হেসে বললেন, তার কথা আর বলিস্ না। যখন থেকে শুনেছে আজ ফল বেরুবে তখন থেকে সে মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছে। একবার ক'রে আমার কাছে এসে বসছে, আবার বেরুচ্ছে। সন্ধ্যের সময় আর পারলে না। তেতলায় পালাল। সিঁড়ির ওইখান থেকে জোরে জোরে ডাক্ দিকি।

রামকিঙ্কর ডাকতে সাড়া পেলে।

ছুটে বেরিয়ে এসে চুপি চুপি বললে, রামদা, আজ রেজাল্ট বেরুচ্ছে, জান ?

—জানি। তা কি হবে ?

গম্ভীরভাবে বললে, কি যে হবে রামদা, ভগবান্ জানেন।

ওর পাকা বুড়ীর মত কথায় রামকিঙ্কর হেসে ফেললে : কি আর হবে ? হয় পাস, নয় ফেল। তার বেশি ত কিছু নয় ? আমাদের পাওনা মিষ্টি কে ঠেকাচ্ছে ?

চোখ বিস্ফারিত ক'রে লীনা বললে, দা ফেল করলেও তুমি মিষ্টি চাইবে ?

—চাইব না ? আমরা ছেলে-মেয়ের দল। পাস-ফেলের কি ধার ধারি ? আমাদের মিষ্টি পাওনা। আমরা খাব।

লীনা গালে হাত দিয়ে বললে, তুমি সাংঘাতিক ছেলে বাবা !

ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা ফেরে নি মা ?

—না।

—খবরও কিছু পাওয়া গেল না ?

সুলোচনা হেসে বললেন, গেছে ত। রাম বলে নি ?

—না। কি বলছে জান মা? বলছে, আমরা পাস-ফেলের ধার ধারি না। আমরা মিষ্টি খাব।

—খাবি ত। ও মিষ্টি আনতে যায় নি? বলে নি আমি সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করেছি?

এবারে লীনা লাফিয়ে উঠল: কি সাংঘাতিক ছেলে বাবা! শুধু আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছিল!

ইতিমধ্যে রামকিঙ্কর আর বিশ্বনাথ হৈ হৈ করতে করতে এল। রামকিঙ্করের হাতে খাবারের ঠোঙা।

॥ ৬ ॥

বছর তিনেক পরের কথা। রামকিঙ্কর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সময় নেই বললেই চলে। দোকানের কাজ যেন আরও বেড়ে গেছে। কথায় কথায় তারই ডাক পড়ে। খদ্দের নেই দেখে একটু যদি সে আড়ালে গিয়ে বই খোলবার চেষ্টা করে, তখনই ডাক পড়ে। খদ্দের নেই ত তাগাদায় বেরোও।

তার সহকর্মীরা হাসে।

সবাই জানে রামকিঙ্কর পড়াশোনায় কোনদিনই ভাল ছিল না। যখন অবারিত অধ্যয়নের সুযোগ ছিল তখনই সে সব বিষয়ে ফেল করত। সেই ছেলে সমস্ত দিন খাটুনির পর বিরল অবসরে বই প'ড়ে পাস করবে, পাগল ছাড়া এ ভরসা কেউ করতে পারে না।

রামকিঙ্কর পাগল হয়ে গেছে।

দিনের বেলায় আহারান্তে সে ঘণ্টাখানেক পড়ার সময় পায় কি পায় না। সন্ধ্যার পরে একটুখানি সময় পায়। সাতটা থেকে এগারোটা। আর ভোরে তিনটে থেকে ছ'টা।

এর মধ্যে হরেকৃষ্ণ একদিন তাকে ডাকলে: বাপু, তুমি ত হাকিম হবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছ। হাকিম হও তাতে আমার আপত্তি নেই। সে ত ভাল কথা। কিন্তু যতক্ষণ চাকরি করছ, কোম্পানীর লাভ-লোকসানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে রামকিঙ্কর কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাজে সে কখনও গাফিলতি করে না। হরেকৃষ্ণকে সে বাঘের মত ভয় করে। তার পিতার শত্রু, কখন কি অনিষ্ট করে তার ঠিক নেই। সকল সময় সে সন্ত্রস্ত থাকে।

সেদিন একটু অবসর পেয়ে সে একটু বই খুলে বসেছে। কি ক'রে যে হরেকৃষ্ণ টের পায় ভগবান্ জানেন, তখন রামকিঙ্করকে ডেকে তাগাদায় পাঠাল। রামকিঙ্কর প্রতিবাদ করে নি। চোখ ফেটে তার জল আসছিল। সেই জল মুছে, মুখখানি ছাতার আড়াল ক'রে তাগাদায় বেরিয়ে পড়েছে।

হরেকৃষ্ণের অভিযোগে সে অবাক্ হয়ে গেল।

হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল: রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত তোমার ঘরে আলো জ্বলে। আবার ফের শেষ রাত্রে। অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কোম্পানীর যে মিটার ওঠে সে খেয়াল আছে?

সে একটা প্রশ্ন বটে। রামকিঙ্কর নতশিরে চুপ ক'রে রইল।

হরেকৃষ্ণ বললে, আমি সবাইকে ব'লে দিয়েছি, তোমাকেও ব'লে দিলাম, রাত ন'টায় আমাদের খাওয়া হয়। দশটার পরে আর কোন ঘরে আলো জ্বলবে না। বুঝলে?

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে চ'লে গেল।

সুবল আড়াল থেকে সমস্ত শুনেছিল। রামকিঙ্করকে ডেকে বললে, তোমাকে পরীক্ষা দিতে ও দেবে না রাম।

রামকিঙ্করের চোখ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। বললে, পরীক্ষা আমি দোবই সুবল। কেউ আটকাতে পারবে না। দোকানের আলো না পাই, ফুটপাথের গ্যাসের আলোয় পড়ব।

রামকিঙ্করের এই মূর্তি কেউ কখনও দেখে নি। গ্রামে দুষ্টুমি করেছে অনেক। কিন্তু এখানে এই পরিবেশে এসে সে যেমন শান্ত, তেমনি নম্র হয়েছে। কখনও কারও সঙ্গে কলহ করে না। তার সাত চড়েও রা বেরোয় না।

সুবল অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সুলোচনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ ক'রে এসে একদিন সে হরেকৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়াল।

—কি?

—একটা কথা বলব।

—বল।

—এখানে দশটার পর ত আলো জ্বলে না। ভাবছিলাম, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে একটি বন্ধুর বাড়ী পড়তে যাব। আবার ভোরবেলায় ফিরে নিজের কাজকর্ম করব।

হরেকৃষ্ণের মুখে একটা কুটিল রেখা খেলে গেল।

বললে, তোমার বন্ধু জুটেছে সে আমি জানি বাপু।

কিন্তু তোমার কাকাকে জিগ্যেস না ক'রে রাত্রে ত তোমাকে বাইরে যেতে দিতে পারি না। বয়েসটা ত ভাল নয়। তোমার কাকা আমাকেই দুষবেন।

রাগে রামকিঙ্কর ঘামতে লাগল।

হরেকৃষ্ণ বললে, তার চেয়ে এক কাজ কর।

—কি কাজ?

—চাকরি ছেড়ে দাও। তোমার বন্ধুর বাড়ীতে এই ক'টা মাস বিনি পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পার না?

—সেখানে খাব কেন?

—অমন যখন বন্ধু, তখন খেতে দোষ কি?

—না। তা হয় না। ওঁরা বলেছিলেন তাই, আমি রাজী হয় নি।

রামকিঙ্কর আর দাঁড়াল না। নিজের রাগকে সে ভয় পায়। তার চণ্ডাল-রাগ। রাগলে কোনও জ্ঞান থাকে না। সেই দুর্দমনীয় ক্রোধকে আড়াল করবার জন্যে সে স'রে গেল।

পাশের অন্ধকার ঘরে একটা শূন্য পিপের আড়ালে ব'সে ব'সে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ কাঁদলে। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে আবার দোকানের কাজে মন দিল।

বিশ্বনাথের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রামকিঙ্কর পড়ার জন্যে এই রকমের একটা নির্ঘণ্ট তৈরি করলে: দুপুরের খাওয়ার ছুটির সময় এক ঘণ্টা; সন্ধ্যায় সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা। রাত দশটার পর দোকানের আলো নিভে গেলে বিশ্বনাথ জোরে জোরে পড়বে, ও শুনবে; ভোরেও তাই।

এমনি ক'রে রামকিঙ্কর টেষ্ট পরীক্ষা দিলে এবং পাস করলে। ফল খুব ভালো হ'ল না। তবে সব বিষয়েই পাস করলে এবং মোটামুটি তৃতীয় বিভাগের নম্বর রইল।

চিন্তা হ'ল পরীক্ষার ফি নিয়ে।

হরেকৃষ্ণকে অনুরোধ জানালে, ফির টাকাটা ক্যাশ থেকে ধার দিতে। মাসে মাসে তার মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে।

হরেকৃষ্ণ হেসে বললে, তা কি ক'রে হয়? মাসে দু'টি টাকা তোমার হাতখরচের জন্যে রেখে বাকি টাকা তোমার কাকাকে পাঠিয়ে দিতে হয়। তোমার কাকাকে চিঠি লেখ। তিনি রাজী হ'লে দোব।

রামকিঙ্কর তার কাকাকে লিখলে। কাকা জবাব দিলে: বাবাজীবন, আমরা গরীব গৃহস্থ। তোমার মাহিনার টাকা দিয়ে পরীক্ষার ফি দিলে কয়েক মাস আমাদের উপবাস ক'রে থাকতে হবে। তার পরেও পাস করতে পারবে কি না সন্দেহ। এমনি অনিশ্চিত ব্যাপারের জন্যে আমাদের উপবাসী রাখা কি তোমার পক্ষে উচিত হবে?

কাকার সম্মতি পাওয়া গেল না।

রামকিঙ্কর আহারনিদ্রা ছেড়ে দিলে। দিনরাত গোপনে শুধু কাঁদে আর ঠাকুরকে ডাকে।

তার অবস্থা দেখে সকলেরই দয়া হ'ল। কিন্তু সকলেই স্বল্পবেতনের কর্মচারী। সকলেরই ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে আছে। এদিকে ফি জমা দেবার শেষ দিন আসন্ন।

তারা নিজেদের মধ্যে দশটি টাকা সংগ্রহ ক'রে রামকিঙ্করকে দিলে। বললে, বাকি টাকার ব্যবস্থা দেখ।

বাকি টাকা? সেও ত অনেক! কোথায় তার ব্যবস্থা হবে?

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বন্ধুর বাড়ী থেকে বাকি টাকার ব্যবস্থা হয় না?

—কিন্তু তাঁরাও ত ধনী নন। নিজেদের ছেলের পরীক্ষার ফি দিতে হচ্ছে।

একজন বললে, মালিকের সঙ্গে দেখা করবে?

—কেন?

—তাঁরা বড়লোক। কেঁদে-কেটে পড়লে হয়ত দিয়ে দিতে পারেন।

অসম্ভব নয়। কিন্তু রামকিঙ্করের ভয় করে।

কিন্তু ভয় করলে ত চলবে না। পরীক্ষা দিতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় কি? সবাই মিলে ঠেলে-ঠুলে পাঠালে। রামকিঙ্কর তাঁদের বাড়ীটাও চেনে না। সুবল সঙ্গে গেল।

গিয়ে শুনলে, শনিবার সন্ধ্যায় বাবু বাগানে গেছেন। আজ রবিবার সেখানেই থাকবেন। কাল সকালে ফিরবেন।

তা হ'লে?

রামকিঙ্করের মুখে সেদিন কি একটা বোধ হয় ছিল। যে ভৃত্য এই সংবাদ দিলে তারও করুণা হ'ল?

জিজ্ঞাসা করলে, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করবেন?

গিন্নীমা? তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে কি কাজ হবে?

রামকিঙ্কর সুবলের মুখের দিকে চাইলে।

সুবল বললে, তাই খবর দাও ভাই। ব'লো, দোকানের একটি কর্মচারী দেখা করতে চায়।

চাকরটি চ'লে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এসে ডাকলে, আসুন।

গিন্নীমা ঠাকুর-দালানের প্রশস্ত বারান্দায় ব'সে পুজোর যোগাড় করছেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। পাকা আমের মত রং। পরণে একখানি মটকার থান।

ওরা দু'জনে গিয়ে প্রণাম করলে।

—কি বাবা?

কথাটা বলবার জন্যে সুবল রামকিঙ্করের মুখের দিকে চাইলে।

কিন্তু কথা বলবে কি, গিন্নীমার শান্ত কোমল মুখের দিকে চেয়ে একটা চাপা কান্না তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল।

সুবলই তার হয়ে ব্যাপারটা বললে।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, কত টাকা ফি?

সুবল বললে। বললে, সব টাকা দিতে হবে না। দশটি টাকার যোগাড় হয়েছে।

—কি ক'রে হ'ল?

এবার সুবল মুখ নামালে।

বললে, আমরা নিজেদের মধ্যে দু'টাকা এক টাকা তুলেছি।

গিন্নীমা হাসলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, পরীক্ষা যে দেবে বাবা, দোকানের কাজ ক'রে সময় পাবে কতটুকু?

বন্ধুগর্বে উৎসাহিত সুবল রামকিঙ্করের পড়া ও টেষ্ট পাসের সমস্ত বিবরণী জানালে।

গিন্নীমা রামকিঙ্করের মুখের দিকে চাইলেন। আশায়, আশঙ্কায়, উদ্বেগে, সঙ্কোচে রামকিঙ্করের সমস্ত দেহ থর থর ক'রে কাঁপছে।

গিন্নীমা বললেন, তোমরা ব'সো বাবা।

ওরা সিঁড়ির উপরেই ব'সে পড়ল। শুধু রামকিঙ্করেরই নয়, ভয় সুবলেরও একটু একটু করছিল।

গিন্নীমা সরকারকে ডাকলেন। বললেন, ওই ছেলেটিকে পঞ্চাশটা টাকা দাও। আমার নামে খরচ লিখো।

রামকিঙ্করের কথা বেরুচ্ছিল না। তবু কোনমতে ব্যস্ত হয়ে বলবার চেষ্টা করলে, অত টাকা নয় মা।

বাধা দিয়ে গিন্নীমা বললেন, জানি বাবা। কিন্তু ফিই ত সব নয়। বই আছে, খাতা-পেন্সিল আছে, কত কি আছে। কিছু টাকা হাতে থাকা দরকার।

সরকারকে বললেন, আর একটা কাজ ক'রো। দোকানের ম্যানেজারকে আমার নামে রোকা লিখে দাও, পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছেলেটির ছুটি। ও দোকানে থাকবে-খাবে, মাইনেও যেমন পাচ্ছিল তেমনি পাবে।

—যে আজ্ঞে।

রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন, ওর সঙ্গে যাও বাছা। পরীক্ষা পাস ক'রে আবার একদিন এস।

ওরা গিন্নীমাকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল।

সুবলকে দোকানে ফিরে যেতে ব'লে রামকিঙ্কর সটান চ'লে গেল বিশ্বনাথের বাড়ী। গিয়ে দেখে বিশ্বনাথ আর সুলোচনাতে কি যেন একটা গুরুতর আলোচনা চলছে। লীনাও একপাশে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে আলোচনা হঠাৎ থেমে গেল।

কিন্তু রামকিঙ্করের অত লক্ষ্য করবার সময় নয়।

জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ফি দিয়েছ বিশ্বনাথ?

—না। তুমি কি করলে?

—চল, দিয়ে আসি।

—চল।

মায়ের দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে বিশ্বনাথ উঠল। সুলোচনাকে প্রণাম ক'রে দু'জনে রাস্তায় এল।

বিশ্বনাথ একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ফি-এর টাকা যোগাড় হয়েছে?

প্রকাণ্ড বড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রামকিঙ্কর বললে, হয়েছে অনেক কষ্টে।

কিভাবে যোগাড় হ'ল, সে কাহিনী রামকিঙ্কর বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করলে। বললে, কি যে ভাবনা হয়েছিল ভাই। দিনরাত খালি কাঁদতাম আর ঠাকুরকে ডাকতাম। আমাদের মালিকের মা সাক্ষাৎ দেবী। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। একটি কথায় টাকা ত দিয়ে দিলেনই, অনেক বেশি দিলেন। তার উপর পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ ক'মাসের বেতনসহ ছুটিও মঞ্জুর করলেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

গৌরবে ও গর্বে রামকিঙ্করের বুক ফুলে উঠল।

বিশ্বনাথ বললে, তোমার কথাই আমরা ভাবছিলাম।

—তা জানি।

বিশ্বনাথ চমকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে জানলে?

—বা! আমার কথা তোমরা ভাববে, তার আর জানাজানি কি?

—না, জান না। আমি সকালে তোমাদের দোকানে গিয়েছিলাম, জান?

—না।

—গিয়ে শুনলাম তুমি কোথায় বেরিয়েছ। শুনলাম, তোমার ফি'র টাকা এখনও যোগাড় হয় নি। বাড়ী এসে মাকে বললাম সেকথা। মা বাবাকে বললেন।

বাবা বললেন, তাঁর হাতে ত আর টাকা নেই।

মা তাঁর একখানা গয়না খুলে দিয়ে বললেন, ওইটে বাঁধা রেখে কোথাও থেকে টাকা নিয়ে আসতে।

রামকিঙ্কর পথের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ জ্বালা করছে। এখনই বন্যা নামবে বোধ হয়।

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, তার পর?

একটু চুপ ক'রে থেকে বাবা বললেন, থাক্ ওটা। দেখি যদি কোথাও থেকে ব্যবস্থা করতে পারি। তিনি গেছেন সেই ব্যবস্থা করতে। ফিরে এসে শুনবেন তোমার টাকার যোগাড় হয়ে গেছে।

বিশ্বনাথ হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর কিন্তু হাসতে পারলে না। তার বুকের ভিতর কিসের যেন একটা ঢেউ উঠেছে।

এই পৃথিবী—কত কদর্য, অথচ কত সুন্দর। এখানে নিজের কাকা তার ভবিষ্যতের চেয়েও নিজের সংসার প্রতিপালনের অর্থকে বড় মনে করে! হরেকৃষ্ণ অকারণে তার পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করতে চায়! আবার গিন্নীমা এক কথায় আবশ্যকেরও অতিরিক্ত টাকা দিয়ে দিলেন। যাতে নিশ্চিন্তে সে পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আর একজন ছেলের বন্ধুর ফি'র টাকার জন্যে হাসিমুখে নিজের গায়ের গহনা খুলে দিতে পারেন!

রামকিঙ্করের বুকের ভিতরটা যেন আথাল-পাথাল করছিল। সামলাতে সময় নিলে।

বিশ্বনাথ বললে, রাম, এবারে কিন্তু আমাদের দু'জনকেই খুব খাটতে হবে।

—সে আর বলতে!

—কাল থেকে পড়া আরম্ভ হবে—সকাল সাতটা থেকে বারোটা, আবার দুটো থেকে পাঁচটা। পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত পার্কে একটু বেড়িয়ে এসে রাত দশটা পর্যন্ত। দোকানের খাটুনি ত আর তোমার রইল না।

—না। কিন্তু দোকানের খাওয়া রাত সাড়ে ন'টায় শেষ হয়। দশটায় আলো নিবে যায়। সুতরাং ন'টার মধ্যে দোকানে ফিরতে হবে।

—বেশ। কিন্তু ভোরের পড়াটা?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আলো ত জ্বালাতে পারব না। সুতরাং তুমি পড়বে আর আমি শুনব।

বিশ্বনাথ বললে, ওটা পড়াই নয়।

তার পরে বললে, একটা কাজ করলে হয়।

—কি কাজ?

—আমাদের বাড়ীতে একটা হারিকেন আছে।

—আছে?

—হ্যাঁ। হঠাৎ আলো বন্ধ হয়ে গেলে সেটা দরকারে লাগে। সেইটে তুমি নেবে। রাত্রে হারিকেন জ্বেলে পড়বে। তাতে ত আর কারও বলবার কিছু থাকবে না।

—না।

আনন্দে রামকিঙ্কর লাফিয়ে উঠল: এটা আমার মাথায় আসে নি। আমার মাথায় কিছু নেই, জান? ছেলেবেলায় মাস্টার বলতেন, শুধু গোবর-পোরা আছে।

রামকিঙ্কর হাসতে লাগল।

ফি জমা দিয়ে যখন ওরা ফিরল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

বিশ্বনাথ অবশ্য স্নানাহার ক'রে বেরিয়েছিল। কিন্তু রামকিঙ্করের না স্নান, না আহার। অথচ সেদিকে তার খেয়ালই হয় নি। ক্ষুধা দূরে থাক্, একটু তৃষ্ণার পর্যন্ত উদ্রেক হয় নি।

খেয়াল হ'ল প্রথম বিশ্বনাথের। ওর মাথার রুক্ষ চুল এবং শুকনো মুখ দেখে।

—তোমার কি নাওয়া-খাওয়া হয় নি রাম?

এতক্ষণে রামেরও খেয়াল হ'ল। হেসে বললে, না।

—কি আশ্চর্য! দোকানে গিয়ে কি খেতে পাবে?

—পেতে পারি। দোকানে খাওয়া-দাওয়া একটু দেরিতেই হয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সেই জরাসন্ধের কারাগারে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। চল, কোনও খাবারের দোকানে, কি রেষ্টুরেন্টে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্। কি বল?

বিশ্বনাথ বললে, আমি ত এই ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। ক্ষিধে নেই। তুমি খেয়ে নাও বরং।

—তা হবে না। হয় দু'জনেই খাব, নয় কেউ খাব না।

রামকিঙ্কর একরকম টানতে টানতে বিশ্বনাথকে একটা খাবারের দোকানে নিয়ে গেল। তার পকেটে কয়েকখানা পাঁচ টাকার নোট। এ রকম ঘটনা জীবনে কোনদিন ঘটে নি।

পেটপুরে খেয়ে দু'জনে বেরিয়ে এল।

দোকানের কাছে এসে বিশ্বনাথকে বললে, তুমি বাড়ী যাও। আমি সন্ধ্যের সময় যাব।

বিশ্বনাথ চ'লে গেল।

দোকানের সামনে এসে রামকিঙ্করের বুকটা আবার ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠল। সামনেই হরেকৃষ্ণ ব'সে আছে। সমস্ত দিন দোকান কামাই করেছে। কি জানি কি বলে!

দোকানের সামনে হরেকৃষ্ণ ব'সে আছে। সামনে সেই কাঠের হাতবাক্স। চোখে সেই নিকেলের ফ্রেমের চশমা নাকের ডগা পর্যন্ত ঝুলে এসেছে।

রামকিঙ্কর দোকানে ঢুকতেই চশমার ফাঁক দিয়ে হরেকৃষ্ণ একবার তাকে দেখে নিলে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে, যেন তাকে দেখেই নি।

রামকিঙ্কর সটান দোতলায় চ'লে গেল।

ঘরে ঢুকে জামা খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। মনে হ'ল ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আসছে। অথচ এই ক্লান্তি এতক্ষণ কোথায় ছিল, কে জানে।

ঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলে, ভাত খাবেন নাকি?

—না। খেয়ে এসেছি। শুধু চানটা করব।

একটু পরে স্নান সেরে আবার যখন সে উপরে এল পিছু পিছু সুবল এসে হাজির। তার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

—ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, কেন?

—আগুন হয়ে আছে। ক'দিন আর দেখা ক'রো না।

—কেন? কি ব্যাপার?

—গিন্নীমার রোকা এসে গেছে।

—তার পরে?

—শুনেছে তোমার ফি'র টাকা তিনিই দিয়েছেন। শুধু আমি যে তোমার সঙ্গে ছিলাম সেইটে জানতে পারে নি।

সুবল হি হি ক'রে হাসতে লাগল।

॥ ৭ ॥

পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকে এই ক'টা মাস বেশ কাটছিল। জুনের মাঝামাঝি আসতেই আবার সেই দুশ্চিন্তা।

রামকিঙ্করেরও, হরেকৃষ্ণেরও।

রামকিঙ্কর ভাবে কি জানি কি হয়।

হরেকৃষ্ণও।

একজনের ফেলের দুশ্চিন্তা, অন্যজনের পাসের।

দু'জনের সমান দুশ্চিন্তা। এবং সেই যন্ত্রণায় দু'জনেই শুকিয়ে যেতে লাগল।

রামকিঙ্কর ভাবে: এত কাণ্ডের পরীক্ষা। ফেল যদি করে, হরেকৃষ্ণ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসবে, গিন্নীমা ভাববেন তাঁর টাকাটা জলে গেল, বন্ধুরা হাসবে না হয়ত, তবু তাদের সামনে মুখ দেখাবে কি ক'রে?

হরেকৃষ্ণ ভাবে, রামকিঙ্কর যদি পাস করে, করবে না হয়ত, কিন্তু যদিই করে, সে সহ্য করবে কি ক'রে? তার সামনে ছেলেটা বুক ফুলিয়ে বেড়াবে, সে অসহ্য। তা ছাড়া, তার উপর গিন্নীমার নজর পড়েছে। একবার তার বাবা তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে গেছে, এ যে আবার একটা ধাক্কা দেবে না, কে বলতে পারে?

দোকানের যথারীতি কাজকর্মের মধ্যে দু'টি চিত্তের অন্তস্তলে দু'টি পরস্পরবিরোধী চিন্তা ফোঁপাতে লাগল।

ইতিমধ্যে একদিন সকালে বিশ্বনাথ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে উপস্থিত।

রাস্তা থেকে হাঁকতে হাঁকতে আসছে—রাম! ও রাম!

হাতে তার গেজেট।

রামকিঙ্কর তখন কি একটা কাজে ভিতরের গুদামে।

হরেকৃষ্ণ তার কাঠের হাতবাক্সের সামনে শক্ত হয়ে গেছে। বুকের স্পন্দন শুব্ধ হয়ে গেছে।

সহকর্মীরা ছুটে এল: কি ব্যাপার! কি ব্যাপার!

এক নিশ্বাসে বিশ্বনাথ বললে, রাম পাস করেছে, প্রথম বিভাগে! কই সে! কোথায় সে!

সকলে সমস্বরে বললে, পাস করেছে?

—হ্যাঁ, ফার্স্ট ডিভিশনে।

—আপনি?

—আমিও, কই সে?

সকলে সমস্বরে ডাকতে লাগল: রাম! ও রাম!

একজন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধ'রে নিয়ে এল।

বিশ্বনাথ তাকে জড়িয়ে ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠল—আমরা দু'জনেই পাস করেছি। দু'জনেই ফার্স্ট ডিভিশনে।

রামকিঙ্কর যেন কি রকম বোকা হয়ে গেছে। যেন কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছে না। এর-ওর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাইছে। দেহটা কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে।

বিশ্বনাথের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে বললে, আমিও ফার্স্ট ডিভিশনে!

—হ্যাঁ। দু'জনেই।

বিশ্বনাথ গেজেট খুলে দেখালে।

তাই বটে।

—তোমারটা ?

বিশ্বনাথ তার নিজের রোলটাও খুলে দেখালে। প্রথম বিভাগ, কিন্তু লেটার পেয়েছে তিনটে।

এতক্ষণে রামকিঙ্করের স্বাভাবিক উৎসাহ ফিরে এল। বিশ্বনাথকে সে জড়িয়ে ধরল—এই রকমই আমি আশা করেছিলাম। তুমি ষ্ট্যাণ্ড যদি নাও কর, স্কলারশিপ একটা পাবেই।

—কি জানি কি হবে। চল, মা ডাকছেন।

হ্যাঁ, মাসীমাকে প্রণাম করতে যেতে হবে। গিন্নীমাকেও। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

আর, হ্যাঁ, হরেকৃষ্ণকেও একটা প্রণাম করা দরকার, মনে তার যাই থাক্।

রামকিঙ্কর হরেকৃষ্ণকে একটা প্রণাম করলে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও হরেকৃষ্ণ নিবিষ্টচিত্তে খাতা দেখছিল। এমন নিবিষ্টচিত্তে যে রামকিঙ্কর তাকে যে প্রণাম করলে, তা সে জানতেও পারলে না।

স্থলোচনা ওদের জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন।

রামকিঙ্কর তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। স্থলোচনা শিরশ্চুম্বন ক'রে আশীর্বাদ করলেন।

বললেন, আজ তোদের সত্যিকারের খাওয়া। রাত্রে এখানে থাবি। এখন একটু মিষ্টিমুখ কর্।

জিজ্ঞাসা করলেন, এবারে কলেজে ভর্তি হ'তে হবে। কি পড়বি ঠিক করেছিস্ ?

রামকিঙ্কর হাসলে। বললে, আমি যে কোনদিন পাস করব, স্বপ্নেও ভাবি নি। যখন স্কুলে পড়তাম, অতি বোকা ছেলে ছিলাম। কোন বিষয়ে পাস করতে পারতাম না। কাকা তাই আমাকে পড়া ছাড়িয়ে চাকরিতে পাঠালেন। পাস করলাম শুধু বিশ্বনাথের জন্যে। কলেজে পড়ার কথা ভাবিই নি।

—এইবার ভাব। স্থলোচনা বললেন,—কোন্ কলেজে পড়বে, কি পড়বে। সময়ও বেশী নেই।

মিষ্টিমুখ ক'রে রামকিঙ্কর উঠল। বললে, সন্ধ্যেবেলায় আসব মাসীমা। এখন একবার গিন্নীমার কাছে যেতে হবে।

—হ্যাঁ বাবা। তাঁর কাছে তোমার আগেই যাওয় উচিত ছিল। তাঁর কাছে তোমার অনেক ঋণ।

সেদিন সঙ্গে সুবল ছিল। আজ সে একা। ফটকের কাছে এসে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। তার পাড়াগাঁয়ের লজ্জা এবং ভয় এখনও কাটে নি।

কিন্তু তাঁরকাছে যেতেই হবে। কোনক্রমে দেহটা ঠেলে-ঠুলে ভিতরে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কি করবে, এমন সময় সেইদিনের সেই চাকরটি কি কারণে যেন বাইরে এল।

ওকে চিনতে পেরে হাসলে।

জিজ্ঞাস করলে, গিন্নীমার কাছে যাবেন ?

—হ্যাঁ।

ভিতর থেকে ফিরে এসে সে বললে, আসুন।

এবারে আর ঠাকুর-দালানে নয়। অন্দরের ভাঁড়ার ঘরে।

রামকিঙ্করকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, পাস করেছ ?

প্রণাম ক'রে রামকিঙ্কর বললে, হ্যাঁ মা। সবই আপনার দয়া।

—না বাবা, ঠাকুরের দয়া। আমি উপলক্ষ্য।

গিন্নীমা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি কি দেবকিঙ্করের ছেলে ?

—হ্যাঁ মা।

—তাই শুনলাম সরকারের কাছে। সে বড় ভাল লোক ছিল। আজ সে বেঁচে থাকলে বড় আনন্দ করত। তোমার মা আছে ?

রামকিঙ্কর আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। কোঁচার খুঁটে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগল। মেঘ মনের মধ্যে ঘুরছিল। স্নেহ ও করুণার শীতল স্পর্শে অশ্রু হয়ে ঝরতে লাগল।

গিন্নীমা সান্ত্বনা দিলেন। মিষ্টিমুখ করালেন।

রামকিঙ্কর একটু শান্ত হলে জিজ্ঞাসা করলেন, কলেজে পড়বে ত ?

—পড়ার ইচ্ছা আছে। আজকাল সন্ধ্যায় কলেজ হচ্ছে। দোকানের কাজকর্ম সেরে পড়া চলে।

—মাইনে লাগবে ত ?

রামকিঙ্কর চুপ ক'রে রইল।

গিন্নীমা বললেন, তোমার ভর্তির টাকাটা সরকারের কাছ থেকে নিয়ে যাবে। আমি ব'লে রাখব। আর—

গিন্নীমা একটু থামলেন, কি যেন ভাবলেন, বললেন, কলেজের মাইনেটাও আমি দোব। পড়া ছেড় না।

তবে আর কি !

রামকিঙ্কর দোকানে ফেরবার পথে স্থলোচনা ও বিশ্বনাথকে সুসংবাদটা দিয়ে এল। স্থলোচনা খুশী হলেন। বিশ্বনাথ ত আনন্দে নাচতে লাগল।

বললে, আমি সায়েন্স নিচ্ছি। তুমি কমার্স নাও।

—কমার্স ? এই দোকানদারী আমার ভাল লাগে

না; তা, তুমি যদি বল তাই নোব। কবে ভর্তি হতে হবে?

—কাল, পরশু। যেদিন সুবিধা।

—তাই হবে।

হবে ত, পথে আসতে আসতে রামকিঙ্কর ভাবতে লাগল, তা হ'লে পরশু সকালে আবার গিন্নীমার কাছে যেতে হবে। তার পরেও প্রতি মাসে আর একবার ক'রে, কলেজের মাইনের জন্যে। সেই গভীর লজ্জার কথা ভাবতেও তার মন কুঁকড়ে গেল।

এ ভিক্ষাবৃত্তি।

সে ভিক্ষুকের পরিবারে জন্মায় নি। যদি তার বাবা বেঁচে থাকতেন হয়ত এর প্রয়োজন হ'ত না। তিনি বেঁচে নেই। দেশে জমি-জায়গা কি আছে জানা নেই। যদি তার মাইনেটা সংসার প্রতিপালনের জন্যে পাঠানোর প্রয়োজন না থাকত, তা হ'লে ভর্তির জন্যে, দু'চারখানা বই কেনবার জন্যে কারও কাছে হাত পাতবার প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু সেখানেও তার হাত-পা বাঁধা। মাইনের টাকা সে ত চোখেই দেখতে পায় না। কথা হয়েই আছে টাকাটা দোকান থেকে সটান তার কাকার কাছে যাবে। তার আর নড়চড় নেই।

সুতরাং হাত তাকে পাততেই হবে। এমন অবসর তার নেই যে, একটা ট্যুইশানী ক'রেও পড়ার খরচ চালাবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকান। তার মধ্যে দুপুরের খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া আর তার অবকাশ নেই।

দোকানে ফিরতেই হরেকৃষ্ণ এক চোট নিলে:

বাপু, ম্যাট্রিক পাস ক'রে তুমি যা ক'রে বেড়াচ্ছ, মনে হচ্ছে এর আগে আর কেউ ম্যাট্রিক পাস করে নি। আজকাল ঝাঁকামুটেও ম্যাট্রিক পাস। মনে ক'রো না, কাল তোমাকে লাট সাহেব ডেকে নিয়ে গিয়ে তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেবে। এই দোকানেই তোমাকে তেলের পিপে গড়াতে হবে। মন দিয়ে কাজ করতে পার চাকরি থাকবে, নইলে থাকবে না।

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল:

সকালে বন্ধুর সঙ্গে সেই বেরিয়ে গেছ, এই ফিরলে। তোমার কাজ কে করবে শুনি? তোমাকে আজ আমি হুঁশিয়ার ক'রে দিলাম, বারান্তরে এ রকম যেন না হয়। আনন্দ ত খুব হ'ল। এবার স্নানাহার সেরে একটু তাগাদায় বেরোও।

দু'জায়গায় খাবার খেয়ে রামকিঙ্করের পেট ভর্তিই ছিল। যেটুকু খালি ছিল এই তিরস্কারেই তা পূর্ণ হয়ে গেল।

সমস্ত সকালটা সত্যই সে কোন কাজ করে নি। কর্মচারীর পক্ষে কাজটা ভাল হয় নি। সে ম্যাট্রিক পাস করেছে ব'লে ত আর দোকানের কাজ বন্ধ থাকবে না।

লজ্জিত ব্যস্ততার সঙ্গে রামকিঙ্কর স্নান ক'রে নিলে। ঠাকুরকে বললে, তার ক্ষিধে নেই, সে খাবে না।

ব'লেই তাগাদায় বেরিয়ে গেল।

কোথায় ট্যাংরা আর কোথায় মেটেবুরুজ। সমস্ত ঘুরে যখন সে ফিরল তখন সন্ধ্যাবেলা। পাওনা টাকার হিসাব বুঝ ক'রে নিলে হরেকৃষ্ণ। কিন্তু মুখখানা তার বজ্রগর্ভ মেঘের মত।

রামকিঙ্করের সেদিকে খেয়াল নেই। তাকে দেখলেই হরেকৃষ্ণের মুখ অমনি হয়। তার চোখে ওটা নতুন কিছু নয়।

হিসাব বুঝিয়ে যখন উপরে এল, পিছু পিছু সুবলও এল।

এক মুখ চাপা হাসি।

—কি ব্যাপার! হাস যে!—রামকিঙ্কর বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—গিন্নীমার কাছে গিয়েছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। প্রণাম করতে।

—তাঁর সঙ্গে আর কিছু কথা হয় নি?

—হয়েছে। আমার ভর্তির ফি আর কলেজের মাইনে তিনি দিতে রাজী হয়েছেন।

—ব্যস্। তাতেই হরেকেষ্ট কাৎ।

—কি রকম?

সুবল হাসতে হাসতে বললে, সকালে তুমি চ'লে যাওয়ার পর একপ্রস্থ বকুনি আরম্ভ হ'ল: ছেলেটার বাড় বড্ড বেড়েছে। বাবুকে ব'লে ওর তেল মারছি। তার পরে তুমি ফিরে এলে, তখন ত তোমার ওপর আর এক প্রস্থ গেল। তার পরে তুমি স্নান ক'রে বেরিয়ে গেলে তার একটু পরেই গিন্নীমার রোকা এল।

—কিসের রোকা?

—তা হ'লে তোমাকে বলি শোন: এই যে দোকান কর্তা দিয়ে গিয়েছেন, অর্ধেক গিন্নীমাকে আর অর্ধেক বাবুকে।

—বাবু কি গিন্নীমার নিজের ছেলে নয়?

—নিজেরই ছেলে। কর্তা জীবিতকালেই বাবুর

বেচাল দেখে যান। তাঁর ভয় হ'ল, ছেলে সম্পত্তি উড়িয়ে না দেয়, সেজন্যে তাঁর বিরাট্ সম্পত্তির অর্ধেক স্ত্রীকে দিয়ে যান।

—মায়ে-ছেলেয় ভাব নেই?

—ভাব থাকবে না কেন? বাবু গিন্নীমাকে খুব মানেন। যাই হোক্ এই দোকানে দুটো হিসাব আছে: একটা গিন্নীমার, একটা বাবুর। রোকা এসেছে, তাঁর হিসেব থেকে তোমার ভর্তির জন্যে একশো টাকা আর প্রতি ইংরেজী মাসে তোমার কলেজের মাইনে দেওয়া হবে। রোকা প'ড়ে হরেকেষ্টর চোখ ট্যারা হয়ে গেল।

দুজনেই খুব হাসতে লাগল।

সুবল বললে, রেগে হরেকেষ্ট ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। ছোঁড়া ওর বাপের মত মিটমিটে শয়তান হয়েছে। এদিকে সাত চড়ে রা নেই, ওদিকে পেটে পেটে মতলব ভাঁজছে। ভেবেছে গিন্নীমাকে পটালেই কাজ হবে! আমিও দেখছি।

রামকিঙ্কর ভয় পেয়ে গেল: আমার কিছু ক্ষতি করবে না ত?

—কচু করবে। ওকে কেউ দেখতে পারে না—বাবুও না, গিন্নীমাও না। বাবুর কাছে যাবার সাহস আছে ওর?

কে জানে আছে কি না, কিন্তু রামকিঙ্কর খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। হরেকৃষ্ণকে সময় দেওয়া হবে না। ওসব লোক সব করতে পারে। কালকেই তহবিল থেকে একশো টাকা নিয়ে ভর্তি ত হওয়া যাক্। তার পরে মাইনের টাকাটা আটকায় ত আটকাবে। সে দেখা যাবে এখন।

জিজ্ঞাসা করলে, ভর্তির টাকাটা হরেকেষ্টবাবু আটকাবে না ত?

—ওরে বাবা! গিন্নীমার রোকা। ওর বাপের ক্ষমতা নেই। কালই টাকাটা তুলে নাও।

— তাই ভাবছি।

রাত্রে আহারাদির সময় পর্যন্ত এই কথাই ভাবলে। শোবার সময় মনে পড়ল বাবাকে আর মাকে। আজ তাঁরা নেই। তার পাস করার সমস্ত আনন্দ যেন নিরালম্ব, নিরাশ্রয়। ক্রমশঃ

—•—

প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে লেখা খোলা চিঠি

(যুদ্ধ নিবারণের একটি দুঃসাহসিক বাস্তব পরিকল্পনা)

অনুবাদঃ শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

প্রিয় প্রেসিডেণ্ট কেনেডি,

আমরা সকলেই—আমেরিকা এবং রাশিয়ার অধিবাসিগণ—মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে বিচরণ করছি। আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ আজ আর দূরের ব্যাপার নয়, আয়োজন তার পূর্ণতায় পৌঁছেছে। সামান্য একটু হিসেবের ভুলে আজ আমরা সকলে না হ'লেও অধিকাংশ মানুষই অকস্মাৎ শেষ হয়ে যাব। কেবলমাত্র আণবিক আতঙ্কের ভারসাম্যই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

অবশ্য আপনি একথা জানেন, কারণ, আপনিই সুবিবেচকের মত বলেছিলেন,"কোন যুক্তিসম্পন্ন মানুষই বোধ হয় যুদ্ধ চাইবে না।"

তবুও, গত শরৎকালের কিউবা সঙ্কটের সময় থেকে আমরা প্রতিদিনই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখছি।

কাজেই এটা একটুও আশ্চর্য নয় যে, মানবের ভাগ্যের উপর ব্যক্তি-মানুষের কোন হাত আছে একথা আজ খুব কম লোকই বিশ্বাস করে। টাইম্‌স্ স্কোয়ার অথবা রেড্ স্কোয়ার-এ গিয়ে যে-কোন লোককে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, যুদ্ধ রোধ করার জন্য তার কি কিছু করণীয় আছে ব'লে সে বিশ্বাস করে? তা হ'লে জবাবে সে সম্ভবতঃ বলবে, "না, এটা কেবল গভর্ণমেণ্টই করতে পারে।"

কাজেই একজন সাধারণ নাগরিক যদি মনে করেন, সব যুদ্ধ রোধ করার মত এমন একটা পরিকল্পনা তিনি বের করেছেন যা কাজে পরিণত করা সম্ভব, তবে সেটা আশ্চর্য বৈ কি! একথা সত্য যে, অনেক অদ্ভুত এবং অবাস্তব বিশ্বশান্তির পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা তাঁকে উপহাস করছেন না, অথবা পাগলও বলছেন না। অনেক সামরিক বিভাগের লোক, পদার্থবিদ্, সমাজসেবী এবং রাজনীতিজ্ঞ স্বীকার করেন যে, ঐ ব্যক্তির বক্তব্য ভেবে দেখবার মত।

এই সব বিশেষজ্ঞরা যেমন তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করেন না, তেমনি এই ম্যাগাজিনের সম্পাদকগণও করেন না। ঠিক যেমন এই বিশেষজ্ঞগণ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত মনে করেন, তেমনি সম্পাদকগণও তাই মনে করেন। সেজন্য Pageant পত্রিকা সাগ্রহে ও সসম্মানে ইঞ্জিনিয়ার হাওয়ার্ড জি, কুর্জ ও তাঁর 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' কল্পনার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছে।

এ কল্পনার মূল ভিত্তি হচ্ছে এই বিস্ময়কর ধারণা: যে-কারিগরী জ্ঞান পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে সেই জ্ঞানের প্রয়োগই আবার এই ধ্বংসকে অসম্ভব ক'রে তুলতে পারে। হাওয়ার্ড কুর্জ ধারণাটা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—"যে কারিগরী বিজ্ঞান মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যায় এবং নিরাপদে মর্ত্যে ফিরিয়ে আনে, সেই বিজ্ঞানেরই প্রয়োগ এখন সম্ভব মহত্তর আদর্শ সিদ্ধির জন্য—যে আদর্শ পৃথিবী থেকে যুদ্ধ একেবারে নির্মূল ক'রে দেবে এবং সকল দেশের সর্বসাধারণ নাগরিকগণ একসঙ্গে নিরাপদে বাস করবে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ বর্তমানে এতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছেন যে, এই মুহূর্তে তাঁরা যুদ্ধেরই বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন।"

এক নজরে মনে হ'তে পারে কয়েকটা পরিকল্পনার মধ্যে যেন 'বাক্ রোজার' গল্পের গন্ধ আছে, কিন্তু কুর্জ লক্ষ্য করতে বলছেন, "বাল্যকালে জন গ্লেন বাক্ রোজারের শূন্যমার্গে দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনী পড়েছিলেন। মাত্র ২৫ বছর পরেই কর্ণেল গ্লেন নিজেই মহাকাশ-যানে পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন। সেইভাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আজ যুদ্ধের বিরাট্ সমস্যাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে।" তা ব'লে কুর্জ এ দাবী করেন না, 'যুদ্ধ-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' কল্পনাটি কার্যকরী হবেই। তিনি মনে করেন, হ'তে পারে, এবং পারে কি না তা আমাদের পরীক্ষা ক'রে দেখা কর্তব্য।

বলা বাহুল্য, হাওয়ার্ড কুর্জ একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর মা পেনসিলভেনিয়া নিবাসী জার্মান, তিনি ছিলেন মেথডিষ্ট সানডে-স্কুলের সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট্। কিন্তু কুর্জ সকল রকম জনসভায় নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন। ৫৫ বছর বয়সে

তাঁর কিছু অর্থ-সঞ্চয় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি ১৫ বছর সময় এবং নিজের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করেছেন। তাঁর এই কাজে স্ত্রী হ্যারিয়েটের পূর্ণ সম্মতি ছিল এবং তিনিও এই পরিকল্পনা নিয়ে হাওয়ার্ডের সঙ্গে কাজ করছেন।

হ্যারিয়েট কুর্জ বলেন, "আধুনিক জগতে দু'টি পথ গ্রহণ করা যেতে পারে; মানুষ তার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য কিছু পার্থিব সঞ্চয় রেখে যেতে পারে অথবা আমরা যে পথ গ্রহণ করেছি তাও করা যেতে পারে—সেটা হচ্ছে, তাদের ভিন্ন প্রকার নিরাপত্তার জন্য কাজ ক'রে যাওয়া। যে পৃথিবী আণবিক রশ্মির ও যুদ্ধের আতঙ্কে সর্বদা সন্ত্রস্ত, সেই পৃথিবীতে অর্থ তাদের কি এমন কাজে আসতে পারে? আমরা সন্তানদের প্রকৃত নিরাপত্তার জন্যই ব্যগ্র।"

কুর্জ-দম্পতি তাঁদের অল্পবয়স্ক সন্তান ১৮ বছরের ব্রায়ান এবং ১৭ বছর বয়স্ক ব্রেণ্ডাকে নিয়ে নিউইয়র্ক-এর চাপ্পাকোয়াতে একটা সাধারণ বাড়ীতে বাস করেন। বাড়ীটা যে জমির উপর অবস্থিত সেই জমিটা এক সময় হোরেস গ্রীলের সম্পত্তি ছিল, কিন্তু সেটা পরে পরিত্যক্ত হয়।

হাওয়ার্ড কুর্জকে আজকাল প্রায়ই ওয়াশিংটনে দেখা যায়। সেখানে কখনও তিনি কংগ্রেস সদস্য এবং সেনাপতিদের সঙ্গে, আবার কখনও অস্ত্র পদার্থবিদ্, ইঞ্জিনিয়ার ও রসায়নবিদ্দের সঙ্গে 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি অত্যুৎসাহী কিন্তু কঠোর বা উৎকট গোঁড়া নন। মুখে সব সময়ে হাসি লেগেই আছে এবং তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মরবার জন্য আরও বেশী নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করবার আগে মানুষ বাঁচবার জন্য নতুন পথ খুঁজে বের করবেই।

হ্যারিয়েট কুর্জ একথা সমর্থন করেন। সদাপ্রফুল্ল কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির এই মহিলার স্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, যখন তাঁরা দু'জনেই আমেরিকার বিমান বিভাগে কাজ করতেন। তিনি বলেন, "কেমন ক'রে যে আমি বিমান বিভাগের সেক্রেটারী হয়েছিলাম জানি না। আমি ওয়েলেসলীতে বাইবেলের ইতিহাসে মেজর হয়েছিলাম।"

তবুও যিশুর উপদেশ তাঁর মনে দৃঢ়ই ছিল। তিনি বলেন, চাপ্পাকোয়া চার্চের সেক্রেটারী থাকার সময়ে তিনি অনুভব করতেন, রবিবার প্রাতে চার্চের অনুষ্ঠান থেকে ধর্ম এমন একটা শক্তিতে পরিণত হ'তে পারে যা মানুষের জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করবে।

ছয় বছর আগে হ্যারিয়েট কুর্জ নিউ ইয়র্কের একটা ইউনিয়ান থিওলজিক্যাল সেমিনারীতে কিছু সময় পড়াশুনা করতেন এবং বর্তমানে যাজক সমাজে তাঁকে গ্রহণ করা হবে তারই অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তিনি যাজকীয় শাসন-ক্ষমতা পাবার জন্য চেষ্টা করবেন না। ধর্মীয় আলোচনা এবং বাস্তব রাজনৈতিক জীবন—এ দু'টির মধ্যে যে ফাঁক আছে তা পূরণ করবার জন্যই তিনি পথ খুঁজতে চাইছেন।

হাওয়ার্ড কুর্জও পেশা বদলেছেন। তিনি বর্তমানে ব্যবসা-পরিচালন পরামর্শদাতা, উৎসাহী এবং স্পষ্ট বক্তা, তাঁর নাম সরকারী মহলে অজ্ঞাত নয়। প্রথমে তিনি পেনসিলভেনিয়ার সরকারী কলেজে শিল্প-বিজ্ঞানের ইঞ্জিনিয়াররূপে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি সামরিক বিমান বিভাগে বৈমানিকের কাজ করেন। তার পর কিছুকাল অসামরিক বিমান বিভাগে কাজ করার পর গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং এয়ার ফোর্সে লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল-এর পদপ্রাপ্ত হন। যুদ্ধের পরে যখন আমেরিকার ওভারসীজ এয়ারলাইন্‌স্ নিউ ইয়র্ক থেকে মস্কো পর্যন্ত বিমানে পাড়ি দেওয়া স্থির করে তখন কুর্জ-দম্পতি কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে দু'বছরের জন্য রাশিয়া সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে যান এবং পরে তাঁরা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির রাশিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটে যান।

একদিন গভীর রাত্রে এই বিমান-বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রদপ্তর থেকে এক টেলিফোন পান, তাতে তাঁকে মস্কো ছুটে যেতে বলা হয়, কারণ, সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হবে তাতে মার্কিন প্রতিনিধিদের জন্য টেকনিকাল বিষয় সম্পর্কে তাঁকে বিশদ ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি বলেন, সেখানেই ১৯৪৭ সালে তিনি বিশ্বশান্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটা পথ খুঁজে বের করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন।

তিনি বলেন, "মে ডে উৎসবে রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে আমি ঝাঁকে ঝাঁকে জেট বিমান উড়তে দেখলাম। যদিও সেগুলি সংখ্যায় বহু এবং উৎকর্ষতার বৈশিষ্ট্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সজ্জিত ছিল, তবুও অধিকাংশ আমেরিকাবাসী ফিরে এলেন এই ধারণা নিয়ে যে, রাশিয়ার লোকেরা অনগ্রসর কৃষক। আমি বুঝেছিলাম, শীঘ্রই তারা আমাদের সামরিক কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে ফেলবে। আমি এই কথা ভেবে আতঙ্কিত হলাম যে, শীঘ্রই আমরা উন্নত

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াব। আমি অগণিত মানুষের ধ্বংসের এই সমরাস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণ করবার পথ খুঁজতে লাগলাম।"

১৯৪৯ সালে রাশিয়া যখন তার প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, কুর্জ তখন তাঁর পরিকল্পনার মূল বক্তব্য বের ক'রে ফেলেছেন। বিমান-পরিচালক অথবা বিমানযাত্রীরূপে যখন তিনি একটা কামরায় বন্ধ হয়ে ঊর্দ্ধ আকাশে উড়তেন এবং চারিদিক্ লক্ষ্য করতেন তখন তাঁর মনে হ'ত একটা সংঘর্ষ বাধলে বাঁচবার কোন উপায়ই নেই। তিনি বলেন, "আমরা আজ ঠিক সেই অবস্থায় আছি, একটা সংঘর্ষের দিকে কামরায় তালাবদ্ধ অবস্থায় চলেছি।" তুলনাটা তিনি এভাবে দিয়েছেন:

"ভূভাগে অথবা সমুদ্রে আমরা সব সময়ই গতি মন্থর ক'রে দিতে পারি, পাল নামিয়ে দিতে পারি, নঙ্গর ফেলে দিতে পারি, গতি রোধ করতে পারি—জরুরী অবস্থায় নিজেদের বাঁচাতে পারি। কিন্তু মানুষ যখন প্রথম মেঘের মধ্য দিয়ে অন্ধ হয়ে এরোপ্লেন উড়িয়ে দিল তখন সে নতুন একটা তীব্র উৎকণ্ঠার যুগে প্রবেশ করল। বিমানচালকগণ একে অন্যকে দেখতে পেতেন না, এড়াবার সময় না দিয়েই চক্ষের নিমেষে সংঘর্ষ ঘটতে পারত। মস্তিষ্ক সতর্ক হবার আগেই সব শেষ হয়ে যেতে পারত।"

কুর্জ বলেন, বিমানচালকগণ বুঝেছিলেন, "আপনি যদি এই মেঘের মধ্যে একটি বিমান চালান এবং আমি অন্য একটি, তখন কোন্ গির্জায় আপনি বা আমি যাচ্ছি, কোন্ রাজনৈতিক দলে আপনি বা আমি আছি, আপনি কোন্ জাতির লোক, অথবা আমি আপনাকে পছন্দই বা করি কি না সে সব কথায় কিছু এসে-যায় না। সংঘর্ষ বাধলে আমরা দু'জনেই মরব।"

কুর্জ বলেন, বিমানযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার রীতি উদ্ভাবন ক'রে বৈমানিকগণ এই নতুন বিপজ্জনক যান্ত্রিক শক্তির হতবুদ্ধিকর অবস্থার বিরুদ্ধে সাড়া দিলেন। এই রীতি কিন্তু বিমানপথের উপর বিশ্বকর্তৃত্ব নয় অথবা বৈমানিকদের জন্য আন্তর্জাতিক আইন নয়।

তিনি বলেন, "প্রত্যেকটি বিমানপথে এখনো নিজের নিজের কর্তৃত্বাধীনে বিমান আছে এবং প্রত্যেকটি বৈমানিক এখনো নিজের বিমান নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু প্রত্যেকেই নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য আকাশে বিপদের সঙ্কেত আগে থেকে ধ'রে ফেলবার রীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা অন্যদের সঙ্গে নিয়ে আত্মহত্যা করার অধিকার পরিত্যাগ করেছেন।"

'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' কল্পনার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে কুর্জ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, বিমান-যাত্রা নিয়ন্ত্রণ নীতি কাজ করতে পারত না যদি তা সকল বৈমানিকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য না হ'ত—যদি তার ইলেকট্রনিক কলাকৌশল মেঘের মধ্যে সকল বিমানের অবস্থান-সঙ্কেত বুঝে নিতে না পারত।

তিনি বলেন, "এইজন্য ঠিক এখনই নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা কাজে আসবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না যে, অন্যে সত্যই নিরস্ত্র হয়েছে। তা ছাড়া এখন যদি সব জাতি আণবিক অস্ত্র থেকে মুক্ত হয় তা হ'লেও যাদের লোকসংখ্যা বিপুল, তারা কেবল তাদের লোকবলের জোরেই অন্যদের এখনো পরাভূত করতে পারবে। তা হ'লে সমস্যাটা হচ্ছে, আণবিক অস্ত্রের অস্তিত্ব উদ্ঘাটন করার জন্য এমন একটা নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি আবিষ্কার করা যা কাউকে বোকা বানাতে পারবে না, কোন জাতিকে অন্যের কথার উপরও বিশ্বাস করার দরকার হবে না, এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রত্যেকে নিজেই সব আণবিক অস্ত্রের অস্তিত্ব বুঝে নিতে পারবে।"

সত্যই কি এটা করা সম্ভব? কুর্জ বলেন, আধুনিক কারিগরী বিজ্ঞান এই সম্ভাবনার এত কাছে আমাদের ইতিমধ্যেই পৌঁছে দিয়েছে যে, বাকীটুকু এগিয়ে গিয়ে আমাদের খুঁজে দেখা কর্তব্য। তিনি বলেন, "ইতিহাসে এই প্রথম একটা বিশ্বাসযোগ্য সর্বজাতীয় আত্মরক্ষা-পদ্ধতি গঠন করা সম্ভব হ'তে পারে, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং সেই সঙ্গে অন্য সকল দেশেরও নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে।"

সহজ কথায়, 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনা এভাবে কাজ করবে:

প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগুলি পৃথিবীব্যাপী গুপ্তচর বিভাগ গঠন করবে, এতে থাকবে তাদের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ। নানা দেশের পক্ষ থেকে, এমন কি রাষ্ট্রসঙ্ঘেও পরিদর্শন-রীতি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে যত প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশী জটিল হবে এই গুপ্তচর বিভাগ। প্রত্যক্ষ গোচরের নানারকম ব্যবস্থার ফলে উদ্ঘাটনের জালটাতে বর্তমানের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং অস্ত্রে পরিণত হ'তে পারে বা সামরিক প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন সব সাজ-সরঞ্জামের অস্তিত্ব ধরা পড়বে। সব কিছুই যুক্ত থাকবে কেন্দ্রীয় সঙ্কেতাগারের সঙ্গে, যেখানে যে-কোন প্রতিকূল গতিবিধি সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বোঝা যাবে। বিপজ্জনক গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে

শান্তিরক্ষার অধিকার-প্রাপ্ত সর্বজাতীয় সংগঠন তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সর্বাপেক্ষা জটিল পরিকল্পনার এটা হচ্ছে অতি সরল বিবরণ। কি ভাবে বাস্তবক্ষেত্রে এটা কাজে পরিণত হ'তে পারে তার কয়েকটা বিশেষ দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হচ্ছে :

তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity) গোপন রাখা অসম্ভব। কারখানা-নিঃসৃত অজানিত তেজস্ক্রিয় রশ্মির ঝড়তি-পড়তিগুলির অস্তিত্ব ধ'রে ফেলার একটা পন্থা হবে প্রত্যক্ষগোচরের যন্ত্রপাতিগুলি নদীর মুখে স্থাপন করা। বিমান থেকে নেওয়া ছবিতেও এইসব ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যাবে, সেই ছবিতে কারখানার চারিদিকের গাছের পাতাগুলির অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে কি না দেখে।

যে সব রেলগাড়ী উৎপাদনের উপকরণ বহন করবে সেই গাড়ীর গায়ে চিহ্নিত করা থাকবে শান্তির উদ্দেশ্যে অথবা সামরিক উদ্দেশ্যে সেগুলি ব্যবহৃত হবে এবং ইলেকট্রনিক পন্থায় তার আওয়াজ শুনবার ও গন্তব্য জানবার ব্যবস্থা থাকবে। গাড়ীগুলি যদি ভুল গন্তব্যে যায় অথবা যদি কোন স্থানে উপকরণগুলি অঘোষিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তবে তা তৎক্ষণাৎ জানা যাবে।

ভবিষ্যতে আণবিক অস্ত্রসমূহ একটা সুটকেস-এ বহন করা যাবে, সেজন্য বিদেশীদের আগমন-স্থানগুলি প্রত্যক্ষগোচরে আনবার ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত রাখতে হবে, যাতে সর্বব্যাপী তল্লাসী না ক'রেও আণবিক অস্ত্রের অস্তিত্ব ধ'রে ফেলা যাবে।

রাডার, ইন্‌ফ্রা-রেড ক্যামেরা, টেলিভিশন যন্ত্র-সজ্জিত কৃত্রিম উপগ্রহগুলি সবই যেমন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারবে, তেমনি সে কাজ করতে পারবে এরূপ যন্ত্র যা ভূ-কম্পন এবং ভূ-গর্ভের ভিতরে আণবিক বিস্ফোরণ-জনিত কম্পনের পার্থক্য ধরতে পারে এবং যে-যন্ত্র আলো, উত্তাপ, শব্দ এমন কি বীজাণু-ঘটিত প্রক্রিয়ায় সাড়া দেবে। এই সমস্ত তথ্য বিশাল গণনাগারে চ'লে যাবে যেখানে যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন সব উপকরণ ও ক্রিয়াকলাপের তথ্যগুলি অবিরাম আসতে থাকবে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যই সরকারী তথ্যাগারে সংগৃহীত থাকবে।

এই কল্পনার বিশালতায় ও ব্যাপকতায় পূর্বের সমস্ত পরিদর্শন-পরিকল্পনা ও বিশ্ব-পুলিস পরিকল্পনা তুচ্ছ হয়ে যায়। সোজা কথায়, এতে কোন জাতিকে অন্যের মুখের কথাকে আমল দিতে হবে না, কারণ, বাস্তব যন্ত্রগুলিই তথ্য সরবরাহের কাজ করবে! কুর্জ বলেন, "হিসাব-রক্ষার যন্ত্র হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক। তার নিজের কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির মতলব নেই।" এই কথাটা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য যেখানে বহু জাতি অপরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রাদি সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে।

তার উপর, অসংখ্য প্রধান প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রগুলিতে সঙ্কটজনক সংবাদগুলি তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করা হবে এবং সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদল এক নজরেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ঘটনা বুঝতে পারবে। এই ভাবে, যখন খোলা আকাশ ("open skies") পরিকল্পনার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে ক্রমাগত বৈমানিক নিরীক্ষা চলবে, তখন দেখা যায়, 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনা দ্বারা সংবাদ সরবরাহের সময়টা অনেক কমে গেছে, এমন কি দিন এবং ঘণ্টা থেকে মিনিটে ও সেকেণ্ডে নেমে গেছে। গত শরৎকালে কিউবাতে সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্রের উপস্থিতির প্রমাণ পেতে আমাদের বিমানের কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল, 'যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনায় এই ক্ষেপণাস্ত্রের গতিবিধি, তাদের জাহাজঘাটা ত্যাগ করবার আগেই বুঝে ফেলতে পারবে।

কুর্জ বলেন, "তা ছাড়া, সামরিক যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান অধিকার করতে পারে শান্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সব সমবায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকল জাতির বৈজ্ঞানিকগণই এই ব্যবস্থাকে বানচাল ক'রে দেবার চেষ্টা করবেন। যতবারই তাঁরা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইবেন ততবারই ফাঁকি দেবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভাবে এই পরিকল্পনাটি ক্রমাগত সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে।"

কুর্জ মনে করেন, এত বড় বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনায় কোন জাতিকেই তার সার্বভৌম অধিকার বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করতে হবে না। প্রত্যেক দেশেরই তার নিজের লোকেদের ইচ্ছা ও ঐতিহ্য অনুসারে রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার স্বাধীনতা থাকবে। 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনাতে "মানুষের বিশ্ব-মহাসভা" থাকবে না, যে মহাসভা আমাদের সংহতি সম্পাদনের উপায় ব'লে দেবে অথবা রাশিয়াকে তার নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেবার পথ ব'লে দেবে। জাতিগুলির মধ্যে মত-পার্থক্য ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু তাদের বিরোধ আদিম ধ্বংস ও হত্যার স্তরের ঊর্ধ্বে উঠবে।

হাওয়ার্ড কুর্জের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি দাবি করেন না যে, তাঁর এই শ্বাসরোধকারী বিরাট্ পরিকল্পনা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ইতিমধ্যেই কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে অথবা শীঘ্রই সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, "আমি শুধু মনে করি, এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা সম্ভব কি না তা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে।"

তবুও কুর্জের পরিকল্পনা যতদূর যেতে সাহস করেছে আমাদের অর্জিত পারদর্শিতা তার চেয়েও বেশী দূর এগিয়ে গেছে। গত দেড় বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫-৩০টা "গোপন" কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করেছে, এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি-আধুনিক "গুপ্তচর" বৃত্তির কাজ আমাদের জন্য ক'রে যাচ্ছে। ইন্‌ফ্রা-রেড তাপ অনুসন্ধানী উপগ্রহ ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটিগুলি খুঁজে বের করছে, এবং অন্যান্য উপগ্রহগুলি আণবিক-রশ্মিপূর্ণ মেঘের সন্ধান করতে পারে এবং সাইবেরিয়ার উপর দিয়ে তার পশ্চাৎ অনুসরণ করতে পারে। মেঘগুলি যখন সমুদ্রের উপর দিয়ে যায় আমাদের বিমান তখন তার ভিতর দিয়ে যায় প্রত্যক্ষগোচরের কৌশল নিয়ে এবং তাদের আণবিক শক্তির ক্রিয়া পরিমাপ করে।

কুর্জ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনাকালে একজন ইঞ্জিনিয়ার, যিনি প্রাক্তন বিমান অফিসারও, বলেন, "আমাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে বর্তমান প্রত্যক্ষগোচরের যন্ত্রগুলির উদ্দেশ্যকে পরিবর্তিত করা, এ ধরণের আরও যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন করা এবং সেগুলির সমন্বয় সাধন ক'রে একটা সুশৃঙ্খল সংহত প্রণালীতে পরিণত করা।"

যাঁরা অস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত, এমন কিছু লোক স্পষ্টই বলেন, 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনা কাজে পরিণত হ'তে পারে। ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট সোসাইটি অব আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট র‍্যাল্‌ফ্ এইচ. ট্রূপ মনে করেন, "সতর্কীকরণ যন্ত্র, স্মরণকারী যন্ত্র এবং হিসাবরক্ষাকারী যন্ত্রের পারদর্শিতা অতি দ্রুত উন্নত হচ্ছে। যে কতগুলি সমস্যা আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার চেয়ে 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনা কারিগরী বিজ্ঞানের দিক্ থেকে বেশী কঠিন নয়।"

"কম্পিউটার্স এ্যাণ্ড অটোমেশন" কাগজের সম্পাদক এডমাণ্ড সি. বার্কলে বলেন, এই পরিকল্পনাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা, যা রাজনৈতিক দিক্ থেকে কাজে পরিণত করা সম্ভব হ'তে পারে, কারণ, "এটা সর্ব জাতির স্বার্থের জন্য কাজ করবে যৌথ সতর্কীকরণ প্রথায়।"

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের অধীনে "সিভিল এ্যাণ্ড ডিফেন্স মোবিলিজেশন" অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এইচ. বার্ক হর্টন্ বলেন, "মানব জাতি টিঁকে থাকবে একথা যদি আমরা বিশ্বাস করি তা হ'লে অস্ত্র-শস্ত্রের উপর কোনপ্রকারের যুক্তিসঙ্গত বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রতি আমাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রাখতে হবে। যে কারিগরী জ্ঞানের প্রতিভা এই সব অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করেছিল তাকে এখন সেই সব অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবার কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন করতেই হবে। 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান'-এর মত একটি পরিকল্পনার কথা এখন আমাদের প্রত্যয়যোগ্য ও তার পরিণতির দিকেও আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে।"

কুর্জ নিজেই স্বীকার করেন যে, তাঁর পরিকল্পনা "মানুষের কঠিনতম কাজ হ'তে পারে", কিন্তু তিনি মনে করেন, আপনি, প্রেসিডেণ্ট কেনেডি, মানবজাতির এই টিঁকে থাকার সঙ্কটজনক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে পারেন, এর সম্ভাবনার বিষয় ভেবে দেখবার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের উপর কর্তব্য সম্পাদনের ভার দিয়ে।

তিনি বলেন, "আমরা যদি এ কাজ আরম্ভ না করি, তবে রাশিয়ার লোকেরা করবে। প্রকৃতপক্ষে তারা আভাস দিয়েছে যে, ভূমিকম্পন-সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক-ঘাঁটির বিশ্বব্যাপী জালবিস্তার হয়ত একটা সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে। যদিও আমার পরিকল্পনার জটিলতা এর চেয়ে ঢের বেশী, কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিক গোপনীয়তা বিশেষ কিছু আর নেই, এবং রাশিয়ার লোকেরা অতীতে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা কার্যকরী ভাবে এবং সাহসের সঙ্গে কাজ করতে পারে। আমরা যদি প্রথমে কাজটা করি তা হ'লে আমরা পৃথিবীর কাছে সদাচারী মহাশক্তি রূপে পরিগণিত হব।"

যাঁরা বৈজ্ঞানিক নন, তাঁরা 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনার কারিগরী অকাট্যতা বিচার করবার যোগ্য নন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের দ্বারা সমর্থিত এই পরিকল্পনা প্রচার করবার দায়িত্ব তাঁদের আছে এবং সেই ভাবেই এখানে এই সংবাদ পরিবেশিত হ'ল।

প্রেসিডেণ্ট মহাশয়, যদি আমরা রাশিয়ার লোকেদের 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনার অনুসন্ধানকার্যে এবং অগ্রগতির কার্যে যোগদানে প্ররোচিত

করতে পারি তা হ'লে ত ভালই। যদি তারা অনিচ্ছুক হয় তবে আমরা নিজেরাই এগিয়ে যাব—নিরস্ত্র না হয়ে—এবং তাদের কাছে এমন একটা পরিকল্পনা উপস্থিত করব, যার কার্যকারিতা সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করা যায়।

হাওয়ার্ড ও হ্যারিয়েট কুর্জ এবং তাঁদের প্রখ্যাত সমর্থকগণের মত এই পত্রিকাও মনে করে যে, উচ্চ-স্তরের লোকেদের এই সুমহান্ সম্ভাবনাকে গভীর মনোযোগের সহিত ভেবে দেখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। 'যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান' পরিকল্পনা পুরোপুরি ভাবে কাজে পরিণত হ'তে বহু বৎসর সময় লাগবে, এবং সেজন্যই এই বিবেচনার কাজটা যত শীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করা উচিত।

যদি এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব না হয় তবে ক্ষতি কিছুই হবে না।

যদি এটা কার্যকরী হয় তবে যুদ্ধবিহীন পৃথিবীর দিকে পথ নির্দেশ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর সারা বিশ্বের কৃতজ্ঞতা বর্ষিত হবে।

সসম্ভ্রমে ভবদীয়
হ্যারল্ড মেহ্‌লিং

—•✱o—

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (এবং তার আগেও(প্রবাসী বাঙালী কবি আগ্রা (?) নিবাসী গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের (?)

"কত কাল পরে বল, ভারত রে,
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।"

ইত্যাদি গানটি গীত হ'ত। এই গানটিরই অন্তর্গত—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর দাসখতে সমুদয় দিলে"

পংক্তি দুটি একসময় 'প্রবাসী'র মলাটে উদ্ধৃত হত, এবং এরই শেষে আছে—

"পরদীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

অক্ষয়কুমার দত্ত রস-সম্ভারপূর্ণ কোন গ্রন্থ লেখেন নি। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি, তাঁর "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ" এবং তাঁর "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদ বৈজ্ঞানিক গদ্য এবং গম্ভীর ও ওজস্বিতাপূর্ণ গদ্যের উৎকৃষ্ট নমুনা বিস্তর আছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অন্য সব রচনা ছেড়ে দিলেও তাঁর "সফল স্বপ্ন" এবং শিবাজী ও রোশিনারা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গল্পগুলিতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বেশ পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আত্মচরিত" প্রাগ্‌বঙ্কিম যুগের গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এইরূপ লেখকদের গদ্য বিবেচনা করলে মনে হয়, বঙ্কিমই প্রথমে এবং একাই আধুনিক গদ্যকে প্রায় শৈশব থেকে যৌবনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন বললে যেন অত্যুক্তি করা হয়। তাঁর সমকালিক লেখক কেশবচন্দ্র সেন সুলভ-সমাচারে যে গদ্য ব্যবহার করতেন তা সহজ সরল ও কথ্য বাংলার গা ঘেঁষা।

—১৫।১০।১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রের দু'টি অংশ।
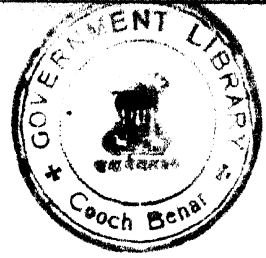
আঁধার রাতে একলা পাগল

শ্রীসমীর সেনগুপ্ত

'না বুঝে প্রথমবার, তারপর থেকে সহজেরে
অসহ আত্মীয় জেনে কেবল খুঁজেছি ঘুরে ফিরে…'
শিল্পীর উত্তর : শ্রীবুদ্ধদেব বসু : যে আঁধার আলোর অধিক।

বাড়ী থেকে বেরোবার সময় সব ভাল ছিল; কিন্তু তারপর কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

সব ভাল ছিল: বৃষ্টিময় দুপুরে আরমদায়ক ঘুম, উঠেই বিছানার পাশে ধোঁয়া-ওঠা চায়ের পেয়ালা, সদ্য-মেঘভাঙা বোলতা-রঙের রোদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সন্ধ্যাটা মনোরমভাবে কাটানোর চমৎকার প্ল্যানটা মাথায় আসা; ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে নেয়া তক্ষুণি, তারপর ধোপভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি চড়িয়ে, চুল আঁচড়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়া; বাসটাও আশ্চর্যরকম ফাঁকা, সোজা দোতলায়, একেবারে সামনে বাঁদিকে প্রিয় সিটটাতে বসতে পেয়ে-যাওয়া জানলার ধারে,—সমস্তই যেন সহজে, নতুন-কেনা বিজলী পাখা থেকে হাওয়ার মত মসৃণভাবে বেরিয়ে এল। সামনে কার্নিশ মত লোহাটার উপরে পা তুলে দিল সে, জানলায় হাত রেখে বাইরে তাকাল। নিচে স'রে স'রে যাচ্ছে চিরচেনা বৌবাজার, বাঁক নিয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীট, পরিচিত সাইনবোর্ড, ওই দোকানির কাছ থেকে সস্তায় পুরোনো রেকর্ড কিনেছিল, ছবি তুলিয়েছিল ওই ষ্টুডিও থেকে। সমস্তই পুরোনো, পরিচিত, প্রিয়; আর ততক্ষণে সূর্য চ'লে এসেছে সামনে, দূরে রাজভবনের ফটকের তলা দিয়ে দীর্ঘ বর্শার মত একটা রশ্মি রাস্তাটাকে বিঁধে আছে। সেদিকে তাকিয়ে পুরো ছবিটা বুঝে নিতে ওর যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণে বাস পেরিয়ে গেছে চাঁদনিচক, ঘণ্টা বাজানো ছোট্ট গির্জা, বর্ষাতির বিজ্ঞাপনওয়ালা দোকানগুলো ছাড়িয়ে গিয়ে চৌরঙ্গিতে মোড় নেবার আগে লালবাতিতে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। কতগুলো মোড় আছে, সেখনকার লাল বাতিকে তুমি কিছুতেই এড়াতে পারবে না। শ্যামবাজারের মোড়, পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়, হাওড়া ব্রিজে উঠবার আগের মোড়, আর এই ধর্মতলা-চৌরঙ্গি। পা নামিয়ে নিল সে, সামনের জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

বাসটার সামনেই কালো রঙের মস্ত একটা গাড়ি, ভিতরে একজন প্রৌঢ়া মহিলা ব'সে আছেন। বসার ভঙ্গিটা পরিচিত ব'লে মনে হ'ল তার, ভাবতে চেষ্টা করল মহিলাকে কোথাও দেখেছে কি না। ভাবতে-ভাবতে নম্বরটার দিকে চোখ পড়ল তার। ডবল্যু বি ডি ৩৭১৫। না, গাড়িটা তার পরিচিত নয়। সবুজ আলো জ্ব'লে উঠল, মোড় নিল বাসটা। আর তক্ষুণি হঠাৎ কথাটা মনে হ'ল তার। তাই ত, এটা ত সে খেয়াল করে নি। লাফিয়ে উঠে সামনের জানলা দিয়ে তাকাল, কিন্তু কালো গাড়িটাকে আর দেখতে পেল না।

গাড়িটার নম্বরে চারটে সংখ্যাই বিজোড়। চারটেই বিজোড় সংখ্যা, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত নয় কি? অবিশ্যি অদ্ভুত-ই বা কি আর এমন—সে ভাবতে লাগল, বাস ততক্ষণে চৌরঙ্গির ষ্টপেজ ছাড়িয়েছে। আরও কত গাড়ি আছে, যাদের নম্বরের চারটেই আলাদা-আলাদা জোড় কি বিজোড় সংখ্যা—থাকা ত উচিত অন্তত! অঙ্কের হিসেবে অন্তত সেকথাই বলে। দেখাই যাক্—ভাবল সে—এখান থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত যেতে কতগুলো শুদ্ধ বিজোড় সংখ্যাওলা নম্বরের গাড়ি দেখা যায়। আচ্ছা, জোড় সংখ্যই হোক। বেশ মজার খেলা—সময়টা কাটবে ভাল, চারটেই আলাদা-আলাদা সংখ্যা হ'তে হবে, একই সংখ্যা দুবার থাকলে চলবে না- শূন্য থাকলে চলবে না। দেখতে দেখতে অনেকটা পথ পেরিয়ে গেল, বাস আটকাল পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে। অনেকগুলো গাড়ি সারবেঁধে দাঁড়ায় এখানে, ভেবেছিল প্রথমটা এখানেই পেয়ে যাবে—পেল না। না-পেয়ে নিরাশ হ'ল, একটু জেদও চাপল একটুখানি। দেশপ্রিয় পার্ক অবধি যেতে অন্তত পাঁচটা গাড়ি বার করবেই—অনেকটা এই রকম একটা প্রতিজ্ঞাগোছের ক'রে নিয়ে সিধে হয়ে বসল। সে বসেছে গাড়ির বাঁদিকে- সেদিক্ দিয়ে বেশী গাড়ি যাচ্ছে না, অথচ ডান-দিকের সিটগুলো সব ভর্তি হয়ে গেছে। উঠে বসল সে, ঝুঁকে প'ড়ে সামনের জানলা দিয়ে পুরো রাস্তাটার উপর তীক্ষ্ণ নজর ছড়িয়ে দিল।

কিন্তু নিরাশ হ'তে হ'ল তাকে। সামনে, পিছনে,

ডাইনে, বাঁয়ে শত শত গাড়ি তাকে পার হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি গাড়ির নম্বর প্লেট লক্ষ্য করছে সে, কিন্তু একটাও মিলছে না। এলগিন রোড পেরিয়ে গেল, পেরোল জগুবাবুর বাজার, আশুতোষ কলেজ, হাজরার মোড়। বেশ হালকা মনে সে খেলাটা আরম্ভ করেছিল; কিন্তু রাস্তা যত পার হয়ে যেতে লাগল, চারপাশ দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগল গাড়ির স্রোত, ততই যেন ব্যাপারটা আর খেলা রইল না তার কাছে; জানলার রডটা দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রে, সিট থেকে প্রায় উঠে প'ড়ে জানলা দিয়ে মাথা বার ক'রে, রাস্তার দিকে চেয়ে রইল সে; নম্বর মিলল না। তিনটে জোড়, একটা বিজোড়; একটা বিজোড়, পরেরগুলো জোড়; সবগুলো জোড় সংখ্যা, মাঝখানে খামকা একটা শূন্য; কিছুতেই মিলল না, এড়িয়ে যেতে লাগল, তার কাম্লিত সংখ্যার আশপাশ দিয়ে স'রে স'রে যেতে লাগল নম্বরগুলো, ধরা দিল না কিছুতেই। এমনি ক'রে বাস যখন রাসবিহারীর মোড় ছাড়াল তখন তার রোখ চেপে গেছে। চারটে পৃথক জোড় সংখ্যাওলা গাড়ির নম্বর একটা দেখবেই সে, দেখতেই হবে তাকে। দেশপ্রিয় পার্ক এল, কিন্তু নামল না সে, নামবার কথা খেয়ালই হ'ল না। পেরিয়ে গেল মহানির্বাণ মঠ, ত্রিকোণ পার্ক, গড়িয়াহাট (এখানে সে চারদিকে তাকিয়ে ব্যাকুলভাবে খুঁজল), একডালিয়া রোড। অবশেষে বালিগঞ্জ স্টেশনে ডিপোর মধ্যে বাস ঢুকতে নেমে পড়ল সে। ফিরে গেল দেশপ্রিয় পার্কে, কিন্তু বাসে উঠল না, হাঁটতে-হাঁটতে গেল, ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে চলল যদি কোথাও একটা তেমনি নম্বর চোখে পড়ে। পড়ল না, বরং জোড় সংখ্যাটাই মোটরের নম্বর থেকে লোপ পেয়ে যেতে লাগল যেন। ৩১১০; ৭৫০৬; ৭৭৩৫; এমনি সব নম্বর চোখে পড়ল তার, আর রাস্তায় অন্য কিছু চোখেই পড়ল না। ঝলমলে সাজ-করা এক প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল তার, মহিলা কটমট ক'রে তাকালেন, কিন্তু সে কিছুমাত্র ক্ষমাপ্রার্থনা না-ক'রে কথোপকথনরত দুই ভদ্রলোকের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেশপ্রিয়র মোড়ে একটা গাড়ির নম্বর দেখতে-দেখতে রাস্তা পার হচ্ছে যখন, আরেকটা গাড়ি প্রায় চাপা দেবার উপক্রম করল তাকে; এক চুলের জন্য বেঁচে গিয়ে ট্রামলাইনের ফুটপাথে উঠল সে, গাড়ির ড্রাইভার হিন্দিতে অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে উঠল, আর তার ঠিক পাশেই একটি কিশোরী তার সঙ্গিনীকে বলল, 'দ্যাখ্ ভাই, গাড়িটার নম্বরটা কী মজার। টু ফোর সিক্স এইট।' কিন্তু ছুটো মন্তব্যের কোনটাই সে শুনতে পেল না, কারণ, সে তখন অপরদিকের রাস্তার একটা গাড়ির নম্বর আলো-আঁধারি ভেদ ক'রে পড়তে ব্যস্ত ছিল।

দরজা খুলে ওকে দেখে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রিণা। বলল, ইস্, কি ক'রে জানতে পারলে আমি সারাদিন তোমার কথাই ভাবছিলাম? না কি কিছুই না জেনে আমার ইচ্ছের জোরে চ'লে এসেছ? এস, এস, ভেতরে এস। বাড়ীর সবাই কোন্নগর গেছে, রাত দশটার আগে ফিরছে না। আমি শুধু র'য়ে গেছি বাড়ী পাহারা দিতে। খালি বাড়ীতে এমন বিচ্ছিরি লাগে যে কি বলব। খালি ভাবছিলাম, যে তোমায় যদি কোন রকমে একটা খবর পাঠান যেত! টেলিফোন না থাকলে—ও কি, দেখছ কি ওদিকে? হাঁ ক'রে?'

—'না, কিছু না—একটা গাড়ির নম্বরটা দেখছিলাম।'

—'কার গাড়ি? চেনা লোক বুঝি?' ব'লে বেরিয়ে এসে রিণা তার কাঁধের উপর দিকে ঝুঁকে তাকাল।

—'না, চেনাটেনা নয়। হঠাৎ মনে হ'ল দেখি চারটেই জোড় সংখ্যাওলা একটা নম্বর দেখা যায় কি না, তা কিছুতেই পাচ্ছি না। সেই ধর্মতলা থেকে দেখতে-দেখতে এলাম, অথচ একটাও পেলাম না।' খুঁজতে খুঁজতে বালিগঞ্জ স্টেশন অবধি চ'লে যাওয়া এবং সেখান থেকে পদব্রজে ফিরে আসার ঘটনাটা সে রিণার কাছে গোপন ক'রে গেল।

তবু রিণা চোখ বড়-বড় ক'রে তাকাল ওর দিকে। তারপর মনোরম ভঙ্গিতে গালে তর্জনী ছুঁইয়ে বলল, 'ওমা, কি ছেলেমানুষ! তা-ই দেখছিলে ওভাবে হাঁ ক'রে? আর এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছ? চল' চল' —ব'লে রাস্তার উপরে যতটা সম্ভব, তার চেয়ে একটু বেশি ঘনিষ্ঠভাবে হাত ধ'রে টেনে ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল রিণা। একটা সোফায় ঠেলে দিল ওকে, নিজে আধশোয়া হ'ল আরেকটাতে। এক হাতের উপর ভর রাখল মাথার, অন্য হাত দিয়ে কপালের উপর থেকে চুল সরিয়ে হাতটা আর সরাল না। ভ্রূভঙ্গি ক'রে তাকিয়ে বলল, 'বল, তোমার খবর বল। সাতদিন হয়ে গেল আসো না। তোমার থীসিস কদ্দুর?'

অন্যমনস্কভাবে সেদিকে ভাবতে লাগল সে। তারা প্রণয়ে লিপ্ত আছে প্রায় পাঁচবছর। তাদের বিয়ে হবে, সবই ঠিক হ'য়ে আছে—শুধু তার থীসিসটা শেষ হ'লেই হয়। অবিশ্যি ওদের প্রেম আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সকলের কাছেই পুরোণো হয়ে গেছে—ওর নিজেরই ঈষৎ

ক্লান্ত লাগে কখন কখন। কিছু একটা ছিল, সেই পাঁচ বছর আগে—যখন তার বয়স ছিল কুড়ি। সেই সময় ধোঁয়া-ঝুলে-থাকা শীতকালের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, বৌ-বাজারের এঁদো গলির পুরোণো এক বাড়ীতে, পুরোণো বাল্‌বের হলদে-ম্লান আলোয় এই মেয়ের মুখে সে কি যেন দেখেছিল। তারপর হারিয়ে গেছে সেই দেখা, যা একবার অতি সহজে, সম্পূর্ণ অতর্কিতে দেবদূতের হাসির মত এই মেয়ের মুখ উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিল, তাকে এই পাঁচবছরের দীর্ঘ অক্লান্ত চেষ্টায় মুহূর্তের জন্যেও ফিরে পায় নি সে। তাই দেখবার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরেছে রিণার সঙ্গে, পার্কে-লেকে-ময়দানে-রাস্তায়, নির্জন ঘরে গভীর রাত্রিতে জেগে ব'সে পাতার পর পাতা চিঠি লিখেছে, জনহীন বর্ষার দুপুরে নির্মম চুম্বনে রিণার নরম অধরোষ্ঠ পিষে দিয়েছে। আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ঠোঁটে হাত চেপে কৃত্রিম ভর্ৎসনায় রিণা বলেছে 'ব্যথা লাগে না বুঝি?' আর সে নিশ্বাস বন্ধ ক'রে তাকিয়ে থেকেছে সেই চুম্বিত মুখশ্রীর দিকে, আশা করেছে এইবার এক লহমার জন্যে সেই হাসি জ্ব'লে উঠবে। কিন্তু না, তা হয় নি। একবার যাকে কিছুই না ভেবে, কোন মূল্যই না দিয়ে পাওয়া যায়, সহস্র চেষ্টা করলেও তা বুঝি আর সারাজীবনেও ফিরে আসে না।

—'কী ভাবছ সেই এসে থেকে? হয়েছে কি?' উঠে পড়ল রিণা, দারুণ লাস্যময় ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে খোঁপা ঠিক ক'রে নিল। 'দাঁড়াও চা ক'রে আনি। যা বাদলা প'ড়েছে, চা না খেলে চাঙ্গা হবে না। মিইয়ে গেছ একেবারে। একটু বোস, কেমন?' বলতে-বলতে ওর কাছে এসে দাঁড়াল রিণা, ক্ষিপ্র লঘুভাবে কপালে চুমু খেল একটি। সে অভ্যাসবশে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল, কিন্তু অভ্যস্ত চটুলতায় রিণা স'রে গেছে ততক্ষণে। আঙুল তুলে ওকে ব'সে থাকার নির্দেশ দিয়ে সে নাচের পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'কোন দোষ নেই', চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে সে ভাবল, রিণার কোন দোষ নেই। নিজের প্রাপ্য কেন বুঝে নেবে না রিণা, জীবন যা কিছু দিতে পারে তার থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত ক'রে রাখবে। প্রেম পেয়েছে সে, স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। আর আমিও ত ওকে কিছু দিতে, ওর থেকে আনন্দ আহরণ ক'রে নিতে কোন দ্বিধা করি নি। কিন্তু আমি ওর ভিতরে যা খুঁজে বেড়াচ্ছি তা ওর আয়ত্তের মধ্যে নেই তার জন্যে ওকে দোষী ক'রে কি লাভ? যা কেউ দিতে পারে না তা আমি ওর কাছে কি ক'রে প্রত্যাশা করব? জানালার কাছে গিয়ে রাস্তায় তাকাল সে। ওধারের ফুটপাথ ধ'রে একটি মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এদিকে পানের দোকানের সামনে থেকে একটি ছেলে তাকিয়ে দেখছে তাকে। কি জানি, ওই ছেলেটা হয়ত এই মুহূর্তে সেই জিনিষ পেয়ে গেল, সারাজীবনেও যা আর খুঁজে পাবে না সে।

অনেকক্ষণ সে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় রিণা এসে বলল, 'চল, আমার ঘরে চা এনে রেখেছি।' আর তারও অনেকক্ষণ পরে, যখন চায়ের পেয়ালাদুটো কঙ্কালের অক্ষিকোটরের মত তাকিয়ে আছে, আর রিণার রিক্ত-প্রসাধন মুখে হারান রতন খুঁজছে সে, তখন হঠাৎ বাইরে রাস্তায় তীব্র হর্ণ বাজাল একটা মোটর। সেই শব্দে তার আবেশ কেটে গেল, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, যেন ভয়ংকর জরুরী একটা কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে। চকিতে উঠে বসল রিণা, গায়ের কাপড় ঠিক করতে-করতে বলল, 'কি হ'ল? এসে গেছে নাকি ওরা সবাই?'

স্খলিত গলায় সে বলল, 'না, তা নয়। তবে—'

—'কি তবে?'

—'ওই গাড়িটা—মনে হ'ল—' হঠাৎ গলায় উৎসাহ এনে এবং কপট ব্যগ্রতা ফুটিয়ে সে বলল, 'আসলে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল প্রোফেসর ঘোষের সঙ্গে সাড়ে সাতটার সময় জরুরি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। কি রকম ব্যস্ত লোক উনি জানোই ত, আর তার ওপর কি খিটখিটে। সময়ের একটু নড়চড় হ'লে আর রক্ষা নেই। ওই গাড়িটার হর্ণটা ঠিক প্রোফেসরের গাড়ির হর্ণের মত, তাইতেই ভাগ্যিস্ মনে প'ড়ে গেল। দেখি, কোথায় গেল চটিটা?' অত্যন্ত ব্যস্তভাবে চটি খুঁজে নিল সে, টেবিল থেকে রিণার চিরুণি তুলে নিয়ে চুলে একবার ছুঁইয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জলভরা গলায় পিছন থেকে ওকে ডেকে বলল রিণা, 'বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেও।' ব'লে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে বালিশে মুখ গুঁজল।

আসলে কিন্তু কোন কাজ নেই তার। গাড়ির হর্ণটাই তাকে টেনে তুলেছে বটে, কিন্তু শব্দটা শুনে ওর কেন জানি মনে হয়েছিল, এই গাড়িটার নম্বরে নিশ্চয়ই চারটে জোড় সংখ্যা থাকবে। কিন্তু বেরিয়ে এসে আর গাড়িটাকে দেখতে পেল না! সামনে ফুটপাথ-ঘেঁষে একটা পুরোণো প্লিমাথ দাঁড়িয়ে আছে, সেটার নম্বর ডবল্যু বি সি ২৭৪৫। সামনে, একটু এগিয়ে একটা বিয়েবাড়ী, ক্ষণকালীন নহবৎখানায় শানাই বাজছে,

সামনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। নানা মেকারের, নানা মডেলের গাড়ি। ছোটবেলায় গাড়ি দেখে নাম চিনতে শিখেছিল, তারপরে বহুদিন আর মাথা ঘামায় নি ও নিয়ে। অবাক্ হয়ে দেখল প্রায় সবগুলো গাড়িই চিনতে পারছে। ডজ, প্লিমাথ, সিত্রোয়ঁ, বেণ্টলি, ওই দুরন্তটা ষ্টুডিবেকার কম্যাণ্ডার, তার পাশে ফোর্ড, এ্যামব্যাসাডর, উলসলে, সানবীম ট্যালবট—সস্তা, দামি, পুরোণো, নতুন, নানা ধরণের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু কোনটার নম্বর চারটে আলাদা-আলাদা জোড় সংখ্যা দিয়ে তৈরী নয়। এদের মধ্যেই কোনটা থেকে হর্ণ বেজেছিল কি না কে বলবে? বিয়েবাড়ী ছাড়িয়ে গেল সে, গলিপথ পেরিয়ে বড়রাস্তায় এসে পড়ল। সাড়ে সাতটা ঠিক ; বাসে উঠল না, হেঁটেই চলতে লাগল মোটরগুলোর দিকে নজর রেখে, যেন সে বাসে উঠলেই নম্বরটা তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে। হয়ত পিছন থেকে এসে চকিতে গলিতে ঢুকে গেল একটা গাড়ি, নম্বরটা দেখতে পেল না সে ; অমনি মনে হ'ল হয়ত ওইটাই তার আকাঙ্ক্ষিত চারটি সংখ্যা পাশাপাশি বহন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত লোক দেখছে নম্বরটা, গাড়ির ড্রাইভার, ক্লীনর, রাস্তার লোক ; নিয়ম লঙ্ঘন করলে ট্রাফিক পুলিস পরম অবহেলার সঙ্গে নোটবইতে টুকে রাখছে সেটা। সত্যি, বিকেল থেকে কয়েক হাজার হয়ত মোটর দেখল সে, একটাও দেখল না সেই নম্বর? হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চ'লে এল, গ্র্যাণ্ড হোটেলের উলটো দিকে থেমে থাকা রাশি-রাশি গাড়ির প্রত্যেকটি দেখল ভাল ক'রে। কোথাও নেই। পথে পথে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ। কখন দশটা, সাড়ে দশটা, এগারোটা বাজল, রাস্তায় মোটরের ভিড় ক'মে এল ক্রমশ, লোকচলাচল কমল, চৌরঙ্গির দেয়ালজোড়া নিয়নের বিজ্ঞাপনগুলো নিবতে লাগল একে-একে। অবশেষে অনেক রাত্রে, ক্লান্ত অসাড় দেহে, ঘুমে ভেঙে-আসা চোখে, বাড়ীর দরজায় এসে ঘা দিল সে। হাতের উলটো পিঠে চোখ মুছতে-মুছতে ছোটভাই এসে দরজা খুলে দিল, জানাল, রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। টলতে টলতে রান্নাঘরে গেল সে, ঘুমে চোখ মেলে রাখতে পারছে না, কি খেল সে নিজেই জানে না, কোন-মতে মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

সেই রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সে।

বিশাল জনতা গিজ-গিজ করছে ; দোকান বাজার মেলা ব'সে গেছে চারদিকে, একজায়গায় একগুচ্ছ গ্যাস বেলুন উড়ছে, রাস্তার ধারেই ব'সে আগুন জ্বালিয়ে হোম করছে কে এক ব্রাহ্মণ। দেশী, বিদেশী, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ রমণী, ধনী, নির্ধন, সবদেশের সবরকম লোক আছে সেই মেলায়। আর সামনে সেই ভিড়ের ভিত্তি-ভূমি থেকে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে এক মন্দির, শেষ সূর্যের আলো প'ড়ে তার চূড়ার স্বর্ণকলস দেব-লোকের কনকদেউলের মত মহীয়ান্। লক্ষ লক্ষ লোক সেই মেলায়, তারা কেউ মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, কেউ বা দেবদর্শনে যাবে। মন্দিরের দুয়ারে এক বিশাল রূপার ঘণ্টা, দেবদর্শন ক'রে বেরিয়ে এসে সবাই তাতে ঘা দেয় ; আর তার চাপা গুম্‌গুম্ শব্দ, সমুদ্রের অতল থেকে উঠে-আসা বাসুকীর দীর্ঘশ্বাসের মত সমস্ত জনতার উপর, জনপদের উপর ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরের সামনে এক বিশাল চত্বর, শত-শত বৎসর ধ'রে কোটি কোটি মানুষের পায়ে-পায়ে তার উপরিভাগ মসৃণ হয়ে গেছে, পাথরের খাঁজে গুল্ম জন্মাতে পারে নি। হাঁটতে-হাঁটতে এসে সে এই মন্দিরের দরজা ধ'রে দাঁড়াল। ভিতরে প্রায়ান্ধকার মণিকক্ষে দীর্ঘদেহ শীর্ণ পুরোহিত, মন্দির নির্মাণের সময় থেকেই তিনি আছেন ; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ফুল, বেলপাতা আর নৈবেদ্য ঘেঁটে-ঘেঁটে তাঁর হাতের মাংসমেদ সব প'চে গেছে, দু'হাতের দশটি হাড়ের শৃঙ্খল দিয়ে অঞ্জলি ক'রে তিনি তবু যাত্রীদের প্রণামী গ্রহণ করেন, প্রতিদানে দেন প্রসাদকণিকা, শুকনো ফুল আর দেবতার চরণামৃত। মন্দিরের বাইরে উজ্জ্বল ময়ূখপ্রভায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়, ভিতরে ঢুকলে ঘন, বন্য অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চলে না। পায়ে-পায়ে ঢুকল সে ভিতরে, হাতড়ে-হাতড়ে আন্দাজ ক'রে গর্ভবেদিকার সামনে এসে দাঁড়াল ; অসীম অন্ধকারে দেবতার মুখ দেখা গেল না। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার মনে হ'ল, কোন দূর বিস্মৃত শতাব্দীতে সে এসে এই মন্দিরের দেবতার সামনে দাঁড়িয়েছিল, দেখেছিল ঈশ্বরের মুখ। কি দেখেছিল সে? বহু স্মরণ বিস্মরণের পরপারে হাত বাড়াল সে, সেদিনের প্রসাদী ফুলের এককণা গন্ধ তুলে আনতে চাইল। অসম্ভব। শুধু মনে পড়ল, কি যেন দেখেছিল সেদিন, এই প্রায়ান্ধকার মণিকক্ষে, ধূপ-গুগ্‌গুল-পুষ্প-চন্দনের সৌরভে মন্থরবায়ু মন্দিরগর্ভে, তা-ই আর একবার পাবার জন্য এই সহস্র বৎসর ধ'রে সে অপেক্ষা ক'রে আছে। আবার তাকাল যেদিকে দেব-প্রতিমা, কিছুই দেখা গেল না। পাশের লোকটি বলল, পুরো এক প্রহর যদি এখানে অপেক্ষা করা যায়, তা হ'লে

নাকি চোখ স'য়ে আসে, দেখা যায় দেবতার মুখ। কিন্তু পিছনে অপেক্ষমাণ অধৈর্য জনতার চাপ পড়ল পিঠের উপর, প্রবল স্রোত তাকে বেদিকার সামনে থেকে তুলে নিয়ে এল যেন, ছুঁড়ে ফেলে দিল পুরোহিতের পায়ের সামনে। প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল সে। এই সেই রহস্যময় পুরুষ, কেবল এঁর কাছেই দেবতা প্রত্যক্ষ। পুরোহিত তার হাতে তুলে দিলেন প্রসাদ, একটি ফুল, মাথায় দিলেন চরণামৃত, গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শুভমস্তু।' তাঁর চোখের দিকে নাকি তাকান যায় না, এত দাহ সেখানে। তাঁর পায়ের দিকে চোখ রেখে সে প্রশ্ন করল, 'আপনি ত রোজ দেখেন দেবতাকে, আপনি আমায় দিতে পারেন, যা আমি সেই প্রথমবার পেয়েছিলাম?' সহসা নিঃশব্দ ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন দেবোপম দীর্ঘ পুরোহিত; ফিসফিসে গলায় বললেন, 'পারি না, পারি না! মূর্খ, চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে!' চোখ তুলে তাকাল সে, তার মনে হ'ল আয়নায় মুখ দেখছে। পুরোহিতের কাঁধের উপর তার নিজেরই মুখ বসান, পুরোহিত সে নিজেই। ভাঙা গলায় বললেন, 'পাই নি, পাই নি, প্রথম দিনের পর কিছুই পাই নি। তবু শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধ'রে ব'সে আছি, প্রতীক্ষা ক'রে আছি যদি আর একবার পাওয়া যায়।' সে আবার তাকাল সেই মুখের দিকে, তার নিজেরই মুখের দিকে, তাকাল তাঁর অস্থিময় হাতের দিকে। তারপর কিছু না ব'লে বেরিয়ে এল। প্রখর উজ্জ্বল সূর্যালোকে দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেল তার। সামনেই মানুষের চেয়েও বড় রূপার ঘণ্টা, রোদ প'ড়ে ঝকঝক করছে। দণ্ড তুলে নিল, প্রাণপণে ঘা দিল ঘণ্টায়।

অমনি কোথা থেকে ছুটে এল এক পাগল। শীর্ণ নগ্ন দেহ, সারা শরীরে কোথাও একটু বস্ত্রাবরণ নেই। মাটি পড়েছে সারা গায়ে, প্রতিটি অস্থি গুণে নেওয়া যায়, একমুখ দাড়ি, চুলগুলো জট পাকিয়ে একরাশ অতিকায় জোঁকের মত ঘাড়ের উপর ঝুঁকে আছে। ছুটে এল লোকটা, শিরাবহুল দুই হাত তুলে, উৎকণ্ঠায় তার স্বর কেঁপে গেল, ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল' 'পেলে? দর্শন পেলে?' বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়ল সে, আর তাই দেখে হতাশায় মাটিতে ব'সে পড়ল পাগল, আকাশের দিকে চোখ তুলে হুহু ক'রে কেঁদে উঠল। বলল, "জানি। কেউ দর্শন পায় না। সেই কবে কোন্ যুগে কত হাজার বছর আগে একবার দর্শন পেয়েছিলাম আমি, তারপরে সে কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর থেকেই এইখানে ঘুরে বেড়াই আমি, আর প্রত্যেককে প্রশ্ন করি, 'পেলে, দর্শন পেলে?' সবাই বলে, 'না পাই নি।' জানে শুধু ওই পুরোহিত। একমাত্র ও-ই শুধু রোজ দেখে দেবতাকে। ওকে যদি একবার হাতে পেতাম আমি!" চোখ জ'লে উঠল পাগলের, হাতের মুঠি দৃঢ়বদ্ধ হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই কান্নায় ভেঙে প'ড়ে আবার বলল, "কিন্তু আমাকে যে মন্দিরে ঢুকতে দেয় না ওরা! বলে, আমি অশুচি, অপবিত্র। আ, একবার যদি ঢুকতে পেতাম।" নোংরা শিরাবহুল হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল পাগল, আর সে কি ভেবে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে পাগলের মুখ তুলে ধরল। আবার ভুল হ'ল তার, মনে হ'ল আয়নায় মুখ দেখছে। পাগলের কাঁধের উপর তারই মুখ বসান, পাগল এবং সে অভিন্ন, একই ব্যক্তি। আর সহসা হাওয়া দিল এলোমেলো, দুলতে লাগল সমস্ত দৃশ্যপট, সমস্ত লোক একসঙ্গে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, পাগল এবং পুরোহিত তার সামনে মুখ এনে চীৎকার ক'রে উঠল, প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের দলবদ্ধ বানরের কলরবের মত। আর ঘুম ভেঙে সে দেখল, বিছানায় রোদ এসে পড়েছে।

সারাটা দিন সে ঘুরে বেড়াল রাস্তায়-রাস্তায়। স্নান করল না, দুপুরে খিদে পেলে খেয়ে নিল যে-কোন এক জায়গায়। জরুরী কাজ ছিল কয়েকটা, গেল না কোথাও। সেই নম্বরওলা গাড়ি একটা দেখতে না-পেলে সে যেন পাগল হয়ে যাবে। সারা কলকাতা পায়ে হেঁটে ঘুরল সে, হেঁটে বেড়াল মাইলের-পর-মাইল। প্রথমে গেল শ্যামবাজারের মোড়ে, ঘণ্টাদেড়েক দাঁড়িয়ে রইল সেখানে; কিন্তু অনেক বড় জায়গা নিয়ে গাড়িগুলো ঘোরে সেখানে, সবগুলো দিকের উপর নজর রাখা সম্ভব হয় না। তাই কিছুক্ষণ পর হাঁটতে আরম্ভ করল সে, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বৌবাজার ষ্ট্রীট ধ'রে ডাইনে ফিরল ডালহৌসির দিকে; দেখতে লাগল প্রতিটি গাড়ি, প্রত্যেকটি। দেখে-দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার, একসঙ্গে পাঁচ-ছ'খানা মোটর পাশ দিয়ে গেলেও প্রত্যেকটির নম্বর দেখে নিতে পারছে এখন। অনেক দৃঢ়, আর অনেক শান্ত হয়েছে তার চলা আজকে। গতকাল রাতের মত তাড়াহুড়ো করছে না, রাস্তা পার হ'তে গিয়ে উপক্রম হচ্ছে না গাড়ি চাপা পড়ার। আর তাছাড়া দৃষ্টিও তার আশ্চর্যরকম তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। বহুদূরের গাড়ির নম্বরও সে প'ড়ে ফেলতে পারছে আজকে। হাঁটতে-হাঁটতে নবলব্ধ ক্ষমতাটা আবিষ্কার করল সে। ততক্ষণে চ'লে এসেছে

হাইকোর্টের সামনে, দীর্ঘ সারিতে সাজান মোটরগুলো দেখতে-দেখতে গঙ্গার দিকে চ'লে এসেছে, হাঁটতে সুরু করেছে বড়বাজারের দিকে। বড়বাজারের অজস্র গলির মধ্যে শত শত মোটর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটা একটা ক'রে দেখে যেতে লাগল সে। ব্রাবোর্ণ রোডে ঘুরতে-ঘুরতে কখন এসে পড়ল এজরা ষ্ট্রীটের সংকীর্ণ গলির মধ্যে। থেমে-থাকা মোটরের অরণ্যে সেখানে পদাতিকের পথ চলা মুশ্‌কিল। তার মধ্যে ঘুরে বেড়াল সে উদ্‌ভ্রান্ত, উদাসীন। রাস্তার ধারে একটা লোক ভিক্ষে চাইতে অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিল, যা হাতে ঠেকল তাই ওর হাতে তুলে দিয়ে অন্য রাস্তায় বাঁক নিল আবার। এমনি ক'রে সারাদিনে হাজার-হাজার গাড়ি দেখে বেড়াল সে, কিন্তু পেল না এমন একটা গাড়ি, যার নম্বরে চারটে আলাদা-আলাদা জোড় সংখ্যা।

ঘুরতে-ঘুরতে সাড়ে তিনটে বাজল। পরিশ্রান্ত হয়ে একটা বড় বাড়ীর সিঁড়িতে ব'সে পড়ল সে। সূর্য হেলেছে, বাড়ীটার এপাশে ঠাণ্ডা ছায়া। একটু পরে বাড়ীর ভিতরে একটা ঘণ্টা বাজল। সে তাকিয়ে দেখল, বাড়ীটা একটা ইস্কুল, ছুটির ঘণ্টা পড়ল এই মাত্র। ছেলেরা বেরিয়ে আসতে লাগল দল বেঁধে, বইভর্তি স্যাচেল আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল কেউ, একজন পকেট থেকে লাট্টু বার ক'রে হাতের উপর ঘোরাতে লাগল, বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে বলতে বেরোল কেউ-কেউ। তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। ছোট্ট একটি ফুটফুটে ছেলে, বোধ হয় একেবারে নিচের ক্লাসে পড়ে, বইয়ের ব্যাগ পিঠের সঙ্গে বাঁধা, হাতে তালি দিয়ে কি যেন বলতে বলতে আসছে। সে কান পাতল, আরও কাছে এল ছেলেটি, সে শুনতে পেল তার আপন-মনে আবৃত্তি—

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাতসাগরের পারে
আমি ছাড়া আর কেহ ত পায় না খুঁজে তারে।
দু'হাতে তার কাঁকন দু'টি, দুই কানে দুই ফুল,
খাটের থেকে মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তার মাণিকগুলি পড়বে ঝ'রে ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমায় কোথা শোন মা কানে-কানে
ছাদের 'পরে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

শুনতে শুনতে দু'চোখ ভ'রে জল এল তার, সেইখানে সেই স্কুলের সিঁড়িতে ব'সে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল সে, ফুলে-ফুলে, নিঃশব্দে। ওই কবিতার ত একদিন তারও অধিকার ছিল, ওই কবিতা কবে একদিন আবৃত্তি ক'রে ঘুরে বেড়াত সে-ও। তার পর কোথায় গেল সেই দিন, সেই সব রোমাঞ্চ, শিহরণ, কবে একদিন না-চাইতেই যা পাওয়া গিয়েছিল পরশপাথরের মত সহসা, আজ হাজার খুঁজেও তার কোন চিহ্ন মেলে না কেন? বেরিয়ে যেতে যেতে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল ছেলেরা, সেই ছোট্ট ছেলেটি পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভয়ে কবিতা বলা বন্ধ ক'রে দৌড়ে চ'লে গেল, আস্তে আস্তে ফাঁকা হ'ল ইস্কুল-বাড়ী, একে একে বেরোতে লাগলেন গম্ভীর মুখ মাস্টারমশাইরা। তার পর চ'লে গেলেন তাঁরাও, ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে গেল, একে একে ঘর বন্ধ ক'রে তালা লাগাতে লাগল দারোয়ান। শূন্য বাড়িতে তার ঝেঁকে-ঝেঁকে তালা লাগানোর শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল কেবল। সিঁড়িতে ব'সে-থাকা একটি ভগ্ন মূর্তিকে আমল দিল না কেউ, তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার মত প্রয়োজনীয় ব'লেও বোধ করল না। তার পর যখন পাঁচটা বাজে, তখন উঠে দাঁড়াল সে, মাথা নিচু ক'রে কোনও গাড়ীর দিকে না তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। আর এক সময় মাথা তুলে দেখল, ধর্মতলা চৌরঙ্গির মোড়। গতকাল ঠিক এই সময় সে এখানে ছিল। ঠিক এই সময়? বাসটা যখন গির্জাটা পার হয়ে আসে, তার মনে পড়ল গির্জার ঘণ্টাতে পাঁচটা বেজেছিল। মুখ তুলে দেখল পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

দু'তিন মিনিট পরে তার বন্ধু পঞ্চানন দেখতে পেল তাকে। দ্রুতপদে রাস্তা পার হয়ে এসে ডাকল, 'এই—এই—'

মুখ তুলে তাকাল সে। বন্ধুকে দেখতে পেয়ে বলল, 'কি রে, তুই? কোথায় যাচ্ছিস?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে পঞ্চানন বলল, 'এ কি চেহারা হয়েছে তোর? চোখ টকটকে লাল, উশকো-খুশকো চুল—' গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে?'

সে ম্লান হেসে বলল, 'কাল বিকেল থেকে একটা গাড়ির নম্বর খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

—'নম্বর? গাড়ির?' পঞ্চাননের হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, ও জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে না ত? ওর হাত ধ'রে বললে, 'চল্, তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। গাড়ির নম্বর কি রে?'

—'হ্যাঁ রে, গাড়ির নম্বর। এমন একটা নম্বর, যার চারটে সংখ্যাই চারটে আলাদা আলাদা জোড় সংখ্যা।'

—'এই খুঁজতে তুই ঘুরছিস কাল থেকে? পাগল

নাকি? এ ত পাঁচ মিনিটে বার করা যায়। দাঁড়া—' এদিক্-ওদিক্ তাকাতে লাগল পঞ্চানন।

—'ওই—ওই যে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছিস্? ওই সবুজ রঙের গাড়িটা? নম্বরটা পড়তে পারিস্?'

পড়তে পারল সে। স্পষ্ট দেখা গেল—ডবল্যু বি ডি ২৪৬৮।

—'দেখলি ত? হ'ল? এখন চল্, বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি তোকে। একটু দাঁড়ালে এক্ষুণি চারটে বিজোড় সংখ্যাওলা নম্বরও পেয়ে যাবি একটা।'

পরের দোতলা বাসটার তলা থেকে যখন ওর নিষ্পিষ্ট দেহটা বার করা হচ্ছে, তখন ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে পঞ্চানন একটা কথা ভাবছিল। চারটে আলাদা আলাদা বিজোড় সংখ্যাওয়ালা একটা গাড়ির নম্বর তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

——

আপনি দেশভক্ত কবি হিসাবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীন চন্দ্র সেনের উল্লেখ করেছেন। তার আগে "পদ্মিনীর উপখ্যান" প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে যাঁর,

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়;
ক্ষণেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।"

বাল্যে কৈশোরে আবৃত্তি করেছি, এখন বার্দ্ধক্যেও উদ্ধৃত ক'রে থাকি।

—১৫।১০।১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।

একশ্রেণীর শব্দ আছে যাহাদের সংস্কৃত অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি বাঙ্গলায় কোন অর্থে প্রযুক্ত তাহা নাই। যথা—অভিধানে "ত" অর্থে—চৌ, বৃষ, অমৃত, পুচ্ছ, পুণ্য; "গো" অর্থে—বৃষ, চন্দ্র, সূর্য্য, স্বর্গ, দৃষ্টি, বাণ, জল, কেশ, কিরণ, বজ্র, ধেনু, বাক্য, বাগীশ্বরী, পৃথিবী; প্রভৃতি আছে।

কিন্তু "তাইত", "না গেলে ত হবে না", "তুমি কে গো", "না গো না", "মা গো"! ইত্যাদির "ত" ও "গো"র কোন অর্থ নাই।

—বঙ্গভাষা ও বাঙ্গলা অভিধান, প্রবাসী—১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, ১৩০৮, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বাংলা উপন্যাসে রোমান্সের প্রাধান্য

শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমের পর রোমান্সের ধারায় নূতনত্ব সংযুক্ত করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমের পরও বাংলা উপন্যাসে রোমান্সের চেয়ে নভেলের ধারাটি বেশী প্রবল হয়ে ওঠে নি। সুতরাং "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে ব্যাখ্যাত শ্রীকুমারবাবুর ঐ মতবাদটি ভুল। রমেশচন্দ্রই প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। তিনি রোমান্সের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সমকালীন সঞ্জীবচন্দ্রও রোমান্টিক উপন্যাস রচয়িতা ছিলেন। তাঁর সরল মাধুরীভরা অযত্ন-সম্ভূত সৌন্দর্যমণ্ডিত রচনা স্নিগ্ধ রোমান্সের পরিবেশ গড়েছে।

বঙ্কিম-রমেশ-সঞ্জীব, এই তিনজন প্রধান ঔপন্যাসিককে নিয়ে বঙ্কিম-যুগ কল্পনা করা যায়; কিন্তু এই যুগের পরও বাংলা উপন্যাসে রোমান্সের প্রাধান্য বিনষ্ট হয় নি। স্বর্ণলতা, মেজ বৌ, স্নেহলতা প্রভৃতি উপন্যাসের ধারা কোন সময়েই পরিপুষ্টি লাভ করে নি। বস্তুত, ব্যক্তি-স্বাধীনতা যেমন নভেলের জন্মদাতা, তেমনি রোমান্সেরও উৎস স্বরূপ। ঐ ব্যক্তি-স্বাধীনতার জোরেই একদা পাশ্চাত্যে রোমান্টিক অভ্যুত্থান সম্ভবপর হয়েছিল। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ধ্বংস না হ'লে তার স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ রোমান্টিকতা কখনও নষ্ট হ'তে পারে না, রোমান্সের রস মানবচিত্ত থেকে লুপ্ত হ'তে পারে না। যদি কোনদিন পৃথিবীর সব দেশের মানব-সমাজ থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়, ফরাসী বিপ্লব ও রোমান্টিক অভ্যুত্থানের বাণী নিঃশেষে স্তব্ধ হয়, কেবল তা হ'লেই চূড়ান্ত বাস্তবানুগামিতা প্রকাশ পেতে পারে। স্বাধীনচিত্ত মানুষ আপন জীবনের গতিপথে চিরদিনই রোমান্স রচনা করবে, আর তার সেই রোমান্টিক জল্পনা-কল্পনা সাহিত্যের বিষয়বস্তুও হবে চিরদিনই; কোন মার্ক্সবাদ বা যান্ত্রিক জীবনাদর্শ তা থেকে মরণশীল মনুষ্য-সমাজকে বিরত করতে পারবে না। মৃত্যুবিমুখ মানবের জীবনমাধুর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষায় রোমান্টিক চেতনার উদ্ভব ও নিত্য নব প্রকাশ একটি স্বতঃসিদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিম ও রমেশের মত বিশেষভাবে রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেন। বঙ্কিম-যুগের লেখক না হ'লেও তাঁর উপন্যাসাবলীতে রোমান্সের ভাগ খুব বেশী। যাঁরা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত "বাস্তবানুগ" বা অন্তত বঙ্কিমের চেয়ে বেশী "বাস্তবানুগ", তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত রোমান্টিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন নন। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি এবং শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব; সেই কবিচেতনা এবং ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য তাঁর সমস্ত উপন্যাসে সুপরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আচার্যপ্রবর সুকুমার সেন এক জায়গায় যা বলেছেন, তা এই উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়:

"প্রকৃত কবি মাত্রেই রোমান্টিক। রবীন্দ্রনাথও রোমান্টিক, অতি-রোমান্টিক বলিলেও চলে।"

জলবায়ুনিরোধক প্রকোষ্ঠের মত এক-এক ধরণের সাহিত্যশৈলীতে আলাদা আলাদা সাহিত্যচেতনা প্রকাশ করা যায় না। যে শিল্পী মূলত রোমান্টিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁর সমস্ত কাব্য রোমান্টিক অথচ তিনি উপন্যাস লেখার সময় "বাস্তবতার প্রবর্তন" করেছেন, এমন সিদ্ধান্ত হাস্যকর। শ্রীকুমারবাবু রোমান্স ও নভেলের যে-সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, নিজেই তা মেনে চলেন নি, সম্ভবত: ও-দুটির পার্থক্য তিনি নিজেও ভাল ক'রে বুঝতে পারেন নি। সেই জন্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আলোচনার সময় তাঁকে মাঝে মাঝে মত পরিবর্তন করতে হয়েছে। নিরুপায় হয়ে তিনি স্বীকার করেছেন—"নৌকাডুবি উপন্যাসটি রোমান্সের ন্যায় একটি বিস্ময়কর সংঘটনের উপর প্রতিষ্ঠিত;...উপন্যাসটির মধ্যে অপ্রত্যাশিত অংশ একটু অনুচিতরকম বেশী এবং এই হিসাবে ইহা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।" নৌকাডুবি যদি ঘটনাবলীর দিক্ থেকে রোমান্স হয়, তা হ'লে এতে "রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সুর ধ্বনিত" হয় কি ক'রে আর সেই সুর শোনাই বা যায় কোথায়? রমেশ-কমলার মধুর সম্বন্ধটা ত একান্তই রোমান্টিক; তার মধ্যে বাস্তবতা কোথায়? তবুও নৌকাডুবি নাকি "বাস্তবতা-প্রধান উপন্যাস"!

প্রসঙ্গতঃ খেয়াল রাখা উচিত যে, রোমান্স কেবল বহির্জগতের ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল নয়, অন্তর্জগতেও রোমান্সের উপযোগী রসলীলার যথেষ্ট অবকাশ আছে; রোমান্টিক কবিতার ভাব, আবহ ও পরিবেশ-বাহী উপন্যাসও রোমান্টিক উপন্যাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। রোমান্টিক কবিতায় রোমান্টিক কল্পনা ও চিন্তার বিকাশ মুখ্য স্থান অধিকার করে; রোমান্টিক উপন্যাসেও তেমনি ঘটনার পরিমাণ যাই হোক না কেন, ভাষা, বর্ণনীয় বিষয়, ব্যক্তিমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা-স্বপ্নের বিবরণ বিশেষত্বের উপর বিশুদ্ধ রোমান্টিকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারে।

এই প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে দু-একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন খাঁটি নভেলের স্বকীয়তা দেখা দেয় নি। সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকদের মত রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয় জানতেন, সাহিত্যে যা-কিছু ঘটনার সম্ভাব্যতা ও ঔচিত্যবিধানের নিয়মাবলী অতিক্রম করে না, তাই বাস্তব এবং যে বিশেষ বস্তুটিকে আজ "বাস্তব" বলা হয়, তা আসলে গড়পড়তা। শ্রীকুমারবাবু-প্রদত্ত নভেলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—"যতদূর সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জনীয়।" অর্থাৎ, যতদূর পারা যায়, গড়পড়তা বা সাধারণকে নিয়ে নভেল লিখতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন উপন্যাসে এই সাংঘাতিক কাজটি করেন নি। গড়পড়তাকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মুখ্যতঃ রোমান্টিক শিল্পীরা সে-কাজ করার চেষ্টা করবেন, একথা ভাবা যায় না। তার কারণ, গড়পড়তা হচ্ছে পারিপার্শ্বিকের একান্ত অধীন সত্তা, তার জীবনে সাহিত্যোপযোগী বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। মানুষ যেখানে তার স্বকীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ করে পারিপার্শ্বিকের পরকীয়তাকে উপেক্ষা ক'রে, সেখানেই সাহিত্যরসের উপলক্ষ্য-উপকরণ, উদ্দীপনা, উন্মেষ, উৎস, উৎসাহ। মামুলি তেল-নুন লকড়ির বিবরণ একঘেয়েমির দোষে পাঠক-চিত্তকে প্রাত্যহিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে না, তথা পাঠকের অন্তঃকরণে রসের উৎসারণ সম্ভবপর করতে পারে না। তাই ত হাক্সলির Eyeless in Gaza-র Anthony Beavis-কে তার রোজনামচায় এই মন্তব্য করতে দেখা যায়:

"Life's so ordinary that literature has to deal with the exceptional. People who are completely conditioned by circumstances—one can be desperately sorry for them; but one can't find their lives very dramatic. Drama begins where there's freedom of choice."

রবীন্দ্রনাথও বহু স্থানে এ কথা নানাভাবে বলেছেন। তাঁর উপন্যাসেও রোমান্সের রসধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। তাঁর ৫৩ বছর সময়ের মধ্যে লেখা ১৪খানি উপন্যাসের মধ্যে ১০ খানিই রোমান্স; তাঁর রোমান্সে কাব্যধর্ম ও অন্তর্মুখিতা প্রবল হলেও উপযুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, উল্লিখিত উপন্যাসগুলি রোমান্স ছাড়া আর কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসই রোমান্টিক। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের গার্হস্থ্য জীবনেও যে রোমান্স থাকতে পারে, প্রভাতকুমার তা বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সব উপন্যাস লিখছেন, সে-সবের আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, তিনিও বিশেষভাবে রোমান্টিক ও আদর্শবাদী ছিলেন। তাঁর গণিকাদরদী রচনাবলীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শরৎচন্দ্র ছন্নছাড়া ভবঘুরে, গণিকা, মেসের ঝি, ছাত্র, কেরাণী, প্রভৃতি নিম্ন মধ্যবিত্ত আর সমাজনিন্দিত ব্যক্তিদের জীবনের অসাধারণ বৈচিত্র্য রোমান্সের র'সে নিষিক্ত ক'রে তাঁর অনুপম সাহিত্যে তুলে ধরেন। যে যুক্তিনিষ্ঠা ও চিত্তবিশ্লেষণ নভেলের প্রাণ, যে বাস্তব ঘটনাবলীর সচরাচরতা নভেলের তথাকথিত বাস্তবিকতার প্রমাণ, শরৎচন্দ্রের দেবদাস, শ্রীকান্ত প্রভৃতি রচনায় তা নেই। পথের দাবি কতকাংশে গোরার মত রাজনৈতিক সমস্যা ও চিন্তাপ্রধান রচনা, কিন্তু ঘটনাবলী নিতান্ত রোমান্টিক।

বাস্তববাদীর দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাসও নভেল নয়। শ্রীকুমারবাবুর মতে, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল—এই চারটি নভেল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গঠনের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারায় তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। কারণ, রজনীর অনেকাংশের অতি-প্রাকৃত ঘটনাবলী যথা, শচীন্দ্রের স্বপ্ন দেখা, রজনীর দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি প্রভৃতি নিতান্তই রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত; অন্য বই তিনটিও অনুরূপ সব ঘটনার অভাবনীয় চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ। বিষবৃক্ষ আর রজনী পারিবারিক উপন্যাস ও ঘরোয়া রোমান্সের নিদর্শন; পাত্রপাত্রীর কার্যকলাপ, ব্যক্তিচরিত্র

ও ঘটনাবলীর নভেলোচিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই বই দু'টিতে এক রকম নেই বললেই হয়। প্রাত্যহিক জীবনে যে সব ঘটনা, মনোবৃত্তি, ভাবের অভিব্যক্তি, পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন মানুষকে হ'তে হয়, তাদের মর্মকথা যুক্তি ও ব্যাখ্যার দ্বারা পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়াই নভেলের কাজ; এর দ্বারাই তার বাস্তবানুগামিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাজ গল্পধর্মী ততটা নয়, যতটা প্রবন্ধধর্মী। রোমান্সে ঘটনাবলী ও পরিবেশ-বর্ণনার প্রাধান্য থাকে ব'লে তা গল্পধর্মী, কিন্তু নভেল চিন্তা ও আলোচনাবহুল ব'লে প্রবন্ধধর্মী রচনা। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের মত ঐ চারটিও গল্পধর্মী রচনা, প্রবন্ধধর্মী নয়; এই বাস্তব সত্য উপেক্ষা করতে না পেরে শ্রীকুমার-বাবুও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে আর একটি বিতর্কের বিষয় এই যে, বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস কোন্ রচনাগুলিকে বলা যায়। যে উপন্যাসের কাজ সমাজজীবন প্রদর্শন করা, এমন সব সমস্যার আলোচনা করা যেগুলি সমাজের বিরাট্ এক অংশকে স্পর্শ করে, সেই রচনাকে সামাজিক উপন্যাস বলা চলে। যে উপন্যাসের একমাত্র কাজ ঘরোয়া সুখদুঃখের হাসিকান্না এমনভাবে রূপায়িত করা, যার ফলে বিশেষ একটি পরিবারের বাইরের বৃহত্তর সমাজের কোন অঙ্গ স্পর্শ করা হয় না; সামাজিক কোন আলোড়ন বা উপন্যাসে আলোচ্য বিশেষ একটি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সুখ-দুঃখ ছাড়া অন্য কোন জনসমষ্টির কথা সে-উপন্যাসের নিতান্ত বহির্ভূত। সামাজিক উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর কাজ সর্বদা সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট। বিধবার বিবাহে যেখানে সমাজে আলোড়ন ওঠে, যেমন রমেশ-চন্দ্রের "সংসার"-এ, সেখানে তা সামাজিক সমস্যা; কিন্তু যেখানে ব্যক্তিবিশেষের বিধবা-বিবাহ গোপনে সমাজের অজ্ঞাতসারে বা ঔদাসীন্যে সংঘটিত হয়, যেমন বঙ্কিম-চন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" আখ্যায়িকায়, সেখানে তা মোটেই সামাজিক সমস্যা নয়, বড় জোর দাম্পত্য বা পারিবারিক সমস্যা। ব্যক্তিবিশেষ সমাজের বাইরে বিধবা প্রণয়িনীকে নিয়ে প্রস্থান করলে সমাজ যদি তাকে নিয়ে মাথা না ঘামায়, তা হ'লে সেই লোকটির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বা পরিবার-সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন তাকে নিয়ে যতই উদ্বিগ্ন হোক্, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এ, ব্যাপারটা একান্ত পারিবারিক সমস্যাই থাকে, সামাজিক হয় না। যেখানে ব্যক্তিবিশেষ নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও নিজেকে সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে প্রস্তুত ক'রে, তার সব কাজ সমাজের মুখ চেয়ে সংঘটিত হয়, সেখানে তার প্রচেষ্টা সামাজিক প্রচেষ্টা ব'লে গণ্য হবে, তার কাহিনী সামাজিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হবে, যেমন হার্ডির "তেস্ অফ দি ডুরবার্ভিল" (১৮৯১) উপন্যাসে দেখা গেছে। কোন উপন্যাসে ব্যক্তির সমাজ-সম্বন্ধীয় সমাজ-সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের ঐ ধরণের বিবৃতি থাকলে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলতে বাধা নেই। তাতে অতীত ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক পরিবেশ থাকতে পারে। তা হ'লেও তা সামাজিক ও ঐতিহাসিক রোমান্স ব'লে গণ্য হবে। এইভাবে বিচার করলে বঙ্কিমের লেখা বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস একটিও দেখা যাবে না। মিশ্র ঐতিহাসিক রোমান্সকেই সামাজিক উপন্যাসের লক্ষণোপেতরূপে ধরা দরকার হবে, যদি তাঁর রচনায় সামাজিক উপন্যাস একান্তই খুঁজে বার করতে হয়। সেদিক্ থেকে, "দেবীচৌধুরাণী" আর "চন্দ্রশেখর", মাত্র দু'টি সামাজিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তসংক্রান্ত কার্যকলাপ, দলনীর লোকলজ্জা ও দুর্নামের ভয়, সবই সমাজসংশ্লিষ্ট ব্যাপার। "দেবীচৌধুরাণী"-তে প্রফুল্লের সমগ্র বিবর্তনটি সমাজের চাপে, সমাজের মুখ চেয়ে, সমাজের মনোরঞ্জনার্থে সংঘটিত। সুতরাং এই দুটিকে বিশেষতঃ "দেবীচৌধুরাণী"-কে সামাজিক উপন্যাস, অবশ্যই রোমান্স ধরণের উপন্যাস, বলা চলে। "বিষবৃক্ষ", "ইন্দিরা", "রজনী" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল"—চারটি উপন্যাসকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই বিশুদ্ধ পারিবারিক উপন্যাস। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ আদৌ সমস্যার আকারে উপস্থাপিত নয়; নগেন্দ্রের কুন্দের প্রতি আসক্তি এবং বিতৃষ্ণা—দু'টি ব্যাপারের সঙ্গে যথাক্রমে রূপমোহ এবং মোহভঙ্গ অবস্থা দু'টি বিজড়িত; বিধবাবিবাহের জন্যে সামাজিক কোন আন্দোলন বা নগেন্দ্রনাথের অসামাজিক কাজ করার জন্যে কোন পশ্চাত্তাপের পরিচয় বইটিতে নেই। নগেন্দ্রনাথের অনুতাপ যা, তা প্রেমময়ী পত্নী সূর্যমুখীকে ত্যাগ করার জন্যে, নিজের রূপমোহসঞ্জাত নিষ্ঠুরতার জন্যে; একটি বিধবাকে বিয়ে ক'রে ফেলে ভুল করার জন্যে নয়, সমাজ-তাড়নায় নিজের দুঃসাহসের অনৌচিত্যের কথা ভেবে নয়। কৃষ্ণকান্তের উইলে বিধবার যৌন ক্ষুধা কতকটা সমস্যার আকারে উপস্থাপিত; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র

সমস্যাটির পূর্ণায়ত রূপ প্রদর্শন না ক'রে যৌবনজ্বালায় পথভ্রষ্টার শোচনীয় পরিণাম রোমাণ্টিক কাহিনীর আকারে সাজিয়ে দিয়েছেন। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিবাহ ক'রে সামাজিক মর্যাদা দিলে উভয়ের প্রণয়ব্যাপার সামাজিক সমস্যার পর্যায়ে উন্নীত হ'ত। কিন্তু সমাজের মধ্যে থেকে ন্যায্য উপায়ে নিজের প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা না ক'রে রোহিণী কেবল যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে অপরের বিবাহিত স্বামীকে নিয়ে সব সমাজের বাইরে চ'লে গিয়ে নিন্দনীয় অসামাজিক জীবন যাপন করতে লাগল। সে যদি ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেও কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করত, তা হ'লেও তার বিদ্রোহ সামাজিক মনের বিদ্রোহ হ'ত, কিন্তু সে যা করল, তা সমাজবিরোধী ব্যভিচারের অসামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র। এক বিবাহিত জমিদারযুবক রূপোন্মত্ত হয়ে এক যৌনক্ষুধাতুরা রূপবতী বিধবাকে নিয়ে নির্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগের পর সব সমাজের বাইরে চ'লে গেলে, দু'দিনের অসামাজিক মনোবৃত্তিপ্রসূ কাম-মোহের যে-পরিণাম হয়, সেই পরিণামই বইটিতে দেখান হয়েছে। এর সমস্যাও রূপমোহসংক্রান্ত এবং উপন্যাসের নামকরণও পারিবারিক উপন্যাসের সূচক। গোবিন্দ-লালকে নিয়ে সমাজের কোন উৎকণ্ঠা ছিল না, ছিল মাধবীনাথের এবং তা নিতান্ত পারিবারিক কারণে।

রমেশচন্দ্রের "সংসার"-এ বিধবা-বিবাহ সমস্যার আকারে উপস্থাপিত; শরৎ ও হেম চরিত্র দু'টিকে প্রবল সামাজিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের সমস্যাও তাঁর উপন্যাসে দেখান হ'য়েছে। কি ভাবে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব সামাজিক মন নিয়ে বিদ্রোহ ক'রে সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রে সমাজের কাছে ন্যায়সঙ্গত দাবি পুরণ করিয়ে নিতে পারে, কি উপায়ে সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত বিদ্রোহকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তার চমৎকার দৃষ্টান্ত 'সংসার' ও 'সমাজ' বই দু'টিতে আছে। অনেক পরে শরৎ-চন্দ্রও তাঁর কোন উপন্যাসে সামাজিক সমস্যার সমাধানে রমেশচন্দ্রের পরিকল্পিত চরিত্রগুলির মত অমন বলিষ্ঠ চরিত্র গ'ড়ে দেখাতে সাহসী হন নি এবং তাঁর মত স্বাভাবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যার স্বরূপবিচার ও সমাধান প্রদান করতে পারেন নি। রমেশচন্দ্র তাঁর ক্ষুদ্রায়তন নভেলে কোন অবাস্তব ভোজবাজির সাহায্য গ্রহণ করেন নি। তিনি সাধারণ মানুষের মামুলি জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার কার্যকরী বাস্তব সমাধান সহজ ঘটনাপরম্পরায় সাজিয়ে যুক্তিসম্মত উপায়ে পাঠকের কাছে এমনভাবে উপ-স্থাপিত করেছেন যে, প্রতিবাদের কোন পথ নেই। সমাজ উপন্যাসে তবু রোমাণ্টিকতার প্রভাব দেখা যায়; কিন্তু সংসার নভেল রচনার সার্থক উদাহরণ। শুধু বাস্তবতার বিচার করলে রমেশচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপন্যাসে শরৎ-চন্দ্রের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; পল্লীসমাজের চরিত্রগুলির চেয়ে সংসারের চরিত্রগুলি ঢের বেশি বাস্তব।

কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রসাদপুরে অবস্থানকালে গোবিন্দ-লাল ও রোহিণীর চিত্তবিপ্লবের উপযুক্ত বিশ্লেষণ, তাদের দু'জনের মানসবিবর্তনের স্তরপরম্পরা পাঠক-সমক্ষে প্রদত্ত হয় নি। নোংরা ব্যাপারের প্রতি ঘৃণাবশতঃ বঙ্কিম ইঙ্গিত ও সঙ্কেতের সাহায্যে পাঠককে দু'জনের আনন্দ বিতৃষ্ণা ও চিত্তবিকার বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই জন্যে এই বইটিকে নভেল বলা সঙ্গত নয়। কেউ কেউ রোহিণীর মৃত্যুকে tour-de-force বা কলমস্ত চোটাৎ সাধিত ব্যাপার ব'লে ধরেন; কিন্তু বইটিকে রোমান্স হিসেবে গণ্য করলে আর এ রকম বিচারমূঢ়তার সৃষ্টি হয় না।

আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী একটি নভেলও বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন নি ব'লে তাঁর অগৌরবের কোন কারণ নেই; বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্র ছিল রোমান্সের; রোমান্সরচনার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব অর্জন ক'রে তিনি তাঁর আসন চিরস্থায়ী করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে ইত্যাদি উপন্যাস-গুলির মধ্যে বঙ্কিমী ধরণের না হ'লেও অন্যরকমের রোমান্স অলক্ষ্য নয়। বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক প্রভাববিজড়িত মহৎ আদর্শবাদী রোমাণ্টিক উপন্যাসযুগল; চোখের বালি পারিবারিক উপন্যাস এবং এতে নভেলের উপযুক্ত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও শেষভাগে বিহারী-বিনোদিনীর প্রণয়পরিণতি রোমাণ্টিক স্বপ্নমধুর আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবিত। এই তিনটি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু প্রভাব অনুভব করা যায়। পরে বঙ্কিমের প্রভাব অপসৃত হ'লেও রোমাণ্টিকতার প্রভাব দূর হয় নি। অন্তর্মুখী রোমান্স হ'লেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে সর্বত্র রোমান্সের ভাবমধুর পরিবেশ বর্তমান। নৌকাডুবি রোমাণ্টিক উপন্যাস এবং পারি-বারিক উপন্যাস। চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে আর যোগাযোগ—এই চারখানি উপন্যাসকে নভেল বলা যায়; গোরা বাস্তবিকই নভেলরূপে রচিত হয়; কিন্তু তারও শেষ দিকে বিচিত্র অতিনাটকীয়তা তথা রোমাণ্টিকতার সমাবেশ করা হয়েছে। গোরার পরিসমাপ্তি নভেলের উপযুক্ত হয় নি। গোরার আইরিশ হয়ে যাওয়া না বাস্তব ঘটনা ও বিশ্লেষণের নীতির দিক্ থেকে ব্যাখ্যাগম্য, না প্রতীক হিসেবে সার্থক, রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাসে রোমান্সের প্রভাব সম্পর্কে সুসাহিত্যিক

সুরসিক অধ্যাপকপ্রবর বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের অভিমত প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা উচিত :—

"বৌঠাকুরাণীর হাট এবং রাজর্ষির মধ্যে রোমান্সের আকস্মিকতা, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা এবং কল্পনাবিলাসই অধিক পরিস্ফুট।…গোরার মধ্যে মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং উপন্যাসোচিত কার্যকারণশৃঙ্খলা যথেষ্ট থাকিলেও ইহার মধ্যে রোমান্সের আকস্মিকতা এবং কৌতূহল কিছু কিছু আছে। যে মূল আখ্যানবস্তুকে ভিত্তি করিয়া গোরা উপন্যাসখানি খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রোমান্সের আকস্মিকতা এবং কৌতূহল ধর্মকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।…নৌকাডুবিকে উপন্যাস ও রোমান্সের একটি বিচিত্র সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে।…(গোরা) উপন্যাসখানির মধ্যে তর্ক, আলোচনা এবং বক্তৃতার যতই আয়োজন থাকুক না কেন, ইহার প্রধান চরিত্রগুলির চরম পরিণতি আসিয়াছে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া, যুক্তি, তর্ক বা আলোচনার পথ ধরিয়া নয়।"

শেষ মন্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের বাস্তবানুগামিতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে যা বলেছেন, তার তুলনায় "কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে বিশ্বপতিবাবু অনেক বেশি রসবোধ ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসখানিকেও কোন দিক্ দিয়েই নভেল বলা যায় না। এ সম্বন্ধে বিশ্বপতিবাবু প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বলেছেন :—

"দামিনী চরিত্রটি যেমন অভিনব, তেমনি অদ্ভুত। …সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী দুইটি চরিত্র সৃষ্টি করিতে গেলে উপন্যাসের ক্ষেত্রকে অনেকখানি প্রসারিত করিতে হয়। ইহার জন্য অনেক আয়োজন, অনেক কলাকৌশলের প্রয়োজন। কিন্তু চতুরঙ্গলেখকের সে ধৈর্য এবং বাসনা কোনটিই নাই। ঔপন্যাসিক বাস্তবতার প্রতি তিনি একেবারেই উদাসীন।…তিনি ঔপন্যাসিক মনোবৃত্তি লইয়া চতুরঙ্গ লিখিতে বসেন নাই।…তিনি এখানে ইচ্ছা করিয়াই ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করিয়া এক নূতন ধরণের অভিনব ভঙ্গিতে মানবজীবনকে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই নূতন ভঙ্গির মধ্যে ঔপন্যাসিকের সুতীক্ষ্ণ, সজাগ দৃষ্টি নাই—আছে কবির কল্পনাজড়িত স্বপ্নময় তন্দ্রালস দৃষ্টি।"

বিশ্বপতিবাবু ঘরে-বাইরে আর যোগাযোগের মত নভেলেও রোমাণ্টিক অবাস্তবতার আভাস লক্ষ্য করেছেন, যোগাযোগে কুমু-মধুসূদন সমস্যার যে লেডি ডাক্তারী সমাধানকে স্বয়ং শরৎচন্দ্র বিদ্রূপ করেছিলেন তা যে নভেলের রীতিসঙ্গত নয় একথা কে না জানে? শ্রীকুমার-বাবুও পরস্পরবিরোধী নানা কথা লিখতে লিখতে এক জায়গায় গোরা-পরবর্তী উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন, "সর্বত্রই উদ্দাম ঝড়ের হাওয়ার মত একটা নিঃশ্বাসহীন চঞ্চলতা উপন্যাসগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।" কিন্তু উড়ে-যাওয়া উপন্যাসে নভেলী অসাধারণত্ববর্জিত বাস্তবতার কথা কি ক'রে আসে? এ সবই নির্বোধের প্রলাপোক্তি মাত্র। এই ধরণের অসংখ্য প্রলাপভাষণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মহাগ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। বিশদভাবে তাঁর ভুল ধরাতে হ'লে একটি বৃহত্তর গ্রন্থ রচনা করা আবশ্যক। আপাতত সে-পণ্ডশ্রমের প্রয়োজন নেই। মোহিতলাল অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে মন্তব্য করেছিলেন, "বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-যুগ, সেই যুগের প্রধান প্রবৃত্তি বাস্তবানুগামিতা নয়।" আমরা আরো দেখতে পাই যে, বঙ্কিম-রমেশ-রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমারে ত নয়ই, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণেও তথা-কথিত বাস্তবচেতনা প্রায়শঃ অনুপস্থিত; এই ছয়জনই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছয়জন ঔপন্যাসিক।

শরৎচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব রোমাণ্টিক উপন্যাস রচনায়; দেবদাস, শ্রীকান্ত, দত্তা—এগুলি রোমাণ্টিক উপন্যাস; তাঁর বিদ্রোহ ব্যক্তিমনের রোমাণ্টিক এবং কতকাংশে অসামাজিক বিদ্রোহ। শ্রীকান্ত এক ভবঘুরের দৃষ্টিতে জগতের বিচ্ছিন্ন চমকপ্রদ ঘটনা ও চরিত্রের শিথিল-বিন্যস্ত বিবরণ ছাড়া কিছু নয়; তা পরম উপভোগ্য বটে, কিন্তু রোমাণ্টিক বৈচিত্র্যের নিজগুণে। এই বিরাট্কায় উপন্যাসটিতে চরিত্রের ক্রমপরিণতি প্রদর্শনকালে যুক্তিসঙ্গত পন্থা সর্বদা অনুসৃত হয় নি, শরৎচন্দ্র যে নভেলগুলি লিখেছিলেন, সেগুলির কোনটিই শ্রীকান্তের মত সুখপাঠ্য রচনা হয় নি। "দেনাপাওনা," "চরিত্রহীন," "গৃহদাহ"—যুক্তির বিন্যাসের ত্রুটির জন্যে প্রায় কোন নভেলই তাঁর রোমান্সগুলির ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না, "শেষ প্রশ্ন" উপন্যাসে তিনি বার বার যুক্তি, তর্ক, ও বিশ্লেষণ এড়িয়ে গেছেন এই কথা ব'লে : মানে নেই, এমনি!—যা নভেলে বলা চলে না। তার উপর এটি বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার অনুসরণ করেছে, যে শেষের কবিতা বিশুদ্ধ রোমান্স এবং বাংলা উপন্যাসে রোমান্সের প্রবাহস্ফীতির প্রবল নিদর্শন।

শূন্যের কাছাকাছি

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

এখানে এসে জিনিষের প্রকৃতি যেন কেমন বদ্‌লিয়ে যায়। শূন্যের মানে ত 'যা নেই'। কিন্তু শূন্যতা বলতে আমরা তেমন কোন নিদারুণ দার্শনিকতা বোঝাতে চাই না, বলছি তাপের মাত্রা বা অবস্থা বা টেম্পারেচারের কথা। মিষ্টি আর মিষ্টত্ব যেমন এক নয়, অথচ তাদের মধ্যে যোগ-সূত্রও রয়েছে,—মিষ্টত্ব মানে কোন কিছুতে (যথা সরবতে) কতটা মিষ্টি বা চিনি রয়েছে তার পরিমাণ; টেম্পারেচারও তেমনি তাপের তাপত্ব,—কতটা উত্তাপ 'গাঢ়' হয়ে জমা রয়েছে। তাপ আর তাপমাত্রায় এ হ'ল তফাৎ, জল আর জলের গভীরতায় যেমন। চতুরমণি শেয়াল গল্পের সারসকে থালায় মাংসের ঝোল খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল, নিচু মাত্রার তাপের জগতে এসে বিজ্ঞানেরও হয়েছে সেই একই অবস্থা। জিনিষের গুণাগুণ এখানে এসে কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়ে।

তাপমাত্রার তারতম্যে জিনিষের অবস্থাবৈগুণ্য ঘটে। কঠিন, তরল আর গ্যাস—এ তিনটি রূপে বিশ্বপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। জল—যাকে আমরা তরল হিসাবে পিপাসার সময় স্মরণ করি, শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায় তাই আবার জমাট বরফের আকার নিয়ে চোখ ঝল্‌সায়। টেম্পারেচার দশ ডিগ্রীর কাছাকাছি এলে আমরা চোখে 'বরফের ফুল' দেখি। তাপের এই মাত্রা শূন্য ছাড়িয়েও নেমে যেতে পারে। অক্সিজেন গ্যাস ১৩৩ ডিগ্রীতে জমে তরল হয়, এখানে ১৩৩ ডিগ্রী শূন্য ছাড়িয়ে ১৩৩। অথবা বলতে পারি মাইনাস ১৩৩ ডিগ্রী। জলের হিমাঙ্ককে মনে রেখে টেম্পারেচার মাপার এ হ'ল এক হিসাব—সেন্টিগ্রেডের হিসাব। কেলভিনের পরিমাপে এই শূন্যকে আরও পেছিয়ে ধরা হয়েছে, শকাব্দ যেমন খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বছর পর থেকে গণনা করা হয়। কেলভিনের মতে জল জমছে ২৭৩·৩ ডিগ্রীতে, আর তা ফোটে আরো ১০০ ডিগ্রী তফাতে অর্থাৎ ৩৭৩·৩ ডিগ্রী কেলভিনে।
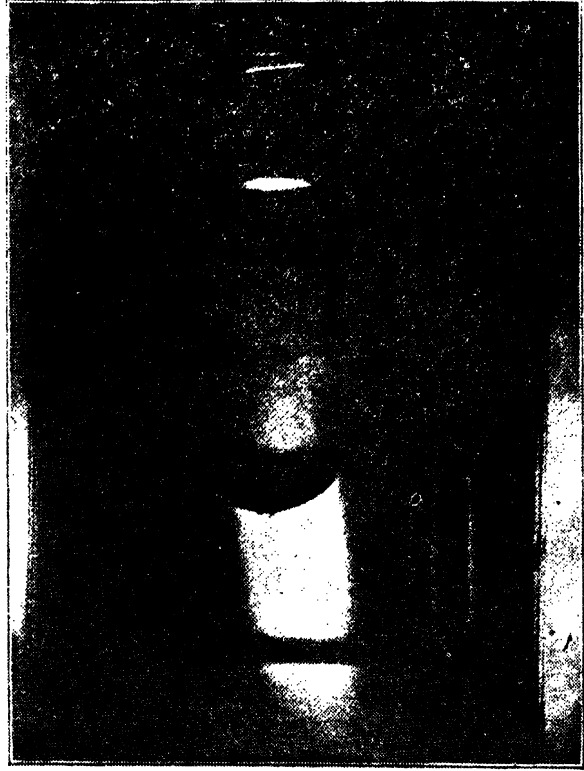
তরল হিলিয়াম জ্যান্ত জিনিষের মত পাত্রের গা বেয়ে উঠছে।

কেলভিনের শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ২৭৩·৩ ডিগ্রী পেছনে। কোন জিনিষের বেগই যেমন আলোর বেগকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না—প্রকৃতির এ এক মৌলিক নিয়ম, তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও তেমনি কোন জিনিষ হিমাঙ্কের নিচে ২৭৩·৩ ডিগ্রীর বেশি ঠাণ্ডা হ'তে পারে না, কেলভিনের

মাপকাঠিতে এখানেই দাগ কাটা আছে। সাধারণ পরিমাপ থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যময়, তাই শূন্য ডিগ্রী কেলভিনকে বলা হয় চরম শূন্য (বা অ্যাবসল্যুট জিরো)।

আমরা যে শূন্যের কথা ব'লে প্রবন্ধের সূচনা করেছি তা কেলভিনের এই শূন্য ডিগ্রী। এই জিরোর মানে যে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হ'তে পারে তা একবার চিন্তা ক'রে দেখা দরকার। টেম্পারেচারের প্রভাবে গ্যাসের আয়তন বদল হয় আমরা জানি। তাপমাত্রা বাড়লে আয়তন বাড়ে, কমলে আয়তনও ক'মে যায়। যে হিসাবে এই পরিবর্তন হচ্ছে তাতে হিমাঙ্কের ২৭৩·৩ ডিগ্রী নিচে গ্যাসের আয়তন কমতে কমতে একেবারে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার কথা। আমরা থার্মোমিটার হাতে জিনিষের উষ্ণতা মাপতে গিয়েছিলাম, সেখানে কি না খোদ জিনিষটাই উধাও। বিশেষ কোন তাপমাত্রায় জিনিষের আয়তন হারিয়ে যাবে এ আমরা ধারণা করতে পারি না। অবশ্য টেম্পারেচার এত নিচুতে নামার অনেক আগেই গ্যাস তার 'গ্যাসত্ব' বিসর্জন দিয়ে তরল বা কঠিন রূপ নেবে। গ্যাসের আয়তন তাই শেষ পর্যন্ত কি দশায় এসে পৌঁছয় তা নিয়ে তত্ত্বালোচনার বাইরে সত্য সত্যই কোন পরীক্ষা ক'রে দেখার উপায় নেই। কেলভিন বিষয়টিকে অন্যভাবে বিবেচনা করলেন। একটি কাল্পনিক ইঞ্জিন, মনে করুন 'ক' পরিমাণ তাপ গ্রহণ ক'রে 'খ' পরিমাণ বর্জন করছে। 'ক – খ' উত্তাপ যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এখন 'খ'-এর মান যদি হয় শূন্য, গৃহীত তাপের সবটাই কাজে পরিণত হবে। এমন একটা আদর্শ ইঞ্জিন বাজারে মেলে না, তবে অসম্ভব যদি সম্ভব হয় হিমাঙ্কের নীচে ২৭৩·৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেই তা সম্ভব হবে। তাপমাত্রার এই হিসাব জিনিষের গুণ বা প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে না—এটাই মূলকথা, টেম্পারেচার চরমে নামলে গ্যাসের আয়তন সত্যই শূন্যে মিলিয়ে যায় কি না তার উত্তর খোঁজা এখানে নিরর্থক। যাহোক, এভাবে শূন্যের একটা মানে প্রস্তুত হ'ল, যে শূন্য ফাঁকা বা ধোঁয়াটে কিছু নয়, বরং বস্তুগত তাৎপর্য নিয়ে তাপমাত্রার পরিমাপে শরীরের উত্তাপের মতই সুনিশ্চয় ও সংশয়াতীত।

টেম্পারেচার শূন্যের কাছাকাছি এলে জিনিষের গুণাগুণ অন্যভাবে আবর্তিত হয়, আমাদের স্বাভাবিক পরিচিত যুক্তিবিধির অন্তরালে আলাদা এক জগৎ-কৌশল আভাসিত হয়ে ওঠে। এই অভাবনীয় দিক্‌গুলিই আমরা একে একে উল্লেখ করছি। প্রথমে বিদ্যুৎ প্রসঙ্গ। বিদ্যুৎ প্রবাহের পথে—কম বা বেশি, একটা রোধ বা বাধা (resistance) রয়েছে। ১৯১১ সালে কেমারলিঙ্ক ওনেস্ দেখলেন, বিশেষ কতকগুলি ধাতুর ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যভাবে দেখা দিচ্ছে। শূন্যের কাছাকাছি নেমে সীসা টিন পারা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষের বৈদ্যুতিক রোধক্ষমতা যেন পুরোটাই বাতিল হয়ে যায়। এর ফল সত্যই অভাবনীয়, চার ডিগ্রী তাপমাত্রায় সীসার তৈরী একটা তারে সামান্য বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে দেখা গেছে, স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে এই স্রোত নিমেষেই থেমে যাওয়ার কথা, পুরো দু বছরেও তা বিলীন হয় নি—বিদ্যুতের স্রোত যেন অনন্তকাল ধ'রে প্রবাহিত হতে চাইছে। আমরা জানি, বৈদ্যুতিক স্রোত মানে ইলেকট্রনের প্রবাহ, এই ইলেকট্রন পরমাণুর অংশ-মাত্র। পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর বাঁধনে জিনিষের যে মৌলিক গঠনসজ্জা (lattice) তার মধ্যেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের এই বাধা বা রোধ সঞ্চিত থাকে। এই গঠনসজ্জা যদি নিখুঁত হয় ইলেকট্রনের স্রোত বাধা পায়, তা ছাড়া তাপমাত্রার প্রভাবে আভ্যন্তরীণ পরমাণুগুলি যেভাবে স্পন্দিত হয় তাতে কিছু পরিবাহী ইলেকট্রন ছিটকিয়ে পড়ে। এভাবে বৈদ্যুতিক রোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সাধারণ ব্যাখ্যা শূন্যের কাছাকাছি এসে কেমন যেন খাপছাড়া। চুম্বকশক্তির প্রয়োগে বিদ্যুতের প্রকৃতি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। বিদ্যুৎ ও চুম্বক ধর্মের এই অভাবনীয় দিক্‌গুলির ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ প্রবাহের মধ্যে এক 'অতি-প্রবাহে'র খোঁজ নিতে হ'ল। এই অতি-প্রবাহ বা সুপার কারেন্ট নিচু তাপমাত্রায় ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে। ইলেকট্রনের ব্যবহার তখন খুব বিচিত্র। সংখ্যায়ন ও গণিতবিজ্ঞানের গণনায় এ সম্বন্ধে নানা কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি যে এখনই স্পষ্ট হয়েছে তা নয়। লণ্ডন, মেইজনার, ফ্রলিক, কক্, ল্যান্দাউ প্রভৃতির গবেষণায় প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে মাত্র।

তরল হিলিয়ামের ব্যবহার আরো বেশি রহস্যময়, আরো বেশি ইঙ্গিতধর্মী। বস্তুজগতে এই জিনিষটির স্থান খুবই বিশেষত্বপূর্ণ। হিলিয়াম একটি দুর্লভ গ্যাস, বায়ুমণ্ডলের সাধারণ স্তরগুলিতে তার নাগাল মেলে না। রাসায়নিক গুণবিচারে গ্যাসটি খুব নিষ্ক্রিয়, অন্য কোন জিনিষের সঙ্গে মিলিত হ'তে চায় না। জলের বাষ্প যেখানে ২৭৩·৩ ডিগ্রীতে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ৩০৪·২ ডিগ্রীতে তরল হয়, হিলিয়ামের জন্য সেখানে তাপমাত্রা প্রায় চার ডিগ্রী পর্যন্ত নামান প্রয়োজন। নিচু তাপমাত্রায় পৌঁছানোর সমস্যাটি গ্যাসের এই তরলী-

করণের সঙ্গে জড়িত। কাইনেটিক থিয়োরি-র ব্যাখ্যায় গ্যাসের তাপমাত্রার কারণ তার উপাদান পরমাণুগুলির আভ্যন্তরীণ চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতার আভাস মেলে, যখন দেখি, ঘুলঘুলির ফাঁক-দিয়ে আসা বিকালের এক ফালি হেলান রোদে ঘরের ধূলিকণা কেমন অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাপমাত্রার সঙ্গে এই চঞ্চলতা কমে বা বাড়ে, এভাবে কেলভিনের শূন্য ডিগ্রী টেম্পারেচারে এসে কেমন যেন থমকে দাঁড়ায়; পরমাণু তখন নিশ্চল, গতিহীন,—সেনাপতির আদেশে সারিবদ্ধ সৈন্যের মত অবিচল রয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন তাপমাত্রায় গ্যাসের পরমাণু স্তম্ভিত হয়ে থাকবে এ যেন কেমন কথা। তাপমাত্রা অবশ্য শূন্য ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু এই শূন্যের কাছাকাছি এসেই দেখি অভাবনীয় ব্যাপার। পরমাণুর চঞ্চলতা যখন থেমে আসার কথা ছিল, দেখা গেল সেখানেই তা সবচেয়ে বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হিলিয়ামের সূক্ষ্ম স্তরে তার বিশেষ প্রকাশ। ১৯৩৬ সালে বিজ্ঞানী রোলিন তরল হিলিয়ামে একটি সূক্ষ্ম স্তর বা ফিল্মের খোঁজ পেলেন যা জ্যান্ত অ্যামিবার মতই অনায়াসে ছুটে চলতে পারে। পাত্রে তরল হিলিয়াম রেখে দেখা গেল কিছুক্ষণ পরেই তা পাত্রের তলদেশে ছড়িয়ে পড়ছে—ভাঙা কলসীর জল যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার—যাকে বলা হয় ফাউন্টেন এফেক্ট। তরল হিলিয়ামের পাত্রে সূক্ষ্ম একটি নল বসান আছে। এবারে হিলিয়ামের গায়ে ক্ষীণ একটু আলো ফেলা হ'ল, আলোর সঙ্গে রয়েছে কিছু তাপ, উষ্ণতা—এতেই হিলিয়াম উচ্ছ্বসিত, ফোয়ারার ধারায় ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উপছিয়ে উঠেছে। ২'১৯ ডিগ্রী কেলভিনের নিচে হিলিয়ামের এই সূক্ষ্ম ফিল্মটি যেভাবে চঞ্চল, গত শতাব্দীর কাইনেটিক থিয়োরির ব্যাখ্যায় তা সম্ভব হয় না।

আসল কথা, এখানে এসে হিলিয়ামের প্রকৃতিই গেছে বদ্‌লিয়ে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণুর জগতে যেমন আমাদের পরিচিত জগতের সাধারণ ধারণা ও যুক্তিগুলি অচল হয়ে যায়, তার জন্য আলাদা ক'রে নিয়মকানুন তৈরী করতে হয়েছে; শূন্যের কাছাকাছি এসে হিলিয়ামের মধ্যেও যেন সেই কোয়ান্টাম প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে। কোয়ান্টাম-তত্ত্বে গ্যাসের পরমাণুগুলি তাপমাত্রার প্রভাবে অন্যভাবে আচরণ করে। এই তত্ত্বের মূল উদ্‌গাতা ম্যাক্স প্লাঙ্ক পরমাণুর স্পন্দনকে প্যাণ্ডুলামের দোলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। গ্যাসের ভিতরে এভাবে লক্ষ কোটি প্যাণ্ডুলাম লক্ষকোটিভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে। তাপমাত্রার সঙ্গে এই দোলনের একটি সম্পর্ক আছে। টেম্পারেচার কমলে পরমাণুর স্পন্দন-সংখ্যা কমে কিন্তু সেসঙ্গে তার বিস্তার (amplitude) বেড়ে যায়। এই মৌলিক ধারণাটি যদি হিলিয়াম গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। মনে করুন, নির্দিষ্ট আয়তনের একটি বাক্সে একটিমাত্র হিলিয়াম পরমাণু স্পন্দিত হচ্ছে, বাক্সটির আয়তন স্পন্দিত পরমাণুর বিস্তারের ঠিক সমান। এবার তাপমাত্রা কিছু কমান হ'ল। ফলে বিস্তার কিছুটা বাড়বে। বাক্সটি নির্দিষ্ট আয়তনের হওয়ায় পরমাণুটি দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা দেবে। বাইরের দিকে এভাবে একটা চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। হিলিয়াম গ্যাসের পরস্পর-আকর্ষণী শক্তি খুবই কম, তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি এসে বাইরের দিকের এই চাপ খুব প্রবল। ফলে বাক্সটির আয়তন সহসা বেড়ে গিয়ে বিচিত্র এক অবস্থার সৃষ্টি করে। ভিতরের পরমাণুটি তখন সাধারণ বিজ্ঞানের আওতা ছেড়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়। তরল হিলিয়াম এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের দ্বারাই প্রভাবিত। কিন্তু এই তত্ত্বের ছোট্ট ক্ষুদ্র সামান্যকে নিয়ে কারবার। যা আয়তনে খুবই ছোট কিংবা যেখানে শক্তি পরিমিত সেখানেই কোয়ান্টাম-প্রকৃতি আভাসিত। অজস্র পরমাণু ঘনীভূত হয়ে যেখানে তরল হিলিয়াম হিসাবে আকার পাচ্ছে, সেখানেও যে কোয়ান্টামের নিয়ম প্রবর্তিত হ'তে পারে, এ এক আশ্চর্য ঘটনা। বস্তুগুণে হিলিয়ামের গঠন-প্রকৃতির মধ্যেই তার কারণ নির্দেশিত আছে।

অধ্যাপক সত্যেন বসু আদর্শ গ্যাসের যে সমীকরণ ব্যক্ত করেছেন তা থেকে আইনষ্টাইন গণনা ক'রে দেখেন যে, কোন জিনিষের ঘনত্বই নির্দিষ্ট একটি মানের বেশি উঠতে পারে না। নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে বস্তুর পরিমাণ যদি এই বিশেষ সীমাকে ছাড়িয়ে যায়, বাড়তি বস্তুটুকুর জন্য তখন ঘনত্বের কোন অদল-বদল হয় না, ন্যূনতম চাপ ও আয়তন বৃদ্ধি না ক'রেও তা এক বিচিত্র অবস্থায় অবস্থান করবে (বসু-আইনষ্টাইন কনডেনসেশন)। তরল হিলিয়ামের মধ্যে এই বস্তু-প্রকৃতিরই যেন আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ অনুসারে লণ্ডন ও টিজা ১৯৩৪ সালে নূতন এক তত্ত্ব দাঁড় করালেন। তরল হিলিয়ামের মধ্যে সাধারণ হিলিয়াম ছাড়াও যেন একটি 'অতিপদার্থ' (super fluid) মেলানো-মেশানো রয়েছে—এটির নাম দেওয়া হয় 'দ্বিতীয় হিলিয়াম'। অতিবাহী বিদ্যুতের মতই হিলিয়ামের এই অতিপদার্থটি খুব সহজে চলাফেরা করতে পারে, এমন কি খুব সূক্ষ্ম নলের পথেও তার গতি রুদ্ধ হয় না। তাপমাত্রা ২'১৯ ডিগ্রী কেলভিনের নিচে

নামলেই দ্বিতীয় হিলিয়ামের অস্তিত্ব। টেম্পারেচার তার পরে যত কমানো যায় অতিপদার্থের পরিমাণও সে অনুপাতে বাড়তে থাকে। এক ডিগ্রী কেলভিনে এসে দু' নম্বর হিলিয়াম হ'ল শতকরা ১৭ ভাগ। অ্যান রোনি কাশভিলির পরীক্ষায় বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু লণ্ডনের এই অভিনব তত্ত্ব সকল ঘটনার ব্যাখ্যায় সমান কার্যকরী হয় নি।

তরল জিনিষের স্ফুটনের উপর তাপমাত্রা ছাড়াও চাপের একটা প্রভাব থাকে, এজন্য ঠাণ্ডা ক'রেও ফোটানো সম্ভব—যদি চাপও সে সঙ্গে কমিয়ে আনা যায়। হিলিয়ামের উপর পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, তাপমাত্রা ২'১৯ ডিগ্রী কেলভিনে এসে স্ফুটন সহসা একেবারে স্তব্ধ —কয়েক ফোঁটা তেলের স্পর্শে সামুদ্রিক বিক্ষোভ যেমন সহসা শান্ত হয় ব'লে গল্পে লেখা আছে। স্ফুটনের ফলে যে বুদ্‌বুদ 'গাঁজিয়ে' ওঠে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য থাকার জন্যই তা সম্ভব। ২'১৯ ডিগ্রীর নিচে তরল হিলিয়ামের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা লক্ষ গুণ বেড়ে উঠেছে—তাপমাত্রার কোন পার্থক্য আর মালুম হচ্ছে না। বুদ্‌বুদের সমস্ত বিক্ষোভ তাই বন্ধ।

তাপ পরিবহনের ক্ষমতা সহসা কেন এভাবে বেড়ে যাচ্ছে লণ্ডনের তত্ত্বে তার সুষ্ঠ মীমাংসা নেই। লণ্ডনের ধারণায় তরল হিলিয়াম সত্যেন বসুর নিয়ম মেনে চলে। মূল তত্ত্বটিতে এই তাপ-ঘটিত অসঙ্গতির স্থান নেই। তা ছাড়া বসু-সংখ্যায়ন গ্যাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তরল হিলিয়ামের পরমাণুতে পরস্পর আকর্ষণী শক্তি খুব কম হওয়ায় তাতে গ্যাসের ধর্ম কিছুটা বর্তায়, তা ব'লে পুরোপুরি গ্যাস হিসাবে তাকে চালানো যায় না। লণ্ডনের তত্ত্বে এ হ'ল মূল দুর্বলতা। রুশ বিজ্ঞানী ল্যান্দাউ বিষয়টিকে এক নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপন করলেন। তাঁর মতে তরল হিলিয়াম কখনই সত্যেন বসুর আদর্শ গ্যাসের মত ব্যবহার করবে না। নিচু তাপমাত্রায় এসে হিলিয়ামের পরমাণু যেন দুভাবে তেজ সঞ্চার করে। ফোনন ও রোনন এই দু জাতের পরমাণু। বিভিন্ন তাপমাত্রায় রোনন আর ফোনন-এর অনুপাত পরিবর্তিত হয়। অত্যন্ত জটিল নিয়মে তা হিলিয়ামের প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তত্ত্বটির সার্থকতা 'দ্বিতীয় শব্দে'র প্রকৃতিতে প্রথম ধরা পড়েছে। শব্দের প্রভাবে যেমন পরমাণুগুলি স্প্রীংয়ের দোলার মত সঞ্চালিত হয় তরল হিলিয়ামের ভিতরেও সেভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। সাধারণ ও বিশেষ—কিংবা রোনন ও ফোনন, দু' ধরণের পরমাণুই এ ভাবে আলাদা হয়ে পড়ে। ভিতরকার এই পরিবর্তনের ফলে হিলিয়ামের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তাপমাত্রার একটা পার্থক্য দেখা দেয়। এর নামই দ্বিতীয় শব্দ—সাধারণ শব্দের সঙ্গে মিল থাকলেও যা পুরোপুরি তা নয়। শ্রুতিবোধ্য শব্দে বস্তুর তরঙ্গ, দ্বিতীয় শব্দে তাপমাত্রার পার্থক্য তরঙ্গাকারে প্রকাশ। এই দ্বিতীয় শব্দের গতি মাপতে গিয়েই তরল হিলিয়ামের তত্ত্বগুলির যাচাই হয়ে গেল। পেসকভ ও ওসবর্ণ-এর পরীক্ষায় ল্যান্দাউয়ের তত্ত্বটি সমর্থন পেল। সম্প্রতি আবার অত্যন্ত নিচু তাপমাত্রায় নিউট্রন কণা বর্ষণ ক'রে তরল হিলিয়ামে দু' প্রকতির পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর ভিত্তিতে ১৯৬২ সালে ল্যান্দাউ পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজের সম্মান পেলেন। তা ব'লে ল্যান্দাউয়ের তত্ত্ব-ধারণা যে সম্পূর্ণ তা নয়। ক্রেমার ও কনিগ্-এর মূল্যবান্ কাজের পর বসু-সংখ্যায়নের মধ্যে নূতন কি তাৎপর্য পাওয়া যায়, পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানীসমাজ এখন তা অনুধাবন ক'রে দেখছেন। তরল হিলিয়ামের "ঢল" শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এ মুহূর্তে ঠিক স্পষ্ট নয়।

ধাপে ধাপে অনেক দূর নেমে গেছে। সিঁড়ির ধাপগুলি জলের নিচে ডোবানো। এই জল জ'মে বরফ হয়ে আছে। হিমাঙ্কের নিচে মোট ২৭৩টি ধাপ। তার ধাপে ধাপে নানা সমস্যা নানা রহস্য। মাঝে মাঝে তরল গ্যাসের ঘড়াগুলি বসানো রয়েছে। সব শেষে পেলাম হিলিয়াম। তাপমাত্রা তখন শূন্যের কাছাকাছি। প্রকৃতির নিয়মগুলি এখানে কেমন পালটিয়ে গেছে। যা আমরা ধারণা করতে পারি না, তাই আমাদের ধারণা করতে হচ্ছে। তরল হিলিয়াম নূতন জগৎ-নিয়মের সূত্রে আমাদের বোধকে প্রসারিত করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী :

London, F. Superfluids, Vol. I. 1950.

Gorter, C.J. Two Fluid Models for Superconductors and Helium II. Progress in Low Temperature Physics, Vol. I. 1955.

Feynman, R.P. Application of Quantum Mechanics to Liquid Helium. -do-.

Simon, F.E. Low Temperature Problems, A General Survey, Low Temperature Physics, 1952.

Allen, J. F. Liquid Helium -do-.

Squire, C.F. Low Temperature Physics, 1953.

Casimir, B.G., On the Theory of Superconductivity, Niels Bohr and Development of Physics, 1955.

Band, W.C. Introduction to Quantum Statistics, 1955.

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'বেতার-বার্ত্তা'

বর্ত্তমান ভারতের দেব-নিবাস দিল্লী হইতে বাংলায় সংবাদ প্রচার সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। সংবাদ যখন বাঙ্গলায় প্রচারিত হয়, তখন আশা করি ঐ-বিষয় কিছু মন্তব্য করার অধিকার বাঙ্গালী শ্রোতা মাত্রেরই আছে। বিশেষ করিয়া যখন গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া দিল্লী হইতে সংবাদ-আকারে প্রচারিত (গত কিছুকাল হইতে সংবাদ কলিকাতা ও কার্সিয়ং হইতে আর "সমপ্রচারিত" হয় না, কেবলমাত্র "রিলে" করা হয়!) সংবাদ আমাদের শুনিতে হয়।

দিল্লী হইতে প্রত্যহ তিনবার বাঙ্গলায় সংবাদ প্রচার করা হইয়া থাকে। সংবাদ প্রচার আরম্ভ হইবার পুর্ব্বেই শ্রোতারা কান খাড়া করিয়া থাকেন প্রাত্যহিক "কৃষ্ণ"-নাম শুনিবার জন্য। বর্ত্তমানে রেডিওর কল্যাণে শ্রীযুক্ত বাবু জহরলাল নেহরু কৃষ্ণের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন—বিশেষ করিয়া রেডিওপ্রচার ক্ষেত্রে। তথা-কথিত সংবাদ আরম্ভ হইবে "প্রধানমন্ত্রী বলেছেন", "শ্রীনেহরু মন্তব্য করেছেন", "প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করেছেন," "জহরলাল নেহরু অমুক স্থানে গিছলেন, সেখানে হাজার হাজার 'জনগণসমূহ' তাঁকে অভ্যর্থনা করেন", "প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে জনসাধারণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবেন নিশ্চয়"—এই প্রকার বহুমূল্য এবং মৃত-জাতির-জীবনে অতি-অবশ্য-প্রয়োজনীয় অমৃত সন্দেশাবলী। সংবাদ প্রচারের ১৫ মিনিটকাল মধ্যে—প্রায় প্রত্যহ অন্তত ২০।২৫ বার শ্রীনেহরু-নাম কীর্ত্তন করিতেই হইবে—রেডিও-মহলে ইহাই বোধ হয় অলিখিত বিধি হইয়াছে—বিগত ১৪।১৫ বৎসর যাবৎ।

নেহরু কোথায় গেলেন, কি বলিলেন, কি উপদেশ বিতরণ করিলেন, জনগণ তাঁহাকে কি ভাবে আদর অভ্যর্থনা করিলেন—এই সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় 'সংবাদ' ছাড়াও—নেহরু কি করিবেন, কি ভাবিতে পারেন, দশ মাস পরে কি উপদেশ দিতে পারেন সে-বিষয়েও বহু তথ্য-পূর্ণ এবং জাতীয় সঙ্কটকালে বিষম-প্রয়োজনীয় বহু বিষয়েও 'সংবাদে' প্রচারিত হইয়া থাকে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর পর মহামন্ত্রী পাটনা গিয়া সদাকাত আশ্রমে রাজেনবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া আড়াই মিনিট 'মৌন-পালন' করেন—এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে, অসুস্থ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেখিবার যে তাঁহার কি ভীষণ ইচ্ছা ছিল—কিন্তু অতি-প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য তাহা হয় নাই—এই সবই "সংবাদ"—এবং লম্বকর্ণ রেডিও-কর্ত্তাদের মতে ক্ষুদ্রকর্ণ শ্রোতাদের পক্ষে অবশ্য-জ্ঞাতব্য।

প্রায়ই দেখি—দিল্লীর সংবাদ প্রচার, বলিতে গেলে নেহরু-নাম গান ছাড়া আর কিছুই নহে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য, যে বর্ত্তমান ভারতের এই নীলকণ্ঠ মহাদেবের, পার্শ্বচর নন্দী-ভৃঙ্গীর দলও সংবাদ প্রচারে সামান্য ছিঁটে-ফোঁটা প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হন না।

দিল্লী কেন্দ্রের বাঙ্গলা সংবাদ-ঘোষক

খ্যাতনামা একজন সংবাদ-ঘোষক বিগত প্রায় ২৪।২৫ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা সংবাদ প্রচার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার সংবাদ প্রচারকে "ঐ আসে ঐ আসে ভৈরব দাপটে, শ্রোতাদের কর্ণ ধরিতে সাপটে" বলা চলে। এই ঘোষক মহাশয়ের বিষম-কণ্ঠস্বরে সংবাদ প্রচার একটি ত্রাস-সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইঁহার বিশেষত্ব আছে। কেবল সংবাদ বলিয়াই ইনি শেষ করেন না, শ্রোতাদের সংবাদ ব্যাখ্যা করিয়া সমঝাইয়া দেন। 'সৈন্যরা দুর্গ দখল করেছে' বলিয়া সংবাদ শেষ না করিয়া ইনি ব্যাখ্যা দিবেন, "অর্থাৎ বিরুদ্ধপক্ষের সৈন্য-বাহিনী শত্রুপক্ষের দুর্গে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ে—কেল্লাটি অধিকার করেছে।" শ্রোতাদের ভুল বুঝিবার কোন অবকাশ এই ঘোষকপ্রবর রাখেন না। "নেহরু—

অর্থাৎ আমাদের প্রধানমন্ত্রী"—এমন ভাষ্যও শোনা গিয়াছে। এগুলি মনগড়া কথা নহে—যাঁহারা এই বিশেষ ঘোষকের সংবাদ প্রচার কষ্ট করিয়া শ্রবণ করেন, তাঁহারা ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। এই ঘোষক মহাশয়ই বহুকাল পূর্ব্বে কটকের Ravenshaw College-এর নাম 'সংস্কৃত' করিয়া প্রচার করেন "রাভেনশ" কলেজ বলিয়া। সংবাদ প্রচার ইনি বহুদিন করিয়াছেন, এইবার ইঁহাকে শ্রোতা-কর্ণ-মর্দ্দন কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি দিয়া "সংবাদ-গবেষক" হিসাবে নিযুক্ত করিলে খুবই ভাল হইবে।

দিল্লীকেন্দ্রে জনৈকা "ঘোষকা" আছেন। ইঁহার সংবাদ প্রচারের বিষম গতি এবং ত্রস্ত কণ্ঠস্বরে মনে হয় ঠিক সংবাদ প্রচারের পূর্ব্বেই তাঁহাকে পিছন হইতে পাগলা কুকুর তাড়া করিয়াছে! ইঁহার নিদারুণ কর্কশ কণ্ঠ, বিষম বাচনভঙ্গি এবং 'সুপারসোনিক স্পিড' শ্রোতাদের কর্ণে সুধা বর্ষণ করে না বলা বাহুল্য। যে দুইজন ঘোষকের বিষয় বলা হইল, তাঁহাদের সংবাদ প্রচার টেপ-রেকর্ড করিয়া তাঁহাদেরই একবার শ্রবণ করাইবার ব্যবস্থা করিলে—নিজেদের কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গিতে তাঁহারা নিজেরাই হয়ত ভড়কাইয়া মূর্চ্ছা যাইবেন।

অথচ কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে যাঁহারা স্থানীয় সংবাদ প্রচার করেন তাঁহাদের কণ্ঠস্বর যেমন শ্রুতিমধুর, বাচনভঙ্গিও তেমন সংযত শোভন সুন্দর। এই কারণেই বোধ হয় ইঁহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোষক হইয়াই রেডিও-জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

বারান্তরে সংবাদের 'বিশেষত্ব', 'পক্ষপাতিত্ব', 'ব্যক্তি'-বিচার, দল-অনিরপেক্ষতা এবং অল্-ইণ্ডিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ভাবে বেতার-কেন্দ্রগুলি যে গরীব করদাতাদের পয়সার শ্রাদ্ধ করিয়া বিশেষ ভাবে সরকার এবং দল-বিশেষের একঘেয়ে প্রচার মেশিনারী বা যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার বিষয় সবিস্তারে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কলিকাতা বেতারে পল্লীমঙ্গল এবং মজদুর মণ্ডলীর আসর দু'টিতে যথারীতি প্রভুদের গুণকীর্ত্তন চলিতেছে। পল্লীমঙ্গল আসরের আলোচনার নামে ভাঁড়ামো শ্রবণ করিলে মনে হইবে—পশ্চিমবঙ্গে দুঃখ-দারিদ্র্য বলিতে কিছু নাই। চাষীদের অভাব-অভিযোগ সবই বিদূরিত হইয়াছে। সাধারণ জীবনে সুখের স্রোত বহিতেছে। সরকার বাহাদুর গরীব করদাতাদের অভাব অভিযোগ বলিতে আর কিছু রাখেন নাই। লোকের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সরকার বাহাদুরের সেদিকে সদা সজাগ দৃষ্টি। কয়েকদিন পূর্ব্বে পল্লীমঙ্গলের ভাঁড়-প্রধান মোড়ল—মোরারজীর বিষম কর-বৃদ্ধিকেও সহজেই বুঝাইয়া দিয়াছেন—ইহা কিছুই নহে এবং সাধারণ লোকে এই মারাত্মক কর-বৃদ্ধিকে পরম হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে। বারান্তরে এই আসর দুইটির আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব। এবারে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পল্লীমঙ্গলের মোড়ল এবং মজদুর মণ্ডলীর পরিচালক—এই দুই পরম ন্যাকা এবং চরম বিজ্ঞের মতে সমস্যা-সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গ বর্ত্তমানে প্রায় স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে কংগ্রেসী সরকারের শাসনের গুণে!

আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থা!

দেশের কল্যাণে অর্পিত-দেহমন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী (শাস্ত্রী কোন্ সুবাদে?)—প্রকাশ করিয়াছেন সরকারী ভাষা হিসাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা ইংরেজীর স্থলে হিন্দীকে ক্রমে ক্রমে চালু করিবার জন্য একটি বিল রচিত হইয়াছে—যাহা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিরা মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক শীঘ্রই বিবেচনা করা হইবে। ইতিমধ্যে বিবেচনা শেষ হইয়াছে।

শাস্ত্রী (কোন্ শাস্ত্রে পণ্ডিত জানা নাই) মহাশয় আরও বলেন যে, বিলটির ধারাগুলি পাঠ করিয়া সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করিবেন! শাস্ত্রীর আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের এই পরম বিপদ্‌কালে জরুরী-ব্যবস্থা হিসাবে হিন্দী-সাম্রাজ্য বিস্তার-প্রয়াস না পাইলে কি চলিত না? ইহা না করিলে কি (মহা-) ভারত নরকে যাইত? ইংরেজীর স্থলে হিন্দীকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংবিধান সংশোধন করিবার কোন প্রশ্নই নাকি ওঠে না, শ্রীলালবাহাদুর ইহাও বলিয়াছেন। সত্য কথা, কারণ সংবিধান ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের হাতেই—যথা ইচ্ছা তথা সংশোধন এবং পরিবর্ত্তন করা হইতেছে। তাহা ছাড়াও আমরা মনে করি মন্ত্রীমহাশয়দের ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে সং-বিধান! শাস্ত্রী মহাশয় যখন ইচ্ছা করিয়াছেন—ইংরেজীর স্থলে হিন্দী চলিবে - তখন এই ইচ্ছার প্রতিবাদে রাজভক্ত, দরিদ্র, অসহায় অহিন্দীভাষী, বিশেষ করিয়া দীন-দরিদ্র সর্ব্বপ্রকারে অবহেলিত, নিপীড়িত এবং কেন্দ্রীয় প্রেম-বঞ্চিত বাঙ্গালীদের কিছুই বলিবার থাকিতে পারে না, কিছু বলার অর্থই হইবে—রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এ অপরাধ ভারতীয় চীন-প্রেমী কম্যুদের অপরাধ অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য অপরাধ, অমার্জ্জনীয়।

গরীব প্রজাকুলকে না হয় দায়ে পড়িয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু যে-সকল বাঙ্গালী এবং অহিন্দীভাষী অন্যান্য এম. পি. আছেন, তাঁহাদেরও কি জোর করিয়া হিন্দী চাপানোর বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার, সক্রিয় প্রতিবাদ করিবার নাই? জনগণের ভোটের কল্যাণে নির্ব্বাচিত বাঙ্গালী কংগ্রেসী এম. পি'র দল এবং তাঁহাদের রাখাল শ্রীঅতুল্য ঘোষও কি ভোটদাতা বাঙ্গালী জনগণের পক্ষে সামান্য প্রতিবাদও জ্ঞাপন করিতে ভরসা করেন না? পৃথিবীর বৃহত্তম গণ-তন্ত্রের (?) 'স্বাধীন' লোকসভার নির্ব্বাচিত সদস্য হইয়াই কি তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং বিবেক-বুদ্ধি মত কথা বলিবার সর্ব্ব অধিকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-মহোদয়গণের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন?

রাষ্ট্রের ভাষা (সরকারী) নির্দ্ধারণ করার অধিকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরভুক্ত কি না, হিন্দী বিল পেশ করিবার পূর্ব্বে ইহার যথাযথ বিচার হওয়া অবশ্য প্রয়োজন ছিল। সাধারণ বুদ্ধিতে বলা যায় আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব যে মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে, সরকারী ভাষার মত এত বড় একটা বিষয়ের চরম নির্দ্ধারণ তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে। ইহা সর্ব্বতোভাবে দেশের জনগণ নির্ব্বাচিত পণ্ডিত, বিশেষ করিয়া ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য প্রখ্যাত ভাষাবিদ্‌দের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। যে-ভাষার সহিত জীবনের গভীর সম্পর্ক আপামর জনসাধারণের সেই ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারী পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত শাস্ত্রী-পদবীধারী কোন ব্যক্তির থাকিতে পারে না। ভাষা, মোরারজীর সর্ব্বমারী ট্যাক্স নহে, যে দিল্লীর হুকুম-মত তাহা নতশিরে সকলকে পালন করিতেই হইবে।

মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বেই হিন্দী লইয়া দেশব্যাপী মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে। যাহার ফলে দেশ প্রায় টুকরা টুকরা হইবার মত হয়। সেই সঙ্কটকালে মিঃ নেহরু এবং এই শাস্ত্রী মহাশয়ও দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, জোর করিয়া কাহারও ঘাড়ে হিন্দী চাপানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। ইংরেজীকে বিতাড়িত করার কোন চিন্তাও তাঁহাদের নাই! এখন দেখা যাইতেছে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি 'আপৎকালীন' মিথ্যা স্তোকবাক্য মাত্র। আপদের কিঞ্চিৎ আসান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জনকয়েক হিন্দী-ভাষী কেন্দ্রীয় নেতার মনে এবং মাথায় আবার হিন্দী-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চাড়া দিয়া উঠিয়াছে!

সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় ১৩ কোটির মত হিন্দীভাষীর (আসল হিন্দী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা মাত্র ৫ কোটি লোকের মাতৃভাষা) এবং পণ্ডিত-সমাজে প্রায়-অচল-হিন্দীকে ৩৪ কোটি লোকের উপর চাপাইবার চেষ্টা আজ না হয় কাল অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় ভাবিয়াছেন, কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী অসমীয়াদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার সময় তিনি যেমন চতুর-কৌশলে আসামে হিন্দীর প্রাধান্য দিয়া সমস্যার সমাধান (?) করেন, এখন তেমনি 'আপৎকালীন' অবস্থার সুযোগে হিন্দীকে অত্যন্ত "জরুরী" বলিয়া চালাইয়া দিবেন। সাময়িক সাফল্য হয়ত তিনি পাইতে পারেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানের দুঃসময়ে সকলে যেন ঐক্যের মনোভাব লইয়া 'হিন্দী-প্রচলন' বিলটি গ্রহণ করেন!"—অহো! কি বিষম যুক্তি!

আমরা বলিব, "দুঃসময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের দেশের ঐক্যের কারণেই তাঁহার অহিন্দী-ভাষা-মারী হিন্দী বিলটি শিকায় তুলিয়া রাখা উচিত ছিল।" দুঃসময়কে হিন্দী চালাইবার পক্ষে সুসময় বলিয়া মনে করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের হিসাবে মারাত্মক গলদ হইয়াছে!

শ্রীলালবাহাদুর হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদানের জন্য এই সম্পর্কীয় বিল পেশ করিয়াছেন। এই বিলে ভাষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইয়াছে। আলোচ্য বিলটিতে শুদ্ধমাত্র হিন্দীকেই সরকারী ভাষা হিসাবে পূর্ণ মর্য্যাদা দিবার প্রস্তাব প্রকট হইয়াছে।

এই বিলটি লোকসভায় পেশ করিবার একটু পরেই উগ্র হিন্দীওয়ালাদের অসভ্য-অভদ্র নর্ত্তন-কুর্দ্দনের বহর দেখিয়া অহিন্দীভাষীরা এই সরকারী 'ভাষা-বিলের' স্বরূপ এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। বিলটিতে ঘোরতম অবিচার করা হইয়াছে অহিন্দীভাষীদের উপর এবং সেই সঙ্গে ভারতে হিন্দীর একাধিপত্য তথা হিন্দী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি চমৎকার পরিকল্পনাও হইয়াছে।

বিলে আছে—যদিও হিন্দীই কেন্দ্রের একমাত্র সরকারী ভাষা হইবে, তাহা হইলেও সরকারী কাজকর্ম্মে ইংরেজীও 'হয়ত' কিছুকাল চালু থাকিবে, কিন্তু ইংরেজীকে সরকারী সহযোগী ভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হইবে না এবং ১৯৬৫ সন হইতে দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৭৫ সনে ইংরেজীকে একেবারে বিতাড়িত করিবার পবিত্র মতলবও গোপন করা হয় নাই। কিন্তু ইংরেজীকে নির্ব্বাসিত করিয়া অপক আঞ্চলিক ভাষা হিন্দীকে সিংহাসনে বসাইবার এই উদ্যোগ-আয়োজন ভারতের সংখ্যাগুরু অহিন্দীভাষীদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

করিয়াছে তাহা বোধ হয় কর্ত্তারা এখনও সম্যক বুঝিতে পারেন নাই। বিল পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই অহিন্দীভাষীদের বিরোধিতা সুরু হইয়াছে—এবং এই হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন ক্রমে এক ভীষণরূপ ধারণ করিতে বাধ্য। বামনাবতার লালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিলেন, অবিলম্বে তাহা প্রত্যাহার না করিলে তাঁহার রোপিত হিন্দী-দানব একদিন অখণ্ড ভারতকে আবার খণ্ড খণ্ড করিবেই।

অল্পবুদ্ধি, মূর্খ, ক্ষমতালোভীদের হাত হইতে ভগবান ভারতকে রক্ষা করুন!

শাস্ত্রীর মিথ্যা স্তোকবাক্য

'জোর করিয়া হিন্দী চাপান হইবে না!'

বামনাবতার দয়া করিয়া এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, জোর করিয়া কাহারও উপর অর্থাৎ অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপান হইবে না। যে-সকল কংগ্রেসী সদস্যদের সঙ্গে লাল-বাবুর হিন্দী লইয়া আলোচনা হয়, সেই সব অহিন্দীভাষী সদস্যদের তিনি বলিয়াছেন যে—তাঁহাদের ভাষা সম্পর্কে সকল পরামর্শ এবং যুক্তি যথাকালে (মরণকালে?) বিবেচিত হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান বিলটি যথাসম্ভব 'বিতর্কমুক্ত' আবহাওয়ায় এবং বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া গৃহীত হউক—এই হইল তাঁহার বিনীত ইচ্ছা! এই ইচ্ছা অতি পবিত্র—এবং ইহাকে অনুরোধ না মনে করিয়া প্রভুর হুকুম বলিয়াই কংগ্রেসী সদস্যদের স্বীকার করিতে হইল। বিলটি গৃহীত হইয়া আইনে পরিণত হইবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই হিন্দী লইয়া বামনাবতার তথা অন্যান্য হিন্দী-ওয়ালাদের প্রচণ্ড প্রতাপ জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে তাণ্ডবলীলা সুরু হইবে—ইহা স্থির নিশ্চিত। বিল গৃহীত হইবার পরক্ষণেই ইহাই প্রকট হইয়াছে।

হিন্দীভাষীরা হিন্দী-সাম্রাজ্য চাহিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কিন্তু, দিল্লীতে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, এখন হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পঞ্চম শ্রেণী হইতেই হিন্দী শিখিতে হইবে। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতেই ছাত্রদের হিন্দী শিখিতে হয়। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা অহিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীদের বেলাতেই। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে প্রফুল্ল-চিত্তে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে—এবং স্বীকৃতিমত ব্যবস্থাও গৃহীত হইয়াছে। এত তাড়াতাড়ি হিন্দী সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এত উদারতা এবং ব্যগ্রতা কেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে এই উগ্রতার ফলে দশ-এগার বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের বাঙ্গলা, ইংরেজী এবং তাহার উপর অনাবশ্যক হিন্দী শিখিতে হইলে, তিনটি ভাষা শিক্ষাতেই তাহাদের সময় কাটিয়া যাইবে—অন্যান্য অতিঅবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিবার অবসর অবকাশ তাহাদের একেবারেই থাকিবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিত অপেক্ষা অহিত এবং ছাত্রদের ভাল অপেক্ষা অমঙ্গলই সাধন করিলেন।

দক্ষিণ-ভারতে এবং অন্যান্য অহিন্দীভাষী অঞ্চলে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক হিন্দী শিক্ষার ব্যাপারে এখনও কার্য্যকরী কিছু করা হয় নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ-বিষয়ে মাথা (অবশ্য মাথা বলিয়া বস্তু এ-রাজ্যের মন্ত্রী-মহলে বিরল) ব্যথা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দিল্লীর হিন্দী-প্রভুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এমন প্রচণ্ড এবং হঠাৎ আনুগত্য সন্দেহের বিষয় বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য, ছাত্রদের যথার্থ শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলা অপেক্ষা—হিন্দী প্রচার-দ্বারা হিন্দী-সাম্রাজ্য বিস্তার করাই যদি বর্ত্তমান ভারতের—অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং কু-শিক্ষিত কর্ত্তাদের কাম্য হয় তাহা হইলে—একমাত্র রামধুন গাওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করিবার, বলিবার নাই।

সরকারী ভাষা-বিল (দেশ এবং জাতির ঐক্য এবং জীবন-মরণের প্রশ্ন মাত্র ১৮৫টি ভোটের জোরে গৃহীত হইল) পূর্ব্বেই জানা ছিল লোকসভায় গৃহীত হইবে—২৭শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলির বামনাবতার এই পুণ্য ব্রত সার্থক করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঐক্যের উপরও চরম আঘাত হানিয়াছেন। ভাষা-বিল পাশ হওয়াতেই এই পর্ব্বের শেষ হইল না,—বোধন হইল মাত্র। হিন্দী মহাপূজার মহাষ্টমীর বলী হইবে বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা ভাষা।

ভাষা-বিলের আলোচনাকালে বাঙ্গলার কংগ্রেসী এম. পি. শ্রীঅরুণ গুহ নামক এক ব্যক্তির এই বিলের পক্ষে যুক্তিগুলি বাঙ্গালীদের মনে রাখা প্রয়োজন। আগামী নির্ব্বাচনকালে (এখন হইতে আম-চুনাই বলিতে হইবে) অন্ধ এবং বধির বাঙ্গালী ভোটদাতারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন—'জোড়া-বলদের' পরিবর্ত্তে 'জোড়া-গাধা' কিংবা 'জোড়া-রামপাঁঠা'দের ভোট দেওয়া শ্রেয়তর হইবে কি না। গাধা চাট্ মারিতে পারে, পাঁঠা গুঁতাইতে জানে, কিন্তু বলদের এ-সব দোষ (গুণ?) নাই। পরম নিশ্চিন্তে জাবর কাটিতে পাইলেই জোড়া বলদ খুশী থাকে।

কংগ্রেসী এম. পি. শ্রীগুহ (জোড়া-বলদ মার্কা হইলেও) বুদ্ধিমান। ভাষা-বিলের পক্ষে ওকালতি করিয়া তিনি বিশেষ একটি ছাপাখানার অশেষ কল্যাণ সাধনই হয়ত করিলেন পরোক্ষভাবে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ আরও বুদ্ধিমান্। ভাষা-বিলের আলোচনাকালে তিনি দিল্লীর পথে পা মাড়াইলেন না। দীঘাতে নেহরু পূজার মহা আয়োজনেই একান্ত ব্যস্ত রহিলেন। অতুল্যের অতুলনীয় ভক্তি বৃথায় যাইবে না। প্রভুর নিকট হইতে অবিলম্বে পুরস্কার আসিবে!

সর্ব্বমারী মোরারজীর সদম্ভ ঘোষণা

স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশের কঠোরতা কিছু শিথিল করিবার জন্য কয়েকজন এম. পি. মোরারজীকে সবিনয় আবেদন জানান। এই সবিনয় আবেদনের জবাবে মোরারজী ঘোষণা করেন যে স্বর্ণ-নীতি অপরিবর্ত্তনীয় এবং কেবল তাহাই নহে, এই নীতি কঠোরতর করা হইবে। মোরারজী আরও বলেন যে, "যদি কেহ মনে করেন যে ১৪ ক্যারেট আবার বৃদ্ধি পাইয়া ২২ ক্যারেটে যাইবে, তাহা হইলে তিনি ভুল করিতেছেন!"

ইহার জবাবে বলা যায় যে—"মোরারজী যদি মনে করিয়া থাকেন তিনিই চিরকালের জন্য ভারতের স্বর্ণ-ভাগ্য-বিধাতা হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনিও ভুল করিতেছেন।" জনগণের 'সেবক' কংগ্রেসী কোনো মন্ত্রী এমন সদম্ভ ঘোষণা যে করিতে পারেন, কেহই কল্পনা করে নাই। যাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং বেকুবীর ফলে দেশকে আজ এমন বিপাকে পড়িয়া ধনে-মানে-প্রাণে এমন অসম্ভব মূল্য দিতে হইতেছে, তাঁহাদের মনে লজ্জা এবং গ্লানিবোধ বিন্দুমাত্রও থাকিলে, লোক-সমাজে গাধার টুপী পরিয়া তাঁহারা কালামুখ দেখাইতেন না!

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রত্যহই অ্যাসিড্ পান করিয়া স্বর্ণ-শিল্পীর আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। সরকারী কৃপায় এই হতভাগ্যের দল একমাত্র আত্মহত্যার দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান করিতেছে—কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রীপুত্র-পরিবারকে চরম অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতেছে। কালক্রমে হয়ত এই সকল অসহায় হতভাগ্যকেও আত্মহত্যার দ্বারাই সকল জ্বালা জুড়াইতে হইবে! দাম্ভিক-মোরারজী, বিশ্বপ্রেমিক-নেহরু তথা অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা—বাঙ্গলার এই সকল আত্ম-হত্যাকারী কিংবা পিছনে ফেলিয়া-যাওয়া তাহাদের অনাহারী স্ত্রীপুত্র-পরিবারের জন্য একটিবার 'আহা' বলিবার অবকাশ এখনও লাভ করেন নাই!

লোকসভায় অর্থমন্ত্রী আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে—১৪ ক্যারেট সোনাকেও শেষ পর্য্যন্ত ৯ ক্যারেটে পরিণত করা হইবে। কংগ্রেসী মন্ত্রীর মুখে এই ঘোষণা যথাযথ হইয়াছে। দেশের শাসনভার হাতে পাইয়া গত প্রায় ১৬ বছরে এই সকল রাসভাধম কংগ্রেসী মন্ত্রী তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং সর্ব্ব-বিষয়ে সকল প্রকার ব্যভিচার, অনাচার, অবিচার এবং দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া দেশের মানুষের চরিত্রের সকল শ্রেয়ত্ব, মহত্ব এবং সাধুতাকে আজ ২২ ক্যারেট হইতে 'নো-ক্যারেটে' নামাইয়াছেন। ইহা আজ সকল মানুষের সম্মুখে অতি প্রকট হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকাররূপ দিল্লীর নোংরা খাটালে বাস করিয়া আজ কেন্দ্রীয় (সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য) মন্ত্রিগণ দেশকে নরক অপেক্ষাও অধিকতর পূতিগন্ধময় খাটালে পরিণত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে তাঁহারা অবিলম্বে ভারতের 'ধাপাতে' পরিণত করিতে বদ্ধ-পরিকর। এই অতিপুণ্য কার্য্যে আজ পশ্চিমবঙ্গের সাব্-হিউম্যান মন্ত্রীগুষ্টি সর্ব্বপ্রকারে সকল সহায়তা-সহযোগিতা অতুল্য মাত্রায়, প্রফুল্লবদনে এবং হৃষ্টচিত্তে কেন্দ্রকে দান করিতেছেন।

মহাত্মা-ভক্ত মোরারজী মনে করেন যে, তাঁহার স্বর্ণ-(কু) নীতির ফলে স্বর্ণশিল্পীগণ বিশেষ কেহই বিপন্ন হন নাই। স্বর্ণ-নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ-ছয় লক্ষ স্বর্ণশিল্পী (সমগ্র ভারতে ১০.১২ লক্ষের কম নহে) যে আজ অকালে এবং অযথা মরণের পথে চলিয়াছেন, ইন্দ্রপ্রস্থে বসিয়া স্বাধীন ভারতের দুঃশাসন ইহা স্বীকার করেন না। ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্য্যোধনগুষ্টি ভুলিয়া যাইতেছেন যে—'কুরুক্ষেত্র' খুব দূরে অবস্থিত নহে। সময় থাকিতে যদি এই দুষ্ট-শাসকগণ তাঁহাদের শাসন-ব্যভিচার সংযত না করেন, তাহা হইলে দ্বাপর যুগের কুরুক্ষেত্রের পুনরাভিনয় ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

মাত্র পাঁচ জন!

মোরারজীর মতে এযাবৎ সংবাদপত্রে মাত্র ৫ জন স্বর্ণ-শিল্পীর আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তির ধরন দেখিয়া মনে হয় যেন ইহাও অযথা বেশী করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সরকারকে বিব্রত করিবার জন্যই। মোরারজী হয়ত ভাবিতে পারেন যে, যে-সকল স্বর্ণশিল্পী আত্মহত্যা করিয়াছেন—তাহা বিনা কারণেই। আত্মহত্যাকারী স্বর্ণশিল্পীদের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে জব্দ করা!

স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ কঠোরতম করিতে ইচ্ছা থাকিলে

মোরারজী তাহা করিতে পারেন, কারণ ভবিষ্যত-'প্রধানমন্ত্রী' হইবার কল্পনা-বিলাসী এই দাম্ভিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সংযত করিবার মত কেহ আজ দিল্লীতে নাই—নেহরু নিরুপায়!

সরকারী স্বর্ণবিধি যে মানবিক ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে সে-সম্পর্কে কোন সম্যক্ চেতনার পরিচয় অর্থমন্ত্রীর বিবৃতিতে নাই। কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মন্ত্রীর এর চেয়ে নির্দ্দয় উক্তি কল্পনা করা যায় না। মাত্র পাঁচজন স্বর্ণশিল্পী আত্মহত্যা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের অবস্থাটা যতটা খারাপ বলা হইতেছে আসলে ততটা খারাপ নয়—ইহা অপেক্ষা হৃদয়হীন যুক্তি আর কি হইতে পারে? মোরারজীর সোনার খড়্গের আঘাতে কয়টি প্রাণ বলি হইলে তিনি সমস্যাটির গুরুত্ব স্বীকার করিবেন? স্বর্ণকার সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, সারা ভারতে অর্দ্ধ শতাধিক বেকার স্বর্ণশিল্পী আত্মহত্যা করিয়াছেন এবং একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এই আত্মঘাতী স্বর্ণশিল্পীর সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২০। দয়াময় শ্রীদেশাই যদি স্বর্ণশিল্পীদের শব গণনাই করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ হইতেই নিম্নলিখিত স্বর্ণ-শিল্পীদের শবদেহগুলি উপহার দিতে পারা যায়। (১) পরেশ রায়, জলপাইগুড়ি—অনাহারে মৃত, (২) মতিলাল দাস, কলিকাতা—অ্যাসিড পানে আত্মঘাতী, (৩) শৈলেন দাস, কলিকাতা—অ্যাসিড পানে আত্মঘাতী, (৪) সুনীল কর্ম্মকার, কলিকাতা—অ্যাসিড পানে আত্মঘাতী, (৫) পাঁচুগোপাল রাহী, নবদ্বীপ—অ্যাসিড পানে আত্মঘাতী, (৬) অজ্ঞাতনামা—ট্রেনের নীচে আত্মঘাতী, (৭) মণীন্দ্রচন্দ্র দে—অনাহারে মৃত। ইহার পর গত কয়েকদিনে আরো অন্তত ১২টি স্বর্ণশিল্পীর আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনাহারের জ্বালায় ২।৩ জন স্বর্ণশিল্পীর স্ত্রীও স্বামীদের অনুগমন করিয়াছে।

কিন্তু মৃত্যু ও আত্মহত্যাই কি বেকার স্বর্ণশিল্পীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার একমাত্র মাপকাঠি? যাঁহারা জীবিকা হারাইয়া অভাব-অনটনের সহিত লড়াই করিতেছেন, রাস্তায় ফেরী করিয়া, তেলেভাজার দোকান খুলিয়া, ভিক্ষা করিয়া সংসার চালাইবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা আত্মহননের অবাঞ্ছিত পন্থা গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মত মহাসুখে কাল কাটাইতেছেন? স্বর্ণশিল্পীদের দুর্দ্দশার সম্পর্কে মোরারজীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিষম এক গলদ রহিয়াছে। এমন কি অর্থমন্ত্রীর নির্ম্মম উক্তি যেন আত্মঘাতী হইবার জন্য স্বর্ণশিল্পীদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর অনতিপ্রচ্ছন্ন প্ররোচনার মত শোনাইতেছে। যখন একজনের পর একজন স্বর্ণশিল্পী জীবনে আশাহীন ব্যর্থতায় অভিভূত হইয়া মৃত্যুর হাতে নিজেদের সমর্পণ করিতেছে তখন অর্থমন্ত্রীর এই ধরনের কথাবার্ত্তা বিবৃতি এবং উক্তি—তাঁহার চরম অমানবতাই প্রমাণ করিতেছে। পাঁচ মাসের অধিককাল হইয়া গেল, স্বর্ণশিল্পীদের বাস্তব পুনর্ব্বাসনের কোন ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বেকার স্বর্ণশিল্পীদের লইয়া যে-প্রকার তামাসা চলিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে প্রশ্ন জাগে—আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করিতেছি, না, আবার আলামগীর বাদশার রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছি? সত্যই বিচিত্র এই নেহরু-মোরারজী মার্কা গণতন্ত্র! এখানে সাধারণ মানুষের জীবিকার অধিকার এবং একমাত্র সম্বল এক কথায় হরণ করা যায়, কিন্তু সামাজিক বিবর্ত্তনের অজুহাতে ধনিক এবং বণিকের সর্ব্বস্বার্থ সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হয়, অসাধুতার দ্বারা অর্জ্জিত "ব্যক্তিগত" ধন-সম্পদ অটুট থাকে যাহার কারণে সাধারণ মানুষকে বিবিধ প্রকার সরকারী অনাচার এবং অবিচার সহ্য করিতে হয়।

বিগত-বোম্বাই রাজ্যে অতিরিক্ত গান্ধীভক্তি এবং সাধুতার ভড়ং দেখাইতে গিয়া মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে "মুখ্যমন্ত্রী" মোরারজীকে যে-শিক্ষা পাইতে হয়, সে-কথা এখন তাঁহার মনে নাই—। কিন্তু আগামী নির্ব্বাচনে দেশবাসী তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না। সেই আগামী দিনের কথা স্মরণ করিয়া দেশাই সাবধান হউন।

প্রভুদের তিন সত্য পালন

অনাহারে "কাহাকেও মরিতে দিব না, দিব না, দিব না!"

বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্য-ত্রাণ মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতির তিন সত্য পালন অতি সার্থকতার পথেই চলিয়াছে, সন্দেহ করিবার আর কোন অবকাশই নাই। তবে এই সত্য পালনে বাঙ্গলার সংবাদপত্রগুলি একনিষ্ঠ সহযোগিতা দিতেছে না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। একটি দৈনিক সংবাদপত্রে মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই দেখিলাম প্রকাশিত হইয়াছে—২৪ পরগণা জেলায় অনাহারে দুই জনের মৃত্যু॥ ৩০ লক্ষ লোকের অনাহার-অর্দ্ধাহারে জীবনযাপন॥ দেশের লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া পাকিস্তানে চাউল পাচারের অভিযোগ। এইগুলি মাত্র শিরোনামা। ২৭ শে এপ্রিলের কাগজে প্রকাশ:

খাদ্য নাই, খাদ্য চাই—হাহাকার উঠিয়াছে ২৪ পরগণা জেলার ৩৩ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৩০ লক্ষ মানুষের ঘরে। জেলার এই ৩০ লক্ষ মানুষের কম-বেশি সকলেই চাউলের মূল্যবৃদ্ধি-হেতু অনাহার-অর্দ্ধাহারে উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে কাল কাটাইতেছে। ইতিমধ্যে ২৪ পরগণা জেলার দুইজন মানুষের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জনৈক প্রদেশ কংগ্রেস নেতা এই মৃত্যু সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করেন। খাদ্যাভাবের সহিত ব্যাপকভাবে কলেরা-বসন্তও দেখা দিয়াছে। তাহাতে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কংগ্রেসী নেতা এ-সংবাদ অস্বীকার করিবেন ইহাতে অবাক্ হইবার কিছুই নাই। উপর মহলের নির্দ্দেশেই বর্ত্তমান কংগ্রেসীদের সত্য-মিথ্যার মান স্থির হয়। এইচ-এম-ভি রেকর্ডের ধর্ম্ম মিথ্যা হইবে না। আর একটি সংবাদে দেখুন :

বিগত কিছুদিন ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশন এলাকায় ক্ষুধার্ত মানুষের ভীড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সারাদিন সহরে ও সহরের আশেপাশে উঁহারা ভিক্ষা করেন এবং সন্ধ্যার পরে উক্ত ষ্টেশন এলাকায় আসিয়া রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। উঁহাদের সঙ্গে বেশ কিছু পোষ্যও রহিয়াছে।

প্রকাশ যে, ঐ সকল মানুষেরা ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিতেছেন। গ্রামাঞ্চলে জীবিকা এবং অন্নের সংস্থান করিতে না পারিয়াই নাকি তাঁহারা কলিকাতার পথে পা বাড়াইতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সকল স্থান হইতেই চাউলের বিষম মূল্য বৃদ্ধির খবর পাওয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সর্ব্ববিধ খাদ্যশস্যের মূল্যও সমান তালে চড়িতেছে এবং আরও চড়তিমুখে। রাজ্য সরকারের মতে চাউলের মূল্য ২৮ টাকা মণ—কিন্তু কলিকাতার বাজার বলিতেছে ৩৪ টাকা হইতে ৩৬ টাকা মণ। হাতে-কলমে ইহার সাক্ষ্যও মিলিতেছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চাউলের দর স্থির থাকিতেছে না—ক্রমশ যেন বাড়তির দিকেই চলিয়াছে। এখনও বর্ষা নামে নাই। বর্ষার সময় চাউলের দর কি হইবে, কোথায় গিয়া ঠেকিবে—সাধারণ মানুষ সেই চিন্তায় এখন হইতে আতঙ্কিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে চাউলের মূল্যের সঙ্গে বাজারের এবং দেশের অর্থনীতি সবিশেষ জড়িত আছে। বাস্তবেও দেখা যাইতেছে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্ব-প্রকার খাদ্য-সামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল খাদ্যবস্তুই নহে—ঘুঁটে, গুল, কাঠকয়লা, জ্বালানী কাঠ প্রভৃতি একান্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বেশী করিয়া আলু খাইবার পরামর্শ না দিয়া যদি আপৎকালে মূল্য স্থিতির যে সাধু সঙ্কল্প ঘোষণা করেন (যাহা বর্ত্তমানে আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে) তাহা পালনের চেষ্টা করেন, হয়ত কিছু মানুষ না-খাইয়া না-মরিতেও পারে।

"বাঙ্গালীর এই প্রধান খাদ্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধি যদি রোধ না করা যায় তাহা হইলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবে, আতঙ্ক ছড়াইবে এবং সেই আতঙ্ক বাজার-দরকে আরও উপরে ঠেলিয়া তুলিবে। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ কি? রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলীর গত বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন ভাষণে জানাইয়াছিলেন যে, অনাবৃষ্টির ফলে গতবারের তুলনায় এইবার পশ্চিমবঙ্গে আমন ধান হইতে উৎপন্ন চাউল ৪ লক্ষ টন কম (৪৩ লক্ষ টনের স্থলে ৩৯ লক্ষ টন) পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের আমদানী এইবার কম হইয়াছে। গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য উপমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি জানান যে, উড়িষ্যা হইতে গত বৎসর যেখানে ৩৩,৪১০ মেট্রিক টন (অর্থাৎ প্রায় ৩৬,৮১৮ শর্ট টন) চাউল ও ৩১,১১৪ ট্রিকমে টন (প্রায় ৩৪,২৮৮ শর্ট টন) ধান পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিল, সে-স্থলে এইবার গত ১৩ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবসায়িক সূত্রে উড়িষ্যা হইতে ৩০,৩২৩ মেট্রিক টন (প্রায় ৩৩,৪১৯ শর্ট টন) চাউল ও মাত্র ১০,৮৬০ মেট্রিক টন (প্রায় ১১,৯৬৮ শর্ট টন) ধান আসিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় এইবার আমাদের রাজ্যে চাউলের ঘাটতি রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, উৎপাদকগণ উৎপন্ন খাদ্য ধরিয়া রাখিতেছেন এবং তাহার ফলে গত বৎসরের তুলনায় ধান ও চাউলের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি যে-সকল বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি উৎপাদকগণ কর্ত্তৃক অথবা ব্যবসায়ীদের দ্বারা চাউলের মজুতদারকে এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। বস্তুতঃপক্ষে তিনি বলিয়াছেন যে, এই ধরনের মজুতদারির বিশেষ কোন সংবাদই তাঁহার কাছে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপাত্রগণ বেশী করিয়া গম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেছেন। বলা হইতেছে যে, সরকারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গম সরবরাহ করা সম্ভব এবং বাঙ্গালী যদি ভাত খাওয়া কমাইয়া রুটি খাইতে অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে চাউলের বাজারের উপর চাপও কমে, খাদ্য সমস্যার সমাধানও সহজতর হয়।"

সরকারী মুখপাত্রদের শ্রীমুখের বাণীতে এবং 'টন্-মন্' সাংখিকের টন্-মণের হিসাবে অনাহারী জনের তনু-মন শান্ত হইবে না। গম খাইবার উপদেশ দেওয়া সহজ। কিন্তু কয়লা এবং কেরোসিনের আকাশ-ছোঁয়া মূল্য-বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের ঘরে বাতি এবং উনানে হাঁড়ি চড়াইবার সাধ্যও প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

চাউলের এই ঘাটতিতে গম ভক্ষণের উপদেশ একেবারে বাজে নহে—প্রয়োজনের তাগিদে ইহা স্বীকার করিতে হইবেই। গত কয়েক বৎসরে বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালীদের গম অর্থাৎ রুটি খাওয়ার অভ্যাস খুবই বাড়িয়াছে।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে বাঙ্গলার অধিবাসীরা প্রায় ২ লক্ষ টন্ গম ব্যবহার করিয়াছে আজ সেখানে প্রায় ৮৷৷০ লক্ষ টন্ বিক্রয় হয়।

"বহুদিনের প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস বদলাইতে সময় লাগে। গ্রামে গম ভাঙ্গাইয়া আটা করার সুবিধা নাই, আটা দিয়া রুটি তৈরী করার পদ্ধতি অনেকেই জানেন না। তাহা ছাড়া, যে সকল দরিদ্র পরিবারে নুন-ভাতই একমাত্র খাদ্য তাহাদের সে সঙ্গতি কোথায় যে, রুটির সঙ্গে অন্তত একটা তরকারিও তাহারা জুটাইতে পারে? ১৯৬২ সালেই পশ্চিমবঙ্গে গমের ব্যবহার সর্বোচ্চ পরিমাণে উঠিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইবার সেই রেকর্ডও অতিক্রম করিয়া এই রাজ্যের অধিবাসিগণকে ১২ লক্ষ টন গম খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং বলিতে গেলে এই একটি পন্থাকেই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে যে চাউল দেওয়া হয় সেগুলি প্রায়ই অখাদ্য জাতের হয়। সেগুলি হয় দুর্গন্ধযুক্ত, না হয় কাঁকর-ভর্ত্তি অথবা পোকায় খাওয়া থাকে। স্বভাবতঃই লোকে সেগুলি নিতে চায় না।

ইহা ছাড়া ফেয়ার প্রাইস দোকানগুলিতে চাউল মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে গিয়া বহু প্রকারে অযথা হয়রানি এবং সময় সময় অপমানও ভোগ করিতে হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রী কিংবা কোন সদস্য হয়ত একথা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা কেহ যদি সাধারণ ক্রেতা রূপে, চাউলের যে-কোন একটি ন্যায্য মূল্যের দোকানে দয়া করিয়া র‍্যাশনব্যাগ হাতে করিয়া (যদি অপমান বোধ না করেন) শুভ-পদার্পণ করেন, সাধারণ ক্রেতার অবস্থা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন!

কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ এবং কংগ্রেসী সভ্যগণ একটা সমান্য কথা মনে রাখিবেন—কথাটা এই যে, প্রত্যহ সকল সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ না হইলে দেশে চীনা-আক্রমণ অপেক্ষাও বহুগুণ এক আপৎকালীন অবস্থার উদ্ভব হইতে বাধ্য। এবং (ভগবান্ না করুন!) এই অবস্থার উদ্ভব হইলে ক্ষমতার উচ্চ আসনে যাঁহারা তাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে কালযাপন করিতেছেন তাঁহারা জন-চাপের বিষম সর্ব্বধ্বংসী তাপ হইতে রেহাই পাইবেন না।

ইছাপুর গান অ্যাণ্ড শেল্ ফ্যাক্টরী

এককালে বহু-খ্যাত ভারতের অদ্বিতীয় এই অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ কারখানা হইতে আর একটি বিভাগকে হায়দরাবাদে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন (ইতিপুর্ব্বে আরও দু'একটি বিভাগ এখান হইতে বাঙ্গলার বাহিরে চালান করা হইয়াছে।) ইহার কারণ এই যে, হায়দরাবাদে—জমি, জল এবং 'পাওয়ার' প্রভৃত পরিমাণে পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে নাকি ইহার একান্ত অভাব! একটি অতি-বৃহৎ কারখানার স্থান সঙ্কুলান বাঙ্গলায় হইয়াছিল এবং যাহার মধ্যে এই মেটালারজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরীও ছিল, হঠাৎ তাহার জন্য এমন কি স্থানের অভাব ঘটিল, তাহা বোঝা কষ্টকর। খুব সম্ভবত আপৎকালে অপব্যয় রোধ করিবার কারণেই ইহা ঘটিল। আসল কথা—পশ্চিমবঙ্গকে ক্রমে ক্রমে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার পরিকল্পনা মতই কেন্দ্রীয় সরকার কাজ যথাযথই করিতেছেন। ইছাপুরের Gun & Shell Factory হইতে সব gun-গুলিই প্রায় অপসারিত করা হইল, ইছাপুর এবার শুধুমাত্র Shell Factoryতে পরিণত হইবে। আমাদের খোলাটুকুতেই তৃপ্ত থাকিতে হইবে। নলচে গিয়াছে এবার খোলটিকে অপসারিত করিতেও বিলম্ব হইবে না।

এত বড় একটা অন্যায় এবং অযথা অপব্যয়ের ব্যাপার অনায়াসেই সম্পাদিত হইল। বাঙ্গলার কংগ্রেসী প্রভুরা, নেতারা এমন কি সংবাদপত্রগুলিও সংবাদমাত্র ছাপিয়াই কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। বাঙ্গালীর আর একটি কর্ম্ম-সংস্থারও বিলোপ ঘটিল। অথচ নূতন ৫টি অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানা বোম্বাই সহরের কাছাকাছি স্থানেই স্থাপিত হইবে। একদিকে দরিদ্র বাঙ্গালীকে সর্ব্ব বিষয়ে আরও বঞ্চিত করিবার পাকা পরিকল্পনা, অন্যদিকে ধনী মহারাষ্ট্র রাজ্যকে খুসী করিতে কেন্দ্রীয় সরকার নূতন পাঁচটি অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানা বোম্বাই শহরের চারি পার্শ্বে স্থাপন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠিত হইবে না?

ইন্দ্রপ্রস্থের কুরুকুলপতিরা ঘোষণা করিয়াছেন—"বেঙ্গল" নাম দিয়া রেজিমেণ্ট গঠন করিলে শ্রেণীগত নামকরণে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, কাজেই বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠন করা হইবে না। তবে মহারাষ্ট্র রাজপুত, শিখ প্রভৃতি রেজিমেণ্টগুলি যেমন আছে তেমনি বর্ত্তমানে থাকিবে—শ্রীচ্যবন ইহাও প্রকাশ করেন। চ্যবনের অশেষ দয়া বলিয়া তিনি আরও বলেন যে—বাঙ্গালীদের সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশে কোন বাধা নাই, অর্থাৎ তাহারা যদি পাকেপ্রকারে সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করিতে পারে, তবেই পারিবে, না পারিলে পারিবে না!

বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠনের দাবী বহুদিনের। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার এই দাবী স্বীকার করেন এবং বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট প্রথম গঠিত হয়। এই রেজিমেণ্ট মেসোপটেমিয়াতে যথেষ্ট কৃতিত্বে

পরিচয় দেয়। বিদেশী সরকার যে সামান্ত বিচার বাঙালীকে এই বিষয়ে দান করেন, আজ দেশের স্বাধীন সরকার বাঙালীকে ততটুকুও দিতে রাজী নহেন—এবং ইহার একমাত্র কারণ বাঙালীকে "সামরিক জাতি" বলিয়া স্বীকার না করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল উদ্যম এবং প্রচেষ্টা এ বিষয়ে ব্যর্থ হইল!

কেন্দ্রীয় সরকারের মতলব যদি ইহাই ছিল, তাহা হইলে বছরের পর বছর "বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট" গঠন প্রশ্ন সম্পর্কে এমন বিচিত্র নীরব ভূমিকা গ্রহণের দ্বারা বাঙালীর মনে আশার ভাব সৃষ্টি করবার কোন প্রয়োজন ছিল না—প্রথমেই সোজা 'না' বলিয়া দিতে পারিতেন! ইহার একটা ভাল ফল হইলেও হইতে পারে—বাঙালী মাত্রেই (অবশ্য কংগ্রেসী এবং কম্যুদের বাদ দিয়া) আজ উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইতেছে—তাহারা "নিজ বাসভূমে পরবাসী"! শ্বেত শাসনকালেও বাঙালী যাহা অনুভব করে নাই নিজেদের যতটা অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করে নাই—আজ তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালী তাহাই বোধ করিতেছে! ব্রিটিশ আমলে যোগ্যতার একটা কিছু যাহা হউক স্বীকৃতি ছিল—কিন্তু আজ এ-দেশে মানুষের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি, সে জোড়া-বলদ মার্কা কি না—কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বাঙালী জোড়া-বলদের মূল্য ভারতের চলতি বাজার মূল্য অপেক্ষা অনেক কম।

এখন আর বাঙলার বিগত সুদিনের কথা ভাবিয়া লাভ নাই, আগত দুর্দিনের চিন্তা করিয়া বাঙালীকে নিজের মুক্তির, জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রকৃত পন্থা বাহির করিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতার যুগেও আজ বাঙালীকে নূতন করিয়া আবার স্বরাজের সাধনায় মগ্ন হইতে হইবে। বাঙলাদেশে জোড়া-বলদের দ্বারা নূতন করিয়া স্বরাজের চাষ আবাদ চালানো যাইবে না। এই জোড়া-বলদই সোনার বাঙলার সোনার ফসল ধ্বংস করিতেছে। অতএব—?

—০—

তিন সখী

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

একটি আশ্চর্য্য শান্ত বিকেলে নিরুপমাকে ওরা দেখতে এল। তখন আকাশে সুন্দর সূর্যাস্ত। সমস্ত দিনের দারুণ উত্তাপের পর বিকেলে ফুরফুরে হাওয়া বইতে সুরু করেছে। আকাশে পাখী উড়ছে···ছাদে ছাদে মেয়েপুরুষের ভিড়। কয়েকজোড়া শালিক একটা নেড়া ছাতের কোণে কিচিরমিচির সুরু করেছে নিজেদের মধ্যে।

ওদের বসানো হয়েছিল দক্ষিণের খোলামেলা ঘরখানায়। দোতলার মধ্যে ওই ঘরখানাই সবচেয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো। দেওয়ালে সুদৃশ্য ছবি,···একটা বিদেশী ক্যালেণ্ডার। সুন্দর একটি ঢাকায় ড্রেসিং টেবিলের কাঁচখানি আচ্ছাদিত। এককোণে মাঝারি সাইজের আলমারী একটি। তার মাথায় ঘড়ি, চুলের কাঁটা, একটি ফুলদানী ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিষ। এসেছিল ওরা তিনজন। ছেলের বাবা, এক ভগ্নীপতি আর একজন বন্ধু। ওরা আসবে ব'লে দোকান থেকে একদিনের জন্য একটি টেবিলফ্যান ভাড়া ক'রে আনা হয়েছে। পুরাণো ফ্যান। টেবিলের উপর সেটি ঘুরছে। একটি অদ্ভুত শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত ঘরময়।

অক্রুর দত্ত লেনের এই বাড়ীটার দোতলায় তিনটি পরিবারের বাস। সাকুল্যে ছ'খানা ঘর। প্রত্যেকে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করছে। ঘরগুলোর সামনে উঠোন খানিকটা। ওধারে সারিবদ্ধ রান্নাঘর তিনটি। এককোণে কলঘর ইত্যাদি। দক্ষিণদিকের ঘর দু'খানাই নিরুপমাদের। ওর দু'ভাই। দু'জনেই ছোট। এখনও স্কুলের গণ্ডি পার হয় নি। অন্য দু'টি পরিবারেও ছ'সাত জন ক'রে লোক। কিন্তু সবচেয়ে সম্প্রীতি তিন পরিবারের তিনটি মেয়ের মধ্যে। ভাব জমাতে আর বন্ধু পাতাতে মেয়েদের নাকি জুড়ি নেই। সুলতা, নিরুপমা আর রেখার তাই গলায় গলায় ভাব। উনিশ-কুড়ি বয়সের আইবুড়ো মেয়ে তিনটির চিন্তাধারা আলাপ-আলোচনা আর বিষয়বস্তু এক।

কালকের বিকেলেই এই অনুষ্ঠানকে নিয়ে ওদের মধ্যে এক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। রেখা বলেছে—'কি যে বিশ্রী ব্যাপার। মনে হয় যেন আলুবেগুন কিনতে এসেছে।'

সুলতা যোগ দিয়েছে সে কথায়। কিন্তু নিরুপমা বেচরী আর মুখ খোলে নি। তার সেই পরীক্ষার দিন আগত। সে একটু লজ্জার হাসি হেসেছে ঠোঁটের কোণে।

সুলতা বলল, 'দেখবি, কি বিশ্রী সব প্রশ্ন করবে। যেন সবজান্তা মেয়ে চাই ঘরে। নিয়ে গিয়ে ত বাপু সেই রান্না করাবি, তার অত ফিরিস্তি কিসের?'

—'জানিস, আমার এক মাসতুতো দিদিকে দেখতে এসেছিল বালীগঞ্জ থেকে। তাকে কি সব বিদঘুটে প্রশ্ন। আমাদের অর্থমন্ত্রী কে, ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালবাসে কি না, প্রেসার কুকার না চুল্লীর রান্না বেশী পছন্দ।'

—'একটা প্রেসার কুকারের কত দাম রে?'

—'কি জানি।'

—'তোর মাসতুতো দিদির খুব বড়লোকের বাড়ীতে সম্বন্ধ হচ্ছে বুঝি?'

—'বড়লোক না ছাই। ও সব প্রশ্ন বাড়ী থেকে তৈরি ক'রে আসে। বিদ্যে জাহির করার ইচ্ছে।'

সুলতা নিরুপমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'একদম ঘাবড়াস্ নে নিরু। যার কথার জবাব দিতে পারবি নে তাকে স্রেফ ব'লে দিবি। মুখ নীচু ক'রে ব'সে থাকিস নে যেন।'

বাধা দিয়ে রেখা বলল, 'মানে একটু স্মার্ট হবি। জানিস্ ত, আজকালকার ছেলেরা একটু চটপটে, একটু চালাক চতুর মেয়ে চায়। অবিশ্যি বিয়ে হবার পর আর সেটা পছন্দ করবে না। তখন একনিষ্ঠ হবি, এদিক্ ওদিক্ তাকাতে পাবিনে। কারও সঙ্গে কথা বললেই দেখবি, ভদ্রলোক মুষড়ে পড়েছেন।'

ওরা সমস্বরে হেসে উঠল।

তিনটি মেয়ে। যেন তিনটি সখী। নিরুপমা ম্যাট্রিক দিয়েছিল কিন্তু পাস করতে পারে নি। এখন সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করে। বাবার জামা-কাপড়গুলো অফিস যাবার আগে ঠিকমত গুছিয়ে দেয়। বোতাম খ'সে পড়লে বোতাম লাগিয়ে দেয় যথাস্থানে।

ভাইদের তদারক করে। আর অবসর সময়ে সুলতা রেখার সঙ্গে ছাদের এককোণে জটলা করে। এ পাড়ার সব খবর ওদের মুখস্থ। কোন্ বাড়ীতে নতুন বউ এল, কাদের বাড়ী মেয়েটা পাড়ার কোন্ ছেলের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করেছে, এ সবের কোন কিছুই ওদের শ্যেন-দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। ছাদের এককোণে তিন সখীতে মিলে পরচর্চায় মশগুল হয়ে থাকে।

সুলতা ওদের মধ্যে একটু বেশী পড়াশুনা করেছে। সে আই. এ. পাস করেছে বছর দুই আগে। কম্পার্ট-মেণ্টাল পরীক্ষাতে পাস, আর কলেজে ভর্তি হয় নি। এখন একটা টিউশনি ক'রে কুড়ি টাকা পায়। রোজ সকালে চটিতে ফরফর শব্দ তুলে সে টিউশনি করতে বেরিয়ে যায়। মাঝে মাঝে চাকরির দরখাস্তও ছোঁড়ে। অবিশ্যি বেশীর ভাগেরই উত্তর পায় না কোন। কালে-ভদ্রে একটা আধটা ইণ্টারভ্যু এসে যায়। তখন নানা জল্পনা-কল্পনা করে ওরা। চাকরি পেলে কি করবে সুলতা। সখীদের সবিস্তারে সেই কথা শোনায়।

রেখা মেয়েটির দাদা কি যেন একটা ভাল চাকরি করে। মা আছে, বাবা নেই ওর। ম্যাট্রিক পাস করেছে বছর কয়েক আগে। আর পড়ে নি। বিয়ের নানা চেষ্টা করেন ওর মা দাদা। কিন্তু কালো আর একটু কোলকুঁজো ব'লে হয়ত কেউ পছন্দ করে নি। তাছাড়া টাকার দাবী। মুক্তিপণের অংশটা হয়ত কালো মেয়ে ব'লেই অবিশ্বাস্য হারে বেশী জানিয়েছে। আজকাল একটা গানের স্কুলে গীটার শিখছে রেখা। সপ্তাহে একদিন শিখতে যায় সেখানে। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গীটারও কিনেছে। খাওয়াদাওয়ার পর গীটার নিয়ে নতুন-শেখা বিদ্যেটার তালিম দেয় মাঝে মাঝে।

রেখা বলল, 'কাল তোকে বিকেলবেলায় দেখতে আসবে বুঝি ওরা? দিনের আলোয় মেয়ে দেখতে চায়, তাই না?'

—'বোধ হয়'—নিরুপমা আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল।

—'নিরু দেখছি এর মধ্যেই ঘাবড়ে গেছিস্। এত ভয় কিসের তোর?'

সুলতা ওকে সাহস জোগাল।

—'ভয় হবে না?' রেখা উত্তর দিল ওর হয়ে। 'এই প্রথম ওকে দেখতে আসছে। তোর আমার মত নয় ত, রপ্ত হয়ে থাকবে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। এর আগে সুলতা আর রেখা অনেকবার কনে দেখার আসরে বসেছে। নিরুপমার এই প্রথম। বয়সও ওর কম ওদের চেয়ে। গায়ের রংটা মোটামুটি ফরসা। নাকমুখ চোখ বেশ ভাসা ভাসা। এক নজরে দেখলে অপছন্দ করার মত মনে হবে না।

মেয়ে দেখে ওরা চ'লে গেল। তেমন কোন বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন করে নি কেউ। জিজ্ঞেস করেছে বাঙ্গালীর সংসারের কথা। জানতে চেয়েছে ঝালঝোল শুক্তো অম্বল রান্নার প্রণালী। উৎসাহভরে সুলতাই মেয়ে সাজিয়েছে। খোঁপায় মোটা বেলফুলের মালা,...কপালে খয়েরী টিপ,...পরিচ্ছন্ন একটি তাঁতের শাড়ী পরণে। নিরুপমাকে দেখতে কিছু মন্দ মনে হয় নি।

সুলতা বলল, 'বুঝলি নিরু, এ পরীক্ষাটায় পাস ক'রে গেলে জানবি যে, অনেকটাই আমার সাজানোর বাহাদুরি।'

নিরুপমা ঘাড় নাড়ল।

ক্লাস থেকে দ্রুতপদে বাড়ী ফিরল রেখা। মেয়ে দেখার সময় উপস্থিত ছিল না সে। তার গীটারের ক্লাস। সপ্তাহে একটা মাত্র দিন। তাই কামাই করতে পারে নি বেচারী—

ছাদের এককোণে সুলতাকে খুঁজে বার করল রেখা।

—'কিরে, কেমন মেয়ে দেখল ওরা?' একটি সাগ্রহ প্রশ্ন করল সে।

—'আমার ত ভালই মনে হ'ল। বোধহয় হয়ে যাবে'—একটা ভারী নিঃশ্বাস পড়ল।

—'ছেলে নিজে এসেছিল নাকি?"

—'না। এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিল মেয়ে দেখতে।'

—'আমাদের নিরু তা হ'লে প্রথম পরীক্ষতেই পাস, বলিস কি?'

—'কি জানি। ছেলে কি কাজ করে যেন রেখা?'

—'এ. জি. বেঙ্গলে কি যেন কাজ। শ'দুই টাকার মত নাকি পায়।'

—'তবে সাধারণ চাকরি? আর বয়সটা? দেখতে শুনতে কেমন শুনেছিস নাকি?'

—'বয়স ত বত্রিশ না কত যেন!' ঠোঁট উল্টিয়ে রেখা জবাব দিল।

—'তোকে আর দেখতে আসছে না কেউ? বাড়ীতে শুনিস নি কোন কথাবার্তা?'

—'কি জানি। দেখতে ত কতজনই এল-গেল।'

খানিকক্ষণ কেউ কোন কথাবার্তা বলল না। একটি নিস্তব্ধতা, একটি মৌন প্রশ্ন দু'জনের মনকেই আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। প্রথম পরীক্ষাতেই উৎরে যাবে নিরু?

এই সাফল্য যেন ওদের মর্মান্তিক লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেখাই কথা বলল আবার,—'তোর সেই অজয়দার কি খবর সুলতা? আর দেখা হয় না?'

—'আর দেখা হয়ে লাভ কি? সে ত বিয়ে করেছে।'

—'সে কি? তুই বলিস নি ত কোনদিন—'

—'ব'লে কি হবে? আজকাললকার ছেলেগুলোই অমনি। এতটুকু সাহস নেই। মেয়ে বন্ধু দরকার শুধু কফিহাউস আর রেস্তোরাঁর জন্য।'

দিন দুই পরে খবর পাঠাল ওরা।

মেয়ে পছন্দ হয়েছে মোটামুটি। তবে আর একবার পরীক্ষা করবে বাড়ীর মেয়েরা। সেই তারিখটাও জানিয়ে দিয়েছে।

নিরুপমা বলল,—'সুলতা, তুই কিন্তু ভাই সাজিয়ে দিস্ আমাকে। তোর হাত ভারী পয়মন্ত রে।'

সে কথার কোন জবাব দিল না সুলতা।

রেখা বলল,—'কে কে দেখতে আসবে, জানিস্ নাকি কিছু?'

—'কি জানি, ছেলের মা হয়ত আসবে শুনেছি।'

হাসল সুলতা। বলল,—'ছেলের মা কিরে? তোর পূজনীয়া শাশুড়ী বল্।'—

ওরা এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার পর মেয়ে দেখতে আসবার কথা সকলের। নিরুপমাদের বাড়ীতে সেই আয়োজনই চলছে। দোকান থেকে রজনীগন্ধার সতেজ ঝাড় কিনে আনা হয়েছে। ফুলদানীতে সাজান হয়েছে সেগুলি। ঘরে বেশী পাওয়ারের আলো দেওয়া একটি। ঝকঝকে তকতকে মেজের উপর কার্পেট বিছানো। বিছানার নতুন চাদর, টেবিলের উপর কভার—সবকিছুই রুচিসম্মত।

দুপুরে বন্ধুর বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছে সুলতা। রেখার গানের স্কুলের কি একটা ফাংশন। তার না গেলেই নয়। তবে সুলতা সন্ধ্যার আগেই ফিরবে ব'লে গেছে। মেয়ে সাজানর দায়িত্ব তার—।

নিরুপমা বলেছে—'আজকের দিনটা তোর বন্ধুর বাড়ীতে না গেলেই চলছিল না?'

সুলতা হেসে উত্তর দিয়েছে—'তোর এত ভয় কিসের রে? আমি ঠিক এসে যাব সন্ধ্যের আগে।'

—'এলেই ভাল,' নিরুপমা ম্লান হেসে বলল।

মেয়েদের চোখ অনেক প্রখর। তারা নিরুপমাকে নতুন ক'রে যাচাই করলেন বেশী পাওয়ারের আলোর সামনে। সমস্ত চুল খুলে দেওয়া হ'ল নিরুর। তাকে হাঁটান হ'ল, সামনে আবার পিছনেও। ছোট ভাইয়ের বাংলা বইটার কি একটা কবিতা পড়তে হ'ল খানিক। একটা কল্পিত চিঠির খানিকটা লিখে দেখাতে হ'ল। এর পর হাতের কাজ। রেখার উলের কাজ দু-একটা, সুলতার সূচীশিল্প, নিরুপমার দু-একটা সেলাইফোঁড়াই সবই ওর নামে দেখান হ'ল। ঘণ্টা দুই পরে বাড়ীমুখো হলেন ওঁরা। নিরুপমা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সুলতা ফিরল অনেক রাতে। ওর বন্ধু নাকি কিছুতেই ছাড়ে নি ওকে। গড়ের মাঠের ওদিকে গঙ্গার ধার অবধি বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিল দু'জনে। মাস্তুল গোটান বিদেশী জাহাজ, আলো-ঝলমল সাদা রঙের ঘরগুলো। নিরুপমাকেও একদিন নিয়ে যাবে সুলতা।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুই সখীতে ছাদে উঠল। অন্ধকারপক্ষ চলছে। কাছের মানুষও যেন দেখা যায় না আর। গলির এদিকটায় করপোরেশনের ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি বহুদিন অকেজো হয়ে গেছে। ছাদের ওপাশেও ছাদ। ছায়াকৃতি মানুষের নিঃশব্দ পদচারণা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে।

রেখা বলল—'কি রে সুলতা, বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে তুই ব'সে রইলি কেন?'

—'কি করব তবে? এখানে ব'সে ব'সে দেখব শুধু নিরু কেমন তরতর্ ক'রে উৎরে যাচ্ছে পরীক্ষায়?'

রেখা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল কয়েকটা। যেন একটা সাপিনী হিস্ হিস্ করল আক্রোশে।

সুলতা বলল—'তোর গানের স্কুলের ফাংশন-টাংশন সত্যি ত? না কি অন্য কোথাও গিছলি?'

—'ফাংশন না কচু। পার্কে গিয়ে বসেছিলাম কতক্ষণ। জানিস, কি সুন্দর একজোড়া ময়ূর-ময়ূরী রেখেছে পার্কে। দুটোতে কি ভাব। আমার কি ভাল যে লাগছিল দেখতে'—

সুলতা স্তব্ধ হয়ে রইল। বড় গুমোট আজ। নৈশ প্রকৃতিতে মৃদু বাতাসেরও আনাগোনা নেই। দূরে হাওড়া পোলের মাথায় লাল আলোর সতর্কতা।

—'নিরুর কি খবর রে? আজ যে বড় ছাদে এল না?'

—'ওর মায়ের কাছে ব'সে কি কাজ করছে যেন। আর ছাদে আসবে কেন? এরপর বিয়ে হ'লে বরকে নিয়ে বেড়াতে আসবে দেখবি। তোকে-আমাকে দেখে মনে মনে হাসবে।'

—'নিরুটার কপাল ভাল। প্রথমবারেই বেশ উৎরে

গেল। অথচ তোর আমার দশা দেখ্। চার-পাঁচবার কত লোক এল-গেল। দূর ছাই, ওসব মনে ক'রে কি হবে? শুধু শুধু মন খারাপ।'

দিন সাত পরে। ক'দিন একটু ঝড়বৃষ্টি হয়ে রুদ্র প্রকৃতি শান্ত হয়েছে। সন্ধ্যার বাতাসটাও যেন ঠাণ্ডা। গঙ্গার ওপর থেকে ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ছাদে ছাদে মেয়ে-পুরুষের ভিড়। আকাশে এক ফালি চাঁদের একটু হাসি—

খুঁজে খুঁজে সুলতাকে ছাদে টেনে নিয়ে এল রেখা। কি যেন করছিল সুলতা। রেখার এই অকারণ ব্যস্ততায় মনে মনে বিরক্ত একটু।

—'বল্ কি বলবি। ইস্, এমন ক'রে টেনে নিয়ে এলি!'

—'শোন্ না। আজ সন্ধ্যের ডাকে চিঠি এসেছে নিরুদের। পোষ্টকার্ডে লেখা।'

—'কিসের চিঠি? খুলে বলবি ত?'

—'বলছি, শোন্ না। গানের স্কুল থেকে ফিরে লেটার বাক্সটা হাতড়াচ্ছি। দেখি চিঠিখানা। লুকিয়ে নিয়ে এসে পড়লাম। ওদের পছন্দ হয় নি, বুঝলি?'

সুলতা সাগ্রহে বলল, 'সে কি রে? কই চিঠিখানা?'

—'এই মাত্র দিয়ে এলাম ওদের। আমি কিন্তু জানতাম যে, পছন্দ হবে না।' রেখা হাসল।

—'কি ক'রে জানতিস্?'

—'আমার সেই সোয়েটারটা, যেটা বুনছিলাম তখন? নিরুর মা ওটা দেখিয়েছিল ওদের। নিরু বুনেছে যেন,' চোখ নাচিয়ে বলল রেখা।

—'তার পর?'

—'তার আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে সোয়েটারটা আগাগোড়া খুলে উল্টোপাল্টা বুনে দিয়েছিলাম আমি। দশ-বিশটা ঘর এখানে সেখানে ফেলে দিয়েছিলাম। জানতাম ওরা ঠিক ধ'রে ফেলবে।' রেখা ঠোঁট টিপে হাসল।

ছাদের অন্য কোণ থেকে একটি ম্লানমূর্তি এগিয়ে এল ওদের দিকে। যেন এই মাত্র কি একটা দুঃসংবাদ পেয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছে বেচারী।

—'কে রে, নিরু না?' রেখা সাগ্রহে বলল।

সুলতা এগিয়ে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল ওকে ছাদের অন্য কোণে।

নিরুর চোখে জল চিক্‌মিক্ করছে। চাঁদের ম্লান আলোতেও সেটা দেখা যায়।

—'দূর বোকা, কাঁদছিস্ কেন?' সুলতা পরমাত্মীয়ের মত বলল কথা ক'টি।

রেখা বলল, 'এই সামান্য ব্যাপারে কি মন খারাপ করতে আছে? প্রথমবারেই কি আর কেউ পছন্দ করে? এই দেখ্ না, আমায় পাঁচবার, সুলতাকে তিনবার দেখে গিয়েছে। আমরা কি কেউ মন খারাপ ক'রে ব'সে?'

হঠাৎ সুলতা একটা ঘোষণা করল।—'ঠিক আছে, নিরুর অনারে আমি তোদের সিনেমা দেখাব। আজই টিউশনির টাকা পেয়েছি। কালকের সন্ধ্যের শোতে তিনটে লেডিজ সেকেণ্ড ক্লাস কেটে ফেল্।'

—'কি বই দেখবি?' রেখা প্রশ্ন করল।

—'যাই হোক্। তোদের যা পছন্দ'—সুলতা দরাজ গলায় ব'লে চলল।

এই মুহূর্তে ওরা তিনটিতে আবার তিন সখীতে পরিণত হয়েছে। ওদের চিন্তাধারা, আলাপ-আলোচনা বিষয়বস্তু সব এক। এখন পৃথিবী শান্ত। ফুরফুরে মৃদুমন্দ মলয়ানিল। হানাহানি, রেষারেষি, একটা সরীসৃপের হিসহিসানি যেন সব অন্য কোন দূর গ্রহলোকের অনুভূতি।

—০—

অসামান্য

শ্রীকালিদাস রায়

ঐ যে বিমান নোংরা করে শুচি আকাশ-পথ,
চমক লাগায় দানবপুরীর ঐ যে ইমারত,
মাঠের বুকে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটছে মালের ট্রেন,
ভারী ভারী জগদ্দলে উর্দ্ধে তোলে ক্রেন।
ঐ যে সেতু নদীর এপার-ওপার বেঁধে খাড়া,
ঐ যে ব্যারেজ ঘুরায় তাহার ধারা,—
বিস্ফারিত চোখে—
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখে সকল লোকে।
ক্ষণকালের এ সব আকর্ষণ,
সঙ্গে সঙ্গে ফুরায় প্রয়োজন।
প্রথম দিনই জাগায় তা বিস্ময়,
অপূর্বতা হয়ে তাদের নিত্য পরিচয়।

ঐ যে চাষী চলছে বলদ লাঙল নিয়ে মাঠে,
ঐ যে বধূ ভরছে কলস ঘাটে,
ঐ যে ধেনুর অঙ্গে জাগে তৃপ্তি-শিহরণ,
জলার ধারে সারি-বাঁধা হাঁসের বিচরণ,
ঐ যে লতা ফুলের মালা জড়ায় শিশুগাছে,
কোলে তাহার পুচ্ছ নেড়ে টুনটুনিটি নাচে।

পাখী তাহার ছানার মুখে দিচ্ছে আহার পূরে,
পল্লবেরা গাইছে গীতি ঐকতানিক সুরে,—
নয় এরা সব বিরাট্ বিশাল, জাগায় না বিস্ময়,
একের মাঝে অনন্তকাল জীবন-ধারা বয়।

কেউ কি কভু তাকায় তাদের পানে?
তাদের মাঝে কিসের লীলা চলছে তা কি জানে?

শিল্পী-রসিক কবি,
কিসে তোমায় মুগ্ধ করে সবি?
কে তোমার ঐ চোখে করে শকতি সঞ্চার,
কর যাতে অসামান্ত নিত্যে আবিষ্কার!
যন্ত্র নহে, জীবনই দেয় অসীমা-সন্ধান
অফুরন্ত তাই ত তাহার দান।
বর্ণরেখা-বাণী ধ্বনির বন্ধনে সে ধন
ক'রে রাখ তুমিই চিরন্তন।

আমরা তখন তাদের মাঝেই পাই
এমন যাহা যন্ত্রাদি বা জড়ের দেহে নাই।
নিত্য নব নবায়মান তাহার মধুরিমা,
উপভোগে পাই না তাহার সীমা।
নগণ্য কি তুচ্ছ তারে আর ভাবি না মনে,
যেন ফিরে পাই রে হারাধনে।
নগণ্য যে, চেয়ে দেখি অগণ্য রূপ তার,
দেখা তারে ফুরায় না ক আর।
সকল বস্তু স্পর্শে কর কস্তুরী-সুরভি,
শিল্পী তুমি আবিষ্কারক, স্রষ্টা, তুমি কবি।

—•—

পারাপার

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ওকে দেখলাম।
ট্রাম-বাস্-জীপ-ট্রাক-স্কুটারে-মোটরে
বান-ডাকা শহরের পথ,
সেই পথ পার হ'তে ফুটপাথ ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম,
ভীরু চোখে গ্রামের বধূটি।
ওর ছ'টি ভীরু চোখে
ওর গ্রামটিকে দেখলাম।

ট্রাম-বাস্-জীপ-ট্রাক-স্কুটার-মোটর,
এরা থামবে না।...

বধূটির দুটি চোখে ছায়া ফে'লে যায়,
চকিত বিধুর ছায়া,
ওর দূর গ্রামটির ছায়া-ঢাকা পথ।
ধবধবে বেলে মাটি ভরা
সে-পথে খুঁড়িয়ে চলে
ওপাড়ার কেলুয়া কুকুর।
যেতে যেতে থামে, ফিরে চায়,
আবার খুঁড়িয়ে পথ চলে।

স্কুটার-মোটর-ট্রাম-বাস্
জীপ-ট্রাক, এরা থামবে না।
হর্ণ দেয়, হর্ণ দেয়,
ঘণ্টা বাজায়।...

দূরে বাঁশবনে
বৌকথাকও পাখী ডাকে।
মহিষের পিঠে চ'ড়ে রাখাল ছেলেটা
হেলেদুলে চ'লে যায় মোড় ঘুরে নদীটির দিকে।

দুপুরের খরতাপে বধূটির চোখের তলায়
ছ'টি ফোঁটা ঘাম জমা হয়।
খরস্রোতা নদীটির ঘোলাজলে মহিষের স্নান,
রাখাল ছেলের স্নান
ওর সেই চোখে দেখলাম।

তাকাল আমার দিকে গ্রামের বধূটি
পলকের সচকিত চাওয়া।
তার সেই চাওয়াটিতে
কত কি যে আমি দেখলাম।
পাতলা কাঠের ফ্রেমে পাতলা কাঠের ঢাকনায়
পারা-ওঠা আয়নাটি ঢাকা,
ছ'চারটি দাঁত ভাঙা সরু-মোটা দাঁতের চিরুনী,
তেল-জবজবে কালো ফিতে,
কাজললতার পাশে সিঁদুরের ছোট কৌটোটি।
কি করুণ সে দীনতা,
কি যে ভয়াতুর!
জানি তাই,
দুবার যে ফিরে চাইবে না
আমার শহরে চোখে চোখ তুলে গ্রামের বধূটি।

ট্রাম-বাস্-জীপ-ট্রাক-স্কুটার-মোটর,
এরা থামবে না।..

শুয়ে ঠাণ্ডা ঘরে
ভাবছি, এ নিদারুণ গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়
পায়নি স্নানের জল
শহর-প্রবাসী ঐ গ্রামের বধূটি।

পাবে না ঝালর-দেওয়া হাতপাখাখানি
নিয়ে যা আসেনি সঙ্গে ক'রে।
শহরে কি ও জিনিষ নিয়ে যেতে আছে ?

গভীর হয়েছে রাত।
ট্রাম-বাস্-জীপ-ট্রাক-স্কুটার-মোটর,
ওরা থেমে গেছে।...

বলছ, থামেনি ?
ঐ বধূটির ভীরু চোখে
ওরা থামবে না কোনদিন ?
ওরা শুধু চলবেই, চলবেই, জানবে না কোথায় চলেছে,
থামতে যদি বা কেউ চায়,
পারবে না,
পেছনের ট্রাম-বাস্-স্কুটার-মোটর
হর্ণ দেবে, হর্ণ দেবে, ঘণ্টা বাজাবে,
তাড়া দিয়ে দিয়ে তাকে আবার চালাবে,
এরা চলবেই।
কোথা যাবে ?
যেখানেই যাক্, থামবে না,
চলবে আবার।

আজ আর ঘুম আসবে না।
বধূটির ভয়ের ছোঁয়াচ
লেগেছে আমারও মনে।
এরা চলবেই।
যদিই না থামে ?
চাইলেও যদি এরা থামতে না পারে ?
ট্রাম-বাস্-জীপ-ট্রাক-স্কুটার-মোটর
বান ডেকে যদি বয়ে যায়
যুগ যুগ ধ'রে
বৌকথাকও-ডাকা জীবনের
পথ-পারাপার রুদ্ধ ক'রে ?

হে বিধাতা, ব'লে দাও,
কোথায় চলেছে এরা,
কোথায় থামবে এরা,
কখন থামবে।
পথ পার হ'তে
দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে
ভীরু চোখে গ্রামের বধূটি।

—•—

নাত্-বৌ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ও বড় বৌ, প্রদীপ তুলে ধর্,
এ বাড়ীতে নতুন মানুষ এল,
অনেকদিনের লুকিয়ে-থাকা সাধ
হঠাৎ যেন আলোর পরশ পেল !
চোখের দৃষ্টি নেইক' তেমন আর,
দেখতে-যে সাধ যায় ত বারে-বার !
—চার কুড়ি যে বছর হ'ল পার,
আশায় আশায় দিন যে কেটে গেল !

আমার হাতে রাখুক্-না ওর হাত,
বেনারসীর খস্‌খসানি শুনি,
গায়ের সুবাস চুলের পরশ নিয়ে
একটু না-হয় সুখেরি জাল বুনি !
পদ্ম-খোঁপার স্বপ্নটুকু ঘিরে
একটি স্মৃতি আসুক-না আজ ফিরে,
দাঁড়িয়ে এখন বৈতরণী-তীরে
ফেলে-আসা পায়ের ধ্বনি শুনি !

হাত দু'টি ওর মাখন দিয়ে গড়া
আঙুলগুলি যেন চাঁপার কলি,
চোখের পাতা অল্প গেছে ভিজে,
কান্নাহাসি লুটায় গলাগলি !
ঝাঁপিটি তার লুকিয়ে কোথাও রেখে
লক্ষ্মী বুঝি এল স্বরগ থেকে ?
—ও বড় বৌ, রাখিস না আর ঢেকে,
দিস্ নে ধাঁধাঁ নতুন কথা বলি'।

আর ক'টা দিন বাঁচব আমি বল্,
বংশে আমার জালিয়ে গেলাম বাতি,
শেষ আরতি সাজিয়ে গেলাম ঘরে,
মালায় দিলাম শেষের কুসুম গাঁথি' !
ওরি হাতের খাব ছেঁচা পান,
ওরি গলায় শুনব হরি-গান,
উজাড় ক'রে করব আশিস্ দান,
ওরি পরশ নোব হৃদয় পাতি' !

আশি বছর বদ্‌লে গেল যেন,
কোন্ মায়াতে দেখছি শুধু চেয়ে—
নাত্-বৌ নয়, আমিই যেন এসে
দাঁড়িয়েছি সেই দশ বছরের মেয়ে !
আল্‌তা-দুধে রাখতে গিয়ে পা,
কেমন-যেন শিউরে ওঠে গা,
কড়ি খেলায় মন যে ভোলে না,
অশ্রু কেবল ঝরে দু'চোখ বেয়ে !

নিজের ছবি দেখছি যে ওর মুখে,
আশি বছর এমন কিছু নয়,
জানি, আবার ওরি যে নাত্-বৌ
আসবে নিয়ে নতুন পরিচয় !
আমের বউল সেদিন যাবে ঝ'রে
'বউ-কথা-কও' ডাকবে আকুল স্বরে,
লেবু ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে,
জগৎ হবে এমনি মধুময় !

গায়ের গন্ধে ধরছে কেমন নেশা,
রাখতে বুকে চাই যে সারাক্ষণ !
ঠোঁটের ফাঁকে শুনি নতুন স্বর,
কত যুগের মধুর আমন্ত্রণ !
মুখের 'পরে তাকিয়ে অনিমেষে
হৃদয় সাথে হৃদয় যে আজ মেশে,
জানি না যে কোথায় ভালবেসে
কেমন ক'রে তৃপ্ত হবে মন !

ও বড় বৌ, থামিস্ কেন বল্,
জোরে জোরে বাজিয়ে যা রে শাঁখ,
একটি সাঁঝের স্বপ্ন-মধুর ক্ষণে
হল্‌দে পাখীর সুরটি শুনে রাখ্ !
খুলে দে রে ঘরের সকল দ্বার,
মাটির সুবাস পাই যেন এবার,
রূপটি দেখি সন্ধ্যা-তারকার,
—পুরেছে সাধ, আসুক এবার ডাক !

বৃষ্টি এলো

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি এলো, ভিজছে টবে ফুল।
হাওয়ায় যেন গন্ধ আসে, রাতের এলো চুল
গন্ধ ঢালে···ঘর ভেসে যায় গন্ধে···ভিজে চুল
টানতে থাকে অকুল স্রোতের দৃশ্যবিহীনে···
বুকের মধ্যে জল ঢেলে ঢেউ তুলতে থাকে সে।
আকুল চোখে মিথ্যে চাওয়া, এখন এলে কে ?

তোমার দেহ দৃশ্যাবলী বিজন শয়নে
রইলো পড়ে, বৃষ্টিভেজা গভীর নিশীথে
লুটানো অভিমানের মালা ভাসিয়ে দিলো যে
ঘর, ভেসে ঘর নিজেই মিলায় বাইরে ; অকূলে
ডাকছে কেন কোথায় যাবো কিছুই জানি নে···
ছিন্নমালা অন্যমনে নীরব ভাসানে
ভাসছে ; তুমি আসতে যদি প্রথম প্রহরে—

আগুনছোঁয়া নিঃস্ব ঘরে একলা পুড়েছি,
তোমার শীতল চোখ মেলে কই ভুলেও আস নি।

—•—

সোবিয়েত সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৮ই অক্টোবর, ১৯৬২ : দিল্লী

আজ দশহরা বা দশেরা। সন্ধ্যার দিকে বের হলাম দশহরার দশ-দশা দেখবার জন্য। দশ দফা পাপ হরণ করবার জন্য গঙ্গাদেবীর জন্ম হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে—ইতি-পুরাণ-কথা বা শাস্ত্রকথা। কিন্তু সেটা কার্তিক মাসে কার্ণিভালে পরিণত কি ক'রে হ'ল ভেবে পাইনে। দশেরার উৎসব দু'বার দেখেছি এলাহাবাদে। আজ দিল্লীতে ঘুরছি শহরের পথে পথে। ফাঁকা জায়গায় রাবণের বিরাট্ মূর্তি ক'রে পোড়ান হচ্ছে—বাজি পুড়ছে, বোমা ফাটছে। রাস্তার দুপাশে দোকান ফলে, ফুলে, ভোজ্য-পানীয়ে পূর্ণ। নরনারী, বালক-বালিকারা তাদের সেরা সুন্দর পোশাক প'রে বের হয়েছে—দলে দলে চলেছে। চলার জন্যই চলা—চলার মধ্যে যে অহেতুকী আনন্দ আছে তা বহুকাল হারিয়েছি। এখন কাজের তাড়ায় চল্‌তে হয়, চলার বেগে এখন পায়ের তলায় রাস্তা জাগে না। জনতার পোশাক-পরিচ্ছদ বিচিত্র —অধিকাংশক্ষেত্রে প্যাণ্ট, শার্ট। ধুতি, পাজামা, দেশী কুর্তা পরা লোক পঞ্চমের দলভুক্ত। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আমাদের ন্যাশনাল পোশাক প্যাণ্ট, শার্ট কোট হয়ে গেছে। মুসলমানী দরবারী পোশাকের অনু-করণে গায়ে আচকান, পরণে যোধপুরী আঁটা পায়জামা, মাথায় গান্ধী টুপি চাপিয়ে একটা ক্যামিলিয়নী জাতীয় পোশাক করেছি বটে, তবে তাও সর্বদেশ গ্রহণ করে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের বড়-মেজরা এই পোশাক পরেন—কিন্তু অবশিষ্টরা পাশ্চাত্ত্য পোশাক পুরোপুরি নিয়েছে—মায়-কণ্ঠলংগোটি। লংগোটি নাম শুনেও কারও ও জিনিষটা পরতে ঘেন্না হ'ল না। একবার ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব্ বিকানীর থেকে ষ্টার থিয়েটরে রবীন্দ্র উৎসব করে; আমি ছিলাম প্রধান অতিথি। গিয়ে দেখি, সভায় মাড়োয়ারী বণিক্ পনের-আনি দর্শক, কিন্তু একজনেরও পরণে মাড়বারের জাতীয় পোশাক দেখলাম না ; কারো মাথায় পাগড়ি নেই। সকলের পরণে নিখুঁত সাহেবী পোশাক —মায় রঙবেরঙের টাই ! জয়পুরে গতবৎসর গিয়েছিলাম —সেখানে দেখি 'সভ্য'দের মধ্যে দেশী পোশাক অদৃশ্য হয়েছে। পুষ্করতীর্থ থেকে ফিরতি জনতার দেহে ও শিরে রঙের বাহার দেখেছিলাম। সেই বিচিত্র রঙের সৌন্দর্য দেখে মনে হ'য়েছিল, এরা যেন সভ্য না হয়। কিন্তু তারা ভাবছিল হয়ত ঠিক উলটো কথা। এইসব গ্রাম্য জবড়জং পোশাক ছেড়ে বেশ ফিট্‌ফাট্ সাহেবী পোশাক কবে ধরবে। মোটকথা—একদিন যেমন আমরা মুসলমানদের পোশাক পরেছিলাম, আজ পাশ্চাত্ত্য আবরণে দেহ আচ্ছাদন করছি। মুগলযুগে আকবর ও প্রতাপ সিংহ, অউরঙ্‌জেব ও শিবাজীর পোশাক একই ছিল। এখনও তাই। তবে এখন দুনিয়ার সর্বত্র এই পোশাকই লোকে পরছে, সুতরাং হৃষ্টমনে সেটা মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ম। কিন্তু মেয়েরাই দেশের ধারা রক্ষা ক'রে আসছে—শাড়ি প'রে। তবে slack পরা মেয়েও দেখেছি—তাদের দিকে তাকান যায় না। অনুকরণ কতদূর যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত এই মহানগরে দেখলাম। সুন্দরীদের সুন্দর পোশাক পরার অধিকার নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু সুন্দরের কি মাপকাঠি নেই ? দেশ কাল পাত্র কিছুরই বিচার করতে হবে না ? বীট কবিদের কবিতার মত তাদের পোশাক, তাদের খানা-পিনা তারও অনুকরণ করতে হবে আধুনিকতার দোহাই পেড়ে ? নাইলন্ আর কত সূক্ষ্ম হবে ?

দিল্লীর আলো-আঁধার রাস্তায় ঘুরছি। রাবণের দেহভস্ম তখন ধূমায়মান—উৎসাহী দর্শকের ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। জানি না কোন দেশের কোন এক সম্প্রদায় কবে ঘোষণা ক'রে বসবে, তাদের 'হিরো' বা বীরকে অসম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে—জিগির তুলবে—বয়কট কর, উৎসব বন্ধ কর। তখন একপক্ষে রাবণ পোড়ান হবে ধর্মের অঙ্গ, অপর পক্ষে সেটা বন্ধ করা হবে পুণ্যকর্ম। বাধুক হাঙ্গামা।

হজরত মহম্মদের ১৬ শতকের আঁকা দুষ্প্রাপ্য ছবি বহুব্যয়ে বিলাত থেকে সংগ্রহ ক'রে পাঠ্যপুস্তকে ছাপিয়ে লেখক-প্রকাশক মনে করেছিলেন, তাঁদের বই মুসলমান-প্রধান বাংলা দেশের স্কুলে মকৃতবে খুব কাটবে। কিন্তু হজরতের ছবি দেখে নিষ্ঠাবান্ মুসলমানরা এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত প্রদেশ থেকে এক রজহি বা ছুতারের ছেলেকে আনিয়ে ভোলানাথ সেন

প্রকাশককে দিবালোকে হত্যা করান ; কারণ কাফেরেরা হজরতের ছবি ছেপেছে। মূর্তি! সর্বনাশ! কিন্তু আসল কথা ছবিটা মুসলমানেরই আঁকা। তবে সে মুসলমান শিয়া—আর এঁরা সুন্নি! শুনেছি—ভগবান্ বুদ্ধদেব সেজে আর অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে নামতে পারছে না। পশ্চিম ভারতের নয়া বৌদ্ধরা মারমুখো হয়ে উঠছেন। হিন্দুরা কৃষ্ণকে 'কেষ্টঠাকুর' বানিয়ে পথে পথে থালা হাতে নাচিয়ে বেড়ায়, তাতে কারও আপত্তি হয় নি। পরম আর্থিকবোধ থেকে তার উদ্ভব!

৯ই অক্টোবর, ১৯৬২ : নয়াদিল্লী

ঘড়িতে হয়েছে ভোর ; কিন্তু এখনো রয়েছে রাতের অন্ধকার। দূরের মোটরের হর্ণ নিকটে আসে। থামে দরজার কাছে ; মৃদু হুংকারে জানিয়ে দেয় পালামে যাবার জন্য সে এসে গিয়েছে। কালকে রাত্রে বিশ্বপ্রিয় ট্যাক্সিস্থানে গিয়ে ব'লে এসেছে—ভোর পাঁচটায় আসতে হবে। ঠিক এসেছে। দিল্লীর এই একটা সুবিধা—শহরের ভিতর ফোনে জানালেও ট্যাক্সি এসে পড়ে। আমরা তৈরী ছিলাম। ডাঃ বিনদ্রা এলেন, তাঁর ওখানে গিয়ে চা খেলাম ; গতকাল উপরে এসে নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছিলেন।

পালামের পথে গোপীনাথনকে তুলে নিলাম ; এঁর সঙ্গে পূর্বে পরিচয় হয়েছিল। ইনি কেরলার লোক, কট্টর কম্যুনিষ্ট ছিলেন, এখন মতভেদ হওয়ায় স'রে এসেছেন। জনযুগম্ কাগজের সঙ্গে যখন যুক্ত, তখন বোলপুরে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে একটা লেখা আনতে গিয়েছিলেন আমার কাছে।

পালামে পৌঁছিয়ে দেখি—তখন বেলা ৬টা—কৃপালনী এসে গেছেন ; নন্দিতাও তাঁর সঙ্গে এসেছেন, স্বামীকে see off করবার জন্য। কৃপালনী সিন্ধী ; আচার্য কৃপালনী তাঁর দূরকুটুম্ব। যৌবনে বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে আসেন ; কিন্তু আইন ব্যবসায়ে ঢুকতে মন গেল না। তাই গেলেন শান্তিনিকেতনে —শিক্ষকতা করবার জন্য। বহুকাল ছিলেন সেখানে। অধ্যাপনা, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলীর সম্পাদনা, রবীন্দ্র-সদন পরিচালনা প্রভৃতি অনেক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সহকারী কর্মসচিবেরও কাজ করেন দীর্ঘকাল। রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতাকে বিবাহ ক'রে সেখানেই সংসার পাতেন। পরে শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিল্লীতে চ'লে যান। নানারকম বেসরকারী, আধাসরকারী, সরকারী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। এখন তাঁর খ্যাতি সাহিত্য আকাদেমীর সম্পাদক ব'লে। ঐ প্রতিষ্ঠানটা তাঁরই। অদম্য চেষ্টায় খাড়া হয়ে উঠেছে। ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখেও ইনি যশস্বী হয়েছেন। কৃপালনী বিদেশে ঘুরেছেন—ঘাঁতঘোত জানেন—তাই এঁকে সঙ্গীরূপে পাওয়াতে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছিল, কারণ, দ্বিবেদী ও আমি একেবারে গ্রাম্য। একজন বালিয়া জেলার, অপর জন বীরভূমের। আমাদের কাছে ঘর ছেড়ে আঙিনাই বিদেশ।

হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী এসে পড়লেন সপরিবারে স্ত্রীপুত্র পুত্রবধূ, কন্যা জামাতা এমন কি তৃতীয় বংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এখন দ্বিবেদী চণ্ডীগড়ের অধ্যাপক। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর ছিলেন হিন্দীর শিক্ষক। বিশ্বভারতীর হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার কথা স্মরণীয়। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল কাজ পেয়ে চ'লে যান। ধন ও মান অর্জন ক'রে ঘরবাড়ী বানিয়ে বেশ ছিলেন। তার পর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রাম্য' রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে উড়ে গিয়ে সদ্য পড়েছেন চণ্ডীগড়ে। হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক তিনি। বাংলা ভাল জানেন।

একটু পরেই মিস্ কিচ্‌লু এলেন, সঙ্গে তাঁর আমাদের ছাড়পত্র। কাগজপত্র বুঝে নিলেন কৃপালনী। এলেন সোবিয়েত এমবেসীর সংস্কৃতি অ্যাটাচি ; মরোজোভ এলেন। ইনি শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস ছিলেন, বাংলা ভালই জানেন—রুশভাষা শেখাতেন সেখানে। কিন্তু বিশ্বভারতীর কেউ সে ভাষা শেখে নি। সুরু করেন জন দশ—কি উৎসাহ! কিন্তু একে একে নিবিল দেউটি—উৎসাহের দপ্‌দপানি মিলিয়ে গেল রুশ ব্যাকরণের কড়মড়ানি শুনতে শুনতে। মরোজোভকে উপরের হুকুমে কলকাতায় চ'লে যেতে হ'ল ; তার পর এখন এমবেসীতে কাজ করছেন। শান্তিনিকেতনে বড় বাড়ী ভাড়া করেন, বেশ ভাল রকম খরচ করতেন। কম্যু-নিষ্টরা বিদেশে বেশ আরামেই থাকে—দেশে এত আরাম পায় না। মস্কো, লেনিনগ্রাদের একটা ফ্ল্যাট বাড়ীতে কয়েক শ' পরিবারের সঙ্গে ৩।৪ খানা ঘর নিয়ে টোঙের উপর খাঁচা ঘরে বাস। আর এখানে বিশাল বাড়ী, চাকর-বাকরের অভাব নেই। এরা এত যে খরচ করতে পারে তার কারণ এরা রুব্‌লে বেতন পায়। একটা রুব্‌লে পাঁচ টাকার উপর বিনিময়ে পাওয়া যায়। সুতরাং তারা ভাল ক'রেই খরচ করতে পারে। পূর্ব জার্মেনীর এক অধ্যাপক কলকাতায় এসে কিছুকাল থাকেন ; তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। বাড়ী ভাড়া ৬০০৲—এয়ার

কন্‌ডিশন্‌ড ঘর। চাকার-বাকর, শোফার, গাড়ী সব আছে। আসল কথা বিদেশে গিয়ে কোন জাত নিজের দেশের দারিদ্র্য, দুঃখ দেখাতে চায় না।

এরোপ্লেন ছাড়তে দেরি আছে। মিসেস বিকোবা নামে এক রুশী মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। পরিচয় করিয়ে দিলেন রুশ সংস্কৃতি অ্যাটাচি। মিসেস বিকোবা রুশ থেকে এসেছেন—যাচ্ছেন কলকাতায়, প্রশান্ত মহলানবিশের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে থাকবেন; সেখানে লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে মূল্যবান্ সংগ্রহ আছে, তাই নিয়ে কাজ করবেন। ইনি বাংলা ভাষায় পণ্ডিত—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষক। আমাকে জানেন আমার বই দিয়ে। আমরা কথা বলছি—এমন সময় মাইকে হাঁক দিল—'কলকাতার প্লেন ছাড়বে, যাত্রীরা প্রস্তুত হন।' সুতরাং কথাবার্তা বন্ধ হ'ল। তবে, বিকোবা বললেন—'আপনি ফিরে আসুন, দেখা করবই'। দেশে ফিরে যাবার আগে এক সপ্তাহ তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ ক'রে থেকে যান।

আমাদের অনেক বেড়া ডিঙাতে হবে—হেল্‌থ, কাস্টম্‌স্‌, ন্যাশনালিটি প্রভৃতি। কাস্টম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, টাকাকড়ি কি আছে? বললাম, ৭৫ টাকা। আমাদের সহযাত্রী ছিলেন দুইজন অতি তরুণ অধ্যাপক—একজন ওড়িয়া, অপরজন পাঞ্জাবী হিন্দু,—বর্তমান ভারত ইতিহাস সম্বন্ধে রুশের ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতার জন্য যাচ্ছেন। তাঁরা একটি পয়সাও সঙ্গে নেন নি। তাসখন্দে এঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়।

ওভারকোট, ছাতা, ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছি চা খাচ্ছি। এমন সময় শোনা গেল, প্লেন ছাড়বে। আগেই প্লেনের ভিতরের প্ল্যান ও কোন্ সিট আমার—তাতে লাল পেন্‌সিল দেগে, কাগজ দিয়েছিল। জন ৭০ যাত্রী। প্লেনটা রুশীয়; পাইলট, হোস্টেস্ সবই তদ্দেশীয়। ঘোষণা রুশীয় ভাষায় হয়—পরে ইংরেজীতে ব'লে দেয়। প্লেনের অভিজ্ঞতা ছিল, দার্জিলিং ও বোম্বাই যাওয়া-আসা করেছি। ককপিটে ব'সে ভিতরের যন্ত্রপাতির কাজকর্ম ও বাইরের দৃশ্য দেখেছি। সোবিয়েত প্লেনে ধূমপান নিষেধ নয় তবে উপরে নিরাপদে চলবার পর, সে অনুমতিটা দেওয়া হয়। প্লেন ছাড়বার সময় রুশ ভাষায় আলোর অক্ষরে জানিয়ে দিল যে, এবার বেল্‌ট্ বাঁধতে হবে, মাইকেও জানিয়ে দিল রুশ ভাষায় ও ইংরেজীতে। কাগজপত্র ছিল লণ্ডনের কম্যুনিষ্ট কাগজ ডেলি ওয়ার্কার এবং সোবিয়েত দেশে মুদ্রিত কয়েকখানা পত্রিকা। ভারতীয় কাগজ পত্রিকা ছিল না। কেন ভারতীয় কাগজ নেই বুঝলাম না। অথচ ইণ্ডো-সোবিয়েত চুক্তিতেই যাওয়া-আসা চলছে।

পালাম বন্দর ছাড়বার এক ঘণ্টার মধ্যেই দূর প্রেনে শ্বেত পর্বতসারি দেখা গেল, তখনও বুঝতে পারছিনে যে তুষারাবৃত পর্বত সামনে। একটু একটু ক'রে কাছে আসছে—প্লেন সমতল ভূমি ছেড়ে চলেছে তুষারঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়ে। এ কি মহান্ দৃশ্য—মনে হচ্ছে যেন মাটির তরঙ্গ তুষার-ফেনরাশি বক্ষে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। আমরা চলেছি—১১০০০ মিটার উপর দিয়ে। যে গিরিশৃঙ্গ মানুষ পায়ে হেঁটে উত্তীর্ণ হবার কত চেষ্টা করেছে, কত মানুষের প্রাণ হরণ করেছে এই নিষ্ঠুরা নির্বাক্ স্তব্ধ ধরণী। আজ বিজ্ঞানীর যন্ত্র-দানব তাকে নিচে ফেলে বিকট উল্লাসে উড়ে চলেছে।

যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি,
স্থল জল যত তার পদানত
আকাশ আছিল বাকি।
আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
কর্কশ স্বরে গর্জন করে
বাতাসেরে জর্জরি।
আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।

উপর থেকে অত্যুঙ্গ শিখরশ্রেণীকে মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য তাঁবু। কল্পনা করছি ঐ-ঐখান দিয়ে হয়ত পথ—ঐ-না একটা গাছ—ঐ একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কত ছবি মনে জাগছে। প্লেন চলেছে শব্দ ক'রে। এয়ার হোস্টেস ব্রেকফাস্ট আনে—চেয়ারের সঙ্গে ট্রে আটকে টেবিল তৈরি করে। রুশিয়ান খানা। সুন্দর করে সাজানো খাদ্যগুলি সুখাদ্য—অন্য প্লেনের অভিজ্ঞতার কথা নাই বা তুললাম।

তুষার-তরঙ্গ চলছে; হঠাৎ মনে হ'ল, একটা অতি বিস্তৃত সমতল ভূমি। এই কি পামীর মালভূমি—ভূগোলে যার কথা পড়েছি?

কে জানে? কাকে জিজ্ঞাসা করব? দু'ঘণ্টার উপর এই তুষার-তরঙ্গের উপর আমরা ভেসে চলেছি। সমতল দেখা গেল—বুঝলাম, ভারত সীমানা পেরিয়ে মধ্য এশিয়ায় পড়েছি।

সহযাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় কয়জন দেখলাম, আলাপ হ'ল। তাঁদের মধ্যে দুই জন বাঙালী।—এঁরা পাঁচ জন বিমান বিভাগে (এয়ার ফোর্সে) কাজ করেন যাচ্ছেন তাসখন্দ। বুঝলাম, মিলিটারী ব্যাপার নিয়ে

চলেছেন। এই যুবকদের স্বাস্থ্য, উৎসাহ, সাহস দেখে বুঝলাম, ভারতে যে নূতন প্রাণ এসেছে—এঁরা তারই প্রতীক। নানা কথা হ'ল, কিন্তু কেন যাচ্ছেন, সে-সব প্রশ্ন করলাম না। আন্দাজ করলাম M.I.G-এর শিক্ষানবিশী করতে চলেছেন।

উজবেকিস্তানের পাহাড়, সমতল, শস্যক্ষেত, গ্রাম, শহর দেখতে দেখতে তাসখন্দের এয়ারপোর্টে নামলাম। বেলা প্রায় ১১টা তখন।

প্লেন থামল। কিন্তু তখনই নামতে পেলাম না। সকলেই ব'সে। দেখি দু'জন মহিলা ডাক্তার ও নার্স উঠে এসেছেন। প্রত্যেক যাত্রীর মুখে মোটা থার্মোমিটার ভ'রে তাপ দেখছেন—৩৬ ডিগ্রী অর্থাৎ নর্মাল। নাড়ি টিপে দেখলেন ঠিক আছে।—মনে পড়ে, যেবার রেঙ্গুন যাই, কলকাতার বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়বে। আমরা ষোল টাকার ডেক-যাত্রী জাহাজে উঠবার সিঁড়ির মুখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে—বাঙালী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া, বিহারী। একজন ডাক্তার এলেন—পেটে একটা ধাক্কা দিয়ে কি দেখলেন তিনিই জানেন; চোখের নিচটা টেনে ধরলেন, হাঁ ক'রে জিভ দেখালাম। তারপর ছুট্ ছুট্—সিট দখল করতে হবে। রুশ ডাক্তারণী ও নার্স নামবার সময়ে International Health Certificate-টা দেখলেন। এই সার্টিফিকেট জোগাড় করতে কি হয়রানি ভুগতে হয়েছিল। আর তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে সীল দিয়ে কাজ শেষ করলেন। এত মেহনতে পাওয়া কাগজটার উপর আরেকটু দরদ দিয়ে দেখ বাপু।

এয়ারপোর্টের কাছেই একটা বাড়ী—সেদিকে চলেছি, এমন সময় একটি লোক এসে ইংরেজীতে শুধুলেন আমরা সায়েন্স অ্যাকাডেমির অতিথি কি? তিনি উজবেকী মুসলমান, পোশাক-পরিচ্ছদ তদ্দেশীয়—নীল পায়জামা, নীল কোর্তা, মাথায় ঐ দেশীয় টুপী, নীলের উপর সাদা সূতির কাজ। উজবেকী ভদ্রলোকের নাম মিঃ আন্‌বার—স্থানীয় অ্যাকাডেমির সদস্য, ভূতত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন। তাঁরা আমাদের নিয়ে সেই বাড়ীতে চললেন। এটা যাত্রীদের বিশ্রাম ও ভোজনালয়। তাসখন্দ হোটেল অনেক দূরে, শহরের ভিতর। প্লেন বদলাতে হবে জেনে জিনিষপত্র সব নামিয়ে এনেছিলাম। শুনলাম মস্কো-প্লেন ছাড়বে সন্ধ্যার পর, অর্থাৎ সাতঘণ্টা এই শহরে থাকতে হবে। মন্দ কি। শাপে বর হ'ল, মধ্য এশিয়ার একটা জায়গার উপর ত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাবে। অ্যাকাডেমির মোটর গাড়ি ক'রে আমরা শহর দেখতে বের হলাম। প্রথমেই প্রাচ্য অ্যাকাডেমিতে গেলাম। আধুনিক ঘরবাড়ী সাজ-সজ্জা। অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় হ'ল—মিঃ আন্‌বার দোভাষীর কাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উজবেকী ভাষায় গ্রন্থ লেখা হয়েছে, কবির বইও কিছু কিছু ছাপা হয়েছে। নৌকাডুবির উজবেকী অনুবাদ হয়েছে রুশী তর্জমা 'ক্রুশেনী' থেকে; তাসখন্দে ছাপা হয় (১৯৫৮)। এছাড়াও গল্পগুচ্ছের কতকগুলি গল্পের অনুবাদ দেখলাম, সেটা ছোট বই। অধ্যক্ষ আমাদের 'বাবরনামা' বই দিলেন, তাতে মধ্য এশিয়ার মধ্যযুগীয় চিত্র ও তুর্কী লিপিকলার (caliography) ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। এখানে অল্ বারুণী সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে; এই মহাপর্যটকের এক মূর্তি তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এ মূর্তির মূল ছবি কোথায়? তাঁরা বললেন, কল্পনা থেকে এটা সৃষ্টি করা হয়েছে।

উজবেকীদের নৃত্যকলা ও নাট্যাভিনয় বিখ্যাত, সে সব দেখার ফুরসুত নেই। এরাই রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি নাট্যাকারে অভিনয় করে—গঙ্গার কন্যা (ডটার অব্ দি গ্যাঞ্জেস) নাম দিয়ে। এদের সরকারী থিয়েটারে অভিনয় হয়। গত বৎসর মার্চ মাসে যখন দিল্লী গিয়েছিলাম পীস্ ফেষ্টিভালের রবীন্দ্র উৎসবে যোগদানের জন্য, তখন ট্রাভাংকোর হাউসে রবীন্দ্রনাথের রূপপরিক্রমা সম্বন্ধে চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়; গিয়েছিলাম। সেখানে নৌকাডুবির চিত্রগুলি দেখান হয়েছিল। প্রদর্শনী উন্মোচন করেন বাণারসী দাস চতুর্বেদী—পার্লামেন্টের সদস্য; আমার পুরাণো বন্ধু—শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ছিলেন এণ্ডরুজের সহায়রূপে। বহির্ভারতে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা ছিল এঁর বিশেষ আলোচনার বিষয়।—প্রদর্শনীতে পরিচয় হয়েছিল অ্যাকাডেমিশিয়ান Seri-brykaov-এর সঙ্গে। মস্কোতে এবার তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়; সে কথা পরে আসবে।

অ্যাকাডেমিতে মিঃ আনবারের বদলে একটি রুশ মহিলা এলেন দোভাষী হয়ে। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে হিন্দী পড়ান। ইংরেজীতে কথাবার্তা হচ্ছিল; কিন্তু যখন জানলাম হিন্দী শিক্ষিকা, তখন হিন্দীতে কথা সুরু করলাম। বেচারা প্রথমে খুব সঙ্কোচ করছিল। মেয়েটি উক্রেয়েনী; 'পিতাজি'র সঙ্গে তাসখন্দে এসেছিল, তিনি কাজ করেন। 'মাতাজি' Moldaviaতে থাকেন, কেন তা বুঝলাম না, জিজ্ঞাসাও করলাম না। মেয়েটি বিবাহিতা—স্বামী স্থানীয় সঙ্গীতশালায় কাজ করেন—একটি শিশু আছে। শহর ঘোরার সময় তারা কোথায় থাকে দেখিয়ে দিল। শহর ঘুরছি—ক্রুস্তেজর বিরাট্ মূর্তি

চোখে পড়ল। ফ্রুনজে (১৮৮৫-১৯২৫) নামকরা বিপ্লবী, মধ্য এশিয়ায় জন্মেছিলেন খিরগিজস্থানে পিশপেক শহরে; এই শহরের নাম এখন ফ্রুনজে। মস্কোতে ফ্রুনজে মিলিটারি অ্যাকাডেমির দশতলা বাড়ী—যেখান থেকে অনেক রণধুরন্ধর শিক্ষা পেয়ে বের হয়েছেন। ঐ অ্যাকাডেমির সামনের উদ্যানে ফ্রুনজের মূর্তি আছে, মস্কোতে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ে। ফ্রুনজের নাম রুশে সুপরিচিত। ফ্রুনজের নাম দেওয়া শহর সম্বন্ধে পড়েছি; বিশাল শিল্পনগরী হ'য়ে উঠেছে। সময় ও সুযোগ থাকলে মধ্য এশিয়ার রূপান্তরটা দেখতাম। আমি জানি তাদের প্রাচীন ইতিহাস।

এককালে সে অঞ্চলের লোকে ছিল বৌদ্ধ, ধর্ম পেয়েছিল ভারত থেকে। ধর্মগ্রন্থ পড়ত সংস্কৃত থেকে তারপর সেখানে এল ইসলাম। পুরাণো পটের উপর নূতন রঙ পড়ল। আরবী হ'ল ধর্মের ভাষা। পার্সী সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পকলা। আচার-ব্যবহার লোকের মনে নূতন প্রেরণা এনে দিল। আলো জ্বলল সমরকন্দ, বুখারা, খিভায়······কালে জ্ঞানের ইন্ধন গেল ফুরিয়ে। নিষ্প্রভ হয়ে গেল মধ্য এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। জ্বলল সেখানে হিংসার আগুন, উপজাতিতে উপজাতিতে কলহ ও যুদ্ধ। সেই শনির ছিদ্রপথ দিয়ে রুশীয়রা এখানে প্রবেশ করে, যেভাবে ভারতে করেছিল ইংরেজ। জারের ('Czar') কঠোর শাসনে নিষ্পিষ্ট হ'ল এরা। তারা না পায় শিক্ষার আলোক, না জাগে সেখানে নূতন শিল্পকলা। ধর্মের মূঢ়তা মনের উপর এনে দিল আঁধার। সোবিয়েত ভুক্ত হয়ে আজ সে দেশে নানা জাতির মধ্যে আত্মচেতনা জেগেছে। নূতন শিক্ষা তাদের মনের মুখোশ খুলে দিয়েছে। এখন যে শিক্ষা পাচ্ছে তা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাসখন্দে কত প্রতিষ্ঠানের পাশ দিয়ে গেলাম। লাল রঙের ট্রাম, ট্রলিবাস, মোটরকার সবই আছে আধুনিক শহরে। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে চললাম শহরতলীতে। এখনও আধুনিক বিজ্ঞানের স্পর্শ ততদূর পৌঁছয় নি। খোলা ড্রেন দিয়ে নর্দমার জল যাচ্ছে, কিন্তু এ সবের বদল শীঘ্র হবে ব'লেই তাঁরা আশা করেন।

তাসখন্দ হোটেলে এলাম বিশ্রামের জন্য। সরকারী হোটেল বেশ বড়। আমরা এখান থেকে ছবির কার্ড কিনে চিঠি লিখলাম দেশে—দাম দেব কি ক'রে, আমাদের কাছে আছে ভারতীয় মুদ্রা। আমাদের দোভাষী মহিলা কাকে কি বললেন—কার্ডও পেলাম, স্ট্যাম্পও পেলাম।

এই হোটেলের সামনে রাস্তার অপর পারে জাতীয় থিয়েটার—সুসজ্জিত উদ্যান; ফোয়ারা থেকে জল ছিটকে পড়ছে। কত লোক কত জাতের কত বিচিত্র পোশাক। তবে পোশাক মোটামুটি ভাবে পাশ্চাত্ত্য—রুশীয় নয়। উজবেকীরা কিন্তু তাদের জাতীয় পোশাক প'রে। মেয়েরা পর্দানশীন নয়, উজবেকী পোশাক পরে চলেছে পথে—ট্রামে বাসে। মধ্যযুগের বুরখা-ঢাকা মেয়ে চোখে পড়ল না।

আবার শহর ঘুরতে বের হলাম, অন্য গাড়ি এসেছে। প্রথম গাড়ির ড্রাইভারের ছুটি হয়েছে। তাসখন্দ বিরাট্ শিল্প-নগরী—বিশেষতঃ তুলার বা সূতীর কাপড় বানাবার কারখানা অনেক; বড় বড় বাড়ী উঠছে পথের ধারে, জীর্ণ-কুটীরবাসীদের জন্য নির্মিত হচ্ছে।

বিকালে ফিরে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া হ'ল—তাকে লাঞ্চ বলতে পার—ডিনারও বলতে পার। তাসখন্দ হোটেলের বিরাট্ ভোজনশালা; মহিলারাই সেবিকা। কি ছোটাছুটি করছে রাশি রাশি খাবার নিয়ে। এখানকার রান্নাবান্না রুশীয় থেকে একটু পৃথক্—পোলাও, শিক্কাবাব প্রভৃতি এখানে দেয়। কিন্তু আমরা এমন অবেলায় হাজির হয়েছি, যখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের খাদ্যবস্তু নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বেকন চলে না, বেশীর ভাগ মেষ-মাংসই। প্রচুর আঙুর টেবিলে দিয়েছে। অন্য টেবিলে দেখি, ভোজনবিলাসীর দল এক একটা বৃহৎ তরমুজ কিনে এনে ফালা ফালা ক'রে কাটিয়ে তৃপ্তি ক'রে খাচ্ছে। আমার সহযাত্রারা কেউ তরমুজ খেলেন না ব'লে, আমিও আর চাইলাম না; তবে ফিরতি পথে খেয়েছিলাম। শীতকালে তরমুজ খাওয়ার কথা আমরা ভাবতে পারি নে, তাই স্বাদটা গ্রহণ করা গেল।

এর পর আমরা এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁতে চ'লে এলাম। তখন খাওয়ার ঘর একেবারে জনশূন্য, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কেবল দুইজন মহিলা সেবিকা অপেক্ষা করছেন। সাধারণতঃ এখানে যাত্রীর ভিড় হয়—এরোপ্লেন এসে গেলে।

দ্বিবেদীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী অধ্যাপক, ডক্টর তেওয়ারী, ইনি দ্বিবেদীর ছাত্র। বাসা পান নি ব'লে এখনও তাসখন্দ হোটেলে আছেন সপরিবারে। আমরা সেখানে গিয়ে তাঁর সন্ধান করি—তখন ছিলেন না। এখন এলেন। বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ জন ছাত্র হিন্দী শিখছে। উজবেকী ছাত্রই বেশী, রুশীও আছে। প্রত্যেক ছাত্রকেই তিনটা ভাষা শিখতে হয়—মাতৃভাষা, রুশীভাষা ও আরেকটা ভাষা—এখানে হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্সী ও

চীনা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাংলার ব্যবস্থা নেই ; মনে হ'ল, যেখানে শিল্পীরা নৌকাডুবির নাট্যরূপ দিয়ে খ্যাতিলাভ করেছে—তাদের মধ্যে বাংলা শেখাবার ব্যবস্থা করলে হয়ত প্রয়াস ব্যর্থ হ'ত না।

ডক্টর তেওয়ারী বললেন, তাসখন্দে সাধারণের মধ্যে হিন্দী ফিল্মের খুব জনপ্রিয়তা। 'বৈজুবাওরা' থেকে 'লাভ ইন্ সিমলা' সবই এসেছে। খুবই ভিড় হয়। এমন কি টিকিট বেচাবেচিও চলে চড়া দামে। প্রথম প্রথম হিন্দী ফিল্মগুলিতে উজবেকী ভাষা জুড়ে দেওয়া (dub) হত, এখন তা হয় না। হিন্দী গান মুখে মুখে অনেকে শিখেছে, ছাত্রেরা কালিদাস, তুলসীদাসের সঙ্গে নার্গিস রাজ কাপুর সম্বন্ধে জানবার জন্য উৎসুক। বুঝলাম, হিন্দী ভাষাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। আর জনতার রুচি? যেমন শেখাবে তেমনি শিখবে। মানুষের মত অনুকরণপ্রিয় জন্তুর জুড়ি মেলে না জীবজগতে।

মস্কো যাবার প্লেন এসেছে শুনলাম। মিঃ আন্‌বার এসেছেন উঠিয়ে দেবার জন্য। সমস্ত যাত্রী দাঁড়িয়ে ঘেরার বাইরে—এখনও উঠবার হুকুম হয় নি। আমাদের দোভাষী গেটে কি বললেন, জানি নে,—আমরা প্রবেশ করতে পেলাম। বিরাট্ জেট প্লেন দাঁড়িয়ে, আমরা প্রথমে উঠতে পাই—তারপর যাত্রীরা উঠলেন, ভ'রে গেল ৮০টা সীট্।

ক্রমশঃ

—•—

বিপ্লবে বিদ্রোহে

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

২

১৯০৮ সালে নিথর নিষ্কম্প শান্ত সরোবরে চাঞ্চল্য তুলল যখন মজঃফরপুরের ঘটনা, সব ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গ ছড়াতে রইল। তাকে সংহত করার প্রয়োজন দেখা দিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে, জার্মানীর সাহায্য পাবার সম্ভাবনা যখন জানা গেল কয়েক বছর আগে বিদেশে প্রেরিত কর্মীদের কাছে। বাংলার বিপ্লবী দলগুলির সমন্বয়ে গঠিত হ'ল নতুন যুগান্তর দল যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে। ১৯১২ সালে বসন্ত বিশ্বাস যেদিন লর্ড হার্ডিং-এর উপর বোমা ফেলে জগৎকে স্তম্ভিত করলেন, ভারতময় বিপ্লব-চাঞ্চল্য জাগালেন, তারপর থেকে রাসবিহারীর বাংলায় আসা সহজ ছিল না—তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে যতীন মুখার্জি, নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) আর অতুল ঘোষ কাশীতে যান। রাসবিহারী তখন উত্তর ভারতের যে বর্ণনা দেন, তাতে বুঝা গেল, ইংরেজের দেশীয় সৈন্যদের ভিতর বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব। সুবর্ণ সুযোগ বুঝলেন এঁরা—সফলতার স্বপ্ন দেখলেন।

যুগান্তরের নেতাদের ভিতর এক যাদুগোপাল ভিন্ন আর সকলে কিন্তু এবিষয়ে ছিলেন একমত। যেমন যতীন মুখার্জি, তেমনি বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, যেমন উত্তর বঙ্গের যতীন রায়, তেমনি ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, ফরিদপুরের পূর্ণ দাস মনে করতেন, একবার দাঁড়িয়ে স্থানে স্থানে ইংরেজের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ দিতে পারলেই অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া গেল। এ-স্তরের মত, তাতেই বিপ্লবের সাফল্য। দেশ স্বাধীন তাতে হবে না। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য প্রথম যা প্রয়োজন, সেই বিরাটতর জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। যাদুগোপালের ধারণা ছিল, ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধের মাঝখানে যদি জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গেই বাংলায় উত্থান-চেষ্টা এবং উত্তর ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, সতের হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজ ভারতবর্ষে তার সাম্রাজ্য টিঁকিয়ে রাখতে পারবে না। এঁরা সবাই মিলে সোৎসাহে বিপ্লব-যজ্ঞের আয়োজন সুরু করলেন।

বিদ্রোহের চিন্তা যাঁরা করতেন, এই বিপ্লব-চেষ্টায় তাঁরা যোগ দিতে পারেন নাই। তাঁদের যুক্তি হ'ল, এ-চেষ্টা সফল হবে না, অনর্থক দলের শক্তির অপচয় ঘটবে। সে-শক্তি বজায় রাখতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। কাশীর শচীন সান্যাল কলকাতা অনুশীলনের সম্পর্কে আগে ছিলেন যুগান্তর দলে; ১৯১২ সালে কাশীতে দলের ভিতর কেউ কেউ একটু ধর্মপ্রবণতার আতিশয্য এনে ফেলার ফলে কলকাতায় এসে ঢাকা অনুশীলনের দু'একজন পলাতক কর্মীর সঙ্গে কিছু যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু কুমিল্লার নগেন দত্ত (গিরিজাবাবু), ফরিদপুরের নলিনী মুখার্জি ছিলেন ঢাকা সমিতির বিশিষ্ট কর্মী। এঁরা এবং আরও কেউ কেউ যখন শুনলেন, ঢাকা সমিতি বিপ্লব-চেষ্টায় যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা স'রে এসে বিপ্লব-চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজেদের দল থেকে পৃথক্ হয়ে এঁদের অনেকের পক্ষে বাংলায় কাজ করা সহজ ছিল না। যাদুগোপাল ও অতুল ঘোষের পরামর্শে তাঁরা উত্তর ভারতে রাসবিহারীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। শান্তিপদ মুখার্জি যুগান্তরের লোক হয়েও ঘটনাচক্রে ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িয়ে পড়েন। পরে তিনি বিদেশে চ'লে যান।

আর একটি পন্থা বাংলার মনস্বীদের চিন্তায় দেখা দিয়েছিল গত শতাব্দীর শেষ বা এই শতাব্দীর প্রথম থেকে। এঁরা জাতের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। বিদেশী শক্তি আছে কি নেই সে প্রশ্নকে উপেক্ষা ক'রে এঁরা চেয়েছিলেন জাতির আত্মিক শক্তির উদ্বোধন। এ পন্থা সে-যুগে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (বা passive resistance-এর) পন্থা ব'লে পরিচিত ছিল। আমরা আমাদের শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে জাতকে গড়ব, বিদেশী শিক্ষা শিল্প পণ্য সবকিছুকে বর্জন ক'রে বিদেশী শাসককে উপেক্ষা ক'রে চলব। বিদেশী শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষ একদিন না একদিন আসবে, সে সংঘর্ষে দুঃখ বরণের ভিতর দিয়ে আমাদের জয় অনিবার্য। এই পথের সাধক ও প্রচারক হিসাবে সুপরিচিত শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, ডন সোসাইটির সতীশ মুখার্জি। এঁদের ভিতর সতীশবাবুর

নাম সবচেয়ে স্বল্পপরিচিত হ'লেও তিনিই এই চিন্তা-ধারাকে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক দর্শনের রূপ দেন। এই চিন্তার ধারাই পরে ভারতের বাস্তব রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করল মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে।

এ-পন্থাও বিপ্লবেরই পন্থা। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে বিপ্লবের ধারা বেয়ে এলেন, সে বিপ্লবেরও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল মজঃফরপুরে আর বালেশ্বরে। ১৯০২ বা '৪ সালে অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা দেখা দিতে পারত না। বিশ্বযুদ্ধের কালেও যখন পাঞ্জাবে বাংলায় ঝাঁকে ঝাঁকে বিপ্লবীরা প্রাণ দিচ্ছেন, তখনও মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে গোখলে প্রতিষ্ঠিত সারভ্যান্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে যোগ দেবার কল্পনা করছেন। ইতিমধ্যে প্রাণের বলিতে দেশময় প্রাণচাঞ্চল্য ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠতে রইল। যুদ্ধের বিপদের দিনে ভারতীয় বিপ্লবীরা দেশ ময় বৈপ্লবিক উত্থানের ষড়যন্ত্র করেছে শত্রুজাতির সঙ্গে। ইংরেজও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে এমন আইনের খসড়া করল, যা দিয়ে যখন তখন জাতকে চরম আঘাত হানা যায়। গান্ধীজি একদিকে দেখলেন জাতির জীবনে নবজাগরণ, অপরদিকে এই রাওলাট আইনের অমানুষিক বর্বরতা। এরই প্রতিবাদে তিনি ভারতের বিপ্লবক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। প্রথম আঘাতের প্রত্যাঘাতেই ফুটল জালিয়ানওয়ালাবাগ। মৃত্যুবরণের ভিতর দিয়ে প্রাণ-চাঞ্চল্যের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে রইল।

জাতের জাগরণ কিন্তু তখনও এমন তিনি দেখেন নাই যাতে ইংরেজকে ভারতছাড়া করবার মত আন্দোলন সুরু করতে পারেন। ইংরেজের সাথে সহযোগিতা করব না, শুদ্ধমাত্র এই কর্মসূচী দিয়েই তিনি আন্দোলন সুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে জাগরণের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার কর্মসূচী যদি দেশ গ্রহণ করে, এক বছর না ঘুরতে স্বরাজ এনে দেব। সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থায় যাঁরা ধাপে ধাপে দেশকে এগিয়ে নিয়ে আসছিলেন তাঁরাও এ আন্দোলনের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেন নাই।

১৯১৬ থেকে ১৯২০ সালে কারান্তরালে ব'সে বিপ্লবীদের কাজ ছিল ভবিষ্যতের পথ খোঁজা। প্রথম জীবনে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব এঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এর রাজনৈতিক দিক্‌টা আজকের মানুষের পক্ষে কল্পনা করা তেমন শক্ত নয়, কিন্তু স্বামীজির সমাজ-বিপ্লবের আদর্শ এঁদের অনেককে সংস্কারমুক্ত করেছিল, একথা বললে আজকের পাঠকের ধারণায় কোন ছবি ফুটে উঠবে না। কারণ, জাতিভেদের নিগড়ে শৃঙ্খলিত সেদিনের শিক্ষিত সমাজেরও মন আজকের পাঠকের দৃষ্টিশক্তির বহুদূরে প'ড়ে গেছে।

এই গেল একদিক্। সমাজের অপর দিকে, ঠিক ঐ সময়টাতেই এল রুশ-বিপ্লব। জেলখানায় সর্বপ্রকার সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধ ছিল প্রথমটায়। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক্, এঁরা অনেকেই তা সংগ্রহ করতেন। তার পর প্রায়োপবেশনের কল্যাণে যে দু'একটা দরজা-জানলা খুল্‌ল তার ভিতর ছিল ষ্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরণের বিপ্লব-কল্পনা কারাবাসীর মনে দোলা দিল। কিন্তু ইংরেজ তাড়িয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনবার স্বপ্নই প্রবল। যাঁরা যুক্তি দিলেন, সমাজ-বিপ্লবে দেশের জনমন জাগবে, তাতে ইংরেজ তাড়ানোও ত্বরান্বিত হবে, অতীতে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে তাঁদের সে-যুক্তির সমর্থন মিলল না। বিপ্লব-কল্পন আর গণবিপ্লব কল্পনার এই দ্বন্দ্বের মাঝেই এসে পড়ল গান্ধী-বিপ্লবের প্রচারণা। সে-যুগের সমাজ-বিপ্লব কল্পনার যে-দু'টি দিকের উল্লেখ করেছি, তার সমাধান চেষ্টারও ঈষৎ আভাস দেখা গেল সেই প্রচারণার ভিতর। এই সশস্ত্র বিপ্লব-পন্থীদের তরফ থেকে গান্ধীজিকে প্রশ্ন করা হ'ল, এক বছরে স্বরাজ দেবেন বলছেন, আপনার কি লক্ষ্য কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ভারতের পার্লিয়ামেণ্ট ব'লে ঘোষণা করা?

বিপ্লবের এ ধরণের কর্মসূচী সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদের অজানা নয়। কিন্তু অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্ম-বান্ধব, সতীশচন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবচিন্তার ভাবুকরা যে-যুগে এ আদর্শ প্রচার করেছেন, সে-যুগে জ'তের কয়জন মানুষ ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবছিল? সে-যুগে গণ-তান্ত্রিক ভারতের নামে কোন পার্লিয়ামেণ্ট দাঁড়ান কল্পনার বাইরে। ঐ বিশ বছরে গঙ্গায় অনেক জল ব'য়ে গেছে। কবির ভাষায়, মৃত্যুর সম্বলে জাত সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। জাতির জীবনে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দিয়েছে। তবু সশস্ত্র বিপ্লবীদলের প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজি যখন বললেন, হাঁ, হুবহু এই আমার উদ্দেশ্য। প্রতিনিধি বললেন—তাতেই দেশ স্বাধীন হ'য়ে যাবে এ বিশ্বাস আমরা করি না, কিন্তু বিশ্বাস করি জাতির জাগরণ একটা বৈপ্লবিক পর্যায়ে উঠবে। ঠিক এই লক্ষ্যে আমরা পুরোপুরি আপনার সঙ্গে আছি। এই একবছর আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনে সর্বপ্রকারে বিরত থাকব।

গান্ধীজি বললেন, তোমরা যদি ধর্ম-হিসাবে অহিংসাকে নিতে পারতে, আমার উৎসাহ অনেক বাড়ত। কিন্তু রাজনৈতিক পদ্ধতি (policy) হিসাবে নিচ্ছ, এতেও আমি খুশী। বিপ্লবী দলের এই প্রতিনিধিকে শ্রীঅরবিন্দও কিন্তু এরপরই উপদেশ দেন, "I don't want you to make a fetish of non-violence। গান্ধী এসেছেন এক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। তিনি দেশকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু স্বাধীন করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমি করি নে। তোমরা নিজেদের ভাসিয়ে দিও না। ভবিষ্যতে আবার তোমাদের পথে আয়োজন করতে হবে।"

কিন্তু বিপ্লবের অর্থ যাদের অজানা, তাদের কাছে ভারতীয় বিপ্লবীর এখানেই জাতিপাত হ'ল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার দ্বন্দ্বে হিংসাও ধর্ম নয়, অহিংসাও ধর্ম নয়। জাতির জাগরণের পর্য্যায়বিশেষে এর কোনটাই অধর্মও নয়। মাপকাঠি সনাতন নীতি কিছু নয়, সফলতার সম্ভাবনা—সমগ্র জাতকে নিয়ে এগিয়ে যাবার শক্তি আহরণ। সংক্ষেপে পন্থাটির বিশ্লেষণ আবশ্যক। কোনও বিদেশী জাত যদি আমার দেশকে আক্রমণ করে, তাকে বাধা দিতে অস্ত্রের প্রয়োজন আমার ততটা, যতটা পর্যন্ত আমার জাতের মানুষ আমার বাধা দেবার কাজের সমর্থক নয়। ততখানিই আমার জাতের দুর্বলতা। আর সেই ফাঁকাটাকে ভরবার প্রয়োজনেই অস্ত্র।

জাতের প্রত্যেকটি মানুষ যদি সচেতন বিপ্লবী হয়, তা হ'লে অস্ত্র সংগ্রহের আমার কোন প্রয়োজনই নেই। গান্ধীজীর নিরস্ত্র সংগ্রামের মূলকথা এখানে। যেমন তাঁর 'স্বরাজে'র নির্ভর মানুষের এবং মানুষ জাতের পরিপূর্ণ আত্মসচেতনতার উপর, তেমনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর নির্ভর ছিল সমগ্র ভারতীয় জাতের জাগরণের উপর। সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীরা বিশ্বাস করতেন, সে সম্ভাবনা ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে তখনও এক সুদূরের আদর্শ। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। গান্ধীজিকে এ কথা বিপ্লবীদের তরফ থেকে স্পষ্টই জানিয়ে দেওয়া হয়।

অস্ত্রের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী সেই অনুপাতে, যে অনুপাতে জাতের সমর্থন বিপ্লবের পেছনে নেই। আর, কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ভারতের পার্লিয়ামেণ্ট ব'লে ঘোষণা করার মত আন্দোলনের বিশালতা গভীরতা আর উন্মাদনা যদি দেখা দেয়, অস্ত্রের প্রয়োজন প্রাপ্তি-সম্ভাবনার সীমার ভিতর এসে যায়। আর, সে সম্ভাবনার ক্ষেত্রও প্রসার লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-প্রয়োগশিক্ষারও ক্ষেত্র।

সুতরাং গান্ধীজিকে যে-কথা সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদের তরফ থেকে দেওয়া হ'ল তার ভিতর কোন কপটতা ছিল না, ছিল যুক্তি—বিপ্লব জাগাবার উপায়ের সন্ধানে মিলেছিল যে-যুক্তি। সমগ্র জাতের জীবনে তুলতে হবে প্রতিরোধের উত্তাল তরঙ্গ—সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড়িয়ে যা বিদেশী শাসককে বলবে, তোমায় মানি নে। যা একদিন সুশীল সেন একলা করেছিল, তা করতে প্রস্তুত হবে গোটা জাত। 'বন্দেমাতরম্' চীৎকার ক'রে বেত খেল এক জায়গায়, প্রত্যুত্তরে বোমা পড়ল আর এক জায়গায়। ঐ একটি ঢিলে যে ঢেউ জাগল, তা 'আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে' গানের সুরে ছড়িয়ে গেল সবখানে। বিদ্রোহ যাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের চিন্তাধারা ভিন্ন। এ ধরণের আন্দোলনের তাঁদের কাছে কোনও সার্থকতা নেই। অসহযোগের অহিংস বিশেষণের ভিতর বরং তাঁরা অনিষ্ট সম্ভাবনাই দেখলেন। সুতরাং ধরলেন বিপরীত পথ।

অতীত থেকে বর্তমান একটা আকস্মিক বিচ্ছেদ নয়, বর্তমান থেকেও নয় ভবিষ্যৎ। আদর্শের লক্ষ্যে সাধনা জাতের অতীত দিয়ে সীমিত। জাগরণের যে বিস্তৃতি, গভীরতা আর উন্মাদনায় কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ভারতের পার্লিয়ামেণ্ট ব'লে ঘোষণা করা চলত, তা দেখা দিল না। চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধীজি আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিলেন। পরে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু সত্যই কি ব্যর্থ হ'ল? মজঃফপুরও ব্যর্থ হয় নাই। তার প্রমাণ বালেশ্বর। বালেশ্বরও ব্যর্থ হয় নাই। তার প্রমাণ অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনও ব্যর্থ হয় নাই। তার প্রমাণ একদিকে আইন অমান্য আন্দোলন, অপর-দিকে চট্টগ্রাম, ডালহৌসি স্কোয়ার, রাইটার্স বিল্ডিং। এরাও ব্যর্থ হয় নাই। তার প্রমাণ ১৯৪২ সালে এদের সম্মিলিত আত্মপ্রকাশ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে আর সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রচেষ্টা। এরাও ত ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ ধ্যানে তার দুর্বলতা আবিষ্কার ক'রে ১৯৪৭ সালে ভারত ছাড়ে নাই।

গান্ধীজির প্রস্তাবের আগেই একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের তখনকার মত সীমা দেখা গেল, অপর দিকে বিপ্লবীদের গান্ধীজির কাছে দেওয়া এক বছরের মেয়াদও ফুরিয়ে গেল। বিদেশী শাসকের দৃষ্টি তখন সশস্ত্র বিপ্লব-

পন্থীদের থেকে খানিকটা কংগ্রেস আন্দোলনের দিকে স'রে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বিপ্লবায়োজনে যতীন মুখার্জির দক্ষিণ হস্ত ছিলেন অতুল ঘোষ। অসহযোগ আন্দোলনের শেষ দিকে তিনি বললেন, অস্ত্রসংগ্রহ ত করতেই হবে, এখনই তার সুযোগ, পুলিশ এদিকে আর তেমন সজাগ নয়। পথের এই পরিবর্তনের প্রয়োজনে সশস্ত্র বিপ্লবীদলের পার্টি মিটিং ডাকা হ'ল চট্টগ্রামে।

১৯২২ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স চলছে তখন সেখানে। পার্টি মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন রায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ডাঃ আশুতোষ দাস, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত, জীবনলাল চ্যাটার্জি, সূর্য সেন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছিলেন এ রা সবাই। এঁদের ভিতর যতীন্দ্রমোহন রায় এবং ডাঃ আশুতোষ দাস শেষ পর্যন্ত গান্ধীবাদী সংস্থার সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন। এঁরাও এবং আর সবাই একমত হলেন—অস্ত্র এখনও ব্যবহার করা হবে না কিন্তু সংগ্রহ করা হবে। ভিন্ন মত হ'ল কেবল মনোরঞ্জন গুপ্তের। অস্ত্র সংগ্রহে তাঁর সম্মতি আসে প্রায় এক বছর পরে। ইতিমধ্যে কিন্তু সংগ্রহ সুরু হয়ে যায়। চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালে যেপর্বের সুরু এবং ১৯৩৪ সালে দেবং-এ যার অবসান এখানেই তার গোড়া পত্তন। সে আন্দোলনে কিন্তু এক অংশে মনোরঞ্জন গুপ্ত নেতৃত্ব নিয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন যখন বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল, জেলে ব'সে দেশবন্ধু তার আখ্যা দিলেন Himalayan blunder। যে-বিপ্লব চাঞ্চল্য জেগেছিল, তা ঝিমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা যেন গান্ধীজির চোখ এড়িয়ে গেল। তাকে বাঁচিয়ে রাখবার পন্থা দেশবন্ধু আবিষ্কার করলেন সংগ্রামকে আইন পরিষদের মধ্যে টেনে নেওয়ার ভিতর। আবিষ্কার করেন নাই, এ-পন্থা তিনি গোড়া থেকেই ছাড়তে চান নাই। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষা বিপ্লবীদলে—বিপ্লবীদলের প্রতিষ্ঠান ভূমি যখন অরবিন্দের গীতার আদর্শে প্রাণরস আহরণ করতে থাকে সেই কালে। পরিস্থিতির বিশ্লেষণে এবং কর্মসূচীতে বিপ্লবীরা দেশবন্ধুর সাথে এক মত হলেন। স্বরাজ্যপার্টি গঠিত হ'ল। তার সংগঠনের ভার নিলেন বাংলায় বিপ্লবীরা।

কংগ্রেস এবং স্বরাজ্য পার্টির ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিপ্লবীরা বসছিলেন। বিদেশী শাসকের এতে স্বস্তি ছিল না। আবার বিনা বিচারে ধরপাকড় সুরু হ'ল। ইতিমধ্যে এল তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ। আবহাওয়া তখনও উত্তপ্তই ছিল। সেই অবকাশে বিপ্লবীরা তাঁদের সংগঠনকে জোরদার করতে সুরু করলেন। ত্যাড়া বেলতলায় আর যাবে না, তাই প্রবর্তন হ'ল প্রথম বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। দেশবন্ধু এটাকে নিলেন তাঁর স্বরাজ্যপার্টির প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে। জবাব দিলেন তিনি—নবগঠিত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ আসন দিলেন পরিচিত বিপ্লবী এবং মুক্ত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের।

কিন্তু আধারের চেয়ে তখন আধেয় বড় হয়ে উঠেছে। যে-বিপ্লব চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল অসহযোগ আন্দোলনে, তাকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নেবার যত বা শক্তি ছিল, নেতৃত্বের ধরপাকড়ে তাও সম্ভব হ'ল না। সে চাঞ্চল্য ফুটে উঠল নানা মুখে। এক ত বিদ্রোহীদল আগে থেকে যা ছিল, অসহযোগ আন্দোলনের সুযোগ সে তার নিজের হিসাবে নিল এবং স্বভাবতই একটা প্রতিবিপ্লবী পন্থায় সংস্থা গড়বার ও প্রচার চালাবার চেষ্টা পেল। নতুন শক্তিও কিছু দেখা দিল। বিশ্বযুদ্ধ ও তার আগে বিপ্লবীদের কর্মপন্থার বহিঃপ্রকাশ অনেকে দেখেছে, কিন্তু তাদের আদর্শের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ছিল না। অস্ত্রের ব্যবহারকেই তারা মনে করত বিপ্লব। তাদের দু'একটা ছোটখাট কার্যকলাপকে উপলক্ষ ক'রে হ'ল ১৯২৩-২৪ সালের ধরপাকড়। এই উদ্দেশ্যে এর ব্যবহারের একটা পূর্বপরিকল্পনাও বিদেশী সরকারের ছিল। আবার বিপ্লব-চিন্তা ও বিদ্রোহ-চিন্তার মিশ্রণও কিছু ঘটে। তার আত্মপ্রকাশ প্রধানতঃ হয় বিহারে দেওঘরে ও উত্তর প্রদেশে কাকোড়ি ষড়যন্ত্র মামলায়। কিন্তু বৃহত্তর জাগরণের স্পষ্টতর বহিঃপ্রকাশও দেখা দিল অন্ততঃ দু'টি দিকে।

এর প্রথমটি যুব-আন্দোলন। এ আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় ইউরোপের ছিল সেদিনে, এদেশের ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের পর ডাঃ ভূপেন দত্ত প্রভৃতি যে সব নির্বাসিত বিপ্লবী বিদেশ থেকে ফিরে এলেন, তাঁরা এই আন্দোলনের পথে এগোতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাসিত বিপ্লবীদের ভিতর এম. এন. রায়ের মত কেউ কেউ বোলশেভিক বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কে এসেছিলেন। তাঁরা বিদেশ থেকে প্রেরণা যোগাতে চেষ্টা করেন। প্রথমটা কৃষক-শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংগঠন গড়তে চান তাঁরা। রুশ বিপ্লবের পর এ-আন্দোলনে ভয় পাবার কারণ ছিল বিদেশী রাষ্ট্রের। কিছু লোকের ধরপাকড় হয়। তাঁদের নিয়ে প্রথমতঃ কানপুরে, পরে মীরাটে ষড়যন্ত্রের মামলা

হয়। এই আদর্শ-প্রচারের সুযোগ হয় মামলা চলবার সময় কোর্টে।

দু'টি আন্দোলনেই নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গে আগুন ধরায় যুক্তপ্রদেশে, পাঞ্জাবে। দিল্লীতে এ্যাসেমব্লির অধিবেশনের ভিতর বোমা ফেলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর। বাংলায় স্বদেশী যুগের উত্তেজনার মাথায় যে কাজ করে মজঃফরপুরের বোমায়, ও-অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলনের মাথায় প্রায় সেই কাজ করে দিল্লীর এ্যাসেম্‌ব্লির বোমায়। এঁদের নিয়ে আর এক ষড়যন্ত্রের মামলা। উত্তেজনাময় প্রচার। অনশন। প্রাণ দেন যতীন দাস। বিদেশী শাসকের চণ্ডনীতিতে যে উত্তেজনা বিস্তৃতিতে বাধা পেল, তা গভীরতার দিকে শক্তি সঞ্চয় করতে রইল।

এই চাঞ্চল্যের ভিতরই হ'ল কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৮ সনের অধিবেশন। আগামী দিনের প্রস্তুতি হিসাবে গ'ড়ে উঠল বিপ্লবীদেরই হাতে সামরিক কায়দায় ভলান্টিয়ার দল। অপরদিকে—ভারতবর্ষ কি চায় তার স্বরূপ জানবার কথা উঠেছিল ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে। সর্বদলের সম্মেলনের ফলে নেহরু রিপোর্ট। সেখানে দাবী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের বেশী দূরে গেল না। এই আদর্শের বিরোধী দল দানা বেঁধেছিল পূর্ব বৎসরে, গ'ড়ে উঠেছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। এর নেতারা কিন্তু গান্ধীজী আর পণ্ডিত মতিলালের অনুরোধে ১৯২৮ সালের অধিবেশনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন আদর্শের বিরোধিতা না করতে রাজী হন।

কিন্তু যে বাংলায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে কত যুবক আত্মদান ক'রে গেছেন, তারই বুকে ব'সে জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই আদর্শ মেনে যাবে, একটা প্রতিবাদও হবে না, বিপ্লবীরা এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র তাঁদের অনুরোধে এ আদর্শের বিরোধিতা করেন। সর্বদলীয় প্রস্তাবের গান্ধীজি মুখপাত্র। সুতরাং তা পাস হ'ল। কিন্তু বিরোধিতারও ফল ফললো। গান্ধীজি কথা দিলেন, এই আদর্শ এক বছরের জন্যই মাত্র। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর পেছনে জাতির প্রস্তুতি চাই। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী এই এক বছরে ডোমিনিয়ান স্টেটাস না দিলে আগামী বছরের কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা আদর্শ ঘোষণা করা হবে এবং তা আদায়ের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন করা হবে।

যে গভীরে পৌঁচেছিল বিপ্লবচাঞ্চল্য, সেখানে তাকে আবার বিস্তৃতি দেবার দায় এল বিপ্লবী দলের। তাঁদের মুখপত্র তখন সাপ্তাহিক "স্বাধীনতা"। সেই কাগজের মারফৎ জাতকে এবং তার নেতা গান্ধীজিকেও এখন স্পষ্ট ক'রে বলার দিন এল: "১৯৩০ সালের মধ্যেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে প্রজাতন্ত্র স্বাধীন ভারতের পার্লিয়ামেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। তারপর সম্ভব হইলে এই পার্লিয়ামেণ্ট হইতেই প্রকাশ্য ভাবে, অথবা প্রয়োজন হইলে গুপ্তভাবে দেশের শাসন ভার গ্রহণ করিতে হইবে।......কংগ্রেস যদি তাহার পক্ষে এই একমাত্র সহজ সত্য পন্থা অবলম্বন করে তাহা হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত এই একমাত্র সত্যিকার রাষ্ট্রশক্তিকে বাহিরের আক্রমণ বা অত্যাচারীর জুলুম হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার সেনানী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে সেই যুব-শক্তিকে যে যুবশক্তি এতকাল ধরিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সকল প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া তিলে তিলে শক্তি সঞ্চয়ের সাধনা করিয়া আসিতেছে, যে যুব শক্তি আজ এক যুগ ধরিয়া পূর্ব গগনের পানে অনিমেষ চোখে চাহিয়া একাকী দীর্ঘ-রজনীর পল গণিয়া গণিয়া কাটাইয়াছে।"

কিন্তু বিপ্লবীশক্তি নিজের অধীর আগ্রহে জাতের যে শক্তি কল্পনা ক'রে নিয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তা আসতে আরো অন্তত: এক যুগ বাকী। উপস্থিত, জাতের আর এক স্তর আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্যে আইন অমান্য আন্দোলনের বেশী কংগ্রেসের তরফ থেকে কল্পনা করা গেল না। সশস্ত্র বিপ্লব-পথের পথিকও তখন অস্ত্রবল সংগ্রহের সীমার ভিতর স্থির করল—যদি দেখা যায় ১৯২১ সালের মতো বিদেশী শাসক নিরস্ত্র জনতাকে লাঠিপেটা করে, সেই জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। প্রতি-শোধের অস্ত্র যতই দুর্বল হোক, আঘাতে সংঘাতে জাতির শক্তি মরিয়া হয়ে উঠবে। এই মরিয়া শক্তিই বিপ্লব-শক্তি। গোপন পথে এক বছরে যতটা সম্ভব আয়োজন হয়েছে এর। তারই ওপর জাতকে পথ চিনিয়ে গেল। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম থেকে শুরু ক'রে ১৯৩৪ সালে লেবং পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে সেদিন যা ঘটেছিল দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

—•—

দেবতাত্মা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

হে নিষ্কলঙ্ক আনন্দ!
ঝরণার সহস্রতারে ঝঙ্কার দিয়ে চলেছ
মুগ্ধ অতীতের অসংবৃত হয়েছে অবগুণ্ঠন বিহ্বল আবেশে,
আকাশের প্রান্তিক সূর্য বর্ষণ করেছে অভিনন্দন
নির্বাক্ বিস্ময়ে।
তখন কোথাও ছিল না কাগজ, মসীপাত্র,
লেখনী কিংবা লিপি।
নামহীন ফুলে ফুলে
নক্ষত্রের অক্ষরে
তার স্বরলিপি অক্ষয় করলেন
স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়, হে হিমালয়!

হে অতলান্তিক শান্তি!
ক্ষুধার্ত মহাপশুরা আকণ্ঠ পঙ্ক পান ক'রে
শুয়ে পড়ল মাটিতে
পাহাড়ে পাহাড়ে কঙ্কাল রেখে।
নীরন্ধ্র-অন্ধকার-লালিত-দুরন্ত বিভীষিকা
প্রবল প্রাণের মত্ততায় প্রাণের ধর্মকে
বিষাক্ত পুচ্ছে যখন আঘাত হানলো,
মৃত্যু দিলেন বিধাতা তাকে।
তোমার তপস্যা রইল অনাহত,
জটার বাঁধন খুলে বেরিয়ে এল
মুক্তির ধারা,
পতিত পাবনী পরমা করুণা
নবসৃষ্টির চিরন্তনী বাণী নিয়ে,
হ'ল শিব ও শক্তির শুভদৃষ্টি
ইতিহাসের গোধূলিতে।
সেই উৎসবের গৈরিক নিমন্ত্রণ সাগর পেরিয়ে
গেল উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে
উচ্ছ্বসিত শ্বেত পারাবতে।
সনাতন সেই রাজসূয় ভোজে
ব্রাত্যের সঙ্গে একই পংক্তিতে আসন নিলেন
সুর-সমাজ।
ধরণীর কবি বিকশিত করলেন
নব কুমারসম্ভবের শ্লোক,
"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।"

হে অতন্দ্র বিস্ময়!
তোমার শান্ত সমাহিত ধ্যান উগ্র করেছে
শতাব্দীর রাক্ষসের
অক্ষৌহিণী দম্ভের কুৎসিত উৎসাহ।
তোমার অম্লান সম্রাট্-হংস-সুষমা উন্মত্ত করেছে
তার লোলুপতা;
তোমার প্রজ্ঞার গৌরবে
বিভ্রান্তবুদ্ধি হুঙ্কার তুলেছে আক্রোশে,
হেনেছে হিংস্র থাবা,
নখরে রক্ত নিয়ে আস্ফালন করছে,
"আমি রাত্রির গোত্রজ, হৃৎপিণ্ড-পেষণ-পটু,
করোটি-কিরীট অসুর!
পল্লবিত পালক ছিন্ন ক'রে
বিদ্ধ ক'রে চক্ষুতে অঙ্গুলি,
লুণ্ঠন করব তোমার রত্নগুহা
বলে।"
হে পরম শিল্পী!
তোমার বীণাতারের মূর্ছনায় ধ্বনিত হল ধনুকের টঙ্কার,
তুমি উচ্চারণ করো সন্ন্যাসী ভৈরবমন্ত্র,
"সোহহং।
আমি পশুর সংহার করি পাশুপতে,
বজ্র নিক্ষেপ করি বিনষ্ট বিবেককে,
নাশ করি অশুচি।
আমার অপৌরুষেয় তুষার তাণ্ডবের তালে তালে
ছন্দিত হবে চিতায়,
দগ্ধ হবে বিকৃত গলিত বেতালের
কবন্ধ দৌরাত্ম্য।"

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা পৌর-সংস্থার বাজেট

কিছুদিন আগে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ চলতি বৎসরের আয়-ব্যয়ের বাজেট উপস্থিত করেছেন; আয় ৯·৬৬ কোটি টাকা, ব্যয় ৯·৯৮ কোটি টাকা।

পূর্ববর্তী কয় বৎসরের তুলনায় এই অঙ্ক অনেক বেশী, কিন্তু এ যুগের অন্যতম বৃহৎ নগরীর ন্যূনতম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ও প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার জন্য এই টাকা যথেষ্ট কি না তাই নিয়ে অনেকে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এক দলের মতে প্রয়োজনের তুলনায় এবং ভারতবর্ষেরই অন্য কোন কোন শহরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে কলকাতা কর্পোরেশনের আয় কম। উপরন্তু শহরবাসীরা অনেকেই কর্পোরেশন-কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স সময়মত জমা দেবার বিষয়ে চরম উদাসীন; অনেক টাকা অনাদায়ীও থেকে যায়। যুদ্ধ-পূর্বকালের তুলনায় জনপিছু আয় কমেছে, ব্যয়ের ভার বেড়েছে; অতএব এক দলের অভিমত হচ্ছে, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদে, বর্তমানে যতটুকু করা হচ্ছে তার বেশী কিছু উন্নতি আশা করা চলে না।

আরেক দল বলেন, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি যথেষ্ট উদ্যোগী হতেন, তা হ'লে মোট যত টাকা কর্পোরেশন তহবিলে আসে, সেই টাকা বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যয় ক'রে আরও ভাল ফল পাওয়া যেত।

আরেক দলের বক্তব্য হচ্ছে, বহু সমস্যা-জর্জরিত কলকাতাবাসীর পক্ষে এই শহরের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়; এর জন্য সরকারের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে কলকাতার পুঞ্জীভূত সমস্যা দূর করার জন্য টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ত্রিশ কোটি টাকারও বেশী খরচ করেছেন, কর্পোরেশনও এই সময়ের মধ্যে বাৎসরিক চলতি খরচ বাদেও তের কোটি টাকা খরচ করেছেন; তা সত্ত্বেও সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল আকার ধারণ করছে। অতএব পূর্ব-ভারতের স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির ব্যয়ভার শুধুমাত্র এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপর থাকা সম্ভব নয়। মহানগরী পুনর্গঠন সংস্থা (C. M. P. O.) এই সমস্যাটি গোড়া ঘেঁষে সমাধানের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন; ইতিমধ্যে তালুকদার কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তার থেকেও সমস্যার পরিমাণ অনুমান করা যায়।

জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পৌরশাসন ব্যবস্থা পরিচালন বহুকাল থেকেই চ'লে আসছে, এ সম্বন্ধে কলকাতায় আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তারই যেন প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় কলকাতা পৌর-সংস্থার সম্বন্ধে একশ' বছর পূর্বেকার সরকারী রিপোর্টগুলিতে; দেশের অন্যান্য শহরেও একই সমস্যা কিছু কম বা কিছু বেশী মাত্র। গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে শতাব্দীকাল পূর্বের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা জটিলতর ক'রে তুলছেন; দলীয় স্বার্থের কাছে সর্বসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা ন্যায্য পাওনা আজ নিতান্তই তুচ্ছ। (দেশের কাজের নামে আমরা যতটুকু প্রত্যক্ষ কাজের নমুনা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে নির্বিচারে রাস্তার নাম পরিবর্তন!) জনসাধারণের মধ্যেও যাঁরা অতিরিক্ত হিসাবী তাঁরা তাঁদের দেয় ট্যাক্স কি ভাবে কম দিয়ে বা একেবারে না দিয়ে অব্যাহতি পাওয়া যায় সেই চেষ্টায় আছেন। করদাতাদের এক দল মনে করেন, তাঁরা দরিদ্রতর প্রতিবেশীদের জন্য যে ব্যয় হয় তা অতিরিক্ত হারে বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন, আরেক দল মনে করেন, কর্পোরেশনের কাছ থেকে যতটা উপকার পাওয়া দরকার ততটা তাঁরা পাচ্ছেন না। এই "দুষ্টচক্র" উত্তরোত্তর সমস্যা জটিলতর ক'রে তুলছে, অপর দিকে 'পুনর্গঠন' খাতে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আদায় করা টাকা বা বিদেশ থেকে কর্জ করা টাকা প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করার কথা চলছে।

কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য থেকে যত টাকা আয় হচ্ছে তার এক মোটা অংশ চ'লে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তহবিলে 'আয়কর' বাবদ; যে সব ধনী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি কলকাতায় ব'সে তাঁদের কারবার

সাফল্যের সঙ্গে চালাচ্ছেন তাঁদের লাভের আরও কিছু বেশী অংশ শহরের উন্নতির জন্ম আদায় করা সম্ভব বা উচিত কি না তাই নিয়ে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। বোম্বাইয়ের সমৃদ্ধির সঙ্গে কলকাতার সমৃদ্ধি তুলনীয় নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু দু'টি শহরের মাথাপিছু ট্যাক্স-এর যে হিসাব সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় তার থেকে অনুমান হ'তে পারে যে, কলকাতা কর্পোরেশনের আয় তুলনামূলক ভাবে কিছু বেশী পরিমাণেই যেন অল্প। বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজের মাথাপিছু ট্যাক্স (per capita Municipal tax)-এর হিসাব উল্লেখ করছি।

	কলিকাতা		মাদ্রাজ		বোম্বাই	
	টাঃ	নঃ পঃ	টাঃ	নঃ পঃ	টাঃ	নঃ পঃ
১৯৩৯-৪০	১৮	৬৬	৮	৩১	২৪	৭২
১৯৪০-৪১	১০	০৬	৭	২২	১৯	৮২
১৯৫০-৫১	১১	৪৬	১০	৭৬	২৪	৮২
১৯৫৫-৫৬	১৬	৫২	১৩	১৭	৩৫	৯৪
১৯৫৮-৫৯	১৭	৩৭	১৩	৮৪	৩৮	৮৮
১৯৫৯-৬০	১৭	১৭	১৩	০৪	৪৪	৯৭
১৯৬০-৬১	১৬	৫০	১৬	০০	৪৪	০০

মাদ্রাজ ও বোম্বাইএ-র পৌর প্রতিষ্ঠানের কুড়ি বছরের হিসাবের সঙ্গে কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের আয় বিশেষ ভাবে তুলনীয়।

বিভিন্ন শহরে কি পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ে খাটছে আর তার কত অংশ শহরবাসীর আয় বা লাভ হিসাবে শহরেই থাকছে, এই জটিল হিসাবের মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রবেশ করতে পারব না। নিতান্ত আংশিক হ'লেও বিভিন্ন শহরে কি পরিমাণ চেক্ 'ক্লিয়ারিং হাউস' মারফৎ লেনদেন হচ্ছে, তার হিসাব থেকে আমরা উভয় কেন্দ্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের মোট পরিমাণের একটা আন্দাজ পাই।

১৯৫১-৫২

	'চেক'-এর সংখ্যা (হাজার)	'চেক'-এর মোট টাকার অঙ্ক (লক্ষ)
কলকাতা	৬৯৬০	৩২৫৪৫০
বোম্বাই	১০৫৭০	৩০৩৯০৭

১৯৬১-৬২

	'চেক'-এর সংখ্যা (হাজার)	'চেক'-এর মোট টাকার অঙ্ক (লক্ষ)
কলকাতা	১০৫৫১	৪২৪৯৪২
বোম্বাই	২০৬১১	৪৯৫০৫৬

দশ বছরে উভয় কেন্দ্রেই চেক্-এর সংখ্যা এবং মোট টাকার পরিমাণ প্রভৃত বেড়েছে দেখা যাচ্ছে; বোম্বাই-এর তুলনায় কলকাতায় টাকার অঙ্ক ১৯৫১-৫২-তে বেশীই ছিল, ১৯৬১-৬২-তেও পার্থক্য খুব উল্লেখযোগ্য নয়। দশ বছরে কলকাতা কর্পোরেশনের মাথাপিছু ট্যাক্স (Per capita Municipal Tax) ১৩ টাকা ২২ নয়া পয়সা থেকে বেড়ে ১৬ টাকা ৫০ নয়া পয়সা দাঁড়িয়েছে, আর বোম্বাই-এ ২৬টাকা ৩৮ নঃ পঃ থেকে ৪৪ টাকা!

কলকাতা কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস থেকে আমরা আরেকটি দিক দেখতে পাই—

	১৯১১	১৯২১	১৯৫১	১৯৬১
এলাকা (একর)	১১৯৫৪	১১৯৫৪	২৩৬২৯	২৩৬২৯
জনসংখ্যা (০০০)	৮৬১	৮৮৫	২৫৪৮	২৯২৬
চল্‌তি খাতে আয় (০০০)	৯৭৫৩	১৫৯৩৬	৫৫৩৯৫	৮৩৬৭৭
ব্যয় (০০০)	৯৭১৯	১৭২৫৭	৫২২২৩	৮৬৯৫১
একর-প্রতি ব্যয় (টাকা)	৮১৬১	৪৪৭	২২১০	৩৬৭৯
জনপিছু ব্যয় (টাকা)	১১·৩	১৯·৫	২০·৫	৩৩

টাকার অঙ্কে পঞ্চাশ বছরে যেমন জনপিছু ব্যয় প্রায় তিন গুণ বেড়েছে, টাকার মূল্য হ্রাস হয়েছে তার বহুগুণ বেশী। একদিকে শহরে দুঃস্থ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, অপর দিকে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি, এরই মাঝখানে প্রৌরপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যাচ্ছে বেড়ে, আয় সেই হারে বাড়ছে না। এরই সঙ্গে অবশ্য মিলিত হয়েছে অন্যান্য বহু রকম প্রশাসনিক দুর্বলতা, যার অবসান ঘটাতে গেলে জনসাধারণের পক্ষ থেকে পাঁচ বৎসরান্তে ভোটকালীন উত্তেজনা (যাকে আমরা নাগরিক কর্তব্যের একমাত্র নিদর্শন ব'লে মনে করতে শিখেছি) ছাড়াও আরও কিছু দায়িত্ব নিতে হয়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আমরা নাগরিকের কর্তব্য পালন করছি কি না সে প্রশ্ন আমাদের সকলকেই ভেবে দেখতে হয়। অনাদায়ী ট্যাক্সের অঙ্ক বেড়ে চলেছে, অপর দিকে আমাদের এই দরিদ্র দেশে যে অপচয়ের অভ্যাস আমরা অর্জন করেছি তাও ছাড়তে পারছি না; উদাহরণ-স্বরূপ, অতিরিক্ত জল সরবরাহের চাহিদার সঙ্গে পরিস্রুত জল অপচয়ের সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা সামঞ্জস্যবিহীন ব'লে আমাদের মনে হয় না। জল সরবরাহ বাবদই কর্পোরেশনকে ১৯৫৪-৫৫ সালে সেখানে ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল, ১৯৬২-৬৩তে সেস্থলে ১১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য করতে হয়েছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের গত কয়েক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের হার বেড়ে চলেছে।

	১৯৫৪-৫৫	১৯৬২-৬৩ বাজেট	শতকরা বৃদ্ধি
সরকারী সাহায্য ব্যতীত অন্য আয় (লক্ষ টাকা)	৫৪৮·১৫	৮৩৪·৪৫	৫২.২
সরকারী সাহায্য („)	৬৩·৭৯	১২১·১৭	—
মোট আয় („)	৬১১·৯৪	৯৫৫'৬২	৫৬·১
মোট ব্যয় („)	৬১৪·১১	৯৯৩·৮৫	৬১·৮

আয়ের তুলনায় ব্যয়ের হার বাড়ছে, আর ট্যাক্স যদি বা অনাদায়ী হয়েও থাকে, বাজেটে নির্ধারিত ব্যয় সেই হারে হ্রাস পাবার সম্ভাবনা কম।

১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৬২-৬৩-র খরচের বাজেটে দেখা যাচ্ছে, কর্মচারীদের বেতন-বাবদ ১·৬৫ কোটি টাকার স্থলে ২·০৯ কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে; ঋণের সুদ-বাবদ দিতে হচ্ছে ৪৪ লক্ষ টাকার স্থলে ৬৪ লক্ষ টাকা; ঋণ পরিশোধের বাবদ দিতে হচ্ছে ৭·৯৩ লক্ষ টাকার স্থলে ১৩·১৭ লক্ষ টাকা; কোন খাতেই ব্যয় সঙ্কোচের কোন সম্ভাবনা না থাকারই কথা।

আয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি হচ্ছে স্থাবর সম্পত্তির ওপর ট্যাক্স (Consolidated Rate); ১৯৫৪-৫৫-তে মোট আদায় হয়েছিল ৪০১·৪৯ লক্ষ টাকা। ১৯৬২-৬৩-র বাজেটে ধরা আছে ৫৮৫·৫০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৪৫% শতাংশ বৃদ্ধি; এর থেকে কিছু অনাদায়ী থাকলে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের হার আরও নেমে আসে। সম্প্রতি যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৮-৫৯-এর শেষে এই ট্যাক্স-বাবদ যা পাওনা ছিল তার মাত্র ৫৬·৬৭% শতাংশ আদায় হয়েছিল।

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন ও পোর্ট-ট্রাস্টের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশ করেছেন (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, নভেম্বর ১৯৬২) তাতেও দেখা যাচ্ছে যে, মোটামুটিভাবে সব স্থানেই ব্যয়ের তুলনায় আয়ের হার কমছে।

কলকাতার সমস্যা অন্যান্য অনেক বড় শহরের থেকেই ভিন্নরকম; সব সমস্যাগুলির আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে পৌর-শাসনের অব্যবস্থার মূলে একদিকে যেমন রয়েছে পৌরসভার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও শৈথিল্য, আরেক দিকে রয়েছে আয়-ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্য।

যত টাকা তহবিলে আসছে তার সমস্তটিই বিচক্ষণ ভাবে ব্যয়িত হ'লে ফলাফল অন্যরকম হ'ত অবশ্যই; কিন্তু তার জন্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিসর্জন দেওয়া কি অনিবার্য? ১৮৪০ সাল থেকে যতদিকে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন হয়েছে, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব এবং মিউনিসিপ্যালিটির কার্যভার সম্পাদন—এই দুই প্রশ্ন নিয়ে সমস্যার উদয় হয়েছে; আজ যা ঘটছে তা অতীতের পুনরাবৃত্তি।

আমরা ভোটের মাধ্যমে আমাদের নাগরিক কর্তব্য সমাপ্ত করি; অতীত যুগের 'নগর-রাষ্ট্র'র দিন যখন চ'লে গেছে তখন এর বেশী আর কিছু করা সম্ভবও নয়। একদল প্রতিনিধি যদি অকৃতকার্য হন, তা হ'লে পরের বার আমরা অন্য প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু অবস্থা যখন আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাবার উপক্রম হয়েছে তখন শহরের সম্মিলিত স্বার্থের খাতিরে করদাতা-দের আরও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সে কথা বোধহয় ভাববার সময় এসেছে। একথা ঠিক যে, আমরা যারা শহরে বাস করছি, সকলেই নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে বিব্রত; শহরের সামগ্রিক জীবন সম্বন্ধে একজোট হয়ে ভাববার ও কাজ করবার অবকাশ আমাদের নেই। কিন্তু আমরা যখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দেশের ও বিদেশের বৃহত্তর সমস্যাদি নিয়ে চিন্তা করি, তখন আজকের সঙ্ঘচেতনার যুগে শহরের সমস্যা নিয়ে ভাবতেই পারব না কেন? গত শতাব্দীর এক রিপোর্টে আমরা উল্লেখ পাচ্ছি—

> "There has been occasion for question whether a body of well-to-do householders have not preferred to reduce the direct house taxation when taxation affecting a poorer class had perhaps greater claims to consideration."

আজকেও হয়ত এই পরিস্থিতির বদল হয় নি। কিন্তু আজকাল সভাসমিতি মারফৎ আমরা যত সহজে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারি, এক শতাব্দী পূর্বে সে অবস্থা ছিল না। এযাবৎ যদিও নামে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চ'লে এসেছে, কার্যতঃ আমরা শহরবাসীরা পৌরশাসন ব্যবস্থায় যথেষ্ট আগ্রহশীল হ'তে পারি নি। আজ কলকাতার সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে; এর অনেকখানি অংশ শহরবাসীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হ'লেও, বহুলাংশে অতীতের বাসিন্দাদের পরমুখাপেক্ষিতা বা উদাসীনতার দরুণ জমে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। জোট বেঁধে শহরের শাসনব্যবস্থা পরিচালন করা যায় না—একথা সত্য, কিন্তু জোট বেঁধে আমাদের প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ

বা পরিচালন করা অসম্ভব নয়। আজ কলকাতা পুনর্গঠনের পরিকল্পনা যখন পুর্ণোদ্যমে চলেছে এবং মোটা টাকা ঋণ নিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করার কথা হচ্ছে, তখন আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশন আরও কতটুকু কাজ করতে পারে, নাগরিকরাই বা আরও কি ভাবে নাগরিক কর্ত্তব্য পালন করতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করার অবকাশ আছে।

—০—

॥ নীল্‌স্ বোর প্রসঙ্গে ॥

সম্পাদক, প্রবাসী, সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমতী মনীষা দত্তরায় ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার 'নীল্‌স্ বোর' প্রবন্ধটির সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা অনুধাবন করলাম। মাইৎনার-অটো ফ্রিশ-এর ব্যক্তিগত সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তাই যথার্থ, আমার রচনায় অসাবধানতা-বশত তা উল্টো ভাবে এসেছিল। ফ্রিশ মাইৎনারের পিতৃব্য নন, বরং শ্রীমতী মাইৎনারের NEPHEW হচ্ছেন ফ্রিশ। যেহেতু NEPHEW কথাটার মানে একাধিক, সঠিক সম্পর্কটি জানার কৌতূহল রইল। কোন পাঠক যদি এ বিষয়ে আলোকপাত করেন, বাধিত হব।

ধন্যবাদ সহকারে। ইতি—

অশোককুমার দত্ত।

৩০শে মার্চ্চ, ১৯৬৩

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

১৪

কর্ত্তামশাই পায়ের ওপর পা তুলে ব'সেই রইলেন। দুলাল সা এসে সবিনয়ে সামনে দাঁড়াল। নিতাই বসাক পেছনে ছিল। সেও দুলালের পাশে এসে দাঁড়াল। নতুন-বৌ তাড়াতাড়ি এসে মাথায় ভাল ক'রে ঘোমটা দিয়ে কর্ত্তামশাই-এর পায়ের ধুলো নিলে।

—আমি আসতে পারি নি জ্যাঠামশাই, শুনলাম হরতন এসেছে, কোথায় সে?

কর্ত্তামশাই বললেন—ওপরে আছে, যাও দেখে এস গে—

দুলাল সা সামনের চেয়ারটাতে বসল। নিতাই বসাকও তক্তপোশটার ওপরে ব'সে পড়ল।

দুলাল সা'ই প্রথম কথা বললে—কেমন আছে এখন হরতন?

—ভাল!

কথাটা ব'লে কর্ত্তামশাই একটু চুপ ক'রে রইলেন। সামনেই ইলেকট্রিকের মিস্ত্রীরা দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দিকে চেয়ে বললেন—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? যাও, আমার ম্যানেজারের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে সব দেখে-শুনে এস—

তার পর দুলাল সা'র দিকে ফিরে বললেন—তারপর? কি খবর তোমাদের?

দুলাল সা মাথা নিচু ক'রে সবিনয়ে বললে—আপনি আসা পর্য্যন্ত একবারও আসতে পারি নি, আমাদেরও খুব বিপদ্ চলছে কি না—

—বিপদ্? তোমার আবার কি বিপদ্?

—আজ্ঞে কর্ত্তামশাই, সেই সদানন্দ, তাঁকে চিনতেন নিশ্চয়ই, সেই সদানন্দ হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে! এতদিন ধ'রে তাকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলাম, শেষকালে আমাকে ফাঁসালে—

কর্ত্তামশাই অনেক দিন ধ'রে ভেবে রেখেছিলেন দুলাল সা এলে কি কি কথা শোনাবেন। কি কথা কেমন ভাবে বলবেন। এতদিনের সব অপমানের প্রতিশোধের কথাও ভেবে রেখেছিলেন। কিন্তু দুলাল সা'ও বোধ হয় তৈরি হয়ে এসেছিল। দুলাল সা'ও জানত, কি কি কথা তাকে শুনতে হবে, কি কি কথা কর্ত্তামশাই তাকে বলবেন।

—অথচ দেখুন কর্ত্তামশাই আপনার দয়াতেই আমি এই কেষ্টগঞ্জে একটা মাথা গোঁজবার কুঁড়ে করতে পেরেছি। আপনি সেই জমি দিয়েছিলেন, তাতেই আমি আবার দাঁড়াতে পেরেছি কোনও রকমে। নইলে কি আমার মত লোক দাঁড়াতে পারে?

কর্ত্তামশাই ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন দুলাল সা'র মুখের দিকে।

—তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করতে এলে দুলাল?

দুলাল সা জিভ কাটলে দাঁত দিয়ে, বললে—আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করলে আমার মুখ যেন খ'সে যায় কর্ত্তামশাই, আমি যেন পরকালে রৌরব নরকে পচি। আমি হরিকে সাক্ষী রেখে বলছি কর্ত্তামশাই, আমি আজ আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেই এসেছি। এই নিতাইকে বলছিলাম আমি এতক্ষণ, টাকা-পয়সা সবকিছু হাতের ময়লা, আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক টাকা আমার হাত দিয়ে এল-গেল, কিন্তু তাতে মনের শান্তি পাই নি কর্ত্তামশাই। আমার স্ত্রী মারা গেছে আজ কতকাল, একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়েছি, সকালবেলা উঠে রোজ নদীর ঘাটে গিয়ে নিজের হাতে ঝাঁটা নিয়ে পৈঁঠে ধুই—কিছুতেই শান্তি পাই না। আপনি পুণ্যাত্মা মানুষ, আপনি গতজন্মে অনেক পুণ্য করেছিলেন, তাই আবার আপনার নাতনীকে ফিরে পেলেন, কিন্তু আমি কি পেয়েছি?

—তুমি বলছ কি? তুমি কিছুই পাও নি? তুমি কি ছিলে আর কি হয়েছ বল দিকি নি? আমিই বা কি ছিলাম আর কি হয়েছি তাও তোমার অজানা নেই!

দুলাল সা হঠাৎ নিচু হয়ে কর্ত্তামশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাল, তার পর হাতের আঙুলটা ভক্তি-ভরে জিভে ঠেকিয়ে আবার ভাল ক'রে বসল।

বললে—আপনি ব্রাহ্মণ, কলিযুগ হ'লেও কেউটে সাপ কেউটে সাপই থাকে। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, আমি ঠিক করেছি, আমি সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করব মনস্থ করেছি—

—সে কি?

দুলাল সা বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তামশাই। আমি ভেবে দেখলাম, সংসারে থাকলে আমার মন ভগবানের দিকে ঠিকমত দিতে পারব না—আমি সংসার ত্যাগ করব ঠিক করেছি—

—তোমার ছেলে? তোমার পুত্রবধূ? তারা? তারা কোথায় যাবে?

—তাদের কথা তারা ভাববে কর্ত্তামশাই, আমি কে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমি সংসারের জন্যে অনেক করেছি, কিন্তু সংসার ত আমার পরকাল দেখবে না। আমার পরকালের কথা ত আমাকেই ভাবতে হবে—আমার হয়ে ত আর অন্য কেউ ভাববে না!

কর্ত্তামশাই এতদিন ধ'রে দুলাল সা'কে দেখে আসছেন, তবু যেন কেমন সমস্যায় পড়লেন। এই এত জাঁক-জমক, এই এত বাড়ী-গাড়ী, এই এত ধান, চাল, পাট, তিসির আড়ৎ, এই সুগার-মিল সব ছেড়ে চ'লে যাবে দুলাল সা! দুলাল সা'র চেহারার দিকে চেয়ে দেখলেন কর্ত্তামশাই! সেই খালি-গা, সেই খালি-পা, সেই হাতে হরিনামের ঝোলা, কপালে তিলকের ফোঁটা, সব কি তা হলে সত্যি? এতদিন দুলাল সা সম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা ক'রে এসেছিলেন, সব তা হলে ভুল? সব মিথ্যে? সেই পৈঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে এত মারামারি-কাটাকাটি সবই স্বপ্ন নাকি? আসলে দুলাল সা সত্যি-সত্যিই ভাল, সৎ মানুষ!

—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন কর্ত্তামশাই, আপনার আশীর্ব্বাদ ফলবে, আশীর্ব্বাদ করুন যেন অন্তে শ্রীহরির চরণ-দর্শন পাই—

নিতাই বসাক এতক্ষণ চুপ ক'রেই ব'সে ছিল।

বললে—আপনি একটু বলুন কর্ত্তামশাই, আপনি বললেই দুলাল আবার সংসার করবে—ওর মন ফিরবে—

দুলাল সা বললে—না কর্ত্তামশাই, আমায় আর আপনি সংসার করতে বলবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন হাসিমুখে সংসার ত্যাগ করতে পারি। আমার এই চালের-ধানের-পাটের-তিসির আড়ৎ, আমার সুগার-মিল, কোনও দিকেই আমার আর কোনও টান নেই।

কর্ত্তামশাই বললেন—তা হঠাৎ তোমার এমন বেয়াড়া ইচ্ছেই বা হ'ল কেন দুলাল?

—আজ্ঞে, হঠাৎ ত নয়, ক'দিন থেকেই গুরু আমাকে ডাকছেন, বলছেন, দুলাল, আমার কাছে চ'লে আয়, এখানে এলে শান্তি পাবি—

—তা তুমি শান্তি পাচ্ছই না বা কেন?

দুলাল সা বললে টাকা ছুঁলেই আমার হাত জ্বলে যায় কর্ত্তামশাই—আমি যে কি করি—

—তা হলে ত তোমার ডাক্তার দেখান উচিত, টাকায় বিরাগ এসেছে, এটা ত ভাল কথা নয়, তোমার সম্পত্তি টম্পত্তি সব ত নষ্ট হয়ে যাবে।

দুলাল সা এক রকম অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল।

বললে—সম্পত্তি ত বিষ কর্ত্তামশাই, সংসার যেমন বিষ মনে হচ্ছে, সম্পত্তিও তেমনি বিষ মনে হচ্ছে আমার কাছে।

কর্ত্তামশাই নিতাই বসাকের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন নিতাই? টাকাকে বিষ মনে হলে ত ভয়ের কথা হে—কোন্‌দিন সত্যি-সত্যিই শেষকালে সন্নিসী হয়ে বেরিয়ে যাবে, তখন মুশ্‌কিল হবে তোমাদের।

নিতাই বসাক বললে—আজ্ঞে, ডাক্তারকে দেখিয়েছি।

—কি বলছে ডাক্তার?

—বলছে এ কিছু নয়, এ দু'দিনের মধ্যে সেরে যাবে, বলছে আসলে এটা রোগ নয়, বাতিক।

—কোন্ ডাক্তার? কোথাকার ডাক্তার?

—আজ্ঞে এখানকার রমেন ডাক্তার নয়, খোদ কলকাতার ডাক্তার, কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলাম যে দুলালকে। সেই জন্যেই ত আপনার সঙ্গে এ ক'দিন দেখা করতে পারি নি। আপনার নাতনীকে কেষ্টগঞ্জে নিয়ে এসেছেন, তাও শুনেছি, তবু দেখা করতে পারি নি—বড় ভাবনায় পড়েছি আমরা সবাই—

এতদিন ধ'রে সেই কথাই ভাবছিলেন কর্ত্তামশাই। এত লোক দেখতে আসছে হরতনকে, অথচ দুলাল সা ত একবারও এল না। নিতাই বসাকও এল না। ওদের নতুন-বৌও এল না। অথচ তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন বড়গিন্নীকে এসে রোজই একবার ক'রে দেখে গিয়েছে নতুন-বৌ। সমস্ত শুনেছেন তিনি নিবারণের কাছে। এতদিন কাউকে বলেন নি বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবতেন খুব। আজকে এখন কারণটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মনে-মনে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন কর্ত্তামশাই, একেই বলে ভাগ্যচক্র। দুলাল সা'র ভাগ্য এখন থেকে পড়তে সুরু করল আর তাঁর ভাগ্য এবার থেকে উঠবে। দুলাল সা'র পাটের আড়ৎ যাবে, সুগার-মিল যাবে। আর এদিকে তাঁর বাড়ী আবার নতুন হবে, ধনে-জনে সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কেষ্টগঞ্জের লোক এখন যেমন

দুলাল সা'র বাড়ীতে যায়, তেমনি তখন আসবে তাঁর বাড়ীতে।

বললেন—তা মহাজনী কারবার? সেটা এখনও করছ তুমি?

দুলাল সা বললে—আগেকার খাতক যারা আছে তাদের সঙ্গে কারবার চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু নতুন খাতক আর নিচ্ছি নে—মন বারণ করছে।

—খাওয়া-দাওয়া? মাছ-মাংস খাচ্ছ?

—মাছ-মাংস ত আগেই ছেড়ে দিয়েছি সেই দীক্ষা নেবার সময়। আর ছুঁইনে ও-সব।

কর্ত্তামশাই নিতাই বসাকের দিকে আবার চাইলেন।

বললেন—তা হলে ত সর্ব্বনাশ, কি করবে ঠিক করেছ?

নিতাই বসাক বললে—সেই পরামর্শ করতেই ত আপনার কাছে দুলালকে নিয়ে এসেছি কর্ত্তামশাই, আপনি কিছু ওকে পরামর্শ-টর্শ দিন।

কর্ত্তামশাই বললেন—আমি এসব ব্যাপারে কি পরামর্শ দেব বল দিকি নি? আমি কি ও-সব বুঝি? আর আমার অত সময়ই বা কোথায়? এই দেখ না এখন হরতন এসেছে, এই বাড়ী নতুন ক'রে সারিয়েছি, হাজার হাজার টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। আবার কলকাতা থেকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী আনিয়েছি, এদেরও কত হাজার টাকা দিতে হবে তার ঠিক নেই—

নিতাই বসাক বললে—তা টাকার যদি দরকার থাকে ত বলুন না, দুলালের ত টাকা রয়েছে।

দুলাল সাও বললে—আজ্ঞে টাকা ত এখন আমার কাছে খোলামকুচি, টাকাও যা মাটিও তাই আমার কাছে, অন্য লোকে লুটেপুটে খাবে, তার চেয়ে আপনার দরকার, আপনিই না হয় নিলেন—

কর্ত্তামশাই একবার নিতাই বসাক আর একবার দুলাল সা'র দিকে চাইলেন। বললেন—টাকা ত নিতে পারি, কিন্তু শোধ করতে ত হবে আমাকেই, তখন কোত্থেকে শোধ করব?

দুলাল সা আর থাকতে পারলে না। কানে হাত দিলে। বললে—এসব কথা শোনাও পাপ কর্ত্তামশাই। আমি অনেক অপরাধ করেছি কর্ত্তামশাই, কিন্তু এমন ক'রে আর আমাকে অপরাধী করবেন না। আপনার পৈঁপুল-বেড়ের বাঁওড় আপনি নিয়ে নিন, যা নিয়ে অত হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ তাও আমি আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি, যে-ক'টা টাকা আমার গেছে, তাও বুঝব না-হয় দণ্ডই দিলাম। আর তার ওপর যে সুগার-মিল করেছি আজ, তাও আপনাকে আমি দানপত্র ক'রে দিয়ে দিচ্ছি—আপনি হাত পেতে নিলেই—

দুলাল সা পাগলের মত সব কথা গড় গড় ক'রে ব'লে যাচ্ছে। যেন সত্যিই তার বৈরাগ্য এসেছে সংসারে। সত্যিই যেন এ-যাবৎ যত অপরাধ করেছে তার জন্যে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। এও কি সত্যিই সম্ভব? এও তা হ'লে সংসারে ঘটে!

কর্ত্তামশাই বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে গেলেন দুলাল সা'র কথা শুনে। জয় মা মঙ্গলচণ্ডী! জয় বাবা বিশ্বনাথ! তোমার পায়ে অনেক দিন নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করেছি। অনেক কেঁদেছি মা লুকিয়ে লুকিয়ে। আমার মনের দুঃখ বাইরের কেউ বোঝে নি মা। কেউ সে কথায় কান দেয় নি। এতদিনে বুঝি তুমিই শুনলে, এতদিনে তুমিই আমার উপায় ক'রে দিলে।

কর্ত্তামশাইয়ের পা দু'টো থর থর ক'রে কাঁপতে সুরু করেছিল। হাত দিয়ে পা দু'টোকে চেপে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন। ঠিক এমনি অবস্থা তাঁর হয়েছিল হাওড়ার জুট-মিলে গিয়ে, যেদিন প্রথম হরতনকে পাওয়া গিয়েছিল। আজ এতদিন পরে যখন ভাবছেন, কেমন ক'রে হরতনের চিকিৎসা হবে, কেমন ক'রে এই বাড়ী আবার প্রাসাদ হয়ে উঠবে, তখন ভাগ্যের এ কি অভাবনীয় লীলা! সেই দুলাল সা তাঁকে টাকা দেবে? তাঁর পৈঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা ফিরিয়ে দেবে? এ-সব কে করাচ্ছে? এ কার লীলা? এ লীলা দেখবেন ব'লেই কি এতদিন তিনি বেঁচে আছেন? তা হ'লে কি তাঁর ছেলে ফটিকও ফিরে আসবে? কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বংশ আবার কি ধনে-জনে ভর-ভরাট হয়ে উঠবে? আবার হাতীশালে হাতী উঠবে, ঘোড়াশালে ঘোড়া উঠবে। আবার দুর্গোৎসব হবে বাড়ীর সামনের উঠোনে। আবার সামিয়ানা খাটানো হবে মাঠে, আবার 'নল-দময়ন্তী' পালা যাত্রা হবে, মতি রায়ের দলের যাত্রা শুনতে দলে দলে হাজির হবে এসে কেষ্টগঞ্জের লোক? আবার তিনি চীৎকার ক'রে উঠবেন—এ্যায়ও —চোপ্—। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সব গোলমাল থেমে যাবে তাঁর গলার আওয়াজে! আগে তাঁকে দেখে যেমন লোকে রাস্তার মধ্যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত, আবার সেই রকম প্রণাম করবে! আবার তিনি বলবেন —কি রে, কেমন আছিস্ রে জগা?

জগা বলবে—হুঁজুর যেমন রেখেছেন—

—তোর জামাই কেমন আছে? বড় জামাই?

—আজ্ঞে, ম্যালেরিয়া হয়েছে, সারছে না, পিলে বেড়েছে—

—পিলে বেড়েছে ত ডাক্তার দেখা!

—হুঁজুর, ডাক্তার-ওষুধের যে মেলা পয়সা লাগে।

—পয়সা নেই তোর?

নিবারণ পাশেই থাকবে। নিবারণকে ডেকে বলবেন —নিবারণ, জগাকে কালই পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিও ত।

শুধু জগা কেন, কেষ্টগঞ্জের তাবৎ লোকে এসে সকাল থেকে তাঁর দরজায় ধর্ণা দেবে। যেমন আগে দিত। কখন কর্ত্তামশাই ঘুম থেকে উঠে নিচেয় নামবেন, কখন দর্শন দেবেন, তাই ভেবেই তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে। তারপর তখন থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত লোকে-লোকারণ্য থাকবে বার-বাড়ী। সদর থেকে এস-ডি-ও আসবে কর্ত্তামশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে, তিনি দেখা করতে পারবেন না। সময় হবে না কর্ত্তামশাই-এর। এস-ডি-ও-ই হোক্ আর কলকাতার মিনিষ্টারই হোক্, তিনি কি তাঁদের চেয়ে কিছু কম নাকি? দুলাল সা যেমন মিনিষ্টারকে ডেকে নিয়ে এসে বাড়ীর সামনে মিটিং করালে, দরকার হ'লে তিনিও তেমনি করাবেন। মিনিষ্টারের সঙ্গে ফোটো তোলাবেন। সেই ছবি আবার কলকাতার খবরের কাগজে ছাপাবেন। তার পরে আজকাল ত রায়সাহেব রায়বাহাদুর ও-সব পাট উঠে গেছে। এখন পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ ভারত-রত্ন হয়েছে। ইচ্ছে হ'লে তারই মধ্যে একটা কিছু হবেন। কেষ্টগঞ্জে কোনও নতুন লোক এলে এই ভট্টাচার্য্যি বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে—এটা কার বাড়ী হে?

পাশের লোকটা বলবে—কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্যির বাড়ী।

—কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্যি কে?

—সে কি, কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্যির নাম শোন নি? এরই পূর্ব্বপুরুষ ত গৌড়েশ্বরের রাজপুরোহিত ছিলেন, রোজ হাতীর পিঠে চ'ড়ে রাজবাড়ীতে যেতেন গৃহ-বিগ্রহের পুজো করতে, রোজ একশ' আটটা পদ্মফুল দিয়ে পুজো হ'ত ঠাকুরের। ইনিই ত এবার ভারত-রত্ন উপাধি পেয়েছেন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে।

আর হরতন?

হরতন তখন দৌড়তে দৌড়তে এসে কাছে দাঁড়াবে। বলবে—দাদু—

কর্ত্তামশাই বলবেন—কি দাদু?

—আমায় একটা গাড়ী কিনে দাও দাদু, আমি মটর চালাব।

সে হাতীর যুগ আর নেই এখন। এখন গাড়ীর যুগ। একটা গাড়ীও দরকার। এই এখান থেকে ওখান পর্য্যন্ত মস্ত এক গাড়ী কিনতে হবে হরতনের জন্যে। কেষ্টগঞ্জের রাস্তায় এখন পিচ-বাঁধান হয়েছে। বাস চলছে। স্টেশন থেকে একেবারে সোজা মুড়োগাছা পর্য্যন্ত বাস চলে। হরতনের পাশে ব'সে আছেন কর্ত্তামশাই। দূরে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টার ওপর সুগার-মিলের বড় চিমনিটা দেখা যাচ্ছে। তার ওপর ধোঁয়া উঠছে। ওইখানে গিয়ে একবার নামবেন। দুলাল সা'কে যেমন সবাই সেলাম করে, তেমনি ক'রে সবাই তাঁকে সেলাম করবে।

– কি খবর দারোয়ান, সব ঠিক আছে ত?

দরোয়ান বলবে—জী হুজুর—

ম্যানেজার এসে সামনে দাঁড়াবে।

—কাজকর্ম্ম কেমন চলছে সব ম্যানেজার?

—আজ্ঞে, সব ঠিক চলছে।

এই রকম দু'-একটা খুচরো কাজ। একবার ক'রে রোজই যেতে হবে মিল-এ। নিজে না দেখলে কি কাজ-কর্ম্ম চলে? তিনি নিজে আর হরতন। হরতন সব সময়েই সঙ্গে থাকবে। তার পর হু হু ক'রে চ'লে যাবেন মালোপাড়ার দিকে। কোনও কোনও দিন একেবারে মুড়োগাছা পর্য্যন্ত। মুড়োগাছার পর শ্রীনাথপুর। শ্রীনাথপুরের পর ফতেহাবাদ। তারপর নদী। ইছামতী আবার বাঁক নিয়েছে দক্ষিণদিকে। সেখান থেকে সামনে চেয়ে দেখলে শুধু দেখা যাবে কাশ-ক্ষেত। মাটির ওপর কাশক্ষেত আর মাথার ওপর আকাশ। শুধু আকাশ আর আকাশ। আকাশের পর

—কর্ত্তামশাই!

হঠাৎ চমক ভাঙল। চার দিকে চেয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। দুলাল সা আর নিতাই বসাক দু'জনেই কখন চ'লে গেছে টের পান নি। শুধু নিবারণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর মেকার-মিস্ত্রী।

কর্ত্তামশাই জিজ্ঞেস করলেন—দুলাল সা কখন গেল?

—আজ্ঞে, তারা ত অনেকক্ষণ চ'লে গেছে—নতুন বৌও হরতনকে দেখতে এসেছিলেন, তিনিও চ'লে গেছেন।

—কই, যাবার সময় আমাকে ব'লে গেল না ত?

—আজ্ঞে, ব'লেই ত চ'লে গেল। যাবার সময় আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল যে!

—ও—তাই নাকি?

কথাটা ব'লে নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন। তা

হ'লে এতক্ষণ দুলাল সা যা কিছু ব'লে গেল সমস্তই স্বপ্ন নাকি?

—আজ্ঞে, মিস্ত্রীরা বলছে ওরা সমস্ত এষ্টিমেট্ পাঠাবে, তারপর এষ্টিমেট্ দেখে আমরা মত দিলে ওরা কাজ করবে। এরা বলছে অন্ততঃ দশ হাজার টাকার মত পড়বে।

কর্তামশাই বললেন—তা পড়ুক, দশ হাজারই পড়ুক আর বিশ হাজারই পড়ুক, কাজ আমার ভাল হওয়া চাই, টাকার জন্যে কাজ খারাপ করা চলবে না তা ব'লে।

আরও কি কি সব কথা বলতে লাগল মিস্ত্রীরা। সে সব কথা তখন আর ভাল লাগছিল না কর্তামশাই-এর। তারা প্রণাম ক'রে চলে যেতেই কর্তামশাই নিবারণকে ডাকলেন—শোন নিবারণ—

নিবারণ সামনে এল।

কর্তামশাই বললেন—নিবারণ, দুলাল সা যা বলছিল, শুনেছ?

—শুনেছি, আমাদের বলেছেন—

- তোমাকেও বলেছে? কি বলেছে?

—আজ্ঞে, বলেছেন উনি সন্নিসী হয়ে চ'লে যাচ্ছেন। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় আমাদের ফিরিয়ে দেবেন, আরও সব অনেক কথা ব'লে গেলেন।

—তোমার বিশ্বাস হ'ল কথাগুলো?

—আজ্ঞে, আপনার দয়াতেই ত দাঁড়িয়েছেন উনি, তাই এখন বোধহয় ধর্ম্মভয় জেগেছে মনে। আর নতুন-বৌও ত একখানা গয়না দিয়ে মুখ দেখে গেল হরতনের।

—গয়না? কিসের গয়না, সোনার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সোনার। সোনার বালা একজোড়া। তা হাত দিয়ে দেখলাম ওজনে আট ভরিটাক্ হবেই, বেশ ভারি ভারি।

—কই, দেখে আসি, চল ত।

ব'লে কর্তামশাই উঠলেন। বললেন—বঙ্কু কোথায়?

—হরতনের কাছেই আছে।

কর্তামশাই চলতে চলতে বললেন—হরতনের ওষুধ এনেছ?

—আজ্ঞে, ওষুধ ত কালকেই এনেছি।

—ওষুধ খাইয়েছ?

—আজ্ঞে, ওষুধ ত সব বঙ্কুই খাওয়ায়, আমার হাতে ও ওষুধ খেতে চায় না হরতন, বড় গিন্নীর হাতেও খেতে চায় না, কেবল বঙ্কুর হাতে খাবে।

—আর ফল? আঙুর, আপেল, বেদানা, ও-সব?

—সবই খাওয়াচ্ছে বঙ্কু। আমাদের কারোর কথাই ত শুনবে না, বঙ্কুই ত দিনরাত কাছে থাকে, আর দেখা-শোনা করে।

তা বটে। কেষ্টগঞ্জে আসার পর দিন থেকেই সেই যে বঙ্কু হরতনের সেবার ভার নিয়েছে, সে এখনও চলছে। কোথাকার যাত্রাদলের ছেলে, চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে উঠল, আর যাওয়া হ'ল না তার।

কর্তামশাই বলেছিলেন—তোমার চাকরিটা যাবে না ত বাবা?

বঙ্কু বলেছিল—এই হরতন ভাল হয়ে গেলেই চ'লে যাব—আর ত দুটো দিন, একটু উঠে হেঁটে-বেড়াতে দিন—

কর্তামশাই বলেছিলেন—সেই কামনাই কর বাবা তোমরা, তুমিও ছুটি পাও, আমার হরতনও ছুটি পায়।

তা সেই থেকে রয়ে গেছে বঙ্কু এখানে। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই সেই যে গিয়ে বসে হরতনের সামনে, তার পর আর তার ছুটি নেই। হরতনের মুখ ধুইয়ে দেয়, দাঁত মেজে দেয়, ওষুধ খাইয়ে দেয় তাকে। ফলগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মুখে পুরে দেয়। তালপাতার পাখাটা নিয়ে মাথায় নাগাড়ে বাতাস করে।

মুখটা নিচু ক'রে একবার জিজ্ঞেস করে—এখন কেমন আছ গো তুমি?

হরতন জেগে থাকলে উত্তর দেয়, নইলে আর উত্তরই দেয় না।

অন্য সময়ে বলে—বঙ্কু—

বঙ্কু মুখ নিচু ক'রে বলে—কিছু বলবে?

হরতন বলে—কোথায় ছিলাম আমরা আর কোথায় এলাম বল ত?

বঙ্কু বলে—আমি বরাবরই বলতাম তোমায়, তুমি রাজরাণী হবে।

হরতনের মুখে ফ্যাকাশে হাসি ফুটে ওঠে। বলে—কিন্তু আমি যে সত্যিকারের রাজকন্যে তা ত জানতাম না—

—ভালই ত হ'ল।

বঙ্কু আরও জোরে-জোরে পাখার বাতাস করে। বলে—ভালই ত হ'ল, তোমার ভাল হ'লেই আমার ভাল।

—আমি সেরে উঠলে তুমি কি করবে?

বঙ্কু বলে—তুমি সেরে উঠলে আবার চণ্ডীবাবুর দলে চ'লে যাব, আবার গোঁফ কামিয়ে 'রাণী রূপকুমারী' সেজে আসরে নামব—আবার আসরে নেমে বলব—

কোথা যাব অবলা রমণী,

কে আছে আমার !

কার কাছে মাগিব আশ্রয়, বল অন্তর্যামী ?

কথাটা সুর ক'রে ব'লে বঙ্কুও হাসে, হরতনও হাসে।

বঙ্কু বলে—আর লোকে যদি টিট্‌কিরি দেয় ত চণ্ডীবাবুর গালাগালি খাব—! আগে গালাগালি খেলে তবু তোমার মুখে চেয়ে সব হজম করতাম, এখন তুমি চ'লে এলে, এখন কষ্ট হ'লে ফকিরের কাছ থেকে হুঁকো চেয়ে নিয়ে কষে টান দেব।

হরতন বলে—তামাকটা তুমি ছেড়ে দিও, বুঝলে ? বেশি তামাক খেলে শুনিছি বুকের রোগ হয়।

বঙ্কু বলে—হোক্ গে বুকের রোগ—আমার বুকের রোগ হ'লে কার কি ? কারুর ত কিছু এসে-যাচ্ছে না—চণ্ডীবাবু আর একটা লোক খুঁজে নেবে—

হরতন বলে—তা বুকের রোগ হওয়া ভাল নাকি, তোমারই ত কষ্ট, তুমিই ত ভুগে ভুগে কষ্ট পাবে।

বঙ্কু বলে—তোমাকে আর তার জন্যে ভাবতে হবে না, তুমি একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর দিকি নি।

হরতন একটু থেমে বলে—আচ্ছা, বঙ্কুদা, আমি যেমন রাজকন্যে হয়ে গেলাম, তুমিও যদি তেমনি হঠাৎ রাজপুত্তুর হয়ে যেতে ?

বঙ্কু হাসে। বলে—তা হ'লে খুব মজা হ'ত সত্যি, না ? কিন্তু আমার চেহারা যে বাঁদরের মত, আমি রাজপুত্তুর হ'লেও মানাত না।

হরতন বলে—আমার চেহারার উপর নজর দিচ্ছ ত ? দেখবে, ঠিক আমার অসুখ সারবে না—মোটে সারবে না—

বঙ্কু হাত দিয়ে হরতনের মুখখানা চাপা দেয়।

বলে—তোমার মুখে কিছু আটকায় না দেখছি—

হরতন রেগে যায়। বলে—আবার ছুঁলে ত আমাকে ?

—বেশ করব ছোঁব, কেন তুমি বার-বার অমন অলুক্ষুণে কথা বলবে—

—কিন্তু আমার ত ছোঁয়াচে রোগ, আমাকে এত ছোঁয়াছুঁয়ি কি ভাল ? আমাকে না-হয় এখন তুমি দেখছ, তখন তোমার রোগ হ'লে তোমাকে কে দেখবে ? তোমার কে আছে শুনি ? তোমার রোগ হ'লে চণ্ডীবাবু তোমাকে ভাগাড়ে ফেলে দেবে, দেখো—

বঙ্কু রেগে যায়। বলে—আমার কথা আর তোমায় অত ভাবতে হবে না গো ধনি, তুমি তোমার নিজের ভাবনাটা ভাব আগে।

হরতন কিন্তু কথাটা শুনে হাসে।

বলে—আমার ভাবনা ভাববার অনেক লোক আছে। দেখছ না, কত লোক আসছে আমাকে দেখতে, কত লোক কত আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছে এসে, কত লোক কত আদর ক'রে কথা বলছে আমার সঙ্গে! এমন আদর আমাকে আগে কেউ জীবনে করেছে ?

বঙ্কু বললে—করে নি ?

—কে করেছে বল ?

—কেন, আমি করি নি ? আমি···

হঠাৎ বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে দু'জনেই চমকে উঠেছে। বাইরে বড়গিন্নী তখন নতুন-বৌকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বঙ্কু দেখলে, হরতন দেখলে, বড়গিন্নীর সঙ্গে একজন বৌ ঘরে ঢুকেছে। বেশ দামী শাড়ি, গায়ে দামী দামী সোনার গয়না। বঙ্কুকে দেখে বৌটির বুঝি একটু সঙ্কোচ হ'ল। মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে জ্যাঠাইমা—

বড়গিন্নী বললে—ওই ওদের সঙ্গেই ত ছিল এতদিন আমার নাতনী, অসুখ ব'লে রয়েছে। এই হরতনের অসুখ সেরে গেলেই আবার চ'লে যাবে।

বঙ্কু তখন একটু দূরে স'রে দাঁড়িয়েছে। নতুন-বৌ কাছে এল। তার পর হাতের একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট হরতনের হাতে দিয়ে বললে—এইটে তোমায় দিলাম ভাই, আমার শ্বশুর তোমাকে দিয়েছেন—

হরতন মুখখানার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞান ও ভাষাসমস্যা

বিজ্ঞানের প্রকৃতি আন্তর্জাতিক। শিল্প বা সাহিত্যের বিষয়গুলির মত স্থানভেদে ব্যক্তিভেদে তার রূপ পালটায় না। বিষের তাবৎ জিনিষের মধ্যে বিজ্ঞান যে রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে তা মস্কো প্যারিস নিউইয়র্ক বন্‌ সর্বত্রই একই সূত্রে বাঁধা রয়েছে। বিজ্ঞান প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য আলাদা ভাবে তৈরী হয় নি।

কিন্তু ভাষার ব্যবধানে এই আন্তর্জাতিক বিষয়টি অন্যভাবে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ফলগুলি আট কি নয়টি ভাষায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। ইংলিশ জার্মান রাশিয়ান ফ্রেঞ্চ এবং স্পেনিশ ছাড়াও ইতালিয়ান জাপানি চাইনিজ ইত্যাদি ভাষায়। কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই এর সবগুলি রপ্ত করা সম্ভব নয়। কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কি কি তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে তার পুরো বিবরণ কোন গবেষকেরই গোচরে আসছে না। ভাষায় ব্যবধানে বিশেষ একটি অংশ তার কাছে গোপন থাকছে

বিভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞানীর সংখ্যা

বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা

(UNESCO, 1957)

ছবিতে পাশাপাশি আর লম্বালম্বি দু'ভাবে ঘরগুলি সাজানো রয়েছে। তাদের কতকগুলি ঘন কালো আর কতকগুলি ফোটাকাটা। এ দু' ধরনের ঘর থেকে আমরা পৃথিবীর মোট বিজ্ঞান আলোচনার পরিমাণ এবং বিভিন্ন প্রধান ভাষাগুলিতে তার প্রসার বোঝাতে চেয়েছি। পাশাপাশি সাজানো ঘরগুলিতে বিভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞান জাতীয় পত্র-পত্রিকার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে দেখানো হচ্ছে। আর এই সমস্ত আলোচনা বিভিন্ন ভাষার বিজ্ঞানী সমাজে কতটা ছড়াতে পারে তা লম্বালম্বিভাবে আঁকা ঘরগুলি থেকে বোঝা যাবে। উদাহরণ হিসাবে ইংরেজীর ঘরটাই ধরা যাক। ইংরেজীতে লেখা বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা ইংরেজীভাষী বিজ্ঞানী ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক ফরাসী জার্মান ও রাশিয়ান বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারে (চিত্রে লম্বালম্বিভাবে ইংরেজীর উপরকার সাদা জায়গাগুলি দেখুন)। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক আলোচনাগুলি সেভাবে রাশিয়ান ছাড়াও কিছু কিছু জার্মানদের কাছে বোধগম্য কিন্তু অন্যান্য প্রধান ভাষাভাষীদের জগতে তার দরজা বন্ধ। বিজ্ঞান মূলতঃ আন্তর্জাতিক হয়েও এভাবে ভাষার কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এভাবে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। উঁচু পর্যায়ের গবেষণা-কর্মীর পক্ষে একাধিক ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা তাই অনেকদিনকার পরিচিত রীতি। সে সঙ্গে, সম্প্রতি অনেক দেশে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফলগুলি অল্পদিনের মধ্যে ভাষান্তরে প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এ সমস্তই আংশিক সমাধান। বিজ্ঞান মূলতঃ আন্তর্জাতিক হয়েও এভাবে তার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। ভাষাই তার কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গটি যদি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে টেনে আনি, বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না, বিজ্ঞানের চর্চা চালিয়ে যেতে হ'লে আমাদের বিদেশী ভাষার সুযোগ বাদ দিলে চলবে না। মাতৃভাষা প্রাথমিক ধারণা তৈরীর পক্ষে অতুলনীয়, শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে তার স্থানই সর্বপ্রথম। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যদি সত্য সত্যই অগ্রসর হ'তে হয়, জাত্যাভিমানকে খর্ব ক'রে জাতীয়তাবোধকে নূতন আলোকে দেখতে হবে। বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিদেশী ভাষার চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

ফুয়েল সেল

ফুয়েল সেল বিজ্ঞানের পরশমণি। স্পর্শমণি আকাশের ফুল তবু তার খোঁজে একদিন অ্যালকেমিষ্টরা বিজ্ঞানের সাধনা করেছিলেন। ফুয়েল সেল এই বিংশ শতকেরই গবেষণার বিষয়। সত্যি সত্যিই কি তা সম্ভব হবে?

ফুয়েল সেল হ'ল যে কোন ফুয়েল বা জ্বালানীকে সরাসরি বিদ্যুতে পরিবর্তন করার যন্ত্র। কয়লা তেল বা গ্যাস পুড়িয়ে আজকাল যে বিদ্যুৎ হয় তা জলকে বাষ্পে পরিণত ক'রেই তবে সম্ভব হচ্ছে। পরমাণুর যে এত বিপুল শক্তি—তা থেকে বিদ্যুৎ "নিংড়ানো" হচ্ছে, তাও আসলে সামান্য জ্বালানীরই কাজ করছে। মূলে পরিবর্তন আসে নি, কয়লা বা গ্যাসের বদলে পরমাণুর থেকে উত্তাপ গ্রহণ করা হচ্ছে মাত্র।

ফুয়েল সেল সেদিক্ দিয়ে নূতন—চমকপ্রদ! তাই বলছিলাম, স্পর্শমণি। তার স্পর্শে যেন কয়লা বা তেল সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত হবে। যদি তা সম্ভব হয়! যদি সম্ভব হয়,—পৃথিবী এই যুগের খোলস পাল্‌টিয়ে নূতন এক যুগে প্রবেশ করবে। বিজ্ঞানী কার্ণোর তত্ত্বধারণায় রয়েছে—কোন ধরণের জ্বালানী পুড়িয়ে তা থেকে শতকরা ৪৫ ভাগের বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে না। ফুয়েল সেলে ফুয়েল পোড়ানোর সমস্যাই নেই! কিন্তু তার থেকেও যা ব'ড় কথা, তা আমাদের সামনে শক্তি উৎপাদনের এক নূতন কৌশল ধ'রে আনছে। গাছের পাতা সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে, ফটো-সেলেও সেভাবে সফল হয়েছে—আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ। ফটোসেল বিজ্ঞানের ভাবলোক ও কর্মলোক দু' জায়গাতেই প্রবল আলোড়ন তুলেছিল, ফুয়েল সেলও তার থেকে কম তাৎপর্য দেখাবে না। জ্বালানীকে না জ্বালিয়ে তা থেকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি—কল্পনাই করা যায় না! বিজ্ঞান সে পথেই এগিয়ে চলছে, গবেষণায় সফলতার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই তুলে ধরেছে। তত্ত্বের কথা থাক, বাস্তবে তার একটি প্রয়োগ এখনই স্পষ্ট। কয়লা পরমাণু বা জলশক্তি নির্ভর উৎপাদন-যন্ত্রে যা উৎপাদন-ক্ষমতা, সাধারণতঃ তার শতকরা ৪৭ ভাগ কি ৫০ ভাগ মাত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়, কারণ বিদ্যুতের চাহিদা নদীর জোয়ার-ভাঁটার মতই কমে ও বাড়ে। ফুয়েল সেল যদি সম্ভব হয় ছোট আয়তনের যন্ত্র বসিয়েই কাজ চালানো যাবে, বাড়তি প্রয়োজন ঐ সেলই জুগিয়ে যাবে। তাছাড়া যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাধারণ উপায় নেই—কয়লা বা জলশক্তির অভাব, সেখানেও বসানো যাবে ঐ ফুয়েল সেল।

বিদ্যুতের স্পর্শে দেশের শ্রী পালটে যাবে। বিজ্ঞান তাই এই পরশমণির খোঁজে উঠে-প'ড়ে লেগে গেছে।

মনোরেল

মানুষ এক পায়ে হাঁটলে তাকে বলি খোঁড়া, আর রেলগাড়ী যদি একটিমাত্র লাইন ধরে ছোটে তখন তা হ'ল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দুষ্কর কৃতিত্ব। মনোরেল—একটিমাত্র রেল, মনো মানে এক। একটিমাত্র রেল লাইনের আশ্রয়ে তা বেয়ে চলে। এক্কা গাড়ীতে একটিমাত্র ঘোড়া, কিন্তু চাকার সংখ্যা দুটি। এই দুয়ের জন্যই তার ভারসাম্য। কিন্তু লাটু "আলে"র মাথায় ভর দিয়ে বেশ ঘুরপাক খায়, ঘূর্ণনের বেগ থেকেই তার এই সমতা। তার মানে, দুটো জিনিষের উপর না দিয়েও ভারসাম্য রাখা যায়। এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে—সে হলো তালগাছ। একটিমাত্র রেল লাইনে ভর দিয়ে গাড়ী চলতে পারে, তৈরীও হয়েছে সেভাবে।

হাইড্রোজেন-অক্সিজেন ফুয়েল সেল।

মনোরেল সাধারণ রেলগাড়ীর এক বিশেষ-রূপ। বিশেষ অবস্থার দায়ে তেমন একটা জিনিষের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। জীবিকার আকর্ষণে মানুষ আজকাল ক্রমশ অধিক হারে সহর বন্দর বা শিল্পাঞ্চলের
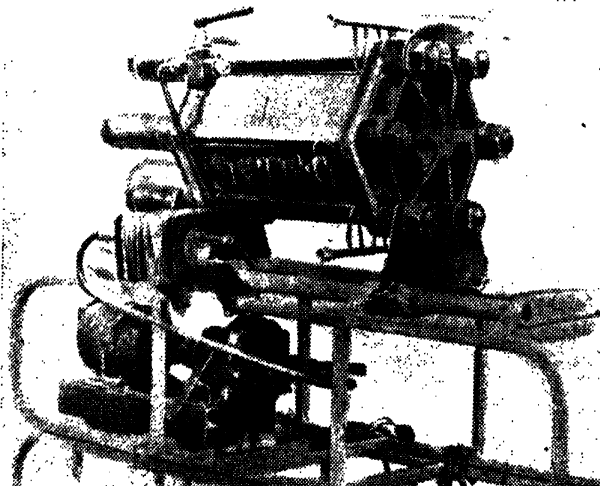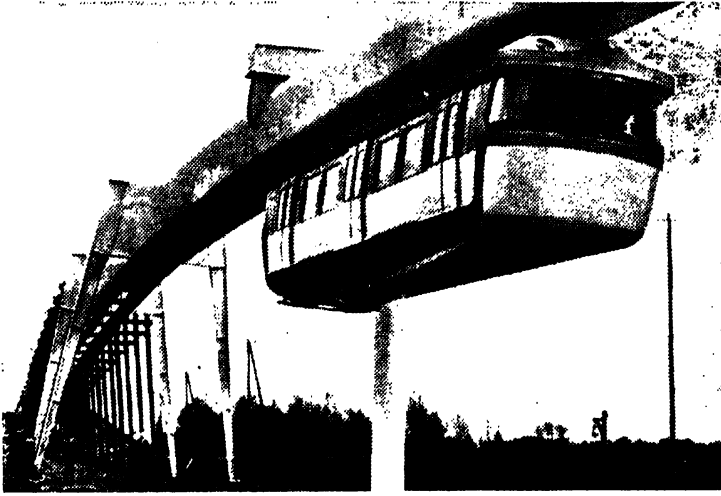
ফরাসী মনোরেলওয়ে ও মনোরেল গাড়ী।

সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। পরিবহনের সমস্যা তাই বেড়েছে। ট্রাম, বাস, ট্রেন, পায়ে চলার রাস্তা সমস্ত কিছুতে অসম্ভব চাপ এসে পড়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য অনেকে মাটির দিকে আজ চোখ দিয়েছেন। ব্রিটেনের টিউব; আমেরিকার সাব-ওয়ে; ফ্রান্সের মস্কো—মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ট্রেন চলার পথ। কিন্তু ভূগর্ভের এই পথ বড় ব্যয়বহুল, নির্মাণ সময়সাপেক্ষ আর ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যার কথা ত আছেই। নূতন এক উপায় তাই খোঁজা হচ্ছিল। রাস্তার ঠিক উপরে যে অবারিত আকাশটা ঝুঁকে থাকে সেখানেই হাত বাড়াই না? আলোকে বাস্তবন্দী করতে গেলে অন্ধকারই জমাট বাঁধে, আকাশের দিকে অঙ্গুলি না তুলে রাস্তাকেই আকাশে তুলে দিলাম। এই যে আকাশমার্গ—মনোরেল সে পথেই চলে।

রাস্তার উপর থাম গেঁথে লাইন বসানো হ'ল, একটিমাত্র রেলপথ। এই রেলপথ থেকে "ঝুলে" চলবে মনোরেল, গতি ঘণ্টায় এক শ কিলোমিটার (৬২ মাইল)। রাস্তার পরিধি এভাবে দ্বিগুণ হ'ল। নিচে-উপরে দু ধরনের রাস্তায় মানুষ বিচিত্র সব যানের যাত্রী হয়ে কর্মস্থানের দিকে ধেয়ে চলছে। অবশ্য এ দৃশ্য বহুব্যাপী হতে এখনো দেরী আছে।

কিন্তু কোলিয়ারির 'রোপ ওয়ে'র মত একটিমাত্র রেল লাইন কেন। রাস্তার উপর সাধারণ ভাবে জোড়া লাইন পেতে গাড়ী চালানোর আগে এক পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তার জন্য যে ভারী ভারী লোহার "বীম" গেঁথে লাইন পাকাপোক্ত করতে হয়, তাতে সমস্ত শহরটিই একটা লোহা-লক্কড়ের যন্ত্রখানায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। খরচের কথা তো আছেই, —তা ছাড়া লোহার সঙ্গে লোহার ঘর্ষণে যে বিকট শব্দ হয় তাতে নূতন যানবাহনের সমস্ত সুবিধাই বাতিল হয়ে যায়। আমাদের এই মনোরেলে এই অসুবিধাগুলি নেই। ব্যয় পরিমিত, ওজনে অনেক হাল্কা, থামগুলি তাই খুব ঘন ঘন বসানোর দরকার হয় না। বাক্সের প্যাটার্ণে গড়া girder-এর মধ্যে লাইনটি লুকানো রয়েছে। রাবারের তৈরী চাকায় গতি নির্বিরোধ, কোন অস্বস্তিকর আওয়াজ পর্যন্ত নেই। বাহনহীন পাক্ষী যেন দোলনার মতই ভেসে চলছে।

বস্তু কেন "একরকম"

বস্তু বহুরূপে রয়েছে সত্যি কিন্তু আসলে তা এক। কাঠ মাটি সিমেন্ট জল বাতাস ধাতু যা-কিছু আছে তা সমস্তই এক জাতের জিনিষ। বিদ্যুৎ যে ভাবে পজিটিভ আর নিগেটিভ রয়েছে, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সে হিসাবে অন্য কোন জাতের বস্তু নেই। সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালের 'সায়েন্স এণ্ড কালচার'-এ শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সংক্ষেপে এখানে তার উল্লেখ করছি।

ভিন্ন প্রকৃতির কোন পদার্থ যদি সত্যই থেকে থাকে, ধরা যাক্ নিউটনের নিয়মসূত্রগুলিই তা মেনে চলবে। পজিটিভ আর নিগেটিভে যেমন আকর্ষণ হয়, জিনিষে জিনিষে তেমনি একটা আকর্ষণ রয়েছে। এর বিপরীতে সাধারণ জিনিষ আর ভিন্নধর্মী জিনিষের মধ্যে একটা বিকর্ষণ দেখা দেওয়ার কথা। এর ফলে, সত্য সত্যই যদি বিপরীতধর্মী কোন জিনিষ থেকেও থাকে, সাধারণ জিনিষগুলির থেকে তারা দূরেই থাকবে। আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে তাই ভিন্ন জাতের কোন জিনিষের খোঁজ পাওয়া যায় না।

মন্তব্য: বর্তমানে ল্যাবরেটরীর বিশেষ অবস্থায় বিপরীতধর্মী বস্তুর কিছু কিছু উপাদান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা আজকাল বলছেন, আমাদের এই সৌর মণ্ডলের কোটি কোটি আলোক-বর্ষ দূরে বিপরীতধর্মী বস্তুতে গড়া আশ্চর্য এক বিশ্বজগৎ আছে। ইলেক্ট্রনগুলিকে আমরা নিগেটিভ-ধর্মী জানি, প্রোটন পজিটিভধর্মী; সাধারণ পদার্থের বিপরীত এই অভিনব পদার্থের জগতে বিদ্যুতের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত।

দূর থেকে কাছে

পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিকদের কাছে এক

বিশেষ সমস্যা। ইতিমধ্যেই তা ৩০০ কোটি ছাড়িয়ে উঠছে। ক্ল্যারিয়েল মিল্‌স্ সমস্যাটিকে তাপমাত্রার সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তাঁর ধারণা, টেম্পারেচারের সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্বন্ধে ১৯৫০ সালে তিনি লিখেছেন: পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশ শুষ্ক ও উত্তপ্ত হচ্ছে, এমন অবস্থায় লোকসংখ্যাও নাকি ভবিষ্যতে কমে যাওয়ার কথা।

ভবিষ্যদ্বাণী করা যে কত বিপজ্জনক, সময়ের বিচারে বার বার তা প্রমাণিত হয়েছে।

এ. কে. ডি

ভেসে-যাওয়া মহাদেশ, ডুবে-যাওয়া মহাদেশ

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বহুলোকের মনে এ ধারণা প্রায় বদ্ধমূল যে, মানব-সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনও এক সময়ে একটি বিরাট্ মহাদেশ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এই কাল্পনিক মহাদেশটিকে বলা হয় আট্‌লাণ্টিস্। বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের আজকাল ক্রমশঃ বিশ্বাস হচ্ছে যে, কথাটা নিছক কল্পনা নাও হতে পারে।

তাঁদের এরকম মনে হওয়ার একটি কারণ, আট্‌লাণ্টিকের অনেকটা জায়গা জুড়ে সমমুদ্রতল বেশ উঁচু, এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠের পর্ব্বতমালার মত নিমজ্জিত পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। অন্য কোনও সমুদ্রের তলদেশ এ রকমের নয়। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে একটা মহাদেশের ডুবে যাওয়া বা দূরে স'রে যাওয়া যে অসম্ভব নয়, তার আরও একটা প্রমাণ হিসাবে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার আকৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব্বোপকূল সীমান্ত আফ্রিকার পশ্চিমোপকূল সীমান্তের সঙ্গে প্রায় খাপে খাপে মিলে যায়, যার থেকে সহজেই মনে হ'তে পারে যে, এই দুটি মহাদেশ কোনও এক সময় একসঙ্গে জোড়া ছিল, পরে কোনও কারণে জোড় ভেঙ্গে গিয়ে পরস্পর থেকে বহু দূরে স'রে যায়।

কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে ত প্রশ্ন ওঠে, এ ধরণের ব্যাপার সম্ভব হ'ল কি ক'রে?

এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

একদল বিজ্ঞানী ব'লে থাকেন, মহাকাশে ছড়ান মহাবিশ্বের অগণ্য বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে খুব অল্প ক'রে হ'লেও ক্রমশঃ প্রভাবিত করে, এবং কোটি কোটি বৎসরে এই শক্তি ব্যাহত হওয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ ব্যাবৃত হতে থাকে যার ফলে সেখানে চিড় ধরে ও মহাদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের বয়স মাত্র দু'কোটি বৎসর। ব্যাহত মাধ্যাকর্ষণের থিওরী অনুসারে এত বড় একটা মহাসমুদ্রের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের মতে পৃথিবীর দ্রবীভূত অভ্যন্তরে নিরন্তর যে স্রোত আবর্তিত হয়ে চলেছে তারই আকর্ষণ বিকর্ষণে উপরকার কঠিন আস্তরণের স্থানচ্যুতি ঘটে। বর্ত্তমান যুগেও বৎসরে আধ ইঞ্চি ক'রে মহাদেশগুলির স্থানচ্যুতি ঘটছে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা এইভাবেই হয়ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকবে।

মানুষের শরীরে রক্তের পরিমাণ

সাধারণ সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে দশ পাঁইট পরিমাণ রক্ত থাকে। আপনার শরীরে কত রক্ত আছে, তার একটা মোটামুটি হিসাব যদি চান ত আপনার শরীরের ওজন যত সের তাকে ৬ দিয়ে ভাগ করুন।

মহাকাশে হীরে

NASAর একজন রসায়নবিৎ পণ্ডিত এম ই লিপশুট্‌জ্ একটি উল্কাপিণ্ড বিশ্লেষণ ক'রে তার মধ্যে কতকগুলি হীরক-কণিকার সন্ধান পেয়েছেন। এই উল্কাপিণ্ডটিকে তিনি ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এটি পড়েছিল এদেশে। লিপশুট্‌জ্ মনে করেন, মহাকাশে অন্য কোনও বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ-জনিত উত্তাপে এই উল্কাটির অন্যতম উপাদান গ্রাফাইট হীরকে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান যুগ

বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের স্থান যে কোথায় তা এই তথ্যটি অনুধাবন করলে বোঝা যাবে যে, মানব-সভ্যতার সুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত বিজ্ঞানী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের শতকরা নব্বুইজন জীবিত আছেন আজকের দিনে।

সর্পাঘাতের আধুনিকতম চিকিৎসা

সর্পদষ্ট জায়গাটা চিরে দিয়ে সেখানকার বেশ খানিকটা রক্ত শোষণ ক'রে নেওয়ার যে প্রক্রিয়ায় সর্পাঘাতের চিকিৎসা করা হ'ত তার পরিবর্তে আরও বেশী কার্য্যকরী একটি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছেন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে এক মুলিন্‌স্। প্রক্রিয়াটি আর কিছু নয়, সর্পদষ্ট হাত বা পা বরফজলে ডুবিয়ে রাখা, অথবা গুঁড়ো বরফ-ভর্ত্তি প্লাষ্টিকের ব্যাগ দিয়ে ভাল ক'রে জড়িয়ে দেওয়া। সর্প-দংশনের আধ ঘণ্টার মধ্যে এটা করলে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক বিষ প্রতিরোধক শক্তি বিষের ক্রিয়াকে ব্যাহত ক'রে দেয়।

পাখীরা কি মনের আনন্দে গান করে?

তা করে, তবে সব সময় আনন্দটাই যে তাদের গান করার কারণ তা নয়। আমরা এখানে রয়েছি, এটা আমাদের এলাকা, এখানে অন্য কারুর আসা বারণ, এই বার্ত্তা প্রচার করবার জন্যেও তাদের 'গান' করতে হয়। প্রিয়তমা বা প্রিয়তমকে বিরহী হৃদয়ের আকুতিও জানাতে হয় গানের সহায়তায়।

স. চ.

রহস্যময় শুক্রগ্রহ

লাওএল মানমন্দিরের কোন পরিদর্শক সূর্যের দিকে তার যে অংশ আছে তার ফটো নিয়ে রহস্যময় শুক্রগ্রহ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—চিরস্থায়ী মেঘের মুখোস পরে 'একটি শূন্যে ঝুলন্ত সাদা টেনিস বল'।

শুক্রের চারপাশে যে মেঘের জাল তা কোথা থেকে আসে এবং কি আছে ওখানে, কোন প্রাণী ঐ গ্রহে বাস করতে পারে কি না এ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। কেবলমাত্র জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা নিশ্চয় ক'রে এই রহস্যময় গ্রহ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন।

৭,৫৭৫ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট এই গ্রহটি আকারে আমাদের পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ এবং ওজনেও প্রায় পৃথিবীর কাছাকাছি। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের এই গ্রহের দূরত্ব আমাদের থেকে ২ কোটি ৬০ লক্ষ মাইলের কাছাকাছি এবং মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব ৩ কোটি পঞ্চাশ মাইলের মত। শুক্র আমাদের ২২৫ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

রাত্রের আকাশে চন্দ্র ছাড়া শুক্রগ্রহই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে শুক্রকে দেখা যায় চন্দ্রের মত, সূর্যের সামনে থেকে পেছনে যাবার পথে কখনও তার কলা বৃদ্ধি পেয়ে সে থালার মত গোলাকায় কখনও বা আকারে ছোট। কদাচিৎ দেখা যায় এর অন্ধকার দিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃপুঞ্জ, যার থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে শুক্রগ্রহেও বায়ুমণ্ডল আছে।

শুক্রের সূর্যালোকিত দিকে কতকগুলো অস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায় যে-গুলিকে মনে হয় মেঘের মত। এ ছাড়া আরও নানা প্রমাণ পাওয়া যায় যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে, শুক্রের এক দিন আমাদের পৃথিবীর সময়ানুসারে ২২ ঘণ্টা থেকে ২২৫ দিন পর্যন্ত যা-কিছু হতে পারে।

শুক্রের কোন উপগ্রহ আছে কি না জানা যায় না। কিন্তু কোনদিন হয়ত আবিষ্কৃত হবে যে মঙ্গলগ্রহের মত তারও দু'টি ছোট চন্দ্র উপগ্রহ আছে, যাদের ব্যাস ৭ থেকে ১৫ মাইল।

শুক্রের আবহাওয়ায় কোন প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা কষ্টকর। আলোকরশ্মি দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তাতে মনে হয়, চার ভাগের তিন ভাগই সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে ভরা। গত বছর পর্যন্ত জলের কোন চিহ্ন শুক্রে পাওয়া যায় নি। গত বছর বিরাট্ বেলুনে টেলিস্কোপ যন্ত্র নিয়ে যে অভিযান হয় তাতে শুক্রে জলের অস্তিত্ব আছে ব'লে অনুমান করা যাচ্ছে।

শুক্রের অন্ধকারময় দিকের ছবি নিয়েও দেখা গিয়েছে যে, প্রাগৈতিহাসিক কালের পৃথিবীর মতই তার জলাভূমি থেকে বাষ্পের কুণ্ডলী উঠছে। সুতরাং এ অবস্থায় প্রাণীর বাসের সম্ভাবনা কিছুটা আশাপ্রদ, অন্ততঃ মঙ্গলের মত কি তার চেয়েও বেশী। এ ধারণার কারণ পৃথিবীর মতই সেখানেও মেঘ সৃষ্টি হয় জলের থেকেই।

১৯৪০ সালে শুক্রগ্রহে জলীয় বাষ্প আবিষ্কারের ব্যর্থতা একটা নতুন দৃশ্য দেখায়ঃ শুক্রগ্রহ একটি শুষ্ক মরুভূমি বিশেষ যেখানে কেবল ভয়াবহ ধূলির ঝড় বইছে। এর সাদা আস্তরণ কেবল ধূলি-মেঘ।

১৯৫০-এ পাশাপাশি নতুন মত দেখা দিল। শুক্রে জল নেই একথা মানতে রাজী নন অনেকেই। শুক্রের অভ্যন্তর সীমাহীন সমুদ্রের মত জলের দ্বারা প্লাবিত। আর একটি মতে শুক্রের যে সমুদ্র তা তৈলের সমুদ্র।

কিন্তু আজকে শুক্রে ধূলির অস্তিত্বের কথা অচল। সর্বশেষ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, শুক্রের তাপমাত্রা ৬০০ ডিগ্রীর মত। অন্ধকার ও সূর্যালোকিত দিকের মধ্যে তাপের পার্থক্য সামান্য কয়েক ডিগ্রীর। এর থেকে মনে হয় কোন ঠাণ্ডা জায়গা নেই সেখানে।

যদি এই সম্ভাবনাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় তবে বলা যায়, শুক্রের পতিত জমি এতই গরম যে, সীসা ও টিনের মত ধাতু গলতে পারে এবং কোন রকম জল নিশ্চয়ই ফুটছে সেখানে। সুতরাং ঐ রকম উত্তাপে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না এবং শুক্রে সম্ভবতঃ ঐ অবস্থাই চলতে থাকবে। যদি তাই হয় তবে কোন মহাকাশ যাত্রীর পক্ষেও শুক্রে অবতরণ করা সম্ভব হবে না—কারণ, এমন কোন পোশাক নেই যা তাকে ঐ উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে।

কিন্তু জ্যোতির্বিদরা শুক্রের ৬০০ ডিগ্রী উত্তাপ সম্বন্ধে একটু যেন সন্দেহ পোষণ করেন। কেন এত উত্তাপ? কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য?

এ সম্পর্কে আর একটি উচ্চ পর্যায়ের চিন্তা আছে। কেউ কেউ মনে করেন কোন গ্রহের যে স্বাভাবিক বেতার-তরঙ্গের সূক্ষ্ম কম্পন তার থেকে কোন হদিশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও বাধা। যেন কোন কচু প্রতিনিয়ত শুক্রগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কার্যকে ভণ্ডুল করে দিচ্ছে।

যাই হোক, শুক্রের কাছাকাছি গিয়ে পর্যবেক্ষণেই একমাত্র তার সম্পর্কে মানুষের যে তীব্র অনুসন্ধিৎসা তা তৃপ্ত হতে পারে এবং আশা করা যায় একদিন তা হবেই।

পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু

অনেকের মতে নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সের মধ্যে অবস্থিত জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ব্রিজই শুধু নয়, সবচেয়ে বড়ও বটে। হাডসন নদীর উপরে এই সেতুটির দ্বিতলের উদ্বোধন হয়েছে এবং এর ১৪টি ছোট সড়ক দিয়ে বছরে ৭ কোটি মোটর গাড়ী, বাস এবং ট্রাক যাতায়াত করে।

দুই তলা-বিশিষ্ট সেতু কিন্তু মোটেই নতুন নয়। সানফ্রানসিস্কোতে অকল্যাণ্ড বে-ব্রিজটিই এর নিদর্শন। পুরাতন সেতুটার সঙ্গে ৩৫০০ ফুট লম্বা (পৃথিবীতে তৃতীয় দীর্ঘতম) ডেক পুনরায় জুড়ে দিয়ে এই সেতুটি নির্মিত হয়। বেথেলহেমের ইস্পাত-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারগণ এই সেতুটি নির্মাণে নতুন এবং জটিল সব নানারকম উপায় উদ্ভাবন করেন। নীচের ডেকটাকে সাময়িক ভাবেও বন্ধ না ক'রে এবং উপরের ডেকে দৈনিক ১ লক্ষ যানবাহনের যাতায়াত অব্যাহত রেখে ৪ বছর যাবৎ এই বিরাট্ গঠনকার্য চলতে থাকে। নদীর দুই তীরের ইয়ার্ডে জড়ো হয়েছিল ৭৫টি বিরাট্ ২২০ টন-বিশিষ্ট ইস্পাতের ডেক যা চওড়ায় ১০৮ ফুট এবং লম্বায় ৯০ ফুট। এগুলিকে ট্রাকে ক'রে বয়ে এনে ট্রলির সাহায্যে তোলা হয়েছিল।

১৯৩১ সালে এই ব্রিজটি নির্মিত হয় এবং প্রয়োজনবোধে এর নীচের তলাটিও যুক্ত হয়। এই নিউইয়র্ক ব্রিজটি তৈরী করতে খরচ হয় ২১ কোটি ডলার এবং বাড়তি খরচ হয় ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।

জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ।

গোখুরা সাপ নিয়ে নাচ

'বিস্ময়ের দেশ' হিসাবে টাঙ্গানিকার নাম অনেক কালের। আজও তার সে নাম বজায় আছে এবং কোন বহিরাগত ওখানে গেলে এমন কিছু দেখবেন যাতে তাঁকে অবাক্ হয়ে যেতে হবে।

স্বভাবতঃই তিনি স্থানীয় লোকদের তাঁর রেডিও শুনিয়ে গর্ব অনুভব করতে পারেন। কিন্তু এই বিংশ শতকেও টাঙ্গানিকার লোকেরা এমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক খেলা দেখাবেন যার সঙ্গে অন্য কোন কিছুর তুলনাই চলবে না।

মাটির থেকে অনেক উঁচুতে একটা সরু লাঠির ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, ক্ষুরের মত ধারালো ছুরির ফলা নিয়ে হাতের খেলা, সর্বোপরি ম্যাজিক-এর সঙ্গে এমন হাত সাফাই-এর খেলা আছে যা স্থানীয় উপজাতীয় জনসাধারণের কাছে বিশেষ প্রিয়।

যাই হোক, সভ্য দেশের লোকেরা অবশ্যই সুকুমা বীরদের দক্ষতা ও নির্ভীকতাকে অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন, যখন দেখবেন তারা সম্পূর্ণভাবে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে বিষধর গোখুরা সাপের সঙ্গে খেলা করছে।

টাঙ্গানিকার সর্পনৃত্য।

সাপটি ফণা বিস্তার ক'রে এগিয়ে যাবে সাহসী লোকটার দিকে। নৃত্যরত লোকটি সম্মোহিত হয়ে নাচবে এবং আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাবে। এরপর সাপটি যখন তার কুটিল ফণা নিয়ে আক্রমণ করবে লোকটিকে, তখন সে পিছনের দিক্ দিয়ে সাপের মাথাটা তার মুঠির মধ্যে নিয়ে নাচতে থাকবে সুন্দর নাচ।

এই নাচ চলবে আধঘণ্টা ধ'রে, যে পর্যন্ত না নাচিয়ে লোকটি সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে মাটিতে প'ড়ে যাবে। অবশ্যই তখনও মৃতপ্রায় সাপটি তার মুঠোয় ধরা থাকবে।

এই সময় নাচিয়ে লোকটির সহকর্মী এগিয়ে এসে সাপটিকে তার মুঠি থেকে নিয়ে ঝাঁপির মধ্যে রেখে দিলে সর্পনৃত্য এইখানেই শেষ হবে।

শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

চিত্রে যে চিমনিটি দেখা যাচ্ছে তা ধ্বসে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। ফলে একটি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় উইভিং কারখানা বিনষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। গণতান্ত্রিক জার্মানির দুজন চিমনি-শ্রমিক অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে চিমনিটি খুলে ফেলেন ও নিরাপদে নামিয়ে আনেন। তাঁরা যখন কাজ করছিলেন তখন তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের ১১ ডিগ্রি নিচে। একটানা কুড়ি মিনিটের বেশি তাঁরা কাজ করতে পারেন নি। ১৫ মিটার লম্বা একটি দড়ির সাহায্যে হেলিকপ্টার থেকে তাঁদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রাণী, রানী, রাণি, রানি

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বানানগুলি নিয়ে বহু বৎসর আগে একবার আলোচনা করেছিলাম, মোটামুটি তারই পুনরাবৃত্তি করছি এখানে।

ইকার দেব না ঈকার দেব তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক্।

তৎসম শব্দের তৎসম বানান কি কারণে বদলাম চলবে না তা অন্যত্র একাধিক বার বিশদভাবে বলেছি। পুনরুক্তি না ক'রে এই কথাটা ধ'রে নিয়ে শুরু করছি যে, বাংলা বানানে ই-ঈ, ইকার-ঈকার এ দুয়েরই ব্যবহার চলবে।

একথা সকলেই জানেন, যে, বাংলা লিপির ঠাটটা যদিও ধ্বনি-অনুসারী, আমাদের উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই বানানকে অনুসরণ করে না। অনেক তৎসম শব্দেরও ঈ বাংলা উচ্চারণে ই, আবার কোন কোন তৎসম শব্দের ই উচ্চারণে ঈ। যেমন, নদী-নদি, বিষ-বীষ। সুতরাং বানান ধ্বনি অনুসারী হবে, এই সূত্র গ্রহণ করলে আমরা অথৈ জলে গিয়ে পড়ব। তার ধাক্কা তৎসম শব্দগুলোর গায়ে গিয়ে লাগবে এবং আমাদের ভাষার ধাতে সেটা একেবারেই সহ্য হবে না।

বাংলা উচ্চারণে তৎসম শব্দের ই-ঈ, ইকার-ঈকার যখন আমরা মিশিয়েই ফেলেছি তখন দুটো দুটো বানান কেবল তৎসম শব্দগুলোর জন্যে রেখে দিয়ে বাকী সর্ব্বত্র নির্ব্বিচারে ই এবং ইকার ব্যবহার করব এই সূত্র গ্রহণ করা যেতে পারে ব'লে অনেকে মনে করছেন।

কিন্তু শব্দের মধ্যে জাতিভেদ প্রথাকে মান্য ক'রে এই রকম নিয়ম করবার অসুবিধা অনেক। ব্যতিক্রম যত কম হয়, নিয়মের পক্ষে ততই সেটা ভাল। সবচেয়ে ভাল হয়, এমন নিয়ম যদি আমরা কিছু করতে পারি, যেটা কোথায় খাটবে আর কোথায় খাটবে না তাই নিয়ে শিক্ষার্থীকে গলদ্‌ঘর্ম হ'তে না হয়।

মনে করুন, ব্রাহ্মণবর্ণের তৎসম স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দগুলির শেষে ঈকার দেওয়া বিধি। ব্রাহ্মণেতর তদ্ভব-দেশজ-বিদেশাগত শব্দগুলির জন্যে যদি অন্যরকম ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে কোন্ শব্দটা তৎসম, কোন্‌টা নয়, পদেপদে সেই বিচার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণেরা উপবীত ধারণ করেন, তাঁদের চিনে নেওয়া সহজ; কিন্তু ব্রাহ্মণবর্ণীয় শব্দগুলি ত উপবীত-ধারী নয়? বাংলা শিক্ষার্থীদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, শিক্ষকদের মধ্যে এমন ক'জন আছেন যাঁরা সর্বত্র তৎসম এবং তৎসমেতর শব্দের পার্থক্যবিচার নির্ভুল ভাবে করতে পারেন? আমার বিশ্বাস, সংস্কৃতভাষা যাঁরা অধ্যয়ন করেন নি তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, 'রাণী' কথাটা তৎসম, না তদ্ভব, না দেশজ, নিশ্চয় ক'রে বলতে পারবেন না।

বাংলার বানান-সমস্যা এমনিতেই যথেষ্ট জটিল। ভাষায় জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত ক'রে সমস্যাটাকে আরও জটিলতর ক'রে তুলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত নয়, যাতে ভাষাবিদ্ মহাপণ্ডিত ভিন্ন অন্যদের পক্ষে এ ভাষার শব্দের যথাযথ বানান ব্যবহার প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে গিয়ে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-পরীক্ষক শ্রেণীর লোকেরা ভিন্ন অন্যরা।যে-ভাষার ঠিক ঠিক বানান করতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাবে, সে-ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

চিন্তিত হবার কারণ থাকত না, যদি বাংলাশব্দ মাত্রেই বাংলাশব্দ এই কথাটা স্বীকার ক'রে নিয়ে এমন কতগুলি সাধারণ সূত্র রচনা করা সম্ভব হ'ত, যার দ্বারা জাতি-নির্ব্বিশেষে ভাষার সমস্ত শব্দের বানান নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারত।

বানান ধ্বনি-অনুসারী হবে, কিন্তু ঈ এবং ঈকার বানান কেবল তৎসম শব্দে চলবে অন্যত্র নয়, এই ধরণের কোনও সাধারণ সূত্র হ'তে পারে না ব'লেই বানানে যে যথেচ্ছাচার চলতে হবে তাও নয়। ই-ঈ, ইকার-ঈকার দুটোদুটোই যখন আমাদের রাখতে হচ্ছে, তখন চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত, আলাদা রকমের কাজে এদের লাগান যেতে পারে কি না। কেবল প্রশ্নবোধক কি-র জন্যে 'কি' রেখে, ইংরেজী what-এর অনুবাদ 'কী' দিয়ে করলে আমাদের সুবিধা বাড়ে। ঝিল্লী—ঝিঁঝিঁ পোকা, ঝিল্লি - membrane; ঘরবাড়ী, লাঠির বাড়ি; কাঁচি —scissors, কাঁচী—ওজন। হাতে হাত রাখি, হাতে রাখী বাঁধি; তরুরাজি, আমি যেতে রাজী; টুপি প'রে সাহেব সাজি, সাজীমাটি, জিন—ঘোড়ার পিঠের আসন, জীন—দৈত্য; এই ধরণের একই উচ্চারণের ভিন্নার্থক

শব্দের আলাদা বানান রাখতে পারাটাও একটা মস্ত সুবিধা। তৎসমেতর শব্দগুলির এইরকমের সত্যিকারের কিছু কিছু কাজ ঈ এবং ঈকারকে দিয়ে যদি আমরা করিয়ে নিতে পারি, তাতে তৎসম শব্দগুলোর বা ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের লোকসান ত কিছু নেই? কোন্ কাজটা কার সেটা জেনে নেওয়া, উপবীতহীন অপরিচিত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ ব'লে চিনে নেওয়ার মত দুরূহ ব্যাপার যেন না হয়, এইটুকু কেবল মনে রেখে এমন কতগুলি সূত্র আমরা সহজেই রচনা করতে পারি, যাদের সহায়তায় তৎসম-তদ্ভব-দেশজ-বিদেশাগত নির্ব্বিশেষে আমাদের ভাষার প্রায় সমস্ত শব্দের ই-ঈ এবং ইকার-ঈকার বানান সুনির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া যায়।

আমি যে সূত্রগুলি করতে বলছি সেগুলি এই :—

(১) কতগুলি তৎসম শব্দে ঈ এবং ঈকার, জন্ম-দাগের মত সহজাত। তৎসম শব্দ ব'লে নয়, ঈ এবং ঈকার উচ্চারণ এমনিতেই হয় ব'লেই এই শব্দগুলিকে চিনে রাখতে হবে। এরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়।

(২) সন্ধিসূত্রের নিয়মানুসারে যে ঈকার এবং সংস্কৃত প্রত্যয়জাত যে ঈকার তা ঈকার থাকবে। শব্দগুলির জাতিনির্ব্বিশেষে।

(৩) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের শেষে ইকার কোথাও নয়, সর্ব্বত্র ঈকার। বুড়ি হয় পাঁচগণ্ডায়; বৃদ্ধা বুড়ি নয়, বুড়ী। মুরগি নয় মুরগী। শাশুড়ি, খুড়ি, মাসি, পিসি নয়; শাশুড়ী, খুড়ী, মাসী, পিসী। গিন্নি, ছুঁড়ি নয়; গিন্নী, ছুঁড়ী। ব্যতিক্রম, ঝি এবং বিবি। ঝী এবং বিবী বানান এককালে চলত, আবার সে বানান চালু করতেও কোন বাধা নেই।

প্রত্যয়জাত 'ইকা' শেষে আছে, এমন শব্দ থেকে উদ্ভূত তদ্ভব শব্দের বানান অনেকে ঈকার দিয়ে ক'রে থাকেন। যেমন, আকর্ষিকা—আকষী, মথনিকা—মউনী, কেদারিকা—কেয়ারী, দীর্ঘিকা—দীঘী, কঞ্চিকা—কাঁকী, মৃত্তিকা—মাটী, আদর্শিকা—আরশী, বটিকা—বড়ী, কর্ত্তরিকা—কাটারী, ঘটিকা—ঘড়ী, পঞ্চালিকা—পাঁচালী, পঞ্জিকা—পাঁজী, পুস্তিকা—পুঁথী, সন্দংশিকা—সাঁড়াশী, হণ্ডিকা—হাঁড়ী। এই ধরণের 'কৃত্রিম' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাংলায় চলা উচিত নয়, কারণ জীবজগতের বাইরে লিঙ্গভেদ স্বীকার করা বাংলার ধাত নয়। অন্যত্র স্ত্রীলিঙ্গ ব'লে যে জিনিষগুলোকে মানব না, সে-গুলোর বানানটা কেবল স্ত্রীলিঙ্গের মত ক'রে করবার মানে হয় না কিছু। ইকার দিয়েই এই শব্দগুলিকে বানান করতে হবে।

(৪) অনেকদিক্ দিয়েই স্ত্রীলক্ষণাক্রান্ত ব'লে ফুলের নামের বেলায় ঈকার বানান চলবে। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব'লে নয়, ফুলের নাম ব'লেই ঈকার বানান বিহিত হবে। যেমন, জাতী, মালতী, চামেলী, কুর্চ্চী, বাঁধুলী, শিউলী, শেফালী, বেলী, করবী, যূঁথী, কল্কী, লিলী, প্যান্সী, গ্ল্যাডিওলী ইত্যাদি।

(৫) সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ের সমধর্ম্মী বাংলা প্রত্যয়টার বানান হবে ঈ, ই নয়। পাখা আছে যার, পাখী। তেমনি হাতী, শিঙী। বেড়িয়া ধরে যে, বেড়ী; জাঁতিয়া কাটে যে জাঁতী; রাখে অর্থাৎ রক্ষা করে যে, রাখী। ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিরও বানানে ঈকার হবে ব'লে, সকল শ্রেণীর শব্দেরই বানান একটি সূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে।

(৬) এর থেকে তৈরি, এই অর্থে শব্দের শেষে ঈকার হবে। বাঁশ থেকে তৈরি বাঁশী; তাল থেকে তৈরি তাড়ী, সূতার তৈরি সূতী, রেশমের তৈরি রেশমী।

(৭) ভাষার বা লিপির নামের শেষে ঈকার হবে। আরবী, ফারসী, ইংরেজী, হিন্দী, গুজরাটী, কানাড়ী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, মৈথিলী, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, নাগরী, গুরুমুখী।

ব্যতিক্রম—পালি, ব্রজবুলি।

(৮) অমুক দেশবাসী, এই অর্থে শব্দের শেষে ঈকার হবে। ফরাসী, জাপানী, বর্ম্মী, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী, তুর্কী, মিশরী, কাশ্মীরী, কাবুলী, মালাবারী, সিংহলী, ইস্পাহানী, ঘোরী, কাছাড়ী, বেলুচী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী (জামা অর্থে পাঞ্জাবি), নেপালী, মাড়োয়ারী, পাহাড়ী, কাঠিওয়াড়ী, আরমাণী, ইরাণী, হাবসী।

(৯) জাত বা সম্প্রদায় নির্দেশক শব্দের শেষে ঈকার হবে। ক্ষেত্রী, খেত্রী, ছত্রী, সুন্নী, সুফী, ওয়াহাবী, পিরালী, গন্ধী, গান্ধী, হাড়ী, বাগদী, ইহুদী, সিউলী, বাউরী, পারশী, ফিরঙ্গী, জেরবাদী।

(১০) পারিবারিক উপনামের শেষে ঈকার হবে। লাহিড়ী, চৌধুরী, কুশারী, ভাদুড়ী, বাগচী, গাঙ্গুলী, চাকী। ব্যতিক্রম:—পালধি।

(১১) বৃত্তি-নির্দেশক শব্দের শেষে ঈকার হবে। তাঁতী, দাঁড়ী, পূজারী, এটর্ণী, ধুবী, মুচী, যুগী, ঢুলী, তিলী, চাষী, আরদালী, বাবুর্চ্চী, ঘরামী, মুদী, শুঁড়ী, কুলী, হালী, খালাসী, বেপারী, সিপাহী, মিস্ত্রী, বর্গী, মুহুরী, কেরাণী, মুৎসুদ্দী, দপ্তরী, মালী, তামুলী, তামলী, শিকারী, কাজী, দরজী, তবলচী, মশালচী, পাটুনী, পাটনী, মুনশী, বকশী, ডুবারী, ঢাকী, ডেপুটী, পাদরী,

করাতী, ফুঙ্গী, বাইতী, দোকানী, পসারী, খাজাঞ্চী, মৌলবী, ভিখারী। ব্যতিক্রম :—মাঝি।

বেসাতি—পণ্য, বেসাতী—দোকানদার। পারাণি—পারের কড়ি, পারাণী—মাঝি।

কিন্তু বৃত্তির নাম, কিম্বা বৃত্তির থেকে উপার্জ্জন যদি বোঝায় তা হ'লে ইকার হবে। চাকরি, দারোয়ানি, ফকিরি, উমেদারি, মোসাহেবি, কেশিয়ারি সেরেস্তাদারি, ড্রাইভারি, নকলনবিশি, মোক্তারি, তেজারতি, ওকালতি, কারিগরি, শাগরেদি, উজীরি, জজিয়তি, খিদমতগারি, চুরি।—দস্তুরি, বানি, পারাণি, মজুরি, দালালি।

বৃত্তি বা উপার্জ্জনবাচক এইসব ইকারান্ত শব্দ ঈকারান্ত হ'লে হয়ে যায় বিশেষণ। যেমন, দোকানদারের বৃত্তি দোকানদারি, কিন্তু দোকানদারী মনোভাব। কেউ গাড়োয়ানি ক'রে খায়, কারও বা গাড়োয়ানী হাল চাল। জমিদারি কিনেছে, জমিদারী সেরেস্তা। দিল্লীর বাদশাহি, বাদশাহী মেজাজ। একদিনের সুলতানি, সুলতানী টাকা। দেওয়ানি করা, দেওয়ানী আদালত। তাঁর নবাবি শেষ হ'ল, নবাবী আমল। এ আমীরি ক'দিনের, আমীরী চাল। তিনি ডাক্তারিও করেন, কবিরাজিও করেন; ডাক্তারী, কবিরাজী দু'রকম চিকিৎসাই করিয়েছি। সে হোমিওপ্যাথি শিখছে, হোমিওপ্যাথী ওষুধ। ওস্তাদি দেখেছ, ওস্তাদী গান। মহাজনির পয়সা, মহাজনী নৌকা। কেউ মোক্তারি করে, কারও বা এমনিতেই মোক্তারী বুদ্ধি।

(১২) একই উচ্চারণের সমস্ত বিশেষ্য পদের শেষে ইকার ও বিশেষণ পদের শেষে ঈকার দেব। খাঁটি—মদ, খাঁটী—আসল। চাঁদি—রূপা, চাঁদী—রূপার তৈরি। শয়তানি ধরা পড়েছে, শয়তানী বুদ্ধি। শাড়ির গায় চৌখুপি, চৌখুপী শাড়ী। আমদানি করা, আমদানী মাল। আমার খুশি, আমি খুব খুশী। দলিল রেজিষ্টারি করা, রেজিষ্টারী চিঠি। রাহাজানি ক'রে খায়, রাহাজানী কাণ্ড। বেগুনি ভাজছে, বেগুনী রঙ। তামাদি limitation, তামাদী barred by limitation। বিজলি—বিদ্যুৎ, বিজলী—বৈদ্যুতিক, যেমন বিজলী বাতি। চাঁদনি উঠেছে, চাঁদনী রাত। সওয়ারি—যানবাহন, পালকি; সওয়ারী—আরোহী। কমবেশি—স্বল্পতা ও আধিক্য; বেশী—অধিক।

(১৩) সহজাত ঈকার বা প্রত্যয়বিহিত ঈকার বা পূর্বে উল্লিখিত কোনো সূত্র অনুসারে ঈকার পরে না থাকলে বিশেষ্য পদ মাত্রেরই শেষে ইকার এবং বিশেষণ পদ মাত্রেরই শেষে ঈকার হবে। ঢেঁকী নয়, ঢেঁকি; নেকামী নয়, নেকামি; দেরী নয়, দেরি; কাওয়ালী নয়, কাওয়ালি; কারদানী নয়, কারদানি; চালাকী নয়, চালাকি; চরকী নয়, চরকি; খাসী নয়, খাসি; ফাঁসী নয়, ফাঁসি; ভেলকী নয়, ভেলকি; জিলাপী-কচুরী নয়, জিলাপি-কচুরি; মেহেদী নয়, মেহেদি; আঁকশী নয়, আঁকশি; আঙুনী নয়, আঙুনি; আদমী নয়, আদমি। তেমনি, উড়ানি, কুলপি, গদি, গরমি, গাড়ি, শাড়ি, ঘটি, চিমনি, চুড়ি, জরি, জমি, জারি, জোনাকি, টেমি, শহরতলি, দাবি, নথি, পাটি (মাদুর), পাথরি, পায়চারি, পালকি, পুরি (লুচি), ফন্দি, বঁড়শি, বিউলি, বিচালি, বীরখণ্ডি, বেজি, বৈজি, মশারি, মাকড়ি, আংটি, মাড়ি, মিছরি, মেহেরবানি, রুলি, রেজগি, রেড়ি, শুনানি, সবজি, এইগুলোই হবে বিহিত বানান। ব্যতিক্রম: ইংরেজী y-অন্তিক কম্পানী, জুরী, মিউনিসিপালিটী ইত্যাদি।

তেমনি, ইলাহি-এলাহি নয়, ইলাহী-এলাহী; আজগবি-আজগুবি নয়, আজগবী-আজগুবী। আনাড়ী, খাপী, বাকী, ঘাগী, ঘিঞ্জী, দাদখানী, পাজী, ফী (প্রত্যেক), বেলোয়ারী, বিচ্ছিরী, মাগ্‌গী, মুলতবী, মৌরুসী, রায়তওয়ারী, মরসুমী, রদ্দী, রাজী, রাহী, মিহী, মেয়েলী, সোনালী, রূপালী, মামুলী, দস্তখতী, দরকারী, আমানতী, গাঁজাখুরী, চৈতালী, জঙ্গী, জবানী, খয়রাতী, আন্দাজী, এইগুলো হবে বিহিত বানান। ব্যতিক্রম:

(ক) টি; একটি, দুটি, তিনটি।

(খ) তি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ; উরতি, উড়তি, ঝরতি, পড়তি, নামতি, চড়তি, বাড়তি, চলতি, ফিরতি, ঘাটতি, ভরতি।

(গ) দ্বিত্ব ক'রে বলা শব্দ; আড়াআড়ি, পাশাপাশি, মুখোমুখি, সামনাসামনি, খুনোখুনি, ভাসাভাসি, হারাহারি।

(১৪) তদ্ভব রূপগুলো কোন্ সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে সেটা যদি স্পষ্ট হয়, অর্থাৎ দুটো রূপের মধ্যে তফাৎ যদি কম হয় এবং তৎসম রূপগুলিও বাংলায় যদি সুপ্রচলিত হয়, তা হ'লে তৎসম বানানের ঈ-ঈকার তদ্ভব বানানেও বিহিত না হ'লে শিক্ষার্থীর অকারণ দুর্ভোগ বাড়বে। তাই বানান হবে, দীর্ঘ—দীঘল, দীর্ঘিকা—দীঘি, অশীতি—আশী, চতুষ্পাঠী—চৌপাঠী, বাটী—বাড়ী, কুম্ভীর—কুমীর, জীব—জী, হরীতকী—হর্তকী বা হত্তুকী নীচ—নীচু, ভীত—ভীতু, জম্বীর—জামীর, আভীর—

আহীর, জীবন—জীয়ন, আত্মীয়—আত্তীল, প্রীতি—পিরীতি, বীণা—বীণ, সমীহা—সমীহ, হীরক—হীরা, দীপাবলী—দেওয়ালী, সীসক—সীসা।

(১৫) এছাড়া আর সর্ব্বত্র, তৎসম-তদ্ভব-দেশজ-বিদেশাগত নির্বিশেষে সমস্ত শব্দের বানানে, আদিতে মধ্যে ও অন্তে, ই এবং ইকার ব্যবহার হবে সাধারণ বিধি।

ব্যতিক্রম: বিদেশাগত ঈগল, ঈদ, খ্রীষ্ট, দীনার, পীর, বীবর, বীমা, যীশু, রীম, রীল, সীন, সীলমোহর, ষ্টীমার বা স্টীমার ইত্যাদি।

সুতরাং রানি বা রাণি না লেখাই যে উচিত, এইটুকু বোঝা গেল। এরপর দেখতে হবে, রাণী লিখব, না রানী লিখব।

সংস্কৃত ণত্ব-বিধি মতে রাণী বিহিত বানান। বলতে পারেন, তদ্ভব শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানব কেন? ণত্ব-বিধি কেবল তৎসম শব্দে চলবে, তদ্ভব-দেশজ-বিদেশাগত শব্দে সর্বত্র ন ব্যবহার করব। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি, সেটা কেন করবেন, ক'রে কি লাভ হবে তাতে, ত আপনি কি জবাব দেবেন?

যদি বলতে পারতেন, বাংলায় ণ অক্ষরটা থাকবেই না, তাহলে বুঝতাম একটা কাজের মত কাজ হ'ল। শিক্ষার্থী-দের নম্বর কাটা যাবার ভয় খানিকটা কমল, আমাদের বর্ণমালায় একটা অক্ষরেরও সাশ্রয় হয়ে গেল। কিন্তু ন-ণ দুটোই থাকবে, অথচ ণ কেবল তৎসম শব্দগুলোর জন্যে তোলা থাকবে, এ যদি হয় ত শিক্ষার্থীকে ণত্ব-বিধিও শিখতে হবে আবার তৎসম শব্দগুলিকে দেখবা-মাত্র চিনে নেবার বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হবে। তাদের পরিশ্রম যে বাড়বে খানিকটা সে-সম্বন্ধে ত কোনও তর্কই উঠতে পারে না। বাস্তবিক, যেহেতু ণত্ব-বিধিটা বিধি, সেটাকে আয়ত্ত করা সহজ, কিন্তু তৎসম শব্দ কোন্‌গুলো তা নির্ভুলভাবে জানতে হ'লে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন হয়।

তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। বাংলায় ই-ঈ, ইকার-ঈকার আমরা যেভাবে মিশিয়ে ফেলেছি, ন-ণ সেভাবে মিশে যায় নি, মিশে যেতে পারে না। যে কোন শব্দে ই-ইকার লিখে ঈ-ঈকার অথবা ঈ-ঈকার লিখে ই-ইকার উচ্চারণ আমরা করতে পারি, করা সম্ভব, করতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ণত্ববিধিবিহিত ণ-এর উচ্চারণ নিজে থেকেই মূর্দ্ধণ্য হয়ে যায়।

বাস্তবিক, ণত্ববিধি যে বিধি, সেটা ণত্ববিধির সূত্র-রচনাকারীদের গায়ের জোর ণ-বিরোধীদের চেয়ে বেশী ব'লে নয়। সন্ধিসূত্র ভিন্ন অন্যত্র ই-ঈ এবং ইকার-ঈকার ব্যবহারের সূত্রগুলি আমরা যেমন নিজেদের খুশি-মত ক'রে নিয়েছি, ন-ণ-এর বেলাতে তা করা সহজ নয়, কারণ ন যে ণ হয় সেটা কারও মন রাখবার জন্যে হয় না, উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়মে নিজে থেকেই ণ তাকে হ'তে হয়। এখানটায় ণ 'হবে', না-ব'লে সূত্রকার বলতে পারেন, ণ 'হয়'। এরই নাম ণত্ববিধি। কতগুলি শব্দের যে সহজাত ণ সেগুলোর কথা ধরছি না।

যেমন ধরুন, ঘণ্টা, বর্ণনা। টবর্গ উচ্চারণ করবার মুখে কিম্বা র উচ্চারণ করবার পরে জিহ্বার সংস্থান যেটা হয় তা নিয়ে ন-এর দন্ত্য উচ্চারণ করা শক্ত। 'ভীষণ', 'রাণী' না ব'লে 'ভীষন', 'রানী' বলতে গেলে জিহ্বার মেহনত বাড়ে। জিহ্বাটাকে অকারণে অনেকখানি পাঁয়তারা করতে হয়।

আজকের দিনের বাঙ্গালীদের কানে ন-ণ-এর উচ্চারণ-গত পার্থক্য হয়ত তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু ণত্ববিধি-বিহিত ণ-এর উচ্চারণ যে ন-এর থেকে আলাদা, একটু অবহিত হয়ে শুনলেই সেটা বুঝতে পারা যায়। উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়ম মান্য ক'রে কতকগুলি জায়গায় ণ লিখছি এই যদি হয়, ত সে নিয়ম তৎসম শব্দের বেলায় চলবে, অন্যত্র চলবে না, এ বড় অদ্ভুত ব্যবস্থা হবে। বাংলা-লিপিকে যতটা সম্ভব ধ্বনি-অনুসারী করবার চেষ্টা আমরা করছি; হঠাৎ একটা জায়গায় ঠিক তার উল্টোটা কেন আমরা করতে যাব? ই-ঈ, ইকার-ঈকার উচ্চারণ আমরা মিশিয়ে ফেলেছি, তবু আশা করতে বাধা নেই, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে ঠিক উচ্চারণগুলি আবার চালু হবে। কিন্তু তৎসমেতর শব্দে ণ উচ্চারণ বাধ্য হয়ে যেখানে আমাদের করতে হচ্ছে সেখানে যদি আমরা ন লিখব স্থির করি, তা হ'লে বানানকে ধ্বনি-অনুসারী করবার চেষ্টার সোজাসুজি বিরুদ্ধাচরণ করা হবে।

কতকগুলি অবস্থায় ন-কে ণ উচ্চারণ করা মানুষের স্বভাব, এটা তার জিহ্বার ধর্ম, এই সহজ নিয়মটাকে কতকগুলি শব্দের বানানের বেলায় মানব, কতগুলির বেলায় মানব না, এটা সমস্তরকম যুক্তিবিচারের বিরোধী কথা। এতে বাংলা বানানের জটিলতাকে অকারণে আরও অনেক বেশী জটিলতর ক'রে দেওয়া হবে।

আমাদের সমাজে জন্মগত শ্রেণীভেদ প্রথা আমাদের জাতীয় দুর্বলতার একটা বড় কারণ। আমাদের ভাষারও মধ্যে আজকের দিনের পণ্ডিতেরা এই জাতিগত বৈষম্যের আমদানি করতে উঠেপ'ড়ে লেগেছেন। এর ফল ভাষার

পক্ষে যে কি মারাত্মক হবে তা অন্যত্র আলোচনা ক'রে দেখাব। জাতিবৈষম্য যে সমস্তরকম logic-এর বিরোধী তার প্রমাণ এঁরা নিজেদের ব্যবহারে এরই মধ্যে দিয়ে চলেছেন। তৎসমেতর শব্দে ণ-এর বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তৎসমেতর অনেক শব্দের ণ্ট, ণ্ড তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। এণ্টালী, কণ্ট্রাক্টর, ঘুণ্টি, বাণ্ট্, ব্রণ্টোসর, মণ্ট্, অণ্ডাল, আণ্ডিল, খাণ্ডার, গণ্ডা, গুণ্ডামি, ঝাণ্ডা, ঠাণ্ডা, ডাণ্ডা, পাণ্ড', পিণ্ডারী, বাণ্ডিল, মণ্ডা সণ্ডা অবাধে লেখা হচ্ছে। ন দিয়ে কথাগুলোর বানান এঁরা নিজেরাও করছেন না। এর থেকে মনে হতে পারে না কি, যে যুদ্ধটা আসলে লোক দেখানো, ওটার মধ্যে গরজ কিছু নেই?

গরজ থাকবার কথাও নয়। এ যুগের ব্রাহ্মণেরা অনেকেই গুণকর্মের বিচারে আর ব্রাহ্মণ নেই। বাংলার তৎসম শব্দগুলির অধিকাংশ তেমনি আসলে আর তৎসম নেই, উচ্চারণের বিচারে তারা প্রায় সকলেই এখন তদ্ভব। কেবল চেহারাটা বামনাই, স্বভাবটা অন্ত্যজ। এদের জন্যে ন-ণ দুটোর ব্যবস্থা যখন রাখতেই হচ্ছে, এবং অকুলান হবার প্রশ্ন একেবারেই উঠছে না, তখন যারা সোজাসুজি অন্ত্যজ তাদের পাতেই বা ণ পড়বে না কেন? কোন্ অপরাধে তাদের আমরা বঞ্চিত করব? ভাষায় ব্রাহ্মণ-অন্ত্যজ মেশামেশি হয়ে আছে ব'লে পরিবেশনকারীর যে অসুবিধা তার কথা ত আগেই বলেছি।

তৎসমেতর শব্দের সর্বত্র নির্বিচারে ন ব্যবহার করতে পেলে বানান সহজ হয় এটা একেবারে ভুল কথা, কারণ তা হ'লে কোন্ শব্দগুলি তৎসমেতর, শিক্ষার্থীকে এই দুরূহতর বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। বর্ষণ—বরষন, কণ্ঠ—কন্ঠা, ঘণ্টা—ঘুন্টি, দণ্ড—ডান্ডা, শিক্ষার্থীদের চোখে অশ্রুর বর্ষা নামাবে। কতগুলি শব্দের সহজাত ণ যে-কোনও অবস্থাতেই শিক্ষার্থীকে চিনে রাখতে হবে, সেগুলিকে সে চিনে রাখবে। বাকী সর্বত্র উচ্চারণের কতগুলি স্বাভাবিক সুনির্দিষ্ট নিয়মে ন ণ হবে, এই হ'লে শিক্ষার্থীর কোথাও কোনও অসুবিধাই আর থাকে না। এই সমস্ত দিক্ ভেবে বিচার করলে ন-ণ সম্পর্কিত বাংলা বানানের সূত্র হওয়া উচিত:

(১) কতগুলি শব্দের ণ সহজাত। সংখ্যায় এরাও মুষ্টিমেয়; শিক্ষার্থীকে শব্দগুলি চিনে রাখতে হবে। যেমন, অণু, উৎকুণ, চণক, গণ, গণন, গুণ, কণা, কোণ, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, কল্যাণ, নিক্বণ, চিক্কণ, পণ, পাণি, পাণিনি, পুণ্য, ভ্রূণ, নিপুণ, বেণী, বাণ, বণিক্, বিপণি, ফণা, মণি, মৎকুণ, মাণিক্য, লবণ, শোণিত, স্থাণু।

এগুলি তৎসম শব্দ, না আরবী-ফারসী মূলীয় তা না জানলেও বানান শিক্ষার্থীর অসুবিধা কিছু নেই।

(২) তৎসম-তদ্ভব-দেশজ-বিদেশাগত নির্ব্বিশেষে ণত্ববিধি সর্বত্র চলবে। যেমন, কার্ণিস, কোরাণ, ঘরণী, ঝর্ণা, ট্রেণ, ড্রেণ, দরুণ, নরুণ, রাণী, কেরাণী, ঘরাণী, চাকরাণ, চাকরাণী, মেথরাণী, চৌধুরাণী, পরগণা, পরাণ, পুরাণো, বার্ণিশ, শিহরণ, হয়রাণ, বরিষণ, বরষণ, রঙীণ, রঙণ, রণপা, আঘ্রাণ, ভেরেণ্ডা, আণ্ডা, গণ্ডার, গুণ্ডা, ঠাণ্ডা, পারাণি, তুরপুণ, রওণা, রওয়াণা, ধরণ, ধরণা, পিরাণ, বরণ (বর্ণ), ফরমাণ, মার্কিণ, ঝর্ণা।

ন বা নো; এবং আন বা আনো, এই দু'টি ক্রিয়া বিভক্তির ন ণ হবে না। করান-করানো, চরান-চরানো, ঝরান-ঝরানো, ধরান-ধরানো, বর্ষান-বর্ষানো, উতরান-উতরানো, পরান-পরানো, পেরোন-পেরোনো, বেরোন-বেরোনো।

বলা বাহুল্য, তৎসম শব্দের ণত্ববিধি বিহিত ণ তদ্ভব শব্দে আনা চলবে না, যদি সেখানেও ণত্ববিধির দ্বারা বিহিত না হয়। স্বুবর্ণ সোণা নয়, সোনা; কর্ণ কাণ নয় কান; চূর্ণ চুণ নয়, চুন; পর্ণ পাণ্না নয়, পান্না; কার্যাপণ কাহণ নয়, কাহন; কর্ণাটক কাণাড়া নয়, কানাড়া; দ্রোণী দুণি নয়, দুনি; বর্ণন বাণান নয়, বানান।

(৩) তৎসম রূপটা বাংলায় যদি সুপ্রচলিত হয় এবং তদ্ভব রূপের সঙ্গে তার আকৃতিগত পার্থক্য যদি নগণ্য হয় তা হলে তৎসম শব্দের সহজাত ণ তদ্ভব শব্দেও ণ-ই থাকবে। এ না হ'লে শিক্ষার্থীর অকারণ দুর্ভোগ বাড়বে। কোণ—কোণা, উৎকুণ—উকুণ, কঙ্কণ—কাঁকণ, চিক্কণ—চিকণ, বীণা—বীণ, মাণিক্য—মাণিক, গণন—গোণা এই শব্দগুলিরও ণ সহজাত ব'লেই শিক্ষার্থীরা জানবে এবং এগুলিকে চিনে রাখবে।

কিন্তু এক চক্ষুহীন অর্থে কাণ বাংলায় চলে না ব'লে কাণা নয়, কানা। চণক বাংলায় অচল, সুতরাং চানা। কফোণি বাংলায় কেউ লেখে না, তাই কণুই নয়, কনুই। বণিক্-এর সঙ্গে বেনের আকৃতিগত তফাৎ এতই বেশী যে বেণে বলবার সার্থকতা কিছু নেই। লবণ থেকে সেই কারণেই নুন এবং লোনা, নুণ বা লোণা নয়।

—•—

পুরুষকার

শ্রীমিহির সিংহ

পাড়াটা অবস্থাপন্ন লোকেরই পাড়া। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ীরই সামনে বাগান আছে, লন আছে। প্রায় সব বাড়ীর হাতার মধ্যে এক বা একাধিক আউট-হাউস আছে। দরোয়ান, মালী, ড্রাইভার, আয়া ইত্যাদি সকলের বাসগৃহ বেষ্টিত বাড়ীগুলি যেন এক-একটি আভিজাত্যের দুর্গ। শান্ত পরিচ্ছন্ন রাস্তাটি খুব বেশী চওড়া নয়, ট্রাম বাস ইত্যাদির অশোভন কোলাহল এখানে ঢুকতে পায় না। এমন কি, ভাড়াটে ট্যাক্সির দেখাও খুব বেশী মেলে না এ রাস্তায়। এ পাড়ার যারা বাসিন্দা নয়, তারা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, তখন তাদের শহরের বৈশিষ্ট্যহীন ফ্ল্যাট বাড়ী দেখা চোখে বিস্ময়পূর্ণ সম্ভ্রম না জেগে পারে না। তবে সব বাড়ী ছাড়িয়ে যে বাড়ীটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে বাড়ীটির নাম 'উদয়গিরি'।

উদয়গিরি নামটার মতনই বাড়ীটির চেহারা। বিস্তৃত লন, চারপাশের সুপ্রাচীন ঝাউগাছগুলির উচ্চতা অতিক্রম ক'রেও বাড়ীটা তার উর্দ্ধগতিকে গ্রানাইট মোড়া স্থাপত্যের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে তোলে। লক্ষ্য ক'রে দেখলে বোঝা যায়, বাড়ীটি খুব বেশী দিন তৈরী হয় নি। কিন্তু যে স্থপতির হাতে এর ছক তৈরি হয়েছিল, সে স্থপতি নিশ্চয়ই কোন এক দুর্লভ মুহূর্ত্তে প্রেরণা পেয়েছিলেন কুলী মজুর আর কংক্রিটের সাহায্যে বাড়ীটিকে প্রাকৃতিক সৃষ্টির অখণ্ড সুষমা দিতে। প্রশস্ত ভিত থেকে সুরু ক'রে গতিময় কার্ণিশগুলো পেরিয়ে অতি উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত চেহারাটি দেখলে দর্শকের মনে হ'তে পারে যে, বাড়ীটার পরিকল্পনার মধ্যে উদ্ধত অহঙ্কার মিশে আছে, যদি না এর প্রতিটি রেখায় একটি সুন্দর ছোট পাহাড়ের রূপ নিয়ে বাড়ীটি সহজ গর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত। 'উদয়গিরি' এ পাড়ার বাসিন্দার কাছে নিতান্ত সম্ভ্রমের সামগ্রী।

উদয়গিরির যিনি মালিক এর স্থাপত্য তাঁরই। উদয়নারায়ণ রায় ওরফে ইউ. এন. রায় কলকাতার সমাজে স্বল্প-পরিচিত নন। তাঁর বাল্যকাল ও যৌবন কারুর কাছেই পুরো জানা নয়। অনেক গল্প চলতি আছে তাঁর উঠ্‌তি অবস্থায় প্রচণ্ড প্রয়াসসঙ্কুল দিন-গুলোর সম্বন্ধে। যতদূর জানা যায়, তিনি জীবন আরম্ভ করেছিলেন কলকাতার ডক্ এলাকায়, ছোটখাট এটা-সেটা কাজের মধ্যে দিয়ে। ক্রমে সেন রায় ষ্টিভেডোর কোম্পানীতে সামান্য চাকরি সুরু করেন, তার পরে সাহস আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কল্যাণে কখনও আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। সে অনেক অতীতের কথা। দশ বছরের মধ্যে সেন রায় কোম্পানীটাই তাঁর মালিকানায় এসে গিয়েছিল। সেখান থেকে কণ্ট্রাক্টরের ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা, জাহাজ কোম্পানী ইত্যাদি বহুবিধ পথে তাঁর বাণিজ্য-সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় বহু-বিস্তৃত হয়ে উঠেছে।

যদি কখনও উদয়নারায়ণের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়—না তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়া আপনার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়—তা হ'লে তিনি হেসে নিজের কর্ম্মঠ হাত দু'টি দেখিয়ে বলবেন যে, তাঁর ভাগ্য তাঁর নিজের এই হাত দু'টি দিয়েই গড়া, উদয়গিরি বাড়ীটা তাঁর সেই জ্বলন্ত পুরুষকারের প্রতীক। তবে আরও যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন তাঁরা জানেন যে, জীবনে যদি কোন একটি জিনিসের জন্যে তাঁর গর্ব্ববোধ থাকে, সেটি হ'ল তাঁর একান্ত আন্তরিক কথা—নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এতটা গর্ব্ব-বোধ সাধারণতঃ কোন মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। উদয়নারায়ণের সম্পদের ইয়ত্তা নেই, তাঁর ভোগস্পৃহাও সেই রকম আত্মসচেতন পৌরুষে পরিতৃপ্ত। যখন যেটা ধরেছেন তখন তাকে শেষ পর্য্যন্ত দেখে তবে নিরস্ত হয়েছেন। তাঁর প্রবৃত্তি সব সময়েই তৃপ্তি খুঁজেছে বিভিন্ন জিনিষকে নিজের দখলে আনতে, আয়ত্তের মধ্যে আনতে।

এক সময়ে গাড়ীর শখ হয়েছিল। সেইদিনকার সাক্ষ্য হিসাবে অতি প্রাচীন রোল্‌স্ রয়েস থেকে সুরু ক'রে চোখ-ঝলসান হিস্‌পানো সুইজা পর্য্যন্ত এগারটি দুষ্প্রাপ্য গাড়ী বিশেষ ভাবে তৈরী একটি গারাজে সংরক্ষিত আছে। কখনও জয়পুরী গহনা, কখনও ভারতীয় মৃৎ-শিল্পের নিদর্শন, কখনও বা ইস্পাতের তৈরী অস্ত্র শস্ত্র—বিভিন্ন জিনিষের চূড়ান্ত এক-একটি সংগ্রহ তৈরী করা

তাঁর জীবনে এক-একটি অধ্যায়ের মত এসেছে আর তাঁর উদয়গিরির ঘরে ঘরে, সিঁড়ির পাশে, বারান্দায় পলিমাটির মতন তাঁদের অমূল্য নিদর্শন রেখে গিয়েছে। একটি কাজ তিনি কখনও করেন নি, অন্ততঃ তাঁর অন্তরঙ্গরা সেই কথাই বলেন। অন্যান্য অনেক বড়লোকের অনুসরণে, মেয়েদের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কটাকে অর্থ বা প্রতিপত্তির বিনিময়ে প্রাপ্য সামগ্রী হিসাবে সংগ্রহ করতে যান নি। শোনা যায়, কোন এক বিশেষ দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে তিনি ব'লে ফেলেছিলেন যে, তাঁর উচ্চাশা ছিল সমস্ত মেয়েদের মধ্যে অবিসংবাদী রূপে শ্রেষ্ঠ একজনকে তিনি সঙ্গিনী করে আনবেন, তার সঙ্গে ভিড় ক'রে দাঁড়াতে পারে এমন আরও কতকগুলি মেয়েকে জীবনে স্থান দিয়ে তিনি নিজেকে ভারাক্রান্ত করতে চান নি।

সুরঙ্গমা রায় যে এরকম একটি স্থান অধিকার করার উপযুক্ত, তাতে সন্দেহ নেই। তবে তিনি আজকে যা, তা যে অনেকটাই উদয়নারায়ণের জন্যে, তাতেও সন্দেহ নেই। উদয়নারায়ণের ঠিক বাহান্ন বছর বয়স, যখন তিনি তাঁর ভাবী স্ত্রীকে প্রথম দেখেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে কয়েক বছর কেটে গেছে, National Steamship কোম্পানী চালু করবার পরে প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়েছে, এখন আশা করা যেতে পারে যে, সে তার নিজের গতিতেই চলতে থাকবে। প্রচুর কর্ম্মব্যস্ততার পরে প্রায় মাস তিনেক হ'ল শুরু করেছেন বালুচরী শাড়ীর সংগ্রহটা। তাও শেষ হয়ে এসেছে। এমন একটি ভাঁটার সময়ে রসা রোডের ওপরে মহিলা কলেজের সামনে বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন একটি মেয়েকে। কলেজ ছুটির পরে তার অথবা তার সঙ্গিনীদের কারুরই বেশভূষার পারিপাট্য ছিল না, কিন্তু ঘূর্ণায়মান প্রগল্ভতার স্রোতের মাঝে এই মেয়েটি যেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট্ট দ্বীপের মতন।

উদয়নারায়ণ রোজই সেই সময়ে অফিসে যান। পরদিন প্রায় নিজের অজান্তে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন মেয়েটিকে দেখা যায় কি না। প্রথমে মনে হ'ল নেই। কিন্তু একটু পরেই দেখলেন যে, সঙ্গিনীদের সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ফটকের নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সেই দিনই বাড়ী ফিরে এসে অতি বিশ্বস্ত নগেনবাবুকে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিলেন। দু'তিন দিন বাদে মেয়েটির সমস্ত পারিবারিক খবর উদয়নারায়ণকে জানিয়ে নগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন যে তার বাবাকে নিয়ে আসবেন কি না। উদয়নারায়ণ কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে বললেন, না, আপনি কালকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করুন, তার পরে তাঁর সুবিধামত আমি যাব তাঁর কাছে। নগেন বাবু আপত্তি জানালেন, বললেন, কিন্তু আর কিছু না হোক্, ওঁরা ত একটু বিব্রত বোধ করতে পারেন আপনি ওদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লে?

তবে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে উদয়নারায়ণের জ্ঞান কারুর চাইতে কম নয়। তিনি এমন ভাবে সব অবস্থাটাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এলেন যে, নিতান্ত ঈর্ষ্যান্বিত নিন্দুকেরা ছাড়া আর কেউ কোন ত্রুটি ধরতে পারলে না। আড়ম্বর বাদ দিয়েই বিয়ে হ'ল, তবে অনুষ্ঠানের দিক্ দিয়ে কোন কিছু বাদ গেল না। কেরাণী বাবার একমাত্র মেয়ে, দেখতে ভাল ব'লে তাঁদের হয়ত ভরসা ছিল যে খুব খারাপ জামাই তাঁরা পাবেন না। কিন্তু এ রকম অভাবিত সৌভাগ্য যে তাঁদের জীবনে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত নেমে আসবে তা কি ক'রে তাঁরা ভাববেন?

উদয়নারায়ণের এক বয়সটাই বেশী হয়েছিল। তবে ঐ স্বাস্থ্য, দেখতে গতানুগতিক ভাবে ভাল না হ'লেও প্রবল পৌরুষব্যঞ্জক চেহারা—কারুর চোখেই তাঁকে মেয়ের পাশে বেমানান ব'লে মনে হয় নি। নতুন জামাই-এর দিক্ থেকে ভদ্রতায় বা অন্য কোন কিছুতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি কিছু হ'ল না। অমায়িক নগেনবাবুর মাধ্যমে, সামাজিকতার সব দুরূহ বেড়া সবাই যেন অবলীলাক্রমে ডিঙ্গিয়ে চ'লে গেলেন। বিয়ের পরে তিন মাসের মধ্যে মেয়ের বাবার পৈত্রিক বাড়ী সুন্দর ক'রে মেরামত হয়ে গেল, প্রৌঢ় দম্পতি সেখানে অপ্রত্যাশিত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দিন কাটাতে কাটাতে দু'শো মাইল দূরে কলকাতায় মেয়ে-জামাইএর উদ্দেশ্যে প্রচুর আশীর্ব্বাদ জানাতে লাগলেন, মনে মনে এবং চিঠিপত্রে।

বিয়ের আগে মেয়ের নাম ছিল অলকা। কিন্তু উদয়নারায়ণ তা পাল্টিয়ে রাখলেন সুরঙ্গমা। বললেন, তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নামটা মানাচ্ছিল না। আসলে সেই বাস্ ষ্ট্যাণ্ডে দেখা তরুণীটির সঙ্গে সুরঙ্গমা রায়ের মিল কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। জহুরীর চোখে উদয়নারায়ণ তার মধ্যে কি দেখেছিলেন তা আজকে জানা নেই, তবে অন্যদের কাছে অদৃশ্য অথচ তাঁর কাছে দৃশ্য যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তিনি তাঁর স্ত্রীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা ক'রে এসেছেন, তার পরিচয় আজকের সুরঙ্গমা রায়ের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি উচ্চারণে পাওয়া যাবে। সুন্দরী অনেকেই হয়, গানও ভাল গাইতে পারেন

আমাদের দেশের অনেক সুন্দরী মহিলা। কিন্তু বেশ-ভূষায়, কথা বলতে, মানুষের সঙ্গে নিজের দূরত্ব বজায় রেখে মন কেড়ে নিতে সুরঙ্গমার অসাধারণত্ব মহিমময়ী নারীত্বের এক চরম বিকাশ।

উদয়নারায়ণ সকলের কাছে যতটা সহজলভ্য—সুরঙ্গমা ঠিক ততটাই দুর্লভ। এমন কি খবরের কাগজের পাতায় মাসের মধ্যে তিন-চার বার তাঁর যে ছবি বেরোয়—বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে—তাতেও তাঁর স্বাতন্ত্র্যটুকু পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর বোধ হয় সেই জন্যেই উদয়গিরির ঘরোয়া সঙ্গীত বৈঠকগুলিতে নিমন্ত্রিত হবার জন্যে কলকাতার সব চাইতে নাক-উঁচু মানুষেরাও এত উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে থাকেন। প্রতি মাসেই প্রায় বৈঠকটি হয়। উদয়গিরির চারতলাতে মস্ত বড় চাতাল—মাঝখানে অপ্রত্যাশিত একটি ফোয়ারা—শোনা যায়, ফ্রান্সের কোন বিলাস-প্রাসাদ থেকে তাকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। বসবার আসনগুলি থেকে সুরু ক'রে আলোর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সবই উদয়নারায়ণের নিজস্ব পরিকল্পনা।

সেখানকার সেই মোহময় পরিবেশের জন্যেই হয়ত শহরে আগন্তুক কোনও বড় ওস্তাদের সঙ্গীতের সঙ্গে সুরঙ্গমা দেবীর আতিথেয়তা, কিংবা সুরঙ্গমা দেবীর গানের সঙ্গে সমজদার ওস্তাদের তন্ময়-চিত্ততা ভাগ্যবান্ অতিথিদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকত। অনেক রাত্রে তাঁরা যখন এই বিশেষ অভিজ্ঞতাটুকুর কথা ভাবতে ভাবতে নিজেদের বাড়ী ফিরতেন, উদয়নারায়ণ উচ্ছ্বসিতভাবে স্ত্রীকে বলতেন, তুমিই আমার জীবনের সবচাইতে বড় কীর্ত্তি। সুরঙ্গমা দেবী কোনও উত্তর দিতেন না। শুধু হাসতেন। উদয়নারায়ণ স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়তেন। বলতেন, লেনার্দো দা ভিঞ্চি মোনালিসার ছবি এঁকে গিয়েছেন—তুমি আমার জীবন্ত মোনালিসা। সুরঙ্গমা দেবীর হাসি ঠোঁটের কোণে আরও রহস্যময় হয়ে উঠত।

সম্প্রতিকালে উদয়নারায়ণ নতুন ক'রে প্রেমে পড়েছিলেন—মোগল আমলের চিত্রকলার সঙ্গে। তিনি নতুন ক'রে চিনছিলেন এই বিশেষ শিল্পকলাটিকে আর সারা ভারতবর্ষে খবর পাঠিয়েছিলেন অনাবিষ্কৃত অনাদৃত ছবির সন্ধানে।

ওদিকে নতুন রোলিং মিল তৈরীটাও উদয়নারায়ণকে ব্যস্ত রাখছিল। স্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত তাঁর কম হচ্ছিল। অবশ্য সুরঙ্গমা দেবীর তাতে কোনও অভিযোগ ছিল না। তুচ্ছতম জিনিষটিও তিনি চাইবার আগেই পেয়ে যান, সঙ্গীতসাধনায় কেটে যায় দিনের অনেকটা সময়। কেবল যখন গ্র্যানাইটের স্তূপের মতন মস্ত বাড়ীটার মধ্যে অবসর সময়টুকু নিটোল নিঃসঙ্গতার চাপে অসহ্য মনে হ'ত, তখন তাঁর সেই হাসিটা আরও রহস্যময় হয়ে উঠত। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে অক্লান্তকর্ম্মা উদয়নারায়ণের মনে নেশা ধরার মতন হ'ত। বারবার বলতেন, তোমার চাইতে মহার্ঘ্য কোন কিছু আমার ব'লে পাই নি। তোমার কোনও কিছু আমার অজানা নয়, তুমি আমারই প্রিয় শিষ্যা, কিন্তু তুমি অতুলনীয়া।

সেদিন দুপুরে খেতে এসে উদয়নারায়ণ বললেন, সুরঙ্গমা, আজ বিকেলে আমি দিল্লী যাব, মোহনলাল ট্রাঙ্ক্‌কল করেছিল, কয়েকটা মূল্যবান্ কিউরিয়ো পেয়েছে, আজই দেখে দাম বলা দরকার, নইলে যে আমেরিকান ক্রেতা ব'সে আছে, ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। আমি কাল সকালের flight-এই চ'লে আসবার চেষ্টা করব। সুরঙ্গমা বললেন, বেশ ত। উদয়নারায়ণ একটু কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় যে সেই নতুন অভিনয়টা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল 'শীষমহলে'? সুরঙ্গমা বললেন, তাতে কি হয়েছে, পরে দেখব। উদয়নারায়ণ বললেন, না, তা কেন? তুমি বরং প্রতাপকে নিয়ে যাও—ও ত তোমাকে বেশ খুশী রাখে দেখেছি। সেই ভাল কথা, কেমন? সুরঙ্গমা উত্তর দিলেন না।

পরদিন এগারোটা নাগাদ উদয়নারায়ণ যখন ফিরলেন তখন সুরঙ্গমা ব্রেকফাষ্ট করছেন। উদয়নারায়ণ বললেন, আজ এত দেরি কেন? ঘুম থেকে উঠতে বুঝি দেরি হয়েছে? সুরঙ্গমা বললেন, হ্যাঁ, কাল বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। উদয়নারায়ণ তৃপ্ত ভাবে কফির পেয়ালাটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, কাল কি যে জোগাড় করেছি দেখলে তুমি ভারী খুশী হবে—এতদিনে আমার miniature collectionটা জাতে উঠল। আসুক্ ওগুলো, ওদের অনারে জমিয়ে পার্টি দেব একটা। কিন্তু এখন বল, কাল অভিনয় কেমন দেখলে। সুরঙ্গমা বললেন, কেমন আর? সেই একই রকম, মামুলী। উদয়নারায়ণ অন্যমনস্কভাবে বললেন, তোমাকে কি রকম বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে আজকে। ব'লে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে প্রথম পাতাতে চোখ বোলাতে গিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, গত সন্ধ্যায় প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে শীষমহল রঙ্গমঞ্চটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। অস্ফুট শব্দ ক'রে সুরঙ্গমার মুখের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, তিনি জানলা দিয়ে বাইরের রৌদ্রস্নাতা প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি মেলে রয়েছেন—মুখের হাসিটুকু অপার্থিব, রহস্যময়!

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকীতে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ যেন একটি রাজহংস। আনন্দের সাগরে ভাসমান রাজহংসকে স্পর্শ করতে পারে না দুঃখ-সুখ, লাভ-ক্ষতি, জয়পরাজয় কোন-কিছুই। জগন্মাতার পদপ্রান্তে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে শান্ত বালকটির মত তিনি ব'সে আছেন চুপ্‌চাপ। মা ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না, আর কিছুই তিনি কামনা করেন না। আনন্দময়ীর কোলে ব'সে আছেন রামকৃষ্ণ—একটি আনন্দময় চিরশিশু। ঈশ্বরীয় আনন্দের অমৃত পান ক'রে রামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হয়ে আছেন। পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিতে তিনি সদাহাস্যময়।

রামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্যটি কিন্তু উড্ডীয়মান ঈগলের প্রসারিত দু'টি জোরালো ডানার কথাই মনে করিয়ে দেয়। মহাবীর্য্যের তিনি জীবন্ত প্রতীক। ক্ষাত্রতেজে বহ্নিশিখার মতই তিনি জ্বলছেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে রণতূর্য্য। দামামা বাজিয়ে তিনি আহ্বান করছেন তাঁর স্বদেশকে দিগন্তজোড়া অজ্ঞানের অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, সমস্ত ক্লীবতা এবং তামসিকতাকে পরিহার ক'রে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে, আত্মকেন্দ্রিকতার আদিম মহাপাপকে পদদলিত ক'রে আর্ত্ত-মানবতার সেবায় আগিয়ে আসতে, পরানুকরণের দাসসুলভ মনোভাবকে ধুলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারতের নিজস্ব সভ্যতায় এবং সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবান হ'তে। বিবেকানন্দ যেন বজ্রপাণি পুরন্দর। বেদান্তের অগ্নিগর্ভ বাণীর অশনিপাতে জাতির যুগযুগসঞ্চিত অবসাদভার চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিচ্ছেন, আত্মঅবিশ্বাসের বিষবৃক্ষকে পুড়িয়ে অঙ্গার ক'রে ফেলছেন। বিবেকানন্দের ভাষায় বারুদের গন্ধ, রসনায় কঠিন নির্ম্মল সত্যের খরখড়্গের দীপ্তি। রামকৃষ্ণের এই ক্ষত্রিয় শিষ্যটি সম্পর্কে ফরাসী মনীষী রলাঁ (Romain Rolland) ঠিকই মন্তব্য করেছেন:

He was energy personified, and action was his message to men.

গুরুদেব সম্পর্কে নিবেদিতার সেই চমৎকার মন্তব্যটি:

How often did the habit of the monk seem to slip away from him, and the armour of the warrior stand revealed!

'সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন তাঁর অঙ্গ থেকে খ'সে পড়ত বারম্বার; দেখা যেত, গৈরিকের নীচে যোদ্ধার বর্ম্ম!'

বিবেকানন্দ ঝড়কে এনেছিলেন সাথী ক'রে। তাঁর জীবনের আকাশে ঝোড়ো মেঘদের আনাগোনার বিরাম ছিল না। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও আনন্দ-লোকের নির্ম্মল নীলিমা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু জগজ্জননীর পদপ্রান্তে রামকৃষ্ণ যে একটি অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগ করতেন সেই শান্তি বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল না। নির্দ্বন্দ্ব তিনি ছিলেন না। শেলীর স্কাইলার্কের মত পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে সেই জ্যোতির্লোকের অসীমে তিনি উধাও হ'তে পারেন নি। তিনি যেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক। একদিকে ধরণীর মৃত্তিকা তাঁকে আকর্ষণ করছে, আর একদিকে চিরনীল মহাকাশ তাঁকে ডাকছে। রলাঁ ঠিকই লিখেছেন, Battle and life for him was synonymous. তাঁর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আত্মায় সংগ্রামের অন্ত ছিল না। বর্ত্তমান আর অতীত, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য, ধ্যান এবং কর্ম্ম—কাকে তিনি পশ্চাতে রাখবেন এবং কাকেই বা আসন দেবেন পুরোভাগে?

"সাইক্লোনিক" সন্ন্যাসী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের একখানি পত্রে লিখছেন জনৈক আমেরিকানকে:

"How I should like to become dumb for some years, and not talk at all! I was not made for these worldly fights and struggles. I am naturally dreamy and slothful. I am a born idealist, and can only live in a world of dreams. The touch of material things disturbs my visions and makes me unhappy."

"কয়েকটা বছর আমি যদি একদম চুপচাপ থাকতে পারতাম! এই সব জাগতিক সংগ্রামের জন্যে তৈরী হই নি আমি। আমি স্বভাবতই কর্ম্মকে এড়িয়ে চলতে চাই, ধ্যানের দিকেই আমার স্বাভাবিক ঝোঁক। জন্ম থেকেই আমি আদর্শবাদী, ধ্যানের জগতে বাস করতেই আমার ভাল লাগে। যা পার্থিব তার সংস্পর্শ আমার ধ্যানকে বিচলিত করে, আমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু, হে প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্‌।"

নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুবে থাকবেন—এই ত ছিল তাঁর স্বপ্ন। ঈশ্বরের সন্ধানেই ত তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পূজারী ব্রাহ্মণটির কাছে ছুটে এসেছিলেন। ধন ক্ষণস্থায়ী, রূপ ক্ষণস্থায়ী, জীবন ক্ষণিকের, যৌবনই বা কদিনের? ঈশ্বর শাশ্বত, ভক্তি চিরকালের। পৃথিবীর বিবেকানন্দেরা সুখ-সম্পদ-মায়া-মমতার বন্ধনে বাঁধা পড়তে পারেন? অবতার পুরুষ যাঁর আত্মাকে নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন পরম আদরে, তিনি দিব্যরত্ন বর্জ্জন ক'রে কাজ নিয়ে কেমন ক'রে পরিতৃপ্ত থাকবেন? স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে তাই দেখতে পাই একখানি চিঠিতে রয়েছে:

What, seekest thou the pleasures of the world?—He is the fountain of all bliss. Seek for the highest, aim at the highest and you shall reach the highest.

"কি, জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা কর তুমি? তিনিই সমস্ত আনন্দের উৎস। যিনি সকলকে অতিক্রম ক'রে আছেন তাঁরই সন্ধানে ব্রতী হও, তোমার লক্ষ্য হোক সেই পরম পুরুষ আর তাঁকে তুমি নিশ্চয়ই লাভ করবে।" ঐ চিঠিতেই রয়েছে,

Wealth goes, beauty vanishes, life flies, powers fly,—but the Lord abideth for ever, love abideth for ever.

ছেলেবেলা থেকে নরেন্দ্রের মন ঈশ্বরেতে। গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়—সে ত ঈশ্বরের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে চরম দারিদ্র্যের অন্ধকারেও নরেন্দ্রনাথ নিজের ঐহিকসুখ প্রার্থনা করতে পারলেন না; বললেন, 'মা! আমায় বিবেকবৈরাগ্য দাও।' এ হেন বিবেকানন্দের মর্ম্মের গভীরতম আকূতি ছিল, ঈশ্বরের পদপ্রান্তে নিঃসঙ্গ মুক্ত জীবনযাপন করবেন, ডুবে থাকবেন ঈশ্বরীয় আনন্দের অমৃতসাগরের মধ্যে। তাই ত চিকাগোর ধর্ম্মসভায় সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর হিন্দুসন্ন্যাসীর জয়ধ্বনি যখন আমেরিকানদের কণ্ঠে কণ্ঠে তখন গৌরবের সেই তরঙ্গচূড়ায় স্বামীজী কাঁদছেন—আনন্দের আতিশয্যে নয়, দুঃখে। নির্জ্জনে সচ্চিদানন্দের ধ্যানের মধ্যে ডুবে থাকবেন, সংসারের অরণ্যে বন্যকুঞ্জরের মত অপার মুক্তির সন্ধানে একা একা ঘুরে বেড়াবেন—হায়, সেই মুক্ত-জীবনের স্বপ্ন ইহজীবনে আর বুঝি ফলবান হবার নয়! অজ্ঞাতবাসের পালা ফুরিয়ে গিয়ে এখন থেকে সুরু হ'ল রণপর্ব্ব। এখন থেকে শুধু কাজ আর কাজ, জনসভার পর জনসভায় বক্তৃতার পর বক্তৃতা, বাধার পর বাধার সঙ্গে সংগ্রামের পর সংগ্রাম! র'লাঁ লিখেছেন স্বামীজীর জীবনীতে:

What did he think of his victory? He wept over it. The wandering monk saw that his free solitary life with God was at an end.

এত বড় জয়! কিন্তু স্বামীজীর মনোভাব কি? জয়ে তিনি কাঁদলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর নির্জ্জনে মুক্ত জীবন যাপনের পালা শেষ হয়ে গেল!

কিন্তু পরিব্রাজকের অজ্ঞাতবাসের পালায় ছেদ পড়ল—সে ত সন্ন্যাসীর নিজেরই ইচ্ছায়। জীবনের ভীষ্মপর্ব্বের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে তিনি গাণ্ডীবধন্বার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কারও উপরোধে অনুরোধে নয়; রামকৃষ্ণের উদার যুগবাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে, বেদান্তের অমৃতবাণী জগতকে শোনাতে, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মিলনের স্বর্ণ-সেতু রচনা করতে। কিন্তু আরও একটা জরুরী প্রয়োজনে বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের দুঃখমোচনের প্রয়োজনে। আমেরিকা ধনকুবেরদের দেশ আর ভারতবর্ষের জন-সাধারণ দুঃসহ দারিদ্র্যে জীবন্মৃত। ডলারের দেশ থেকে সাহায্য সংগ্রহ ক'রে এনে মৃতকল্প স্বদেশবাসীগণকে নবজীবনের মধ্যে বাঁচানোর প্রেরণাও স্বামীজীকে আমেরিকায় যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বিবেকানন্দের মত মহামানবেরা মগজের মধ্যে শুধু জ্ঞানের সম্পদ্ নিয়ে আসেন না; তাঁদের সংবেদনশীল হৃদয়ে আর্ত্তমানবতার জন্যে অপরিসীম করুণা নিয়ে আসেন তাঁরা। জ্ঞানের আর করুণারই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল বিবেকানন্দের জীবনে। বুদ্ধি তাঁর খুবই স্বচ্ছ ছিল। অন্ধ ভাবাবেগ তাঁর প্রজ্ঞার নির্ম্মলদীপ্তিকে কোন সময়েই আবিল করতে পারত না। আর অনাবিল জ্ঞানের শুভ্র আলোয় তিনি পরিষ্কার দেখতেন; জগতের দুঃখমোচনের জন্যে আমরা যা করি তার কোন মূল্য নেই। কর্ম্মযোগের মধ্যে তিনি বলছেন:

In the presence of an ever active providence who notes even the sparrow's fall, how can man attach any importance to his own work? Will it not be a blasphemy to do so when we know that He is taking care of the minutest things in the world? We have

only to stand in awe and reverence before Him saying, "Thy will be done."

"জগতের যিনি প্রভু, যাঁর সদাজাগ্রত চক্ষু সবকিছুই দেখছে, ক্ষুদ্র চড়াই পাখীটির পতন পর্য্যন্ত দেখছে, যাঁর কাজের মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম নেই তাঁর সামনে মানুষ নিজের কাজকে কেমন ক'রে মূল্য দিতে পারে? জগতের সামান্যতম বস্তুর পিছনেও যাঁর পরিচর্য্যা রয়েছে তাঁর কাছে নিজের কাজকে গুরুত্ব দেওয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ। আমরা সসম্ভ্রমে তাঁর সম্মুখে শুধু বলতে পারি 'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

জগতের কোন স্থায়ী উপকার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব—একথা বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না। কর্ম্মযোগে বলছেন:

No permanent or everlasting good can be done to the world; if it could be done, the world would not be this world.

জগতের চিরস্থায়ী ভাল করা সম্ভব নয়; সম্ভব হ'লে পৃথিবী আর এই পৃথিবী থাকত না।

যে গুরুদেবের পদপ্রান্তে ব'সে নরেন্দ্রনাথের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা তিনি ত বারম্বার এই কথাই বলতেন, 'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।' তাঁর সব জোরটা ছিল ঈশ্বর লাভের উপরে। জগতের উপকার হবে ব'লে তিনি ত জগন্মাতার কাছে কতকগুলো পুকুর, রাস্তাঘাট, ডিস্‌পেন্সারি, হাসপাতাল কামনা করেন নি, তিনি কামনা করেছিলেন মায়ের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি। তাই ব'লে জগতের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হবে—এমন কথাও ঠাকুর বলেন নি। কথামৃতের মধ্যে আছে:

"তবে দয়ার কাজ—দানাদি কাজ—কি কিছু করবে না? তা নয়। সামনে দুঃখকষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়া উচিত।"

এ হেন রামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দ ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কেবল জগতের উপকার করবার জন্যে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকবেন—এরকম একটা সিদ্ধান্তে বুদ্ধি সায় দেয় না। হৃদয়ের মাঝে দৈববাণীর মত সর্ব্বদাই তিনি শুনতে পেতেন: "ত্যাগ কর, ত্যাগ কর সব। ঈশ্বরীয় আনন্দের মধ্যে ডুবে থাক।" জগতের উপকার তুমি কি করবে? কত ঈশা বুদ্ধ মহম্মদ এলেন! কত হিতকথা পৃথিবীকে শোনালেন তাঁরা। কুকুরের বাঁকা লেজ কি অণুমাত্র সোজা হয়েছে? 'সেই যেখানে জগত ছিল এককালে সেইখানে আছে বসিয়া।'

কিন্তু ভারতবর্ষের ঐ লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট অর্দ্ধ-উলঙ্গ চলন্ত নরকঙ্কালগুলি যে তাঁর ভাই! তাদের দুঃসহ দারিদ্র্যের জ্বলন্ত জতুগৃহের মধ্যে রেখে দিয়ে তাঁর শান্তি কোথায়, মুক্তি কোথায়? ধর্ম্ম কোথায়? রক্তের প্রতিটি কণা দিয়ে তিনি যে, অনুভব করেছেন তাদের অসহনীয় দৈন্যের যাতনাকে! সেই প্রেমের অনুভূতি এমনই সুতীব্র ছিল যে আমেরিকান ধনীদের গৃহে অত আরামের মধ্যেও রাত্রে তিনি ঘুমাতে পারতেন না। সমুদ্রপারে তাঁর দুঃখিনী জন্মভূমির ক্রোড়ে অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে যারা ডুবে আছে, দারিদ্র্য যাদের জীবন্মৃত ক'রে রেখেছে তাদের মৃতম্লান মুখগুলির কথা বারম্বার তাঁর মনে পড়ত আর তিনি মেঝেতে শুয়ে ছট্‌ফট্ করতেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত অস্ফুট আর্ত্তনাদ। তাঁর হৃদয়ের কাছে আর্ত্তমানবতার আবেদন ছিল দুর্ব্বার। তাঁর স্বদেশের ভাগ্যহত নরনারীদের কান্না থামানোর জন্যে সহস্রবার তাঁকে যদি জন্মগ্রহণ করতে হয় তাতেও বিবেকানন্দ প্রস্তুত। নিবেদিতা ঠিকই লিখেছেন,

Our Master has come and he has gone, and in the priceless memory he has left with us who knew him, there is no other thing so great, as this his love of man.—(*The Master As I Saw Him*).

"আমাদের গুরুদেব এসেছিলেন, চ'লে গেছেন। তিনি যে অমূল্য স্মৃতি রেখে গেছেন তার মধ্যে অনুপম হয়ে আছে তাঁর এই মানবপ্রীতি"।

বিবেকানন্দের জীবন সত্যই একটা অন্তহীন সংগ্রাম। একদিকে যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি অদ্বৈত তাঁর প্রতি অনুরাগে তিনি পাগল হয়ে আছেন। আর একদিকে যারা সকলের নীচে, সকলের পিছে বেঁচে থেকেও মরে আছে তাদের দুঃখের ভার হাল্কা করবার জন্যে তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। দু'য়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে স্বামীজী হিমসিম্ খেয়ে যেতেন। শ্যাম রাখতে গিয়ে কূল থাকে না, কূল রাখতে গিয়ে শ্যামকে হারাতে বসেন। কর্ম্মবীর বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠ গর্জ্জন ক'রে উঠছে: 'বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়েমানুষের মত ব'সে থাকা কি আমার সাজে?" গুরুভ্রাতাদের একজন কর্ম্মের উপরে স্বামীজীর এতটা গুরুত্ব আরোপকে প্রসন্ন নয়নে দেখতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ ত মানব সেবার চাইতে ঈশ্বর-প্রাপ্তিকেই বেশী মূল্য দিতেন। সেই বক্রোক্তি শুনে স্বামীজীর চোখ দু'টিতে যেন আগুন জ্বলে উঠল। শরীর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। ভাবাবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। নিজের

ঘরে পালিয়ে গেলেন তিনি। ধ্যানের মধ্যে ডুবে রইলেন অনেকক্ষণ। তরঙ্গবেগ শান্ত হ'লে কোমলকণ্ঠে স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের বললেন,

Oh, I have work to do! I am a slave of Ramakrishna, who left his work to be done by me and will not give me rest till I have finished it!

"কাজ আমাকে করতেই হবে! আমি যে রামকৃষ্ণের দাস। তাঁর অমৃত বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার ভার তিনি যে আমাকে দিয়ে গেছেন। সে কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তো আমাকে বিশ্রাম দেবেন না!"

বিবেকানন্দ যতদিন বেঁচে ছিলেন অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর গুরুদেবের কাজ ক'রে গেছেন। তাঁর কণ্ঠে ত কর্ম্মযোগেরই জয়ধ্বনি! তাঁর মন্ত্র ত বীর্য্যেরই মন্ত্র! তবু তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে স্বামীজীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাওয়া যাবে। সেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছে অন্ধকারের পারে যিনি জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষ তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার আকুতি থেকে। কবে ধনুঃশর নামিয়ে রেখে, কর্ম্মভার নব-সেবকের হাতে দিয়ে অদ্বৈতের ধ্যানে তিনি ডুবে যেতে পারবেন? রামকৃষ্ণের মতই ঈশ্বরের মাধুর্য্য-স্রোতে দিবারাত্রি ভেসে চলবেন? আমেরিকায় ক্ষিপ্ত পাদ্রীরা নিন্দার শরজালে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে। স্বদেশের শিক্ষিতসমাজ ঈর্ষায় অন্ধ হ'য়ে তাঁকে আঘাত হান্‌ছে। একটা ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করবার জন্যে বিবেকানন্দ একাকী লড়াই ক'রে চলেছেন পর্ব্বত প্রমাণ তামসিকতার বিরুদ্ধে। রণক্লান্ত ঈগলের ডানা-দুটি হিমালয়ের শান্ত শীতল ক্রোড়ে বিশ্রামের জন্যে মাঝে মাঝে উন্মুখ হয়ে উঠতো। ঈগলের ইচ্ছা করতো, গুরু-দেবের মতো শুভ্র রাজহংসটি হ'য়ে তিনি যদি শান্তছন্দে সচ্চিদানন্দ সাগরে ভেসে বেড়াতে পারতেন।

অদ্বৈত আর আর্ত্ত মানবতা—দুয়েরই সমান আকর্ষণ ছিল বিবেকানন্দের কাছে। রলাঁ ঠিকই লিখেছেন:

He never could satisfy the one without partially denying the other.

তবুও আশ্চর্য্য হ'তে হয় তাঁর ক্ষমতা দেখে। আপাতবিরোধী সুরগুলিকে তিনি মেলাতে পেরেছিলেন একটি অপূর্ব্ব 'সিম্‌ফনি'র মধ্যে। আবার রলাঁর ভাষাতেই বলি,

It was wonderful that he kept in his feverish hands to the end the equal balance between the two poles: a burning love of the Absolute (the Advaita) and the irresistible appeal of suffering Humanity.

দু'য়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যখন একান্ত অসম্ভব হয়েছে তখন করুণার কাছে বিবেকানন্দ সমস্ত কিছু বলি দিয়েছেন। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের গৈরিকের নীচে একটি বিরাট প্রাণকে আমরা আবিষ্কার করি। সেই প্রাণের দিব্য মহিমার কাছে মাথা নীচু না করে উপায় কি?

বরযাত্রী

শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

বিয়েবাড়ীতে একটি মাত্র লোককে ঘিরেই যত রোশনাই, যত আনন্দোৎসব, যত আলো আর শঙ্খধ্বনি। যত লোক আসে বিয়েবাড়ীতে সবাই দেখে সেই একটা লোককে। কেননা সে বর অর্থে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বরকে না দেখে আসে বরযাত্রীদের দেখতে এমন বিয়েবাড়ীর ঘটনা নিশ্চয়ই তোমরা জান না।

আমি এ রকম একটা ঘটনার কথা জানি যেখানে বিয়েবাড়ীর সব লোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বরযাত্রীদের দেখার জন্য।

—কি ব্যাপার?

—তাই নাকি?

রমেনের মুখ থেকে কথা ক'টা বেরুবা-মাত্র বন্ধুর দল ছেঁকে ধরল ওকে। এমন-কি সদ্যবিবাহিত চারুব্রতর নববধূ পর্যন্ত উৎসুক হ'য়ে উঠেছে এ গল্প শুনতে তা তার মুখের দিকে চেয়েই রমেন বুঝে ফেলল এক নিমিষে।

রমেন চিরকালই জমাটে গল্প বলায় ওস্তাদ। বাইরে যখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে তখন চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে ভূতের গল্প এমন চমৎকার বলতে পারে যে, শ্রোতারা গল্পের আসর ভাঙার পর সঙ্গী-ছাড়া বাড়ী যেতেই পারে না। যদি বাঘের নাম কেউ কোনরকমে উচ্চারণ করে তবে সুরু হবে বাঘের গল্প এবং সে রাত্রে আলো-ছাড়া কেউ বাড়ী যাবে না এবং আলো না পেলে বন্ধুর বাড়ীতেই রাত কাটাবে এমন ঘটনাও ঘটেছে।

শৈলেশ রমেনকে এতখানি প্রাধান্য দিতে রাজী নয়। সে বলে, টোপর মাথায় দেওয়া আর চন্দনতিলকে সাজা বরকে ছেড়ে মেয়েরাও বরযাত্রীদের দেখবার জন্য ভীড় করেছিল?

—হাঁ। ভীড়টা মেয়েদেরই ছিল বেশী। আর সেই কারণেই এ গল্প শোনাবার মত।

শৈলেশ এই জবাবের পরও খুশী নয়। কিন্তু মুখ বুঁজে রইল। অন্যেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল গল্প শুনতে রমেনকে ঘিরে।

—আর ভূমিকা নয়! গল্প সুরু কর রমেন। চারুব্রতর তাড়া।

গ্রামে আমাদের পাশের বাড়ীর ছেলের বিয়ে। আমরা সব বরযাত্রী। বাইশ জনের মত আমরা বরযাত্রী, আমরা ধোপদুরস্ত ভাল জামাকাপড় প'রে যাত্রা করলাম বিয়েবাড়ীর উদ্দেশ্যে। বাড়ী থেকে ষ্টেশন মাইল-দুয়েক। সেখান থেকে ট্রেন ধরতে হবে।

গাঁয়ের ছেলে, হেঁটেই পৌছালাম ষ্টেশনে। যথারীতি ট্রেন ধ'রে নামলাম কাটোয়া—আমোদপুর ন্যারো গেজের ছোট লাইনের এক জনবিরল ছোট্ট ষ্টেশনে। চারদিকে ধূ ধূ করে মাঠ। জনবসতির কোথাও চিহ্ন পাওয়া যায় না! দৃষ্টিশক্তি প্রখর হ'লে অনেক অনেক দূরে হিল্ হিল্ করা গ্রামের অস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। সে গ্রাম হয়ত বেশ কয়েক মাইল দূরে।

আমরা নামতেই চারদিকে চেয়ে প্রায় হতাশ হ'য়ে পড়েছি কন্যাপক্ষের কোন লোকজন না দেখে। এমন সময় এক ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। সাজপোষাকে তাঁকে দেখেই বোঝা যায় তিনি বিয়ে বাড়ীর লোক।

—এই যে আসুন! আসুন! নমস্কার! আমার পৌছাতে একটু দেরী হয়ে গেল বলে কিছু মনে করবেন না। অনেক দূরের পথ ত! তা ছাড়া গরুর গাড়ীতে এলাম কি না!

—কতখানি পথ? আমিই প্রশ্ন করলাম প্রথমে।

ভদ্রলোক এবারে বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন বোঝা গেল। আগে থেকে অনেক পথ বলে যে ভুল তিনি করেছিলেন এবারে তা শুধরে নিলেন। বললেন—ঐ ত দেখা যায় গ্রাম—ঐ যে হিল্ হিল্ করে বাড়ীগুলো! তিন চারখানা মাঠ পেরুলেই গ্রাম।

তার কথামত সেদিকে চেয়ে গ্রাম দেখলাম না কোন। শুধু দেখলাম আকাশ যেন ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে দিকচক্রবালে যেখানে মাটি ছুঁয়েছে সেই অস্পষ্ট বনরেখাকে—মনে হয় যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

একথা মাত্র ছইওয়ালা গাড়ি দেখেও প্রশ্ন করলাম, কিসে যাব আমরা!

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালেন। আজ্ঞে, গাড়ি পাওয়া যায় নি, তাই কষ্ট ক'রে আপনাদের হেঁটেই যেতে হবে। পথ সামান্য! শুধু একখানি গাড়ি এসেছে বর নিয়ে যাবার জন্য।

ছোট গরুর গাড়িতে বর আর বাচ্চা তিন-চারজনেই ভর্তি। আমাদের অনুমতি নিয়ে ভদ্রলোক বর নিয়ে গাড়ির সঙ্গে রওনা দিলেন। আমরা শুরু করলাম হাঁটতে। সঙ্গে আমাদের কন্যাপক্ষের কেউ নেই। বরের ভাই বিষ্টু পথ চেনে। অতএব সেই পথপ্রদর্শক।

গল্প করতে করতে হাঁটছি আলের ওপর দিয়ে। কখনও পথ জমির মধ্য দিয়ে, কখনও আলের উপর দিয়ে। চারদিক শূন্য—বিরাট্ শূন্য। কোথাও হঠাৎ একটা পুকুর, তার পাড়ে দু'-চারটে তালগাছ।

হাঁটছি ত হাঁটছিই। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যাচ্ছি। গ্রামের কোন চিহ্ন নেই। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি আকাশের দিকে। আকাশ অন্ধকার ক'রে হঠাৎ নামল বৃষ্টি। একেবারে মুষলধারে, কোথাও দাঁড়াবার নেই আশ্রয়। এমন-কি একটা গাছও নয়। বাইশজন বরযাত্রী বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলেছি বিয়েবাড়ীর উদ্দেশ্যে। এত জোরে বৃষ্টি যে আগের লোককে দেখাই যায় না। তবু চলেছি মাঠের মধ্য দিয়ে। লোকালয় ত দূরের কথা একটা মানুষ পর্যন্ত চোখে পড়ে না। এমন বিব্রত অবস্থা যে, কেউ কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারছি না।

এতক্ষণ তবু চলছিলাম। এবারে আর চলা যায় না। আঠাল মাটি পিছল হয়েছে দারুণ; এর ওপর জলের ঝাপ্টা। পা টিপে টিপে চলেছি কাঁপতে কাঁপতে। শীতে দাঁতে দাঁত লেগে যাবার যোগাড়। উপায় নেই। থামলে আর চলা যাবে না। থাকবই বা কোথায়! মিছামিছি দেরি করেও লাভ নেই।

ভিজে একেবারে বেড়াল-ভেজা হ'য়ে আমরা হাজির হলাম একটা ছোট্ট নদীর পাড়ে। নদীটা পার হ'তে হবে। চওড়ায় হাত-পাঁচেক, গভীরতা নাকি বেশী নয়, এক-বুক কি এক-গলা জল।

—এত ছোট নদী হয় নাকি সমতলে?

শৈলেশ যেন সুযোগ পেয়ে রমেনকে বেকায়দায় ফেলতে চায়।

—ওর চেয়েও ছোট নদী আছে ব'লে শুনেছি!

—রমেন তুমি চালিয়ে যাও! শৈলেশের কথা শোনার দরকার নেই।

ন'ড়ে-চ'ড়ে সবাই আবার ঠিক হয়ে বসেছে।

বৃষ্টিটা তখন ধ'রে এসেছে অনেকটা। এবারে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি অনেকক্ষণ পরে। কথা বলব কি কাঁপুনি থামে নি তখনও। পণ্ডিতমশায় বুড়ো মানুষ। তাঁকে ধ'রে নিয়ে আসছে একজন। দু'জন এর মধ্যেই আছাড় খেয়েছে পিছল মাটিতে। জামা-কাপড়ে কাদার দাগ। বৃষ্টির ছাটে অনেকটা ধুয়ে গেলেও কাদার দাগ সম্পূর্ণ মোছে নি। বরের ভাই বিষ্টু এবারে এগিয়ে এসে আশ্বাস দেয়—এসে গিয়েছি আর! নদীটা পার হ'লেই গ্রাম।

—কই কোথায়? দেখা যাচ্ছে না ত?

—বৃষ্টির জন্য ভাল দেখা যাচ্ছে না। নদী পার হলেই দেখা যাবে গ্রাম। বিষ্টুর পুনরায় আশ্বাসবাণী।

—কতখানি জল হবে!

—বেশী নয়।

আমি বললাম, কম বেশী যাই হোক্ তুমি আগে নেমে পড় বিষ্টু!

বিষ্টু আমাদের এই দুর্দশায় লজ্জিত আর ব্যথিত। সে কথাটি না ব'লে পার হয়ে গেল। মনে হ'ল একটু সাঁতার দিয়েই পার হয়ে গেল নদী।

ওপারে গিয়ে সে বলল—এখানটায় জল একটু বেশী। আপনারা বাঁদিক্ দিয়ে চ'লে আসুন। হেঁটেই পার হ'তে পারবেন।

—তুমি ত বেশ সাঁতরে গেলে! আমরা পার হব কি ক'রে?

—ভয় নেই, চ'লে আসুন! সাঁতার না-জানা কেউ নেই ত?

আমরা সবাই প্রস্তুত হলাম ভবনদী পার হবার জন্য। বেঁকে দাঁড়ালেন পণ্ডিতমশাই। মোটা ছোটখাটো মানুষটি নদী পার হ'তে চাইলেন না। এর ওপর বয়স হয়েছে অনেক।

প্রমাদ গণলাম আমরা। কি হবে! নদী পার হওয়া ছাড়া বিয়েবাড়ীতে পৌঁছাবার আর যে উপায় আছে তা হচ্ছে দু'মাইল পথ ঘুরে নদীকে এড়িয়ে যেতে হবে, যে পথে বর গিয়েছে গরুর গাড়ি চেপে। অতএব। সকলেই চিন্তিত।

আমাদের চিন্তা দূর করতে এগিয়ে এলেন মাষ্টার-মশাই! একই স্কুলে একজন পণ্ডিত আর একজন মাষ্টার।

—ভয় নেই পণ্ডিতমশাই! আমি আপনাকে পার ক'রে দেব।

পণ্ডিতমশায়ের কাঁপুনি থামে নি তখনও। কাঁপা গলাতেই প্রতিবাদ জানালেন, না বাবা! তুমি পারবে না।

—পারব পণ্ডিতমশাই, ভয় পাবেন না। আপনি আমার কাঁধে চাপুন। আমি নির্বিবাদে আপনাকে পাড়ে নিয়ে যাব।

না, না ক'রেও রাজী হ'তেই হ'ল পণ্ডিতমশায়কে। শুভক্ষণে দুর্গানাম স্মরণ করে পণ্ডিতমশায় মাষ্টারমশাইয়ের কাঁধে চেপে বসলেন। আমরা একে একে আগেই পার হয়েছি অনেকেই। মাষ্টারমশাই পা টিপে টিপে জলে নামলেন কাঁধে পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে। এক পা, দু'পা ক'রে কিছুটা নামতেই পা পিছলে একেবারে দু'জনেই জলের নীচে। আমরা যারা পাড়ে দাঁড়িয়ে ঝপাং ক'রে একটা বিরাট্ শব্দ শোনার পর চেয়ে দেখি কাউকে দেখা যায় না। দু'জনেই তলিয়ে গিয়েছেন। জলের ওপর মানুষের বদলে শুধু ঘোলা জলের বিরাট্ ঘুর্ণি তোলপাড় করছে। নীচের থেকে জল পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে ওপরে। মাঝে মাঝে দু-চারটে বুদবুদ। বন্যার সময় নদীর পাড় ভেঙে পড়লে যেমন বিকট্ শব্দ তুলে চারপাশের জলকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে, ঠিক তেমনি!

আমরা সেকেণ্ড কয়েকের জন্য হতভম্ব হয়ে আছি দাঁড়িয়ে। প্রায় মিনিট খানেক কেটে যাওয়ার পরও কেউ উঠছেন না। সাড়া নেই দেখে বুঝলাম দু'মণ ওজনের পণ্ডিতমশাই পড়েছেন দু'মণ মাষ্টারমশায়ের ওপরে। কাৎ হয়ে দু'জনে এমনভাবে পড়েছেন এবং পণ্ডিতমশায় মাষ্টারমশায়কে এমনভাবে চাপা দিয়েছেন যে, মাষ্টারমশায়েরও আর ওঠার ক্ষমতা নেই। তিনি ছট্‌ফট্ করছেন পণ্ডিতমশায়ের বিরাট্ বপুকে সরিয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাস নেবার জন্যে। পণ্ডিতমশায়ও তাই। জলের নীচে দু'জনের জড়াজড়ি ক'রে কুস্তির ফলে নীচের জল প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ওপরে উঠছে বিরাট্ আলোড়ন তুলে।

—দেখছ কি! নেমে পড় জলে! ম'রে গেল যে! ওদের তোল আগে।

কে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে সভয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিন-চারজন জোয়ান ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি ততক্ষণে জলে। অতি কষ্টে চার-পাঁচ জনে তাদের দু'জনকেই টেনে তুলে এনেছি ডাঙ্গায়। যা আন্দাজ করেছিলাম তাই। কাৎ হয়ে পড়েছেন একজন অন্যের ওপরে জড়াজড়ি ক'রে।

মাষ্টারমশায়ের জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। পণ্ডিতমশায় হাঁপাচ্ছেন ভীষণ। কথা বলবার ক্ষমতা থাকলেও বলতে পারছেন না। রাগের চোটে শুধু একটা কথা শোনা গেল, হারামজাদা! আবার দু'বার শ্বাস নিয়ে, মেরে ফেলে—ছিলটা বলার দম পেলেন না বোধ হয়।

মাষ্টারমশায় মরার মত প'ড়ে। পেটটা ফুলেছে যেন। মনে হয় জল খেয়েছেন অনেক। বাচ্চা ছেলে হ'লে পা ধ'রে দুটো পাক দিলেই নাক-মুখ দিয়ে সব জল বার হয়ে আসত। জল খেয়ে আড়াই মণ ওজন হয়েছে মাষ্টারমশাই-এর। তাকে ও পণ্ডিতমশাইকে জলের নীচে থেকে তুলে আনতেই আমরা পাঁচ-ছ'জন লোক হিমসিম খেয়েছি।

অতএব পেটে চাপ দিয়ে দেখব কিনা ভাবছি এমন সময় মাষ্টারমশাই উঠবার চেষ্টা করছেন নিজে নিজেই বুঝলাম। আমরা তাঁর যতটা জল খাওয়ার কথা ভাবছিলাম ততটা নয়। মিনিট দশেকের মধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছেন দু'জনেই। পণ্ডিতমশাই হাঁ ক'রে শ্বাস টানছেন আর মাঝে মাঝে 'হারামজাদা; সব্বোনাশ করেছিল আমার; মেরে ফেলেছিল আর কি!'

মাষ্টারমশাই খানিকটা বমি ক'রে জল উঠিয়ে ফেলে একটু সুস্থ হয়েছেন মনে হ'ল। আমরা যারা ওঁদের তুলে এনেছি তারাও বেশ পরিশ্রান্ত। শীত আর নেই আমাদের। বাকী যারা পাড়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল মাঝে মাঝে খুক্ খুক্ ক'রে তারাও শীত কাটিয়েছে মনে হচ্ছিল। আমরা ওদের মুখের পানে চেয়ে ব'সে আছি। ছেলে-ছোকরা দু'একজন তখনও হাসছে খুক্ খুক্ ক'রে মুখে ভিজে রুমাল চেপে।

হাসির কথা তুলতেই রমেনের শ্রোতারাও এবারে আর চাপতে পারল না তাদের হাসি। এতক্ষণ ওরাও হেসেছে মনে মনে। এবারে একেবারে প্রকাশ্যে।

—তোমরা হেসে গল্পটাকে কিন্তু এখানেই দিলে শেষ করে। গল্প কেন্তু শেষ হয় নি!

—গল্প শেষ ক'রে দিয়েছে শুনে চারুব্রতর ধমক খেয়ে সবাই চুপ। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে চারুব্রত তার নববধূকে ছোট্ট একটা চিমটি দিয়ে চুপ করতে ইসারা জানাল।

আবার নিস্তব্ধ ঘর। গল্প সুরু।

পণ্ডিতমশাই আর মাষ্টারমশাইকে দু'জনে ধ'রে নিয়ে আমরা শুরু করলাম আবার হাঁটতে। বৃষ্টি ধরে এসেছে। শুধু ফিস্ ফিস্ ক'রে জের টেনে চলেছে আগের ধারাবরিষণের। জলে ভিজে যা চেহারা হয়েছে তাতে চেনার উপায় নেই। কারও চুলের ভিতরে কাদা, কারও বা জামা কাপড়ে কাদা। এই অবস্থায় বিয়েবাড়ীর শঙ্খধ্বনি আর মেয়েদের হুলুধ্বনি আনন্দকোলাহলের মধ্যে প্রায় বরের পিছু পিছুই আমরা পৌঁছলাম বিয়েবাড়ীতে।

এ পর্যন্ত আমাদের অন্য কোন খেয়ালই ছিল না। বিয়েবাড়ীর ভিতরে আলো আর আনন্দ কলরবের মধ্যে

আমরা ভূতের মত চেহারা আর কাদামাখা ভিজে জামা-কাপড় নিয়ে দাঁড়াতেই চারপাশের চাপা ফিস্ ফিস্ শব্দে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচকিত হলাম। মনে হ'ল সুমুখে কোন আয়না না থাকলেও বিয়েবাড়ীর মানুষের মুখচোখই যেন আয়নার কাজ করছে।

উপায় নেই। কন্যাকতারা ক্রটি স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এগিয়ে এলেন হাতজোড় ক'রে।

—আপনাদের ভারী কষ্ট দিলাম আমরা; ভিজে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছেন দেখছি! ক্রটি নেবেন না!

মেয়ের বাবা এগিয়ে এসে করজোড়ে দাঁড়ালেন—কন্যাদায়গ্রস্ত আমি; আমার ক্রটিকে ক্ষমা ক'রে নেবেন দয়া করে! গরীব ব্রাহ্মণ, তাই গাড়ির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি!

অন্য একজন ভদ্রলোক সুরু করলেন এবারে—এরকম জানলে যে ভাবেই হোক্ গাড়ির ব্যবস্থা রাখতাম। আপনাদের কষ্টের সীমা নেই সত্যি!—যাই হোক্ আপনারা ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুন। আমরা শুকনো কাপড় এনে দিই!

হাজির হ'লাম বিয়ের আসরে। পণ্ডিতমশাই ছিলেন একটু পিছিয়ে। তিনি এসে পড়েই সামনেই মেয়েপক্ষকে পেয়ে তুমুল গর্জন ক'রে উঠলেন—কি রকম ভদ্রলোক মশাই? এই দুর্যোগে একটা গাড়ি পর্যন্ত পাঠান নি, নদী পার হ'তে গিয়ে হারামজাদা আমায়—পণ্ডিতমশাই কথাটা শেষ করতে না পেরে কাশতে সুরু ক'রে দিলেন।

কন্যাকর্তাদের হাতজোড় আর আমাদের অনুনয়ে পণ্ডিতমশায় থামার পর আমরা ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়ে ওঁদের দেওয়া শুকনো কাপড় প'রে এসে বসলাম বিয়ের আসরে। সমস্ত বিয়েবাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সব-কিছু ফেলে ছুটে এল বর দেখতে। কিন্তু একি! সকলের চোখে-মুখেই হাসি। তারা বর দেখছে না, দেখছে আমাদের আর হাসছে মুখ টিপে টিপে।

—কি ব্যাপার? চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের শচীনকে।

শচীন এদিক্-ওদিক চেয়ে বলে, বুঝতে পারছি না ত?

হাসিটা এতক্ষণে ছিল পুরুষ আর মেয়েদের সকলের মধ্যেই। এবারে পুরুষেরা কাজের লোক ব'লে স'রে যেতেই দেখি মেয়েরা মুখ টিপে হাসছে আর সঙ্গে সঙ্গে স'রে যাচ্ছে আমাদের সুমুখ থেকে।

বার বার এদিক্-ওদিক্ চেয়ে পিছনে দেখি মাষ্টার-মশাই সাত আট বছরের মেয়ের একটা কাপড় আর সমর একটা গামছা মত কি পরে বরের আসরে এসে হাজির। প্রায় ছ'ফুট লম্বা সমরের ভাগ্যে শেষে জুটেছে পড়বার জন্য একটা গামছা! গরীব ভদ্রলোক বাইশ জনের জন্য বাইশখানা বড় কাপড় জোগাড় করতে না পেরে এই ঘোর বর্ষার মধ্যে আমাদের গামছা পর্যন্ত দিয়েছেন লজ্জা নিবারণের জন্য।

সমরের দিকে চেয়ে ফুল দিয়ে সাজানো ঘর, গালিচা-পাতা বরাসন আর সুমুখে রঙীন প্রজাপতির মত রং-বেরঙের শাড়ীতে সেজে-আসা মেয়েদের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারলাম না। তাদের চোখেমুখে কৌতুক আর বিদ্রূপের বাঁকা হাসি, কখনও বাইরে থেকে খিল্ খিল্ শব্দে উচ্চকিত হাসি আমাদের লজ্জায় মিশিয়ে দিল মাটির সঙ্গে।

মনে মনে বললাম, মা বসুমতী দ্বিধা হও! অমন সুন্দর পাট-করা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় ভিজিয়ে শেষ পর্যন্ত গামছা প'রে বিয়ের আসরে এলাম বরযাত্রী সেজে!

রমেনের গল্প শেষ হয় নি তখনও। কিন্তু আর কে শোনে, আর কেই-ই বা বলে। আসরের সকলের চাপা হাসি ততক্ষণে ফেটে পড়ল নববধূর মুখ দিয়ে। সেও এবারে হাসি চাপতে না পেরে হেসে উঠল খিল্ খিল্ ক'রে।

—•*•—

দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ন। দিলীপকুমার রায় সংকলিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭। আট টাকা।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের সঙ্গে এখনকার পাঠকের পরিচয় প্রায়শই পাঠ্যপুস্তকের ওই বহুব্যবহৃত দু'একটি কবিতার বাইরে নয়। এই অকিঞ্চিৎকর পরিচয়ের প্রধানতম কারণ, সাম্প্রতিককালে তাঁর কাব্য-গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ অভাবে, সেগুলি পাঠকদের সংগ্রহ করা যথেষ্ট আয়াস-সাধ্য। সুতরাং কবিপুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় সংকলিত বক্ষ্যমান গ্রন্থটির মূল্য অশেষ।

The lyrics of Ind সহ দ্বিজেন্দ্রলালের আটখানি কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটি থেকে কবির প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু কিছু কবিতা ও গান সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এমন কি, কবির নাট্যকাব্যের অংশবিশেষও সংকলনে উপস্থিত করতে সংকলন-কর্তা ভোলেন নি। যার ফলে, আমার মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র কবিচরিত্রটি সংকলনের মধ্যে বিধৃত। বস্তুত, যদি বলি এ-সংকলনটির প্রকাশ উৎসাহী সাহিত্য পাঠকের কাছে একটি সংবাদ, তা হ'লে কি খুব বেশী বলা হয়?

দ্বিজেন্দ্রলাল জনচিত্তজয়ী কবি। তাঁর কবিতার অসংখ্য কলি শুধু কণ্ঠে নয়, প্রবাদ-বচনের মত আজও অনেকের মুখে মুখে ফেরে। এ-থেকে বোঝা যায় তাঁর কাব্যে জনচিত্তজয়ের সামর্থ্য কি অপরিসীম। অবশ্য এর মূলে আছে কিঞ্চিৎ নাটকীয় শব্দের অব্যর্থ সন্ধান। পরিণামে কিন্তু তারা গীতিকবিতার অন্তর্মুখী গুঞ্জন থেকে স'রে গিয়ে অনেক সময় উচ্চরোলের আসর ডেকেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্তী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। অথচ রবীন্দ্রনাথের দুর্নিবার অনুকরণ-আকর্ষণ থেকে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ মুক্ত। এবং রবীন্দ্রনাথকে দূরে সরিয়ে নিলে, তৎকালীন বাংলাকাব্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কয়েকজন প্রধান কবিদের তিনি অন্যতম হয়েও অনন্য। এ-স্বাতন্ত্র্যের উৎসে ছিল তাঁর পৌরুষদীপ্ত ও আবেগকম্পিত স্বদেশপ্রীতি আর সুস্থ সমাজচেতনা। যার সুবর্ণ ফসল তাঁর প্রাণবান দেশাত্মবোধক ও নিপুণ হাস্যরসাত্মক কবিতা-গান। সুখের বিষয় এ-গ্রন্থে তার নিদর্শন সুপ্রচুর।

তারপরই আসে তাঁর ভক্তিমূলক গীতি-কবিতা। এখানে প্রত্যাশিত নিভৃতের অনুভবচেতনা অপেক্ষা তাঁর কাব্য প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের স্বভাব-ভক্ত উচ্ছ্বাসে উদ্দাম। তাঁর প্রেমের কবিতায় আবার, 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে', এ-জাতীয় সহজ সরল অথচ অমোঘ পংক্তি কখনো-সখনো এসে গেলেও, প্রেম অথবা প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা-গানের চেষ্টাকৃত শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত গদ্যময় ও ব্যঞ্জনাহীন।

তাঁর কবিতার ভাষায় ব্যঞ্জনাশক্তির এ-অভাবকে অনেক সমালোচক 'ঠিক অভাব না ব'লে স্বভাব বলাই সঙ্গত' ব'লে উল্লেখ করেছেন। তিনি ডাইমেনশনে বিশ্বাসী না হয়ে সুস্পষ্ট বাক্-নৈপুণ্যের অনুরাগী। যদিচ শব্দের ব্যবহার ও বিন্যাসে (syntax) যে-গদ্যরীতিকে ছন্দোবদ্ধরূপে তিনি প্রবর্তন করেন, বাংলা কাব্যের মুক্তি প্রবাহে সে-কৃতিত্ব অসামান্য; তিনি ঈর্ষাযোগ্য পথিকৃৎ:

—এস বন্ধু কাছে বসো; বন্ধুভাবে তোমার কাছে,
নিতান্তই বন্ধুভাবে, আমার কিছু বলবার আছে।
বাক্যহানাহানি চক্ষুরাঙারাঙি পরিহরি',
এস একটু শান্তভাবে বন্ধুভাবে তর্ক করি।

(মদ্যপ)

বিয়ের রাতে সাহানাতে প্রথম নিশার অবসান,
যৌবনের সেই প্রথম স্বপ্নে চুম্বনের সেই সুরাপান,
জীবনকুঞ্জে হেনার গন্ধ আকুল অন্ধ বাসনায়,
—কে আছিস্ রে— আজকে আমার জীর্ণ প্রাণে নিয়ে আয়।

(প্রবাস)

ছন্দের ক্ষেত্রেও তাঁর যে সৎসাহসী সাফল্য, তা দীর্ঘদিন অবহেলিত হ'লেও, আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। বিশেষ ক'রে, স্বরবৃত্ত ছন্দের অপার শক্তি ও সম্ভাবনার যে-পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন, সে-প্রসঙ্গে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দিলীপবাবুর আলোচনাটি মূল্যবান্।

গ্রন্থে সূচীপত্রের অভাব একান্ত পীড়াদায়ক। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এ-ত্রুটি সংশোধিত হবে।

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

সামূহিক বিকাশ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এস, কে, দে প্রণীত। অনুবাদক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃঃ ৩২ + ১৯৪ থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং (১৯৩৩) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য নয় টাকা।

রাজনৈতিক মুক্তিলাভের পর দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অনুভব করিলেন যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না হইলে মুক্তি শুধু জীবনের বহিরঙ্গে থাকিয়া যাইবে। গ্রন্থকার এস, কে, দে মহাশয় স্বীয় ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দেশের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং ক্রমে সমাজ-উন্নয়ন কার্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন। ১৯৫৬ সালের শেষ ভাগ হইতে তিনি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইয়া আছেন।

দীর্ঘ কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তাঁহাকে বহুবিধ বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সমবায় ও পঞ্চায়েতী রাজ-প্রতিষ্ঠা যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ভারতবর্ষে সম্ভব হইবে না।

আমাদের দেশের শাসকবর্গের মধ্যে স্থিরভাবে চিন্তা করিবার সময়ের বড় অভাব। দ্রুত কর্মস্রোতের মধ্যে চিন্তা স্বচ্ছতা লাভ করে না। তাহা

সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত এস, কে, দে যে যথেষ্ট সময় দিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতাকে পরিপাক করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্ত লেখার মধ্য দিয়াও তাঁহার চিন্তা সুস্পষ্টতা লাভ করিয়াছে। মানব-প্রকৃতি, জীবনের ধর্ম, সমাজ উন্নয়নে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্থান, ভারতের ঐতিহ্য ও তাহার সঙ্গে নবজীবন প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক, নানা বিষয়ে বহুবিধ চিন্তার পরিচয় তিনি প্রদান করিয়াছেন।

অনুবাদক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। অনুবাদকের অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত এস, কে, দের লেখন মণ্ডলীর মধ্যে অন্তর্নিহিত দর্শনটিকে তিনি যে সুস্পষ্ট আকার প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

সমালোচকের চোখে সমগ্র লেখার মধ্যে একটি অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাহা হয়ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ সাল হইতে দেশকে নূতনভাবে গড়ার প্রয়াস করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে; দেশ বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। গ্রন্থকার তাহার কোনও স্পর্শলাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ তাঁহার অভিজ্ঞতা বা দর্শন উহার দ্বারা কোথাও সমৃদ্ধ হয় নাই। 'রামরাজ্যে'র বিষয়ে মন্তব্য তিনি করিয়াছেন। কিন্তু সে রামরাজ্য বাল্মীকির রামরাজ্যও নয়, গান্ধীজীর রামরাজ্যও নয়। তাহা দারিদ্র্য, বল্কল, গরুর গাড়ির দ্বারা রচিত। ইহলোককে প্রত্যাখ্যান করিয়া পরলোকে মুক্তিকামী। এ 'রামরাজ্য'কে অন্ততঃ গান্ধীজীর রামরাজ্যের ব্যঙ্গচিত্র বলা চলে।

এইটুকু সামান্য ত্রুটির কথা বাদ দিলে শ্রীযুক্ত এস, কে, দে স্বাধীনভাবে বর্তমান যুগের একজন দরদী চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে স্বীয় অভিজ্ঞতার যে দার্শনিক নির্য্যাস সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেশপ্রেমী সকলের ভাল লাগিবে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৭০

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৭০

কামরায় কেব্‌ল্ কখন নেই রেলের যাত্রী হিসাবে আপনি ঠিক টের পাবেন। কামরার আলো আর পাখা-গুলো তখন কাজ করে না। টাকার অঙ্কে শেষপর্যন্ত রেলওয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়, কিন্তু সারা বছর ধরে লক্ষ লক্ষ রেলযাত্রীকে যে অস্বাচ্ছন্দ্য, দুর্ভোগ আর বিপদাশঙ্কা ভোগ করতে হয় সে হিসাব জানার কোন উপায় নেই।

কেব্‌ল্ বা অন্যান্য সাজসরঞ্জাম চুরি যাওয়ার এই অন্যায়কে রোধ করতে যাত্রীসাধারণের কাছ থেকে যে কোন সাহায্য বা সংবাদ পেলে রেলওয়ে কৃতজ্ঞ থাকবে।

যে-কোন মূল্যেই
রেলওয়ে আপনাকে
সেবা করতে চায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

IPB/SE/5-62

সূচীপত্র—আষাঢ়, ১৩৭০

— রঙীন চিত্র —

বুন্দেলা কেশরী ছত্রসাল

(একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বুন্দেলা-কেশরী ছত্রসাল
(একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে)

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

৩য় সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৭০

রাষ্ট্রপতির বিদেশ ভ্রমণ

আমাদের রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন বিগত ১লা জুন বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ২রা জুন নিউ ইয়র্কে পৌঁছাইবার পর তিনি নয়দিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন, তার পর সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি ব্রিটেনে ১২ই জুন পৌঁছাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গ লিখিবার সময় তিনি সেখানেই আছেন এবং ব্রিটেনে তাঁহার বার দিনের সফর শেষ হইলে পরে এদেশে ফিরিবার কথা আছে।

রাষ্ট্রপতির বিদেশ ভ্রমণ এইবার একটু অন্য ধরনের হইতেছে, কেননা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয় দেশই তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছে ও করিতেছে। মার্কিন দেশে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত করার বিষয়ে কিছু নূতনত্বও ছিল এবং তাঁহাকে যেভাবে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও বিশেষত্ব ছিল। অবশ্য এতাবৎ যে-সকল সংবাদ আসিতেছে তাহাতে এই বিদেশ ভ্রমণের পূর্ণ বিবরণ নাই, আছে শুধু সেইটুকু, যাহাতে এদেশের লোকে খুশী হয়। ভারতবিরোধী মার্কিন ও ব্রিটিশ সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও মন্তব্য পড়িলে বুঝা যাইবে যে, এই বিদেশযাত্রা ফলপ্রসূ কতটা হইয়াছে। যে সংবাদগুলি আমাদের দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে আড়ম্বর ও মর্য্যাদা দানেরই উল্লেখ আছে। তাহার অধিকাংশই "এহ বাহ্য" বলিয়া সরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মার্কিন দেশে অবস্থানকালে রাষ্ট্রপতি যাহা বলিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনার জন্য সেখানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারও অতি সংক্ষিপ্ত ও সারহীন চুম্বক এখানে প্রচারিত হইয়াছে। তবে কয়েকটি ইংরেজী সংবাদপত্রে রাষ্ট্রপতির টেলিভিসন মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর দানে এক পূর্ণ বিবরণ দিয়াছে। এই টেলিভিসন সারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারিত হইয়াছে এবং ইহা সুদীর্ঘ ও ব্যাপক আলোচনাযুক্ত। ইহার মধ্যে অনেক কিছু আছে যাহা প্রণিধানযোগ্য এবং সে কারণে সর্ব্বপ্রথমে উহারই আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা উহাতে এমন অনেক কথা আছে যাহা দ্বারা মার্কিন দেশের লোকে বুঝিতে পারে যে, নেহরুর ভারত ছাড়াও আর একটি ভারত আছে যাহার জীবন-পথ সহজ ও সরল না হইলেও তাহার মধ্যে মানবত্বের ধারা সাধারণভাবেই প্রবাহিত হইতেছে।

এই টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক সংবাদদাতা মিঃ স্কেলি প্রশ্ন করেন এবং রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন উত্তর দিয়াছিলেন। মিঃ স্কেলি অভিজ্ঞ এবং অতি নিপুণ প্রশ্নকারী বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহার কয়েকটি প্রশ্নে অতি গভীর এবং জটিল সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতির উত্তর প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গত হয়। কোনও অবান্তর কথার আড়ম্বর তাহাতে ছিল না এবং অযথা

ভারতীয় নীতির উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে ঢোকান হয় নাই।

মিঃ জন স্কেলি সাক্ষাৎকারের আরম্ভে রাষ্ট্রপতির পরিচয় ও প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানান। রাষ্ট্রপতি অকারণে বক্তৃতার ফোয়ারা না খুলিয়া, দুইটি কথায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। মিঃ স্কেলি তার পরই বলেন, "এইভাবে শক্তিগোষ্ঠী-বহির্ভূত জগতের একজন বিশিষ্ট নেতার সহিত সাক্ষাৎকারের বিশেষত্ব এই যে, অনেক সমস্যার—যথা: পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বর্ত্তমান যুযুৎসু ভাবের উপর এক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে বিবেচিত মত শুনিবার সুযোগ পাওয়া যায়।"

"মহাশয়, আপনার নিজের পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া আপনি আমাদের বলিতে পারেন যে, পরস্পরকে এবং পৃথিবীর বৃহৎ অংশকে বিস্ফোরণে চূর্ণ না করিয়া এই যুযুৎসু ভঙ্গিমা (উভয়ের মধ্যে) কি পূর্ব্ব ও পশ্চিমী দল আর বেশীদিন চালাইতে পারিবে?"

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন—"পূর্ব্ব ও পশ্চিম বলিতে আপনি ভৌগোলিক সংস্থানের কথা বোধ হয় বলিতেছেন না। যখন আপনাদের প্রেসিডেণ্ট পশ্চিমের ও পূর্ব্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ভৌগোলিক সংস্থানের কথাই বলিয়াছিলেন। আপনি রাষ্ট্রনৈতিক জগতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমের কথা বলিতেছেন।"

মিঃ স্কেলি—"হ্যাঁ।"

রাষ্ট্রপতি—"গণতন্ত্রবাদী ও কম্যুনিষ্ট। ইহারাই আপনার প্রশ্নের বিষয়।

"আমার মনে হয় যে, জগতের মুখ সূর্য্যের (আলোকের) দিকে ফিরাইয়া দিয়া লোকসমাজে এই সম্পর্কে আশাবাদের প্রবর্ত্তন করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই জাতীয় যুযুৎসা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে, যথা: গ্রীক ও বর্ব্বর, রোমক ও কার্থেজিয়, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট, অক্ষশক্তিবর্গ এবং মিত্রশক্তিগোষ্ঠী। এবং এখন আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট জগতের মধ্যে যুদ্ধ।

"ঐ সকল (পূর্ব্বেকার) বিবাদের কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উভয়দিকেই একের উপর অন্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীকেরা বর্ব্বরদের কর্তৃক প্রভাবিত হয় এবং বর্ত্তমানে অক্ষশক্তিভুক্ত জাতিগুলি ও মিত্রশক্তির অন্তর্গত জাতির মধ্যে পরম মিতালি রহিয়াছে এবং সেইজন্য জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে ঐরূপ একটা প্রলয়ঙ্কর পরিস্থিতির ভিতর দিয়া আমাদের যাইতে হইবেই, এরূপ কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আপনাদের সিনেটে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। এই সমস্যা সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যের সকল বিচ্ছেদকারী বিবাদই প্রায় শূন্যে লীন হইতে পারে এবং আমরা সকলে এক স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্যবাদী জগতে বন্ধুভাবে পরস্পরের সহিত সহযোগ করিয়া থাকিতে পারি, যদি কালের নিরাময় শক্তি মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক, পুনরুত্থান ক্ষমতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থাগুলির রূপান্তর গ্রহণ ক্ষমতা এবং সর্ব্বোপরি বিধাতার দয়া, এই সকলের প্রভাব চলিতে থাকে।

"ইহাই আমার আশা-ভরসা এবং আমার ঐ কথা বলার পরের কয় বৎসরে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

"মিঃ ক্রুশ্চভ সেদিন বলিয়াছেন যে, ধনিকতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের নিকট আমাদের শিক্ষা করার অনেক কিছু আছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতিতে আপোষ-মীমাংসা চলিতেছে। এমন কি আণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা ক্ষেত্রেও এখন পাটিগণিতের প্রশ্নই আসিয়াছে। সোভিয়েট বলেন যে, তিনবার মাত্র (বৎসরে) পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে দিতে তাঁহারা রাজী। যুক্তরাষ্ট্র চাহেন সাত-আট বার করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপোষ স্বীকৃতি এবং এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে আপোষ চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা কিছু আছে মনে হয়, কেননা মানুষ-মাত্রেই মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে এবং আত্মরক্ষার বিষয়ে প্রকৃতিগত ইচ্ছা রাখে।

"সকল শক্তিমান বৃহৎ জাতি, যাহাদের আণবিক অস্ত্রশক্তি আছে, তাহারা সে সব রাখিতে পারে কিন্তু তাহাদের এই স্বভাবজাত অস্তিত্ব বজায় রাখার ঈপ্সা সেই সঙ্গে আছে এবং আমার সন্দেহ নাই যে, ঐ স্বভাবজাত প্রবৃত্তিই থাকিয়া যাইবে।

"সেইজন্য আমি বলি যে, যে সকল অস্তিবাচক positive প্রেরণা এই দুই বিবাদমান শক্তিকে পরস্পরের নিকটে আনিতেছে সেগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা উচিত, এইরূপ সৃষ্টিকারী ঈপ্সা আরও বর্দ্ধিত করা উচিত এবং জগতকে ধ্বংসের দিকে যাইতে দেওয়া উচিত নয়। উহা আত্মঘাতী, ধ্বংসমুখী ক্রোধোন্মত্ত ও বিপথগামী লোকেদের কবল হইতে রক্ষা পাইবে।"

মিঃ স্কেলি: "প্রেসিডেণ্ট মহাশয় আপনি কি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে আণবিক পরীক্ষা বন্ধ করার সন্তোষজনক চুক্তিকে দুই তরফের মধ্যে আরও অধিকতর মনের মিল

স্থাপনের বিষয়ে অপরিত্যজ্য চাবি (সূত্র) হিসাবে দেখিতেছেন ?"

রাষ্ট্রপতি : "আমি সবিশেষে আশা করি যে, ঐ সমস্যার পূরণ সন্তোষজনকরূপে হইবে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মনের মিল আসিবে। আমি উহা হইবে এই আশা পোষণ করি।"

মিঃ স্কেলি : "প্রেসিডেন্ট মহাশয় আপনি সোভিয়েটের মধ্যে কিছু অস্তিবাচক স্পন্দনের কথা বলছিলেন। আপনি কি এমন আশাপ্রদ লক্ষণ কিছু দেখিতেছেন যাহাতে এখন হয়ত সন্তোষজনক বুঝাপড়ার সম্ভাবনা আগের চাইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে ?"

রাষ্ট্রপতি : "আমি ১৯৪৯ হইতে ১৯৫২ পর্য্যন্ত দুই-তিন বৎসর সোভিয়েট দেশে ছিলাম। তারপরও তিন-চারিবার মিঃ ক্রুশ্চভের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি আমাকে একবার সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের দেশে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী। এবং তিনি এমন অনেক কিছু বলিয়াছেন যাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার রঙ্গরসের জ্ঞান আছে। তিনি নিজের ব্যাপার লইয়া হাসিতে পারেন, যাহার অর্থ তাঁহার মধ্যে মানবত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে।

"আমার মনে পড়ে সেকথা, যাহা তিনি লণ্ডনে শ্রোতাদের বলেন। তিনি এইভাবে বলিয়াছিলেন, 'আমি জানি আমাদের সম্পর্কে আপনাদের বিরূপ সমালোচনা কেন হয়। একবার আমার এক খালকোস হইতে আগত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয় এবং আমি তাকে প্রশ্ন করি 'আনাকারেনিনা' লিখিয়াছে কে ? সে অশ্রু-সিক্ত নয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে 'আমি লিখি নাই'।

"আমি সেই ছাত্রের শিক্ষককে বলি 'তুমি ইহাদের কি শিক্ষা দিতেছ'? শিক্ষক তিন দিন পরে আসিয়া আমায় বলে, সে এখন স্বীকার করিতেছে যে উহা সেই লিখিয়াছে।

"ঐ কথাগুলিতেই আমাদের ধারণা হয় যে, মিঃ ক্রুশ্চভও নিজেদের বিষয় লইয়া হাসিতে সমর্থ এবং তিনি তাঁহাদের পন্থার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা হয় তাহা প্রণিধান করিতে এবং বাধা-বিঘ্ন লক্ষ্য করিতে সক্ষম। যখন একজন নিজের হাস্যকর কাজ লইয়া হাসিতে পারে তখন তাহার জন্য আশা আছে।

"আমার মনে পড়ে ওদের রেডিওতে ঐ রকম হাস্য-রসের সৃষ্টির কথা। রেডিওতে প্রশ্ন করা হয় 'পুঁজিবাদ কাহাকে বলা হয়'? উত্তর হয়—'মানুষ যখন মানুষকে শোষণ করে'। তারপর প্রশ্ন হয় 'কম্যুনিজম বলে কাহাকে'? উত্তর হয় 'তাহার উল্টা'।

"দেখুন যখন সোভিয়েট রেডিও পর্য্যন্ত এইভাবে হাসি-ঠাট্টা চালাইতে পারে তখন বুঝিতে হইবে তাহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে আদান-প্রদানের কিছু যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টিত। যোগসূত্রের অভাবই আমাদের যত কষ্টের কারণ। যদি তাহা স্থাপিত হয় তবে বুঝা-বুঝির সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হয়। আমি ইহাই অনুভব করি।"

মিঃ স্কেলি : "প্রেসিডেন্ট মহাশয়, আপনি বলিলেন পূর্ব্ব-পশ্চিমের মধ্যে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা এখন পাটিগণিতের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ, কে কতবার অন্যকে পরিদর্শন করিতে দিবে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন দুই কি তিনবার পরিদর্শন করিতে দিবে বলিবার সঙ্গে এখনও পরিষ্কার করিয়া কি প্রকার পরি-দর্শনের কথা তাহার মনে রহিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে বাকী রাখিয়াছে। এখনকার অবস্থায় সেটাই বিশেষ বাধা-বিঘ্নের কারণ। আপনি কি নিরাপদে পূর্ণরূপে পরিদর্শনের ব্যবস্থা এই কার্য্যক্রমের অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে প্রয়োজনীয় মনে করেন ?"

রাষ্ট্রপতি : "উহা নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের ধৈর্য্য বা আশা হারানো উচিত নয়। আমার একথাই মনে হয়, যদি আমরা চেষ্টা করিতে নিবৃত্ত না হই তবে সাফল্য আসিবেই।"

মিঃ স্কেলি বিশ্বখাদ্য কংগ্রেসে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ উল্লেখ করিয়া বলেন যে "আপনি সেই ভাষণে বলিয়াছিলেন যে, জগৎকে যদি বর্ত্তমান উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার টানাটানি হইতে মুক্ত করিতে হয় তবে সর্ব্বপ্রথমে ক্ষুধার্ত্ত মানবের খাদ্য সমস্যা পূরণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী বলিয়াছেন যে, এই ক্ষুধা দমন অভিযান কখনও সফল হইতে পারিবে না—যদি না জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিরোধী সমস্যাগুলির উপর প্রবল ও ব্যাপক আক্রমণ চালিত করা হয়। আপনার এ বিষয়ে মত কি ?"

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, "এদেশে (ভারতে) দুই দিকেই মনোনিবেশ করা হইতেছে এবং আমরা প্রত্যাশা করি যে, অন্যেরাও সেইভাবে কাজ করিবে। ছোট দেশগুলির পক্ষে ইহা মহান সমস্যা। যদি তাহাদের (আত্মরক্ষার জন্য) অস্ত্রশস্ত্রের জন্য অজস্র অর্থব্যয় না করিতে হইত তবে ক্ষুধা নিবারণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারিত। আমি আশা করি যে, যদি জাতিসঙ্ঘের বৃহত্তম শক্তিশালী জাতিগণ উহাদের নিরাপত্তা এবং

বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন তবে ঐ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকে অস্ত্রবল কমাইবেন। এবং তবেই তাহাদের সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে সাহায্য করা হইবে।"

মিঃ স্কেলি : "সংযুক্ত সোভিয়েট ও কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্যে আদর্শবাদ লইয়া যে বিবাদ চলিতেছে, আপনি কি ইহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক হেরফেরের চাল লইয়া অন্তর্বিবাদ মাত্র দেখিতেছেন, না ইহা জগৎব্যাপী কম্যুনিজম প্রবর্ত্তনের উপায় কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা লইয়া সম্মুখ দ্বন্দ্ব মনে করেন?"

রাষ্ট্রপতি তাহাতে সোজাসুজি উত্তর দেন, "এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার আয়ত্তের বাহিরে, কেননা বিবাদ কি জাতীয় তাহা আমার জানা নাই। সম্প্রতি একটা মনান্তর ঘটিয়াছে এবং উহা মিটিয়া যাইতে পারে আবার বৃদ্ধি পাইতেও পারে। সব কিছুই নির্ভর করে পরে কি ঘটে তাহার উপরে। চীনের সঙ্গে যোগসূত্র না থাকায় আমাদের এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।"

এই প্রসঙ্গেই রাষ্ট্রপতি সারা জগতকে এক সমাজ ভুক্ত করিয়া রাষ্ট্র ও জাতির উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বমানবের ধ্যানচিত্রের ব্যাখ্যা করেন। এখনকার ঝগড়া-বিবাদ যুদ্ধবিগ্রহকে ঐ বিশ্বসমাজ ও বিশ্বমানবের জন্ম-যন্ত্রণা বলিয়া তিনি মনে করেন। ঐ ভাবেই কম্যুনিজম্ ও গণতন্ত্রবাদের মধ্যে প্রভেদ বুঝাইয়া কেন তিনি গণতন্ত্রবাদকে মানুষের প্রগতি ও উন্নতির বিষয়ে স্থায়ী সুফল-প্রদায়ক মনে করেন, সেকথা বলেন।

প্রসঙ্গতঃ রাষ্ট্রপতি বলেন, অপরকে আক্রমণ করা বা অপরের এলাকা গ্রাসের জন্য ভারত নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে না, আত্মরক্ষার জন্যই করিতেছে। সামরিক দুর্ব্বলতা আক্রমণকারীর মনে লোভের জন্ম দেয়, কিছুটা সামরিক শক্তি প্রতিবন্ধকের কাজ করে।

তিনি বলেন, চীনারা যে ভারতীয় এলাকা দখল করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ইহাতে চীনের মর্য্যাদা বাড়িয়াছে এবং অনেকে হয়ত কম্যুনিষ্ট মতাদর্শের কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু ভারতের গণতান্ত্রিক জীবনধারা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বেশ কিছুটা সফল হইয়াছে এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহাও সংক্রামক। অনেকে হয়ত ভাবিতেছেন চীনের উদাহরণই ভাল, কিন্তু ইহা বেশিদিন টিঁকিবে না।

চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জোটবর্জ্জন নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ভারত যে কোন শক্তি-গোষ্ঠীতে জড়াইয়া পড়ে নাই তাহাতে পৃথিবীর কল্যাণ হইয়াছে। কিন্তু ভারত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বকেয়া বিরোধের নিষ্পত্তির আদর্শের সমর্থক।

বিশ্বশান্তি সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত গণতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইবে, এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন আশাবাদী, এই কথা তিনি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে জানান।

তিনি বলেন, জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করা, বিশ্বের কল্যাণের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ফেরানো সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

গণতন্ত্র অথবা কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া বৈষয়িক উন্নতি সাধনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায়, কমিউনিজমের পরিবর্ত্তে গণতন্ত্রই যে ভারতে স্থায়িত্ব লাভ করিবে, তাহাতে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই।

জোট বর্জ্জন নীতি লইয়াও রাষ্ট্রপতি কোনও উচ্চস্তরের নীতিবাদের অবতারণা করেন নাই। অতি সহজ ও সরল ভাবে ঐ নীতি গ্রহণ করায় আমাদের সুবিধা ও জগতের অন্য রাষ্ট্রের কি সুবিধা হইয়াছে, তাহাই তিনি বলেন। ভালমন্দ লইয়া তত্ত্বকথার ব্যাখ্যান তিনি করেন নাই। সত্যাগ্রহের সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি প্রথমেই বলেন, এই অহিংস প্রতিরোধ নীতি বা সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কোনও মতামত দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। "আমাদের ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন বিনা রাষ্ট্রনৈতিক ছলচাতুরি, প্রবঞ্চনা বা হিংসাত্মক শক্তির ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং সেই সময়ের জগতে নানা প্রকার অবস্থার হেরফের হওয়াও আমাদের ঐ আদর্শ বজায় রাখিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সেই কারণে ভারতের এই দৃষ্টান্ত মানব জগতের মহান্ শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হইয়াছে। তবে অন্য দেশে ভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার বশে এই পথ লওয়া চলিবে কি না, সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না। সবই নির্ভর করে অবস্থার উপর।"

সত্যাগ্রহ জগতের অন্যতম মহান শক্তি কি না এই প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রপতি সোজা বলেন, "উহা জগতের মহান্ শক্তির মধ্যে অন্যতম, একথা আমি বলিতে পারি না। এখানে-সেখানে কিছু লোক এই শক্তির ব্যবহার করিতেছে, এই পর্য্যন্ত বলা যায়।"

রাষ্ট্রপতি এই টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে ভারতবাসী ও ভারতকে সহজে বুঝিবার পথ মার্কিন দেশবাসীর কাছে খুলিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত পাণ্ডিত্যের সহিত ও সহজ সরল দার্শনিক দৃষ্টিতে সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি যে ভাবে দিয়াছেন তাহা অনুপম।

ব্যাপক দুর্নীতি

সম্প্রতি কলিকাতার সিরাজুদ্দিন কোম্পানীর বিরুদ্ধে খনিজ ইত্যাদি রপ্তানীর ব্যাপারে বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানী-শুল্ক বিষয়ে ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ আসে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় পুলিসের তদন্তে নানা গোপনীয় তথ্যের আবিষ্কার হয়। সেই সব কথা কি ভাবে জানি না, সংবাদপত্রমহলে ছড়াইয়া পড়ায় কয়জন উচ্চপদস্থ অধিকারীর নামে প্রকাশিত হয় যে, ইঁহারা নাকি বিলক্ষণ আর্থিক ও অন্যজাতীয় উপঢৌকন—সহজ ভাষায় যার নাম ঘুস—লাভের কারণে ঐ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের ফাঁকির পথ খুলিয়া দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানী দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালব্যের নাম এই ব্যাপারে এতদূর জড়াইয়া পড়ে যে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু—প্রথমে লম্ফঝম্প করিবার পর—সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রী এস. কে. দাসকে ঐ অবৈধ লেনদেন বিষয়ে তদন্ত করিতে নিযুক্ত করেন। শোনা যায় সেই তদন্তের ফলাফলের আভাস পাইয়া শ্রীমালব্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাঁহার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। এ বিষয়ে পাকা খবর এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এই খনিজ রপ্তানী বিষয়ে আরও কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তাহা আংশিকভাবে নীচে উদ্ধৃত হইল :

"খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং খনিজাত দ্রব্য রপ্তানীর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী পরিচালনাধীন তিনটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে বেশ কিছুদিন যাবৎ যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি দিতেছেন, সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

"সংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ, জাতীয় সরকারের অনুগ্রহবলেই ইহারা ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থবিরোধী কাজ করিতে পারিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে শুধু লক্ষ লক্ষ টাকার রয়্যালটি ফাঁকি দেয় বা কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা কর্পূর করিয়া দেয় তাহাই নহে, কারসাজি-বলে খনিজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজারের উপরও বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে এবং ফলে, ভারতের খনিজাত দ্রব্য রপ্তানী বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়।

"এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের একটির কর্মক্ষেত্র উড়িষ্যা ও বিহারে, আর একটির ঘাঁটি মধ্যপ্রদেশে এবং তৃতীয়টির স্বার্থ প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রে। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য জগতে তিনটিরই যথেষ্ট প্রভাব। তাহা ছাড়া, কয়েকটি আন্তর্জাতিক খনিজাত দ্রব্য আমদানী-রপ্তানী প্রতিষ্ঠান এবং ইংলণ্ডের দু'একটি বিখ্যাত ইস্পাত কারখানার সঙ্গেও ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

"স্বাধীনতার পর ভারত সরকার স্থির করিয়াছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি খনিজদ্রব্যের ব্যাপারে বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর হাত দিতে দেওয়া হইবে না; এমন কি, কতকগুলি ক্ষেত্রে স্বদেশী ব্যবসায়ীদেরও বাদ দিয়া সরকার নিজেই খনি পরিচালনা এবং খনিজাত দ্রব্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। সেই অনুযায়ী, বিদেশী ও স্বদেশীদের বহু 'অনুমতিপত্রের' (মাইনিং লিজ রাইট) আবেদনও বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উল্লিখিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তখন সেই নীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

"কিন্তু হঠাৎ কেন যেন সরকারের নীতি পাল্টাইয়া গেল। সরকার স্থির করিলেন, কতকগুলি ক্ষেত্রে বে-সরকারী ব্যবসায়ীদেরও 'সঙ্গে লওয়া' হইবে। অর্থাৎ, সরকার তাহাদের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসায় নামিবেন।

"এই নীতি পরিবর্তনের সুযোগ সবচেয়ে বেশী করিয়া কাজে লাগাইল ঐ তিনটি প্রতিষ্ঠান। আইনতঃ সরকার তাহাদের সঙ্গে মিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল তাহারাই সরকারকে সঙ্গে লইয়াছেন—সরকারের শুধু নাম আছে, কাজ সব প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরা নিজেরাই চালায়। এমন কি, কতকগুলি ক্ষেত্রে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে বাদ দিয়া রপ্তানীর সম্পূর্ণ অধিকারও ইহাদের দেওয়া হইল।"

তার পর বিবরণ রহিয়াছে যে, কিভাবে সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার পথ খুলিয়া যাইবার পর খনিজ-শুল্ক (রয়্যালটি) পর্য্যন্ত বাদ দিয়া ইহারা কাজ চালাইতেছে এবং কিভাবে এই ভারতরাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন ইহারা করিতেছে।

আমরা শুধু বুঝিলাম না যে, ঐ "সংশ্লিষ্ট মহল", যেখানে "সম্প্রতি" "তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে" এতদিন চুপ করিয়াছিল কেন। সংশ্লিষ্ট মহল বিক্ষোভ প্রকাশের পথ চিনিত না বা জানিত না, একথা বিশ্বাস্য নয়। অবশ্য আমরা জানি সরকারী দপ্তরে সৎলোক যাঁহারা আছেন তাঁহারা দপ্তরের মধ্যে অসৎ দুর্বৃত্তদিগকে ভয় করেন, কেননা একেবারে উপরে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা হয়

এ বিষয়ে কোনও প্রতিকার করিতে অনিচ্ছুক নিম্ন থাকে থাকিবার জন্য, নয় তাঁহারা উপযুক্ত "বিবেচনার নজ়র" প্রাপ্তির কারণে সে বিষয়ে অন্যমত পোষণ করেন। সুতরাং সৎ কর্মচারীর পক্ষে নির্বিবাদী হইয়া থাকাই শ্রেয়। কিন্তু যদি তাঁহারা সত্যসত্যই "বিক্ষুব্ধ" হওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তবে সে বিক্ষোভ-জ্ঞাপনের অন্য পথ কি ছিল না? সংবাদপত্রের মাধ্যমে, পরোক্ষভাবে এই দুর্নীতি বিষয়ে আন্দোলন বহু উপরে ঠেলা দেওয়ার ফলে অবশ্য নীচের লোকের মনে সাহস আসিতে পারে। যাহাই হউক এই জাতীয় বিক্ষোভের সঞ্চার দেশের পক্ষে আশাপ্রদ, তাই আমরা আশা করি অন্য অন্য মহলেও এই বিক্ষোভের সংক্রামণ হইবে। দুর্নীতি ত ব্যাপকভাবে চতুর্দ্দিকেই ছড়াইয়া গিয়াছে।

"যুগান্তর"ও কয়দিন পূর্ব্বে ঐরূপ দুর্নীতির একটি উদাহরণ দিয়াছেন। জানি না ঐ-সংক্রান্ত বা সংশ্লিষ্ট মহলে এ বিষয়ে কোনদিন বিক্ষোভ দেখা দিবে কি না। তবে যেহেতু এখানে অসতের ভয়ে সৎলোকের কি অবস্থা হয় তাহার সামান্য উদাহরণ আছে, সে কারণে উহাও আংশিকভাবে উদ্ধৃত করা হইল :

"মেমারি (বর্দ্ধমান), ৮ই জুন—এই ভঙ্গ বঙ্গে কোথাও যদি কাগজের নোটের খনি থাকে তাহা হইলে তাহা এই মেমারিতেই। এখানকার বামুনপাড়ার মোড়ে কাঁচা টাকার যে কালোবাজারী লেনদেন চলিতেছে কাহারও সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

"ত্রিভুজের মত স্থানটির তিনদিকে কালো পীচের ঝকঝকে তকতকে 'রাস্তার দেওয়াল'। তিন দিকেই বন্দুকধারী সিপাহী সারাক্ষণ পাহারা দিতেছে—কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার জো নাই। একের পর এক লরী আসিতেছে, কাঁটায় মালসমেত তাহার ওজন দেখা হইতেছে, তাহার পর আবার তাহারা চলিয়া যাইতেছে।

"ভিতরে যাইবার হুকুম নাই, তবে বাহির হইতেও জানিবার কিছুই বাকি থাকে না। কাঁটায় লরী উঠিতেই ব্লু বুক লইয়া ড্রাইভার নীচে লাফাইয়া পড়েন, ঘরের ভিতরে নিভৃতে 'কাঁটার বাবু'দের সম্মুখে কড়কড়ে কয়েকখানা নোটসমেত ব্লু বুকটি আগাইয়া দেন, তাহার পর আবার চলিয়া আসেন—শুধু বামুনপাড়া কেন, মেমারির যে-কোন ওয়াকিবহাল ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন, তিনি এই কথাই বলিবেন।

"সত্যটা যাচাই করিতে গিয়াছিলাম। অনেক অনুনয় (এবং অর্থ ত্যাগ করিয়া) জনৈক সর্দ্দারজীকে রাজী করাইয়া বর্দ্ধমান হইতে তাঁহার লরীতে করিয়া মেমারি গিয়াছিলাম। ওয়েব্রীজে লরী উঠিতেই সর্দ্দারজী হাত বাড়াইয়া উপর হইতে একটি কাপড়ে বাঁধা মোড়ক বাহির করিলেন, তাহার পর সেখান হইতে ব্লু বুকটি বাহির করিয়া পকেট হইতে কয়েকটি দশ টাকার নোট তাহাতে গুঁজিয়া লাফাইয়া পড়িলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিতেই হাসিয়া বলিলেন, 'দস্তুরি আছে, বাবুজী'।"

দৈনিক দশ-পনের হাজার "কাঁচা টাকা" এইভাবে হস্তান্তর হওয়ার বিবরণ এবং উহা যে প্রায় সর্ব্বজন-বিদিত, এই তথ্য ঐ সঙ্গেই দেওয়া হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে, এই জাতীয় খনিকে ইজারা দেওয়া হয় না কেন, অর্থাৎ সরকার বিলাতি হোটেলের ওয়েটারদের কাছে হোটেলের মালিক যে ভাবে "প্রিমিয়ম" আদায় করিয়া তবে কাজে ভর্ত্তি করেন, সেই ভাবে ঐরূপ খনি যেখানে জানা আছে সেখানে নিযুক্ত করার পূর্ব্বে প্রার্থীদের ডাক দিয়া নগদ অর্থের বিনিময়ে ঘুস লওয়ার অধিকার দিলে হয়ত কিছু টাকা সরকারের হাতে আসিতে পারে।

পরলোকে ডাক্তার পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

শল্য-চিকিৎসক হিসাবে সর্ব্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে মে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

ডাঃ পঞ্চানন ১৮৯২ সনে বালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রিভার্স টমসন স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স ও ১৯১০ সনে উত্তরপাড়া কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯১৭ সনে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম. বি. পাস করিয়া, ১৯২০ সনে তদানীন্তন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরেই বাংলার সরকার তাঁহাকে হাসপাতাল পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যুক্তরাজ্যে পাঠান। সেখানে গিয়া তিনি এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যুক্তরাজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি ছয় বৎসর কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে কাজ করেন। ১৯২৮ সনে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অনারারি সার্জ্জেন নিযুক্ত হন। ঐ সময় হইতে ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত তিনি প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল সার্জ্জারি, প্রফেসর অব সার্জ্জারি প্রভৃতি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৯৫২ সনে তিনি প্রফেসর অব সার্জ্জারি রূপেই মেডিকেল কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কিন্তু ইহাই তাঁহার বড় কথা নয়, শল্য-চিকিৎসক হিসাবে তিনি যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা দেশবাসী আজ বৈজ্ঞানিক যুগেও স্মরণ করিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশের ফলাফল ও পরিণতি

সম্প্রতি গুজরাটরাজ্য সফরকালে এবং তাহারও পরে কোলার স্বর্ণখনির উৎপাদন ব্যয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারতে সোনার দর আন্তর্জ্জাতিক মানে নামিয়া যাইবে এমন অসম্ভব আশা তিনি কোনকালে করেন নাই, এমন দাবিও করেন নাই। স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশ প্রবর্ত্তনের দ্বারা এ দেশে গোপনে বেআইনী ভাবে স্বর্ণ আমদানীর কারবারটি শুধু তিনি বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য, অর্থমন্ত্রী দাবি করেন, সম্পূর্ণ ভাবেই সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার দ্বারা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যয় ঘটিতেছিল, এই চোরা আমদানী কারবারটি বন্ধ হওয়ায় এখন তাহা সম্পূর্ণ ভাবেই নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী সম্ভবতঃ স্মৃতিশক্তির অতি-ক্ষীণতা রোগে ভুগিতেছেন। কেননা, স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করিবার উপলক্ষ্যে তিনি আকাশবাণী মারফৎ যে ভাষণ প্রচার করেন, তাহাতে এই নিয়ন্ত্রণাদেশের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ভারতে সোনার দাম আন্তর্জ্জাতিক মূল্যমানের কাছাকাছি নামাইয়া আনাও যে অন্যতম ছিল, একথা বেশ স্পষ্ট ভাষায়ই প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আকাশবাণী মারফৎ এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়া স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির যে ব্যাখ্যা দেন তাহাতে এই আদেশ দ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হইবে এরূপ দাবি করেন :

(১) এই আদেশ দ্বারা প্রথমতঃ গহনা ব্যতীত দেশে মজুদ স্বর্ণভাণ্ডারের একটা সম্যক্ এবং নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যাইবে।

(২) এই আদেশ দ্বারা সোনা কেনা-বেচা বেআইনী ঘোষিত হওয়ায় এই ধাতুটির চাহিদা আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে এবং ফলে একদিকে যেমন ইহার মূল্য কমিতে সুরু করিবে, অন্যদিকে তেমনি দেশে বিদেশ হইতে সেনার চোরা আমদানী বন্ধ হইবে। এই আদেশ দ্বারা সোনার বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এবং মজুদ স্বর্ণের হিসাব দাখিল করিতে সকল স্বর্ণভাণ্ডারী বা মজুদ স্বর্ণের মালিকদের বাধ্য করিবার ফলেও সোনার চোরা আমদানীর কারবার চালান অসম্ভব করিয়া তোলা হইবে।

(৩) ১৪ ক্যারেটের অধিকতর স্বর্ণমূল্যবিশিষ্ট কোনপ্রকার গহনা প্রস্তুত বা বিক্রয় করা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হওয়াও সোনার দাম আনুপাতিক পরিমাণে কমিতে বাধ্য হইবে।

(৪) এ ভাবে সোনার দাম কমিয়া গেলে, স্বর্ণের মালিকদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের সোনার বিনিময়ে স্বর্ণবণ্ড ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবেন। যে দরে এভাবে সরকারী স্বর্ণবণ্ড বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা নিয়ন্ত্রণাদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার বাজার-দরের প্রায় অর্দ্ধেক সত্য, কিন্তু অন্য ভাবে সোনার কারবার চালু রাখিবার উপায় না থাকায় শতকরা ৬॥০ সুদে স্বর্ণবণ্ড ক্রয় করা লাভজনক বলিয়াই দেখা যাইবে। এভাবে সরকারী তহবিলে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ প্রবাহিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যাঁহারা সরকার-নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এভাবে স্বর্ণবণ্ডের বিনিময়ে সরকারী তহবিলে তাঁহাদের মজুদ স্বর্ণ জমা দিবেন, তাঁহাদের ঐ পরিমাণ সোনার উপর সরকারের ন্যায্যপ্রাপ্য সম্পত্তিকর, আয়কর বা অতিরিক্ত আয়কর কিছুই দাবি করা হইবে না এবং কি ভাবে এই স্বর্ণ সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহারও কোন হিসাব চাওয়া হইবে না।

এই নিয়ন্ত্রণাদেশ কয়েক মাস হইল চালু হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত ইহার ফলাফল হিসাব করিলে অর্থমন্ত্রীর সাফল্যের দাবি কতটা গ্রাহ্য তাহা বুঝা যাইবে। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি হইবার প্রাথমিক ফল যাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা এই যে, ইহার ফলে দেশজোড়া স্বর্ণশিল্প ব্যবসায়টি একপ্রকার সম্পূর্ণই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বহু লক্ষ স্বর্ণশিল্পী ও এই ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীগোষ্ঠী যে, একদম বেকার হইয়া পড়িয়াছেন তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। ইহাদের জন্ম

কোনও বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব অর্থমন্ত্রী সম্পূর্ণই অস্বীকার করিয়াছেন। স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশের এই প্রত্যক্ষ ও আশু ফলটি আমাদের সকলেরই সম্মুখে দেখা যাইতেছে।

কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন সুফল ফলিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না। একমাত্র গহনার দোকানগুলির মালিক ও স্বর্ণব্যবসায়ীরা ব্যতীত আর কেহ বড় একটা তাঁহাদের নিকট মজুদ স্বর্ণের বিশেষ কিছু হিসাব দাখিল করেন নাই। ফলে দেশের মজুদ স্বর্ণের একটা সম্যক্ হিসাব আজিও প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, কি নূতন উদ্ভাবনের দ্বারা মুনাফাপুষ্ট ধনীদিগকে স্পর্শমাত্র না করিয়া কি ভাবে দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্তকে অধিকতর নিষ্পেষণ করা যায়, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে যাঁহারা মোরারজি দেশাইয়ের প্রকৃতির সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে এই রকম একটা কিছু উদ্ভাবন তিনি শেষ পর্য্যন্ত করিবেনই। কিন্তু যাহাই করুন তাহার ফলে দেশের মজুদ স্বর্ণের একটা সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া সম্ভব হইবে, এমন আশা করিবার কোন সমীচীন কারণ নাই। এবং এই মজুদ স্বর্ণের অধিকাংশ কেন, এমন কি অপেক্ষাকৃত সামান্য অংশও স্বর্ণবণ্ডের বিনিময়ে সরকারের তহবিলে জমা করা সম্ভব হইবে, এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, অর্থমন্ত্রী যদি স্বর্ণবণ্ডের মূল্যায়ন দেশের চলতি বাজার-মূল্যের অনুপাতে করিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই খাতে সরকারী তহবিলে অনেকটা স্বর্ণ ব্যক্তিগত গোপন তহবিলগুলি হইতে প্রবাহিত হইতে পারিত। আমরা মনে করি তাহাও হইত না। কেননা সকল দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নহে যে, ইহাও স্বল্পমূল্য নহে। গোপন স্বর্ণের বৃহৎ ভাণ্ডারগুলির অধিকাংশই যে কালোবাজারী কারবার, সরকারী ট্যাক্স ফাঁকি ইত্যাদি নানাবিধ অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত ও সঞ্চিত, এই বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবার সমীচীন কারণ নাই। এ সকল সরকারী পাওনা উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হইলে এই সকল গোপন স্বর্ণের মজুদ তহবিলের অন্ততঃ পক্ষে তিন-চতুর্থাংশ এভাবেই ব্যয় হইয়া যাইত। সরকার যখন তাঁহাদের পাওনা দাবি ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণ স্বর্ণটুকুরই বিনিময়-মূল্য দিতে স্বীকার করিতেছিলেন, তখন এই দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে সোনার মালিকরা যে বাজার-দরের অর্দ্ধেক মূল্যেও তাহাদের ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত অনেক বেশী পাইতে-ছিলেন, ইহা সতই বোধগম্য। তাহার উপরে শতকরা ৬।০ টাকা হারে সুদের স্বীকৃতিও ইহাদের জন্য স্বাভাবিক হারের অধিক অতিরিক্ত মুনাফার ব্যবস্থা করিয়াই দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও যখন একথা স্মরণ করা যায় যে, এই সোনার বেশ একটা মোটা অংশ চোরা-আমদানার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার জন্য রাষ্ট্র এবং দেশ-বাসী উভয়কেই প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তখন যেই মূল্যে স্বর্ণবণ্ডের বিনিময়ে স্বর্ণের দর বাঁধা হইয়াছে তাহাও অতিরিক্ত মনে হইবে।

যাহা হউক স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করিবার ফলে আর যাহাই ঘটিয়া থাকুক, সরকারের তহবিলে দেশের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডারের প্রায় কোন বিশিষ্ট অংশই প্রবাহিত হয় নাই, কিংবা দেশে অবস্থিত মজুদ স্বর্ণের কোন একটা নির্ভরযোগ্য মোটামুটি হিসাব পাওয়াও সম্ভব হয় নাই। সোনার দর বাড়িয়াছে কিংবা কমিয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, কমে নাই এবং আত্ম-সমর্থনের জন্য এখন বলিতেছেন যে এরূপ আশাও তিনি কখনও করেন নাই। তবে তিনি দাবি করিতেছেন যে, এই আদেশ জারি করিবার পিছনে তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল, এ দেশে বিদেশ হইতে বেআইনী ভাবে সোনার চোরা-আমদানী বন্ধ করা, তাহা সম্পূর্ণই সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থমন্ত্রীর এই দাবিটুকু কতটা পরিমাণে আপাতঃসত্য এবং কতটা পরিমাণে ভবিষ্যতের জন্য নির্ভরযোগ্য, তাহা বিচারের বিষয়। ইহা হয়ত সত্য যে, স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করিবার ফলে দেশে চোরা স্বর্ণ আমদানীর বিরুদ্ধে যে আপাতঃ-দৃশ্য প্রতিবন্ধকগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার ফলে সাময়িক ভাবে অন্ততঃ চোরা-আমদানী হয় একেবারেই বন্ধ হইয়া আছে কিম্বা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ইহা সম্ভব যে, এই প্রকার চোরা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ীগোষ্ঠী এই সকল নতুন প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করিবার উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে এখন ব্যস্ত আছেন বলিয়া সাময়িক ভাবে কারবার বন্ধ করিয়াছেন কিংবা অন্যদিকে প্রবাহিত করিতেছেন। ইহা সত্য যে, সকল প্রকার চোরা আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায় অবস্থান্তর ভেদে তাহাদের পদ্ধতির রদবদল করিয়া থাকে। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রচার যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বার-স্বর্ণের চাহিদা আপাততঃ কিছুটা কম হইয়াছে। সম্ভবতঃ চোরা কারবারে বার স্বর্ণের সহজ আন্তর্জ্জাতিক পরিবহন বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে এবং এই ধরনের সোনার

কারবারীরা এ বিষয়ে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার আয়োজন করিতেছেন। লণ্ডনে প্রচারিত একটি সংবাদে প্রচার যে, সম্প্রতি এক স্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তর কালে অর্দ্ধটন পরিমাণ সোনা চুরি হইয়াছে। এ সকল ঘটনার তাৎপর্য্য হয়ত এই যে, সোনার চোরা রপ্তানী বা আমদানী ব্যবসায়ে হয়ত নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে এবং হয়ত আগে যতটা অংশ ধরা পড়িত, নতুন নতুন কৌশলের দ্বারা তাহার সামান্য অংশই এখন আইনের বন্ধনে ধরা পড়িতেছে।

যাহাই হউক, অর্থমন্ত্রীর দাবি-অনুযায়ী যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া হয় যে, চোরা-আমদানী আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে, তাহা হইলেও যে ইহা আবার জোরদার হইয়া উঠিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? সোনার চোরা-আমদানী বন্ধ করিতে হইলে যে-সকল প্রাথমিক আয়োজনগুলি সিদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক—যথা, দেশের স্বর্ণভাণ্ডারের একটা সম্যক্ ও নির্ভরযোগ্য হিসাব, সোনার বাজার-দর আন্তর্জ্জাতিক দরের কাছাকাছি হওয়া, ইত্যাদি—কোনটাই নিয়ন্ত্রণাদেশ দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। ফলে দেশের অভ্যন্তরে সোনার চাহিদা এবং দর উভয়ই উচ্চ পর্দ্দায় বাঁধা আছে। ফলে আজ বন্ধ থাকিলেও কাল যে আবার চোরা-আমদানী আরও অধিকতর পরিমাণে চলিতে থাকিবে না তাহার সত্যকার আশ্বাস কোথায়?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উদ্ভাবিত এই স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশ দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র কয়েক লক্ষ লোকের জীবিকা হরণ। সোনার সাদা বাজার আইন করিয়া বন্ধ করা হইলেও ইহার চোরা বাজার বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়াও মনে হয় না। অতএব চোরা-আমদানীও বন্ধ করা সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে এই চোরাবাজারের সোনার দর নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি হইবার পূর্ব্বেকার বাজার-দর হইতে যে আরও বেশী তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

অতএব প্রশ্ন এই যে, অর্থমন্ত্রী এরূপ একটি হঠকারিতা কেন করিলেন? ইহা স্পষ্ট ও অবিসম্বাদী যে, কালো বাজারের মুনাফা, ট্যাক্স ফাঁকি এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে অবৈধ ভাবে সঞ্চিত অর্থরাশির গোপন তহবিলের প্রয়োজনেই সোনার চাহিদা এত বেশী বাড়িয়াছিল এবং বড়-গোছের সোনার চোরা-আমদানী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সঞ্চয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না পারা পর্য্যন্ত এই চোরাকারবার বন্ধ করিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু স্বর্ণনিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করিয়া যে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না, ইহাও সহজেই অনুমান করা যাইত। বস্তুতঃ আশঙ্কা হয় যে, অর্থমন্ত্রীর আদৌ এ উদ্দেশ্যই ছিল না। কেবলমাত্র সাধারণের সমালোচনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এমন একটি আদেশ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, কালোবাজার বা চোরাবাজার বন্ধ করিবার মানসে নহে। তাহা সত্যই করিতে চাহিলে অন্য এবং অনেক বেশী সহজ উপায় ছিল। একটি উপায় কতটা সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যাইতে পারিত তাহা ব্রহ্মদেশে জেনারেল নে উইন পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

দামোদর ভ্যালী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের অন্তর্গত বন্যা-নিরোধ, সেচ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ ইত্যাদি নানাবিধ বহুমুখী পরিকল্পনার রূপায়ণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার কেন্দ্র, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার একত্রে বিভিন্ন অংশে বহন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কেন্দ্র ও বিহার রাজ্য সরকারের সম্মিলিত দায়িত্বেরও অনেক বেশী। চল্তি ব্যয়ের বেলাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুরূপ ব্যয়াংশ বহন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সেচ, জল সরবরাহ, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের নিকট হইতে ন্যূনতম পাওনাও কখনও মেটাইবার প্রয়াস করা হয় নাই। ইহা লইয়া বৎসর বৎসর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সহিত ডি. ভি. সির মতদ্বৈধ ও দ্বন্দ্ব লাগিয়াই রহিয়াছে। কিন্তু ডি. ভি. সি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা (autonomous corporation), ইহার পরিচালনার উপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্ব্বোচ্চতম আর্থিক দায়িত্ব সত্ত্বেও কোন অধিকার নাই। তাই রাজ্য সরকার কেবল ডি. ভি. সির অপটুতা ও দায়িত্বপালনে অক্ষমতার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

অন্যপক্ষে ডি. ভি. সির প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া বিহারে রাঁচী কিম্বা মাইথনে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য বিহার রাজ্য সরকার অনেক-দিন হইতে চাপ দিতেছিলেন। বিহার সরকারের তরফ হইতে এ বিষয়ে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, এই কার্য্যালয় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বলিয়া এই সংস্থার অধীনে চাকুরির ব্যাপারে বাঙালীরাই অধিকতর সুবিধা পাইয়া আসিতে-ছিলেন। ইহা ছাড়াও বন্যা-নিরোধ ও সেচের ব্যাপারেও ডি. ভি. সি হইতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যই বিহারের তুলনায়

অনেক বেশী লাভবান হইবেন বা হইতেছেন। ডি. ভি. সি. উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রায় সমান সমান সুবিধা ভোগ করিতেছেন।

অতএব অন্ততঃ এই সংস্থার অধীনে চাকুরির দিক দিয়া, বিহারবাসীরা বাঙালীর তুলনায় অধিকতর সুবিধা করিয়া লইতে পারে তাহার জন্য ডি. ভি. সি-র প্রধান কার্য্যালয় বিহারের অন্তর্গত কোন কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করিবার জন্য বিহার রাজ্য সরকার জোর চাপ দিতেছিলেন। বস্তুতঃ এই চাপের ফলে কিছুদিন পূর্ব্বে ডি. ভি. সি-র কর্ম্মকর্ত্তারা এক রকম ঠিকই করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, এই কার্য্যালয়টি মাইথনে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংস্থার কর্ম্মচারীদের আবেদন-নিবেদন সকলই বিফল হয়। শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দৃঢ় প্রতিবাদের ফলে এই সিদ্ধান্ত রদ করিতে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তারা বাধ্য হন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আর একটি কৌশল প্রয়োগ করিয়া বিহার সরকার ও ডি. ভি. সি-র কর্ম্মকর্ত্তাগণের অভিলাষ বহুল পরিমাণে পূরণ করিয়া লইয়াছেন। বন্যা-নিরোধ, সেচ-সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও ও সরবরাহের আবশ্যিক সুবিধার প্রয়োজনের অজুহাতে সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারী-গোষ্ঠীকে ইতিমধ্যে মাইথনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে ডি. ভি. সি-র কর্ম্মচারীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা অনেকেরই যে প্রভূত অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে শুধু তাহাই নহে, এ সকল দপ্তর মাইথনে স্থানান্তরিত করিবার পর অনবরত নতুন লোক নিয়োগ করা হইতেছে এবং তাঁহাদের প্রায় শতকরা ১০০ জনই বিহারবাসী, অন্ততঃপক্ষে অবাঙ্গালী।

ডি. ভি. সি-র সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে বিহার, কেন্দ্রীয় সরকার, এমন কি স্বয়ং ডি. ভি. সি-র কর্ম্মকর্ত্তা-গোষ্ঠী পর্য্যন্ত আগাগোড়াই একটা বিরুদ্ধ মনোভাব যে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কিছুদিন পূর্ব্বেও বিহার রাজ্যবিধান সভায় এই লইয়া প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল। জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেস-সভ্য বিহার সরকারকে বলেন বলিয়া প্রচার হয় যে, এই বহুমুখী রিভার-ভ্যালী প্রজেক্টের ফলে বিহার নানাভাবে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে, আর কেবলমাত্র বাঙালী তাহা হইতে সুবিধা লুটিয়াছে। তিনি বলেন যে, বন্যা-নিরোধ সমস্যা বিহারের সমস্যা নহে, ইহা পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা এবং উহারই সমাধানকল্পে বিহারে যে-সকল বাঁধ বাঁধা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ বিহারী চাষীকে তাহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে হইয়াছে, ইহাদের বহু সহস্র লোককে আজ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুত বিকল্প চাষোপযোগী জমি কিংবা ক্ষতিপূরণ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। সেচের জল-সরবরাহের ব্যাপারেও বিহারের ডি. ভি. সি-র নিকট হইতে কোন উপকার লাভ হয় নাই। ইহার প্রায় সবটাই লাভ হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের। কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক সরবরাহের ক্ষেত্রে বিহার খানিকটা সুবিধা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভাগ করিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির অধিকতর অংশ পশ্চিমবঙ্গই পাইতেছেন, বিহার ততটা নহে।

ইহার জবাবে অনেক কিছুই বলা যাইতে পারিত। যথা, বাঁধের প্রয়োজনে উচ্ছেদকৃত চাষীদের বিকল্প চাষোপযোগী জমির ব্যবস্থা করিয়া দিবার দায়িত্ব লইয়াছিলেন বিহার রাজ্য সরকার। ইহার উপরেও তাঁহাদের পাওনা নির্দ্ধারিত আর্থিক ক্ষতিপূরণও ইঁহাদের মধ্যে বণ্টন করিবার দায়িত্বও বিহার সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অংশের এই হিসাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ সম্পূর্ণটাই বহুকাল পূর্ব্বেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। উচ্ছেদকৃত চাষীরা যদি আজও বিকল্প চাষোপযোগী জমি বা আর্থিক ক্ষতি-পূরণ না পাইয়া থাকেন, তবে তাহা ঘটিয়াছে বিহার রাজ্য সরকারের অন্যায় গাফিলতির দরুণ; এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দায়ী করা অন্যায় ও অসমীচীন। বন্যা-নিরোধ ব্যবস্থা বা চাষের জন্য সেচের জলের প্রয়োজন হয়ত বিহারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত অনেকটা বেশী। কিন্তু ইহার জন্য পুঁজি-লগ্নী (capital outlay) এবং ব্যয়বরাদ্দ (revenue expenditure) যাহা প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশটাই পশ্চিমবঙ্গকেই বহন করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পশ্চিমবঙ্গ এই উভয় খাতে যে ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাহা বিহার রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সম্মিলিত দায়িত্বেরও অনেক বেশী। আর ডি. ভি. সি-র উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের যে অধিকতর অংশ পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে একটি পুরাণো ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজ ডি. ভি. সি-র বৈদ্যুতিক শক্তির খরিদ্দারের অভাব নাই, যতটা সরবরাহ করা সম্ভব সবটাই উচিত মূল্যে এবং তৎক্ষণাৎই বিক্রয় হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ডি. ভি. সি. যখন বোখারোতে প্রথম বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে সুরু করে,

তখন এই শক্তির সবটার খরিদ্দার পাওয়াও ভার ছিল। সেই মূল্যে ডি ভি সি হাইটেনশন্ ভোল্টেজে (১১।৩৩ কেভি) বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিতে তখন সক্ষম ছিল, তাহার অনেক কম খরচায় পশ্চিমবঙ্গ-বিহার বৃহৎ শিল্প এলাকার অধিকাংশ শিল্প-সংস্থাই আপন আপন প্রয়োজনমত শক্তি উৎপাদন করিয়া লইত। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কিংবা আসানসোল এলাকার দিশেরগড় কিংবা শিবপুর পাওয়ার সাপ্লাই কোং কিংবা লয়াবাদে সিজুয়া সাপ্লাই কোং, সকলেও অনেক কম খরচায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিত। ১৯৪৬।৪৭ হইতে ১৯৫০।৫১ সাল পর্য্যন্ত ডি ভি সির প্রথম চেয়ারম্যান ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সুধীন্দ্র মজুমদারের প্রভাবে ডি ভি সি প্রস্তুত বৈদ্যুতিক-শক্তির প্রাচুর্য্যের ফলে দামোদর উপত্যকা ভরিয়া বিদ্যুৎশক্তি নির্ভর যে নূতন নূতন মধ্যমানবিশিষ্ট ও ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থা সমূহ গড়িয়া উঠিবে বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার কিছুটাও বস্তুতঃপক্ষে ঘটে নাই। ডি ভি সির আদি পর্ব্বের পরিকল্পনার অধিকাংশই যে বাস্তব হিসাব বিরোধী কল্পনার উপরে মাত্র ভিত্তি করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছিল, বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদনের বেলায় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে খরিদ্দারের অভাবে ডি. ভি. সি-র প্রাথমিক শক্তি উৎপাদনের কাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট চাহিদার অভাব ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে সরকারী চাপ দিয়া দিয়া বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলিকে এবং কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে উহাদিগের স্ব স্ব উৎপাদন-খরচার অনেক অধিক মূল্য দিয়া ডি. ভি. সি-র নিকট হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়। তাহাও সম্ভব হইয়াছিল কেবলমাত্র সরকারী ক্ষমতাবলে ইহাদিগের অতিরিক্ত শক্তির চাহিদা মিটাইবার উপযুক্ত উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতির আমদানী করিবার লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দিয়া। আজ অবশ্য শক্তির চাহিদার অভাব নাই, অভাব কেবল উৎপাদনের এবং সরবরাহের।

যাহা হউক, ডি. ভি. সির কর্ম্মকর্ত্তাগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট তাঁহাদের ন্যূনতম দায়িত্ব প্রথম হইতেই আজ পর্য্যন্ত কখনও মিটাইতে পারেন নাই। বন্যানিরোধ ব্যবস্থার ব্যবহার এমন দায়িত্বহীনতার সহিত করা হইয়াছে যে, ১৯৫৬ সনে বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল ভাসিয়া গিয়া অসম্ভব ক্ষতি সাধন করিয়াছে। তাহার পরে আরও একবার পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, হুগলী জেলাসমূহ বন্যার প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তবে ১৯৫৬ সনের মত এমন সর্ব্ববিধ্বংসী হয় নাই। এই দুইটি বন্যার জন্য ডি. ভি সির অক্ষমতা ও দায়িত্বহীনতা যে প্রভূত পরিমাণে দায়ী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই। কিন্তু এইখানেই ডি. ভি. সির কর্ম্মকর্ত্তাদের অক্ষমতা ও দায়িত্বহীনতার শেষ হয় নাই। সেচের জল সরবরাহের ব্যাপারে প্রথম হইতেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিকট ইঁহাদের ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব কখনও আংশিকভাবের বেশী পরিমাণে পালিত হয় নাই। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উন্নয়নের পথে যে বিরাট্ প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনানুযায়ী উৎপাদন-পরিমাণ কখনই সম্ভব হইবে না, ভবিষ্যতে ডি. ভি. সির নিয়ন্ত্রণাধীনে কখনও সেচের অবস্থা বিশেষ ভাবে উন্নত হইবে এমন আশাও সুদূরপরাহত। বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যাপারেও ডি. ভি. সি. কখনই পশ্চিমবঙ্গের নিকট তাহার ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। অনবরতই সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোৎপাদন যে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

এই সকল কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কিছুকাল হইতেই ডি. ভি. সির নিয়ন্ত্রণাধীন সেচ-ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের আয়োজনসমূহ আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে লইয়া আসা যায় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কেবলমাত্র বিরোধী পক্ষ হইতে নহে, এমন কি সরকার পক্ষ হইতেও কেহ কেহ এমন অভিমত প্রকাশ করিতেছিলেন যে, বাংলা দেশ যখন চুক্তিমত উপযুক্ত সময়ে এবং পরিমাণে সেচের জল (সেচের জলের বিশেষ প্রয়োজন বীজ বপনের সময়ে ও তাহার পর কিছুদিন ধরিয়া এবং বর্ষান্তে ধানে পাক ধরিবার সময়, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে), কিংবা বিঘ্নহীন ভাবে এবং চুক্তি অনুযায়ী পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি কিছুই ডি. ভি. সির নিকট হইতে পাইতেছে না, তখন এই সংস্থাটির জন্য এরূপ প্রচণ্ড আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ ও বহন করিবার কোনই নৈতিক দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নাই এবং এই সংস্থাটির পরিচালন ব্যয়ের যে বৃহত্তম অংশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এ যাবৎ বহন করিয়া আসিতেছিলেন তাহা এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং ইহার বন্যানিরোধ, সেচ-সরবরাহ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ সংস্থাসমূহ স্থাপন করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ আজ পর্য্যন্ত যত অর্থলগ্নী বা খরচ করিয়াছেন তাহা সবই ফেরৎ চাওয়া উচিত। ইহা লইয়া কেন্দ্রীয়

সরকার ও সংবাদপত্র মারফৎ জানা যায়, বিহার সরকারের সঙ্গেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খানিকটা আলোচনা হইয়া থাকিবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও চতুর্থ পরিকল্পনানুযায়ী শক্তি-উৎপাদন সম্প্রসারণের আয়োজনের আলোচনাকালেও এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত কিছুটা আলোচনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হয়ত এই সকল কারণেই এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দাবির যাথার্থ্য কেন্দ্রীয় সরকার মহলে খানিকটা অনুভূত হইতে সুরু করিয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। ইহা অবশ্য ডি. ভি. সির পক্ষে শ্লাঘার পরিচায়ক নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের পুঁজি ও অর্থপুষ্ট এই স্বয়ংস্বাধীন (autonomous) সংস্থাটি কেবল যে আগাগোড়া পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ইহার কর্ম্ম-বিভাগগুলির কোনটিরই সম্বন্ধে আজি পর্য্যন্ত ইহার ন্যূনতম চুক্তি বা দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হয় নাই শুধু তাহাই নহে, উপরন্তু যে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থবিরোধী সকল আয়োজন বা আন্দোলনেই ইহার সোৎসাহ সমর্থন প্রভূত পরিমাণে সকল সময়েই লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহারও প্রমাণের কোন অভাব নাই। তাই ডি. ভি. সিকে বাতিল করিয়া উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে যে সকল সংস্থার সহিত পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ জড়িত আছে, সেই সবগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অধিকারের প্রস্তাব যে জনসাধারণের উৎসাহ-পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না।

সেই কারণেই বোধ হয় আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার একটা চেষ্টা ডি. ভি. সির তরফ হইতে করা হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিম-বঙ্গের স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ-বিরোধী কার্য্যকলাপে বিহার রাজ্য সরকারের পরোক্ষ এবং অপ্রকাশ্য অনুমোদন, এই উভয় মিলিয়া ডি. ভি. সিকে দুঃসাহসী করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গই যে ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় আর্থিক রসদ জোগাইয়া আসিতেছিল তাহা সাময়িক ভাবে উপেক্ষা করা হইলেও, অস্বীকার করা অসম্ভব। সম্প্রতি প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এলাকার মধ্যে অবস্থিত ডি. ভি. সির সকল বন্যানিরোধ, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা-সম্পর্কিত সম্পূর্ণ আয়োজনটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে অর্পণ করা হউক। এই প্রস্তাবটি কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। কিন্তু সম্প্রতি উঁহারা রায় দিয়াছেন যে, বিহার রাজ্যের অন্তর্গত অন্ততঃ মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধ ও তৎসংলগ্ন বৈদ্যুতিক সংস্থাসমূহ একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে না আনিলে, প্রস্তাবিত সংস্থাগুলির পরিচালনদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পালন করা একেবারেই অসম্ভব হইবে।

আমাদের মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সিদ্ধান্তটি তাঁহাদের সদ্বিবেচনারই পরিচয় জ্ঞাপন করে। বন্যা-নিরোধের প্রাথমিক ব্যবস্থা মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধ দু'টির মধ্যে নিহিত আছে। সেচের জলের সরবরাহের মূল উৎসও এই দুইটি বাঁধ-সংশ্লিষ্ট বিরাট জলাশয় দুইটির মধ্যে। উচ্চতম চাহিদা বা অকস্মাৎ (accidental) বিরতির সময় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহে ঐ দুইটি বাঁধ-সংশ্লিষ্ট জলবিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রই ঠেকা দিয়া থাকে। এই তিনটি মূল সংস্থাই যদি অপরের (এবং বিশেষ করিয়া অক্ষমতাদুষ্ট ডি. ভি. সি-র) নিকট ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে বাকী সংস্থাগুলি আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি বন্যানিরোধে, কি সেচ-জল-সর-বরাহে, কিংবা বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহে যে বিশেষ সফলতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইলেও এই-গুলির উপর পশ্চিমবঙ্গের দাবি যে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের এই দাবি মানিতে হইলে বিহার রাজ্যের সমর্থন প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এইটিই বিহার সরকারের বিচার ও বিবেচনাধীন আছে বলিয়া প্রকাশ। কেন্দ্রীয় সরকার বিহার সরকারকে এই বিষয়ে তাঁহাদের সমর্থন যদি স্পষ্টভাষায় জ্ঞাপন করিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ বিহার সরকারের এই বিষয়ে একটা আশু সিদ্ধান্তে অবিলম্বে পৌঁছান সহজ হইত। হয়ত ডি. ভি. সির ন্যায় অন্তর্ব্বর্ত্তী একটা সংস্থা সকল সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের দাবি ও প্রয়োজনের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া এগুলি চালাইতে পারিলে আরও ভাল হইত এবং প্রতিবেশী রাজ্য দুইটির মধ্যে মতান্তরের কোন অবকাশ থাকিত না। কিন্তু এত বৎসর ধৈর্য্য ধরিয়া—অবশেষে একটা কিছু অবিলম্বেই যে না করিলেই নয় ইহা অনস্বীকার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গের দাবির যাথার্থ্য দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত এবং স্বীকৃত হইবে।
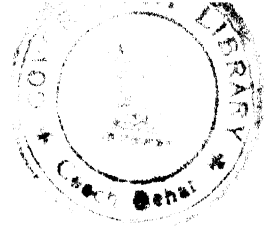
বিপ্লবে বিদ্রোহে

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

৩

সূর্য্য সেনের হাতে ছেলের দল যখন কাজে উপদেশ নিয়েছে, মরণ-বাঁচনের কোন প্রশ্নই তাদের কাছে নেই! প্রাণ ত দেবই—এই সংকল্পই সৃষ্টি করেছে এক উচ্ছল আনন্দ, যে আনন্দকে বলা হয়েছে সর্ব্বসৃষ্টির মূল। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের, জীবন ছিন্নবস্ত্রের মত তুচ্ছ—একথা শেখাতে হয়েছে। শেখাতে বেগ পেতে হয় একথা, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই। এই বিপ্লবীদলের ছেলেদের কাছে এ কিন্তু হয়ে গেছে যেন একান্ত স্বতঃসিদ্ধ। এই এদের চরিত্রের পরিচয়। এই ছেলেমেয়ের দল এসেছে যেন অর্জ্জুনের দিন থেকে এক অভিব্যক্তির ধারা বেয়ে—যুগযুগের পূর্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ সমন্বয়ের শৃঙ্খল অতিক্রম ক'রে। মানবচরিত্রের এই অভিব্যক্তি কি সূচিত করে বিপ্লবেরও অভিব্যক্তির?

যে-জাতের শিক্ষক হয়ে জন্মেছিলেন বিগত শতাব্দীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাণাডে, দয়ানন্দ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ; সে-জাতের প্রথম বাইশ বছর যেমন প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই, ধিংড়া, যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, বসন্ত বিশ্বাস, আবাদ বিহারী, পিংলে, গোপীনাথ, ভগৎ সিং, অনন্তহরি, যতীন দাস,—তেমনি শেষ চার বছরের সূর্য্য সেন, দীনেশ মজুমদার, বিনয় বোস, প্রীতিলতা, রজত সেন, চন্দ্রশেখর আজাদ, নির্মল সেন, দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, অতুল সেন, নরেশ রায়, ব্রজকিশোর, জীবন ঘোসাল, টেগরা বল, অনুজা সেন, তারকেশ্বর, বাদল গুপ্ত, স্বদেশ রায়, নির্মলজীবন, মতি কানুনগো, হরকিষেণ, অপূর্ব সেন, কালিপদ চক্রবর্তী, গোগাটে, মধু দত্ত, মণি লাহিড়ী, অনিল ভাদুড়ী, অনাথ পাঞ্জা, মৃগেন দত্ত, ভবানী ভট্টাচার্য্য, কানাই ভট্টাচার্য, আরও কত, কত জন! এঁরা প্রমাণ দিয়ে যান, জাতের ঐ শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই, আত্মপরায়ণতাই আমাদের আবহমানকালের নয়, আত্মবিলুপ্তির পথও এ-জাত ধরতে জানে।

মৃত্যুর যে-সম্বল এজাত যুগ যুগ ধ'রে হারিয়ে ফেলেছিল, নিজেদের নিঃশেষে মুছে ফেলার আনন্দে সে-সম্পদ্ জাতের জীবনে ফিরিয়ে আনতে আত্মবলি দিলেন সেদিন দেশের অগণিত যুবক আর যুবতী। দেশ আশা ক'রে রয়েছে, এঁদের আত্মদান-সমৃদ্ধ জাত আজকের বিরাট্ সম্ভাবনার বিশাল ক্ষেত্রে এক নতুন জগৎ গ'ড়ে তুলবে। ইতিহাস অনুকরণ নয়, অনুকরণে ইতিহাসের ধারা শুকিয়ে আসে। অতীতের সমৃদ্ধি নিয়ে জাতের চরিত্র গড়ে, সেই চরিত্রের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ মহত্তর, উজ্জ্বলতর হয়ে ফোটে। বিপ্লবের পরিচয় ক'টা বোমা ফাটল, তার ভিতর নয়; কি চরিত্র ফুটল, তার ভিতর।

শতাব্দীর গোড়ায় বিপ্লবী বাংলার মর্মবাণী যেমন ফুটে ওঠে "যুগান্তরের" মুখে, তৃতীয় দশকে তেমনি "স্বাধীনতা"য়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর "স্বাধীনতা"র শেষ সংখ্যায় সম্পাদকীয় বের হ'ল "ধন্য চট্টগ্রাম!" বিদ্রোহী নেতৃত্বের তরফ থেকে প্রশ্ন এল, যাতে বিশ্বাস নেই, তার প্রচার কেন? এর ঠিক পূর্বে বিপ্লবী আর বিদ্রোহী দলের এক মিলন চেষ্টা হয়েছিল। সেই সুবাদেই এই প্রশ্ন। মিলনের সূত্রপাতে বিপ্লবী ভেবেছেন, মিলনে বিপ্লব এগিয়ে যাবে; বিদ্রোহী ভেবেছেন, তাঁদের চেষ্টা প্রসার লাভ করবে। যাঁর যাঁর মনের দিক্ থেকেই ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছেন। দেখা দিয়েছে চিন্তার বিশৃঙ্খলা আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। এই অসম্ভব চেষ্টায় লাভবান্ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি—দুই দলই বিভিন্নভাবে ঘা খেয়েছে। "স্বাধীনতা"-সম্পাদকের জবাব ঐ প্রশ্নের: যা বিশ্বাস করে না, বিপ্লবী তা লেখে না। আজ যা ঘটেছে, আরও যা ঘটতে চলেছে, "স্বাধীনতা" গত এক বছর ধ'রেই তা ব'লে গেছে।

চট্টগ্রামের ঘটনায় যুবকদলে তখন উন্মাদনা এসে গেছে। তাদের কাছে মুখরক্ষা করতে বিদ্রোহী-নেতৃত্বকে বলতে হ'ল, একসঙ্গেই এগোতে চেষ্টা করব। সে-কথায় আন্তরিকতা থাকতে পারে না। সুতরাং যুবকদলের তরফ থেকে বিদ্রোহী-নেতৃত্বের আওতার বাইরে গিয়ে

কিছু করবার চেষ্টা হয় কয়েক ক্ষেত্রে, বন্দীশালা থেকে পালিয়ে। এ যেন স্বধর্মত্যাগ। সাম্রাজ্যবাদী একে বড় একটা নামে অভিহিত করে। কিন্তু এতে কোন চরিত্র ফোটে নাই। প্রাণহীন এই প্রচেষ্টা যেন ১৯৩০ সালের প্রজ্বলিত যজ্ঞবহ্নির নিভন্ত স্ফুলিঙ্গ। তা কাজে লাগল বিপ্লবী শক্তির নয়, বিদেশী শক্তির।

অভ্যুদয়ের পর পতন। জাতের যে-চরিত্র ফুটল, বিশেষ ক'রে ঐ কয় বছরের বাংলায়, তাকে ভয় পাবার কারণ ছিল বই কি সাম্রাজ্যবাদী শাসকের। রামমোহন থেকে অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জাতের শিক্ষকরা মরা জাতের অতীত থেকে তার জীয়ন-কাঠি খুঁজে পেয়েছিলেন। বাইরের দিকের ধর্ম তার তিতিক্ষা, অন্তরের দিকের আত্মানং বিদ্ধি, আর নিত্যকার জীবনের দিকে ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। এরই উপর ভারতীয় বিপ্লবী জীবনের প্রতিষ্ঠা। এই জীবন তার বিপুল বিশাল তরঙ্গে সবে যখন উঠেছে, তারই শীর্ষে দাঁড়িয়ে যতীন্দ্রনাথ হেসে বলেছেন, আমরা মরব, জাত জাগবে। জাগার মত ক'রেই যে জেগেছিল জাত—তা সে দেখিয়ে গেল ঐ শেষ পাঁচ বছরে—১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত।

তারপর? তারপর সুরু হ'ল এই পূর্বপক্ষের প্রতিপক্ষ—এই thesis-এর antithesis। গতানুগতিকতা আর বিপ্লবধর্ম 'পরস্পরে রাঙায় চোখ'। গতানুগতিকতার বাঁধা পথ প'ড়ে ছিল জাতের জীবনে কয়েক শতাব্দী ধ'রে। তার মর্মকথা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আত্মপরায়ণতা হয়ে উঠেছিল তার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। এতেই ভাঙন ধরিয়েছিলেন জাতের ঐ শিক্ষকরা আর তাঁদের দীক্ষায় দীক্ষিত বিপ্লবীরা। দৃষ্টি এড়াল না শ্যেনচক্ষু সাম্রাজ্যবাদীর। ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত আমরা, দেখেছি আর চিনি শুধু সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচারকেই। দেহের উপর অত্যাচার সম্বল ক'রেই যে দু'শ বছর ইংরেজ আমাদের উপর রাজত্ব করে নি, তা আমরা দেখেও দেখি নি। তার অস্তিত্বের এই চূড়ান্ত সঙ্কটকালে সে তার কোন অস্ত্র ব্যবহারেই কার্পণ্য করে নি। তার লক্ষ্য হয়েছিল সেদিন জাতকে বিপ্লব-ধর্ম ভুলিয়ে আবার তার গতানুগতিকতায় ফিরিয়ে নিতে। এই দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সমগ্র নির্যাতনের (total repression-এর) সে নাম দিয়েছিল—বেশ বুদ্ধিমানের মতই নাম দিয়েছিল—অ্যান্টিটেররিষ্ট ক্যাম্পেন। জাতের তরফ থেকেও একটু বুদ্ধিমানের মত চোখ খুলে দেখলেই ধরা পড়ে: এরই মারফৎ সেদিন—

(১) দেশের শিক্ষা ও শিক্ষককে নানাভাবে বিপথে চালানো হয়েছে। সাহিত্য ও সংবাদপত্রও পড়ে এর ভিতরেই।

(২) সিনেমার বহুল প্রচার ও প্রসারও ঐ একই উদ্দেশ্যে।

(৩) খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদও জেলায় জেলায় অভিভাবকশ্রেণীর লোকের সাহায্যে এমন দিকে টেনে নেওয়া হ'ল, যেন চিন্তা ও চরিত্রের গভীরতা গ'ড়ে উঠবার অবকাশ না পায়।

(৪) রাজনৈতিক দিকেও পৃথিবীর ইতিহাসে একটা সফল বিপ্লবের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যে-দল দাঁড়াতে চেয়েছে, তাকেও তুলনায় একটা অকিঞ্চিৎকর আপদ (lesser evil) ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে, আর বন্দীশালায়, আন্দামানে এবং মুক্তির বেলাকার হিসাবেও যেমন, দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তেমনি, নানাভাবে চেষ্টা হয়েছে যাতে এই কম্যুনিষ্ট দল দাঁড়িয়ে যেতে পারে। দেশের মাটিতে যে-আদর্শনিষ্ঠা জেগে উঠেছে, যে-বিপ্লব-ধারা গ'ড়ে উঠেছে, তাকে নিস্তেজ নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে সাহায্য করতে পারে। রাজনীতির শিশুরা জানে না কিন্তু ঝানু সাম্রাজ্যবাদী এ্যাণ্ডারসনের দল জানত, অনুকরণ—বিপ্লব-বিরোধী একরকম স্থিতিস্থাপকতা। তাতে কোন চরিত্রের পরিচয় থাকতে পারে না, কোন মরিয়া ধরণের আন্দোলন গ'ড়ে উঠতে পারে না। তাই এই দলটির মারফৎ জাতির জাগ্রত যৌবনের আদর্শনিষ্ঠার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে।

(৫) অন্য চেষ্টাও হয়েছে। দেশবন্ধুর দিন থেকে বিপ্লবী রাজনীতি বাংলায় ছিল সব্যসাচী, সে ডান হাতে বিপ্লবের আয়োজন করেছে, বাঁ হাতে গণপ্রতিষ্ঠানকে বিপ্লব-যজ্ঞের দিকে টেনেছে। এর ভিতর গণপ্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠার মোহ জাগে বৈকি? বিপ্লব-নিষ্ঠা যে মুহূর্তে স্তিমিত, সেই মুহূর্তে এই মোহজালে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও জড়িয়ে পড়তে পারে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সেই ত ভরসা। স্বরাজ্যদলকে পঙ্গু করবার জন্যে যে-দিন সাম্রাজ্যবাদী শাসক প্রথম বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের পত্তন করে, দেশবন্ধু সেদিন তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের ত্যাগ করেন নাই, বরং তাঁদের আরও আঁকড়ে ধরেছেন। কোনোমতে ক্ষমতায় আসা নয়, সংঘাত সৃষ্টি লক্ষ্য—বিপ্লবে আর স্থিতিস্থাপকতায় সংঘাত। এই বিপ্লবী মনের ধর্ম। দেশবন্ধুর ছিল সেই মন। দেশবন্ধু এদিন নেই, বিপ্লবীতে বিদ্রোহীতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কাজে বিদেশী শাসকের পক্ষে বাংলার এক খ্যাতনামা আইন-জীবীকে কাজে লাগানো সহজ হ'ল। পনেরো বছর পূর্বেও বাংলার কয়েকজন আইনজীবী এই চেষ্টা

করেছিলেন। কিন্তু তখন দেশবন্ধু ছিলেন; তাই অসহযোগের সেই যৌবন-জল-তরঙ্গকে রোধ করা কারো সাধ্যে কুলায় নাই। কিন্তু এখন শাসনচক্রের কেন্দ্রে ব'সে এই বাঙ্গালী আইনজীবী যুগান্তর অনুশীলনের ক্ষমতাদখল-ক্ষমতার উনিশ-বিশের হিসাব কষে। দুর্দমতর বিপ্লব-চেষ্টার পৈশাচিক নিষ্পেষণে দুদিনের মতো জাত তখন ঝিমিয়ে পড়েছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। সর্বদেশে সর্বকালেই পড়ে। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের এই সদস্যটির পক্ষে মোহগ্রস্তের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার উপায় হিসাবে বিপ্লবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর প্রতি আকর্ষণ জাগানো শক্ত হয় নাই। এর পাঁচ বছরের ভিতরেই বিপ্লবী কংগ্রেসকে চুরমার করবার গোড়াপত্তন করেছে।

এরই আশুসিদ্ধান্ত (corollary) হিসাবে এসে পড়ল ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা। অ্যান্টি-টেররিষ্ট ক্যাম্পেনের দিন থেকে দেশে মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদ-সাহিত্য—এসবের উপর নানাভাবে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ প্রবল হয়ে ওঠে। সেই নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে বিদ্রোহী আর বিপ্লবীর সীমারেখা লোপ ক'রে বিপ্লবীকে মুছে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের এই স্বাভাবিক চেষ্টা সহজ হয়েছে, তার কারণ আগেই বলেছি—দেশের সাধারণ লোকের কাছে বিপ্লব-বিদ্রোহের সমস্যাটা এমন ক'রে কখনও ফুটে ওঠার অবকাশ হয়নি। এমন কি, এসবে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদেরও কারও কারও কাছে হয়নি। স্মৃতিকথা কোন্‌টা বিপ্লব-বাদের, কোনটা বিদ্রোহের বার্তার, তা লেখকরাও তলিয়ে দেখেন নাই। ফলে, নাম-করা ঐতিহাসিকরাও পথ হারিয়ে মুড়িমিশ্রি একই দরে বিক্রি করেছেন। গুপ্ত সমিতির ইতিহাস লেখার বিপদ্ কোথায় তা এঁদের অজ্ঞাত। হাতের কাছে যা পেয়েছেন, তা-ই টুকে ইতিহাসের নামে বাজারে ছেড়েছেন। এই পল্লবগ্রাহী যুগে এই জিনিষই গবেষণার নামে চলছে।

(৬) বাংলার গভর্ণর অ্যাণ্ডারসনও হিসাব ক'রে দেখেন, যে নামে বিপ্লবীদল দাঁড়িয়ে যেতে পারে, সেই নাম নিজের বন্ধুদের মারফৎ কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীদের অন্ততঃ চাল মাৎ ক'রে দেওয়া যায় কি না।

কিন্তু নিঃশেষে নিজেকে মুছে ফেলেই যে খোঁজে আপন সার্থকতা, এই সব হিসাব তার নাগাল পায় না। যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয়েরা এই স্তরে বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে পরিপূর্ণ আত্ম-বিলোপ সাধন করলেন। সাধারণ ঘোষণা প্রচার ক'রে যুগান্তরের বিলুপ্তি সাধন করলেন। জাতকে জাগিয়ে জাতীয় প্রতিষ্ঠান দাঁড় করান হয়েছে—রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালা-বাগ, অসহযোগের দিন থেকে আইন অমান্য, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ডালহৌসি স্কোয়ার, লেবং-এর দিন পর্যন্ত। বিপ্লবের সাধনা এরপর সেখান থেকেই চলতে পারবে। এর জন্যে আলাদা আর কোন সদর মোকাম (Headquarters) রাখার প্রয়োজন নেই। যুগান্তরের প্রয়োজনও তাই ফুরিয়েছে। রাজনৈতিক কোন দল এভাবে স্ব-প্রণোদিত হয়ে নিজের বিলোপ সাধন করে না, ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই।

দলের নেতৃস্থানীয়েরা ছিলেন অনেকেই সর্বস্বার্থদৃষ্টি-সর্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীর শিষ্য বা সন্ন্যাসের আদর্শেই গ'ড়ে উঠেছিলেন। তাঁদেরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্ম-বিলুপ্তির আনন্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী থেকে তারাদাস ভট্টাচার্য পর্যন্ত বীরের দল। কারা এঁরা?—যাঁরা এমন অনাড়ম্বরে মিলিয়ে দিলেন নিজেদের "এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে।" তেমনি মিলিয়ে গেল যে এদের কোলে নিয়ে মানুষ করেছিল, সেই যুগান্তর দল। এত বছরে বিদ্রোহী মনের ছোঁয়াচ লেগেছিল অনেকের মনে। তার ফলে যুগান্তরেরই বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় অনেকে এই সংকল্পের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নাই, সিদ্ধান্ত নেবার আগেই তাঁরা স'রে গেলেন। কিন্তু যুগান্তর দল গড়বার আর কোন চেষ্টা হয় নাই। দল গড়বার পাটোয়ারী বুদ্ধি এঁদেরও শিক্ষা-সংস্কারের বাইরে।

৪

এসে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের চরিত্র থেকেই বুঝা গেল, বিদেশী শাসনকে চরম আঘাত হানবার সুযোগ ও সময় এসেছে। কিন্তু পথ কি? বিপ্লব, না, বিদ্রোহ? জাতের অধিকাংশ মানুষ—এমন কি শিক্ষিত মানুষও—দুই পথকে স্পষ্ট ক'রে দেখবে, বুঝবে, এমন আশা করা যায় না। এটা বুঝবার দায়-দায়িত্ব জাতের নেতৃত্বের। দুই রকম চিন্তাই তাঁদের ভিতর দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহের পথের কথা যাঁরা ভাবছিলেন, তাঁরা লড়াইয়ের গোড়াতেই ধ্বনি তুললেন, England's danger is our opportunity। এ-ও সেই অনুকরণ। এঁরা দেখলেন না, সিন্‌ফিন্ কোন্ সময়ে যুদ্ধের কোন্ অবস্থায় এই ধ্বনি তুলেছিলেন। কংগ্রেস-নেতৃত্ব তখন

দেশের সকল দলের কর্মীদের সঙ্গেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরামর্শ করছেন। পুরাণো যুগান্তর দলের কর্মীদেরও ডাকেন।

অরবিন্দ বহু বৎসর আগে বলেছিলেন, রাইফেলই যতদিন সাম্রাজ্যবাদীর চরম অস্ত্র ছিল, ততদিন নিছক অস্ত্রের লড়াইতে পরাধীন জাতের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল। আকাশযানে যুদ্ধের দিনে, কামানেরও ধ্বংস-ক্ষমতা যখন এমন মারাত্মক হয়ে উঠেছে, তখন গেরিলা যুদ্ধেও স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনা অনেক কমে এসেছে। এখন বেশীর ভাগ নির্ভর করতে হবে গণ-শক্তির উদ্বোধনের উপর। অবশ্য, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সহায়তায় পরাধীন জাতের বাধা ব্যাঘাত অনেক কমতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে যতীন্দ্রনাথ যখন জার্মানীর সাহায্য নিয়ে স্থানে স্থানে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করার কল্পনা করেছিলেন, তখন সুভাষচন্দ্র যুগান্তর দলে সবে যোগ দিয়েছেন এবং পরোক্ষভাবে যতীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এবারে যুদ্ধ লাগবার সকল আয়োজন তিনি ইউরোপে থাকতেই দেখেন এবং এই পন্থাতেই অগ্রসর হবার সংকল্প করেন। কংগ্রেস-নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নাই। দেশের বিপ্লব-চেষ্টার দায়-দায়িত্ব তিনি কংগ্রেসের কাছেই ছেড়ে রেখে বিদেশে চ'লে যান। সেখানে তিনি প্রথম জার্মানীতে এবং পরে পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করেন। যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি ভারত অভিমুখে অভিযান চালাতে চালাতে নিজেকে নিঃশেষে বলি দিয়ে যান।

দেশের ভিতর বিপ্লবী-কংগ্রেসের পক্ষে তখন সমস্যা—জাতের জাগ্রত উদ্যমকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; সময় সুযোগ বুঝে কার্যকরী পন্থায় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করা। ভিন্ন রাষ্ট্রের সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা ক'রে তার আত্মশক্তির উদ্বোধন হবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেলা জাতের জাগরণের যে শৈশব ছিল, আজ তা নেই। বিপ্লবের পন্থায় জাত অনেক দূর এগিয়েছে। এখন জাগ্রত জাতের আত্মশক্তির উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করতে হবে। পুরাণো যুগান্তর দলের কর্মী গান্ধীজী যাঁদের চিনতেন, ১৯৩৯ সালে তাঁদের প্রশ্ন করতে, তাঁদের মুখপাত্রের জবাব হ'ল—আইরিশ ইতিহাসের ও কথা এখন খাটে না। কোন লড়াইয়েরই গোড়ার দিকে গণ-সংগ্রামের সুযোগ আসে না। তখন জনগণের সচ্ছলতা বরং বাড়ে, তাদের ভিতর বৈপ্লবিক উত্তেজনা কম থাকে। লড়াই কিছুকাল চলতে থাকলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙবে, জনগণের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কমবে, তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য বাড়বে। ক্রমে হয়ত একটা দুর্ভিক্ষই দেখা দেবে। গণ-সংগ্রামের দিন আসবে ঠিক সেই দুর্ভিক্ষ আসবার পূর্বক্ষণে ("on the eve of that famine")। দুর্ভিক্ষ এসে পড়লে কিন্তু কোন সংগ্রাম চলে না। গান্ধীজী এ-মতে সায় দিলেন।

এই দলের অন্যতম মুখপাত্র বললেন, কিন্তু মহাত্মাজী, হয় নেতৃত্ব নিন, নয়ত স'রে দাঁড়িয়ে অন্যকে নিতে দিন। গান্ধীজী বললেন, আশা হারিও না। তবে ভুলে যেও না, আমি বুড়ো হয়েছি। বিশ বছর আগে যেমন ভরসা পেতাম, অপর পক্ষ অসৎ মতলবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা অন্যবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি করলে নিজে ছুটে গিয়ে একটা সুরাহা করতে পারব, আজ আর নিজের শারীরিক শক্তির উপর সে আস্থা নেই। তবু দেখা যাক্ কি করা যায়।

গান্ধীজী এবং কংগ্রেস-নেতৃত্ব মাসে দু'একবার ক'রে ওয়ার্কিং কমিটিতে একত্র হয়ে তখন পথের আলোচনা করছেন। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাঁরা এই সময় নিজেদের দলের বিলোপ সাধন ক'রে কংগ্রেসেই সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মুখপাত্র তখন সাপ্তাহিক Forward। সেই কাগজেও প্রতি সপ্তাহে এই পথের আলোচনা চলছে। ধীরে ধীরে এই সঙ্কটের বিশ্লেষণে তাঁরা পেলেন : এই যুদ্ধে একপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অপর পক্ষে ফ্যাসিষ্ট শক্তি। ফ্যাসিষ্ট শক্তির উত্থান রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায়। পূর্বপক্ষ Dictatorship of the Proletariat, প্রতিপক্ষ Dictatorship of the Bourgeoisie, এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় লোকায়ত্ত সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদী দুই শক্তির সংঘাত থেকে যদি জন্ম নিয়ে থাকে রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র, আজকের সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিষ্টবাদী রাষ্ট্রের সংঘাতেও বিবর্তনের ধারায় ফুটে উঠবে এক নতুন রাষ্ট্র—হয়ত জনগণের কল্যাণ-রাষ্ট্র। ভারতকে এর জন্যে কয়েক শতাব্দীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত এক সঙ্গে পেরিয়ে যেতে হবে। Forward-এর সেদিনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বলছে—

"In India, we are just going through, as it were, three of the greatest revolutions of the world at one swoop. They are the Reformation, the French Revolution and the Revolution of 1917. Those who are used to

view history from an evolutionary standpoint know what it means. The outside world has come too suddenly upon us and the epilogue of the world history that this war is writing has been too abruptly introduced on the scene of a placid, ancient India. In this devastating whirlpool, when the tops and bottoms are fast tearing away all the ties between them, the Congress has shown wonderful adaptability, an unsuspected vitality. Yesterday's upholder of the sacredness of all hereditary rights, rights of the upper and middle classes, says today: 'Swaraj based on non-violence does not mean mere transfer of power. It should mean complete deliverance of the toiling yet starving millions from the dreadful evil of economic serfdom'."

আদর্শ স্পষ্ট। কিন্তু পথ কোথায়? স-শস্ত্র পন্থায় এই বিরাট্ বিপুল উত্থানের পরিকল্পনা ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব। বৈপ্লবিক আগ্রহ, উত্তেজনা, শক্তির ভারতবাসীর যতখানি অভাব ততখানি যদি অস্ত্র দিয়ে পূরণ করতে যাওয়া যায়, তাহ'লে তা হবে বিদেশী শাসকের হাতে মারণাস্ত্র। জাতের বৈপ্লবিক শক্তি যতখানি ব্যাপক হবে তাকেও সে ক্ষুণ্ণ করবে। কিন্তু বিপ্লব-বহ্নি যদি একবার দেশময় জ্ব'লে ওঠে, তারপর কে কোথায় কতটুকু হিংসার আশ্রয় নিল, না নিল, যায় আসে না। এ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি—বিশেষতঃ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদ এই কর্মীদলের সঙ্গে একমত। ক্রমে গান্ধীজীর মতও এই হয়ে দাঁড়ায়।

তবু কিন্তু পথের সন্ধান মেলে না। ওয়ার্কিং কমিটিতেও আলোচনা হয়। ফরওয়ার্ডেও। এ যেন বিভিন্ন গবেষণাগারে একই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তথ্যানুসন্ধান। সারা জীবন ধ'রে জীবন দিয়ে যাঁরা পথ খুঁজেছেন তাঁদের মতের প্রতি শ্রদ্ধা। পরস্পরকে আকর্ষণ ক'রে। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগ দেবার জন্যে রওনা হবার পথে ফরওয়ার্ডের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এক-একটা প্রুফ-কপিও কোন দিন নিয়ে যান মৌলানা আজাদ। অবশেষে মহাত্মা গান্ধী অকস্মাৎ আবিষ্কার করেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পন্থা।

পরিপূর্ণ সমাধান মিলল এই আসল সমস্যার। বিপ্লবপন্থী কর্মী সবাই খুশী। সেই পুরোণো কথা—জাতের বিপ্লবীসংস্থা কংগ্রেসই জাতের হয়ে বিদেশী শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবে; কেড়ে নিয়ে গণতান্ত্রিক ভারতের শাসন-ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলবে। দেশের অগণিত স্থানীয় সংস্থা যেমন তার নির্বাচক, তেমনি তার রক্ষক, তার শক্তির উৎস। এই সব স্থানীয় সংস্থায় সংহত বিপ্লবশক্তি-দৃপ্ত চল্লিশ কোটি মানুষ। এদের ডাক দিয়ে যাবে প্রতি স্থানে স্থানীয় সেনানায়ক—ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী, The Representative Man। নিরস্ত্র জনগণের মুক্তিসংগ্রামে একান্ত প্রয়োজন এই স্থানীয় নেতৃত্বের। এক নেতা যাবে, অন্য নেতা দাঁড়াবে। নেতার ডাকে দশ হাজার মানুষ, বিপ্লবী মানুষ উঠে দাঁড়ালে, কি করবে স্থানীয় চৌকির একশটা বন্দুক? না হয় এক হাজার লোককে গুলী ক'রে মারবে। বাকী নয় হাজারের হাতে তখন চৌকি আর তার বন্দুক। বিপ্লবের এই পরিকল্পনাতেই ১৯৪২ সালের অভ্যুত্থান যা দাঁড়াবার দাঁড়াল।

বিপ্লবের এই পরিকল্পনাতেই একদিন এমন সম্ভাবনা দেখা দিল, পশ্চিমের ইংরেজ সাম্রাজ্য থেকেই তখন পর্যন্ত জাত মুক্তি পায় নাই, আবার পূর্ব থেকে জাপানী সাম্রাজ্যের বাহিনী প্রবল ঝঞ্ঝার আকারে এগিয়ে আসছে। চেনা ঘোড়াটাকেই আঁকড়ে থাক, বুদ্ধি দিলেন বুদ্ধিমানের দল। দুইকেই রুখতে হবে, বলল জাতের সেদিনকার বিপ্লবী নেতৃত্ব। বিপ্লবের ধর্মই এই। ওর মর্মকথা সেই পুরোণো L'audace l'audace encore de l'audace স্পর্ধা, স্পর্ধা, আরও বেশী স্পর্ধা। সেদিনের ইতিহাসের পাতায় Valmyর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকালে মনে হবে না, এ রাস্তার পাগলের চীৎকার। বিপ্লব-বিধ্বস্ত ফ্রান্স সেদিন সমগ্র ইউরোপকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করেছিল। অভিমন্যুর মত ইউরোপের কোন্ জাত না ফ্রান্সকে ঘিরে ধরতে গিয়েছিল সেদিন? ঘরের পাশে প্রাশিয়া আর অষ্ট্রিয়া সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্র।

কিন্তু এর পরই আমাদের কি হ'ল? ক্ষমতা হস্তগত করা আর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে আসা—এ দু'য়ে দিনে আর রাতে প্রভেদ। কি হ'ল, কেন হ'ল, কি হ'তে পারত, কি করা উচিত ছিল; যে দেশ-বিভাগের বিনিময়ে ক্ষমতা হাতে এল, সেই দেশ-বিভাগের দাবির বৈপ্লবিক সমাধান কখন হ'তে পারত, কি হ'তে পারত, কেন হ'ল না—সে অনেক কথা; সে আলোচনা এখন করব না।

মোটের উপর ইতিহাসের পরিণতি এখানে যাই হয়ে থাক, বিচক্ষণ বিপ্লবী ঐতিহাসিক হাইণ্ডম্যানের

চোখ এড়ায় নাই; সেই ১৯২১ সাল থেকেই এশিয়া আর আফ্রিকার বহু শতাব্দীর দুর্বল পতিত পরাধীন জাতগুলোর দৃষ্টি একলক্ষ্যে দেখছে ভারতের এই নিরস্ত্র বিপ্লবের ধারা। বিপ্লবের সর্বপ্রধান অস্ত্র, জাগ্রত জাতের আত্মসম্মানবোধ। যতীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর এক অনুগামী,—কেমন ক'রে লড়লে তুমি ঐ অতগুলো গোরা সৈন্যের সঙ্গে একলা? জবাব দিলেন যতীন্দ্রনাথ, তুই কি মনে করিস্, গায়ের জোরেই শুধু লড়া যায়? এইটেই আসল কথা। বিপ্লবের এইটেই চরম কথা। আজও বিভিন্ন পরাধীন দেশে যারা প'ড়ে আছে, বিভিন্ন স্বাধীন দেশেও যারা অন্নের দাসত্বে পরাধীন হয়ে প'ড়ে আছে, কোথায় কোন্ আশার আলো ফুটত তাদের চোখে এই আণবিক যুগের অন্ধকারে—যদি না ভারতীয় বিপ্লব চিনাত বিপ্লবের এই শেষ পন্থা নিরস্ত্র মানুষের, 'মরিয়া' সত্যাগ্রহের পন্থা?

মানবজাতের ধ্বংসের বীজ ঐ মিসাইল আর হাইড্রোজেন বোমাও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের মন্ত্রেতন্ত্রে যাবে না; যাবে মানববংশের হয়ে মানব-সন্তান যেদিন বলবে, ক্ষুধার অন্নের দাসত্বও আর করব না, জেল দাও, আর গুলী কর, স্বদেশবিদেশের ভাইকে মেরে নিজে বেঁচে থাকার অপমানও সইব না, মারবার ঐ সব অস্ত্রপাতির কলকারখানা হাতেও ছোঁব না।

কিন্তু আজকের পৃথিবী অবাক্ হয়ে দেখছে—যেমন দেখছে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মানুষ, তেমনি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মানুষ, তেমনি গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ জাতরা; এমন সম্ভাবনাপূর্ণ যে বিপ্লব—উন্মীলনের সঙ্গেই যেন এসে গেল তার নিমীলন! কেন এমন হ'ল? দেশের মানুষও বিস্ময়ে হতবাক্। ভারতীয় বিপ্লবীর তরফ থেকে কিন্তু এর জবাব আছে এবং হতাশায় ঝিমিয়ে না পড়বার কারণও আছে। বিরোধ-সমন্বয়ের বিচারেই পাওয়া যায়, যুগযুগের আত্মপরায়ণ জাত আত্মবিলুপ্তির যে ঊর্ধ্বশিখরে উঠেছিল, তার প্রতিপক্ষও ছিল বাসা বেঁধে তখনও তার রক্তের কণায় কণায়, সে আবার তাকে নামিয়ে নিয়ে এল তার পুরোনো স্ব-ভাবের দিকে। জাতের অগণিত মানুষ জাতের অল্পসংখ্যকের প্রতিপক্ষ। এ যুগে বিপ্লবের, নিরস্ত্র বিপ্লবের সার্থকতা জাতের সকল মানুষের বিপ্লবী আত্মসম্মান জাগিয়ে। তা জাগে নাই। সাময়িক মোহ এসে আবার তাই তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। তার যুগযুগের স্বার্থবুদ্ধি তাকে ক্ষমতা-প্রলুব্ধ ক'রে তুলল।

নেতৃত্বের ভিতরেই বিপ্লবীও ছিল, বিদ্রোহীও ছিল। যেমন ছিলেন সেখানে গান্ধীজী, তেমনি ছিলেন সর্দারজী। যুক্তি হ'ল, ক্ষমতা হাতে পেলে সব কিছু করা যায়। সব কিছু করা যায়, কেবল পারা যায় না জাতকে প্রাণ দিতে। এ যেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগার—যন্ত্র-মানুষ (robot) তৈরী করা যায় সেখানে নিখুঁত, কেবল তার প্রাণ নেই। তাই প্রাণ-চাঞ্চল্যে সজীব একটা বিপ্লবী জাতের সৃষ্টি আসছে না জাতের জীবনে, এসেছে ব্যুরোক্রাসির হাতের প্রাণহীন প্রকল্প আর সংগঠন। আর আছে ঐ ক্ষমতা-লোভের সংক্রামকতা। ক্ষমতার পরে চাকরি, চাকরির পরে ডানহাতে দু'টাকা ভাতা, বাঁহাতে অন্য কিছু। আবার সেই আত্মপরায়ণতার মিশ্-কালো সুড়ঙ্গপথ।

সাম্প্রতিক চীনাযুদ্ধের কালেও দেখা গেল, দেশ যখন আক্রান্ত, তখন সেটা সৈন্যসামন্তেরই ব্যাপারমাত্র। নিজেদের দেশ বাড়ী রক্ষার ব্যাপারেও টাকা যোগানো ছাড়া নিজেদের করবার কিছু নেই। এর নাম স্বাধীনতা নয়, স্বরাজ ত নয়ই। যে আদর্শ নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার লড়াই করেছিল, তা থেকে আবার সে কয়েক দশক পিছিয়ে গেছে, দেশকে আবার সেই সৈন্যসামন্ত আর ব্যুরোক্রাসির হাতে সঁপে দিয়ে। মাথায় ব'সে আছেন মাত্র জন-কতক মন্ত্রী। দেশবাসীর সাথে যোগ তাঁদের যেটুকু তা এই সব কর্মচারীদের মারফৎ।

কিন্তু এ নতুন কিছু নয়। একটা কথা আছে A nation gets the sort of Government it deserves.। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বিস্মৃতির সীমারেখা পর্যন্ত দৃষ্টি ফেলে কোথায় কবে স্ব-শাসন চেয়েছি তা ত খুঁজে পাইনে। চেয়েছি সু-শাসন, সে শায়েস্তা খাঁই করুন আর সার হেন্‌রী ক্রেকই করুন। যেন খেয়েদেয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনের দিন ক'টা কাটিয়ে দিয়ে যেতে পারি। এ পাপস্পর্শ কি রক্তমজ্জা থেকে সহজে যাবার? এখনও অনেক বিরোধ-সমন্বয়ের বজ্রদৃঢ় শিকলের আঘাত খেতে হবে তার জন্য। তার আগে মুক্তি নেই, স্বরাজ নেই। তবে ভরসা আছে—ইতিহাস গরুর গাড়ীর তালে চলার অভ্যাস ছেড়ে দৌড়চ্ছে, সে চলছে এখন জেট প্লেনে দুর্লক্ষ্য গতিতে।

কিন্তু ইতিহাস চলবে তার স্বাভাবিক ধারা ধ'রে—উপস্থিত, এক অদূরের আদর্শ নিয়ে। জনগণের নামে ক্ষমতা আহরণ ক'রে তার উপভোগই সে ক্ষমতাকে

অন্তঃসারশূন্য ক'রে দিয়েছে। হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে যাঁরা জাতের জীবনে প্রাণ এনেছেন, তাঁদের স্মৃতি কারও কারও কাছে আজও অমলিন। তাদের নাম পরিচয় দেওয়া যায় না, কিন্তু তারা আছে। তারা এক দিকে যেমন দেখছে এই চির-ক্ষুধার্ত কৃপাপাত্রের পালকে, আর একদিকে তেমনি তারা জানে, জীবনের পরিপূর্ণতম সার্থকতা কোথায়—সে সার্থকতা নিজের জীবনের রসে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্যে দেশের মাটিকে উর্বর ক'রে যাওয়ার ভিতর। প্রবঞ্চিত মানুষের দুঃখের এরা মূর্ত প্রতীক। সেই দুঃখের অবসান জনগণের কল্যাণ-রাষ্ট্রে। এরই সমৃদ্ধ পরিণতি the withering away of the State। ১৯৪৭ সালে প্রাপ্ত ক্ষমতার প্রতি-পক্ষ গ'ড়ে উঠছে এই পনের বছর ধ'রে সেই ক্ষমতার উপভোগের ধরণের ভিতর দিয়ে। এ দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। এ দ্বন্দ্বের শেষে গ'ড়ে উঠবে কল্যাণ-রাষ্ট্র তাদের হাতে, যারা জানে, নিজেকে নিঃশেষে দিয়েই কেবল পাওয়া যায় জীবনের পূর্ণতা, জীবনের আনন্দ। রাষ্ট্রবিধি নয়, এই আনন্দই হবে এর পর সমাজ-জীবনের নিয়ামক—সেই পুরোণো কথা—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।

—○—

বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম artist। তিনি শুধু অনুবাদক এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকাবলীর লেখক নন। তাঁর লেখা শকুন্তলা, সীতার বনবাস ও ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতিতে) সেই রস আছে যা থাকলে বাক্যসমষ্টি সাহিত্য নামধেয় হয়। প্রথম প্রথম তিনি লম্বা লম্বা সমাস ব্যবহার করতেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমও প্রথম প্রথম তা করতেন। উভয়েই পরে ভাষাকে সহজ ক'রে এনেছিলেন।

সেক্সপীয়রের অনেক নাটকের, শুধু আখ্যান নয়, কথোপকথনের বিস্তর বাক্যও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের গ্রন্থ হ'তে নেওয়া; কিন্তু সেজন্যে কেও তাঁকে তাঁর যশ থেকে বঞ্চিত করে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর যদিও অভিজ্ঞান শকুন্তল, উত্তররামচরিত, বা Comedy of Errors-এর অনুবাদ করেন নি, ঐ নাটকগুলি থেকে উপন্যাসের মত গ্রন্থ লিখেছেন, তবুও আমরা অনেক সময় তাঁকে শুধু অনুবাদকই মনে করি।

১৫।১০।১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ আট ॥

রামকিঙ্করের পরীক্ষা পাসের খবর পেয়ে শিবকিঙ্কর লিখলে :

বাবাজীবন, আমাদের বংশে কেহ কখনও পরীক্ষা পাস করে নাই। তুমি আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার কাকীমা ও ভাইবোনেরা সকলেই খুব আনন্দ করিতেছে। অনেকদিন এবাটী আস নাই। সকলেই তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। কয়েক দিনের ছুটি লইয়া যতশীঘ্র পার একবার বাটী আসিবা।

এখানে বিশ্বনাথের পাশে সে বৈদ্যুতিক আলোর নিচে মাটির প্রদীপের মত জ্বলছিল। মনের মধ্যে গৌরব-বোধ জাগবার অবকাশই পায় নি। তার উপর সকল সময় সামনে হরেকৃষ্ণের মেঘাচ্ছন্ন মুখকান্তি। তার মধ্যে তার মনে একটা গুমোট লেগেই ছিল। কাকার চিঠিতে তার প্রথম গৌরববোধ জাগল। মনে হ'ল, সে ত সামান্য ব্যক্তি নয়। তাদের বংশে সে প্রথম ম্যাট্রিকুলেট।

হরেকৃষ্ণ বলে, এখানে ঝাঁকামুটেও ম্যাট্রিকুলেট। হ'তে পারে। কিন্তু তাদের গ্রামে সে পঞ্চম ম্যাট্রি-কুলেট।

স্কুল দূরে। ছেলেদের রোদ-বৃষ্টির মধ্যে জল-কাদা ভেঙে দু'ক্রোশ যেতে হয়, আসতে হয়। তার উপর ম্যালেরিয়া আছে, কলেরা-বসন্ত আছে। এতগুলি বাধা অতিক্রম ক'রে যারা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে, গ্রামবাসীদের চোখে তারা সামান্য ব্যক্তি নয়।

নিজের অসামান্যতা গ্রামের মধ্যে দেখিয়ে আসবার জন্যে রামকিঙ্করের মনটা উৎসুক হয়ে উঠল।

হরেকৃষ্ণের কাছে যেতে তার ভয় হয়। তবু গেল। কাকার সঙ্গে হরেকৃষ্ণের ভাব মন্দ নয়। কাকার চিঠির কথাই সে তুললে।

শুনে হরেকৃষ্ণ হো হো ক'রে হেসে উঠল : বাপু, তুমি বড় গাছে নৌকো বেঁধেছ। আমি সামান্য লোক। এ সব কথা আমার কাছে কেন?

ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে রামকিঙ্কর কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, আপনি ম্যানেজার। আপনার কাছেই ত—

আঙুল দিয়ে অন্য কর্মচারীদের দেখিয়ে হরেকৃষ্ণ বললে, আমি ম্যানেজার ওদের কাছে। তুমি হ'লে গিন্নীমার খাস কর্মচারী, আমার এক্তিয়ারের বাইরে। হাঃ, হাঃ, হাঃ।

রামকিঙ্কর ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হচ্ছিল।

বললে, তা হ'লে ছুটি পাব না?

—ছুটি!—হরেকৃষ্ণ আবার হো হো ক'রে হেসে উঠল,—তোমার আবার ছুটি কি? খুশি হ'লে কাজ করবে, না হ'লে কাজ করবে না, ছুটি। ম্যাট্রিক পাস ক'রে এখনও যে দয়া ক'রে তেলের পিপে গড়াচ্ছ, সেই ত যথেষ্ট!

রামকিঙ্কর চ'লে এল।

বুঝলে, এখান থেকে ছুটি পাওয়া যাবে না। এবং এর জন্যে গিন্নীমার কাছে যাওয়া, কথায় কথায় গিন্নীমার কাছে যাওয়া, অত্যন্ত অসঙ্গত হবে। সে অন্য ব্যাপারে গিন্নীমার কাছে গেছে। ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হ'লে যেতে পারে। কিন্তু হরেকৃষ্ণ দোকানের ম্যানেজার। তাকে ডিঙিয়ে ছুটির ব্যাপারে গিন্নীমার কাছে দরবার করতে সে প্রস্তুত নয়,—বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা তার যত প্রবলই হোক্।

সে গুম্ হয়ে কাজ করতে লাগল।

সুবল এসে জিজ্ঞাসা করলে, ছুটি হ'ল না?

—না।

—ও দেবে না। তোমাকে গিন্নীমার কাছেই যেতে হবে।

—সে আমি চাই না।

—কেন?

—কথায় কথায় তাঁর কাছে যাওয়া ঠিক নয়। যেটুকু দয়া করছেন, তাও হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে।

—যাবে না।

—কি ক'রে জানলে?

—তুমি কত মাইনে পাও, বাবু জেনে পাঠিয়েছেন।

—তাতে কি ?

সুবল মুচকি মুচকি হাসে: হরেকেষ্টর সন্দেহ, তোমার মাইনে বাড়বে। বোধ হয় কলেজের মাইনেটা যোগ হবে।

রামকিঙ্কর চুপ ক'রে রইল।

সুবল বললে, বাড়া আর কি, যে টাকাটা গিন্নীমার হিসেবে খরচ পড়ছিল, সেটা কোম্পানীর খাতায় পড়বে। তোমার ভাগ্যটা এখন খুব ভালো চলছে হে!

রামকিঙ্কর চম্‌কে সুবলের দিকে চাইলে। এ দোকানে, সত্য বলতে কি, সুবলই তার একমাত্র হিতৈষী। তারও মনে কি হিংসা জমছে? বিচিত্র কিছুই নয়।

সন্ধ্যেবেলায় হরেকৃষ্ণ রামকিঙ্করকে ডাকলে: তোমার কত দিনের ছুটি দরকার?

রামকিঙ্কর অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে। কণ্ঠস্বরটা খুব কর্কশ শোনাল না। মনিবের বাড়ী থেকে কি কোন নির্দেশ এল? কিন্তু তা কি ক'রে আসবে? সে ত সেখানে কিছু জানায় নি।

উত্তর না পেয়ে হরেকৃষ্ণ নিজের থেকেই বললে, সাত দিন হ'লে হবে?

রামকিঙ্কর বললে, না, অতদিন কি ক'রে থাকব? কলেজ রয়েছে। শনিবার যাব, রবিবার, আর তিন-চার দিন হ'লেই হবে।

—তাই হবে। কিন্তু তার বেশি যেন দেরি ক'রো না।

—না।

রামকিঙ্কর কাকাকে চিঠি দিলে, শনিবার সে বাড়ী যাচ্ছে।

ভর্তির জন্যে গিন্নীমা যে একশ' টাকা দিয়েছিলেন, তার থেকে কিছু টাকা তার ছিল। ভাইবোনেদের জন্যে তার থেকে কিছু জিনিষ কিনলে।

সামনের এই দু'তিনটে দিন যেন আর কাটে না। যে গ্রামকে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, ক'দিন ধ'রে সেই গ্রামের অজস্র খুঁটিনাটি সে ভাবতে লাগল। কত দিনের কত ছোটখাটো কথা। একমাত্র তার কাছে ছাড়া যে সব কথার কোন মূল্য নেই।

তার বাল্যবন্ধুদের কথা। তাদের জন-দুই পড়া ছেড়ে দিয়ে চাষবাস দেখছে। একজন এবার পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু পাস করেছে কি ফেল করেছে খবর পায় নি। ফেলই করেছে সম্ভবত। পাস করলে তার কাকার চিঠিতেও একটা খবর পেত নিশ্চয়।

স্টেশনে এসে খোঁজ করলে, যদি চেনা লোক পাওয়া যায়। ওদের গ্রামের লোক কলকাতায় কেউ থাকে না। তবে পাশাপাশি কিছু লোক কলকাতায় থাকে।

কিন্তু কাকেও পেলে না।

স্টেশনে নেমে অনেকখানি পথ হাঁটতে হবে। মোট-পোঁট্‌লা বিশেষ ছিল না। যা ছিল তা হাতে ঝুলিয়েই নিয়ে যাওয়া যায়। ভেবেছিল তার বন্ধুদের কেউ স্টেশনে আসতে পারে। তার বাল্যবন্ধুদের কেউ। যাকে বলা যায় অত্যাগসহনো বন্ধু। ভোরে উঠেই যাদের দেখবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

কিন্তু কেউ আসে নি।

বাড়ী পৌঁছুতে রাত ন'টা হ'ল।

পাড়াগাঁয়ে ন'টা অনেক রাত্রি। পথের দু'পাশের দাওয়া শূন্য। গ্রাম অন্ধকার। মাঝে মাঝে পোদ্দার বুড়োর কাশি ছাড়া জনমানবের সাড়া নেই।

দু'পাশে ঘন বাঁশের বনে জোনাকী উড়ছে।

বাড়ী এসে দেখলে শিবকিঙ্কর অন্ধকারে বৈঠকখানার দাওয়ায় ব'সে তামাক টানছে। বোঝা যায়, তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। এরকম বড় কখনও হয় না।

রামকিঙ্কর কাকাকে প্রণাম করলে।

—আয়। এত দেরি হ'ল যে?

—ট্রেণটা লেট ছিল।

—আমারও তাই মনে হ'ল। আবার মনে হ'ল, তুই বোধ হয় এলি না। চল্, ভেতরে চল্।

শিবকিঙ্কর আগে আগে চলল।

এমনও বড় কখনও হয় না।

সদর দরজা বন্ধ ক'রে উঠান থেকেই হাঁকলে: কই গো, রাম এসেছে।

বড়ঘরের দাওয়ায় শিবকিঙ্করের স্ত্রী যশোদা ছেলে-মেয়ে নিয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। স্বামীর ডাকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল।

—এলি? বাবা! তোর জন্যে ব'সে থেকে এই একটু চোখ টানল। আয়, আয়।

রামকিঙ্কর খুড়ীমাকে প্রণাম করলে।

—আয়, আয়। ওরে, দাদাকে হাতমুখ ধোয়ার জল দে।

সবাই উঠে বসল। দাদার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

—কি রে? চিনতে পারছিস্ না?

সবাই লজ্জিতভাবে হাসলে। চিনতে পারছিল,

কিন্তু কি রকম যেন লাগছিল। মনে হচ্ছিল, চেহারাটা একটু বদ্‌লেছে। সেই সঙ্গে যেন কণ্ঠস্বরও।

খাওয়া-দাওয়ার পরে যশোদা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় শুবি? কোঠার ওপরে, না বৈঠকখানায়?

তিন বৎসর পরে রামকিঙ্কর বাড়ী এল। পূজার সময়ও আসে নি। আসে নি ইচ্ছা ক'রে নয়, অর্থাভাবে। তার আগে এ বাড়ীতে সে যে কোথায় শুত, কোঠার উপরে, না বৈঠকখানায় মনে করতে পারছে না?

শিবকিঙ্কর ধমক দিলে, কোঠার ওপর ও কি শোয় যে আজ শোবে?

তাই বটে। রামকিঙ্কর বরাবর বৈঠকখানায় শুয়ে এসেছে। অর্থাৎ বড় হবার পর থেকে।

জিজ্ঞাসা করলে, সেই তক্তাপোশটা আছে?

—আছে বই কি!—শিবকিঙ্কর বললে।

—তা হ'লে ওইখানেই ভাল।

যশোদা বড় ছেলেকে বললে, দুখু, যা ত বাবা, বৈঠকখানায় দাদার বিছানাটা ক'রে দিয়ে আয়।

হারিকেন নিয়ে দুখু, তার পিছু পিছু রামকিঙ্করও গেল।

সে কলকাতা যাবার পর আর কেউ এ ঘরে শুয়েছে ব'লে মনে হ'ল না। যদিও মেঝেটা, বোধহয় সে আসবে ব'লেই ঝাড়-পোঁছ হয়েছে।

মেঝের কয়েকটা গর্ত চোখে পড়ল। ইন্দুরের গর্ত নিশ্চয়ই। কিন্তু সাপ ইন্দুরের গর্তেই থাকে।

জিজ্ঞাসা করলে, হাঁরে দুখু, সাপ-খোপ নেই ত?

বিছানা পাততে পাততে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে দুখু বললে, থাকলেই বা। তুমি ত মশারির ভেতর শোবে।

তা বটে। মশারির ভিতর শুলে সাপের ভয় নেই।

দুখু জিজ্ঞাসা করলে, তামাক সাজব নাকি?

—কি হবে?

—খাবে না?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, না রে। ও সব ছেড়ে দিয়েছি।

—কি খাও তবে? বিড়ি?

—তাও না।

দুখু অবাক্ হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলে। দাদার শোঁ-টানে কলকে জ্বলে উঠেছে, এ তার নিজের চোখে দেখা। সেই দাদা তামাক দূরে থাক, বিড়ি পর্য্যন্ত খায় না।

তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

সকালে খোলা জানালা দিয়ে বিছানায় রোদ এসে পড়েছিল। রামকিঙ্কর তখনও শুয়ে। প্রথম রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। মুখের উপর রোদ এসে পড়ায় ঘুমটা ভাঙল।

বাইরে বৈঠকখানার সামনের উঠানে তার বন্ধুরা এসে জুটেছে। শিবকিঙ্কর তাদের সঙ্গে গল্প করছে। শুয়ে শুয়েই তাদের কথা রামকিঙ্করের কানে আসছে।

শিবকিঙ্কর বলছে, আর সে রাম নেই হে। আরও খানিকটা লম্বা হয়েছে, রং ফর্সা হয়েছে, কলকাতিয়া চুল ছাঁটা, তার ওপর বিবেচনা কর একটা পাস দিয়েছে, তারও একটু জৌলুস আছে। গলার স্বর পর্য্যন্ত বদ্‌লে গেছে।

শুনে ওরা খুব আমোদ অনুভব করছে: তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—উঠিয়ে দোব?

—না, না। এখানে সকালে ত আর দোকানের কাজ নেই। একটু ঘুমোয় ত ঘুমুক।

মুখে রোদ এসে পড়েছে, রামকিঙ্কর এখনই উঠত কিন্তু তার প্রসঙ্গ আলোচনা হওয়ায় আর উঠতে পারলে না। মটকা মেরে প'ড়ে রইল। একটু পরে যখন ওরা প্রসঙ্গান্তরে পৌছুল তখন ধীরে ধীরে উঠে বাইরে এল।

সবাই এসেছে,—বলাই, গোপী, রাধাকৃষ্ণ, শশী। শুধু কেদার নেই।

রামকিঙ্কর কেদারের কথা জিজ্ঞাসা করলে।

—সে গাঁয়ে নেই।

—কোথা গেল?

—আজকাল আর সে গাঁয়ে থাকে না। শ্বশুরবাড়ীতে বাস করে।

—শ্বশুরবাড়ীতে? কেন?

—শ্বশুরের ওই একটি কন্যে। পয়সা-কড়ি আছে। তারাও ধ'রে বসলে, ও দেখলে গাঁয়ে ব'সে লাঙ্গল ঠেলে লাভ নেই। বোশেখ মাসে গেল, আর ফিরল না।

রামকিঙ্করের মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। তার বন্ধুদের মধ্যে কেদার সবচেয়ে নিরীহ, সবচেয়ে ভালো ছিল। কেদারের সঙ্গেই তার ভাব সবচেয়ে গভীর ছিল।

জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় বিয়ে হ'ল?

—পলাশপুরে।

—বউ কেমন হয়েছে?

—বটে এক রকম।

—আমি কিছুই জানতাম না।

একটু পরে আবার বললে, না। দেশ ছাড়বে কেন, আবার আসবে। দেশ কি কেউ ছাড়ে?

—দেশ না ছাড়ে ভালই। আমরা কিন্তু তাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছি।

আর একজন বললে, তোকেও।

বিস্মিতভাবে রামকিঙ্কর বললে, আমাকে কেন?

—না ত কি? কদ্দিন পরে বাড়ী এলি?

—আমি টাকা-পয়সার অভাবে আসতে পারি না।

—বিয়ে হ'লে আসবি। তোর কাকাকে বলছিলাম এইবার রামের একটা বিয়ে দাও।

রামকিঙ্কর শিউরে উঠল: কি সর্বনাশ! ওই ত মাইনে, এখন বিয়ে করব কি?

—কেন? আমরা কি চাকরি করি? তাই ব'লে বিয়ে করি নি?

—তোদের কথা জানি না।—রামকিঙ্কর অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে।

পল্লীগ্রামে বিবাহটা ছেলেদের কাছে একটা সমস্যাই নয়। এই উপলক্ষ্যে আপাতত একটা প্রাপ্তিযোগ থাকে। দু'পাঁচ বিঘা ধানের জমি প্রায় সকলেরই আছে। তাতে মোটা ভাত-কাপড়টা চ'লে যায়। স্ত্রী ব্যয়বহুল নয়। উদয়াস্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'বেলা দু'টি শাক-ভাত, বছরে তিনখানা শাড়ি, কিছুই নয়। স্ত্রী একাধারে রাঁধুনী, ঝি, সমস্তই। সুতরাং ষোল বছর বয়সের পর ছেলেরা বড় একটা কুমার থাকে না, থাকতে চায়ও না।

কিন্তু শহরের জীবন-যাত্রা রামকিঙ্কর দেখে এসেছে। মেয়েরা সেখানে যে ঘর-সংসার দেখে না, পরিশ্রম করে না, তা নয়। কিন্তু গ্রামে এবং শহরে পরিশ্রমের ধারা বিভিন্ন। গ্রামে সকল কাজই বাড়ীর বউরা করে। শহরে বউরা ততখানি করে না। কিছু ঝিয়ে করে, কিছু চাকর। তার উপর শাড়ি-গহনার বাহার আছে, সিনেমা থিয়েটার আছে, প্রসাধনের খরচ আছে, ছেলেমেয়ে হ'লে তার লেখাপড়ার খরচ আছে। বিবাহের সময় থেকেই স্বামী বেচারার খরচের পথ প্রশস্ত হয়। দেখে-শুনে ছেলেরা বিয়ে করতে ভয় পায়।

পাড়াগাঁয়ে সে সব বালাই নেই। বিয়েটা ভাত-মুড়ি খাওয়ার মতই সহজ এবং উপাদেয়।

রামকিঙ্করের চিন্তিত ভাব দেখে বন্ধুরা খুব আমোদ অনুভব করছিল।

বললে, চিন্তা করিস্ না। তোর জন্যেও মেয়ে দেখা চলছে।

—বলিস কি!— রামকিঙ্কর চমকে উঠল।

—হ্যাঁ। পাতিলপুরের মেয়ে। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। ধান-জমিই দু'শ বিঘে। খামারে পঁচিশটা গোলা। গরু-বাছুর গোয়াল-ভর্ত্তি। তার ওপর একখানা কাপড়ের দোকান আছে। দেবে-থোবেও ভালো। মেয়েটিও বেশ ডাগর-ডোগর। প্রাইমারী দেবে এবার।

বর্ণনা দিয়ে ওরা হাসলে।

পল্লী অঞ্চলে ডাগর মেয়ে বড় পাওয়া যায় না। প্রাইমারী অবধি পড়াও না। মেয়েদের সাধারণত এগারো-বারো বৎসরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। তারা প্রাইমারী পরীক্ষা দেবার আর সুযোগ পায় না। সুতরাং পাত্রী হিসাবে লোভনীয় সন্দেহ নেই।

রামকিঙ্কর বুঝতে পারলে না, ওরা কাকার নির্দেশ-মত এই আলোচনা আরম্ভ করেছে, না নিজেদের খেয়ালমত। উদ্দেশ্য যাই হোক্, এ আলোচনায় আর অগ্রসর হওয়া সুবিধাজনক নয়।

বললে, পলাশপুর যাবি?

—সেখানে কি?

—কেদারের সঙ্গে দেখা করতে। অনেক দিন দেখা নেই। আবার কবে ছুটি পাব, গাড়ি ভাড়া জুটবে, তার ঠিক নেই। চল্ না, সবাই মিলে গিয়ে তার উপর খানিকটা হামলা ক'রে আসি।

হামলার নামে সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। পলাশপুর দূরে নয়। ক্রোশ চারেক। খেয়ে দেয়ে বেরুলে রাত আটটার মধ্যে আবার ফিরতে পারবে। কারও হাতে কোন কাজ নেই।

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

গ্রামের মেঠো রাস্তায় জুতা চলে না। কখনও কাদার জন্যে, কখনও ধুলোর জন্যে। বর্ষার সময় থেকে শীতের মুখ পর্যন্ত কাদা। কোথাও বেশি, কোথাও কম। আরও বেশি হয় গরুর গাড়ি চলার ফলে। কোথাও এত কাদা যে, গাড়ির চাকা বসে যায়। তোলা যায় না। গরু-মোষ পড়লে আর উঠতে পারে না। আবার শীতকালে তেমনি ধুলো। হাঁটু পর্যন্ত ধুলোয় সাদা হয়ে যায়।

আগে এদিকে জুতার চল কম ছিল। এখন জুতা একজোড়া সকলেরই আছে, যদিও তার ব্যবহারের সুযোগ কমই মেলে। যদিও পায়ের জন্যেই কেনা, কিন্তু হাতেই জুতা চলে বেশি। লোকে গ্রাম পার হয়েই জুতা হাতে নেয়। গন্তব্য-গ্রামে ঢোকবার মুখে পায়ের কাদা পুকুর-ঘাটে ধুয়ে পায়ে দেয়।

তেমনি ক'রে রামকিঙ্কররাও পলাশপুরে গিয়ে

পৌঁছল। কেদারের শ্বশুরের নামটা কেউ জানে না। কিন্তু এইটুকু গ্রামে, জামাই হলেও, কেদারের নামটাই যথেষ্ট।

বস্তুত তারও দরকার হ'ল না।

গ্রামে ঢুকেই একটা ছুতোরের দোকান। গরুর গাড়ির চাকা তৈরি হচ্ছে। কেদার সেইখানে ব'সে তামাক খাচ্ছে আর আড্ডা দিচ্ছে। সেইখানে ওদের সঙ্গে দেখা।

কেদার ত অবাক্।

সে ভাবতেই পারেনি, তার গ্রামের বন্ধুদল, বিশেষ ক'রে রামকিঙ্কর, কোন সূত্রে তার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে এসে উপস্থিত হবে।

কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা আনন্দে কেদার কিছুক্ষণ ছটফট্ করলে। তারপর বললে, তারপর? কেমন আছিস্ বল্। রাম কবে এলি? গাঁয়ের সব খবর কি বল্ দিকি।

আরও অনেক প্রশ্ন কেদার জিজ্ঞাসা ক'রে বসত। রামকিঙ্কর বাধা দিলে: গাঁয়ের সব খবর কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জেনে নিবি? তোর শ্বশুরবাড়ী অবধি নিয়ে যাবি না?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

কেদার হন্ হন্ ক'রে আগে আগে চলতে লাগল: আয়, আয়।

ওখান থেকে এক মিনিটের রাস্তা। মোড়টা ঘুরেই। সামনে বোধহয় একটা ন্যাড়া বেলগাছ। তার সামনেই বৈঠকখানা। ডানদিকে মস্তবড় গোয়ালে অনেকগুলি গরু-মহিষ রোমন্থন করছে। এ পাশে কয়েকটা গোলা, মস্ত বড় বড় কয়েকটা খড়ের পালা।

বৈঠকখানায় দু'পাশে দু'খানা ছোট ছোট ঘর, মাঝখানে চাতাল। চাতালের মাঝখানে একখানা ভাঙ্গা চেয়ার। তার সামনে একখানা আম কাঠের টেবিল, ওপাশে ওই কাঠেরই একখানা বেঞ্চি।

কেদার সগৌরবে জানালে, চেয়ার-টেবিল রাখতে হয়েছে, বুঝলি? শ্বশুর ত ইউনান বোর্ডের হাকিম। দারোগা থেকে আরম্ভ ক'রে যত বড় বড় লোক সবই মাঝে মাঝে আসেন। লুচি-মাংস আহার ক'রে বাড়ী যান।

কেদার হা হা ক'রে হাসতে লাগল।

—তোদের কিন্তু রাত্রে এখানে থাকতে হবে। পেছনের পুকুরে সব সময় মাছ জিওনো থাকে। জাল ফেললেই একসের পাঁচপো মাছ উঠে আসবে। রাত্রে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে, সারা রাত গল্প ক'রে, কাল সকালে ছেড়ে দোব।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, তাই বটে! দারোগা এলে লুচি-মাংস আর জামাই-এর বন্ধুদের বেলায় ঝোল ভাত! সেটি হচ্ছে না। থাকলে লুচি-মাংস খাব, নইলে চ'লে যাব।

কেদার খুব বিব্রত হয়ে উঠল। বললে, কি জানিস্ ভাই, তাঁরা সব খবর দিয়ে আসেন। অসুবিধা হয় না। এখন এই অসময়ে হঠাৎ বললে মাংস জোগাড় করা—

বাধা দিয়ে রামকিঙ্কর বললে, কিছু ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমাদের এখনই ফিরতে হবে।

—পাগল নাকি! তোদের দেখে কি আনন্দ হচ্ছে, সে আর বলবার নয়। মনে হচ্ছে, আবার যেন গাঁয়ে ফিরে গেছি। মাইরি বলছি, তাই মনে হচ্ছে।

—গাঁয়ের কথা মনে হয় তোর?

—বলিস্ কি! মনে হয় না? একলা ব'সে থাকলেই গাঁয়ের কথা মনে হয়। মাঝে মাঝে মন যখন খুব খারাপ হয়, তখন কি করি জানিস্?

বড় বড় চোখ ক'রে কেদার সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চাইলে। বললে, আমাদের গাঁয়ে পালের পুকুরের ধারে একটা হাঁটু-ভাঙ্গা দ'-এর মত তালগাছ আছে না? ঠিক সেইরকম একটা গাছ এ গাঁয়েও আছে, সেইখানে গিয়ে বসি। মনে হয় যেন গাঁয়েই আছি।

—তা, চল্ গাঁয়ে।

—যাব একদিন। কিন্তু আজ তোমাদের এইখানেই থাকতে হবে।

রামকিঙ্কর গম্ভীরভাবে বললে, থাকতে ইচ্ছে করছে। তুই যখন বলছিস্। কিন্তু উপায় নেই।

—কেন?

—কাল সকালেই আমাকে দেখতে আসবে।

—তাই নাকি!—আনন্দে কেদার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—তা হ'লে তোর বিয়ে বল্।

কুণ্ঠিতভাবে রামকিঙ্কর বললে, পছন্দ হ'লে তবে ত।

—আলবৎ পছন্দ হবে। তোকে পছন্দ হবে না, এ একটা কথা! মেয়ে কেমন?

—তা কি ক'রে জানব? ওরা জানে।

ওরা বললে, মেয়ে মন্দ নয়, জান্‌লি? রং তোর বউয়ের চেয়ে একটু ফরসাই হবে, কিন্তু মুখশ্রী অত সোন্দর নয়। তবে অবস্থা ভাল, দেবে-থোবেও ভাল।

শুনেই কেদারের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। অস্ফুটে একবার বললে, অবস্থা ভাল!

—খুব ভাল।

—হুঁ।

উৎসাহে ও উত্তেজনায় এদের আসার খবরটা কেদার ভিতরে জানাতে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ভিতরে মেয়েরা টের পেয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ওদের জন্যে বাটিভরা মুড়ি এল, গুড় এল, একবাটি ক'রে গুড়ের চা-ও এল। দারোগাবাবুদেরও গুড়ের চা খেতে হয় কি না কে জানে? বোধহয় হয় না। তাঁরা পূর্বাহ্ণে খবর দিয়ে আসেন কি না।

কেদার অনেক সাধ্য-সাধনা করলে থাকবার জন্যে। বন্ধুদের ছেড়ে দিতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু কাল সকালেই যখন রামকিঙ্করকে দেখতে আসবে, তখন কি আর করা যায়।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে সে মাঠ পর্যন্ত এল। হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে নিলে, কাছাকাছি কেউ কোথায় আছে কি না। তারপর রামকিঙ্করের হাত দু'টি ধ'রে সকাতরে বললে, একটা কথা তোকে বলি রাম।

—বল্।

—অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে করিস্ না।

ওরা অবাক্।

রামকিঙ্কর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, কেন রে?

—না। ওতে সুখ নেই।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। আবার তাও বলি, বিয়ে করবি না কেন, কর্। কিন্তু বিয়ের মজা ওই বউভাত পর্যন্ত।

—তার পরে?

—তার পরে আর মজা নেই।

এবারে ওদের সঙ্গে কেদারও হো হো ক'রে হেসে উঠল।

॥ নয় ॥

আবার সেই কলিকাতা।

সেই গাড়ি-ঘোড়ার ঘর্ঘর, রাস্তার ভিড়, ঘেঁষাঘেঁষি খিস্তি, সেই হরেকৃষ্ণের কুটিল, বিরক্ত মুখ, আর তেলের কারবার। রক্ষা এই যে, কলেজ আছে। সেখানে অবশ্য বিশ্বনাথ নেই। কিন্তু আরও অনেক ছেলে রয়েছে যাদের সরল, সরস, সতেজ মুখ দেখলে মনে আশা এবং স্ফূর্তি জাগে। মন প্রসন্ন হয়।

অনেক দিন দেশে যায় নি, বেশ ছিল। দেশ থেকে ফিরে দেশের জন্যে মন কেমন করে। যখনই একা থাকে, দেশের কথা রোমন্থন করে। বেশ আনন্দ পায়।

কেদারের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। 'বিয়ের মজা ওই বউভাত পর্যন্ত, জানলি? তার পরে আর মজা নেই।' কেদারের মনে যেন আনন্দ নেই। অমন সরল, হাসিখুশী ছেলেটার মুখে যেন বিষণ্ণতার ছায়া। সন্দেহ হয়, বিয়ের আনন্দ তার শেষ হয়ে গেছে।

কেন, কে জানে।

হয়ত ঘর-জামাই রয়েছে সেইজন্যে। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীতে স্বামীকে যতখানি আদর-যত্ন করে, বাপের বাড়ীতে ততখানি করে না বোধ হয়।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতেই বা সে থাকে কেন? তাদের অবস্থা শ্বশুরের মত ভাল না হ'তে পারে, কিন্তু যা আছে তাতে আর পাঁচজনের যেমন চলে তারও তেমনি চ'লে যেত।

কেদারের উপর তার রাগও হয়; তার জন্যে দুঃখও হয়। বেচারা কেদার! ভারী প্যাঁচে প'ড়ে গেছে।

বিশ্বনাথের সঙ্গে সময়াভাবে এসে পর্যন্ত দেখাই করতে পারে নি। দুপুরে একটুখানি ফুরসুৎ আছে। কিন্তু তখন বিশ্বনাথের কলেজ। সন্ধ্যায় দোকান থেকে ছুটি পেলেই ছুটতে হয় কলেজে।

এই অবস্থায় একদিন কলেজে বেরুচ্ছে এমন সময় কলেজ-ফেরত বিশ্বনাথ এসে উপস্থিত।

—কবে ফিরলে?

অপ্রস্তুত ভাবে রামকিঙ্কর বললে, ফিরেছি তিন-চার দিন হ'ল। কিন্তু সময়ের অভাবে যেতে পারি নি তোমাদের বাড়ী।

—বাঃ! বেশ ছেলে! আমরা ভাবছি, তুমি এখনও দেশ থেকে ফেরোই নি। ভাগ্যিস্ আজ এলাম! কলেজ যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—চল। তোমার সঙ্গে কিছুদূর যাই।

দোকান থেকে রাস্তায় নেমে দু'পা যেতেই বিশ্বনাথ বললে, একটা চাকরি খালি আছে। করবে?

—নিশ্চয় করব। কোথায়?

—বাবার জানা একটা অফিসে।

উৎসাহে রামকিঙ্কর লাফিয়ে উঠল। অফিসের চাকরি, জিগ্যেস করছ করব কি না!

—কিন্তু তোমার কি পোষাবে? মাইনে মোটে আশীটি টাকা।

—সে ত অনেক টাকা। এখানে কত পাই জান?

—কিন্তু থাকতে-খেতে পাও। মেসে থাকতে গেলে কত পড়বে জান ?

—কত ?

—পঞ্চাশ টাকার কম নয়। তারপরে জলখাবার আছে, আর-পাঁচটা খরচ আছে।

চিন্তিত ভাবে রামকিঙ্কর বললে, কলেজের মাইনেও আছে। এখান থেকে চ'লে গেলে গিন্নীমা নিশ্চয় কলেজের মাইনেটা দেবেন না। যা বলেছ। ভাববার কথা আছে।

তারপর বললে, আমার মন বলছে এই তেলের পিপের হাত থেকে বাঁচি। কিন্তু—

বললে, তোমার বাবা এখন বাড়ী আছেন ?

—আছেন সম্ভবত।

—তা হ'লে আজ আর কলেজ যাব না। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করিগে চল তিনি যা বলবেন, তাই করা যাবে।

বিশ্বনাথের বাড়ীর দিকে চলতে চলতে রামকিঙ্কর বললে, আসল কথা কি জান, এই দোকানে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না। বিশেষ হরেকেষ্টবাবুর জন্যে।

—তোমাদের ওই বিষমুখো ম্যানেজার ?

—হ্যাঁ।

—ভদ্রলোককে আমারও ভাল লাগে না। আমি তোমাদের দোকানে গেলেই কি রকম বাঁকা চোখে চায়।

—ওই ত! তোমরা যে আমার কাছে আস, তোমাদের জন্যে আমি যে পাস করলাম, কলেজে ভর্তি হলাম, গিন্নীমা যে আমার পরীক্ষার ফি দিলেন, এখনও মাইনে দিচ্ছেন, এটা ও একেবারে সহ্য করতে পারে না। ওর জন্যেই আমার আরও বিরক্ত লাগে।

দু'জনে নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল।

রামকিঙ্কর বললে, ওদিকে আবার গিন্নীমার কথাও ভাবতে হবে। ভদ্রমহিলা আমাকে খুবই অনুগ্রহ করেন। আমি চ'লে গেলে মনে মনে হয় ত দুঃখিত হবেন।

—হওয়াই স্বাভাবিক।

—নয় ?

হেসে বললে, চাকরির যদি একটা সম্ভাবনা দেখা গেল, তার কত বিঘ্ন দেখ! একেই বলে কপাল! মাসীমা কি বলেন ?

—তাঁর ইচ্ছে, তুমি দোকান ছেড়ে দাও। তিনি বলেন, ওখানে থেকে তোমার পড়াশুনা হবে না।

—ঠিকই বলেন। দোকানের হাওয়াই অন্য রকম। মা সরস্বতীর ওখানে প্রবেশ নিষেধ।

দু'জনে হাসতে লাগল।

বিশ্বনাথের বাবা চন্দ্রনাথবাবু পরামর্শদানের দায়িত্ব এড়িয়ে চললেন। কি চাকরি, কি করতে হবে, কাজের সময়, সব বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, এখন তুমিই বল, তোমার সুবিধা হবে কি না।

সুলোচনা ঝঙ্কার দিলেন—ও ছেলেমানুষ, ও কি বলবে ? ও কি কাজ করে, কোথায় থাকে, কেমনভাবে থাকে, সব তুমি জান। অফিসের চাকরি ক'রে চুলও পাকালে। তুমি বলবে, কিসে ওর ভাল হবে, কিসে মন্দ হবে।

চন্দ্রনাথ গৃহিণীর দিকে চেয়ে হাসলেন।

রামকিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওখানে কত পাও আগে বল।

—আজ্ঞে, কুড়ি টাকা পেতাম, দু'টাকা বেড়ে বাইশ হয়েছে। আর থাকা-খাওয়া।

সুলোচনা গালে হাত দিলেন—বছরে মোটে দু'টাকা ক'রে মাইনে বাড়ে ?

রামকিঙ্কর বললে, আজ্ঞে, প্রতি বছর বাড়ে না। দু'চার বছর অন্তর-অন্তর বাড়ে। গিন্নীমা খুশী হয়ে এবারে দু'টাকা বাড়াবার হুকুম দিয়েছেন।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, গিন্নীমা কে ?

—আজ্ঞে দোকানের যিনি মালিক...তাঁর মা।

বিশ্বনাথ বললে, ওর পরীক্ষার ফি তিনিই দিয়েছিলেন। এখনও কলেজের মাইনে তিনিই দেন।

চন্দ্রনাথ বললেন, তা হ'লে মাইনের সঙ্গে ওটাও যোগ কর। দাঁড়াচ্ছে একত্রিশ টাকা।

রামকিঙ্কর বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

গৃহিণীর দিকে চেয়ে চন্দ্রনাথ বললেন, বিশেষ তফাৎ হচ্ছে না তা হ'লে।

সুলোচনা বললেন, কিন্তু অফিসের কাজে উন্নতি আছে।

চন্দ্রনাথ বললেন, সেটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। কারও উন্নতি হয়, আবার কেউ গোঁজে বুড়োয়।

সুলোচনা বললেন, তবু সম্ভাবনা ত রয়েছে।

চন্দ্রনাথ বললেন, তা আছে। কিন্তু ওই গিন্নীমার কথা ভাবছি।

—কি ভাবছ ?

রামকিঙ্করকে চন্দ্রনাথ বললেন, কাল সকালেই তুমি

গিন্নীমার সঙ্গে দেখা কর। তাঁকে সব কথা খুলে বল। তিনি তোমার হিতৈষী। তিনি যা বলবেন, তাই করবে।

সুলোচনা বললেন, ততদিন চাকরী থাকবে?

—তা থাকবে। দু'চার দিন আমি আটকে রেখে দেব। তোমাকে বলি রাম, ওই গিন্নীমাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে কোথাও যাওয়া তোমার ঠিক হবে না।

চন্দ্রনাথবাবুর কথা সুলোচনা ছাড়া আর সকলেরই মনঃপূত হ'ল। রামকিঙ্কর দোকানে চাকরি করে, এ তাঁর ভালো লাগে না। কিন্তু স্বামীর কথার উপর তিনি আর কথা বললেন না। কিন্তু তাঁর মনটা ঠিক প্রসন্ন হ'ল না।

পরদিন সকালেই রামকিঙ্কর গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করলে।

কয়েকদিন যাওয়া-আসার ফলে এখন আর রামকিঙ্করকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এত্তেলা করতে হয় না। বাড়ীর সরকার এবং চাকর-দাসী সকলেই জেনে গেছে, রামকিঙ্কর গিন্নীমার অনুগ্রহ-ভাজন।

রামকিঙ্কর গিয়ে গিন্নীমাকে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ ক'রে বললেন, বসো বাবা। দেশ থেকে কবে ফিরলে?

রামকিঙ্কর একটু অবাক্ হ'ল। সে যে দেশে গিয়েছিল, গিন্নীমা জানলেন কি ক'রে? বোঝা যায়, বাড়ীতে ব'সেও তিনি রামকিঙ্করের, এবং বোধ করি দোকানেরও খবর রাখেন। তার কোন সূত্রও নিশ্চয় আছে।

বললে, তিন-চারদিন হ'ল ফিরেছি।

—বাড়ীর সব খবর ভাল? তোমার কাকা-কাকীমা, তাঁদের ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের আশীর্বাদে সবাই ভাল আছেন।

—বর্ষা কেমন? চাষ-বাস চলছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বর্ষা মন্দ নয়।—ব'লেই হেসে বললে,, আপনি কি চাষ-বাসের খবর রাখেন?

গিন্নীমা-ও হেসে বললেন, রাখি বইকি বাবা। আমি ত পাড়াগাঁয়েরই মেয়ে।

ব'লেই বললেন, তাঁরা এক রকমের বড়লোক। পাঁচজনকে নিয়ে, পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁদের কারবার ছিল। পাঁচজনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যোগ ছিল। এরা নিজেরা বড়লোক। নিজেদের সুখ-ঐশ্বর্য, আরাম-বিলাস নিয়ে আছে। কারও সঙ্গে মনের কোনও যোগ নেই।

গিন্নীমা হাসলেন।

বললেন, অত্যাচারও ছিল বইকি। সে-ও নিজের চোখে দেখা। আবার দান-ধ্যানও ছিল। এরা অত্যাচার তেমন করে না। আবার দান-ধ্যানও করে না। করে, ঘুষ দান করে।

ব'লে হাসলেন।

বুড়ো মানুষ, পুরণো কথা পেলে আর ছাড়তে চান না। অনেক পুরণো কথার পরে রামকিঙ্কর আসল কথা পাড়বার ফুরসুৎ পেলে।

বললে, একটু দরকারে এসেছিলাম।

—বল। পড়াশুনো চলছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু একটু মুশ্‌কিলে পড়েছি।

—কি?

—আমার এক বন্ধুর বাবা আমার জন্যে একটি চাকরি যোগাড় করেছেন।

—কোথায়?

—তাঁর জানা একটি অফিসে। আশী টাকা মাইনে।

—তারপরে?

কাল সন্ধ্যেবেলায় তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে সব কথা বললাম। আপনার কথাও।

—আমার কি কথা?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে রামকিঙ্কর বললে, আপনার অনুগ্রহের কথা।

গিন্নীমার মুখ যেন বেশ প্রসন্ন হ'ল। জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বললেন?

—বললেন, রাম, এই শহরে তাঁর চেয়ে বড় হিতৈষী তোমার আর নেই। চাকরি তোমার জ'ন্যে দু'চার দিন অপেক্ষা করবে। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর। তিনি যা পরামর্শ দেবেন তাই করবে।

গিন্নীমা চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে?

—কিছু না। তবে ওটা অফিসের চাকরি। ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

গিন্নীমা হাসলেন: ভবিষ্যৎ কতদূর মানুষ দেখতে পায় বাবা? ও কিছু নয়। তুমি সন্ধ্যেবেলায় এস বাবা। আমি ছেলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তোমাকে বলব।

রামকিঙ্কর বললে, সন্ধ্যেবেলায় কলেজ আছে।

—বেশ, কাল সকালে এস।

গিন্নিমাকে প্রণাম ক'রে রামকিঙ্কর বেরিয়ে এল।

গিন্নীমা বললেন বটে, কিন্তু ছেলেকে ধরা বড় সহজ কথা নয়। বৃন্দাবনচন্দ্র সন্ধ্যার সময় বাগানে যান, কোনদিন ফেরেন, কোন, দিন ফিরতেই পারেন না। যেদিন ফেরেন সেদিন এত-রাত্রে এমন অবস্থায় ফেরেন যে, তা মা হয়ে চোখে দেখা যায় না।

ফিরেই শুয়ে পড়েন, ওঠেন বেলা এগারোটায়। তারপরে নানারকম পরিচর্যা আছে। তাদের জন্যে খাস-ভৃত্য ঘনশ্যাম আছে। পরিচর্যান্তে বাথরুমে ঢোকেন একটায়, বেরোন ছুটোয়। তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কতকটা সুস্থভাবে আলোচনা করা চলে। পাঁচটার পর বৃন্দাবনচন্দ্র উস্‌খুস্ করেন। সন্ধ্যায় বাগানে যাবার আয়োজনের জন্যে।

গিন্নীমা সেই সময়টা ওঁকে ধরলেন।

—সকালে রাম এসেছিল।

—রাম কে?

—আমাদের বড়বাজারের দোকানের ম্যানেজার ছিল দেবকিঙ্কর,—

বৃন্দাবনচন্দ্রের মনে পড়ল। এমনিতে ভদ্রলোক খুব বুদ্ধিমান্। কথা বুঝতে এক মিনিট লাগে।

বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের দোকানে কাজ করে। কি বলতে চায়?

—কোন্ অফিসে একটা চাকরি পাচ্ছে।

—বেশ ত। যাক্ না।

—কিন্তু ছেলেটা ভালো। এবারে ম্যাট্রিক পাস করেছে।

—জানি। ওর বাবাও খুব ভালো লোক ছিল।

—হ্যাঁ। ওকে আমি ছাড়তে চাই না। তোমার হরেকেষ্ট লোক খুব সুবিধার নয়। চুরি-চামারি করে বলে আমাব সন্দেহ।

মুখ তুলে বৃন্দাবনচন্দ্র সহাস্যে বললেন, সন্দেহ কি, চুরি করে। আমি ত জানি।

—জানিস্? তবে ওকে রেখেছিস্ কেন?

—উপায় নেই ব'লে। হরেকেষ্ট কিছু মারে, কিছু রাখে। ওর চেয়ে ভালো লোক পাব কোথায়? সব চোর।

গিন্নীমা বললেন, আমি বলি রামকিঙ্করকে ম্যানেজার করলে কেমন হয়?

বৃন্দাবন হেসে বললেন, তুমি যা বলবে তাই হবে মা। কিন্তু রামকিঙ্কর যে বড্ড ছেলেমানুষ। ব্যবসায়ে ঘোর-প্যাঁচ আছে। সে কি ও বুঝবে?

—আস্তে আস্তে বুঝবে।

—আস্তে আস্তেই ওকে ম্যানেজার করতে হবে। এত তাড়াতাড়ি নয়। এখন পড়ছে, পড়ুক না।

—কিন্তু চ'লে যেতে চাচ্ছে যে!

—যাবে না। সকলকে বাদ দিয়ে একা ওর মাইনে ত বাড়ান চলে না। ওকে বই কেনবার জন্যে একশ টাকা দিয়ে যাও। এবার পুজোয় সকলকে দু'মাসের মাইনে বোনাস দোব ভাবছি। বড় কম মাইনে পায় বেচারারা। সেই জন্যেই চুরি করে। সেই সময় রামকে আলাদা ডেকে গোপনে আরও কিছু দিয়ে দিও। তাহলেই ওর পুষিয়ে যাবে। আর যাবার নাম করবে না।

বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দ বুদ্ধি দেন নি।

সকালে রামকিঙ্কর এলে গিন্নীমা ম্যানেজার করার কথা প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, বাবা, ভাগ্য কার কখন কোন্ পথে খোলে কেউ জানে না। এখনকার ছেলেরা আপিসে কাজ করার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু ব্যবসাও খারাপ নয়। তুমি দেবকিঙ্করের ছেলে। তাকে আমরা বড় ভালবাসতাম; সেজন্যে তোমার ওপরও একটা টান আছে। তুমি আপিসে যদি যেতে চাও, বাধা দোব না। কিন্তু থাক, এই আমাদের ইচ্ছে।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, তাহলে যাব না মা-জননী।

প্রণাম ক'রে সে উঠে যাচ্ছিল। গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, আর শোন। তোমার বই-টই সব কেনা হয়েছে?

এরই মধ্যে অত বই কেনার রামকিঙ্করের সামর্থ্য কোথায়? সে নতমুখে চুপ ক'রে রইল।

—একটু দাঁড়াও।

ব'লে গিন্নীমা ভিতরে গেলেন। ফিরে এসে একশ টাকার একখানা নোট ওর হাতে দিয়ে বললেন, এইতে বই কিনো। আর অভাব-অভিযোগ কিছু থাকলে আমাকে জানিও।

রামকিঙ্কর আবার একবার তাঁকে প্রণাম ক'রে খুশী হয়ে চ'লে গেল, দোকানে নয়, বিশ্বনাথের বাড়ী। সেখানে বিশ্বনাথের বাবা-মাকে সব কথা খুলে বললে।

চন্দ্রনাথ গৃহিণীর দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন, দেখেছ! আমি তখনই বলেছিলাম, ওদের আশ্রয় ছাড়া রামের পক্ষে ভালো হবে না।

দোকানের চাকরি। সুলোচনার মন একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল বটে, কিন্তু স্বামীর কথার সারবত্তা অস্বীকার করতে পারলেন না। ক্রমশঃ

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন
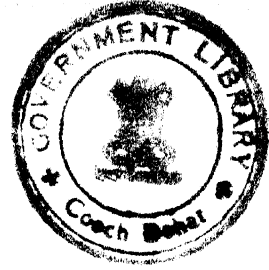
আদালতের জীর্ণ কালো কোটটা শোবার ঘরের হুকে টাঙিয়ে রাখতে গিয়ে রাজচন্দ্র উকিলের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, তারপর এদিক্ পানে ফিরতেই গৃহিণীর চোখে চোখ প'ড়ে গেল।

স্বামী উকিল, কাছারি থেকে ফিরলেই মুক্তামালা আজ তের বছর ধ'রে ওমনি ক'রে কাছে এসে দাঁড়ায় —একদিনেরও ব্যতিক্রম হয় নি। আজও দাঁড়িয়েছে নিস্তব্ধ ছায়ার মত। রাজচন্দ্রও আজ তের বছর ধ'রেই ওমনি ক'রেই দৃষ্টি বিনিময় ক'রে থাকে এই সময়ে, কিন্তু মুক্তামালার দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসছে দিন দিন।

আহা বেচারী! আর একটা দীর্ঘশ্বাস নিজেরই অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল রাজচন্দ্রের বুক খালি ক'রে—মুখে কিন্তু ফুটে উঠল হাসির রেখা। মুক্তার মনে হ'ল, এ হাসি যেন আগের ফেলে-আসা দিনের পরিপূর্ণ হাসি নয় —এ হাসি নিতান্ত বাহ্যিক—হয়ত বা হাসির অভিনয়।

কিন্তু স্বামীরই বা দোষ কি? বেলা দশটায় নাকে-মুখে দুটো গুঁজে ছুটে যায় আদালতে। কাজ নেই, তবু ওকে অভিনয় করতে হয় কর্ম্মব্যস্ততার—অভিনয় চালাতে হয় ফুরসুতহীন বড় উকিলের অনুকরণে, এ এজলাস থেকে ও এজলাসে—এ ঘর থেকে ও ঘরে। আশ্চর্য্য ওর স্নায়ুশক্তি—এই প্রাত্যহিক নিরর্থক অভিনয়ের ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। কিন্তু মুক্তা বেশ বুঝতে পারছে যে, ওর স্বামীর প্রাণরস দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে নিজের বিফলতার দুঃখের তাপে।

রাজচন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস মুক্তা শুনেছে—ধ্বক্ ক'রে উঠেছে বুকের ভেতরটা। এত বড় গ্রীষ্মের দিনে টিফিন বলতে হয়ত জুটেছে, কাছারির দোকানে তেতো এক কাপ গরম পাঁচন, যেটা দোকানদার চা ব'লেই সগর্ব্বে বিক্রি ক'রে থাকে। তাও হয়ত আবার সবদিন—

মুক্তামালার কি হ'ল কে জানে, জড়িয়ে ধরল বিফল-কর্ম্মা রাজচন্দ্রকে—

"কর কি—? কর কি—ছেলেমেয়েরা সব—"

মুক্তা সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিল। তের বছরে এসেছে পাঁচটা ছেলেমেয়ে। এই সব অবৈতনিক স্নেহের প্রহরী কখন কে যে এসে পড়ে—

রাজচন্দ্র শার্ট গেঞ্জি খুলে ব'সে পড়ল চেয়ারে। তিনটে বাজলেই মুক্তা বাইরে বারান্দার দিকে টুলের পাশে সযত্নে রেখে দেয় এক বালতি জল আর একটা গামছা—খেটে আর তেতেপুড়ে আসছে তার স্বামী—কত খাটুনি! হায় মুক্তা, সে খাটুনির কথা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পার না! সে যে কি অদ্ভুত খাটুনি! বার-লাইব্রেরীর খবরের কাগজখানার মায় বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে দেখে যখন চোখদুটো টাটিয়ে ওঠে তখন একবার বেরিয়ে পড়ে অর্থহীন আদালত পরিক্রমায়, চ'লে যায় এজলাস ঘরের দিকে—সেখানেও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি! মফঃস্বলের মুনসেফ আদালত, এখানে তিন-চারজন উকিলের একচেটে ব্যবসা, আর কেউ মাথা গলাতে পারে না। অর্থাৎ ঐ তিন-চারজন ওকালতি ক'রে খান, বাকী সব বাড়ীর খেয়ে ওকালতি করেন। কিন্তু এজলাস ঘরের আট-দশখানা চেয়ারে শোভাবর্দ্ধন ক'রে ব'সে থাকেন প্রবীণ আর প্রায়-প্রবীণ উকিলবাবুরা —কেউ সামনে খুলে ব'সে থাকেন ডেলি কজলিষ্টখানা, কেউ পড়বার ভান করেন অন্যের আর্জ্জি-জবাব। এই ভানের খাটুনি রাজচন্দ্রও খাটে!

"ও কি? হাত-মুখ ধোওনি এখনও—?" রাজচন্দ্রের চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিল মুক্তামালা—এক হাতে ধূমায়িত চা অন্য হাতে খানকয়েক রুটি আর আলুভাজা!

খাবার দেখেই রাজচন্দ্রের মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে ওঠে—হয়ত জীবনের সমস্ত আস্বাদ ওর মুখে জমা হয়েছে আজ।

"মুক্তা, থাক্ ওসব—ভাল লাগছে না—" রাজচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে গড়িয়ে পড়ল নিজের বিছানায়।

ভীষণ অপ্রস্তুত হ'ল মুক্তা—অমার্জ্জনীয় অপরাধী ব'লে মনে হ'ল নিজেকে। প্লেটের ওপর ক'খানা রুটি —সেই কোন্ দুপুরের শেষ উনোনে মুক্তা রুটি ক'খানা ভেজে রেখে দেয় প্রতিদিন—এখন শুকিয়ে হয়ে উঠেছে কাঠ! জলে সেদ্ধ আর তেলের প্রক্ষেপ দেওয়া জড়সড়

আলুভাজা—ছি ছি, এই খেয়ে কি চলে খাটুনির মানুষের? কিন্তু—? কিন্তু মুক্তামালাই বা কি করবে? জীবনে কখনও ওরা কারও সম্বন্ধে অন্যায় করেনি, অথচ ভগবান্—! চক্‌চক্ ক'রে উঠল নিরুপায় মুক্তামালার চোখদুটো—এক মুহূর্ত্ত কি ভাবল, তারপর হন্‌হন্ ক'রে ফিরে গেল রান্নাঘরের দিকে চা আর রুটির প্লেট হাতে নিয়েই।

মুক্তার এমন ক'রে ফিরে যাওয়ার অর্থ রাজচন্দ্র বুঝতে পেরেছে, চড়া গলায় হাঁক দিল—"এই, শুনছ—?"

কিন্তু কোন সাড়া এল না।

কোলের মেয়েটার সাবু আর সকলের চা-বাবদ চিনি কেনা হয় আড়াই ছটাক দৈনিক, আর কেনা হয় দৈনিক একপোয়া দুধ মেয়েটারই নামে। হ্যাঁ, মেয়েটার নামে এইজন্য যে, সকলের চায়ের চাহিদা মেটানর পর যদি কিছু থাকে, তা হ'লে বাকীটা মেশাতে হয় মেয়েটার দৈনন্দিন আহার সাবুতে। কিন্তু সে যাই হোক্, এটা স্বীকার করতেই হয় যে, ভগবান্ আছেন—শুধু ঐ সাবু খেয়েই দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আছে কোলের মেয়ে রুমা! সেই চিনি থেকে রুমাকে বঞ্চিত ক'রে মুক্তা গেল হয়ত রাজচন্দ্রের জন্য সুজি তৈয়ার করতে!

"এই, শুনছ?" রাজচন্দ্র আর একবার চিৎকার করে, কিন্তু কে শুনছে? চায়ের উনোনে চাপান কড়াইয়ে সুজি ভাজার ঘটঘটানি রাজচন্দ্র দিব্যি শুনতে পেল, নাকে এসে লাগল সুজি ভাজার বিশেষ গন্ধ। ফ্যাঁস—ঐ বোধ হয় মুক্তা জল ঢালল সুজির তপ্ত কড়াইয়ে—না না, রাজচন্দ্র কিছুতেই খাবে না অমন সুজি। মুক্তার কোন কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না এ জীবনে।

খানিকটা গরম সুজি আর একটা বাটিতে দুধের সর, যে সরটা একপোয়া দুধ হ'তে তুলে রাখা হয়েছে, নিয়ে মুক্তা আবার হাজির হ'ল রাজচন্দ্রের কাছে—টেবিলের ওপর রেখে বলল—"নাও, ওঠ দেখি—"

চঞ্চল পায়ে দৌড়ে এগিয়ে আসছে রাজচন্দ্রের ছেলে সতু—দূর থেকেই শোনা যায় সে শব্দ। ঠিক এই ভয়টাই করছিল মুক্তামালা—এক মুহূর্ত্ত দেরি না ক'রে সতর্ক সান্ত্রীর মত আগলে দাঁড়াল স্বামীর ঘরের দরজা। যা লোভী হয়েছে সতু! শুধু সতু? বাকী চারটেও তাই। না, কিছুতেই ওকে মুক্তা রাজচন্দ্রের ঘরে ঢুকতে দেবে না এখন।

কিন্তু মুক্তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল—হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল সতু এবং মায়ের আগল-দেওয়া বাহুর নীচ দিয়ে মাথা গলিয়ে ঠিক দেখে ফেলল বাবার জন্য টেবিলে সাজান সুজি, সর। রাজচন্দ্র স্পষ্ট দেখতে পেল, সতুর চোখে নিমেষের লোভাতুর দৃষ্টি। সতু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল থমকে—"বাবা, আজ যে আমার বেল্ট এনে দেবে বলেছিলে—এনেছ?"

"বেল্ট? অ'চ্ছা, সে হচ্ছে। নে, হাত পাত—" রাজচন্দ্র চামচ দিয়ে খানিকটা সুজি তুলে নিয়ে দিতে যায় সতুকে, কিন্তু কোথায় সতু?

মুক্তামালার যে অগ্নিদৃষ্টি আর রুক্ষ ভ্রূকুটি এক নিমেষে সতুকে সেখান থেকে অদৃশ্য ক'রে ফেলেছে তার এক বিন্দুও টের পায়নি রাজচন্দ্র।

"সতু—উ? অ সতু—উ—উ—" রাজচন্দ্র হাঁক দেয়।

"আমাকে ডাকছ বাবা—?" সতু অবশ্য আর এ তল্লাটে নেই, কিন্তু তার বদলে যেন আকাশ থেকে পড়ল কন্যা—মিতু।

"হ্যাঁ—ডাকছেন, এস।" রুক্ষ ভাবে ধমকে উঠল মুক্তামালা—"মুখপুড়ী—ছল করবার আর জায়গা পাও না? মেয়ে কি না, তাই এই বয়সেই এত ধূর্ত্তমি! বলি এখন বাড়ীর ভেতরে তোমার কি রাজকার্য্য আছে শুনি?"

মিতুও অদৃশ্য হ'ল পরমুহূর্ত্তে।

কিন্তু মুক্তামালার গজরানির শেষ নেই—তার মুখ্য বক্তব্য হ'ল এই যে, তুলনা ক'রে দেখলে ছেলেদের অত খাব খাব থাকে না, ওরা কখন্ খায়, কোথায় বেড়ায়! কিন্তু মেয়েগুলো? বাবাঃ, এত খায় কিন্তু ছোঁকছোঁকানি স্বভাব ওদের যায় না! তা নয় ত কি? কাণ্ড দেখ না—'ডাকছ বাবা?' মুখ ভেংচে মুক্তামালা অনুকরণ করল মিতুর, তারপরই রাজচন্দ্রকে ধমক দিল—"খেয়ে নাও দেখি, আমার কত কাজ প'ড়ে আছে—।"

'না', করার ক্ষমতা রাজচন্দ্রের নেই। রাজচন্দ্রের মনে হ'ল, এও একরকমের চুরি। কত ধারা? ৩৭৯? না বেআইনী আত্মসাৎ—৪০৩ ধারা? যাদের প্রাপ্য তাদের ফাঁকি দিয়ে, বঞ্চিত ক'রে চুপি চুপি সুজিটা খেতে হবে রাজচন্দ্রকে। ইচ্ছা হয়, মুক্তাকে জিজ্ঞাসা করে, এ সুজির স্বাদ নোনা না মিষ্টি? কিন্তু যাকে জিজ্ঞেস করবে সে এখন অন্য মানুষ। কথার খেই ধ'রে ধ'রে সে এখন পৌঁছেছে অর্থনীতির মূল তথ্যে—"আজ আমাদের অভাবটা ছিল কিসের? যদি ঐ মুখপোড়া মুখপুড়ীগুলো না আসত? কি দরকার ছিল তোদের আসবার? যা আনছে সবই যাচ্ছে তোদের পিণ্ডির আয়োজনে—"

হাতমুখ ধুয়ে-মুছে রাজচন্দ্র গামছাখানা এগিয়ে ধরল মুক্তার দিকে—"নাও, ধর—"

"ধরগে যাও—" মুখঝামটা দিয়ে মুক্তামালা চ'লে গেল রান্নাঘরের দিকে। রাজচন্দ্র নিঃশব্দে ঢুকল নিজের ঘরে। এর পর সুজির খানিকটা অন্ততঃ না খেলে মুক্তা আজ আস্ত রাখবে না সতু-মিতুদের—অন্যায় ভাবে দায়ী করবে ওদের।

কাজেই খেতে হ'ল সুজি। তারপরই মনে প'ড়ে গেল, সতুর বেল্টের কথা—আজ দিন-সাতেক হ'ল একটা বেল্টের জন্যে আব্দার করছে—কিন্তু পেরে উঠছে না রাজচন্দ্র। বিশ্বাস হচ্ছে না যে, একজন উকিল তার ছেলের জন্য বারো আনা দামের বেল্ট কিনতে পারছে না। কি ক'রে পারবে রাজচন্দ্র? গত বুধবার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে চাঁদা দিতে হয়েছে তিন টাকা—এর কম দিলে কি ভাবত আশ্রমের কর্ম্মীরা, বৃহস্পতিবারে মুন্সেফ বাবুর ফেয়ারওয়েল, শনিবারে গেল জয়রামবাবু উকিলের ছেলের বৌভাত—দিতে হ'ল কিছু। ক্ষমতা থাক্ বা না থাক্, সম্মান রাখার খেসারত অর্থহীন সম্মানী লোককে দিতেই হয়।

"মা,—বাবাকে ডেকে দাও না—কে একজন ডাকছে" —সতু মায়ের কাছ থেকে নিরাপদ্ দূরত্ব বজায় রেখে উঠোনের অন্যপ্রান্ত হ'তে বক্তব্যটা জানিয়ে গেল। কে জানে মায়ের রাগটা পড়েছে কি না।

মুক্তামালাকে ডাকতে হ'ল না, রাজচন্দ্র নিজেই শুনতে পেয়েছে সতুর কথা—গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে নিজের সেরেস্তা ঘরের দিকে চলল। মনে মনে আঁচ ক'রে দেখতে চেষ্টা করে, কে আসতে পারে এই অসময়ে। ডিক্রিজারির পনেরোটা টাকার এক পয়সাও মক্কেল ডিক্রিদারকে দেওয়া হয় নি—আজ হয়ত এসে পড়েছে সে।

না, সে নয়, আশ্বস্ত হ'ল রাজচন্দ্র। যে এসেছে তাকে আদালত এলাকায় প্রায়ই দেখা যায়—হয়ত মক্কেল। রাজচন্দ্রের অনেকদিন পরে ভগবানের কথা মনে হ'ল—ভগবান্। সতুর বেল্টটা তা হ'লে আজই কিনে দিতে পারে। যদি চার টাকা ন'-ই দেয়, দুটো টাকা ত নিশ্চয় দেবে। বারো আনার বেল্ট কিনবে আর অনেক দিন পুরো এক প্যাকেট সিগারেট কেনে নি রাজচন্দ্র।

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল লোকটি—"আদাব উকিল বাবু।"

আদাব। কি চায়?

গলায় কি যেন আটকে গেল লোকটার, কাশল একবার, তারপর অত্যন্ত বিনীত ভাবে মাথা নিচু ক'রে বলল, "উদয়পুরে যে ইনকুয়্যারী করেছেন তার রিপোর্ট দেবার দিন কাল—তাই—"

মনে পড়েছে রাজচন্দ্রের। উকিল কমিশনার হয়ে একটা লোকাল ইনস্পেক্শন ক'রে এসেছে, কিন্তু একে ত উদয়পুরে দেখেছে ব'লে মনে হয় না!—"তুমি কি ঐ মোকদ্দমায় পক্ষ আছ নাকি?"

"না হুজুর। বাদী ইয়াজুদ্দি আমারই চাচেরা ভাই —বেজায় গরীব, কিন্তু বিবাদী এক লম্বরের মামলাবাজ, তার ওপর মস্ত বড়লোক, গাঁ-সুদ্ধ লোক ওর হাতে। আপনি ত নিজের চোখে দেখেছেন, বাড়ীর জল-নিকাশী মুড়িটা বেবাদী বন্ধ ক'রে দিয়েছে মাটি ফেলে—এখন আগনেতে এক হাঁটু জল দাঁড়ায় মুড়ি বন্ধ থাকায়—"

রাজচন্দ্রের চোখের সামনে ভেসে উঠল বিরোধীয় স্থানের চিত্রটা—বাদী তার বাড়ীর জল-নিকাশী মুড়িটা চালাতে চায় বিবাদীর ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে। এরই মধ্যে চারটে ফৌজদারি হয়ে গিয়েছে—এখন শেষ নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতে।

"হুজুরের রিপোর্টেই ইয়াজুদ্দির জীবন-মরণ। আপনি ত সেখানে এক গেলাস জলও খান নি, তাই শুনে এলাম ছুটে—" একখানা দশ টাকার নোট ভাঁজ খুলে সন্তর্পণে রেখে দিল টেবিলে।

—সতুর বেল্ট, গৃহিণীর ব্লাউস, গোয়ালার দুধের দাম, পরিপূর্ণ এক প্যাকেট সিগারেট। তার পরেও হয়ত রাজচন্দ্রের হাতে থেকে যেতে পারে কিছু, যদি গ্রহণ করে ঐ নোটটা—পরিবর্ত্তে রিপোর্ট হবে বাদীর অনুকূলে। আর যদি নোটটা না গ্রহণ করে, যদি ফিরিয়ে দেয়—?

একটা সর্ব্বগ্রাসী ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে এল রাজচন্দ্রের চোখের সামনে। দিনের পর দিন সতুকে দিয়ে যেতে হবে মিথ্যা স্তোকবাক্য, দুধওয়ালাকে বলতে হবে—ঘুম হচ্ছে না নাকি ক'টা টাকার জন্যে? হিসাব ক'রে দিয়ে দোব। অর্থাৎ, রাজচন্দ্র যে টাকাটা দিচ্ছে না সেটা তার আর্থিক অনটনের জন্যে নয়—দিচ্ছে না শুধু হিসাব কষার আলসেমিতে—দৈনিক এক পোয়া দুধের হিসেব।

কিন্তু তাই ব'লে ঘুষ নিতে হবে? একজন নিরীহ লোকের করতে হবে সর্ব্বনাশ? রাজচন্দ্র দেখল, ভাঁজ আর মোচড় খাওয়া দশ টাকার নোটটা আপনা থেকেই ন'ড়ে উঠল, কুঁকড়ে উঠল—একটা মোচড়-খাওয়া কেউটের বাচ্চা যেন ছোবল দিতে উঠল রাজচন্দ্রের টেবিলের ওপর। দেওয়ালে নজর পড়ল—রবিঠাকুর,

বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণের ছবি—ওরা কি শুধু দেওয়ালের অলঙ্কার?

ঘামে ভিজে উঠল রাজচন্দ্রের গেঞ্জিখানা।

লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে রাজচন্দ্রকে দেখে চলেছে—ঠায় পাথরের মত ব'সে ব'সে এত কি ভাবছে উকিল বাবু? এর মধ্যে বিবাদী পক্ষ এসে তদ্বির ক'রে গেল নাকি? দশ টাকাটা বড্ড কম হয়েছে। মোকদ্দমার মূল কথা হ'ল তদ্বির—ভাল তদ্বির। মামলা রুজু করলেই নম্বর পাওয়া যায় না—নম্বর জানতে হয়। গড়জারি না জারি করতে চাও সমন? নথী দেখতে চাও বেদিনে? ইন্‌জাংশনের হুকুম ও-বেলা নাগাদ জারির জন্যে বের করতে চাও? তদ্বির করলে—

না, না, কোন কথা নয়। লোকটা আর একখানা দশ টাকার নোট রেখে দিল টেবিলে, তারপর হাতজোড় ক'রে বলল, "হুজুর, গরীব ভাই—আপনার মান কি আর রাখতে পারে—শুধু পান সিগারেটের জন্যে—আদাব।"

"তোমার নাম কি?"

"হেদায়েতুল্লা—" একগাল হেসে উত্তর দিল।

শোনা নাম। বড় রকমের টাউট। রাজচন্দ্র সমস্ত বুঝে নিয়েছে—মামলার দালাল। উকিল-মোক্তারের ভবিষ্যৎ এরা যতটা নিশ্চয়তার সঙ্গে ভাঙ্গে-গড়ে ততটা নিশ্চয়তার সঙ্গে স্বয়ং ভগবানের ভাঙ্গা-গড়াও চলে না। এই টাউটের পাল্লায় পড়েছে বাদী। ওর ঘাড় ভেঙ্গে নিয়েছে হয়ত পঞ্চাশ টাকা, রাজচন্দ্রকে দিয়েও হয়ত নিট লাভ থাকবে তিরিশ টাকা।

বৈকালিক দ্বিতীয় দফার চা নিয়ে মুক্তা অন্দরে যাবার ভেজানো দরজার ও-পিঠ থেকে কড়াটা নাড়ল—ঐ কড়ার শব্দতরঙ্গের কোড বা ভাষ্য একমাত্র রাজচন্দ্রই বুঝতে পারে, কোন্‌টা মামুলী, কোন্‌টা জরুরী আর কোন্‌টা জুলুমী।

রাজচন্দ্র উঠে গেল চায়ের কাপটা আনতে। মুক্তা-মালা চায়ের কাপটা তুলে দিতে গিয়ে রাজচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখল, কোন প্রাপ্তিযোগের চাপা ঝিলিক্ খেলছে কিনা। স্বামীর সাফল্য বা নিরাশার অনুচ্চারিত ভাষা মুক্তামালা সঠিক ভাবে পড়তে পারে শুধু ওর মুখ দেখে, কিন্তু আজ কিছুই ধরতে পারল না। রাজচন্দ্রের নাকের ডগা, কপাল গেঞ্জি ভিজে উঠেছে ঘামে—কেমন যেন থম্‌থমে ভাব—কি হয়েছে?

"লোকটা কে—মক্কেল?" মুক্তামালা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

রাজচন্দ্র ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকল, কোন উত্তর দিল না—কোন জটিল চিন্তার দুর্ভেদ্য ঠুলি দিয়ে যেন ওর চোখ-কান বন্ধ।

রাজচন্দ্র চায়ে চুমুক দিচ্ছে কিন্তু চিন্তার ছেদ নেই—যে ভদ্রলোক নিজের ছেলের আব্দার রাখতে পারে না, জোগাতে পারে না বাচ্চার দুধ, নিজের স্ত্রীকে যে পরিয়ে রাখে ছেঁড়া ব্লাউস, তার নীতিজ্ঞান টন্‌টনে হবে না তো হবে কার? যথেষ্ট হয়েছে—আর নয়। মুখ থাকতে কেউ নাক দিয়ে খায় না। হাঁটতে জেনেও কে দেয় হামা?

চায়ের খালি কাপটা তাড়াতাড়ি মুক্তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গেল সে সেরেস্তা ঘরে—কিন্তু কোথায় লোকটা? মুক্তামালার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে হয়ত সে স'রে পড়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেছে—নোট দু'খানা টেবিলে চাপা দেওয়া আছে কাঁচের চাপার নিচে।

মুক্তা উঁকি দিয়ে দেখল—রাজচন্দ্র একাই ব'সে আছে গালে হাত দিয়ে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রাজচন্দ্রের চেয়ারের পেছনে—দুখানা দশ টাকার নোট। মুক্তামালার চোখ যেন বিশ্বাস করতে চায় না—স্বামীর পকেট হাতড়ে অত টাকা একসঙ্গে অনেক দিন দেখে নি।

"মক্কেল দিল বুঝি? দাও না গোটা পাঁচেক আজ—" আব্দার করল মুক্তা।

"টাকার কি খুবই দরকার—মুক্তা?"

একটা ভীষণ রূঢ় কথা মুক্তামালার ঠোঁটের ডগায় এল কিন্তু বলা হ'ল না—নিজের জিভটা সংযত করতে পারার গুণে নয়—কথাটা আটকে গেল রাজচন্দ্রের কেমন এক অসহায় মুখের চেহারা দেখে।

বাইরে সিঁড়ির কাছে সাইকেল থেকে নামল এখানকার এক জুনিয়র উকিল—অপরেশ মজুমদার। বছর সাতেক হ'ল ওকালতিতে ঢুকেছে—রাজচন্দ্র বিশেষ স্নেহ করে ওকে। স্বাস্থ্য আর উৎসাহ আছে প্রচুর, তাই উকিল-বারের মুরুব্বিরা নিজেদের রোজগার ওকে সময়াভাবের অজুহাতে ওকে বারের নানা অবৈতনিক কাজের ভার দিয়েছে। অপরেশ পরম উৎসাহে আদায় ক'রে বেড়ায় বার ফাণ্ড, হিসেব রাখে উইকৃলি নোট্‌সের, এ. আই. আর-এর আর গাদা গাদা আইনের বই-এর। কিন্তু ওরা একটা টাকারও সংস্থান ক'রে দেয় না কোন মামলার জুনিয়র নিয়ে—মুনসেফ আদালতে আবার জুনিয়র নেওয়া কি! এতদিন ওর পেন্‌শন পাওয়া বাপ বেঁচে ছিল, কোন ভাবনাই ছিল না। এখন হাড়ে হাড়ে

টের পাচ্ছে যে, পুকুরপাড়ে শুধু তেল গামছার জোগাড়ে যতই তড়বড় ক'রে বেড়াও না কেন, জলে নিজে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না!

অপরেশ একটা ঠেকায় প'ড়ে রাজচন্দ্রের কাছে এসেছে। অপ্রত্যাশিত পিতৃবিয়োগে সাংসারিক বোঝাটা ওর কাঁধে কেটে বসেছে—যত দিন যাচ্ছে ততই ওর চেহারার জৌলুস ম্লান হয়ে আসছে। কোটের হাতায় আর কলারের পেছনে স্থতোর আঁশ উকি মারতে লেগেছে। রাজচন্দ্রের বড় দুঃখ হয় ওকে দেখে—একটা সবুজ সতেজ চারা গাছে যেন ঘর-পোড়ার আঁচ লেগেছে, কিন্তু সাধ্যি নেই যে দৌড়ে পালায়। করবে কি? স্কুলের মাষ্টার? ছাত্র আর সহকর্মীরা আঙুল দেখিয়ে বলবে—কিস্সু হয় নি ওকালতিতে। ব্যবসা? ভারতীয় দণ্ডবিধি ছেড়ে তুলাদণ্ড? উকিলী মেজাজ টুঁটি টিপে ধরবে না অপরেশ মজুমদারের? কাজেই জীবনের পাশার দান ওর চালা হয়ে গিয়েছে।

"বৌদিকে ওকালতি শেখাচ্ছেন নাকি রাজুদা?" অপরেশ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করল।

"না ভাই, নতুন ক'রে আর কিছু শেখাচ্ছি না! যা শিখেছে তারই ঠেলায়—"

"আঃ, কি যে তুমি! আসুন অপরেশবাবু।" মুক্তামালা অভ্যর্থনা করল।

"একটু চা খাওয়ান ত—" আর কিছু বলতে হ'ল না, মুক্তা চ'লে গেল চা করতে।

"মান থাকে না রাজুদা—গোটা পনেরো টাকা যদি—" কানদুটো লাল হয়ে উঠল অপরেশের। ঋণ চাওয়ার মত এতটা আত্মঘাতী অপমান মানুষ আর নিজে নিজেকে অন্য কোন উপায়ে করতে পারে না।

টাকা? পনেরো টাকা? রাজচন্দ্রকে কেটে ফেললেও পনেরো টাকা পাওয়া যাবে না! রাজচন্দ্রের হঠাৎ নজরে পড়ল যে, টেবিলের ওপরেই ত দু'খানা দশ-টাকার নোট প'ড়ে আছে!

"এই নাও—" রাজচন্দ্র এক মুহূর্ত দেরি করল না।

"এ যে কুড়ি টাকা দাদা—আমার কাছে ত ভাঙানি নেই—"

"কিচ্ছু দরকার নেই, তুমি কুড়ি টাকাই নিয়ে যাও।"

কৃতজ্ঞতায় চোখদুটো চকচক ক'রে উঠল অপরেশের, সেই সঙ্গে বার লাইব্রেরীর আর একটা চিত্র ভেসে উঠল চোখের সামনে—বারের চেয়ারে ব'সে দ্বিজেনবাবু দিনের শেষে নিজের বিভিন্ন পকেট থেকে এক-একটি টাকার নোট বের ক'রে দেখিয়ে দেখিয়ে অথচ গল্প করার ছলে সাজিয়ে রাখছেন বাঁ-হাতে। এই নোট সাজানোর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল একটা আদিম পশু-প্রবৃত্তি,—একটা বলিষ্ঠ নেকড়ে বাঘ যেন একটা মৃত পশুর মাংস খুবলে খুবলে নিচ্ছে এখান-ওখান থেকে, দূরে অপেক্ষমান ক্ষুধিত স্বজাতিদের দেখিয়ে দেখিয়ে! কই, দ্বিজেনবাবুর কাছে ত গতকাল পাঁচটা টাকাও ধার পায় নি অপরেশ!

মুক্তামালা দু'কাপ চা এনে টেবিলে রাখল।

"অত ভেবো না অপু। তবু আমি আবার বলছি, তুমি এ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু ধর—নিদেন মোটর গাড়ির ড্রাইভারি।"

"তুমি নিজে যে বড় আঁকড়ে ধ'রে আছ? পরের বেলায় বক্তৃতা না দিয়ে নিজেই ত ছাড়তে পার আগে।" মুক্তামালা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল।

চ'টে উঠল রাজচন্দ্র—"দেখ, মেয়েছেলেদের এটাই বড় দোষ! এঁচড়ের ডালনায় আর মাছের কালিয়ায় সরসে না জিরে কোন্‌টা লাগবে তার নির্দেশ তোমরা না-হয় দিও, কিন্তু কে কি পেশা ধরবে তার নির্দেশও কি তোমাদের কাছ থেকে নিতে হবে?"

অপরেশের নিজের স্ত্রীর চিত্রটাও ভেসে উঠল চোখের সামনে:—এদিক্ দিয়ে কোন পার্থক্য নেই এখানে আর ওখানে! স্ত্রী তরুবালা বলে—"লেখাপড়া শিখে যদি পরিণামে দিনের পর দিন উপোস দেবার জ্ঞান লাভই হয়ে থাকে, তা হ'লে যে অশিক্ষিত বিড়িওয়ালা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চালায় তাকেই বেশী পণ্ডিত বলা উচিত, নাই বা জানল অ, আ, ক, খ। শিক্ষার মুখে আগুন, ঝাঁটা মার পড়াশুনোয়—" তরুবালার তিক্ত কথাগুলো বারংবার ভেসে এল অপরেশের কানে।

কয়েক চুমুকেই চা শেষ ক'রে চ'লে গেল অপরেশ।

"কই, নোট দু'খানা দেখছি না যে?" মুক্তা রাজ-চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল।

"দিয়ে দিলাম অপুকে।" নির্ব্বিকার উত্তর!

"মানে?"

"অপুর বড্ড দরকার। তা ছাড়া ঘুষের টাকা ঘরে না থাকাই ভাল।"

"ঘুষ—!" আঁৎকে উঠল মুক্তা, তারপর বলল, "শেষটা তুমি ঘুষ নিলে?"

"না—আমি নি' নাই। তুমি নিয়েছ, সতু নিয়েছে, মিতু নিয়েছে—"

"কি বলছ—আমি নিয়েছি ঘুষের টাকা?"

"হ্যাঁ,—হ্যাঁ, তোমরাই নিয়েছ।—ঠিক হাত পেতে

নাও নি সত্যি, কিন্তু তোমাদের প্রয়োজন নিয়েছে হাত বাড়িয়ে—আমি নিমিত্ত মাত্র!"

"ও—প্রয়োজন শুধু আমার, মিতুর, সতুর—না? একথা তুমি বললে—" হু হু ক'রে জল বেরিয়ে এল মুক্তামালার চোখ দিয়ে। আজ তের বছর ঘর করছে রাজচন্দ্রকে নিয়ে; অভাব অনটন যতই হোক্ রাজচন্দ্র ত কোনদিন এতবড় কটু কথা বলে নি! মুক্তাই বরং পরিহাস করেছে, ব্যঙ্গ করেছে স্বামীর অনিশ্চিত রোজগার নিয়ে—কতদিন, কতভাবে। কিন্তু আশ্চর্য ওর ধৈর্য—একটুও অনুযোগ করে নি কোনদিন। আজ সেই রাজচন্দ্র কিনা ভাবছে যে, মুক্তামালা তার জীবনে না এলে ছিল ভাল—!

সেই মক্কেলটা আবার ফিরেছে, মুক্তাকে সদরে দেখে ইতস্তত: করছে ঢুকতে। মুক্তামালার কেমন যেন ভয় হয় লোকটাকে আবার আসতে দেখে—কিন্তু উপায় নেই, নিঃশব্দে ফিরে গেল অন্দরের দিকে।

লোকটা ঘরে এসে বসল—ধ্বক ক'রে উঠল রাজচন্দ্রের বুকটা—লোকটার গা থেকে যেন বেরুচ্ছে একটা অজানা বিষের গন্ধ, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে রাজচন্দ্রের, কিন্তু তবু সহ্য করতে হবে। টাকাটা যে ফেরত দেবে তারও উপায় নেই—একটা-দুটো নয়, কুড়িটা টাকা এইমাত্র কোথায় পাবে রাজচন্দ্র? ভগবান্! ভগবান্ ছাদ ফুঁড়েও ত টাকা ফেলে দেন অভাবীর সংসারে—আজ সেই রকম ত দিতে পারেন! ভগবান্! হাসি পেল রাজচন্দ্রের, ভগবান্ আজকাল শুধু তাদের, যারা ভগবানের জন্য শ্বেত-পাথরের হর্ম্যমন্দির তোলে, গড়িয়ে দেয় সোনার মুকুট—চূড়ো!

"লেন বাবু, সিকরেট খান—" এক প্যাকেট সিগারেট রেখে দিল টেবিলে লোকটা, তারপর ব'লে চলল—"বেশী আর কি! শুধু রেপোর্টে লেখে দেবেন যে, ঐটাই একমাত্র জল-নিকাশী মুড়ি—" তারপর চোখ দুটো শয়তানিতে মিটমিট ক'রে বলে, "আর একটা যে মুড়ি আছে অন্যদিকে সেটা চেপে গেলেই হবে! আপনি ভাল রেপোর্ট দেন, আরও—"

"থাম—" উৎকটভাবে ধমকে উঠে রাজচন্দ্র—"কুড়িটা টাকা দিয়ে মাথা কিনতে চাও? তোমার রিপোর্ট আমি দেবই না—"

লোকটা থ।

রাজচন্দ্র কিন্তু প'ড়ে গেল মহা-সমস্যায়।—খুব ত বড়াই করল, কিন্তু নিজে না নিক্, টাকাটা ত প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করা হয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া টাকাটা এখনই বা কোথা থেকে ফেরত দেবে?

দরদর ক'রে ঘেমে উঠল রাজচন্দ্র—অকালেই যেন সন্ধ্যা নেমে এল চোখের উপর।

অন্দরের দরজার কড়াটা বেজে উঠল মুক্তমালার পরিচিত সঙ্কেতে—ভাল লাগল না মোটেই, তবু উঠতে হ'ল।

মুক্তামালা একটা রুমালে বেঁধে নিয়ে এসেছে নোটে, আধুলিতে, সিকিতে মোট তেইশ টাকা বারো আনা—"এক্ষুণি ফিরিয়ে দাও ঘুষের টাকা।"

"এ কি? কোথায় পেলে এত টাকা?"—ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করল রাজচন্দ্র।

মুক্তামালা রাজচন্দ্রের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে দিল দরজার দিকে, "টাকাটা দিয়ে পাপ বিদেয় কর আগে—"

রাজচন্দ্র নোট আর খুচরোতে মোট কুড়ি টাকা গুণে ফেরত দিল লোকটার হাতে। হতবাক্ লোকটা বোকার মত চুপি চুপি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—রাজচন্দ্র পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ফেলে গা'টা এলিয়ে দিল চেয়ারে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে কি না কে জানে, কিন্তু রাজচন্দ্র দেখল দেবার হ'লে ভগবান্ আজও ছাত ফুঁড়েই দেন!

মুক্তামালা চুপি চুপি এসে দাঁড়াল রাজচন্দ্রের চেয়ারের পাশে, চোখে দুষ্টুমির মিটিমিটি হাসি—"তোমার পকেট মেরেই জমিয়েছিলাম।"

রাজচন্দ্র ভুলে গেল যে, এটা সদর ঘর—মুক্তামালাকে পরম উচ্ছ্বাসে কাছে টেনে নিয়ে বলল,—"হায়রে! এমন এক মুক্তামালা কিনা শেষটা এই অভাগা বাঁদরের গলায়! তোমার বাবা কি ভুলটাই না করেছিলেন মুক্তা!"

"বাবা মোটেই ভুল করেন নি কত্তা! আমি চিরদিন জানি যে রাজার গলাতেই ত মুক্তামালা দিয়ে গিয়েছেন।"

দ্বৈত মিষ্টি হাসিতে ভ'রে গেল অভাবী রাজচন্দ্রের সেরেস্তা ঘর।

বিশ্বামিত্র

শ্রীচাণক্য সেন

২

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূজার বেশবাস বদল ক'রে শুভ্র খদ্দরের ধুতি ও কুর্তা পরিধান ক'রে প্রভাতী জলযোগের জন্যে প্রস্তুত হ'লেন। জলযোগ ঠাকুর-বেয়ারা সাজিয়ে দেয় খাবার ঘরে; উপস্থিত থাকেন পরিবারের পুরুষরা সবাই, মেয়েদের কেউ কেউ এবং একান্ত নিকটবর্তী কোনও কোনও রাজনৈতিক কর্মী। কদাপি কখনও নিমন্ত্রিত হন অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সহকর্মী।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, তারা শ্বশুরালয়ে। ছেলেদের মধ্যে চারজন বাবার সঙ্গে থাকে। বড় ছেলে অম্বিকাপ্রসাদ তিনবার আইন পরীক্ষায় ফেল ক'রে চতুর্থবার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে সে আইন কলেজে অধ্যাপক, হাইকোর্টেও যাতায়াত করে। দ্বিতীয় ছেলে শ্যামাপ্রসাদ কাপড়ের ব্যবসায় ভাল উপার্জন করছে। চতুর্থ ছেলে সূর্যপ্রসাদ রাজনীতি করে; বর্তমানে বিধান সভার সদস্য। পঞ্চম ছেলে চন্দ্রপ্রসাদ কিছু করে না। বিলাসপুর সহরে তার পরিচয়, সে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে।

তৃতীয় ছেলে দুর্গাপ্রসাদ বাবার সঙ্গে থাকে না। বিদ্রোহের অপরাধে সে নির্বাসিত। পড়াশুনায় ভাল ছিল, একটানে এম.এ. পর্যন্ত পাস ক'রে গিয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল। ছেলেদের সবাকার চেহারা সুন্দর, কিন্তু দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। গৌরবর্ণ ছ' ফুট দেহে ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভেবেছিলেন, তাকে এম. এল. এ বানাবেন; দু'-তিন বছরের মধ্যে উপমন্ত্রী ক'রে নেবেন। যে কয়জন উপমন্ত্রী আছে তাদের সবার একত্রিত যোগ্যতার চেয়ে দুর্গাপ্রসাদের যোগ্যতা তিনি বেশি মনে করতেন।

কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ বিদ্রোহ ক'রে বসল। তার রাজনীতি বিপজ্জনক পথ ধরল। প্রথমে সে সমাজতন্ত্রী দলে গিয়ে ভিড়ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশেষ বিব্রত হ'লেন না। সমাজতন্ত্র ত কংগ্রেসের আদর্শ, যদি কেউ পারে কংগ্রেসই পারবে তাকে বাস্তব রূপ দিতে। নিজে তিনি সমাজতন্ত্র ব্যাপারটা কি, ভাল জানেন না; কিতাব পড়ার সময় কোথায় যে জানবেন? তবে তিনি যে উদয়াচলকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে কোনদিন তাঁর সন্দেহ জাগে নি। কেননা, সমাজতন্ত্র যখন কংগ্রেসের আদর্শ, এবং তিনি যখন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী, তখন যা-ই না কেন তিনি করুন, তাতেই সমাজতন্ত্রের পথ তৈরী হওয়া উচিত। এমন সহজবোধ্য ব্যাপার নিয়ে এর চেয়ে বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

দুর্গাপ্রসাদ যখন সমাজতন্ত্রী দলে ভিড়ল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভাবলেন, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। কয়েকমাস বিরোধী দলে কাজ করলে লোকের নজরে পড়বে, জনপ্রিয় হবে। তা ছাড়া এ-কালে তরুণদের রাজনীতি করতে গেলে কিছুটা "প্রগতিবাদী" হওয়া দরকার। তাই বাধা দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু মাস ছয়েক পরে একদিন দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি দেখলেন, ছেলের মতিগতি একেবারে ভাল নয়। সে কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজী নয়।

কারণ?

কারণ, কংগ্রেস নাকি আদর্শচ্যুত! তার মুখে কংগ্রেস সরকারের—যার মাথা তিনি নিজে—যে তীব্র নিন্দা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শুনতে পেলেন বিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় তার কাছে নরম হাতবুলানি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে গেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের।

"তুমি সন্তান হয়ে পিতৃনিন্দা করছ! তুমি কুসন্তান।"

দুর্গাপ্রসাদ চুপ ক'রে গিয়েছিল।

"বল, তুমি কংগ্রেসে আসবে কি না!"

"না।"

"তোমার ভবিষ্যৎ ভাল হ'ত।"

"অমন ভালয় আমার লোভ নেই।"

"তিন বছরে আমি তোমায় উপমন্ত্রী করতে পারতাম।"

"তা অত্যন্ত অন্যায় হ'ত।"

"যে পার্টিতে তুমি আছ তার ভবিষ্যৎ কি?"

"সংগ্রাম।"

"তুমি মূর্খ। দেশে আজ, আরও অনেকদিন কোনও,

সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। যে সংগ্রাম আমরা করেছি তার পলিমাটি দেশকে উর্বর করেছে। দেশ এখন গঠনের পথে, সংগ্রাম ক'রে তোমরা কিছু বদলাতে পারবে না।"

"তবু করব।"

"জেলে যেতে হবে।"

"যাব।"

"তবে তাই যেয়ো।" চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

কথাবার্তা সেদিন আর এগোয় নি।

দুর্গাপ্রসাদ কিছুদিনের মধ্যে আবার অঘটন ঘটিয়ে বসল।

এমনি এক প্রভাতী জলযোগের সময় হঠাৎ সে ঘরে ঢুকল। এ বাড়ীতেই সে থাকত, কিন্তু সচরাচর তাকে পারিবারিক আসরে দেখা যেত না। সকালবেলা বেরিয়ে যেত, ফিরত অনেক রাত্রে।

পুরি মুখে দিতে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন।

দুর্গাপ্রসাদ এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

"আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, পিতাজী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

"আমি একটা শুভকাজে আপনার অনুমতি চাইছি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরিতে কামড় দিলেন।

"আমি আগামী কাল বিবাহ করছি, পিতাজী।"

নিস্তব্ধ ঘরের নৈঃশব্দ্য চূর্ণ ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চেঁচিয়ে উঠলেন :

"কি করছ?"

"বিবাহ, পিতাজী। সুরেশ তেওয়ারীকে আপনি চেনেন। তাঁর মেয়ে কমলাকে।"

"সে ত বিধবা!"

"মাত্র এক বছর তার স্বামী জীবিত ছিল।"

"সে ত তোমাদের পার্টিতে বেলেল্লাপনা ক'রে দিন-রাত ঘুরে বেড়ায়।"

"কমলা খুব ভাল কর্মী, পিতাজী।"

"তুমি তাকে বিবাহ করছ?"

"জী, পিতাজী।"

"তাইতে আমার মত চাও?"

"আপনি অনুমতি দিলে ভাল হয়।"

"না দিলে?"

"কমলাকে আমি কাল বিবাহ করছি, পিতাজী।"

"তোমার মা'র মত পেয়েছ?"

"মত পাই নি। তবে তাঁর অমতও নেই।"

হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। পুরিখানা চিবিয়ে খেলেন। তারপর চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন।

এবার বললেন, "তুমি আজই, এখুনি, এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে বিদায় নেবে। একটা অসচ্চরিত্র বিধবাকে পুত্রবধূ আমি করতে পারি না। তুমি কদাপি আর আমার সামনে আসবে না।"

পাঁচ ছেলের মধ্যে তাই চারজন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে বাস করে। মাত্র একজন, দুর্গাপ্রসাদ, এ বাড়ীর কেউ নয়। সহরের বাইরে যে অঞ্চলে দুই কাপড়ের কল, সেখানে ছোট্ট দোতলা বাড়ীর একতলায় সে বাস করে। সে আর তার স্ত্রী কমলা আর তাদের একটি কন্যা, সুভদ্রা।

আজ প্রভাতী জলযোগে যোগদান করতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন উপস্থিত হয়ে দেখলেন, চার পুত্র ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছে। অম্বিকাপ্রসাদের স্ত্রী রাধাও এসে বসেছে। ঠাকুর-বেয়ারা প্রাতরাশ সাজিয়ে রেখেছে বৃহদাকার টেবিলে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঘরে ঢুকে একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে নিলেন, এটা তাঁর অভ্যাস। কোনও ঘরে, সভায়, আসরে, আলোচনায় উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তিনি চতুর্দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নেবার চেষ্টা করেন।

আজ খাবার ঘরের পরিস্থিতি অনুভব ক'রে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বিশেষ খুশী হলেন না। নিঃশব্দে টেবিলের মাঝখানে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। রাধা এক গ্লাস সাস্তরার রস এগিয়ে দিল। নিঃশব্দে পান করলেন।

কর্ণ ফ্লেক্স্ মিলিয়ে এক বাটি দুধ পান করেন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রাতরাশের সময়। দুধ সামনে রেখে তিনি প্রথম কথা বললেন :

"অম্বিকাপ্রসাদ?"

"পিতাজী।"

"তোমার চাকরি কি পার্মানেণ্ট, না এখনও টেম্পোরারী?"

"গত বছর পার্মানেণ্ট হয়েছি। কিন্তু—"

"কিন্তু এখনও সেই লেকচারারই রয়ে গেছ।"

"জী। কিছুতেই রীডারের পোস্ট্‌টা দিচ্ছে না।"

"পাবার যোগ্যতাও তোমার নেই।"

অম্বিকাপ্রসাদ চুপ ক'রে গেল।

"দিচ্ছে না কে?"

"দুর্গাভাই।"

"হুঁ। শক্ত মানুষ। তার ছেলেকে সে আজ পর্যন্ত কোনও চাকরি ক'রে দেয় নি।"

"আপনার নতুন ক্যাবিনেটে দুর্গাভাই যোগ দেবেন?"

বিষণ্ণ হাসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "আমার নতুন ক্যাবিনেট জন্মাবে কি না খুব সন্দেহ, অম্বিকাপ্রসাদ। তাই দেখে নিতে চাই, তোমরা কে কোথায় দাঁড়াতে পেরেছ। আমার আর কি? বৃদ্ধ বয়সে এ সব ঝামেলা আর ভাল লাগে না। একমাত্র দেশের প্রয়োজনে, উদয়াচলের প্রয়োজনে, রাজকার্য্যের গুরুভার অকৃতজ্ঞ দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যে বহন করা।"

কথাগুলি বেশ শোনাচ্ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কানে। হঠাৎ মনে হ'ল, কেউ বুঝি শুনছে না। দেখতে পেলেন, রাধা ঠাকুরকে নির্দেশ দিচ্ছে; অম্বিকাপ্রসাদ সংবাদপত্র পাঠ করছে; শ্যামাপ্রসাদ, সূর্যপ্রসাদ ও চন্দ্রপ্রসাদ চুপি চুপি কিছু একটা আলোচনায় রত।

গলা চড়িয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে উঠলেন, "লেকচারারও তুমি হ'তে পারতে না, তোমার বাবা মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে।"

চমকে উঠে অম্বিকাপ্রসাদ চুপ ক'রে গেল।

"কত মাইনে পাও?"

"তিন শ বত্রিশ টাকা।"

"তোমার ত তিনটি সন্তান, না?"

অম্বিকাপ্রসাদ রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, "জী।"

রাধা চতুর্থবার মা হ'তে চলেছে।

"তোমার দিন চ'লে যাবে। এ দরিদ্র দেশে তিন শ বত্রিশ টাকা কম নয়। খাতাপত্র দেখেও ত কিছু পেতে পার।"

এবার মনোযোগ পড়ল শ্যামাপ্রসাদের ওপর।

"ব্যবসা কেমন চলছে?"

"মন্দ নয়।"

"বাপ চ'লে গেলে এ রকম চলবে?"

"না।"

"উঠে যাবে?"

"মনে হয় না।"

"আমি তোমাকে ব্যবসা গড়তে কোনও সাহায্য করেছি?"

"না।"

"কাউকে বলেছি তোমায় সাহায্যের জন্যে?"

"না।"

"পারমিট পাইয়ে দিয়েছি তোমাকে?"

"না।"

"সরকারী ধার পাইয়ে দিয়েছি?"

"না।"

"তা হ'লে আমি মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে কেন?"

"বা রে! হবে না?"

শ্যামাপ্রসাদ এর বেশি কিছু বলল না। পিতাজীকে সে জানে। আর কিছু বলা তিনি পছন্দ করবেন না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করলেন। তার পর বললেন, "সুখনলাল কটন মিলসের এজেন্সি পেয়ে গেছ?"

"এখনও পাই নি।"

"কেন?"

"দেশপাণ্ডেজী—"

"হুঁ।"

ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ। শক্ত, কঠিন, বক্র নাক হিংস্র হয়ে উঠল।

দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "মাধব দেশপাণ্ডে?"

এর বেশি এগোলেন না। হঠাৎ নজর পড়ল চতুর্থ পুত্রের ওপর।

"সূর্যপ্রসাদ?"

"পিতাজী!"

"তোমার খবর কি?"

"খবর কিছু আছে।"

"বল।"

"এখানেই বলব?"

"বলতে পার। এমন কিছু খবর তুমি সংগ্রহ করতে পারবে ব'লে মনে করি না যা তোমার ভাই-রা জানলে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে।"

সূর্যপ্রসাদের গৌরবর্ণ মুখ অপমানে রক্তিম হ'ল।

সে বলল, "দুর্গাভাইজী দিল্লীতে এক জরুরী পত্র পাঠিয়েছেন।"

মৃদু হেসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "জানি।"

সূর্য্যপ্রসাদ দমে গেল। তবু বলল, "পত্রের বিষয়-বস্তু জানেন?"

"জানি।"

সূর্যপ্রসাদের মুখে আর কথা এগোল না।

"একটা খবর তুমি আমায় দিতে পার, সূর্যপ্রসাদ।"

"কিসের খবর, পিতাজী?"

"হরিশংকর ত্রিপাঠীর বাড়ীতে পরশু রাত্রে পার্টি হয়েছিল, জান?"

"জানি।"

"কারা কারা উপস্থিত ছিলেন জান?"

"সবাকার নাম জানি না।"

"সতাশ-আটাশ বছরের একটি মেয়ে ওখানে এসেছিল জান?"

"জানি।"

"সরোজিনী সহায় তার নাম?"

"তা জানি না।"

"পার্টি না ভাঙ্গতেই এগারোটার সময় মেয়েটি বিদায় নেয়?"

"জানি না।"

"সুদর্শন দুবের গাড়ীতে সে চ'লে যায়।"

"আচ্ছা!"

"সে গাড়ীতে তিনজন পুরুষ ছিলেন। সুদর্শন দুবে, মাধব দেশপাণ্ডে, এবং আর একজন।"

সূর্যপ্রসাদ চুপ ক'রে রইল।

হঠাৎ টেবিলে টোকা মেরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে উঠলেন: "এই যে তৃতীয় ব্যক্তি—দি মিসিং থার্ড ম্যান—ইনি কে ছিলেন বার করতে পার?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে চোখে সূর্যপ্রসাদের চোখে তাকিয়ে রইলেন সে দৃষ্টি চতুর্থ পুত্র সহ্য করতে পারল না। চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ সে ব'সে রইল। তার পর উঠে দাঁড়াল।

বক্র হাসির সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "চেষ্টা ক'রে দেখ। দু'ঘণ্টা সময় আছে। দু'ঘণ্টা পরে মাধব দেশপাণ্ডে আমার কাছে আসবেন। তার আগে খবরটা আমার চাই।"

সূর্যপ্রসাদ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে, তিনি তাকে ডাকলেন।

"শোন।"

সূর্যপ্রসাদ কিছুটা এগিয়ে এল।

"তোমার অগ্রজ দুর্গাপ্রসাদকে মনে আছে?"

সূর্যপ্রসাদ মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"সেই-যে, আমারই ছেলে দুর্গাপ্রসাদ, তোমার বড় ভাই! যে আমার বিরুদ্ধে দিনরাত প্রচার করছে; যার কুলটা স্ত্রী কাপড়-কলের মজদুরদের ক্ষেপিয়ে হরতালের চেষ্টা করছে। তাকে মনে আছে?"

"জী।"

"উদয়াচলে মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব যাতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের হস্তচ্যুত হয় এ জন্যে আজ তারা মজদুরদের মিছিল বার করবে।"

"জানি।"

"মিছিল বার হবে বারোটার সময়। শহরের বড় বড় রাস্তা ঘুরে গান্ধী পার্কে সন্ধ্যাবেলা তাদের সভা হবে।"

"জানি, পিতাজী।"

"আরও নিশ্চয় জান, এ মিছিলের পেছনে সুদর্শন দুবের সমর্থন ও সহায়তা আছে?"

"শুনেছি।"

"মজদুরদের মিছিল ও সভাকে আমি ভয় করি না। কিন্তু সুদর্শন দুবের গোপন চেষ্টায় জনসভায় অনেক সাধারণ মানুষের আগমন হ'তে পারে।"

"শুনেছি, এ সভার মারফৎ ওঁরা হাইকমাণ্ডকে জানিয়ে দিতে চায় যে উদয়াচলের জনসাধারণ—।"

"বলতে গিয়ে থামলে কেন? জনসাধারণ আমাকে চায় না, এই ত?"

"জী।"

"জনসাধারণ কা'কে চায়?"

সূর্যপ্রসাদ চুপ ক'রে রইল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে চললেন: "জনসাধারণ কে, কারা, কোথায় তাদের অস্তিত্ব? কারখানার মজুর? মাঠের চাষী? ছাপোষা কেরাণী? স্কুলের শিক্ষক? কলেজ-পালান ছেলে-ছোকরাদের দল? তারা রাজনীতির কি জানে? তারা পারবে রাজত্ব করতে? তারা জানে কি তারা চায়, কাকে তারা চায়? তারা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে কতটুকু জানে? সুদর্শন দুবেকে কি তারা একটুও চেনে? না, মাধব দেশপাণ্ডেকে, বা হরিশংকর ত্রিপাঠীকে? যদি চেনে, তা হ'লে তারা কাউকে চায় না। অথচ তারা চাক্ কি না চাক্, রাজত্ব আমরাই করব—হয় আমি, নয় হরিশংকর ত্রিপাঠী, নয় মাধব দেশপাণ্ডে, নয় সুদর্শন দুবে। আর নয়ত সবাই একসঙ্গে, যেমন এতদিন ক'রে এসেছি।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "ঠিক কথা।"

"জনসভা, অতএব, জনমত নয়। জনমতে রাজত্ব চলে না।"

"তবু গণতন্ত্রে—"

"তোমার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনার সময় নেই আজ। তা ছাড়া, তুমি এসব বুঝবেও না। এম.এল.এ হয়েছ বাপের জোরে; আজ আমার গদি গেলে ওটুকুও তোমার থাকবে না। জীবনে এর চেয়ে বেশি কিছু করতেও পারবে না।"

সূর্যপ্রসাদ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

"যা বলছি শোন। মোহান্ত গণেশপ্রসাদের বাড়ী চ'লে যাও। তাঁকে ব'লো আমার সঙ্গে ছুটোর সময় যেন দেখা করেন। নিজে গিয়ে বলবে। টেলিফোন করবে না।"

"জী।"

"আর বলবে, মিছিল ভাঙ্গবার দরকার নেই। মিছিল, সভা সব নির্বিঘ্নে, শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়ে যাক্।"

"যে আজ্ঞা, পিতাজী।"

"আরও বলবে, পরশুদিন পাণ্টা মিছিল ও জনসভা হবে। তার ব্যবস্থা অনেকখানি এগিয়েছে। মোহান্তজীকে সব দায়িত্ব নিতে হবে।"

হাত-ঘড়িতে চোখ রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রাতরাশ শেষ করলেন। উঠে ঘর থেকে বার হবার সময় কনিষ্ঠপুত্র চন্দ্রপ্রসাদকে দেখতে পেলেন।

"কি হে রাজকুমার?"

চন্দ্রপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল।

"হুকুম করুন, মহারাজ।"

হেসে ফেললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"কেমন চলছে?"

"অন্তিম মুহূর্তটা মন্দ কাটছে না।"

"কিছু কাজকর্ম করবে?"

"না।"

"চলবে এমনি ক'রে?"

"চলবে, পিতাজী, চলবে।"

তার হাসিখুশি আমুদে মুখখানা দেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভাল লাগল। ছোট ছেলেটা কোনও কাজের নয়। দিন-রাত অকাজ-কুকাজ ক'রে বেড়ায়। তবু ছেলেদের মধ্যে ওর প্রতি কেমন দুর্বলতা বহন করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তৃতীয় সন্তান দুর্গাপ্রসাদ বিদায় নেবার পর সে দুর্বলতা বেড়ে গেছে।

তিনি পা বাড়াতে চন্দ্রপ্রসাদ আরও ব'লে বসল—

"ঘাবড়াবেন না, পিতাজী। উদয়াচলের গদিতে আপনাকে সরিয়ে বসতে পারে এমন কেউ নেই।"

চলতে চলতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "একজন আছেন।"

"তিনি গদিতে বসবেন না, পিতাজি।" চন্দ্রপ্রসাদ চটপট জবাব দিল, "আপনার কোনও ভয় নেই।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পাশের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হবার মুখে চন্দ্রপ্রসাদ আবার বলল, "আপনার কোনও কাজে আমি লাগতে পারি না, পিতাজী?'

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রশ্ন করলেন, "তুমি?"

"আশ্চর্য কথা ব'লে ফেলেছি পিতাজী।"

"তোমার ভাইদের মধ্যে একমাত্র তুমিই মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে। আর সবার কিছু একটা পরিচয় আছে। তোমার এ ছাড়া অন্য পরিচয় নেই।"

"তাই ত, পিতাজী, আপনার মুখ্যমন্ত্রিত্বে আমার স্বার্থ সবচেয়ে বেশি।"

"কি সাহায্য তুমি আমার করতে পার? তোমার একমাত্র কাজ দোকানে ঘুরে জিনিস কেনা—আর বিলে সই মেরে চ'লে আসা।"

"সে সব বিল আপনার কাছে আসে, পিতাজী?"

"আসে নিশ্চয়। দোকানদার বিনি পয়সায় তোমাকে জিনিষ দেবার লোক নয়।"

"বড় দুঃখ পেলাম পিতাজী। আমার ধারণা ছিল, ওসব বিলের বেশির ভাগই আপনার কাছে আসে না।"

এ প্রসঙ্গ চাপা দিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

বললেন, "তোমাদের চার ভাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছ না কেন?"

"পা কমজোর, পিতাজী। আকাঙ্ক্ষার বোঝা বইতে পারে না।"

"শোন চন্দ্রপ্রসাদ।"

"বলুন।"

"তোমার কি মনে হয়?"

"আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার।"

"আমি ত রাজনীতি বুঝি না, পিতাজী।"

"তাই ত তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।"

"একটা কথা আমি বুঝি। বলতে পারি, যদি শুনতে চান।"

"বল।"

"মুখ্যমন্ত্রী থাকা আপনার দরকার। এবং আপনাকে থাকতে হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তড়িৎদৃষ্টিতে চন্দ্রপ্রসাদের দিকে তাকালেন। মুখে তাঁর খুশির ঝিলিক্ খেলে গেল। কঠোর সংকল্পে তখুনি মুখ কঠিন হ'ল।

"একটা কাজ করবে তুমি?"

"বলুন।"

"পাণ্ডেজীকে খবর দেবে, কাল সকালে যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।"

"রাজ জ্যোতিষীকে?"

"আটটা দশের মিনিটে।"

"রাজনীতিতে জ্যোতিষশাস্ত্রও চলে নাকি পিতাজী?"

'রাজনীতিতে সব চলে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঘর থেকে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে বারান্দা অতিক্রম ক'রে লন পেরিয়ে দপ্তর ঘরের দিকে হেঁটে চললেন। প্রতি পদক্ষেপে বিজয়ের সংকল্প। ক্রমশঃ

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

১০

অবশেষে বিনুর বহু দুঃখ ও পরিশ্রমের পায়েসের কড়া নামিল। বাটি, কাঁসি ও পাথরের খোরায় খোরায় ভাগ হইতে লাগিল। তার পরে পায়েসের জের চলিল ঘণ্টার পরে ঘণ্টা। উনুনের গন্‌গনে আগুন কাটিয়া জল ঢালিয়া ঢালিয়া গোবরজলে নিকাইয়া শুদ্ধ করা হইল। উনুনের সংশ্লিষ্ট বাসন-কোসন বাহির করিয়া দেওয়া হইল মাজিবার জন্য। অবশেষে গোবর-জলে গোটা ঘর, বারান্দা ধুইয়া-মুছিয়া বিনু অব্যাহতি পাইল।

মাজা হাতা, কড়া লইয়া এবার মনোরমা স্বয়ং দুধের পরিচর্য্যায় বসিলেন।

অবকাশ পাইয়া বিনু পলায়ন করিল তাহার নিভৃত কক্ষে। ঘরখানাকে বিনু খুব ভালবাসে। বিরাট্ রায়-ভবনের একপ্রান্তে তাহার নির্জ্জন গৃহ। এ ঘরে বাড়ীর কেহ বিশেষ দরকার না হইলে আসে না। জনতা নাই, কোলাহল নাই। রাত্রে ছোট ঠাকুমা আসিয়া শয়ন করেন মাত্র, সারাদিনে আর এখানে পদার্পণ করেন না। ঘরের আসবাব—তার বাবার দান, বিবাহের যৌতুক খাট পালঙ্ক টেবিল চেয়ার আলমারিতে ভরা। আলনায় তাহারই নিজস্ব গুটিকতক শাড়ী সেমিজ। কোণের দিকে তাহার বাক্স প্যাঁটরা। ব্র্যাকেটে তাহারই লাল গামছা। বাতাসে দুলিতেছে। এখানে এই একটিমাত্র স্থান তাহার একার। অন্য অংশীদার নাই।

পিতলের কলসী হইতে এক গেলাস জল খাইয়া বিনু পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া মেঝেয় শুইয়া পড়িল। সামনের ঢেঁকিশালা নির্জ্জন, কেহ কোথায়ও নাই। মাথার উপরে চন্দ্র-তারকাখচিত শরতের অনাবৃত অবারিত নীলাকাশ। ছাদশূন্য বারান্দায় চাঁদের আলো ঝরিয়া পড়িতেছে। গাছপালা চন্দ্রকিরণে স্নান করিয়া ঝর্ ঝর্ খর্ খর্ শব্দে শাখা নাড়িতেছে। ঝোপেঝাড়ে জোনাকী জ্বলিতেছে। ঢেঁকিশালার পরে প্রাচীর, তারপরে মস্ত বড় পুষ্করিণী; বারান্দা হইতে দেখা যায়। শান-বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট। সারি সারি সিঁড়ি গভীর জলে নামিয়া গিয়াছে। বর্ষার ভরাজলে জলাশয় টলমল্ করিতেছে। পুকুরের উত্তর পাড়ে ঘাট নাই, জনসমাগম নাই। তাই সবুজবর্ণের শেওলা লম্বা রেখাকারে আসন পাতিয়া রাখিয়াছে। শ্যামল শৈবালের ফাঁকে ফাঁকে ফুটিয়াছে সাদা শাপ্‌লা ফুল। গগনের চন্দ্র নিম্নের কুমুদিনীকে কি সঙ্কেত করিতেছে তাহা কে জানে? পুকুরের পশ্চিম পাড়ের নীচ দিয়া গলি-পথের খাল চলিয়া গিয়াছে গ্রামব্যাপী। স্রোতের গতি গ্রামের শেষে চলন বিল অভিমুখে। চলন বিল মিশিয়া গিয়াছে বিনুদের হীরাসাগর নদীর সহিত। বর্ষাকালে গলিপথে ছোট-বড় নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে বৈঠার হটর্ হটর্ শব্দ করিয়া।

গলির ঘোলা জলের পানে চাহিলে বিনুর মন যেন কেমন উদাস হইয়া যায়। মনে পড়ে সেই দিনের কথা —সেটা ছিল বসন্ত কাল, গলিপথ বারিশূন্য শুষ্ক। হেলিয়া-পড়া শিমুল ও গাব গাছের কি মনোহর পুষ্পসজ্জা। শিমুলের লাল ফুলে বনতল ছাওয়া। আশা আকাঙ্ক্ষায় দুরু দুরু বক্ষে আঁখিপল্লবে স্বপ্নজড়িমা মাখিয়া বিপুল সমারোহের মধ্যে নববধূ বেশে পাল্‌কি চড়িয়া বিনু ওই পথ দিয়াই এ গৃহে আসিয়াছিল। পাথরকুচির কত—লোক ঐ পথ বাহিয়া এখানে বাজার করিতে আসে। হরিণঘাটার কই মাছ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। খালুই বোঝাই দিয়া কইমাছ লইয়া আবার তাহারা ফিরিয়া যায়। সকলেই যে যায়-আসে, কেবল বিনুই আসিয়া যাইতে পারে না। মণিকোঠায় বন্দিনী জীবনযাপন করিতেছে।

বছর খানেক পূর্ব্বেও তাহার গতি ছিল স্বাধীন স্বচ্ছন্দ। এ গ্রামের গোসাঁইবাড়ীর বিগ্রহ শ্যামরায়ের দোলযাত্রার প্রসিদ্ধি আছে। মস্ত মেলা বসিয়া থাকে, নাগরদোলা আসে। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে যাত্রী সমাগম হয়। শ্যামরায়ের পঞ্চম দোল তাদের দোল যাত্রার পরে।

গত বছর শ্যামরায়ের দোলের মেলায় বিনু আবদারে আবদারে ঠাকুরদাদাকে অতিষ্ঠ করিয়া মেলায় আসিয়াছিল, বর্ষার জলে ধুইয়া-মুছিয়া না গেলে ওই পথে তাহার পায়ের চিহ্ন হয় ত খুঁজিলে পাওয়া যাইত। কোথায় সে দিন? অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কোথায় সেই পাথরকুচির মুক্ত নীলাকাশ, বন হইতে বনান্তরে বিচরণ? কৌতুকময়ী চঞ্চলা হীরাসাগর, যাহার বক্ষ আন্দোলিত, উচ্ছ্বসিত করিয়া, নদীর জলে শুভ্র ফেনা তুলিয়া ষ্টীমার একবার যায়, আবার আসে।

হীরাসাগরের এপারে চালে চালে বসতি, পরপারে শ্যামল শস্যক্ষেত্র স্তরে স্তরে বিস্তীর্ণ হইয়া অসীম আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে।

মানসে ভাসিতেছে সেই হারাইয়া যাওয়া, ফেলিয়া আসা দিবস-রজনী। সে যাইত দুই পাশের ঘন বাঁশ-বনের বেষ্টনীর মধ্য দিয়া নদীতে স্নান করিতে। তাহার সঙ্গী হইত ভুলু কুকুর; পিছু লইত দধিমুখী বিড়াল। তাহারা তাহার পায়ে পায়ে ঘুরিত, কাছে কাছে থাকিত, মুহূর্ত্তের জন্যেও চোখের আড়াল করিত না।

শুধু কি বিড়াল-কুকুর? কাকা প্রবাসে পড়িতে যাইবার সময় তাঁহার অতি আদরের অতি সাধের এক খোপ ভরা পায়রাদের তত্ত্বাবধানের ভার তাহাকেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। সে "আয় আয়" করিয়া ডাকা মাত্র সেই লোটন পায়রার ঝাঁক লেজ ফুলাইয়া, ঝুঁটি নাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া আসিত। কোনটা বসিত মাথায়, কোনটা কাঁধে। হাত হইতে ধান চাল খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইত। লালমণি, ধলামণি, আদরিণী, সোহাগিনী, গাভীর দল কাছে গেলেই বিশাল নেত্র মেলিয়া সস্নেহে গা চাটিয়া দিত। আজ তাহারা কোথায়? কতদূরে? এখন তাহাদের কে দেখিতেছে? আঁচল ঘুরাইয়া কে তাহাদের গায়ের মশা মাছি তাড়াইয়া দিতেছে? মা ও ঠাকুমারা এখন কি করিতেছেন? মায়ের কোলের এক বছরের খুকু শৈলি বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? সে মায়ের মত সুন্দর না হইলেও দেখিতে মিষ্টি। শৈলি মিষ্টি হইলেও ভাই কেদারের মত সুন্দর হইতে পারে নাই। উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় মাত্র পাঁচটি বছর অম্লান তেজে জ্বলিয়া যে অকালে নিবিয়া গিয়াছিল, তাহার মত আর কে হইবে?

কেদারের বিয়োগের পর তাহাদের বাড়ীতে শোকের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল। গৃহে সঙ্গী ছিল না, সাথী ছিল না। ঠাকুমা ও মায়ের একমাত্র নয়নের মণি হইয়া থাকিতে থাকিতে বিনুর যেন কেমন বুনো-বুনো স্বভাব হইয়া গিয়াছে। কাহারও সঙ্গে সহজে মিশিতে পারে না।

বিনুর মাথার উপর দিয়া একটা নিশাচর পাখী কক্ কক্ করিয়া উড়িয়া গেল। সেই শব্দে সে সচকিত হইল। এত রাত্রি অবধি সে এখানে মাটিতে শুইয়া আছে কেন? কেহ ত কোথাও নাই, সে যে একাকী। পাখীটা কতদূরে উড়িয়া চলিয়া গেল, ও নিশ্চয় পাথরকুচি গ্রামের পাখী, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। ঝিরঝিরে বাতাসটাকেও যেন চেনা চেনা লাগিতেছে; বাতাসও আসিয়াছে সেখান হইতে ছুটিতে ছুটিতে।

তরুর আদরের ফুলমণি বিড়াল লোকের গা ঘেঁষিয়া থাকিতে ভালবাসে। বিনুকে নিরালায় পাইয়া সে আনন্দে তাহার পায়ে গা ঘষিতে ঘষিতে ডাকিল, "মিউ, মিউ!"

অবোধ জীবের স্নেহের প্রত্যাশা বিনুর ভাল লাগিল না। সে সজোরে ফুলমণির গায়ে একটা চাপড় মারিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "দূর হ কালোমুখা, আমার বালাই পড়েছে তোকে আদর করতে। তুই আমার দধিমুখীর পায়ের নোখের যুগ্যি নয়। যেমন ধোকড়ের বাড়ী, তেমনি মাকড়ের বেড়াল! সারাদিন গরর্ গরর্ ক'রে গা বেয়ে আসে।"

"একলা একলা কার সাথে কথা কইচো বৌমা, বিলায়ের সাথে? আজ ত দিনমান দিব্যি ওনাগরে সাথে কাজে কামে ছিলা, তা সাত তাড়াতাড়ি আবার বার হইয়া আইলে ক্যানে? একেবারে গাল ত শ্যাষ-ম্যাস ক'রে ওনাগরে সাথে খাইয়া-দাইয়া ঘরে আইলে ভাল হ'ত?"

কামিনীর ম'র আগমনে বিনু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "শোন মাসী, আজ কি কাণ্ড হয়েছে। চিনির বদলে ভুল ক'রে আমি দুধে সুজি দিয়েছিলাম, ওঁরা খুব বকেছেন।"

"তুমি দোষ করলি বলবে না? তাতে কি গোঁসা করতে হয়, মা? ভুলচুক্ করতি না করতিই সগল কাম শিখে যাবে। আমি সকলি শুনেচি, নানান তালে থাকলেও তোমার পরে আমার নজর থাকে। যা হইবার হইচে, এখন তুমি যাও ওনাদের কাছে। একটু পরেই আমি সগলেরে খাইতে ডাক দেব।"

"তা দাও গে মাসী, আমি যাব না। আমার হাত ব্যথা করছে, মাথা ধরেছে। আমি খেতেও পারব না, ওদের কাছে যেতেও পারব না। আমি সুজি চিনি না, ঘন দুধ দেখি নি, কেন সেই সমস্ত জিনিষ আমি খেতে যাব? খাব না, আমার ঘুম পেয়েছে আমি শুতে যাচ্ছি।" বলিতে বলিতে অভিমানিনী বিনু বিছানায় শয়ন করিতে গেল। অবুঝ বালিকা বুঝিল না এখানে তাহার অভিমানের মূল্য, অশ্রুজলের মূল্য কতটুকু।

১১

পরের দিন রায়বাড়ীর বড় জামাতা হেমন্ত আসিয়া পৌঁছিল। জামাই করিবার মতনই তাহার অপরূপ রূপ, সুমিষ্ট স্বভাব। ছোটদের আনন্দ কলরবের মধ্য হইতে হেমন্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুমাকে প্রণাম

করিল। তাঁহাকে কাহারও খুঁজিয়া ডাকিয়া আনিতে হয় না। তিনি সময় সময় সমস্ত বাড়ী প্রদক্ষিণ করিয়া আবার চিরন্তন স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া থাকেন।

হেমন্তকে নিরীক্ষণ করিয়া ঠাকুমা আনন্দে বিগলিত হইলেন। তাহার জামার প্রান্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন, "হেম, এলে ভাই? ভাল আছ? এই দেখ, এখনও মহেশের ভাঙ্গা নৌকোখানা ঘাট জুড়ে রইচে। তলিয়ে যাবার নাম-গন্ধ নেই।"

হেমন্ত হাসিমুখে বলিল, "সে কি ঠাকুমা; এক্ষুণি তলিয়ে যাবেন কেন? থাকুন কিছুকাল; দেখাশোনার যে ঢের বাকী রয়েছে।"—

"না দাদা, আর দেখতে চাই না। মেয়েমুনিষ্যির বেশি দেখার লোভ ভাল নয়। তা তুমি আমার পেসাদকে সাথে ক'রে আনলে না কেনে, হেম? সে ছেলেমানুষ, অতদূর কলকেতা থেকে খানিক রেলগাড়িতে, খানিক ধুমোকলের নায়ে পদ্মা-যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে কি একলা একলা আসতে পারবে? মহেশের খেয়ে-দেয়ে কাজ ছিল না, ছেলেকে পাঠিয়ে দিচে কোন ধাপধার গোবিন্দপুরে; লেখন-পড়ন করতে। রায়-বংশের কোন্ ছেলে কবে গেচে অত দূরে? বংশের ধারা অমান্যি ক'রে মহেশ করেছে আজগুবি কাণ্ড। পেসাদের জন্যে আমার পরাণটা ঝুরে ঝুরে মরে দিনরাত।"

"এত ভাবেন কেন, ঠাকুমা? এ কি আপনাদের সেকাল আছে নাকি? একালের ছেলেদের লেখাপড়া না শিখলে কি চলে? প্রসাদের কলেজ বন্ধ হয় নি, সে পঞ্চমীর দিন আসবে। যে বিয়ে ক'রে বউ ঘরে এনেছে, তাকে অতটা নাবালক ভাববেন না। আমাদের আগে ছুটি হ'ল তাই আগেই চ'লে এলাম।"

"বেশ করেছ ভাই, তোমার হ'ল 'আথার পরে ক্ষীর, পরাণ নয়কো থির।' তুমি কেনে পেসাদের তরে দেরি করবে, তোমার যে 'যার সাথে যার মজে মন, কিবে হাড়ি কিবে ডোম'।"

"এইবার আপনি ধরা প'ড়ে গেলেন ঠাকুমা, নিজে ডোম না হ'লে কি ডোম নাতনী হয়?"

"তা কইতে পার দাদা, আমি ভাল বামুনের মেয়ে, ভাল বামুনের বউ ছিলাম চিরকাল, ডোমের হাতে নাতনী দিয়ে এখন ডোম হয়ে গিইচি।"

এবার হেমন্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

এতদিন পুজোর তদ্বির তদারক করিয়া ঠাকুমার নিষ্কর্মা অবসাদগ্রস্ত হৃদয়তন্ত্রীতে সুরের মূর্চ্ছনা বাজিতে-ছিল। জামাতার আগমনে সেই সুর পুলকের ঝঙ্কার তুলিল।

তরু রন্ধনশালার সিঁড়িতে ফুলমণিকে কোলে লইয়া একখানা মোটা আস্ত আখ দাঁতে কাটিয়া চিবাইতেছিল। ঠাকুমা তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া হাসিমুখে কহিলেন—"তপ্ত ভাত দুটো খেয়ে নে না। তন্বি, হাবিজাবি খেলে কি পেট ভরে? ভাতের তুল্য আছে কি? লোকে কয়, 'ভাতের বড় জ্বালা, দুই, হাঁটু ভেঙ্গে আসে, কানে লাগে তালা'।"

চর্ব্বণরত তরু উত্তর দিল না। ঠাকুমা কাহারও প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশা করেন না। এখানেও করিলেন না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোদের কি মাছ এনেছে, তন্বি?"

"রুই আর চিতল মাছ। আর সেই শিংবাঁকানো বুড়ো ভেড়াটাকে কাটা হয়েছে।"

"জামাই এলে ত নানান্‌খানা করতেই হয়। গোয়ালা দই দিয়ে গেল দেখলাম। যোগাড় ত ভালই হ'ল। 'দধির প্রথম ঘৃতের শেষ, তরুণ ছাগ বৃদ্ধ মেষ।' তোর মা কেনে এখনো রাঁধার ঘরে আসছে না? মণিরাম ঠাকুর কি জুত ক'রে রাঁধতে পারবে? অরাঁধুনীর হাতে প'ড়ে রুইমাছ কাঁদে, না জানি রাঁধুনী আমায় কেমন ক'রে রাঁধে? উড়ে-ম্যাড়া সে হইবে এ বাড়ীর পাকা রাঁধুনী?"

"না গো, তা নয় ঠাকুমা, আমাদের মণিরাম খুব ভাল রাঁধে। তুমি তার রান্না কক্ষণো খাওনি ব'লে অরাঁধুনী বলচ। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি কেমন রাঁধতে জান, তা কোনদিন খাই নি। একদিন খাওয়াও না রেঁধে?"

"আঃ, আমার পোড়া কপাল! 'সেদিন গেছে বয়ে, ঢোলকলমি খেয়ে'। আর কি আমার সেদিন আছে? এখন আমি 'আলপনা জানি মনে মনে, ধার আসে না হাতের গুণে।' ছিল লো, আমারও একদিন ছিল। তখন পেতল লোয়ার এত চলন ছিল না; আমরা রাঁধতাম মাটির পাতিলে। সে বেগুনের যেমন স্বাদ হ'ত, তেমনি সুঘ্রাণ। তোর ঠাকুরদা পাতা চেটে খেয়ে আমার হাত চাটতে চাইত।"

তরু খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার হাসির গমকে ফুলমণি মাথা তুলিয়া ডাকিল, "মিউ-মিউ!"

ঠাকুমা তাঁহার বাক্যের সূত্র ধরিয়া ফের সুরু করিলেন, "ভেড়ার মাংসের সাথে জামাই মণ্ডিকে

চারটে পোলাও ক'রে দিতে হয়। তোর মা ভেন্ন অত তোড়জোড় করবে কে? 'সকলেই ত সিন্দূর পরে, কপাল গুণে আলো করে।' কালোজিরের ঝাড় হলেও রাঁধে ভাল।"

তরু চটিয়া আগুন, "আমার মা যেন কালো জিরে, তুমি ত সাদা জিরে আছ। যাও না নারকেল খাঁটতে, মা আসুক রান্নাঘরে। কাজ করতে পার না, খালি খালি ফোড়ন দাও।"

ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ হইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। রায়বাড়ীর কর্ম্মশালার সম্মুখে উপনীত হইয়া হেমন্তর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। "মধুমতা, মাস্তি কোথায় গেলি লো? তোদের চুলের টিকিরও দেখা নাই। হেমকে জল খেতে দিবি কখন? এত বেলায় তার পুকুরে ডুব দিয়ে না নাওয়াই ভাল। সামনে কার্ত্তিক মাস, ম্যালেরির সময়। নবনে তার চানের জল তুলে দিক্, কুয়োর পাড়ের চৌবাচ্চায়। জামাই দুইতলায় রইচে; তোরা যা না একবার তার কাছে? কেউ খোঁজ-খবর না নিলে সে ভাববে কি? সকলেই কাজে মত্ত হয়ে রইচে। সকল দিকে নজর রেখে কাজ করতে হয়, যারা রাঁধে তারা কি চুল বাঁধে না লো? হ্যাঁ, ভাল কথা মনে হ'ল, আমাদের যে প্রতিপদে ডালের বড়ি দেবার নিয়ম, বড়ি দিয়ে ছাত থেকে নামাস্ নি ত। মরি, যা না লো বড়িগুলান রোদে উল্টে-পাল্টে দিয়ে হেমকে নাওয়া-খাওয়ার তাগিদ দিয়ে আয়। ভাগ্যি কোথা—দুইতলায় নাকি? এখন আমাদের সেকাল নাই, তখনকার কালে বৌ ঝিরা দিনমানে সোয়ামীর মুখ দেখতে পেত না। এখন কলিকাল, ঘোর কলি, 'কালে কালে কতই হ'ল, পুলিপিঠেরও ন্যাজ গজালো।' পেসাদের বউ, তুই লজ্জাবতি লতা হয়ে রইলি কেনে? যা না, নন্দাইয়ের সাথে একটু হাসি-মস্করা করতে? যাবি না? তা যাবি কেনে, তোর মনও ভাল না। মন কইচে—'নিশি হল ভোর, ডাকিছে ভোমর, প্রাণনাথ কেন এলো না?' মন যে পূজো দিনে সকলেরেই চায়, আমার যেমন চাইছে পরমাকে। মেয়ের বড় মায়া বড় জ্বালা 'কন্যা-কন্যা উদরীরোগ যাবৎ কন্যা তাবৎ শোক'।"

ঠাকুমা কন্যা-প্রসঙ্গে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সহসা কামিনীর মা'র সঙ্গে চোখোচোখি হইল। সে এক সাজি পান পুকুর হইতে ধুইয়া ফিরিতেছিল, ঠাকুমা সহাস্যে ডাকিলেন "ও রাজেশ্বরী, (কামিনীর মা'র নাম) কয়কুড়ি পান ধুয়ে আন্‌লি? এবার বুঝি পান বানাতে বসবি? দেখ্, জামাইয়ের পান পাঁচ মসলা দিয়ে ভাল ক'রে বানিয়ে বিড়িদানি ভ'রে দিস্। বিড়িদানির মধ্যে পানে ক'রে চুন আর বোঁটা রাখিস্, 'পান দিয়ে যে না দেয় চুন, সেবা পানের কিবা গুণ?' পান নিয়ে বসার আগে এক ঝলক রান্নাঘর হয়ে যা। রান্না-বাড়ার কতদূর কি হ'ল? জামাই মুনিষ্যিকে বেলা গড়াতে যেন ভাত দিস্ না।"

কামিনীর মা ঠাকুমায়ের পাশ কাটাইয়া বলিল, "এদিকের কোনডা বাকি নাই মাঠান, ঠাকুর ভোগ হ'লেই খাওন-দাওনের ঠাঁই পিঁড়ি করি। কয় কুড়ি পান তা আমি জানি না। সরকার জানে।"

ঠাকুমার আবোল-তাবোল প্রলাপে কেহ জবাব দেয় না। সকলেই যথাসাধ্য তাঁহাকে পরিহার করিয়া চলে, হঠাৎ কেহ মিষ্টস্বরে কথার উত্তর দিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না। কামিনীর মা'র কথায় তিনি প্রসন্ন হইয়া পুনরপি শুধাইলেন, "মাঝিরা যে কলসী নিয়ে সারি সারি গঙ্গাজল আনতে গেচে, এখনো ফিরলো না কেনে?"

"গঙ্গা কি এ মুল্লুকে মাঠান, নাও বেয়ে যাবে আসবে, সময় নাগবে না? আপনার পূজোর সময় গঙ্গা পাইলেই হল গে।"

বহুকাল পরে 'আপনার' শব্দটুকু ঠাকুমার অত্যন্ত মধুর লাগিল। ওই শব্দটা কেহ যে ভ্রমেও উচ্চারণ করে না; একজনা যদি ভুলিয়া উচ্চারণ করিল, তাহার মর্য্যাদা না দিয়া তিনি পারেন কি? তিনি গদগদ স্বরে কহিলেন, "আমারি ত সর্ব্বস্বি। আমি এত বড় পূজা-পার্ব্বণে ক'রে-ব'লে না দিলে ওরা ছেলেপেলে মুনিষ্যি এক করতে আর ক'রে বসবে? ওদের ভুলচুকের জন্যেই না আমার সারাদিন টিকৃটিক্ ক'রে মরা। হ্যাঁরে, বিল থেকে পদ্ম-ফুল আনতে, কলার পাতা কাটতে কারে কারে পাঠিয়েছে? তুই জানিস্ না, কইচিস্ কেনে লো? তোরই যে সকলের আগে জানার কথা? তুই কি আজকের লোক? সেই কর্ত্তার আমলের। তুই আর পর নোস্, আমার ঘরের মেয়ে।"

"তা জ্যান তুমি জান মাঠান, নেড়িবেড়ি নতুন মাগী-গুলান তা বোঝে না। কিছু কইতে গেলেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে ওঠে। হাত-পাও মোড়ায়ে আমার কি একদণ্ড বসার সময় আছে? পান বানায়ে না রাখলে নবনে আবার দাপাদাপি লাগায়ে দিবে।"

কামিনীর মা ঠাকুমার নয়নপথ হইতে অদৃশ্য হইলেও তিনি নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার গলায় ভাঙ্গা জয়ঢাক

সমান তালে বাজিতে লাগিল, "ঢেঁকিতে কোটা-কাটা যার যা আছে এইবেলা সেরে তেরে রেখো বাপু। ষষ্ঠীর ঘট বসলে ঢেঁকিতে পাড় দিতে নেই, ক্ষার-বোল করতে নেই। লক্ষ্মীপুজো না হওয়া অবধি নিয়ম মানতে হয়।"

১২

একে রায়বাড়ীর ভোজনের বিপুল আড়ম্বর; তায় জামাতার শুভাগমন। খাওয়া-দাওয়া মিটিতে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

আহারের পরে আজ আর ঠাকুমা অস্থানে-কুস্থানে অঞ্চল পাতিলেন না। দক্ষিণ-দ্বারী ঘরের বারান্দায় আসন লইয়া অনিমেষে দ্বিতলের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দোতলায় এক সারি ঘর। নীচের বাহির মহলের ন্যায় ওপরে বিরাট্ গোল বারান্দা। অন্দরের দিকে খোলা ছাদ। সাবেকী খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া সচরাচর কেহ দ্বিতলে শয়ন করিতে ভালবাসে না। বিশেষতঃ নিম্নতলে স্থানের অপ্রতুলতা নাই। কাছাকাছি থাকিলে গল্প-স্বল্প, আলাপ-আলোচনার অনেক সুবিধা। সেইজন্য ঊর্দ্ধগামী হইতে কাহারও আগ্রহ ছিল না। আত্মীয়-কুটুম্ব ও জামাতাদের ব্যবহারের জন্যই সাধারণতঃ দ্বিতলের ঘরগুলি সাজাইয়া-গোছাইয়া রাখিয়া দেওয়া হইত। ভোজনের পরে হেমন্ত উপরে বিশ্রাম করিতেছিল। সকলের অগোচরে অলক্ষ্যে ভানুমতী বার কতক উপর-নীচ করিয়া ফের কর্ম্মশালার ঘানিগাছে জুড়িয়াছে।

পাচক রান্না করিলেও শেষের দিকে মনোরমাকে হেঁসেলে ঢুকিতে হইয়াছিল। যে সময়টা অপব্যয় হইয়াছে তাহা পূর্ণমাত্রায় পোষাইয়া লইতে হইতেছে।

ভানুমতী কাজের লোক, কিন্তু আজ যেন তাহার কেমন ঝিমানো ভাব। উড়ুউড়ু চঞ্চল মনের গতি। মধুমতীর চিত্তে সুখ নাই। মেজ জামাতা তারাকান্তের পত্র আসিয়াছে। এবার পূজায় সে আসিতে পারিবে না। মামার বাড়ীর পূজা দেখিতে যাইবে।

বঞ্চিতা-বিড়ম্বিতা সরস্বতী, তাহার আসিবার কেহ নাই, পত্র লিখিবারও কেহ নাই। মরু-শুষ্ক জীবনে শ্যামচ্ছায়া বিলীন হইয়াছে, সুশীতল পানীয় শুকাইয়া গিয়াছে। তরুহীন, বারিহীন প্রান্তরে তপ্ত বালুকা খাঁ খাঁ করিতেছে।

সে কাহারও পতিসম্মিলন সহিতে পারে না। হৃদয়ের অপরিসীম জ্বালা হৃদয়ে লুকাইয়া বাক্যের বিষবাষ্পে চারিদিক বিষাক্ত করিয়া তোলে।

মনোরমা অনাথা মেয়ের অন্যায়-অবিচার নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যান। তাঁহার পরিপূর্ণ সুখের সংসারে সরস্বতী মূর্ত্তিমতী অশান্তি, শান্তির কুঞ্জ-কাননে দুঃখের দাবানল।

আহারান্তে সকলের সহিত বিনু গা ধুইয়া শুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, সকলে ভেজা কাপড় ছাড়িয়া চুল এলাইয়া দিয়া সমবেত হইয়া বসিয়াছিল সামনের বারান্দায়।

কামিনীর মা রূপার বাটা ভরিয়া পান সাজিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ইঙ্গিতে সে শাশুড়ী, ননদিনী-দের হস্তে পান বিতরণ করিতে লাগিল। এমন সময় ঠাকুমা খাবার জল চাহিলেন। বিনু বাটা রাখিয়া হাত ধুইয়া জল দিতে গেলে তিনি ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, জলের ছুতোয় তোরে আমি ডাক দিয়েছি বউ একটা দরকারে। পান গালে দিয়ে ওরা সব ঘরে ঢুকছে। তুই এই ফাঁকে ওপরে গিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখে আয়, জামাই-এর ঘুম ভেঙেছে কি-না। পা টিপে চুপে চুপে যা—দেখে এসে আমাকে বলবি।"

বিনু নিরুত্তরে পা বাড়াইতে না বাড়াইতেই ঠাকুমা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চাপাস্বরে বাধা দিলেন, "এই বুঁচি, থাম ত থাম। ওই যে জামাই উঠেছে, নীচে না নেমে গেল কোথায়?"

বিনু চোখ তুলিয়া বলিল, "হাঁ, জামাইবাবু ঘুম থেকে জেগে বোধ হয় মুখ ধুতে চানের ঘরে গেছেন।"

ঠাকুমা বিনা বাক্যব্যয়ে খোঁড়া পা লইয়া হেলিয়া দুলিয়া ছুটিলেন। সাধারণতঃ দ্বিতলের অধিবাসীদের অন্তঃপুরের হল্ অতিক্রম করিয়া বাহির হইতে হয়। ঠাকুমা হেমন্তের প্রতীক্ষায় হল্ আগুলিয়া রহিলেন।

হেমন্ত দিবানিদ্রা সারিয়া বাহিরে যাইতেছিল। ঠাকুমা ঝঙ্কার দিলেন, কি দাদা, ঘুম ভাঙ্গল তোমার? কেউ না ডাকতেই যে এত শীগ্‌গির জাগলে—রাই জাগো রাই জাগো শুক শারী বলে, কত নিদ্রা যাও কালো মানিকের কোলে?"

হেমন্ত লজ্জিত হইল, "সত্যি ঠাকুমা, বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর খানিকটা শুয়ে থাকলে কষ্ট ক'রে আর উঠতে হ'ত না। দিনের সঙ্গে রাত সমান হয়ে যেত। ঘুমের আমার অপরাধ নেই। পুজোর ভিড়ে সারারাত জেগে এসেছি। তার পরে আপনারা যা খাওয়ালেন, ফাঁসীর খাওয়া। শুধুই ঘুমুইনি; গোটা দুপুর বিছানায় কুমড়ো গড়ান গড়িয়েছি। আপনাদের কালোমানিকের খবর আপনারাই জানেন। তিনি আমার কাছে ছিলেন নাকো।"

"জানি ভাই, তারে গরুর মতন হালে জুতে রেখেছে। বাড়ীর পুজোর কি যে খাটা হাঁটা, তার শেষ যেশ নাই। তুমি বসো, জলখাবার খাও। এখন না খেলে রাতে ভাতের পাতে কি জল খাবে?"

"রক্ষে করুন ঠাকুমা, আজ আমি আর কিছুই খেতে পারব না। ভাতও নয়, জলও নয়!"

"খানিক ঘোরাফেরা করলেই তোমার ক্ষিদে হবে হেম। আমি তোমারে একটা কাজ দেই, তুমি ডাক্তার, সে কাজ তোমারি। এরা নম্বা নম্বা শিং দেখে চাপনাড়িওয়ালা এক পাল বলির পাঁঠা এনে রেখেছে। ছোট পাঁঠার মাংস কম হয় ব'লে আনে এক-একটা মোষের বাচ্চা। তার ভাল মন্দ নাই, খুঁত অখুঁত নাই, হলেই হ'ল। মার নামে বলি দেওয়া কি সোজা কাণ্ড? পাঁঠা চিতকপালে, পেট ধলা হ'লে মা তারে গেরণ করেন না। বলি ঠেকা খুব অলক্ষণ। তুমি একবার পাঁঠার পালগুলানকে পরখ ক'রে দেখলেই আমি স্থির রইতে পারি, দাদা।"

হেমন্ত হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

হেমন্তর উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঠাকুমা অপ্রতিভ হইলেও দমিলেন না, ক্ষণেক মৌন থাকিয়া পুনরায় অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, "তুমি হাসই বা কাঁদই, তোমাকে পরখ করতেই হবে, হেম। খুঁত-অখুঁত যদি ধরতেই না পারবে তবে ডাক্তার হইছ কেনে?"

"সেটা ঠিক কথা ঠাকুমা, তবে আমার সামান্য বিদ্যে মানুষের শরীর নিয়ে, পশু-পক্ষীর পর্য্যায়ে তা পড়ে না। তবু কাল সকালে আপনার বলির জীব-গুলিকে পরীক্ষা ক'রে দেখব।"

"কাল সকালে ও পালকে কোথায় পাবে তুমি? ভোর হতে না হতেই পাঁঠার ঘরের দোর খুলে দেবে, ওরা ছুটবে চরাবরায়। এ বাড়ীর পালানে, সে বাড়ীর বাগিচায়। ঘরে না থাকলে তুমি পাল ধ'রে পাবে কোথায়। কষ্ট যখন করতেই হবে, এখুনি কর না কেনে?"

"এখন যে সন্ধ্যে হয়ে গেচে ঠাকুমা?"

"তা হোক্, চাকররা আলো ধরুক। একটা আলোয় যদি ঠাহর না হয়, তা হ'লে মেজি মেজি ঢের বাতি আছে বাড়ীতে, তাই জ্বেলে দেবে, দিনের মত দপ্ দপ্ করবে।"

হেমন্ত শক্তের পাল্লায় পড়িয়া নীরবে মাথা চুলকাইতে লাগিল।

আসন্ন সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ফিকা অন্ধকার হইয়া নামিয়া আসিতেছে। পাখীরা কলকূজনে নীড়ে ফিরিতেছে।

নবীন চাকর ঘরে ঘরে প্রদীপের সজ্জা করিতে ব্যস্ত। অন্দরের হলে সন্ধ্যা হইতে রাত দশটা অবধি তেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। পিতলের ঝক্‌ঝকে পিলসুজের উপরে মাটির প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলে। বাড়ীর অসংখ্য গৃহের মধ্যে এইখানাই প্রধান। এখানে নবমী পূজা সমাপ্তে পূজার 'ভরা' ওঠে। লক্ষ্মীপূজা হয়। কোণের বড় লোহার সিন্ধুকে রায়-লক্ষ্মীদের সোনা রূপা সংরক্ষিত।

নবীন মাটির প্রদীপে তেল সলিতা সাজাইতে আসিলে ঠাকুমা মিনতি করিতে লাগিলেন, "বাবা নবনে, আমার একটু কাজ কর্, আমি পরাণ ভ'রে তোরে আশীর্ব্বাদ করব। লণ্ঠন ধ'রে একদৌড়ে জামাইবাবুকে পাঁঠার ঘরে নিয়ে যা। পাঁঠারা সব-গুলান ঘরে উঠেছে তো? দরজার তালা দেয়া হইচে?"

"তালা দেওয়া হয় অনেক রাতে, সকলের শোবার সময়। পাঁঠারা সকলে ঘরে উঠেছেন, মাঠান। আমি এখন ওদিকে গেলে সাঁজ দেবে কে? মণ্ডপে তুলসীতলায় ওঁরা যেন বাতি দেবে, তাছাড়া সারা বাড়ী আমারি রাজত্বি। একটু এদিকে-ওদিকে হ'লে খেঁকিয়ে আসবে সকলে।"

"তা হলে তুই আর-কারোকে ব'লে দে। গণ্ডা গণ্ডা চাকর রইচে। জামাইবাবুকে বাতি ধ'রে পাঁঠার আস্তানায় নিয়ে যাক্। যা বাবা, আমি তোরে আশীর্ব্বাদ করব।"

কালের কুটিল গতি, যিনি একদিন এখানকার সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, তিনিই আজ সামান্য বেতনভুক্ ভৃত্যকে আদেশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সময়ে ভেকের লাথিও হস্তীকে সহ্য করিতে হয়। তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বোধহয় ঠাকুমা যখন-তখন ছড়া কাটেন "হাতীরও পিছলে পা, সুজনেরও ডোবে না'।" দাসদাসীরা স্বেচ্ছায় তাঁহার আদেশ পালনের পাত্র নহে; কিন্তু সম্মুখেই মহামান্য বড় জামাতা, তাঁহার খাতিরেই বিরক্ত ভাবে নবীনকে যাইতে হইল।

ঠাকুমার শান্তি নাই, তিনি এই মুহূর্ত্তে হেমন্তকে যে ভার অর্পণ করিলেন, তাহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দিকে মন দিতে পারিলেন না। বাহির ও অন্দরের প্রাচীরের দরজা ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পর হেমন্ত ফিরিয়া হাসিমুখে অভয় দিল,

পাঁঠাগুলিকে ভালরূপেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, একটাও চিত-কপালে, কাত-কপালে নয়, দিব্যি সুস্থ সবল স্বাস্থ্যবান্। বলির পরে মায়ের প্রসাদ সুখাদ্য হইবে। কিন্তু এতখানি বয়সেও এত খুঁটিনাটি বিষয়ে ঠাকুমার লক্ষ্য থাকে কিরূপে?

এতক্ষণে ঠাকুমার বুক হইতে ভারী বোঝা নামিয়া গেল। তিনি খুশী হইয়া কহিলেন, "সেকালের গিন্নীদের সকল দিকে নজর রাখতে হ'ত যে। একালের গিন্নীরা খালি ভাবে, 'আমি গিন্নী হব কালে, তেল বিলাব খাবলা খাবলা, পান বিলাব গালে।' তাতেই জয়জয়-কার। আমার সাথে ওরা পারবে কেনে? ওরা কাঁচা আমি পাকা—

'আমি বিন্দে নাম ধরি, জানি কত ছল,
জলে আগুন দিতে পারি, অগ্নি করি জল।'

তুমি আমার একটা বড় কাজ করলে দাদা, আমি তোমারে আশীর্ব্বাদ করি, আমার মাথার যত চুল এত তোমার পেরমাই হোক্, তুমি নতুন খেয়ো পুরোনো পরো, শিলে ছেঁচে পান খেয়ো লাঠি ভর দিয়ে বেড়িয়ো। ভাগ্যি আমার পাকা চুলে সিন্দুর পরবে। জন্ম জন্ম মাছে-ভাতে খাবে।"

১৩

তখনও দিবালোক তেমন প্রখর হয় নাই। আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে কেবল রং ধরিয়াছে। ঝন্ঝন্, খন্খন্ বিকট রবে বিনু সভয়ে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইল।

ইহারই মধ্যে রায়বাড়ীর কর্ম্মের রথ ঘরঘর শব্দে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাতীমুখী বারান্দায় চাকররা রাশি রাশি পূজা ও ভোগের বাসন আঁধার কুঠারি হইতে বহন করিয়া আনিয়া নামাইতেছে। সে কি বাসন! পুষ্পপাত্র, টাট, কোশাকুশী, গামলা, পরাত, টউ, পিতলের কড়া। এক-একখানা আধমণ একমণ ওজনের। একজনার বহিয়া আনা কষ্টকর। পূজাপার্ব্বণে সাবেক কালের বাসন বাহির করা হয়। কাজ মিটিয়া গেলে আবার সযত্নে সুরক্ষিত হয় "আঁধার কুঠারিতে"। দোতলার সিঁড়ির নীচের অংশটাকে দরজা-জানালা বসাইয়া বাসন রাখার ঘর করা হইয়াছে। তাহার নাম আঁধার কুঠারি।

স্নানান্তে ঠাকুমা স্বস্থানে বসিয়া কর ধরিয়া তাঁহার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিতেছিলেন। জপ অতি উচ্চাঙ্গের, এদিকে আঙুল নড়িতেছে সবেগে, ওদিকে দৃষ্টি রহিয়াছে বাসনের প্রতি।

অসাবধানে নবীনের হস্ত হইতে একখানা কাঁসার থালা ঝন্ঝন্ শব্দে পড়িয়া গেল শানের উপরে। ঠাকুমা কর ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আহা, বগি থালাটা ভেঙ্গে ফেলি যে। গায়ে বল নাই খামটি আছে। নোককে দেখান চাই, 'আদা কুটলাম, আদা ধুলাম, নুন দিয়ে আদা আপনি খেলাম, তিনকর্ম্ম একলা করলাম।' তুই পারছিস না, হরিকে বল্, তার গায়ে তোর চেয়ে বেশি জোর আছে।"

"জোর না ছাই আছে। সেই ত ঘর থেকে বের ক'রে দিচ্ছে, আমি ভাগে ভাগে গুছিয়ে রাখচি।" বলিয়া নবীন রাগতভাবে পুনরায় বাসন আনিতে গেল।

ঠাকুমা তাহার গমন পথে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "যোগ্যতালির হীরে, অম্বলে পোড়ায় জিরে।"

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। গাছের মাথা হইতে শরতের সোনার রৌদ্র আঙ্গিনায় লুটাইয়া পড়িল।

ঠাকুমার চঞ্চল মন বাসনের প্রতি আর আবদ্ধ হইয়া রহিল না। তিনি বাসন-মাজুনীদের উদ্দেশ্যে হাঁকিলেন, "ও পমারি, হারাণী, তুফানি, তোরা কোথা রইচিস্? যেমন বাসন বের হচ্ছে তেমনি সাথে সাথে পুকুরে নিয়ে যা মাজতে। পর্ব্বত পেরমাণ হ'লে কি কাজ এগোয় বাপু? ওমা,—বলে কি? এত বেলাতেও ওরা কাজে আসে নি? রাজরাণীদের এখনও ঘুম ভাঙ্গে নি? ভাঙ্গবে কেনে—ওরা হইচে 'বড়নোকের নাতা পাতা, পায়ে পাগড়ি, মাথায় জুতা।' বাগানের তেঁতুল গাছ থেকে ঝাঁকা ভ'রে তেঁতুল পেড়ে রেখেছে। কাঁচা তেঁতুল সেদ্ধ ক'রে না নিলে এ বাসনের পাহাড় চক্চকে হবে কিসে? কাজের দিকে কি ওদের মন আছে? ওদের কথা হ'ল—

'কাজে কামে ক'য়ো না, মা আমি যুবতী,
জেঁতে জুঁতে ভাত বাড়ো, মা আমি পোয়াতি'।"

বিনু খানিকক্ষণ ঠাকুমার বচন-সুধা পান করিয়া শাশুড়ীর পিছু লইল। তিনি সুজি চিনি ময়দার ঘি লইয়া চায়ের ঘরে যাইতেছেন। সে-সময়ে পল্লীগ্রামে সুজি ময়দার তেমন প্রচলন ছিল না। দুগ্ধ ও নারিকেলের নানাবিধ মিষ্টান্নই আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। লুচি, মোহনভোগ ছিল সৌখীন ও সম্মানের বস্তু। জামাই আসিয়াছে, তাহার সামনে তক্তি-নাড়ু-সরভাজা-ক্ষীরের পুলির পাশে পাশে লুচি মোহনভোগ না দিলে মানাইবে কেন?

মনোরমা বধূকে কাছে পাইয়া বলিলেন, "আমি

এদিকে রইলাম। আজ হাটবার। সরকার চাকর ক'জনা তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে যাবে হাটে। ঠাকুর ডাল ভাত চড়িয়েছে। তুমি ক'টা লাউ নিয়ে এক গামলা লাউঘণ্ট কুটে দাওগে। লাউঘণ্ট কুটতে জান ত ?"

বিনু মাথা হেলাইয়া মনে মনে হাসিল ; সে নাকি লাউঘণ্ট কুটতে জানে না ! তাহার খেলাঘরে সে যে ছোট বঁটি পাতিয়া তিতপোল্লা, তেলাকুচা, পিঠালির ফল কুটিয়া কুটিয়া হাত পাকাইয়াছে। তাহার চিকণ পরিপাটি কুটনো কোটা দেখিয়া সেখানকার ঠাকুমা দুর্গাসুন্দরী পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আর কাজে সাজে না বউ লাউ কোটায় দড়।' কিন্তু ইহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সে গৃহকর্ম সুচারুরূপে না জানিলেও যাহা জানে সময়েও তাহার প্রমাণ . য় নাই।

বিনু কর্মশালার বারান্দা খাঁড়ার মত বঁটি পাতিয়া লাউ কুটিতে বসিল। মনোরম ছোট-বড় চারিটা লাউ তাহাকে কুটিতে দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের ভৃত্য-সম্প্রদায় যেন রাবণের গোষ্ঠী। ভোজের বাড়ীর ন্যায় কেবলই পাতা পড়িতেছে, আর উঠিতেছে। এত সোরগোল বিনুর ভাল লাগে না। তাহার ভোঁতা বুদ্ধি গোলমালে আরও গোল পাকাইয়া যায়।

বিনুর তিনটি লাউ কোটার পরে ছোট ঠাকুমা ভানুমতীকে লইয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। সরস্বতী নারায়ণের সিংহাসনের সামনে জপে বসিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার শ্বশুরকুলের কুলগুরু তাহাকে দীক্ষা দিয়াছেন। মনের খেদেই হউক, মন্ত্রের প্রভাবেই হউক, তাহার বহু সময় পূজা-অর্চ্চনায় অতিবাহিত হয়। দীক্ষার পর হইতে তাহার আচার-নিষ্ঠা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্ম হইয়াছে শুচিবাই-এর সীমায় বন্দী।

ভানুমতী বিনুর লাউ কোটার প্রতি বারেক নেত্রপাত করিয়া প্রশংসায় মুখর হইল, "বাঃ, বউ ত বেশ ঝুরঝুরে ক'রে লাউ কুটতে পারে ? এত ভাল পারে জানতাম না। জানবই বা কি ক'রে, না কুটলে। ছোট ঠাকুমা, তুমি কি দিয়ে আজ ঠাকুরের ভোগ দেবে ? তোমার হাতের তরকারির লোভে ওদিকে জিব দিয়ে লাল ঝরছে।"

ছোট ঠাকুমার জীবনের একমাত্র কাম্য রন্ধন ও রন্ধনের সুখ্যাতি শ্রবণ। তিনি উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "হেমন্ত যে-তরকারি খেতে ভালবাসে, তাই হউক।"

"তুমি অম্বরের দই-ডাল রাঁধ। শুক্ত, বড়ি-ভাজা, ঝোল এই ক'টা রেঁধে তারপর যা ইচ্ছে। তুমি যা-কেন রাঁধ না—তাই তোমাদের জামায়ের কাছে অমৃত।"

ছোট ঠাকুমার মলিন মুখ অপার্থিব আনন্দে উজ্জ্বল হইল। তিনি বঁটি পাতিয়া তরকারির ডালা টানিয়া লইলেন।

তাহার পর বেলা নয়টা পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল তিনখানা বঁটিতে খস্ খস্, খস্ খস্।

ইহাদের অন্ধকার অভিযান দুগ্ধের। কয়েকটা পিতলের কলসী লইয়া ভৃত্যবর্গ বাজারে দুগ্ধভরণে গিয়াছে। তাহাদের ফেরার বিলম্ব নাই। ফেরামাত্র জোড়া উহুনে জোড়া কড়া চাপিবে। ক্ষীর হইবে ; ছানা হইবে। ছানা ও ক্ষীর সংযোগে প্রস্তুত রাঘবসই, প্যাঁড়া, চোখামণ্ডা, নাড়ু, স্বস্তি, বরফি, পুলি ইত্যাদি। প্রত্যেকটির গায়ে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য করিতে হইবে।

হাতের কাজ শেষ হইলে বিনু একছুটে তাহার শয়নগৃহের পশ্চিমের বারান্দায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ঢেঁকিশালায় ধুপ ধুপ করিয়া ধানভানা হইতেছে। হারাণী পাড়ানের কাছে উঁচু খুপ্‌রি পিঁড়ায় বসিয়া সাবধানে ধান উল্টাইয়া দিতেছে, আধ-ভাঙ্গা ধান কুলায় ঝাড়িয়া তুষ বাহির করিয়া দিতেছে।

হারাণীর মেজাজ গরম। যাহাদের এই কর্ম, সেই ধীবর-কন্যা তিনটি জলাশয় আলো করিয়া বাসন মাজিতেছে।

বাজারের মাছের খোঁজ লইতে ঠাকুমা যাইতেছিলেন কাঁঠালতলায়, এ বাড়ীর মাছ কোটার স্থানে। হারাণীর কল্ কল্ কলস্বরে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পথের মাঝখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হারাণীর কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিলেন না, না বুঝিলেও তাঁহার বিশেষ আসে-যায় না। তিনি কাঁঠালতলার দিকে পদক্ষেপ করিয়া নিজের মনে ছড়া কাটিলেন—

"হারাণী বাড়ানি কাঁঠালের কোশ ; যত লোক চুরি করে হারাণীর দোষ।"

ঢেঁকিশালার পশ্চাতে মিঠে কামরাঙ্গার গাছ, ট'কো কামরাঙ্গা গাছ পুকুরের পথে। হলুদ বর্ণের অসংখ্য পাকা কামরাঙ্গা ডালে ডালে ঝুলিতেছে।

তরু মিঠে কামরাঙ্গার অনুরাগিণী। সে এক কোঁচড় কামরাঙ্গা সংগ্রহ করিয়া নিভৃতে বিনুর পাশে আসিয়া বসিল।

অঞ্চল হইতে একটা সুপক্ক ফল নির্ব্বাচন করিয়া দাঁতে কাটিতে কাটিতে বলিল, "খাবে বউদি, খুব মিষ্টি, তোমার এইখানে নুন আছে ?"

বিন্নু কহিল, "নুন নেই, ঠাকুরঝি।"

"নুন রাখ না, তা হ'লে টকো কামরাঙ্গা খাও কি দিয়ে? কাল গা ধুয়ে আসবার সময় তুমি যে দুটো কামরাঙ্গা কুড়িয়ে কাপড়ের ভেতরে লুকিয়ে আনলে, বিনা নুনে তা খেলে কি ক'রে?"

বিন্নুর ধারণা ছিল, তাহার কুড়াইয়া আনা চুরি কেহ টের পায় নাই। এখন বুঝিল, এখানে দেয়ালেরও চোখ আছে, বাতাসেরও কান আছে। ধরা পড়িয়া মিছে বলায় লাভ কি? সে কহিল, "বিনা নুনেই খেয়েছি। আমি নুন পাব কোথায়?"

"মাগো, বলে কি, নুন পাব কোথায়? ভাঁড়ারে, রান্না ঘরে, ভোগের ঘরে ত লবণের ছড়াছড়ি। একখানা নারকেলের মালায় ক'রে একটুখানি এনে তোমার বাক্সের পেছনে লুকিয়ে রাখতে পার না? তোমার ট'কো কামরাঙ্গা ভাল লাগে, না মিষ্টি?"

"ট'কোই আমি ভালবাসি। মিঠেগুলো কেমন যেন জলো-জলো পানসে।"

"কাঁচা খেলে পানসে, পাকলে খুব মিষ্টি, নুনটুন কিছু লাগে না।" বলিয়া তরু একটি কামরাঙ্গা বাছিয়া বিন্নুকে অর্পণ করিল।

বিন্নু মুখে তুলিয়া প্রফুল্ল স্বরে বলিল, "এটা খুব মিঠে, ঠাকুরঝি।"

"বেছে খেলে ভাল না হয়ে যায় না, যা-তা মুখে পুরলে কি ভাল লাগে? শোন বউদি, তোমাকে একটা কথা বলি—আমি তোমার চেয়ে বয়সে দু' বছরের ছোট, তবু তুমি আমাকে ঠাকুরঝি বল কেন? ঝি-চাকররা রাতদিন ডাকছে 'বট্ ঠাকুরঝি', 'মেজ ঠাকুরঝি', 'সেজ ঠাকুরঝি', 'ছোট ঠাকুরঝি!' শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। থেকে থেকে ঠাকুমা শোলক দেয় 'বেগুন পোড়ায় দিয়ে ঘি, নাক পোড়ালেন ঠাকুরঝি।' এক কথা একশ'বার শুনতে ভাল লাগে না।"

"না, আমারও ভাল লাগে না। তোমার যেমন 'ঠাকুরঝি' বিচ্ছিরি লাগে, আমারও 'বউ-বউ' শুনে গা জ্বালা করে। কিন্তু ওঁরা যে কারোকে নাম ধ'রে ডাকতে বারণ ক'রে দিয়েছেন। ঠাকুরঝি না ব'লে তোমাকে আমি কি ব'লে ডাকব ঠাকুরঝি?"

"ডাকবে 'তরু' ব'লে। ওরা কি তোমার গলা শোনে, না কথা শোনে? চুপে চুপে ডেকো। সুমন্তকে যারা ছোট ঠাকুর' বলতে বলে তাদের কথা ছেড়ে দাও।"

তরুর সহৃদয়তায় বিন্নুর চোখ জলে ভরিয়া গেল। অকালপক্ক মুখরা হইলেও উহার হৃদয় আছে। ইহাকে সময় সময় কাছে পাইলে কত শান্তি! কিন্তু তরুকে আয়ত্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখা যায় না। বসন্তের চঞ্চল মলয়ের মত ও অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ছোট তরফের মেনি তরুর প্রাণের সখী। খেলাধুলা, স্নান, সাঁতার যত কিছু তাহার সহিত তরুর। এক ক্ষুধা পাইলে সে ছুটিয়া আসে, নিজে খাইয়া মেনির ভাগ লইয়া ফের দৌড়ায়, ঘুরিয়া বেড়ায় বনে বনে, প্রান্তরে, ফল-বৃক্ষের তলায়। খেয়ালী স্বভাব উহার। খেয়ালের বশে কখনও লক্ষ্মীমেয়ে, কখনও দুর্বিনীতা দুরন্ত। দোষের ভিতর প্রধান, ঝগড়াটি। একবার মুখ খুলিলে ছোট-বড় কাহাকেও কেয়ার করে না। ক্ষুদ্র বালিকার সুমধুর ভাষণে ঠাকুমা ছড়া বাঁধিয়াছেন, 'মহেশ আমার সোনার ছেলে, তার কপালে ছার-কপালে'। এ হেন মহীয়সী তরুর কোমল ব্যবহারে বিন্নু আনন্দে বিগলিত হইয়া কহিল, "তোমাকে আমি এক্ষুণি 'তরু' বলছি তরু। আন না তোমার পুতুলের ঝাঁপিটে, কামরাঙ্গা খেতে খেতে তোমার সাথে পুতুল খেলি? কতদিন খেলতে পাই না।"

তরু সবিস্ময়ে তাহার আয়ত উজ্জ্বল আঁখি দুইটি বিন্নুর পানে তুলিল, "এ আবার বলে কি গো, বউ-মানুষ নাকি পুতুল খেলে? তুমি না আমার বড়। আমি বাপু তোমার সাথে পুতুল খেলতে পারব্ না, বউদি। এত বড় মেয়ের পুতুল খেলার সখ! বুদ্ধি নেই, তাই মেজদি মেনির কাকিমা, জেঠিমার কাছে তোমার নিন্দে করে।"

"কি নিন্দে, তরু?"

"নিন্দে হ'ল গে, আমি যে সখ ক'রে দু'দিন ফ্যানা-ভাত রেঁধেছিলাম, তাই নিয়ে বলেছিল, 'বুড়োমাগী বয়সের গাছ পাথর নেই; কুটোটা ভেঙ্গে দু'খানা করে না। এক রত্তি মেয়ে ভাত রেঁধে দেয়, তাই গেলে গব্ গব্ ক'রে।' আরও কত বলেছে, আমি অতশত জানি না। মেজদি ভারি ক্যার-ক্যারানী, সকলের পেছনে খালি কাঠি দেয়। আমার খুশী হয়েছিল ভাত রেঁধে-ছিলাম, খুশী হয় না আর রাঁধি না। নতুন রান্না শিখে তোমাকে এক হাতা ভাত খেতে দিয়েছিলাম, তাই নিয়ে খুন হয়ে মরছে, মরুকগে।—কাল কি মজা বউদি, পঞ্চমী। আমাদের দাদা আসবে। দেখ না কত কি নিয়ে আসে। ঢের ঢের জিনিসের সাথে আনবে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল। এখানে যা পাওয়া যায় না—সেই সমস্ত জিনিষ আনতে মা-দাদাকে ফরমাস দিয়ে চিঠি লেখে। মা'র বাতিক পৃথিবীর যা-কিছু এনে তার দুর্গাঠাকুরোণকে দিতে

হবে। আমার বাপু, ন্যাসপাতি ভাল লাগে না, কেমন যেন কচ্‌কচে, আমি ভালবাসি আপেল।"

বিমু তরুর ফল-সমস্যায় যোগ না দিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, কাল এখানে তাহার বর আসিবে। সেখানেও তাহার বাবা, কাকা, তিন-ঠাকুরদারা, দিদিমণিরা আসিবেন। তাহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার—তাহার ঠাকুরদাদার তিন খুড়তুত ভাই প্রবাসে কাজ করেন। পূজায়-দোলে সকলে একত্র হইতে আসেন। বিমু তাঁহাদিগকে ন'দাদা-মেজদাদা-ছোড়দাদা বলিয়া ডাকে। ঠাকুমাদেরও দিদি ডাকে।

প্রতিবারের মত এবারেও তাহাদের গৃহ আনন্দে উল্লাসে হাসি-গল্পে মুখরিত হইবে। সেই শুধু সে আনন্দের অংশ লইতে পারিবে না। ঠাকুমা আড়ালে, 'বিমু, বিমু' বলিয়া কাঁদিবেন। মা ঘন ঘন চক্ষু মুছিবেন। ভুলু, দধি-মুখী সকলের মাঝে তাহাকে খুঁজিবে। তাহার বিচ্ছেদে ঠাকুরদাদা গম্ভীর, বাবার চক্ষু অশ্রু-সজল। কাকা ম্রিয়মাণ। প্রবাসী দাদা-দিদিদের মন ভার। এবার পূজায় পুরোহিত-কাকাকে কে নিখুঁত বেলপাতা বাছিয়া দিবে? কে আঁটি আঁটি দূর্ব্বা জোগাইবে? মণ্ডপের গায়ে হেলিয়া-পড়া শেফালি গাছের তলায় কে রাত্রে চাদর পাতিয়া রাখিবে? মা দুর্গার গলায় কে গাঁথিয়া দিবে সাদা-নীল অপরাজিতা ফুলের মালা?

বিমুর চোখ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। তরু টের পাইবে ভয়ে সে মুখ নামাইয়া রহিল। কিন্তু তরুর সন্ধানী দৃষ্টি নাই। তাহার যেমন স্বচ্ছ মন, তেমনি উদাস দৃষ্টি। সে একটার পর আর একটা কামরাঙ্গা বাছিতে উৎসুক।

ক্রমশঃ

—•—

বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা সম্পূর্ণ হয় রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ২৫ বৎসর। পদাবলীর সাতটি পদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়। এর পর কবি আরও কয়েকটি পদ লেখেন। তাঁর ২৩ বৎসর বয়সে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাতে তিনটি পদ দেখা যায় না। সেই তিনটি পদ হচ্ছে —'আজু সখি মুহু মুহু…', 'মরণরে তুহুঁ মোর শ্যামসমান …' এবং 'কো তুহু বোলবি মোয়…'। কবির উক্তিতে জানা যায় যে, উক্ত তিনটি পদের মধ্যে প্রথম দুইটি ১২৮৯ সালের পূর্বে রচিত। শেষের পদটি প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সংস্করণে।

এই পদাবলী-রচনার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতার প্রতি সুগভীর অনুরাগ। ১৩১৭ সালের ২০শে আষাঢ়ের এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করছি; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমের বৈষ্ণব-ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলাম।' (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-জীবনী, পৃঃ ৬১, পরিবর্ধিত সংস্করণ।) এখানে 'বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন, 'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন, সাহিত্য-রসের জন্য, তত্ত্বের জন্য নহে।' (ঐ, পৃঃ ৬১-৬২।) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাব-কবি, কাজেই কাব্যরত্নের অনুসন্ধান ও সৃষ্টি তাঁর অন্যতম প্রধান ধর্ম, তা হলেও তিনি যে বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের সত্য দর্শন ক'রে নানা কবিতার মধ্যে তা প্রকাশ ক'রে গেছেন, এর প্রমাণ দুর্লভ নয়। দু'টি মাত্র দৃষ্টান্তেই তা বোঝা যাবে। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শুভক্ষণ' কবিতায় পাওয়া যায়,—

ওগো মা,

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কি মতে।
বলে দে আমায় কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস।

মাগো, কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস।
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে,
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কি মতে।

উদ্ধৃত কবিতাটিতে কি বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের ইঙ্গিত নেই? বহু সাধনার পর চির-আকাঙ্ক্ষিত দয়িত যখন গৃহ-সম্মুখে আসেন, তখন বস্তুজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও দেবময় হয়ে সেই চির-সুন্দরকেই ত দেখতে হয়!

উক্ত কাব্যগ্রন্থের 'ত্যাগ' কবিতায় কবিগুরু আবার বলেছেন,—

ওগো মা,

রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার 'পরে।

মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে!
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,

চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ—
ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কি মতে।

যে-মণিহারটি রাজার ছেলের উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সে মণিহারটি কি একটি তুচ্ছ পার্থিব বস্তুমাত্র? তার মধ্যে কি প্রেমভক্তি দীপের শিখাই প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি? রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলাম'—এই সহজ কথাটার অর্থান্তর-আবিষ্কারের চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। এই বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের রসাস্বাদকরূপে কবিগুরুকে পাই 'পদরত্নাবলী' নামে পদসংকলন গ্রন্থেও। এই সংকলন গ্রন্থ রচনার মূল সন্ধান করলেও এর সত্যতা কিছু ধরা পড়বে। বর্তমান প্রবন্ধটি মূলতঃ পদরত্নাবলীর আলোচনা নিয়ে এবং এর মধ্যে কবিগুরুর বৈষ্ণবতা কি ভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখানই অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

পদরত্নাবলী প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে। এক বৎসর আগে অর্থাৎ ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সামান্য কয়েক বছরের বড় এই বধূটি দেবরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন। কবিগুরুর জননী সারদা দেবীর মৃত্যুর পর কাদম্বরী দেবী একাধারে শিশুদের মাতৃস্থান ও বন্ধুস্থান পূরণ ক'রে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা যেমন এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রেরণায়, তেমনই কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভাবগুলি উদ্বোধিত করেছিলেন স্নেহ ও প্রেম দিয়ে। ইনি ছিলেন তরুণ কবির সাহিত্যরস-মাধুর্যের যেমন উপভোক্তা, তেমনই সমালোচক। নব নব প্রেরণায় ইনি কবিচিত্তকে নূতন ভাবরসে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতেন। কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণায় এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে আসে দারুণ আঘাত। শোকাচ্ছন্ন মনকে শান্তিরসে সিঞ্চিত করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পদাবলীরস-সমুদ্রে নিমজ্জিত রাখেন মনে হয়। এই কথা সত্য হ'লে নিশ্চয়ই মনে করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যরস-আস্বাদনের জন্যই পদাবলীর রসসায়রে নিমগ্ন হন নি; পার্থিব বস্তুর বাইরে যে রহস্য আছে তাই অনুসন্ধানের জন্য পদাবলী-অধ্যয়নে নিরত হন। সেই সত্য দর্শনে তাঁর শোকক্লিন্ন চিত্ত শান্তি লাভ করবে, এই ছিল কবির উদ্দেশ্য। কাজেই বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের রহস্য জানার ইচ্ছা যে রবীন্দ্রনাথের হয় নি, তা বলা যায় না। পদাবলীর রসাস্বাদনকালে হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল যে, শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি তিনি চয়ন ক'রে একত্র করবেন এবং সেইগুলির দর্শন ও অনুভাবনে শোকতপ্ত মনকে শীতল করতে পারবেন। পদগুলি সংকলন ক'রে কবিগুরু যথার্থই তাদের রত্নের কোঠায় ফেলেছিলেন ব'লে নাম দিয়েছেন 'পদরত্নাবলী'।

পদরত্নাবলী সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ সাহায্য নিয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের। কবির যৌবনে যে কয়জন সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসপিপাসুর সান্নিধ্য লাভ ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার অন্যতম। বিলাত থেকে ফেরার পর কবিগুরুর কাব্যমধুচক্রের মধু আস্বাদন ক'রে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং এতেই হয় উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সৃষ্টি। ইনি ছিলেন বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর ও স্বয়ং বৈষ্ণব। বৈষ্ণব কাব্যজগতে তাঁর ছিল অবাধ গতি এবং এঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে 'বৈষ্ণব সাহিত্যের রসবোধশিক্ষা' লাভ করেছিলেন, তা স্বীকার করতে বাধা নেই। এতেও পদাবলী-সাহিত্যের উপর কবির গভীর অনুরাগ জন্মে। এই বন্ধুটির সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলী' নামে সঙ্কলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদনায় দুইজনের নাম থাকায় মনে হয়,পদগুলি চয়ন করেছিলেন কবি স্বয়ং এবং পদসংক্রান্ত ব্যাখ্যা বা ভাবপ্রকাশের ভার নিয়েছিলেন শ্রীশবাবু।

১১০টি পদ নিয়ে পদরত্নাবলী সম্পূর্ণ। পদগুলি রবীন্দ্রনাথ কোথায় পেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সে-সময় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্কলিত পদকল্পতরু প্রকাশিত হয় নি; বটতলার ছাপা থেকে কবি সংগ্রহ করলেও মূল পুঁথিও কবি দেখেছেন; তাতে কোন কোন পদের ভণিতাংশে অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষণদাগীত-চিন্তামণির পুঁথি, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পলতিকার ছাপা বই যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদুনাথ ভণিতায় পদরত্নাবলীর 'রাই! কত পরখসি আর...' পদটি কেবলমাত্র ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতেই পাওয়া যায়; কিন্তু এই সঙ্কলন-গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দীর পূর্বে মুদ্রিত হয় নি। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষণদার হাতে-লেখা পুঁথি দেখেছিলেন, তাতে সন্দেহ

নাই। পদামৃতসমুদ্র ১২৮৫ সালে প্রকাশিত হয়; সুতরাং এই সঙ্কলন-গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে পদসংগ্রহ করেছিলেন তা নিশ্চিত জানা যায় পদরত্নাবলীর 'কপালে চন্দন চান্দ' ইত্যাদি ২৯ সংখ্যক ও 'কি পেখলু বরজ' ইত্যাদি ৩৩ সংখ্যক পদ দু'টিতে। পদকল্পলতিকা প্রকাশিত হয় ১২৫৬ সালে। এই সঙ্কলন-গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি পদ পদরত্নাবলীতে উদ্ধৃত করেন। চণ্ডীদাস-ভণিতায় ৪৮, ৫৫, ৫৯ সংখ্যক যে তিনটি পদ পদরত্নাবলীতে আছে, তা কোন প্রাচীন সঙ্কলন-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ-ছাড়া রায় বসন্ত ভণিতার ৯৮ সংখ্যক পদটির দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, কবি এই পদটি কোন প্রাচীন পুঁথি থেকে পেয়েছিলেন।

ভানুসিংহপদাবলীর শেষ পদটি রচিত হবার প্রায় সমসাময়িক কালেই রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলীর সঙ্কলন-কাজ শেষ করেন এবং গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে কবিগুরু ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের যুক্ত সম্পাদনায়। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় কলকাতার আদি ব্রাহ্ম-সমাজ-যন্ত্রে।

পদসঙ্কলন-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। তাঁর সঙ্কলন-গ্রন্থটি মুখ্যত: রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক পদ নিয়ে। এর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে টেনে আনা বা তাঁর মাহাত্ম্য-বর্ণনা ও কৃপাপ্রার্থনার যৌক্তিকতা তিনি বোধ করেন নি। বাস্তবতার অনুসরণে গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পদটিতে দেখা যায় যে, পৌর্ণমাসী দেবী নন্দালয়ে এসেছেন কৃষ্ণদর্শনে। যে-আনন্দ নিয়ে তিনি শিশুকে দেখতে এসেছেন এবং যশোদাকে যে-ভাবে আশীর্বাদ করছেন তাতে মনে হয়, কৃষ্ণের জন্মের সংবাদ পেয়ে তিনি অতিবৃদ্ধা হ'লেও একবার কৃষ্ণকে দর্শন ও যশোদাকে আশীর্বাদ করার জন্য নন্দালয়ে না এসে পারেন নি। উদ্ধৃত পদটিতেই তা পরিস্ফুট হবে,—

দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী খ্যাতি
প্রভাতে সিনান করি।
কানুর দরশে চলিলা হরষে
আইলা নন্দের বাড়ী॥
শিরে শুভ্রকেশ তপসির বেশ
অরুণ বসন পরি।
বেদময় কথা ঘন হালে মাথা
করেতে লগুড় ধরি॥

সান্দীপনি মুনির মাতা পূজনীয়া বৃদ্ধাকে দেখেই নন্দরাণী ছুটে এসেছেন তাঁর চরণধূলা গ্রহণ করতে; তখন দেবী পৌর্ণমাসী যশোদাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন,—

সতী-শিরোমণি অখিল জননী
পরাণ-বাছনি মোর।
পতি পুত্র সহ ধেনু বৎস সব
কুশলে থাকুক তোর॥

এর পর নন্দরাণী দেবীকে নিয়ে গেলেন সন্তানের শয্যাপাশে,—

রাণী তারে লৈয়া তুরিতে আসিয়া
দেখায় পুত্রের মুখ।
গায়ে হাত দিয়া উঠায় ধরিয়া
স্নেহে দরদর বুক॥

সন্তানবাৎসল্য-হেতু বৃদ্ধার চোখের জলে শিশুর শয়নবাস ভিজে গেল।

যদুনন্দন দাসের এই পদটি সঙ্কলন-গ্রন্থের প্রথমে স্থান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে কৃষ্ণের জন্মালেখ্য দিলেন, তেমনই অপরদিকে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যকেও নিলেন স্বীকার ক'রে। কৃষ্ণমুখদর্শনে বৃদ্ধার 'নয়নের নীরে স্তনখিরধারে' যে শিশুর শয্যা ভিজে গেল, তার মধ্যে পৌর্ণমাসী দেবীর আস্বাদিত বাৎসল্যভক্তিরসের আস্বাদন কি রবীন্দ্রনাথ করেন নি? শ্রীকৃষ্ণজন্মের চিত্রপ্রদর্শনই যদি মুখ্য হ'ত তবে রবীন্দ্রনাথ অন্য পদও প্রথমে সংস্থাপিত করতে পারতেন। পদকর্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সঙ্কলন-কর্তাও যে বাৎসল্যভক্তিরসের আস্বাদন করেছিলেন, এ-কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। জহুরীই চেনে প্রকৃত রত্নকে। ভক্তিরসাশ্রিত পদের মাধুর্য ভক্ত ছাড়া কি অন্যে গ্রহণ করতে পারে? সঙ্কলন-বিষয়ে এই পদটির নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আর একটি কথা মনে হ'তে পারে। মাতৃসম কাদম্বরী দেবীর অকাল-মৃত্যুতে স্নেহধনবঞ্চিত কবির শুষ্ক মরুহৃদয়ে স্নেহবারি লাভের অনুবেদনও থাকতে পারে এবং মনে হয়, সেইজন্যই অপার স্নেহময়ী পৌর্ণমাসী দেবীর এই অপরূপ চিত্রটি প্রথমেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

কোন বিষয় বলতে গেলে যেমন তার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হয়, তেমনই রবীন্দ্রনাথও কৃষ্ণের জন্মালেখ্য উদ্‌ঘাটনের পর আমাদের সামনে ধরেছেন কৃষ্ণের শৈশব চিত্র, রাধার বয়:সন্ধি বা পূর্বরাগের চিত্র নয়। এখানেও রবীন্দ্রনাথ পদসংকলন-ব্যাপারে চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করেন নাই। দ্বিতীয় পদ থেকে পঞ্চম পদ পর্যন্ত হচ্ছে কৃষ্ণের শৈশবলীলার চিত্র—

ধাতু প্রবাল-দল নব গুঞ্জাফল
ব্রজবালক-সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি মণিমুকুতা ঝুরি
কটিতটে ঘুঙ্গুর বাজে ॥

নবনী ভক্ষণ করতে গিয়ে কৃষ্ণের মুখে, বুকে ননী লেগে আছে; কৃষ্ণের কালো অঙ্গে ঐগুলি দেখাচ্ছে বড়ই সুন্দর। তাই,

হেরি যশোমতী প্রেমেতে পুরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারি যাই।

কৃষ্ণ তুড়ি দিয়ে কত ভঙ্গিতে নাচছেন; চরণ তুলতে দেখা যাচ্ছে অরুণ কিরণ; হৃদয়ে দুলছে বাঘ নখ; নূপুরের রুনুঝুনু শব্দে চারিদিক মুখরিত। যশোদা ডেকে বলছেন—

কোথা গেলা নন্দরায় আনন্দ বহিয়া যায়
দেখসিয়া নয়ন ভরিয়া।

পঞ্চম পদে কৃষ্ণ বায়না ধরেছেন, তাঁকে কোলে নিতে হবে; যশোদার কাঁকে জলভরা কলসী; তিনি কি ক'রে কৃষ্ণকে কোলে নেন! কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই মায়ের বসন ছাড়ছেন না। কাজেই যশোদাকে ছল পাততে হ'ল। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, তুমি আগে আগে যাও, তোমার 'ঘাঘর নূপুর কেমন বাজে' তাই শুনব; তোমাকে একটা রাঙা লাঠি দেব, তাই দিয়ে শ্রীদামের সঙ্গে খেল; ঘরে যাবার পর ক্ষীর, ননী দিয়ে তোমাকে পরিতুষ্ট করব; কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই আঁচল ছাড়েন না, শেষে আর না পেরে যশোদা বললেন—

কলসী লাগিল কাঁখে ছাড়রে অভাগী মাকে
হোর মেঘ ধবলী পিয়ায়।
মায়ের করুণাভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজরায় ॥

বলা বাহুল্য, এই ক'টি পদের মধ্যে যশোদার বাৎসল্য-ভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

এর পরেই সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার চিত্র। পদগুলির মধ্যে বলরাম দাসকৃত পাঁচটি পদ উদ্ধৃত ক'রে রবীন্দ্রনাথ সখ্যরসের অপূর্ব আলেখ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণ মাকে এসে বললেন যে, তিনি শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির সঙ্গে বৎস চরাতে যাবেন বৃন্দাবনে; সেইজন্য চূড়া বেঁধে মুরলী হাতে দিতে আর পীতধড়ায় সাজিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দিতে মাকে বললে—

শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিনী ধটী পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি পুচ্ছ চূড়ার টালনী ॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে ॥ (৭নং পদ।)

যশোদা কৃষ্ণকে মনের মত সাজিয়ে দিলেন; কিন্তু তাঁর মনে নানা আশঙ্কার উদয় হ'তে লাগল। তিনি কৃষ্ণকে বিশেষ সাবধান ক'রে বললেন, বাছা, ধেনু বৎসের আগে আগে তুমি কখনও যেও না, নিকটেই তাদের রাখবে, আর মাঝে মাঝে বাঁশি বাজিও, যাতে বংশীধ্বনি শুনে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তুমি থাকবে সকলের মাঝখানে; তোমার আগে যাবে বলাই, শিশুরা সব বামে, আর শ্রীদাম, সুদাম থাকবে পেছনে; কারণ, 'মাঠে বড় রিপুভয় আছে।' খিদে পেলে খেয়ে নিও। পথে অতিশয় তৃণাঙ্কুর, সুতরাং পথের দিকে চেয়ে চেয়ে যেও। বড় বড় ধেনুর কাছে যেন তুমি যেও না, আমার মাথায় হাত দিয়ে তুমি শপথ ক'রে যাও। গাছের ছায়ায় থাকবে, যেন গায়ে রোদ না লাগে।

কৃষ্ণ মাকে প্রণাম ক'রে রওনা হলেন শিশুদের সঙ্গে, ঘন বন শিঙ্গা-বেণুর রব ও শিশুদের হৈ হৈ শব্দে সবার মন আনন্দে ভ'রে উঠল। কৃষ্ণ সকলের মাঝে নাচতে নাচতে চললেন। যমুনার তীরে ধেনু-বৎস ছেড়ে দিয়ে শিশুরা মনের আনন্দে খেলতে লাগল। শেষে খিদে পেলে সকলে ভোজন সমাপন ক'রে বসল কদম গাছের ছায়ায়। নদীতীরের শীতল বাতাসে কৃষ্ণ শয়ন করলেন শ্রীদামের কোলে, আর বলরাম সুবলের কোলে। নব নব পল্লব দিয়ে সখাগণ দুইজনকে বাতাস দিতে লাগল; কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে কোকিল পঞ্চম স্বরে গান ধরল। এই ভাবে অনেকক্ষণ চ'লে গেলে কৃষ্ণ আলস্য ত্যাগ ক'রে উঠে পড়লেন, তখন দেখা গেল যে, ধেনুবৎস সব অনেক দূরে চ'লে গেছে, আর সন্ধ্যাও প্রায় হয়ে এসেছে; তখন মায়ের কথা মনে পড়ায় কৃষ্ণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কিন্তু গোধন দেখতে না পেয়ে তিনি—

চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু উর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥

* * *

ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।

দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে ॥

ধেনু-বৎস সব একত্র ক'রে ও শিশুদের নিয়ে কৃষ্ণ ফিরলেন ঘরে ; মা যশোদা সারাদিন পর রাম-কৃষ্ণকে কোলে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে দীর্ঘক্ষণের বিচ্ছেদ-জ্বালা সব ভুলে গেলেন —তিনি কৃষ্ণকে বামে এবং রামকে দক্ষিণে বসিয়ে তাঁদের মুখচুম্বনে হলেন পুলকাকুল। ক্ষীর, ননী, ছানা, সর সমস্তই পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিল। জননী স্বহস্তে উভয়কে খাইয়ে দিতে লাগলেন। অপরাপর গোপ-রমণী চারদিক্ থেকে তাঁদের ঘিরে দাঁড়াল। যশোদা সকলকে নিয়ে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন, আর মুহুর্মুহু মুখ চুম্বনে কৃষ্ণ-বলরামকে আকুল ক'রে তুললেন।

বাৎসল্যরসের এমন মধুর চিত্রের প্রকাশ নিতান্ত সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পদকর্তার বাৎসল্য-রসাশ্রিত সুন্দর সুন্দর পদগুলি একত্র ক'রে পদরত্নাবলীর প্রথমাংশ মধুরতর ক'রে তুলেছেন। অকস্মাৎ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে স্নেহরসবঞ্চিত কবির হৃদয় যে অনুক্ষণ হাহাকার ক'রে ফিরত এবং পদাবলীর রসাস্বাদনে তিনি যে তার খানিকটা পূরণ করতে চেয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রাচীন পদসংকলন-গ্রন্থে মধুর রসের পদসংখ্যাই বেশি ; কারণ, ভজনসাধনের উপাসনা-পদ্ধতিই ছিল মধুর রসকে আশ্রয় ক'রে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-সংকলিত পদরত্নাবলীর ১১০টি পদের মধ্যে ১৮টি পদেই বাৎসল্য ও সখ্য রসের চিত্র। সুতরাং, বোঝা যায়, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করেন নি।

পদরত্নাবলীর অষ্টাদশ ও উনবিংশতিতম পদ দুইটি বিশিষ্টতাপূর্ণ। প্রথম পদটি সখ্যভাবাশ্রিত, আর শেষেরটি রাধিকার পূর্বরাগমিশ্রিত হ'লেও পদ-দুইটিতে বিশেষ সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু একই বিষয়ের মধ্য দিয়ে যে দুইটি বিভিন্ন ভাবের আরোপণ সম্ভব, তা রবীন্দ্রনাথ অতি দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন।

অষ্টাদশ সংখ্যক পদে আছে—যমুনার তীরে কৃষ্ণ শ্রীদামের সঙ্গে খেলাধুলা ক'রে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন —সূর্যের প্রচণ্ড তাপে মুখ গেছে শুকিয়ে ; কৃষ্ণের শুকনো মুখ দেখে সখাদের মনে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত। তারা স্পষ্টই বলল—

আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সবারে ॥
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সবাকার ॥

পক্ষান্তরে, উনবিংশতিতম পদের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাধিকার চোখেও পড়েছে কৃষ্ণের পরিশ্রান্ত মুখ এবং তাতে হয়েছে কারুণ্যের সঞ্চার। তিনি বলছেন—

বড়ি মাই, কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা পুলিন বনে দেখ্যাছি রাখাল-সনে
খেলারসে হৈয়াছিল ভোর ॥
বংশী বটের তল ছায়া অতি সুশীতল
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ মুখখানি ঘামিয়াছিল
ভোখে আঁখি অরুণ-বরণ ॥
পীতধড়া-অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যাম কায়া।
মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোক ভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করোঁ ছায়া ॥

(শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃ ১২১।)

পদ দুইটি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে পদনির্বাচন ও পদসন্নিবেশের যুগপৎ বৈদগ্ধ্য রবীন্দ্রনাথে লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না। একই ঘটনায় যে দুইটি বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্ট হ'তে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল উক্ত দু'টি পদ। কৃষ্ণের মলিন মুখ দেখে তাঁর উপর সখাগণের যে-করুণার সৃষ্টি হয়েছে, সেই দুঃখ থেকেই রাধিকার হয়েছে কারুণ্যজাত প্রেমের উৎপত্তি।

উক্ত পদের সঙ্গে পরবর্তী পদেরও ভাবসাদৃশ্য ধরা পড়ে। কৃষ্ণের মলিন মুখ দেখে রাধিকার মনে সহানুভূতি এসেছে ; কিন্তু রাধা ত এখন বালিকা নন, তাঁর দেহে ও মনে তারুণ্যের অরুণোদয় হয়েছে ; এখন তাঁর বয়ঃসন্ধির সময়—

হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খেনে আঁচর দেই খেনে হয়ে ভোর ॥
বালা শৈশবে তরুণে ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ ॥

(২০ নং পদ।)

রাধিকা শৈশব অবস্থায় তারুণ্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ; শৈশব ও তারুণ্য—এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টি বড় অর্থাৎ কোন্‌টির প্রভাব বেশি, তা লক্ষ্য করা যায় না। রাধিকা কোনও সময় বালিকা-ভাবের পরিচয় দিচ্ছেন, আবার কখনও তারুণ্যের ন্যায় আচরণ করছেন ; সুতরাং তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে, তিনি বালিকা, না তরুণী। এই জন্যই পূর্ববর্তী পদে রাধা লজ্জা-সরমের আর অপেক্ষা না রেখে বড়াইকে মনের কথা খুলে বললেন—

মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোক ভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করোঁ ছায়া ॥

কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মাথার উপর আঁচল বিছিয়ে রাধা ত ছায়া করতে পারছেন না ; কারণ, রাধার মধ্যে হয়েছে এখন তারুণ্যের সঞ্চার।

এর পরে চারটি পদ পূর্বরাগের—প্রথম দু'টি রাধিকার এবং শেষ দু'টি কৃষ্ণের। পঞ্চবিংশতিতম পদটি হচ্ছে জ্ঞানদাসের। রাধা স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখে প্রাণের সখীর কাছে তার বর্ণনা দিয়ে বলছেন—শ্রাবণের রাত্রি, যেমন মেঘ গর্জন তেমনই বারিবর্ষণ ; পালঙ্কে সুখে নিদ্রা যাচ্ছি, দেহের বসন বিস্রস্ত ; চারদিকে ময়ূরের কেকাধ্বনি, ভেকের দল উন্মত্ত হয়ে রব তুলেছে, অহুক্ষণ ঝিঁঝিঁ ডাকছে ; মাঝে মাঝে ডাহুকা ডাক দিয়ে তার হর্ষ প্রকাশ করছে ; এমন সময় আমি দেখলাম এক মধুর স্বপ্ন। এক পুরুষরতনের সুমধুর কথা আমার কানে গেল। আমি চেয়ে দেখলাম,—

রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
'আমা কিন বিকাইলুঁ' বোলে ॥

(দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান।)
সেই পুরুষরতনের অঙ্গ নানা ভূষণে বিভূষিত, তার চাহনিতে কামদেবেরও মোহ জন্মায় ; তার কথা বলার কত সুমধুর ভঙ্গিমা, মুখে হাসি লেগেই আছে, মন ভুলানর রঙ্গ সে যেন কতই জানে। শেষে—

রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।

স্বপ্নের এই বৃত্তান্ত শুনে সখী রাধাকে সাবধান ক'রে বলল,—

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি যব সুপুরুখ জানি ॥
সুজনক প্রেম হেম-সমতুল।
দহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল ॥
টুটাইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছন বাঢ়ত মৃণালক সুত ॥

সুজনের প্রেম অতি অদ্ভুত ; ভাঙলেও এ-প্রেম ভাঙ্গে না। মৃণালের সূত্র বা আঁশ যেমন টানলে বাড়তেই থাকে, কখনও ছিঁড়ে যায় না, সেরূপ সুজনের প্রেম কেবল বাড়তেই থাকে, কিন্তু এই সুজন পাওয়া বড় দুষ্কর ; কারণ—

সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোয়িল-বাণী ॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহে গুণবন্ত ॥

(২৬ সংখ্যক পদ।)

কিন্তু সখীর কথায় কিছুমাত্র রাধার মনে স্থান পেল না। তাঁর অন্তর এখন কৃষ্ণময়। রাধা স্পষ্টই সখীকে নিজের মনের কথা খুলে বললেন,—

প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতি কুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর-রঙ্গী ॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহব কায় ॥

(২৭ সংখ্যক পদ।)

এর পরে চারটি পদে রাধাকৃত কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কৃষ্ণের প্রতি রাধার সুগভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। রাধা বলছেন, কৃষ্ণের কপালে চন্দনের চন্দ্রাকার ফোঁটা যেন কামিনীর মোহন ফাঁদ ; দেখলে মনে হয়, মেঘের উপরে যেন পূর্ণশশীর উদয় হয়েছে ; তার আঁখির হিল্লোলে পরাণপুতলি যেন কেমন করতে থাকে ; বাঁশী বাজানর সময় তার হাতের দশটি নখচন্দ্রের নৃত্য কি অপূর্ব ; চূড়ায় লম্বিতবিনোদ ময়ূরের পাখা দেখলে জাতি-কুল রাখা দায় হয়ে পড়ে ; কৃষ্ণ হাসিমুখে কথা বলে আর পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে আমার ছায়ার সঙ্গে তার ছায়া মেশাতে ; অঙ্গের বাস বাতাসে উড়ে তার অঙ্গ স্পর্শ করে ; কৃষ্ণ হচ্ছে সহজ রসের আকর, আর তাতে আছে ভাবের অঙ্কুর। তার রূপ দেখতে দেখতে—

যে অঙ্গে নয়ন থুই সেই অঙ্গ হৈতে মুঞি
ফিরাইয়া লৈতে নারি আঁখি ॥
অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী তরঙ্গে যেন
চাঁদ ঝলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি-অঙ্গে হেরি কত শশী ॥

(পদসংখ্যা ২৮-৩১।)

এই অবস্থায় রাধা আর স্থির থাকতে না পেরে প্রকাশ্যে সখীকে বলছেন, সখি, আমি মথুরার পথে গেলে

সেই পুরুষরতনকে নিশ্চয়ই দেখতে পাব; স্বপ্নে নিজে তাকে দেখেছি, আবার অপরের মুখেও তার কথা শুনেছি। সুতরাং—

নিতি নিতি অনুরাগে হারাব আপনা।
যে হকু সে হকু দেখিব কাল সোনা॥ ৩২

আমি কৃষ্ণকে দেখব অলক্ষ্যে, কোন পরিচয় দেব না; কোন আভরণ বা গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করব না, আর নীল-বাস দিয়ে দেহ আচ্ছাদিত ক'রে রাখব; কাজেই কৃষ্ণ আমাকে বুঝতেই পারবে না; কিন্তু আমার দৃষ্টি যদি একবার তার উপর পড়ে, তবে ত আমি নিজেকে তখন আর স্থির রাখতে পারব না। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে আমাকে এরূপভাবে গোপন ক'রে রাখবে যাতে আমিও তাকে দেখতে না পাই, আর সেও যেন আমায় না দেখে।

এর পরে রাধিকার কৃষ্ণদর্শন হ'ল; কিন্তু মাত্র দু'নয়নে তাকে কতটুকুই দেখা যায়! তাই রাধিকা খেদ ক'রে বলছেন, বিধাতা আমার 'প্রতি-অঙ্গে লাখ নয়ান' কেন দিলেন না! যেটুকু দেখলাম তাও—

দরশন লোরে আগোরল লোচন
না চিনিলু কাল কি গোর॥৩৩

তা হ'লেও তাকে যতটুকু দেখেছি, তার বর্ণনা শত মুখেও করা যায় না। এর পরে রাধা কৃষ্ণের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বাহু ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে বললেন যে, বিধাতা কি রূপমাধুরী দিয়েই না কৃষ্ণকে গড়েছেন। তার ফলে এই—

যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥ ৩৪-৩৫

এর পর বাঁশীর মাহাত্ম্যসম্বলিত পদটিতে রাধিকা বলছেন, যখন আমার বঁধুয়া বাঁশী বাজায় তখন বৃক্ষলতা থেকে আরম্ভ ক'রে বনের পশুপাখী পর্যন্ত নয়নজলে ভিজে যায়; সে সময় আমারও প্রাণ বড়ই আকুল হয়ে ওঠে; কিন্তু সে-কথা ত কাউকে আমি বলতে পারি না।

উপরি-উক্ত আলোচনায় বোঝা যায় যে, পদরত্নাবলীর পদনির্বাচন ও পদ-সন্নিবেশের মধ্যে রয়েছে কত বৈদগ্ধ্য! কৃষ্ণের শিশুলীলা থেকে আরম্ভ ক'রে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ-অনুরাগের পদগুলি যে নিপুণতার সঙ্গে সাজানো হয়েছে, তাতে একটা ধারাবাহিকতাই লক্ষ্য করা যায়; উপরন্তু বাস্তবতার ছোঁয়াচও যে এতে নেই, তা জোর ক'রে বলা যায় না।

এর পরে তিনটি পদে রাধাকৃষ্ণ উভয়ের প্রকাশ পেয়েছে সুগভীর আকুলতা। কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন—

রাই! কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
যজ্ঞ দান তপ জপ সব তুমি মোর।
মোহন মুরলী আর নয়ানকো লোর॥ ৩৭

আমি যে আজ পীতবাস ধারণ করেছি, তা তোমার জন্যই; তোমার দেহের বর্ণ আমি দেখতে পাই এই পীতবসনে; তোমার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, আর তোমার বিলোল চাহনিতে হৃদয়মাঝে ওঠে রসের হিল্লোল। এর উত্তরে রাধা কৃষ্ণকে বলেন, তোমার রূপ-সন্দর্শনে স্বয়ং রতিপতিও বিমুগ্ধ; তোমার প্রতি-অঙ্গ রূপতরঙ্গের লীলানিকেতন, তোমার বংশীধ্বনি যেন অমৃত বর্ষণ করতে থাকে, তোমার মধ্যে অদ্ভুত মোহিনী শক্তি; অবলার প্রাণ নিতে তোমার মত আর কাউকে দেখি না। দিবারাত্রি তোমার কথাই ভাবি; কিন্তু তোমার 'পিরীতির' থই পাই না; তোমার জন্যই—

ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥ ৩৯

শারদ পূর্ণিমায় বৃন্দাবনের শোভা বর্ণিত হয়েছে ৪০ সংখ্যক পদে; সেই বনমধ্যে আছে মণিমাণিক্যখচিত রত্নবেদিকা, আর তার পাশে হীরকখচিত স্ফটিকময় তরুরাজি, তাদের বেড়ে আছে নেতের পতাকা-শোভিত কুঞ্জকুটির, তার মধ্যে মণি-মাণিক্যনির্মিত রাসমণ্ডপের কিরণছটায় চারদিক্ হয়েছে উদ্ভাসিত এই বৃন্দাবনে—

আজু খেলত আনন্দে ভোর
মধুর যুবতী নব কিশোর।
মধুর বরজ-রঙ্গিনী মেলি
করত মধুর রভস কেলি॥ ৪১

মাধবীকুঞ্জে ফুটে রয়েছে রাশি রাশি কুসুম, আর সেখানে মত্ত ভ্রমরের দল গুণ গুণ ক'রে ফিরছে, মৃদু-মধুর পবনের হিল্লোল লেগেছে বনানীতে, আর মধুর ছন্দে কোকিল গান ধরেছে; অন্যত্র বিহগকুলের সুমধুর সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠেছে; শারী-শুক পরস্পর মধুর আলাপে নিরত, নৃত্যপরায়ণ ময়ূর-ময়ূরীর কেকাধ্বনি বনভূমি কাঁপিয়ে তুলছে। চারদিকেই 'মধুর মিলন খেলন হাস, মধুর মধুর রসবিলাস।' ৪০-৪১

উক্ত পদদ্বয়ে রাসের ইঙ্গিত থাকলেও পদসংকলয়িতা এ-বিষয়ে আর অগ্রসর না হয়ে হঠাৎ মাঝে রাধাকৃষ্ণের প্রেমাকুলতাব্যঞ্জক চারিটি পদ দিয়ে আবার দু'টি রাসের পদ দিয়েছেন। উক্ত চারটি পদের মধ্যে একটি অভিসারের। রাসের পদে আছে রাস-শ্রমে অলস রাধিকার কৃষ্ণের ক্রোড়ে শয়ন। মনে হচ্ছে—

শ্যামঘন বরিখয়ে প্রেমসুধা-ধার।
কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥৪৭

এর পরেই নিবেদনের একটি পদে রাধা বলছেন—

বঁধূ কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিব প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ ৪৮

এর পরবর্তী পদদ্বয় আক্ষেপানুরাগের। রাধিকা বলছেন, বিবিধ কুসুম সযত্নে আহরণ ক'রে 'পিরীতি মালা' গাথলাম, কিন্তু প্রেমরস-সেবনে দেহ শীতল হওয়া দূরে থাকুক, তার জ্বালায় গলা জ্বলে গেল; মালী যে ওতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে! সুতরাং এ কলঙ্কিনীর মুখ আর কাউকে দেখাব না, এ বৃন্দাবনে আর থাকব না—

কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানুগুণযশ গানে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে ভরমিব আমি যোগিনী হইয়া ॥৫০

পদরত্নাবলীর প্রথম ৩৬টি পদের পৌর্বাপৌর্ব যথাযথ রক্ষিত হয়েছে; কিন্তু তার পরে এ বিষয়ে অভাব দেখা যায়। এর নানা কারণ থাকতে পারে। হাতের কাছে যে-সব পদ ছিল, তাই দিয়ে হয়ত কবিগুরু প্রথমের দিকে সাজিয়ে দিয়েছেন; পরে যে-সব পদ নির্বাচন করেন, সেগুলি এই সাজানো পদগুলির মধ্যে আর ঢোকাবার চেষ্টা করেন নি, পৃথক্ পৃথক্ই রেখে দিয়েছেন। আবার এও মনে হ'তে পারে যে, পদ সংকলন ক'রে প্রথমের দিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাজিয়েছিলেন এবং পরবর্তী পদগুলির সাজানোর ভার ছিল অন্যতর সম্পাদকের হাতে; শ্রীশ-বাবু হয়ত কবিগুরুর পদসাজানোর ধারাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি; অথবা রবীন্দ্রনাথের সামনে হয়ত তেমন পদ সংকলন-গ্রন্থের কোন আদর্শ পুঁথি ছিল না; আবার এ কথাও অসম্ভব নয় যে, কবিগুরু পদের সংকলন ও সন্নিবেশ করতে করতে কার্যান্তরে ব্যাপৃত হন এবং শ্রীশবাবু সেরে দেন বাকী কাজটুকু।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

—•—

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

১৫

আসলে দুলাল সা'র কথাগুলো কর্তামশাই-এর বিশ্বাস করতে ভাল লাগল। জীবনে মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য যেমন নেই, জীবনটাও যে মিথ্যে নয়, এ সত্যটাও তেমনি একটা বড় সত্য। আর এই সত্যটাকেই পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে হ'লে অর্থের প্রয়োজন অনিবার্য্য। জীবন যে অনিত্য, তা কর্তামশাই-এর মত দুলাল সা'ও জানত। যেমন পৃথিবীর আরও হাজার হাজার লোক জানে। কিন্তু সেই অনিত্য বস্তুটাই অর্থ ছাড়া যে অনিত্যতর হয়ে ওঠে একথা কর্তামশাই-এর চেয়ে আর কেউ বেশী মর্মান্তিক ক'রে অনুভব করে নি। তাই দুলাল সা'র এই হঠাৎ-পরিবর্তনে কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

ছ'মাসের মধ্যেই ভট্টাচার্য্য-বাড়ী আবার নতুন চেহারায় মর্য্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠল। আবার চুণকাম করা হ'ল দেয়ালে। বাড়ীর গায়ে বালির পলেস্তারা লাগল। রং লাগল। ঘরে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ আলো পাখা ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলল।

লোকে বাড়ীর সামনে এসে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকত। বলত—বাঃ—

ভেতরে এসে কর্তামশাই-এর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করত। কর্তামশাইও পা বাড়িয়ে দিয়ে হাত উঁচু ক'রে আশীর্বাদ করতেন।

তারা জিজ্ঞেস করত—নাতনী কেমন আছে কর্তামশাই? আপনার হরতন?

কর্তামশাই বলতেন, এই ভাল হয়ে উঠছে, আর দু'দিন, দু'দিন পরেই উঠে-হেঁটে বেড়াবে।

সকাল থেকে লোকের আর কামাই নেই যেন। লোক আসে, কর্তামশাইকে প্রণাম করে, আর তার পর কর্তামশাই-এর সামনে ব'সে তাঁর কথাগুলো চুপ ক'রে শোনে। যেমন ক'রে এতদিন শুনত দুলাল সা'র কথা।

কর্তামশাই বলতেন, ধর্ম আছে, বুঝলে হে কালিপদ, এই কলিযুগেও ধর্ম আছে, ভগবান্ আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে—সবই আছে। আমরা শুধু দেখতে পাই না, এই যা—

তার পর আবার একটু থেমে বলতেন, মানুষ অন্ধ, সংস্কারে সব মানুষ অন্ধ হয়ে আছে ব'লেই কিছু দেখতে পায় না। নইলে তোমরা ত নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছ—

তারা সবাই বলত, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

কর্তামশাই বলতেন, চোখ-কান খুলে রাখ, দেখতে পাবে।

—কি দেখতে পাব হুজুর?

—দেখতে পাবে পুণ্যের জয় আর পাপের পরাজয়। আমি জীবনে কোনও পাপ করি নি। কারোর কোনও অনিষ্ট-চিন্তা করি নি। কারও ক্ষতির কথা স্বপ্নেও দেখি নি। তোমরা ত জান আমাকে। আমি চিরকাল লোকের ভাল চেয়েছি—চাই নি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত আপনি চেয়েছেনই।

—এখনও তাই-ই চাই। এখনও চাই সকলের ভাল হোক্। চাই ব'লেই ত আজ আমার এই নাতনী আবার ফিরে এল। এই বাড়ী আবার নতুন হ'ল। এই যে ইলেক্‌ট্রিক্-আলোর ঝাড় দেখছ, কলকাতার লাট-সাহেবের বাড়ীতেও এই ঝাড়-লণ্ঠন আছে—কলকাতার মেকার-মিস্ত্রী এসে এই সব ক'রে দিয়ে গিয়েছে—

—কত খরচ পড়ল আজ্ঞে?

কর্তামশাই মিটি-মিটি হাসতেন। জিজ্ঞেস করতেন, তোমরাই আন্দাজ কর না কত খরচ পড়ল?

গ্রামের সাধারণ সাদা-সিধে লোক সব। তারা জীবনে এ সব দেখে নি কখনও। চারদিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে বলত, আজ্ঞে, তা পাঁচশ-ছ'শ টাকা হবে বেকসুর।

কর্তামশাই বিজ্ঞের হাসি হেসে বলতেন, ওই নিবারণকে জিজ্ঞেস কর।

নিবারণ পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত।

—কত খরচ পড়ল, সরকার মশাই?

—পঞ্চান্ন হাজার টাকা।

কর্তামশাই বলতেন, তাও ত এখনও কিছুই হয় নি রে! হরতনের জন্যে নতুন মোটর-গাড়ি কিনতে হবে

আবার। তাতেও পড়বে হাজার চোদ্দ টাকা—তার পর পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টাও ত কিনে নিচ্ছি—

—ওতে যে চিনির কল হয়েছে সা' মশাই-এর!

—চিনির কলটাও কিনে নেব আমি।

সবাই অবাক্ হয়ে যেত খবরটা শুনে। মুখে কিছু বলত না। খানিক পরে শুধু বলত, সবই ভগবানের দয়া কর্ত্তামশাই, সবই ভগবানের দয়া।

কর্ত্তামশাই চেঁচিয়ে উঠতেন। বলতেন, ওরে সেই কথাই ত তোদের এতদিন ব'লে আসছি—ধর্ম্মও আছে, ভগবানও আছে, কলিযুগ ব'লে যে সব-কিছু মিথ্যে হয়ে গেছে তা নয়, কলিযুগেও ভগবান্ আছে, আমি এই হাতে হাতে তার প্রমাণ পেয়েছি।

কথা আর বেশিক্ষণ হয় না। বঙ্কু কলকাতায় গিয়েছিল ডাক্তার আনতে, সে ফিরে আসতেই আসর বন্ধ হয়ে গেল।

সাধারণতঃ কলকাতার ডাক্তার এই পাড়গাঁয়ে আসতে চায় না। যারা নামজাদা ডাক্তার তারা হাসপাতাল, নার্সিং-হোম করেছে সবাই। বাড়ীতে ব'সে রোগী দেখে আর দরকার হ'লে রোগীদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। নিবারণ নিজে গিয়েও তু'বার খালি হাতে ফিরে এসেছে।

বঙ্কু বলেছিল, আমি যাব কর্ত্তামশাই? আমি যেমন ক'রে পারি ডাক্তার ডেকে আনব।

তা যাক্। বঙ্কুই যাক্। সব ডাক্তারই বলেছে, হরতনকে কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে। এ রোগের চিকিৎসা বাড়ীতে হয় না। বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ে। ওষুধ না-হয় কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া গেল। কিন্তু ইন্‌জেক্‌শন দিতে লোক চাই। তা সে ব্যবস্থাও হয়েছিল। হরিসাধন সামন্ত কেষ্টগঞ্জের বাজারে নতুন ডাক্তারি পাশ ক'রে দোকান খুলেছিল। সে-ই এসে কলকাতার ডাক্তারের পরামর্শ-মত ইন্‌জেকশন দিয়ে যেত।

কর্ত্তামশাই জিজ্ঞেস করতেন—কেমন বুঝছ তুমি, হরিসাধন?

হরিসাধন বলত—আজ্ঞে, ভাবনা করবেন না আপনি, ভাল্ হয়ে যাবেই।

কর্ত্তামশাই রেগে যেতেন। বলতেন—আরে ভাল ত হবেই, সেটা আর আমি বুঝি না? তুমি আমাকে তাই বোঝাবে? আমি কখনও কোনও পাপ করি নি, কারও অনিষ্ট চিন্তা করি নি, কারও ক্ষতির কথা স্বপ্নেও ভাবি নি, তা ভাল হবে না মানে?

মুশকিল সবচেয়ে বেশি হয়েছিল বঙ্কুর। তুপুর রোদের মধ্যে একবার যেত ডাক্তারের কাছে, আবার এসে বসত হরতনের পাশে। তারপর হরতনের মাথায় পাখার বাতাস করত। মাথার ওপর ইলেকট্রিকের পাখা বন্ বন্ ক'রে ঘুরত, তবু পাখার বাতাস না-ক'রে শান্তি পেত না বঙ্কু। নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকত না বঙ্কুর।

—হ্যাঁ বাবা, তুমি খাবে না আজকে?

বড়গিন্নীরই ছিল জ্বালা। কর্ত্তামশাই সারা দিন হৈ-হৈ ক'রে বেড়াচ্ছেন, সরকারমশাইও তাঁর হুকুম তামিল করবার জন্যে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বঙ্কু ত সারাদিন হরতনকে নিয়েই আছে। এদের সকলের খাওয়া-দাওয়ার দিক্‌টা বড়গিন্নীকেই দেখতে হয়। তার ওপরেই বলতে গেলে সমস্ত সংসারটার ভার। হরতনের ডাবের জল, তার তুধ, তার ফল, তার ভাত, তার সবকিছুর দিক্‌টা বড়গিন্নী না দেখলে কে দেখবে?

বঙ্কুকে ডেকে খাওয়াতে হয়। বঙ্কুর লজ্জা-টজ্জার তেমন বালাই নেই।

বলে—আর তুটো ভাত দিন মা-মণি, ডালটা বড্ড ভাল রান্না হয়েছে।

বড়গিন্নী বলে—তা হ'লে আর একটু ডালও দিই বাবা তোমাকে।

—তা দিন। অনেক দিন এমন ক'রে খাই নি আমরা মা-মণি! শ্রীমানী অপেরায় আমাদের এক-একদিন পেটই ভরত না, হরতন এক-একদিন আধপেটা খেয়েই কাটিয়েছে।

—তা তু'টো ভাত, তাই-ই তোমরা পেট ভ'রে খেতে পেতে না? আহা—

—আজ্ঞে, কি বলব আপনাকে, চণ্ডীবাবুর ওই মুখটাই যা মিষ্টি, মুখের কথা শুনলে মনে হবে একেবারে যেন যুধিষ্ঠির, বুঝলেন, আসলে শকুনি, শকুনিকে জানেন ত? কুরুবংশ একেবারে ধ্বংস ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল।

খেতে খেতে অনেক গল্প করে বঙ্কু।

বলে—অঞ্জনাকে আমি কদ্দিন বলেছি, জানেন মা-মণি, বলেছি এই চণ্ডীবাবুর দলটা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিয়ে চল আমরা চ'লে যাই যেদিকে তু'চোখ যায়। এই খাওয়ার কষ্ট আর ভাল লাগে না—কিন্তু কিছুতেই শুনত না। শুকনো তু'টো মুড়ি খেতে ইচ্ছে হ'লে খাবার উপায় নেই, জানেন?

—কেন? কেন?

—আজ্ঞে, সবাই ত উপুসী! সকলকে না দিয়ে কেমন ক'রে খাই বলুন দিকিনি। কতদিন থেকে অঞ্জনার ইচ্ছে ছিল ভাতের সঙ্গে আলুভাতে খাবে, তা একদিনও দেবে না চণ্ডীবাবু।

—কেন? আলুভাতে দিলে কিসের ক্ষতি?

বঙ্কু বলে—আলুভাতে যে দেবে চণ্ডীবাবু, তা আলুর দাম নেই? চণ্ডীবাবু বলত—আর আলুভাতে খেতে হবে না, আলুর দাম কত ক'রে তা জানিস্?

—ওমা, আলুর ত ভারি দাম, তাই নিয়েই এত হেনস্তা?

—ওই বুঝুন! আমরা কি কম কষ্ট করেছি মা-মণি! তা যাক্, এখন অঞ্জনার সুখ হয়েছে, তাই দেখেই আমারও সুখ। আমি গিয়ে সব বলব চণ্ডীবাবুকে।

বড়গিন্নী বলে—না বাবা, তুমি যেন এখন চ'লে যেও না—হরতন আগে একটু ভাল হোক্, তার আগে আর তোমাকে ছাড়ছি না।

বঙ্কু বলে—এই দেখুন, হরতন না সেরে উঠলে আমিই কি যাব নাকি ভেবেছেন? আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি ওকে এই অবস্থায় ফেলে যাচ্ছি না—এই আপনাকে ব'লে রাখলাম।

তারপর খেতে খেতেই হঠাৎ বোধ হয় খেয়াল হয়।

বলে—উঠি মা-মণি, হরতনকে একলা ফেলে এসেছি ওদিকে।

ব'লে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়েই আবার দৌড়ে গিয়ে হাজির হয় হরতনের কাছে।

নিতাই বসাকের কাজের তাড়াটাই সবচেয়ে বেশি। সুকান্ত রায় ক'দিন থেকে নিতাই বসাককে ধরবার চেষ্টা করছিল। অনেক দিন থেকেই পেছনে পেছনে ঘুরেছে। কলকাতায় যায়, বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে, একটা কথা বললেই সুকান্তর বদলিটা হয়ে যায়।

নিতাই বসাক অনেক আশা দিয়েছিল।

বলেছিল—আপনি কিছু ভাববেন না সুকান্তবাবু, সব মিনিস্টার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

সেদিন এল দুলাল সা'র বাড়ী।

দুলাল সা' ব'সে ব'সে মালা জপ্‌ছিল কাছারি-ঘরের সামনে।

নমস্কার ক'রে সুকান্ত সামনে গিয়ে বসল।

জিজ্ঞেস করলে—বসাকমশাই আছেন নাকি সা'-মশাই?

দুলাল সা এমনিতে কথা বলতে পেলেই বেঁচে যায়। কিন্তু আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। কথায় কথায় বলে—আমি আর ক'দিন রে বাবা, তোরা সংসার-ধর্ম্ম কর্, আমি আমার পরকালের ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি।

যারা শোনে তারা জিজ্ঞেস করে—কিন্তু আপনার সংসার? আপনার সংসার কে দেখবে?

—যিনি দেখবার তিনিই দেখবেন!

—কিন্তু আপনার ছেলে ফিরে আসুক, সে এলেই না-হয় যা করবার করবেন।

দুলাল সা হাসে। বলে—আমি যদি হঠাৎ মারাই যাই ত তখন যদি যমরাজাকে বলি যে, আমার ছেলে আসুক তখন আমি মরব—তা বললে কি শুনবে? বল্ না তোরা, শুনবে যমরাজা?

নিতাই বসাককেও সবাই জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ বসাক মশাই, সা'মশাই নাকি সংসার ছেড়ে চ'লে যাবেন?

নিতাই বসাক বলে—তাই ত বলছে দুলাল।

কিন্তু এত বড় একটা কাণ্ড ঘটতে চলেছে অথচ সবাই যেন নির্ব্বিকার। কেউ যেন বিশেষ বিচলিত নয়। খবরটা সুকান্ত রায়ও শুনেছিল।

বললে—সা'মশাই, একটা কথা শুনলাম, আপনি নাকি সংসার ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাশীধামে চ'লে যাচ্ছেন? সত্যি?

দুলাল সা বললে—যাব বললেই ত আর যাওয়া হয় না বাবা, মন কেবল পেছু টান দিচ্ছে—বলছে, তোর এই সংসার, তোর এই ছেলে, তোর এই পুত্রবধূ, সবই যে তোর—

সুকান্ত বললে—তা ত বটেই—

—আসলে বাবা কেউ কারও নয়, তোমার পাপের বোঝা কেউ নেবে না—

বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ কথা হ'ত। কিন্তু বাধা পড়ল। নিবারণ সরকার গুটি-গুটি এসে হাজির হ'ল।

—কি নিবারণ? তোমার হরতন কেমন আছে?

—সেই রকমই সা' মশাই!

—ডাক্তার এসেছিল কলকাতা থেকে?

—এসেছিল!

—কি ব'লে গেল?

—বলছে ত সবাই, সারবে। এখন ভগবান্ যা করেন!

ব'লে ভগবানের উদ্দেশ্যে চোখ দু'টো তুলে নামিয়ে নিলে।

দুলাল সা মালা জপ্‌তে জপ্‌তে বললে—ভগবানই একমাত্র সারবস্তু হে। এ সংসারে আর সবই মায়া।

তাই ত আমি এই সুকান্তকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম।

নিবারণ হঠাৎ বললে—আমার একটু তাড়া আছে সা'মশাই—আমাকে আবার একবার ওষুধ কিনতে যেতে হবে কলকাতায়। দামী দামী ওষুধ সব, এখানে পাওয়া যাবে না—

দুলাল সা কান্তর দিকে চেয়ে বললে, ওরে কান্ত, দে বাবা দে—নিবারণের আবার তাড়া আছে, নিবারণ কলকাতায় আবার ওষুধ কিনতে যাবে—

কান্ত তৈরিই ছিল। কান্ত তৈরিই থাকে বরাবর। নিবারণ এখানে আসা মানেই টাকা ধার নেওয়া। দু'তিন দিন অন্তর আসে আর যা টাকার দরকার তাই-ই নিয়ে যায়। সা মশাই-এর ঢালা হুকুম আছে। তিনি ত চ'লেই যাচ্ছেন, এ-সংসারের ওপর, এ-টাকার ওপরে ত তাঁর আর কোনও আকর্ষণই নেই। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই তিনি সংসার থেকে বিদায় নেবেন।

কান্ত তখন একটা-একটা ক'রে নোট গুণছিল। নোটগুলো গুণে নিবারণ সরকারের হাতে দিতেই নিবারণও একটা কাগজে ষ্ট্যাম্পের ওপর সই ক'রে দিলে, কর্ত্তামশাই একটা কাগজে যা লেখবার লিখে দিয়েছিলেন আগেই। সেইটেই হ'ল তমসুক। কান্ত তমসুকটি অতি যত্নে আবার তুলে রেখে দিলে ক্যাশ বাক্সের ভেতরে।

—নিলে?

নিবারণ টাকাটা পেট-কাপড়ে গুঁজে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁ, নিলাম সা'মশাই—

—কত নিলে?

—দশ হাজার!

—দশ হাজারে কুলোবে ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ-যাত্রা এতেই কুলিয়ে যাবে!

—না কুলোয় ত আরও হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে যাও না। ও-টাকা নিয়ে আমি কি করব? আমি ত সংসার ছেড়ে চ'লেই যাচ্ছি হে—

তার আর দরকার হ'ল না। সত্তর হাজার আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, এখন দশ হাজার আরও। মোট হ'ল গিয়ে আশি হাজার।

দুলাল সা বললে—তুমি যেন লজ্জা ক'রো না নিবারণ? কর্ত্তামশাইকে গিয়ে বল যে, হরতনের অসুখের জন্যে, আর ওই বাড়ী সারাবার জন্যে যা টাকা লাগে সব আমি দেব। কিছু সঙ্কোচ করবার দরকার নেই, বুঝলে?

নিবারণ সরকার চ'লেই যাচ্ছিল। দরজা পর্য্যন্তও যায় নি। হঠাৎ নিতাই বসাক ঢুকল।

সুকান্ত রায় এতক্ষণে উঠে বসল নিতাই বসাককে দেখে।

—কি বসাক মশাই, কোথায় ছিলেন এ্যাদ্দিন?

কিন্তু উত্তর দেবার আগেই পেছনে পেছনে আরও দু'জন ঢুকল। কেষ্টগঞ্জ থানার পুলিসের দারোগা আর একজন কনেষ্টবল।

নিতাই বসাকই এগিয়ে এসে দুলাল সা'র দিকে চেয়ে বললে—এই দেখ দুলাল, দারোগাবাবু এসেছেন, সদানন্দর লাশ পাওয়া গিয়েছে বলছেন—

সদানন্দর লাশ!

সুকান্তই বেশি চমকে উঠেছে। দুলাল সা'র মুখে কিন্তু কোনও বিকার নেই।

বললে—তুমি আগে বোস দারোগাবাবু, পরে শুনব সব—

দারোগাবাবু একটা চেয়ারে বসল। খাকি পুলিসের পোশাক, হাতে একটা বেতের ছড়ি, কনস্টেবলটার হাতেও একটা মোটা লাঠি। সে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি হয়েছিল বাবা তার? কে মারলে তাকে? আহা—

দারোগাবাবু দুলার সা'র অনুগৃহীত। অনেকবার নানা উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে। টাকাটা-সিকেটাও বরাবর পেয়ে এসেছে কারণে-অকারণে। আর তা ছাড়া এই দুলাল সা' বাড়ীতেই এসে একদিন অতিথি হয়েছিলেন পুলিশ মন্ত্রী।

—মারা ত আজকে যায় নি সা'মশাই। লাশ দেখে মনে হচ্ছে সাত-আট দিন আগে কেউ তাকে মেরে ফেলে রেখে দিয়ে গেছে ওখানে। এতদিন যে শেয়াল-কুকুরে খায় নি এইটেই আশ্চর্য্য!

দুলাল সা মুখের ভেতর জিভ দিয়ে একরকম চুক্-চুক্ আওয়াজ করলে।

—আহা, কে এমন কাজ করলে বল দিকিনি বাবা? কে এমন শত্রুতা করলে আমার এমন ক'রে?

—সে ত ইন্‌ভেষ্টিগেশন ক'রে দেখা যাবে। এখন দু'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব আমি।

—তা কর না বাবা। যেমন করে পার, যে আসামী তাকে বাবা তোমায় ধ'রে জেলে পোরা চাই। এ কি কথা! দিনে-দুপুরে আমার কর্ম্মচারীকে হাসপাতাল থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে খুন ক'রে ফেলবে, এ তুমি সহ্য ক'রো না। তাকে ধ'রে ফাঁসি দিতে হবে—

নিতাই বসাক বললে—কিন্তু খুন যে করেছে তার প্রমাণ পেয়েছেন আপনারা?

দারোগাবাবু বললে—খুনও হতে পারে আবার সুইসাইডও হতে পারে। সমস্ত ইনভেষ্টিগেশনেই বেরিয়ে যাবে। বডিটা পাওয়া গেছে হাসানপুরের হোগলা বনের মধ্যে—

দুলাল সা বললে—না বাবা, আমার সন্দেহ হচ্ছে ও খুন, ও খুন না হয়ে যায় না। আমি অত আরামে রেখে-ছিলাম ওকে হাসপাতালে। সেখান থেকে পালিয়ে ও আত্মঘাতী হতে যাবে কেন? কিসের দুঃখে। ও দেখো বাবা নিশ্চয়ই খুন—খুনীকে তোমার ধরতেই হবে, আর ধ'রে একেবারে ফাঁসি দিতে হবে— ক্রমশঃ

—০—

শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রী মহাশয়ের মর্ম্মস্পর্শী কবিতা আমরা অনেকেই শুনিয়াছি—

আজি শচীমাতা	কেন চমকিলে?
ঘুমাতে ঘুমাতে	উঠিয়া বসিলে
লুণ্ঠিত অঞ্চলে	নিমু নিমু বলে
দ্বার খুলি মাতা	কেন বাহিরিলে?
"বউমা বউমা	ঘুমায়ো না আর
উঠ অভাগিনি	দেখ একবার
প্রাণের নিমাই	বুঝি ঘরে নাই
বুঝি বা গিয়াছে	করি অন্ধকারা"
তাই বটে হায়	বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিতা	সরলা কামিনী ইত্যাদি

ইহা শুনিয়া আমাদের মানসনেত্রে একটি সুকরুণ দৃশ্য ভাসিয়া উঠে। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত ঘুমাইতে-ছিলেন। শেষ রাত্রে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। শচীমাতার করুণ বিলাপ-ধ্বনিতে নৈশ নিস্তব্ধতা ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ঘটনা অন্যরূপ। শ্রীচৈতন্যদেব (তখন নিমাই) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির রাত্রে গৃহত্যাগ করিবেন—পূর্ব্বেই তাঁহার মাতাকে জানাইয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইতে নগরবাসিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া গেলেন। শচী মাতার কি সে রাত্রে ঘুম হয়? তিনি জাগিয়া বসিয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় নিমাই তাঁহাকে বলিয়া অনেক সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছিলেন। আর এক কথা, বিষ্ণুপ্রিয়া সেদিন গৃহেই ছিলেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনচরিত মুরারি গুপ্তের করচা নামে পরিচিত। ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। মুরারি গুপ্ত বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ১৫ বৎসর বড়। শ্রীচৈতন্যদেবের অধিকাংশ নবদ্বীপলীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের বিস্তৃত বিবরণ কিছু নাই। তাঁহার দ্বিতীয় জীবনচরিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত। ইহা সম্ভবতঃ চৈতন্য-দেবের জীবিতকালেই লেখা হইয়াছিল। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করা পর্য্যন্ত জীবনচরিত এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও পুরীর কিছু ঘটনা ইহাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের শেষলীলা ইহাতে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী উক্ত সমাজ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যদেবের আর একটি জীবনচরিত লিখিতে বলেন। এই গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবনী ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, কারণ বৃন্দাবন দাস ইহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের উল্লেখ অত্যন্ত সম্মানের সহিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি যেঁহো তারিল সংসার ॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ।)

শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক জীবনচরিত হইতেছে (১) মুরারি গুপ্তের করচা (সংস্কৃত), (২) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, (৩) কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত। তাঁহার গৃহত্যাগের বিস্তৃত বিবরণ মুরারি গুপ্তের করচা বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে নাই। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে

আছে। এবং তাহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। সে বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ—

একদিন নিমাই ভাবে বিভোর হইয়া "গোপী" "গোপী" জপ করিতেছিলেন। দৈবাৎ একটি টোলের প্রগল্‌ভ ছাত্র সেখানে ছিল। সে নিমাইকে বলিল, "নিমাই পণ্ডিত, তুমি গোপী, গোপী বলিতেছ কেন? কৃষ্ণ নাম জপ কর।" তখন নিমাইয়ের কতকটা দিব্যোন্মাদ ভাব; তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ ত দস্যু। তাঁহার নাম জপ করিব কেন? তিনি বালিকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করিলেন। স্বর্পণখা স্ত্রীলোক, তথাপি তার নাক-কাণ কাটিলেন। বলির যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে পাতালে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার নাম কিছুতেই করিব না।" ইহা বলিতে বলিতে নিমাই ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং লাঠি হাতে করিয়া "ধর ধর" বলিয়া ছাত্রটিকে তাড়া করিলেন। ছাত্রটি প্রাণ-ভয়ে পলাইল। প্রভুর ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া শান্ত করিলেন। এদিকে ছাত্রটি যখন ছাত্রাবাসে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল, তখন অন্য ছাত্রগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে। ছাত্রটি বলিল, "সবাই বলে নিমাই পণ্ডিত বড় সাধু হইয়াছে। আমি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম সে, 'গোপী গোপী' জপ করিতেছে। অপরাধের মধ্যে আমি বলিলাম, গোপী নাম জপ করিয়া কি হইবে? কৃষ্ণ নাম জপ কর। আমাকে ঠেঙ্গা হাতে খেদাড়িয়া আসিল। পরমায়ু ছিল, তাই রক্ষা পাইয়াছি।" ইহা শুনিয়া ছাত্রগণ খুব উত্তেজিত হইল। বলিল, "ভারী ত সাধু হইয়াছে দেখিতেছি। আর যদি কোনও দিন মারিতে যায় আমরা বেশ করিয়া প্রহার দিব।" এই কথা নিমাই পণ্ডিত জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি লোক উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। কিন্তু করিতে যাইতেছি লোক সংহার। যাহারা আমাকে মারিবে বলিতেছে তাহারা ত নিজেরাই ধ্বংস হইবে। এক কাজ করা যাক্। আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাই। যাহারা আমাকে মারিবে বলিতেছে তাহাদের দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব। বাড়ীতে সন্ন্যাসী দেখিয়া তাহারা আমার পায়ে ধরিবে। তাহা হইলে তাহাদের উদ্ধার হইবে।' এই কথা নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর ও অন্য ভক্তগণকে বলিলেন। ভক্তগণ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া অন্নগ্রহণ ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমি সর্বদা তোমাদের কাছে থাকিব। তোমরা দুঃখ করিও না।" ক্রমে শচীমাতা ইহা শুনিলেন। শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, নিরবধি অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাপ নিমাই, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমার মুখ দেখিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। তুমি ঘরে থাকিয়া ভক্তগণ লইয়া কীর্তন কর। বৃদ্ধ মাতাকে ছাড়িয়া যাওয়া কি ধর্ম! তোমার বড় ভাই (বিশ্বরূপ) সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমার বাবা স্বর্গে গিয়াছেন। তুমি গেলে আমি বাঁচিব না।" শচীমাতা আহার ছাড়িয়া দিলেন। অস্থিচর্ম সার হইলেন। একদিন নিমাই তাঁহার মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি অস্থির হইও না। আমি পূর্বে কতবার তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি শ্রবণ কর:

"বহুকাল পূর্বে তোমার এক পূর্বজন্মে তোমার নাম ছিল পৃশ্নি। আমি তোমার পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। তাহার পর স্বর্গে তুমি অদিতি হইয়াছিলে, আমি বামন অবতার রূপে তোমার পুত্র হইয়াছিলাম; তুমি দেবহূতি হইয়াছিলে, আমি তোমার পুত্র কপিল হইয়াছিলাম; তুমি কৌশল্যা হইয়াছিলে, আমি রামচন্দ্র হইয়াছিলাম; তুমি দেবকী হইয়াছিলে, আমি কৃষ্ণ হইয়াছিলাম। আমি সংকীর্তন প্রচার করিবার জন্য অবিলম্বে আরও দুই জন্ম তোমার পুত্র হইব।" এই সকল কথা শুনিয়া শচীর মন কিছু স্থির হইল। প্রভু যেদিন সন্ন্যাস করিবেন তাহা নিত্যানন্দকে বলিলেন এবং তাঁহার মাতা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ এই পাঁচজনকে মাত্র জানাইতে বলিলেন। সেদিন সন্ধ্যা হইলে তাঁহার আসন্ন সন্ন্যাসের কথা না জানিয়াও তাঁহার অলৌকিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে নগরবাসী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত প্রভু তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আহার করিতে বসিলেন।

ভোজন করিয়া প্রভু মুখ শুদ্ধ করি।
চলিলা শয়ন গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ॥
আই জানে আজি প্রভু করিবা গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জাগি।
গদাধর বোলেন চলিব সঙ্গে আমি ॥
প্রভু বোলে "আমার নাহিক কারো সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব রঙ্গ ॥"

আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর ॥
(চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, ২৬ অধ্যায়।)

তাহার পর মাতাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া এবং তত্ত্বকথা বলিয়া প্রভু বাহির হইয়া গেলেন।

জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে ॥
(চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, ২৬ অধ্যায়)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই বিদায়-দৃশ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কোনও উল্লেখ নাই। গদাধর ও হরিদাস প্রভুর নিকটে শুইয়াছিলেন। ইহা হইতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ীতে ছিলেন না। ইহার কারণ আমরা অনুমান মাত্র করিতে পারি। গয়াতে বিষ্ণু পাদপদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রথম ভাবোচ্ছ্বাস হয়।

প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে ॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা ॥
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড ১২ অধ্যায়।)

শিষ্যগণ অনেক কষ্টে তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য খণ্ডের প্রথম অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইতেছে :

পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্বক্ষণ।
* *

তাঁহার মাতা

লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥
* * *
কখনো কখনো যে বা হুঙ্কার করয়ে।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়ে ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥

প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কীর্তন করিতেন :

সর্ব নিশা যায় যেন মুহূর্তের প্রায়।
প্রভাতে কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায় ॥

অনুমান হয় যে প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার কিছুদিন পিতৃগৃহে থাকাই সমীচীন মনে হয় এবং সেই সময় প্রভু সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। কিন্তু তাহা হইলেও প্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার শচীমাতার নিকট আসিয়া থাকা স্বাভাবিক হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে বা পরেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কেন শচীমাতার নিকট আসিলেন না তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল শ্রীচৈতন্যদেবের আর একটি জীবনচরিত। ইহা যে চৈতন্য ভাগবতের পরে রচিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ এই গ্রন্থের সূত্র খণ্ডে চৈতন্য ভাগবতের উল্লেখ করিয়া লোচন দাস বৃন্দাবন দাসকে প্রণাম করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে ॥

চৈতন্য ভাগবত পূর্বে লেখা হইয়াছিল বলিয়া এবং চৈতন্য চরিতামৃত-কার দ্বারা বিশেষরূপে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য মঙ্গল অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক। চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য যখন গৃহত্যাগ করিয়া যান তখন বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যদেবের বাটীতেই ছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া অনেক কান্নাকাটি করিয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাকে অনেক আদর করেন এবং তত্ত্বকথা বলেন। যে রাত্রে প্রভু গৃহত্যাগ করিয়া যান, সে রাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে যখন চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য মঙ্গলের বিবরণে অমিল দেখা যায় তখন চৈতন্য ভাগবতের বিবরণকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। লোচন দাস বোধ হয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত কিছু কল্পনা মিশ্রিত করিলে শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের বিবরণ একটি উৎকৃষ্ট করুণ রসাত্মক কাব্যের উপাদান হয়। শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার অমিয়নিমাইচরিত গ্রন্থে লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও প্রামাণিক চৈতন্য ভাগবতের বিবরণ গ্রহণ না করিয়া চৈতন্য মঙ্গলের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কোনও কারণ দেন নাই। ঐতিহাসিক ঘটনা ভুলিয়া লোচন দাসের কাব্যই লোকে সত্য বলিয়া মনে করিতে থাকে। ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"দিনের বাণী"

স্বামী বিবেকানন্দের পুরাতন বাণী :

> "আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্য্যকলাপের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।"

কংগ্রেসী নেতৃত্বে এবং শাসনকালে উপরিউক্ত বাণীর 'নব-সংস্করণ', (যাহা কংগ্রেসী নেতাদের শ্রীমুখ হইতে অহরহ নির্গত হইতেছে) :—

> "তোমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন (তোমাদের) ঘুমাইবার সময় নহে। তোমাদের কার্য্যকলাপের উপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।"

[টীকা : বিশ্রাম এবং ঘুমাইবার জন্য আমরা (অর্থাৎ কংগ্রেসী নেতারা) আছি। তোমাদের হইয়া ঐ কষ্টকর কাজ দুটি কষ্ট করিয়া আমরাই করিব।]

সাধারণ বাঙ্গালীর বর্ত্তমান জীবন

বর্ত্তমান দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সমাজের বাঙ্গালী দু'বেলা অন্তত: আধ-পেটা আহার এবং বছরে খান-দুই বস্ত্র পাইলেই নিজেদের পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া ভাবিয়া থাকে। ইহার উপর যদি বসবাস করিবার জন্য সামান্য একটা আশ্রয় (তাপ-নিয়ন্ত্রিত না হইলেও চলিবে)—এমন কি চালাঘর হইলেও হইবে— তাহা হইলে ত কথাই নাই! কিন্তু প্রতিনিয়ত যদি তাহাদের প্রাণ রাখিতেই প্রাণান্ত হয় তাহা হইলে (বক্তার পক্ষে) মনোহর-তাত্ত্বিক কচ-কচি এবং টনের সাংখ্যিক হিসাবে তাহাদের দৈনিক এবং মানসিক জ্বালা নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধিই পাইবে। তাত্ত্বিক মর্ম্ম এবং সাংখ্যিকের প্রায়-মিথ্যা হিসাব জনসাধারণ বোঝে না, বুঝিতে চাহেও না,—যদি বাস্তবে তাহার বিন্দুমাত্র পরিচয় তাহারা না পায়—এবং দিনের পর দিন তাহাদের অভাব-অনটন এবং পেটের জ্বালা বাড়িয়া চলিতেই থাকে। বর্ত্তমান ইহাই হইয়াছে বাঙ্গালী জীবনের পরম বিড়ম্বনা।

ইদানীং যে অর্থ নৈতিক সমস্যাটি এ রাজ্যে একটা সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে, সেটি হ'ল মূল্যবৃদ্ধি। প্রাত্যহিক জীবনে যে জিনিষগুলি নহিলে আমাদের চলে না, তাহাদের দর প্রায় রোজই চড়িতেছে। চাল, কাপড়, মাছ, সরিষার তেল, ডাল—বাঙ্গালীর সংসারে যেকয়টি জিনিষ না হইলে চলে না, তাহাদের দাম ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে সীমিত-আয় মধ্যবিত্ত এবং স্বল্পবিত্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অনেকের পক্ষেই সংসার-চালানো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে অসন্তোষের সৃষ্টি ইহাতে হইয়াছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে তাহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও শুভ হইবে না। কাজেই পণ্যমূল্যের এই যে উচ্চগতি, সেটা অর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক—এই ত্রিবিধ কারণেই রোধ করা দরকার।

কেবল রোধ করা দরকার বলিলেই যথেষ্ট হইবে না—। অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি যদি রোধ করিতে সরকার অপারগ হন, তাহা হইলে দেশে হঠাৎ এমন একটা বিষম অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, যে-অবস্থা জীবনে বে-পরোয়া, ক্ষুধার্ত্ত এবং নিঃস্ব জনসাধারণ দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চেষ্টা পাইতে পারে। যে-বিষম অবস্থার আশঙ্কা আমরা করিতেছি—তাহা কালক্রমে সর্ব্বক্ষয়ী এক মহাবিপ্লবের আকার ধারণ করিতে বাধ্য। জীবনের সকল দিকে, সকল বিষয়ে এবং সকল ভাবে বঞ্চিত এবং আশা-নিহত বেপরোয়া জনসাধারণ পূর্ব্বকালে বিভিন্ন দেশে স্বার্থপর শাসক-গোষ্ঠীর কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে—ইতিহাসে তাহার প্রভূত সাক্ষ্য প্রমাণ মিলিবে।

এ কথা স্বীকার করি যে, একটা দেশে যে সময় আর্থিক সবিশেষ উন্নতির আয়োজন চলিতে থাকে, সেই সময় দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি একটা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধও থাকিতে পারে না।

কিন্তু বর্ত্তমান এ রাজ্যে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহাকে অর্থনৈতিক প্রগতির অবশ্যম্ভাবী ফল বলা যায় কি না সন্দেহ। কেন্দ্রীয় সরকার যে নূতন কর বসাইয়াছেন তাহার চাপেও জিনিষের দর বাড়িয়াছে সত্য; কিন্তু দাম যতটা বাড়িয়াছে তাহার সবটার মূলেই কি স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া আর-কিছু নাই? তা যদি হয়, তাহা হইলে অবশ্য জিনিষের দাম ক্রমাগতই বাড়িবে এবং হা-হুতাশ ছাড়া আর আমাদের কিছু করার উপায় থাকিবে না। সে-ক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধিকে আমাদের বৈষয়িক প্রগতির মাশুল হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে জিনিষের দাম ধীরে ধীরে গত বারো বৎসর ধরিয়াই বাড়ে নাই। তা যদি হইত তাহা হইলে অনায়াসে ইহাকে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহজাত ফল বলিয়া

ধরিয়া লইতে পারিতাম। তখন উৎপাদনবৃদ্ধিই হইত প্রতিকারের একমাত্র পথ এবং যতদিন না সেটা ঘটিত ততদিন আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুর চড়া দামের এ-চাবুক নিরুপায় হইয়াই খাইতে হইত। কিন্তু দাম দেখিতেছি হঠাৎ বাড়িয়াছে চৈনিক আক্রমণের পরে। কাজেই কেমন করিয়া বলি, তাহার সহিত এই আকস্মিক মূল্য-বৃদ্ধির কোনও সম্বন্ধ নাই? উৎপাদন যে হঠাৎ কমিয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ কই? আর যদি তাহা না ঘটিয়া থাকে তবে দর এমন বাড়িতেছে কেন?

এই 'কেন'র জবাব দিতে হইবে দেশের সরকারকে এবং শাসকদের—যাঁহারা অহরহ শুনাইতেছেন যে—"মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যই (যেমন করিয়া হোক্) প্রতিরোধ করা হইবে!" আমরা কি ইহাই ভাবিয়া লইব যে, বর্ত্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী প্রত্যহ যে অধিক হইতে অধিকতর মূল্যে বিক্রীত হইতেছে—কর্ত্তারা তাহা 'মূল্য-বৃদ্ধি' বলিয়া স্বীকার করেন না? রেশনের থলি লইয়া তাঁহাদের বাজারে ভিক্ষার জন্য যাইতে হয় না বলিয়াই হয়ত তাঁহারা—অর্থাৎ আমাদের শাসকগোষ্ঠী—মূল্য-বৃদ্ধির প্রবল চাপ এবং বিষম তাপ স্বীকার করিবেন না।

মূল্য-বৃদ্ধির প্রকৃত হেতু কি

এ-কথা পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলজনই জানেন যে, চাহিদার হঠাৎ বৃদ্ধি কিংবা উৎপাদনের কমতি এই অস্বাভাবিক মূল্য-স্ফাতির কিছুটা হইলেও, ইহার প্রকৃত কারণ অসাধু অতি-লোভী এবং হাঙ্গর-প্রকৃতি ব্যবসায়ী-দেরই কারসাজি। চীনা হাঙ্গামার প্রারম্ভ হইতেই দেশের এই বিষম আপৎ এবং সঙ্কটকালকে এই অসাধু অতিলোভী ব্যবসায়ীর দল তাহাদের অর্থ কামাইবার পরম এক সুযোগ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে:

> উৎপাদন যদি একগুণ কমিয়া থাকে তবে দাম তাহারা বাড়াইতেছে দশগুণ। এমন কি করের যে বোঝা কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীর উপর চাপাইয়াছেন তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও দর এত বাড়া উচিত নয়। সেখানেও করের অজুহাত দেখাইয়া মুনাফাশিকারীর দল কাজ গুছাইয়া লইতেছে। নিছক উৎপাদন বাড়ানোর ভয় দেখাইয়া তাহা-দের শায়েস্তা করা যাইবে না, কেননা তাহারা জানে রাতারাতি উৎপাদন বাড়ানো রূপকথার বাহিরে কোথাও সম্ভব হয় না; তাহার জন্য বিস্তর কাঠখড় পোড়াইতে হয় এবং অনেক সময় লাগে। কাজেই এখানে শুধু কথায় চিঁড়া ভিজিবে না। সরকারকে এই মুনাফাশিকারীদের দমন করিবার দায়িত্ব লইতে হইবে

কিন্তু বলিতে দুঃখ অপেক্ষা লজ্জা বেশী হয় যে—অদ্যকার শাসনদণ্ড যাঁহাদের দুর্ব্বল এবং বিবিধ অনাচার-কলঙ্কিত হস্তে অর্পিত, তাঁহারা অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে দমন করিয়া দেশের অসহায়, অনশনক্লিষ্ট জনগণকে রক্ষা করিবার কথা সহস্রবার মুখে বলিলেও, বাস্তবক্ষেত্রে কোনপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। সরকার বাহাদুরের ক্রমিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অসাধু অতিলোভী ব্যবসায়ীদের দমন করিবার কোন পরিকল্পনার কথা এখনও কেহ শ্রবণ করেন নাই, চোখে দেখা ত দূরের কথা!

ব্যবসায়কে ন্যায়সঙ্গত পথে পরিচালনা করিবার প্রসঙ্গে সরকারী বিশেষ মহল হইতে আবার 'নিয়ন্ত্রণ' এবং রেশনিং প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-কালের বিষম কষ্টকর অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যায় যে, এই দুটি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবামাত্র জনসাধারণের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিকতর হইয়া থাকে। এই অসহায়ের নিদানের বিধান সুরু হইবা-মাত্র একটা ভীষণ কালো-বাজারও আরম্ভ হইয়া যায় এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের সৃষ্টি-করা এই কৃত্রিম কালোবাজার সাধারণ মানুষের অভাব, দুঃখ-কষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার বিড়ম্বনার মাত্রা হাজার গুণ বৃদ্ধি করে। বিগত মহাযুদ্ধের দুঃসময়ের কথা মনে হইলে সাধারণ মানুষের মনে এখনও মহাতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু সে যাহাই হউক, দেশের এই অবস্থায় সরকারকে আলস্য এবং 'ব্যবসায়া-ভীতি' পরিহার করিয়া, জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া অসাধু ব্যবসায়ীদের বিষ-দন্ত ভাঙ্গিবার সক্রিয় ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। অতিলোভী এবং আপৎকালে দেশের ও জন-গণের শত্রু এই মুনাফা-শিকারীদের সহজে সোজাপথে আনিতে না পারিলে—অন্য দেশে যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকে, আমাদের দেশেও এই সময় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রয়োজন-মত

দু-চারজন কালোবাজারী এবং অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া সাধারণ পার্কের মধ্যে কিংবা বাজারের চৌমাথায় গুলি করিয়া হত্যা করিতে হইবে।

কিন্তু এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যেন 'সরিষার মধ্যেই' ভূত না থাকে। ব্যবসায়ে অসাধুতা এবং অতিলোভ যাঁহারা দমন করিবেন, তাঁহাদের একদিকে যেমন সৎ, অন্যদিকে তেমনি মনোবলে কঠোর হইতে হইবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোনপ্রকার বাছবিচার বা শ্রেণীবিভাগ চলিবে না। মাল মিঞার বেলায় এক ব্যবস্থা এবং সম-অপরাধে অপরাধী—পিরলা অ্যাণ্ড মাসতুত ভাই

কোম্পানীর বেলায় ভিন্নতর ব্যবস্থা চলিবে না। এমন কি প্রধান মন্ত্রীর পরোক্ষ হুকুম-নির্দেশও এ-বিষয় পরম অবহেলার সহিত অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

অবস্থা তেমন হইলে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারকে নিজের দায়িত্বে ক্রেতা-সাধারণের নিকট ন্যায্য মূল্যে সকল প্রয়োজনীয় পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থাও করিতে হইবে। উৎপাদন কেন্দ্র হইতে সরাসরি সরকার যদি পণ্যের বিলিব্যবস্থার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, একমাত্র তাহা হইলেই হাঙ্গর-প্রকৃতি অসাধু ব্যবসায়ীদের আক্রমণ হইতে জনগণকে রক্ষা করা যাইবে।

অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের সৎ করিতে বহুকাল বিগত হইবে। এ-কাজ সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে—বিনোবাজীকে এ-বিষয় অনুরোধ করিলে তিনি হয়ত একটা 'সুমতি দান' ব্রত আরম্ভ করিতে পারেন এবং এই ব্রতে তিনি সার্থক হইলে আমরা তাঁহাকে পূজা করিতেও দ্বিধা বোধ করিব না।

এই প্রসঙ্গে কন্‌জিউমার্স ষ্টোর্সের কথা আসিয়া পড়ে। এই বহু-ঘোষিত পরিকল্পনাটি সরকার যদি নিষ্ঠার সহিত বাস্তবে পরিণত করিতে পারেন, জনগণের বহু উপকার হইবে। সরকার নানা প্রকার ব্যবসা সাক্ষাৎ ভাবে করিতেছেন। এই বহু-প্রচারিত "কন্‌জিউমার্স ষ্টোর্স"—এই সময় বাঙ্গলার সকল শহরে খুলিয়া নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়-ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতে পারেন। "ক্রেতাদের নিজের দোকান" খোলা এই অবস্থায় সম্ভব নহে। কাজেই এ বিষয়ে সরকার যদি উদ্যোগী হইয়া সরাসরি কিছু করেন—তাহা হইলে বহু কালোবাজারীর বিষদাঁত ভাঙ্গা সম্ভব হইবে।

সর্ব্বশেষ কথা—সরকার আর অসহায় ভাবে বসিয়া থাকিবেন না। অবিলম্বে জনগণের অবস্থার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিয়া সক্রিয় কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করুন। ইহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।

কলিকাতা এবং সন্নিকটস্থ অঞ্চলসমূহে জমির মূল্য

কলিকাতা এবং ইহার ৩০,৪০ মাইল এলাকার মধ্যে সকল অঞ্চলেই জমির মূল্য গত কয়েক বৎসর হইতে বৃদ্ধির মুখে ছিল—কিন্তু গত দেড়-দুই বছরে এই অঞ্চলে জমির মূল্যে কমপক্ষে একশত হইতে দেড়শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির-ফলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের কারও পক্ষে দু'তিন কাঠা জমি কিনিয়া একটা সমান্য মাথা গুজিবার ঠাঁই-সংস্থান করার আশা-ভরসা চিরতরে চলিয়া গিয়াছে। আজ সাধারণ মানুষের পক্ষে জমি ক্রয়ের বাসনা আকাশকুসুম ছাড়া কিছুই নয়। তিন-চার বৎসরে পূর্ব্বে হয়ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী স্ত্রীর গয়না-গাটি এবং গৃহস্থালীর ঘটিবাটি বিক্রয় করিয়া—কোনক্রমে সামান্য দু-এক কাঠা জমির মালিক হইবার আশা করিতে পারিত। কিন্তু আজ তাহা একান্ত অসম্ভব দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কথা এই যে, যাঁহারা কল্পনাতীত চড়া-মূল্যে জমি কিনিতেছেন, তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জনই অবাঙ্গালী। এই সকল ক্রেতার মধ্যে মাড়োয়াড়ী এবং কালোয়ারদের সংখ্যার প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে। কেবল জমি নহে, শহরের বিভিন্ন পল্লীতে—এমন কি খাস বাঙ্গালী পল্লীতে, যেখানে দশ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা একশতটি বাড়ীর মালিক ছিল বাঙ্গালী, সেই সব পল্লীতেও বিবিধ কারণে বাঙ্গালী মালিক আজ বাড়ী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন অবাঙ্গালীর নিকট। ইহার প্রধান কারণ ১০।১৫ হাজার টাকার পাকা বাড়ীর জন্য মাড়োয়াড়ী এবং কালোয়ার খরিদ্দার হাসিমুখে ৪০।৫০ হাজার টাকা দিতেও গররাজী নহেন। এই অসম্ভব অর্থের লোভেই আজ বহু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী কলিকাতার বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া দিতেছেন—ভবিষ্যতের চিন্তা না করিয়াই।

কলিকাতায় জমি এবং বাড়ীর এই প্রকার অত্যধিক এবং অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ জমির বিষম চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক শ্রেণীর (ইহাদের শতকরা ৯৯ জনই অবাঙ্গালীর কালোবাজারী) হাতে অসম্ভব 'কালো'-টাকার আমদানী। গত মহাযুদ্ধের কল্যাণে বিশেষ এক শ্রেণীর অবাঙ্গালী অসৎ ব্যবসায়ীদের হাতে অবৈধ ভাবে অর্জ্জিত প্রভূত পরিমাণে অর্থ জমিয়াছে। এই টাকা প্রকাশ্য ভাবে ব্যবসায়ে খাটাইবার কিংবা খরচ করিবার পথে বহু বাধা আছে। প্রধানতঃ আয়কর বিভাগের হাতে বিড়ম্বনার ভয়, কারণ এই প্রভূত অর্থের আয় কোন্ সুড়ঙ্গ-পথে কি-ভাবে হইয়াছে—তাহা কালোবাজারীদের পক্ষে প্রকাশ করা বিপদ্‌জনক—সন্তোষজনক অন্য কোন কৈফিয়তও তাহারা দিতে পারিবে না। ইহারা দেখিতেছে:

জমিতে মূলধন নিয়োগের নিরাপত্তা আর তাছাড়া জমির লেনদেনের ব্যাপারেও ইদানীং এক অদ্ভুত কালো-বাজার চালু হইয়াছে।

বিগত যুদ্ধের সময় হইতে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর হাতে যে বিপুল পরিমাণ অবৈধ টাকা জমিয়াছে জমি ক্রয় করিয়া সেই টাকা নিয়োগের এক সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া লওয়া হয়। ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কেহই জমির প্রকৃত দামের উল্লেখ করে না। নামমাত্র মূল্যে জমির লেনদেন হয়। নির্ধারিত দাম দেওয়া হয় 'কালা-টাকায়' বিনা রসিদে। উভয়পক্ষেরই ইহাতে লাভ হয়:-ক্রেতার অবৈধ টাকা নিয়োজিত হয়: বিক্রেতাও অতিরিক্ত করের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়।

সরকারের এন্‌ফোর্সমেণ্ট বিভাগ নাকি দেশের বহু অনাচার দমন করিতে সার্থকতার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু এত বড় একটা অনাচার এবং তাহার সঙ্গে সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা ফাঁকির কারবারের কথা কি সর্ব্বজ্ঞ এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ জানে না? জানে না বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু সত্যই যদি এ-বিষয় এই বিভাগের কিছু জানা না থাকে তাহা হইলে অন্তই পুলিসের এই দপ্তরটির অবসান ঘটাইয়া গরীব করদাতাদের অর্থ বাঁচানোর ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

জনসাধারণের আশা ছিল, দেশের শাসন-ব্যবস্থা দেশের লোকের হাতে আসিলে দেশের সর্ব্ববিধ অনাচার, পাপাচার এবং দুর্নীতির বিলোপ ঘটিবে। কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে, সাধারণ মানুষের অবস্থা আজ ১৯৪৫-৪৭ সালে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা হাজার গুণ মন্দই হইয়াছে। ভিক্ষা এবং দেশ মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া যাঁহারা তথাকথিত 'স্বাধীনতার মালিক হইলেন, অপূর্ব্ব দক্ষতা এবং অপরূপ শাসন-গুণে দেশে আজ তাঁহারা ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য নীতি-দুর্নীতি, আচার-অনাচার প্রভৃতি সব-কিছুর এক বিচিত্র সহ-অবস্থান কায়েম করিতে পরম সার্থকতার পরিচয় দান করিয়াছেন!

অসম্ভব এবং অকল্পনীয় কী মূল্যে আজ কলিকাতায় জমি বিক্রয় হইতেছে, তাহা জানিলে হয়ত অনেকে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইবেন। কলিকাতার একটি বিশেষ ব্যবসায় অঞ্চলে এক কাঠা জমির দাম লক্ষের সীমা ছাড়াইয়াছে! দক্ষিণ কলিকাতায় মাত্র দু'বছর পূর্ব্বে যেখানে ৭.৮ হাজার টাকা কাঠা ছিল, আজ তাহার মূল্য হইয়াছে ২০।২২ হাজার—এই মূল্যেও নাকি বহু ধনী পছন্দমত জমি পাইতেছেন না। লেক-অঞ্চলে পছন্দমত জমির জন্য জনৈক অবাঙ্গালী ধনী নাকি ৩০।৩৫ হাজার কাঠা-প্রতি দিয়াছেন।

ডাঃ রায় যাদবপুরে যোধপুর পার্ক সরকার হইতে দখল লইয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেদের জন্য কাঠা-প্রতি হাজার-দেড় হাজারে জমি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় অনেকে এই এলাকার জমি ক্রয় করেন, কিন্তু এখনও বহু জমি থাকা সত্ত্বেও আজ তাহা কেবল মধ্যবিত্ত নহে, ধনী বাঙ্গালীদেরও আয়ত্তের বাহিরে। মাত্র দু'মাস পূর্ব্বে যোধপুর পার্কে এক কাঠা জমির মূল্য ছিল ১৫ হাজার, আজ সেই জমির মূল্য আরও দু'চার হাজার বাড়িয়েছে। বর্ত্তমানে বেলেঘাটা, ট্যাংরা, তিলজলা, গোবরা প্রভৃতি অঞ্চলেও ১০ হাজার টাকার কমে জমি পাওয়া অসম্ভব। গড়িয়া, বারুইপুর এবং অন্যান্য এই প্রকার অঞ্চলে কাঠা-প্রতি জমির দাম হইয়াছে চার হইতে ৭।৮ হাজার টাকা পর্য্যন্ত।

জমির আকাশমুখী মূল্য প্রতিরোধে যদি সরকার হইতে আর অযথা কাল-বিলম্ব না করিয়া কোন ব্যবস্থা এবং কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার বিশিষ্ট এবং শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি হইতে বাঙ্গালীদের বিদায় লইয়া বরাকর, ঘাটাল, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কলোনী স্থাপন করিয়া কি বাস করিতে হইবে। এখানেই শেষ হইবে না, ক্রমে ঐসব নূতন 'কলোনী' হইতেও বাঙ্গালীদের হটিয়া যাইতে হইবে এবং কালক্রমে বাঙ্গালী নূতন এক বেদে জাতিতে পরিণত হইবে।

বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পশ্চিম বাঙ্গলার বাঙ্গালীদের। সরকারের দয়ায় এবং বহুদর্শিতার ফলে পশ্চিম বঙ্গবাসী বঙ্গসন্তানদের চাকুরির ক্ষেত্র অতি সীমায়িত। কোন প্রকারে 'উদ্বাস্তু' খাতায় নাম লিখাইতে পারিলে হয়ত বা কিছু আশা থাকিলেও থাকিতে পারে আর তাহা না পারিলে, একদেশদর্শী সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনার কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গ সন্তান অচিরে, নূতন এক শ্রেণীর উদ্বাস্তুতে পরিণত হইবে। ইতিমধ্যে অনেকে হইয়াছেও! বাঙ্গালীর জমিজমা ক্রমে ক্রমে হস্তান্তরিত একবার হইয়া গেলে বাঙ্গালী নামের আর সার্থকতা কি থাকিবে?

কলিকাতার চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ, বিবেকানন্দ রোড, সাদার্ণ এ্যাভেনিউ, থিয়েটার রোড, লাউডন ষ্ট্রীট, উড ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, আলীপুর লেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্টীট, আপার চিৎপুর রোড, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, মহাত্মা গান্ধী রোড, ম্যাডান ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী এবং এই প্রকার সর্ব্ব অঞ্চলেই আজ শতকরা অন্ততঃ ৯০টি তিন-চার, পাঁচ-ছয় কিংবা ততোধিক তলা বাড়ীর মালিক অবাঙ্গালী।

বাহির হইতে কেহ হঠাৎ এই অঞ্চলগুলি আজ দেখিলে ইহাদের রাজস্থানের অংশ বিশেষ বলিয়া মনে

করিবেন। এই ভাবে চলিলে আর ১০।১৫ বছর পরে কলিকাতা কর্পোরেশন অবাঙালীর করতলে আসিতে বাধ্য। বাস্তবে ইহা ঘটিলে কলিকাতা কেন্দ্র-শাসিত শহর বলিয়া ঘোষিত হইবার পথে কোন বাধাই থাকিবে না। পূর্ব্বে একবার এই চেষ্টা হয়।

ডাঃ রায় বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত-বা আমরা কিছু প্রতিকার আশা করিতে পারিতাম। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য—তিনি নাই। পশ্চিমবঙ্গের অল্পবুদ্ধি, সীমিত-দৃষ্টি, ক্ষীণ-মস্তিষ্ক, আত্মতুষ্ট, তাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসবাসকারী কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রীচরণে-স্থ বাক্ সর্ব্বস্ব বর্ত্তমান মন্ত্রীদের কাছে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর আশা করিবার আর কিছুই নাই। একমাত্র আশা অঘটন ঘটন পটিয়সী ভাগ্যদেবী।

কলিকাতার বাড়ী ভাড়া

প্রসঙ্গক্রমে কলিকাতার 'গগন বিহারী' বাড়ী ভাড়ার বিষয় কিছু বলা অবান্তর হইবে না। ১৯৪১,৪২ সালে আলিপুরে আধুনিক ফ্ল্যাটের (৩-কামরা) ভাড়া ছিল ২৫০৲ টাকা, শরৎ বোস রোডে ৫।৬ কামরার ফ্লাটের ১৪৫৲-১৫০৲ টাকা, ভবানীপুর অঞ্চলে পুরা একটি তিন তলা বাড়ীর (৮,১০ কামরা) ১৫০৲।১৬০৲, রাজা বসন্ত রায় রোডে দোতলা ৬-কামরা বাড়ীর ভাড়া ৬০৲-৭০৲ টাকা, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ অঞ্চলে ৩কামরা ফ্ল্যাটের ভাড়া ৫০৲।৬৫৲ টাকা। গত বৎসর হইতে সেই সব ফ্ল্যাট এবং বাড়ীর ভাড়া যথাক্রমে অন্ততপক্ষে হইয়াছে, ৮০০৲।৯০০৲ টাকা, ৪৫০৲।৫০০৲ টাকা, ৬০০৲।৭৫০৲ টাকা, ২০০৲ ২৫০৲ টাকা, ২৫০৲।৩৫০৲ টাকা মাত্র! বনেদী পাড়ার মোটামুটি অবস্থা এই, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মহল্লায় সাধারণ ভাড়াটিয়ার অবস্থা আজ এমনই হইয়াছে যে, ১৫০৲।৩০০৲ টাকা মাসিক আয়-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির পক্ষে ভদ্র-পল্লীতে দুইখানি মাত্র ঘর মাসিক ১২৫৲।১৫০৲ টাকার কমে পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। গড়পাড়, যুগীপাড়া, মানিকতলা, সুকিয়া ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে নূতন ভাড়াটিয়ার পক্ষে ১, ২ কিংবা ৩ খানি কামরার জন্য (বারোয়ারী কল, পায়খানা, স্নানের ঘর) মাসিক অন্তত ভাড়া গুণিতে হইবে যথাক্রমে ৫০৲, ৮০৲, ১০০৲ টাকা অন্ততপক্ষে, অবশ্য যদি পাওয়া যায় এবং 'ভাড়া' নীলামে না চড়ে। ইহার উপর (আক্কেল) সেলামী এবং আগাম ভাড়ার বে-আইনী অত্যাচার আজ প্রায় 'আইনী' হইয়াছে।

স্থানাভাবে কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলের বাড়ী ভাড়ার খতিয়ান দেওয়া সম্ভব নহে। তবে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে এক শ্রেণীর বাড়ীওলার ভাড়ার দাবি মিটান সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে আজ অসম্ভব। এমন বহু মধ্যবিত্ত পরিবার আছে—যাহাদের একটি কামরাতেই সপরিবারে (বয়স্ক পুত্র, কন্যা, ভগিনী—এমন-কি ক্ষেত্র বিশেষে পুত্র পুত্র-বধূসহ) বসবাস করিতে হইতেছে। এমন বহু দশ-বারো কামরাযুক্ত বাড়ী আছে, যেখানে দশ-বারোটি পরিবার (গড়ে পরিবার-পিছু ৫।৬ জন লোক) বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। বলা বাহুল্য—এই সব পরিবারের জন্য আলাদা কল, পায়খানা, রান্নাঘর প্রভৃতি কিছুই নাই। এ সবই 'কমন্' অর্থাৎ বারোয়ারী। এই প্রকার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রত্যেক কামরার জন্য গড়-পড়তা ৩৫৲।৪০৲ টাকা মাসিক ভাড়া দিতে হয়। বহু বাড়ীতে গৃহস্থের বৌ-ঝিকে রাস্তার 'বারোয়ারী' কল হইতে প্রয়োজনীয় জল আনিতে হয়।

এই ভাবে বসবাসের ফলে আজ কলিকাতার মধ্যবিত্ত সামাজজীবনে বহুবিধ ক্ষতিকর সমস্যা এবং অনাচার দেখা দিয়াছে। সমস্যা এবং অনাচারগুলি কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। 'বারোয়ারী' ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কোন প্রকার পর্দ্দার বালাই না থাকাতে—মধ্যবিত্ত সমাজের বালকবালিকাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রাবল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গৃহস্থ আজ সকল দিক্ হইতে প্রাণান্তকর অনটন-জর্জ্জরিত হইয়া চোখের সামনে বিন্দুমাত্র আশার আলোক দেখিতে পাইতেছে না। এই সর্ব্বনাশা-দিশেহারা অবস্থায় পরিবারের অপরিণত বয়স্ক বালক-বালিকারা—বিষম 'সহ-অবস্থানের' ফলে কোন্ দিকে যাইতেছে—তাহা দেখিবার অবকাশ কোন গৃহস্থেরই নাই।

মধ্যবিত্ত পরিবারের হাজার হাজার যুবক-যুবতী—বাসা বাঁধিবার মত দু'একখানি ঘরও পাইতেছে না, ফলে সব ঠিকঠাক করিয়াও তাহারা বিবাহিত জীবনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহার বিষময় ফলও বাঙ্গালী সমাজকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করিতেছে বিবিধ প্রকারে।

মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার সরকারী এবং আধা-সরকারী পরিকল্পনা—এখনও প্ল্যানের বাহিরে বিশেষ কিছু দেখা যায় নাই। সরকার এখন চীনা আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং ত্যাগ করিবার বাণী বিতরণ করাকেই প্রধানতম

কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু পথের ভিখারী (যাহাদের গৃহ-সমস্যা নাই), অপেক্ষাও মন্দ-ভাগ্য সর্ব্বস্ব বঞ্চিত বাঙ্গালী আর কি ত্যাগ করিবে? এখন একমাত্র পরণের বস্ত্র, ছেঁড়া মাদুর এবং ফুটো ঘটিবাটি ছাড়া সাধারণ বাঙ্গালীর "ত্যাগণীয়" আর কি আছে? আমরা মনে করি—অবস্থার প্রতি অবহিত হইবার সময় উপস্থিত, চীনা আপদ্ অপেক্ষা অধিকতর আপদ্ হইতে দেশকে, জাতিকে এবং শাসকগোষ্ঠীর নিজেদেরকেও রক্ষা করিতে হইলে—উপযুক্ত ব্যবস্থা আজই করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালীর শান্তিপুরী শাড়ীর সমাদর

একটি সংবাদে দেখিলাম—

বাংলার বাহিরে বাংলার শান্তিপুরী শাড়ির সমাদর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কারণ?

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের রাজ্যপাল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লিণ্ডসে ষ্ট্রীটস্থ সেলস্ এমপোরিয়াম হইতে একজোড়া জরিপাড়ের সাদা শান্তিপুরী শাড়ি ভি-পি যোগে লইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত এম্পোরিয়ামে এইরূপে অনুরোধ আরও আসিতেছে।

এবার শান্তিপুরের তাঁতিদের বোধহয় কপাল ফিরিল! আর কেহ না হউক—এখন হইতে বোম্বাইয়ের উপর-মহলের মহিলারা বোধহয় সকলেই ভিঃ পিঃ যোগে শান্তিপুরী শাড়ির অর্ডার দিতে থাকিবেন। অবশ্য সব কয়টি ভিঃ পিঃ পার্শেল যথারীতি 'ছাড়ান' হইবে কি না বলা শক্ত।

এই প্রসঙ্গে দিল্লী হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত সংবাদটি হয়ত বাঙ্গলার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং জনগণকে উৎসাহিত করিবে—

১৯৬০ সালে সেলস্ এম্পোরিয়াম স্থাপনের জন্য কক্ষটিকে (দিল্লীতে) রাজ্য সরকারের হস্তে অর্পণ করা হয়। এই কক্ষের পাশে কেরল, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের এম্পোরিয়াম বেশ জেল্লা দিতেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্দ্ধারিত হতভাগ্য কক্ষটি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের উপর এই এমপোরিয়ামটির দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছিল। তাঁহারা পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার মূল্যবান বস্ত্রাদি দিল্লীতে লইয়াও গিয়াছিলেন, জনৈক কর্ত্তাব্যক্তি বারদশেক এই এমপোরিয়াম সাজাইতে দিল্লীতে গিয়া বঙ্গ ভবনে অবস্থানও করিয়াছেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—

এখনও কক্ষটি তিমিরাচ্ছন্ন। তাহার উপর পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার বস্ত্রাদির একটি বড় অংশের কোন পাত্তাই পাওয়া যাইতেছে না।

এমন কি বেশী অপরাধ হইল? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীমহাশয়গণের বিষম দায়িত্ববোধ এবং পরম কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার অনুকরণ-মাত্র তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মীগণও দ্বিগুণ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, বাঙ্গলার মন্ত্রীদের efficiency বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের বসবাসের জন্য তাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে, যদিও বা থাকিয়া থাকে-efficiency আজ জমিয়া গিয়া পরম 'গব্যে' পরিণত হইয়াছে। গৌরী সেন এখনও বাঁচিয়া আছেন—প্রমাণ হইল!

অহিন্দী ভাষীদের সম্পর্কে "বিশ্বাস" রক্ষা

লোকসভার ভাষা-বিলের সম্পর্কে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে—

"....in so far as services are concerned whether in the matter of recruitment or promotion we do not envisage that a boy or girl will suffer only because he or she does not know Hindi".

—অর্থাৎ কাজ পাওয়া বা কাজে উন্নতির ব্যাপারে হিন্দী জানায় বা না-জানায় কিছুই এসে-যাবে না। একই প্রকার উক্তি শ্রীনেহরুও বহুবার করেছেন।

বলা বাহুল্য—দুই মহানুভব নেতার এ উক্তি বা ঘোষণাতে আমরা এবং অন্যান্য অহিন্দীভাষীরা বিশ্বাস করি নাই। আমাদের অবিশ্বাস যে কতখানি সত্য—তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত একটি "কর্ম্মখালি" বিজ্ঞাপনেই প্রমাণিত হইয়াছে।

ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কমিশনারের চীফ সেক্রেটারীর নামে কর্মখালি বিজ্ঞপ্তির একটি দীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ৪৭টি বিভিন্ন বিভাগে মোট প্রায় ১৫০টি চাকুরি খালি আছে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখযোগ্য এইটুকু যে, সকল প্রার্থীর পক্ষেই হিন্দী জানা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হইয়াছে—Knowledge of Hindi is Essential'—আছে বিজ্ঞপ্তিতে।

কেন্দ্রীয় দপ্তর হইতে আরো বহু কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনে "হিন্দীজানা বাধ্যতামূলক" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে—হইতেছেও। এ-বিষয় আমরা এবারের মত একজন সাধারণ বাঙ্গালীর মতামত মাত্র দিতেছি—

"আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, হিন্দী প্রাদেশিকতা সুরু হয়েছে দিল্লী থেকে আর তার সাম্রাজ্যবাদী করাল ছায়া পরিব্যাপ্ত হয়েছে সারা ভারতের সর্ব্বত্র। আজ অহিন্দীভাষী মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার পায়ে দলে সদম্ভে ক্ষমতার অপলাপ করছেন হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীরা—কিন্তু তাঁদের জেনে রাখা ভাল —ইতিহাস নির্ম্মম, মূঢ়তার প্রতিফল একদিন কড়ায়-গণ্ডায় পেতে হবে তাঁদের ইতিহাসের কাছ থেকে। আশঙ্কা হয়, দেশকে তাঁরা রক্তক্ষয়ী বিসম্বাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ধীরে ধীরে। জনসাধারণের প্রাক্তবাদ অগ্রাহ্য ক'রে, বোম্বাই ও গুজরাটের সোনার পাথরবাটি তৈরী করবার চেষ্টা করেছিলেন

একবার পার্লামেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকার। পরে তাঁদেরই পাঠ করতে হয়েছিল সাধারণ মানুষের প্রত্যুত্তর—যা লেখা হয়েছিল রক্তের অক্ষরে। সরকার পিছু হঠেছিলেন। ভাষানীতি ব্যাপারেও সরকার এবং লোকসভা বিজ্ঞতার পরিচয় কতটা দিলেন তার মাপকাঠি আছে ভবিষ্যতের হাতে। এ-বিষয় কোনও হঠকারিতার আশ্রয় না নিতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা—বিশেষ ক'রে আপনারা বারংবার সতর্ক ক'রে দিয়েছেন সরকারকে, কিন্তু আচরণ দেখে মনে হয়, পথে-ঘাটে গোলমাল পাকিয়ে না-ওঠা-পর্য্যন্ত জনমতকে আমলে আনতে তাঁরা চান না।

ভাষা-বিষয়ে স্বাধিকার রক্ষার কারণে দক্ষিণ-ভারতে রাজাজী নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দী-বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে অন্দোলন ঐ অঞ্চলে ক্রমশ জোরদার এবং সক্রিয় হইতেছে—কিন্তু বাঙ্গলা, ওড়িষ্যা ও আসাম এ বিষয় এখনও নিদ্রিত কেন? কেন্দ্রীয় কৃপাপ্রার্থীদের কথা বাদ দিতেছি, কিন্তু অন্যেরা কি করিতেছেন? হিন্দী ভাষারূপী দানবকে হত্যা করিতে হইলে শিশু অবস্থায় করাই শ্রেয় এবং যুক্তিযুক্ত।

বেতার-বার্ত্তা

দিল্লী এবং কলিকাতার বেতার সম্পর্কে বহু কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—কিন্তু কোন ফলের আশা না করিয়াই। দিল্লী হইতে বাঙ্গলায় বেতার সংবাদ প্রচার সম্পর্কে একটি জাতীয়তাবাদী দৈনিক মন্তব্য করিয়াছেন। আনন্দবাজারের মতে—

দিল্লী থেকে প্রচারিত বাঙলা সংবাদ বিভাগটির খোল নলচে পাল্টাবার সময় হয়ে গেছে। বিশেষ ক'রে দু'জন সংবাদ-পাঠিকাকে অনতিবিলম্বে অন্য কার্য্যে নিয়োগ করে শ্রোতাদের রেহাই দেওয়া উচিত বাঙলা সংবাদের অসহায় শ্রোতা কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে অন্ততঃ এই-টুকু সহানুভূতি আশা করে। সংসাদ পাঠিকার উচ্চারণ বিকৃতির কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি, মে মাসে, প্রথম পক্ষে শোনা 'চীন রাক্স' 'কথা বাত্রা' "নিদৃষ্ট" ইত্যাদি। সংবাদের ভাষার কিছু নমুনা দেখুন 'বিভিন্ন' 'বিশ্বের রাজধানীতে' 'সংবাদ সমীক্ষা বলা শেষ হলো' '৪৪৭ জন যুদ্ধ বন্দীদের, "সবচেয়ে বৃহত্তম" ইত্যাদি অলমিতি। পশুদের ক্লেশ নিবারণের জন্য একটা সমিতি আছে। আকাশবাণীর বাংলা সংবাদের শ্রোতা মানুষ হয়ে এমন কি অপরাধ করছে?

বিচিত্র নমুনার সংখ্যা অসীম, কাজেই তাহা অযথা লিপিবদ্ধ করিয়া লাভ কি?

গত কিছুকাল হইতে স্থানীয় আকাশবাণীতে চীনা এবং চীনা আক্রমণ সম্পর্কে এক পরম শুক্কারজনক এবং বিরক্তিকর প্রচার চলিতেছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সেই একই কথা এবং চীনাদের সম্পর্কে একই বোকার মত মন্তব্য বিভিন্ন আসরে বিভিন্ন বিচিত্র কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া শ্রোতাদের কানে মধু বর্ষণ করিতেছে! এই প্রকার প্রচারে এবার উল্টা ফলই হয়ত ফলিবে। যে-ভাবে রেডিওতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা এবং হিন্দীতে "চীনা মার, মার চীনা" প্রচার চলিতেছে—তাহাতে সাধারণ শ্রোতা ইহাকে আর কোন গুরুত্বই দেয় না। বেতারে বর্ত্তমান "চীন মার" প্রচারকে এখন শ্রোতারা আবহাওয়া সংবাদ, বাজারদর প্রভৃতির মত একটা প্রাত্যহিক রেডিও 'রুটিন' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। বাঙ্গলা এবং হিন্দীতে চীনারা কি ভীষণ পাজি, কি ভীষণ বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বিশেষণ হাজার বার প্রচার করিয়া কাহার কি লাভ হইতেছে জানি না (একমাত্র ঘোষক বা বক্তা ছাড়া)। চীনারা কি ইহা শুনিতেছে?

চীনাদের বিরুদ্ধে আর একটি প্রচার-অস্ত্র হইতেছে যে—তাহাদের পঞ্চ বা দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা মত খাদ্য-শস্য কিংবা পণ্য উৎপাদন হয় নাই এবং সাধারণ চীনারা আজ অভাবে অনাহারে বিষম কষ্টে দিন যাপন করিতেছে—কথাটা বোধ হয় ভারতীয় জনসাধারণের বর্ত্তমান পরম সুখের এবং অভাব-অনটন-বর্জ্জিত নিশ্চিন্ত জীবনের সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়া থাকে! চালুনির পক্ষে ছুঁচের সমালোচনার মত! চীনাদের কি নাই তাহা বার বার একঘেয়ে প্রচার না করিয়া আমাদের কি আছে, পরিকল্পনা-মত আমরা কতখানি করিয়াছি—সেই সব কথা রেডিও মারফৎ প্রচার (করিবার মত যদি কিছু থাকে) করিলে শ্রোতারা বহু পরিমাণ শান্তি এবং আরাম লাভ করিবে। নিছক পরের নিন্দায় মানুষের আত্ম-অবনতি ঘটিতে বাধ্য।

বাকল পরিধান কাল সমাগতপ্রায়

বঙ্গীয় মিল মালিক সংস্থার সভাপতি মিঃ টি. পি. চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার এক ভাষণে বলিয়াছেন যে সরকারকে এখন অবিলম্বে বস্ত্র মূল্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ বস্ত্র উৎপাদন খরচা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্ত্র শিল্পের বিষয় অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ কথাও তিনি বলিয়াছেন, তবে সে-সব বিষয়ে সাধারণ মানুষের বিশেষ মাথা-ব্যথার কারণ নাই। আমাদের মাথা-ব্যথা—আবার বস্ত্রের মূল্য-বৃদ্ধি হইলে সাধারণ মানুষ কি করিবে, কি পরিবে?

একদা যে ধুতি-শাড়ির (মোটা) মূল্য ছিল চৌদ্দ আনা, পাঁচ সিকা জোড়া, মূল্য চড়িতে চড়িতে আজ তাহা হইয়াছে কম পক্ষে ১০।১১ টাকা। যে মিহি ধুতি জোড়া দু'টাকা বারো আনায় পাওয়া যাইত, যে শাড়ির

জোড়া-প্রতি মূল্য ছিল তিন টাকার মধ্যে, আজ তাহার মূল্য হইয়াছে—১৮৲ টাকা হইতে ২২।২৩ টাকা।

বস্ত্র মূল্য-বৃদ্ধির দাবি ভারতীয় বস্ত্রকল সংস্থার সভাপতি লালা ভরত রামও উত্থাপন করিয়াছেন। অজুহাত একই—উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি। কিন্তু আসল কারণ মিল-মালিকদের লাভের অঙ্ক কিছু কম্‌তির দিকে। দেশের বা মানুষের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, শিল্পপতিদের লাভের অঙ্ক কিছুতেই কম হইলে চলিবে না—এবং ইহার জন্য শিল্পপতিরা ন্যায়-অন্যায় যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে কোন দ্বিধাই করিবেন না।

আজ পর্য্যন্ত কোন শিল্পপতিকে বলিতে শুনিলাম না, উৎপাদন খরচা বৃদ্ধির কারণে তিনি তাঁহার বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য বিবিধ খাতে বিবিধ প্রাপ্তির কিছু পরিমাণ ত্যাগ করিলেন। এ দেশের এই এক বিচিত্র ব্যবস্থা, শেষ পর্য্যন্ত সবকিছুর চাপ সেই চির-অসহায় এবং চির-শোষিত ক্রেতা-সাধারণকেই বহন করিতে হয়—বিনা প্রতিবাদে।

মিল-মালিকরা (অন্ততঃ তাঁহাদের শতকরা ৭০ জনই ক্রোড়পতি) বিগত বহু বৎসর দেশবাসীর কল্যাণে অজস্র অর্থ রোজগার করিয়াছেন। আজিকার এই দুঃসময়ে এবং অভাব-অনটন, অর্দ্ধাহার-অনাহার-কদাহার এবং তাহার উপর ইন্দ্রপ্রস্থের দুঃশাসন মোরারজী শোষিত এবং প্রাদেশিক সরকার নিষ্পেষিত জনগণের মুখ চাহিয়া দুইচার বছরের জন্য লাভের অঙ্ক মিল-মালিকরা কি সামান্যও কমাইতে পারেন না?

দেখিতে বড়ই বিচিত্র লাগে—মিল-শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, কাঁচা মালের বর্দ্ধিত মূল্য, কয়লা এবং বিদ্যুতের বর্দ্ধিত চার্জ্জ ও সারচার্জ্জ, এক কথায় আর্থিক দিক হইতে মিলগুলি যে ভাবে এবং যত দিক্ হইতেই 'আক্রান্ত' হউক না কেন, মিলমালিক সঙ্ঘ তাহা হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লইয়া শ্রীসরকার বাহাদুরকে খুশী করিবেন—কারণ তাঁহারা জানেন মালের উৎপাদন খরচা শত-জোড়ায় এক টাকা মাত্র যদি বৃদ্ধি পায়, তাঁহারা অসহায় ক্রেতার মাথায় গাঁট্টা মারিয়া জোড়া-প্রতি ১৲ টাকা বেশী অনায়াসেই আদায় করিতে পারিবেন এবং এ-পুণ্য কর্ম্মে প্রজাপালক নেহরু সরকার তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকার সমর্থনও দিবেন।

কংগ্রেস সরকারের বহু-বিঘোষিত "প্রাইস লাইন" শেষ পর্য্যন্ত বিষম প্রজামারী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কংগ্রেসী সরকার স্থির জানিবেন, প্রজা পীড়নে তাঁহারা যেমন বেপরোয়া নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, গরীব এবং অসহায় প্রজাসাধারণও তেমনি বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে। জন-অসন্তোষের বারুদ স্তূপীকৃত হইয়াছে—এখন একটি স্ফুলিঙ্গের মাত্র প্রয়োজন—এবং যে কোন সময় তাহা এই বারুদ স্তূপকে বিস্ফোরিত করিবে। কংগ্রেসের জন-প্রিয়তার ব্যারোমিটার রিডিং হালের লোক-সভার তিনটি বাই-ইলেক্‌শনেই সূচিত হইয়াছে।

—০—

বাতিল

শ্রীমানসী দাশগুপ্ত

প্রথম এসে যেদিন দাঁড়ালেন, দোর খুলে দিয়েছিল নমিতা। প্রণাম ক'রে বলেছিল, "আসুন।" কিন্তু তাতে আহ্বান যেন বাজল না। সুমন্ত্রকে সে ডেকে দিল না পর্যন্ত। নিজের হাতেই সদানন্দের ক্যাম্বিশের ব্যাগটা টেনে ভিতরে এনে রেখে বারান্দার কোণে অসমাপ্ত রান্নার কাজে ফিরে গেল। সুমন্ত্র স্নানে যাচ্ছিল, থেমে বলল, "দাদু, এখন এলেন? ভাল আছেন?"

পাঁচ বছর কাল তীর্থে তীর্থে কাটিয়ে সদানন্দের এই নিজের বাড়ীতে ফেরা। নিজের বলতে আছে এখন কেবল মেয়ের দরুণ ঐ নাতিটি আর নাত-বউ। সুমন্ত্রকে এনে চেতলার এ বাড়ীতে তুলেছিলেন সদানন্দের স্ত্রী, —যখন একে একে ছেলে, বউ, মেয়ে, জামাই সব যে যার মত সংসার শূন্য ক'রে চ'লে গেল। বলেছিলেন, "তবু একজন কাছে থাক্, ডাকতে সাড়া পাব।"

সদানন্দ তখন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল। অফিসে, ফাইলে, প্রমোশনে, এক্‌স্টেনশনে তাঁর জগৎ-সংসার তখন পরিপূর্ণ। স্ত্রীর দুঃখে তিনি দুঃখিত হন নি, বা, ছেলেমেয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোক পান নি, এমন নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরাসক্ত কর্মী মানুষ। ঘরের কোণে ব'সে মেলা কথা তাঁর আসত না। স্ত্রীর সহস্র প্রলাপেও না। রিটায়ার করার পরেও ঘরে ব'সে পুঁথি কাগজ, এক-হাতের-খেলা তাস নিয়েই তাঁর দিন কেটে গেছে। সুমন্ত্রকে কেন্দ্র ক'রে তার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে কথায় গল্পে আসর জমজমাট ক'রে রেখেছিলেন তাঁর স্ত্রী-ই। স্ত্রী যাওয়ার আগে থেকেই তাঁর শরীর কতটা ভেঙে পড়েছিল তা সদানন্দ টের পেলেন বিপত্নীক হওয়ার পরে। অন্য মানুষ হ'লে ডাক্তার-বদ্যি ডেকে এক কাণ্ড ক'রে ব'সে থাকত। তিনি লোটা-কম্বল নিয়ে তীর্থে চ'লে গেলেন। তীর্থে দেহপাত হ'লে যে পুণ্য হ'ত তা সঞ্চয় না ক'রেই যে তিনি ফিরে এলেন, তার প্রধান কারণ এই যে, আর পেরে উঠছিলেন না। শরীরের নাম যাই হোক্ না কেন, প্রকৃতির মার বেশ জোরালো হাতের মার, যখন আসে তখন সামাল দিতে বেগ পেতে হয়, যা ইচ্ছে তাই সওয়ানো যায় না। সদানন্দকে ফিরে আসতে হ'ল।

এ সব কথাই বলবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে এসে-ছিলেন, কিন্তু বলার সুযোগ পেলেন না। সুমন্ত্র স্নানে গেল। আর, নমিতা কাজ নিয়ে এমনি মেতে রইল যে, তার দিকে তাকানরই ভরসা হ'ল না সদানন্দের।

তিনি বাইরে থাকতেই খবর পেয়েছিলেন, বাড়তি ঘর-দুয়োর ছাঁটকাট করে সুমন্ত্র ভাড়া দিয়েছে। এখন টের পেলেন, সে-সব ব্যবস্থা কি রকম মজবুত। স্থানে-অস্থানে পাকা দেয়াল গেঁথে, কাঠের দরজা সেঁটে এমনি করে বাড়ীর সব বাকী অংশকে এ অংশ থেকে পৃথক্ করা হয়েছে যে, মনে হয়, এদের সঙ্গে ভাড়াটেদের মুখ দেখা-দেখি পর্যন্ত নেই। ভাড়াটে দু'ঘর দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার, নিঃসন্তান—জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল। খাবার দিতে এসে নমিতা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আর দাঁড়াল না। সুমন্ত্র কল ঘর থেকে বেরিয়ে খেতে বসেছে, এবার নমিতা যাবে স্নানে। সদানন্দ বারান্দায় সুমন্ত্রকে উদ্দেশ ক'রে একটু যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, "বৃষ্টি নামল।"

সুমন্ত্র একবার চোখ তুলে তাকাল। তার পর খাওয়া ফেলে উঠে এসে বাঁ হাতে পুবের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ফিরে গিয়ে খেতে বসল।

সে কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! সে জলে কুকুরটা-বেড়ালটা পর্যন্ত পথে বেরোয় না। আর, এদের এখানে সুমন্ত্র বেরিয়ে গেল, পিছু পিছু একটু পরেই কালো ব্যাগ হাতে শাদা শাড়ী প'রে চটি সামলাতে সামলাতে গেল নমিতা। ব'লে গেল, "আপনার দুপুরের খাবার ঢাকা রইল দাদু, রান্নাঘরে। বিকেলে ফিরতে একটু দেরি হয় আমাদের। রান্নাঘরের তাকে কলা আর পাঁউরুটি আছে। বিকেলে একটু খেয়ে নেবেন।"

বৃষ্টি পড়ল, ধরল, রাস্তায় জমে-ওঠা জলের যে অংশ তাঁর ঘরের জানলা থেকে অল্প একটু দেখা যায়, সে জল নেমে গেল। সদানন্দ খেয়েদেয়ে শুলেন। ঘুম ভেঙে উঠলেন। ঘর-বারান্দা করলেন খানিকক্ষণ। ওদের ঘরে ওরা দোরে ছোটমত একটা তালা দিয়ে গেছে। বাড়ীটা কি ছোট, কি ছোট মনে হয়। দু'পা কোনদিকে হাঁটলেই যেন ধাক্কা লাগবে। তাও যদি লাগত মানুষের সঙ্গে, তা ত নয়! জনপ্রাণীহীন শূন্য বাড়ীর খাঁ খাঁ দেওয়াল।

ওরা ফিরল সন্ধ্যে ক'রে। ফিরেই নমিতা অবশ্য তখনি একপ্রস্থ খাবার গুছিয়ে দিল। ঠিকে ঝি কাজ সেরে যেতেই একটুও দেরি না ক'রে রাতের রান্না চাপিয়ে দিল। সুমন্ত্র আটটা সাড়ে-আটটার ভিতরেই কোথা থেকে এক পাক ঘুরে এসে সদানন্দের সঙ্গে খেতে ব'সে গেল। এর পরে রান্নাঘরে কিছুক্ষণ হাঁড়ি-কলসীর শব্দ। তার পরেই ওদের দোর বন্ধ, সমস্ত ঘর নিঃঝুম, অন্ধকার।

সেই থেকে আজ অবধি এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। কি বর্ষা, কি শুখো, কি ছুটিতে, কি কাজের দিনে —সুমন্ত্র, নমিতা দুজনেই বেরিয়ে যায়। ফেরে সন্ধ্যায়, রাঁধে, খায়। কিছু না বলতে তাঁর জন্যে ফলপাকুড়, যখনকার যা, আনে। কিছু না বলতেই নমিতা এরই ভিতরে তাঁর জন্য পাতলা মত উলের জামা পর্যন্ত বুনে দিয়েছে, কম ঠাণ্ডায় পরবার জন্যে। বাড়ীভাড়ার হিসেব সুদ্ধ সুমন্ত্র একবার তাঁকে দিতে এসেছিল, তিনিই নেন নি। তবু, এই তিন মাসে মন যেন সংসারী মানুষ হিসেবে তিনি চোখকান-খোলা ছিলেন না ব'লে তাঁর স্ত্রী অনেক অনুযোগ করেছেন সত্যি, কিন্তু সংসারে তা ব'লে তিনি কখনও কিছু দেখেন নি এমনও ত নয়। বয়স আজ তাঁর সত্তর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন আড়ি-দেওয়া স্বামী-স্ত্রীর সংসার তিনি জীবনে দেখেন নি। স্বামী-স্ত্রীতে খাটছে পিটছে, অসুখ নেই বিসুখ নেই, ছেলেপুলের ঝঞ্ঝাট পর্যন্ত নেই এখনও অবধি; হাসবে, খেলবে, থাকবে, তা নয়— সমস্ত বাড়ীকে যেন দমবন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে। হাসি-খেলা ত নেই-ই, কথাটি পর্যন্ত ফোটে কি ফোটে না।

সকালে সুমন্ত্র বাজারে যায়। তখন দুটো কথার আদান-প্রদান হয়। এ ছাড়া "আরেকটু দাও," "আর দিও না," "আচ্ছা", "বেশ", ছাড়া ত সদানন্দ কখনও কথা বলতে শুনলেন না এদের। এর কারণ লজ্জা ব'লে ভাবা যেত। কিন্তু নমিতার অসম্ভব শান্ত মুখে লজ্জার কোনও নরম রেখা পড়ে না। সদানন্দের চোখে ছানি পড়েছে ব'লে কি উনি তা-ও দেখবেন না? নমিতার মুখের ভাবলেশ পর্যন্ত কে যেন মুছে নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এ বাড়ীর শব্দ সুরও গেছে থেমে।

নমিতা রান্না করে কড়ায় চাপা দিয়ে দিয়ে, শব্দ উঠতে দেয় না। ঘোরে-ফেরে নিঃশব্দে। চলতে-ফিরতে শাঁখাতে-চুড়িতে বাজবে, সে সম্ভাবনাই রাখে নি। ওর দুই হাতে একগাছি ক'রে বালা চলচল করছে, ঐ পর্যন্ত! সারা বাড়ীতে সাড়া তুলতে এক আছে ঠিকে ঝিয়ের ঘরমোছার বালতি নাড়ানাড়ি, আর সদানন্দের খড়ম পায়ে চলাফেরা! এদের এই থম্‌কানো ঘরে অমন শব্দ ক'রে চলতেও যেন সদানন্দের অস্বস্তি লাগে।

প্রথম দু'চারদিন, ভয় ভয় করলেও, চেষ্টা পেয়েছিলেন মাঝে-মধ্যে কথা বলার। বিশেষ ক'রে নমিতা রান্নায় বসলে তিনি প্রায়ই ঘুর ঘুর করেছেন সেখানে গিয়ে। শুধু শুধু খুক্‌ খুক্‌ ক'রে কেশেছেন। যদি নমিতা জিজ্ঞেস করে, "কাশি হ'ল নাকি দাদু?"

কিন্তু না। নমিতা সেরকম কোন লক্ষণই দেখায় নি কখনও। চুপ ক'রে হাঁটুর ওপর থুতনি চেপে যেমন ব'সে থাকার, তেমনি ব'সে থেকেছে। সুমন্ত্র সামনে দিয়ে হেঁটে তাঁর ঘরে ঢুকে খবরের কাগজ নিয়ে গেছে, ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে ব'সে ব'সে পড়েছে। কারও যেন পরস্পরের সঙ্গে চেনাজানাও নেই। রাত্রে ওরা এক খাটে শোয় কি ক'রে দেখতে ভারি সাধ হয় মাঝে মাঝে সদানন্দের। ঐ ঘরেই একদিন স্ত্রীকে নিয়ে সদানন্দ বাস করেছেন। কিন্তু এখন যেন দিনের বেলাতেও ও-ঘরের দিকে তাকাতেই তাঁর ভয় করে।

বাইরের দরজার একটা বাড়তি চাবি আসার মাস খানেকের মধ্যেই নমিতা তাঁকে করিয়ে দিয়েছে। সংক্ষেপে বলেছে, "যদি বেরোন কখনও, আমরা যখন নেই-টেই।"

কিন্তু বেরোবেন সদানন্দ কার কাছে যাবার জন্যে? ওসব এখন তাঁর আর আসে না। সকালবেলা থেকে যে কাগজখানা দিয়ে যায় সুমন্ত্র, তাই পড়তেই তাঁর ঝিমুনি ধরে! তিনি এখন ব'সে আছেন স্টেশন প্লাটফর্মের ধারে, গাড়ী আসার অপেক্ষায়। কি হবে তাঁর জেনে, যে মুল্লুক ছেড়ে তিনি চ'লে যাচ্ছেন, সেখানে কোন্‌ গলিতে কি হচ্ছে? এককালে এই কাগজ পড়ার জন্যে স্ত্রীর অর্ধেক কথা তিনি কানে নেন নি; তাই স্ত্রী কত অনুযোগ করেছেন। আজ অনুযোগ করবার কেউ নেই, দুটো কথা শুনবার জন্যে তিনি উৎকর্ণ হয়ে থাকলেও কেউ কথা বলতে আসে না। দুপুর বেলার তন্দ্রাটা ভাঙিয়ে দিয়ে জানলার বাইরের কপাটের প্রান্তে ব'সে একটা কাক অনর্থক ডাকাডাকি করে। দিনটা অসহ্য ভারি হয়ে ওঠে সদানন্দের। এমনি ক'রেই কাটছিল তাঁর এখানে। পূজোর শেষাশেষি হঠাৎ ব্যতিক্রম দেখা দিল।

সকালবেলায় যেমন বেরিয়ে যায় তেমনি বেরিয়ে গিয়েছিল দেবাদেবী। দুপুরে সবে নিজের ঢাকা ভাত

খুলে খেয়ে শুয়েছেন সদানন্দ—চোখের পাতা মুদেছে কি মোদে নি, দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠল। ঠিকে ঝি এমন সময়ে কোনদিন আসে না। তাছাড়া আর কেউ যে ভুলেও কখনও এখানে আসতে পারে এ যেন মনেই করতে পারেন না সদানন্দ। তন্দ্রার ঘোরে ভুল শুনেছেন কি না ভাবতে ভাবতে সদানন্দ দরজা খুললেন। সুমন্ত্র বলল, "ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি দাদু?"

সুমন্ত্রর এই অসময়ে ফিরে আসা এবং অকস্মাৎ প্রশ্নে সদানন্দের মুখে হঠাৎ জবাব জোগাল না। সুমন্ত্র ভিতরে এসে নিজে থেকেই কথা বলতে সুরু করল। বলল: "আমাদের একটি বন্ধু আসছে দাদু আজ। এই এসে পড়বে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।" ব'লে হাতঘড়ির দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞাসা করল, "আপনার এ ঘরের মেঝেয় ও শুলে অসুবিধে হবে নাকি আপনার?"

সুমন্ত্রকে এত হাসিখুশী, চাপা উত্তেজনায় রাঙা দেখেন নি সদানন্দ আজ কতদিন। সে উত্তেজনার ছোঁয়াচ তখনি লাগল তাঁকে। অস্থির হয়ে বললেন, "কি যে বল তার ঠিক নেই। তোমার বন্ধু, অতিথি, থাকবে মেঝেয়, আর আমি থাকব চৌকিতে—তোমাদের বাপু মতিগতির ঠিক নেই। বরং নটরাজনদের ব'লে বাইরের বড় ঘরটা দু-এক রাত্তিরের মত—কি বল?"

সুমন্ত্র একটু অদ্ভুত ভাবে হাসল। বলল, "না, না, ওসব কিছু দরকার হবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। কেবল ব'লে রাখলাম।"

ব'লে সে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সদানন্দের ব্যস্ত হওয়া ছাড়া উপায় কি। বাড়ী ত তাঁর। এরা যা-ই ভাবুক। একটা লোক আসছে। এদের না আছে ব্যবস্থা, না কিছু। নমিতা ত রইল অফিসে ব'সে। এ সমস্ত ছেলেমেয়ের বন্ধুই বা হয় কেন, আসেই বা কোথা থেকে, ভেবে তিনি কেবলই ঘর-বারান্দা করতে লাগলেন।

ঠিক ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা এল ওপরে। সিঁড়ি দিয়ে ওদের জুতোর দরাজ শব্দ আর উঁচু হাসির সুর ভাসতে ভাসতে এল আগে আগে। ঘুম-পাড়ানো বাড়ীটার হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙেছে। হাতের সুটকেস নামিয়ে নির্মল প্রণাম করল তাঁকে। বলল, "আমাকে আপনি দেখেছেন অনেকবার এখানেই। অন্ততঃ আমি ত আপনাকে দেখেছি বটেই। বিষম ভয় করতাম ব'লে কথাবার্তা হয় নি কখনও। আপনার নিশ্চয় মনে নেই।"

নির্মলের কথায় এমন একটা অন্তরঙ্গ সুর আছে, সদানন্দের গলার কাছটা কেমন কেমন করতে লাগল। সুমন্ত্র যে ওকে ডেকে নিয়ে চ'লে গেল নিজের ঘরে এবং সেখান থেকে ওদের হাসি-গল্প শোনা যেতে লাগল, এতে সদানন্দের নিজেকে অকস্মাৎ বিশেষ ভাবে বঞ্চিত মনে হ'ল। অস্থির হয়ে ঘুরলেন খানিকক্ষণ। গিয়ে একবার সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন, "তোমার বন্ধুর চা-জলখাবারের ব্যবস্থা—"

সুমন্ত্র কথার মাঝখানেই সংক্ষেপে ওঁকে বলল, "নমি আসুক।"

সদানন্দকে নিজের ঘরে চ'লে আসতে হ'ল। এসে অবধি আজ এই যে প্রথম নাতির মুখে নাতবউয়ের নাম উচ্চারিত হতে শুনলেন, এ নিয়ে রসিকতা করবার ইচ্ছেটুকুও তাঁর হ'ল না।

নমিতা ফিরল সন্ধ্যে ঘেঁষেই। সদানন্দ উত্তেজনায় অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই দেখতে পেলেন। বিছানায় ব'সে গল্প করছিল ওরা: সুমন্ত্র আর নির্মল। নমিতাকে দেখে ওদের কথা থেমে গেল মুহূর্তে। নির্মল দরজার ধারে উঠে এল বিছানা ছেড়ে। নমিতা ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়াল একপলক স্তব্ধ হয়ে। নির্মল তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, "কি নমি?" আর, দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠে নমিতা কলঘরে গিয়ে দোর দিল। সুমন্ত্র উঠে এসে নির্মলের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। বলল, "বাচ্চাটা যাবার পরে তোমায় ত আর দেখেনি। আমি ভেবেই ছিলাম এটা হবে।"

নির্মল আস্তে আস্তে বলল, "অনেক দিন ত হয়ে গেল।"

"কত কি-ই অনেক দিন হয়ে যায়!"—সুমন্ত্র একটু হাসল।

সদানন্দ অন্ধকার বারান্দায় যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বাচ্চা হয়েছিল তাহলে এদের, হোক্‌না দৌহিত্রের ঘরে, তবু সদানন্দের বংশধরই সে। সে কথা সদানন্দকে জানাবার কথা মনেই হয় নি এদের। এখন কোথাকার কে বন্ধুকে দেখে নমিতার কান্না উথলে উঠল। তবু—তবু, সেই কান্না দেখেও সদানন্দের চোখ ছলছল ক'রে এল। পা টিপে টিপে ঘরে চ'লে আসবার জন্যে ছেলেমানুষের মত পায়ের খড়ম খুলে নিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এলেন সদানন্দ। অন্ধকারে চৌকিতে ব'সে রইলেন।

একটু পরে নমিতা নিজেকে সামলে বাইরে এসে কথা বলল। খানিক পরে তার নরম গলার হাসি পর্যন্ত শোনা গেল। চা নিয়ে সে এ ঘরে এসে আলো জাললে সদানন্দ বললেন, "বন্ধুবান্ধব এলে বাড়ীটা ভরা-ভরা লাগে, না দিদি?"

নমিতা শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। বলল, "মাংসটা হ'তে একটু দেরি হবে। আপনাকে আর একটু মিষ্টি দেব এখন?"

রাত্রের খাবার নিয়মমত ঘরেই এল সদানন্দের। বাইরে সন্ধ্যের মেঘ কেটে গিয়ে ওদের কলরব জমে উঠেছে। চোখাচোখা কথা আর বাঁকা হাসিতে রস ভ'রে উঠেছে। সেখানে সদানন্দ কোথায় বসবেন? এরই মধ্যে এক সময়ে এসে সদানন্দের ঘরের মেঝে পরিষ্কার ক'রে বিছানা পাততে লাগল নমিতা।

সদানন্দ বললেন, "আমি মেঝেয় শোব।"

নমিতা সংক্ষেপে বলল, "এ বিছানাটা ওঁর, যখন আসেন এতেই শোন।"

সদানন্দ ক্ষীণ ভাবে বললেন, "প্রায়ই আসে বুঝি?"

"প্রত্যেক বছরই একবার দু'বার। উনি এ বাড়ীতে পুরোণো লোক।"

সদানন্দ বললেন, "তাই দেখছি।"

নমিতা নিঃশব্দে বিছানার চাদর টান টান ক'রে দিতে লাগল। কে বলবে, এই মেয়েই একটু আগে নির্মলের মত ভবঘুরেকে কে বিয়ে ক'রে মরবে ব'লে হেসে খুন হচ্ছিল। এই মেয়েই আজসন্ধ্যায় কেঁদেছে?

নির্মলের সঙ্গে আরও দুটো কথা কইবার ভারি সাধ হচ্ছিল সদানন্দের। রাত্রে শেষ অবধি যখন সে শুতে এল তখন অপেক্ষা ক'রে ক'রে সদানন্দের ঘুম এসে গেছে। সে ঘুম যখন এদের চাপা গলার কথায় ভাঙল, তখনও তাঁকে ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাকতে হ'ল।

নির্মল এসে ঘরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলছিল, "এবার তুমি গিয়ে শুয়ে পড়গে নমি। সুমন অনেকক্ষণ ডেকে গেছে, তাছাড়া "

নমিতা বুঝি বারান্দাতেই ব'সে ছিল, সেই সন্ধ্যে থেকেই, যেমন ছিল ওরা। কিন্তু সেই সন্ধ্যের সুর ওর গলায় বাজল না। কেমন ফিস্ ফিস্ আধ-বোজা গলায় অল্প হেসে বলল, "তাছাড়াও অনেক কিছু ভাববার আছে। তা ত অনেকবার শুনেছি, আর কত শুনব। ব'স এসে এখানে।"

নির্মল দোরগোড়া থেকে স'রে গেল। সদানন্দের চোখ থেকেও ঘুম গেল উধাও হয়ে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন, নির্মল চাপাগলায় বলছে, "কত রাত হ'ল নমি। সুমন অপেক্ষা ক'রে আছে, ঘুমুতে পারছে না।"

"সুমনের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না নির্মল।" নমিতা বলল, "ও জেগেজেগেও ঘুমোয়। আর আমি ত ম'রেই থাকি, সে-রকম মানুষের কিবা জাগা কিবা ঘুম।"

নির্মল একটু যেন উত্যক্ত হয়েই বলল, "ছেলেমানুষিটি করবার বয়স আমাদের সবারই পেরিয়ে গেছে, যায় নি নমি? সুমন আমাকে লিখেছিল, আমার ওপর ও কত অন্যায় করেছে, এতদিনে বুঝতে পারছে।"

নমিতা এক নিঃশ্বাসে ব'লে উঠল, "পারছে, না? আমার ওপর কত অন্যায় যে এখনও করছে, তা কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না।"

"আস্তে নমি, আস্তে। অন্যায় ওর একার নয়। ওর ওপর দোষ চাপিয়ে ওকে কষ্ট দিয়ে এখন কার কি লাভ? যাও, লক্ষ্মীটি, ঘরে যাও এবার, হঠাৎ যদি ও উঠে আসে—"

নমিতা বাঁকা হাসল মনে হ'ল, বলল, "ভয়ে রাত্রে তোমার নিজের ঘুম এলে হয়!"

"ভয় নমি? তুমি এই কথা বলছ?"

"আমি ছাড়া কে বলবে? আমিই ত বলব। তোমরা ভালমানুষী ভয় দিয়ে সব চাপা দিতে চাও। বাচ্চাটি যখন গেল, মনে হয়েছিল আমারই এতদিনের ফাঁকি, এতদিনের পাপের ফল ফলল।"

"কিন্তু পাপ ত তুমি কর নি নমি। কোনও ফাঁকি ত দাও নি কাউকে।"

"চুপ কর। আমায় বলতে দাও। সেই থেকে কেবলই ভেবেছি, কি ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করব।"

"সুমনও ঐ সময় দিয়েই মন খারাপ ক'রে চিঠি দিয়েছিল।"

"কেবল 'সুমন' 'সুমন' ক'রো না।"

নির্মল আস্তে আস্তে কেমন এক রকম চেপে চেপে বলল, "সুমন আমার অনেক দিনের বন্ধু, নমি।"

"জানি, জানি। সে আর আমার জানতে বাকি নেই।"

দুজনেই এর পর চুপ। উত্তেজনায় সদানন্দের ভিতরটা কাঁপছিল। শক্ত হয়ে প'ড়ে রইলেন।

নির্মল বলল, "সুমন কিন্তু তোমায় জোর ক'রে বিয়ে করে নি নমি, তোমরা সকলেই মত দিয়েছিলে।"

"জোর কেবল একরকম নয় নির্মল! তাছাড়া,—ভুল সকলেরই হয়।"

"হয়ই ত। দামও দিতে হয়। হয় না?"

"দাম দিয়েছি, দিচ্ছি। কিন্তু আমার বাচ্চাটা শুদ্ধ চ'লে গেল, কি নিয়ে থাকব আমি বল ত?"

"বাচ্চা তোমার আবার হবে নমি। তাছাড়া, সুমন ত তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছে। তুমি স্বাধীন ভাবে কাজ করছ। নিজের মনে সংসার করছ। ক'টা জিনিষ ভুলতে কি লাগে?"

"জানি না কি লাগে। ভাল ভাল কথা বলতে অন্তত: কিছু লাগে না, সে বেশ ভাল ক'রেই ক' বছরে জেনেছি।"

আবার অনেকক্ষণ কথা শোনা গেল না ওদের। নমিতাদের ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। এ ঘরে বন্ধ চোখের ওপরে এসে আলো পড়ল, সদানন্দ টের পেলেন। সে আলো নিবল। নির্মল দোর বন্ধ ক'রে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল জানালায়। তার পরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সকালবেলা এদের চায়ের আসর জমেছিল সেই বাইরের বারান্দায়ই পাটি বিছিয়ে। সদানন্দ যখন ঘর থেকে বেরিয়ে সেখান দিয়ে গেলেন, দেখলেন, হাসিতে নমিতার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাঁকে দেখে সে কাঁধের কাপড় অল্প একটু টেনে দিল মাত্র। রাত্রে নিঃসাড়ে শুয়ে যা কিছু শুনেছিলেন, মনে হ'ল সবই তাঁর গুরুভোজনের ফলে কাঁচা ঘুমের স্বপ্ন-কল্পনা। এ নমিতা সে-সব অর্থহীন জটিল প্রসঙ্গ তুলবে কোন্ দুঃখে? এর চিন্তা অন্য। এ বলছে: "বাসে-ট্রামে ঘুরে ঘুরে সারা সপ্তাহ ত হাত-পা ব্যথা হয়েই আছে। একটা ছুটির দিন, তাও কি কেবল ঘোরা, ঘোরা! ব'সে কিছু একটা কর না?"

সুমন্ত্র বলল, "যেমন, ইকির-মিকির-চাম-চিকির খেলা!"

নমিতা যে কখনও, কোনও কারণেই এত খুশী হ'তে পারে, সুমন্ত্র এত মুখর, সদানন্দ যেন ভাবতে পারতেন না। কিন্তু যে-কলরবের জন্যে তাঁর মন তিন মাস ধ'রে এত উতলা হয়েছিল, সেই কলরবেই আজ তাঁর কেবলি উত্যক্ত লাগতে লাগল। এদের কিবা হাসি, কিবা কান্না, কিছুরই ত কোন মানে নেই?

দুপুর বেলায় সুমন্ত্রকে টানাটানি ক'রে নির্মল কোথায় যেন নিয়ে গেল। নমিতাও যাবে, সেই রকম বুঝি প্রত্যাশা ছিল, নমিতা কিন্তু গেল না। বিকেলের খাবার করার নাম ক'রে রয়েই গেল। ব্যাপারটা কি হ'ল আভাস নেবার জন্যে সদানন্দ বাইরে এসে দেখলেন, ষ্টোভের অল্প আঁচে এই অবেলায় ব'সে ব'সে একা হাতে নমিতা একডাঁই কচুরি বেলে, ভেজে তুলছে। তার মুখচোখ রাঙা হয়ে আছে। মনে হয়, একটু আগে সে কাঁদছিল। কাল রাত্রের যে-সব কথা আজ সকালে সদানন্দের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে নি, সেই সব কথা আবার ওঁর মনে পড়ল। নমিতার কান্নাভেজা মুখ দেখে তাঁর মন কেমন ক'রে উঠল।

বললেন, "নাত-বউয়ের শরীর খারাপ নাকি?"

নমিতা উত্তর দিতে একটু সময় নিল। কিন্তু উত্তর দিল শান্ত স্বরেই। বলল, "না ত। দু'খানা গরম কচুরি খান দাদু। এখানেই দিই?"

খাওয়া ছাড়া যেন সদানন্দের কথা থাকতে নেই। ছোট ছেলে কাছে এসে দাঁড়ালেই মা যেমন বলে, "কি আবার? খিদে?" সদানন্দের প্রতি নমিতার ভাব ঠিক তেমনি। সদানন্দ চুপ ক'রে ব'সে ব'সে কচুরিই খেলেন। নমিতাকে ব'লে লাভ নেই। হয়ত সুমন্ত্রকে বলা দরকার। হতভাগা ছেলে, ও কি জানে, ও নিজের পায়ে কি কুড়ুল মারছে? কিন্তু, নির্মল ছেলেটা ভাল, সত্যি ভাল! কার জন্যে মায়া করবেন, কি করবেন ভাবতে ভাবতে সদানন্দ বিষম খেলেন। নমিতা কড়া নামিয়ে উঠে গিয়ে তাঁকে জল গড়িয়ে এনে দিল।

সুমন্ত্ররা ফিরল বিকেল গড়িয়ে। হাতের কাজ সেরে চুল বাঁধার নাম ক'রে চিরুণী হাতে নিয়ে যখন নমিতা চুপ ক'রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, তখন। সদানন্দ প্রথমেই ডাক দিলেন, "সুমন্ত্র!"

এতে নির্মল এবং নমিতা উভয়েই চকিত হয়ে তাকাল। তিনি গ্রাহ্য করলেন না। নাতিকে ডেকে এনে ঘরের দরজা অল্প ভেজিয়ে বললেন, "বোস।"

সুমন্ত্র বসল। বলল, "আমরা ছ'টার শো'তে বেরুচ্ছি। সাড়ে পাঁচটা বাজে। আপনার খুব দরকার?"

তার শান্ত, সমাহিত ভাব দেখে সদানন্দের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। বেশ নাটকীয় ভাবে বলতে পারতেন, দরকারটা আমার নয়, তোমার। বলা হ'ল না। বাইরে থেকে নির্মল ডাকল, "সুমন।"

সুমন্ত্র তাঁর দিকে তাকাল।

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "না, দরকার কিছু নয়। ঘুরে এস তোমরা। দেরি হয়ে যাবে।"

চ'লে গেল ওরা। সদানন্দ দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ একা ঘরে। সন্ধ্যে হয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এই ঘর, এই বাড়ী আর যেন চেনা মনে হয় না সদানন্দের। কবে যে এখানে তিনি এরই একজন হয়ে ছিলেন, ভুলে গেছেন। কি ভেবে আস্তে আস্তে তিনি জুতো পায়ে দিলেন, জামা গায়ে দিলেন। তার পর তালাচাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিজেও। পথে

লোকের ভিড়ে সদানন্দের বেড়াতে আর ভাল লাগে না ব'লে তিনি বড় একটা বেরোন নি অনেক কাল। কিন্তু গত তিন মাসের স্তব্ধতার পরে এই দু'দিনের প্রবল উত্তেজনায় তিনি অস্থির হয়েছিলেন ব'লেই বোধ করি বাইরে বেরিয়ে আজ তাঁর ভাল লাগল। শুকিয়ে যাওয়া গঙ্গার ধারে শুকনো জায়গা বেছে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ। ওপারে শ্মশান চিতায় ধোঁয়া উঠছে, কে যায়! লোকের ভিড়। এরই পাশে বাজার বসেছে। মুলো, বেগুন, লঙ্কার দর নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছে বিস্তর। বহুক্ষণ স্বপ্নের ভিতর বুঝি ব'সে ছিলেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল রাত্তির বাড়ছে। বাড়ী যেতে হবে।

বাড়ীর দরজার ধারে সিঁড়িতে নমিতা ব'সে ছিল। তাঁকে দেখে ক্লান্তভাবে একটু হাসল। তার পরে তাঁর হাত থেকে চাবিটা চেয়ে নিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। বাকি সব ওরা গেল কোথায়, দু-দুটো চাবি গেল কোন্‌খানে, এ সব কিছুই জিজ্ঞাসা করার কথা মনে হ'ল না সদানন্দের। কেবল ব'লে উঠলেন, "কি হয়েছে নাতবউ?"

নমিতা থেমে গিয়ে বলল, "কি হবে দাদু? ওঁরা দু'জন দু'দিকে গেলেন হল্‌ থেকে বেরিয়ে। আমি একটু দোকান হয়ে আসব বলেছিলাম—"

সদানন্দ বললেন, "না, না, সে কথা নয়। এমনিতে তোমাদের এই গোলমালটা কি নিয়ে?"

নমিতার ঠোঁট দুটো প্রথমে একবার কেঁপে উঠল। তার পরেই কিন্তু সে মুখ তুলে বলল, "কৌতূহলে বেড়াল মরেছিল, জানেন দাদু? আপনি অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন!"

মেয়েছেলের মুখে ইংরেজী প্রবচনের বেতরো বাংলা অনুবাদ শুনে সদানন্দ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। উত্তর দেবার আগেই নমিতা চ'লেও গেল নিজের ঘরের ভিতরে। সুমন্ত্ররা এসে দরজায় সাড়া না তোলা পর্যন্ত বেরোলই না একবারও।

সেদিন রাত্রে ওদের সভা ভাঙবার অপেক্ষায় ঘরে জেগে বসেই রইলেন সদানন্দ। একবার শেষ চেষ্টা করতে চান তিনি। ঠিক কি করতে চান, নিজের কাছেও তাঁর স্পষ্ট নয়। কিছু একটা। বাইরে ওদের কথা চলছেই। নির্মল চ'লে যেতে চায় কাল, সুমন্ত্র তাতে নানা রকম আপত্তি তুলছে।

নমিতা বলল, "মন বসছে না ওর এখানে। কেন ধ'রে রাখা?"

সুমন্ত্র বলল, "ও যে যাবে চলে—এই ত বলছ? সেই ত বাঁচোয়া! কি বল, নির্মল? শেষের মধ্যে অশেষ নিয়ে যিনি যতই মাতামাতি করুন, ঐ সব অশেষ টশেষ যে মাঝে মাঝে শেষ হয়, আমাদের সংসারী লোকের এই সান্ত্বনা! নইলে কি হ'ত, ভাবতেও ভয় করে!"

মুখসর্বস্ব কথার ফুলঝুরি এই সুমন্ত্র ছোঁড়াটা। হোক না নিজের নাতি! সদানন্দের মনটা তেতো-তেতো লাগে। নমিতার গলা শোনা যাচ্ছে না। হয়ত সে আবার কান্না চেপে শক্ত হয়ে ব'সে আছে।

নির্মল বলল, "সংসার ত করি নি, করলে বুঝতে পারব।"

সুমন্ত্র বলল, "ক'রে ফেল। ভয়ে ভয়ে কত এড়িয়ে বেড়াবে?"

নির্মল বলল, "বেড়াব না। বাড়ী যাব। যাবে নাকি তুমি সুমন? এখন ত দাদু রয়েছেন এখানে। বাড়ীতে নমি একা থাকবে ব'লে ভয় করার কিছু নেই।"

নমিতা বলল, "একা থাকায় আমার ভয়ের কিছু নেই! তোমাদের ভয় ঘুচলেই বাঁচি।"

সুমন্ত্র বলল, "কোথায় যাওয়ার কথা বলছ? জাকার্তা?"

নির্মল বলল, "পাগল? বীরনগরে! মেজদিরা বারবার ক'রে লিখেছে, এবার যেন অবিশ্যি দেখা ক'রে যাই ফিরে যাবার আগে।"

"মেজদিরা বীরনগরে বুঝি? কবে থেকে?"

"অনেক দিন। জামাইবাবু ত ওখানে—"

নমিতা আস্তে আস্তে উঠে এসে ঢুকল সদানন্দের ঘরে। এইবার এদের কথা যে-পথ নিচ্ছে, সে পথ এদের বাল্য-স্মৃতিতে ঢাকা। সেখানে নমিতার ছায়াও নেই। নমিতার ভূমিকা এদের জীবনে যে কত সীমায়িত, এ কথা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই বুঝি নির্মল-সুমন্ত্র বার বার সেই বাল্য-স্মৃতি রোমন্থন করতে চায়।

ঘরে নমিতাকে ঢুকতে দেখেই সদানন্দ তাড়াতাড়ি শুয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলেন। ছোট ক'রে আধমেলা চোখে একবার দেখলেন, জানলার কাছে চুপ ক'রে নমিতা দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ পরে সে স'রে এল জানলা থেকে। ডান হাতের তালু দিয়ে কপালটা টান ক'রে ঘষল একবার। পথের আলো জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। আলোছায়ায় ম্লান দেখাল তাকে। নিচু হয়ে অকারণেই নির্মলের জন্য মেঝেয় পাতা বিছানার টান চাদর আরও একবার টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খানিক পরে নির্মল ঢুকল ঘরে। সদানন্দ চোখ চেয়ে

দেখেই চট ক'রে অন্ধকারের ভিতরেই উঠে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন। নির্মল একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে নিজের বিছানায় বসল। সদানন্দও বসলেন নিজের চৌকিতে। বললেন, "গোটাকত কথা স্পষ্ট ক'রে বলি, কিছু মনে ক'রো না।"

নির্মল সসম্ভ্রমে বলল, "বলুন বলুন, দাদু।"

সদানন্দ বার-দুই গলা খাঁকারি দিলেন। কোঁচার খুঁটটা কোমর থেকে খুলে একবার ঝেড়ে নিয়ে ফের কোমরে গুঁজলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দরজাটা ঠিকমত বন্ধই আছে কি না দেখে নিয়ে ব'লে উঠলেন, "তুমি মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন বাপু?"

নির্মলের মুখ অস্বস্তিতে ভ'রে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, "আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।"

সদানন্দ বললেন, "বেশ পারছ। বুড়ো হয়ে গেছি ব'লে বোকা হয়ে গেছি ভেব না। বোকা ঠকান উত্তর দিয়ে পার পাবে না।"

নির্মল বলল, "বলুন তবে।"

সদানন্দ বললেন, "বলবে ত তুমি। জট পাকিয়েছ তুমি, আমি কি বলব!"

নির্মল প্রথমটা চুপ ক'রে রইল। তার পরে সহজ ভাবেই বলল, "সব জট অস্থির হয়ে খোলা যায় না দাদু। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। রাত হয়ে গেছে।" ব'লে সে নিজেও পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

সদানন্দ ব'সে ব'সে মনঃকষ্টে দগ্ধ হ'তে লাগলেন। এরা কেউ কোনদিক্ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে দেবে না, শপথ করেছে। এরা ধ'রে নিয়েছে তাঁর কোনও কাজ নেই। "Your services are no longer required" ব'লে নোটিসটা স্পষ্ট ক'রে পেলে মনটা যেমন করে, সদানন্দের মনটাও তেমনি ক'রে অস্থির অস্থির করতে লাগল। কেবল ত মুখের অন্ন কাড়াটাই সব কাড়া নয়, হাতের কাজ কেড়ে নেওয়ার বঞ্চনা তারও বেশি। কি করবেন সদানন্দ তাঁর কর্মহীন চিন্তা নিয়ে?

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদের আলো ঘরের মেঝের মাঝখানটায় পৌঁছেছে। রাত কত বেজে গেল কে জানে। নমিতার কান্না-মুখখানা চোখে ভাসে। ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন, "আমি হ'লে বাপু নিয়ে যেতাম মেয়েটাকে। পুরুষ মানুষ হয়ে একটা মেয়েকে দুঃখ পেতে দেখব ব'সে ব'সে চোখের সামনে, এও কি একটা কথা হ'ল?"

নির্মল বিদ্যুদ্বেগে উঠে বিছানা ছেড়ে বাইরে চ'লে গেল। সদানন্দ চমকে উঠলেন। নির্মল জেগে আছে ভাবতে ইচ্ছা করলেও সত্যি যে ও জেগে তা হয়ত বিশ্বাস ছিল না তাঁর। পিছু পিছু উঠে গিয়ে যে এখন দেখবেন, দুপুর রাতে ছেলেটা গেল কোথায়, সে সাহসও তাঁর হ'ল না। অস্পষ্টভাবে তাঁর মনে হ'ল, কি যেন গোলমাল হবে! ভয়ে ভয়ে ছেলেবেলার মত মুখ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। তিনি কী করেছেন, করেছেন কী? তাঁর দোষ হ'ল কোথায়?—যেন কেউ তাঁকে বলেছে যে তাঁর দোষ হয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল তাঁর। উঠেই এদের নির্মলের বাক্স-বিছানা গোছাতে ব্যস্ত দেখে তিনি নিঃশব্দে তৈরী হয়ে বেরিয়ে গেলেন। আজ আর বাড়ীর কাছে মরা গঙ্গার ধারে নয়। ট্রামে ক'রে সোজা গেলেন গড়ের মাঠে। অন্যমনস্কের মত গিয়ে বসলেন গাছের তলায়। দুটো পথখেদানো কুকুর পরস্পরের গা শুঁকে দিচ্ছিল। কিছু বেকার অকাল-ঘুমন্ত মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে। ব'সে থেকে থেকে সদানন্দ দেখলেন, পথে ভিড় বাড়ছে। টের পেলেন গলাটা শুকিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে উঠে ফিরতি ট্রাম ধরলেন।

বাড়ীতে নমিতা অফিস যাওয়ার সেই বিধবা-শাদা শাড়ী পরেছে ফের। হাতে কালো ব্যাগটা ধরে, দরজাটা খুলেই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। তাঁকে দেখে ব'লে উঠল, "এত দেরি হ'ল যে দাদু? চা-টা না খেয়ে সেই বেরুলেন?"

শুনেই সদানন্দের কি হ'ল কে জানে। গরম হয়ে ব'লে উঠলেন, "জবাবদিহি করতে হবে নাকি?"

সদানন্দের বিসদৃশ উত্তরে নমিতা এক মুহূর্ত থমকে গেল। তার পর বলল, "কি হয়েছে আপনার বুঝতে পারছি না। আজ অফিসের দিন। আমার বেরুতে হবে। আপনি একটাও চাবি না নিয়ে বেরিয়ে গেছেন দেখলাম। তাই বলেছি।"

ব'লে সে আঁচল গুছিয়ে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

সদানন্দ ব'লে উঠলেন, "আমার সারাদিন কাজ কেবল তোমাদের কর্তাগিন্নীর কখন অফিস, কখন প্রমোদ প্রহর—তাই হিসেব রাখা, না? ওসব পোষাবে না বাপু। আমার কি হয়েছে? আমার কি হয়েছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজেদের হওয়াহওয়ি সামলাও গে। কিছু বলি না ব'লে!"

এর উত্তরে নমিতা কি বলবে, তারও উত্তরে তিনি আরও কি জোরালো কথা বলবেন—মনে মনে গুছিয়ে

নিতে নিতেই দেখলেন, নমিতা ম্লান মুখে বেরিয়ে গেল। যাক্! ফিরতে ত হবে? তখন কথা তুলতে গিয়ে দেখে যেন নমিতা। সদানন্দের মায়ামমতা, দুঃখ-ভাবনা সব উপেক্ষা করুক না ওরা, তাঁর রাগ অগ্রাহ্য করা তাই ব'লে এদের কর্ম নয়। রাগ সদানন্দ দেখান না তাই। তাই এরা সাপের পাঁচ পা দেখেছে। তাঁর কাছে জবাবদিহি চাওয়া!

কিন্তু—

দোর বন্ধ ক'রে আসতে আসতে কথাটা মনে পড়ল তাঁর। রান্নাঘরের শিকল তোলা দরজার দিকে চেয়ে মনে হ'ল কথাটা। সুমন্ত্রদের ঘরের দুয়োরে তেমনি তালা বন্ধ। সুমন্ত্র, নির্মল—কারও কোনও চিহ্ন কোথাও ছড়িয়ে নেই। তাঁর শোবার ঘরের মেঝে আগের মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে। জানলার কপাটের বাইরের দিকে ব'সে একটা কাক ডাকাডাকি করছে। সমস্ত বাড়ী আবার নিঝুম।

ঠিক আগের দিনের মতই যদি নমিতা আবার স্তব্ধ হয়ে যায়? যদি ফের তেমনি চাপা ঠোঁটে ঘুরে-ফেরে? যদি উত্তর দেবার মত একটা কথাও আর না-ই বলে? তাহলে, এমন কি কলহ করবার মৌলিক অধিকারও সদানন্দ আর পাবেন না। একা একা কি বেশিদিন রাগরাগিও করতে পারবেন?

—০—

যোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীশান্তা দেবী

পণ্ডিত-প্রবর আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাকে লিখিতে বলা হইয়াছে। তাঁহার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহার সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞান থাকা দরকার তাহা আমার নাই। আমি যতটুকু সংগ্রহ করিয়াছি সেইটুকুই লিখিলাম।

যোগেশচন্দ্রের জন্ম হয় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল আরামবাগের দিগড়া গ্রামে। যোগেশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রণজিৎ রায় দিগড়া গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাঁহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়াই ছিলেন শাক্ত। রণজিৎ রায় গভীররাত্রে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া জপ করিতেন। এই রাজা ছাতনার শুশুনিয়ার নিকট আরামবাগের দক্ষিণে এক দীঘি খনন করেন। সেই দীঘিতে আজও লোকে বারুণী-স্নান করে। আরামবাগ বাঁকুড়ার পূর্ব্বদিকে।

যোগেশচন্দ্রের পিতা ছিলেন বাঁকুড়ার সব-জজ। সে সময় দিগড়া গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। যোগেশচন্দ্রের পিতার ইচ্ছা ছিল বাঁকুড়াতেই চিরস্থায়ী বাসের ব্যবস্থা করেন। বাঁকুড়ার জেলাস্কুলেই যোগেশচন্দ্রের ইংরেজী হাতেখড়ি হয়। এইখানে পড়াশোনায় যখন তিনি মগ্ন তখন কর্ম্মরত অবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অগত্যা তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল। পরে বর্দ্ধমান রাজস্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া তিনি স্কলারশিপ পাইলেন। পাস করিয়া হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। বাল্যকালে এক বৎসর মাত্র তিনি বাঁকুড়ায় ছিলেন। প্রথমদিকে কিছুদিন সেখানের বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন।

শৈশবে যোগেশচন্দ্র দেশের পাঠশালায় পড়িতেন। পাঠশালায় চাণক্যশ্লোক মুখস্থ করিতে হইত। পাঠশালায় প্রতি শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা করার নিয়ম ছিল। প্রতিমা স্থাপন করা হইত না, পুঁথিপত্র ও কাগজ-কলমই ছিলেন সরস্বতীর প্রতীক। যোগেশচন্দ্র এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "পূজার পর কি আনন্দ! মনে হইত যেন নূতন জন্ম হইয়াছে।" বিদ্যার দেবতা যে তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয় হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার চিরজীবনের সাধনায় প্রকাশ পায়। খুব কম বিদ্যাই আছে যাহা তিনি আয়ত্ত করেন নাই।

শৈশবে অন্যান্য শিশুর মত ইনিও গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। পিসী, জেঠাই প্রভৃতির কাছে কঙ্কাবতীর 'শোলোক' শুনিতেন। নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন। পরে কথকথা শুনিতে ভালবাসিতেন। কলেজে যোগেশচন্দ্র অধ্যাপক লালবিহারী দে'র নিকট ইংরেজী পড়িয়াছিলেন। দে মহাশয় বলিতেন, "ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিতে ও চিন্তা করিতে যখন পারিবে তখন বুঝিবে ইংরেজী শিখিয়াছ।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনার্স-সহ এম-এ পাস করিবার পর তিনি কটকে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া যান। 'রেভেন্‌শ' কলেজ ছিল তাঁহার কর্ম্মস্থান। কটকে তাঁহার জীবনের ছত্রিশ বৎসর কাটিয়াছিল। প্রায় একটানাই ছিলেন। মাঝে বছর খানিকের জন্য একবার হুগলী মাদ্রাসা কলেজে আর দুই মাসের জন্য চট্টগ্রামের একটা কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপকতাই করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার কত ছেলেকে যে তিনি মানুষ করিয়াছেন তার সংখ্যা নাই। তখন সেখানে প্রায় সব প্রফেসারই ছিলেন বাঙ্গালী। হরেকৃষ্ণ মহতাব, প্রাণকৃষ্ণ পড়িচা, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও ইঁহারা ছিলেন যোগেশচন্দ্রের ছাত্র। তিনি বলিতেন, "চৈতন্যদেবের সময় হইতে বাঙ্গালীই ত উড়িষ্যাকে পথ দেখাইতেছে।" যোগেশচন্দ্র তাঁহার ছাত্রদের পুত্রতুল্য জ্ঞান করিতেন ও সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের হিতচিন্তা করিতেন। যাহারা তাঁহার ছাত্র নয়, দেশের এমন সকল যুবসম্প্রদায়েরই তিনি মঙ্গল কামনা করিতেন এবং তাহাদের স্বাস্থ্য, চরিত্র, ব্যবহারিক জীবন ও ভবিষ্যৎ সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ও চিন্তা ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু যখন কটকে রেভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, তখন যোগেশচন্দ্র কলেজের প্রফেসার। সুভাষ মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইতেন। যোগেশবাবু বলিতেন, "ওঁদের পরিবারে সুভাষ ছেলেটা যেন খাপছাড়া। তাকে দেখেই বোঝা যেত, ভবিষ্যতে সে একটা অসাধারণ কিছু হবে।"

যোগেশচন্দ্রের পিতামাতার প্রথম পুত্রের মৃত্যুর পর ইঁহার জন্ম হয়। সেই কারণে পিতামাতা তাঁহার নাম রাখেন হারাধন। বাড়ীর একটা চাকরের নামও ছিল হারাধন। হারাধন বলিয়া ডাকিলে উভয়েই সাড়া দিতেন। দশ বৎসরের বালক যোগেশচন্দ্রের ইহাতে ভারী রাগ হইল। তিনি খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া নাম বদলাইবার সঙ্কল্প করিলেন। স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ইহা শুনিয়া তাঁহাকে গোটা পঞ্চাশ নামের একটা ফর্দ্দ দিলেন। তিনি তার ভিতর হইতে যোগেশ নামটি পছন্দ করিয়া নিজেই নিজের নাম দিলেন। তিনি হাসিয়া গল্প করিতেন, "আমি স্বনামধন্য পুরুষ।"

ইংরেজী ১৯১২ সালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য যোগেশবাবু বাঁকুড়ায় বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন। সেখানে তখন ম্যালেরিয়া ছিল না। বাঁকুড়া আমার পিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দেশ। এইখানে তাঁহার সহিত যোগেশচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ১৮৯২ সাল হইতেই তাঁহাদের পত্রালাপ চলিত। রামানন্দের পরিচালিত "দাসী" পত্রিকায় যোগেশচন্দ্রের ছাত্র মৃগাঙ্কধর রায় তাঁহাকে লিখিতে বলেন। এই সূত্রেই সম্পাদক ও লেখকের প্রথম পরিচয়। কটক হইতে রিটায়ার্ড হইবার পর বন্ধু রামানন্দের ইচ্ছাতেই ইনি বাংলা ১৩২৭ সাল হইতে বাঁকুড়া-বাস করেন। ঐখানেই তিনি বাড়ী করিয়াছিলেন এবং বাঁকুড়াতেই ৯৭ বৎসর বয়সে ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ মাসে তিনি অমরধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

যোগেশচন্দ্র বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু আরও বহুবিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। চিরজীবন নূতন নূতন সাধনায় তিনি ডুবিয়া থাকিতেন এবং আয়ত্ত বিদ্যাগুলির ফল নিজ রচনার মধ্য দিয়া দেশবাসীকে দান করিতেন। বন্ধু রামানন্দের 'প্রবাসী'তে তিনি অনেক লিখিয়াছেন। মৃত্যুর দুই-তিন বৎসর আগেও লিখিতেন। তৎপূর্ব্বে রামানন্দ-সম্পাদিত 'প্রদীপ' এবং 'দাসী'তেও লিখিতেন। 'নব্যভারত', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকাতেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধই পরে 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল', 'পৌরাণিক উপাখ্যান', 'পূজাপার্ব্বণ', 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' এবং 'Vedic Antiquity' প্রভৃতি গ্রন্থে পরিণত হয়। তাঁহার ইংরেজী রচনাও খুব সুখপাঠ্য ছিল। 'Ancient Indian Life' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে তাহা বোঝা যায়। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী গুজরাটি ইত্যাদি বহুভাষা জানিতেন এবং এই জন্যই তাঁহার মনীষা এত বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা নির্ণয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি,বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার জন্যই তিনি জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "আমি যখন কটক কলেজের প্রফেসর, তখন দৈবক্রমে একদিন খণ্ডপড়া রাজ্যের এক জ্যোতিষীর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। তাঁর নাম চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি নীরবে সাধনা ক'রে চলেছিলেন, কারও কাছে আত্মপ্রকাশ করেন নি। বলতে গেলে আমিই তাঁকে আবিষ্কার করি। তিনি ইংরেজী জানতেন না, কেবল ওড়িয়া আর সংস্কৃত জানতেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি তা সম্পাদনা করে এবং ইংরেজীতে ভূমিকা লিখে প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম। ইউরোপের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। বইটির খুব সমাদর হয়েছিল। চন্দ্রশেখরকে F. R. A. S. উপাধি দেওয়া হয়েছিল। চন্দ্রশেখরের কাছে ভারতীয় জ্যোতিষ শিক্ষা করে আমি বাংলায় আমাদের 'জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' লিখলাম। তার পর বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে জ্যোতিষের প্রয়োগ করতে লাগলাম।"

ইতিহাসে দেখা যায় খ্রীষ্ট জন্মের দুই হাজার বৎসর আগে আর্য্যেরা ভারতে আসেন। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেন, "আমি প্রমাণ করেছি ও করব যে ভারতে আর্য্য কৃষ্টির বয়স দশ হাজার বছরের কম নয়।"

বিদ্যানিধি মহাশয়ের সকল সৃষ্টিই জ্ঞানের বিষয়। তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গলগান ইত্যাদি লইয়া বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মাণিক গাঙ্গুলী রূপরাম ইত্যাদি কবিদের গ্রন্থ-রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন। প্রাচীন কবিদের কাল নির্ণয় তাঁহার একটি কীর্ত্তি। চণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার ছাতনার কবি ছিলেন কিনা এবিষয়ে তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ছাতনায় বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস একজনই ছিলেন। তিনি মনে করিতেন নান্নুরের মাঠে এবং ছাতনার গ্রামে তাঁহার কিছুকাল কাটিয়া থাকিবে। তাঁর মতে চণ্ডীদাস ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সামন্তভূমের রাজা হামীর উত্তর রায় চণ্ডীদাসকে বাসলী দেবীর বড়ু কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

এই সকল প্রবন্ধের মধ্য দিয়াই তাঁহার অগোচরে

বাংলা ভাষাতত্ত্বের গোড়াপত্তন হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে বাংলা ভাষাতত্ত্বের একজন পথিকৃৎ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বাংলা অক্ষরও সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। অনেক পত্রিকা সম্পাদক তাঁহার নীতি বুঝিতেন না, অনেকেরই প্রেসে তাঁহার প্রস্তাবিত টাইপের অভাব ছিল। তিনি বলেন, "এমন অবস্থা থেকে আমাকে রক্ষা করেন আমার বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি আমার অক্ষর-সংস্কার-নীতিতে আস্থাবান ছিলেন। নূতন টাইপ তৈরী করিয়ে তিনি আমার প্রবন্ধগুলো 'প্রবাসী'তে ছাপতে আরম্ভ করলেন।" যোগেশচন্দ্রের অক্ষর সংস্কারের মূলনীতি এখন প্রায় সকল প্রেসেই ব্যাপক ভাবে গৃহীত হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতে যখন তিনি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া 'প্রবাসী' প্রভৃতিতে ছাপিতেন, তখন কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "একজন ওড়িয়া আমাদের বাংলা শেখাচ্ছেন।"

উড়িষ্যায় যোগেশচন্দ্রের সমস্ত যৌবনকাল কাটিয়াছিল। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের আগেই উড়িষ্যায় বসিয়া চরকার উন্নতি চিন্তা করিয়াছেন, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। সপ্তাহে সপ্তাহে College Extension Lecture-এর ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যার মধুসূদন দাস, গোপবন্ধু দাস প্রভৃতির সঙ্গে যোগ দিয়া উড়িষ্যার কল্যাণে ব্রতী হইয়াছিলেন। উড়িষ্যাও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল, সেখানের কবি কবিতায় তাঁহার স্তব করিয়াছেন, সেখানের পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দেন, উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্. উপাধি ভূষিত করেন। উড়িষ্যায় বসিয়াই তিনি বাংলা শব্দকোষ ও বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। যোগেশচন্দ্র বলিতেন 'সার জে. সি. বোস আমার প্রত্যেক কাজ appreciate করতেন, তবে আমি সবচেয়ে বেশী উৎসাহ যাঁর কাছে পেয়েছি তিনি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দবাবু। তাঁর উৎসাহ না পেলে আমি অগ্রসর হতে পারতাম কি না সন্দেহ।"

যোগেশচন্দ্রের রচনার একটি বিশেষ style আছে। ডাক্তার সুকুমার সেন ইঁহাকে 'বঙ্কিমরীতির শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক' বলেন। কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইঁহার রচনায় নিজস্ব একটা বিশেষত্ব আছে। ইঁহার রচনা-পদ্ধতি সরল ও আধুনিক, কিন্তু ইহা আধুনিক অন্য লেখকদের মত নয়। এই আধুনিকতা তাঁহার নিজস্ব। তিনি জটিল করিয়া বা style দেখাইবার জন্য ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া লিখিতেন না। ইহাতে লেখা অতি সহজে বোধগম্য হইত। যোগেশচন্দ্রের পরে যাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই ইঁহার নিকট ঋণী এবং এই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

যোগেশচন্দ্র প্রায় সকল বিষয়েই লিখিতেন—ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও কলা, অর্থনীতি ও সমাজনীতি, পদার্থ বিদ্যা ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জ্যোতিষ ও রসায়ন · বেদ ও পুরাণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়েই তাঁহার চিন্তা ধাবিত হইত এবং তাহার ফল প্রবন্ধাকারে লোকসমাজকে তিনি উপহার দিতেন, সাধারণ লোকাচার, দেশের স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, পথ-ঘাট ইত্যাদি কোনো বিষয়ই তাঁহার চক্ষু ও মনকে এড়াইত না। যখন তিনি দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য স্বয়ং লিখিতে পারিতেন না, তখনও তাঁর শিষ্যদের সাহায্যে তিনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন।

বাংলা ১৩৪১ সালে বিদ্যানিধি মহাশয় বাঁকুড়া জেলার পুরাকৃতি অর্থাৎ প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি, ধাতুমূর্ত্তি, সীসা বা ধাতুর তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁকুড়া শহরে একটি মিউজিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৩৬৭ সালের ২১শে বৈশাখ এই মিউজিয়মের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয় "আচার্য্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন" নামে। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা ও তদীয় সংগ্রহশালা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবিতকালে ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৫৭ সালে সাহিত্য পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার ৯১ বর্ষ পূর্ত্তির জন্ম দিবসে বাঁকুড়ায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

তিনি বোধহয় উড়িষ্যাতেই বিজ্ঞানভূষণ উপাধিও পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় স্থানের মধ্যে আরামবাগ, কটক ও বাঁকুড়ার কথা তাঁহার রচনাবলীতে বারে বারে উল্লিখিত হইয়াছে। একটি জন্মভূমি, একটি কর্ম্মভূমি ও তৃতীয় শেষ জীবনের বাসভূমি।

"সোহাগ রাত'

শ্রীআভা পাকড়াশী

ছিঃ ছিঃ, কেন এলাম আমি এখানে! ওর জন্য শেষে আমি এতটা নীচে নামতে বসেছি। নিজের খানদান আব্বাজানের মান-সম্ভ্রম সব মিট্টিতে মিলাতে বসেছি? কিন্তু কি যে এক অদম্য নেশা। কিছু না, শুধু একবার দেখব। অতবার দেখা মানুষটিকে আরও একবার দেখার জন্য কি পরিমাণ না ছটফট করেছি। ক'দিন ধ'রে শুধু তসবি জপের মত জপ করেছি, কবে আট তারিখ আসবে। আট তারিখ সুবা হ'তেই মনে পড়েছে আজ আট তারিখ। সে আসছে। আমাদের এই স্টেশনের ওপর দিয়ে আজ সে যাবে। তাকে লিখেছিলাম—তোমার ডর নেই, তোমার ত্রিসীমানায় আমি যাব না, তোমার বিবি-বাচ্চা কেউ আমাকে পয়চানতে পারবে না। শুধু তুমি একটিবার স্টেশনে নেমে ওভারব্রীজের সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে আবার তক্ষুণি না-হয় ফিরে যেও। আমি নকাবের মধ্যে দিয়ে একটিবার তোমাকে দেখে নেব।

আমাদের বাড়ীর রেওয়াজ নেই যে, বেগারসাদিবালি কুমারী মেয়েরা কোথাও যাবে। শুধু কলেজ যাও আর কলেজ থেকে বাড়ী। তাও ইসলামিয়া কলেজের গাড়ি আসবে, বাড়ীর সামনে আঙ্গ এসে চেঁচাবে, 'গাড়ি আগঈ সায়েদা আপা চল...।' তখন আমি বোরখা পরে হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাসের মধ্যে ঢুকে পড়ব, ব্যস্। আবার কলেজ কম্পাউণ্ডে নামিয়ে দিয়ে বাস নিয়ে চ'লে যাবে ড্রাইভার সাব। সে বাসেরও আবার চারদিকে পর্দা ঘেরা। কোথাও গেলে বাড়ীর গাড়িতে যাই। আব্বাজান বা ভাইসাব চালায়। আর সেই আমি কিনা আজ কত কাণ্ড ক'রে, কত বাহানা লাগিয়ে পেটে অসম্ভব ব্যথা করছে ব'লে টিচার ইসরৎবাজির কাছ থেকে ছুট্টি নিয়ে রিকৃশায় বসে স্টেশনে এলাম! যার জন্য এত করলাম, সেই কিনা বিবির ভয়ে ট্রেণ থেকে একবার নামল না! এত ভীতু আর ডরপোক? এতই যদি বিবিকে ভয় কর তবে আমার সঙ্গে মহব্বত করতে এসেছিলে কেন? তখন বুঝি বিবির কথা মনে পড়ে নি? কত সুনহেরী স্বপন দেখিয়েছ তুমি, বলেছ, এতদিন আমি পেয়ার কাকে বলে তা জানতাম না সায়েদা, তুমি আমাকে পেয়ার দিয়ে পেয়ার শেখালে। নিজের বিবিকে আমি ভালবাসতে পারি নি। তুমি বল কেন পার নি? আমার চেয়ে ত তোমার বিবি খুবসুরৎ, তবে? শুধু খুবসুরতিই কি সব সায়েদা? তার মধ্যে আসল জিনিষে যে ঘাটতি। তার দিল ব'লে যে কোন পদার্থ নেই। সে খালি নিজের স্বার্থ বোঝে, আমার দিকটা দেখে কই? তার খালি জেবর গহনা, ভাল ভাল কিমতি স্যুট-সালোয়ার এই সব হলেই হ'ল। আমার আয় বুঝবে না, নিজের খেয়ালখুশি মত ব্যয় করবে। বলে কি না, তোমার এত কমতি রূপেয়া রুকৃসৎ, এত কম আয় জানলে আমি তোমাকে সাদি করতাম না। সে ত আমাকে সাদি করে নি সায়দা, আমার রূপেয়াকে সাদি করেছে। আর তুমি? তুমি তোমার সেবায় আমাকে কিনে নিয়েছ সায়েদা।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এত গণ্ডগোলের মধ্যেও আমার কানে ইকবালের এই কথাগুলো ভাসছে। সত্যি, ও বড় ভালমানুষ। কারুর ওপর জোর খাটাতে পারে না। ওর মনটা বড় নরম। আঘাত পেয়ে পাল্টা আঘাত দিতে জানে না। তাইতে ওর বিবি এত মেজাজ চড়িয়েছে। কিন্তু ও ঐ বিবির জন্য এত করে, এত ভাবে যে, দেখলে অবাক্ হতে হয়। কখন তার কি চাই, কখন তার কোন্ দাওয়াই দরকার, কি সিনেমা দেখবে সে, কোন্ রং-এর গারারার সঙ্গে কি রংয়ের কামিজ চাই—সব জোগাবে ইকবাল। সেবার আমার বড় বোন আপাপেয়ারীর সাদির সময় আমরা ত অবাক্, জুবেদার কাণ্ড দেখে। মিয়ার অত অসুখ, ঐ রকম শক্ত বেমার আর ও কিনা বার বার ড্রেস বদল করছে, মেকআপ করছে, হেসে হেসে রঙ্গ ক'রে সকলের সঙ্গে খুশিয়া মানাচ্ছে; আর ওদিকে তার পতিদেবতা ঐ ইকবাল বিছানায় প'ড়ে ছটফট করছে। যদি বা এক-আধবার যাচ্ছে খবর খয়রিয়ত নিতে ত ইকবাল আবার নিজেই বলছে, তুমি যাও জুবেদা, দুলহনের কাছে গিয়ে বস। শুধু বলার অপেক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল সে। কিন্তু আমি ফেলতে পারি নি। ওরা আমাদের বাড়ী মেহমান হয়ে এসেছে আর আমি কি না তার দেখভাল

করব না? সে সময়টা আম্মিজী, আব্বাজান সাদিতে ভীষণ ব্যস্ত। আমার ছোট বোনেরা তারা খুবই ছোট। আমার ভাই এসে আমাকে বলল, ওই আমাদের একটি মাত্র ভাই, তাকে আমরা বাড়ীর সকলের ওপর জায়গা দিই। কোন কথা ফেলা যায় না। সেও খুব ভাল। এত লাড়-পেয়ারেও বিগড়ে যায় নি। বলল, সায়েদা! ইকবাল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মর্দ্দানা কামরায় ত ওর বিবি যেতে পারবে না। ও এক ত আমাদের রেস্তদার, দ্বিতীয়তঃ আমার খুব বন্ধু, তাই ওকে এই অবস্থায় বাইরের ঘরে ফেলে না রেখে ভেতরে আনতে চাই। তুমি ওকে পর্দা ক'রো না। ওর দেখাশুনা ক'রো। সেই থেকেই আমাদের মহব্বতের সূত্রপাত।

তারপর থেকে কত চিঠি লিখেছি আমি ওর দপ্তরে। আর ও লিখেছে আমার নানীর বাড়ীতে। শুধু এই নানী জানত আমার কথা। একজন কাউকে না বলতে পারলে দম ফেটে মারা যেতাম আমি।

সেই অসুখের মধ্যেই ও ওর নিজের মনের কথা সব বলত। বলত, বরাবর আমি এমনি বিবি চেয়েছিলাম যে আমার ঘরে শান্তি আনবে। নিজের হাতে সংসার তুলে নেবে, খানা পাকিয়ে আমাকে খাওয়াবে, আমার দিকে খেয়াল করবে। আমার জামা-কাপড় গুছিয়ে দেবে, তা না, এমন বিবি পেলাম যে শুধু আমার ওপর হুকুম চালায়। তার রূপে ঘরে আমার রোণক এসেছে বটে, কিন্তু তাতে সুখ কই? সায়েদা, তুমি যদি আমার বিবি হতে? ওই তার প্রথম উলফতের কথা। আজও কানে বাজছে।

একে ত বাড়ীতে সাদি। তায় আবার কুমারী মন। বড় বেশী এগিয়ে দিলাম নিজেকে। মাঙ্গনী হয়ে গেছে। আপাপেয়ারীর সেদিন মেহদি লাগবে। সমস্ত বাড়ী রঙ্গাই-পোতাই ক'রে সাফ-সুতর করা হয়েছে। বাড়ীরই যেন সাদি লেগেছে। সমস্ত বাড়ীতে নানা পোশাকের আওরাতে ভ'রে গেছে। নানা রং-এর সিল্ক, সাটিনের, বানারসীর সালোয়ার কামিজ আর গারারার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। কত রকমারী গয়না পরেছে মেয়েরা। সব বোরকা প'রে আসছে, তখন শুধু তাদের সোনালী জুতোর চমক দেখা যাচ্ছে। বোরকা খুলতেই বেরিয়ে পড়ছে সাজ। যাদের নতুন বিয়ে হয়েছে তারা মাথায় সোনার টিকলি, শৃঙ্গার পট্টি, ঝুমর পরেছে, গলায় নেকলেস, কানে ঝালর তার সঙ্গে মোতির টানা আর হাতে একরাশ কাঁচের চুড়ির সঙ্গে কঙ্কণ পরেছে। আবার কেউ কেউ পৌকবন্ধ পরেছে। ওদিকে রসুইতে সালন আর পোলাউ-এর খোসবু ছেড়েছে। আজ মেয়েদের দাওয়াত। আজ এরা আপাপেয়ারীর হাতে বিকু লাগাবে। ঐ ত আপাপেয়ারী হলদে রং-এর সালোয়ার কামিজ প'রে গলায় গোলাপের মালা দিয়ে মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছে। সবাই এসে একটু ক'রে বিকু নিয়ে তার হাতের ওপর রাখছে আর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করছে। আমিও আজ পিলা স্যুট পরেছি। হলদে সাটিনের গারারা আর ব্যাঙ্গালোরী পিসের আঁটো কামিজ। দোপাট্টাও পিলা। আমার ওপর ভার পড়েছে সকলের বোরকা রাখার। সেই ঘরেই রয়েছে ইকবাল, যে ঘরে বোরকা রাখতে যাচ্ছি বারবার। সেদিন ওর জ্বরটা একটু কম। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে আমার দিকে। একটু আগেই ওকে হরলিক্স খাইয়েছি।

আমাকে ডাকছে, সায়েদা: বড় সুন্দর লাগছে তোমাকে। তোমার আপাপেয়ারীর চেয়েও সুন্দর লাগছে। তোমাকে দুলহন সাজলে ওর চেয়েও ভাল মানাত। সত্যি বলছি, তোমার মত এত সুন্দর চোখ আমি খুব কম দেখেছি। আমি বললাম, থাক্, আর তারিফ করতে হবে না। জুবেদা, আপাপেয়ারী এদের মত সাফ রং নাকি আমার?

তোমার এই শ্যামলা রং-এর বেশী শোভা সায়েদা। তোমার ঐ বড় বড় ভাঁওরা ঘেরা চোখ, ঐ টানা ভ্রু, অমন নাক, মিষ্টি হাসি এ যেমন তোমার শ্যামলা রং-এ খুলেছে তা ঐ আগুন রং-এ খুলত না, যেন আসমানের মেহ্‌তার সজল শোভা নিয়ে তোমায় ঘিরে আছে। তোমাকে দেখলে ঠাণ্ডা-নরম একটা মিষ্টি নার্গিস ফুল ব'লে মনে হয়। ওরা বড় উগ্র। আমি বলি, আহা! ওরা কত লম্বা-চওড়া? আমার মত ছোট্টখাট মেয়ে তোমার ভাল লাগে? হ্যাঁ, লাগে, সত্যি ভাল লাগে তোমাকে। তুমি বড় মিষ্টি। আমার কুমারী-মন ছলাৎ ক'রে ওঠে।

আর দু'দিন পরেই আপাপেয়ারী শ্বশুরাল যাবে। সেদিন হবে সোহাগ রাত। সেদিন ওরও সোহর, আমাদের ভাইসাব, মানে তাওজী, জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে, সেও অমনি ক'রে ওর কানে কানে এইসব কথা বলবে। ওকে কত আদর করবে, সোহাগ করবে। মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। বড় কাছে এগিয়ে যাই, একেবারে ইকবালের বিছানার পাশে, সেও এই সুযোগ ছাড়ে না। আমার হাত ধ'রে চারপাইতে বসায়, তার পর দুইহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আমাকে। উঃ! সে

অনুভূতি কি ভোলবার ? সেই আমার জীবনে পুরুষের প্রথম পরুষ-স্পর্শ !

গাটা ছমছম ক'রে ওঠে। আরও পাঁচ মিনিট দাঁড়াবে গাড়িটা। সারা স্টেশন চুঁড়ে ফেললাম, নকাবের মধ্যে দিয়ে ত সকলের মুখ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যাকে দেখতে চাই, সে কই ? তবে কি সে ঝুটা পেয়ার করেছে আমার সঙ্গে ? মহব্বতের খেল খেলেছে ? কিন্তু তাও যে বিশ্বাস করতে মন চায় না। আজ আপাপেয়ারীর সাদি হয়েছে প্রায় এক বছর, তার সঙ্গেও আমার এক বছরের আলাপ। নিয়মমত চিঠি দিয়ে গেছে। এই ত সেদিনও আমার ভাই তাকে ধ'রে এনেছিল দু'দিনের জন্য আমাদের বাড়ীতে, তখনও সে কত কথা বলেছে আমাকে। কত আশা দিয়েছে। আমি ত তার কাছে অন্যায় আবদার কিছু করি নি ? বলি নি ত, যে তুমি তোমার বিবি-বাচ্চাকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নাও ? সত্যি বলতে কি, আমি তার টাকাকড়ির ওপর মোটেই নজর দেই নি, বলেছি, সব ওদের দাও, শুধু তুমি আমার থাক। তাতে যত দুখ ওঠাতে হোক আমি ওঠাব। কম খরচে সংসার বানাব। সে শুনে বলেছে, না সায়েদা, আমি তকলিফ করতে দেব কেন তোমাকে ? আল্লা পরবরদিগার আমাকে দুটো সংসার করার মত রুপেয়া দিয়েছেন। কষ্ট আমি কাউকেই দেব না, ওদেরও দেব না, তোমাকেও দেব না। সাদি যখন করেছি জুবেদাকে, ও বেচারী ছেলেমানুষ, মা-বাপ ছেড়ে এসেছে, ওকেও তকলিফ দেব না। মনে মনে জ্ব'লে উঠি, হ্যাঁ, ছেলেমানুষ ! এত যে জ্বালায় তোমাকে তবু তার ওপর তোমার দরদ ! আবার ভাবি, এই হ'ল ইকবালের পরিচয়। একথা না বললে যে ওর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না।

আপাপেয়ারীর মেহেদি লাগানর পরের দিন "খিলাজ শরিফ"। সেদিন আমরা সারারাত জেগে গান-বাজনা করেছিলাম। সেদিন আখরি রাত আপাপেয়ারীর। পরের দিন সকালে নিকা। নিকার পর রাত্রিবেলা বরাত আসবে আর ভাইসাব দুলহা সেজে এসে আমাদের আপাপেয়ারীকে নিয়ে চ'লে যাবে। মনটা সেইজন্য খুব খারাপ। তবু এই আমাদের নিয়ম। বাড়ীসুদ্ধ সবাই এসে একবার ক'রে আপাপেয়ারীর মাথায় হাত ফেরেছে, আর নজম গাইছে। "ছোড় বাবুলকা ঘর, আজ পিকে নগর, মুঝে যানা পড়া" এমনি ধরনের আরও সব বিদায়ী 'সের', যার যা জানা আছে বা বই থেকে দেখে গাইছে। আমার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। আজ ভাল আছে ইকবাল। একটু একটু উঠে বসছে। এই ক'টা দিন সিগারেট খেতে পায় নি। আজ উস্‌খুস্ করছে তাই জন্য। আমাকে বারবার বলাতে আমি বললাম, দাঁড়াও, ভাইকে ডাকিয়ে দিচ্ছি সে ব্যবস্থা ক'রে দেবে। কিন্তু ডাক্তারের বারণ তবু তুমি সিগারেট খাবে ? হঠাৎ আমার হাতটা ধ'রে বলল, সায়েদা ! কাল কি আমি তোমার ওপর জুলুম করেছি ? আজ সারাদিন তুমি এত অন্যমনস্ক কেন ? তোমার চোখ এত লাল কেন ? অনুতাপ হয়েছে কি তোমার মনে ? আমি জানি, তোমরা খুব মজ্‌হবি। পাঁচ বারের একবারও তোমাদের নমাজ বাদ যায় না। আজ বিকেলের নমাজের সময় আমি তোমার মুখ দেখছিলাম। ঐ বাইরের চবুতরায় কালিন পেতে নমাজ পড়ছিলে তুমি, বড় বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল তোমাকে।

আমি বললাম, না না, ইকবাল, তা নয়। আপাপেয়ারী কাল চ'লে যাবে কিনা তাই মনটা উদাস হয়ে রয়েছে। সবাই কাঁদছে, আমারও তাই রোণা এসে যাচ্ছে। দাঁড়াও, আমি ভাইকে ডাকিয়ে দিই। উঠে আসতে গেলাম, দিল না। আমার হাত ধ'রে বলল, এত তাড়া কিসের ? একটু বোস না আমার কাছে। এখন তোমার আপাপেয়ারীকে নিয়েই ত সবাই ব্যস্ত। ঝি-চাকর, নোকর-নোকরাণী সবাই ত ওপরে রয়েছে। বসলাম তার কাছে। সেদিন আমার জলভরা দুটো চোখের উপর চুমু খেয়ে ও বলেছিল, দুঃখ পেও না, তোমাকে আমি ছাড়ব না। ফাঁকি দেব না তোমাকে। ইনশাল্লা একদিন না একদিন তুমি আমার হবেই। বল হবে ত ? তার এই কথা শুনে তখনকার মত আমার মনের গ্লানি সত্যিই অনেকটা কেটে গিয়েছিল। তারপর সারা রাত সেদিন সেও ঘুমোয় নি আমিও ঘুমোই নি। যখনই ফাঁকা দেখেছি, সুবিধে পেয়েছি, একবার ওর কাছে এসে ওকে দেখে গেছি। আশ্চর্য্য জুবেদার কাণ্ড; সেদিন সারারাত প'ড়ে প'ড়ে ও ঘুমোল ! কি ? না কাল নিকা, সাদির সময় ওকে না-হ'লে বড় খারাপ দেখাবে, আঁখ ব'সে যাবে, শুখা শুখা লাগবে চেহারা।

কাল রাত্রে সরাকায় স্কুল বিল্ডিংএ মর্দানা দাওয়াত হয়ে গেছে। আজ আবার দুপুরে মেয়েদের দাওয়াত। আজ ইকবাল ভাল আছে। কাল ডাক্তার ওকে রেশমীরোটি আর লৌকি সালন খেতে বলেছে। ইকবাল বলছে, পেয়ারী সায়েদা, এই ক'দিন পর আজ রোটি খাব, আমাকে অন্ততঃ একটুকরো তোমাদের দাওয়াতের সালন দিও। আর একটু শ্রীমাল কিংবা নান। আমি বললাম, আচ্ছা তাই হবে। তবে যদি

অসুখ আরও বাড়ে তা হ'লে ডাট পড়বে আমার ওপর, তাই না?

দপ্তরখান বিছান হয়ে গেছে। প্লেট চামচে সাজান তিনজন ক'রে একটা ভাগ থেকে নেবে, এই হিসেবে সালন আর গোস্ত-পোলাউ রাখা হয়েছে। এক এক থাকে দশখানা ক'রে নান। সব গরম গরম দেওয়া হচ্ছে। আব্বাজান কাল ওদিকে দাওয়াত খাইয়েছেন আর এদিকে আজকের দাওয়াতের জন্য সারারাত ধ'রে বাবুর্চিদের দিয়ে খানা পাকিয়েছেন। ঐ স্কুল বাড়ীতেই তৈরী হয়েছে খানা। সেখান থেকেই ডেকভরে, ভারির কাঁধে এসেছে বড় বড় দু'ডেক মাংস। আজ সাদি, সালন কাবাবও হয়েছে, আর গোস্ত-পোলাউ। কাল রাতে হয়েছিল শ্রীমাল আর শাহীটুকরে। আজ হয়েছে নান আর মিঠা চাউল। এছাড়া ভিণ্ডির তরকারি আর আলুর তরকারিও আছে। যারা গোস্ত, সালন খাবে না তাদের জন্য আছে মটর-পোলাউ, সিতাফলের কোপ্তা আর মিঠার মধ্যে ফির্ণি। একদিকের দপ্তরখানে সবাই এদিকে-ওদিকে বসেছে, সেটা খালি হ'তে সাফ করান হচ্ছে, ওদিকের সাজান দপ্তরখানে তখন দাওয়াতিরা বসেছে। ওদের খানা খতম হ'তে হ'তে এদিকের দপ্তরখান তৈরী। আজ আমি সুতী সালোয়ার কামিজ প'রে ছুটে ছুটে কাজ করছিলাম। বড় বাওল ভরে তিন তিন জনের মত পোলাউ, মাংস সব নিয়ে আসছিলাম বাবুর্চিখানা থেকে। এক-একবার বারান্দার কোণে চোখ পড়তে দেখলাম, ইকবাল আড়চোখে পর্দার আড়াল থেকে আমাকে দেখছে।

সকালে আপাপেয়ারী চান করেছে আজ একঘণ্টা ধ'রে। তিন দিন ধ'রে যা উপ্টন মলা হয়েছে ওকে—সারা গা হলদে হয়ে গিয়েছিল। তার পর লাল কামদার নাইলনের কামিজ আর লাল সাটিনের গারারা প'রে ব'সে ছিল। খুব কেঁদেছে বোধহয় চানের সময়। চোখ দুটো লাল। সুর্ক রং-এ বড় সুন্দর মানিয়েছে ওকে।

ওর শ্বশুরাল থেকে সব জিনিষ এল। দু'থলি মেওয়া, দুটো শুখা গোরি, এই নারকোল না হলে আমাদের কিছু হয় না। তাছাড়া টয়লেট সেট, সোহাগ মশালা আর সাটিন আর সানিল, ভেলভেটের সলমা-চুমকির কামদার চার-পাঁচ জোড়া স্যুট। সুন্দর রং চুনেছে ওরা। তরমুজি-রং ঐ সালোয়ার-কামিজে সুন্দর মানাবে আপাপেয়ারীকে। আমাদের সব বোনেদের মধ্যে ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। নিকার জন্য মৌলভী এসে গেছে। গাওয়া হয়েছেন মামুজী আর রসুল ভাই। পাঁচ হাজার এক টাকার মোহর-নামা লেখা হ'ল। আপাপেয়ারীকে নিজের মুখে বলতে হ'ল, সাদি মঞ্জুর। যদি কখনও ভাইসাব আপাপেয়ারীকে তালাক দেয় তবে ঐ টাকা তাকে দিতে হবে। আর স্ব-ইচ্ছায় যদি আপাপেয়ারী ওকে ছেড়ে দেয় তবে অবশ্য টাকা পাবে না। এর পর আবার সবাই আশীর্ব্বাদ করল। এই সময়টা সত্যি বড় কান্না পায়। মনে হয়, এতকাল যাদের ছিলাম তাদের কাছ থেকে চিরকালের মত পর হয়ে গেলাম। ইকবালের চারপাই খালি। উঠে বাইরে গেছে বোধ হয়। আজ জুবেদা তার মেয়ের কথা বলছিল—নিজের জ্যেঠানির কাছে রেখে এসেছে তাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইকবাল ভাই ত একই আওলাদ মা-বাপের? জুবেদা বলল, হ্যাঁ, কিন্তু এরা আমাদের বাড়ীতে থাকে। দূরের রিস্তার জ্যেঠানি। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বেটির সকল্ সুরত কার মত হয়েছে? বলল, একেবারে আমার মিয়ার মত। ওর মুখ বসান, তবে রংটা বোধ হয় আমার পাবে। কি জানি কেন বড় দেখতে ইচ্ছে করছে জুবেদার মেয়েকে। সে জুবেদার মেয়ে ব'লে নয়; ইকবালের আহেলা বলেই বোধ হয়।

দুপুরের দাওয়াতের পর এবার সাম হ'ল। সারা বাড়ী আলো দিয়ে সাজান হয়েছে। আঙ্গনে চাঁদোয়া টাঙ্গানো হয়েছে। দুলহা মিয়ার জন্যে জাজিম পাতা হয়েছে। সব শাশুড়ীর দল জাজিম ঘিরে বসেছে। সবাই দুলহা-দুলহনকে রকম দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবে। যার যেমন ক্ষমতা সে তেমনি দেবে। কেউ দশ, কেউ পঁচিশ এমনি। ইকবাল শুধু একটিবার ভেতরে এসেছিল। আমি ওকে একা পাই নি, তবু ওরই মধ্যে ব'লে দিলাম, বেশী ঘোরা-ঘুরি ক'রো না, না হ'লে আবার বোখার হবে। হাসল একটু।

আপাপেয়ারীকে এবার দুলহন সাজিয়ে নীচে আনা হ'ল। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। চমকিলি দিয়ে মাঙ্গ ভ'রে দিয়েছে, আমাদের ত আর সিঁথিতে সিঁদুর পরে না? তার ওপর মাথায় পরেছে সোনার টিকলি, সেটা গঁদ দিয়ে কপালে আটকে দিয়েছে। তার ওপর শৃঙ্গার-পট্টি আর এক পাশে ঝুমর, সব চুনি আর পোকরাজের সেট। গলার নেকলেসও চুনি পোকরাজের সেটের। কানের লম্বা ঝালর তার সঙ্গে মুক্তোর টানা, কানের ওপর দিয়ে চুলে আটকে দিয়েছে। আপাপেয়ারীর পায়ের আঙুল বেশ লম্বা লম্বা, তাই চাঁদির ছালা পরিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের সোহাগী, সধবার চিহ্ন, নাকের কিল পরেছে নাকে, সেটাও সুর্ক রং, বেশ বড় চুনির। মেহদি-রঙ্গা হাতে

কাঁচের চুড়ির সঙ্গে আছে শোকবন্ধ। দশ আঙ্গুলে দশটা জড়োয়ার আংটি, চমৎকার ডিজাইনের রতনচুড়। এই শোকবন্ধ হাতে না থাকলে দুলহন ব'লে মানায় না। দুলহা মিয়ার বাঁদিকের আসনে জরির ঘেরার ব্রোকেডের দোপাট্টায় মুখ ঢেকে বসেছে আপাপেয়ারী। ওপর থেকে গোলাপের মালা পরিয়ে দিয়েছে। আমি তখন সাদা সাটিনের গারারা আর হাল্কা নীল মুনলাইট কাপড়ের কামিজ আর সাদা গুলসনজালির দোপাট্টা পরেছি। পেছনে দাঁড়িয়েছি আপাপেয়ারীর। ভাইসাব, দুলহা মিয়ার মাথায় দোপাট্টা চাপা দেব। তখন টাকা দেবে সে আমাকে। সুর্মাদান এনে রাখা হয়েছে, আগে দুলহা প'রে দুলহন চোখে সুর্মা এঁকে দেবে। নানী বলবে, আমার নাতনী তোমার চোখের সুর্মা হোক্। জামাই সাহেব বলবে, হাঁ জী, মঞ্জুর। তখন আমরা দোপাট্টা সরিয়ে নেব।

এবার মেওয়া আর বাতাসার পোঁটলা হাতে দুলহা মিয়াকে নিয়ে তার আব্বাজান সভায় এলেন। প্রথমে এই শ্বশুরকে দুলহনের 'মু'দিখানি' দিতে হয়। কঙ্কণ পরিয়ে দিলেন বহুর হাতে। এবার তাঁর গলায় গোলাবের হার পরিয়ে তাঁকে দুধ খাওয়ান হ'ল। দুধ খেয়ে তিনি বলবেন, বহুর স্বভাব এমনি মিঠা হোক্। মেওয়া চার ভাগে বাঁটা হ'ল। মেওয়া নিয়ে খেলা হ'ল, দুলহন জিতে গেল। সাদি হয়ে গেল। ফ্ল্যাশলাইট ক্যামেরায় ছবি তুলছে ইকবাল। আলোটা যেন বেশী ক'রে আমার মুখের ওপরেই চমকাচ্ছে। এখন কেউ আর অত পর্দা মানছে না। আমরা বোনরা ছাড়া আমার বয়েসী মেয়েরা ওপরের ছাদের রেলিং বা ছাজজা খিড়কি থেকে ঝাঁকছে আর সাদিবালি বা একটু বয়স্কারা নীচেই রয়েছে। সভা ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। আমাদের উঠোনের উঁচু চবুতরার ওপরেই সাদি বসেছে।

সাদি হয়ে গেল নীচে, ফুল দিয়ে সাজান মোটর তৈরী, গলায় মালা, মাথায় টুপি, আলিগড়ী পাজামা আর শেরোয়ানী প'রে দুলহামিয়া বসে বসে সালাম দেয় সবাইকে। প্রথমে আম্মিজী পাঁচশো এক রূপেয়া দিল দামাদের হাতে, তার পর যার যা ক্ষমতা এক এক ক'রে দিয়ে মাথায় হাত ফেরতে লাগল। সব শেষে নানী শাল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করল। দুলহামিয়ার আব্বাজান, তাওজীকেও শাল চড়ান হ'ল। এবার বিদায়ের পালা। সবাই কাঁদছে। একে একে এসে আপাপেয়ারীর মুখ দেখছে, তাকে আদর করছে, শির চুমছে আর চোখের জল ফেলছে। এই প্রথম আমি আমার জ্ঞানে আব্বাজানের চোখে জল দেখলাম। তাওজীর দুই হাত ধ'রে একবার বলছেন, যদি কোন দোষগুণ্ হা হয়ে থাকে তার জন্য আমার বেটিকে যেন তকলিফ্ দিও না। ওদিকে ওর শাস মানে নিজের ভাবীর হাত ধ'রে বলছেন, আমার পেয়ারী বেটিকে তোমার হাতে দিলাম, নিজের মেয়ের মত দেখো। ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়ছে চোখ দিয়ে।

এদিকে আমারও চোখে জল আসছে। আচ্ছা ডরপোক, এত বার ক'রে বলেছিলাম একবার গাড়ি থেকে নামল না। ঐ ত হুইসিল বাজল, গার্ড সবুজ নিশান দেখাল, এবার ধীরে ধীরে গাড়ি ছেড়ে দিল। যে যার ফিরে যাচ্ছে। কেউ হয়ত কাউকে নিতে এসেছিল, সে তাকে নিয়ে হাসতে হাসতে, কত জমান কথা কইতে কইতে, ফিরছে। আবার কারুর কেউ আপন জন চ'লে গেল, সে চোখ মুছতে মুছতে ফিরছে। কিন্তু আমার মত কি শূন্য-হৃদয়ে কেউ ফিরছে? জানি আজ সে এই গাড়িতে এসেছে আবার চ'লেও গেল, কিন্তু একটি বার নামল না ব'লে আমি তাকে দেখতে পেলাম না। যে তাকে ভালবাসে না সে রাণীর সম্মানে তার পাশে ব'সে ফার্ষ্টক্লাশে সফর করছে, আর যে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, নিজের মান, সম্মান তুচ্ছ ক'রে ছুটে এল,—তার ত একটিবার তার সকল্ দেখার পর্য্যন্ত এযাযত নেই। হায় আল্লা! এ তোমার কি খেয়াল?

নানীর বাড়ী গিয়ে তার বুকের ওপর প'ড়ে কাঁদতে কাঁদতে সব বললাম। আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আমার বুড়ী নানী বলল, কেন সাদিবালা মর্দের সঙ্গে মহব্বত করতে গেলি? এদিকে তোর আব্বাজান তোর সাদি ঠিক করেছে জুবেদার ভাইয়ের সাথে। আমি মানা করলাম, বললাম, ও বড় ছোট, আর কিছুদিন থাক্। কতদিন আর রুখতে পারব, বল? দেখি, আমি নিজে একবার ইকবালের সঙ্গে বোঝাপড়া করব তার পর তোর সল্হানামা লিখতে দেব। যা, ঘর যা বেটি, ঘর যা।

আবার চোখ পুঁছতে পুঁছতে বাড়ী ফিরলাম। মনে পড়ছিল আপাপেয়ারীর সোহাগ রাতের কথা। আমিও আপাপেয়ারীর সঙ্গে তার শ্বশুরাল গিয়েছিলাম। ফুলের ছড়ি দিয়ে সাজান হয়েছিল আমাদের দেওয়া নতুন পালং। সাটিনের লেহাব আর মখমলের তাকিয়া, কামদার মখমলের রেজাই সুন্দর ক'রে সাজান। গুলদস্তা সাজান রয়েছে টেবিলের ওপর। এক পাশে নতুন ড্রেসিং টেবিল আর আমাদের দেওয়া ড্রয়িং-রুম সেট, কামরা সেন্ট, আতর, ফুলের গন্ধে ভ'রে আছে। আপাপেয়ারীকে নিয়ে গিয়ে সেই পালং-এ বসান হ'ল।

ফেরার সময় মোটর চালাচ্ছিল ইকবাল। পেছনে সবাই মিলে বোরকা প'রে ঠেসে-ঠুসে বসেছে। আমি জায়গা না পেয়ে সামনে ভাইয়ের পাশে বসলাম। ইকবাল হঠাৎ বলল, আর দেরি নেই সায়েদা, এবার তোমারও সাদি হ'ল ব'লে। বাড়ী এসে সবাই নামছে, ভাই নেমেছে, তার পেছনে আমি, হঠাৎ বোরকার ভেতরে আমার হাতটা চেপে ধ'রে, ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে, চল পালাই এই মোটরে। সেই রাতের গাড়িতেই ওরা চ'লে গেল। শুধু একবার মওকা পেয়েছিলাম ওপরের ছাদে। চাঁদনী রাত ছিল। আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিল, দেখ, মৌসম নিজেই আমাদের সোহাগ রাতে চাঁদনী ছেয়ে দিয়েছে।

বাড়ী আসতেই আম্মিজী বলল, তার এসেছে জুবেদার বাড়ী থেকে,—এইটুকু শুনেই আমি চম্‌কে উঠে বলি, কেন আম্মিজী, কি হয়েছে? সব খয়রিয়ত ত? বোরকাটা খুলতেও হাত সরে না। আবার বলি, বল না? কোথায় সে তার? দেখি, ভাই সোফায় ব'সে চোখ পুঁছছে। তার হাতে তার। ছিনিয়ে নিলাম তারটা। "আচানক্ ইকবাল কি এন্তেকাল হো গিয়া।" হায় আল্লা পরবরদিগার, তোমার মনে এই ছিল? এমনি ক'রে কেড়ে নিলে? সত্যিই তবে আমার মহব্বতের রেল তার স্টেশন ছেড়ে চ'লে গেল?

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

খাদ্যশস্যের মূল্যনির্ধারণ-পদ্ধতি

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আমাদের দেশের খাদ্য-শস্যের মূল্য সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন—

The Minister pledged the government to-day to "incentive prices" for farmers and a shift of policies from "consumer orientation" to "farmer orientation" *even if that meant a rise in prices*. . . .

The Minister said that "The Government's policies must look to the interests of the agricultural producers, who formed more than 80% of the country's population, not to the interests of the 18% or 20% who were urban consumers" . . . . he smothered fears about a rise in agricultural prices by describing it as a long overdue favour to "the 60 million farming households of India."—(*The Statesman*, March 22, 1963).

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের খাদ্যমন্ত্রী তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার দুই বছর অতিবাহিত হবার পর বহু কালের এক জটিল সমস্যার এমন সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছেন জেনে দেশবাসী আশ্বস্ত ও আনন্দিত বোধ করবেন। দেশের শতকরা ১৮ বা ২০ জন দেশবাসীর সকলেরই সমস্যা এবং জীবনযাত্রার মান একসূত্রে গ্রথিত এবং এরা সকলে একজোট হয়ে শতকরা ৮০ জন গ্রামবাসীর ন্যায্য পাওনা থেকে তাদের বঞ্চিত করছে; আর "Consumer Orientation" থেকে "Farmer Orientation"-এর কথা বলাতে মনে হচ্ছে farmer-রা বেশি দাম পেলেই তাদের আর "Consumer"-এর সমস্যাদি ভোগ করতে হবে না।

গ্রামবাসী তথা কৃষকগোষ্ঠীর স্বার্থে এতদিন বাদে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে সেটি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হ'লে দেশের মঙ্গল হবে সন্দেহ নেই। ইদানীং খাদ্যশস্যের দাম যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় অনেক বাড়বার ফলে অন্তত একদল কৃষকের প্রভূত উপকার হয়েছে। এখন শস্যের ভাল দাম প্রায় সুনিশ্চিত, জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদনও অতিরিক্ত নয়, যে জন্য বড় চাষীদের অবস্থা ফিরেছে। আজ পৃথিবী জুড়ে ক্ষুধিতের অন্ন-সংস্থানের যে উদ্যোগ চলেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সরকারের এই সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী, এ কথা স্বীকার করতে হবে। যারা জমিতে চাষ ক'রে দেশের লোকের অন্ন জোগান দিচ্ছে তারা তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পাবে, এ ত খুবই সঙ্গত কথা; কিন্তু তারই সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের আরও মূল্য বৃদ্ধির অনিবার্যতা সম্বন্ধে খাদ্যমন্ত্রী যে উক্তি করেছেন তার সামঞ্জস্য আছে কি না, সে কথা দেশের বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ্‌রা বলতে পারবেন।

প্রশ্নটিকে নানান দিক্ থেকে দেখা যেতে পারে—কৃষকেরা যে মূল্য পাচ্ছেন (farm price) তার সঙ্গে বাজারদর (retail market price বা consumer's price)-এর ব্যবধান; বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যের পারস্পরিক মূল্য-সম্পর্ক; কৃষিজ পণ্যের সঙ্গে শিল্পজাতপণ্যের পারস্পরিক মূল্য সম্পর্ক এবং জনসংখ্যার অনুপাতে দেশের খাদ্য-উৎপাদনক্ষমতা।

১৯১০-১১ থেকে ১৯১৪-১৫-র বাৎসরিক গড় থেকে হিসেব সুরু করলে দেখা যায় যে (১), ১৯৩৭-৩৮ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচক-সংখ্যা (Index number) ১০০ থেকে ১২৫-এ এসে দাঁড়িয়েছে; খাদ্য উৎপাদন (food production) দাঁড়িয়েছে ১১০-এ, এবং খাদ্যের জোগানের (food supply available for

(১) দ্রষ্টব্য: ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়: "The Food Supply: Oxford Pamphlet on Indian Affairs.

consumption) সূচক-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৮-তে। ১৯৩১-এর পর থেকেই দেখা যাচ্ছে দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ জনসংখ্যার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। যুদ্ধোত্তর পর্বের এই কুড়ি বছরের ইতিহাস আমাদের কাছে সুবিদিত ; এতদিন আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও আমাদের বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে (২), আর সাম্প্রতিক এক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদও আমাদের দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোককে অর্ধাহারে থাকতে হবে।

অতএব খাদ্যশস্য উৎপাদনের তুলনায় খাদ্যের চাহিদা আমাদের দেশে হ্রাস পাবে এই সম্ভাবনা যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন বাজারদর প্রভাবান্বিত করার অন্যান্য কারণগুলির কথা বাদ দিলে, চাহিদার অভাবেই দাম কমে যাবে, এ কথা আমাদের দেশে প্রযোজ্য নয়। আমেরিকার কথা স্বতন্ত্র, সেখানে উদ্‌বৃত্ত শস্য এত বেশি হচ্ছে যে, সে-দেশের কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়েই দাম (floor price) বেঁধে দিয়ে, বাড়তি শস্য গুদামজাত ক'রে, দেশে-বিদেশে বিক্রী বা দান ক'রে, কৃষির জমি অন্য কাজে লাগিয়ে, নানানভাবে কৃষকের লোকসান রোধ করার চেষ্টা করতে হচ্ছে।

চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অতিরিক্ত হবার সম্ভাবনা যখন আমাদের দেশে নেই এবং খাদ্যশস্যের দাম নির্ধারণও যখন এ যুগের অর্থনৈতিক রীতি অনুযায়ী বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের উপরই নির্ভর করছে, তখন আমরা সম্ভবত ধ'রে নিতে পারি যে, অস্বাভাবিক কোন প্রভাব না থাকলে কৃষিজ পণ্যের দাম কমবে না। এর উপর আবার আছে সরকারী বাজেট ও কর-নির্ধারণ নীতির প্রভাব। কর বৃদ্ধি এবং deficit financing অনিবার্য ব'লেই মেনে নিতে হচ্ছে, কিন্তু তার ফলে প্রতি বছর অনিয়ন্ত্রিতভাবে যেরকম দাম বৃদ্ধি হচ্ছে তারও প্রভাব গিয়ে পড়ছে কৃষিপণ্যের মূল্যের উপর।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, অভাব-জর্জরিত কৃষক-গোষ্ঠীর অধিকাংশই সারা বছর মহাজনের কাছ থেকে দেড়গুণ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতিতে জমি বন্ধক দিয়ে ধান ধার নিচ্ছে আর বৎসরান্তে, ঋণ পরিশোধের পর যা হাতে থাকছে তা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে নিজের ঘরে না রেখে ক্রেতার নির্ধারিত মূল্যে শহরে এসে বেচে যাচ্ছে, আর সেই শস্য মুষ্টিমেয় মহাজন ও ব্যবসায়ীরা সুবিধামত সময়ে যে-কোন দামে বাজারে বিক্রী করছে।(৩)

কৃষক যে দাম পাচ্ছে আর ক্রেতা যে দাম দিচ্ছে তার ব্যবধান উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। আর মাঝারি-গোছের যে-সব কৃষক কিছু উদ্‌বৃত্ত ধান বেশি দামে বিক্রী করতে পারছে তারা শহর থেকে প্রয়োজনীয় ও সখের জিনিষ অনেক বেশি হারে দাম দিয়ে কিনে শহরেই তার রোজগারের বেশির ভাগ অংশ রেখে বাড়ী ফিরছে। আমাদের দেশে যারা ক্ষেতে-খামারে কাজ করছে তার মধ্যে শতকরা কতজন জমিবিহীন মজুর (৪), কতজন নিজেদের সারা বছরের প্রয়োজনটুকু কোনক্রমে মেটাবার মত জমির মালিক, আর কতজনই বা উদ্‌বৃত্ত (marketable surplus) শস্য বাজারে এনে বিক্রী করছে, সে তথ্য সরকারের অজানা নয় ; জমিদারী প্রথা লোপ করবার পর কতজন ভূমিহীন মজুর 'কৃষক'-পর্যায়ভুক্ত হয়েছে এবং তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন তার ফলে ঘটাতে পেরেছে, সে বিষয়েও ইদানীং বহু গবেষণা হয়ে গেছে। কৃষি-ঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনে সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে অনুসন্ধান করেছেন তার বিবরণী থেকেও আমরা জানতে পারি কিভাবে শহরের ব্যবসায়ীগোষ্ঠী এবং গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকরা অল্প জমিবিশিষ্ট বা জমিবিহীন লোকেদের পরিশ্রমের ফল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলছেন। অতঃপর স্বভাবতই যে প্রশ্ন মনে আসে তা হচ্ছে, কৃষি-পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিই কি আসল সমাধান, না মুষ্টিমেয়

(২) ১৯৫১-৫২ সালে আমাদের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৫১ মিলিয়ন টন ; আর ১৯৬১-৬২তে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় ৭৬ মিলিয়ন টন ; আর ১৯৫৮-৫৯-এর থেকে আমরা খাদ্য আমদানী করেছি যথাক্রমে ১৮৯ কোটি, ১৮১ কোটি, ২১৪ কোটি এবং ১২৩ কোটি টাকার। এ ছাড়াও দান বা ঋণ হিসাবে আরও খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে।

(3) Prices paid by the consumers are high, often as much as double the harvest prices. Due to their incapacity to sustain themselves otherwise, than by selling their produce immediately after the harvest, the farmers are forced to sell their goods at a low price.—*Techno-Economic Survey of West Bengal,* 1962.

(4) About 40 per cent of the agricultural population in West Bengal do not own land. They carry on cultivation either as share croppers or tenants and are easily liable to eviction. As such they do not have any incentive for carrying out such measures that bring about permanent improvement in land.—*Techno-Economic Survey of West Bengal,* 1962.

কয়েকজনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণই সর্বাগ্রে প্রয়োজন? আর মূল সমস্যার সমাধান না ক'রে যদি মূল্যবৃদ্ধির দিকেই নজর দেওয়া হয় তা হ'লে তার ফলভোগ করবেন কারা? সরকারের বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও এ বছর বাংলা দেশের উদ্বৃত্ত অঞ্চলে চালের দাম একদিকে বেড়ে চলেছে আরেকদিকে অভাবী চাষীর জমি বিক্রীর পরিমাণও বেড়ে চলেছে।

অপর প্রশ্ন হচ্ছে কৃষিজ পণ্যের সঙ্গে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক। কৃষকরাও "Consumer" এবং তাদের সবাইকেই শিল্পজাত দ্রব্যাদি কিনতে হচ্ছে এমন এক দামে যার উপর তাদের কোনই হাত নেই; অগণিত, বিচ্ছিন্ন, কৃষকগোষ্ঠী এ যুগে তাদের বিক্রীত পণ্যের মতই কেনবার জিনিষ সম্বন্ধেও অন্যান্য দেশের কৃষকদের মতই পরমুখাপেক্ষী। আমাদের দেশে যুদ্ধোত্তর পর্বে বেশির ভাগ বৎসরেই শিল্পজাত দ্রব্যের দাম কৃষিজপণ্যের তুলনায় বেশি হারেই বেড়েছে (৫)। ১৯৫২-৫৩ থেকে হিসাব ধরলে বিভিন্ন জিনিষের দামের সূচকসংখ্যা কি ভাবে ওঠানামা করেছে তার হিসাব উল্লেখযোগ্য।

[১৯৫২-৫৩=১০০]	চাল	গম	চা	কয়লা	কাঁচা পাট	তুলা	পাটদ্রব্য	কাপড়	আখ	চিনি	লৌহ দ্রব্য
১৯৫১-৫২	১০৪	৯৪	১৫১	১০০	২২০	১২৮	১৯১	১০৮	১১১	১০৪	৮৭
১৯৫৫-৫৬	৭৮	৭২	১৭০	১০১	১১৭	৯৭	৯৬	১০৫	৯২	৯৪	১১৯
১৯৫৬-৫৭	৯৭	৮৮	১৬৫	১১৬	১২৬	১১১	৯৫	১১৬	৯১	৯৫	১৩১
১৯৫৭-৫৮	১০৫	৮৮	১৬৪	১২৮	১৩৩	১০৬	৯৫	১১৬	৯১	১১০	১৪৩
১৯৫৮-৫৯	১০৫	১০৫	১৬৯	১৩৩	১১৮	৯৯	৮৭	১১২	৯১	১২১	১৪৫
১৯৫৯-৬০	১০৫	৯৬	১৮৬	১৩৫	১২৫	১০৬	৯১	১১৭	৯৬	১২৪	১৪৬
১৯৬০-৬১	১০৮	৯০	২০৬	১৪১	২১০	১১২	১৩১	১২৮	১০২	১২৭	১৪৭
১৯৬১-৬২	১০৫	৯১	১৯৩	১৪২	১৭৮	১০৯	১২২	১২৮	১০২	১২৫	১৪৮

(৫) ১৯৩৯-এর তুলনায় পরবর্তী কয়েক বৎসরের মূল্য বৃদ্ধির হিসাব (১৯৩৯=১০০)

	খাদ্যদ্রব্য	শিল্পের কাঁচামাল (Industrial Raw material)	শিল্পজাত দ্রব্য (Manufactured articles)	গড় (General Index)
১৯৪৮-৪৯	৩৮২.৯	৪৪৪.৮	৩৪৬.১	৩৭৬.২
১৯৫০-৫১	৪১৬.৪	৫২৩.১	৩৫৪.২	৪০৯.৭
১৯৫১-৫২	৩৯৮.৬	৫৯১.৯	৪০১.৫	৪৩৪.৬
১৯৫২-৫৩	৩৫৭.৮	৪৩৬.৯	৩৭১.২	৩৮০.৬
১৯৫৪-৫৫	৩৩৯.৮	৪৩৬.২	৩৭৭.৪	৩৭৭.৫
১৯৫৫-৫৬	৩১৩.২	৪১৯.৭	৩৭২.৯	৩৬০.৪
১৯৫৬-৫৭	৩৮৮.৫	৫০১.৯	৩৮৪.৬	৪১৪.০
		১৯৫২-৫৩=১০০		
১৯৫৩-৫৪	১০০.১	১০৭.৪	১০০.৭	১০১.২
১৯৫৪-৫৫	৮২.১	৯৪.৬	১০০.১	৮৯.৬
১৯৫৫-৫৬	৯৪.৬	১১০.৬	১০১.৬	৯৯.২
১৯৫৬-৫৭	১০১.৭	১১৬.৮	১০৫.৩	১০৫.১
১৯৫৭-৫৮	১০৩.৪	১১২.৯	১০৭.৪	১০৬.১
১৯৫৮-৫৯	১১২.৭	১১৫.৯	১০৯.৫	১১২.১
১৯৫৯-৬০	১১৬.৫	১৩২.০	১১৬.২	১১৮.৭
১৯৬০-৬১	১১৮.১	১৫৮.৫	১২৭.৪	১২৭.৫
১৯৬১-৬২	১১৮.৪	১৩৪.৬	১২৪.৮	১২২.৯

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণের ঘাত-প্রতিঘাতে জিনিষের দাম বেড়ে চলেছে বছরের পর বছর ; কোন্‌টির ধাক্কায় কোন্ জিনিষের দাম বাড়ছে তাই নিয়ে বিভিন্ন মত থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে, খাদ্যদ্রব্যের দাম সামান্যতম বাড়লে তার তরঙ্গ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায় কৃষকগোষ্ঠীর উপকারের নাম ক'রে চালের ও অন্যান্য প্রধান খাদ্যশস্যের দাম বাড়াতে সুরু করলে তার ফল এই দাঁড়াবে যে, টাকার ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস অব্যাহত থাকবে ; উপরন্তু কৃষকগোষ্ঠীকে যদি শিল্পজাত দ্রব্য বেশি মূল্যে কিনতে হয় তা হ'লে তার নগদ টাকায় বেশি দাম পেয়েই বা কি লাভ ?

এই সূত্রে আন্তর্জাতিক কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) বিভিন্ন দেশের কৃষকদের আয় ও ব্যয়ের যে সূচক-সংখ্যা প্রকাশ করেছেন (৬) সেটি উল্লেখযোগ্য। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র—এই পাঁচটি কৃষিপণ্য রপ্তানীকারক দেশেই দেখা যাচ্ছে ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৬১-র মধ্যে, কৃষকেরা যে হারে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফল পেয়েছেন, তার তুলনায় তাঁদের খরচের হার বেড়েছে। অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, জাপান ও পশ্চিম জার্মানী—(সব কয়টিই কৃষিপণ্য আমদানীকারক দেশ)—এই কয়টি দেশে কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নানান উপায়ে (Price Support measures) বেশি রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও কৃষকেরা "real income"-এর হিসাবে লাভবান্ হতে পারেন নি। (৭)

আমাদের দেশেও একই ধারা লক্ষিত হচ্ছে। আপাততঃ খাদ্যশস্য বিক্রী ক'রে বেশি দাম পেয়ে অনেকেই খুশী ; গ্রামবাসীরা উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে পাকা বাড়ী করছেন, ট্র্যানসিষ্টর, গ্রামোফোন ইত্যাদি কিনছেন, মামলা-মোকদ্দমায় আরও বেশি ক'রে পয়সা খরচ করছেন। এই আপাতঃ-সমৃদ্ধির লক্ষণ দেখে মনে প্রশ্ন আসে এই বেশি টাকা কতজনে পাচ্ছে ; আর কাঁচা টাকার আকর্ষণে বা প্রয়োজনের তাগাদায় যারা ধান বিক্রী করছে তারা আবার কত টাকায় চাষের কাজেই প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং অন্যান্য দৈনন্দিন জিনিষ কিনছে ? এরই সঙ্গে যে প্রশ্নটি মনে আসে সেটি হচ্ছে নগদ টাকা যত পরিমাণে গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে তার কতটা অংশ জমির স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য যাচ্ছে আর কতটাই বা বিলাস-দ্রব্যের দরুন খরচ হয়ে ধনী শিল্পপতিদের হাতে গিয়ে জমছে ? ভারতবর্ষ যখন ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশ ছিল তখন "Free International Trade"-এর নামে যেমন লেনদেন হ'ত, আজও কি ভিন্ন পরিবেশে শহর ও গ্রামের মধ্যে, শিল্প ও কৃষির মধ্যে সেই রকম লেনদেন চলছে ? কৃষিজ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কি পরোক্ষে শিল্পপতিদেরই উপকারে আসবে ? কৃষকরা সবাই যদি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় এবং তার দ্বারা তাদের জমির স্থায়ী উন্নতি ঘটাতে পারে, তবেই কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কিছু সার্থকতা থাকতে পারে। আর এই অবস্থা আনতে হ'লে যত-না মূল্যবৃদ্ধি প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন বর্তমান অসম বণ্টন-ব্যবস্থা দূর করা এবং টাকার ক্রয়ক্ষমতা স্থির রাখা (৮)। বাজার দরের ওঠানামার যে রীতি আজকের বাণিজ্যজগতে প্রচলিত ও গৃহীত, তারই মারফৎ কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা অন্য কোন দেশে এ যাবৎ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সাফল্য লাভ করেছে কি না সন্দেহ। সরকার ইতিমধ্যে "Price determining authority" নিয়োগের কথা ভাবছেন। অন্যান্য সমস্ত

(৬) The State of Food & Agriculture, 1962 ; FAO Production Year Book. 1961 ; FAO.

(৭) ভারতবর্ষের তিনটি কেন্দ্রের যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে অনুমান হয় যে, কৃষকরা যে-হারে ব্যয় করছেন তার থেকে বেশী হারে তাদের পণ্যের মূল্য পেয়েছেন (Production Year Book, 1961, page 373)। কিন্তু এই বিশাল দেশের মাত্র তিনটি কেন্দ্রের তথ্য থেকে যে সঠিক চিত্র নেওয়া যায় না, এ কথা রিপোর্টে বলা হয়েছে। বর্তমানে ধানের দামের অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু কৃষকরা,—বা অন্ততঃ তাদের কয়েকজন—যে সুবিধা পাচ্ছেন, তা বেশিদিন স্থায়ী হবে না, যদি না খালের জল পাবার দরুণ যে অতিরিক্ত উৎপাদন হচ্ছে, তার উপরও জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হয়, এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা হয়।

(৮) ১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসে অবিভক্ত ভারতে মোট নোট-এর পরিমাণ (notes in circulation) ছিল ১৭০.২৯ কোটি টাকার ; অক্টোবরে ১৯৯'৮২ কোটি। ১৯৫১-৫২তে এই অঙ্ক দাঁড়ায় ১১৪১'১১ কোটি টাকায়, আর ১৯৬১-৬২তে ২০৭০'৩০ কোটি টাকায় ; মোট অর্থ (Money Supply with the public) ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬১-৬২র মধ্যে ১৮৫০ কোটি থেকে ৩০৫০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।—কুড়ি বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৮%, মূল্যবৃদ্ধির সূচক-সংখ্যা ৪৩৭'৭৫%। গত দশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ২১'৫%, নোটের পরিমাণ বেড়েছে ৮১%, মোট অর্থ (money supply) বেড়েছে ৬৫%, জাতীয় আয় বেড়েছে ৪২% এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৬%; মূল্য-সূচক এই সময়ের মধ্যে উঠেছে ১০০ থেকে ১২৩% এ।

সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে সরকারী দপ্তরের ঘোষণার দ্বারা কৃষিপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের অনেক অসুবিধা সন্দেহ নেই, কিন্তু কালক্রমে আমাদের ঐ পথে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই সূত্রেই আরেকটি প্রশ্ন আসে; বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যের পারস্পরিক মূল্য সম্পর্কে কি রকম হবে। পাট ও ধানের চাহিদা ও মূল্যের তারতম্যে কি ভাবে একটির উৎপাদন অপরটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে, সে দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অজানা নয়। যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা গেছে একটি পণ্যের ন্যূনতম মূল্য (floor price) অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক দরে বেঁধে, জমির এলাকা সীমাবদ্ধ করার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকরা স্বল্প জমিতে অধিক পরিমাণ শস্য উৎপাদন ক'রে সরকারের নীতি ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে।

আমাদের দেশে এমন যেসব অঞ্চলে হালে খাল খনন করা হয়েছে সেখানে জমির দাম ও ধানের দামে এক প্রতিযোগিতা চলেছে। বেশি লাভের আশায় চাষীরা অনেক বেশি দামে জমি কিনেছে, আবার বেশি দামে জমি কেনার ফলেও ধানের দাম কমবার সম্ভাবনা ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে লোকসংখ্যার তুলনায় জমি কম, জমির উৎপাদিকা শক্তিও জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুততর হারে এগোতে পারছে না; এরই সঙ্গে জড়িত আছে খাদ্যশস্য ও industrial crops-এর প্রতিযোগিতার প্রশ্ন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রী কৃষকদের incentive দেবার যে পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন তার ফলে দেশে নূতন ক'রে মুদ্রাস্ফীতি বা টাকার মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা ঘটবে কি না, সে কথা বিবেচ্য।

—০—
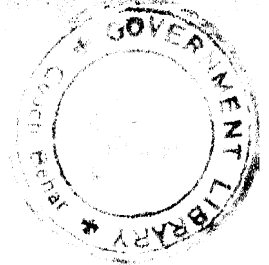
অন্য গ্রহে জীব ?

সম্প্রতি এই প্রশ্নটি বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বাইরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও কি প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব! প্রশ্নটি অবশ্য খুবই পুরাণো, অনাদিকাল থেকে এ সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা শোনা গেছে, কিন্তু নূতনভাবে তা আবার সামনের সারিতে আসীন হয়ে বিজ্ঞানীর ভাবনাকে জর্জরিত ক'রে তুলছে।

মাত্র কয়েকমাস আগে বিজ্ঞানের জগতে যে ঘটনাটি ঘটে, দুনিয়ার কোন খবর কাগজে তা ছাপা হয় নি। কিন্তু, হায়, সংবাদপত্রকে বৃথা দুষি কেন। প্রশ্নটির যেখানে শুরু তা ত কম ক'রে এক শ'বছর বিজ্ঞানীর সন্ধানী-দৃষ্টির আড়ালে অবহেলায় প'ড়ে ছিল। যাদুঘরে যে উল্কাপিণ্ডগুলি সাজান থাকে তাতেই রয়েছে এই গুরুতর প্রশ্ন। উল্কার দেহ হ'ল মূলতঃ ধাতব, পাথর জাতীয় কিছু উপাদানও তাতে থাকে। বিজ্ঞানীরা প্রায় নিশ্চিত, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে যে গ্রহানুপুঞ্জ রয়েছে তার খণ্ড ক্ষুদ্র উপাদানগুলিই অভিকর্ষের প্রবাহে পৃথিবীতে উল্কার আকারে জ্বলে যায়। কিন্তু পৃথিবীতে অন্ততঃ বিশটি যে বিশেষ উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে তার মধ্যে আবার জল কেন, কার্বোহাইড্রেট কেন। জলের আর এক নাম জীবন, আর কার্বোহাইড্রেট—? হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন এবং কখনো কখনো বা নাইট্রোজেন—এইমাত্র দিয়ে কার্বোহাইড্রেটর রাসায়নিক গঠন হ'লেও জীব দেহেই তার উৎস, এক কথায় তা জৈবিক পদার্থ। এমন জিনিষ উল্কাপিণ্ড কোন্ অজ্ঞাত দেশ থেকে বহন ক'রে আনল? প্রশ্নটি এই বিচারে মৌলিক।

অনেকে অবশ্য বলতে চাইলেন, উল্কাপিণ্ড ব'লে যাদের মনে করা হয়েছে তা আসলে পার্থিব উপাদান। দু শ' কি তিন শ'হাজার বছর আগে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে তারা দূরের আকাশে ছিট্‌কিয়ে পড়েছিল, বর্তমানে তা আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে এসেছে। অনেকে আবার এমন কথাও বললেন, ব্যাপারটা সাধারণসংশ্লেষণের (synthesis) ব্যাপার। যাদের বিশেষ জাতের উল্কাপিণ্ড ব'লে মনে করা হচ্ছে—তারা সাধারণ জিনিষ ছাড়া কিছুই নয়, তবে পৃথিবীতে আসার পথে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে তার পরমাণুগুলি শৃঙ্খলিত হয়ে ক্রমশ জটিল জৈবিকরূপ ধারণ করেছে। এজন্ত আবার প্রাণী-টানীর কল্পনা কেন?

মোট কথা, অপার্থিব জৈবিক উৎস স্বীকার করা যায় না। কিন্তু গত বছর নভেম্বরে অধ্যাপক ন্যাগী (NAGY) এবং ক্লাউস এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কার্বোহাইড্রেট নয়, পষ্ট পষ্ট উল্কাপিণ্ডের মধ্যে "এলগী" (ALGAE) জাতীয় খুব সূক্ষ্ম জীবদেহের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তাই ত, সত্যি ত, জীবের যেন সন্ধান মিলছে। না, কোন সন্দেহ নেই। তবে "ভেজাল" কি না কে তা জোর ক'রে বলতে পারে, বোধহয় পার্থিব জীবদেহের অংশই ঢুকে গিয়ে বিজ্ঞানকে প্রতারিত করতে চাইছে।

এভাবে নানা প্রশ্ন, নানা অনুমান মাথা তুলে উঠছে। পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণের উৎস রয়েছে, এ কল্পনা খুবই শক্ত। বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে সরাসরি কথা বলার সামর্থ্য তার নেই। অসীম অনন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আজও তা রহস্যময়। মানুষ খুব অল্পই তার জানতে পেরেছে। মাথার উপরে যে আকাশ, অজ্ঞানতার মোহজালে তা বিচিত্র, তারই ফাঁকে সূর্য এবং তারাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করে—নূতন উল্কাপিণ্ড সেই পর্দাটাই একটু দুলিয়ে দিয়েছে।

মেশিন কি চিন্তা করে?

যন্ত্র কি সত্যসত্যই চিন্তা করতে পারে? কয়েক বছর আগেও এ ছিল বিতর্কের চালু প্রসঙ্গ। আজও তা একেবারে পুরাণো হয়ে যায় নি। চিন্তার মানে যদি ধ'রে নেওয়া হয়, 'যা মেশিনে পারে না,' তা হ'লে অন্য কথা, না হ'লে যন্ত্রেরও চিন্তাশক্তি আছে—অনেকেই এ কথায় আজ সায় দিবেন। মানুষের তৈরী মেশিন মানুষের মতই চিন্তাশীল—এটা মানতে যাঁরা আহত বোধ করেন তাঁরা চিন্তার নূতন অর্থ নির্দেশ করেছেন। চিন্তা নাকি সৃষ্টিধর্মী, যুক্তির তুলনায় তা নাকি আবেগ-প্রধান। সুতরাং—মোক্ষম অস্ত্র—মেশিন কবিতা লিখতে পারে না, গানের মর্ম বোঝে না, সুরের জ্ঞান তার ভোঁতা। হায়, মেশিন যে কবিতাও লিখেছে, গানে সুর পর্যন্ত দিয়েছে। অবশ্য বানরেও কবিতা লিখেছে (কবিকুল মাপ করবেন), টাইপরাইটার যন্ত্রে আনাড়ি হাতে টাইপ করলেও এক সময় না এক সময় দু'লাইনে পদ্য বেরিয়ে আসবে। সুতরাং কবিতা-চর্চাই মেশিনের "বিত্তেবুদ্ধি"র পরিচয় নয়। অগ্নিপরীক্ষা হোক্ এখানে: যন্ত্র কি প্রেমে পড়তে পারে? ১৯৫০ সালে এ. এম. টুরিং এর উত্তর দিয়ে গেছেন। এক কথায় তা হ'ল "হাঁ"। যন্ত্রের তৈরী মানুষ-রোবটের আচার-ব্যবহার দেখে বুদ্ধিজীবী মানুষ হতভম্ব হবে, বোধহয় মেশিনের সাহায্যেই তখন তার আসল বিষয়টি বুঝে নেওয়া দরকার।

মেশিন চিন্তা করতে পারে, যদি মানুষের নিয়ন্ত্রিত পথেই তা চিন্তা করে। ইঞ্জিনের ক্ষমতা মানুষের ক্ষমতা ছাড়িয়ে, কিন্তু এই ক্ষমত মানুষের কাছেই সে পেয়েছে। চাষ ক'রে আলু ফলনের মত মাঠে ইঞ্জিন জন্মায় না। মেশিন মানুষকে অতিক্রম ক'রেও তা এভাবে মানুষের উপর নির্ভর ক'রে রয়েছে। মেশিনের চিন্তাও এভাবে মানুষের

শারীর-শক্তি-চালিত প্লেন—পাফিন
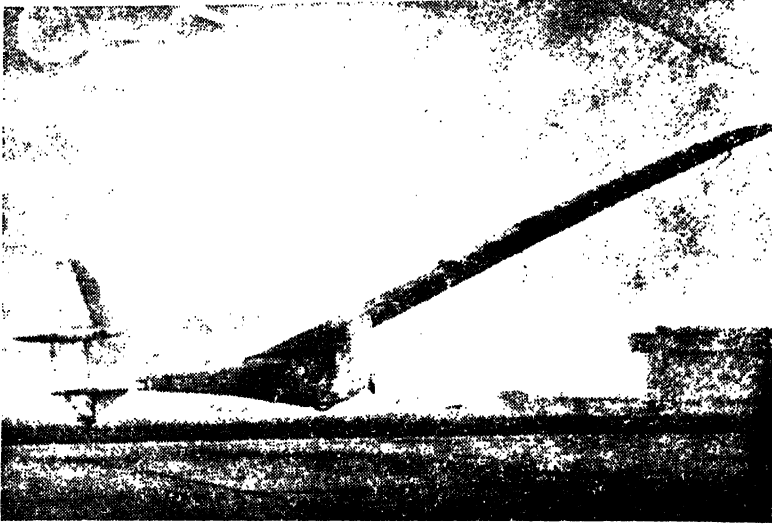
চিন্তারই কিছু প্রতিফলন। যন্ত্র বোধহয় গণনা করল, সময় লাগল মাত্র কয়েক মিনিট। এই গণনা মানুষের পক্ষে যদি একান্ত অসম্ভব না হয়, সময় লাগবে অন্ততঃ কয়েক মাস, তাও নির্ভুল হবে কি না সন্দেহ। যন্ত্র মানুষকে ছাপিয়ে উঠল। কিন্তু গণনা করার এই শক্তি সে মানুষের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছে। সাজান কয়েকটিমাত্র সমস্যার সমাধানে সে পারদর্শী হয়েছে, কিন্তু বিশেষ বিষয়টির বাইরে তা সামান্য জড়পিণ্ডের মতই অসাড় থাকে। চিন্তার জগতে তা শ্রমিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, মানুষেরই ইঙ্গিতে তার চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

উড়ুক্কু মানুষ

ওড়বার ইচ্ছা মানুষের অনেক দিনের। পাখীর মতন উড়বে এই ইচ্ছা। গল্প-কবিতার আখ্যানে তার এই অভিলাষ কিছু কিছু মিটেছে। কিন্তু এই মেটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান! পৃথিবীর বুকে শক্ত ক'রে দাঁড়াতে শিখে মানুষ যুগে যুগে আকাশে ওড়ার কত-না চেষ্টা করেছে। বেলুন ওড়ান থেকে এরোপ্লেন-রকেট—সেই একই পথের ইতিহাস। কিন্তু এই ওড়া আসলে যন্ত্রেরই উড়ে যাওয়া, মানুষ তাতে আশ্রয় নিচ্ছে এই মাত্র। অনেকটা যেন ঘোড়ার মত ছুটতে না পেরে ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলা। যন্ত্রের সাহায্যটুকু রইল, তবে গায়ের জোরকে কাজে লাগিয়ে উড়তে পারি তবেই বাহাদুরি। যে যুগে মানুষ মহাকাশ লঙ্ঘন করার স্বপ্ন দেখছে, আকাশযাত্রী অভিযাত্রী বার বার বহিঃপৃথিবীর সীমানা ছুঁয়ে আসছে, সে যুগেই তাই আপন শক্তিতে ভর ক'রে উড়ে যাওয়ার চেষ্টার বিরাম নেই! ইঞ্জিনের ক্ষমতার বদলে কেবলমাত্র মানুষের গায়ের জোরে চালান একটা উড়োযানের ছবি এখানে দেখান হ'ল। গত বছর মে মাসে এই বিশেষ যানটি আকাশপথে আধ মাইল মত উড়ে গিয়েছিল, গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৯ মাইল।

ফের্মি পুরস্কার

"এটম বোমার রাহুগ্রাস থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত অনেক কথাই হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এ-ধরণের আলাপ-আলোচনা আমি পছন্দ করি; কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা যেন মোহগ্রস্ত না হই। পরমাণু বোমা নিয়ে আমরা যা-ই করি না কেন, বোমা আবিষ্কারের আগে যে পৃথিবী তা কোনদিনই আর ফিরে আসবে না। কারণ, বোমা তৈরীর যা কৌশল তা আমরা বিসর্জন দিতে পারি না। এই বোমা রয়েছে এটম বোমা সম্বন্ধে আমাদের যা-কিছু করণীয় এই অশুভ উপস্থিতি মেনে নিয়েই আমাদের ঠিক করতে হবে।

"যুগ যুগ ধ'রে সুদীর্ঘ পরিক্রমায় বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে। কালে তা আরও এগিয়ে যাবে, পিছনে ফেরার পথ তার বন্ধ। যে-কোন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার মনোবল তাই তৈরী ক'রে নিতে হবে।"

যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি সম্বন্ধে যিনি এ ধরণের কথা বলেন, তিনিই হচ্ছেন জে. রবার্ট ওপেনহাইমার—নানা সংশয় ও তত্ত্বের ব্যুহজাল ভেদ ক'রে পরমাণু যাঁর হাতে "শত সূর্যের তেজ" নিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রয়োজন যাঁর প্রতিভাকে এই দানব-সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত করেছিল, সমস্ত মানব সভ্যতায় তার দুষ্ট প্রভাব সম্বন্ধে প্রথম থেকে তিনি সচেতন ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বোমার পরিকল্পনা থেকে তাই তিনি দূরে ছিলেন। দেশদ্রোহীর অপবাদ তাঁর কপালে জুটেছিল। কিন্তু তাঁর বিবেক-নিয়ন্ত্রিত মন এতটুকু টলে নি। এই মানব সভ্যতার কারণে কোন ত্যাগই যথেষ্ট নয়—এ কথা তিনি বার বার বলেছেন।

"আমরা এক অসাধারণ যুগে বাস করছি। একজন মানুষের আয়ুকালের সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই বড় বড় পরিবর্তনগুলি এসেছে। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন বিশ্ব-প্রকৃতি পর্যায়ে মানুষের

ধারণা ও জ্ঞান আশ্চর্য গতিতে প্রসারিত ও গভীর হচ্ছে ; মানুষের আশা ও প্রয়োজনের নিরীখে এই জ্ঞান কার্যকরী করার ব্যাপারে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—অতীতে যার তুলনা খুব অল্পই পাওয়া গেছে।"

- গার্হস্থ্য প্রয়োজন
- অফিস কাছারি
- কারখানা (৬৬০ ভোল্ট পর্যন্ত)
- কারখানা (৬৬০ — ৬৬০০ ভোল্ট)
- রাস্তার আলো
- ট্রামগাড়ী
- জল সরবরাহ
- অন্যান্য

সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যিনি এ ধরণের কথা বলতে পারেন তিনি যে মূলতঃ শান্তিকামী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরমাণু-বিজ্ঞানী এনারিকো ফের্মির নামে আমেরিকা সরকার যে বিশেষ শান্তি পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন এ বছর ডঃ ওপেনহাইমারের নাম সে-প্রসঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। ফের্মি শান্তি পুরস্কার পরমাণু বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য প্রতি বছর দেওয়া হয়ে থাকে। পুরস্কারের মূল্যমান, একটি সোনার পদক, নগদ পঞ্চাশহাজার ডলার এবং প্রশস্তি-পত্র। প্রথম ফের্মি পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী হলেন অধ্যাপক নীল্‌স্ বোর যিনি সম্প্রতি বিগত হয়েছেন।

শান্তির স্বপক্ষে কথা বলতে গিয়ে যিনি এককালে সরকারী মহলে ধিকৃত হয়েছিলেন তাঁর এই সম্মান লাভে শান্তির জয়ই সূচিত হচ্ছে।

কলিকাতায় বিদ্যুৎ

আবার সেই পুরাণো সংকট কলকাতায় বিদ্যুতের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দুর্ভিক্ষকথাটা এখানে পুরোপুরিই সত্য। তারের পথে যে বিদ্যুৎ আসে (আকাশপথে যে বিদ্যুৎ, তা ঝড় বিদ্যুৎ) বিহার. উত্তর প্রদেশ এবং উড়িষ্যার সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। কিন্তু কলকাতায় বিদ্যুতের যখন ঘাটতিদেখা দিল তখন এই পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ কাজে আসে নি। আসলে সারা দেশ জুড়ে যে বিদ্যুতের টানাটানি। বিরাট অঞ্চল ব্যাপী বৈদ্যুতিক পরিবহন ব্যবস্থার (Transmission) সুবিধা এই যে তা দিয়ে এক স্থানের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে আর এক জায়গার ঘাটতি পূরণ করা যায়। কিন্তু সর্বত্রই যখন ঘাটতি কে কার দিক্ সামলাবে। ফলে যা হবার তাই হ'ল। বিশেষ এক যন্ত্রের উৎপাদনী ক্ষমতা যখন ব্যাহত হ'ল, শিল্প উৎপাদনেও তার প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল। কল আর ঘোরে না, বাতি আর জ্বলে না— জলের সরবরাহ বন্ধ—কারণ পাম্পও অচল। বিদ্যুৎবিহীন সভ্যতা কাদায় গড়াগড়ির তই দুর্দশাগ্রস্ত।

আমাদের দেশে যাঁরা জাতীয় পরিকল্পনাগুলির কর্তা, তাঁরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে প্রথম থেকেই তেমন মনোযোগ দেন নি ; পরে সংশোধনের সুযোগ এসেছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতাকে তখনও কাজে লাগান হয় নি। বিদ্যুৎ-শিল্প দুনিয়ার প্রাণ-প্রবাহ। আমাদের এই সভ্যতা তার বহু-বিচিত্র সম্ভার উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে যদি একটা অতিকায় যানবাহন হিসাবে কল্পনা করা যায় তবে তা বহন ক'রে চলছে মানুষের আয়ত্তাধীন নানা প্রাকৃতিক শক্তি—বিশেষ বিদ্যুৎশক্তি। বিদ্যুৎকে অবহেলা ক'রে জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা গড়া তাই ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া না জুড়ে চালাতে যাওয়ার সামিল।

কলকাতা ভারতের একটা প্রধান শিল্পকেন্দ্রিক অঞ্চল। এমনএকটা জায়গায় বিদ্যুতের দুর্ভিক্ষ পরিকল্পনার রচয়িতাদের বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দেয় না। বৃহত্তর কলকাতায় প্রায় পাঁচ শ বর্গমাইল আয়তন জায়গায় আজকাল বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় পাঁচ লক্ষ কিলোওয়াট—এই চাহিদা প্রতিদিনই বৃদ্ধির মুখে। কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তার

ডক্টর ওপেনহাইমার

প্রায় পঁচাশী শতাধিক (বা শতাংশ) জোগান দিয়ে থাকে। বাকিটা রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্তব্য। মোটামুটি এই ব্যবস্থা চলছিল। ডি-ভি-সি হিরাকুদ, রিহান্ত-এর সংযোগিতায় ঘরে বাতি জ্বলছিল, কারখানার কল ঘুরছিল। কিন্তু সংকট-মুহূর্তে কাজে লাগানর জন্য উদ্বৃত্ত সংস্থান রাখা হ'ল না। জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ-সঙ্কোচ নিয়েই এভাবে মূলে ঘা পড়ল, অদূরদর্শী অর্থনীতি, অর্থনীতির গোড়াতেই আঘাত হানল। অভিজ্ঞতা তা যদি শুধরে দেয় তবেই শেষ সান্ত্বনা।

এ. কে. ডি.

সেলোয়ে (Sailway)

হল্যাণ্ডের উপকূল থেকে হালিগ্ দ্বীপটির দূরত্ব সাড়ে চার মাইল। মাঝখানকার সমুদ্র বাঁধ দিয়ে বেঁধে ১৯৩৮ সালে যে রেলপথটি তৈরী করা হয় তাকে রেলোয়ে না ব'লে বলা হয় সেলোয়ে (Sailway), অর্থাৎ কি না রেলপথ নয়, পাল-পথ। তার কারণ, একটি মাত্র ওয়াগন এই রেলপথ দিয়ে চলাচল করে, কিন্তু তাকে টেনে নিয়ে চলবার জন্যে ইঞ্জিন নেই। বাতাস অনুকূল থাকলে পাল খাটিয়ে একে চালানো হয় হাওয়ার জোরে, আর বাতাস প্রতিকূলে বইলে একে চালাতে হয় গায়ের জোরে। কিন্তু সাড়ে চার মাইল পথ একে ঠেলে নিয়ে যাবার বা আসবার যে শারীরিক কষ্ট, হালিগ্ দ্বীপের অধিবাসীরা সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না। এরকমটি পৃথিবীর আর কোথাও নেই ভেবে তারা অত্যন্ত গর্ব অনুভব ক'রে থাকে।
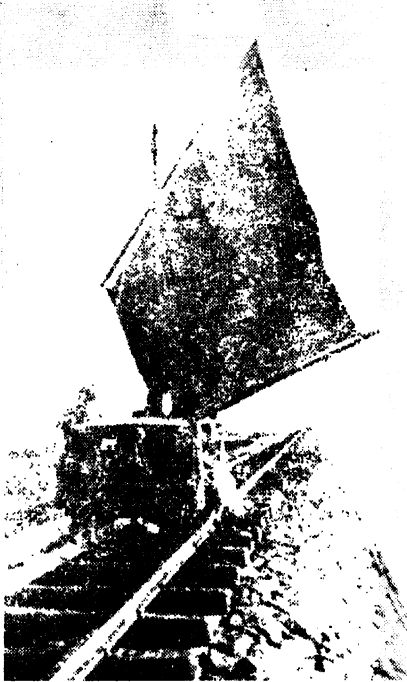
পালের রেলগাড়ী

অভিনব বাইসিকেল

বাইসিকেল জিনিষটার চেহারা-চরিত্র গত সত্তর বৎসরের মধ্যে বিশেষ কিছু বদলায় নি। অবশ্য মানুষের প্রগতির ইতিহাসে এটা বিশেষ একটা লক্ষ্য করবার মত ব্যাপার নয়, কারণ বিগত পাঁচহাজার বৎসরে আমাদের দেশের গরুর গাড়ীগুলোরও চেহারা-চরিত্র বিশেষ কিছু বদলায় নি।

খুব সম্প্রতি ব্রিটেনের সাইকেল কারখানার মালিকরা একটি নূতন ডিজাইনের বাইসিকেল তৈরি করতে সুরু করেছেন। ষোল ইঞ্চি ব্যাসের চাকা, গোলালো নলের অত্যন্ত মজবুত কাঠামো, মালপত্র রাখবার প্রচুর জায়গা এবং ইচ্ছামত বাড়ানো যায় এমনতর বসবার গদি, যাতে একটা গোটা পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হয়, এইগুলো হচ্ছে এ অভিনব বাইসিকেলের বিশেষত্ব।
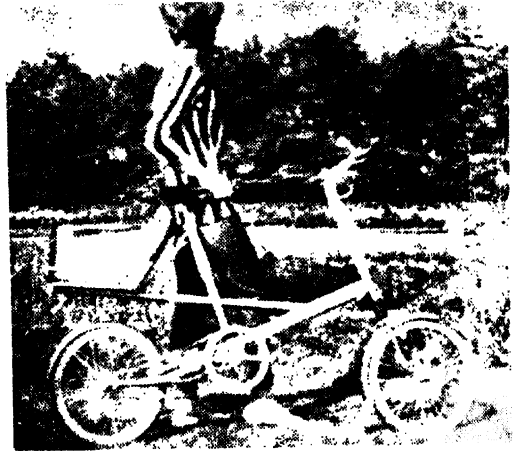
নব-পর্য্যায়ের বাইসিকেল

ছোট ছোট চাকা, যার ফলে ভারকেন্দ্র অনেক নীচে নেমে আসে। একটি চাকার প্রান্ত থেকে অন্য চাকার প্রান্তের অধিকতর দূরত্ব, যার ফলে স্থিতিস্থাপকতা অনেক বৃদ্ধি পায়, অনেক বেশী হাওয়া ভরা যায় ব'লে টায়ার ছুটো প্রায় পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়, কিন্তু তার ফলে সাইকেল যাতে বেশী না লাফায় সেজন্যে রবারের স্প্রিং-এর ব্যবস্থা এইসব নিয়ে সাইকেলটি বাস্তবিকই অভিনব।

বেলুন-দূরবীণ

গত মার্চ মাসে এই জিনিষটি নিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়েছে। বেলুনটি ৯০ ফুট উঁচু; তার নীচে লম্বায় ৩৪০ ফুট সসেজের আকৃতির এক প্লাষ্টিকের আধার: সঙ্গে ছুটি প্যারাশুট ও একটি তিন টন ওজনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র। সবগুলিকে হিসেবে ধরলে উঁচুতে একটি ৬৬ তলা বাড়ীর সমান হয়।

এই বিরাট্ ব্যাপারটি ৮০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে ভূ-পৃষ্ঠের বিজ্ঞানীদের নির্দেশক্রমে মঙ্গলগ্রহের দিকে ভাল ক'রে দৃষ্টিপাত করবে। সমস্ত ব্যাপারটির নাম দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় ষ্ট্র্যাটোস্কোপ (Stratoscope II)। ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশ পর্য্যবেক্ষণের প্রধান যে বাধা, বিক্ষুব্ধ এবং ধূলি-

পরিবৃত বাতাবরণ. এই বেলুন-দূরবীন তার শতকরা ৯৬ ভাগ থেকে মুক্ত হতে পারবে। বিজ্ঞানীরা তাই আশা করছেন যে, এর সহায়তায় বহু-বিতর্কিত মঙ্গলগ্রহের খাল, শুক্রগ্রহের মেঘাস্তরণ, বৃহস্পতির দেহে রক্তবর্ণ চিহ্ন, ও বুধগ্রহের গুহাগুলি সম্বন্ধে আমরা হয়ত কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করতে পারব।

দ্বিতীয় ষ্ট্র্যাটোস্কোপ হয়ত আমাদের বলতে পারবে :

১। শুক্রগ্রহ প্রায় সর্বক্ষণই একটি মেঘাস্তরণে ঢাকা থাকে; এই মেঘাস্তরণ কিসের তৈরী? জল-বিন্দুর, না বরফের কুচির, না ধুলোর?

২। বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির দেহ সম্পূর্ণ বায়বীয় কি না। ৩০,০০০ মাইল দীর্ঘ যে রক্তবর্ণ একটি চিহ্ন তার দেহের উপরিভাগে সঞ্চরণ ক'রে বেড়ায়, আসলে সেটা কি বস্তু।

৩। শনিগ্রহের বলয় সম্ভবতঃ কোটি কোটি কোটি ক্ষুদ্রাকার বস্তুপিণ্ডের তৈরী। এই বস্তুপিণ্ডগুলির পারস্পরিক দূরত্ব কতটা আর এরা আকারেই বা কতটা বড়।

৪। কোন কোন নক্ষত্রের সঙ্গী যে নক্ষত্রগুলিকে নির্বাপিত ব'লে ধরা হয়, তারা সত্যিই নির্বাপিত কি না।

৫। ওরায়নের নীহারিকার মত আরও কোটি কোটি নীহারিকার সঙ্গে আমাদের নক্ষত্রজগৎ ছায়াপথের সাদৃশ্য আশ্চর্য রকম বেশী। এই কোটি কোটি বিভিন্ন ছায়াপথের মধ্যে কোথাও না কোথাও হয়ত নূতন নূতন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে। দ্বিতীয় ষ্ট্র্যাটো হয়ত এদিককার খবরও কিছু কিছু আমাদের দিতে পারবে।

৬। সবচেয়ে বড় কথা, হয়ত কোন কোন নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

একটা কথা আছে যে, শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদরা মৃত্যুর পর চন্দ্রমণ্ডলে গিয়ে অবস্থান করেন, কারণ, সেখান থেকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সুবিধা অনেক বেশী। দ্বিতীয় ষ্ট্র্যাটোস্কোপ হয়ত এই আশ্বাস তাঁদের দিতে পারবে যে, উক্ত উদ্দেশে পৃথিবীমণ্ডল ছেড়ে যাবার প্রয়োজন তাঁদের হবে না।

ডানাওয়ালা নৌকো

বরফের ওপরে ছোটাছুটির খেলায় দুপায়ে যে লম্বা ও চাপ্টা স্কি পরে খেলোয়াড়েরা, সেই ধরণের স্কি নীচে লাগিয়ে আর এরোপ্লেনের ডানার মত দু'টি ডানা দু'দিকে জুড়ে দেখা গেছে, মোটর বোটের গতিবেগ অন্ততঃ দেড়গুণ দ্রুততর হয়। ডানার নীচে বাতাসের যে কুশন তৈরী হয়, তার ফলে জলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ও ঢেউয়ের বাধা অনেক ক'মে যায়।

জিনিষটি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁদের মনে আশা আছে যে, কালক্রমে এই পথটি ধ'রে বড় বড় মালবাহী জাহাজগুলি সমুদ্রের খুব কাছ ঘেঁষে ২০০ মাইল বেগে চলতে পারবে। বর্ত্তমান কালের কোন জাহাজের গতিবেগ এর কাছাকাছিও কিছু নয়। তাছাড়া বড় এরোপ্লেন চালানোর খরচের তুলনায় এ ধরণের জাহাজ চালানোর খরচও হবে অনেক কম।

আমরা আরও একটা কথা ভাবছি। হয়ত ঊর্দ্ধাকাশচারী এরোপ্লেনের চাইতে এই জাতীয় জাহাজে চলাচল অনেক বেশী নিরাপদও হবে।

দুতলা বুদ্বুদ বাস্

প্যারিসের অন্যান্য অনেক দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে এটিকেও আপনি আপনার তালিকাভুক্ত ক'রে নিতে পারেন। এর উপর থেকে নীচে

দুতলা বুদ্বুদ-বাস্

পর্য্যন্ত বুদ্বুদের আকারের প্রায় সমস্ত দেহটা জুড়েই কাঁচের জানালা ব'লে একে বুদ্বুদ বাস্ বলা হয়। আরোহীদের দৃষ্টি ব্যাহত হয় এমন কিছুই প্রায় কোথাও নেই। এমন কি এর ছাদও এমন কয়েকটা ভাগে ভাগে তৈরি যেগুলিকে ইচ্ছে করলে টেনে সরিয়ে দেওয়া যায়, আর সরিয়ে দিয়ে আরোহীরা ফাঁকগুলো দিয়ে মাথা গলিয়ে চারদিক্‌টাকে দেখতে পারেন। তাঁদের দৃষ্টির পথে তখন কাঁচের বাধাও আর থাকে না।

স. চ.

ডানা-ওয়ালা নৌকো

মাভৈঃ আমেরিকা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ওরা নিগ্রো। ওদের চেহারায় নেই আভিজাত্যের ছাপ, ধমনীতে
নেই আর্য্যের রক্ত, ঐতিহ্যে নেই সংস্কৃতির গরিমা,
ওরা অপাংক্তেয়, তবু খানা খাবে আমাদের সঙ্গে একই টেবিলে,
একই হোটেলে,
ওদের আলকাতরা কালো ছেলেগুলো আমাদের তুষারশুভ্র
আর্য্যকন্যাদের সঙ্গে একই বিদ্যা-মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভোজন
করবে জ্ঞানের পরমান্ন,
গায়ে গা ঠেকিয়ে চলতে চায় একই বাসে,
ওদের স্পর্দ্ধার কোন পরিসীমা নেই।

আমাদের সুশিক্ষিত সারমেয়-বাহিনীর তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড়ে
ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেব ওদের দেহ,
কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে দিয়ে ওদের প্রগল্‌ভ মিছিলগুলিকে
পর্য্যবসিত করব ছত্রভঙ্গ মেষপালে,
পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ওদের বামন হ'য়ে চাঁদ ধরার
স্বপ্নকে পরিণত করব আফিমখোরের দিবাস্বপ্নে,
দুর্জ্জয় আমরা শক্তির প্রাচুর্য্যে, নীল আমাদের ধমনীর রক্ত,
আমরা জানি কেমন ক'রে শায়েস্তা করতে হয়
ঐ উদ্ধত নিগ্রোদের।

এ্যালাবামার কণ্ঠে এই বর্ব্বরের কর্কশভাষা কি আমেরিকার?
আমেরিকা, তুমি আমাদের কাছে এব্রাহাম লিঙ্কনের জন্মভূমি,
তুমি পৃথিবীকে দান করেছ এমার্সন আর থোরোকে,
যুগের কবি ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্‌ম্যান্‌কে,
তোমার জেটিস্‌বার্গের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে লিঙ্কনের সেই
কালজয়ী ভাষণ,
সেই অবিস্মরণীয় ভাষণের মধ্যে প্রাচ্যের মুগ্ধশ্রবণ শুনেছে
গণতন্ত্রের জয়-ডঙ্কা, কালপুরুষের পদধ্বনি,
তোমার চারণকবি হুইট্‌ম্যানের পাঞ্চজন্যে ধ্বনিত
হয়েছে যুগ-সারথীর সংগ্রামের আহ্বান,

সাম্যের আর স্বাধীনতার সেই রোমাঞ্চকর স্তবগান শুনে
কম্পিত হয়েছে স্বৈরাচারী, উল্লসিত হয়েছে পৃথিবীর উৎপীড়িতেরা।
আমেরিকা, তুমি জন্ম দিয়েছ সেই কবিকে যিনি সমষ্টিজীবনের
একটা আদর্শকে মর্মের গভীরতম অনুভূতির যাদু দিয়ে রূপান্তরিত
করলেন এক প্রাণময় মহাসঙ্গীতে,
আর তোমার সেই আরণ্যক থোরো, ওয়াল্‌ডেনের সেই অনাসক্ত
সন্ন্যাসী, যাঁর শুচিশুভ্র বলিষ্ঠ বাণী ভগবদ্গীতারই প্রতিধ্বনি,
উদ্ধত রাজশক্তির অন্যায়কে অবজ্ঞা করবার নৈতিক অধিকারের
অকুণ্ঠ স্বীকৃতি যাঁর নির্ভীক লেখনী-মুখে,
যাঁর চিন্তার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেশ-কালের সীমারেখা পেরিয়ে
কখন্ উড়ে এসে পড়ল ভারতের গান্ধীর মনে, তাঁর
ভাবের জগতে ঘটাল যুগান্তকারী বিপর্য্যয়,
আর তোমার ঋষিপ্রতিম এমার্সন, যাঁর লেখায় নীলাভ দিগন্তের
হাতছানি, সপ্তর্ষির নিঃশব্দ আহ্বান, তপোবনের বাণীর
অমৃত,
আমরা তোমাকেও কি ভুলতে পারি ?

মহান্ ঐক্যমন্ত্রের উদ্গাতা এই বাঙ্ময় আমেরিকাই চিরকালের,
আর ঐ লিট্‌ল্ রকের আর বার্মিংহামের ভেদবুদ্ধিতে কলুষিত
আমেরিকা—ও ত ক্ষণকালের একটা দুঃস্বপ্ন !
গাছের ভালোমন্দের শেষ পরিচয় কি কীটে-খাওয়া ফলগুলিতে ?
একটিমাত্র সুস্বাদু নিটোল ফল তার রসে গন্ধে বর্ণে বহন করে
গাছের কৌলীন্যের স্বাক্ষর।

আমেরিকা, একদা তোমার ডলার-পাগল বণিকের দল
হানা দিত আফ্রিকার অরণ্যের গভীরে,
ধ'রে আন্‌ত বনের সিংহ, জেব্রা, জিরাফকে,
আর ধ'রে আনত সিংহ-জেব্রা-জিরাফের মতোই স্বচ্ছন্দবিহারী
বনচারী মানুষগুলিকেও,
পিতামাতার বাহুবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন নিগ্রো ছেলে-মেয়েরা
তোমার হাটে হাটে বিক্রীত হ'ত গবাদি পশুর মতোই,
মিসিসিপির তীরে তীরে রক্ত আর ঘর্ম্ম দিয়ে তারা তৈরী করত
রাশি রাশি কার্পাস,
সেই রক্তে আর ঘর্ম্মে গড়ে উঠত শ্বেতাঙ্গদের পর্ব্বতপ্রমাণ ঐশ্বর্য্য।

কখন্ তোমার মনের মধ্যে উঁকি দিল এক মহাজিজ্ঞাসা,
'প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসো'—খ্রীষ্টের এই বাণীর সঙ্গে
মানুষকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার মিল কোথায়?
প্রেমের দুর্ব্বার প্রেরণা থেকে এল অন্তর্বিপ্লবের বন্যা,
নিগ্রোদের কল্যাণকে কেন্দ্র ক'রে বইতে লাগল প্রলয়ের ঝড়,
কত সুখময় নীড় ভেঙে গেল সেই ঝড়ের ঝাপটায়, কত মাতা
হ'ল পুত্রহীনা, কত স্ত্রী হারাল স্বামীকে,
সাদাদের সেই রক্তধারায় মুছে গেল নিগ্রোদের ললাটের
দাসত্বের চিহ্ন,
গৃহ-যুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর সেই দাবানলে ভেদবুদ্ধির মহাপাপের আবর্জ্জনা
গেল ভস্মীভূত হয়ে!

আমেরিকা, ভেদবুদ্ধির সর্ব্বনেশে বীজাণু আবার তোমার
নৈতিক জীবনকে করেছে আক্রমণ।
এই ত বিশ্বের অলঙ্ঘ্য নিয়ম, জীবননাট্যে সংগ্রামের পর সংগ্রামের
অন্ত আছে কোথাও? ভীষ্মপর্ব্বে যবনিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে
সুরু হয়ে যায় কর্ণপর্ব্ব।
মাভৈঃ আমেরিকা, বিঘ্ন যদি এসেই থাকে তোমার নৈতিক জীবনের
এই যুগসন্ধিক্ষণে, সে বিঘ্ন তোমার বিকাশের পথকে
প্রশস্ত করবে, বিঘ্নিত পথেই ত প্রাণের জয়যাত্রা।
ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর দানবটাকে আবার তুমি করবে ধরাশায়ী,
তোমার রাষ্ট্রনেতার কণ্ঠে শুনেছি গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি,
তোমার চারণকবির রুদ্রবীণায় শুনেছি সাম্যের আবাহনগীতি।
যার ঐতিহ্য জ্যোতির্ম্ময়, তার ভবিষ্যৎকে কে রুখবে?

—০—

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

শ্রীজীবনময় রায়

জীবনে কত মানুষের সঙ্গে ত পরিচয় ঘটিয়াছে, কত মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে, কত লোকের সঙ্গে আত্মীয়তাও জন্মিয়াছে ; কিন্তু সামান্য পরিচয়, সামান্য টুকরা টুকরা সঙ্গলাভ, ছোটখাটো দেখাশোনা, গল্প-গানের মধ্য দিয়া কোন মানুষ যে মনের উপর চিরস্থায়ী মধুময় এমন একটি অমৃতের আস্বাদ রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাই।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন এমনি একটি মধুর চরিত্রের মানুষ। নিরহঙ্কারতা-প্রসূত স্বাভাবিক বিনয়ে তাঁহার ব্যবহার সকলের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্ণ সহানুভূতিতে মেদুর ও মধুময়। সামান্যতম মানুষের প্রতিও কখনও মমতাশূন্য উদাসীনতা তাঁহার দেখি নাই।

পুত্র-কন্যাগণের সহিত তাঁহার সুগভীর স্নেহবন্ধন এবং নির্ভরপূর্ণ সুনিবিড় সখ্য সে-যুগের অভিভাবকদিগের প্রচলিত সংস্কার হইতে এমনি একটি ব্যতিক্রম ছিল যে, তাঁহাকে তখনকার কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

সাধু রামতনু লাহিড়ী সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "কস্তুরী যেমন যে ঘরে থাকে সেই ঘরকে আমোদিত করে, তেমনি তিনি যে দলে মিশিতেন, যে ঘরে যেয়া বসিতেন, সেখানে এক প্রকার অনির্দেশ্য অথচ জনমনের পবিত্রতাবিধায়ক বায়ু প্রবাহিত হইত।"

উপেন্দ্রকিশোরকে স্মরণে আনিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার চরিত্র ও আচরণের এই সৌরভের কথা মনে আসে। মধুর সুবাসের আকর্ষণে মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়, উপেন্দ্রকিশোরের চরিত্রের মাধুর্যে তেমনি করিয়া মানুষ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। বস্তুত, এক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্যতীত, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত মানুষকে আর কেহই, অকৃত্রিম মাধুর্যের আকর্ষণে, এমন করিয়া আকৃষ্ট করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। অনন্যব্যক্তিত্বসম্পন্ন সরসমধুর-চরিত্র শিবনাথও বুঝি বালখিল্যদিগকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিতে পারিতেন না।

সুতরাং শিশুদের ত কথাই নাই। তাহাদিগের সান্নিধ্যে আসিলেই তাঁহার হৃদয়ের রহস্যনিকেতনের দুয়ারটি আপনিই খুলিয়া যাইত এবং সম্মোহিত শিশুকুল তাঁহার অন্তরের কৌতুকহাস্যরস-মুখরিত রহস্যনিকেতনের অঙ্গনে গিয়া প্রবেশ করিত। তাঁহার দীর্ঘায়ত দেহ ও বিপুল শ্মশ্রুর ছদ্মবেশ তাহাদের বিভ্রান্তি জন্মাইতে পারিত না। ক্রীড়াসঙ্গীটিকে চিনিয়া লইতে তাহাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইত না।

শিশুদিগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং 'সখা'-সম্পাদক প্রমদাচরণের সহিত পরিচয় ও বন্ধুত্ব-যুক্ত হইয়া এবং আদৌ তাঁহার প্রভাবে পাঠ্যাবস্থাতেই উপেন্দ্রকিশোরের অন্তর্নিহিত শিশুসাহিত্য-প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং অচিরেই তিনি একজন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক রূপে গণ্য হইলেন। তাঁহার অন্তরে যে নিত্যকালের শিশুটি একটি স্বর্গীয় সৌরভের মিষ্টতা লইয়া বিরাজ করিত, শিশুদিগের সঙ্গ ও সেবা ব্যতীত সে বাঁচিবে কি করিয়া?

সেকালের কথা, ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, টুনটুনির বই, ছোট্ট রামায়ণ এবং অবশেষে শুধু শিশু নয়—সর্বজনমনহারী সচিত্র, আদর্শ মাসিক পত্র—"সন্দেশ" প্রকাশিত হইয়া বাংলা দেশে, তথা বাংলা-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিল। উপেন্দ্রকিশোর তাঁহার সেই চিরন্তন শিশু-হৃদয়ের অমৃতবার্তা বহন করিয়া যখন শিশু-জগতের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন এক লহমায় যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল ; "সন্দেশ" বালকবীরের বেশে শিশু-জগতের দ্বারে আসিয়া তাহার বিজয়-শঙ্খটি বাজাইতেই এক মুহূর্তে বাংলার শিশু-চিত্তকে জয় করিয়া লইল। উপেন্দ্রকিশোরের "সন্দেশ" সে-যুগের সাহিত্য-জগতের একটি বিস্ময়। "সন্দেশে"র পূর্বে বা পরে বালকদিগের জন্য এমন সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্র আর প্রকাশিত হয় নাই।

কী আশ্চর্য সরল, মধুর, মন-ভুলানো ভাষায় তিনি লিখিতেন। তাঁহার ছোট্ট রামায়ণের কবিতাগুলি কি মিষ্ট, কি মধুক্ষরা। পড়িলে কেহ মুগ্ধ না হইয়া পারে না।

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
ছায়া তার মধুময় বায়ু বয় ধীরে।
সুখে পাখী গান গায় ফোটে কত ফুল,
কি বা জল নিরমল চলে কুলকুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।

রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড় সুন্দর কথা শুন মন দিয়া।

কোথা হইতে তাঁহার লেখনীতে এই মধুর রসের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল?

কিশোরদিগের জন্য সঙ্কলিত তাঁহার ছেলেদের রামায়ণ ও ছেলেদের মহাভারতের তুল্য উৎকৃষ্ট 'আবার-বলা-গল্প-গ্রন্থ' (Stories re-told) শিশুসাহিত্যে, আমার ধারণায় ও বিশ্বাসে, আজও বাংলা ভাষায় আর একটি রচিত হয় নাই। বিরাট্ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ও অষ্টাদশপর্ব মহাভারত হইতে বালপ্রীতিরসসম্ভূত এক আশ্চর্য অধ্যবসায়ের সহিত, বালচিত্তহারী ও শিক্ষণীয় গল্পাংশগুলি বাছিয়া লইয়া, অথচ সেই মহাগ্রন্থদ্বয়কে কিছুমাত্র বিকৃত না করিয়া, এই অনবদ্য গ্রন্থ দুইখানি তিনি সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন,—ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, আরও অবাক্ হই এই লক্ষ্য করিয়া যে, তাঁহার লেখার মধ্যে কোথাও কোন অনবধানতা দেখিতে পাই না। কোথাও বিকৃত বানান বা অবিশুদ্ধ ভাষা বা হেলাফেলা করিয়া প্রমাদপূর্ণ তথ্য পরিবেষণের ত্বরা নাই। শিশুর প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ও দায়িত্বপূর্ণ প্রেম তাঁহার সমস্ত বই এবং মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশে'র একটি গৌরবময় বিশেষত্ব। তাঁহার প্রাণ যে কত মহান্ ছিল, শিশুদিগের প্রতি এই শ্রদ্ধাপূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানের দ্বারাই তাহা সূচিত হয়।

মাঘোৎসবের বালকবালিকা সম্মেলনে, নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসবে, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উদ্যোগপর্বে, সর্বক্ষেত্রে আমাদের শিশুচিত্ত "লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি", সেই বয়স্ক শিশুটির 'অবতীর্ণ' হইবার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। তিনি আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলে তবেই আমাদের সেই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার অবসান হইত এবং একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া আমরা নড়িয়া-চড়িয়া বসিতাম। এই সব কথার সাক্ষ্য দিবার জন্য এখনও কেহ কেহ জীবিত আছেন।

উপেন্দ্রকিশোরের মত বহুমুখী প্রতিভাশালী মানুষ আমার চক্ষে আর পড়ে নাই। এই প্রতিভা কেবল প্রবণতামাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই। যে-কোনও বিষয়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহারই মধ্যে গভীরভাবে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া তাহাতে বিশেষ একটি নূতন রং ধরাইয়াছেন অর্থাৎ তাহাকে নবতর এবং উন্নততর রূপদান করিয়াছেন। হাফটোনের নবপদ্ধতি উদ্ভাবন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কি সঙ্গীতবিদ্যায়, কি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের সাধনায়, কি চিত্রবিদ্যায়, কি বহুবিধ বিজ্ঞান চর্চায়, কি মুদ্রণ বিদ্যায়, কি অধুনা সুপরিচিত হাফটোন ব্লক নির্মাণ-কৌশলের নবপদ্ধতি উদ্ভাবনে; অথবা শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির রূপায়ণে—প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার গভীর জ্ঞানপিপাসা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অদম্য কৌতূহল ও বীর্যবতী মনীষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন এবং নবতর সৃষ্টির দ্বারা তাহাকে উন্নততর করিয়া তুলিয়াছেন। কোনরূপ বিপর্যয়ে, যথা—অর্থহীনতা, সহায়হীনতা, এমন কি তদানীন্তনকালের রাজশক্তির বিরুদ্ধতা প্রভৃতি কোন বাধাই তাঁহার অটল স্থৈর্যকে বিচলিত ও অকুতোভয় বীর্যকে অবনত করিতে পারে নাই। বস্তুত, তাঁহার স্বভাবের একটা আশ্চর্য গুণ এই ছিল যে, সকল বাধা, বিপত্তি, বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নির্বাচিত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করিয়া তিনি নিরস্ত হইতেন না। বৈজ্ঞানিকসুলভ মন লইয়া তিনি প্রতিটি বিষয়ের গভীরে যাইয়া প্রবেশ করিতেন। তাঁহার জীবনে পল্লবগ্রাহিতার কোন স্থান ছিল না।

তাঁহার কথা লিখিতে গিয়া প্রবাসী-সম্পাদক মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"উপেন্দ্রবাবু পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রত্নজীব-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিজ্ঞান জানিতেন। অনেক বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। এগুলি পল্লবগ্রাহীর মত এক-আধটা বিলাতী সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ দেখিয়া লেখা নয়—বিশেষজ্ঞের মত লেখা।" আবার লিখিয়াছেন, "হাফটোন খোদাই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন এবং যে-সব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাহা ইউরোপ-আমেরিকায় নূতন ও মূল্যবান্ বলিয়া আদৃত হইয়াছে।" বহু পাশ্চাত্ত্য-বিশেষজ্ঞ কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই দান ও এ-বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ দিবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই।

প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যা সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, "কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং দক্ষতার সহিত উহা শিখাইতে পারিতেন। সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি যে স্বরলিপি ব্যবহার করিতেন তাহা শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝিতে পারিত। হারমোনিয়ম শিখাইবার জন্য তিনি একখানি বহি লিখিয়াছিলেন। উহার বেশ কাটতি ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল যে, হারমোনিয়মের দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের

বড় অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এইজন্য তিনি ঐ বইর প্রকাশকের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আর নূতন সংস্করণ ছাপিতে দেন নাই।" 'মৃদুনি কুসুমাদপি' স্বভাবের অন্তরালে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' চরিত্রের এই দৃঢ়তা উপেন্দ্রকিশোরকে মনুষ্যত্বের এক মহিমাময়রূপ দান করিয়াছিল। কোন প্রলোভন বা প্ররোচনায় তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সেই বাণী—"যে যায় যাক, যে থাকে থাক, শুনে চলি তোমারি ডাক" বারংবার উপেন্দ্রকিশোরের জীবনে পরীক্ষিত সত্যরূপে তাঁহার জীবনকে ভাস্বর ও মহিমান্বিত করিয়াছে।।

তাঁহাকে স্মরণ করিতে যাইয়া আজ ক্ষণে ক্ষণে শিশুকালে দেখা তাঁহার গল্প বলার অভিনয়রঞ্জিত অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গি এবং কৌতুকহাস্যে উদ্ভাসিত আস্যখানি মনে পড়িতেছে।

আমাদের সম্মুখে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ওপারে ঐ যে প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকা আজও অতীতের এক রহস্যঘন ইতিহাস বক্ষে গোপন করিয়া বাতায়ন দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঐ ১৩ নম্বরের বাড়ীতে একদা বালহাস্য কলমুখরিত ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপেন্দ্রকিশোর এই দুইটি নবীন প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীতমুকুলে প্রকাশিত গীতাভিনয়গুলির (যাহার অনেকগুলিই তাঁহারই রচিত) —গীত এবং অভিনয় এই দুইয়ের শিক্ষাতেই তাঁহার প্রভূত স্পর্শ থাকিত।

মনে পড়িতেছে সিনেম্যাটোগ্রাফ তখনও কলিকাতায় চালু হয় নাই। ১৩ নম্বরের ঠাকুরদালানে একটা পর্দা খাটাইয়া উপেন্দ্রকিশোর ও কুলদারঞ্জন দুই ভাই পর্দার আড়াল হইতে নানা অঙ্গভঙ্গিসহকারে অভিনয় করিয়া আমাদের অবাক করিয়া দিয়াছিলেন ও খুব হাসাইয়াছিলেন।

আর একদিন—মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে—শরীর তখন তাঁহার খুবই ভগ্ন, গিরিডিতে স্বনামধন্য এইচ. বোসের বাড়ীতে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ধনঞ্জয় বৈরাগী সাজাইয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকখানি অভিনয় করিয়াছিলাম। ঐ অসুস্থ দেহ লইয়া তিনি নিত্য-নিয়মিত আমাদের রিহার্সালে আসিতেন এবং অভিনয়-ঘটিত সাজসজ্জা, স্টেজ প্রস্তুত ও প্রায় সর্ববিষয়েই উপদেশ দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অভিনয়ের দিন ঐ দুর্বল দেহ লইয়া দুই ঘণ্টার উপর খাড়া দাঁড়াইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বেহালা বাজাইয়াছিলেন। আমরা পাছে অভিনয় করিতে যাইয়া লোকসম্মুখে অপদস্থ হই, সেইজন্য অত্যন্ত অসুস্থ দেহ লইয়াও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। ছোটদের প্রতি তাঁহার এই করুণা, মমতা ও স্নেহপূর্ণ চেষ্টার কথা জীবনে কোনদিন ভুলিবার নয়।

কেবলমাত্র শিশুদের জন্য কবিতা, গান ও অভিনয়-সঙ্গীত রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল এমন নয়। ভগবদ্ভক্তিরসে অভিষিক্ত, ভাবৈশ্বর্যপূর্ণ তাঁহার প্রাণমুগ্ধকর সঙ্গীতগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতের অনবদ্য সঙ্কলনে অতি মূল্যবান্ যোজনা। বস্তুত ১১ই মাঘের উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে তাঁহার রচিত "জাগো পুরবাসী, ভগবতপ্রেম পিয়াসী" চিরদিন উৎসবরস-পিপাসু নরনারীর চিত্তে ভাবের স্রোতধারা মুক্ত করিয়া দিয়াছে এবং করুণে কোমলে মধুরে গম্ভীরে উৎসবের রসস্রোত প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত করিয়াছে।

আজ তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কথা, তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের কথা, বিচিত্র বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য সিদ্ধির কথা, তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি ও শিশুসাহিত্যে তাঁহার নবযুগ সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়া, অবনত মস্তকে বারংবার তাঁহার অননুকরণীয় প্রতিভাকে নমস্কার জানাইতেছি। এ-সকলেরই সাক্ষ্য তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে কিছু-না-কিছু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকল সৃষ্টির চেয়ে তিনি যেখানে মহৎ, সেই মহান্ মানুষটিকে বর্তমান কালের নিকটে, কোন্ সাক্ষ্য-প্রমাণ-বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিব?

সকল মানুষের প্রতি তাঁহার সেই অকপট সহানুভূতিপূর্ণ মমতা, সেই সহ-জ বিনয়, সেই অপার্থিব মধুরতা; অথচ সত্যের প্রতি, আদর্শের প্রতি তাঁহার সেই অবিচলিত নিষ্ঠাসমুদ্ভূত দৃঢ়তা, এবং সর্বোপরি তাঁহার সেই আশ্চর্য সরল সহ-জাত স্বর্গীয় শিশুত্বের মাধুরী কেমন করিয়া দেখাইব? কোন্ রং বা কোন্ তুলির সাহায্যে তাঁহার সদা-প্রসন্ন আননের সেই নীরব ভগবদ্ভক্তির পুণ্যপ্রভা ফুটাইয়া তুলিব?

আসুন, আমরা আজ আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আবাহন করিয়া লই; নিত্য ধ্বনিত হউক আমাদের আলস্য-নিমগ্ন সুখসুপ্ত চিত্তের রুদ্ধদুয়ারে তাঁহার সেই গম্ভীর কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান, "জাগো! জাগো পুরবাসী"।*

---

* শিবনাথ মেমোরিয়াল হলে, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর আলেখ্য উন্মোচন উপলক্ষ্যে রচিত।

উষ্ট্র-সূক্ত

শ্রীকালিদাস রায়

বৈদিক ঋষি দেবতাগণেরে দেখে নাই ধরাধামে।
তবুও তাহারা সূক্তমন্ত্র রচিল তাঁদের নামে।
ইতিহাস বলে, ঋষিদের তুমি আদি সহচর ছিলে,
বারবারই ঐ যাযাবরদের মরুপার করে দিলে।
তুমি পশু তবু দেবতার চেয়ে বড়
সূক্ত শ্রবণে তুমিই যোগ্যতর।
তোমারে উষ্ট্র কুৎসিত বলে লোকে,
কারণ, তাহারা দেখিতে জানে না শিল্পী কবির চোখে।
ব্যঙ্গ করি না, সত্যই তুমি অপরূপ সুন্দর।
কুৎসিত যারা বলে তারা বর্বর।
সূক্ত রচিব হে পশু তাপস দুর্গম-পথগামী
তব উদ্দেশে, যদিও শ্যামলা বঙ্গের কবি আমি।
তোমার পৃষ্ঠে চড়ি নাই কভু, চড়াও সহজ নয়,
যদি চড়িতাম, পড়িতাম নিশ্চয়।
তুমি টানিয়াছ যান,
সেই যানে চড়ি' কাটোয়া হইতে গিয়াছি বর্ধমান।
তুমি একাধিক বার
মরুর বাড়া সে কর্জনা মাঠ করিয়া দিয়াছ পার।
মরুদেশে তুমি কাঁটা ঘাস খাও, এই দেশে নিমপাতা,
কারো খাদ্যের ভাগীদার নও, দাবি কর না ক ভাতা।
এ সব তুচ্ছ কথা,
তোমাকে লইয়া চলিবে না রসিকতা।'
বারি-সিন্ধুর চেয়ে দুস্তর মরুময় পারাবার
নিরুপায় নরে দেহতরী 'পরে করিতেছ পারাপার।
বালু দরিয়ার নেয়ে,
পঞ্চতপারা কৃচ্ছ্রসাধন করে না তোমার চেয়ে।
অগ্নি জ্বলিছে পায়ের তলায় অসহ্য বালুকায়,
অতএব তোমা ষট্‌তপা বলা যায়।
তপ করে যেবা করে না সে সেবা,
দুই-ই তুমি একা কর।
অতএব তুমি সব তাপসের বড়।
মরু সৃজিলেন যিনি, তাঁর দেখ আছে কিছু বিবেচনা,
তোমারে সৃজিয়া দিলেন আর্ত মরুভূমে সান্ত্বনা।
নমামি তোমায় মরুমাতৃক দেশের পরিত্রাতা।
একাধারে তুমি মিত্র সেবক ভ্রাতা।

গুণ পরিচয় দিই যদি যথাযথ,
সূক্ত আমার উষ্ট্র পুরাণে হয়ে যাবে পরিণত।
চরম কথাটি বলি'
শূন্য করিব আমার তপ্ত বালুকার অঞ্জলি
একটি চিত্র স্মরি',
দুপুর বেলার মরুপরিবেশ মনে মনে লই গড়ি'।

কোনখানে নেই একটি ফোঁটাও ছায়া,
তাপসের তপ ভঙ্গ করিতে নাচে মরীচিকা-মায়া,
তোমার তনুটি দহে খর ভানু-করে।
স্থাণু হয়ে তুমি আছ দাঁড়াইয়া জ্বালাময় প্রান্তরে।
চারিটি চরণ বালুতে প্রোথিত, নয়ন মুদায় ঝড়,
জঠরে পীড়িছে ক্ষুধার বৈশ্বানর।
তৃষ্ণায় তব কণ্ঠ রুধিয়া আসে,
তোমার দেহের দীর্ঘ ছায়াটি পতিত তোমার পাশে।
আরোহী তোমার সেই দুর্লভ ছায়া করি' আশ্রয়
দণ্ড দুয়েক অঙ্গ জুড়ায়ে লয়।
এই চিত্রটি ভাবি
আর মনে হয়, আরোহী সে ভাবে তাহার ন্যায্য দাবি।
প্রবলের দুনিয়ায়
তোমাতে এবং নিরীহ মানুষে তফাৎ নাই ক হায়।
যাক্—কি কথায় কি কথা পড়ল এসে,
উষ্ট্র-ভক্তি বুঝিবা মানব-মমতায় যায় ভেসে।
ভয় হয়, তুমি সিম্বল হয়ে পড়
তোমার কথাই আমার লক্ষ্য, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।
জঙ্গমরূপে সেবা কর তুমি মান না পাত্র-ভেদ,
স্থাবর রূপেও সেবাধর্মের হয় না ক বিচ্ছেদ।
সেবাধর্মের এই যে নিদর্শন,
নহে কি বিশ্বে অনুপম অতুলন?
গিরি, অরণ্য, চন্দ্র, তপন, নদী
সূক্তই লভে যদি,
ব্রহ্ম যাহাতে জলজিয়ন্ত সে কেন পড়িবে বাদ?
জীবের মধ্যে শিবের বসতি ভুলে যাওয়া অপরাধ।
সকলের মাঝে ব্রহ্ম বিরাজে, তোমার মাঝারে বুঝি
সেবকাদর্শ রূপে সেবমান, তাহারেই আমি পূজি।
সেবাধর্মের তুমি আদর্শ, তোমারে নমস্কার।
মরু না থাকিলে এই আদর্শ কোথায় মিলিত আর?
যত দোষ থাক, তোমার খাতিরে তাহারেও
আমি ক্ষমি।
হে পশু তাপস তোমার সঙ্গে মরুরেও আমি নমি।

মৃতবৎসা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কচি কচি মুখ বুকে এসে যায় সরি',
কামনা-মুকুল না ফুটেই যায় ঝরি',
হায় রে পিপাসা, হায় রে মায়ের মন,
খুঁজে ফেরে শুধু কোথায় হারানো ধন !
শিশিরের কণা ক্ষণিক ঝলসি'
প্রভাতেই যায় মরি' !

শত স্নেহপাকে রাখি যা'কে তনু জুড়ে,
গুটি-পোকা হয়ে সেও হ'লে যায় উড়ে !
পেয়েও হারাই যে পরশটুকু হায়,
তারি লাগি আজো জ্বলে মরি পিপাসায় !
কতদূর হতে কে যেন স্বপনে
ছোট হাত নাড়ি ডাকে !

ক্ষণিকের মায়া ক্ষীণ আলোছায়া বুকে
যারা আসে শুধু মরণের কৌতুকে,
ব'হে আনে যারা কত-না গোপন আশা,
শিরায় শিরায় নীড়-বাঁধা ভালবাসা,
মায়ের চোখের আশিস্-মেশানো
হাসি আনে কচি মুখে ।

কত আরাধনা-আড়ালে রেখেছি যারে,
হারাতে চাই না, তবু যে হারাই তারে !
প্রথম ক্ষুধায় এল অভিশাপ কিসে ?
বুকের সুধায় গরল কি গেছে মিশে ?
পোড়া মন শুধু মাথা কুটে কুটে
শাপ দেয় দেবতারে ।

কবে বুঝি, হায়, জানি না হারানো কথা,—
কোন্-সে মায়েরে দিয়েছিনু শেল-ব্যথা,
এ জনমে তাই নেমে আসে অভিশাপ,
বুকে পাই যেন রুক্ষ মরুর তাপ,
একে একে, হায়, কুঁড়ি যে শুকায়,
লুটায় অভাগী লতা !

যে পাখী ছেড়েছে ঝড়ে-ভাঙ্গা তার বাসা,
আকাশের নীল দেয় তা'রে ভালবাসা।
মাদুলি কবচে বাঁধিতে চেয়েছি যারে,
ধর্না দিয়েছি শত দেবতার দ্বারে,
বঞ্চিত-বুকে মরীচিকা মত
তার শুধু যাওয়া-আসা!

স্নেহের দেউলে রাখি যে শূন্য ডালা,
ফুল-ঝরা কোন্ অলখ-সূতার মালা,
মায়ের অশ্রু মোছে চন্দন-রূপ,
বুক-ফাটা শ্বাস নিভায় আরতি ধূপ,
যত বাঁধি হায়, ঝড়ে উড়ে যায়
আশার পর্ণশালা!

পাড়া-পড়শীর করুণা নীরবে সই,
সকলের চোখে পাপিনী হইয়া রই,
কার পাপে মোর হ'ল রাক্ষসী নাম?
শুধিতে পারি না নারী-জনমের দাম?
ফল্গুর মত জীবন-আড়ালে
অভিশাপ-ধারা বই?

পথে হেরি' শিশু অশ্রু যে পড়ে ঝরি',
মনে মনে তা'র বয়স হিসাব করি।
ক্ষণিকের ভুলে না চিনি' আপন মাকে
কারো শিশু যদি 'মা' বলিয়া মোরে ডাকে,
অমার উল্কা আলোক-রেখায়
অন্তর দেয় ভরি'।

ওরে বাঞ্ছিত, ওরে ও নিঠুর-মন,
বারে বারে তোর এ কী খেলা অকারণ?
হাসি নিয়ে এসে দিস্ যে চোখের জল,
এত লুকোচুরি কোথায় শিখিস্ বল্?
এ চাতুরী ছেড়ে থাক্ বুকে ও রে
মা'র কোল-জোড়া ধন!

কে তুমি?

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ও চায় তোমার কথা বলে।
কথাতে মুখটি এঁকে সবারে দেখায়।
এও চায়, তুমি যে কে, কেউ না জানুক।
তোমাকে সরিয়ে রেখে তোমাকে ধরিয়ে দিতে চায়!

অনন্ত তোমার রূপ।
হ'লে রূপকার,
রূপের আদলে কিছু রূপক মিশিয়ে
তুমি যে কি সেটা ব'লে, তুমি যে কে সেইটে লুকোত।
কথা, সে যে নিজেই রূপক,
তাই সে রূপক খোঁজে শুধু।

দুইটি বাড়ীর মাঝখানে
প'ড়ো জমিটির কোণে জমেছে কতক আবর্জ্জনা,
গজিয়েছে লকলকে ঘাস,
ওপাশে দেয়াল ঘেঁষে মানকচু গাছ গুটি-চার,
এপাশে লেবুর গাছে জানালার আধখানা ঢাকা,
পিছনে বেড়ার গায়ে একটি অপরাজিতা লতা,
আরেকটি প'ড়ো জমি তারও পিছনে।
কিছু এতে বোঝা গেল?

তবু তার মন তাকে বলে,
এরও মধ্যে তুমি আছ কোনও রকমে কোনোখানে।
যেখানে যা দেখে,
তোমার কিছুটা দেখে সকল-কিছুতে,
তাইতে সে বাঁচে।
এ মানুষ
কোথায় রূপক পাবে তোমার ও রূপ-কে বোঝাতে?
তবু সে রূপক খোঁজে।

বর্ষা এসে গেছে।
বর্ষার অনেক রূপ, ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর,
রূপকের তাতে ছড়াছড়ি।
অপরাহ্ণ বেলা,
পূবের আকাশে কালো মেঘ,
সে-মেঘের গায়ে রামধনু
সেই রূপ-রূপকের কোষাগারে তোরণের মত।
তার যে বিরহী মন
চায় না মেঘের দৌত্য,
চায় না কোনও দৌত্য নিজের অন্তর-দৌত্য ছাড়া,
চ'লে যায় সে-তোরণ দিয়ে
বর্ষার ঐশ্বর্য্য-ভরা রহস্য-গভীরে।
খুঁজে ফেরে তোমার ও রূপের রূপক।
খুঁজে পায়।
পেয়েই হারায় নিজেকেই।
তোমার ও রূপের আকাশে
নিজে বর্ষা হয়ে যায় দুর্দ্দম দুর্ব্বার।

ও চায়, তোমার কথা বলে,
তুমি যে কে, কেউ না জানুক।
তোমার ও রূপের আকাশে
ও যখন বর্ষা হয়ে যায়,
তুমি যে কি, তুমি যে কে, তা কি মনে রাখে?
তখন কে তুমি?
তুমি কি আকাশ হয়ে গেলে
তারপর তুমি থাকো আর?

আলোয় এলো না

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

এক চোখে বিতৃষ্ণা যেন অন্যচোখে বয়
সমর্পণের ইচ্ছে⋯ও-দুই স্রোতের মোহনায়
দাঁড়িয়ে আছি, মুখ তোলে না, এ কী রে সংশয়।

ভাঙতে ভাঙতে অন্ধকার প্রান্তসীমানাও
ছাড়িয়ে গেলো, ছাড়িয়ে গেলো, আলোয় এলো না
যতই বলি আলোয় এসে দু'চোখ তুলে চাও

অন্ধকারে মুখ ঢাকে সে, আলোয় আসে কই—
আমার দিকে বইছে কী স্রোত জানাই হ'ল না :
শেষ আলোটুক ডুবে গেলো, দাঁড়িয়ে তবু রই ⋯

কাঁপতে থাকে ভয়ের ছায়া, নিভৃত বন্যায়
কী স্রোত এসে অন্ধকারে বক্ষ ছুঁয়ে যায়!

নির্জন

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নির্জন নদীর এক জনশূন্য ঘাটে
এসো বসা যাক। সূর্য নামে পাটে।
খুব কাছাকাছি বসবার নেই দরকার
প্রয়োজন নেই হাতে হাত ধরবার।
শুধু বসা আর চেয়ে থাকা—
নদীর ঘোলাটে জলে নানা ছবি আঁকা।

বসে-বসে শুধু ঢেউ গোণা
পলক ও মুহূর্তের ফাঁকে-ফাঁকে শোনা
জোয়ারের পদধ্বনি।
নতুন দিগন্ত রেখার নিবিড় বন্ধনী
প্লাবনের ভাষা নিয়ে আসে—
নির্জন নদীর তীরে তুমি আছো পাশে।

এখন নির্জন নদী
প্রায় অন্ধকার,
হৃদয়ের পদধ্বনি
কোথায় খুঁজছে পথ বল বারবার?

তিমিরশিখায়

শ্রীনিখিলকুমার নন্দী

যখনই কম্প্র স্বর্ণশিখাকে শুনেছি নিবিড়ে দিনান্তলীন
স্থির ও অধীর অন্ধ অন্ধকারের ভণিতা!
তুমি কি আসবে? তুমি কি আসবে?
অচিরে শোনাল অবগাঢ় নীল মগ্নতিমির দুঃস্বপ্নের গীতা :
কি তুমি আনবে? কি তুমি আনবে?

এই আসা-আসি আশা-নিরাশায় আনা-না-আনার
দ্বন্দ্বে আঁধার আলুলায়িত অবতামসীতে
কখনও ত্রস্ত আলোক আঁধারে মানা-না-মানার
আলোড়িত মিতে :

বলেছে বলছে বলবে সঘন,
আমরা দু'জনে দু'জনেরই যেন পরমলগ্ন।
কিন্তু দ্বৈত-চূড়ো হবে গুঁড়ো পরমুহূর্তে,
থাকবে আঁধার মাটির আঁধার পাতাল খুঁড়তে
অথবা আলোক আবির আলোক আকাশে উড়তে
আসা-না-আসার আনা-না-আনার দ্বন্দ্ব ঘুরতে
লাগবে—কেবল বাসনাবিকল চরাচরময়
শিখায়-তিমিরে তিমিরশিখায় প্রেমের প্রলয়।

সোবিয়েত্ সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্লেন উড়বার আগে টারম্যাকের উপর বহুদূর গড়গড়িয়ে চলল। তারপর ছুটতে ছুটতে কখন যে মাটি ছেড়ে উঠে গেছে—বুঝতে পারলাম না। সন্ধ্যার পর চারিদিকে আলো জ্বলছে, নিচের দিকে চেয়ে দেখে বুঝলাম, উড়েছি। জেট প্লেনের পেটের ভিতর কি শব্দ! অন্ধকারের মধ্যে কি ক'রে চলছে ভাবি—শুধু কলের দিকে চেয়ে হেড-ফোন্-এ চলার ইঙ্গিত পেয়ে চলেছে। রাতে প্লেন চড়ার আমার প্রথম এই অভিজ্ঞতা।

রাত্রের ডিনার এসে গেল। দ্বিবেদী বাছাবাছি ক'রে খাচ্ছেন—পাছে ঘাসপাতা ও গব্যপদার্থের সঙ্গে অখাদ্য কিছু চ'লে যায়। আমরা 'মাফলেযু'র দল অর্থাৎ শুধু ফলে তুষ্ট নই। খাওয়া-দাওয়ার পর একটা রুশ ভাষার বই নিয়ে নাড়ানাড়ি করছি। আমার বাথরুমের দরকার হ'লে একটি ভদ্র রুশীয় যুবককে রুশীয় শব্দটা বই থেকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন, কি ভাবে খোলা যায় দেখিয়ে দিলেন—তার পর ঠিক ভাবে এনে আসনে বসিয়ে দিলেন। প্লেন বেশ দুলছে। তাঁকে কাছে ডেকে কিছুক্ষণ ভাষা চর্চা করা গেল। আমি রুশ জানি না, তিনি ইংরেজি জানেন না। যুবকটি আসলে হাঙ্গেরিয়ান, এখন রুশীয় হয়ে গেছে। বেশ ভাল লাগল—ভাষার ব্যবধানেও মানুষকে ভালবাসা যায়, তাকে ভুলি নি।

মস্কো দেখা যাচ্ছে কি? আলোকমালা-সজ্জিত বিচ্ছিন্ন শহর, সে সব শহরের নাম জানি না। কারা রাস্তায় আলো জ্বেলে চলছে—কাদের ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাতে মোটরে ক'রে কোথায় যাচ্ছে সব। প্রত্যেক ঘরে মানুষ আছে, কেমন তারা!

রাত ৯টার পর মস্কো এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। আজই সকালে নয়াদিল্লী ছেড়েছি। ভাবতেই পারছিনে, এই দূরত্ব কত অল্প সময়ে পেরিয়ে এলাম। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে সুন্দর ছয় মাসের পথ ছয় দিনে উতরিল ব'লে পড়েছি। আজ যন্ত্রদানবের পিঠে চ'ড়ে আমরা ছয় মাসের পথ ছয় ঘণ্টায় পার হয়ে এলাম। বিজ্ঞান স্থান-কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মনে হ'ল বিজ্ঞান কি মানুষে-মানুষে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান দূর করতে পারছে?

মস্কোতে যখন এরোপ্লেন থেকে নামলাম, তখন ঝির-ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, দুরন্ত হাওয়া বইছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে শীতের দেশে এসেছি। প্লেন থেকে নেমে দেখি সায়েন্স অ্যাকাদেমি থেকে গাড়ি এসেছে ও দুইজন প্রতিনিধি এসেছেন আমাদের স্বাগত করবার জন্য। তাঁদের একজন মহিলা। ইনিই পরে হলেন আমাদের দোভাষী ও অন্যতম গাইড।

এয়ারপোর্ট থেকে চলতে চলতে আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা হ'ল। কথাবার্তায় বুঝলাম, আমাদের বিশেষ কোন কাজের জন্য আনা হয় নি, কোন সভাসমিতিতে ভাষণাদির কথা শুনলাম না। দ্বিবেদী বললেন তাঁর ইচ্ছা মস্কো য়ুনিভার্সিটিতে গবেষণার কাজ কি ভাবে চলছে সেটা জানবার। আমি বললাম, দেশটা দেখব, আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সোবিয়েত সাহিত্যিকরা কি কাজ করছেন, সেটা জানতে পারলে খুশি হব। আর যদি ব্যবস্থা হয় তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। পরে বুঝলাম আমাদের কথা শোনবার থেকে তাদের কথা শোনানোর জন্যই উৎসাহ বেশী। অসময়ের ঘুম থেকে ঝাঁকানি খেয়ে উঠে ঘুমন্ত মানুষটা প্রাণপণে প্রমাণ করতে চায়, সে জেগে ছিল—নূতন জেগে সোবিয়েতদের সেই দশা। তারা কিছুতেই পেছিয়ে নেই—তারা সব বিষয়ে সবার এগিয়ে আছে, এটাই দুনিয়ায় জানান দিচ্ছে। তাদের মাপকাঠিতে যারা পিছিয়ে আছে, তাদের আদর্শে যাদের আস্থা পুরোপুরি মজবুত হয় নি, সেই সব 'অনগ্রসর' জাতের লোকদের ডেকে এনে দেখিয়ে দেয়, শুনিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয়—তারা কী প্রোগ্রেসী জাত হয়ে উঠেছে!

উক্রেইন হোটেলে উঠলাম। শুনলাম প্রায় ত্রিশতলা বাড়ী। প্রতীক্ষালয়ে গিয়ে বসলাম। আমাদের দোভাষী মহিলা লিজ দেবী ছুটোছুটি করছেন ব্যবস্থার জন্যে। বেশ ভীড়। নিয়ম অনুসারে পাসপোর্ট হোটেলে

জমা দেওয়া হ'ল। এটা করার কারণ কে কখন কোথায় যান, তার খবর রাখা সরকারীপক্ষীয় লোকদের পক্ষে একান্ত দরকার। পাসপোর্ট ছাড়া বিদেশীর কোথাও নড়বার উপায় নেই। ভুল ক'রে লেনিনগ্রাদে যাবার সময় হোটেল থেকে পাসপোর্টগুলি নিয়ে যাওয়া হয় নি। লেনিনগ্রাদের হোটেলে সেটা দাখিল করতে না পারায় একটু মুশ্‌কিল হয়েছিল। সেই রাতেই টেলিগ্রাম ক'রে, তার পরদিন প্লেনে পাসপোর্ট আনানো হয়। লেনিনগ্রাদের দোভাষী বারানিকফ পার্টির সদস্য—তিনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন।

উক্‌রেইন হোটেলে ঘর পাওয়া গেল আট তালায়—তবে পাশাপাশি ঘর হ'ল না—তিন জনের তিন জায়গায় থাকতে হ'ল ; আমার ঘরের নম্বর ৮৬২, কৃপালনীর ৮২৭ ও দ্বিবেদীর ৮১৪। শুতে প্রায় রাত একটা হয়ে গেল। কফি ছাড়া আর কিছু খেলাম না। ঘরে বিছানা পাতা ; সেণ্ট্রাল হীটিং-এর ব্যবস্থা ; জানালা কাঁচের ডবল প্যানেলিং ; পর্দা টাঙানো। মেঝে কাঠের, কার্পেট পাতা। বাথরুমের পাশেই বেশ বড় ঘর, বড় বাথটব ; গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল, শাওয়ার, স্প্রের ব্যবস্থা।

বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কানের কাছে রেডিও মৃদুকণ্ঠে বিদেশী ভাষায় গান করছে—কী তার আবেদন তা বুঝছিনে। তবে মনে হচ্ছিল মানুষকে যন্ত্রণা দেবার যে সব যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, এটা তার অন্যতম। কলকাতার বাসায় নিজেদের রেডিও খোলবার প্রয়োজনই হয় না—প্রতিবেশীর সর্বকাল মুক্ত বাক্‌যন্ত্র থেকে সদা আর্তনাদ ধ্বনি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখানে সেটি হচ্ছে না ; মৃদু ধ্বনি—ইচ্ছা করলেই বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে, সুইচ বিছানার কাছে। পাশেই বেড সুইচ, টিপলেই বাতি জ্বলে ওঠে।

১০ অক্টোবর, ১৯৬২ মস্কো।

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙল ; ঘড়িতে দেখি ছয়টা বেজেছে। বাড়ীতে অন্ধকার থাকতেই উঠি। এখানেও উঠে পড়লাম। সকালেই স্নান করে নিলাম—প্রচুর গরম জল। কিন্তু চায়ের জন্য মনটা ছুক ছুক করছে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি একটা রেস্তঁরার মত রয়েছে, ঢুকে পড়লাম—চা খেলাম। দিল লেবু চা, আমার ভালই লাগে—বাড়ীতে মাঝে মাঝে সখ ক'রে খাই। কিন্তু পয়সা দেব কি ক'রে ? আমাদের কাছে ত ভারতীয় টাকা, রুবল বা কোপেক্‌ নেই। ভারতীয় নোট বের ক'রে দেখালাম, বোধ হয় কর্মচারীরা বুঝলেন ব্যাপারটা। ইতিমধ্যে লিডিয়া—দোভাষী মহিলা এসে পড়লেন। বেচারার বাড়ী অনেক দূরে। উক্‌রেইন হোটেলে গত রাত্রে প্রথম আসে অ্যাকাডেমির মোটরে ক'রে। তার বাড়ী থেকে আসতে হ'লে বাস্‌, মেট্রো অর্থাৎ পাতালযান ও পয়দালে আস্‌তে হয়। এই দিকটাই তার জানা নেই ভালো ক'রে।

লিফ্‌টে নিচে নামলাম, এখানকার লিফ্‌টে চালক আছে। অবশ্য তারা মেয়ে, কলকাতায় সক্ষম পুরুষদের এই হাল্‌কা কাজে নিযুক্ত করা হয়, শক্তির অপচয়। তবে রাশিয়ার সব জায়গায় লিফ্‌টে লোক থাকে না। পরে লেনিনগ্রাদ থেকে ফিরে এসে যে হোটেলে উঠি, সেখানে স্বয়ং চালক হতে হয়। ফ্ল্যাট বাড়ীতেও স্বয়ং চালক ব্যবস্থা, অটোমেশন, র‍্যাশানালিজিশনের যুগ আগত !

নিচে সেই প্রতীক্ষালয়ে এলাম—যেখানে গত কাল রাত্রে এসে ঘরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। দিনের আলোয় সবটা স্পষ্ট হ'ল, দোকান আছে অনেক কয়টা। আমাদের খাবার রেস্তঁরা হোটেল বাড়ির সংলগ্ন। কিন্তু একবার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আর এক দিকে নামতে হয় সিঁড়ি বেয়ে, তার পর পাওয়া যায় খাবার ঘর। শুনলাম হোটেলের থাকা ও খাওয়া দুটো পৃথক্‌ প্রতিষ্ঠান। ঘরে ঢোকবার আগে ওভারকোট রেখে যেতে হয় একটা দপ্তরে—চাকৃতি দেয় সনাক্তের জন্য। ওভারকোট প'রে সার্কাস, সিনেমা ছাড়া আর কোথাও যাওয়া যায় না। ঘরের ও বাইরের তাপের তফাৎ ব'লে এটা হয়েছে।

আমাদের জন্য একটা টেবিল ঠিক করে রাখা ছিল। প্রাতঃরাশ শেষ করতে দশটা বাজলো। এবার সফর সুরু হবে। ইতিমধ্যে আমাদের দ্বিতীয় দোভাষী বরিস্‌-কাপুর্শকিন এসে পড়েছেন। আমরা অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের অতিথি। সুতরাং সেখানেই প্রথমে যেতে হ'ল। অ্যাকাডেমির বড় বাড়ী—বাড়ীর সম্মুখে মোটা মোটা থাম—আগের যুগের স্থাপত্য প্রাঙ্গণে গোর্কির মূর্তি। ঘরগুলি খুপরি খুপরি, বড় বড় ঘর দ্বিখণ্ড, ত্রিখণ্ড করা হয়েছে। আমরা একটা ঘরে বসলাম—সহকারী অধ্যক্ষ Akromovitch স্বাগত করলেন। অধ্যক্ষ চেলিসাফ ছুটিতে আছেন—গেছেন কৃষ্ণসাগর তীরে বিশ্রামের জন্য। এঁর কথা পূর্বে বলেছি—সহকারী অ্যাকরোমোবিচকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে ; বুদ্ধিতে, স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল চেহারা। দোভাষী লিডিয়া তাঁর কথাগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করে বলছিলেন। এই অ্যাকাদেমিতে এশিয়ার প্রাচ্য ভাষার

চর্চা হয়। এ বিষয়ে রুশীয়রা বহুকাল কাজ করছেন। তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষা নিয়ে আলোচনায় রুশ পণ্ডিতদের নাম যশ আছে। সংস্কৃত ও পালির চর্চার জন্য খ্যাতিমান স্কলারের নাম অজ্ঞাত নয় বিদ্বজ্জন সমাজে। এখানে বিদ্যার্থীরা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হন—পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট কাজ বলা যেতে পারে। আগে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল লেনিনগ্রাডে—এখনও সেখানে আছে—তবে দুই জায়গার গবেষণার বিষয়ের পার্থক্য হয়ে গেছে। লেনিনগ্রাদে নানা দেশের, নানা ভাষার পুরাতন পুঁথিপত্র যথেষ্ট থাকায় সেখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতির চর্চাটার উপর জোর পড়েছে (Philologia)।

মস্কোতে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার কাজটাই জোর পেয়েছে। মস্কো রাজধানী, তাই রাজনৈতিক কারণ থেকেই দুনিয়াকে জানবার ও বুঝবার জন্য দেশবিদেশের ভাষাটাকে ভালো ক'রে আয়ত্তে আনার আয়োজন হয়েছে রাজকীয় ভাবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা পেয়ে অ্যাকাদেমিতে আসতে পারা যায় ; তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয় সুপারিশ চাই এখানে প্রবেশ করতে। তিন বৎসর কাজ করার পর বিদ্যার্থীকে থীসিস-এর চুম্বক ছাপিয়ে পেশ করতে হয় কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁরা সেই চুম্বকটা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানের অ্যাকাদেমিতে পাঠিয়ে দেন। তবে অ্যাকাদেমির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধ না থাকলেও গবেষণার বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন বা কৌতূহলী, তাঁদের আহ্বান করা হয়। পরীক্ষা বেশ কড়া ভাবেই হয় ; মৌখিক প্রশ্নাদির সামাল দিতে হয়।

কথাবার্তার শেষে আমরা গ্রন্থাগার দেখলাম। প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সুন্দর সংগ্রহ ; দৈনিক বাংলা কাগজ, হিন্দী, উর্দু, মালয়লাম পত্রিকা বাণ্ডিল বাঁধা তাকে তাকে সাজানো।

অ্যাকাদেমির লাইব্রেরীতে তিব্বতী-রুশী অভিধান তৈরী হচ্ছে ; রুশী-হিন্দী, হিন্দী-রুশী অভিধান এখান থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। বাংলা-রুশী অভিধান হচ্ছে, অনেকেই বাংলা নিয়ে কাজ করছেন—মিসেস বিকোবা (Bykova) তাঁদের অন্যতম। এঁর সঙ্গে পালাম বন্দরে দেখা হয়েছিল সেকথা পূর্বে বলেছি। বোরিস কবি পুসকিন বাংলা ভাষা তত্ত্বের উপর বই লিখেছেন ; এখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' অনুবাদ করছেন। লুডমিলা চিকৃকিনা নামে মেয়েটি বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করছেন। মিসেস বিকোবার কাজ এই অ্যাকাদেমিতে ভাষা নিয়ে। এঁরা সকলে মিলে বাংলা ভাষার সুবৃহৎ ব্যাকরণ লিখছেন রুশীভাষায়। বলা বাহুল্য য়ুরোপীয় অন্য জাতও ভারতীয় ভাষা নিয়ে এককালে কাজ করেছেন ; বাংলা ভাষা নিয়ে পোর্তুগীজরা সর্বপ্রথম বই লেখেন। ইংরেজরাও করেছেন—অ্যান্ডারসন ও মিলনের কথা স্মরণীয়। খ্রীষ্টানী জগৎ অর্থাৎ য়ুরোপ-আমেরিকার নানা চার্চের নানামতবিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা দুনিয়ার নানা দেশে গিয়েছেন, নানা ভাষা শিখেছেন, নানা ভাষায় বাইবেল ও খ্রীষ্টানী বই তর্জমা করেছেন—'হীদেন'দের খ্রীষ্টান করবার উদ্দেশে। সোবিয়েত্ রুশ ঠিক সেই কাজই করছে সজ্ঞবদ্ধভাবে একমুখী হয়ে—উদ্দেশ্য অনগ্রসর লোকদের সম্বন্ধে তথ্য জানা ও তাদের কাছে সোবিয়েতের বাণী প্রচার। ইতিপূর্বে এদের মত আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ও বিস্তারিত সংশ্লেষণী আলোচনা করতে আর বড় কাউকে দেখা যায় না।

হোটেলে ফিরলাম অ্যাকাদেমি থেকে। আজ সকালের এটাই হ'ল সবথেকে বড় কাজের কাজ—যাঁদের আমন্ত্রণে এসেছি তাঁদের সঙ্গে মোলাকাত্ করা। লান্চ ক'রে হোটেল-এর একটা অফিস থেকে ২৫ টাকা ভাঙিয়ে নিলাম—পেলাম ৪ রুবল্ ২৮ কোপেক—অর্থাৎ এক রুবলের মূল্য পাঁচ টাকার বেশি, তবে ঐ টাকার বিনিময়ে ডলার বেশি পেতাম। তাই আমাদের কাছে টাকার বিনিময়ে রুশীয় বা মার্কিনী জিনিষের মূল্য এত বেশি লাগে। সোবিয়েত দেশে রুবল্ দিয়ে লোকে দাম পায়—মার্কিনীমুলুকে ডলার দিয়ে। মার্কিনী যে জিনিষের দাম পাঁচ ডলার, আমাদের তার জন্য দিতে হবে প্রায় পঁচিশ টাকা। কাজের জন্য যারা পায় ডলার বা রুবল্ তাদের কাছে জিনিষের দাম চড়া মনে হয় না, কারণ তারা চড়া দাম পায় কাজের বিনিময়ে। তাদের আয়ের অনুপাতে দ্রব্যের দাম ঠিক আছে, আমাদের মুদ্রার মানে সেসব জিনিষের নাগাল ধরা যায় না ; তাই বলি ভয়ানক মহার্ঘ। কিন্তু দশ মিনিটের রেডিও ভাষণ দিয়ে যখন প্রায় সতের রুবল্ (প্রায় ৯০ টাকা) পেলাম, তখন তার থেকে তের রুবল্ দিয়ে ক্যামেরা কিনতে গায়ে লাগল না। কিন্তু আমার টাকার হিসাবে দিতে গেলে লাগত প্রায় ৭০ টাকা। সুতরাং জিনিসের দাম মহার্ঘ বা সুলভ তা নির্ভর করে শ্রমবিনিময়ে লোকে যে টাকা পায় তার উপর। রুশীয় টাকা দিয়ে মস্কোর ম্যাপ, কিছু পুরাতন স্ট্যাম্প, দু'-একখানা বই কিনলাম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর লিডিয়ার সঙ্গে বের হলাম Tolstoi-এর বাড়ী দেখবার জন্য। তোলস্তয় থাকতেন

Yasna polyana-তে তাঁর জমিদারী বাড়ীতে; সেখানকার কথা পরে আসবে। ১৮৮১ সালে তিনি মস্কো আসেন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য। একটা বাড়ী কিনে প্রয়োজনমত বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই বাড়ীতে তোলস্তয় ১৮৮১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ছিলেন। সোবিয়েত সরকার এই বাড়ী রাষ্ট্রীয় আয়ত্তে এনে যেমনটি ছিল তেমনটি রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা পৌছলাম যখন, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়ীতে (অফিস-ঘর ছাড়া) বিজলী বাতি নেই, কারণ তোলস্তয়ের সময় বিজলী বাতি এ বাড়ীতে ছিল না—তিনি পছন্দ করতেন না ব'লেই মনে হয়। তোলস্তয়ের নানা খেয়ালের চিহ্ন রয়েছে। তিনি যে ডামবেল নিয়ে রোজ ব্যায়াম করতেন, সেটা রয়েছে। মাঝে মাঝে সখ হ'ত বোধ হয়, গৃহিণীর সঙ্গে কলহ ক'রে নিজে রেঁধে খাবেন, একটা স্পিরিট স্টোভ রয়েছে। স্বাবলম্বী হ'তে হবে তাই জুতো তৈরী করলেন; সেই জুতোজোড়া, মুচির যন্ত্রপাতি—সবই রয়েছে। নিজে জল আনতেন বাইরের এক সোঁতা থেকে। বাড়ীর যে-ঘরে তাঁর আদরের মেয়ে ছিলেন—যিনি অল্প বয়সে মারা যান—সে-ঘরটিকে ঠিক আগের মতই রাখা আছে। এক পৌত্র মারা যায়, তার সবকিছু সাজান রয়েছে। গৃহিণী যে-ঘরে থাকতেন, সে-ঘরের বিছানার সবকিছু তাঁর নিজের হাতের করা। এই বাড়ীতে তোলস্তয় তাঁর উপন্যাস Resurrection লিখেছিলেন, সেই টেবিলটা দেখলাম। টেবিলের পায়া কেটে খাড়াই কম করা হয়েছে; কারণ যাতে লেখাপড়ার সরঞ্জাম চোখের খুব কাছে আসে। তিনি চোখে কম দেখতেন, কিন্তু চশমা ব্যবহার করতেন না, সেটা কৃত্রিম চক্ষু! আমরা অনেকক্ষণ ঘুরলাম, অন্ধকার হয়ে এল। এ বাড়ীতে জুতোশুদ্ধ ঢুকতে দেয় না। শীতের দেশে ত শুধু মোজা পায়ে হাঁটা যায় না, তাই জুতোর উপর কাপড়ের জুতো প'রে ঘরে ঢুকতে হয়েছিল। মনে পড়ল দিল্লীতে, আগ্রায় মসজিদে ও মক্বরায় কাপড়ের জুতো পরে ঢুকতে হয়েছে। মস্কো, লেনিনগ্রাদে অনেক জায়গায় এমনি ডবল জুতো পায়ে দিতে হয়েছিল।

তোলস্তয়ের বাড়ীর চারিপাশটায় এখনো গাছপালা আছে—শহরের ভিতর হ'লেও গ্রাম্য আবহাওয়া রয়েছে পরিবেশের মধ্যে। তবে বাগানটায় খুব যত্ন করা হয় ব'লে মনে হ'ল না; বরং উপেক্ষিতই লাগল। তোলস্তয় মস্কোতে থাকলেও য়াস্‌নাপোলিয়ানাতে যেতেন, অন্যান্য জমিদারী তদারকেও বের হতেন।

এই বাড়ী ছাড়া তোলস্তয় ম্যুজিয়াম আছে। সেখানে আছে তাঁর পাণ্ডুলিপি, ছবি, বই, তাঁর সম্বন্ধে গ্রন্থরাজি। এখানে নাকি তোলস্তয়ের হাতে-লেখা ১ লক্ষ ৬০ হাজার কাগজপত্র আছে, চিঠি আছে প্রায় ১০ হাজার। একটা রচনা লিখে তিনি কখনও খুশী হতেন না; কতবার যে কাটাকুটি করতেন তার ঠিক নেই। সেই সব কাটাকুটি, ছাঁটাছাঁটি করা কাগজ আছে কয়েক হাজার। বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবিও আছে অনেক। সোবিয়েত সরকার ১৯৩৯ সাল থেকে তোলস্তয় সম্বন্ধে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য এই বাড়ীতে ব্যবস্থা করেন; তার আগে তোলস্তয়ের আত্মীয় ও বন্ধুরা এই প্রতিষ্ঠানটির তদারক করেন।

এরপর চেকভ ম্যুজিয়ামে গেলাম। আজ চেকভ লেখকরূপে পৃথিবীর সভ্যদেশে সুপরিচিত। কিন্তু তাঁকে একদিন সংগ্রাম ক'রেই এই নগরীর একটি ছোট বাড়ীর এক অংশে থাকতে হয় দীর্ঘকাল। ১৮৭৯ সালে চেকভ্ মস্কোতে এসে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র হয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম চলে, পত্রিকায় গল্প লিখে কিছু উপার্জন করতে বাধ্য হন। সাত বৎসরে চারশ'র উপর রচনা-গল্প থেকে আদালতের মামলার রিপোর্ট লিখতে হয় অর্থের জন্য। গল্পের মধ্যে একটির নাম Sputnik, আজ যে নাম ঘরে ঘরে পরিচিত—অন্য অর্থে অবশ্য।

আমরা যে বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সেখানে চেকভ তাঁর নাটক Ivanov লিখেছিলেন। সেই টেবিল এখনো আছে। যাঁরা Korsli-এর থিয়েটারে অভিনয়ে নামেন, তাঁদের ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা আছে, অভিনয় সম্বন্ধে মতামতও। Ivanov অভিনীত হয় ১৮৮৭ সালে, বই আকারে প্রকাশিত হয় দু' বৎসর পরে। চেকভের প্রথম গল্প Strekoza Dragon Fly নামে হাসির কাগজে বের হয় ১৮৮০ সালে। সেই কপি রাখা আছে এই ম্যুজিয়মে।

চেকভ্ সাইবেরিয়া ভ্রমণে যান, সে সম্বন্ধে ছবি আছে টাঙান। শাখালিন দ্বীপের ছবি রয়েছে—সেখানকার কয়েদীদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং ফিরবার সময় সিঙ্গাপুর, ভারত ও সিংহল হয়ে সুয়েজ খাল দিয়ে দেশে ফেরেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁর কোন মতামত সমসাময়িক কাগজপত্রে আছে কি না জানি না। রুশ-ভাষাভিজ্ঞ কেউ যদি চেকভের কাগজপত্রগুলি উল্টে-পাল্টে দেখেন ত ভাল হয়। ১৮৯২-এ চেকভ্ মস্কো ত্যাগ ক'রে সেরপুকোভ জেলায় মেলিখোবো (Melikhovo) গ্রামে জমিজমা কিনে বাস করতে যান। জায়গাটি ওকা নদীর ধারে

মস্কো থেকে মাইল পঞ্চাশের মধ্যে। এই ওকা নদীর উপর দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম য়াস্না পোলিয়ানা যাবার সময়ে—বেশ বড় নদী ভল্‌গায় গিয়ে পড়েছে। আমরা যে সময়ে ম্যুজিয়মে গিয়েছিলাম, তখন চেকভ্‌-সপ্তাহ চলছে ব'লে স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা দলে দলে আসছে। শিক্ষিকা সঙ্গে আছেন। স্থানীয় গাইড তাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন—ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্বভাবকুতূহলী মন নিয়ে নোট্‌ নিচ্ছে, মাঝে মাঝে আমাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টি দিচ্ছে। সত্তর বৎসর পূর্বে চেকভ্‌ ১৮৯২ সালে মস্কো ছেড়ে গ্রামে যান—সেইটা কি এই বৎসর ১৯৬২ স্মরণ করা হচ্ছে?

সন্ধ্যায় ফিরেছি হোটেলে; খুব ক্লান্ত—শুয়ে আছি ঘরে। দাস নামে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে খাবার ঘরে; তিনি এলেন দেখা করতে। ইনি Indian Statistical Institute-এ কাজ করেন, ছুটি নিয়ে বিদেশে একটা গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছেন সপরিবারে। স্ত্রী বিদেশিনী; একটি কন্যা, বৎসর ছয়-সাত, কোলে একটি শিশু পেরামবুলেটর নিয়ে ঘুরছেন। পরিচয় হ'লে জানলাম, বাড়ী তাঁর বরিশালের গৈলা—এককালে নামজাদা বৈদ্য ব্রাহ্মণদের বাসভূমি ব'লে সারা বাংলা দেশে খ্যাতি ছিল। I. S. T-র গিরিধি শাখায় দাস কাজ করেন তিন বৎসর। গবেষণার বিষয় ছিল মাছের পোনা চাষে নাইট্রো-কোবাল্ট দিলে মাছের আকার বাড়ে। এ ছাড়া ছাগল বা গরুর পাকস্থলীর রস খাদ্য হিসাবে দিলেও নাকি মাছ বড় হয়। আমি শুধালাম, এ পদ্ধতি নিয়ে কেউ কাজ করেছে? তিনি বললেন, না, কেউ করে নি। আমি শুনে ভাবলাম, এমন গবেষণা, যার ফল কেউ গ্রহণ করল না! না করার কারণটা কি তা কি কেউ তদন্ত করেছে? এ শুধু এই পরীক্ষা নিয়ে নয়—অসংখ্য পরীক্ষার কি এই পরিণাম হয় নি? তিনি বললেন, ফরমোসা দ্বীপে এই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে ফল পাওয়া গেছে, জানি না সেটা তাঁর শোনা কথা কিনা। Light hearted bureaucracy ব'লে একটা কথা শোনা যায়—এসব কি তারই নমুনা? শ্রী দাস বললেন, দেশে এই কাজে কোন উৎসাহ না পেয়ে এখন অন্য কাজ ধরেছেন। এটা চিকিৎসা-বিষয়ক। হাসপাতালে স্থান পাবার জন্য কোন্‌ ব্যারামের রোগীর সংখ্যা অধিক ও চাহিদা বেশী। সাধারণত কোন্‌ শ্রেণীর রোগী কত দিন হাসপাতালে থাকে, চাহিদার কতদিন পরে তারা স্থান পায় ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করছেন। এ তথ্যরাশি পেয়ে কোন্‌ তত্ত্বে উপনীত হওয়া যাবে জানতে চাইলে শ্রী দাস বললেন, হাসপাতালের কি রকম বা কত রকমের চাহিদা হয়, তা জান্‌তে পারলে তার ব্যবস্থার কথা সরকার ভাবতে পারবেন। কাজটা হচ্ছে, আমেরিকার National Medical Institute-এর পক্ষ থেকে। শ্রী দাস মস্কো হাসপাতাল থেকে তথ্য পেয়েছেন—এখান থেকে লেনিনগ্রাদে যাবেন। হিং টিং ছট্‌-এর আবিষ্কার? না আবোল-তাবোলের কবিতা? হাসপাতালের প্রয়োজন খুবই—সে-বিষয়ে দ্বিমত হ'তে পারে না—কিন্তু রোগ যাতে না হয় তার পরিবেশ সৃষ্টি করাই বোধহয় এক নম্বর কাজ। সদাব্রত, ভিক্ষাদান, পুণ্যকর্ম নিশ্চিত—কিন্তু ভিক্ষুকের বৃত্তি যাতে লোকের না নিতে হয়—সেই রকম আর্থিক পরিবেশ গড়াটাই বোধহয় সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সোবিয়েত সহরে ত ভিখারী দেখলাম না, পথের পাশে অস্থিচর্ম-সার মানুষকে ধুঁকতে দেখলাম না। উলঙ্গ উন্মাদিনীকে অশ্লীল কথা চীৎকার ক'রে বলতে বলতে যেতে দেখি নি। রাতে ডিনারের জন্য নেমে গেলাম। নিজেদের টেবিলে ব'সে খাচ্ছি। অদূরে দেখি একটি টেবিলে দু'জন খাচ্ছেন; দেখে মনে হ'ল তাঁরা বিদেশী,—রুশীয় নন। আলাপ ক'রে জানলাম তাঁরা হাংগেরিয়ান সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার—মস্কোর সরকারী মুখপত্র Izvestia-র সঙ্গে তাঁরা যুক্ত—কাগজের কাজে এসেছেন। আমি রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শুনে বললেন যে, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কথা জানেন; বালাতন ফুরাদে কবি যে শিশু-তরু পুঁতেছিলেন সে সম্বন্ধে দেখলাম ওয়াকিবহাল। এঁদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ হ'ত।

আর এক টেবিলে একটি বাঙালী যুবক ও রুশী যুবক খাচ্ছেন। বাঙালীটির সঙ্গে আলাপ করতেই তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। তাঁরা Tass সংবাদ সরবরাহ সংস্থানের প্রতিনিধি, দিল্লীতে থাকেন—কাজে এসেছেন মস্কোতে।

১১ অক্টোবর, ১৯৬২। মস্কো।

ভোর রাত্রে শরীরটা খারাপ হ'ল—বুঝলাম অশ। আমি কৃপালনীকে ফোন করলাম আসবার জন্য। তিনি সব শুনে তখনই অফিসে গেলেন। প্রত্যেক তলায় একজন করে মহিলা পালাক্রমে তদারক করবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা থাকেন। তাঁকে বলাতে তিনি তখনই কৃপালনীর সঙ্গে ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তার নয় ডাক্তারনী—এলেন দশ মিনিটের মধ্যে ওষুধের ব্যাগ নিয়ে। দেখেশুনে একটা ওষুধ দিয়ে গেলেন। নার্স এসে পেটে ঠাণ্ডা জলের ব্যাগ দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ডাক্তারনী বললেন, তিনি স্পেশালিস্টকে খবর দেবেন। ইতিমধ্যে কৃপালনী ভুলুকে (শুভময় ঘোষকে) ফোন করেছিলেন, সে এসে গেল, বিশ্বজিতও। এরা শান্তিনিকেতনের ছেলে—আমার অসুখ শুনেই চলে এসেছে। কারপুসকিন এসে বললেন—একটু পরে আমাকে নিয়ে একজন বড় ডাক্তারের কাছে clinic-এ পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগারোটার সময়ে অ্যাকাডেমির মোটর গাড়ী এল, আমরা সকলেই উঠলাম। কৃপালনী ও দ্বিবেদীজি যাবেন ভারতীয় দূতাবাসে। তাঁদের সেখানে নামিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে কারপুশ্‌কিন ক্লিনিকে চললেন। এখানকার ক্লিনিকে ডাক্তাররা দেখেন বিনা পয়সায়—যেমন আমাদের দেশেও; ঔষধপথ্য রোগীদের কিনতে হয়। আমি বারান্দায় কিছুক্ষণ বসলাম—কারণ তখন ডাক্তারের ঘরে আরেকজন রোগী ছিলেন। আমাকে যে ডাক্তার দেখলেন, তিনি বয়স্ক এবং পুরুষ মানুষ। ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বললেন, বিশেষ কিছুই নয়—একটা ওষুধ লিখে দিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল—অবশ্য বরিসের মারফৎ। তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত পড়েছেন, একটি প্রবন্ধও লিখেছেন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থের জন্য। আমার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী এবং খুবই যত্ন ক'রে দেখেশুনে বললেন, বিশেষ কিছু নয়।

ক্লিনিক থেকে ফেরবার সময়ে ভারতীয় দূতাবাসে গেলাম। তখন রাজদূত আছেন শ্রীসুবিমল দত্ত—তিনি আমাকে নামে চেনেন। বর্ধমানে যখন তিনি সদরমহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন তাঁর আদালতে যাই একটা মামলার সাক্ষী হয়ে। আমাদের পাড়ায় একটি ব্রাহ্মণ বাস করত, এক ডোম্‌নীকে নিয়ে লোকটি সদ্ ব্রাহ্মণ ব'লে শহরের বিবাহ শ্রাদ্ধের বড় বড় ভোজে ভোজের রান্না করতেন। শান্তিনিকেতন থেকে বাড়ী ফিরছি—দেখি পুলিস ক'জন সে বাড়ীতে হানা দিয়েছে। প্রতিবেশীর কি হ'ল জানবার জন্য গেলাম। স্থানীয় পুলিসের লোক আমায় চিন্‌তেন, বললেন—একটা খানাতল্লাসীর সাক্ষী হন। ব্যাপার কি শুধালাম। তাঁরা বললেন, 'ইনি নোট ডবলিং করেন ব'লে অভিযোগ এসেছে, তাই এই খানাতল্লাসী।' কাঁচ, সিল্কের কাপড়—কি সব পেল মনে নেই। মোট কথা, সেই মামলায় সাক্ষী দেবার জন্য বর্ধমান যাই। সুবিমল দত্তের এজলাসে মামলা হয়। মনে আছে তিনি আমায় বস্‌বার জন্য চেয়ার দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। বহুকাল পরে তাঁকে আজ দেখলাম—রাষ্ট্রদূতরূপে। বিশাল ঘরে একা ব'সে। শুনে এসেছি যে তিনি দু'দিন পরে ভারতে ফিরে যাচ্ছেন। কিছুকাল আগে তাঁর একমাত্র পুত্র মস্কোতে এই বাড়ীতে মারা গেছে। সে এসেছিল বেড়াতে বাপের কাছে। দু'বছর আগে মিঃ দত্তর স্ত্রী মারা গেছেন—এবার গেল ছেলে। মন ভেঙে গিয়েছে—কাজে আর মন দিতে পারছেন না। ফিরে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারী হবার কথা হয়েছে। বহুকাল বৈদেশিক সচিবের কাজ করেছেন; আগের যুগের I. C. S.-দের মধ্যে নামকরা লোক। মিঃ দত্ত ধূমপান করেন না, অন্য ব্যসন ত দূরের কথা। তবে দূতাবাসে রাখতে হয় সবই—তাও বললেন। ভারতীয় দূতাবাসের অপব্যয়ের কথা প্রবাদগত। স্বাধীন ভারত দেশে দেশে দূতাবাস খুলে প্রথম কয়েক বৎসর যে-ভাবে টাকা উড়িয়েছিলেন তার কথা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। আসলে যে ছেলেকে বাপ যৌবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নাবালক বানিয়ে হাত খরচটি হাতে দেন না, সে যখন বাপের মৃত্যুর পর কাঁচা পয়সা হাতে পায়, তখন যেমন দুই হাতে খয়রাতি ক'রে কাপ্তানী দেখায়—আমাদের দেশের সরকারী টাকা নিয়ে তেমনি ছিনিমিনি খেলা চলেছিল এবং তাতে যে এখনও দাঁড়ি পড়েছে, তাও নয়। তবে বিদেশে স্টার্লিং ব্যালেন্স কমলেই শ্মশানবৈরাগ্যের মত ব্যয়-সঙ্কোচের কথা মনে পড়ে। তার পরে গলায় গাবের বীচি নেমে গেলেই, স্বর বদলে যায়—তখন বলে, 'গাব খাব না খাব কি, গাবের বাড়া আছে কি।' নানা ছুতোয় লোক বিদেশে চলতে সুরু করে—স্টার্লিং-এর অভাব হয় না। স্ত্রী ত সঙ্গে যানই, অপগণ্ড শিশুরও বিদেশ ভ্রমণে সহায় হয়।

শুনেছি ভারতীয় দূতাবাসের এক অংশে ১৮১২ সালে নেপোলিওন মস্কো আক্রমণ করতে এলে এখানেই বাসা বেঁধেছিলেন, ভেবেছিলেন, রুশ কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হবে। সে সব কথায় পরে আসতে হবে।

সেদিন দুপুরে লাঞ্চে সুপ্ ও আঙুর ছাড়া কিছু খেলাম না। দুপুরে কৃপালনীরা গেলেন লেখকদের সভায়—আমি গেলাম না, হোটেলেই থাকলাম। সন্ধ্যার পর পাপেট শো অর্থাৎ পুতুল নাচ দেখতে চললাম। সঙ্গে বরিশ কারপুশ্‌কিন। লিডিয়া আজ এলেন না। থিয়েটারের মত ঘর—আমাদের টিকিট একই জায়গায় পাওয়া যায় নি; তাই পৃথক্ পৃথক্ বসতে হ'ল। আমি ও দ্বিবেদী দ্বিতীয় পংক্তিতে চেয়ার পেলাম—সুতরাং দেখতে কোন অসুবিধা হ'ল না। পুতুল দিয়ে একটা

অভিনয়। অভিনয়ের বিষয় হচ্ছে মার্কিনী সিনেমা তৈরীর বিদ্রূপ। ডিরেক্টর, লেখক, পুঁজিপতি, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজ নিজ স্বার্থ ও খেয়ালখুশি-মত কাজ করছে; বিবিধ দৃশ্য আনতে হবে ব'লে ফরমাইশ—বৈচিত্র্য চাই। তাই স্পেনীশ দেশীয় ষাঁড়ের লড়াই—মাতাদোর পর্যন্ত এলেন। সিনেমার ফিল্‌ম তোলা হচ্ছে তাও পুতুল দিয়ে দেখান হ'ল ইত্যাদি। মোট কথা, হাসির ব্যাপার সবটা মিলে—উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ করা। কথা বলছে অবশ্য রুশী ভাষায়। কুকুর একটা লেজ নাড়ছে ও ঘেউ ঘেউ করছে, ষাঁড়টা তেড়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক আকার সবারই। অভিনয় শেষে যাঁরা পুতুল নাচাচ্ছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ পুতুল নিয়ে বেরিয়ে এলেন, একি—এ যে সব doll, ছোট ছোট পুতুল, সেল্যুলয়েডের। ষ্টেজের কায়দায় বাইরে থেকে দেখাচ্ছিল মস্ত!

রুশীয় পুতুল নাচ য়ুরোপের পরম্পরাগত পদ্ধতি থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। সার্জাই ওব্রাজৎসোব (obraztsov) ডিরেকটর হয়ে নূতন টেক্‌নিক্ আনেন। সমকালীন সমস্যাদি নিয়ে এঁরা ছবি সৃষ্টি করেন। এক একটা পুতুলে কত অদৃশ্য সুতো আছে জানিনে; তবে পড়েছি ছয় থেকে ত্রিশটা পর্যন্ত সুতো লাগানো থাকে পুতুলের দেহের নানা অংশে, যাতে ক'রে অতি সূক্ষ্ম নড়াচড়াও দেখানো যায়। আজকের পুতুল নাচে ও দোলনে কি সূক্ষ্ম ভাবভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে।

অ্যাকাদেমির গাড়ি ঠিক সময়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা হোটেলে ফিরলাম ঠিক সাড়ে নয়টায়। একটু সুপ, আইসক্রীম খেলাম। হোটেলে আজ নাচ জমেছে। কন্‌সার্ট বাজছে একটা মঞ্চের উপর—জন ছয় লোক নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজাচ্ছে। যে লোকটা ড্রাম, করতাল, কাঠি একসঙ্গে বাজাচ্ছে—তাকে দেখতে আমার খুব মজা লাগছিল। লোকটাও বেশ আত্মচেতন ছিল, তার বাজানোর কায়দায়। যেই নূতন একটা সুর বেজে ওঠে—অমনি নরনারীর দল খাওয়া ছেড়ে একটু নেচে আসে, আবার খেতে বসে। খাওয়ার সঙ্গে পানটাও চলে—তা ছাড়া ধূমপান। একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক একটি তরুণীকে পেয়েছেন, খুব নাচছেন তার সঙ্গে। উৎসাহটা তাঁর দিকেরই বেশী; কারণ 'কারণ সলিলটা' একটু বেশী পরিমাণে উদরস্থ হয়েছে। মেয়েটি যদি আরেকটু উৎসাহ দেখাত তবে তিনি নাচ জমাতে পারতেন। সব খাদকই যে খাদ্য ছেড়ে উঠে নাচতে যান, তা নয়। আমাদের মত বেরসিকও আছে। পাশের টেবিলে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁরা খাচ্ছেন ও পান করছেন—নাচের দিকে মন নেই; তবে মনে হয় মাঝে মাঝে নাচের দিকে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটছেন। আমরা ১১টার পর খাওয়ার ঘর ছাড়ি, তখনও খাওয়া চলছে। কন্‌সার্ট বন্ধ হয়েছে এগারোটায়। খাওয়ার সঙ্গে পানের পরিমাণটা দেখবার মত। শীতের দেশে প্রচুর খেতে হয় ও দেহকে তাজা রাখবার জন্য পানটা করতে হয় পেট ভরে সেই অনুসারে, মাতালও দেখেছি, মাতলামি করতেও দেখেছি ভড্‌কা রুশীয়দের জাতীয় 'পানীয়'—সকলেই খায়, যেমন আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পচুই ও তাড়ি। তবে হোটেলে নানা রাষ্ট্রের ভাল 'ওয়াইন' প্রচুর বিক্রী হয় দেখতাম রোজই।

—০—

গ্রন্থ-পরিচয়

মায়া মুকুর : শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী। পি, দে এণ্ড কোং কর্তৃক ৪২-এ, বিডন রো, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৬০, মূল্য ৪·৫০ নঃ পঃ।

প্রবীণ সুকবি শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ীর এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ছন্দ, ভাব ও ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই কবির পরিণত সাধনা ও নিবিড় অনুভূতির স্পর্শে স্নিগ্ধ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থের 'মাটি চাই মাটি', 'স্বাধীনতা ওগো স্বাধীনতা', 'দুই অবদান', 'কবির প্রতি', 'মায়া মুকুর', 'বাদল সাঁঝে', 'স্মৃতির শ্মশান', 'তবু চলে যেতে হবে' 'শেষ শয্যায় সাজাহান' প্রভৃতি কবিতা তাঁহার কবিপ্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রকৃতির অতি সাধারণ রূপও তাঁহার লেখনীস্পর্শে জীবন্ত চিত্রে পরিণত হইয়াছে—

'পুকুর জলে ডাহুক চলে, পানকোড়িয়া ভাসে,
সাঁঝের কাজল মেখে সে জল আঁধার হয়ে আসে;
আকাশপথে বকের সারি
আবাস পানে দিচ্ছে পাড়ি,
তাদের ডাকে চমকে উঠে ডাহুক পাখা ঝাড়ে,
পানকোড়িয়া পাখনা মেলে পালায় চুপিসাড়ে।'

(বনপুকুরের ধারে)

'অসীমে অদেখা পাপিয়ার গান বায়ুভরে ভেসে আসা,
আষাঢ়-আকাশে নব মেঘভার চাতকের চির আশা,
কুসুমকলির কম তনুময়
পিয়াসী অলির ভীরু অনুনয়
বাসিয়াছি ভালো, ভালোবাসিয়াছি মানুষের ভালবাসা।'

(তবু চলে যেতে হবে)

উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু আমরা পাঠকবর্গকে সমগ্র কাব্যখানি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। এই কাব্যগ্রন্থে যে সকল ব্যঙ্গ কবিতা আছে, সেগুলি পাঠককে উৎফুল্ল করে কিন্তু উদ্দিষ্টকে পীড়িত করে না। পাকা হাতের পাকা লেখা। ছেলেদের কবিতাগুলির মধ্যেও কবির সহজ সরল শিশু-মনের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই। এরূপ একখানি মূল্যবান্ কাব্যগ্রন্থে অজস্র ছাপার ভুল ও ফর্মার গোলযোগ থাকা যে দুঃখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ সকল ত্রুটিবিচ্যুতি দূর হইবে।

উপনিষদ নৈবেদ্য— পুষ্প দেবী। ১, ডাঃ শ্যামাদাস রো, কলিকাতা-১১। মূল্য ২৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি মূল উপনিষদের কাব্যানুবাদ। পূর্বে একখণ্ড

প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ছিল ঈশ, কেন ও কঠ-এর কাব্যানুবাদ। বর্তমান গ্রন্থে আছে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরিয় ও ঐতরিয়োপনিষদ্। উপনিষদ্ দুরূহ গ্রন্থ। ইহার অনুবাদ করা ততোধিক দুরূহ। ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গেলে রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত হয়। অনুবাদ তিনিই করিতে পারেন যিনি সেই রসের রসিক, তদ্ভাবে ভাবিত। ভাবানুসরণই হইল অনুবাদের প্রধান কথা। এই কারণেই, ইহা অনুবাদ হইয়াও স্বতন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতাগুলি সরল ও সহজ। এই সহজ করিয়া বলাও বড় কঠিন কাজ—চেষ্টা করিয়া ইহা আয়ত্ত করা যায় না। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত। পুষ্পদেবীর এই স্বতঃস্ফূর্ততাই কবিতাগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়াছে।

এই উপনিষদের শ্লোকগুলি পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'শতশ্লোকী-গীতা' তাঁহাকে আরও সুপরিচিতা করিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলার কিছু নাই। মূল গ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নাই, তাঁরা এই গ্রন্থ হইতেই উপনিষদের মর্মকথা জানিতে পারিবেন। প্রচ্ছদপটটি বিষয়বস্তুর অনুরূপ হইয়াছে।

নব জীবনোপনিষদ্ (১ম পর্ব)—শ্রীসংগ্রাম সিংহ দেবশর্মন, ৫, কমার্শিয়াল বিল্ডিং, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১। মূল্য ৩৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের কয়েক বৎসরের দিনপঞ্জী। গ্রন্থকার ইহাকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন—সাধন, শ্রুতি ও দর্শন। গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আত্মচিন্তা এই গ্রন্থের উপজীব্য। তা ছাড়া সাধন পথের এই পথিক যেভাবে অধ্যাত্ম জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছেন তাহাই অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। অনেক ঘটনাই অলৌকিক বলিয়া মনে হইবার সম্ভাবনা হয়ত আছে, কিন্তু বিশ্বাসী মন লইয়া বিচার করিলে ইহাকে অবহেলা করাও যায় না। রসের ব্যাখ্যা করা যায় না, উহা অনুভূতি সাপেক্ষ। ভাগবদ্ কথার মধ্য দিয়া যে উপদেশাবলী আমরা পাইতেছি, জীবন গঠনের পক্ষে তাহাই ত বড় সহায়ক। এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধারণ পাঠক ইহাতে উপকৃত হইবেন।

শ্রীগৌতম সেন

সাহিত্য চিন্তা: অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, শান্তি লাইব্রেরী, ১০বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

এক সময় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং আরও অনেকে 'সাহিত্যের সীমানা' লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত রচনাই সাহিত্য। তাহাকে সীমানায় বাঁধা যায় না। বাঁধিতে গেলে তখন আর তাহাকে শিল্প বলা চলে না। এই সীমানা লইয়াই, অমিয়রতনবাবু তাঁর 'সাহিত্য চিন্তা' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা, আমাদের বর্তমান সাহিত্যে—বিশেষ করিয়া গল্প উপন্যাসে রাজনীতির প্রভাব সংক্রামিত হইয়াছে। পাঠককে যাহাই পরিবেশন করা হইতেছে তাহাই গিলিতেছে। হয়ত এক শ্রেণীর কাছে লেখকেরা বাহবাও পাইতেছেন। কিন্তু কালের বিচারে ইহার মূল্য কতটুকু? এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন: "ঘটে যা, তাই নিয়ে ইতিহাস; ঘটে নি যা, ঘটে না যা—এমনতর বহুবিধ সত্যরূপ আছে মানুষের জীবনে—ঋষিদৃষ্টি সাহিত্যিকেরাই তা দেখেন, দেখতে পান। ইতিহাস বলে, ঘটে যা—তাই সত্য। সাহিত্য বলে, বস্তু-সংসারে যা ঘটে, সব সময় তা যে জীবনের পরমকে প্রকাশ করে, তা ত নয়। জীবনের পরম সত্য কবির মনোভূমিতে স্বপ্নরূপে জাগাতে পারে, সংকল্পকে প্রেরণাও যোগাতে পারে। পৃথিবীর বস্তু-ভূমির চেয়ে কবির মনোভূমি তাই সত্যতর। যা ঘটে, ঘটেছে, ঘটেছিল—জীবনের তা সামান্যতম বিকাশমাত্র; আজও যা ঘটে নি, এমনকি ঘটবে না কোনদিন, জীবনের সাধনা ও গতি অনাগত সেই অপ্রকাশের আনন্দেও। মনে রাখা ভাল, ইতিহাসের জন্যে জীবন নয়, জীবনের জন্যেই ইতিহাস। সাহিত্যে পূর্ণতম জীবন জানার ও মানার—অর্থাৎ অখণ্ড জীবনগত বিশ্ব-বৈচিত্র্যের রসনিপুণ বাণী আনার কথাটাই আসল কথা।"

সাহিত্য যদি প্রচার-ধর্মী হয় তবে সেইখানেই সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটিবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাম্যবাদী সাহিত্যিকেরা ইহা স্বীকার করেন নাই। আজ অবশ্য তাঁহাদের মতের কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। যে গোর্কীকে লইয়া তাঁহারা মাতামাতি করেন, তিনিও ত কোথাও শিল্প-চিন্তা হইতে দূরে সরিয়া যান নাই। প্রচার হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে কোথাও থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক-ধর্ম তিনি নষ্ট করেন নাই।

"আর্টের জন্য আর্ট, কি আর্টিষ্টের জন্যই আর্ট কিংবা ভারতীয় আত্মিক ভাবনার জন্য আর্ট অথবা সমাজতন্ত্রী বস্তুবাদের নীতি-প্রচারের জন্য আর্ট—সাহিত্য-প্রসঙ্গে এ-সমস্তই আংশিক নীতিমাত্র; অংশ দ্বারা পূর্ণকে আচ্ছন্ন করার বিভ্রান্তি আছে এ সব নীতিতে। কথাটা সেকেলে হ'লেও মান্যযোগ্য নয়, আনন্দ বা রসই আর্টের আত্মশক্তি।"

অমিয়বাবু সাহিত্য-ধর্ম ও সাহিত্যিক-ধর্মকে যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর রসানুভূতির পরিচয় পাই। তাঁর বক্তব্যের মূল সুরই হইতেছে, "একথা আমি বিশ্বাস করি যে, সমাজতন্ত্র সত্য এবং ফলপ্রসূ; কিন্তু ভারতের সমাজতন্ত্র ভারতেরই চরিত্রানুসারে পরিকল্পিত হবে, রাশিয়া বা চীনের চরিত্রানুসারে হবে না।......দলকে জাতির মঙ্গলে, জাতিকে বিশ্বের মুক্তিতে প্রেম-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করাই তরুণ ভারতবর্ষের নির্দেশ। আমাদের যে দলই থাকুক না কেন, একটা জায়গায় আমরা এক এবং অবিচ্ছেদ্য—আমরা ভারতবর্ষের।"

একথা না বলিয়া উপায় নাই, সাহিত্যিকরা আজ প্রায় সকলেই ধর্ম-ভ্রষ্ট। অর্থাৎ তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে ভারতকে পাই না! এই প্রসঙ্গে অমিয়বাবু কবিতার কথাও বলিয়াছেন। সেখানেও, আধুনিক কবিতা কোন্ পথে চলিয়াছে—আক্রমণ না করিয়া, তিনি তাঁহার উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন: "সত্যকার কবিত্ব প্রতিভা আসে গূঢ়তর রসবেদনা ও জীবন-চেতনা থেকে। রসবেদনা যাঁর সূক্ষ্ম ও তীব্র, শিল্পবোধ তাঁর আপনা হ'তেই আসে, কৃত্রিম চেষ্টায় তা আনতে হয় না।" লেখক আর একস্থানে বলিয়াছেন, "আধুনিক কাব্যে আঙ্গিক রীতিটা দেখছি কাব্যের প্রয়োজনে কবির স্বভাব থেকে আসছে না, আসছে আধুনিক হওয়ার সজ্ঞান থেকে, সেই হেতু কৃত্রিম, কৌশলকলার তাড়নায়। এতে যে সবসময়ে খারাপ ফল ফলছে তা বলি নে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রীতির দাসত্বে কাব্যকে কুণ্ঠিত হতে হচ্ছে।"

সবচেয়ে বড় কথা তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "হৃদয়ের প্রার্থনা নেই অথচ বুদ্ধির জিজ্ঞাসা আছে—এমন অবস্থায় কবিতার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" নির্ভীকতাই সমালোচনা-গ্রন্থের সম্পদ্। এই সম্পদই গ্রন্থখানিকে মর্যাদা দিয়াছে। সাহিত্যিক মাত্রেই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭০

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭০

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭০

— **রঙীন চিত্র** —

মেঘ ও ময়ূর

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

মেঘ ও ময়ূর
শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৭০

কলিকাতায় পণ্ডিত নেহরু

বিগত ১লা জুলাই, প্রায় এক বৎসর পরে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কলিকাতায় দুইদিনের জন্য আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে অনেকগুলি অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান কর্তার কার্য্য করেন। প্রত্যেক বারই তিনি ভাষণ দিয়াছিলেন। সেই সকল ভাষণের অধিকাংশেই উপলক্ষ্য উপযোগী বাক্যমালার ভূষণ কিছুটা ছিল, কিছু ছিল সেই সকল বিষয়ের চর্চ্চা—যাহার প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা তাঁহার মনকে সদাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং কিছু ছিল স্তোকবাক্য—যাহা সদিচ্ছা বা উন্নত চিন্তাবাচক, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থার গতিতে অর্থহীন বা পরিহাসব্যঞ্জক দাঁড়াইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এবারের ভাষণগুলিতে, বিশেষে ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট্ জনসভায় তিনি এমন কয়েকটি কথা বলেন, যাহাতে মনে হয় পণ্ডিত নেহরুর মানস-কক্ষের দুই-একটি জানালা হয়ত কিছু খুলিয়াছে এবং বাস্তব জগতের হাওয়া ও আলোক সেই পথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার একমুখী চিন্তাধারায় কিছু আলোড়ন আনিয়াছে। জানি না উহা ক্ষণিকের জন্য কি না এবং ইহা বলা অসম্ভব যে, উহা দেশের কোন কাজে লাগিবে কি না। তবে উহা যে উল্লেখযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা ঐ সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্বাগত ভাষণ ইত্যাদিতে গতানুগতিক ধারার বাহিরে কিছুই ছিল না। তাঁহারা প্রত্যেকটি উপলক্ষ্যেই পণ্ডিত নেহরুকে আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহার বাহিরে যে বাস্তব-বাংলার কোনও কিছু সমস্যা পূরণের প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে কেহই কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত বিধানচন্দ্রের ৮২তম জন্মদিবসে। ঐ অক্লান্তকর্ম্মী দেশনেতার স্মৃতিতর্পণে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, যিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নূতন বাংলার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সেই নবীন বাংলার রূপকার চিকিৎসক বিধানচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার যোগ্যতম ব্যবস্থা ঐরূপ একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ। সেই সঙ্গে ডাক্তার রায়ের বাংলা তথা ভারতের কল্যাণসাধন-কার্য্যে আত্মনিয়োগের কথাও পণ্ডিত নেহরু উল্লেখ করেন।

যাঁহারা উদ্যোক্তা, তাঁহারা জমি ও টাকার বিস্তৃতি ও বহরের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই কল্যাণমুখী পরিকল্পনা কবে বাস্তবরূপ ধারণ করিবে সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। বর্ত্তমানে যাহারা শিশু, বাংলার সেই শিশুসন্তানদের কোনও সেবা এখানে হওয়ার সম্ভাবনা কিছু আছে কি না সেকথা অপ্রকাশিতই রহিয়া গেল। পণ্ডিত নেহরু কল্যাণকামী ও

কল্যাণকর্ম্মীর মধ্যে যে প্রভেদ সে সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলিলে কল্যাণকর্ম্মী বিধানচন্দ্রের স্বর্গত আত্মা হয়ত আরও তৃপ্ত হইত।

ঐ দিনই সন্ধ্যায় পণ্ডিত নেহরু মহাজাতি সদনে "ভারতীয় চিন্তাবিদ (!) সম্মেলন" উদ্বোধন কালের ভাষণে প্রথমেই বলেন যে, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি তাহা তাঁহার ঠিক বোধগম্য হইতেছে না। ঐ দিনের সভাপতি ডাক্তার শিশির মিত্র অবশ্য বলেন যে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য দেশের চিন্তাবিদ-গণের (?) মধ্যে একটা সর্ব্বভারতীয় চিন্তা ও ভাবধারার সঞ্চার করিয়া জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ় ও সংহতির গ্রন্থী সুসম্বদ্ধ করা। জানি না এই ব্যাখ্যায় পণ্ডিত নেহরুর মনের ধাঁধা মিটিয়াছিল কিনা, তবে তিনি নিজের ভাষণে ভারতের কয়েকটি প্রধান সমস্যার বিষয়ে কিছু বলেন, এবং সেই প্রসঙ্গের অবতারণায় তিনি বলেন যে, শুধু অতীত গৌরবের কথা আওড়াইলে চলিবে না। তিনি আরও বলেন, শুধু চিন্তা করিলে বা কথা বলিলেও কোন কাজ হইবে না। তাঁহার মতে আমরা বেশী কথা বলি এবং তিনি নিজেও বাদ যান না!

চিন্তাশক্তি এরূপ উন্নত করা প্রয়োজন যাহাতে উহা কর্ম্মে প্রেরণা আনে এবং তাহার দ্বারা সৃজনশীলতা আসে। কেননা, চিন্তা ও কাজ দুইয়েরই প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমাদের সম্মুখে এই প্রশ্নই এখন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে—ভারতকে কি ভাবে গড়িয়া তোলা হইবে? তিনি মনে করেন শিল্প-বিপ্লবের পথে সমৃদ্ধি ও শক্তিলাভ যে জাতি করিয়াছে সেই জাতিই বড় এবং শক্তিশালী। বিজ্ঞান ও শিল্পে-যোজিত ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে জাতি সমৃদ্ধি ও শক্তিলাভ করে।

ভাষণের মধ্যে গান্ধীজীর জীবনে কর্ম্মের প্রাধান্য এবং কি ভাবে তাঁহার সাধনার ফলে ভারতে শক্তির সঞ্চার ও স্বাধীনতা লাভ হয় ও পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে জড়িত জীবনমরণ সমস্যার কথা আলোচনা এবং জাতিভেদ প্রথা ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে চর্চ্চা ইত্যাদি অন্য প্রসঙ্গও ছিল।

দ্বিতীয় দিনে, ২রা জুলাই মঙ্গলবারে, ময়দানের বিরাট্ জনসভায় পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা বিস্তৃত ক্ষেত্রব্যাপী ও দীর্ঘ (৮৫ মিনিট) হয়। এই বক্তৃতার ধরণও কিছু ভিন্ন ছিল। যে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা তিনি করিয়াছিলেন তাহার কয়েকটির মধ্যে নূতনত্ব ছিল উপরন্তু আলোচনার মধ্যে কিছু আত্মজিজ্ঞাসার আভাস ছিল মনে হয়। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয় তবে আশার কথা।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ঐ দিনের বক্তৃতার বিষয়ে বলিয়াছেন ঃ

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার প্রধান প্রধান প্রসঙ্গ এই কয়টি ঃ (১) বিড়লা গ্রহগৃহ ("দেখে মনে হল কত ক্ষুদ্র এই পৃথিবী, কত ক্ষুদ্র আমরা"), (২) প্রজাসমাজতন্ত্রীদের মিছিল ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবির খোলা চিঠি ("দো চার শও কা হুল্লোড়বাজিসে ইস্তফা নহী হোতে"), (৩) ভারতমাতা ও ভারতের সমস্যা ("রাজনৈতিক আজাদী পেয়েছি, এবার চাই আর্থিক ও সামাজিক আজাদী"), (৪) রুশ-চীনের আদর্শগত দ্বন্দ্ব ("ইস্‌মে আউর কুছ হ্যায়"), (৫) বিজ্ঞান শিল্প ও কারিগরি জ্ঞান ("আমরা আণব বোমা তৈরী করব না, আণব-শক্তিকে কল্যাণের কাজে লাগাব"), (৬) চীনা-আক্রমণ ("আমরা একদিকে শক্তি বাড়াব, অন্যদিকে আলোচনার পথ খোলা রাখব"), (৭) পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট পার্টি ("কিছু লোক দেশদ্রোহী"), (৮) জোট-নিরপেক্ষ নীতি ("কিছুতেই ছাড়ব না"), (৯) বিদেশী সাহায্য ("তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ"), (১০) পাঁচসালা যোজনা ("আমাদের স্বয়ম্ভর হতেই হবে"), (১১) সিরাজুদ্দিন কোম্পানী ও কেশবদেব মালব্য ("মালব্যকে তাঁর কাজের জন্যে প্রশংসা জানাই"), (১২) আমরোহা-রাজকোট-ফারাক্কাবাদ উপনির্ব্বাচন ("মনে রাখবেন, সাম্প্রতিক ২৭টি উপনির্ব্বাচনের মধ্যে কংগ্রেস ২০টিতে জিতেছে"), (১৩) স্বতন্ত্র পার্টি ("এরা চায়, আমরা জোট-নিরপেক্ষ নীতি ছাড়ি, আরে চীনও তো তাই চায়"), (১৪) বোকারো ইস্পাত কারখানা ("বিদেশী সাহায্য পাই আর না পাই এ কারখানা হবেই"), (১৫) তারাপুর আণবিক কেন্দ্র ("সাহায্যের জন্য আমেরিকাকে ধন্যবাদ"), (১৬) কলম্বো প্রস্তাব ("পছন্দ না করলেও গ্রহণ করেছি"), (১৭) বিনোবা ভাবে ("তিনি মহাপুরুষ")।

ময়দানে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা-ভাষণের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ওখানে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি বিড়লা

গ্রহ-বেক্ষণাগারে নক্ষত্র ও গ্রহজগতের ক্ষুদ্ররূপ দেখিয়া আসিয়াছেন। উহা দেখিবার পর উঁহার মনে হইতেছিল এই ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীই কতটুকু এবং এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মানুষ আবার কতই ক্ষুদ্র সুতরাং কথার মূল্য কতটুকু? আমরা অনেক সময় মনে করি আমরা বড়—সে আত্মগরিমার মূল্যই বা কি? ঐরূপ ভুল ধারণায় কেহ যেন না পড়েন।

তাহার পর পূর্ব্বদিনে যে রাজভবনের সম্মুখে "বিক্ষোভ-মিছিল" আসে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার মন্ত্রীত্বের ব্যর্থতার কারণে তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিয়া যে "খোলা চিঠি" দেওয়া হয় সে কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে ঐরূপ চিঠি লেখার অধিকার তাঁহাদের নিশ্চয়ই আছে এবং প্রধানমন্ত্রীরূপে তিনি অনেক ভুলত্রুটি করিয়াছেন, একথাও তিনি স্বীকার করেন। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন যে, ঐ "হল্লোড়বাজিতে" বা সোরগোল তুলিয়া কি কোন কাজ হয়? যাহারা এরূপ করিতেছে তাহারা কি তামাসা পাইয়াছে? ভারতের জনতার প্রেমই তাঁহাকে শক্তি যোগাইয়াছে। ভারতে কোন কোন দল আছে যাহারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে, যদিও ভারতে তাহাদের কোনও ক্ষমতা নাই। উপরন্তু ইহাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই, যদিও কংগ্রেসের বিরোধিতায় ইহারা একমত। কোনদিন যদি ইহারা জিতে তবে পরস্পরে গলা ইহারাই কাটিবেন।

সম্প্রতি যে তিনটি লোকসভার উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের হার হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ২৭টি উপ-নির্ব্বাচন হইয়াছে যাহার মধ্যে ২০টিতে কংগ্রেস জিতিয়াছে। ঐ তিনটিতে যাঁহারা জিতিয়াছেন তাঁহাদের তিনি অভিনন্দন জানান। কিন্তু তাঁহারা যে মনে করিতেছেন ভারতের ইতিহাস তাঁহাদের ঐ জিতের দরুন বদলাইতেছে ইহা এক আশ্চর্য্য কথা। ঐ প্রসঙ্গের আরম্ভেই তিনি বলেন যে, তিনি নিজে "ইমানদারীর" সহিত ভারতের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তবে ভুলত্রুটি হইয়াছে।

চীনা আক্রমণের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া এক দলের লোকেরা তাঁহার পদত্যাগ দাবি করিতেছেন, একথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ দাবি "আক্কলমন্দির" (বুদ্ধিবিবেচনা) পরিচয় দেয় না বরঞ্চ দেয় নির্ব্বুদ্ধিতার। চীন আক্রমণ জটিল প্রশ্ন, সহজ কিছু নয়। চীন বিরাট্ দেশ ও উহারা পরিশ্রমী এবং গত পনেরো বৎসর ধরিয়া তাহারা সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে।

ভারত প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছে কিন্তু চীন সেই বন্ধুত্ব ও শান্তিকামনার প্রতিদানে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। ভারত শান্তিকামী এবং দেশের অবস্থা উন্নত করায় সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। শুধু ফৌজ বড় করিলে দেশের উন্নতি করা যায় না।

চীনারা ভারত আক্রমণ করিয়াছে। ফৌজ অপসারণ করা হইলেও আবার আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। সেই আক্রমণের সহিত যুঝিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে কারণেই পুরা শক্তিশালী ফৌজ তৈয়ারী করিতে হইবে। মিছিল বাহির করিয়া শ্লোগান আওড়াইয়া, ছেলে-মানুষির দ্বারা জগতের ধারা বদলানো যায় না। দেশের উন্নয়ন সহজ কথা নয়, একথা তাঁহাদের বুঝা উচিত।

পাঁচসালা পরিকল্পনা চালাইয়া যাইতে হইবে নহিলে ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম আসিবে কোথা হইতে। আমেরিকা ও অন্য অনেক দেশ ভারতকে অস্ত্র সাহায্য করিয়াছে এজন্য তাহাদের ধন্যবাদ দিই, কিন্তু চিরকাল অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে দেশ স্বাবলম্বী হইবে কেমনে? ভারতকে উৎপাদন বাড়াইয়া শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে এবং নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। ফৌজী, অস্ত্রশস্ত্র দুর্মূল্য এবং ইহা বেচিবার সময় "চালবাজি" (প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য-মূলক সর্ত্ত স্থাপন) চলে ও গলা টিপিয়া দাম আদায়ের চেষ্টাও সেই সঙ্গে চলে। এজন্য এ দেশে হাতিয়ার উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। তাতে সময় লাগিবে সুতরাং সেই চেষ্টার সঙ্গে আমদানীও চলিতেছে।

চীনারা "কৃপা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে" কোন কোন লোকের এই মন্তব্যের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উহা অতি উদ্ভট ধারণা। তিনি বলেন, চীনাদের আশা ছিল যে, এই নানা-মতবাদে-কণ্টকিত দেশ তাহাদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিপ্লবে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু আক্রমণের প্রতি-ক্রিয়ায় তাহার পরিবর্ত্তে দেশ একতাবদ্ধ হওয়ায় আক্রমণ বন্ধ হইল, কেননা চীন বুঝিল কোটি কোটি লোকের সহিত লড়িতে হইবে এবং সেই কারণেই তাহারা ফিরিয়া গেল। বাধা প্রবল বুঝিয়াই তাহারা ফিরিয়াছে প্রেম বা করুণার জন্য নয়। তাহাদের চিঠিতে অসভ্য ভাষা তাহার প্রমাণ।

এই সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের যে-দল চীনাদের দালালী ও পঞ্চম-বাহিনীর কাজ করিতেছে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার ক'

স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রপার্টি-প্রমুখ কয়েকটি দলের কথা বলেন, যাহারা চাহে ভারত একটি শক্তিগোষ্ঠীতে যোগদান করুক। ঐ মতের খণ্ডনে তিনি বলেন যে, ঐ পথে ভারত একটি বড় লড়াইয়ের দ্বার খুলিয়া দিবে এবং বর্ত্তমানে যে দুই বিরোধী গোষ্ঠী হইতেই ভারত সাহায্য পাইতেছে তাহাও রুদ্ধ হইবে। চীন ত ইহাই চাহে।

অন্য প্রসঙ্গের চর্চ্চা, যথা মালব্য ও ইব্রাহিমের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ইত্যাদি। তিনি গতানুগতিক ধারাতেই করিয়াছিলেন সুতরাং সেগুলির উল্লেখ ও আলোচনার প্রয়োজন নাই।

নিজেকে বড় মনে করায় এবং সময়ে-অসময়ে নিরর্থক বড় বড় কথা বলায় যে, কোনও কাজ হয় না—একথা পণ্ডিত নেহরু একাধিকবার বলিয়াছেন এবং নিজেরও যে সে দোষ আছে, সে কথাও স্বীকার করিয়াছেন প্রথম দিনে ও দ্বিতীয় দিনের ভাষণে। উপরন্তু ময়দানের ভাষণে তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের কাজে যে ভুলত্রুটি হইয়াছে একথা তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন একাধিকবার। এরূপ স্বীকৃতি পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন! নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর অটল বিশ্বাস, নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করা ও নিজের মতবাদ এবং নিজের কথার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব ও মূল্য আরোপ করা ইত্যাদি আত্মপ্রশস্তির পথেই তিনি এই পনেরো-ষোল বৎসর কাল চলিয়াছেন। আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মপরীক্ষা যে তাঁহার কখনও প্রয়োজন হইতে পারে, একথা তিনি মনেও স্থান দেন নাই। এতদিনে মনে হয় যে, হয়ত বা অতি কঠোর আঘাতের ফলে তিনি নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং তাহারই ফলে হয়ত এই চিন্তাধারায় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে।

তিনি বলিয়াছেন আমি 'ইমানদারীর' সহিত ভারতের সেবা করার চেষ্টা করিয়াছি।" ইমানদারী শব্দে বিশ্বস্ততা, ন্যায়ধর্ম্মানুগত্য ও সততা এই তিনেরই সমষ্টি বুঝায়। আমরা বিশ্বাস করি যে, পণ্ডিত নেহরু জ্ঞানতঃ এই তিনটির ব্যতিক্রম করেন নাই এবং তাঁহার ইমানদারীর উপর সন্দেহ এমন কোনও লোকে করে না, যাহার পর্য্যাপ্ত জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনা আছে ও তাহা সরল পথে চালিত হয়। তবে অতি মহৎ লোক, চাটুকার এবং স্তাবকের চক্রান্তে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়, ইহা ত জগতের ইতিহাসে অসংখ্য নিদর্শনে প্রমাণিত সত্য। এবং চাটুকার ও স্তাবক লোক কদাচিৎ ইমানদার হয় ইহাও ইতিহাসেরই লিখন। পণ্ডিত নেহরু ইতিহাসের এই দুইটি পাঠ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার আগ্রহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই বলিয়াই এত গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে।

কংগ্রেস এখন ভাগ্যান্বেষীর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বস্ত লোক ও সৎলোকের অভাবে যে এরূপ হইয়াছে তাহা ঠিক নয়, কেননা দেশে কংগ্রেসের আদর্শবাদে বিশ্বাসী ও অনুরক্ত লোক যথেষ্ট আছে। কিন্তু যেমন—গ্রেশামের ন্যায় অনুযায়ী—মেকী টাকায় সাঁচ্চা টাকাকে বাজার হইতে বহিষ্কৃত করে তেমনই ঐ স্বার্থসর্ব্বস্ব খল ও কপটদের চক্রান্তে ও প্রভাবে সৎলোকও কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইতেছে কিংবা নির্জীব জড়ভরতের রূপে মূকবধির সমর্থকের ভূমিকায় রহিয়াছে। কংগ্রেসের এই অধঃপতনের দায়িত্ব পণ্ডিত নেহরু এড়াইতে পারেন না। এই অধঃপতনেরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ যে দুর্নীতি ও অনাচারের স্রোতে দেশ প্লাবিত হইতেছে এবং দেশের নিম্নস্তর হইতে উচ্চতম অধিকারীবর্গ অধিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের উচ্চাসন পর্য্যন্ত যে সেই পঙ্কিল স্রোতের আবর্ত্তে আসিয়াছে, একথা ত দিনের আলোকেরই মত সুস্পষ্ট—অথচ পণ্ডিত নেহরু তাহা যেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্য!

যদি পণ্ডিত নেহরুর ভাষণে যে আত্মজিজ্ঞাসার ইঙ্গিত আমরা দেখিতেছি মনে করি, তাহা যথার্থই প্রকৃত হয় এবং যদি উহা ব্যাপক ও স্থায়ীরূপ ধারণ করে তবেই মঙ্গল, নহিলে নয়।

ভারতের কর্ণধারগণ ও ভারতের জনতা

ডিমোক্রাসি শব্দের প্রকৃত অর্থ আমাদের দেশের অধিকারীবর্গ সম্যক্‌ভাবে বুঝেন কি না সন্দেহ। অবশ্য ইহাও সম্ভব যে, তাঁহারা সকলে ইহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন, কিন্তু উহা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব নয় বলিয়া উহা শিকায় তুলিয়া রাখিয়া নিজের ইচ্ছামত চলেন। সেক্ষেত্রে বলিতে হয় যে, ইহাদের কথা এক, কাজ অন্য প্রকার। অথচ ঐ মহাশয়গণ দেশে-বিদেশে বলিয়া বেড়ান যে আমাদের দেশ লোকায়ত্ত রাষ্ট্র, এ দেশের শাসনতন্ত্র দেশের জনসাধারণের ইচ্ছাধীন, এ দেশের সরকার দেশের জনগণউদ্ভূত, উহাদের দ্বারাই চালিত এবং উহাদের স্বার্থেই চালিত (Government of the People, by the People, for the People) ইত্যাদি। কিন্তু কার্য্যতঃ

আমরা দেখি কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মই চলিতেছে, প্রজাসাধারণ তথা ইতরজনার জন্য মাঝে মাঝে মিষ্ট বাক্যের (মিষ্টান্ন নহে) ফোয়ারা ছুটাইয়া দেওয়া হয়—এবং আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দেশের সকলে সেই মধুর বাক্যামৃতের সিঞ্চনেই তৃপ্ত ও তুষ্ট হইয়া শান্ত থাকে !

পণ্ডিত নেহরু এক বৎসর পরে পুনরায় আসিলেন এবং তাঁহার যথারীতি অভ্যর্থনা সম্বর্দ্ধনা হইল এবং সেই সঙ্গে, কলিকাতার প্রথামত বিক্ষোভ মিছিলের ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু কার্য্যতঃ, দেশের লোকের তথা বাংলার জনসাধারণের স্বার্থ বা কল্যাণকার্য্য বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইল কি ? আমাদের মুখপাত্রগণ প্রকাশ্য সভাসমিতি ইত্যাদিতে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন ও প্রশস্তি-বাচন এবং সেই সঙ্গে কিছু নিরর্থক স্তুতির আবৃত্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। বিপক্ষ দলও "গাছে না উঠিয়াই কাঁঠাল" প্রাপ্তির দাবি জানাইয়া কোলাহল তুলিলেন কিন্তু তাহাও দলগত স্বার্থে, জনস্বার্থে নয়। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, "নেপথ্য সংলাপে" অন্য ধরণের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আপনার বা আমাদের কোন্ উপকারে লাগিবে, তাহা কে জানে ?

ময়দানের ভাষণে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন "ভারতের জনতার প্রেমই তাঁহাকে শক্তি যোগাইয়াছে" (আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট) এবং চীনাদের সৈন্য অপসারণের কারণ-ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন ঐ আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় দেশের লোক ছত্রভঙ্গ হওয়ার পরিবর্ত্তে একতাবদ্ধ হওয়াতেই চীন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। দুই স্থলেই তিনি বুঝাইয়াছেন যে, দেশের লোকের সংহত শক্তিই তাঁহাকে ও এই রাষ্ট্রকে শক্তিমান্ করিয়াছে। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে দেশের নানা স্থলে প্রকাশ্য সভায় তিনি এই একই কথা নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

একথা সত্য যে, চীনা আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় এ দেশের জনসাধারণের মনে যে প্রবল উত্তেজনা ও শত্রুকে প্রতিহত করার কাজে যে বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া দেখা দেয় তাহাতেই বহির্জ্জগৎ বুঝে যে, এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষার বিষয়ে যতই অসতর্ক ও অস্থিরচিত্ত হউন না কেন, দেশের জনসাধারণ দৃঢ়চিত্তে শত্রুর সম্মুখীন হইবে এবং তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যুদ্ধদান করিবে। সমস্ত দেশের এই জাগ্রত ও যুযুৎসু ভাব দেখিয়া ভারতের মিত্রদেশগুলি বিনা দ্বিধায় আমাদের সাহায্য দানে অগ্রসর হয় এবং অস্ত্র সাহায্য ভিন্ন অন্য সকল প্রকার সহায়তার প্রতিশ্রুতিও চতুর্দ্দিক হইতে আসে। ইহার ফলে চীন হতোদ্যম হইয়া সৈন্য অপসারণ আরম্ভ করে।

কিন্তু সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা আজ কি অবস্থায় আছে ? যদি কেহ বলেন যে, সেই প্রবাহের গতিমুখ রুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে এবং স্রোত ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে তবে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কি উত্তর দিতে পারেন ? কর্ত্তৃপক্ষ যাহাই বলুন দেশের লোক বুঝিতেছে এবং ক্রমে সারা জগৎ বুঝিবে যে, দেশের এই বিরাট শক্তি-সামর্থ্যের জাগরণ ও স্ফুরণ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের যত্ন ও চেষ্টার অভাবে। যে ভাবে এ অভাগা দেশের শক্তিসামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তা ও সঙ্গতির নিদারুণ অপচয় ও অপব্যয় চতুর্দ্দিকে চলিতেছে সজাগ দৃষ্টি ও যত্নের অভাবে সেই ভাবেই কি এত বড় সংহত শক্তিও নষ্ট হইতে দেওয়া হইবে ?

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, ভারতের জনতার প্রেমই তাঁহাকে শক্তি যোগাইয়াছে এবং চীনাদের সৈন্য অপসারণও সেই ভারতের জনতার মধ্যে একতার ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার দৃঢ় সংকল্পের কারণেই ঘটিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু যেভাবে ও যে ঘটনা-পরম্পরায় এই কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাতে উহা যে তাঁহার অন্তরের কথা তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু এই প্রেম, বিশ্বাস ও প্রবল সমর্থনের বদলে সেই জনসাধারণ কি প্রতিদান এবং সহকারিতা ও সহায়তা পাইতেছে বা প্রত্যাশা করিতে পারে, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। এবং সেই সঙ্গে এ প্রশ্নও আসে যে, পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভার অন্য অধিকারীবর্গের মনে কি ভারতের জনতার সম্পর্কে কোনও নিঃস্বার্থ চিন্তার উদয় কখনও হয় ? অন্তরের যোগ ত দূরের কথা, পণ্ডিত নেহরু ছাড়া অন্য কেহ সে কথা উচ্চারণও করেন না—নিজের দায় না ঠেকিলে পরে—তাহাদের দুঃখ-কষ্ট, সহ্যশক্তির সীমা, এ সকল বিষয়েও ত কেহই উচ্চবাচ্য করেন না।

স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ হইল এবং তাহার প্রত্যক্ষ ফল প্রথমে দেখা গেল অগণিত দরিদ্র স্বর্ণকার-শিল্পীর জীবিকা-অর্জ্জনের পথ রুদ্ধ হওয়ায়। এই নির্দ্দোষ ও অসহায় হতভাগ্যদিগের যন্ত্রণা মোচনের জন্য কোনও সাহায্য বা তাহাদের অভ্যস্ত কাজের বদলে অন্য কোনও জীবিকা-অর্জ্জনের সংস্থান

করার প্রশ্নের উত্তর আসিল "এই বিরাট্ দেশের প্রত্যেকটি লোকের দুঃখ মোচনের ক্ষমতা সরকারের নাই"। অর্থাৎ সরকার অন্নের সংস্থান নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু অন্নের অভাব পূরণের দায়িত্ব তার নয়।

আজ নানা অঞ্চলে বিক্ষোভ ও সেই সূত্রে সংবাদপত্রে তীব্র আন্দোলনের পরে ও তাহার উপর গুজরাটে কংগ্রেসের দুর্গস্থলে লোকসভার উপনির্ব্বাচনে বিপর্যয়ের ফলে সরকারের সুর বদল হইয়াছে। অবশ্য এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন রাজ্য সরকার—বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার—এবিষয়ে প্রথম হইতেই অবহিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন, নয়াদিল্লীর উন্নাসিক উষ্ট্রপক্ষীদের মত বাস্তববিচারহীন ছিলেন না। এতদিনে দেখি যে, স্বর্ণকার-পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে সরকারী চেতনা আসিয়াছে, যথা :

বোম্বাই, ২রা জুলাই—আজ এখানে অনুষ্ঠিত স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভায় স্বর্ণকারদের জন্য একটি পুনর্ব্বাসন কার্য্যসূচী অনুমোদিত হইয়াছে। এই কার্য্যসূচীর জন্য আগামী দুই বৎসরে দশ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং ৭৫ হাজার বেকার স্বর্ণকারের কর্ম্মসংস্থান হইবে।

স্বর্ণবোর্ডের এক সূত্রে প্রকাশ, স্বর্ণকারদের পুনর্ব্বাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে-সব স্কীম ও প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন এবং বোর্ডের সদস্য-সম্পাদক ডাঃ এন এ শর্ম্মা সম্প্রতি ছয়টি রাজ্যে পরিভ্রমণের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, উহাদের ভিত্তিতে এই কার্য্যসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে। কার্য্য-সূচীটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইতেছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও তাঁহার ৯ই জুলাইয়ের বেতার ভাষণে এই স্বর্ণকার-পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন—অন্য নানা তত্ত্ব কথার মধ্যে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থাতেও অনুরূপ ব্যবস্থার অভাব দেখা যাইতেছে। সরকার অর্থ নিষ্কাশনের যন্ত্র-চালনে যথেষ্ট তৎপর, কিন্তু যাহাদের নিষ্পেষণ করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে সেই অল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ যে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির ফলে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ তাপ-উত্তাপ দেখা যায় নাই। এখনও চলিতেছে বড় বড় কথা ও মুনাফাবাজ অসাধু ব্যবসায়িগণের উদ্দেশে উপদেশমালার রচনা। "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" এই সার্থক প্রবাদটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কি কেহই জানেন না?

দেশের লোকের বিপদ্-আপদে মন্ত্রিসভার এই নির্ব্বিকার ভাব জনসাধারণের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কর্ত্তাব্যক্তিগণ জানেন? পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণের সমস্যা-পূরণে রাজ্য সরকারই কি কেন্দ্রীয় ধুরন্ধরগণের সহানুভূতি ও সহায়তার অভাব অনুভব করেন না?

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পণ্ডিত নেহরুর আগমনে যে-সকল আড়ম্বরপূর্ণ সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইল সেখানে এ জাতীয় কোনও প্রশ্ন বা কথা উঠে নাই। জনসাধারণের পক্ষ হইতেও কেহ অগ্রসর হইয়া এই সকল কথার অবতারণা করেন নাই। অবশ্য কয়েকজন বিশেষ নাগরিক পণ্ডিত নেহরুর নিকট এক খোলা চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সে চিঠিও অগোছাল এবং যুক্তির দিকে সর্ব্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নহে।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান

কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের স্বার্থরক্ষা ও এই মহানগরীর পৌর-প্রতিষ্ঠান সুচারু ও যথাযথভাবে পরিচালন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন প্রয়োজন মনে করেন। এই জন্য রাজ্য সরকার এক খসড়া বিল রচনা করিয়াছেন। এই খসড়া বিল সম্পর্কে "যুগান্তর" নিম্নে উদ্ধৃত চুম্বক বিবরণ দিয়াছেন :—

প্রস্তাবিত এই বিলে কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলির সংখ্যা ৯ হইতে কমাইয়া ৪টি করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়াটার সাপ্লাই, এডুকেশন, টাউন প্লানিং ও ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটিগুলি থাকিবে। তবে ষ্টাণ্ডিং কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ হইতে ১২ করা হইবে। কিন্তু ষ্টাণ্ডিং কমিটির সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদের ভোটের অধিকার থাকিবে না।

তালুকদার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই বিলে নীতি, রচনা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিল অনুযায়ী বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্য্যাবলী রাজ্য সরকার স্থির করিয়া দিবেন। এই ব্যবস্থায় কর্পোরেশনের এ্যাকাউণ্টস্ ও এষ্টিমেটস্ কমিটি

এমনভাবে সুগঠিত হইবে, যাহাতে উহা পার্লামেন্টের পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি ও এষ্টিমেট কমিটির ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। বিলে কমিশনারের ক্ষমতার এক্তিয়ার আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিল অনুযায়ী কর্পোরেশন বা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কমিশনারের কোন প্রকার আদেশ বা নির্দ্দেশ দিয়া তাঁহার কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। নেপথ্য হইতে কোন কল-কাঠি নাড়িয়া কর্পোরেশনের কাজে কাউন্সিলার, অল্ডার-ম্যান বা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অধিকার থাকিবে না। রাজ্য সরকার অথবা রাজ্য পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত নহেন, এরূপ যে-কোন পৌর-কর্ম্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করার বা তাঁহার বিরুদ্ধে নির্দ্দেশ দেওয়ার অধিকার কমিশনারের থাকিবে।

কমিশনারকে অধিকতর ক্ষমতা দিবার ব্যাপারে এই বিলে ইংলণ্ডের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে রাজকীয় কমিশনের নিম্নোক্ত সুপারিশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে: "নীতিকে কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে কাউন্সিলারদের বিরত থাকার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।"

এই বিল অনুযায়ী কোন পাবলিক স্কোয়ার বা গার্ডেনকে উহার নিয়মিত ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বৎসরে এক মাসের বেশী ব্যবহার করা যাইবে না। বিলে কোন কোন ধরণের বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইলে উহার নীচে গাড়ী রাখিবার স্থান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

খসড়া বিলে ১৯৫০ সনের কর্পোরেশন আইনের ১৫০টি ধারার সংশোধন করা হইয়াছে। ঐ অবস্থায় বিলটি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বাকী ৯০টি ধারার সংশোধনী চাহিয়া পাঠান। সুতরাং বিলটি যখন আইনসভায় পেশ করা হইবে, তখন মোট ২৪০টি ধারার সংশো-ধনী থাকিবে।

যাহা ঐ বিলে শেষ পর্য্যন্ত রাখা সিদ্ধান্ত হয়, তাহা না দেখিয়া এইখানে উহার ব্যাপক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখনও খসড়া প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা গঠিত এক কমিটির বিবেচনাধীন আছে। অন্যদিকে ঐ সংশোধন প্রস্তাব লইয়া কলিকাতা পৌর-সভার সদস্যগণ এক বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলে উহার বিপরীত ভাব আসে।

বিগত, শুক্রবার ১২ই জুলাই, পৌরসভার অধিবেশনে উক্ত খসড়া বিলের সমালোচনা করা হয়। দেখা গেল কংগ্রেসী সরকারের প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতায় কংগ্রেসী পৌরপিতা-গণই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচনার সময় বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তাহার বশে কয়েকজন বেসামাল হইয়া বেসামাল ভাষা ব্যবহার করেন।

প্রস্তাবিত বিলে পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক বিষয়ে পৌর-পিতাগণের হস্তক্ষেপের পথ থাকিবে না। উহার পরিচালনের সর্ব্বদায়িত্ব কমিশনারের উপর অর্পিত হইবে আবার বিল্ডিং কমিটির মত কয়েকটি "শাঁসালো" কমিটিও তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং একশ্রেণীর সদস্যবর্গের পক্ষে এই সংশোধন প্রস্তাবের আলোচনায় উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক।

অন্যদিকে কংগ্রেস দলের প্রধানগণ যখন এই বিল ও স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখার্জ্জির বিরুদ্ধে কটূক্তিতে মুখর হইয়া উঠিতেছিলেন তখন বিরোধী দলের মধ্যে কেহ কেহ মজা উপভোগ করিয়া টিটকারি দেন, কেহবা শ্লেষপূর্ণ ভাষায় ঐ বিলটির সমর্থন জানান। তাঁহারা বলেন, পৌরসভা বর্ত্তমানে যাঁহারা শাসন করিতেছেন তাঁহাদেরই কার্য্যক্রমের ফলে পৌরসভা দুর্নীতির আকর হইয়াছে। সুতরাং পৌর-সভার প্রতি যে অপমান এই সরকারী বিলে নিহিত রহিয়াছে তাহার দায়িত্বও পৌরসভার ঐ শাসকবর্গেরই।

যাহা হউক মোট ২৬ জন সদস্য প্রায় চার ঘণ্টাকাল বিতণ্ডার করার পর সংখ্যাধিক্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিছু কম্যুনিষ্ট ও নির্দ্দলীয় সদস্য উহার বিরুদ্ধে ভোট দেন। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ:

"ভারতের প্রাচীনতম পৌর-সংস্থার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করিয়া রাজ্য সরকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নয়।"

সেইসঙ্গে এই সংশোধন বিল বিবেচনার জন্য বিধানসভার সদস্যগণ-গঠিত যে কমিটি—তাহার নিকট পৌরসভা আবেদন জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার নাগরিক ও তাঁহাদের প্রতি-নিধিদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবার যেন ব্যবস্থা করা হয়।

আলোচনাকালে ঐ দিনের পৌরসভায় যে সকল সদস্য রাজ্যসরকার ও স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রির বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা

ও কুৎসিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রবিবার ১৪ই জুলাই, পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় এক সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের পক্ষ হইতে সংশোধন প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গঠিত স্পেশ্যাল কমিটিকে অনুত্তেজিত ভাবে কাজ চালাইয়া যাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরিষদীয় দলের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসী কাউন্সিলারদিগের অশোভন মন্তব্যের সহিত স্পেশ্যাল কমিটির কাজের কোনও সম্পর্ক নাই এবং ঐরূপ ইঙ্গিতে স্পেশ্যাল কমিটির কাজ প্রভাবিত হওয়া উচিত নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিলটি শেষ পর্যন্ত যে রূপ লইয়া পরিষদে উপস্থিত হয় তাহা না দেখিয়া কোনও ব্যাপক আলোচনা এখানে এখন করা চলে না। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গঠিত স্পেশ্যাল কমিটির পক্ষে প্রস্তাবটি সূক্ষ্ম ভাবে দেখা প্রয়োজন আমরা মনে করি। কেননা কলিকাতার নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার যাহাতে স্থায়ীভাবে কোন-দিকে খর্ব্ব করা না হয় সেদিকে খরদৃষ্টি রাখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যাঁহারা বর্ত্তমানে নাগরিকদের প্রতিনিধিরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও সেই ক্ষমতার নিদারুণ অপব্যবহার করিয়াছেন অবশ্য তাঁহাদের প্রতি কোনও সহানুভূতি প্রদর্শন করা সম্ভব নয়।

ভারতের প্রাচীন শিল্প নিদর্শন

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রের কলমে এক চুরির কাহিনী প্রকাশিত হয় যাহার আদি ও অন্তের কথা এখনও সাধারণের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় নাই। কাহিনীতে ছিল যে, নালন্দা মিউজিয়ম হইতে ১৮টি মূর্ত্তি চুরি যায়। সেগুলির মধ্যে একটি কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ শিল্প নিদর্শন বিক্রেতার দোকানে পাওয়া গিয়াছে এবং কারবারের মালিক চোরাই মাল রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পরের সংবাদে জানা যায় যে, ঐ মূর্ত্তি যে অপহৃত মূর্ত্তিগুলির একটি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ খোঁজ করা হইতেছে। তাহা পাওয়া যাইলে পরে বোধ হয় ব্যাপারটি আদালতে যাইবে। সুতরাং অন্তের দিকে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কেননা এ সকল ব্যাপারে পুলিশ কতটা দক্ষতার সহিত কাজ চালাইতে পারিবে এবং যেটুকু দক্ষতা তাহাদের থাকা উচিত তাহাও পুরাপুরি ও ঠিক মত ইহাতে নিয়োজিত হইবে কি না, এই দুই বিষয়েই সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেন রহিয়াছে সে কথা পরে বলিতেছি।

অন্যদিকে এই চুরির আদিকাণ্ডের সমস্তটাই রহস্যময়। একটা নয়, দুইটা নয়, আঠারটি মূর্ত্তি নালন্দা যাদুঘর হইতে অপহৃত হইল অথচ এ বিষয়ে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে কোনও তাপ-উত্তাপ নাই, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ছবি নয়, গহনা নয়, মূল্যবান্ বস্ত্র বা অল্প ওজনের নমনীয় বস্তু নয় যে, উহা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া অপসারণ করা সম্ভব। এই মূর্ত্তিগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রাকারও নয় যে, একযোগে অতগুলি একজন বা দুইজনে সরাইয়া ফেলিতে পারিবে। এবং যদি উহা একযোগে না সরাইয়া ক্রমে ক্রমে সরানো হইয়া থাকে তবে ত ঐ মিউজিয়াম বেওয়ারিশ-মালের গাদা, যাহার রক্ষণাবেক্ষণের কোনও প্রয়োজনই থাকে না। এইরূপ চুরিতে মিউজিয়ামের উচ্চতম কর্ম্মচারী হইতে ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত সকলের যোগসাজস না থাকিলে বা উচ্চতম অধ্যক্ষ ইত্যাদি তাঁহাদের হস্তে অর্পিত এই মূল্যবান্ সম্পত্তি রক্ষার কাজে অপরাধজনক অবহেলা না করিলে এবং নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীর যোগসাজস না থাকিলে কখনই সম্ভব হয় না। অথচ এ বিষয়ে কোনই সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই যে, কাহার অবহেলায় বা কি গোপন চক্রান্তে এই অমূল্য সম্পত্তিগুলি খোওয়া গেল। যদি আদিতে পুলিসের হাতে খোলাখুলিভাবে তদন্তের ভার না দেওয়া হইয়া থাকে বা ভার দিবার পর কংগ্রেসের কোনও অযোগ্য অধিকারী তাঁহার আত্মীয়-সম্পর্কী শ্রেণীর কাহাকেও বাঁচাইবার জন্য পুলিসের তদন্তে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহা কার্য্যতঃ রোধ করিয়া থাকে তবে অন্তের দিকের পুলিসের তদন্তে কি গোপন তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে?

সম্প্রতি পুরীর জগন্নাথ মন্দির হইতে ছয়টি প্রস্তর মূর্ত্তি চুরি যাওয়ায় এ বিষয়ে সাংবাদিক মহলে কিছু সাড়া পড়ে। "যুগান্তর" ঐ মূর্ত্তিগুলি সম্পর্কে নিম্নে উদ্ধৃত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন :

"প্রকাশ, অপহৃত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে দুইটি হইল ৮ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মিথুন মূর্ত্তি এবং অন্য চারিটি হইল ৫ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দণ্ডায়মানা নায়িকা মূর্ত্তি। ১৯৫৮ সন হইতে ১৯৬০ সনের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এই মূর্ত্তিগুলি চুরি হয়।

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে ঐ ছয়টি প্রস্তর মূর্ত্তি অপসারণের সহিত পুরীর জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত

আছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত প্রভাবশালী ব্যক্তির অট্টালিকাতেই এই মূর্তিগুলি লুকাইয়া রাখা হয়। কিছুদিন পূর্বে ঐগুলি গোপনে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালা ও ভুবনেশ্বরের সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ মূর্তিগুলি উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন এবং তাঁহারা ঐগুলি ক্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। জানা গিয়াছে, ছয়টি মূর্তির মধ্যে একটি নায়িকা মূর্তি কলিকাতার এক খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর নিকট ১৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে এবং অপর পাঁচটি মূর্তি বোম্বাই-এর জনৈক বেগম সাহেবাকে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে। বর্তমানে ঐ পাঁচটি মূর্তিকে বোম্বাই বন্দর হইতে জাহাজযোগে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফর্টে প্রেরণের তোড়জোড় চলিতেছে।

এই ব্যাপারের সহিত প্রত্নবস্তু চৌর্যে লিপ্ত আন্তর্জাতিক চক্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন অসাধু ভারতীয় প্রত্নবস্তু-ব্যবসায়ীরা অর্থের লোভে দুষ্প্রাপ্য পুরাবস্তুসমূহ বিদেশে পাচার করিতে এই আন্তর্জাতিক চক্রকে সাহায্য করিতেছে। ইতিপূর্বে কলিকাতা ও বোম্বাই বন্দর দিয়া নালান্দা, মথুরা, পাটনা ও লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালার প্রাচীন শিল্পসম্পদসমূহ বিদেশে পাচার করা হইয়াছে। এইবার জগন্নাথদেবের মন্দিরের গাত্রেও দুষ্কৃতিকারীদের হাত পড়িল।

নির্ভরযোগ্য মহল হইতে জানা গিয়াছে, বর্তমানে কলিকাতার একদল অসাধু ব্যবসায়ী পুলিস ও শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দিয়া আগামী কয়েকদিনের মধ্যে জাহাজ অথবা বিমানযোগে নবম শতাব্দীর কল্যাণ-সুন্দর হর-পার্বতী, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর দুর্গা ও বিষ্ণু মূর্তি বিদেশে পাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে অবস্থিত সৌখীন হোটেলের প্রত্নবস্তু বিক্রয়কারীরা, এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও এই আন্তর্জাতিক চক্রের সহিত প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল কর্তৃক জনসাধারণকে জাতীয় শিল্পবস্তু রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হইবার জন্য বার বার আবেদন জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। এই ব্যাপারে পুলিস ও শুল্ক বিভাগের যে দায়িত্ব আছে তাহা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কি না সেই বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে।"

মন্দির, যাদুঘর ও সংগ্রহশালা হইতে মহামূল্য শিল্পনিদর্শন চুরি যাওয়া কিছু নূতন নহে। এই অসাধু ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিক চক্র সকল দেশেই কাজ চালায়, তবে কিছুদিন যাবৎ বিদেশের সংগ্রহশালার অধ্যক্ষগণ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়ায় সেখানে এরূপ ব্যাপক চুরি চলে না। যদি কচিৎ-কদাচিৎ একটি ছবি চুরি যায় বা অতি ক্ষুদ্র প্রস্তর বা ধাতব মূর্তি উধাও হয়—বৃহৎ মূর্তি অপসারণের কথা পাশ্চাত্ত্য দেশে উন্মাদ ছাড়া কেহ চিন্তাও করে না—তবে সারা জগতে সে সংবাদ প্রচারিত হয় ও হুলুস্থুল পড়ে। আমাদের দেশে এ জাতীয় চুরি এতদিন ছোটখাটো মূর্তিতে আবদ্ধ ছিল। এখন যে জাতীয় বস্তু যাইতেছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। পুরাতত্ত্ব বিভাগের আবেদন-নিবেদনে কিছুই হইবে না। এই জাতীয় কাজকে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতায় ফেলিয়া দুই-চারিটি "প্রভাবশালী" ব্যক্তিকে শ্রীঘরবাস ও প্রচুর জরিমানা করিলে তবে ইহা বন্ধ হইতে পারে, নহিলে নয়।

মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে সরকার

বাজারে যখন সমস্ত জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত চড়িতেছে, করের বোঝা যখন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, নিম্নবিত্ত, অভাবগ্রস্ত মানুষ চোখেমুখে পথ দেখিতেছে না, তখনই সরকার নূতন নূতন ফন্দি-ফিকির বাহির করিতেছেন।

আজ প্রতিটি জিনিসই অগ্নিমূল্য। কিন্তু এ আগুন জ্বালিল কে? ভারত সরকারের পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ একটি সাংবাদিক-সম্মেলনে বলেন যে, বর্তমানে দেশে পণ্যদ্রব্যের যে মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী দেশের ব্যবসায়ীরাই। ইহার কারণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, ভারতে চীনের আক্রমণের সময়ে ব্যবসায়ীরা পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িতে দেওয়া হইবে না বলিয়া সরকারকে তাঁহারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা পালন করেন নাই। দেশে কয়েকটি পণ্যের অভাব দেখিয়া তাঁহারা তাহার সুযোগ লইয়াছেন।

শ্রীনন্দের এই মন্তব্যের উত্তরে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান

চেম্বার অব কমার্স সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে তাঁহারা বলিয়াছেন, পরিকল্পনামন্ত্রীর এই উক্তি ঠিক নহে। চেম্বার বলেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধিহীন লোক থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের জন্যই দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। চেম্বারের মতে দেশের শিল্প-ব্যবসায়িগণের মধ্যে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে যে প্রতিশ্রুতি দেন তাহা তাঁহারা পালন করিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্যের নিম্নগতি হইতেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি বর্ত্তমানে যে দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, সেজন্য গবর্ণমেণ্টই দায়ী। চেম্বার বলেন, দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িলেই পণ্যদ্রব্যের মূল্যে উর্দ্ধগতি প্রতিহত হইতে পারে। কিন্তু সরকার পণ্যদ্রব্যের বণ্টন-ব্যবস্থার উপরই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়া নানা বিধি-নিষেধ বলবৎ করিতেছেন। সেই তুলনায় উৎপাদনের দিকে তাঁহাদের তেমন দৃষ্টি নাই। ফলে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ একইভাবে রহিয়াছে। একথা কেবল শিল্পের সম্বন্ধে সত্য নহে, কৃষির সম্পর্কেও সত্য। গত বৎসরে কৃষির মাধ্যমে উৎপাদন সন্তোষজনক না হওয়ায় জাতীয় আয় একইভাবে আছে এবং দেশে প্রতিটি লোকের জন্য খাদ্যশস্যের যোগান হ্রাস পাইয়াছে। আর কৃষির মাধ্যমে উৎপাদন যে হ্রাস পাইয়াছে তাহার কারণ, সরকার-কর্ত্তৃক দেশে কৃষির প্রয়োজনীয় সার ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ না করা। শিল্প সম্বন্ধে চেম্বার বলেন যে, শিল্পের উপর ক্রমাগত অধিক ট্যাক্স বসানো হইতেছে, শিল্পসমূহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাইতেছে না, শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিবহনের জন্য অধিক খরচা পড়িতেছে এবং অনেক সময়ে পরিবহন পাওয়া যাইতেছে না। এই সব অবস্থা শিল্প-পরিচালকদের আয়ত্তের বাহিরে। এরূপ অবস্থায় দেশে যদি শিল্পদ্রব্যের উপযুক্ত যোগান না হয় এবং এজন্য যদি শিল্পদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায়, তাহা হইলে শিল্প-ব্যবসায়ীরা কি করিতে পারেন?

চাউল এবং চিনির অভাব সম্বন্ধে চেম্বার বলেন, দেশে সমষ্টিগতভাবে চাউলের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে এবং দেশের কোনও স্থানে চাউলের অভাব এবং কোনও স্থানে চাউলের প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে। এদিকে যেসব অঞ্চলে চাউলের অভাব, সেইসব অঞ্চলে চাষীরা ভবিষ্যতে অধিক মূল্য পাইবার আশায় ধান-চাউল আটক করিয়া রাখিয়াছে। ফলে ধানের অভাবে দেশের চাউলের কলগুলিতে মাত্র শতকরা ৩০।৪০ ভাগ কাজ হইতেছে। ধানের অভাবে কোন কোন চাউলের কল বন্ধও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাঁহারা যদি ভারতের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে ধান-চাউল রপ্তানির বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করিতেন এবং চাউলের কলগুলি যাহাতে প্রয়োজনীয় ধান পায় সে-বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে দেশে চাউলের মূল্য এতটা বাড়িত না।

সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, উৎপাদন কমিলেই মূল্য চড়িয়া যায়। দেশের শিল্প-পরিচালক, কৃষক এবং পণ্যদ্রব্যের বণ্টনকারী ব্যবসায়ীরা দেশে পণ্যদ্রব্যের অভাবের সুযোগ গ্রহণ করেন বলিয়াই এরূপ অবস্থা ঘটে।

পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, বিদেশ হইতে এবং বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রভূত চাউল আসিয়া পড়ায় সরকার নিজের হাতে বণ্টন-ব্যবস্থা লইয়াছেন। সে চাউল গেল কোথায়? ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ তাঁহারা বণ্টন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চাউল কাহারা পাইয়াছে? সে চাউল গিয়াছে ন্যায্যমূল্যের দোকান হইতে কালো-বাজারে। সরকার এই দুর্নীতিও রোধ করিতে পারেন নাই। শুনিতেছি, এ প্রতিরোধ করিবার শক্তি সরকারের নাই। সুতরাং ইহা চলিতেই থাকিবে এবং সরকার চাহিয়া চাহিয়া দেখিবেন।

আমরা গভীর বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, এই জটিল সমস্যার মূল উপসর্গগুলি সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রীদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, খাদ্যশস্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার উপরই জাতির অগ্রগতি তথা শিল্পের প্রসার নির্ভর করিতেছে এবং কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত খাদ্যশস্যের মূল্য আয়ত্তে রাখা যাইবে না। কিন্তু শিল্পোন্নত ও কৃষিপণ্য সম্পর্কে উদ্বৃত্ত বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা দ্বারা এই ধারণা ভুল বলা যাইতে পারে। পশ্চিম ইউরোপে সব দেশই খাদ্যশস্য—এমন কি, মাংস ও মাছ সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী। তৎসত্ত্বেও ঐসব দেশে শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি ব্যাহত হয় নাই। আর আমেরিকায় প্রচুর খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইলেও, সেখানে শিল্পের প্রসার অতি নগণ্য। আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম মনে রাখা দরকার, ভারতে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এত কম যে, এখানে কোনদিনই খাদ্যশস্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গন্দ্ আমাদের অন্যত্র। অতি-মুনাফা-শিকারী, গাঁটকাটা, জুয়াচোর ব্যবসায়ীরা সব দেশেই আছে। সোভিয়েট রাশিয়া তাহাদের গুলী করিয়া মারে, কায়রোতে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের পুলিস তাহাদিগকে চৌমাথার মোড়ে দাঁড় করাইয়া শঙ্কর মাছের চাবুকের আঘাতে অবিস্মরণীয় শিক্ষা দেয়, লাল চীনে তাহাদের শিরশ্ছেদ করা হয়। আর পশ্চিম ইউরোপে খাদ্য-ঘাটতি দেশগুলি সমবায় দোকানের মারফৎ ও আমদানী খাদ্য-বণ্টনে প্রখর দৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে আয়ত্তে রাখে। আর ভারতে বর্ত্তমান সরকার এমন একটা বিচিত্র ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়াছেন যে, মুনাফা-শিকারীদের দলে যোগ না দিলে ব্যবসা চালানো অসম্ভব! যতদিন ইহার অবসান না ঘটিবে, ততদিন অর্থনীতিক্ষেত্রে কোন সমস্যার সমাধান করাই সম্ভব হইবে না।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, দেশে পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দেশবাসী যে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার জন্য দেশের সরকার এবং পণ্যদ্রব্য-উৎপাদক ও ব্যবসায়ী—সকলেই দায়ী। এই ব্যাপারে কেহই নিজেদের দোষ-স্খালন করিতে পারেন না।

শিক্ষা-সংস্কারে পুনরাবৃত্তি

কিছুদিন পূর্ব্বে নয়াদিল্লীতে শিক্ষা-সচিবদের একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস বাড়াইয়া দশের পরিবর্ত্তে এগার করিয়া, তাঁহারা ভাল করেন নাই। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাঁহারাই বলিয়াছিলেন, এই সংস্কারের ফলে শিক্ষার মান বাড়িয়া যাইবে। আজ এতদিন পরে তাঁহাদের সে-ভুল ভাঙ্গিল। এখন তাঁহারা সুপারিশ করিতেছেন, আপাততঃ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেন আর বাড়ানো না হয়। কিন্তু কথা হইতেছে, উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যদি সফল না হইয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহাদের জের টানিয়া লাভ কি? দশ, এগার দুই-রকম ক্লাস রাখিলে, শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের অসুবিধা হইবে না কি? পরিবর্ত্তনই যদি করিতে হয় তবে একটি ক্লাস তুলিয়া দিলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়। অবশ্য সমস্যা সেদিক্ দিয়াও আছে - তাহাদের পাঠক্রম বদ্‌লাইতে হইবে অর্থাৎ আগাগোড়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে—সেই সঙ্গে কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থাও। সমস্যার এই ব্যাপক বিস্তার দেখিয়াই বোধ করি শিক্ষা-সচিবেরা চম্‌কাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা দুই কূল রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন একটা জোড়াতালি দিয়া।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রীকিরপালের সাংবাদিক-বৈঠক হইতে লোকের এ ধারণাই হইয়াছিল, শিক্ষা-সংস্কারের সমুদ্রে সরকার আর কূল পাইতেছেন না। সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল, তাঁহার দপ্তর হইতে প্রচারিত সাম্প্রতিক প্রেস-নোট হইতে। তাহাতে বলা হইয়াছে, উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আপাততঃ আর বাড়ানো হইবে না। এ সিদ্ধান্তের মূলে আছে অর্থাভাব, আর কিছু নয়।

যদি সেকথা সত্য হয়, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় বিদ্যার্থীর জন্য 'উৎকৃষ্ট' শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে আর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে 'নিকৃষ্ট' ব্যবস্থায় তুষ্ট থাকিতে হইবে—শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের এ কেমন বিচার? যদি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষার উৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে তবে সে ধরণের বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকেই পড়ার সুযোগ দিতে হইবে। নহিলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটা অন্যায় জাতিভেদ সৃষ্টি করা হইবে।

আসল কথা, তাঁহারা গোল বাধাইয়াছেন শাক দিয়া মাছ ঢাকিতে গিয়া। তাঁহাদের সাধের শিক্ষা-সংস্কার যে সার্থক হয় নাই সেটা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু স্বীকার করিতে বাধিতেছে। তাই জোর গলায় বলিতেছেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এগার কেন—বারটা ক্লাস করাই আমাদের লক্ষ্য। তবে দেশের এই দুর্দ্দিনে কাজটা কিছুদিনের জন্য তাঁহারা স্থগিত রাখিতে চান। কিন্তু এ যুক্তিও টিঁকে না। কেননা, কল্যাণ-রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়া শিক্ষা-প্রসারের কাজ বন্ধ রাখিবার কথা উঠিতে পারে না। তাহার গতি না হয় কিছুটা স্তিমিত হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তাহাকে বন্ধ রাখা হইবে কেন? শিক্ষা লইয়া এরূপ পাশা খেলার পণ তাঁহাদের না করাই উচিত। বিশেষ করিয়া, দেশের যাহারা আশা-ভরসা, সেই অগণিত কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ যেখানে নির্ভর করিতেছে। এ সর্ব্বনাশা জুয়াখেলার অধিকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়কে কে দিয়াছে? সরকারই বা কোন্ ভরসায় তাঁহাদের উপর এতগুলি ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ গড়িবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন?

প্যাকেজ এলাকায় প্রবেশাধিকার

শস্য উৎপাদনে কোথায় বাধা—এ সম্বন্ধে 'দামোদর' জানাইতেছেন:

শস্য উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার করিবার জন্য পশ্চিম বাংলার বর্দ্ধমানের ডি.ভি.সি. ক্যানেল অঞ্চলকে

প্রথম লক্ষ্যস্থলরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের মাটি ভাল, এখানের অন্ততঃ অর্দ্ধেক অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে এবং এখানকার চাষী অভিজ্ঞ ও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ বলিয়া খ্যাত, এজন্য সরকার প্যাকেজ প্রোগ্রামের মধ্যে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রথম বৎসর বর্দ্ধমান সদর মহকুমার ১০টি উন্নয়ন ব্লক এলেকা লইয়া ইহার কাজ সুরু হইয়াছে। সরকার হইতে যে তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে ধানের গড় উৎপাদন বিঘা-প্রতি মাত্র ৫ মণ, সেক্ষেত্রে বর্দ্ধমান জেলার সেচ অঞ্চলে ধানের বিঘা-প্রতি গড় উৎপাদন ৯ মণ মাত্র। সম্প্রতি আমরা জেলার শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় দেখিতেছি গত বৎসরে এই জেলার সর্ব্বোচ্চ ধানের ফলন বিঘা-প্রতি ১৯ মণ ৮ সের হইয়াছে। অতএব বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাটি পরীক্ষা করিয়া সেই অনুপাতে সার প্রয়োগ এবং পোকা-মাকড়, গুল্ম প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফসলের উৎপাদন অন্ততঃ দ্বিগুণ হইবে। সরকারের সর্ব্বস্তর হইতে এজন্য বর্দ্ধমানের চাষী ও সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকের পূর্ণ সহযোগিতা প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা জানি এ জেলার সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিক ইহাতে অকুণ্ঠ সাহায্য করিবার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে যে একনিষ্ঠতা, কর্ম্মকুশলতা, সহযোগিতা ও নিরলস উদ্যোগের প্রয়োজন, বর্ত্তমান ব্যবস্থা পর্য্যন্ত প্যাকেজ অঞ্চলের চাষীদের তাহাতে মন উঠিতেছে না। এখানে প্যাকেজ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা অবধি মাত্র একটি রবি চাষের মরশুম গিয়াছে, আমনের মরশুম এই প্রথম। সেজন্যে কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা বিশেষভাবে সচেতন করি। প্যাকেজ এলেকার নানাস্থান হইতে আমাদের নিকট যে সমস্ত সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে (১) সবুজ সারের বীজ যথাসময়ে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হয় নাই, (২) ধান্য বীজ বপনের পূর্ব্বে কীটাণু ও রোগনাশক শোধন ঔষধ দেওয়া হয় নাই, (৩) হাড়ের গুঁড়া সরবরাহের পরিমাণ নগণ্য, (৪) এক্ষণে আষাঢ় মাস শেষ হইতে চলিল এ পর্য্যন্ত মিশ্র সারের সরবরাহ সুরু হয় নাই। আরো মারাত্মক সংবাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাবান সার-পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় সংগঠন থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে প্যাকেজ এলেকার প্রবেশাধিকার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর একান্ত বশংবদ ব্যক্তিদের পরিচালিত সমবায় সমিতির নামে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকার-কবলিত বিভিন্ন প্রকার সমবায়ের রূপ দেখিয়া চাষীরা আতঙ্কিত হইয়া আছে। সেজন্য যাহাতে প্রথম আমন ফসলে সমবায়ে ভরাডুবি না হয় সেজন্য প্যাকেজ অঞ্চলে মিশ্র ও রাসায়নিক সার বিক্রয়ের ও সরবরাহের প্রতিযোগিতার পথ খুলিয়া রাখা উচিত বলিয়া মনে করি। নচেৎ কাহারও একচেটিয়া অধিকার চাষীর উৎসাহে ভাটা আনিয়া দিবে এবং অধিক শস্য উৎপাদনের নামে অধিক দুর্নীতি ও অধিক মুনাফার মহোৎসবে পরিণত হইবে।

ত্রিপুরার 'সমাচার' জানাইতেছেন :

বেণীমাধব বিদ্যাপীঠের দুর্দ্দশা—

আগরতলা টাউন সংলগ্ন পশ্চিম যোগেন্দ্রনগরস্থিত বেণীমাধব বিদ্যাপীঠ নামীয় নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল গৃহটি জায়গাসহ অনুমান ৬ বৎসর যাবত আঞ্চলিক পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। স্কুলটি গ্রামবাসীর প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ১০।১২ বৎসর যাবত গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রামবাসীগণের আর্থিক দুরবস্থার দরুণ গৃহটি নূতন করিয়া তৈরী করা সম্ভব নয়। স্কুল গৃহটি তৈরীর জন্য স্কুল-কমিটির সেক্রেটারীসহ চিঠিপত্র দিয়াছেন। কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। অথচ স্কুলের জন্য অনুমান ৪ হাজার টাকার ফার্ণিচার ও খেলাধূলার জিনিষ দেওয়া হইয়াছে। জিনিষগুলি রাখার জায়গা নাই, স্কুল গৃহটি ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, ফার্ণিচারগুলি জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে পুড়িতেছে। এই জিনিসগুলি রক্ষার জন্য সত্বর গৃহটি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্কুলের মাষ্টারও ২ জন আঞ্চলিক পরিষদ কর্ত্তৃক দেওয়া হইয়াছে। ছাত্র বর্ত্তমানে ১২৫ জন।

বিষয়টি শিক্ষা-পর্ষদে জানান কর্ত্তব্য। মনে হয়, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলায় এই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কলকাতার প্রায় একপাড়াতেই বাড়ী. জোড়াসাঁকো ও সিমলা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ভদ্রাসন থেকে বের হয়ে মদন চাটুজ্জের গলি ধ'রে, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট দিয়ে সিমলার পাড়ায় পৌঁছতে মিনিট দশবারো লাগে, পায়ে হাঁটার পথে। রবীন্দ্রনাথ জন্মালেন জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে, পিরালী ব্রাহ্ম পরিবারে; আর তাঁর জন্মের বৎসর দেড় পরে সিমলার গৌরমোহন মুখুজ্জের গলিতে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। একজনের জন্ম হিন্দুসমাজের অপাংক্তেয় পিরালী তার ওপর ব্রাহ্ম ঘরে; অপর জনের আবির্ভাব হ'ল বাংলাদেশের সনাতনী-সমাজসংস্থার কায়স্থ বা শূদ্রের ঘরে। বাংলাদেশে তো দুটো মাত্র বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র; অবশ্য শূদ্রের মধ্যে হরেক রকমের ভাগ। মোট কথা, দু'জনের মধ্যে কেউই হিন্দুধর্ম্মসমাজব্যবস্থার মুকুটমণি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন নি। অথচ আজ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির তথা ভারতীয়তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক এঁরাই।

কলকাতার এপাড়া-ওপাড়ায় বাস,—সমান্তরাল রেলের উপর দিয়ে ইঞ্জিনের দু'পাশের চাকা আপন পথেই চলে—কারো সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ হয় না, অথচ উভয়ের যোগে বিরাট গাড়িখানা চলেছে—অতীতের সংস্কৃতির ঐশ্বর্য নিয়ে—সামনের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ আপন-আপন মানসিক পূর্ণ বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত একই ভাব ও ভাবনার কাছাকাছি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের ছায়াশীতল আশ্রয়ে, নরেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মধর্মের ভাবনার অধিকারী; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাঁর বিচারবুদ্ধির বা কালধর্মের আকর্ষণে প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সঙ্গে যুক্ত হ'ন। আবার একদিন কালস্রোতে নবহিন্দুত্বের টানে ব্রাহ্মদের ত্যাগ ক'রে যান।

যৌবনের প্রত্যূষে একবার এই দুইজনের সাক্ষাৎ হয়; সেই ইতিহাস সংক্ষেপে এখানে বলি। নরেন্দ্রনাথ সুকণ্ঠ ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন। ১৮৮১ সাল, ২০ বৎসরের রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন গত বৎসর, প্রাচীনপন্থী পিতা ও জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মতের মিল হয় না। শুনলেন, তাঁদের সমাজের অন্যতম প্রধান সহায় রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলার (২০) সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যুবক কৃষ্ণকুমার মিত্রের (২৭); রাজনারায়ণের পুত্র যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহের জন্য গান রচনার কথাবার্তা ও চিঠিপত্র চলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ তিনটি গান লিখলেন, এবং সেগুলো শেখাবার জন্য যান সমাজপাড়ায়। গান শেখেন নরেন্দ্রনাথ, সুন্দরীমোহন দাস, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন যুবক ব্রাহ্ম। ১৮৭২ সালের অ্যাক্ট্ থ্রী মতে বিবাহ ব'লে আদি সমাজের কর্তাদের এ বিয়েতে আপত্তি, তাই বিয়েতে কেউ যোগ দিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের তিনটি গান গাওয়া হয়। নরেন্দ্রনাথ গায়কদের অন্যতম ছিলেন। রবীন্দ্র নরেন্দ্রের এই প্রথম সাক্ষাৎ। তারপর নরেন্দ্রনাথ যখন স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা হয় ব'লে কোনো সমকালীন নথিপত্রী প্রমাণ এখনো হস্তগত হয় নি। নরেন্দ্রনাথ সে-সময়ে এই তিনটি বিবাহসঙ্গীত শিখেছিলেন—

> দুই হৃদয়ের নদী।
> জগতের পুরোহিত তুমি।
> শুভদিনে এসেছে দোঁহে।

একটি ব্রাহ্মবিবাহকে কেন্দ্র ক'রে উভয়ের পরিচয়, তারপর একজন হলেন চিরকুমার ব্রহ্মচারী—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগমন্ত্রের গুরুর শিষ্য; অপরজন লিখলেন 'চিরকুমার সভা', যেখানে কৌমার্যকে বিদ্রূপ করা হয়েছে নাটকীয়তার মাধ্যমে।

পাঁচ বৎসর পরে নরেন্দ্রনাথের জীবনে এল নূতন ধর্মচেতনা—আকস্মিকভাবে জীবনের সমস্তকিছু উলোট পালোট হয়ে গেল। ব্রাহ্মসমাজের কঠোর যুক্তি-আশ্রয়ী ধর্ম-সাধনার মধ্যে Personality cult আদৌ প্রশ্রয় পেত না ব'লে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে, ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় তথা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে সমাজ সীমানা ত্যাগ করতে হয়। বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় ভক্ত সাধককে কেন্দ্র ক'রে ভক্তিমূলক ভাবালুতার চর্চা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অতি-যুক্তিবাদী সদস্যরা বরদাস্ত করতে পারেন নি। দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ভক্ত রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে ভাব-আলোড়ন উদ্‌ভূত হয়, নরেন্দ্রনাথ সেই Personality বা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভক্তিবাদে আত্মসমর্পণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি-সাহিত্যিক, তাঁর জীবনের পরিবর্তন আসছে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে; এ ওকে যেন শুধোয় Quo cursom ventas—কোন্ পথে চললে। উভয়ে চলেছেন—উদ্দেশ্য এক ভারতের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে ভাবী-কালের প্রগতির পথে সুনিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু উদ্দেশ্য আপাত দৃষ্টিতে এক হলেও, গন্তব্যশিখর সম্বন্ধে উভয়েই নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। তবে পথও ছিল ভিন্ন, পাথেয় ছিল পৃথক্। এই ভিন্নতাকে স্বীকার না ক'রে, মাঝে মাঝে দেখা যায়, উভয়ের মতামতের মধ্যে একটা গোঁজামিল দিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। একে আমরা শিথিল চিন্তা আখ্যা দেব; যেখানে মত ও পথ সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক্, সেখানে এ শ্রেণীর প্রয়াস সত্যকে আচ্ছন্ন করে মাত্র। 'গোরা' উপন্যাসে গোরার চরিত্রের মধ্যে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার ছায়া কি পাইনে? রবীন্দ্রনাথ সেখানে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছেন তার সমাধান ত কেউ দিতে পারে নি—না পেরেছে গোরার উৎকট হিন্দুয়ানি, না বরদাসুন্দরীর উগ্র ব্রাহ্মগোঁড়ামি। 'চিরকুমার সভায়' যা বিদ্রূপ-প্রহসনে ব্যক্ত করেন, কণিকার প্রতিজ্ঞা কবিতায় সেই কথাটাই আঘাতে উজ্জ্বল ক'রে বলেন। মোটকথা প্রভেদ ছিল সেটা স্বীকার ক'রে নিয়েই কোথায় মিল সেটার বিচার হতে পারে। সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে গেলে প্রবন্ধের পাতায় তাকে ধরানো যাবে না, নিবন্ধাকার পুস্তিকা রচনা করতে হবে; সেটা এখন থাক।

নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ ক'রে সন্ন্যাসী হলেন—গৃহী ভক্ত সাধকের শিষ্য হলেন সন্ন্যাসী। শুনেছি স্বামীজিকে গৈরিকবেশী হতে দেখে রামকৃষ্ণ বিস্মিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ নাম সম্বন্ধে নানা মত: আমাদেরও শোনা আছে একটা মত। বালককালে সুকণ্ঠ নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন; কেশব চন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' নাটকে বিবেক ও বৈরাগ্যের দুইটি প্রতীক চরিত্র ছিল; নরেন্দ্রনাথ বিবেকের ভূমিকা, ও মন্মথধন দে বৈরাগ্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন। নরেন্দ্র-নাথ নাকি সন্ন্যাসী হয়ে 'বিবেক' নামটি বেছে নেন।

স্বদেশের দুঃখদারিদ্র্য দূর ও অধীনতাপাশ ছিন্ন করবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা ও আর্তনাদ করাটা ইহুদীদের সাহিত্যে দেখা যায়; বাংলা ভাষায় কি ভাবে এল এটা; গবেষণার বিষয়। আমার মনে হয়, রাজনারায়ণ বসুর দেশপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমে ওতঃপ্রোত ছিল তাঁর জীবন, সেটাই সংক্রামিত হয় ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রদের মধ্যে; এবং তাঁরাই তাতে ভাষা দেন—ভাব দেন—গদ্যে পদ্যে গানে। বিবেকা-নন্দের 'বর্তমান ভারত' 'বীরগাথা' প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য কাব্যের কবিতাগুলি তুলনীয়। একথা আজ অনস্বীকার্য যে বর্তমান ভারতের রাজ-নৈতিক চেতনা অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত করেছিল বিবেকা-নন্দের বীরবাণী। আমরা কৈশোরে সেই বিবেকানন্দকে জানতাম—যিনি দেশসেবার ও দেশমুক্তির প্রতীক ছিলেন। দেশ ছিল তাঁর কাছে প্রাণপূর্ণ সত্তা। বোধিসত্ত্বদের ন্যায় তিনি বলেছিলেন, ভারতের মুক্তির জন্য তিনি সব করতে পারেন। তিনি যা করতে পারেন নি, তা করেছিল মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙালী যুবকরা। তারা সকালে উঠে গীতা পড়ত, তারপর স্বামীজির 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি বই। মনে পড়ে আমার এক সহপাঠীকে, সে কী দৃপ্তকণ্ঠে আবৃত্তি ক'রে যেত, 'হে ভারত ভুলিও না' ইত্যাদি সুপরিচিত উক্তিটি; বোমার মামলায় ধরা প'ড়ে বহু নির্যাতন ভোগ করে সে।

বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত, হিন্দু ভারতকে একসূত্রে গাঁথতে হলে চাই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদের মতো একটা মানুষ, যাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠবে নূতন জাতের নয়া সভ্যতা। রামকৃষ্ণ পরমহংস হলেন এই নব্যহিন্দুত্বের প্রতীক; এঁকে কেন্দ্র ক'রে aggresive Hinduism-এর উত্থান হ'ল। দেশ উদ্ধার, দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রভৃতি কথা সেই ভক্তসাধকের মনে উদিত হয়েছিল ব'লে মনে হয় না; তিনি ছিলেন আপন ভোলা সাধক, তন্ময় থাকতেন আপনার মধ্যে।

বিবেকানন্দ জানতেন, অধ্যাত্মজীবনলাভের শ্রেষ্ঠ বাণী উদ্‌গীত হয়েছিল বেদান্তের মধ্যে—প্রস্থান-ত্রয় ছিল তার বাহন—ব্রহ্মসূত্র, দশোপনিষদ্ এবং গীতা। শঙ্করা-চার্যের সময় থেকে এই তিনটি গ্রন্থকে কেন্দ্র ক'রে সকল দর্শন, সকল ধর্মমত প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে; রামমোহন রায় এই সনাতনী পথ অনুসরণ ক'রে যুক্তির উপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বেদান্তাদি

গ্রন্থে ঈশ্বর সম্বন্ধে চরম জ্ঞানের কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে—দেবতাদের প্রভুত্ব কোথাও স্বীকৃত হয়নি। এই জন্য বিদেশে যখন কেউ ভারতের বাণী প্রচারে গেছেন, তখন তাঁরা বেদান্ত মতই ব্যাখ্যা করেছেন—পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা যে সর্বমানবগ্রাহ্য হতে পারে না, তা তাঁরা জানতেন। স্বামীজি আলমোড়ায় বেদান্ত মঠ স্থাপন করেন, আমেরিকা থেকে Vedanta Monthly প্রকাশিত হ'ত। স্বামীজি একদিন ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে, তিনি রামমোহন রায়ের কাছ থেকে তিনটি বিষয়ের প্রেরণা পেয়েছেন—বেদান্তের শিক্ষা, স্বদেশ প্রেম ও হিন্দুমুসলমান প্রীতিভাবনা। বর্তমান ভারতের দিকে তাকিয়ে কি মনে হয় যে, আমরা এই পথে অগ্রসর হয়ে সমস্যা সমাধানের দিকে যাচ্ছি?

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে দীক্ষিত যুবকদের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রের সব কিছুকেই অভ্রান্ত জ্ঞানে মানা ও অনুসরণ ক'রে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আচারের পায়ে বিচারের বলি দিয়ে, বিদ্যা ও বুদ্ধির স্থলে, অন্ধ সংস্কারকে বসাতে তাঁরা রাজী নন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুধর্ম গ্রন্থ মন্থন ক'রে 'ব্রাহ্মধর্ম' সম্পাদন করলেন—ধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য বাণী তিনি পেলেন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে। দেশ সেটাকে গ্রহণ করল না, কারণ 'ব্রহ্ম'র পূজা বা ধ্যান দেশে অজ্ঞাত—লোকে বিষ্ণু ও শিবকে দেবতা রূপে জানে—এবং তার সঙ্গে জানে বিষ্ণু ও শিবের শক্তি প্রকৃতিকে। মোট কথা ভারতের ধর্মাদর্শের শ্রেষ্ঠবাণী যে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল, তা হিন্দু ভারত গ্রহণ করল না। হিন্দুধর্মের মূলগত সত্যের সঞ্চয়ন এ পর্যন্ত হয় নি।—যখনই হতে গেছে—তখন দেবদেবীদের স্তুতি, পূজাপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোকের সংগ্রহ জমা হয়েছে। স্বামীজি বা তাঁর শিষ্যদেরকে সেরূপ কোনো গ্রন্থ সঞ্চয়ন করতে দেখা গেল না—যা সর্বভারতীয় বা বিশ্বমানবীয় ব'লে গৃহীত হতে পারে। শাস্ত্র মানার মধ্যে গতানুগতিকতার শিথিল মনোভাব সুস্পষ্ট। একদিন স্বামীজি তাঁর শিষ্যদের তিরস্কার করেছিলেন, তারা শিবরাত্রির উপবাস পালন করে নি ব'লে। এই সামান্য ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়, বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের status quo বজায় রাখতে চেয়েছিলেন; তিনি ভাঙতেও চান নি, গড়তেও পারেন নি—তিনি মেরামত ক'রে জীর্ণ মন্দিরকে কোনো রকমে টিঁকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। রামমোহন রায় একদিন অতি দুঃখে এক পত্রে লিখেছিলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য হিন্দুধর্মের সংস্কারের প্রয়োজন! কিন্তু নব্য হিন্দুরা সংস্কারপন্থীদের বিদ্রূপ ক'রে আসছেন, তাঁরা সমন্বয়বাদী। তাঁরা সংস্কার করতে নামলেন না—কারণ হিন্দু বাঙালীর উচ্চবর্ণেরা আপনাদের বর্ণগত কৌলীন্য ও উনবিংশ শতকের বিদেশী শাসকের সহায়তায় অর্জিত ধন ও মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য উৎসুক।—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কৌলিক সুবিধা-সুযোগের উপর ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে অর্থাগমের পথ সুগম হওয়ায় দ্বিবিধ শক্তির মালিক তাঁরা থাকলেন—গাছের খাওয়া ও তলার কুড়ানোর একচেটিয়া অধিকার বজায় রইল তাঁদের অনুকূলে! স্বামীজির মনে দ্বিধা ছিল কি না জানি না, তা না হ'লে তিনি যেসব সামাজিক মত প্রচার করেছিলেন, তাঁর গৃহী শিষ্য ভক্তদের জীবনে সে সব রূপায়িত হতে দেখতাম। সেখানে হিন্দুসমাজের status quo বর্তমান; 'জাত পাত তোড়া'র যে রূপ দেখতে পাই সেটাকে উদারতা না ব'লে কালধর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বললেই ভালো হয়। আসল পরখ হচ্ছে—সর্বদ্বারী বিবাহ বন্ধনে—যেখানে 'নেশন'-এর পত্তন হয়—রক্তের সঙ্গে রক্তের সংযোগ হবার বাধা থাকলে, রক্তের বদলে রক্ত দান করা যায় না। প্রসিদ্ধ দুটি দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যার দ্বিতীয় তৃতীয় পৃষ্ঠার উপর চোখ বোলালেই দেখা যাবে, জাতিভেদে এতটুকু মন্দা পড়েনি, বরং সর্বশ্রেণীর মধ্যে 'জাত' রক্ষার চেষ্টা উৎকট হয়ে উঠেছে। স্বামীজির শিষ্যদের মধ্যে অগ্নিবীণার যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, তা কানে আর শোনা গেল না। কেন? ধর্মের নামে monastic life, মঠ বা বিহার জীবনযাপন কি এর জন্য দায়ী নয়? এটা ভাববার কথা।

বিবেকানন্দ যে নবীন সন্ন্যাসীর আদর্শ স্থাপন করলেন, সমসাময়িক ভারতে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। চিরদিন ছাই-মাখা সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা ক'রে খেয়েছে, গাছতলায় ধুনি জ্বেলে সাময়িক ভাবে থেকেছে, আবার কোথায় চ'লে গেছে। বাউল, বোষ্টমরা গৃহী—অনেক সময়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আখড়ায় থাকে—অথচ ভেকধারী সন্ন্যাসীর মত ছাই মাখে না, তবে নানা রকমের তিলকের প্রসাধন করে—বিশেষ ক'রে বোষ্টমীরা। কিন্তু আর্তসেবা, বৈজ্ঞানিক ভাবে দান সংগ্রহ ও খয়রাতি প্রভৃতির কথা তাদের কখনো মনে পড়ে না; দানে যা পায় তা মহোৎসবের ভোজে খরচ হয়ে যায়। ব্রাহ্ম সমাজ দুর্বল হস্তে আর্তসেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেটাকেই মিশন্ ব'লে সমাজজীবনে গ্রহণ ক'রে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। সেবার আদর্শ—বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীরা এনেছিলেন। দুর্গম পার্বত্য দেশে সেখানে

কখনো কেউ সেবার ডালি হাতে যায় নি, যেখানে খ্রীষ্টান মিশনারী স্ত্রী-পুরুষরা স্থায়ীভাবে গিয়ে বাস করেছে—ব্যাধির সময়ে ঔষধ দিয়েছে, অনাহারের সময় খাদ্য জুটিয়েছে, লিপিহীন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। মোট কথা জ্ঞানের কাজল দিয়ে তাদের জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়েছে। অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত উপজাতিরা মানুষের সম্মান লাভ করেছে নানা মিশনারীদের কাছে।

বিবেকানন্দ বুঝলেন, সেই কাজ করতে হবে তাঁর সন্ন্যাসীদের—'এই সব মূঢ় মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।'

তিনি উচ্চবর্ণকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধ'রে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা-ওয়ালীর উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে। তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। ...এরা পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার, বল যা ত্রৈলোক্যে নেই।" বলা বাহুল্য, এ বাণী আজকেরও।

সমাজের অপাংক্তেয় পঞ্চমদের কাছে বহু শতাব্দী কেহ যায় নি; যারা গিয়েছে, তারা তাদের স্বশ্রেণীর লোক—সাধারণকে কাদা থেকে তোলবার শক্তি তাদের ছিল না, বরং অনেক সময়ে জনতার মূঢ়তাকে ঝাপসা অবৈজ্ঞানিক ধর্মের প্রলাপ দিয়ে অধিকতর মোহাচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে। কিন্তু একজন মধ্যযুগে সত্যই জনতার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন—যা এর পরে আর কেউ পারেন নি। চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মুখে সেদিন এই সমস্যাই এসেছিল; তুর্কী-ইসলাম-আরব-পার্শিয়ানের মুক্তিমন্ত্র সেদিন পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত জনতার প্রাণে নূতন শক্তি সঞ্চার করেছিল। তুর্কীদের ফৌজী শাসনের প্রতাপ—তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে হজরত মহম্মদের উদার প্রাণের ধর্মনীতি, সাম্যবাদ; যুগপৎ আসছে সুফী ভাবুকের দল—নিরাকার একেশ্বরের কথা প্রচার করছে তারা। কাজির অত্যাচারে নবদ্বীপ ত্রস্ত। ইসলামের উদার মন্ত্র জনতাকে মুগ্ধ করেছে। এই উভয়বিধ আক্রমণ থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে বাঁচালেন শ্রীচৈতন্য। প্রথমে দিলেন ভীতত্রস্ত জনতার বুকে সাহস। তারপরে ইসলামের অনেক কিছুই গ্রহণ ক'রে বৈষ্ণবধর্মের ভোল দিলেন ফিরিয়ে। হিন্দুর ধর্ম গিয়ে দাঁড়িয়েছে—খাওয়া-ছোঁয়ায়। চৈতন্য মহাপ্রভু উৎসবক্ষেত্রে সহভোজনের ব্যবস্থা দিলেন। হিন্দুর অসংখ্য জাতির পাঁতি-বিবাহের অসংখ্য বাধা নিষেধ। তিনি বললেন, কণ্ঠিবদল কর, ধর্মসম্মতই হবে সে বিবাহ সিদ্ধ—মানুষের জাত নেই প্রেমের কাছে। অখণ্ড জাতি গড়তে হবে জাত ঘুচিয়ে। সর্বদ্বারী বিবাহ হোক্ শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ ক'রে। ইসলামে মৃতকে কবর দেয়; বললেন, বৈষ্ণবদেরও কবর দাও, তবে সে মাথা উঁচু ক'রে নামবে মাটির মধ্যে! তখন কীর্তনের কথা কে জানত? তিনি দেখেছেন, দরবেশরা আল্লার মহিমা গান করছে দুই বাহু তুলে। বললেন, তোমরাও হরি-গুণ গাও পথে পথে—মৃদঙ্গ যন্ত্র সৃষ্টি ক'রে দিলেন। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আছে কোরান—ঐখান থেকে তাদের ওহি (বহি) বা আচেসা শোনাচ্ছে। তোমার রয়েছে ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন ভগবানের অবতার—তাঁকে কেন্দ্র ক'রে সমবেত হও। কালে শ্রীচৈতন্য হলেন কৃষ্ণ-অবতার ও চৈতন্যচরিতামৃত ভাগবতের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ হ'ল বৈষ্ণবদের।

আশ্চর্য মেলে বিবেকানন্দের সঙ্গে। স্বামীজি খ্রীষ্টান মিশনারীদের সেবাধর্ম গ্রহণ করলেন। স্যালভেশন আর্মি বা মুক্তি ফৌজ নামে যে খ্রীষ্টান সাধুরা এ সময়ে ভারতে এসে ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের পোশাক ছিল এক ধরনের সন্ন্যাসীর মত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও তিনি দেখেছিলেন। জানি না এইসব পোশাক থেকে তাঁর মনে নবীন সন্ন্যাসীদের পরিচ্ছদের পরিকল্পনা এসেছিল কি না। মোট কথা হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেন্দ্র ক'রে একটি সংস্থা গ'ড়ে তুলতে চাইলেন;—এ যেন ন্যাজারেথের ছুতোরের পাগলা পুত্রকে নিয়ে সাধু পল-এর প্রচার প্রচেষ্টা। নিরক্ষর যীশু আরামাইক ভাষায় তাঁর ঈশ্বর-অনুভূতির বাণী প্রচার করেছিলেন—সাধারণ জনতার কাছে; সে সব লিখিত হয় গ্রীক্ ভাষায় গস্‌পেলে; সাধু পল বিশুদ্ধ গ্রীক্ ভাষায় সেই বাণীর ব্যাখ্যা ক'রে প্রচার করেন রোমান জগতে। পরমহংসদেব তাঁর অন্তরের কথা ব'লে যেতেন, ভক্তেরা তা টুকে রাখতেন; তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে সেগুলি সুন্দর ক'রে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রচার করেন ইংরেজীতেই বেশির ভাগটা; রামকৃষ্ণর জীবনী ইংরেজীতে লেখান হয় ম্যাক্সমুলারকে দিয়ে, আধুনিক যুগে রোঁমা রোলাঁও লেখেন। কালে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' চৈতন্য চরিতামৃতের স্থান পেয়েছে—সমস্ত আধ্যাত্মিকতার আকরগ্রন্থ।

এখানে একটা কথা মনে হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু, নানক, কবীর প্রভৃতির বাণী যেমন দীনতম জনতার ঘরে

পৌঁছেছিল—আধুনিক যুগে রামমোহন তথা ব্রাহ্মসমাজের বাণী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর বাণী জনতার মধ্যে আশ্রয় পায় নি কেন? মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমিত থাকল কেন? এ প্রশ্নের বিশ্লেষণ হয়েছে কি?

স্বামীজির জন্ম-শতবার্ষিকীতে আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সব কথার বিচার করতে হবে। প্রশ্নহীন চিত্ত নিয়ে ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস বলে বিংশ শতকের সাত দশকের সমস্যার সমাধান হবে না। স্বামীজির মৃত্যুর পরও ষাট বৎসর গত হয়েছে; তাই ভাবি ভারতীয়রা স্বামীজির বাণীর কোন্‌টুকু জীবনে গ্রহণ করেছে—। পুরাণো বয়াত মনে পড়ে—'গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক।' তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তিনি যা করতে পারেন নি, তা কতটা আমরা রূপায়িত করেছি সমাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে। সাধকের উত্তরসূরিরা দেশবাসীর মনের মধ্যে বিপ্লব কি আনতে পারলেন? একটা অতি সাংঘাতিক, তথাকথিত দর্শন তত্ত্ব (?) মানুষের মনে বিপ্লবের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মতবাদ হচ্ছে—'সব ধর্মই সত্য'; এতবড় অত্যুক্তি বোধ হয় কখনও উচ্চারিত হয় নি। সব নদী সমুদ্রে যায় না, অনেক নদী মরুপথে তাদের ধারা হারিয়ে ফেলে—গতি পথে দাম জমে, জীববাসের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। সব ধর্ম সত্য নয়, কিন্তু সব ধর্মের মধ্যে সত্য আছে এই মহৎ সত্যটা ভুলে থাকি ব'লে ধর্মে-ধর্মে এত বিবাদ! পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসের পাতা উল্‌টালেই দেখা যাবে, অসংখ্য ধর্মের কঙ্কাল মহাকালের পথের উপর ছড়িয়ে আছে।

স্বামীজি-প্রবর্তিত মঠাশ্রয়ীরা কালে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে অবতার ও পূর্ণব্রহ্মরূপে পূজা করছেন তাঁর মূর্তি গ'ড়ে। দেখতে দেখতে গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে কতগুলি গুরুর উদ্ভব হয়েছে—দেখলে অবাক্ হ'তে হয়! মানুষের বিজ্ঞানীবুদ্ধি, তার বিচার-বিশ্লেষণী মনন-শক্তিকে সহজের পথে চালিত ক'রে, ধর্মকে বৈষয়িকতায় ও বিলাসে পরিণত ক'রে তুলেছে। স্বামীজির তেজোগর্ভ বাণীর সাধক কোথায়? বেদান্তের প্রতি তাঁর বিশ্বাস স্থলে মানবপূজায় ভক্তদের বেশি আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে। জানি না এর দ্বারা কি ভারতের সমস্যার সমাধান হবে? মনে হয়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের মতামতকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা পুনর্বিচারের সময় এসেছে। মহাপুরুষরা যতই মহৎ হোন, পরবর্তী যুগের মানুষরা তাঁদের অনুকরণ বা অনুসরণ ক'রে কখনও মহত্ত্বলাভ করবে না। বিজ্ঞানের জগতে যেমন মানুষ এগিয়ে চলেছে—পুনরাবৃত্তি করছে না, ধর্ম-জগতেও সেই মনস্বিতাই আশা করব।

স্বামীজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমি আমার 'রবীন্দ্রজীবনী'তে উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা করেছি। আমি সমকালীন রচনা ছাড়া, অন্য কোনও তথ্যকে গ্রহণ করি নি; কেন করি নি তা চতুর্থখণ্ডের ভূমিকায় স্পষ্ট ক'রেই বলেছি। আমার আশঙ্কা দেখছি এখন রূপ নিচ্ছে। 'শোনা' কথা—বহু বৎসর পরে লিপিবদ্ধ হচ্ছে; আমার শিক্ষাদোষে সেগুলিকে ইতিহাসের তথ্যরূপে স্থান দিতে পারছি নে।

—০—

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

১৪

মাছ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল পরে ঠাকুমা কাঁঠাল-তলা হইতে ফিরিলেন। তাঁহার সাড়া পাইয়া তরু চম্পট দিল।

গত রজনীতে তাহার গলার ব্যথা হইয়া কান কট্ কট্ করিতেছিল, তাই সে এখন গলা-ব্যথাতে অনুপোযোগী বস্তুটিকে সকলের অগোচরে রাখিতে চায়। বিনুকে তাহার ভয় নাই। কিন্তু ঠাকুমার জানা মানে হাটে হাঁড়ি ভাঙা।

তরুর আকস্মিক পলায়নে ঠাকুমা আশ্চর্য্য হইলেন না। তাহাকে লক্ষ্যও করিলেন না, লক্ষ্য হইল বধূর প্রতি। কহিলেন, "এখনও তুই নাইতে যাস নি, বৌ? সকলের নাওয়া-ধোয়া হইছে। আজ না তোদের দুধের মহোৎসব? কাল আমার নাতি পেসাদ আসবে ব'লে তোর পরাণে বুঝি ঘোর লেগেছে? তোর হইছে—'কালা যখন বাজায় বাঁশি, মনে বলে দেখে আসি, শুনিয়া বাঁশির তান, অস্থির হইল প্রাণ।' ওমা, রসের কথা শুনে লজ্জায় মুখ নামিয়ে রইলি কেনে? হাসতে কি তোর সরম লাগছে? তা লাগে, 'নতুন নতুন তেঁতুলের বীচি, পুরোণো হ'লে বাতায় গুঁজি।' তুই এখন দোটানায় রইছিস্, এদিকে বর—ওদিকে 'বাপের দ্যাশের লোক পাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যাই।' রং তামাসা এখন শিকেয় রেখে চল্ তোরে চান করিয়ে আনিগে। হবিষ্যি ঘরে রাম-রাবণের যুদ্ধ লেগেছে। তুই না গেলে চোপা নাড়া খাবি। আমি ঘাটে যাব এবার, মাগী তিনটে বাসনের কাঁড়ি নিয়ে কি করচে স্বচক্ষে দেখে আসি। নে বৌ, চট্‌পট্ তেল মেখে নে।"

ঠাকুমার তাড়নায়, চোপা নাড়ার ভয়ে বিনুকে উঠিতে হইল।

লবঙ্গের সহিত বিনুর দেখা হইল পুকুরে। ছোট তরফেও দুর্গাপূজা, কাজকর্ম্মের ব্যস্ততায় এখন তাহার বিনুর সঙ্গে গল্পগাছা করিবার সময় হয় না। ঘাটে পথে আনাগোনায় উভয়ের হাস্যবিনিময় দৃষ্টিবিনিময় অবাধে চলিলেও, বাক্যবিনিময়ের সুযোগ মেলে না।

বাঁধাঘাট জনশূন্য। দাসীরা পৃথক্ ঘাটে বাসন মাজিতেছে। ঠাকুমা কামরাঙ্গাতলা অবধি আগাইয়া সহসা থামিয়া গিয়াছেন। থামিবার কারণ সদ্য বোঁটা হইতে খসিয়া-পড়া একটা পাকা কামরাঙ্গা।

লবঙ্গ বিনুকে ইসারা করিয়া দেখাইল, গলা-সমান ঘোমটার ভিতরে ঠাকুমার কামরাঙ্গা সমেত হাত ঘন ঘন মুখে উঠিতেছে।

বিনু তাচ্ছিল্যভরে তাকাইয়া বলিল, "ও আমি ঢের দেখেছি, এতই যদি ভালবাসেন তবে কারোর সামনে খান না কেন? লজ্জা করে বুঝি?"

"তাই বোধ হয়। মানুষ বুড়ো হ'লে যে ছেলে-মানুষের অধম হয় সেটা ওঁকে দেখলে জানা যায়। তুমি আজ এত বেলায় চান করতে এসেছ? এতক্ষণ কি করছিলে, বৌ? পাড়ায় পাড়ায় তোমার ভারী নিন্দে, কান পাতা যায় না, শুনে আমার দুঃখ হয়। তোমার বড় নন্দাই এসেছে, সখ ক'রে এক বেলাও তাকে দুটো রেঁধে খাওয়াতে চাও নি কেন?"

বিনু আকাশ হইতে পড়িল; একে সে রান্না শেখে নাই; নন্দাই আসিলে যে রান্না করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে হয় তাহাও জানে না। সে ঝাঁজিয়া উঠিল, "আমি ত জানি না, কেউ এলে নতুন বৌকে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াতে হয়। কাজের কথা কেউ বলবে না, খালি নিন্দে করা। বাপরে, এ বাড়ীতে রান্না করতে গিয়ে পুড়ে মরবে কে, এই বড় বড় কড়া, হাঁড়ি। তবু আপনি এসে আমাকে ব'লে দিলে আমি রাঁধতে চাইতাম। আমাকে আজ মা কুটনো কুটতে বলেছিলেন, সেই সকাল থেকে এতবেলা অবধি ধামা ধামা তরকারি কুটে এলাম। নখের ডগা খচ্ খচ্ করছে।"

"বৌ হবার ওই জ্বালা। আমি তোমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে এসে বকুনি খেয়ে মরব। তোমার সাথে আমার ভাবের জন্যে কত কথা হয়েছে। তোমাদের ওরা মেলামেশা ভালবাসে না। মাগো, তোমার গায়ে কি ময়লা বৌ। ছিঃ, কি নোংরা তুমি? এস তোমাকে সাবান মাখিয়ে দেই। কাল তোমার বর আসবে। বড়দিদি বলে, বরের কাছে সাজের বাহার দিয়ে থাকতে হয়। দাদারা বাড়ী এলে

আমার বৌ-ঠানদের কি সাজের ঘটা বাড়ে। বাটি বাটি চন্দন ঘ'ষে গায়ে মাখে; আমলা দিয়ে পেটিপেতে চুল বাঁধে। মোম গলিয়ে সিন্দুরের টিপ দেয় কপালে। ছোট বৌ-ঠান আবার লুকিয়ে গন্ধরাজ ফুল গোঁজে খোঁপায়। ওরা এত করে কেন, আমি তা জানি না। আমার ত বর আসে নি। কিন্তু তোমার বিয়ে হয়েছে, তুমি জান না কেন?" বলিয়া লবঙ্গ বিনুর গায়ে-মাথায় সাবান মাখাইয়া তিতপোল্লার খোসা দিয়া ঘষিয়া দিতে লাগিল।

বিবাহিত জীবনের নিগূঢ় রহস্য অপরে যাহা জানে, সে তাহা জানে না শুনিয়া বিনু লজ্জিত হইল। অন্য বিষয় যাহার যাহা খুশি তাঁহাকে বলুক, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সে যে অনভিজ্ঞা, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া অপমানের কথা। বিশেষ এক কুমারীর কাছে সে কেন পরাজয় মানিয়া লইবে?

বিনু বলিল "ওঁদের বরেরা ওইসব ভালবাসেন তাই করেন। আমার বর যদি ভালবাসে তা হ'লে আমারও করতে হবে। আপনার বিয়ে হ'লে আপনিও অমনি করবেন।"

লবঙ্গ হাসিল "হাঁ, আমার আবার বর আসবে! এলেও তোমারি দশা। পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে-মান্দা আর জিজ্ঞেস্, 'বৌ তোকে কি বল্লে রে? কিসের এত গুজুর গুজুর'।"

"ওঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাই কি আমি আপনাকে যা বলেছি সব আপনি বলে দিয়েছেন পিসীমা?"

"কে তোমায় মিছে খবর দিয়েছে বৌ? আমি তোমার কথা কারোকে বলি নি। সেদিন দুপুরে তোমার সাথে গল্প-সল্প ক'রে বেরিয়ে দেখলাম, তোমার মেজ ননদ ঘরের পেছনে—কুটরাজ ফুল তুলছে। তুমি যা বলেছিলে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিল।"

বিনুর হৃদয়ের কাল মেঘরেখা নিমেষে মিলাইয়া গেল। কামিনীর মা'র নিকটে লবঙ্গের বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পাইয়া তাহার সরল অন্তরে আঘাত লাগিয়াছিল, ক্ষুদ্র 'না' শোনামাত্র সে আঘাত বেদনা নিঃশেষে বিলীন হইল। সে প্রীতিভরে সখীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিল, "আপনি যে বলেন নি, সে আমি জানি পিসীমা, আমি বিশ্বাস করি নি। আপনার সাথে কেউ আমাকে আড়ি করাতে পারবে না। ভাব আমাদের নিত্যি নিত্যি থাকবে। ভাবের একটা গান করুন না, আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে।"

"ধ্যেৎ, ঘাটে কি গান গায়? কেউ শুনলে আমি গাল খেয়ে মরব। তোমাদের জলেরও কান আছে।"

"গান না গাইলে একটা পদ্যই বলুন।"

"পদ্য? কি পদ্য বলব, মনে পড়ছে না। তোমাদের বিয়েতে প্রসাদ ভাইপোর বন্ধুরা যে উপহার পদ্য ছাপিয়েছিল তা মনে আছে?"

"একটু একটু আছে, 'হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর বৌ, হিন্দু হয়ে থেকো, হিন্দুর মতন দেব-দ্বিজে ভক্তি মনে রেখ।' আর মনে নেই, ভুলে গেছি।

"আমার মনে আছে, মন্দ লেখে নি, 'নাহি জানে সুখ দুঃখ শুধু বুকভরা আশা, ছোট ছোট ভাবগুলি সরল অস্ফুট ভাষা।' সুখ দুঃখ বুকভরা আশার মানে জানি কিন্তু সরল অস্ফুট ভাষার অর্থ বুঝতে পারি না। পদ্য মিল ক'রে লিখতে হয় কি না, তাই আশার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে।"

"আমি ভাষার মানে জানি পিসীমা, ভাষা হ'ল জলে ভাসা, সাঁতার কাটা।" বলিতে বলিতে বিনু স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে গভীর জলে ভাসিয়া চলিল।

আশ্বিনের ভরা জলাশয়, জল থই থই করিতেছে। গাছের ছায়া পড়িয়াছে অতল নীরে। শালুক ফুলকুল রবি করস্পর্শে মুদিতনয়ন। দ্বিপ্রহর প্রায় সমাগত, ঘুঘু উদাস স্বরে ডাকিতেছে। ঘাট নির্জ্জন, দাসীরা বাসন লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এহেন সুযোগ বিনু হেলায় হারাইল না। তাহার সুপ্ত বন্যপ্রকৃতি সহসা জাগ্রত হইল। লঘুপক্ষ মরালের ন্যায় সে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া স্থির জলরাশি আন্দোলিত, আলোড়িত করিয়া তুলিল।

নববধূর সন্তরণের দক্ষতা নিরীক্ষণ করিয়া ঝিয়ারী মেয়ে লবঙ্গ পরাভব না মানিয়া সবেগে বধূর অনুসরণ করিল।

"ওলো ছুঁড়ীরা, আর কতক্ষণ জল তোলপাড় করবি? এখন উঠে আয়। 'ডুব দিলেই যদি হয় ধর্ম্ম, তবে পান-কৌড়ির কিবা কর্ম্ম?' জলে বেশিক্ষণ থাকিস নে, ম্যালেরি ধরবে। নালের ডাঁটা তুলিস্ নি, ওতে ত নালের অম্বল হবে না, দুটো-খানিকের কর্ম্ম নয়, এ বাড়ীতে। খাবার সখ হ'লে কাল বিল থেকে আনিয়ে দেব বোঝাখানিক, পরাণ ভ'রে খাস্, আর দু'জনা দু'জনের কানে কানে কোস্—

'নালের অম্বল-পান্তাভাত খেলেম বড় সুখে,
বিছানা ভালো, সোয়ামী কালো, মলেম মনের দুখে।

কাগজ কাটা, উলকি কৌটা কার লেগে বা পরি ?
কালো সোয়ামী চাই না আমি দহে ডুবে মরি'।"

ঠাকুমা কামরাঙ্গা নিঃশেষ করিয়া হাত ধুইতে সোপানে পা দিয়াছেন। তাঁহার কলভাষণে বিন্থ পুকুরের মধ্যস্থল হইতে সভয়ে চাহিল। কি অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ঘটনা—ঠাকুমা শুধু একাকিনী নহেন। তাঁহার পশ্চাতে নটেশাকের সাজি হাতে সরস্বতী শাক ধুইতে আসিয়াছে।

সাঁতারে সাঁতারে তাহারা অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছিল, ফিরিয়া আসিতে সময়ের দরকার। জলের মাতনে বিন্থর মাথায় কাপড় নাই, চুল খসিয়া গিয়াছে। গায়ের কাপড় কোমরে জড়ানো। সে জলে না ভাসিয়া ডুবে ডুবে তীরের সম্মুখীন হইল। অতদূর হইতে উজাইয়া আসা সময়ের দরকার। ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিল সরস্বতী শাক ধুইয়া চলিয়া গিয়াছে।

লবঙ্গ ভীত পাণ্ডুর বদনে বলিল, "আজ রক্ষে নেই বৌ, তোমাকে আস্ত রাখবে না, আমাকেও রেহাই দেবে না।"

ক্ষণেক চিন্তার পরে বিন্থ কম্পিত স্বরে উত্তর করিল, "আমি আজ কারও সামনে যাব না। কাপড় ছেড়ে ঘরে চুপ ক'রে ব'সে থাকি গে। কাছে না গেলে আমাকে গাল দিতে পারবে না। আপনি বৌ নয়, মেয়ে, আপনার ভয় কিসের, পিসীমা ?"

"ভয় তোমার সাথী হয়েছিলাম। আমার সাঁতার কাটা দোষের নয়, সত্যি, কিন্তু আমি কেন বৌকে সাঁতার দিতে দেই, শাসন করতে পারি না ? তুমি আসলে বেহদ্দ বোকা, ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নাই, পালিয়ে থাকলে ওদের রাগ আরও বেড়ে যাবে। বরং সাথে সাথে কাজ-কর্ম্ম করলে ওরা একচোট গালাগালি ক'রে শান্ত হবে।"

আতঙ্কে বিন্থর মুখ শুকাইয়া গেল। বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

ঠাকুমা হাত ধুইয়া সিঁড়ির চাতালে বসিলেন। টকের আস্বাদে তখনও মুখ বিকৃত, কিন্তু বাক্য বিরামবিহীন, "এঁটো খাই মিঠের লোভে, যদি এঁটো মিঠে লাগে।"

১৫

লবঙ্গের উপদেশে বিন্থ বলির পাঁঠার মত কর্ম্মশালায় সকলের মাঝখানে উপনীত হইল।

মনোরমা তক্তির দুধ শুকাইতেছিলেন। সরস্বতী একরাশি পাথরের ও পোড়ামাটির সাঁচ জলে ধুইয়া মুছিয়া ঘৃত মাখাইতেছিল। শঙ্খ, পদ্ম, আতা, আম, মাছ—নানারূপ সাঁচে দুধের তক্তি প্রস্তুত হইবে। ভানু-মতী গত রজনীর জমান সর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ক্ষীরের পুর দিয়া সরের পাটিসাপটা ভাজিতেছিল। মধুমতী পান খাইতে গিয়াছে। ছোট ঠাকুমা ভোগশালায়।

সরস্বতী ভ্রূ বাঁকাইয়া বধূর আপাদমস্তকে চক্ষু বুলাইয়া হেঁটমুখে কাজ করিতে লাগিল। ভানুমতী চোখ তুলিল না। মনোরমার অখণ্ড মনোযোগ দুধের কড়ার প্রতি। বিন্থ বুদ্ধিহীনা হইলেও উপলব্ধি করিয়াছিল —বিরক্তি বা ক্রোধ হইলে ইহারা প্রথমে ঝড়ের আকাশের মত স্তব্ধ হইয়া থাকে, থমথমে-গমগমে ভাব। তাহার পরে চারিদিক কাঁপাইয়া সচকিত করিয়া প্রচণ্ড গর্জ্জনে ঝটিকা বহিয়া যায়। খানিকক্ষণ পর ঝটিকান্তে নীল নভোতল পুনরায় শান্ত স্নিগ্ধ হয় বটে, কিন্তু যাহার উপর দিয়া ঝড় বহে, তাহার মর্ম্মস্থল ঝড়ে-ওড়া তরুপত্রের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

বিন্থকে বিশেষ অপেক্ষা করিতে হইল না। মনোরমা কড়ার দুই কান ধরিয়া বিড়ের উপরে থপ করিয়া নামাইলেন। পাথরের খাদায় চাঁচিয়া-পুঁছিয়া শুকনা ক্ষীর নামাইলেন। তাহার পর ধীরে সুস্থে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ফাটিয়া পড়িলেন, "যে পুকুরে আজও আমি মাথার কাপড় ফেলে ডুব দেই না, সেই পুকুরে তুমি গায়ের মাথার কাপড় ফেলে সাঁতরে এপার-ওপার করছিলে। লজ্জা না থাক্, মানুষের ভয়ও থাকে। তোমার শরীরে কোনটাই নেই। বাপ-মা মেয়েকে যেমন সাঁতার শিখিয়েছিল তেমনি সরম-ভরম শেখাতে পারে নি ? তুমি হ'লে রায়গোষ্ঠীর কলঙ্ক, তোমার বেহায়াপনায় আমি পাড়ায় মুখ দেখাতে পারি না। আমার কপালে এমন জন্তুও জুটেছে। কলকাতার পাকা জুয়াচোর বাপ, গেঁয়ো ভাল মানুষ পেয়ে একটা বদ্ধ পাগল গছিয়ে দিয়েছে। তখুনি পই পই ক'রে মানা করেছিলাম, 'যার দিদিমার মাথা খারাপ, সে ঝাড় থেকে মেয়ে এনো না।' চোখে লেগেছিল সেকি অপরূপ রূপের ছটায়, না বাপ-মার তুক-তাক মন্তরে ?"

ঢাক বাজাইলেই কাঁসি বাজাইতে হয়। কাঁসির ঠুন্-ঠান্ শব্দ না হইলে ঢাকের বাজনা জমে না।' এক শেয়াল রা তুলিলে সকল শেয়াল তান ধরে।

সরস্বতী চেঁচাইতে পারে না, চীৎকার করিলে তাহার মাথা ঘোরে। সে টিপিয়া টিপিয়া টিপ্পনি কাটিল, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারতে গালে চড়। ব্যাখ্যা রেখে এখন সাঁচে হাত দাও মা, ক্ষীর শক্ত হয়ে যাচ্ছে।"

চতুর্দ্দিক্ চমকিত, প্রকম্পিত করিয়া ভানুমতী অকস্মাৎ জয়ঢাক বাজাইল, "অমন বৌ-এর মুখে ঝাঁটা, কপালে

আগুন। যার ভয়-ভক্তি, লাজ লজ্জা নেই, সে ত কুকুর বেড়ালের অধম। নদীর তীরের মেয়ে সেখানে যমুনা লীলা শেষ ক'রে এখানে মথুরা লীলা করতে এসেছে। ধান্য বুকের পাটা, ধন্যি সাহস! নতুন বৌ দেয় দিনে-দুপুরে পুকুর পাড়ি! মাগো, যাব কোথায়? কি ঘেন্না, কি লজ্জা, মরণ মরণ!"

"কিসের ঘেন্না-লজ্জা, বড়দি?" জিজ্ঞাসা করিয়া মধুমতী পান-দোক্তা গালে ঠাসিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল।

বড়দি সত্য-মিথ্যা মিশাইয়া একখানি মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিলেন। রহিয়া রহিয়া সরস্বতী সে ছবিতে রং ফলাইতে লাগিল।

মধুমতী হাসিয়া অস্থির, "বাবা, একটুখানি সাঁতার, তারই জন্যে এই তলাতল, রসাতল? আমি ভাবলাম, না জানি কি? অত শত না বুঝে একবার অন্যায় করেছে, আজ বারণ ক'রে দিলে পরে যদি না শোনে তখন ব'কো বাপু। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে যে হাট বসিয়েছ, লোকে শুনলে কি ভাববে? চল বৌ, আমরা বাইরে ব'সে কিসমিসের বোঁটা ছাড়াইগে, কাল ময়দায় মেখে ধুয়ে রোদে দিয়েছিলাম, সব বোঁটা ছাড়ে নি।"

মধুমতীর সদয় ব্যবহারে ও সহানুভূতিতে বিনুর তাপদগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া গেল। সে ননদিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইল।

সের পনের কিসমিসের বোঁটা ছাড়াইতেছিল বিনু ও মধুমতী। এমন সময় তরুর আগমন, উদ্দেশ্য খাদ্যানুসন্ধান। চাহিয়া খাইতে সে ভালবাসে না। তাহার হইল 'আপন হাত জগন্নাথ'। চিলের মত উড়িয়া আসিয়া সম্মুখে যাহা পায় ছোঁ দিয়া লইয়া সরিয়া পড়া অভ্যাস। সে লোলুপ দৃষ্টিতে কিস্‌মিসের ডালার প্রতি তাকাইয়া গৃহমধ্যস্থ কাড়ানাকাড়ার তুমুল ধ্বনিতে মনোযোগী হইল। তখন যে জয়ঢাক বাজিয়াছিল তাহার রেশ এখনও থামে নাই। রায়বাড়ীর ছেঁড়া কাঁথার আগুন সহজে নিভিতে চায় না। পরস্পরের ইন্ধনের মুখর বাতাসে জ্বলিতে থাকে দাউ দাউ করিয়া।

তরু ক্ষণেক কথামৃত পান করিয়া ঢাকের সঙ্গে কাঁসি, কাঁসির মাঝখানে বাঁশী বাজাইতে লাগিল, "চেলাচ্ছ কেন বড়দি, মিনমিনে মেজদি, আবার এদিকে লাগানির ওস্তাদ। বৌদি একটু সাঁতার দিয়েছিল নাইতে নেমে, তাতে হয়েছে কি? যারা সাঁতার শেখে, জলে নামলেই তাদের সাঁতার দিতে হয়, রাজু আমাকে বলেছে। নইলে সাঁতারের অভ্যাস চ'লে যায়। তোমাদের ইচ্ছে ও একদম সাঁতার ভুলে চিনির বস্তার মত জলে ডুবে ম'রে যাক্। দেখ না, আমাকে আবার ধমকানো হচ্ছে, 'চুপ কর্ পাজি মেয়ে, ফর্ ফর্ করিস নে।' আমি পাজি, না তোমরা? দিন-রাত পেছনে লেগেই আছে। বুড়ো বুড়ো ধুম্‌সীরা ছোটদের নিন্দে ক'রে বেড়াতে লজ্জা করে না?"

কর্মশালা হইতে নাকিসুরের বিলাপধ্বনি অকস্মাৎ রণিত হইয়া উঠিল, "মা, তোমার সামনে একফোঁটা মেয়ে আমাদের এত অপমান করছে? তুমি আনন্দে কান পেতে শুনছ? এমন অপমান সয়ে আমরা তোমার পুজোয় থাকতে চাইনে। দিন রাত দাসীপনা ক'রে হাড় কালি করছি, তার পর অপমান?"

মা নীরবে একখানা চেলাকাঠ হাতে বারান্দায় পা দিবামাত্র তরু দুই থাবা কিস্‌মিস্ মুঠোয় তুলিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দোষীর উপযুক্ত শাস্তি না হওয়াতে তরুর বড়দি ও মেজদি আক্রোশে ফুলিতে লাগিল। আলাপে বিলাপে প্রলাপে কর্মশালা মুখর হইল।

মনোরমা নির্ব্বাক্। পূজার বিলম্ব নাই, জামাতা উপস্থিত। তিনি কোন্ কথার পৃষ্ঠে কথা কহিয়া অনর্থের সূত্রপাত করিবেন? প্রবাদ আছে 'বোবার শত্রু নাই।' মুখরা-প্রখরা কন্যাদের কাছে মাকে সদাসর্ব্বদা এই নীতিই মানিয়া চলিতে হয়। বাতাসের সহিত যাহারা কলহ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা তাহাই করুক। তাঁহার বিলক্ষণ রূপে জানা হইয়াছে বনেদী রায়বংশের রক্তের ধারা ভিন্ন—এ রায়বাঘিনীরা অপর বংশসম্ভূত কাহারও নিকটে বাক্যযুদ্ধে পরাভব মানিবার পাত্রী নহে। সেই আশঙ্কায় অপর সাধারণ ভ্রমেও ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়িতে সাহস পায় না। মনোরমাও মা হইয়াও পান না। কখনও করুণ, কখনও বীররসের অবতারণায় নির্ব্বাক্ শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বিনুকে কেন্দ্র করিয়া অন্য যে বচসার উদ্ভব হইয়াছিল কি জানি কেন যেন তাহাতে তাহাকে তেমন আঘাত দিতে পারিল না। গাছ হইতে পতনের ভয়েই মানুষ অস্থির, পড়িয়া গেলে ভয় কিসের? এই কোমল আর্দ্র-শীতল মৃত্তিকা পর্ব্বতের সানুদেশে থাকিয়া ধীরে ধীরে পাষাণ হইয়া যায়।

আনমনা বিনুর করাঙ্গুলি যন্ত্রচালিতের মত কিস্‌মিসের বোঁটায় সঞ্চালিত হইলেও মন উধাও হইয়া গিয়াছিল সুদূরে। সে এক পাখী-ডাকা, ছায়াঢাকা খণ্ড গ্রাম, যাহার পরিবেশ স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তটিনীর নির্ম্মল প্রবাহ। তাহাকে করুণাময়ী শান্তিময়ী গ্রামলক্ষ্মী নাম

দিলেই যেন অধিক শোভন হয়। তাহার ভাঙ্গন নাই, উদ্দামতা নাই, তীরভূমির প্রতি তাহার অপরিসীম মমতা তাহার জোয়ার-ভাঁটার কত রূপ, বর্ষায় কি বিপুল সমারোহ।

সেইখানে সেই সুশীতল নদীনীরে এক অবোধ বন্য-ভাবাপন্না বালিকা সঙ্গী-সাথী পরিবেষ্টিত হইয়া ডুব-সাঁতারে ঝাঁপুরি খেলায় স্বচ্ছ জল ঘোলা করিয়া তুলিয়াছে।

দলে দলে চাষার ঝি বৌ ঘাটে আসিয়াছে। কেহ কাচিতেছে ক্ষারে সেদ্ধ করা ন্যাকড়া কানি। কেহ এঁটেল মাটি মাখিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতেছে, মাথা ঘষিতেছে, বাসন মাজিতেছে। স্নানান্তে মাটির ভরা কলসী কাঁখে লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে বালির চড়ায় পদচিহ্ন আঁকিয়া।

সেইখানে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি নারী-সমিতির সভা হয়, জলস্রোতের সহিত সমালোচনার স্রোত খরতর বেগে বহিয়া যায়। সখীতে সখীতে কানাকানি হয় সুখ-দুঃখের কাহিনী। ভাসিয়া যায় ছোট-বড় অসংখ্য নৌকা। কোনখানায় শুভ্র পাল, কোনটায় রঙ্গীন। বৈঠার হটর্ হটর্ শব্দের তালে তালে ভাটিয়ালী সুর জলে স্থলে সুধা বর্ষণ করে—

"বলুক বলুক বলুক সই, যার মনে যা লয় লো;
ভয় করিব যারে সই, বশ করেছি তায় লো।
এবার মরে সোনা হবো, গায়েতে জড়ায়ে রবো
নাকেতে বেসর হবো, হবো গলার চিকদানা,
যায় যদি যাক কুলমান, তবু তারে ছাড়বো না।"

মাথার উপরে গাঙ শালিকের ঝাঁক চক্রাকারে উড়িয়া বেড়ায়। তাহাদের কিচিরমিচির রব জলের ছলাৎ ছলাৎ গানে মিশিয়া যায়। শেকড় বাহির করা বৃদ্ধ বটবৃক্ষের শাখায় রামধনু রংয়ের মাছরাঙ্গা পাখী ধ্যানী বুদ্ধের মত স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করে।

তটের ছায়াঘন তরুতল হইতে স্নেহবিজড়িত কণ্ঠের আহ্বান আসে, "বিনু, উঠে আয়, আর জলে থাকে না।" যিনি ডাক দেন তাঁহার রূপ নাই, কিন্তু মহিমা আছে। তেজে নিষ্ঠায় বুদ্ধির দীপ্তিতে সে মুখ উদ্ভাসিত।

বিনু বলে, "তুমি এগিয়ে যাও ঠাকুমা, আমি নিতাই কাকার মাছের নৌকো দেখে এক্ষুণি যাচ্ছি।"

ঠাকুমা প্রস্থান করিলে বিনু তবু জল হইতে ওঠে না; যে পর্য্যন্ত নিতাই মাঝির মাছের নৌকা তীরে আসিয়া না ভেড়ে।

বিনুর পিতামহ গ্রামের বিখ্যাত কবিরাজ। যেমন তাঁহার রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা, তেমনি প্রতিপত্তি। তিনি দরিদ্রের মাতা পিতা, সুহৃদ্ ও সহায়। সকলে তাঁহাকে মান্য করে ভালবাসে। তাঁহার গৃহ-বিগ্রহ শ্রীধরের খ্যাতিও কম নহে। তিনি নাকি জাগ্রত দেবতা, প্রার্থীর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। ভক্তদের ভক্তি-উপহারে তাঁহার দেব-দেউল ভরিয়া যায়। সে উপহার নগণ্য, মূল্যহীন, কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসে অমূল্য। গাছের নূতন ফল তরকারী, নূতন ধানের চাল-চিড়া, নূতন গাভীর দুধ আসিতে থাকে ভারে ভারে। ঈশান কবিরাজের ঈশানী দুর্গা-সুন্দরী শ্রীধরের ভোগ রন্ধন করেন প্রচুররূপে। থালা থালা প্রসাদ বিতরিত হয় ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে। থালার মধ্যে থাকে বাটি বাটি পরমান্ন। নিত্য পায়েস না হইলে শ্রীধরের ভোগ হয় না।

নিতাই মাঝির নৌকা কূলে ভিড়িতে বিলম্ব হইল না। বিনু সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "ও নিতাই কাকা, কি মাছ ধরলে?"

"মাছ ভাল বিনু-মা, তোমার লেগে দু'ডা ভেন্ন করে থুইচি। বা-নন্দ, এক দৌড়ে মাছ দু'ডা ঠাকুরবাড়ী নামায়ে দিয়ে আয়।"

নিতাই মাঝির বালক-পুত্র একজোড়া মস্ত বড় ইলিশ মাছ হাতে ঝুলাইয়া ডাঙ্গায় নামে।

বিনু পুলকিত হইয়া বলে, "এত বড় দু'টো মাছ কেন দিচ্ছ নিতাই কাকা? আমরা ক'জনাই বা লোক, কে খাবে?"

"তুমিই খাইও মা, ঝোলে, ঝালে, ভাজা-ভাতে। রকমারি ক'রে খাইলে আবার ক'খানা মাছ?"

পথ চলিতে চলিতে বিনু তাড়া দেয়, "নন্দভাই, ছুটে মাছ দিয়ে আয়। মাছের কাছে রাজ্যের লোক জড়ো হয়েছে, একলা মাছ বেচতে নিতাই কাকার কষ্ট হবে। অমনি ঠাকুমাকে বলিস্ আমি জল থেকে উঠেছি। গয়লা-পাড়া ঘুরে এক্ষুণি যাচ্ছি বাড়ীতে।"

গোপ-পাড়ার মোহিনী পথ আগলায়, "বিনু-মা, চান হ'ল? আমি টাটকা ঘি-এর চাঁচি কলাপাতায় মুড়ে রেখে দিছি তোর জন্যে। গামছা দে, বেঁধে দেই।"

বাঁশবনে দাঁড়াইয়া সতীশ ঘোষের বৌ যশোদা, সাদরে হাত ধরিয়া জানায়, আজ রাতে তাহাদের এক মণ ক্ষীর তৈরী হইবে, বায়না লইয়াছে। প্রভাতে তাহারা বিন্নী ধানের চিড়া কুটিয়াছে। কাল সকালবেলা সেই চিড়া ও ক্ষীর সে বিনুকে খাইতে দিয়া আসিবে। বিনু যেন ঘুম হইতে উঠিয়া সাত তাড়াতাড়ি ফ্যানা-ভাত খাইতে না বসে।

বিনুদের বাড়ীর সন্নিকটে বৃহৎ দুই শিরীষ গাছের

তলা দিয়া দয়াল পাল বাজারে যাইতেছিল। বাবার নামের নাম জন্য দয়াল বিনুকে "মা-জননী" বলে। এক-মাথা কাঁচা-পাকা চুল তাহার, আধাপাকা দাড়ি-গোঁফ। খাজা বাতাসা কদমা কাটিয়া তাহার দিন গুজরান হয়। টাট্‌কা জিনিষ লইয়া পাল নিত্য যায় বন্দরের বাজারে। যাতায়াতের সময় সে প্রতিদিন বিনুকে একটা না একটা দ্রব্য দিবে কি দিবে। দৈবাৎ কোন সামগ্রী প্রস্তুত করিতে না পারিলে এক মুঠো বাতাসার চাঁচি লইয়া হাজির হয়। কিছু বিনুর হাতে দিতে না পারিলে তাহার দিন নাকি বৃথা যায়।

বিনিময়ে ঠাকুরদাদা ঔষধ দেন, ঠাকুমা প্রসাদ বিতরণ করেন। এত ভাবের আতিশয্যে বিনু বিমুখ হয়।

সেই রাখালিয়া প্রেমের মধুর বৃন্দাবন ছাড়িয়া বিনু আজ আসিয়াছে মথুরায়। মথুরায় রাজা আর প্রজা।

১৬

মধুমতীদের পাশে আসিয়া ঠাকুমা ঘোমটা তুলিলেন।

মধুমতী কহিল, "কিস্‌মিস্ খাবে, পিসীমা?"

"না লো, আমার দাঁত নাই, কিছ্‌মিছু খেতে গেলে দাঁত চাই। আমার হইচে 'দন্তহীনের হাসি, বড় ভাল-বাসি। গায়ে মেখে কাদা, বলে দাদা, দাদা'।"

"এতই যদি জান ঠাকুমা, তা হ'লে ওটাই বা বাকী রাখ কেন? এক ঘটি জল ঢেলে দেই, সারা গায়ে কাদা মেখে চিত্তির কর?"

ঠাকুমা সে প্রসঙ্গ এড়াইয়া বলিলেন, "রাজেশ্বরীর কাছে শুনলাম আমার তারাকান্ত নাকি পুজোর সময় আসতে পারবে না? তাই ক'দিন থেকে তোর মুখখানা ভার ভার দেখছি, 'বৃন্দাবন সুখের ঠাঁই তাতে রাধার সুখ নাই।' আহা মন ভার নাগবে না কেনে? বছরকার দিনে দুই মুল্লুকে দু'জনা। মন কেঁদে কয়—

'বিধি যদি দিত পাখা উড়ে গিয়ে করতাম দেখা ;—

ভুলে বিধি দেয় নি পাখা, ক্যামনে করিব দেখা'।"

মধুমতী লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "থামো ঠাকুমা, ওখানে মা রয়েছে, দিদিরা রয়েছে। তুমি ন্যাকা-বোকা সেজে থাকলেও এতই কি জান।"

"জানি না আবার, আমি কি আজকের মুনিষ্যি? 'মায় বলে ছুটি, বাপ বলে ছুটি, ঘোমটার তলায় আমার পাকাচুলের ঝুঁটি।' আমি যে আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী লো। এখন ব'সে ব'সে দিন গুণচি, আমার মরণ বঁধু আসে না। আসবে ক্যামনে? 'বর্ষায় সকল নদী অকূল পাথার, ক্যামনে আসিবে বঁধু, না জানে সাঁতার'।"

মধুমতী উত্তর দিতে মুখ তুলিয়া থামিয়া গেল মহেশ-বাবুকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া। দুইবেলা আহারের সময় ব্যতীত তিনি ভিতরে বিশেষ আসিতেন না। তাঁহার চা-পান, জলযোগ সমাধা হইত বাহিরে হলে অথবা গোল বারান্দায়।

মহেশবাবু ছিলেন গ্রন্থকীট। পল্লীগ্রামে তখন তেমন শিক্ষার প্রসারতা ছিল না। মাতা-পিতার একমাত্র বংশধর বলিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নের নিমিত্ত দূর প্রবাসে যাইতে দেওয়া হয় নাই। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং গৃহশিক্ষকের নিকটে পড়িয়া তাঁহার প্রথম জীবনে বিদ্যাশিক্ষার ইতি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা ছিল দুর্ব্বার। কিশোরে যাহা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, পরিণত বয়সে যত্নে-চেষ্টায় সেই পিপাসাকে তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। জমিদারী-সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের পরে বাকী সময় তিনি অতিবাহিত করিতেন অধ্যয়নে। তাঁহার বসিবার ঘরে রাশি রাশি পুস্তক সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

জমিদারের একমাত্র বংশধর ও স্বয়ং জমিদার হইয়াও তিনি কাহারও সেবা লইতে ভালবাসিতেন না, সে স্বজন হোক্ অথবা ভৃত্য সম্প্রদায়ই হোক্। মহেশবাবু যেমন শক্তিমান্ পুরুষ, তেমনি তাঁহার চিত্তবল ও সৌন্দর্য্যবোধ। তাঁহার পাঁচমহল প্রাসাদে কোথায়ও এতটুকু আবর্জ্জনা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না কেহ। সর্ব্বত্র ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। তিনি স্নানান্তে নিজের কাপড় নিজে কাচিতেন, বিছানা স্বহস্তে ঝাড়িয়া রাখিতেন।

পিতার ন্যায় পুত্রেরও ছিল পুষ্পপ্রীতি। বাগানের প্রতি তরুলতা প্রতিদিন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে ফুল তুলিয়া পরিবারের প্রত্যেকের বিছানায় চীনামাটির বাটি ভরিয়া রাখিয়া দিতেন।

আর একদিকে ছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি। সেটা হইল অন্তঃপুরিকাদের অভাব, অসুবিধার প্রতি। শুদ্ধাচারিণীদের রাশি রাশি শাড়ী, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় কাচিয়া পরিচারিকারা শুকাইতে দিত গোশালার পশ্চিমে সব্‌জিবাগানের বাঁশের বেড়ার গায়ে। সেই সময় তিনি লক্ষ্য করিতেন কাহার কাপড় ছিঁড়িয়াছে, বিছানার চাদরে ফাটা ধরিয়াছে, ওয়াড়ের জীর্ণ অবস্থা।

নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি মেয়েদের চাহিয়া লইতে

হইত না। মিহি সুতার চটকদার শাড়ী, বোম্বাই বিছানার চাদর, লংক্লথের ওয়াড়, যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা পাইত তাহাদের বিছানার উপরে।

রায়বাড়ীতে এক গোয়ালভরা নধরকান্তি গাভী পালিত হইত। গোরুগুলির প্রতি মহেশবাবুর অতিশয় স্নেহ মমতা, চাকরদের উপরে অবোলা জীবদের সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। তাহাদের আহার-বিহার, দোহন তাঁহার চোখের সম্মুখে সমাধা করিতে হইত।

যাহার যাহা দরকার—তাহাদের বিছানায় পাইলেও মায়ের জিনিষ মায়ের হাতে তিনি নিজে তুলিয়া দিতেন।

মহেশবাবু কর্ম্মশালার দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন "মা, তোমার বিছানার চাদর নাও। দু'খানা আছে।"

ঠাকুমা পুত্রের আপাদমস্তকে স্নেহদৃষ্টি বুলাইয়া আনন্দে গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "আমারে পাড়ন দিলে বাবা, আমার পায়ন একখানা ছিঁড়েছে, আর একখানা শক্তই আছে, তুমি দিলে আমি নিলাম।" ঠাকুমা হাত বাড়াইয়া চাদর লইলেন।

একবার কাশিয়া মুখের ঘোমটা আর একটুখানি টানিয়া দিলেন। চারিদিকে চকিতে চাহিয়া ধীরে বলিতে লাগিলেন "একটা কথা তোমারে কই বাবা; তোমার কি সোনা জড়ানোর কানি জোটে না?"

মায়ের হেঁয়ালী ছেলে হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিয়া মা'র মুখের পানে তাকাইলেন।

"আমি কইছিলাম আমার পেসাদের বৌয়ের কথা, মহেশ। কাল বিকেলে ও বসেছিল আমার কাছে, আমার নজরে পড়ল ওর পরণের ভেজা কাপড়, কইলাম ভেজা কাপড় কেনে পরেছিস্? বৌ কইলো, 'ধোয়া কাপড় ভাল ক'রে শুকোয় নি, এ গায়েই শুখিয়ে যাবে।' তাই কইছিলাম বৌয়ের কাপড় নেই, খান-কতক কাপড় দিতে হবে।"

বিনু শিহরিয়া উঠিল। শত জ্বালায় সে জ্বলিয়া মরিতেছে। এ আবার কি নূতন জ্বালা?

মহেশবাবু মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি কি বৌমার কাপড় নেই, মাধু? ভেজা কাপড় গায়ে শুখিয়ে নিতে হয়; অসুখ করবে যে? তোমরা দেখাশোনা কর না কেন? এক হাত ঘোমটা দিয়ে কি সারাদিন মানুষ থাকতে পারে? আমাদের দেশের প্রথানুযায়ী বিবাহিতা মেয়েদের মাথায় কাপড় দেবার নিয়ম ব'লে কি তোমরা বৌমাকে বোরকা পরিয়ে রাখবে? ঘোমটা কমিয়ে দাও। কাপড় এত ময়লা তোমরা দেখ নি কেন? ছেলেমানুষ তোমাদের কাছে এসেছে। তোমরা আদর-যত্ন ক'রে সব শিখিয়ে নিলে তবেই না শিখবে, আপনার হবে। আমাদের দেশের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, বৌ আসে ফাঁসির আসামী হয়ে। যে শাশুড়ী বধূ-অবস্থায় যত কষ্ট পায়, তার পুত্রবধূ এলে সেই কষ্ট তাকে না দিয়ে তৃপ্ত হয় না। এ হ'ল শিক্ষার অভাব, তোমরা ত কেউ লেখাপড়া শিখলে না। আমার ইচ্ছে বৌমা শেখে। তুমি বৌমার বাক্স খুলে দেখ ক'খানা কাপড় আছে বাক্সে।"

বধূর প্রতি পিতার পক্ষপাতিত্বে মধুমতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "ওর অনেক কাপড় আছে, বাবা। সেদিন বিয়ে হ'ল, দু'জায়গা থেকেই কাপড় পেয়েছে। দেখে-শুনে গুছিয়ে গাছিয়ে পরতে পারে না, বুদ্ধি বড় কম।"

"ক্রমে ক্রমে হবে, কেউ অল্প বয়সে পাকে, কারোর বুদ্ধির বিকাশ হয় দেরীতে। বৌমার মুখের কাপড় একটু তোলো ত। অনেকদিন দেখি নি।"

মধুমতী কেবল ঘোমটা তুলিল না। মাথার আঁচল ফেলিয়া দিল। ভয়ে লজ্জায় বিনু নতমুখী হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিল। তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিতে লাগিল।

মহেশবাবু সচমকে বলিলেন, "এ কি, বৌমার অত সুন্দর চুলে তেল নেই, আঁচড়ানো নেই! যে নিজে পারে না, তাকে যত্ন করতে হয়। আমাদের দেশে শিক্ষার অভাবে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীতে ভারী কষ্ট।"

মহেশবাবু আর দাঁড়াইলেন না, বধূর শয়নগৃহের তত্ত্বাবধান করিতে চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ গৃহের কর্ম্মরতারা নীরবে কাজ করিতেছিল, কর্ত্তা অন্তর্দ্ধান হইলে চাপা মৃদু গুঞ্জন সুরু হইল, "আহা, সারা পৃথিবী খুঁজে এমন দুর্লভ রত্ন আমদানী করেছেন, ওকে টাটে বসিয়ে পূজো করা দরকার। আমরা জ্বালা যন্ত্রণা দিচ্ছি রাজার ঝিয়ারী প্যারীকে। ঘুঁটেকুড়োনী হয়েছেন রাজরাণী। আদর-যত্ন মানে, ভালমতে আমাদের ঝিগিরি করা। কেন, আমাদের কিসের দায়? আমরা মহারাণীর সুখের ভাগ চাই না। পূজোটা বেরিয়ে গেলেই যে যার মতন নিজেদের রাস্তা নেব। ঠেস্ দিয়ে কথা বলার মানে আমাদের জানা আছে।"

মনোরমা স্বামীর ওপরে তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। পুরাতন ইতিহাস তাঁহার হৃদয় হইতে এখনও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। নবজীবনের প্রারম্ভে শ্বশুরগৃহে প্রথম শুভলগ্নে পদক্ষেপে শাশুড়ীই কেবল কাঁদিয়া হাট বসাইয়া

ছিলেন না। স্বামীও হইয়াছিলেন তাঁহার সহকারী। তাহার পরেও সেই অতীত ঘটনার অনেক পুনরাবৃত্তি অভিনয় হইয়াছিল। তাহার মধ্যে লুকাইয়া ছিল অনেক পুঞ্জীভূত বেদনা, অব্যক্ত দুঃখ। কত অশ্রুজল নীরবে ঝরিয়া নীরবে শুকাইয়া গিয়াছিল। কত আশার মুকুল না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে তিনি জমিদার-ভবনের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াও সেদিনের মর্ম্মান্তিক জ্বালা ভুলিতে পারেন নাই। যিনি আঘাত দেন তিনি ভুলিয়া যান সহজে, কিন্তু যে আঘাত পায় সে ভুলিতে পারে না।

মনোরমা আর এক কড়া দুধ উনুনে চাপাইয়া মেয়েদের কথায় সায় দিলেন—"পরের মেয়েকে আনলে আদর-যত্ন ক'রে আপনার ক'রে যে নিতে হয় এ নীতি-বোধ আমার বেলায় দেখি নি। চুলের তেলের, কাপড়ের খোঁজ-খবর তখন কে রেখেছিল? জন্মভোর আমার হাড় জ্বালিয়ে এখনও রেহাই দিচ্ছে না। এদিকে বোকা সেজে থাকা, ওদিকে অন্য কাউকে না জানিয়ে ছেলেকে কুটকুট ক'রে জানানো হ'ল বৌয়ের ভিজে কাপড়ের কথা। যেমন মা, তেমনি ছা।"

কর্ম্মশালায় পূর্ণ উদ্যমে রণডঙ্কা বাজিয়াই চলিল। সৌভাগ্যের বিষয় তাহা মহেশবাবুর কর্ণগোচর হইল না। তিনি অখণ্ড মনোযোগে অন্দরের ঘর বারান্দা গলি-ঘুঁজি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া না দেখিলে বৃহৎ আঙ্গিনা আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া যায়, হাড়িকন্যা অঙ্গন ঝাঁট দিয়া কোণের দিকে স্তূপ করিয়া রাখে আবর্জ্জনা। চাকরেরা গাছের মরা ডালপালা সরাইয়া লয় না। কুয়োর পাড়ে জল জমিয়া পিছল হয়। পুকুর ঘাটের সোপান বালি দিয়া ঘষা হয় না। কোথায় বাতায়নের খড়খড়ি ভাঙ্গিয়াছে, চৌকাঠে মাকড়সা জাল বুনিয়াছে। এক সপ্তাহ কোন্ ঘরের বিছানা রৌদ্রে পড়ে নাই। এমনি সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ে কর্ত্তার সজাগ সন্ধানী দৃষ্টির জন্য রায়ভবনের পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতায় দর্শকের চক্ষু ধাঁধিয়া যায়।

কিস্‌মিস্ ঝাড়া-বাছা হইল। মধুমতী দ্বারপ্রান্তে কিস্‌মিসের ডালা ঠেলিয়া দিয়া বিরস মুখে বলিল, "এই নাও মেজদি, হয়ে গেছে, তুলে রাখ। আমি চললাম বৌকে পরিষ্কার করতে। বাবা বাইরে যান নি, চার দিকে ঘোরাঘুরি করছেন, সাজগোচ হয় নি দেখলে ফের পাঁচ কথা শোনাবেন।"

মধুমতীর সঙ্গে বিনু তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া অবাক্ হইল। ইহারই মধ্যে জোড়া খাটের বিছানা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে। ঘরের মাঝখানে ছাদে আলোর এক বেলোয়ারী ঝাড় ঝুলিতেছে। শিয়রের দেয়ালে কাঠের ব্র্যাকেটে নীল দেয়ালগিরি বসিয়াছে। এ কোণে ও কোণে দুই-তিনটা ত্রিপদী রাখা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে নূতন একখানা ছবিতে। ছবিখানা রবিবর্ম্মার দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা।

১৭

মধুমতীর স্বামী পাবনায় ওকালতি করে। অর্দ্ধ শহরে বাস করিয়া মধুমতী কিঞ্চিৎ আধুনিকা হইয়াছে। তাহার বেশভূষার রূপান্তরে সময় সময় দিদিদের নিকটে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়।

বিনুর চুলের পরিচর্য্যা করিয়া মধুমতী তাহার বাক্স খুলিয়া বলিল, "তোমার একগাদা জামা সেমিজ রয়েছে, তুমি বের করে পরো না কেন? মেয়েদের কাপড়ের নীচে একটা আব্রু থাকা ভাল। হঠাৎ গায়ের আঁচল স'রে গেলে অপ্রস্তুত হ'তে হয় না। নাও, ক'টা বের ক'রে রাখো, রোজ প'রো"

মধুমতীর সহিত তাহার কথা বলা বারণ। সেইজন্য মৌন বধূ মুখর হইয়া বলিতে পারিল না, ইতিপূর্ব্বে তাহার সে পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে।

সেদিন সে ধোয়া শাড়ীর নীচে সেমিজ গায়ে দিয়া কর্ম্মশালায় গিয়াছিল, সরস্বতী তাহাকে কিছুই ছুঁইতে না দিয়া অবিকম্ভ গৃহের বাহির করিয়া দিয়াছিল। সেলাই করা কাপড় নাকি অশুদ্ধ, নিয়মের কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

এ মতবাদে শুচিপরায়ণা সরস্বতীকে দোষ দেওয়া যায় না। তখনও পল্লীগ্রামে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেমিজ-জ্যাকেটের তেমন প্রচলন ছিল না। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে পাড়ায় বেড়াইতে গেলে কেহ কেহ সবে সেমিজ-জামা পরিতে সুরু করিতেছিল। ঘরে স্ত্রীলোকরা সর্ব্বাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র জড়াইয়া পুঁটলি হইয়া বিরাজ করিত। ইতর সাধারণেরা সেমিজের নামকরণ করিয়াছিল 'খেলকা'। খেলকা-পরা বিবিরা সকলের দর্শনীয় বস্তু হইয়াছিল।

বিনুদের বিরাট্ গোষ্ঠীর অধিকাংশ কলিকাতায় কর্ম্ম উপলক্ষ্যে বাস করিতেন। তাহার বাবা-কাকা অবধি। গ্রামে কবিরাজি করিতেন তাহার নিজের ঠাকুরদাদা। পরিবারের যাঁহারা প্রবাসে থাকিতেন, তাঁহারা সভ্যতার আলোকে ও বেশবাসে ঝক্ ঝক্ করিতেন। প্রবাসিনী ঠাকুমারা শহরের মেয়ে। ঠাকুমা ডাক সেকেলে হইয়াছে জন্য তাঁহারা বিনুকে মেজদি, নদিদি, ছোড়দিদি বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছিলেন। তিন দিদির ভিতরে মেজদিদি রাধারাণী ছিলেন অসামান্য

রূপসী। যেমন রূপ তেমনি ছিল তাঁহার বিলাস। তাঁহার রূপসজ্জায় নগরবাসীরাই বিস্মিত হইতেন। ছোট সুরবালা অলস প্রকৃতির, বেশভূষার তেমন ধার ধারিতেন না। নদিদি সারদাসুন্দরী ছিলেন নিঃসন্তান, সাক্ষাৎ দশভুজা, ; সংসারের কাজে অসামান্যা, রন্ধনে দ্রৌপদী। মোটা চালচলন, পরদুঃখে কাতর। সকলে তাঁহাকে বড়মা বলিত। তিনি ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সকলেরই বড়মা হইয়াছিলেন।

প্রথমেই রাধারাণী পাথরকুচি গ্রামে খেলকার বাহার দিয়া সকলের সমালোচনার পাত্রী হইয়াছিলেন, পরে অবশ্য পল্লীবাসিনীরা তাঁহার উগ্র প্রসাধন মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই মেজদিদি বিনুর বিবাহে বাক্সে সাজাইয়া দিয়াছিলেন থাকে থাকে সেমিজ-জ্যাকেট, মায় ডজন খানেক ফুলকাটা রুমাল।

সজ্জা শেষে বিনু ঘরের বাহির হইয়াই পাইল ঠাকুমাকে।

তিনি মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন, "এতক্ষণে না দিব্যি হইচিস্ বৌ, মেয়ে মুনিষ্যির 'শোভা কেশে আর বেশে'। আমার মহেশ না তোরে কলাবৌ হ'তে মানা ক'রে দিচে। বেশি ঘোমটা ভাল নয়, 'নাক ঘোমটা চোখ টান, সেই বৌ শয়তান'।"

বিনু চুপে চুপে কহিল, "ভাল নয় যদি, তা হ'লে আপনি এত ঘোমটা দেন কেন ঠাকুমা?"

"ওমা কয় কি লো, কিসে আর কিসে। তোর চাঁদ-পারা মুখ লোকের দেখার দেব্য। আমার তালের আঁটি আমি নজ্জায় খুন খুন হইয়ে ঢেকে রাখি। এখন হইচে আমার 'দুরন্ত বর্ষার কাল শেয়ালে চাটিছে বাঘের গাল, ওরে সর্প তোরে কই, কাল গুণে সকলি সই।' তোর মতন বয়েসকালে আমিও ঘোমটা তলে কত খেমটা নাচন নেচেছি লো। যখনকার যা, এখন পথে-ঘাটের নোক যদি জমিদার মহেশ রায়ের মা'র মুখ দেখে তা হ'লে কইবে কি? আমার মানী ছেলের মান থাকবে না।"

ঠাকুমার অদ্ভুত মর্য্যাদাবোধে বিনু স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। ঠাকুমা আঁচলের তলা হইতে বিছানার চাদর বাহির করিয়া দেখাইলেন, "দেখ বুঁচি, আমার মহেশ আমারে কি সোন্দর পাড়ন দিইচে, একখানার বদলে দুইখানা।"

হারানী যাইতেছিল কলসী কাঁখে কুয়োর জল তুলিতে। ঠাকুমা হাঁকিলেন, "ও হারানি, এদিকে এগো না লো, দেখ, আমার ছেলে আমারে কি দিয়েছে? ও না দিলে আমি পাব কোথা, আমার হইচে 'বাপ নির্ধন, সোয়ামী কুঁড়ে কে দেবে মোরে অলঙ্কার গড়ে'?"

হারানী আগাইয়া আসিয়া চাদরের তারিফ করিয়া কুয়োর পাড়ে গেল। নিম্নশ্রেণীর ঝিদিগকে ইতিমধ্যে চাদর দেখান হইয়াছিল, এখন বাকী খাসমহলের খাস দাসী কামিনীর মা।

অন্বেষণের ব্যাকুল-দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া ঠাকুমা ডাকিতে লাগিলেন "রাজেশ্বরী, রাজু গেলি কোথায় লো? কাল সাঁজে যে এক ধামা চালের গুঁড়ো কুটলি, তা ত রোদে দিলি না? আজ দিব্যি খট্‌খটে রোদে উঠোন ভ'রে গেচে। যাবে না কেনে? ভোর থেকে কুঁড়ো (বাজ) পাখি উড়ে উড়ে ডাকচে। কুঁড়ো উড়ে ডাকলে খালখন্দ, হিল বিল শুকিয়ে যায়। বাসায় ব'সে ডাকলে তিভুবন জলে জল হয়।"

রাজেশ্বরীর পরিবর্ত্তে নবীন সুমন্তকে কোলে লইয়া উপস্থিত হইল। সুমন্ত ঘুমের বায়না করিতেছে। পূজার কাজ সুরু হওয়াতে এক রাত্রে কাছে শোয়া ভিন্ন তাহার মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। বাহির মহলেই পিতার তত্ত্বাবধানে নবীন তাহাকে স্নান করায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায় ও খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখে। নিরন্তর পুরুষের সঙ্গ আজ শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই কারণে অসময় তাহাকে অন্তঃপুরে আনিতে হইয়াছে।

ক্ষুদে দেবরটিকে বিনুর খুব মিষ্ট বোধ হয়, উহার চোখে-মুখে, হাসিতে, আধো কথায় বিনুর পরপারের পথিক ছোট ভাইটির যেন সাদৃশ্য রহিয়াছে। শিশুও বিনুর অতিশয় বাধ্য। এখনও কথার জড়তা কাটে নাই। তরুর অনুকরণে তাহাকে 'বইদি' বলে। ক্ষিতি ভিতরে বিশেষ আসে না। বছর বার তাহার বয়েস, লাজুক প্রকৃতি। বিনুর সহিত তাহার যোগাযোগ নাই। তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করা বিনুর নিষেধ। নববধূর সঙ্গে মেলামেশার বয়েস তাহার নাকি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এ বেলা কর্মশালায় প্রবেশ করিতে বিনুর ইচ্ছা হইল না। কাজের উপযোগী বেশভূষাও ছিল না। এত সাধের গঙ্গাজলী ডুরে, গোলাপী রং-এর লেস-হাতা সেমিজ এই দণ্ডে 'সোনার অঙ্গে' তুলিয়া এখনই খুলিয়া রাখিতে সে নারাজ। অথচ কিছু না করিলে নিস্তার নাই। ওই হটর, হটর, খটর, খটর, ঝন্ ঝন্ খন্ খনের চাইতে সুমন্ত অনেক ভাল, অনেক মধুর।

সে সুমন্তের দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিল; শিশু হাসির লহর তুলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহার বক্ষে।

ঠাকুমা নাতির গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিলেন, "এক সোন্দর তোমার দাদা, আর সোন্দর তুমি, মাঝে মাঝে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলক দিচ্ছি আমি।" ক্রমশঃ

চর্যাপদে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন ৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভগবান্ বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে,

"According to Theravada Buddhism, the Buddha's Parinirvana occurred in 544 B.C. Though the different schools of Buddhism have their independent systems of chronology, they have agreed to consider the full-moon day of May, 1956, to be the 2500th anniversary of the Mahaparinirvana of Gautama the Buddha."—Foreword, p. 1, S. Radhakrishnan. 2500 years of Buddhism.

বুদ্ধদেব রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে তাঁহার নবনির্মিত রাজধানী রাজগৃহে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ৫৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মহারাজ বিম্বিসারের সিংহাসনে অভিষেক হয়। প্রাচীন গিরিব্রজপুরের উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশে বিম্বিসার তাঁহার নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন এবং উহার নাম রাখেন রাজগৃহ—অর্থাৎ রাজার গৃহ। বর্তমান এই রাজগৃহের নাম হয়েছে রাজগীর। এই রাজগীর পাটনা (প্রাচীন পাটলিপুত্র) জেলাতে অবস্থিত। রাজগীরের বিপুলা পাহাড়ে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার বাণী প্রথম প্রচার করেন। ওখানকার বৈভার পাহাড়ে যে গুহাপথ আছে, ঐ গুহাপথে বুদ্ধগয়া যাতায়াত করা যেত —এই জনশ্রুতি আছে রাজগীরে।

বঙ্গদেশ হ'তে এই রাজগীরের দূরত্ব বেশী নয়; কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম বাঙলা দেশে প্রচার হ'তে একটু বিলম্ব হয়েছিল। তখনকার যাতায়াতের অসুবিধাই ছিল এর অন্যতম কারণ। খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই কলহজনিত অরাজকতা চলেছিল চার বৎসর। সমস্ত অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে অশোক পাটলিপুত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে। প্রায় ৩৭ বৎসর রাজত্ব ক'রে মহারাজ অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রাজ্য পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) এবং সমতট (পূর্ববঙ্গ) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে উত্তর বঙ্গে মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতে।

বঙ্গদেশে ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলা কঠিন। তবে মহারাজ বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ক'রে উহা প্রচারে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বলা যেতে পারে। এর ফলে রাজগৃহের নিকটবর্তী বঙ্গদেশে ঐ ধর্ম নিশ্চয় প্রবেশ লাভ করেছিল। অন্ততঃ মহারাজ বিম্বিসারের পর এবং মহারাজ অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম যে বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়েছিল, এ কথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দ পর্যন্ত মোট ২৭৬ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়।

Buddhism had probably obtained a footing in North Bengal even before Asoka's time. The great missionary activity of Asoka, and the tradition about him recorded in Divyavadana and also by Hiuen Tsang, make it highly probable that Buddhism was not unknown in Bengal during the reign of that great Emperor. The existence of Buddhism in North Bengal in the 2nd century B.C. may also be inferred from two votive inscriptions at Sanchi recording the gifts of two inhabitants of Punavadhana, which undoubtedly stands for Pundravardhana.

Buddhism—Dr. P. C. Bagchi, History of Bengal, p. 411-12, published by Dacca University.

ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনতিকাল পরেই তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক রাজগৃহে একটি সঙ্গীতি অর্থাৎ ধর্ম মহাসম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভগবান্ বুদ্ধের অমূল্য উপদেশাবলী ও বিনয় বা বৌদ্ধ অনুশাসন লিপিবদ্ধ করণ। কিন্তু বৌদ্ধ অনুশাসন নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে পরে মতভেদ দেখা দেয়। এর ফলে প্রায় শতাব্দী ব্যবধানে বৈশালীর শ্রমণগণ অনুশাসনের ধারা শিথিল করবার উদ্দেশ্যে বৈশালীতে দ্বিতীয় ধর্ম মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। পরম সৌগত মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম

মহাসম্মেলন আহূত হয়। ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় ২৩৬ বৎসর পর এই তৃতীয় সভা আহূত হয়েছিল। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুগতের উপদেশাবলী সম্পূর্ণকরণ। পরম সৌগত পণ্ডিত শ্রমণ তিস্স মোগ্গলিপুত্রও ছিলেন এই মহাকার্যের নায়ক। এই সম্মেলনে সমস্ত বৌদ্ধ যোগদান করেন নি। পরন্তু ইহা ছিল বিভাজ্যবাদী সম্প্রদায়ের একটি দলীয় সম্মেলন বিশেষ। মনে হয়, এই সময় (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে) বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় মত নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। এই মতভেদের ফলে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা, পরবর্তীকালে,—সম্ভবতঃ মহারাজ কণিষ্কের সময়ে,—হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে (সম্ভবতঃ খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে) কাশ্মীরে চতুর্থ সম্মেলন আহূত হয়। উত্তর ভারতের হীনযানীরা এই সম্মেলনে সমবেত হন। এই হীনযানীরা প্রাচীন মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায়। মহারাজ কণিষ্ক ছিলেন নব্যতন্ত্রের মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। মহাযানীরা ভগবান্ সুগতের পাশাপাশি ধ্যানীবুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের পূজা করতেন। মহাযানীদের মতে জগতের দুঃখ দূর করতে এবং সত্য-পথ দেখাতে বোধিসত্ত্ব বার বার আবির্ভূত হন। মহাযানীরা ঠিক যেন গীতার ধর্মমতকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥
৪র্থ অধ্যায়॥

মহাযানী বৌদ্ধদের উক্ত মতটি নাগার্জুনের চিন্তা-সম্ভূত ব'লে অনেকে মনে করেন, তবে ইনি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক নাগার্জুন কি না বলা শক্ত। ইনি শতবাহন রাজ যজ্ঞশ্রী গৌতমীপুত্রের (১৬৬—১৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) বন্ধু এবং সমসাময়িক ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রবর্তক।

হীনযান ও মহাযান এই দুই দলের মতভেদের কারণ ছিল বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে। হীনযানীদের সাধনা ছিল নিজেদের নির্বাণের জন্য। তথাগত যে জীবকে ভালবেসে তাদের দুঃখ দূর করতে, তাদের মুক্তির উপায়ের জন্য রাজ্য-ঐশ্বর্য-সুখ-সম্পদ্ ত্যাগ করেছিলেন, হীনযানীরা সে উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি; বরং তাঁরা যেন নিজেদের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের এই হীনপন্থার জন্যই বোধহয় তাঁরা হীনযানী এবং তাঁদের মত হীনযান আখ্যা লাভ করে। অপর পক্ষে মহাযানীদের মত ছিল বড় উদার। উপনিষদের বাণীর সঙ্গে বিচার করলে মহাযানীদের মতের আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যাবে। মহাযানীরা নিজেদের নির্বাণকে উচ্চে স্থান দেন নি। সকল জীবকে ভালবেসে, সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ক'রে নির্বাণ লাভ ছিল তাঁদের সাধনার চরম উদ্দেশ্য। হীনযান মতে সন্ন্যাস-জীবন যাপন না করলে নির্বাণ লাভ হয় না, কিন্তু মহাযান মতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-শূদ্র যে কেহ ভক্তি ও বিশ্বাসে তথাগতের পূজা করবে, আর বুদ্ধের প্রতিরূপ মানুষকে ভালবাসবে, সেই নির্বাণের অধিকারী হবে। ঠিক এইসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে উপনিষদের বাণী— "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। আর মনে পড়ে চণ্ডীদাসের বাণী, "শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" আর মনে পড়ে মহাপ্রভুর বাণী, "চণ্ডালোঽপি দ্বিজোত্তমঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" আরও মনে পড়ে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণী, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" মহাযানীরা নিজেদের মতকে মহা (শ্রেষ্ঠ) যান (পথ) ব'লে মনে করতেন।

অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাযানীদের এই উদার মত বিশ্লেষণ ক'রে লিখেছেন—

"The Mahayanists believe that every-man—nay, every being of the world is a potential Buddha; he has within him all the possibilities of becoming a সম্যক্-সম্বুদ্ধ i.e., the perfectly enlightened one. Consequently the idea of Arhathood of the Hinayanists was replaced by the idea of Bodhisattvahood of the Mahayanists. The general aim of the Hinayanists was to attain Arhathood and thus through নির্ব্বাণ or absolute extinction to be liberated from the cycle of birth and death. But this final extinction through নির্ব্বাণ is not the ultimate goal of the Mahayanists; their aim is to become a Bodhisattva. Here comes the question of universal compassion (Mahakaruna) which is one of the cardinal principles of মহাযান। The Bodhisattva never accepts নির্ব্বাণ though by meritorious and righteous deeds he becomes entitled to it. He

deliberately postpones his own salvation until the whole world of suffering beings be saved. His life is pledged for the salvation of the world, he never cares for his own. Even after being entitled to final liberation the Bodhisattva works for the uplift of the whole world and of his own accord he is ready to wait for time eternal until every suffering creature of the world attains perfect knowledge and becomes a Buddha Himself. (P. 7, Tantric Buddhism.)

হীনযানী ও মহাযানী সম্প্রদায় প্রথমে থেরবাদী (স্থবিরবাদী) ও মহাসাংঘিকবাদী নামে অভিহিত হন। বৌদ্ধসমাজে যে সময় হ'তে মতভেদ দেখা দিক না কেন তার ফলে যে বৌদ্ধধর্মে বিবর্তন এসেছে একথা অনস্বীকার্য। এই বিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে বিরাট্ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোড়নে পৃথিবীর বহুদেশে বৌদ্ধধর্ম সহজে প্রসার লাভ করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষে এই বিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতদূর হয়েছিল যে, তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের টনক নড়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই সময় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সামঞ্জস্য বিধান ক'রে ফেলল। এইরূপ সামঞ্জস্য বিধানের ফলে হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার ব'লে স্বীকার ক'রে নিল। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে হিন্দুসমাজে পূজিত হলেন। শ্রীজয়দেব ভগবান্ বুদ্ধকে তাই পূজা করলেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"

শ্রীগীতগোবিন্দ

বুদ্ধদেব যে নূতন ধর্ম প্রচার করছেন এমন ভাবও তাঁর মনে কখনও আসে নি।

"The Buddha did not feel that he was announcing a new religion. He was born, grew up, and died a Hindu. He was vesting with a new emphasis the ancient ideals of the Indo-Aryan civilization."—Foreword, p. ix. S. Radhakrishnan, 2500 years of Buddhism.

প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম বিরাট্ হিন্দুধর্মেরই একটি সংস্কৃত শাখা। ইহা ঠিক ঔপনিষদিক ধর্মের অভিনব সংস্করণ। শূন্যতত্ত্বের মূল উপনিষদের মধ্যে নিহিত আছে। আচার্য গঙ্গানাথ ঝাঁ-র মতে আচার্য শঙ্করের মায়াবাদ-ভিত্তিক অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্বের নামান্তর। আচার্য রামানুজ এইজন্য আচার্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ব'লে বিদ্রূপ করেছেন। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ-প্রশস্তি করেছেন, এমন কি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। আর বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধীও নহেন, তিনি শুধু পশুহত্যা-সম্পর্কিত যজ্ঞের বিরোধী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতাতে ঠিক এই মতই প্রকাশ করেছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য গতিং প্রতি ॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

২য় অঃ॥

হে পার্থ, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্মকাণ্ডের স্বর্গ-ফলাদি প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত, তাহারা বলে বেদোক্ত কাম্যকর্মাত্মক ধর্ম ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহারা ভোগৈশ্বর্য লাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক আপাতমনোরম বেদবাক্য বলিয়া থাকে ; এই সকল শ্রুতিমুখকর বাক্য দ্বারা অপহৃত চিত্ত, ভোগৈশ্বর্য-আসক্ত ব্যক্তিমনের কার্যাকার্য নির্ণায়ক বুদ্ধি এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না অর্থাৎ ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না।

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন সম্বন্ধে শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—

"Traditions differ as to why the second council was called. All the accounts, however, record unanimously that a schism did take place about a century after the Buddha's parinirvana because of the efforts made by some monks for the relaxation of the stringent rules observed by the orthodox monks. The monks who diviated from the rules were later called the Mahasanghikas, while the orthodox monks were distinguished as the Theravadins (Sthaviravadins). It was rather 'a division between the conservative and the liberal, the hierarchic and the democratic.' There is no room for doubt that the council marked the evolution of new schools of thought."
—Principal Schools and Sects of Buddhism, p. 99.
—2500 years of Buddhism.

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ফলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা হীনযানী (থেরবাদী বা স্থবিরবাদী) ও মহাযানী (মহাসাংঘিকবাদী) এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেলেন। কিন্তু এখানেও সব সমস্যার নিরসন হয় নি।

প্রয়োজনবোধে উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব মত ও পথ জনগণের গ্রহণীয় ক'রে তুলতে উদারতর করে তুলতে থাকলেন। এজন্য উভয় সম্প্রদায় নানা শাখা বিভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। থেরবাদী সন্ন্যাসীরা এগারটি শাখা বিভাগে এবং মহাসাংঘিকবাদীরা সাতটি শাখা বিভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। কিন্তু শাখা বিভাগের এখানেও শেষ হয় নি। তথাগতের পরিনির্বাণের তিন-চার শত বৎসরের মধ্যে এক এক ক'রে বহু শাখা বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল।

থেরবাদীদের মতে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা ব'লে অসৎ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া যায় এবং মনকে পবিত্র ক'রে সৎকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়। সৎচিন্তার দ্বারা প্রজ্ঞা লাভ হয়। প্রজ্ঞাবলে সংসারের অনিত্যতার উপলব্ধি হয়। ইহা হতে নির্বাণের জ্ঞান জন্মে। তৃষ্ণা, অসদিচ্ছা এবং ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হ'তে পারলে মানব নির্বাণের অধিকারী হয়। সুতরাং নির্বাণ অনির্বচনীয়, কায়বাক্‌চিত্তের অতীত অর্থাৎ অবাঙ্‌মনসগোচর।

প্রজ্ঞাবলে মানব যখন এই নির্বাণের জ্ঞান লাভ করে তখন তার আর তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয় বাসনা বা ভোগাসক্তি থাকে না। এমন ভাবাপন্ন মানব অর্হৎ অর্থাৎ প্রকৃত মানব নামে অভিহিত হন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যেমন দুই মহা সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেলেন, তেমনি তাঁরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থের ভাষাও পৃথক্ ক'রে নিলেন। থেরবাদীরা গ্রহণ করলেন পালি ভাষা আর মহাযানীরা গ্রহণ করলেন সংস্কৃত ভাষা।

থেরবাদী সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাখা বিভাগ হ'ল সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছিল মহাযানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু মহামনীষী অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বুদ্ধপালিত, ভাববিবেক, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতের নিকট থেরবাদী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। আর এর ফলে মহাযানী সম্প্রদায়ের যে বিজয় লাভ হয়েছিল তার জন্যে মহাযানবাদ অপ্রতিহত গতিতে দিকে দিকে প্রসার লাভ করতে পেরেছিল।

মহাযানীরা তাঁদের শাস্ত্রবিধি সম্পূর্ণ ক'রে উহা সূত্র, বিনয়, অভিকর্ম, ধারণী ও বিবিধ এই পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলেন। কিন্তু মোটামুটি ভাবে মহাযানীরা থেরবাদীদের মত ভগবান্ তথাগতের মূল সূত্র বা মতগুলি গ্রহণ করেছিলেন। তবে একটু অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, মহাযানীরা সাতটি শাখাবিভাগে ভাগ হলেও তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিভিন্নতার মূলে ছিল প্রয়োজনের তাগিদ। ঠিক প্রাচীন ঔপনিষদিক ধর্ম যেমন মানুষের প্রয়োজনে বিবর্তনের পথে গিয়েছিল, মহাসাংঘিকবাদ বা মহাযানবাদও ঠিক যেখানে যেমন প্রয়োজন ঠিক সেখানে তেমনই পরিবর্তন লাভ করেছে। এ যেন ঠিক উপনিষদের "চরৈবেতি" অবস্থা। তবে মনে রাখতে হবে, সর্বত্র মানুষের প্রয়োজনই অগ্রাধিকার লাভ করেছে। এমন কি ইঁদের মতে একজন অর্হতেরও মানবের কাছ থেকে শিখবার জিনিষ আছে। সুতরাং অর্হৎভাবও নির্বাণের শেষ অবস্থা নয়।

মহাযানীরা জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মানবকে অরূপ বা বিরাগের পথে নিয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ই মানবকে অসৎ অথবা সৎপথে আকর্ষণ করে। মানব ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পারলে আসক্তিহীন হ'তে পারে। আসক্তিহীনতাই নির্বাণের উপায়। প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ লাভ সহজতর হয়। মহাযানীরা এইখানে থেরবাদীদের থেকে অনেক দূর এগিয়েছেন।

মহাযানী সম্প্রদায় যে সব শাখাবিভাগে ভাগ হয়েছিলেন তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল বহুশ্রুতিয়, মাধ্যমিক এবং যোগাচার বিভাগত্রয়। বহু শ্রুতিয় বিভাগের প্রধান মতবাদ ছিল অনিত্যতা, দুঃখ, শূন্য, অনাত্ম এবং নির্বাণী লোকোত্তর ভাব, কারণ ইহাই মুক্তির পথে চালিত করে। যে বিবর্তিত মহাযানবাদ পৃথিবীর বহুদেশে বিস্তার লাভ করেছিল তার মূলে ছিল ইহার অগ্রদূত বহু শ্রুতিয় বিভাগের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্বের প্রচার এই প্রথম পাওয়া গেল।

মহাযানী বহু শ্রুতিয় শাখা বিভাগের সন্ন্যাসীদের দ্বারা শূন্যবাদ প্রথম প্রচারিত হলেও মহাযানী মাধ্যমিক শাখাবিভাগের সন্ন্যাসীদের দ্বারা ইহার সার্থক প্রসারলাভ ঘটেছিল। এজন্য অনেকে মনে করেন, মাধ্যমিক শাখা বিভাগের প্রবর্তক নাগার্জুন বৌদ্ধ শূন্যবাদের উদ্‌ভাবক। যা হোক, নাগার্জুন যে শূন্যতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে শূন্য বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ও সংসার বা জীবাত্মা অভিন্ন প্রমাণ করেছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব উপনিষদের নির্গুণব্রহ্মই মহাযানীদের শূন্যতা।

সুতরাং বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নাসদামীয় সূক্তে শূন্যতত্ত্বের কথা আছে। নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্বের সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ণ মিল আছে। আচার্য শঙ্করের

অদ্বৈতবাদের মূলে আছে—প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি, জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞানে তাহাতে আসক্তির অভাব। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও তদ্ভিন্ন অন্য বস্তু মিথ্যা। নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন জগৎ ব'লে কোন বস্তুই নাই। সুতরাং নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্বের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য আছে। আবার চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে জীব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
যেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥

(মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা)

আবার বেদে উক্ত হয়েছে—"যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইত্যাদি—অর্থাৎ যাহা হ'তে ভূত জন্মে, ইহাতে ব্রহ্ম অপাদান কারক; যাহা দ্বারা ভূত জীবিত থাকে, ইহাতে ব্রহ্ম করণ কারক; পরিণামে যাহাতে ভূত প্রবেশ করে, ইহাতে ব্রহ্ম অধিকরণ কারক। সুতরাং নির্বিশেষ বস্তুর উপযুক্ত কারকত্রয় হওয়া অসম্ভব ব'লে ব্রহ্ম আবার সবিশেষ। তাই ব্রহ্ম নির্বিশেষ, আবার সবিশেষ। "তদৈক্ষত প্রজয়া বহু স্যাং"—অর্থাৎ ব্রহ্মের যখন বহু হ'তে মন হ'ল, তিনি তখন প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করলেন। এই অবলোকন ক্রিয়া দর্শনেন্দ্রিয় মধ্যে। যখন তিনি প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করেছিলেন, তখন প্রাকৃত নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় নি। তথাপি ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় মধ্যে দর্শন ক্রিয়া থাকায় দর্শনেন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপাদিত হ'ল। ইহাই ব্রহ্মের সবিশেষ-নির্বিশেষ ভাব।

দেখা গেল শূন্যবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। আর ঠিক এই কথাই বলেছেন—

S. Radhakrishnan,—"By Sunyata, therefore, the Madhyamika does not mean absolute non-being, but relative being." Indian Philosophy, Vol. I, p. 661.

নাগার্জুনের শূন্যতত্ত্বের শূন্য ও সংসারের অভিন্নতা নিয়ে অনেক পণ্ডিত সমালোচনা করেছেন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা অথবা পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণ বৌদ্ধ শূন্যবাদের শূন্যতাতে পরিণত হয়েছে। আবার জীবাত্মা অথবা জীবাত্মারূপী রাধা করুণাতে পর্যবসিত হয়েছে। তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-রাধা বা পরমাত্মা-জীবাত্মা। একটু পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাবে যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও শাক্ত মতের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের, বিশেষতঃ মহাযানবাদের কোন পার্থক্য নেই। একই কথা, শুধু একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে মাত্র।

শিব ও শক্তি বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা এবং উপায়। এই প্রজ্ঞা এবং উপায় শূন্যতা এবং করুণায় পর্যবসিত হয়েছে। এই সম্বন্ধে প্রখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—

"The ultimate non-dual reality possesses two aspects in its fundamental nature, the negative (নিবৃত্তি) and the positive (প্রবৃত্তি) the static and the dynamic,—and these two aspects of the reality are represented in Hinduism by শিব and শক্তি and in Buddhism by প্রজ্ঞা and উপায় (বা শূন্যতা and করুণা). It has again been held in the Hindu Tantras that the metaphysical principles of শিব-শক্তি are manifested in the material world in the form of the male and the female. Tantric Buddhism also holds that the principles of প্রজ্ঞা and উপায় are objectified in the female and the male. The ultimate goal of both the schools is the perfect State of Union—Union between the two aspects of the reality and the realisation of the non-dual nature of the self and the not-self. (p. 3, Tantric Buddhism.)

মহাযানী মাধ্যমিক শাখাবিভাগের পর মহাযানী যোগাচার শাখাবিভাগের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচার্য মৈত্রেয় বা মৈত্রেয় নাথ তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে এই শাখা বিভাগের প্রবর্তন করেন। এই শাখাবিভাগের মতে বোধি লাভের সর্বোত্তম পন্থা হ'ল যোগ-অভ্যাস। যোগের দ্বারা চিত্ত স্থির হ'লে পর প্রকৃত জ্ঞান বা বোধি লাভ সম্ভব হয়। ঠিক হিন্দুধর্মে ব্রহ্ম লাভের উপায় সম্বন্ধে ঐ কথাই বলা হয়েছে। বহির্মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করতে প্রাচীন আর্যঋষিরা যোগ অভ্যাস করতে বার বার

উপদেশ দিয়েছেন। যোগবলে চিত্তকে অন্তর্মুখী করতে পারলে ব্রহ্মদর্শন হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতাতে শ্রীভগবান্ বলেছেন—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুম্ ধনঞ্জয় ॥
৯॥ দশ সঃ॥

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে সমাহিত করিয়া আমাকে পাইতে চেষ্টা কর।

মহাসাংঘিকবাদ বা পরবর্তী মহাযানবাদ কালক্রমে সাতটি শাখাবিভাগে ভাগ হয়েও সমাপ্তি লাভ করে নি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে উহার আরও বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। অবশ্য এই শাখা প্রশাখাগুলি ঐ মহাযানবাদের অন্তর্গত। হিন্দুধর্মের মধ্যে যেমন বহু সম্প্রদায় আছে (শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য বৈষ্ণব ইত্যাদি) এবং যেমন তাহারা সকলেই হিন্দু, অনুরূপ ভাবে বৌদ্ধ মহাযানীদের মধ্যেও ঠিক তেমনি বহু সম্প্রদায় দেখা দিল এবং তাহারা সকলেই মহাযানী বৌদ্ধ।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দের মধ্যে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু উহার প্রভাব প্রথম দিকে খুব বেশী ছিল ব'লে মনে হয় না। তা হ'লেও ঐ মন্থরতা ধীরে ধীরে অপসৃত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রভাব বৃদ্ধির তীব্রতা অনুভূত হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম হ'তে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে; যখন মহাযানবাদের বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। শাখা-প্রশাখাগুলি এমনভাবে প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্ট হয়েছিল যাতে সেগুলি সর্বস্তরের মানুষের গ্রহণীয় হয়। এই শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় দেখতে পাওয়া যাবে। তান্ত্রিক ও সহজিয়া প্রভাব আবার সর্বাপেক্ষা বেশী। বাঙলা, বিহার, নেপাল ও তিব্বতে এই সময়ে যেন বৌদ্ধধর্মের প্লাবন এসেছিল। এই সমস্ত স্থানে বহু মহাবিহার স্থাপিত হয়েছিল এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত বিহারে থেকে ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান-সাধনা করেছিলেন। এই জ্ঞানসাধনার ফলে বৌদ্ধধর্ম বহু দূরদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম পাশাপাশি থাকলেও তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। বাঙলা দেশের পাল রাজারা ছিলেন পরম সৌগত। কিন্তু বৌদ্ধ হ'লেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ত ছিলই না, বরং তাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আনন্দবোধ করতেন। পরধর্ম এবং পরমত সহিষ্ণুতার যে পরিচয় তাঁরা ঐ সময়ে দেখিয়েছেন তাহা যে কোন কালে যে কোন দেশের অনুকরণীয়। পরবর্তী যুগে যে ধর্মান্ধতার পরিচয় দেশে দেশে দেখা গিয়েছে বর্ণবিদ্বেষের যে নগ্নরূপ দিকে দিকে প্রকাশ হয়েছে—ঐ যুগে ভারতে তা ছিল অজ্ঞাত। পরম সৌগত পাল রাজাদের অনেকেই হিন্দু রাজকুমারী বিবাহ করেছিলেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, হিন্দু দেবমন্দির নির্মাণ ক'রে তার মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম ক'রে তাঁরা মহাপুণ্য অর্জন করতেন। কেহ কেহ পিতৃশ্রাদ্ধ হিন্দুধর্মমতে সম্পন্ন করেছেন। আবার একই পরিবারে পিতা পরম সৌগত, এক পুত্র পরম বৈষ্ণব এবং অন্য পুত্র পরম শৈব এই নিদর্শনেরও অভাব নেই। এই সম্বন্ধে ডাঃ নিহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,—

"পালবংশীয় নরপতিরা অনেকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্য রাজবংশীয় রাজকুমারীদের। রাজা কান্তিদেবের পিতা বৌদ্ধ ধনদত্ত বিবাহ করিয়াছিলেন একটি শৈব রাজকুমারীকে; এই রাজপুত্রী রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে ছিলেন পারঙ্গম। পরম সৌগত কান্তিদেবের এই জননী ছিলেন 'শিবপ্রিয়া'। কাম্বোজেশ্বর গৌড়পতি রাজপালের প্রথম পুত্র নারায়ণ পাল 'বাসুদেব-পাদাব্জ-পূজা-নিরত মানসঃ', এবং দ্বিতীয় পুত্র নয়পাল এক পুণ্য নবমী তিথিতে স্নানাদিপূর্বক শঙ্কর-ভট্টারকের (মহাদেবের) উদ্দেশ্যে তাঁহার বৌদ্ধ পিতা-মাতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য ধর্মচক্র মুদ্রা দ্বারা পট্টিকৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই শত তিন শত বৎসর আগে বৌদ্ধ দেবখড়্গের মহিষী রাণী প্রভাবতী একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পারস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে পাওয়া যাইবে। পাল রাজারা ত সকলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যমূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; রাজা কর্তৃক ভূমিদান সব ত ইঁহাদেরই উদ্দেশ্যে।......ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের মৃত্যুর পর পুত্র জয়পাল যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ত ব্রাহ্মণ্যধর্মানুমোদিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলিয়া মনে হইতেছে; সেই শ্রাদ্ধে মহাদান লাভ করিয়াছিলেন উমাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ।... ...কম্বোজ-বংশীয় রাজ্যপাল ছিলেন সৌগত বা বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহার এক পুত্র নারায়ণ পাল ছিলেন বাসুদেব ভক্ত, এবং আর এক পুত্র নয়পাল ছিলেন শৈব।"

—(বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩০-৩১।)

খ্রীঃ সপ্তম হ'তে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের যে প্লাবন এসেছিল তার ফলে পালবংশীয় রাজাদের দ্বারা বাঙলা দেশে ও তৎসন্নিহিত নানাস্থানে বহু বৌদ্ধ মহাবিহার স্থাপিত হয়েছিল। এইসব মহাবিহারে বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও অবস্থান করতেন। এই বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান-সাধনা লিপিবদ্ধ করতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি মহাযানী বৌদ্ধধর্ম অবস্থিতির ফলে, বিশেষতঃ পরম সৌগত পালবংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করাতে মহাযানবাদের মধ্যে বিরাট্ বিবর্তন এসে গেল। এই বিবর্তনের ফলে বাংলার মহাযানবাদ কয়েকটি স্তরে ভাগ হ'ল। বিভাগগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল মন্ত্রযান ও সহজযান। ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সহজিয়া মতের প্রভাব দেখা যায় ঐ মন্ত্রযান ও সহজযানের মধ্যে।

যে সব বাঙালী মহাযানী বৌদ্ধ মন্ত্রযান ও সহজযান মতাবলম্বী ছিলেন তাঁরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান সাধনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন সন্ধ্যাভাষায়। সন্ধ্যাভাষার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন,—"সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারী ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়,—খানিক বুঝা যায় না।" (বৌদ্ধ গান ও দোহা, ভূমিকা, ৮পৃঃ)। সন্ধ্যাভাষায় লিখিত উক্ত ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানসাধনা বর্তমানে 'চর্যাবাদ' নামে অভিহিত হয়েছে। এই চর্যাবাদ নিয়ে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডাঃ শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ৺মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বহু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

কোর্ডিয়ার সাহেবের যে গ্রন্থ তালিকা আছে তাতে লুইবাদের 'লুইবাদ গীতিকা', তারকনাথ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান অতীশের 'বজ্রানন—বজ্রগীতি', 'চর্যাগীতি', 'দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান ধর্মগীতিকা', ভুসুকুর 'সহজ গীতি', কৃষ্ণাচার্যের 'বজ্রগীতি', অরহের দোহাকোষ গীতিকা', 'দোহাকোষ চর্যগীতি' 'ডাকিনী বজ্রগুহ্যগীতি', কঙ্কণের 'চর্যাদোহাকোষ গীতিকা', বিরূপের 'বিরূপ গীতিকা', 'বিরূপ বজ্রগীতিকা', শবরের 'মহামুদ্রা বজ্রগীতি', 'চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থ গীতি' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম আছে। কোর্ডিয়ার যে সমস্ত গ্রন্থের নাম উদ্ধার করতে পেরেছেন, এমন মনে হয় না। কারণ বাঙলা, বিহার, তিব্বত ও নেপালের মহাবিহারে যে সব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান-সাধনা করতেন তাঁদের লিখিত পুঁথিপত্র সব কোর্ডিয়ারের হস্তগত হওয়া আদৌ সম্ভব নহে।

এর পর আছে ইসলামী অভিযান। ইসলামী অভিযান আরম্ভ হ'লে পর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মহাবিহার-গুলি ধ্বংস হবার আগেই পালাতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাঙলা ও বিহারের সমতল ক্ষেত্র হ'তে দূরে পাহাড়ের ক্রোড়ে, নেপালে, তিব্বতে কাশ্মীরে, আসামে, ব্রহ্মে এবং আরও দূরে চীনে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যখন পালিয়েছিলেন তখন তাঁরা মহাবিহারগুলিতে রক্ষিত পুঁথিপত্র—যতদূর পেরেছিলেন নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে কিছু অনুলিপি, কিছু তিব্বতী অনুবাদ আছে। এই সব পুঁথিপত্রের অন্তর্গত মুষ্টিমেয় যে কয়টি পদ পাওয়া গেছে তৎসম্বন্ধেই পূর্বোক্ত বুধমণ্ডলী নানাভাবে আলোচনা করেছেন। মনে হয় যদি সব গ্রন্থ উদ্ধার করা যেত তা' হলে সন্ধ্যাভাষায় লিখিত এক বিরাট পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি হ'ত।

মহাযানবাদের যে বিবর্তনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় সন্ধ্যাভাষায় লিখিত এই পদগুলির মধ্যে। চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করলে জানতে পারা যায়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক ও সহজিয়া মত অতি আশ্চর্য্যরূপে বৌদ্ধ মহাযানবাদে প্রবিষ্ট হয়ে মন্ত্রযান সহজযানে পরিণত হয়েছে। অবশ্য একথা এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম হ'তে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে, বৈষ্ণব সহজিয়া মত এবং শাক্ত তান্ত্রিক মত পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নি। বৈষ্ণবের সহজ সাধনা বা সহজিয়া মত পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল জয়দেবের সময় থেকে মহাপ্রভুর সময়ের মধ্যে, আর শাক্ত তান্ত্রিক মতের পূর্ণ পরিণতি হয়েছিল রামপ্রসাদ ও পরমপুরুষ পরমহংসদেবের সময়ে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মহাযানবাদের বিবর্তনের ফলে যে মন্ত্রযান ও সহজযানবাদের জন্ম হয়েছিল তার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক ও সহজিয়া মতের অপূর্ণ বীজের প্রভাব বিদ্যমান। পরিণত সহজ সাধনা ও তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, তার পরিচয় পাওয়া যায় রামপ্রসাদের পদে।

"কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে একথা বিষম ভারি।

নিজ-তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পাত ধটি,
এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥
* * *
প্রসাদ হাসিছে, মরমে ভাসিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারি—
মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যাম তনু
একই সকল বুঝিতে নারি॥

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাযানবাদের বিবর্তন এসেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। সর্বস্তরের মানুষের গ্রহণীয় করবার জন্য মহাযানবাদের বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হয়েছিল। প্রশাখাগুলির মধ্যে মন্ত্রযান ও সহজযান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লিখিত হয়েছে মন্ত্রযান ও সহজযানের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান সাধনা বর্তমানের চর্যাপদগুলির মধ্যে নিহিত আছে। মন্ত্রযানের উৎপত্তির মূলে ছিল বহুশ্রুতিয়, মাধ্যমিক ও যোগাচার প্রভৃতি মহাযানবাদের শাখাবিভাগগুলির তাত্ত্বিক কাঠিন্য। বৌদ্ধ জনগণ মহাযানবাদের কঠিন তত্ত্ব আদৌ বুঝিতে পারে নি, এজন্য নূতন এক সম্প্রদায়ের মহাযানী আচার্য মন্ত্রযানবাদের প্রচার করলেন। এও ঐ মহাযানবাদের একটি শাখাবিভাগ। মন্ত্রই হ'ল এই শাখাবিভাগের যান বা পথ। এদের ধারণা, মন্ত্রবলে বোধি বা জ্ঞান লাভ করা যায়, আর সে জ্ঞানই নির্বাণ লাভের পথ। তান্ত্রিক প্রভাব এই মন্ত্রযানের মধ্যে বশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই সময় হ'তে গুরুর প্রভাব বৌদ্ধ জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

মন্ত্রযানের পর সহজযান। অবশ্য মন্ত্রযান ও সহজ-যানের মধ্যে বজ্রযানবাদের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু একটু অনুশীলন করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, বজ্রযানেরই পরিণত অবস্থা হ'ল সহজযান। বজ্রযানবাদ যে মহাযানী মাধ্যমিক বিভাগের প্রানিট স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত—তা লক্ষ্য করার বিষয়। প্রভেদ শুধু প্রয়োগ কৌশলের। মাধ্যমিক বিভাগ "শূন্য" ও "সংসার"-এ যে জটিল তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, সহজযানীরা খুব সহজ পন্থায় তার নিরসন ক'রে দিয়েছেন। সহজযানের প্রথম স্তর বজ্রযান মতে জগতের অনু-পরমাণু অবধি সবই শূন্য। শূন্যের এই জ্ঞানই হ'ল বোধি, আর এই বোধি লাভ হলে পর নির্বাণ লাভ হয়। তবে বজ্রযানীরা নির্বাণ না ব'লে এর নাম দিলেন নিরাত্মা। বোধি লাভ হ'লে, তাঁদের মতে, চিত্তের এক বিশেষ অবস্থা আসে। আর চিত্তের এই বিশেষ অবস্থার নাম বোধিচিত্ত। বোধিচিত্ত নিরাত্মাতে লীন হয়ে যায়। নিরাত্মাতে লীন হ'লে পর মহাসুখের উদয় হয়। এই মহাসুখ অবাঙ্‌মানসগোচর অর্থাৎ অনির্বচনীয়, কায়-বাক্-চিত্তের অতীত। চিত্তের ঐ বিশেষ অবস্থা আসে যোগসাধনের দ্বারা। সুতরাং মহাযানী যোগাচার বিভাগের পথও বজ্রযানীরা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং উপনিষদের "পরমাত্মা ও জীবাত্মা" এবং "সৎ-চিৎ আনন্দ" তত্ত্ব এখানেও দেখা যায়।

বজ্রযানের চরম বিকাশ দেখা গেল সহজযানের মধ্যে। মন্ত্রযানের মন্ত্র বা মন্ত্র-কল্পিত মূর্তি ব্রজযানে প্রসার লাভ করেছিল, কিন্তু সহজযানে এসে ঐ মন্ত্র বা মন্ত্র-কল্পিত মূর্তি আর ঠাঁই পেল না। নির্বাণের রূপও পরিবর্তিত হয়ে গেল। তার স্থানে এল ধর্মকায়। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, এই ধর্মকায়ই হ'ল পরমাত্মা। পরমাত্মা থেকে যেমন জীবাত্মার সৃষ্টি হয়, তেমনি এই ধর্মকায় হ'তে ধর্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহের উৎপত্তি হয়, বা ধর্মকায় হ'তে বোধিচিত্তের উৎপত্তি হয়। জীবাত্মা যেমন মায়ার অধীন এবং যোগসাধনার দ্বারা মায়ামুক্ত হয়ে পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বোধিচিত্ত ধর্মকায়ে লীন হয়। এই বোধি বা জ্ঞান লাভ হ'লে পার্থিব বস্তুর অনিত্যতার জ্ঞান লাভ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মোহমুক্তির সাধনা করে। এর ফলে কামনার বিলুপ্তি ঘটে ও নির্বাণ লাভ হয় অর্থাৎ মানুষ ধর্মকায়ে মিশে যায়।

নির্বাণের স্বরূপ আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, ইহা নিত্য, করুণাভাববিশিষ্ট ও আনন্দময়। বোধি বা জ্ঞান লাভ হ'লে পার্থিব বস্তুর অনিত্যতার সম্বন্ধে ধারণা জন্মে আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অর্হৎ-ভাবের অর্থাৎ অহঙ্কারের বিলুপ্তি ঘটে। অহঙ্কারের বিলুপ্তিতে নিত্যতার জ্ঞান আসে, তখন করুণা-ভাবাবিশিষ্ট হয়ে মানুষ আনন্দের মধ্যে ডুবে যায়। এরই নাম ধর্মকায়ে (তথ্যতা বা শূন্যতা) মিশে যাওয়া বা নির্বাণ-লাভ। সুতরাং নির্বাণ সুখময়। এই সুখময় ভাবই বৌদ্ধ-সহজিয়াপথ বা সহজযান। সহজযান ধ'রে নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়াই সহজযানের মূল লক্ষ্য। সহজযানের মধ্যে বৈষ্ণব সহজিয়া (রাগানুগা বা পরকীয়া) ও শাক্ত তান্ত্রিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। (সহজিয়া রাগানুগা বা পরকীয়া) তত্ত্বের মধ্যেই অতীন্দ্রিয়ানুভূতির চরম বিকাশ সাধিত হয়েছে একথা নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। স্বকীয়া ও

পরকীয়া ভাবের সাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার যে ঐক্য আছে নানাভাবে তাহাও আলোচিত হয়েছে। বৈষ্ণবেরা যেখানে উপাস্য দেবতাকে প্রভু, সখা, পুত্র ও পতিভাবে পূজা করেছেন, শাক্ত তান্ত্রিকেরা সেখানে উপাস্য দেবতাকে কন্যারূপে ও মাতৃভাবে পূজা করেছেন। এ শুধু সাধনার প্রকার ভেদ।

মাধ্যমিকবাদে সুখ বা আনন্দ শুধু তত্ত্ব, কিন্তু সহযানবাদে সুখ বা আনন্দ তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সহজযানীরা সুখ বা আনন্দের নামকরণ ক'রে এর বাসস্থান ঠিক ক'রে দিয়েছেন। সহজযানীরা সুখ বা আনন্দকে তত্ত্ব হ'তে টেনে এনে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিলেন। আর এই দেবী হলেন ঐ নিরাত্মা। নিরাত্মা হলেন তখন নিরাত্মাদেবী। সহজযানীর ধর্মকায়ে মিশে যাওয়া অর্থাৎ নির্বাণ (তথতা বা শূন্যতা) লাভ হ'ল ঐ নিরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাশূন্যে মিশে যাওয়া। যেমন জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়ে যায় এ ঠিক তেমনি অবস্থা। নিরাত্মাদেবীকে সহজযানীরা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন, এ ঠিক ব্রহ্মোপলব্ধি এবং এই উপলব্ধিই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি। ইহা অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য। আর এই উপলব্ধিজনিত আনন্দ অবাঙ্‌মানসগোচর। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই নিরাত্মাদেবীকে উপলব্ধি করা যায় না ব'লে সহজযানীরা এঁকে অস্পৃশ্যা ডোম্বী বলেছেন, আর ইনি অতীন্দ্রিয়লোকে বাস করেন ব'লে তাঁরা দেহ-নগরীর বাইরে এঁর আবাসস্থান নির্দেশ করেছেন। এ সম্বন্ধে ৺মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় লিখেছেন,

"নির্বাণ সুখময়, কারণ দুঃখের নিবৃত্তিতেই নির্বাণ লাভ হইয়া থাকে। এখানে ব্রহ্মের ন্যায় ধর্মকায় বা নির্বাণেও সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব অর্পিত হইয়াছে। নির্বাণের এই সুখবাদ হইতেই পরবর্ত্তীকালে সহজিয়া মতের উদ্ভব হইয়াছে। মাধ্যমিক শাস্ত্রে এই আনন্দ তত্ত্বমাত্র, কিন্তু সহজিয়ারা ইহাকে রূপ প্রদান করিয়াছেন, ইহার নামকরণ করিয়াছেন, ইহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইনি নৈরাত্মাদেবী, নামান্তরে পরিশুদ্ধাবধূতিকা, শূন্যতার সহচারিণী। সাধক যখন পার্থিব মোহ ছিন্ন করিয়া ধর্মকায়ে (তথতা বা শূন্যতায়) লীন হন, তখন তিনি নৈরাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া যেন মহাশূন্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন।......নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া অস্পৃশ্যা ডোম্বী, দেহ-নগরীর বাহিরে অবস্থান করে। ......তান্ত্রিকমতে তাহার আবাস-স্থান দেহ-সুমেরুর শিখর প্রদেশে, অর্থাৎ উষ্ণীষকমলে।...... এই সহজ নলিনীবনে নির্বিকল্প হইয়া প্রবেশ করিতে হয়।" চর্যাপদ, ভূমিকা—পৃঃ ১৮০

হিন্দুদর্শনে যেমন নিরাকার ব্রহ্মকে সাকারে রূপ দেওয়া হয়েছে, অরূপকে স্বরূপে আনা হয়েছে, অনন্ত সান্তের মধ্যে এসেছেন, অসীম সসীমে মিশে গেছেন, বৌদ্ধ সহজযানীরা ঠিক তেমনই নিরাত্মাকে নিরাত্মাদেবী রূপে কল্পনা ক'রে নিলেন। সুতরাং যা' তত্ত্বের মধ্যে নিহিত ছিল, তা' পরবর্ত্তীকালে রূপের মধ্যে এসে গেল। এখানে হিন্দুদর্শনের দ্বৈতাদ্বৈত-তত্ত্বই প্রকারান্তরে এসে গেছে। যা'হোক, সহজযানীরা যখনই নির্বাণ বা নিরাত্মাকে (তথতা বা শূন্যতা) দেবীর আসনে স্থাপিত করলেন, অমনই অতীন্দ্রিয়বাদ এসে গেল। নিরাত্মাদেবীকে সহজযানীরা যেমনভাবে ইচ্ছা গ্রহণ ক'রে আনন্দলোকে বিচরণ করেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়া, শাক্ত তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সহজযানীরা এখানে ঠিক একভাবে সাধনমার্গে চলেছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ক্যানভাসার

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের মুখে ঢুকতেই একটা বিশাল বটগাছ। ঝুরি-নামানো বিরাট্ গাছটা প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। একপাশে নাবাল জমি। পথটা গিয়েছে তারই পাশ দিয়ে। দুধারে যোয়ান গাছের ঝোপ। কেমন একটা কটু আর ঝাঁঝালো গন্ধ গাছগুলোর। এর পরই বাড়ী-ঘরদোর সুরু হয়েছে। মানুষজন, গোরুমোষ, গাছগাছালি সবই নজরে পড়বে। সব মিলিয়ে একটি শান্ত ছবি। চিরন্তন গ্রামবাংলার রূপ। সাদামাটা, আটপৌরে। শিল্পীর তুলির রঙীন আঁচড় নেই কোথাও, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি।

কাঁধের বোঝাটা মাটিতে নামিয়ে একটু থামল নিশি-কান্ত। ইতি-উতি চাইল, এদিকে-সেদিকে। বোঝাটা কম ভারী নয়। কম ক'রে প্রায় খানপঞ্চাশেক বই আছে ওর গহ্বরে। সবগুলি না-খেতে-পাওয়া হ্যাংলা ভিখারীর চেহারা নয়, এক একটা বই বেশ পুরুষ্টু, গায়ে-গতরে একটু ভারী। এই শীতের দিনে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে নিশিকান্তর কপালে। প্রায় মাইল ছয়েক দূরের স্টেশন থেকে একাই টেনে এনেছে বোঝাটা। কখনও পিঠে ঝুলিয়ে, কখনও হাতে বা কাঁধে নিয়ে।

লাল মাটির দেশ। অল্প-স্বল্প চাষের জমি ছাড়া সবই ডাঙ্গাডহরে ভরা, কাঁকুরে মাটি, পথ-ঘাট সব সময়ই ঝরঝরে তকতকে। বৃষ্টি হ'লে জল জমবার ভয় নেই। কাদা মাখামাখি হ'বে না জামাকাপড়ে। লাল কল্কর ছড়ানো রয়েছে সর্বত্র, বৃষ্টি থামলেই জল সরে যাবে আশেপাশের নাবাল জমিতে। পথ-ঘাট শুকনো খট্‌খটে হ'তে দেরি হয় না একটুও।

চাষীগোছের একটা লোককে আসতে দেখা গেল। তাঁতে বোনা আট ন' হাতি কাপড় ছোট ক'রে পরেছে লোকটা। সমস্ত মাথাভর্তি পলাশ-ঝোপের মত একরাশ চুল। উস্কোখুস্কো এলোমেলো, গায়ে একটা সুতির চাদর জড়ানো। নিশিকান্ত জিজ্ঞেস করল—"ওহে, স্কুলটা কোন্ দিকে হবে বলতে পার?"

লোকটা একগাল হাসল। শুধু হাসল না, যেন বিনয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

হাত বাড়িয়ে নিবেদন করল লোকটা—"এজ্ঞে, এই রাস্তা ধ'রে চ'লে যান সিধা। একটা শিব দালান পাবেন দেখতে, তারই পিছন দিকটায় ইস্কুল।"

বইয়ের বোঝাটা আবার কাঁধে টেনে তুলল নিশিকান্ত—একদম স্কুল-বাড়ীতে পৌঁছে জিরুতে বসবে। আর ফেলাছড়ার সময় নেই হাতে, বেলা দশটা বাজতে দেরি কই আর? প্রথমক্ষেপে গিয়ে হেডমাষ্টারকে ধরতে না পারলে সমস্তটাই বৃথা, আসা যাওয়া পণ্ডশ্রম। অন্তত খান-দশেক বই লিষ্টির মধ্যে ঢুকোতে না পারলে কোম্পানীই বা কি বলবে তাকে?

নিশিকান্ত চক্রবর্তী ক্যানভাসার। না, তেল সাবান চুড়ি আলতার ফিরি করে না সে। পাবলিশিং কোম্পানীর মাইনে করা লোক। মাস তিনেকের চুক্তিতে কাজ। কিছু কমিশনও পায় আর একটা নির্দিষ্ট রাহাখরচও দেয় কোম্পানী। শীতের মরসুমে তার মত অসংখ্য কর্মী ছড়িয়ে পড়ে বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে। শহর গ্রাম গঞ্জ কিছুই বাদ যায় না। নতুন স্কুলে যাতে তাদের কোম্পানীর কিছু বই ছেলেদের বুকলিষ্টে স্থান পায় তারই সচেষ্ট প্রয়াস করে তারা। সেজন্যই রেখেছে কোম্পানী, ফি বছর এই তিন মাস তাদের বাঁধা চাকরি, কার্তিকের সুরু থেকে পৌষের শেষ পর্যন্ত।

ছকু খানসামা লেনের একটা গলিতে আস্তানা নিশিকান্তর। আট টাকা দিয়ে ঘরভাড়া নিয়েছে একটা। নামেই ঘর, একটুও হাওয়া ঢোকে না, জানলা নেই একটাও, কপাট বন্ধ করলে অন্ধকূপের সামিল, তাও মাস তিনেকের ভাড়া দিতে পারে নি। দেবে কোথা থেকে? বছরে তিন মাস মাত্র চাকরি। অন্য সময়টা এটা-ওটা করে নিশিকান্ত। ছাপাখানার প্রুফ দেখে দেয় ঠিকে চুক্তিতে। কিংবা কলকাতার বিভিন্ন হষ্টেলে ঘুরে ছেলেদের কাছে বইয়ের অর্ডার জোগাড় করে। সামান্য কমিশন হয়। তবু বিশ্বাস ক'রে অর্ডার দিতে চায় না সকলে, সন্দেহ করে দোকান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা জিনিষ ব'লে। সামান্য আয়, পেটখরচট চলে কোন মতে। ঘর ভাড়ার টাকা সব সময় আসে না হাতে।

শিবদালানটার কাছে আসতেই স্কুল-বাড়ীটা চোখে পড়ল নিশিকান্তর। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা স্কুল-কম্পাউণ্ড। এক পাশে বেশ বড়-গোছের ইঁদারা একটি, গেটের কাছে কৃষ্ণচূড়ার গাছ, আর কিছুদিনের মধ্যেই লাল লাল পুষ্পস্তবকে ভরে উঠবে গাছটা। ফাল্গুনের উতলা দিনগুলি এসে পড়তে দেরি কই আর?

বোঝাটা নামিয়ে হেডমাষ্টারের ঘরের মধ্যে উঁকি দিল নিশিকান্ত। ছোকরা গোছের মাষ্টারটি, বেশী বয়স নয়, বড় জোর ত্রিশ কিংবা ওরই কাছাকাছি হবে ব'লে মনে হয়। বোঝা থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করল নিশিকান্ত। খান দশ-বারো ফাউণ্টেন পেন আছে ওতে। ওরই একটা তুলে নিল সে। কোম্পানী উপহার দিতে বলেছে মাষ্টারমশায়দের, কলমের উপর কোম্পানীর নাম খোদাই করা। নিশিকান্ত একবার পরীক্ষা ক'রে নিল সেটি।

হেডমাষ্টারের ঘরে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল ওর। মনে হ'ল আশা-ভরসা আছে কিছু। খানদশেক না হোক্, কিছু বইপত্তর নিশ্চয় নেবে ওরা। কলম পেয়ে খুশী হয়েছেন হেডমাষ্টার। চোখের তারায় সে খুশির ঝল্‌কানি নিশিকান্তর চোখ এড়ায় নি।

একবার গাঁয়ের দিকে বেরিয়ে পড়ল নিশিকান্ত। চানটান করবে না আর। ময়রার দোকানে কিছু খেয়ে দেয়ে নেবে। ঐ ফাঁকে গাঁটাও ঘুরে আসবে একটু। শীতের দুপুরে রোদটা ভারী মিষ্টি। কেমন একটা আতপ্ত ঘন পরিবেশ। দূরে একটা অশথ গাছের পাতায় দুপুরের রোদ ঝিল্‌মিল্ করছে কেমন। নিশিকান্ত চেয়ে চেয়ে দেখল।

খুব ছোট নয় গ্রামটা। বেশ কিছু লোকের বাস। সবটা ঘুরে বেড়াল না নিশিকান্ত। এদিক-সেদিক ঘুরে-ফিরে আবার ইস্কুলের দিকে এগিয়ে চলল। আসলে কলকাতায় থেকে থেকে সবুজের জন্য মনটা তৃষিত হয়ে আছে। পানাভরা পুকুর, বাঁশবন, আতাগাছ, অপরাজিতার নীল ফুলের দুলুনি দেখতে দেখতে মনের একটা কোণের শূন্যতা যেন ভ'রে ওঠে।

ইস্কুলের দিকে ফিরতে হবে এবার। হেডমাষ্টার ছাড়া আরও সব মাষ্টার মশাই আছেন। তাঁদেরও দু'-একখানা ক'রে বই উপহার দেবে নিশিকান্ত। কলম-টলমও দু'-একজনকে দেবে বৈকি—। তবে হ্যাঁ, লোক বুঝে। কার ওজন কতখানি, নিক্তিতে মেপে নেবে নিশিকান্ত। তার দু'টি চোখ এ ব্যাপারে বড় সন্ধানী, ফাঁকি দিতে কেউ পারবে না।

দুপুর ঘুরে গেছে। বেলা দুটোর মত হবে। শীতের দিন ব'লে এরই মধ্যে সব যেন ম্লান। ছায়া প'ড়ে এল দূরে আমের বনে আর খড়ে-ছাওয়া চালের আড়ালে। নিশিকান্ত পিছন ফিরে চাইল। কে একটি ছেলে তার দিকে ছুটে আসছে না?

নিশিকান্ত দাঁড়াল।

—'আপনার দেশ কি কুসমা গাঁয়ে?'—ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

—'কেন বল ত?'

—'মা বললেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে একবার।'

আরও বিস্ময়ের পালা। নিশিকান্ত চোখ দুটো কুঁচকে ভাবল। তিনকুলে কেউ নেই তার। কোথাকার কুসমা গাঁ, কোনদিন চোখেও দেখেনি সে। এই বিরাট্ বিশ্বে সে স্বজনহীন, আত্মীয়শূন্য একক। তবে কি জানাশোনা কারও সঙ্গে চেহারার মিল দেখে ভুল ক'রে ডেকে বসেছে মেয়েটি? কি ভেবে নিয়ে সে বলল, —'বেশ, যাবো'খন তোমার সঙ্গে। আগে ইস্কুলের কাজগুলো সেরে নি। তুমি একটু অপেক্ষা কর।'

কাজ চুকিয়ে ছেলেটির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সে। হাতের ভারী বোঝাটা এখন অনেকটা খালি। স্কুলে বিলি করেছে কিছু বই। আশ্বাসও পেয়েছে খানিকটা। মনটা মোটামুটি খুশী। তাজা, ঝরঝরে। পথে যেতে যেতে ছেলেটির কাছ থেকে অনেক কিছু জানল সে। বরিশাল জেলার কুসমা গাঁয়ে ওর মামার বাড়ী ছিল। এখন অবিশ্যি আর কিছু নেই। দাদু মারা গেছেন। ওর মা ত একমাত্র মেয়ে। তাই মামাবাড়ীটার দিকে এখন সব ঝাপ্‌সা। ধোঁয়া ধোঁয়া বনরেখার মত দিগন্তলীন ছবি।

বছর বারো বয়স ছেলেটির। ওর নামটা জেনে নিল নিশিকান্ত। বিশ্বনাথ। বাবা মারা গেছেন বছর পাঁচ আগে। বাড়ীতে শুধু ওর মা আর সে। আত্মীয়-স্বজন আছে কিছু। কিন্তু তারা নামমাত্র। শুধু হাতিয়ে নেবার ফিকিরে ঘুরে বেড়ায় জ্ঞাতিজন। ওরাও তেমন সম্পর্ক রাখে না কারও সাথে।

দরজার মুখেই দাঁড়িয়েছিল সুমিত্রা। একগাল হাসি মুখে। মাথার উপর সামান্য একটু ঘোমটা। পরনে মিলের শাড়ী একটা। সরু পাড়, থান নয়—

—'চিনতে পার সতুদা? উঃ কতদিন পরে দেখা। কুড়ি বছর ত খুব হবে। বরং বেশী, কি বল?'

নিশিকান্ত কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বলল—'তা হবে

নিশ্চয়। আর কতদিন পরে দেখা। চট্‌ ক'রে কি চেনা যায়? তুমি যে পেরেছ এই ঢের।'

মাটির দাওয়া। নিকোন-পোছান মেজে। একটা তালাই পেতে বসল নিশিকান্ত। আখের গুড় এল বাটিতে করে। এক গ্লাস জল।

নিশিকান্ত বলল—'তারপর, এতদিন পরে দেখা। খবর টবর বল।' ক্যানভাসারি ক'রে পাকাপোক্ত হয়েছে। জিভে জড়তা এল না।

সুমিত্রার মুখে শেষ নেই কথার। সে ঘাড় দুলিয়ে বলল,—'খবর নিয়েছিলে কোনদিন? সেবার বিয়ের পর প্রথম গাঁয়ে গিয়ে শুনি যে তুমি নাকি নিরুদ্দেশ হয়েছ। হ্যাঁ সতুদা, আর কখনও গেলে না সেখানে?'

—'কই আর গেলাম?' নিশিকান্ত ভাবুকের মত মুখখানা করল।

—'আমারও সেই দশা। এর বাবাও কখনও পাঠাতে চাইত না। তাই গাঁয়ে আর যাওয়াই হল না। তারপর বাবা মারা গেলেন। পাকিস্থান হ'ল, সে দেশ ত এখন বিদেশ, কি বল সতুদা?'

খুব মজা লাগছিল নিশিকান্তর।

সে হেসে বলল,—'তা যা বলেছ। আর যাওয়ার কি কম বায়নাক্কা। পাশপোর্ট, ভিসা, হেন-তেন। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি তখন থেকে—'

সুমিত্রা বলল—'কি ভাবছ?'

—'তুমি আমাকে চিনলে কেমন ক'রে?—'

—'বারে, দেখলাম যে গাঁয়ের পথে হেঁটে যাচ্ছ তুমি। চলনটা যেন চেনা চেনা, সেই মুখের আদল। তাই ত বিশ্বনাথকে পাঠালাম।'

চা ক'রে নিয়ে এল। বাটিতে ক'রে মুড়ি আর ভাজা। খেতে খেতে গল্প সুরু করল নিশিকান্ত। ওর ক্যানভাসার জীবনের গল্প। ছকু খানসামা লেনের কথা। কত দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায় নিশিকান্ত। এ গাঁয়ে, সে গাঁয়ে। এ গল্প থেকে ও গল্পে।

সুমিত্রা বলল—'আজকের রাতটা থেকে যাও সতুদা। এই শীতের রাতে কোথায় আবার গিয়ে ডেরা বাঁধবে। বরং ভোর-ভোর উঠে বেরিয়ে প'ড়ো।'

নিশিকান্ত হেসে বলল—'তা যখন বলছ। তবে মিছিমিছি কষ্ট করবে কেন? রাঁধাবাড়ার হাঙ্গামা আবার—'

—'হাঙ্গামা আবার কিসের?' সুমিত্রা হাসল ঠোঁটের কোণে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পেরিয়েছে। বিধবা হয়ে শরীরের আর যত্নটত্ন নিতে পারে কই। তবু নিশিকান্তর মনে হ'ল হাসিটা ভারি সুন্দর। কুসমা গাঁয়ের সতুদার ওপরে হঠাৎ ঈর্ষা হ'ল ওর।

সুমিত্রা বলল—'বেশ ভাল ক'রে ঝোল রাঁধছি চিংড়িমাছের। তুমি ত ভালবাসতে সতুদা।'

নিশিকান্ত জবাব দিল না।

সন্ধ্যের পর চাদর-মুড়ি দিয়ে বসল নিশিকান্ত। এ অঞ্চলে শীত প্রচণ্ড। মাঘের শেষ, তবু শীতের কামড় কম নয় একটুও।

এক সময়ে কাছে এসে সুমিত্রা বলল—'আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে সতুদা? কালীঘাটে মায়ের মন্দির দর্শন করতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে। মানত করেছিলাম একবার মনে মনে। তা সে মানত আর শোধ হয়ে উঠল না।'

নিশিকান্ত অমায়িক হেসে বলল—'তা বেশ ত, একবার না হয় নিয়ে যাব তোমায়।'

সুমিত্রা ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলল—'কিছু টাকা জমিয়েছি সতুদা, এই শ' দুয়েকের মত। ওই লক্ষ্মীর ঘরে একটা হাঁড়ি আছে, তারই মধ্যে রেখেছি। জ্ঞাতিজন জানতে পারলে কি রেহাই আছে? কার লাগভাগে চেয়ে বসবে। ব্যস্‌, টাকাও গেল, ভাব-ভালবাসাও গেল—।

বিশ্বনাথ এসে ওর পুঁটুলি থেকে বইটইগুলো দেখতে লাগল টেনে। ওকে একটা কলম দিল নিশিকান্ত। কোম্পানীর জিনিষ। কোন মাষ্টারকে দিয়েছে ব'লে চালিয়ে দেবে। কলম পেয়ে বিশ্বনাথ ভারী খুশী। খুশী সুমিত্রাও। চোখেমুখে উজ্জ্বলতার আভা। নিশিকান্ত চেয়ে চেয়ে দেখল।

খাওয়াদাওয়ার পর লক্ষ্মীর ঘরের মেঝেয় বিছানা হ'ল নিশিকান্তর। ওরা মা-বেটাতে বড় ঘরে যেমন শোয়, তেমনি শোবে। বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছে নিশিকান্ত। মেস হোটেলে খেয়ে খেয়ে আহারে যেন অরুচি ধরেছে। আজ খেয়েদেয়ে ভারী খুশী হয়েছে সে। এমন রান্না কতদিন হ'ল খায় নি।

সুমিত্রা এসে বলল—'কি, রান্নাটান্না কেমন লাগল? আগের মত মনে হয় না, আর।'

'কি যে বল?' নিশিকান্ত মিষ্টি ক'রে হাসল। দরজার বাজু ধ'রে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুমিত্রা। নিশিকান্তর মনে হ'ল, ও যেন কিছু বলবে। যেন আরও কিছু বলতে চায়।

—'বিশ্বনাথ ঘুমিয়েছে?' নিশিকান্ত জিজ্ঞেস করল।

—'কতক্ষণ', একটু থামল সুমিত্রা। তারপর এক

গাল হেসে বলল—'একটা কথা বলব সতুদা?'

—'বল না।'

—'তুমি যেন বদ্‌লে গেছ। আগের মত একটুও আর নও।'

নিশিকান্ত বলল—'তাই ত হয়। সবাই ত বদলায়।'

—'তুমি বিয়ে-থা কর নি কেন সতুদা? যা হবার হয়ে গেছে। তুমি কিন্তু একটা বিয়ে কর।'

কি হয়ে গেছে, কিছুই জানে না নিশিকান্ত। আগে কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই তার। তবু এই মুহূর্তে নিজেকে ভারী ম্রিয়মাণ ব'লে মনে হ'ল তার। মুখ নীচু ক'রে কতক্ষণ সে ব'সে রইল। যখন মুখ তুলল, সুমিত্রা চ'লে গেছে। নিশিকান্ত দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল।

অনেক রাতে ঘুম ভাঙল নিশিকান্তর। যেন কিসে কামড়াচ্ছে তাকে। শরীরের কোথাও না, মনের গহনে।

উঠে ব'সে দেশলাই জ্বালল নিশিকান্ত। লক্ষ্মীর বেদীর কাছেই সেই হাঁড়িটা, হাত ভ'রে নোটগুলো বার করল সে। পুরো দু'শ টাকা। সুমিত্রা মিথ্যে বলে নি। অনেক ধার-দেনা রয়েছে নিশিকান্তর। ঘরভাড়া বাকী। এখানে-সেখানে ছড়ান রয়েছে হাওলাত। টাকা ক'টা খুব কাজে লাগবে তার। শুয়ে শুয়ে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগল নিশিকান্ত। খুব ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়বে সে। সুমিত্রার ওঠবার অনেক আগে। মনে নানা চিন্তার জটলা। হঠাৎ কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। ঘুম ভাঙল সুমিত্রার ডাকাডাকিতে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল নিশিকান্ত। খুব চট্‌পট তৈরী হ'তে হবে ওকে। নইলে বেলা দশটার ট্রেণ নির্ঘাত ফেল। থলিটা গুছিয়ে নিয়ে মুখে-চোখে একটু জল দিল সে। ওরই মধ্যে কখন এক ফাঁকে চা তৈরী ক'রে এনেছে সুমিত্রা।

নিশিকান্ত বলল—'তা হ'লে আসি।'

'এস, সতুদা, গিয়ে একটা চিঠি দিও। আর খোঁজখবর নিও আমাদের।' বিশ্বনাথ আর সুমিত্রা দু'জনেই প্রণাম করল ওকে। নিশিকান্তর জীবনে এ জিনিষটা সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত। তিনকুলে কেউ নেই তার। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নি কেউ। ভোরের ফুরফুরে বাতাসে এই ছোট্ট প্রণামটুকু তার মনটাকে এলোমেলো ক'রে দিল, হঠাৎ কেমন হাল্কা হয়ে গেল নিশিকান্ত। ভারমুক্ত, ঋণমুক্ত মনে হ'ল নিজেকে। ভারী ঠেকল শুধু ওই পকেটের দু'শ টাকা।···নিশিকান্ত বলল—'ওই যাঃ, বিড়ির বাণ্ডিলটা ভুলে ফেলে এসেছি ঘরে।' সে এক ফাঁকে লক্ষ্মীর ঘরে গিয়ে ঢুকল।···

গাঁয়ের পথে ঝোলা হাতে অপস্রিয়মান নিশিকান্তর দিকে চিত্রার্পিতের মত চেয়ে রইল সুমিত্রা। মূর্তিটা পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।···

জংশন স্টেশনে একটা নিমগাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসেছিল নিশিকান্ত। বেলা বারোটার কাছাকাছি। ট্রেণ আজ বেশ লেট রয়েছে। মাথার চুলগুলোতে হাত বুলোতে বুলোতে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল নিশিকান্ত। কি যে হয়ে গেল এক মুহূর্তে। পুরো দু'শ টাকা। বোকার মত সে আবার রেখে এল যথাস্থানে। কেন যে এমন হ'ল তার। ঐ শেষ মুহূর্তে নিজেকে হঠাৎ সেই সতুদা ব'লে মনে হয়েছিল নিশিকান্তর। কিন্তু এমন হয় কেন?

ক্যানভাসার নিশিকান্ত চক্রবর্তী নিজেকে একটা বিশ্রীভাষায় গালাগালি ক'রে উঠল।

—•—

সোবিয়েত সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১২ই অক্টোবর, ১৯৬২—মস্কো।

ভোরে দ্বিবেদী তাঁর ঘর থেকে ফোনে খবর নিলেন। এই একটা মস্ত সুবিধা, ঘরে ব'সে ফোনের সাহায্যে কথা বলা যায়। ঘরে ঘরেই ফোন রয়েছে। স্নান ক'রে নিলাম; গতকাল স্নান করি নি। স্নানের পরই সারাদিনের জন্য তৈরী হই—অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ প'রে প্রস্তুত। গতকালের আঙুর ছিল একরাশ; তাই খেলাম। সাদা জল খুব দেয়। বোতলে ভরা মিনারেল ওয়াটার বা খনিজ জল আনা ছিল, টেবিলে বোতল খোলবার যন্ত্রও আছে। সেই জল খেলাম।

সকাল থেকে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। আমার আট তলার ঘর থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে; ট্রলিবাস, সাধারণ বাস চলছে; ফুটপাথের ধারে এসে নির্দিষ্ট স্থানে থামছে। লোকে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, আগে ওঠবার জন্য ঠেলাঠেলি নেই। কলকাতার বাস-ট্রামের ছবি মনে পড়ছে। এখানকার ফুটপাথ মানুষের পায়ে-চলার পথ, তথাকথিত উদ্বাস্তুদের দোকান বা চটবিছিয়ে মনোহারী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় না। দেখছি ছোট ছেলের হাত ধ'রে মায়েরা বের হয়েছেন, কোথায় যাচ্ছেন এমন দিনে জানি না; বোধহয় স্কুলে মা পৌঁছে দিতে চলেছেন। তাদের স্কুলে রেখে হয় ত তাঁদের কাজে বের হ'তে হবে।

সমস্ত বয়স্থা মেয়েদের ও পুরুষদের অফিসে, স্কুলে অথবা কলে কারখানায় কাজ করতে হয়। সমস্ত জাতকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির নেশায় এরা মেতেছে। মা গেল কাজে, ছেলেমেয়ে গেল স্কুলে, বাপ গেল অফিসে বা কারখানায়। এরই মধ্যে সংসারের সব কাজ সারতে হয়। মনে হ'ল এটাই কি সভ্যতার চরম রূপ? কে জানে। নরনারীর কি পৃথক্ জগৎ নেই?... একবার পুকুর কাটাচ্ছিলাম। বাঙালী কুলি পাওয়া যায় না শক্ত কাজের জন্য। ছোটনাগপুরের ওঁরাও কুলি এল একদল। সবাই পরিবার নিয়ে এসেছে। স্বামী-স্ত্রী কাজ করে। মেয়েরা শিশুদের বেঁধে নেয় পিঠে; সেই অবস্থায় মাটি কাটে, ঝুড়ি বয়। আবার ঝুপড়িতে গিয়ে রান্না করে; বেরিয়ে এসে জল আনে, কাপড় কাচে—আবার মাটি বয়। নরনারী সমান ভাবে খেটে চলেছে। শোনা যায়, পুরুষের একলা আয়ে চলে না—তাই ত ছোটলোকদের মেয়ে-মরদে খাটতে হয়। আজ দুনিয়া-ভর মধ্যবিত্ত মেয়ে-মরদে খেটেও হিসাবের ডাইনে-বাঁয়ে মেলাতে পারছে না। পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রায় সর্বত্র মেয়ে-মরদে শুধু খাটছে না, প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে চাকরির বাজারে। আর্থিক ও সাংসারিক সমস্যার সমাধান হয়েছে? সংসারে, সমাজে, সুখ শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় আছে? এদের 'কাজ কাজ' বাতিক দেখে ভাবছি—একেই নাকি বলে সভ্যতা! আমরাও আজ সভ্য হ'তে চলেছি—মেয়ে-মরদে অফিসে, স্কুল-কলেজে কাজ করছি।

প্রাতরাশের পর বের হলাম। বরিস্ এসেছেন নিতে—অ্যাকাডেমিতে যেতে হবে। প্রথম দিন এসেই এখানে এসেছিলাম—আজ কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উপস্থিত হলাম। আমরা বসলাম Roerich-এর ঘরে। বই ঠাসা। টেবিলে তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষা নিয়ে কাজ করছেন কয়েকজন। এই ঘরে জর্জ রো এরিখ কাজ করতেন। ইনি ভারতে ছিলেন বহুকাল। চিত্রশিল্পী নিকোলাস রো এরিখ ১৯২১ সালে দুটি ছেলেকে নিয়ে রুশ থেকে পালিয়ে লণ্ডনে যান। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিকোলাসের দেখা হয়। পরে নিকোলাস হিমালয়ে উমাস্বতী নামে একটি স্থানে এসে বাস করেন। জর্জ রো এরিখ ভাষাবিদ্ হয়ে কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। তিব্বতী ভাষা থেকে কিম্বদন্তীমূলক Blue Annals নামে ইতিহাস ইংরেজিতে তর্জমা ক'রে যশস্বী হয়েছিলেন। বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে এ বই এলে আমি পড়েছিলাম এবং আমার কয়েকটা প্রশ্ন ও সন্দেহের কথা জর্জকে লিখে জানাই, তিনি জবাব দিয়েছিলেন। কয়েক বৎসর আগে জর্জ সোবিয়েত দেশে ফিরে যান এবং অ্যাকাদেমিতে ভাষা-তত্ত্ব নিয়ে কাজে প্রবৃত্ত হন। গত বৎসর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুদিন স্মরণে সভা হবে দুই-একদিনের মধ্যে—আমাদের আসবার জন্য বললেন। আমরা ঘরে বসলাম—ঘরোয়া বৈঠক—চেয়ার নিয়ে ঠাসাঠাসি ক'রে

ব'সে, কথাবার্তা চলল। স্কলাররা একে একে নিজ নিজ পরিচয় দিলেন—বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, কানাড়ী, উর্দু ভাষা নিয়ে কে কি কাজ করছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। মাদাম চেভ্‌কিনা বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন, মিষ্টার ভ্যাসিলি বেস্‌ক্রোভনী উর্দু-রুশী অভিধান তৈরীতে লেগেছেন। ইনি লেনিনগ্রাদের বিখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্‌ অধ্যাপক বারনিকভের ছাত্র—হিন্দী ও উর্দু ভাষা নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত। মিঃ রাবিনোভিচ ভারতীয় অভিধান বা কোষ গ্রন্থতত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন এবং বর্তমানে নেপালী-রুশী ভাষায় অভিধান সম্পাদনে ব্যাপৃত আছেন। মিঃ সিরকিন বৈদিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন, অধুনা ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ বের হয়েছে। তাঁর কৃত পঞ্চতন্ত্রের একটা নূতন তর্জমা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। মিঃ সেরেব্রিয়াকোভ ও মিঃ রাবিনোভিচ যৌথভাবে পাঞ্জাবী-রুশী অভিধান প্রস্তুত করেছেন। সেরিব্রিয়াকোভ পাঞ্জাবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখছেন। সংস্কৃত ইনি ভালই জানেন; ভর্তৃহরি নিয়ে গবেষণা চলছে। বেতাল পঞ্চবিংশতির রুশ অনুবাদ এঁরই করা; সে বই নাকি ২৫ হাজার ছাপান হয়; সমস্তই বিক্রী হয়ে গেছে। মিনায়েফ, শেরবাৎস্কি প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যার আচার্যদের ছড়ান লেখাগুলি সংগ্রহ ক'রে সম্পাদন করেছেন ইনি। এ বইটা ইংরেজী তর্জমা হ'লে ভাল হয়।

বাংলা ভাষা যে মেয়েটি পড়ে—চেভ্‌কিনার সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। দেখলাম ভাষার উপর বেশ দখল আছে। সে অতি আধুনিক কোন বাঙালী সাহিত্যিক সম্বন্ধে আমার মতামত চাইলে। আমি বললাম, আমি ১৯৪১ সালে থেমে আছি। বুঝতে না পারায় বললাম, আমি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে চর্চা করি—তাঁর বাইরে আর কারও সম্বন্ধে বলবার অধিকার রাখি না। বর্তমান ভারতের যে সকল কবি বা সাহিত্যিক বামপন্থী ব'লে আত্মঘোষণা করেন বা সমাজতন্ত্রবাদী এবং যাঁরা সেই মতের অনুকূলে সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের কথা শোনবার জন্য এদের খুব আগ্রহ। স্বাভাবিক। এমন সব লেখকের নাম এঁরা জানেন, যাঁরা আমাদের কাছে অজানা। এইসব লোকদের দুই-চারটে গরম গরম কবিতা বা চরম দরিদ্রের কাতরানিপূর্ণ কাহিনী রুশীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এগুলি ভাষান্তরিত হয়েছে, তাদের সাহিত্যিক গুণের জন্য নয়—তাদের বক্তব্যের জন্য, অর্থাৎ বিশেষ মতবাদের সমর্থনে তারা রচিত বলেই সমাদৃত হচ্ছে। বুঝলাম—সাহিত্যকে রসের দৃষ্টি থেকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না; মতবাদের অনুকূলে লিখিত ব'লেই তাদের মান দিয়ে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আসন দেওয়া হচ্ছে। এ সব দেখে-শুনে মনে হয়, এখনও এদের বিচারবুদ্ধিতে maturity বা পরিপক্কতা আসে নি। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এদের যে উৎকর্ষলাভ হয়েছে, আর্টের ক্ষেত্রে সে রকম শিখর-ছোঁয়া তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি এখনও দেখা যায় নি। নিজেদের মতের অনুকূলে বিজ্ঞানকেও যেমন আনা যায় না, সে তার নিজের ধর্মানুসারে চলবেই; তেমনি আর্ট ও সাহিত্যের নিজস্ব কথা আছে। সেটাকে বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করাই হচ্ছে আসল বিজ্ঞানী-বুদ্ধির পরিচায়ক। তবে নবীন রুশীয় লেখকরা স্তালিনের মধ্যযুগীয় inquisition-এর মনোভাব থেকে বের হয়ে আসছে।

কথাবার্তায় বুঝলাম, এখন পর্যন্ত রুশীয় স্কলাররা ভাষা-চর্চা ও অনুবাদ নিয়ে বেশি ব্যস্ত। ভাষা ভাল ক'রে আয়ত্ত ক'রে, বিদেশী ভাষার সাহিত্য নিজেদের ভাষায় অনুবাদ ক'রে জনতার সামনে এঁরা ধ'রে দিতে চান। আজ পাশ্চাত্ত্য দেশের যে কোন ভাষায় ভাল বই প্রকাশিত হলেই তা অল্পকালের মধ্যে প্রায় সব প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়ে যায়। তাই নরওয়ের সঙ্গে গ্রীসের, স্পেনের সঙ্গে রুশের, আমেরিকার সঙ্গে পোলাণ্ডের ভাব বিনিময় অব্যাহত হয়ে আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক osmosis ক্রিয়া চলছে নিরন্তর। ভারতে তার চেষ্টা সবেমাত্র সুরু হয়েছে সাহিত্য আকাদামিতে। সোবিয়েত রুশের যতগুলি অঙ্গ রাজ্য আছে তার প্রত্যেকটিতে বিজ্ঞান পরিষদ আছে এবং প্রত্যেক রাজ্যের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পর্যাপ্ত আয়োজন হয়েছে। ভারতের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে সাহিত্য অ্যাকাদামি গঠিত হ'লে ভারত-ভাবনা সুদৃঢ় হ'ত। এই মোলাকাত শেষ হ'লে আমাদের ফোটো নেওয়া হ'ল। ভাল ক'রে প্রিণ্ট ক'রে আমাদের পরে পাঠিয়ে দেন।

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েই বের হলাম মস্কোর বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটি দেখবার জন্য। লিডিয়া ফোন ক'রে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলেন—তাই পৌঁছানো মাত্র গাইড এসে আমাদের স্বাগত করলেন। নতুন বাড়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৈরী হয়েছে—লেনিন পাহাড়ের উপর বহু দূর থেকে তার শিখর দেখা যাচ্ছে। পথ দিয়ে চলেছি, বন্ধুরা দেখিয়ে বললেন—ঐ দেখা যাচ্ছে mosfilm, সোবিয়েত দেশের বৃহত্তম সিনেমা তোলার কেন্দ্র, এটা

ছোট মনে হচ্ছে—তাই নূতন একটা তৈরী শুরু হয়েছে।

এসে পৌঁছলাম। বিরাট্ অট্টালিকার সামনে গাড়ি থামল। মাঝের বাড়ী ৩২ তলা উচ্চ, ৭৮৭ ফুট, তার উপর শিখর। আশে-পাশে প্রায় ৪০টি ইমারত; সমস্ত জমি প্রায় আড়াই শ একর। কত রকমের গাছ দেশ-বিদেশ থেকে এনে যত্ন ক'রে বড় করা হচ্ছে। ফুলের বাগানে বারো মাস ফুল পাওয়া যায় এমন ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে।

প্রায় চল্লিশটা বাড়ী কাছাকাছি একটা প্ল্যানের মধ্যে তৈরী; দোতলা, তিনতলা, ছয়তলা, নয়তলা, বারোতলা আঠারোতলা বাড়ী—মাঝের ঐ বত্রিশতলা বাড়ীর আশেপাশে বিন্যস্ত। মস্কো বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লোমোনোসোভ-এর বিশালমূর্তি প্রাঙ্গণে দেখলাম। অষ্টাদশ শতকের লোক তিনি—আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে অমর নাম অর্জন করেছেন।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় বর্ণনা করা সম্ভব নয়—সেটা করতে গেলে সোবিয়েত রুশের শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনা আনতে হয়। সেটা ত সম্ভব নয় এখানে। মোটামুটি গাইডের কাছ থেকে জানলাম যে, এখানে ১৪টি ফ্যাকালটি বা শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভাগ আছে—বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিজ। এই বাড়ীতে বিজ্ঞানসম্পর্কীয় বিষয়গুলি ও পুরাণো বাড়ীতে হিউম্যানিটিজ বিষয়গুলি পড়ানো হয়। হিউম্যানিটিজ কথাটা আজকাল স্কুলের ছেলেরাও জানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাড়ীতে চার হাজারের মত ছাত্র আছে। উচ্চ বিদ্যালয়ে দশ বৎসর প'ড়ে পাশ করলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায়। তবে পাশ করলেই সেটা হয় না; বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আবার যাচাই ক'রে নেয়। যে সব ছাত্র সত্য সত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে থাকবে, তাদেরই ভর্তি হবার জন্য মনোনীত করা হয়। এই পরীক্ষায় সিকি ছেলে পাশ করে; অবশিষ্টরা কারিগরি, মিলিটারি প্রভৃতি নানা বিদ্যা-কেন্দ্রে ভর্তি হ'তে পারে। উচ্চ বিজ্ঞান সকলের জন্য নয়, তার মানে এ নয় যে, দরজা বন্ধ; আদৌ তা নয়। যারা মেধাবী ছাত্র, তাদেরই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়; দারিদ্র্য কোন অন্তরায় নয়। কারণ শতকরা ৮৭ জন ছাত্র সরকারী বৃত্তি পায়। ছাত্রদের হস্টেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন—পৌনে ছয় হাজার ঘর। আমরা ছাত্রাবাসে গেলাম। একটি কুঠরীতে প্রবেশ ক'রে বসলাম। খাট, টেবল, চেয়ার, বিছানা, আলো, হীটার, বাথ সবই আছে। ঘর ভাড়া লাগে সামান্য—খাওয়ার খরচ ৯০ রুবলের মধ্যে হয়ে যায়। বই ছাত্রদের কিনতে হয়, তবে লাইব্রেরীতে পাঠ্যপুস্তকের বহু কপি থাকে এবং লাইব্রেরীও অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে—তাই ছাত্রদের হস্টেল থেকে এসে লাইব্রেরীতে ব'সে পড়তে অসুবিধা হয় না। শিক্ষকরা এখানে থাকেন—প্রায় দুশো ফ্ল্যাট আছে তাঁদের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর একটা অংশ দেখলাম—সব দেখা ত সম্ভব নয়—৩৩টা রীডিং রুম, একটাতে ঢুকেছিলাম। পড়লাম—গ্রন্থাগারে দশ লক্ষ বই। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে চৌদ্দটি বিভাগে ছাত্রসংখ্যা বিশ হাজারের উপর—প্রায় তিন কুড়ি দেশ থেকে ছাত্র এসেছে। সকল শ্রেণীর শিক্ষকের সংখ্যা সওয়া দুই হাজারের বেশি। অবশ্য এ বাড়ীতে সব বিষয় পড়ানো হয় না তা পূর্বে বলেছি; শহরের পুরাণো বাড়ীতে অনেকগুলো বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। সেখানে একটা সেমিনারে এক সন্ধ্যায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে ভাষণ দিতে হ'ল।

ছাত্রদের সভাগৃহ দেখলাম পরিচ্ছন্ন। বুঝলাম, এখানে ইউনিয়ন নেই। তাই ঘরের দেওয়ালে, করিডরে, সিঁড়ির ধারে খবরের কাগজের উপর কলমের ডগা দিয়ে লাল অথবা নীল কালিতে দলগত নির্বাচন 'সাফল্যমণ্ডিত' করবার জন্য 'অনুরোধ' নেই। পঁচিশটা পার্টির পঁচিশ জন ছাত্র নেতার জন্য সুপারিশ নেই।···অনেকগুলি হল (Hall) দেখলাম। একটা ঘরে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয়েছিল, বললেন গাইড। আমাদের প্রথমে যে বিরাট্ হলঘরে নিয়ে যায়, সেখানে নেহরুকে সম্মান দেখানো হয়েছিল। সে ঘর সুন্দর, ঐশ্বর্যমণ্ডিত। দেড় হাজার কুশান দেওয়া চেয়ারে দর্শক-শ্রোতারা আরামে বসতে পারেন। ঘর যতদূর সম্ভব সুন্দর করা যায়, তার প্রচেষ্টা হয়েছে। সবের মধ্যে তাক্ লাগিয়ে দেবার ইচ্ছা খুব স্পষ্ট। যে যুবকটি আমাদের গাইডের কাজ করছিল, তার সঙ্গে অনেক কথা হ'ল—হস্টেলের একটা ঘরে ব'সে। সে ভাল ইংরাজী বলতে পারে ব'লে সুবিধা হয়েছিল; দোভাষীর প্রয়োজন সব সময় হচ্ছিল না। তার নাম Yuri—পুরোপুরি 'মস্কো ভাইট'; মস্কোর খাস বাসিন্দারা বেশ আত্মচেতন। যুবকটি পূর্বে মিলিটারি বিভাগে কাজ করত, পরে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কাজ ক'রে ছেড়ে দেয়। এখন রাতে জার্ণালিজম্ পড়ে ও দিনমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে গাইড-এর কাজ করে। বিবাহিত—স্ত্রীপুত্র নিয়ে আছে। আমাদ সঙ্গে একজন সৈনিক বেশধারী লোক সামনে দেখে

ফিরছিল সে ককেসাসে কাজ করে; এসেছে মস্কো দেখতে। বরিস বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, একদিন ইনি হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসবেন। লোকটির সমস্ত দেখবার, জানবার আগ্রহ খুব। তা হ'লে পেশা বদলান যায়!

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২ তলার উপর লিফ্‌টে ক'রে উঠলাম। হলঘরে বিজ্ঞানীদের আবক্ষমূর্তি। য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশ করেই যে বিশাল হলে এসেছিলাম—সেখানে সর্বদেশের, সর্বকালের বহু জ্ঞান-তপস্বীর মূর্তি দেখে এসেছি। হলের দুই প্রান্তে পাবলোভ ও মেন্‌ডেলীফ্‌-এর বিরাট্ মূর্তি; ঢুকেই সামনে লোমনোসোভের মূর্তি। বত্রিশ তলায় উঠেও রুশীয় বিজ্ঞানীদের মূর্তি দেখলাম। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ—ম্যুজিয়ামও বটে। ম্যাপ, মডেল, গ্লোব, পাথর, শিলা সাজান। সে সব দেখবার সময় খুব কম। তবুও চোখ বুলিয়ে নিলাম।

বত্রিশ তলার সামনে যে খোলা বারান্দা, আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সমস্ত মস্কো শহর এখান থেকে ছবির মত ফুটে উঠল। তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া ও slit বা তুষারকণার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। মানুষের হাতের ছোঁয়া পেলে ধূসর মাটি সবুজ হয়, শ্যামল প্রান্তর মরুভূমি হয়। মানুষের হাতে যাদুমন্ত্র আছে। উপরের ছাদ থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে, সোবিয়েতের বিখ্যাত ক্রীড়াঙ্গন—বা স্টেডিয়াম। য়ুরি দেখাল—ঐ দূরে—ঐখানে পায়োনিয়ার্স প্যালেস্।

য়ুরি দরজা পর্যন্ত এসে বিদায় নিল; তার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি মনে আছে। আমাদের মোটর এসে গিয়েছিল; উঠলাম সকলে। বোরিস্ মেট্রো দিয়ে চ'লে গেলেন। আমরা Stadium-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আমি বললাম —এটা কি দেখা যায় না? গাড়ির ড্রাইভারটি খুব চালাক ও বুদ্ধিমান্। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে প্রহরীদের কি বলল জানি না—তখনি বিরাট্ লৌহ কপাটটি খুলে গেল মোটর ঢুকে পড়ল আঙিনার মধ্যে। তারপর আমরা উঁচু উঁচু ধাপের সিঁড়ি বেয়ে স্টেডিয়ামের মঞ্চে উঠলাম। মঞ্চ পার হয়ে গ্যালারী-ঘেরা বিরাট্ ক্রীড়াঙ্গন। রাত্রে ম্যাচ হবে; সন্ধ্যার মুখে পুলিশ-বাহিনী আসতে আরম্ভ করেছে। গ্যালারীতে লক্ষাধিক লোক বসতে পারে। জনরাজ হলেও শাসকগোষ্ঠীর জন্য পৃথক্ নির্দিষ্ট সুখাসন আছে। বলশই থিয়েটারে জার ও তাঁর পরিবারের জন্য পৃথক্ স্বর্ণাসন ছিল। গ্যালারীর নিচে শুনলাম ১৪টা ব্যায়াম আখড়া আছে। বিচারকদের ঘর, পোশাক ঘর, চিকিৎসকের কুঠরী, টেলিভিশন দেখানর ব্যবস্থা, সিনেমা এবং ভোজনালয়। সময় থাকলে শেষের ঘরটায় ঢুকতাম। কিন্তু এখনি চলতে হবে।

বড় স্টেডিয়ামের পাশে ছোট স্টেডিয়াম—তার পাশে House of Sports—ক্রীড়াগৃহ। এটার উপর আচ্ছাদন আছে; এতবড় খেলার ঘর য়ুরোপে কোথাও নেই। ১৫ হাজার লোক গ্যালারীতে বসতে পারে। গেটের সামনেই নামলাম। ভিতরে যাবার বাধা হ'ল না। গ্যালারীর পাশে দাঁড়াতেই কারা জায়গা ক'রে দিল। বিদেশী ব'লে সর্বত্রই আমরা সম্মান পেয়েছি। কি বাস্-এ, কি মেট্রোতে। গ্যালারী-ভরা লোক। খেলা হচ্ছে ভলিবল—মঙ্গোলীয়ান ও ইস্‌রেয়েলী দলের মধ্যে। খেলা দেখলাম শেষ পর্যন্ত। মঙ্গোলীয়ানরা জিতল। তারপর দুইদল দাঁড়াল—সোবিয়েত জাতীয়-সঙ্গীত গাওয়া হ'ল—সবাই আসন ছেড়ে উঠল—যেমন সব দেশেই হয়। খেলার জায়গা লিনোলিয়ম-মোড়া, দূর থেকে সবুজ ঘাসে ঢাকা মনে হচ্ছিল।—এখানে অনেক রকমের খেলার, এমন কি কন্‌সার্ট প্রভৃতি শোনাবার ব্যবস্থা সহজে করা যায়। জাতীয়-সঙ্গীত গাওয়ার সময় সকল দর্শকই যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা তো মনে হ'ল না। নূতন Generation-এর ছেলেরা সম্পদের মধ্যে বড়ো হচ্ছে—দুঃখের দিন তাদের শোনা কথা। তা না হ'লে ক্রুশ্চেভকে মাঝে মাঝে কড়া কথা বলতে হ'ত না, আর আমাদের কাছ থেকে পথের দুটো ছেলে চুয়িংগাম চাইবে কেন? স্বর্গরাজ্যে ওপাপ প্রবেশ করছে। সেদিন তো পাঁচটা ছোকরাকে নারীনিগ্রহ অপরাধের জন্য গুলী করে মারা হ'ল।

খেলা দেখে হোটেলে ফিরলাম। চা খেয়ে ফের বের হলাম। দ্বিবেদীর সর্দি হয়েছে, তিনি বের হলেন না। কৃপালনী আর আমি, সঙ্গে বরিস। বরিস য়ুনি-ভার্সিটি থেকে এখানে চ'লে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এবার আমার অনুরোধে সবাই চলেছি মেট্রোতে বা পাতাল-যান চ'ড়ে রসাতল ভ্রমণে। হোটেল থেকে বের হয়ে Taxi ধরলাম। খুব ঠাণ্ডা। জোর হাওয়া বইছে—তবুও বের হয়েছি। ট্যাক্সি শেয়ারে পাওয়া গেল—পাঁচ কোপেক ক'রে দিতে হ'ল; অবশ্য খরচ যা কিছু, তা' বরিসই করছেন। ট্যাক্সি ক'রে মেট্রোর প্রধান স্টেশনে এলাম। টিকিট নয়—পাঁচ কোপেক কলে দিলেই তুমি ঢুকতে পারবে। বরিস স্লটে পয়সা দিচ্ছেন দেখে আমি এগিয়ে যাচ্ছি ঢুকবার জন্য। বরিস আমার জামা ধ'রে থামালেন। বললেন, স্লটে কোপেক না ফেলে গেলে

অটোমেটিক কলে পথ আটকাবে; স্লটে কোপেক পড়লে যন্ত্রদানব ঠাণ্ডা থাকেন। কোপেক নৈবেদ্য না পড়লেই টের পায়—অমনি দাঁড়া বের ক'রে পথ রুখে দাঁড়ায়। স্টেশনে ঢুকে এস্‌কেলেটর ক'রে নীচে নেমে চললাম। এস্‌কেলেটর কি জানতেম, তার ছবি দেখেছি, তার পদ্ধতি জানি; কিন্তু কখনো তা চড়ি নি। বরিসকে ধ'রে টপ ক'রে চলন্ত পথে পা দিলাম। দেখতে দেখতে তা সিঁড়ি হয়ে গেল। অতি উৎসাহী, ব্যস্তবাগীশদল সিঁড়ি দিয়েও নামছে। পাশের চলন্ত সিঁড়ি উঠছে, লোকেরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলছে; আমিও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চলেছি। নামবার জায়গায় বরিস ধ'রে টানতেই নেমে পড়া গেল। সঙ্গী কৃপালনী বিদেশে গিয়েছেন বহুবার। চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন, নেমেছেন। আমরা যেখানে নামলাম, সেটা বিরাট্ স্টেশন, শ্বেত-পাথরের মেঝে, থাম, দেওয়াল। ছাদের খিলানের মধ্যে মোজাইক করা ছবি—রুশী ইতিহাস থেকে ঘটনার চিত্র; একটা ছবিতে পালটোবার যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। জার পীটার সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসকে এই যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। এই ধরণের বহু ছবি স্টেশনের ছাদে, প্রাচীর-গাত্রে আঁকা। প্রত্যেকটি স্টেশনে স্থাপত্য ও চিত্র পৃথক্ ধরণের। গাড়ি আসে বিদ্যুৎ বেগে—থামতেই দরজা খুলে যায়; লোক নামে আগে, তারপর লোকে ওঠে, গাড়ি চলতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সন্ধ্যার মুখের গাড়িতে বেশ ভিড়। মনে হ'ল কারখানা প্রভৃতি থেকে লোক ফিরছে। অনেকে বাজার করেও আসছে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি গ্রামের মেয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেল। মেট্রোর একটা স্টেশনে নামলাম, সেটার নাম হ'ল রেভোল্যুশন; যুদ্ধের ছবি, বীরদের রণমূর্তি দিয়ে স্টেশনের প্রাচীর স্তম্ভগুলি সাজানো, প্রাচীরের গায়ে সিনেমার ছবি বা কুৎসিত ব্যাধির অব্যর্থ ওষুধের বিজ্ঞাপন-চ্যাপটানো কাগজ দেখলাম না। সুন্দর স্থানকে সুন্দর ক'রে রাখতে জানে। না রাখলে দণ্ড আছে, তাও অজ্ঞাত নয়। বাস্তববাদী এরা—তাই এরা জানে মিষ্টি কথায় সব কাজ হয় না; কোড়ারও দরকার আছে, দণ্ড কথাটার অর্থ তারা জানে। আর জানে, শক্ত কথায় হাড় ভাঙ্গে না—হাড় ভাঙবার হাতিয়ার শক্ত হাতে ধরতে হয়। হাওড়া স্টেশনের লালরঙ দেওয়া দেওয়াল পানের পিচে আরও লাল হয়ে ওঠে; কারও চোখে লাগে না। রুচিতে বাধে না। কুলিরা যেখানে বসে, সেখানে সমানে খৈনি খাচ্ছে আর ছেপ্ ফেলছে—এ দৃশ্য কার চোখে না পড়ে? যাক্।

পাঁচ কোপেক দিয়ে মেট্রোয় নেমেছি—তারপর ৩।৪ বার স্টেশন বদল ক'রে, নানাদিকে ঘুরে উপরে উঠে এলাম। প্রায় একঘণ্টা পাতালপুরী দেখলাম। রাস্তায় যেতে যেতে মাঝে মাঝে দেখতাম, পাতালযান উপরে উঠে মস্কোনদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে। বেশ দেখতে লাগে দূর থেকে, খেলনার গাড়ির মত। আসলে এটা পাতাল থেকে উঠে নদীর উপর সেতু পেরিয়ে আবার সুড়ঙ্গে ঢুকে মস্কোর অন্যতম রেল স্টেশন কিয়েভে যায়, অর্থাৎ দক্ষিণ রাশিয়ার কিয়েভ্ শহরের যাবার স্টেশন পর্যন্ত যাচ্ছে।

ট্যাক্সি ক'রে হোটেলে ফিরলাম। যথাসময়ে ভোজনালয়ে এলাম। লিডিয়া আছেন, বরিস কারপুশ-কিন আমাদের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে বাড়ি চ'লে যান। সারাদিনই তিনি আমাদের সঙ্গে ঘুরেছেন।

আজ খাবার হলে কনসার্ট বাজছিল। কিন্তু নাচবার লোক দেখা গেল না। দুদিনের জন্য বন্ধুত্ব হয় ক্ষণেকের—তার পর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে—কে কোথায় চ'লে যায়—কখনো কারও সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না। আমাদের দেশে ধর্মশালায় থেকেছি—সেখানেও ক্ষণেকের দেখা। কিন্তু অজানা-অপরিচিতেরা মিলে কোন জলসা, কীর্তন প্রভৃতি করতে দেখি নি।

আমাদের টেবিলে যে মেয়েটি দেওয়া-থোওয়া করে তাকে দেখতে পাচ্ছিনে আজ। তাকে একদিন তার কাজের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম; বলেছিল যে, সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা খাটতে হয় এদের। একদিন ভোর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত ১২।১৩ ঘণ্টা খেটে পরের দিন ছুটি পায়। মাসে ৭০ রুব্‌ল্ বেতন। বাড়ী ভাড়া ৩'৫০ রুব্‌ল্ লাগে। অনুপস্থিত দেখে মেয়েটির খোঁজ নিলে লিডিয়া বললেন, তার মন খারাপ, কাল কাজে আসে নি—সারাদিন কান্নাকাটি করেছে। ব্যাপার কি? তা হলে স্বর্গরাজ্যেও মেয়েদের চোখে জল পড়ে? পড়ে বৈকি—মানুষ যে মানুষ—দেবতাও নয়, দানবও নয়—দুয়ে মিশিয়ে সে যে গড়া—সেটা ভুলে উৎসাহের আতিশয্যে মনে করে ওটা 'সব পেয়েছির দেশ'। শুনলাম স্বামী তার মোটর গাড়ি কিনতে চায়; সে কিনতে দেবে না। সে বলে, মোটর গাড়ি কিনলে তার স্বামী ঘুরে বেড়াবে অন্য মেয়েদের নিয়ে। হায় রে নারী—সর্বদেশে, সর্ব কালেই তুমি এক। মেট্রোতে দেখেছি—বিষাদময়ী প্রৌঢ়া নারী—তাকে বোঝাচ্ছে পাশের যাত্রিণী, চোখ তার ছল ছল। কিসের দুঃখ জানি না। আমি লিডিয়াকে শুধোলাম, 'শুনেছি স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ হ'লে সালিসী হয়।'

উত্তরে শুনলাম, পার্টির মধ্যে মনোমালিন্য হ'লে, পার্টির থেকে মীমাংসার চেষ্টা হয়। তবে সব সময়ে তা যে সফল হয়, তা ত নয়।

আসলে এই সব সামান্য কথা আমাদের দেশে অতিরঞ্জিত ক'রে প্রচার করা হয়; ভাবখানা এই যে, সে দেশে দুঃখ নেই, বিবাদ নেই, বিষাদ নেই। সবাই শতাতপ মুনির নয়া সংস্করণ হয়ে চলাফেরা করছেন, নিয়ম পালন করছেন। মানুষের সমাজে তা সম্ভব হয় না, হয় না— এই সহজ কথাটা বুঝতেও সময় লাগে—যখন দলগত মতামতের ঔদ্ধত্য সহজবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তাই বলছি, সোবিয়েত দেশ হলেও সেখানে সবই আছে—বিবাদ আছে, বিষাদ আছে, বিচারালয় আছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টের দমন হয়; দুষ্টলোক আইনের ফাঁক দিয়ে ফস্‌কে পালাতে পারে না। শুনলাম, বিয়ে করা খুব সহজ, কিন্তু তালাক দিতে হ'লে একটু সময় লাগে। তবে মনের মিল হচ্ছে না ব'লে তালাক পাওয়া যায়। স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্র খারাপ প্রমাণ করবার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী-সাবুদ কাঠগড়ায় এনে যে রকম নোংরা কাদা আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত পত্রিকারা সমাজের মধ্যে ছড়ান, তা ও-দেশে হতে পারে না। ও সব দেশে বিশেষতঃ বিলাতে তার জন্য পৃথক্ কাগজ বের হয়। তার অসম্ভব কাট্‌তি। কয়েক পেনি দিয়ে অতগুলো মুখরোচক খবর বা কেচ্ছা পাওয়া যায়—শনি-রবিবারটা কাটে ভাল।

সন্ধ্যার পর লিডিয়া আমাদের প্রত্যেককে ২৬·৮০ রুব্‌ল্ ক'রে দিল খুচরো খরচের জন্য; এটা অ্যাকাডেমি পাঠিয়েছেন। আমি হেসে বললাম—ছাব্বিশ রুব্‌ল্ আশী কোপেক কেন—সাতাশও নয়, ছাব্বিশও নয়। লিডিয়া এই গাণিতিক সমস্যার কোন উত্তর দিতে পারে নি।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৬২ মস্কো।

স্নানাদি শেষ ক'রে বের হবার জন্য তৈরী হয়েছি। লিখছি ব'সে নিত্য ভ্রমণকথা। এমন সময়ে ফোন্ এল —দানিয়েল চুক্ করছেন। ইনি বাংলা ভাষাবিদ্, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কাজ করেছেন। এলেন। কথাবার্তা হচ্ছে। এমন সময়ে বরিস কারপুশকিন এলেন—যেতে হবে প্রাচ্য সাহিত্য অনুবাদ কেন্দ্রে। উক্‌রেইন হোটেল থেকে অনেকটা দূরে খাস সহরের মধ্যে—পুরাণো বাড়ীতে এই অনুবাদের দপ্তর। চার তলা পর্যন্ত লিফ্‌ট —তাও খুব পুরাণো ধরণের। তার পর পাঁচতলায় হেঁটে উঠতে হয়। সেখানে এই বিভাগের কর্তারা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। অধ্যক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর দুই খণ্ড বের হয়েছে। আরও দশ খণ্ড বের হবে—কাজ চলছে। ইতিপূর্বে আট খণ্ডে বের হয়েছিল, সে সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। তা ছাড়া তাঁরা জানেন যে, সে অনুবাদ সব জায়গায় ঠিক হয় নি। এবার তাঁরা মূলের ভাব রেখে ভাষান্তরিত করবার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় ও রুশীয় মিলে তর্জমা খাড়া ক'রে, রুশী ভাষানিপুণদের সাহায্য নেওয়া হয়। তারপর তাকে অনুবাদ ব'লে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোন একজনের উপর অনুবাদ নির্ভর করে না। পাস্তারনাক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা রুশী অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ-পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা উঠল। আমি বললাম, পাস্তারনাক স্বয়ং কবি, তিনি বাংলা জানতেন না; তাঁর অনুবাদ কতটা মূলের অনুগত হয়েছে বা হ'তে পারে তার বিচার করা কঠিন। আমি সেক্সপীয়রের জার্মান অনুবাদের কথা পাড়লাম; বললাম, Shakespeare Survey ব'লে পত্রিকা বের হয়, তাতে পড়েছিলাম যে, স্লেগেল ভ্রাতৃযুগল ১৯ শতকের গোড়ায় সেক্সপীয়রের নাটকাবলী অনুবাদ করেন। স্লেগেল কবি ছিলেন, অনুবাদ অনবদ্য হয়েছিল। জার্মানরা সেই অনুবাদ গত দেড় শত বৎসর প'ড়ে আনন্দ পেয়ে আসছে। বর্তমান যুগের সাহিত্যিক ক্রিটিকরা বলছেন, স্লেগেল কবি ছিলেন, এই অনুবাদের মধ্যে তাঁদের কবিসত্ত্বা প্রকাশ পেয়েছে। সেক্সপীয়রের যথাযথ অনুবাদ হয়েছে কি না—তার যাচাই হওয়া দরকার। আমি বললাম, অনুবাদ ভাব-অনুগত ও শব্দ-অনুগত হয়েছে কি না সেটার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কথার ভাবে বুঝলাম—ভাবানুবাদ অর্থাৎ কবির মূল বক্তব্য যথাযথ ভাবে প্রকাশই এঁদের উদ্দেশ্য। ম্যাদাম কাজিতিনা বললেন, 'আপনাকে একটা অনুবাদ প'ড়ে শোনাই, আপনি ছন্দ দেখে ধরতে পারেন কি না দেখুন।' তিনি রুশ ভাষায় কবিতাটা যে ভাবে পড়লেন, তাতে মনে হ'ল সেটা 'সোনার তরী'; 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষার' সঙ্গে ছন্দ মিলছে। হ্যাঁ, সত্যই তাই—সেটা 'সোনার তরী' কবিতারই তর্জমা।

রবীন্দ্র রচনাবলী যে দুই খণ্ড বের হয়েছে, তা আমাকে উপহার দিলেন। সেই দুই খণ্ডে নিম্নলিখিত বইগুলির অনুবাদ আছে।

১ম খণ্ডে—৬০০ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা—প্রাং চুক দানিয়েল চুক লিখিত

বউঠাকুরাণীর হাট—শেস্তোপালোবা

রাজর্ষি—বরিস কারপুশকিন

গল্পগুচ্ছ—২৮টি—তোবৃস্তিক, দানিয়েল চুক, স্মির-নোভা, জিয়াকনোভা, কাফিচিনা ইত্যাদি

২য় খণ্ড—কবিতা ও নাটক

সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, ছবি ও গান,
(৩টা) (৪টা) (১২টা) (৫টা)
মানসী সোনার তরী চিত্রা ও চৈতালি
(২৯টি) (১৪টি) (১৩টি) (২৫টি)

প্রকৃতির প্রতিশোধ—কাফিচিনা
রাজা ও রাণী—গরবোৎস্কি
চিত্রাঙ্গদা—কাফিচিনা
বিসর্জন—ৎসিরিন

জিজ্ঞাসা করা হ'ল, রবীন্দ্রনাথের কোন্ বই সব থেকে জনপ্রিয় হয়েছে। শোনা গেল 'গোরা'। ইতিমধ্যে ৬টা সংস্করণ নিঃশেষিত, প্রায় ১০ লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়েছিল! আমরা শুনে স্তম্ভিত! কৃপালনী সাহিত্য আকাদেমির সম্পাদক, তাঁকে নানা ভাষা থেকে বই তর্জমার ব্যবস্থা করতে হয়, টাকা দেওয়া-নেওয়ার অনেক প্রশ্ন ভাবতে হয়। তাই তিনি সম্পাদক পুজিকোভকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সোবিয়েত দেশে যে সব বই ছাপা হয়, লেখকরা কিরকম রয়ালটি পেয়ে থাকেন। পুজিকোভ বললেন, "সোবিয়েতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক্; ব্রিটেন, আমেরিকা বা ভারতে বই বিক্রীর টাকার একটা অংশ লেখকদের দেওয়া হয়। সোবিয়েতে বই-এর পাতা হিসাব ক'রে পারিশ্রমিক দেওয়া নিয়ম। সাধারণ বই থেকে কবিতার বই-এর টাকা বেশী দেওয়া হয়ে থাকে—প্রতি পংক্তিতে ২ রুবল অর্থাৎ আমাদের আজকের মুদ্রা বিনিময়ে হবে ১০ টাকার উপর। ফিরদৌসী তার ষাট হাজার পংক্তি শাহনামার জন্য প্রায় এই রেটেই দাম চেয়েছিলেন। মিঃ পুজিকোভ বললেন, কোন কোন সময়ে বিদেশী লেখকদের বই ছাপলে ডলারে বা ষ্টার্লিংএ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। অনুবাদকরা পাতা ও পংক্তি হিসাবে তাঁদের মেহনতের মূল্য পেয়ে থাকেন। এরা একবারেই টাকা দিয়ে সম্বন্ধ চুকিয়ে-বুকিয়ে দেয়। আমাদের দেশে অখ্যাত লেখকদের দশা যে কি, তা অনেকেই জানেন। তবে আজকাল নামী লেখকরা খুব সেয়ানা হয়েছেন, আর হবেন নাই বা কেন? জেলের পাছে ত্যানা আর মেছুনির কানে সোনা—এটাই কায়েম হবে কেন? অনেক লেখকই এখন নিজেরাই প্রকাশনী কারবার খুলে পাকাবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন।

আলোচনা হ'ল বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে। বিষবৃক্ষ অনুবাদ হয়েছে, আনন্দমঠ সম্বন্ধে কথা তুললেন একজন—আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের জয়গান কেন করেছেন? আমার মত জানতে চাইলে আমি বললাম—'ভুলে যাবেন না, আনন্দমঠের ঘটনাটা অষ্টাদশ শতকের শেষদিক্কার। মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছে; দেশে অরাজকতা; বাঙালীরা পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ অবস্থায় ইংরেজের আসাটা যদি না হ'ত, তবে আমরা আরও বহুকাল পিছিয়ে প'ড়ে থাকতাম। পাশ্চাত্ত্য জাতির আসা প্রয়োজন ছিল। আপনাদের কাছে কার্লমার্ক্স-এর মত উদ্ধৃত করা সমীচীন হবে না; তবু জানাচ্ছি। মার্ক্স লণ্ডন থেকে New York Daily Tribune-এ ১৮৫৩ সালে যে প্রবন্ধ লিখে পাঠান, তাতে আছে—

"Whatever may have been the crimes of England, she was the unconscious tool of history in bringing about the revolution."

আমি বললাম—"বঙ্কিম এই unconscious tool -এর কথাই কাব্যময় প্রতীকময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি ইংরেজের স্তাবকতা করেন নি।" বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সোবিয়েত লেখক ও পাঠকদের কৌতূহল বহুকালের। আজ থেকে ৮০।৯০ বৎসরের কথা; বঙ্কিমচন্দ্র তখনও জীবিত। সেই সময়ে রুশ পণ্ডিত মিনায়েফ বাংলা দেশে আসেন (১৮৭০ ও ১৮৮০ সালে)। তখন তিনি বঙ্কিমের বইগুলি কিনে নিয়ে যান। সেগুলি এখনো লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পড়াশুনা ও তর্জমা সুরু হয় সোবিয়েত শাসন প্রবর্তিত হবার পর। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তুবিয়ানস্কি—যার কথায় আবার আমরা আসব—'বন্দেমাতরম্' গান রুশীভাষায় অনুবাদ করেন ১৯২৩ সালে। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস যা রুশভাষায় অনূদিত হয়, তা হচ্ছে 'চন্দ্রশেখর' (১৯২৮)।...শ্রীমতী নোবিকোভা মহাযুদ্ধের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যুদ্ধ এসে যাওয়াতে সব উলট-পালট হয়ে যায়। তাঁর থীসিস শেষ হ'ল ১৯৫৩ সালে। বঙ্কিমের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত নিয়ে থীসিস লিখেছেন পেয়েভিস্কায়া। নোবিকোভার থীসিসের নাম বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন পত্রিকা। সোবিয়েত দেশে প্রকাশিত 'উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্য' সংকলন গ্রন্থ মধ্যে আনন্দমঠ, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী থেকে অংশ নির্বাচিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে সোবিয়েত রাষ্ট্রীয় অনুবাদ-বিভাগ বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস অনুবাদে মন দিলেন; রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাধারাণীর

তর্জমা বের হয়ে গেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' অনুবাদ করছেন বরিস কারপুশকিন; সে কথায় আমরা পরে আসব। (তথ্যগুলি নোবিকোভা লিখিত প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৫৭, এপ্রিল।)

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রুশীদের যেমন কৌতূহল, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ অনেক বেশি। তাই রুশভাষায় রবীন্দ্রচর্চার কথাটা এখানে বললে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, সোবিয়েত আমলেই রবীন্দ্রনাথের রচনার তর্জমা হচ্ছে। নোবেল প্রাইজ পাবার পর কবির খ্যাতি সর্বদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৩ সালে প্রথম মহাযুদ্ধেরও পূর্বে, জার-এর শাসনকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রুশীভাষায় অনূদিত হয়। গীতাঞ্জলি, 'গার্ডনার,' 'ক্রেসেণ্টমুন,' চিত্রা, 'দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার', 'দি পোস্ট অফিস', 'গ্লিম্প্ সেস্ অব বেঙ্গল লাইফ' প্রভৃতির। আমার কাছে ১৯১৭ সালের 'সাধনার' রুশ অনুবাদ আছে। এবার মস্কো থেকে ফেরার সময় দানিয়েল চুক্‌সেটি আমায় উপহার দিলেন স্বহস্তে বাংলায় লিখে। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৯১৩ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নানা বইয়ের প্রায় ৫০টা সংস্করণ হয়ে যায়; এর মধ্যে গীতাঞ্জলির ১১টা, গার্ডনারের ১০টা সংস্করণ। কবির গ্রন্থাবলীর দুইটা সংস্করণ দুটো কোম্পানী প্রকাশ করে— 'সোব্রেমেনিজা প্রবলেমি' নামে প্রকাশনী কোম্পানী ৬ খণ্ডে (১৯১৪-১৬), ও 'পোত্‌র্গালবো' প্রকাশনী ১০ খণ্ডে। বলা বাহুল্য এ সব ইংরেজী থেকে অনূদিত হয়।

রুশীদের মধ্যে লেনিনগ্রাদ স্টেট য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক তুবিয়ানস্কি (Tubianski) প্রথম বাংলা শিখে মূল বাংলা থেকে কবির জীবনস্মৃতি ও কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতা অনুবাদ করেন। এঁর বাংলা ছন্দজ্ঞান ভালই ছিল; এবং তাঁর অনুবাদে তিনি সেই ছন্দের ধ্বনি রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে কবির রচনার সমালোচনা ও মূল্যায়ন আরম্ভ হয় যুগপৎ। আনাটোলি-ভিলুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩) সোবিয়েত রুশের নামকরা কম্যুনিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ্; তিনি 'ক্রাসনিয়া নিবা' পত্রিকায় (১৯২৩) 'ভারতীয় তোলস্তয়' নামে প্রবন্ধে গান্ধী ও তোলস্তয়ের তুলনা করেন; সেই প্রবন্ধে তিনি লেখেন—

"The works of R. Tagore are so full of colours, of finest feelings and generosity that they truly belong to the treasures of the world culture." Serge Oldenburg (১৮৬৩-১৯৩৪) নামে আরেকজন নামকরা পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের বহু প্রশংসা করেছেন; তাঁর গোরা ও ঘরে বাইরে বিশেষভাবে ভাল লাগে। 'গোরা' ইংরেজী থেকে রুশী ভাষায় প্রথম অনূদিত হয় ১৯২৪ সালে। ই. কে. পিমেনোভই অনুবাদ করেন। ১৯৫৬ সালে মূল থেকে অনুবাদ করেন ই. আলেকনোবই, বরিস কারপুশকিন, ই. স্মিরনোবই; সম্পাদনা করেন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নোবিকোভা।

লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে সোবিয়েতের বিশ বৎসরের ইতিহাসে স্তালিনের উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্ব। এই সময়ের মধ্যে ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে পনের দিনের জন্য কবি মস্কোতে আসেন; সে ইতিহাস সুপরিচিত। 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' নামে যে বই কবির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সেটা পড়লে জানা যায়, কবির প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা এদের।

১৯৫৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব বই রুশী ভাষায় তর্জমা হয়েছিল, তার অধিকাংশই ইংরেজী থেকে নেওয়া; একমাত্র তুরিয়ানস্কি কিছু কবিতা ভাষান্তরিত করেন মূল বাংলা থেকে।

১৯৫৫ সালে যখন বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ ভারত সফরে আসেন, সেই সময়ে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদন মস্কো-ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দপ্তর থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত কবির বই-এর একটি তালিকা আনান; সেই তালিকাটি ১৯৫৫ নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা বিশ্বভারতী নিউজ-এ ছাপা হয়েছিল। তা'তে রুশী ভাষায় অনূদিত ৪০টি বই-এর নাম (ইংরেজী থেকে) পাই। বেইলরুশী, উজবেকী ও উকরাইনী ভাষায় এক-একখানি ক'রে বই-এর নাম পাওয়া যায়। মোট কথা, এখন পর্যন্ত মূল বাংলা শিখে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদ তেমন ক'রে সুরু হয় নি।

১৯৫৫-৫৭-র মধ্যে কবির গ্রন্থাবলী ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থাবলার প্রথম খণ্ডে ছিল— ক্রুশেনই অর্থাৎ নৌকাডুবি; দ্বিতীয় খণ্ডে গোরা; তৃতীয় খণ্ডে ঘরে বাইরে ও শেষের কবিতা; চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে গল্পগুচ্ছ; ষষ্ঠ খণ্ডে মুক্তধারা প্রভৃতি নাটক, সপ্তমে কবিতা, অষ্টম খণ্ডে জীবনস্মৃতি ও রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের সামান্য অংশ এই আটখণ্ডে প্রকাশিত হয়। কবির জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে যে খণ্ডগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, তা আরও ব্যাপক।

শুধু রুশ ভাষায় নয়, সোবিয়েতের প্রধান প্রধান

ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনেক বই-এর তর্জমা হয়েছিল—আর্মেনিয়ান, তাজিক, তুর্কোমেনী, কারাকলপাস, মোলডাবী, বস্কিরী, কজাকী ও উজবেকী। নৌকাডুবি সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস ওদের মধ্যে। তিন বৎসরে ১২টি ভাষায় নৌকাডুবির তর্জমা হয়—মুদ্রিত বই-এর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার। ঐ সময়ে নৌকাডুবির রুশী অনুবাদ বিক্রী হয় ৩ লক্ষ ১৫ হাজার কপি। লাতাবিয়ার ভাষায় কার্ল ঈগলেকৃত নৌকাডুবির ও নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ বিক্রী হয় ৮০ হাজার। এইসব সংখ্যা আমাদের কাছে কল্পনার অতীত। সোবিয়েত রুশের নানা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনূদিত বইএর সংখ্যা যে কত তা সঠিক বলতে পারছিনে, তবে তা যে বহু লক্ষ—সে বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে বলা যায়।*

হোটেলে ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে উপরে গেছি—দিল্লীতে পত্র লিখছি ছেলেকে। ফোন এল নীচ থেকে; বরিস করছেন—পায়োনিয়ার্স প্যালেসে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে—এখনি বের হ'তে হবে।

রবীন্দ্রনাথ যে পায়োনিয়ার্স প্যালেসে গিয়েছিলেন, সেটা নেই; এখন তার স্থলে সত্যই প্রাসাদ উঠেছে বটে। এই প্রাসাদ য়ুনিভার্সিটি মহলে; বিশ্ববিদ্যালয়ের বত্রিশ তলার ছাদে উঠে দেখতে পেয়েছিলাম। আজ সেখানে উপস্থিত হলাম। বরিস বা লিডিয়া—কেউই এদিকের অবস্থা জানতেন না, এখানে কখনও আসেন নি। যাই হোক্, মোটরসুদ্ধ ঢুকে পড়া গেল।

প্রবেশ করতেই বুঝলাম—এখানকার কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েছিলেন এবং আমাদের স্বাগতের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। চারটি মেয়ে আমাদের গাইড হ'ল—এরা ইংরেজী জানে—আড়ষ্টও নয়—গায়েপড়া নয়, মূক নয়, মুখরা নয়। বেশ ভাল লাগল তাদের।

বাড়ীটি নূতন; মাত্র ১লা জুন (১৯৬২) খোলা হয়েছে; ক্রুশ্চেভ উন্মোচন করেন, তাঁর নানা ছবি রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো।

এখানে ৭ থেকে ১৫ বৎসরের ছেলেমেয়ে যার যেটায় দক্ষতা বা অভিরুচি সেটা শিখতে পারে। স্কুলের পড়ার সঙ্গে এর যোগ নেই। বালক-বালিকাদের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সহায়তা করবার জন্য বিচিত্র আয়োজন রয়েছে। একে বলা যেতে পারে হবি হাউস্। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, নৃত্য, ব্যালে, ফোটোগ্রাফী, এরোপ্লেন মডেল প্রভৃতি শেখবার ব্যবস্থা দেখলাম। এ সবের পরিচালনা করবার জন্য শিক্ষিত লোক আছেন। ছেলেরা এরোপ্লেনের মডেল তৈরী করছে—প্রথমে কাগজ দিয়ে, তার পর কাঠ প্রভৃতি দিয়ে। কাগজের তৈরী মডেল আমাদের উপহার দিল ছেলেরা, আমি সযত্নে সেটা এনেছি এবং সাজিয়ে রেখেছি আমার ঘরে। ছেলেদের তোলা ফোটো টাঙানো রয়েছে—দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। একটা হলে দেখি সারি সারি টেবিল—তার উপর দাবার সরঞ্জাম; কোথাও দুজন তন্ময় হয়ে খেলছে। একটা ঘরে গেলাম; গ্যালারি কলেজের লেকচার হলের মত—তবে একটা স্টেজ আছে। ছেলেরা গ্যালারিতে ব'সে—মঞ্চ থেকে একজন বক্তৃতা করছেন। একটি ছেলে কি প্রশ্ন করল। দোভাষী বরিস বললেন—এটা দাবার ক্লাস। ছাত্রটি একজন মার্কিন দাবা ওস্তাদ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করেছে। বুঝলাম, মনোসংযোগের ও বুদ্ধির কসরৎ শিখবার জন্য দাবাকে এরা এত বড় স্থান দিয়েছে। আমাদের দেশে আগে খেলতাম কড়ি ছড়িয়ে 'গোলকধাম'; এখন খেলা 'লুডো', 'স্নেক-ল্যাডার', যে সব খেলার মধ্যে বুদ্ধির কোন প্রয়োজন হয় না—হাত সাফাইয়ে হাতেখড়ি হয়।

দাবার ঘর থেকে নাচের ঘরে গেলাম। সেখানে দলবদ্ধ (group) নৃত্য শেখানো হচ্ছে পিয়ানোর সঙ্গে। অন্য ঘরে নৃত্যের ছন্দ, পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়ানো, হাতের আঙ্গুলের মুদ্রা দিয়ে ভাব বোঝানো প্রভৃতি শেখানো হচ্ছে। আরেকটা ঘরে গেলাম—চার দিকে বড় বড় আয়না; মেয়েরা ব্যালে ও জিমনাষ্টিক নাচ অভ্যাস করছে। কসরৎ দেখবার মত। এই মেয়েরাই হয়ত একদিন বলশোই থিয়েটারে নামকরা ব্যালে নর্ত্তকী হবে। এই সব ছেলেমেয়েরা আসে বাসে, ট্রলিবাসে, মেট্রোতে; সঙ্গে মা-দিদিরা আসে। দেখলাম করিডরের বেঞ্চে মায়েরা ব'সে; তাদের পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়, তারা শ্রমিক অথবা ঐ শ্রেণীর লোক। এক জায়গায় একটা ছেলে অপেক্ষা করছে দিদির জন্য। দিদি তখন একক ব্যালের নাচ শিখছে।

আমরা এদের আন্তর্জাতিক ঘরে গেলাম। সেখানে তারা আমাকে ছবি, বই, পুতুল উপহার দিল। আমিও তাদের জন্য ভারতীয় ষ্ট্যাম্প, আমার পৌত্র-পৌত্রীদের আঁকা ছবি, তাদের 'বন্ধুপত্র' দিলাম; কিছু ভারতীয় coins-ও দিলাম। কি খুশী এই সব পেয়ে। কিন্তু এ সব তারা প্যালেসের জন্য নিল, ব্যক্তিগত নয়।

ফিরছি খেলার জায়গার পাশ দিয়ে। নানা রকম

---

* তথ্যগুলি পেয়েছি শ্রীমতী নোবিকোভার ইংরেজী লেখা থেকে। 'একতা' রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা।

খেলার সরঞ্জাম। এক জায়গায় দেখি, একটি ছোট ছেলে মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে কি বলছে—চারদিকে অন্য ধরণের পোশাকপরা অনেকগুলি ছেলে। যে ছেলেটি কথা বলছে, সে পায়োনীয়ার প্যালেসের সদস্য; আর যারা শুনছে—তারা পূর্ব জার্মেনীর পায়োনীয়ার্স—দেশ-ভ্রমণে এসেছে। সেদিন য়ুনিভার্সিটিতেও একদল বয়স্ক পূর্ব জার্মানীর অতিথিকে দেখেছিলাম।

প্রায় তিন ঘণ্টা কাটল পায়োনীয়ার্স প্যালেসে; বরিসদের বললাম—এটা না দেখলে মস্কো সফর পূর্ণাঙ্গ হ'ত না। চিরদিন ছেলেদের মধ্যে কাটিয়েছি, তাই এদের দেখলেই আমার অতীত দিনের কথা মনে হয়। শিশুরা আমাকে ভয় করে না। আমার লম্বা চুল-দাড়ি দেখে তারা কৌতুক বোধ করে, ভয় ক'রে স'রে যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে পায়োনিয়ার্স কম্যুন দেখতে যান ১৯৩০ সালে, তার থেকে এখনকার প্যালেসের অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে।

প্যালেস থেকে বের হয়ে আসছি—ওভারকোট নিচ্ছি —একটি দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে দেখা। দাড়ি দেখা যায় না ত এখন। তাই আমরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছি; তিনি আলাপ করলেন ইংরেজীতে। দেখলাম ভদ্রলোকটি রবীন্দ্র-সাহিত্য জানেন—গার্ডনার থেকে গড় গড় ক'রে খানিকটা মুখস্থ ব'লে গেলেন। ইনি যুদ্ধে ছিলেন, গালের এক অংশে ক্ষত হয় ব'লে দাড়ি রেখেছেন —লোকটির আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। কিন্তু দাঁড়িয়ে আলাপ করার সময় কোথায়? আমরা সময়ের সঙ্গে ছুটে চলেছি।

সন্ধ্যার পর সিনেমা দেখতে চলেছি। বরিস দ্বিবেদীকে আনতে গেলেন—আমরা মোটরে উঠলাম। কৃপালনী বললেন—দ্বিবেদীর শরীর ভাল নয়, তিনি আসবেন না। আমরা মোটর থামিয়ে বরিসকে উঠিয়ে নিলাম।

সিনেমা হলের কাছে গিয়ে দেখি ভীষণ ভিড়। মোটরকার অসংখ্য দাঁড়িয়ে, কোন রকমে আমাদের গাড়ি ত পার্ক করা হ'ল। কিন্তু টিকিট? বরিস গেলেন টিকিট করতে। ফিরে এলেন—পাওয়া গেল না। এবার লিডিয়া চললেন। খানিক পরে এসে বলছেন, 'নেমে এস, টিকিট পাওয়া গেছে।' আমরা একটু অবাক্ হলাম। বরিস পেলেন না আর লিডিয়া পেলেন? সুন্দর মুখের গুণ নাকি?

এত বড় সিনেমা হল দেখি নি, ২৫০০ আসন; চেয়ার-গুলি ছোট হলেও আরামের। বিরাট্ গ্যালারি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়; আবার রাস্তার সমতলে নেমে লাউঞ্জ ও রেস্তোরাঁ পাওয়া যায়। শো আরম্ভ হ'ল —গল্পটি নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময়। রুশ ধনী ঘরের এক কন্যা পুরুষ সেজে যুদ্ধে গিয়েছে। যুদ্ধের দৃশ্য, সৈন্য-দের আড্ডার দৃশ্য। মেয়েটি ঘোড়ায় চ'ড়ে চলেছে, তাদের বাড়ীর পুরাতন কসাক সেবক তার সঙ্গ নিয়েছে। পথে এক আহত সৈন্য···ফরাসী গুলীতে আহত হয়ে প'ড়ে আছে। তার কাছে সরকারী জরুরী পত্র ছিল, রুশের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। ছদ্মবেশী মেয়েটি সেটি নিয়ে চলল। ছাওনিতে গিয়ে সেনাপতি কুজিনোভকে সেটা পাঠাল। কিন্তু সে যে মেয়ে এ কথা ব'লে দেন একজন ভদ্রলোক—যিনি তাকে পূর্ব্বে চিনতেন। মেয়েটি নাছোড়বান্দা। সে সৈনিক বিভাগে থাকবেই—ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়বেই। তার আগ্রহ দেখে কুজিনোভ মত দিলেন ও তাকে বীরের পদক পাঠিয়ে দিলেন। তার প্রেমাস্পদ যে যুদ্ধে এসেছিল তাকে উদ্ধার ক'রে সে পেল।

সিনেমা শেষ হ'ল। লাউঞ্জে ব'সে আছি—মোটর গাড়ি আসে নি। ফোন ক'রে ক'রে লিডিয়া গাড়ি আনাল। গেটে মেয়ে-রক্ষী পাহারায় আছে। একটা সাধারণ লোক ঢুকতে চেষ্টা করছিল, বোধ হয় টিকিট নেই—অতর্কিতে ঢোকবার চেষ্টায় ছিল, অথবা নেশাখোর। মেয়েরা তাকে ঠেলে বের ক'রে দিল, কেন বুঝলাম না। অমরাবতীর প্রমোদালয়ে বিনা টিকিটে প্রবেশ নিষেধ—আর যার পয়সা কম সে টিকিটও কিনতে পারে না। অতএব···।

ক্রমশঃ

—০—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ দশ ॥

এবারে গিন্নীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসার পর রামকিঙ্করের আত্মপ্রত্যয় অনেকখানি বেড়েছে। হরেকৃষ্ণকে আগে সে বাঘের মত ভয় পেত। তার সামনে জবুথবু হয়ে থাকত। পারতপক্ষে তার ধারে কাছে যেত না। অমন ভয়টা শুধু তার রুক্ষ মেজাজ এবং রূঢ় ভাষার জন্যেই নয়, চাকরির জন্যেও বটে। এখন বুঝেছে, তার চাকরি যাবার নয়। অন্তত হরেকৃষ্ণের সাধ্য নেই তার চাকরি খায়।

তার ফলে চাকরি সম্বন্ধে যেমন সে নিশ্চিন্ত হয়েছে, হরেকৃষ্ণের সম্বন্ধেও তেমনি নির্ভয় হয়েছে।

তাকে গাদা বই কিনে দোকানে ফিরতে দেখে হরেকৃষ্ণ আড়চোখে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এতগুলো বই! কিনলে?

রামকিঙ্কর সহাস্যে জবাব দিলে, তাছাড়া আর কে দেবে?

—এ ত অনেক টাকার বই!

—হ্যাঁ। আটাত্তর টাকা বারো আনা।

—কি সর্বনাশ! এত টাকা পেলে কোথায়?

—তা জেনে আপনি কি করবেন?

রামকিঙ্কর বইগুলো বগলে ক'রে সটান উপরে চ'লে গেল। সে গিন্নীমার নাম নাও করতে পারত। কিন্তু সেটা ঠিক হ'ত না। এখানকার খবর নিয়মিতভাবে গিন্নীমার কাছে পৌঁছায়। গিন্নীমার নাম না করলে তাও নিশ্চয় গিন্নীমার কানে উঠত। তিনি বিরক্ত হতেন। রামকিঙ্করকে অকৃতজ্ঞ ভাবতেন।

আবার তাঁর নাম ক'রেই বা কি হ'ত? অন্তত হরেকৃষ্ণের কাছে? সে ঈর্ষায় জর্জরিত হ'ত।

সুতরাং কিছুই না ব'লে চ'লে গেল। করুক্ না হরেকৃষ্ণ যতরকম সম্ভব-অসম্ভব অনুমান।

ও চ'লে যেতে হরেকৃষ্ণ সকলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি হে।

কেউ জানে না রামকিঙ্কর কোথায় টাকা পেলে। বিস্ময় তাদেরও কম হয় নি।

বললে, কি জানি মশাই!

হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, গিন্নীমা?

—তিনি কি কথায়-কথায় টাকা দেবেন?

তাও বটে। মানুষ উদারতাবশে দয়া ক'রে একবার সাহায্য করতে পারে, দু'বার করতে পারে, কিন্তু বারে বারে করে কি? আবার তিনি যদি না হন, তাহ'লে এই কলকাতা শহরে আর কে আছে যে, এতগুলো টাকা রামকিঙ্করকে দান করতে পারে? কে চেনে এই গ্রাম্য বালককে? বিশ্বনাথের বাবা? কিন্তু বিশ্বনাথকে দেখে মনে হয় না, তার বাবা ধনী লোক।

তা হ'লে কে?

এ কৌতূহল দোকানের অন্য কর্মচারীদের মধ্যেও ছিল। নিভৃতে তারাও জিজ্ঞাসা করেছিল রামকিঙ্করকে, কিন্তু রামকিঙ্কর তাদেরও এড়িয়ে গিয়েছিল। কি দরকার গিন্নীমার নাম ক'রে? বার বার তাঁর কাছ থেকে রামকিঙ্কর মোটা মোটা টাকা পাচ্ছে শুনলে সহকর্মীরাও ঈর্ষান্বিত হ'তে পারে।

কিন্তু তারা খুশী হ'ল রামকিঙ্কর হরেকৃষ্ণকে মুখের উপর জবাব দেওয়ায়। লোকটাকে সকলে সামনে তোয়াজ করলেও মনে মনে কেউ দেখতে পারে না।

এবং সাহসেরও একটা সংক্রামকতা আছে।

রামকিঙ্করের দেখাদেখি সকলেরই একটু একটু ক'রে সাহস বাড়তে লাগল।

হরেকৃষ্ণ প্রমাদ গণলে। সে অনুভব করে তার প্রতাপ কমে আসছে। হাওয়া হঠাৎ ঘুরতে আরম্ভ করলে কেন? সামান্য দোকানের কর্মচারী। তালপাতার শীর্ণ ছায়ায় ব'সে আছে। স'রে গেলেই দারিদ্র্যের প্রখর রোদ। এবং ছায়াটুকু হরেকৃষ্ণের একটি নিশ্বাসে স'রে যেতে পারে। এই কথাই এতদিন ধ'রে সবাই জেনে আসছে। আজ হঠাৎ তার ব্যতিক্রম হ'ল কেন? কে ওদের বুকে সাহস যোগাচ্ছে?

হরেকৃষ্ণের সন্দেহ নেই, সাহস যোগাচ্ছে রামকিঙ্কর।

কিন্তু প্রতিকার কি?

হরেকৃষ্ণের মাথার মধ্যে প্যাঁচ যথেষ্টই খেলে। দোকানের কর্মচারীরা বলে, সে প্যাঁচ এমনই জটিল যে, মাথার মধ্যে একটা পেরেক ঢোকালে তা স্ক্রু হয়ে

বেরিয়ে আসবে। ওকে যে সবাই ভয় করে, তা অনেকখানি সেইজন্যে।

হরেকৃষ্ণ প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে বসল। সে বুঝেছে, গাছ উপড়াতে গেলে চারা অবস্থাতেই উপড়াতে হয়। পরে আর পারা যাবে না। রামকিঙ্কর যত ধূর্তই হোক, এখনও চারা মাত্র। দোকানে তার অপ্রতিহত প্রভাব রাখতে গেলে এখনই ওকে সরাতে হবে।

কিন্তু গিন্নীমার কাছে ওর কতখানি প্রভাব জানা নেই। সর্বাগ্রে সেটা জানা দরকার।

দীর্ঘকাল হরেকৃষ্ণ এই দোকানে কাজ করছে, বাবুর সেরেস্তার অনেকের সঙ্গেই জানা-শোনা। একদিন সুযোগমত তাদের একজনকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলে : রামকিঙ্করকে জান ?

—কে রামকিঙ্কর ?

—ওই যে আমাদের দোকানে কাজ করে একটি ছোকরা ?

—গিন্নীমা যার পড়ার খরচ দেন ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—দেখিছি এক-আধবার।

বাধা দিয়ে হরেকৃষ্ণ বললে, এক-আধবার কি হে ! খুব ঘন ঘন গিন্নীমার কাছে যায়, টাকাটা-সিকেটা ভিক্ষে ক'রে নিয়ে আসে। অনেকবার দেখেছ তাকে।

—না, না। খুব ঘন ঘন যায় না। দরকার পড়লে কচিৎ কখনও যায়।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হরেকৃষ্ণ বললে, কি বাজে কথা বল তুমি ! আমি শুনেছি, গিন্নীমা তাকে খুব স্নেহ করেন।

—গিন্নীমা ত সবাইকেই স্নেহ করেন। বিপদে পড়লে সকলেরই উপকার করেন। আমরা ত জানি। সেবারে তোমার ছেলের অসুখের সময় কম সাহায্য করেছিলেন ? তিনি সবাইকেই স্নেহ করেন।

ও, তাই ? সকলকে যেমন স্নেহ করেন তেমনি ? তার বেশি নয় ? তা হ'লে রামকিঙ্কর অত তড়পায় কেন ?

হরেকৃষ্ণ আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলে। তারাও এই রকম কথাই বললে। গিন্নীমার কাছে রামকিঙ্করকে কেউই ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে দেখে নি।

কি রকম হ'ল ব্যাপারটা ?

হরেকৃষ্ণ ভাবে। কিন্তু রামকিঙ্করের দাপটটা কিসের, কিছুতেই নির্ণয় করতে পারে না।

স্থির করলে, গিন্নীমার কাছে একদিন যেতে হবে। কিন্তু কি উপলক্ষ্যে যাওয়া যায়, ভেবে পেলে না।

এই রকম সময়ে একটা উপলক্ষ্য এসে পড়ল।

হরেকৃষ্ণের যে ছেলেটির কঠিন অসুখের সময় গিন্নীমা অর্থ সাহায্য করেছিলেন, সে এসে উপস্থিত। কোন কাজে নয়, এমনি বেড়াতে।

হরেকৃষ্ণের মনে হ'ল, একে নিয়ে গিন্নীমাকে প্রণাম করতে যাওয়া যায়। উপলক্ষ্যটা মন্দ হবে না।

একদিন সকালে হরেকৃষ্ণ তাকে নিয়ে বার হ'ল।

ঠাকুরদালানেই গিন্নীমার দেখা পাওয়া গেল। দুজনে ভক্তিভরে প্রণাম করলে।

—এস বাবা, এস।

একগাল হেসে হরেকৃষ্ণ বললে, এই দেখুন মা, সেই ছেলেটি, যাকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন।

—আমি না বাবা, ঠাকুর বাঁচিয়েছিলেন।

—ঠাকুর ত আছেনই মা। তিনি ত সবেরই মালিক, কিন্তু তিনি ত নিজে বাঁচান না। তাঁর একটা উপলক্ষ্য চাই। আপনি সেই উপলক্ষ্য। ঠাকুর ত চোখে দেখতে পাই না। কিন্তু আপনাকে পাই।

হরেকৃষ্ণ গদ্গদ ভাবে হাসলে।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি কি পড়ে ?

—ফোরে পড়ে, প্রতি বছর ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়।

—বাঃ ! বেশ ভাল ত, কি নাম তোমার ?

ছেলেটি অবাক্ হয়ে এতক্ষণ গিন্নীমার চেহারা, ঠাকুর-দালানের কারুকার্য, মেঝের সাদাকালো মার্বল পাথর পর্যবেক্ষণ করছিল।

বললে, গোপালকৃষ্ণ রায়।

—বাঃ ! বেশ নাম।

ভিতর থেকে শালপাতায় ক'রে দুজনকে প্রসাদ দিলেন।

বললেন, ব'সে ব'সে খাও বাবা, আমি আসছি।

পিতাপুত্রে অনেকক্ষণ ব'সে রইল, কিন্তু গিন্নীমা আর এলেন না, হয় ভুলে গেছেন, নয় অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

গিন্নীমার সঙ্গে দোকান সম্বন্ধে, সুবিধা হ'লে রাম-কিঙ্করের অবাধ্যতা সম্বন্ধেও আলোচনা করার ইচ্ছা হরে-কৃষ্ণের ছিল। বস্তুত এত ভক্তিভরে গিন্নীমাকে প্রণাম করতে আসার সেইটেই মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু গিন্নীমা দোকান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুললেন না। নিজের থেকে প্রসঙ্গটা তুলতে হরেকৃষ্ণেরও সঙ্কোচ হ'ল।

ফেরবার সময় মনে মনে বলতে বলতে এল, ভালই হ'ল প্রসঙ্গটা আজ উঠল না। প্রথম দিনে এ সব আলোচনা না হওয়াই সঙ্গত। আজ মুখপাতটা ত ক'রে রাখা গেল। আর একদিন এসে দেখা যাবে।

গোপালকে জিজ্ঞাসা করলে, কি রকম দেখলি রে?

এতক্ষণে গোপালের বাক্যস্ফূর্তি হ'ল, বললে, কি বাড়ী বাবা!

—কি রকম?

—সাংঘাতিক! আর কি রং!

—কিসের রে?

—ওই যে গিন্নীমা না কি বলছিলে, তার। এত বয়েস হয়েছে, কিন্তু রং যেন ফেটে পড়ছে!

তাই বটে। গিন্নীমাকে প্রথম যেদিন দেখে সেদিন হরেকৃষ্ণেরও এই কথাই মনে হয়েছিল। কি রং! তখন গিন্নীমার বয়স আরও অনেক কম ছিল, তখন তিনি বিধবাও হন নি।

আশ্চর্য হবার মতই রং।

কিন্তু, হরেকৃষ্ণের মনে হ'ল তখনকার চেয়ে এখন যেন আরও সুন্দর লাগছে, কেন কে জানে!

অবশ্য সুযোগ একদিন এল। পাঁচ-ছয় মাস পরে।

তখন হরেকৃষ্ণের অবস্থা খুব কাহিল হয়ে উঠেছে। কোন কর্মচারীই তাকে মানে না, সেও যেন কি রকম ভড়কে গেছে। ধমক দেওয়া দূরের কথা, কাউকে জোর ক'রে কিছু বলবার সাহস সংগ্রহ করতে পারে না। পারে না আরও এইজন্যে যে, তহবিলে কিছু ঘাটতি আছে। তার সন্দেহ, কর্মচারী কেউ কেউ সেটা টের পেয়েছে। ঘাঁটাঘাঁটি করলে সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়, সে ভয় আছে।

সুতরাং চুপ করেই ছিল এতদিন। নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিল, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই এমন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল যে, আর নিঃশব্দে দেখা যায় না। হয় এর একটা প্রতিকার করতে হয়, নয় চাকরি ছেড়ে দিতে হয়।

প্রতিকার এতদিন তার হাতেই ছিল, এখন হাতছাড়া হয়ে গেছে, এর জন্যে কর্তাদের কাছে দরবার করতে হবে।

কিন্তু কার কাছে?

গিন্নীমার প্রশ্রয়েই রামকিঙ্করের বাড় বেড়েছে। তাঁর কাছে গেলে ফল হবে কি না, কিংবা কতখানি ফল হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

আবার বাবু নিজে কিছুই দেখেন না। রাত্রিটা বাইরে কাটান। দিনে নিদ্রা। যে সময়টুকু জেগে থাকেন তারও বেশির ভাগ কাটে বাথরুমে। তাঁর কি দেখা পাওয়া যাবে? সুস্থভাবে তিনি কি সমস্ত অভিযোগ শুনবেন?

সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

একবার ভাবে, চুলোয় যাক্। দোকানের অদৃষ্টে যা আছে হবে। যতদিন মাইনে পাচ্ছে, থাকবে। দোকানে গণেশ উল্টালে সকলের যা হবে, তারও তাই হবে। চাকরি ত অনেকদিনই করা হ'ল, বয়স হচ্ছে। দোকান থাকলেই বা কতদিন চাকরি করবে?

মনকে এই ব'লে প্রবোধ দেয়, কিন্তু মন প্রবোধ মানে না। হিংসার দস্তুরই তাই।

একদিন সন্ধ্যায় গিন্নীমার কাছে গেল।

—কি বাবা?

—দোকান আর বুঝি রাখা যায় না মা জননী।

—কেন, কারবার ভাল চলছে না? বাজার মন্দা?

—আজ্ঞে না, বাজার মন্দা নয়। কারবারও চ'লে যাচ্ছে একরকম, কিন্তু যে রকম অবস্থা তাতে এরকম ভাবে চললে, আর বেশি দিন চলবে না।

হরেকৃষ্ণ হাতজোড় করলে, তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন।

বললে, মা জননী, দোকানে আর শৃঙ্খলা নেই, সবাই স্ব স্ব প্রধান, কেউ আমাকে মানে না।

—কেন, এতদিন ত মানছিল।

চোখের জল কোঁচার খুঁটে মুছে হরেকৃষ্ণ বললে, আজ্ঞে মা, মানছিল, এখন হাওয়া ঘুরে গেছে। দোকানের কর্মচারী কলেজে পড়ছে। আমি মুখ্যু মানুষ, কেন মানবে বলুন?

গিন্নীমা বুঝলেন, সমস্যাটা রামকিঙ্করকে নিয়ে। তাঁর সুন্দর মুখে চিন্তার ছায়া নামল।

হরেকৃষ্ণ অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, সে আপনার কাছে আসে-যায়। গরীবের ছেলে, আপনিও অনুগ্রহ করেন, সে এক কথা। কিন্তু দোকানে কাজ করব, অথচ ম্যানেজারের কথা শুনব না, অন্যদেরও কুপরামর্শ দোব, এ ত ভাল কথা নয়, মা জননী।

গিন্নীমা কি যেন ভাবছিলেন। জবাব দিলেন না।

হরেকৃষ্ণ হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠল। বললে, তাই আপনার কাছে এলাম মা জননী। অনেকদিন ত হ'ল, এবারে দয়া ক'রে আমাকে ছুটি দিন।

দোকান বহুকালের। গিন্নীমার শ্বশুরের আমলের। অনেক দিন থেকে গিন্নীমা এই দোকানের সঙ্গে জড়িত।

এই এতকালের মধ্যে কখনও কোন কর্মচারীকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিতে তিনি দেখেননি।

হরেকৃষ্ণের কথায় তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, সে কি কথা! দোকান ছেড়ে দেবে কেন?

—না দিয়ে কি করি বলুন। এইটুকু বয়সে এসেছিলাম। মনে করুন সেই কর্তার আমলে। বলতে গেলে আমরাই দোকান গ'ড়ে তুলেছি। সেই দোকান চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে, দেখতে পারি?

কান্নায় হরেকৃষ্ণ একেবারে ভেঙে পড়ল।

গিন্নীমার মন গ'লে গেল। ব্যাপারটা উপেক্ষা করবার মত নয়। বললেন, আচ্ছা, তুমি আজ যাও বাবা। কাল ছেলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় করব। দোকান উঠবে কেন? তোমরাই বা কাজ ছেড়ে চ'লে যাবে কেন?

হরেকৃষ্ণ তখনই চ'লে গেল না। ছলছল্ চোখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গিন্নীমা বললেন, ম্যানেজারকে না মানলে দোকান চলবে কি ক'রে? যার যা খুশি করলেই হ'ল? ম্যানেজারের একটা দায়িত্ব নেই? আমি কালই এর ব্যবস্থা করছি।

হরেকৃষ্ণ খুশী হয়ে দোকানে ফিরে এল। কাউকে কোন কথা সে বললে না। বাইরে থেকে কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবহারেও কোন পরিবর্তন প্রকাশ পেল না।

সে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকদিন চাকুরি করার ফলে এই শ্রেণীর ধনীদের মেজাজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে। জেনেছে, এদের মেজাজের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কোন কথাই এদের মনে থাকে না। নিজের সুখ-সুবিধা ছাড়া অন্য বিষয়ে উৎসাহও নেই। যেটুকু আছে, তাতে তখনই জোয়ার, তখনই ভাঁটা। তার উপর নির্ভর করা নিরাপদ্ নয়।

সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু বেশি অপেক্ষা করতে হ'ল না। পরের দিন সন্ধ্যার পরেই বাবু বাগানে যাওয়ার পথে দোকানে হানা দিলেন।

সকলে সন্ত্রস্ত। এমন কখনও হয় না। দোকানে বাবু খুবই কম আসেন। একবার এসেছিলেন, অনেক দিন আগে, পুরাতন ম্যানেজারকে বরখাস্ত ক'রে দেবকিঙ্করকে ম্যানেজার ক'রে যান। তার পরেও আর দু'একবার যদি এসে থাকেন, গাড়ি থেকে আর নামেন নি। হরেকৃষ্ণকে ডেকে তহবিল থেকে টাকা নিয়ে তখনই আবার গাড়ি হাঁকিয়ে চ'লে গেছেন।

কিন্তু এবারে যে একেবারে গদিতে এসে বসলেন!

মনে মনে সকলেই দুর্গানাম জপ করতে লাগল। এমন কি হরেকৃষ্ণ পর্যন্ত। তারও বুক দুরুদুরু ক'রে কাঁপছে।

অনেক দিন আগেকার কথাটা মনে পড়ল।

তখনকার ম্যানেজারের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল সে-ই। ভরসা ছিল তার বদলে হরেকৃষ্ণ ম্যানেজার হবে। ম্যানেজার বদলাল সত্যি, কিন্তু সে ম্যানেজার হ'ল না, হ'ল দেবকিঙ্কর।

সবই অদৃষ্ট।

এবারই বা তার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?

সকলের সঙ্গে সেও দুর্গানাম জপ করতে লাগল। তারও বুক কাঁপছে দুরু দুরু।

বাবু গদিতে এসে বসলেন, সবাইকে ডাকতে বললেন।

—সবাই এসেছে? -বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

হরেকৃষ্ণ উত্তর দিলে, সবাই এসেছে বাবু, শুধু রামকিঙ্কর নেই।

—কোথায় গেছে?

হরেকৃষ্ণ মাথা চুলকে বললে, কলেজে।

বাবু অবাক্: কলেজে! সেখানে কি?

—পড়ে।

—পড়ে! তা হ'লে দোকানে কাজ করে কখন?

ব্যাপার দেখে সুবলের সন্দেহ হ'ল এর মধ্যে হরেকৃষ্ণের কারসাজি আছে। ভয়ও হ'ল, কারসাজিটা কি কে জানে।

হরেকৃষ্ণ জবাব দেবার আগেই বললে, দিনে কাজ করে বাবু, রাত্রে পড়ে।

—এটা কি রকম ব্যাপার! দিনে কাজ করে, রাত্রে পড়ে!

—মা-জননী বলেছেন, দোকানে বিশৃঙ্খলা চলছে। ম্যানেজারকে কেউ মানে না, এটা ভাল নয়। সকলকে ধমক দিয়ে আসা দরকার। তার মধ্যে আবার এই এক সমস্যা। ছোকরা কলেজে পড়ে! এটা চলবে কি না মা-জননী কিছুই বলেন নি।

সুবল বললে, গিন্নীমা সাহায্য করেন বলেই পড়ে। ওর বই, কলেজের মাইনে সবই তিনি দেন।

বাবু আরও অবাক্। তাই নাকি। গিন্নীমা দেন?

সুবল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। নইলে, দোকানে কাজ করে, ক'টা টাকাই বা মাইনে পায়, ওর কি পড়া হ'ত?

এ আর এক ঝামেলা। এ সম্বন্ধে মা-জননী তাঁকে কিছুই বলেন নি। ওদিকে বাগানে যেতে দেরি

হচ্ছে। সবাই এসে গেছে এবং তাঁর অপেক্ষায় ব'সে আছে।

চুলোয় যাক্ কলেজ। যেজন্যে এসেছেন সেই সেরে বাগানে যেতে পারলে ভদ্রলোক বেঁচে যান।

বললেন, দেখ, দোকানে বিশৃঙ্খলা চলছে। কাজ ভাল চলছে না, এ সব ত চলবে না।

সকলের চক্ষু স্থির! কি বিশৃঙ্খলা চলছে, কোথায় কাজ ভাল চলছে না, তার কিছুই তারা জানে না। কাঠের মত শক্ত হয়ে তারা নিঃশব্দে বাবুর অভিযোগ শুনে যেতে লাগল।

বাবু ব'লে চললেন, এ সব কিছুতেই চলবে না। দোকানে ম্যানেজার আছেন। তার কথা সবাইকে মেনে চলতে হবে। যার অসুবিধে হবে সে চ'লে যেতে পারে। এই আমি হুকুম দিয়ে গেলাম।

ম্যানেজারের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার ওরকম নরম হ'লে চলবে না, শক্ত হতে হবে। যে কথা শুনবে না, কাজ করবে না, আমার কাছে রিপোর্ট করবে। আমি দেখে নেব।

বাবু ঘড়ি দেখলেন, আর দেরি করা যায় না, উঠে গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

কর্মচারীদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে মিনিটখানেক গেল।

তার পরে সুবল জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার ম্যানেজারবাবু?

হরেকৃষ্ণের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল, হাত উলটে বললে, কি ক'রে জানব? তোমরাও যেখানে, আমিও সেখানে।

॥ এগারো ॥

রামকিঙ্করের মনটা খুব খারাপ।

সকাল থেকে বকুনি সুরু হয়। কলেজ যাওয়ার আগে পর্যন্ত চলে। তার কলেজে পড়াটা যে কিছুই নয়, আসলে সে তেলের পিপে গড়াবার কুলী,—এইটে প্রমাণ করবার জন্যে হরেকৃষ্ণ উঠে-পড়ে লেগেছে। নাকের ডগা পর্যন্ত ঝুলে-পড়া নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে সব সময় সে লক্ষ্য করছে, রামকিঙ্কর কোথায়, কি করছে। ভ্রূ সকল সময়ই কুঁচকে রয়েছে।

হাতে কাজ না থাকলে আগে রামকিঙ্কর শিক-দেওয়া বারান্দায় ব'সে ব'সে রাস্তার জনপ্রবাহ দেখত। সে পাঠ একেবারেই চুকে গেছে।

—ওখানে বারান্দায় কে ব'সে?

—আজ্ঞে, আমি রাম।

—ওখানে ব'সে কেন? হাতে কাজ নেই?

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

কুটিল হাস্যে পাশের কর্মচারীটির দিকে চেয়ে হরেকৃষ্ণ বললে, বয়েসটা খারাপ যে। ওখানে ব'সে মেয়েছেলে দেখছে!

রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, পিওর অয়েল মিল থেকে দশ পিপে তেল আসবার কথা ছিল, এসেছে?

—না।

—আসে নি কেন খবর নিতে হবে ত? না, বারান্দায় ব'সে মেয়েছেলে দেখলেই দোকান চলবে?

—কাল গিয়েছিলাম। বলেছে আজ পাঠাবে।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হরেকৃষ্ণ বললে, বললে আর তুমি চ'লে এলে? ফের যাও। তেল সঙ্গে ক'রে নিয়ে ফিরবে। ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই।

শার্টটা গায়ে দিয়ে রামকিঙ্করকে বেরুতে হ'ল মিল এখানে নয়, বেলেঘাটায়। দোকান থেকে ট্রামের ভাড়াও দেওয়া হবে না। হেঁটে যাওয়া হেঁটে আসা মহিষের গাড়ির পিছু পিছু। হরেকৃষ্ণ ব'লে দিয়েছে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবার জন্যে। আগে এলেও চলবে না, পরে এলেও না।

দশটায় বেরুল, ফিরল তখন বেলা দুটো।

সকালে একখানা বাতাসা মুখে ফেলে এক গ্লাস জল খেয়েছিল। তাছাড়া আর পেটে দানাটি পড়ে নি।

কিন্তু ক্ষুধার জন্যে নয়। রোদের জন্যেও নয়। সব চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক অপমানটা। তেল আনবার জন্যে মিলে যাওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। কখনও যাবার দরকারও হয় না। এবারে একটু দেরি হয়েছে হয়ত, নইলে সাধারণত মিল নির্দিষ্ট সময়েই তেল পাঠিয়ে দেয়। বার বার তাগাদার দরকার হয় না। রামকিঙ্করকে কষ্ট দেবার জন্যে, শুধু তাকে অপমান করবার জন্যেই যে এই হুকুম তাতে রামকিঙ্করের সন্দেহ নেই।

তার মুখ রোদে লাল, ক্ষুধায় শুকনো। কিন্তু অপমানের হাজার বিছা যে তার বুকের ভিতর কামড়াচ্ছে, ভাল ক'রে তার আরক্ত জলন্ত চোখের দিকে চেয়ে না থাকলে বোঝা যায় না।

হরেকৃষ্ণ তখন তার উপরের শয়নকক্ষে সুখসুপ্ত। নিদ্রার পূর্বে গড়গড়ার নলটি হাতে ধরা ছিল, সেটি স্খলিত। তার নাসিকা-গর্জনের শব্দ নিচে থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

গদিতে কয়েকজন তন্দ্রাচ্ছন্ন। ওদিকের বেঞ্চে একজন।

ডাকলেই তাদের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু রামকিঙ্কর আর তাদের বিরক্ত করলে না। কুলীরা গড়িয়ে গড়িয়ে পিপেগুলো গুদামে পুরলে। রামকিঙ্কর চালান সই করে, তাদের বিদায় দিয়ে স্নান করতে গেল।

ঠাকুর তার আসা টের পেয়ে উপর থেকে বললে, আপনার ভাত রান্নাঘরে ঢাকা আছে।

রামকিঙ্কর সাড়া দিলে না।

রোদে তার দেহ এবং ক্রোধে তার মন জ্বালা করছিল। স্নান ক'রে দেহের জ্বালার উপশম হ'ল, কিন্তু মনের জ্বালা তেমনি রইল। বাজার থেকে কিছু খাবার আনিয়ে খেয়ে সে গদিতেই গা গড়াল।

একটু পরেই হরেকৃষ্ণ নেমে এল।

বাবুর সেদিনের অভ্যাগমের পরে কর্মচারীদের সকলেই রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হরেকৃষ্ণ দোকানে আসতেই সকলে উঠে বসল।

হরেকৃষ্ণ তার নিজের জায়গাটিতে ব'সে সকলের দিকে একবার চেয়ে নিলে। রামকিঙ্করের দিকেও।

জিজ্ঞাসা করলে, তেল এসেছে?

রামকিঙ্কর ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

হরেকৃষ্ণের বুঝতে বাকি রইল না রামকিঙ্কর ক্লান্ত, অবসন্ন এবং বিরক্ত। বুঝে তার মনটা খুশিই হ'ল।

খুশির সঙ্গে বললে, গেলে তাই পেলে। না গেলে কবে আসত তার ঠিক আছে? ঘরে ব'সে দোকান চলে না, বুঝলে?

ব'লে তেল আনার সমস্ত কৃতিত্বটা আত্মসাৎ ক'রে হরেকৃষ্ণ হাসতে লাগল।

হাসি যেন বিষের ছুরি। সইতে না পেরে রামকিঙ্কর স'রে যাচ্ছিল। চশমার ফাঁক দিয়ে হরেকৃষ্ণ দেখলে। কিছু বললে না। হাত-বাক্সটা খুলে কি যেন খুঁজতে লাগল।

খুঁজতে খুঁজতে যেন আপনমনেই বলতে লাগল: বিলেত বাকি হু'লাখ টাকার ওপর। কি ক'রে যে দোকান চলবে সেই এক চিন্তা। ঘর থেকে পয়সা দিয়ে ত আর মালিক দোকান চালাবে না? বিল আদায় ক'রেই চালাতে হবে।

ব'লে চারিদিকে চেয়ে দেখলে রামকিঙ্কর নেই।

আপন মনেই হাসলে: সময় বুঝে স'রে পড়েছে! খুব চালাক ছোকরা, ডাক ত হে রামবাবুকে একবার।

রামকিঙ্কর এল।

তার দিকে না চেয়েই হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল, একবার বরানগরে যাও, অনেক টাকা বাকি পড়েছে, দেখ কি আদায় করতে পার।

রামকিঙ্কর ঘড়ির দিকে চাইলে, পাঁচটা বাজতে দশ।

বললে, ছটায় আমার কলেজ।

একগাল হেসে হরেকৃষ্ণ বললে, তা বললে ত চলবে না বাপু, মাইনে নাও দোকানের কাজ করবার জন্যে, আগে দোকান, তার পরে কলেজ। দোকান থাকলে তবে ত কলেজ যাবে, ওখানে একবার যেতেই হবে।

রামকিঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে হরেকৃষ্ণ আবার বললে, এই দোকান হ'ল আমাদের ভাত-ঘর। দোকান থাকলে তবে ভাত, তবে ঘর, তার পরে পড়া, আর দেরি ক'রো না, বেরিয়ে পড়।

রামকিঙ্করের মেঘাবৃত মুখের উপর হরেকৃষ্ণের কুটিল, বঙ্কিম হাসি বিদ্যুতের মত খেলে গেল।

বরাহনগরে তাগাদায় চলতে চলতে রামকিঙ্করের মনে হ'ল গিন্নীমার কথা শুনে তখন অফিসের চাকরিটা না নেওয়া বোকামি হয়েছে, গিন্নীমা মন্দ কথা বলেন নি। তাকে যদি পড়াশোনা চালাতে হয় তা হ'লে, হিসাব করে দেখা গেছে, দোকানের চাকরিটাই লাভজনক, তার নিজের হিসাব মতও বটে, হিতৈষীদের হিসাব মতও বটে, বিশ্বনাথের বাপের মত প্রবীণ বুদ্ধিমান্ লোকও দোকানের কাজ ছেড়ে অফিসে না যাওয়ার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন।

কিন্তু উলটা বুঝলি রাম।

এখন দোকানের চাকরিই পড়াশোনার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিঘ্ন হয়ে উঠেছে। এবং যতদিন হরেকৃষ্ণ ম্যানেজার থাকবে ততদিন এই রকমই চলবে। ঠিক কলেজ যাওয়ার মুখে একটা-না-একটা কাজের ফরমাস, অদূর ভবিষ্যতে হরেকৃষ্ণের যাবারও কোন সম্ভাবনা নেই।

গিন্নীমার কাছে সকল কথা জানান চলে। রামকিঙ্করের পড়াশোনার জন্যে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন, হয়ত তার আবেদন শুনলে তিনি প্রতিকারও করবেন, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে দরবার করতে রামকিঙ্করের লজ্জা করে, মানুষের কাছ থেকে অনুগ্রহ নেবারও একটা সীমা আছে।

বিশেষ, সেদিনে দোকানে এসে বাবু যে কথাগুলো ব'লে গেলেন সকলেরই তা কি রকম বাঁকা-বাঁকা ঠেকেছে। মনে হয়েছে, ওই কথার পিছনে আরও কিছু আছে। একটা অজ্ঞাত, গূঢ় চক্রান্ত, সেটা পাকিয়েছে হরেকৃষ্ণ

ছাড়া আর কেউ নয়। ছেলেকে নিয়ে সে যে গিন্নীমার কাছে গিয়েছিল তা সবাই জান্‌তে পেরেছে।

কিন্তু সেই চক্রান্ত কত গভীর এবং কত শক্তিমান্ তা কেউ জানে না, ভয়টা সেই জন্যে।

রামকিঙ্করের এমনও সন্দেহ হয়, গিন্নীমার কাছে গেলে প্রতিকার নাও হ'তে পারে।

বরাহনগর থেকে তাগাদা সেরে সে বিশ্বনাথের বাড়ী গেল। বন্ধু বলতে বিশ্বনাথ, আত্মীয় বলতে তার বাপ-মা।

বিশ্বনাথ পড়া করছিল।

রামকিঙ্করকে দেখে চম্‌কে উঠল, কলেজ যাও নি? তোমার মুখ অমন শুকনো কেন?

—কলেজ যাই নি। রামকিঙ্কর পাশের চেয়ারটা টেনে বসল।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি, কলেজ যাওনি কেন? শরীর খারাপ?

—না, শরীর ভালই আছে।

—তবে?

রামকিঙ্কর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে, বললে, অফিসের চাকরিটা না নিয়ে ভালো করি নি বিশু।

বিশ্বনাথ অবাক্! কেন? কি হ'ল?

—ওখানে থেকে পড়া হবে ব'লে মনে হচ্ছে না, কলেজ যাবার মুখেই একটা-না-একটা ফরমাস আসছে, আজ বরাহনগর গিয়েছিলাম।

—হেঁটে?

রামকিঙ্কর হাসলে না। এ বেলাটা বাসে, কিন্তু দুপুরে যেতে হয়েছিল বেলেঘাটায়, যাবার সময় খানিকটা ট্রামে, খানিকটা হেঁটে, কিন্তু আসবার সময় সমস্তটাই হেঁটে, মোষের গাড়ির পাশে পাশে। দুপুরে খাওয়াই হয় নি।

নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টিতে বিশ্বনাথ ওর দিকে চেয়ে রইল।

বললে, কিন্তু এখনই ত ছেড়ে দিতেও পার না।

—না।

—দেখি বাবাকে ব'লে, বিশ্বনাথ চিন্তিতভাবে বললে।

অর্থাৎ বাবাকে বললেই যে সঙ্গে সঙ্গে কোন একটা অফিসে চাকরি মিলে যাবে তা নয়। চাকরি দুর্লভ বস্তু, তিনি চেষ্টায় থাকবেন, পাঁচজনকে ব'লে রাখবেন, খবর পেলে রামকিঙ্করকে জানাবেন, এই পর্যন্ত।

শুনে সুলোচনা বললেন, আমি তোকে বলি নি রাম, দোকানের চাকরি ঐ রকমই। সবাই বললে, দোকানের চাকরি না ছাড়াই ভালো, শুনে চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু মন আমার খুশী হয় নি।

সে কথাও সত্যি, কিন্তু অতীতের জন্যে অনুশোচনা নিরর্থক। বিশ্বনাথ এবং রামকিঙ্কর দু'জনেই চুপ ক'রে রইল।

দোকানে ফিরে আসতে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, কি হ'ল? টাকা দিলে?

রামকিঙ্কর বিরক্তভাবে বললে, দেবে কি? আজ ত ওদের টাকা দেবার দিন নয়। আমাকে দেখে ওরা অবাক্!

মাথা নিচু ক'রে হরেকৃষ্ণ হাসলে। সে জানে, আজ টাকা দেবার দিন নয়। জেনেই পাঠিয়েছে।

বললে, তাই নাকি? তা হবে। কিন্তু কি জান, দু'দশ দিন আগে একবার তাগাদা দেওয়া ভাল। দুনিয়ায় টাকা কি কেউ সহজে বার করতে চায় হে! আগে একটা তাগাদা দিলে নির্দিষ্ট দিনে টাকাটা পাওয়া যেতে পারে।

—কিন্তু খামোকা কলেজ কামাই, হয়রানি, কষ্ট ভোগ ত হল।

—আরে ও কথা বললে কি চলে? ওই জন্যেই ত আমাদের মাইনে দিয়ে রেখেছে।

হরেকৃষ্ণ রসিয়ে রসিয়ে হাসতে লাগল। দেখে রামকিঙ্করের পিত্ত জ্বলে গেল। সে বিরক্তভাবে উপরে চ'লে গেল। উৎফুল্ল মুখে হরেকৃষ্ণ চোখের চশমাটা ঠিক ক'রে নিয়ে হিসাবের খাতায় মন দিলে।

সুবল উপরে ছিল।

রামকিঙ্করকে দেখে ফিক্ ক'রে হেসে বললে, এর মধ্যে তাগাদা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। আজ এই পর্যন্ত।

—কি রকম তাগাদা হে! আমি ভেবেছিলাম, রাত বারোটায় ফিরবে। রাত্রেও খাবে না।

—সেই রকমই ব্যাপার।

রামকিঙ্কর শার্টটা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিলে। বললে, দিনে চানটা সুবিধে হয় নি। ভালো ক'রে চানটা করতে হবে। চৌবাচ্চায় জল আছে, না নেই?

সুবল বললে, আমরা ত জানতাম না তুমি চান করবে। জানলে শেষ ক'রে দিতাম।

—তা বিশ্বাস নেই।

স্নানান্তে রামকিঙ্কর একটু সুস্থ হল।

সুবল বললে, তোমাকে ও পড়তে দেবে না হে, এই

আমি ব'লে দিলাম। ঠিক কলেজের মুখে কাল তোমাকে মেটেবুরুজ পাঠাবে।

রামকিঙ্কর বললে, তা কি আমি বুঝতে পারছি না? কিন্তু কি জান, আমার অদৃষ্টে যদি বিদ্যে থাকে, কেউ কিছু করতে পারবে না। বিদ্যে না থাকলে, ও উপলক্ষ্য মাত্র।

সুবল বললে, কিন্তু নিত্যি যদি তোমাকে কলেজের সময় বাইরে তাগাদায় পাঠায়, এক মিনিট যদি বই খোলবার সময় না পাও, কি করে বিদ্যে হবে শুনি?

—তা জানি না। কিন্তু হবে। আমি যে ম্যাট্রিক পাশ করব স্বপ্নেও ভাবি নি। করলাম ত। এইখান থেকেই। তেমনি করেই আই. এ, বি. এ. পাস করব যদি অদৃষ্টে থাকে।

ব'লে নিশ্চিন্ত চিত্তে রামকিঙ্কর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সুবল বললে, হলেই ভালো। কিন্তু অদৃষ্ট তো কেউ দেখতে পায় না। যা চোখে দেখছি তা ভালো নয়। ও তোমার পিছনে আড়ে-হাতে লেগেছে।

সে ত রামকিঙ্করও দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু করা যায় কি? সে চুপ ক'রে রইল।

সুবল বললে, আমি যদি তোমার মত একটা-পাস করা হতাম, কবে হরেকেষ্টর নাকে একটা ঘুঁষি মেরে চ'লে যেতাম।

—কোথায়?

—পাশ-করা ছেলের আবার যাবার ভাবনা! যে-কোন একটা আপিসে কাজ খুঁজে নিতাম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামকিঙ্কর বললে, অত সহজ নয় হে বন্ধু, অত সহজ নয়। তবে কথাটা যখন তুললে তখন বলি, এখানে যে আর সুবিধে হবে না তা বুঝেছি।

আর একটু পরে বললে, চাকরি রাস্তায় প'ড়ে নেই। তবে চেষ্টা করতে হবে বই কি। কিন্তু হবে না।

—কেন?

—লক্ষ্মী বার বার আসে না। একবার হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি। আর কি আসবে? মনে হয় না।

সে চাকরিটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়ার ইতিহাস সুবল কিছু কিছু জানে। বললে, তুমি বিশ্বনাথের বাবাকে আর একবার ধর। নিশ্চয় হবে।

—সেইখান থেকেই ত আসছি।

—কি বললেন তিনি?

—তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। যাকগে, ওসব কথা ছেড়ে দাও। সারাদিন আজ যা ঘুরেছি, হাত-পা টাটাচ্ছে। রান্না হতেও দেরি আছে। ততক্ষণ একটু ঘুমুই বরং। কি বল?

—তাই ঘুমোও।

সুবল ওকে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোবার অবকাশ দেবার জন্যে আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রামকিঙ্করকে সুবল হিংসা করত। করবার কারণও রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ওকে করুণা করছে। বেচারার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চলছে। অল্পবিস্তর সকলেরই উপর; কিন্তু ওর উপর যেন বিশেষ ক'রে এবং বেশি ক'রে। গিন্নীমার অনুগ্রহে এবং দোকানের চাকরিটা ক'রে কোনমতে রামকিঙ্কর যে পড়াশোনা চালাচ্ছে, এটা হরেকৃষ্ণ সইতে পারছে না। সেজন্যে রামকিঙ্করের উপর শুধু সুবলই নয় কম-বেশি সকলেরই মনে সহানুভূতি জেগেছে।

[ক্রমশঃ]

—•—

৮

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

বৈদেশিক সাহায্য ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর সুরু হবার সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাণ নিয়ে নতুন ক'রে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। আর প্রায় প্রতি দিনই কাগজে আমরা দেখছি যে আমাদের মন্ত্রীরা বিদেশে গিয়ে আরো অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ করছেন।

১৯৫০-৫১-তে আমাদের জাতীয় আয় ছিল ১০২৪০ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১-তে দাঁড়িয়েছে ১৪৫০০ কোটি টাকা, ১৯৬৫-৬৬-র শেষে এই অঙ্ক তুলতে হবে ১৯০০০ কোটি টাকায়। আমাদের নিজস্ব আয় থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন সঞ্চয় ও নিয়োগ করা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে বিদেশী অর্থ সাহায্য নেওয়া অনিবার্য এবং আমাদের গৃহীত পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে সাময়িক যে ঘাট্‌তি হয়েছে তার জন্য বহু সমালোচনা হচ্ছে; এক দলের মতে রপ্তানী-বাণিজ্যে অগ্রিম হিসাব করা সম্ভব না হ'লেও আমদানীর ক্ষেত্রে আরো বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া যেত। এ যুক্তি খণ্ডন করা কঠিন। তবে এ ধরণের কিছু ভুল-ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী, আর অদূর-ভবিষ্যতে আমাদের দেশের আর্থিক কাঠামোকে আরো শক্ত বুনিয়াদের ওপর দাঁড় করাতে হ'লে যে এমন কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করা দরকার, এ কথাও ত আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিশ্র অর্থনীতির সাহায্যে আমরা দেশ পুনর্গঠনের যে কঠিন দায়িত্ব নিয়েছি, তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে লোকের উদ্বৃত্ত আয় বিভিন্ন উপায়ে সরকারী তহবিলে টেনে নেবার এবং আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর ভাবে চালু করার জন্য এ বছরের বাজেট তৈরীর সময়ে সরকার অনেক নতুন এবং আপাতঃভাবে কষ্টকর নিয়মাবলী প্রবর্তন করেছেন। ইতিমধ্যে আমাদের খাদ্য-সমস্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন না হবার জন্য এখনো আমাদের বিদেশ থেকে গম, চাল আমদানী করতে হচ্ছে; অপর দিকে, ইউ-রোপের শক্তিশালী দেশগুলি একজোট হয়ে বাণিজ্য সুরু করাতে এবং অন্যান্য "অনুন্নত" দেশগুলিও তাদের সামর্থ্যমত উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ সুরু করাতে আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্যের নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

গত দশ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ফলে ইতিমধ্যে আমাদের শিল্পপ্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে; দেশের "reproducible tangible wealth" ১৯৪৯-৫০-এ ছিল ১৭০৮৬ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১তে হয়েছে ৩২১৬৪ কোটি টাকা। অধিকন্তু যে সব সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কাজ চলছে সে-গুলিও অচিরে ফলপ্রসূ হবে; ফলে, এখন যদিও আমরা রপ্তানী-বাণিজ্যে তত সুবিধা করতে পারছি না এবং ইতিমধ্যে বিদেশী ঋণ পরিশোধের সময়ও এসে গেছে, তবু আমরা আশা করছি যে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ আমরা বছরে ১৩০০/ ১৪০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করতে পারব। আপাততঃ একদিকে যেমন আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে তেমনি সেই সঙ্গে রপ্তানী বাড়ানোর শ্রেষ্ঠ উপায় কি, তাই নিয়ে চেষ্টা ও গবেষণা চলেছে। আমদানী কমিয়েই হোক আর রপ্তানী বাড়িয়েই হোক, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাট্‌তি কমাতেই হবে। একদলের মতে আমাদের জোর দেওয়া উচিত এমন জিনিষ উৎপাদনে, যেগুলি বিদেশে রপ্তানী করা চলবে; অপর একদল বলেন, আমাদের দরকার, যে-সব পণ্য আমাদের আমদানী করতে হচ্ছে সেগুলি যাতে দেশের মধ্যে তৈরী করতে পারি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে আমরা যেখানে মোট ৬৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরেছিলাম, তৃতীয় পরিকল্পনায় সেক্ষেত্রে মোট ১০,৪০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরেছি,

আর হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, মোট ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হবে।(১)

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর্বে আমাদের হাতে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় কিছু ছিল, তৃতীয় পরিকল্পনা পর্বে সে অঙ্ক প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা পর্বে আমরা রপ্তানী করব ৩৭০০ কোটি টাকার আর আমদানী করব ৫৭৫০ কোটি টাকার ; এর উপর বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য লাগবে ৫৫০ কোটি টাকা। এই সূত্রে নিম্নলিখিত তথ্য অনুধাবনযোগ্য :

	দ্বিতীয় পরিকল্পনাপর্ব	তৃতীয় পরিকল্পনাপর্ব
	(কোটি টাকা)	
১। পণ্য রপ্তানী	৩০৫৩	৩৭০০
২। সরকারী দান বাদে অন্যান্য "অদৃশ্য" (Ivisiblos) আয় (ভ্রমণ, সুদ, জাহাজ ভাড়া, ইনসিওরেন্স)	৪২০	——
৩। মূলধন পরিশোধ (Capital transactions)	(—) ১৭২	(—) ৫৫০
৪। মোট বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গতি	৩৩০১	৩১৫০
৫। আমদানী :		
(ক) যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	... ...	১৯০০
(খ) শিল্পোৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইত্যাদি	... ৪৮২৬	২০০
(গ) অন্যান্য আমদানী	... ...	৩৬৫০
৬। মোট আমদানী (PL 480 বাদে)	৪৮২৬	৫৭৫০
৭। মোট ঘাটতি	(—) ১৫২৫	(—) ২৬০০
৮। বৈদেশিক সাহায্য (আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থার সাহায্যসহ ; কিন্তু PL 480 বাদে)	৯২৭	২৬০০
৯। সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার থেকে নিতে হচ্ছে	৫৯৮	——

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে আমরা স্বল্পতর বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গতি নিয়ে সুরু করছি এবং আগের পর্বের তুলনায় আরো প্রায় ১০০০ কোটি টাকার বেশি আমদানী করতে মনস্থ করেছি। যদি এই পাঁচবছরের শেষে রপ্তানী-বাণিজ্যের পথ আরো সঙ্কীর্ণ না হয়ে যায় তা হ'লে আমরা আশা করতে পারি যে এখন যত টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী করছি তাই দিয়ে পরে রপ্তানী-বাণিজ্য বহুপরিমাণে বাড়াতে পারব।

আমদানী-রপ্তানীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয় আলোচনার পূর্বে আমাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ নিয়ে কিছু তথ্যাদি একত্রিত করতে হয়।

আমাদের আমন্ত্রণে গত দশ বারো বছরে বিদেশী মূলধন আসার সঙ্গে সঙ্গে(২), বিদেশে লভ্যাংশ পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের বেড়েছে(৩), অপর দিকে বৈদেশিক

---

(১) দ্বিতীয় পরিকল্পনাপর্বে আমরা মোট ৯২৭ কোটি টাকার বৈদেশিক অর্থসাহায্য ব্যবহার করি ; আর বিদেশে সঞ্চিত মুদ্রা যা ছিল তার মধ্যে ৫৯৮ কোটি টাকা কাজে লাগাই, অর্থাৎ মোট ১৫২৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করি। এ ছাড়া আমেরিকার PL. 4030 খাতে আরো সাহায্য পাই। হালের অপর একটি হিসাবে আমরা দেখছি যে, বৈদেশিক মুদ্রাতেই পরিশোধ করতে হবে এরকম যে ঋণ ঐ সময়ের মধ্যে ব্যবহার করি, তার মোট অঙ্ক হচ্ছে ৭২৯ কোটি টাকা ; দেশীয় মুদ্রায় বা টাকায় পরিশোধ করতে হবে এরকম ঋণের পরিমাণ ১১৯ কোটি টাকা ; যুক্তরাষ্ট্রের PL 480 হিসাবে দান ছাড়া অন্যান্য দানের পরিমাণ ২৩০ কোটি টাকা ; আর যুক্তরাষ্ট্রের 480 হিসাবে দানের বা সাহায্যের পরিমাণ ৫৫০ কোটি টাকা।

(২) ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৮-৫৯-এর মধ্যে মোট ১০৩৪ কোটি টাকার বিদেশী মূলধন এসেছে (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, আগষ্ট ১৯৬১)। বেসরকারী মহলে (Private Sector) মোট বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ১৯৪৮-এ ছিল ২৫৬ কোটি টাকা, আর ১৯৬০-এ ৬৯০ কোটি টাকা, (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন অক্টোবর ১৯৬২)। সরকারী খাতে (Official Sector) ১৯৫৬-র শেষে বিদেশী মূলধনের অঙ্ক ছিল ২২৫ কোটি টাকা, ১৯৬১-তে ১৪৭০ কোটি টাকা। সরকারী খাতে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ এই পাঁচবছরের মধ্যে ৯৫৬ কোটি থেকে ৫৬৫ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

(৩) দ্রষ্টব্য : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, জুন ১৯৫৮। সরকারী ঋণের মালিকানা বিশ্লেষণ ক'রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে তথ্য প্রকাশ করেছেন (বুলেটিন মার্চ ১৯৬৩) তাতে দেখা যায় ১৯৩০-এ যেখানে ঋণপত্রের বিদেশী মালিকরা ৮ কোটি টাকার ঋণপত্র রাখতেন ১৯৫৬-তে সেই অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৪১ কোটি টাকায়।

ব্যবসা সংস্থাগুলি আমাদের রপ্তানী আমদানী বাণিজ্যে মোটা অংশ গ্রহণ করছে(৪)।

১৯৪৮-৪৯-এ আমাদের জাতীয় আয় ছিল ৮৬৫০ কোটি টাকা; ১৯৬১-৬২-তে সেই অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১৪,৬৩০ কোটি টাকায়। এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মধ্যে নতুন ঋণ যা তুলতে পেরেছেন তার হিসাব দিচ্ছি। পুরাণো ঋণ পরিশোধের হিসাব বাদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রথম পরিকল্পনাপর্বে নতুন আভ্যন্তরীণ ঋণ তোলা হয় ৩৮৭ কোটি টাকার, আর দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্বে ৯৩১ কোটি টাকার। এই সময়েই বিদেশী ঋণ সংগ্রহের অঙ্ক যথাক্রমে ৯৯ কোটি টাকা এবং ৬৯২ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য ঋণ সংগ্রহের যে বাজেট হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, নতুন বিদেশী ঋণের অঙ্ক হবে ৪৬২ কোটি টাকা, আভ্যন্তরীণ ঋণের অঙ্ক হবে ৩৭৬ কোটি টাকা। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৩-৬৪র মধ্যে মোট সরকারী ঋণের যে হিসাব দেখা যাচ্ছে তাতে দেখছি, ১৯৬১-৬২-তে মোট ৭০৮৯·৬০ কোটি টাকার ঋণের মধ্যে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১১১০·৫৫ কোটি টাকা (অর্থাৎ আনুমানিক শতকরা ১৫ ভাগ); ১৯৬৩-৬৪র শেষে মোট ঋণের অঙ্ক দাঁড়াবে ৯৩৬৪ কোটি টাকা, তার মধ্যে বিদেশী ঋণ ১৭৯০ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ।

ভারত সরকারের সুদবাহী (interest bearing obligations) ঋণের হিসাব নিচে উল্লেখ করছি।

(পৃষ্ঠার নিম্নে টেবুল দ্রষ্টব্য)

গত কয়েক বছরে ট্যাক্সের পরিমাণ ও হার বেড়েছে। জাতীয় আয়ের সঙ্গে ট্যাক্সের আয়ের যে অঙ্ক তা হারাহারি ভাবে অনেক বেড়েছে। যার ফলে অনুমান করা যায় যে, আমাদের দেশের আয় বণ্টনের যে ধারা (৬) তাতে আর দেশের মধ্যে নতুন ঋণ সংগ্রেহের সম্ভাবনা কম; তাই যদি বিদেশী ঋণ না নিই তা হ'লে আমরা যতটা অগ্রগতি আশা করছি তা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা।

আমরা যখন আরও বেশি পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য নিতে মনস্থ করেছি তখন এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারা নিয়ে মনে হয়, বিশেষভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে Law of Comparative Cost বা আপেক্ষিক সুবিধার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের যে মূলনীতি এককালে প্রচার

(কোটি টাকা)	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৩-৬৪
১। ভারতবর্ষে (৫)	২৫০০·৭৩	৩১৭০·৮২	৫৪৫৫·০৩	৭২৮৬·০৯
২। ইংলণ্ডে	৩৬·১৭	২৩·২০	১২২·৫০	১৯২·৮৯
৩। ডলার ঋণ ও অন্যান্য দেশের কাছে ঋণ	২৪·৬০	১১৭·৫৭	৭০৩·০৭	১৫৭৬·৬৫
	২৫৬১·৫০	৩৩১১·৫৯	৬২৮০·৬০	৯০৫৫·৬৩
৪। এর মধ্যে যে টাকা সুদসহ কাজে লাগান হয়েছে (interest yielding assets)	১৬৮১·২১	২৪৬৮·২৯	৫০৮৯·৬৫	৭৩৮০·০৭

(৪) ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে মোট রপ্তানী-বাণিজ্যের যথাক্রমে ৩০·৩%, ২৮·৫% এবং ২৯% ভাগ বিদেশী কোম্পানীগুলি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আমদানীর ক্ষেত্রে এই অঙ্ক যথাক্রমে ২৬·৭%, ২৮% এবং ৩২·৮%.

(৫) ভারতবর্ষে মোট দেনার মধ্যে, সরকারী ঋণ (Loan) এর অঙ্ক ১৪৩৮·৪৬ কোটির স্থলে ৩০৬৮·২৭ কোটিতে দাঁড়িয়েছে; "ট্রেজারী বিল"-এর অঙ্ক ৩৭৩·২০ কোটির স্থলে ১৮৬৮·৯৮ কোটি। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে টাকা ভারত সরকারের কাছে জমা রাখা হয়েছে তার অঙ্ক ১৯৬৩-৬৪-তে ৪৪৪·৫৪ কোটি টাকা।

(৬) ১৯৫৩-৫৪ থেকে ১৯৫৬-৫৭-র মধ্যে দেশের আয় কিভাবে বণ্টন হয়েছে তার এক বিবরণ আমরা পাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিনের সেপ্টেম্বর ১৯৬২-র সংখ্যায়। বুলেটিনের মার্চ ১৯৬৩-র সংখ্যায় দেখা যায় ১৯৬৩-তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন ঋণ সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞপ্তি করেন, মোট দরখাস্তকারীর সংখ্যা ছিল ২৭২৫ জন; আর দরখাস্তকারী পিছু ঋণপত্রের পরিমাণ ছিল ৫৫,৫০০ টাকা; ১৯৫৬-তে অনুরূপ বিজ্ঞপ্তির জেরে ১৫৬৬ জন দরখাস্তকার ঋণপত্র গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী-পিছু ঋণপত্রের অঙ্ক ৬,৭২,১০০ টাকা। স্বল্পতর লোকে অধিক পরিমাণ টাকা লগ্নীতে খাটাতে পারছে। অবশ্য আরো অনুসন্ধানসাপেক্ষে একথা বলা চলে না যে, দেশের উদ্বৃত্ত অর্থের আরো অনেক পরিমাণ অংশ এই মুষ্টিমেয় লোক বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তোলা চলে।

বর্বা'ত তার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে; প্রতিটি দেশ (বা ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের মত কয়েকটি দেশ গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে) স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে ঝুঁকেছে (৭); কাল-ক্রমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে ধারা গ'ড়ে উঠবে, তাতে অনুমান হয় যে, রপ্তানী-বাণিজ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সাময়িক কিছু সুবিধা পেলেও স্থায়ীভাবে কোন বিশেষ পণ্য রপ্তানীতে বা কোন বিশেষ অঞ্চলের স্থায়ী প্রয়োজন মেটাতে পূর্বের মত সুবিধা হয়ত পাব না।

এই সূত্রে যে প্রশ্ন আসে তা হ'ল,—কোন্ পণ্য কি পরিমাণে, কি মূল্যে, কোন্ অঞ্চলে আমরা রপ্তানী করতে পারব? আমরাই বা তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর কোন্ পণ্য কি পরিমাণে আমদানী করব? গত দশ বছরের (১৯৫১-৫৬, ১৯৫৭-৬১), আমদানী রপ্তানীর হিসাব বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায় যে, প্রথম পাঁচ বছরে আমরা ৩১০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করেছি, দ্বিতীয় পাঁচ বছরে করেছি ৩০৬০ কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানী। প্রথম পর্বের ৩৬২২ কোটি টাকার আমদানীর পরিবর্তে দ্বিতীয় পর্বে আমদানী করেছি ৫৩৯৫ কোটি টাকা মূল্যের আমদানী। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সরকারী, বেসরকারী দানের অঙ্ক যথাক্রমে ৩৪৭ কোটি টাকা ও ৪৭৯ কোটি টাকা; বাণিজ্যিক পরিভাষায় যাকে বলে "অদৃশ্য" লেনদেন '(Invisibles)' যথা ভ্রমণ বাবদ আয়-ব্যয়, জাহাজ ভাড়া, ইনসিওরেন্স, বিদেশী লগ্নীর সুদ ইত্যাদি; সে বাবদে প্রথম পর্বে পেয়েছি ৬৫৭ কোটি টাকা, ব্যয় করেছি ৪৬৬ কোটি টাকা; দ্বিতীয় পর্বে পেয়েছি ৮০৮ কোটি টাকা, ব্যয় করেছি ৫৮৪ কোটি টাকা—পণ্য আমদানী রপ্তানীর তুলনায় অন্যান্য খাতে আয় ব্যয়ের পরিমাণ স্বল্প; বিদেশী দান চিরকাল চলবে আমরা আশা করতে পারি না, ইতিমধ্যে বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধ করবার দায় আমাদের বেড়েছে।

বিভিন্ন অঞ্চলে যে লেনদেন হয়েছে তার হিসাব থেকে দেখা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্বে, 'স্টার্লিং এরিয়া'তে রপ্তানীর অঙ্ক যথাক্রমে ২৩৬৭ কোটি ও ২২১৮ কোটি টাকা; আমদানী যথাক্রমে ২০০৮ কোটি ও ২৪ ০ কোটি টাকা। 'ডলার এরিয়া' থেকেও আমদানীর অঙ্ক দ্বিতীয় পর্বে বহু পরিমাণে বেড়েছে। ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট-এর দেশগুলি থেকে আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। রপ্তানী যথাক্রমে ৩৬২ কোটিও ৩৫১ কোটি টাকার; আমদানী হয়েছে যথাক্রমে ৬৩৪ কোটি ও ১২১৮ কোটি টাকার। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও আমদানীর পরিমাণ বেড়েছে। প্রতিটি অঞ্চলেই রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় একই আছে গত দশ বছর ধ'রে; অপর দিকে ঐসব অঞ্চল থেকেই আমদানীর পরিমাণ বেড়েছে বহুগুণে। আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য, তার কয় বছরের অঙ্ক উদ্ধৃত করছি:

(কোটি টাকা)	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
চা	১২৯.১	১২৮.৬	১২২.৬	১২১.৪
তুলাজাত দ্রব্য	৪৫.৫	৬৪.৩	৫৭.৬	৪৮.৪
পাটজাত দ্রব্য	৯৯.৩	১০৯.০	১৩১.৭	১৪০.৫
	২৭৩.৯	৩০১.৯	৩১১.৯	৩১০.৩

মূল্য এবং চাহিদার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এই তিন শ্রেণীর পণ্যই আমাদের রপ্তানী-বাণিজ্যের বৃহৎ অংশ দখল ক'রে আছে। তিনটিরই ভিন্ন ভিন্ন রকমের সমস্যা। ক্ষুদ্র দেশ সিংহল চায়ের বাজারে ভারতবর্ষের প্রতিযোগী; সুলভ মূল্য, উৎকৃষ্টতর উৎপাদন ইত্যাদি কারণে এবং অন্যান্য ভৌগোলিক কারণের সমাবেশে, দেখা যাচ্ছে, ক্রমেই সিংহলের রপ্তানীর পরিমাণ আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে পূর্ব-আফ্রিকার দেশগুলিও চায়ের উৎপাদন সুরু করেছে।

(৭) ইউরোপের দেশগুলি জোট বেঁধে কৃষিজপণ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার চেষ্টা করছে; উপরন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে স্বল্পতর কাঁচামালে বা কৃত্রিম (Synthetic) ব্যবহার করে শিল্পপণ্য বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারছে। তাছাড়াও তারা নিজেদের জোট-এর বাইরে থেকে আমদানী যাতে সহজে না হয় তারজন্য নানান প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে। আবার এই দেশগুলির অনেকেই 'অনুন্নত' দেশগুলিকে ঋণ দিচ্ছে উদার ভাবে। (এই সূত্রে দ্রষ্টব্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন মে, ১৯৬৩।)

দেশ বিভাগের পর আমাদের পাটের ব্যবসা যে ধাক্কা পেয়েছিল, আজও তা সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা যায় নি, ইতিমধ্যে অন্যান্য দেশ বিকল্প পণ্য বা বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে পাটের ব্যবহার কমাতে সুরু করেছে; ব্যবসা-বাণিজ্য বহু পরিমাণে বাড়লেও এ দেশের পাট পূর্বের মত একচেটিয়া অধিকার পাবে কি না সন্দেহ। তুলাজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে আমাদের বহু প্রতিযোগী; তা ছাড়া দরিদ্রতর দেশগুলিও একদিকে যেমন খাদ্য-সমস্যা সমাধানে লিপ্ত তেমনি বস্ত্র উৎপাদনেও আমাদেরই মত স্বয়ংসম্পূর্ণতার চেষ্টা করছে। উপরন্তু সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা গেছে (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন মার্চ ১৯৬২) যে, গত পাঁচ বছরে তুলাজাত দ্রব্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যত টাকার কাপড় বিদেশে রপ্তানী করেছে, তার থেকে অনেক বেশি টাকার মাল (কাঁচা তুলা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি: যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিদেশ থেকে আমদানি করেছে।

আমরা ম্যাঙ্গানিজ, লৌহশিলা ইত্যাদি কিছু কিছু বাইরে পাঠাচ্ছি, কিন্তু যে সম্পদ্ ক্ষয়িষ্ণু, সেগুলি 'কাঁচা মাল' হিসাবে বিদেশে রপ্তানী ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর, উপরন্তু এইভাবে পাঠিয়ে যথেষ্ট মূল্যও পাওয়া যায় না।

আমাদের আমদানী-রপ্তানীর যে সংক্ষিপ্ত হিসাব এখানে উল্লেখ করছি তার থেকে আমাদের ভবিষ্যতের বাণিজ্যের গতির কিছুটা আন্দাজ পাব:

	১৯৫৮-৫৯ আমদানী	১৯৫৮-৫৯ রপ্তানী	১৯৬১-৬২ আমদানী	১৯৬১-৬২ রপ্তানী
	(কোটি টাকা)		(কোটি টাকা)	
ক) খাদ্য, পানীয়, ও তামাকজাতীয় দ্রব্য	১৯১	২০৬	১২৮	২২৯
খ) কাঁচামাল ইত্যাদি	৭৮	১০৫	১২৯	১১৮
পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি	৭২	৯	৯৬	৬
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৬৮	৪	৮৯	৮
শিল্পজাত দ্রব্যাদি	১৮১	২১৫	২১৩	২৭১
যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি	২৩৮	২	৩৪৯	৫
	৬৩৭	৩৩৫	৮৭৬	৪০৮
প্রাণিজ তৈল ইত্যাদি	৪	৭	৮	৬
অন্যান্য	১৮	...	২০	...
মোট	৮৫০	৫৪৮	১০৩২	৬৪৩

খাদ্য আমদানার প্রয়োজনীয়তা অদূর ভবিষ্যতে থাকবে। যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও তৃতীয় পরিকল্পনাপর্বে কত টাকার আনতে হবে তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমাদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং কর্মসংস্থান পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে কোন্ শিল্প আরো কি পরিমাণ প্রসার হওয়া প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে নতুন ক'রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দরকার আছে মনে হয়। বিদেশে চাহিদা হবে—এই প্রত্যাশায়, কোন বিশেষ নতুন শিল্প প্রসারে ঝোঁক দেবার একটি অন্যতম অসুবিধা হচ্ছে এই যে, যতদিনে আমরা বিদেশে রপ্তানীর জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন সুরু করব, ততদিনে তার চাহিদা ক'মে যেতে পারে; তখন আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান এক কঠিন কাজ হবে।

এই সূত্রে যন্ত্রপাতি আমদানী বিষয়ে একটি কথা মনে হয়। যে দেশে জনসংখ্যার এবং বেকার সমস্যার আধিক্য, সে দেশে কোন্ যন্ত্র কি উদ্দেশ্যে আমদানী করা হবে সে সম্বন্ধে আরো দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ধানভানা বা অন্যান্য শস্য Processing এর জন্য গত কয়েক বছরে বেশ কিছু যন্ত্র আমদানী করা হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হয়েছে, তেমনি অপর দিকে যে কাজ অনেকে মিলে ক'রে সামান্য রোজগার করত, সেই সমপরিমাণ কাজই যন্ত্রের সাহায্যে হওয়াতে বহু লোকের রোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে, অল্প

কয়জন লোক সেই অর্থ পাচ্ছে। একথা, বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন উৎপাদন-ব্যবস্থা বাতিল ক'রে নতুন যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে এ ধরণের সমস্যা সব দেশেই কোন-না-কোন সময়ে ঘটেছে; পরে কাজের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যা দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে কি সেই যুক্তি প্রযোজ্য? এই বিষয়ে আরো বিশদ ভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে মনে হয়।

প্রগতির জন্য বিদেশী সাহায্য প্রয়োজন সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই ঋণ পরিশোধ করার কি পন্থা এবং ঋণ পরিশোধের পরবর্তী যুগে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি কি রকম হওয়া উচিত তাই নিয়ে এখনি মনস্থির করা প্রয়োজন মনে হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের শিল্পপণ্যের সম্ভাব্য আভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা বিবেচনা ক'রে আমাদের কি অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো গ'ড়ে তোলার কথা চিন্তা করা দরকার নয়? এ যুগে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের এই বিরাট দেশে কি অন্ততঃ আংশিক ভাবেও 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' থাকা খুব কঠিন হবে? প্রশ্ন হবে, বিদেশ থেকে ত ভবিষ্যতেও কিছু আমদানী করতে হবে, সে-টাকা কোথা থেকে আসবে? অনিশ্চিত চাহিদা এবং প্রতি-যোগিতায় আপেক্ষিক সুবিধা লাভে অনিশ্চিত নতুন নতুন শিল্পদ্রব্য রপ্তানীর দিকে ঝোঁক না দিয়ে আমরা যে সব পণ্য রপ্তানীতে অতীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলাম, সেই শিল্পগুলিকেই বিচক্ষণতার সঙ্গে যথাযথ ভাবে পরিচালিত করতে পারলে সম্ভবতঃ আমাদের সীমাবদ্ধ বিদেশী মুদ্রার চাহিদা মেটানো কঠিন হবে না। কিন্তু আমরা যদি আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং কর্মসংস্থার সমস্যার দিকে যথেষ্ট নজর না দিয়ে বিভিন্ন রকমের পণ্যদ্রব্য নিয়ে বহি-র্বাণিজ্যের উপর অত্যাধিক ভরসা করি, তা হ'লে ভবিষ্যতে সমস্যা জটিলতর হবার আশঙ্কা আরো বেশি থাকবে মনে হয়।

মোটকথা, নির্বিচারে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ এবং তারই জন্য বহির্বাণিজ্যের উপর অত্যধিক ঝোঁক দেবার যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, আমাদের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা ক'রে তার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক মনে হয়।

—০—

ছাড়পত্র

শ্রীরমেশ পুরকায়স্থ

অন্ধকারের বুকটাকে তীক্ষ্ণ সড়কির মত এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে রাত বারোটার ট্রেণ এইমাত্র বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে বাড়ী ফিরবার ফুরসৎ পেল নিবারণ। স্টেশনে খড়ের আড়তে তার কাজ। লরী লরী খড় এখান থেকে চালান যায় প্রতি রাত্রে। আরও অনেকের সাথে সেগুলো ভরা দেয় নিবারণ।

রাত বারোটার মধ্যেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। রোজকার মত ম্যানেজারের কাছ থেকে রুজিটা চেয়ে নেয় নিবারণ। সামান্য কয়েক আনা মাত্র মজুরি। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে। মুখটায় বার দুই ফুঁ দেয়। দাঁতে চেপে ধ'রে ফস্ ক'রে দেশলাই কাঠি জ্বালে। অন্ধকারের মধ্যে দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে তার মুখটা। তার পর আস্তে আস্তে গ্রামের পথ ধরে। স্টেশন থেকে গ্রামটা বেশ কিছু দূর। লাইন ধ'রেই এগিয়ে চলে নিবারণ।

এই সামান্য কয়েক আনা পয়সাই পকেটে ফেলে এক সময় বাড়ীর পথ ধরতে কি ভালই না লাগত তার। জীবনের এই বেদনার গ্লানিটুকু অগ্রাহ্য করত নিবারণ তার মনের গোলাপ—তার বাসন্তীকে দিনান্তে একটিবার একান্ত আপন ক'রে পাবার জন্যে। টিম্‌টিমে হারিকেনটার পিছনে ঘুমে ঢুলঢুলু চোখে রোজ ব'সে থাকত বাসন্তী। এই নিয়ে কতদিন না তার সঙ্গে মিছিমিছি ঝগড়া করেছে নিবারণ।

—তুই কেন রোজ রোজ এমনি ক'রে জেগে থাকিস্ বউ? খেয়েদেয়ে লিদ্রা যেতে পারিস্ না?

চৌধুরী বাড়ীর ভারত-পাঠের একজন সমঝদার শ্রোতা নিবারণ। তাই ঘুমকে 'লিদ্রা' ব'লে পাঠক-ঠাকুরের অনুসরণে কথা-বার্তায় যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ হবার চেষ্টা সব সময়ই করে সে।

আর এইটুকু শুনেই রাগে ফেটে পড়ত বাসন্তী।

—মাগো, এমন অনাছিষ্টির কথাবাত্তা আমার জন্মেও শুনি নি বাপু। ঘরের লোকটা অইলো (রইল) না খেয়ে, আর আমি কোন্ আক্কেলে গিলে নেব?

—তা ব'লে রোজ রোজ অজনী দিপ্পহর পয্যন্ত জেগে থাকবি? যদি কোন অসুখ-বিসুখ করে, অ্যাঁ?

এইটুকুতেই অভিমান হ'ত তার। কি মানিনীই না ছিল বাসন্তী! হারিকেনটা নিবিয়ে সটান হয়ে শুয়ে পড়ত মেঝেয়। নিবারণকেই তখন হার মেনে মান ভাঙাতে হ'ত।

—লাও ঠ্যালা! না হয় আমার ঘাট হয়েছে, তা ব'লে তুই এরকম অবুঝ হবি, বউ?—বলতে বলতে বাসন্তীর মুখটা তুলে ধ'রে নিবিড় অনুরাগে দু'গাল ভরিয়ে দিত অজস্র চুমোয়।

সেই বাসন্তীও চ'লে গেল। বাঁচানোর জন্যে কি কম চেষ্টাই করেছিল নিবারণ! কিন্তু ঐ সামান্য ক'আনা পয়সা রোজগার দিনে। ভিজিটের টাকা কোথায়? কোথায় বা ওষুধের দাম? তবু ডাক্তারবাবুর পা জড়িয়ে কেঁদে পড়েছিল নিবারণ; 'একবারটি চলুন ডাক্তারবাবু, আপনার টাকা আমি যেমন ক'রে পারি শোধ ক'রে দেব।' 'আরে যা যা ব্যাটা, সর্, যত্তো সব আপদ্-বালাই এসে জুটেছে এখানে।'—ডাক্তারবাবু রেগে উঠে বলেছিলেন, 'যেমন ক'রে পারি শোধ ক'রে দেব, টাকা কি তুই গড়বি না কি, শুনি?'

যে ফাঁকি দেবার সে ঠিক ফাঁকি দিয়ে গেল। না ফাঁকি নয়, তাকে রাখতে পারে নি নিবারণ। তবে আর কেন এই টানা-পোড়েন? কিসের আশায়? কালি-পড়া হারিকেনের কালো কাচের ওপারে আর ত কোন ঢুলু-ঢুলু আঁখির প্রতীক্ষা নেই, একটু সোহাগ পাবার অছিলায় মিছিমিছি খুনসুড়ি বাধিয়ে আর ত কেউ অভিমান করবে না। তবে? এও বোধ হয় একটা নেশা—এই যাওয়া আর আসা! শালা, জীবনে কোনটাই বা লেশা নয়!

নিবারণ জোরে পা চালায়। না, অন্ধকারের ভয়ে নয়। অন্ধকারকে ভয় পাবার মত কোন কাজই সে করে নি জীবনে। কিন্তু প্রলোভন কি আসে নি কখনও!

এসেছিল বই কি। তখন সবে এই কাজে ঢুকেছে নিবারণ। চেনা-শোনা হয়েছে বাঘা, ছমির শেখ আর সুখনলালের সঙ্গে। সুখনলালই খবরটা এনেছিল। কাজ শেষ ক'রে নিবারণ একটা বিড়ি ধরিয়েছে। মনটা তেমন ভাল নেই। দিন দিন বাসন্তীর জ্বরটা বেড়েই চলেছে। এমন সময় স্টেশানের দিক্ থেকে ছুটতে ছুটতে এল সুখনলাল। তার হিন্দি-বাংলায় জানাল: 'একটা জব্বর বাত আছে ভাইলোগ।' তিনজনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল আর তার জব্বর খবরটা শোনাল সুখনলাল। শিউরে উঠেছিল নিবারণ। কানে আঙ্গুল দিয়ে বলেছিল, 'না না না, এমন কথা শোবন করলেও যে মহাপাপ! এ কম্ম তুমি চিন্তা করলে কি ক'রে ভাই?'

আরে ছোঃ।—বাঘা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিল তার কথা: পাপ! পাপ কি রে? পেটে ভাত নি শালার আবার পাপ!

হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল ছমির শেখ: খোকা ভয় পেয়েছে। আরে মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষেরও অধম। ঠিক আছে, আমরাই কাজ হাঁসিল ক'রে দিচ্ছি তুই শুধু ফাঁস ক'রে দিবি নি বল্?

—হঁ হঁ হঁ, ঠিক বাত বলিয়েছো ছমির শেখ।—সুখনলাল বলেছিল: যো কুছ করবার হামারা তিন আদমি কোরবে। লেকিন তুমি শুধু দেখিয়ে যাবে নিবারণভাই।

না এ কক্ষণো হ'তে পারে না।—দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিল নিবারণ। এ অন্যায় কথা শোনার পাপটুকুও যেন তাকে স্পর্শ না করে। মনে মনে চৌধুরী বাড়ীর পূজার দালানের একজন ভক্তিমান্ শ্রোতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল সে। ঠাকুর-ঘরের সামনে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। তার স্নিগ্ধ আলোয় নামাবলী গায়ে চন্দনকাঠের চৌকির ওপর ব'সে ঠাকুরমশাই শুদ্ধাচারে পাঠ করছেন। এক দালান মানুষ হাত জোড় ক'রে ভক্তিভরে শুনছে—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

মহাভারতের অমৃত কথা শুনে শুনে পুণ্যবান্ হয়েছে নিবারণ। সে কখনো এই পাপ কাজে রাজী হতে পারে!

সে রাতে আর বাড়ী যাওয়া হয় নি। ওদের দ্বারা বিশ্বাস কি? এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনে নিয়ে ওয়েটিং রুমের সামনে বসেছিল সে। জ্বরে গা পুড়ে-যাওয়া নিঃসঙ্গ বাসন্তীর ক্লিষ্ট মুখ মনে ক'রে সারাক্ষণ প্রাণটা ছট্‌ফট্ করেছিল তার। তবুও সে যেতে পারে নি। ওয়েটিং রুমের মধ্যে নিশ্চিন্তে-ঘুমোনো দামী পেন পকেটে গোঁজা বিত্তবান্ বাবুটিকে এই নির্মম ষড়যন্ত্রের মুখে ফেলে কিছুতেই সে যেতে পারে নি। কিন্তু সুখনলালের প্রস্তাব শুনে একবারও কি প্রলুব্ধ হয়নি নিবারণ? হয়েছিল বই কি। শুধু একবার, একটি মুহূর্তের জন্যে তার মন টলেছিল সুখনলালের কথায়: 'তোমার জেনানা লোকের ত বেমারী আছে। এ রুপেয়া তোমার বহুত উপগরে লাগবে, কেনো তুমি গর্রাজী হোবে নিবারণ ভাই?' টাকা কেন, একটা পাই পয়সাও যে তখন অনেক দরকারী এ কথা কি আর বুঝত না সে। ওষুধ কেনা যেত, ডাক্তার আনা যেত, হয়ত সেরে উঠত বাসন্তী। আঃ, ভাবতেও কি ভাল লাগে! কিন্তু পরমুহূর্তেই শিউরে উঠেছিল সে—'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।' অমৃতের কথা শুনেছে নিবারণ। ছি ছি, এত বড় অপরাধ সে কখনো করতে পারে!

বাঘা বলেছিল, 'ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন, নিবারণ? গলাটা টিপে ধরবো শুধু। ব্যস্, কম্ম ফতে। শালা কাক-পক্ষীও টের পাবে না।'

টের পাবে না, দিনে-রাতে, ঘরে-বাইরে—সর্ব্বত্র যাঁর দিষ্টি চলে তাঁর কাছে কি ক'রে গোপন করবে? তুমি তাঁকে দেখতে পাওনা কিন্তু তিনি যে তোমায় সব সময় দেখেন, তাঁর কাছে গিয়ে এ কাজের কি জবাব দেবে নিবারণ? ক্ষণিকের দুর্বলতার জন্যে মাফ চেয়ে কপালে হাত ঠেকায় সে। সব অবুরাধ ক্ষমা করো, পভু। এমন কুমতি যেন কখনো না হয়।

কিন্তু তবুও ত বাঁচল না বাসন্তী।

চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নিবারণ। কোথায় যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে একটা আওয়াজ হ'ল। লাইন থেকে নেমে মাঠের সরু আল পথ ধ'রে এগিয়ে গেল সে। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল, এত রাত্রে এই বিপথে গরু নিয়ে যায় কারা? নিশ্চয় চুরি। যার গায়ে তেত্রিশ কোটি লোমে তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস সেই গরু চুরি! তার পাথরের মত শক্ত বুকটা রাগে একেবারে আগুন হয়ে যায়, ব্যাটাদের আজ আচ্ছা ক'রে শিক্ষা দেবে নিবারণ, প্রথমে বোঝা দরকার দলে ওরা কেমন। একটু যেন কি ভেবে নেয় সে, তার পর এগিয়ে গিয়ে আলাপের ভঙ্গিতে বলে, ও মশাইরা, একটু দাঁড়াবেন?

দু'টি লোক দাঁড়িয়ে পড়ল।

সতর্ক পায়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেল নিবারণ। তার নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারণ ক'রে বলল, মশাইদের কাছে একটা শলাই পওয়া যাবে, শলাই?

—শলাই ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দে-শলাই।

—ও! ব'লে ম্যাচ এগিয়ে দিল একজন।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করল নিবারণ। ফস্ ক'রে একটা কাঠি জ্বালল, তারই আলোয় লোক ছুজনকে ভাল ক'রে দেখে নিল সে। তার পর জিজ্ঞেস করল—তা মশাইদের কোত্থেকে আগমন হচ্ছে ?

—কপাটের হাট।

—অ! তা গরুটা কয় বুঝি করা হ'ল ?

—আজ্ঞে, হঁ্যা।

—কতকের পড়ল।

—পাঁচ প' (একশ' পঁচিশ টাকা)।

লেজটা ধ'রে একটু মুচড়ে দিতেই গরুটা লাফিয়ে উঠল। পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে নিবারণ বলল—বাঃ! বেশ তেজী আছে, মশায়দের জিত হয়েছে মনে হচ্ছে।

—আজ্ঞে, তা যা বলেন।

—আচ্ছা, ছাড়পত্তটা যদি একবার দেখাতেন—

লোক ছুটির মুখ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল, অন্ধকারের মধ্যেও সেটা বেশ বুঝতে পারল নিবারণ। এ পকেট সে পকেট ক'রে একটা ময়লা কাগজ বার ক'রে দিল একজন।

ছোট্ট টর্চটা জ্বালল নিবারণ। মুখখানা এমন বিজ্ঞের মত ক'রে কাগজখানা উল্টেপাল্টে দেখল যে, স্বয়ং তার গুরুমশায় এলেও বলতে পারতেন না, এই পড়ুয়াই একদা তাঁর পাঠশালায় অ-আ-ক-খ-এর প্যাঁচগুলো কিছুতেই অধিগত করতে না পেরে মা সরস্বতীর পাট চুকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তাই না লেখা-পড়া-জানা লোকগুলোর ওপর অত ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবারণের। অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর সে রায় দিল—এ ত এ গরুর ছাড়পত্র নয়।

ততক্ষণে গরুর মালিকেরা মালিকানা স্বত্ব ছেড়ে দৌড়তে শুরু করেছে। একলাফে একজনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল নিবারণ, তার জগদ্দল পাথরের মত শক্ত ভারী দেহের ভার সামলাতে না পেরে প'ড়ে গেল লোকটা, খানিক হুটোপুটি, ধ্বস্তাধ্বস্তি, তার পরেই কায়দা ক'রে গরুর দড়ি দিয়ে লোকটাকে ক'ষে বেঁধে ফেলল নিবারণ।

বেশ কিছুদিন ধ'রে এ অঞ্চলে গরু-বাছুর চুরি যাচ্ছে, অনেক রিপোর্ট জমেছে থানায়, কিন্তু চোরকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না, তাই ক'দিন থেকে ছোট দারোগাই স্বয়ং বেরোচ্ছেন দলবল নিয়ে। মাঠের মধ্যে তালবনটা হয়েছে তাঁর আস্তানা। ঘন তালবনের কালো কালো সারির সঙ্গে গা মিলিয়ে নিঃশব্দে চারদিক্ লক্ষ্য করছিলেন ছোটবাবু। অনেক দূরে মাঠের মধ্যে যেন একটা টর্চ জ্বলে উঠল, তার আবছা আবছা আলোয় একটা গরুও দেখা গেল যেন। এতদিনে তা হ'লে শিকারকে পাওয়া গেল হাতের মুঠোয়। সাফল্যের উল্লাসে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ ছুটো জ্ব'লে উঠল দারোগা বাবুর, দলবলকে ঠিকমত নির্দেশ দিয়ে দিলেন তিনি, হুইস্‌ল্ বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ঘিরে ফেলবে চারদিক্ থেকে।

গায়ের ঘাম জুড়োবার জন্যে একটা বিড়ি ধরিয়েছিল নিবারণ। লোকটা ততক্ষণে অনুনয়-বিনয় সুরু করেছে।

—এইবারটা ছাড়ান দ্যাও বড় ভাই, এমন কাজ আর জন্মেও করবুনি।

—অ্যাঁ, ছাড়ান দেব, যে গরু দেবতার তুল্য, তাই চুরি করিচিস্, ছাড়ান দেব, মহাপাতুকি হ'তে হবে যে।

—না না, বড় ভাই বিশ্বাস কর, আমি চুরি করি নি, সাদেক আলি চোর নয়।

—শালা, চুরি করিস্ নি, তবে তোর শ্বশুরের গরু নাকি রে ?

তবু লোকটা অনুনয় করে—আল্লার কসম্, বিশ্বাস কর বড় ভাই, আমি চোর নয়, শুধু ফুলমণির কথা ভেবে—

—ফুলমণি! সে আবার কে ?

তার পর নিজের দুঃখের কাহিনী বলেছিল সাদেক আলি।

—ক'দিন থেকে বউটার বেহুঁস জ্বর, ডাক্তার বলে টাইফয়্ট, ইঞ্জিশান করতি হবে, কত জনের কাছে হাত পাতলাম ছুটো টাকার জন্যে, কেউ বিশ্বাস করতি পাল্লুনি বড় ভাই,কারোর মনে দয়া হলুনি। আমির আলি সাহেবের ছুটো পা জড়িয়ে বললুম, 'তুমি ত কত জনারে কত টাকা ধার দ্যাও সাহেব, আমারে দশটা টাকা দ্যাও শুধু।' শুনে হো হো ক'রে হেসে উঠে আমির সাহেব বলল—

না না আমির সাহেব নয়, যেন তন্ময় হয়ে যায় নিবারণ। আমির সাহেব নয়, শুনে হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল বেরজো ঠাকুর। বলেছিল 'তোর পরনে নি টেনা আর ঘরের চালে নি কুটো, তুই কোন্ সাহসে ধার চাস্ নিবারুণে ? আদায় করব কি ধ'রে ? এ্যাঁ, কালে কালে এ হ'ল কি! হরি হে, তুলে নাও দীনবন্ধু।'

সাদেক আলি বলে চ'লে: আমির সাহেবের দয়া

হলুনি। ডাক্তারবাবুর কাছে কেঁদে পড়লুম, আপনি গরিবের মা বাপ। শুনে ডাক্তারবাবু বলল—

হ্যাঁ হ্যাঁ নিবারণ যেন স্পষ্ট শুনতে পায় শুনে ডাক্তার-বাবু বলেছিল, 'যা যা ব্যাটা সব্, যত্তো সব আপদ-বালাই এসে জুটেছে এখানে।'

সাদেক আলি ব'লে চলে: তার পর গিছিলুম গোনি মোল্লার বাড়ী। বললুম, 'আমার ফুলমণিরে বাঁচাও চাচা।' শুনে গোনি চাচা বলল, দশটা টাকা দিতি পারি যদি একটা কাম করতি পারিস্। তার পর এই কাজে এইচিলুম বড়ভাই। বিশ্বাস কর আমি চোর নয়, আল্লার কিরে আমি চোর নয়।

হঠাৎ যেন বাস্তবতায় ফিরে আসে নিবারণ: এঁ্যা, চোর লয়, শালা, পালাবার ফন্দী। হাতে-লাতে ধরা পড়েচিস্, তবু চোর লয়?

প্রায় শেষ-হয়ে-যাওয়া বিড়িতে শেষ বারের মত টান দিল নিবারণ। হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল সে। কোথায় একটা ইশারার আন্দাজ পাওয়া গেল না? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছে। তার অভ্যস্ত চোখ-কানকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। নিজেও ত এক সময় রক্ষীবাহিনীর সভ্য ছিল নিবারণ। আজ না হয় পেটের ধান্দায় সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু গ্রামের ভলেণ্টিয়ার রাতে এতদূরে আসবে না। তবে? নিবারণের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। নিশ্চয় থানার লোক। এই ত দিনকয়েক আগেও তার সঙ্গে দুত্ব-বার দেখা হয়েছিল টহলদারী পুলিশের। এমন কি তারা সাবধানও ক'রে দিয়েছিল। তা হ'লে? তা হলে ত ভালই হ'ল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিবারণ। যাদের কাজ তাদের হাতেই গছিয়ে দেবে। কে বাপু এত সব ঝামেলার মধ্যে যেতে পারে।

শেষ বারের মত চেষ্টা করে সাদেক আলি। হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে: নিতান্তই যখন ছাড়বা না তখন আমার একটা কথা রাখ, বড় ভাই। আমারে ধরায়ে দ্যাবে দ্যাও, কিন্তু আমার ফতোর পকেটে একটা লোট আছে এটটা নে আমোর ফুলমণিরে বাঁচাও।

আবার যেন তন্ময় হয়ে যায় নিবারণ। আমার ফুলমণিরে বাঁচাও···না না আমার বাসন্তীরে বাঁচাও, আমার বাসন্তীরে বাঁচাও···ব'লে কত জায়গায় কেঁদেছিল নিবারণ। বাঁচবার কত সাধই না ছিল তার। নিবারণকে ছেড়ে কিছুতেই সে যেতে চায় নি। কিন্তু কেউ বাঁচায়নি তাকে। কেউ না। বাসন্তী গেছে। ফুলমণিও কি যাবে? না, ফুলমণি যাবে না। সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুত্তরঙ্গ ব'য়ে যায় তার। ফুলমণিকে কিছুতেই যেতে দেবে না নিবারণ। ফুলমণি বাঁচবে। আহা, ফুলমণি বাঁচুক্।

ক্ষিপ্রহাতে বাঁধন খুলে ফেলল নিবারণ। লোকটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকাল। কিছু বলবার আগেই তাকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিল সে: শিগ্‌গির পালাও মিয়াভাই, পুলিশ।

গরুটাকে লক্ষ্য ক'রেই ছুটে আসছে পুলিশের দল। যাক্ সাদেক আলি তা হ'লে পালাতে পেরেছে। আহা! লোকটা বাঁচুক্। সুখে ঘর করুক তার ফুল-মণিকে নিয়ে। শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল নিবারণ। বাসন্তীকে বাঁচাতে না পারার বেদনাটা যেন এতদিনে খানিক কমল।

একেবারে কানের গোড়ায় এসে বাঁশী বাজালেন দারোগাবাবু। চারদিক্ থেকে নিবারণকে ঘিরে ফেলল পুলিশের দল।

—এই শুয়ারকা বাচ্চা, এ গরু কার?—ছোটবাবুর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো জ্ব'লে উঠল।

আজ্ঞে, হুজুরের চোখ লাই, দেখতে পাচ্ছেন না?—শান্ত গলায় জবাব দিল নিবারণ।

গ্যাঁক্ ক'রে নিবারণের পেটে একটা রুলের গুঁতো দিলেন ছোটবাবু: এঁ্যা, উল্লুক কাঁহাকা, চোখ নাই! কোত্থেকে চুরি করেছিস, বল ব্যাটা, শীগ্‌গির বল।

—আজ্ঞে চুরি লয়, কিনে আনতিছি।

—'আজ্ঞে চুরি লয় কিনে আনতিছি,' নিবারণের কণ্ঠস্বর-অনুকরণ ক'রে ভেঙ্‌চিয়ে উঠলেন ছোটবাবু,—তোর কোন্ শ্বশুর টাকা দিল শুনি? কিনে আনছিস ত ছাড় কই?

ছেঁড়া ফতুয়ার পকেটে হাত ঢোকাল নিবারণ। উৎসুকনেত্রে সেদিকে তাকালেন দারোগাবাবু। ধীরে-সুস্থে পকেট থেকে দেশলাইটা বার করল নিবারণ। একটা বিড়ি গুঁজে দিল মুখে। ফস্ ক'রে কাঠি জ্বালল। অন্ধকারে দপ ক'রে জ্বলে উঠল তার মুখ। সেই ক্ষণিক আলোতে কুঞ্চিত রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল মুখে।

এই উল্লুক কাঁহাকা, তুম শুনতা নেহি? ছাড় কাঁহা?—রাগের চোটে আরও অনেক খিস্তি-ওয়ালা হিন্দি বাত বেরিয়ে এল ছোটবাবুর মুখ দিয়ে।

এক ঝাঁকানিতে জলন্ত দেশলাই কাঠিটা নিভিয়ে ফেলল নিবারণ। খুব কষে টান দিল বিড়িটায়। গন্‌গনে আঁচের মত লাল হয়ে উঠল তার মুখ। পরক্ষণে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে বলল— তাই ত, শালা ছাড়পত্রটা যে হাইরে গেচে, দারোগাবাবু!

বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একপঞ্চাশত্তম পদটিতে রয়েছে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনায় রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বর্ণনা। নিধুবনে শ্যাম-বিনোদিনী রসাবেশে বিভোর; ত্রিভুবনে তাঁদের রূপের তুলনা আর সুগভীর প্রেমেরও থই পাওয়া যায় না,—

হিরণ কিরণ আধ বরণ
আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ উরে বন মালা বিরাজিত
আধ গলে গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন-ছবি।
আধ কপালে চান্দের উদয়
আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভা ময়ূর-শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝলমল
ফণী উগারয়ে মণি॥

৪৬ নং পদটিও অনুরূপ অর্থদ্যোতনা করে; সুতরাং এই দু'টি পদ পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করলে সুগভীর রসসঞ্চার করত।

৫২-সংখ্যক পদটি অভিসারের, কিন্তু বর্ষাভিসারের নয়। পৌষ মাসের রাত্রি, কন্ কন্ ক'রে বাতাস বইছে; দরজা-জানলা সব বন্ধ; ঘরের মধ্যে থেকেও প্রচণ্ড শীতে সবাই কম্পমান; শয্যার আশ্রয় নিয়ে সকলে আত্মরক্ষায় বিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু রাধিকা,—

পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভরসহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥

জ্যোৎস্নার শুভ্রতার সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্যই রাধিকা শুক্লাম্বর পরিধান করেছেন; এতে তাঁর উপর কারোর দৃষ্টি পড়বার আশঙ্কা নেই। পদটি গোবিন্দ দাসের।

৫৩-সংখ্যক পদটি সম্ভোগান্তে রসালসের পদ; এটিও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নি। ইতিপূর্বে ৪৬-সংখ্যক চিত্র-ধর্মী মধুর পদটির পাশেই ছিল এর উপযুক্ত স্থান। ৫৪নং পদটির বক্তব্য, কৃষ্ণের বংশীরবে আকুলিত গোপরমণীগণের গৃহকাজ পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণ-সকাশে আগমন। পরবর্তী পদে 'পিরীতি'র সারকথা ব্যক্ত হয়েছে তত্ত্বকথার মধ্য দিয়ে,—

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।

৫৬-সংখ্যক পদটি হচ্ছে গোবিন্দদাসের সুপ্রসিদ্ধ বর্ষাভিসারের। সখী রাধিকাকে সাবধান ক'রে বলছে, সখি, তুমি যে কৃষ্ণাভিসারে যাচ্ছ, দেখ সামনে তোমার কত বাধা। রজনী ঘোর অন্ধকার, বর্ষণের বিরাম নেই, পথঘাট বড়ই শঙ্কাকুল, ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে; এই অবস্থায় তুমি যদি ঘর থেকে বের হও তবে 'প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ'। রাধিকার মুখে সখীর এ-কথার উত্তর পাই আর একটি পদে; কিন্তু সে পদটি পূর্বেই সন্নিবেশিত হয়েছে; সুতরাং পদসংকলনের প্রচলিত রীতি এখানেও ব্যাহত। (দ্রষ্টব্য ৪৩ নং পদ।)

৫৭ নং পদটি বাসকসজ্জার। নায়িকার আটটি অবস্থার মধ্যে বাসকসজ্জা অন্যতম। বাসকসজ্জায় পাই মিলনোদ্দেশ্যে নিজদেহ সজ্জায় ও সঙ্কেতগেহ সজ্জায় নিরতা নায়িকার অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার একটি পদই পদরত্নাবলীতে উদ্ধৃত করেছেন। আলোচ্য পদটি হচ্ছে এই,—রাধিকা বলছেন, কৃষ্ণের জন্য সারা রাত্রি জেগে কাটল; পুরুষ জাতি যে কত নিষ্ঠুর তা এতদিনে জানলাম। কত যত্নে ফুলশয্যা রচনা করেছি, সৌরভে চারদিক্ আমোদিত হয়ে উঠেছে; কিন্তু কই, কৃষ্ণ ত এলেন না। এখন—

অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ জ্বরে।
মনের আগুনি মনে-নিভাইতে
যেমন করএ প্রাণে॥

এর পরে মানের দু'টি পদ; কিন্তু মাঝখানে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ৫৯ নং পদটির সঙ্গে ঐ দু'টি পদের কোন যোগ

নেই। অভিমানে রাধিকা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা ক'রে বলছেন, অন্যের সঙ্গে তোমার কত সঙ্কেত, কত কথা! আমি সব টের পেয়েছি। তুমি যে শঠ, তা তোমার আচরণেই ধরা পড়ে; কিন্তু মনে রেখ, আমি সাধারণ 'কামিনী নারী' নই। কেউ যদি আমাকে 'কাম-কলঙ্কিনী' বলে তবে আমি সে দুঃখ আর সহ্য করতে পারি না, কারণ—

প্রেম-অধীন হাম নিরমল প্রেমহি
মো সঞে করহ বিলাস।

এর পর হয়েছে রাধিকার দুর্জয় মান। কৃষ্ণ কত অনুনয় করছেন; কিন্তু রাধিকা একবারও ফিরে তাকাচ্ছেন না। কৃষ্ণ যতই বিলাপ ক'রে বলছেন, রাধিকার ততই অভিমান বেড়ে চলেছে। গদ্‌গদ স্বরে কৃষ্ণ রাধিকার কাছে আত্ম-নিবেদন জানালেও রাধিকার মুখে একটি কথাও নেই। তাই কৃষ্ণের—

পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর জুড়ি ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥

রাধিকার এই দুর্জয় মান দেখে সখীর অত্যন্ত দুঃখ হয়েছে এবং এর পরিণাম যে কখনই ভাল হবে না, সে-বিষয়ে রাধিকাকে সাবধান ক'রে সখী বলছে,—

ছোড়হ আভরণ মুরলি-বিলাস।
পাতলে লুঠয়ে সো পিতবাস॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥

সখি, দুর্জয় মান ত্যাগ কর; কৃষ্ণ চরণ ধ'রে মিনতি করছেন। মনে রেখ, সাধারণে রসময় কৃষ্ণের সঙ্গ পায় না। কত পুণ্যোদয়ে, কত ভাগ্য বলে কৃষ্ণের সঙ্গ মেলে। চেয়ে দেখ, আজ মধুর বসন্ত রজনী, আর কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত। সৌভাগ্যবশেই এই প্রেমসঙ্গ লাভ করা যায়, উপরন্তু এই সুখময় রাত্রিও সহসা সুলভ নয়। সুতরাং

আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥

পরবর্তী তিনটি আক্ষেপানুরাগের পদে রাধার আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্বস্নেহের কথা রাধিকার সব মনে পড়ছে; যে-কৃষ্ণ অনুক্ষণ বাঁশীতে রাধার নাম নিয়ে নিয়ে ফিরত, সে কৃষ্ণ আজ অন্য নারীকে নিয়ে উন্মত্ত; কৃষ্ণের কী গভীর পরিবর্তন! কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণ-গতপ্রাণা; তিনি কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে জানেন না। তিনি খেদ ক'রে বলছেন,—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমি চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মানিক হারানু হেলে॥

৬৫ ও ৬৬ সংখ্যক পদ দু'টি বিরহের। প্রথম পদে জানা যায়, কৃষ্ণ বৃন্দাবনেই আছেন, কিন্তু অক্রূরের সঙ্গে অচিরেই মধুপুর যাবেন। এই সংবাদ শুনে রাধার মনে সন্দেহ হয়েছে যে, কৃষ্ণ সকলের স্নেহ ছিন্ন ক'রে কি মথুরায় যেতে পারেন? তাই রাধিকা সখীদের ডেকে বলছেন

চল চল সহচরি অকুর-চরণে ধরি
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা-ক্রন্দন শুনাইতে ঐছন
জানি ফিরয়ে বর নাহ॥

দ্বিতীয় পদটিতে রাধিকা বলছেন, এই ব্যাপারে যদি গুরু-জন আমাদের পরিত্যাগ করেন বা দুর্জনরা উপহাস করে, তবে তাতেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করব না, কৃষ্ণ-বিরহে আমা-দের জীবন যে অনুক্ষণ দগ্ধ হচ্ছে, এ বিচ্ছেদ সহনাতীত! মনে হয়, নয়নাঞ্জলি ভ'রে কৃষ্ণমুখামৃত অহরহ পান করি।

অতঃপর বিদ্যাপতির 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' সুপ্রসিদ্ধ বর্ষাকালোচিত বিরহাত্মক পদটির পরে আরও চারটি অনুরূপ পদ উদ্ধৃত হয়েছে। রাধিকা বল-ছেন, কৃষ্ণ ছাড়া 'দণ্ড পল' আমার কাটে না, আর 'কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল', আমার সাধ, কৃষ্ণ মুখ স্মরণ ক'রে ও তার 'নিছনি' নিয়ে আমি দেহত্যাগ করি; অনলে প্রবেশ ক'রে বা যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে এ দেহের অবসান করি। আমার মৃত্যুর পর যেন একবার কৃষ্ণ ব্রজপুরে এসে নিকুঞ্জে রক্ষিত আমার এই গলার হারটি পরে। তরুশাখায় শারী-শুককে রেখে যাব; তাদের মুখে কৃষ্ণ যেন আমার দশার কথা শোনে, আর হরিণীর কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে। কৃষ্ণ দুখিনী মা যশোদাকে যেন একবার দর্শন দিয়ে যায়। রাধিকার এই প্রলাপোক্তিতে সখী আকুল হয়ে মধুপুরে গমনোদ্যত হ'লে রাধিকা সখীকে বলছেন—

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥

সখি ধরবি কাহুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিলুঁ ভাবনে
বিধি সে করিল বাদ ॥
সখি হাস সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন দহয়ে দ্বিগুণ
সহনে নাহিক যায় ॥

উক্ত পদ চতুষ্টয়ে টেনেটুনে সংযোগ রক্ষা করলেও কোন কোন স্থানে রসাভাস যে হয় নি, তা বলা যায় না।

এর পরে বিদ্যাপতির তিনটি পদ। প্রথমটি ভাবোল্লাসের, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে বিরহাতুরা রাধিকার দূতীমুখে কৃষ্ণের নিকট সংবাদ প্রেরণ; শেষেরটি সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের রসোদ্গারের পদ অর্থাৎ মিলনের পর রাধিকার হর্ষোচ্ছ্বাস; রাধিকা বলছেন, আজ বড় সৌভাগ্য আমার রাত্রি প্রভাত হ'ল; প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শনে জীবন-যৌবন সকল এবং দশদিক্ আনন্দময় দেখছি।

আজু গেহ মঝু গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।

এখন লক্ষ লক্ষ কোকিল ডেকে উঠুক্, লক্ষ লক্ষ চাঁদের উদয় হোক্, পাঁচ বাণ এখন লক্ষ বাণ হয়ে আমার কাছে আসুক্, অনুক্ষণ মন্দ মলয়ানিল বইতে থাকুক্।

পরবর্তী সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের দু'টি পদে রাধিকা কৃষ্ণকে বলছেন, অনেক দিন পরে তোমাকে পেয়েছি; আজ তোমাকে দু'নয়ন ভ'রে দেখব; হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তোমাকে আসনে বসিয়ে রাখব। আর,—

কাল কেশের মাঝে তোমারে রাখিব
পুরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহারে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ ॥
নহেত লেহের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥

আমার ত কলঙ্কই রটে গিয়েছে; সুতরাং কাউকে আমার ভয় নাই; আর তোমাকে কখনও ছেড়ে দেব না। আমার হৃদয় থেকে বেরিয়ে গিয়ে তুমি কি ভাবে ছিলে? আমার অদৃষ্টে যত দুঃখভোগ ছিল, তা সমস্তই হয়েছে; আর তোমাকে নয়ন-ছাড়া করব না; ঘরেও আর আমি যাব না। তোমাকে পেয়ে আজ আমার সব সাধ পূর্ণ হ'ল,—

চিরদিনে বিহি আজু পুরল আশ।
হেরইতি নয়নে নাহি অবকাশ ॥

৭৭ এবং ৭৮ সংখ্যক পদে রাধিকার বাঁশী বাজানর সাধ হয়েছে; কিন্তু অন্তরে ও বাইরে উভয়তঃ কৃষ্ণময় না হ'লে ত সে-বাঁশী বাজবে না। রাধিকার অন্তরঙ্গ এখন কৃষ্ণময়; কিন্তু বহিরঙ্গ কি ভাবে পরিবর্তিত করতে হবে তার উল্লেখ ক'রে রাধিকা কৃষ্ণকে বলছেন, হরি, তুমি আমার 'নীল সাড়ী, গজমতি, সিন্দুর, কঙ্কণ কেওড়ি' ইত্যাদি নিয়ে আমাকে দাও 'পীত ধড়া, মালতী, চন্দন, তোড় তাড়।' এই ভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে আমি কৃষ্ণময় হয়ে গেলে আমাকে ব'লে দাও—

কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকারবে নাচে ময়ূরিণী ॥
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ॥
কোন রন্ধ্রে ষড়্ঋতু হয় এক কালে।
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে ॥
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায় ॥

এর পরবর্তী পাঁচটি পদ গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা, রূপ-লাবণ্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত। ৮৪-সংখ্যক পদটি দশ দশায় আপতিত রাধিকা-অবলম্বনে। পরবর্তী পদটি কলহান্তরিতার। এর পরে দুইটি পদে বর্ণিত হয়েছে যথাক্রমে কৃষ্ণের পূর্বরাগ ও রাধিকার আক্ষেপানুরাগ। সুতরাং দেখা যায়, এ-ক'টি পদ সুসন্নিবিষ্ট হয় নি।

এর পরে কয়েকটি পদের মধ্যে প্রায়ই পৌর্বাপৌর্য লক্ষ্য করা যায়। বৃন্দাবনে বসন্তের আবির্ভাবে 'নব যুবতীগণ' নব রসে বৃন্দাবনে ছুটে চলেছে; মধুর নৃত্য সুরু হয়েছে মধুর যন্ত্র সহযোগে। এই মধুময় সময়ে সুমাধুরী রাধিকা শ্যামক্রোড়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন,—

কুসুম-শয়নে মিলিত নয়নে
উলসিত অরবিন্দা।
শ্যাম-সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চান্দের উপর চন্দা ॥

কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন বাণ দোঁহে অগেয়ান
কি বিধি কৈল নিরমাণ॥

কতক্ষণ পরে শ্যামক্রোড়ে রাধিকা জেগে উঠেছেন; অনিমেষ নয়নে উভয়ে উভয়ের পানে আছেন চেয়ে; অপলক দৃষ্টিতেও যেন কারো দেখা ফুরায় না। এদিকে কুঞ্জেকুঞ্জে সুকোমল ফুল ফুটেছে, কোকিল পঞ্চম স্বরে বনভূমি মাতিয়ে তুলেছে; মৃদুমন্দ মলয় সমীরে সুখের অন্ত নেই। বৃন্দাবনের এই অপরূপ শোভা-সন্দর্শনে রাধাকৃষ্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করলেন,—

বীজই বনে ভ্রমই দুহু।
দোঁহার কান্ধে শোভে দোঁহার বাহু॥
দীপ-সমীপে যেন ইন্দ্রনীল-মণি।
জলদে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥

রাধিকার ডান হাত ধ'রে চলেছেন গিরিধর, আর 'আগে-পাছে' সখীরা পুষ্পবৃষ্টি করছে ও সুমনোরম নৃত্যের ভঙ্গিতে চামর ঢুলাচ্ছে। রাধিকার এক হাত কৃষ্ণ ধ'রে আছেন, তার স্পর্শে রাধিকার সর্বাঙ্গে হয়েছে পুলকের সঞ্চার। নৃত্যরঙ্গে চলতে চলতে রাধিকার 'মুখ-ইন্দু' বিন্দু বিন্দু শ্রমজল-কণায় অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। বীণা, কপিনাস, পিণাক ইত্যাদির মধুর ধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত।

আটটি পদের মনোরম এই স্বচ্ছন্দগতিতে বাধা সৃষ্টি করেছে ৯০ ও ৯৩-সংখ্যক অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ দুইটি। রায়বসন্তের পদ দুটির যথেষ্ট উৎকর্ষ আছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু যথাস্থানে সন্নিবেশের অভাবে এদের মাধুর্য ক্ষীণ হয়েছে।

এর পরে আছে রায়শেখরের রসোদ্‌গারের সুপ্রসিদ্ধ পদটি। রাধিকা বলছেন, পিরীতি যে কাকে বলে তা কৃষ্ণকে দেখলেই বোঝা যায়; পিরীতির আসল ধর্ম কেবল তাঁর মধ্যেই বর্তমান। আমি যদি আগের ঘাটে স্নান করি, তবে সে পেছনের ঘাটে নামে; আর দু-হাত বাড়িয়ে দেয় আমার অঙ্গ-সম্পৃক্ত জলস্পর্শের জন্য। কেবল তাহাই নয়,—

বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে
সে মুখে সে দিন থাকে॥

৯৭, ৯৮, ৯৯ সংখ্যক পদ তিনটি রায় বসন্তের। পদগুলিতে রাধা ও কৃষ্ণের মনের কথা সুপ্রকটিত। রাধিকা বলছেন,—কৃষ্ণ, তোমার জন্য আমি 'জাতি কুলশীল লাজে' তিলাঞ্জলি দিয়েছি। কি ক্ষণেই যে আমাদের মিলন হয়েছিল! এখন লোক-মাঝে মুখ দেখান আমার পক্ষে মরণ যন্ত্রণা-স্বরূপ; কিন্তু আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে তোমার মুখচন্দ্র-দর্শনে আমার সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হয়ে যায় এক নিমিষে। আমি সাধারণ 'আহিরিণী গোয়ালিনী' আর তুমি 'নিকষ পাষাণ' হয়ে 'পরশে করিলা মোরে হেম লাখ বাণ'। আমার সাধ হয়, তোমাকে সিঁদুর ক'রে ধরি আমার 'সীঁথায়,' আর হার বানিয়ে তোমায় গলায় গেঁথে পরি। এর উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন,—

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জ রাশি।
না দেখিলে নিমিষে শতেক যুগ বাসি॥

পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে তোমার বদনকমল উদ্ভাসিত; তুমি আনন্দের মূর্তি ও জ্ঞানশক্তি-স্বরূপিণী। একাধারে তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু এবং অন্যদিকে আমার কামনার প্রতিমূর্তি। তুমি আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী; তুমি সর্বত্র সুধাময় ও সুখময়। রাধা-নাম আমার নিকট মন্ত্র-স্বরূপ, কখনও ভুলতে পারি না। তুমি আমার গলার বনমালা, আর তুমিই আমার দেহ।

কৃষ্ণের এই পিরীতির নিদর্শনে রাধিকার বুক ভ'রে আছে। তাই সখীকে রাধিকা বলছেন, আমার জন্য কৃষ্ণের যে কত আর্তি তা আর কি বলব! কেবল ফিরে ফিরে সে আমার দিকে চায়, সারা রাত্রি তার জেগেই কাটে; উজ্জ্বল দীপ জ্বেলে আমার মুখের দিকে অনুক্ষণ তাকিয়ে থাকে; সে আমায় ঘন ঘন কোলে করে, তিলে শতবার মুখচুম্বন করে, বুক থেকে আমাকে শয্যায় নামায় না। যেন—

দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়।

এর পর গোবিন্দদাসের সুপ্রসিদ্ধ শারদীয় রাসের পদ। গগনে পূর্ণচন্দ্র উদীয়মান; ধীর সমীরে সমস্ত বনভূমি পুলকিত; মধুর কুসুমের গন্ধে চারিদিক্ পরিব্যাপ্ত; প্রফুল্ল মল্লিকা-মালতী-যূথি মত্তমধুকরে চঞ্চল। এই মধুময় যামিনীতে শ্যামমোহন কুলবতীর চিত্তচোর মুরলীতে পঞ্চম তান ধরলেন। কৃষ্ণের বেণু-ধ্বনি শ্রবণ

মাত্র তাঁকে আত্মসমর্পণ ক'রে গোপীগণ চলল বৃন্দাবনের উদ্দেশে বিভ্রান্তের মত। তারা এক নয়নে কাজলরেখা দিয়ে অন্য নয়নে দিতে গেল ভুলে; এক বাহুতে মাত্র কঙ্কণ পরল, অন্য বাহু রইল নিরাভরণ। তারপর—

শিথিল ছন্দ নিবিকবন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিল বেণি লোলনি।

ঝুলনলীলার দু'টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে এই শারদীয় রাসের পদের পরে। পদ দুটির মধ্যে বৈশিষ্ট্য তেমন নেই। শ্রাবণ মাসের ভরা যমুনাতীর এবং 'চান্দিনি রজনী,' তাতে বইছে মন্দ-মলয় সমীর। এর মধ্যে আছে ঘোর ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-প্রকাশ ও বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ। এই পরিবেশের মধ্যে ঝুলন রচিত হয়েছে সুশীতল কল্পবৃক্ষতলে। রাধা-কৃষ্ণকে দোল দিচ্ছে দুই সখী। তাদের দেখে মনে হচ্ছে—

তড়িত-ঘন জনু দোলয়ে দুহুঁ তনু
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নিল কমল বিকশিত
স্বেদ-বিন্দু পরকাশ॥

কোন সখী ব্যজন করছে, কেউ তাম্বুল জোগাচ্ছে, কেউ বা মেঘমল্লার রাগে গান ধরেছে। হংস, সারস, ও মত্ত দাদুরির ঘন ঘন রোলে চারদিক্‌ মুখরিত। রাধাকৃষ্ণের কপালে রচিত চন্দন-তিলক্‌ দেখে শশী চমকিত; কৃষ্ণের শিরে মুকুট আর রাধিকার চন্দ্রিকা; দুজনার শ্রবণকুণ্ডলে বিদ্যুল্লেখা বিচ্ছুরিত; দোল দেবার সময় উভয়ের অঙ্গাভরণ ঝল্‌মল্‌ করছে, আর ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে ঝুলন-বিহার। কিছু কাল পরে ঝুলন থেকে নেমে এসে রাধা, কৃষ্ণ ও অন্যান্য গোপীরা ফুল তুলতে সুরু করল গাছে গাছে। কৃষ্ণ নিজেও 'ফুল ঝাঁপা' নিয়ে রাধিকার আঁচলে দিলেন; কিন্তু কখন যে ফুলের সঙ্গে মুরলীও রাধিকার আঁচলে প'ড়ে গেল তা কৃষ্ণ টেরই পেলেন না। এই অবসরে—

পাইয়া মুরলী রাধিকা সে বেলি
রাখিলা বিশাখা-পাশে।

আর, বিশাখাও সযত্নে বাঁশীটি রেখে দিল অন্যত্র; কৃষ্ণ কিছুই টের পেলেন না।

১০৫ ও ১০৬ সংখ্যক পদ দু'টি যথাক্রমে রাস ও গোষ্ঠবিহারের এবং পরবর্তী পদদ্বয় রসোদ্গারের। রাস এবং গোষ্ঠবিহারের পদে বিশেষ কোন মৌলিকতা নেই; কিন্তু রসোদ্গারের পদ দুইটি বড়ই অন্তর্গ্রাহী। রাধিকা সখীকে বলছেন, কৃষ্ণ অনুক্ষণ আমার 'বুকে বুকে মুখে চোখে' লেগে থাকে, অথচ সে সততই আমাকে হারায়। কৃষ্ণ বুক চিরে তার হৃদয়ের মধ্যে আমাকে রাখতে চায়। কর্পূর-তাম্বুল নিজেই সেজে এনে আমার মুখে ভ'রে দেয়। কখনও দীপ হাতে নিয়ে আমার মুখ দেখতে আসে, আর তখন তার নয়নজলে সর্বাঙ্গ যায় ভিজে। কেবল তাই-ই নয়,—

চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আউলাঞা বান্ধয়ে কেশ।

আমার দেহবর্ণের সাদৃশ্যে কৃষ্ণ পীতবাস পরিধান করে; বাঁশীতে আমার নাম উচ্চারিত হয় ব'লেই মুরলী কৃষ্ণের প্রাণের থেকেও প্রিয়। আমার অঙ্গের সৌরভ যে-দিক্‌ থেকে আসে, কৃষ্ণ—

বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায়।

গ্রন্থের শেষ পদ দুইটি আক্ষেপানুরাগের। রাধিকা বলছেন, কৃষ্ণপ্রেম বড়ই অদ্ভুত; এই প্রেম নিত্য নূতন রূপ ধারণ করে, আর তিলে তিলে বাড়তে থাকে। এই প্রেম অনুপমেয় ও বর্ণনাতীত; কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপনির্ণয় যেমন অসম্ভব, তেমনই তাঁর রূপসম্পদের ব্যাখ্যা করাও সাধ্যাতীত। তাই সখীকে রাধিকা বলছেন—

জনম-অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা॥
বচন-অমিয়া রস অনুখন শুনলুঁ
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥

পদরত্নাবলী-ধৃত পদগুলির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল। পদ-সন্নিবেশের বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই কিছু কিছু বলা হয়েছে। এখানে এইটুকু উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাসের পদই উদ্ধৃত করেছেন সবচেয়ে বেশী; কিন্তু প্রাচীন সংকলন-গ্রন্থে গোবিন্দদাসের পদই প্রাধান্য পেয়েছে সর্বাধিক। চণ্ডীদাসের পদও কবিগুরুর ভাল লেগেছিল। পদসংখ্যায় চণ্ডীদাসের পদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পদরত্নাবলীতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত পদের সংখ্যাসমষ্টি সমান। এ-ছাড়া অনন্তদাস, উদ্ধবদাস, কবিবল্লভ, জগন্নাথ দাস, নরহরি, নরসিংহদাস, নরোত্তম, প্রেমদাস, বংশীদাস, বিপ্রদাস ঘোষ, বৃন্দাবনদাস, মাধব-

দাস, যদুনন্দনদাস, যদুনাথদাস, যাদবেন্দ্র, রায়বসন্ত, রায়শেখর, লোচন ও শ্রীনিবাসদাসের পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও আছে গ্রন্থের শেষের দিকে, প্রথমে নয়। সকল সংকলন-গ্রন্থই আরম্ভ করা হয়েছে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ দিয়ে; কিন্তু পদ-রত্নাবলীতে সে নিয়ম অনুসৃত হয় নি। বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপবর্ণনা, পূর্বরাগ-অনুরাগ ইত্যাদির যে ক্রম সংকলন-গ্রন্থে দেখা যায়, তারও অভাব আছে পদরত্নাবলীতে। এই গ্রন্থে আর একটি বৈশিষ্ট্য যে এতে এমন কোন পদ উদ্ধৃত হয় নি, যা অলংকারসম্ভারে সমাবৃত।

উপসংহারে এইমাত্র বলা যায়, পদাবলী-সম্ভূত বিচিত্র রসের আস্বাদনে রবীন্দ্রনাথের কবিমনে এক সময় বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। ফলে, পদরত্নাবলী সংকলন-গ্রন্থটি বিবিধ রস ও ছন্দের খনি হয়ে আছে। প্রশ্ন হতে পারে, এমন খনির অস্তিত্ব লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে কি করে, এর উত্তর হচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ পদ-সংকলনের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেন নি। তিনি পূর্ব সূরিদের অনুবর্তন করতে গিয়ে নিজের মনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন সর্বত্র। তাঁর এই অনন্য সাধারণ মনন শক্তির থই পাওয়া অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য। এই কারণেই এতদিন পদরত্নাবলী অনাবিষ্কৃত ছিল। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় পদরত্নাবলী 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের একটা দিক্ উজ্জ্বলতর করেছেন। পদরত্নাবলীর মূল্য যে কত-খানি তা বোঝা যাবে স্বর্গীয় মনীষী সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিম্নোক্ত উদ্‌ধৃতিতে—

'এই ক্ষুদ্র অথচ উৎকৃষ্ট সংগ্রহখানাও অধুনা অপ্রাপ্য হইয়াছে। সে সময়ে পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ প্রচারিত হয় নাই। এজন্য উক্ত পদাবলীর অনেক পদে অনেক স্থলে পাঠের ভুল রহিয়া গিয়াছে; তদ্ভিন্ন উহার পদাবলীর দুরূহ শব্দ বা বাক্যের কোনও টীকা দেওয়া হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি গ্রহণে তাঁহার কোনও শিষ্য-কর্তৃক এখন পুনরায় ঐ গ্রন্থ-খানির একটি বিশুদ্ধ সঠিক সংস্করণ প্রকাশিত হইলে নব্য শিক্ষিত সমাজে উহা বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারে।' (দ্রষ্টব্য: পদকল্পতরুর ভূমিকাংশ)

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও পদরত্নাবলী আলোচনা করে বৈষ্ণব কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর অনুরাগের পরিচয় প্রদত্ত হ'ল। তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকেই তিনি অতি আগ্রহে বৈষ্ণব পদাবলী রসাস্বাদন ক'রে এসেছেন। ভানুসিংহের পদাবলী ও পদরত্নাবলী ছাড়াও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিমনের পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। সে বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল পরবর্তী প্রচেষ্টায়।

কুদ্দুসের মা

সলিল রায়

ওই নিয়ে ইদ্রিসের মার গর্ব খুব। ইদ্রিসের মা বুড়ী। পঞ্চাশের ওপর বয়স। চুল পেকেছে। চেহারা ছোটখাট, গায়ে মাংস নেই। খিটখিটে দেখতে, কিন্তু এখনও খাটতে পারে জোয়ানের মত। সকালে দোকান সাজিয়ে বসে আর সেই রাত দশটায় ওঠে।

ইদ্রিসের বাবাও আছে। বাপ বড় সিধা লোক। বুড়োও হয়েছে, আর খাটতে পারে না। বুড়ীয়া পারত-পক্ষে ইদ্রিসের বাপকে দোকানে বসতে দেয় না। চোখে ভাল দেখে না ইদ্রিসের বাপ। দোকানে বসলে অনেকে খারাপ পয়সা চালিয়ে দেয়। তাই নেহাতই দরকার না হলে ওকে বসতে দেয় না বুড়ীয়া।

আর দরকারই বা কি? বুড়ীয়ার নিজের দোকানও ভাল চলে। খরিদ্দার ভালই হয়, বুড়ীয়ারও ব্যবহার খুব ভাল। ছোটখাট হোটেলের মৈথিল বামুনগুলো অনেকেই বুড়ীয়ার কাছেই সওদা নেয়। বুড়ীয়ারও সব্জির দোকান। ইদ্রিসের দোকানের পাশেই।

কিন্তু হিসাব সব আলাদা। বুড়ীয়া টাকা দিয়ে ছেলেদের বসিয়ে দিয়েছে, এবার খালাস। তোমরা বড় হয়েছ, সেয়ানা হয়েছ, বিহা-শাদী হয়েছে, লড়কা বাচ্চাও হয়েছে, এবার তোমরা বুঝে নাও। তাছাড়া আমি আর ক'দিন। বুড়ীয়ার মনোভাব এই রকম।

তা ইদ্রিস ছেলে ভাল। বুড়ীয়ার বাত শোনে। দোকানে নিয়ম ক'রে বসে। ব্যবসাও জমিয়ে নিয়েছে। ইদ্রিসের দোষের মধ্যে সিনেমা। রোজই যদি হয় তো ভাল, না তো হপ্তায় পাঁচটি দিন বাঁধা। সেকেণ্ড শো, সাড়ে ন'টা বাজলে ইদ্রিসের আর টিকি দেখা যায় না। পড়ি কি মরি ক'রে ছুটবে। বুড়ীয়া গালাগালি দেয়, এ যে এক কি পাপ হয়েছে—সিনামা। বুড়ীয়া জিন্দগীতে সিনেমা দেখিনি। বুড়ীয়ার ও সবের ফুরসৎ কোথায়? ছেলেগুলাকে মানুষ করতেই ত কোথা দিয়ে যে বছরগুলান পেরিয়ে গেল! এখন ত ঝামেলা আরও বেড়েছে। ইদ্রিসের ছেলেমেয়ে, কুদ্দুসের ছেলে-মেয়ে—এখন মস্ত সংসার।

বৌরা কাজকর্ম করে বটে, কিন্তু বুড়ীয়ার কি তাতে সোয়াস্তি আছে? নিজের দোকান চালানো, ছেলেদের

দু'দণ্ড দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। বড় সুন্দর সাজানো থাকে দোকানটা। দোকান বলতে আর কি—থাক্ থাক্ ইঁটের পাঁজা, হাত দেড়েক উঁচু। তার ওপর চারদিক জুড়ে বড় বড় টুকরি। মাথায় টিনের চালা, দেড় মানুষ উঁচু। নেহাতই ছোট দোকান, কিন্তু চোখ জুড়িয়ে যায়।

সবুজ রঙ কাঁচা লেবু, টুকরি বোঝাই। পাশা-পাশি হলুদ রঙ পাকা লেবু, দু'তিন টুকরি। সবুজ, লাল কাঁচা লঙ্কা—ঝলমলে রঙ, টলটলে গা। চক্‌চক্ করে গাগুলো, মণির মত। আবার একটা ঝুড়িতে পুদিনা, গাঢ় সবুজ। পাশেই ধনের পাতা, মেথির পাতা, স্যালাড পাতা, আর পেছনের দিকে মেটে রঙ আদা, সাদা সাদা কোয়া রসুন, গোলাপী রঙ পেঁয়াজ, আর ডিপ চকোলেট তেঁতুল, সবই স্বাদের জিনিস। বাজারে সব কিছু নিয়ে ইদ্রিসের লেবুর দোকানে একবার দর্শন দিতেই হয়, পুদিনা পাতার ভুরভুরে গন্ধ। লেবু নাও, তেঁতুল নাও, লঙ্কা নাও—যা দরকার। অথবা চাটনি। দু পয়সার চাটনি চাও, তাও দেবে, একটা শালের পাতায় কিংবা বাঁধাকপির সময় বাঁধাকপির পাতায় দুটো পুদিনার ডাঁটি, দুটো ধনের সঙ্গে দুটো কাঁচা লঙ্কা, একটু তেঁতুল, না হয়ত আমসী, আর তাও যদি না হল ত কুদরুঙ—কাঁচায় সবুজ পাকলে লাল—যত্ন ক'রে মুড়ে দেবে। কুদরুঙ স্বাদে টক টক। এতে ক'রে জিহ্বা যা সিক্ত হয়ে ওঠে! মুখ দিয়ে যেন বেরিয়েই পড়ে, হামকো ভি দো।

ইদ্রিস দিয়ে উঠতে পারে না। বিশেষ ক'রে সন্ধ্যের মুখে হিমসিম খেয়ে যায়। কারবাইডের বাতিটা জ্বালতে ফুরসৎ পায় না। কাছারির লোকেরা অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার ক'রেই ফেরে। তাই ভিড়টা আরও বাড়ে সন্ধ্যের মুখে।

লেবুওয়ালা আছে এদিকে সেদিকে, কিন্তু ইদ্রিসের ব্যবহারটা বড় ভাল। কালো চেহারা, ঝাঁকড়া এক মাথা চুল, আর মুখে হাসি। হেসে ছাড়া কথা বলে না। তাই খদ্দের একবার এসে আর ইদ্রিসের দোকান ছাড়ে না।

দোকান দেখা, বুড়ার ওপর নজর রাখা, আবার নাতি-পুতিদের খবরদারি করা! বুড়ীয়া থেকে থেকে আক্ষেপ করে। বলে, বাবু, আমরা আজাদীর আগেও যা ছিলাম, এখনও তাই। ইদ্রিসের বাপও সব্জি বিচেছে, আবার লড়কারাও বেচছে। খাওয়া পরা কোন রকমে চ'লে যায়, কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ত করলাম না। ছোটতেই সব দোকানে বসিয়ে দিলাম।

তবু যা ক'রে হোক, দিন তো চ'লে যায়। তাই বুড়ীয়ার মনে সে জন্যে অত দুঃখ নেই। দুঃখ অন্য কারণে। বুড়ীয়ার ছোট ছেলেটার ওপর ভরসা নেই।

বুড়ীয়ার ছোটা লড়কা কুদ্দুস। ইদ্রিসের ঠিক পাশেই খোলা জায়গায় হেঁকে হেঁকে আলু বেচে কুদ্দুস। কপাল ভাল হ'লে বোরা বোরা আলু বিক্রি হয়ে যায়। বুড়ীয়ার মনটাও খুশী থাকে। খরিদ্দারদের দু-এক নয়া পয়সা হিসেবে ছেড়ে দেয়। বলে, বাবু, কুদ্দুসের এমন সুমতি হলে আমার ভাবনা? কিন্তু তা ত হবার নয়। যা টাকা পাবে কুদ্দুস, সব উড়িয়ে দেবে। তারপর কাল দেখো, আর মাল কেনার পয়সা নাই। বুড়ীয়া ঘর থেকে জমা টাকা ভেঙে ভেঙে আর কত দেবে?

বুড়ীয়া বলে, কত গালাগালি দিই, শাসন করি, বোঝাই, বাড়ী ঢুকতে দিই না, তবু আপদ্ যায় না। ওর বাপ মারধোরও করে। কিন্তু লেড়কা জোয়ান হয়ে গেছে, জরু আছে, একটা বাচ্চা আছে—সেও ত ভাল দেখায় না। অথচ কত আর উমর কুদ্দুসের। এই একুশ কি বাইশ।

বলতে বলতে এক-একদিন বুড়ীয়া কেঁদেই ফেলে। বলে, বাবু, তোমরা ওকে সম্‌ঝিয়ে বল।

কিন্তু বিষ রক্তের মধ্যে ঢুকলে ওঝায় কি করবে? ঝাড়-ফুঁক, মন্তর-তন্তর সব নিষ্ফল। কুদ্দুসকে হাজার উপদেশ দিলেও ফল হয় না। বাপ রাগের মাথায় দু-চারটে ছড়ির ঘা বসিয়েও দেয়, মা কত বোঝায়। বলে, "বিয়া শাদী করেছিস, জরু বেটাকে খেতে দেবে কে?" কুদ্দুসের ও সব কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই, দিব্যি বলে, "শাদী দিয়েছিলি কেন?"

কিন্তু এই প্রশ্নটা বুড়ীয়াকে সকলেই করে। "লেড়কার এমন কিছু উমর হয় নি, এত জলদি শাদী দিলি কেন?"

বুড়ীয়া কপাল চাপড়ায়, বলে, "শাদী কি সখে ক'রে দিয়েছি, বাবু?" তার পর ফিস্ ফিস্ ক'রে হাত নেড়ে বলে, "লেড়কা একদম বেচাল হয়ে গিয়েছিল। কুসঙ্গে পড়লে যা হয়, যত বদ্ সব সঙ্গী, জুয়া, দারু, আর তার চেয়েও পাকা—"বুড়ীয়া যেন উচ্চারণ করতে পারে না—তার পর খুব আস্তে চোখ মুখ কুঁচকে কথাটা বলে। কথাটা যেন বুড়ীয়ার মুখ থেকে থুথুর মত বেরিয়ে আসে, বুড়ীয়া ঢোঁক গিলে বলে, কুদ্দুস ওইটুকুন বয়সে খারাপ গলিতে ঢুকত। বলতে বলতে বুড়ীয়া কখনও কখনও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কখনও আবার কেঁদে ফেলে, কপাল চাপড়ে বলে, আমার নসীব বাবু।

কুদ্দুস শোধরায় না তবু। বিষ ঢুকেছে ওর খুনের মধ্যে। জুয়ার নেশা, দারুর নেশা। যখন হুঁস্ হয়, তখন নিঃস্ব, আবার দুদিন মন দিয়ে দোকান করে। বুড়ীয়া ধারে সওদা যোগাড় করে দেয়, দু'চার দিন মাথা ঠিক রেখে সওদা বেচে, সময় মত বাড়ী ফেরে। ভাই খুশী হয়, মা খুশী হয়, বাপও খুশী হয়, বৌ ত হয়ই। ওদের অভাবের সংসারে হাসি ফোটে, তখন কুদ্দুস একেবারে, একেবারে আলাদা মানুষ। রাস্তার কল থেকে বাল্‌তি বাল্‌তি জল ভ'রে আনে, সংসারের ফরমাস খেটে দেয়। মুরগীগুলোকে আদর করে, দানা দেয়। বাচ্চাটাকে ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাপের পা টিপে দেয়, বুড়ীয়া ত খুশিতে গদ্ গদ্ হয়ে ওঠে।

কিন্তু হলে হবে কি? ওর খুনের মধ্যে যে বিষ ঢুকেছে। ওই বিষটা বুদ্‌বুদের মত মনের মধ্যে ভুড়ভুড়ি কাটে, সঙ্গীরা গালাগাল দেয়, বলে, মৌগা, মুর্দা, না-মরদ—আরও কত কি। আর ওর মনটা শয়তান গরুর মত খোঁটা উপড়ে ছুটতে চায়। ক্ষেতের বেড়া ভেঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে চায়। তাই মনটাকে অত শক্ত বাঁধনে বেঁধেও শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে না কুদ্দুস। বাপ, মা, জরু, বেটা সব ভুলে ও উন্মাদের মত আড্ডায় গিয়ে জোটে।

বুড়ীয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, সকলে সান্ত্বনা দেয় ওকে, বলে, ওর উমর কম, পেটে টান পড়লেই নেশা কেটে যাবে, দুনিয়াদারির হাল বোঝে না কিনা? আর একটু উমর হোক্, ঠিক বুঝবে।

বুড়ীয়া কিন্তু বিশ্বাস করে না, বুড়ীয়ার এক-এক সময় মনে হয়, কুদ্দুসের দোষই বা কি? জোয়ান সব লড়কা, দোকানদারীতে মন বসে কখনও? বড় ঘরের লড়কারা এই উমরে কলেজে পড়ে। কেউ ডাক্তার বনে, কেউ ইন্‌জিনিয়র। বড় বড় সব নোকরী করে। কেউ লড়ায়ের অফসর হয়। কিন্তু হায় আল্লা, বুড়ীয়ার লড়কারা? সেই বচপন্ থেকেই মাথায় ক'রে সব্জির টুকরি বয়ে নিয়ে আসে, পাল্লা ধ'রে। ইদ্রিসকে নিয়ে

বুড়ীয়ার অত চিন্তা হয় নি। ও লিখাপড়ি করতেই চায় নি। কিন্তু কুদ্দুসকে দোকানে বসালেই ও পালিয়ে যেত। আর দোকানের পিছনে বাড়ীর দেওয়ালে ইঁটের টুকরো, কয়লার টুকরো দিয়ে গাই, মুরগী, চিড়িয়া আর আদমির হরেক রকম তসবির আঁকত।

বাপ বকলে, বলত, দুকানে আমি বসব না। বাপ শুধাত, তবে করবি কি? কুদ্দুস জবাব দিত, রেলের কারখানায় নোকরী করব।

তা সে ইচ্ছে কি আর কুদ্দুসের মা-বাপের হত না? বুড়ীয়া ত কত খরিদ্দারকে ধ'রে ধ'রে বলেছে, বাবু, তুমরা ত কারখানায় নোকরী কর, আমার লড়কাকে বাহাল করিয়ে দাও না? চোখ ছল ছল ক'রে, মিনতি ক'রে বলেছে, দু'শ-তিন'শ টাকা খরচা করব, টাকার জন্যে ভেবো না বাবু!

কিন্তু বুড়ীয়ার সাধ পূর্ণ হয় না। হবে কি ক'রে? কারখানায় নোকরী আসমানের চাঁদ। সে একদিন ছিল, ডেকে ডেকে লোক বাহাল করত। কিন্তু সে-দিন নেই। খালাসীর নোকরীর জন্যেই হাজার হাজার মানুষ দেহাত থেকে ছুটে আসে। জমি নাই, কামও নাই। নোকরী চাই, নোকরী, নোকরী, নোকরী। বাবুরা সুযোগ বুঝে প্রলোভন দেয়। টাকা ফেলো, নোকরী পাবে। তার পর বাবুও নেই, টাকাও নেই, নোকরীও নেই।

বুড়ীয়াও ঠকেছে। এক শ' টাকা নিয়ে এক বাবু উধাও হয়েছে, কিন্তু বুড়ীয়ার তাতে দুঃখ নেই। বলে, ও অধর্ম করেছে, পাপ ওরই লাগবে।

নোকরী হ'ল না কুদ্দুসের। বুড়ীয়া ভাবে, গরীবের কেউ নাই। বুড়ীয়ার গোসাও হয় কুদ্দুসের ওপর। বুড়ীয়ার কত সাধ ছিল কুদ্দুস লিখাপড়ি শিখুক, কিন্তু তাও শিখল না। মাদ্রাসার পড়া ওর মনে ধরল না। একদিন যেত, ত দু'দিন যেত না। কিন্তু কহানী পড়তে ওর ভীষণ নেশা! কোথা কোথা থেকে চেয়ে-চিন্তে কহানীর কিতাব আনত আর লাণ্টেন জেলে অনেক রাততক্ পড়ত। বাপ গালাগাল দিত। বলত, অত তেলের পয়সা আমার নাই। পড়ার ধুম দেখ, বেটা আমার ম্যাজিষ্টর হবে!

লিখাপড়িও করল না কুদ্দুস, দুকানদারীতেও দিল্ বসল না, আর নোকরীও হ'ল না। কেন যে এমন হ'ল বুড়ীয়া ভেবে পায় না। বুড়ীয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ভাবে, ও আমার পাগলা লড়কা! ও না বাপের মতন হ'ল, না ইদ্রিসের মতন, ওরা এক রকম, কিন্তু কুদ্দুস দু'ধারা রকম। ও তসবির আঁকত, কহানীর কিতাব পড়ত। ও যখন সব্জির টুকরি মাথায় ক'রে বয়ে আনত, বুড়ীয়ার কলিজা ফেটে যেত। চোখে জল আসত, কিন্তু চোখের জলটা বুড়ীয়া কোথায় যে লুকিয়ে ফেলত, কে জানে! মুখটা কঠিন ক'রে বলত, মরদ হয়েছিস আর বোঝা বইতে পারিস না?

বুড়ীয়া ভাবে আর কাঁদে। লিখাপড়ি শিখল না কুদ্দুস—সেজন্য বুড়ীয়ার তেমন দুঃখ নাই; নোকরী হ'ল না ওর—সেজন্যও অত দুঃখ নাই। নসীবে নাই তাই হ'ল না, বুড়ীয়ার সরল যুক্তি। কিন্তু ওর স্বভাব যে এখনও শুধরালো না—বুড়ীয়ার তাই অত দুশ্চিন্তা। এখনও জুয়ার নেশা, দারুর নেশা। দুকানদারীতেও দিল্ নাই। দু'দিন সংসারে থাকে ত তিন দিন নাই। সব্জির পাইকাররা তাগাদা করতে আসে। বুড়ীয়ার খাতিরে ওরা দিনের পর দিন সবুর করে, কিন্তু গালাগাল দিতে ছাড়ে না, বুড়ীয়া অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওদের শান্ত করে। কুদ্দুসের বাপ বুড়ীয়াকে বাত্ শোনায়। বলে, তুই ওর মাথা খেয়েছিস। ইদ্রিসও তাই বলে। বুড়ীয়ার মনে গোসা হয়, আর গোসা হলে বুড়ীয়ার বড় কষ্ট হয়।

কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে, অনেকবার মাপ করেছে বুড়ীয়া, এবার আর মাপ নাই, এবার বুড়ীয়া দিল্ শক্ত করেছে। কুদ্দুসের বাপ ত রেগে আগুন হয়ে আছে। ইদ্রিসও বলছে, বাড়ীতে ঢুকলেই মেরে তাড়াব, যাক না বাইরে, ক'দিন থাকে দেখব। কুদ্দুসের বৌও চুপচাপ আছে, ভাবীও তাই। ওরা নিশ্চিত জানে এবার একটা কিছু ঘটবে।

কুদ্দুস জরুর হাতের রূপার গহনাগুলো নিয়ে পালিয়েছে। একদিন, দু'দিন, তিনদিন। তিন-তিনটে দিন পার হয়ে গেল, কিন্তু কুদ্দুসের দেখা নেই। কুদ্দুসের ভাবীর মন কেমন করে, হাজার হোক ঘরের ছেলে। তিনদিন হয়ে গেল, ফিরল না। একটা খোঁজ নেওয়া ত দরকার। কুদ্দুসের বৌ চুপচাপ থাকে। বেচারী মুখ ফুটে একটি কথাও বলে না। ইদ্রিস বলে, জাহান্নমে যাক্ না, খোঁজ আমি নিচ্ছি না। বাপ বলে, অমন লড়কা জেলে গেলেও দুঃখ নেই।

আর আশ্চর্য। বুড়ীয়া এবার কঠিন। বুড়ীয়া বলে, অমন লড়কা ম'রে যাওয়াই ভাল।

চতুর্থ দিন। সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যেও গেল। পথ নির্জন হ'ল, বাজার শান্ত, ইদ্রিসের দোকান খালি। ইদ্রিস রাস্তার কলে নাইতে গেছে।

দু-একটা খরিদ্দার ঘোরাঘুরি করছে। ইদ্রিসের দোকানের পাশেই বুড়ীয়ার দোকান। বুড়ীয়া চুপচাপ ব'সে আছে। ছাপরে ঝোলানো লণ্ঠনটা যেন মিট্ মিট্ ক'রে বুড়ীয়াকে দেখছে।

বুড়ীয়ার পাশে একটা ছায়া পড়ল। ছায়াটা এগিয়ে এল খুব ধীরে। বুড়ীয়া অন্যমনস্ক ছিল, চমকে উঠল। বুড়ীয়া ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কুদ্দুস নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে সেই চেক-কাটা লুঙ্গি, গায়ে ময়লা গেঞ্জি। চুলে তেল নেই, খসখসে শুকনো। ঠোঁটে পানের লাল ছোপ। যেন ধুঁকছে কুদ্দুস।

বুড়ীয়ার হাতের কাছেই মোটা ছড়ি। গরু তাড়াবার ছড়ি। বুড়ীয়ার হাতটা ছড়িতে পড়ল। ছড়িটা শক্ত ক'রে ধরল বুড়ীয়া। তার পর সপাং সপাং ক'রে মার। মেরেই চলেছে, মেরেই চলেছে বুড়ীয়া।

দু'চার জন দোকানী উঠে এসে বুড়ীয়াকে থামাল, বুড়ীয়া হাঁপাচ্ছে, কুদ্দুস একটা কথাও বলেনি। এতটুকু প্রতিবাদ করেনি। অতবড় ছেলে, মুখ নীচু ক'রে বসে কাঁদছে।

বুড়ীয়া লোকজন হটিয়ে দিল, বলল, তুমরা যাও এখান থেকে। সব একে একে চ'লে গেল, এখন আর কেউ নেই, কেবল বুড়ীয়া আর কুদ্দুস। ইদ্রিস এখনও ফেরেনি, কুদ্দুস এখনও কাঁদছে, বুড়ীয়া ফিস্ ফিস্ করে বলল, হাঁরে, খুব জোর লেগেছে?

কুদ্দুস কোন উত্তর দিল না, বুড়ীয়া ফের শুধালো, হাঁরে, দরদ হচ্ছে খুব?

কুদ্দুস তবুও নিরুত্তর।

বুড়ীয়া তখন সন্তর্পণে টুকরির আড়াল থেকে একটা কাপড়ে ঢাকা থালিয়া বের করল, কুদ্দুসের সামনে ঢাকনীটা খুলে ধরল। কলাই করা থালিয়াতে ভাত, একটু তরকারী, কাঁচা পেঁয়াজ আর নুন।

কুদ্দুস এখনও কাঁদছে, বুড়ীয়া বলল, জলদি খা, এখনই ইদ্রিস এসে আমাকে গালাগাল দেবে, বলবে, তুই ত ওর মাথা খেয়েছিস।

কুদ্দুস যেন আর থামতে পারে না। চার দিন পেটে দানা পড়েনি। খেতে কে দেবে? সর্বস্ব লুটেপুটে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাপের ভয়ে বাড়ীও ঢোকেনি, পেটে তখন আগুন জ্বলছে ওর। নিমেষে বড় বড় থাবায় ঠাণ্ডা ভাতগুলো নিঃশেষ ক'রে দিল।

বুড়ীয়ার চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল, বলল, হতভাগা, তুই আমার কাছে এলি না কেন? আমি রোজ তোর জন্যে লুকিয়ে ভাত এনে রাখতাম, তোর ভাবী রোজ পুছ্‌ত, কুদ্দুস খেল কিনা? বলতাম, না, ওর দেখাই নাই, তোর ভাবী কাঁদত, খাবার সময় ভাতগুলো রোজ নালাতে ফেলে দিয়ে যেতাম।

বুড়ীয়া কুদ্দুসের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, বলে, হাঁরে, অত মারলাম, লেগেছে খুব, দরদ হচ্ছে খুব?

কুদ্দুস একটি কথাও বলে না।

বুড়ীয়া কিন্তু থামে না, বলেই চলে, হতভাগা, তুই আমার কাছে এলি না কেন? আমি কি ম'রে গেছলাম? আমি থাকতে তোর ডর কিসের? তোর বাপকে আমি সমঝিয়ে দোব, বুড়ার বড্ড গোসা হয়েছে, তুই এখন বড় হয়েছিস, রোজগারের ধান্ধা না করলে চলে? জরু আছে, বেটা আছে, আখেরের কথাও ত ভাবতে হয়, বেটা বড় হবে, লিখাপড়ি শিখবে, বড় নোকরী করবে, আমার আর ক'দিন? মরলে গোর দিবি আঙিনায়, সাঁঝের সময় দিয়া জ্বেলে দিবি...

হাত বুলোতে বুলোতে বকেই চলে বুড়ীয়া। কুদ্দুসের ঘুমে যেন চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে আসে। বুড়ীয়ার কোলের কাছেই ছোট্ট ছেলের মত হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়ে, আর ছাপরে ঝোলানো লণ্ঠনটা মিটমিট ক'রে বুড়ীয়ার স্নেহমাখা মুখখানা দেখতে থাকে।

—০—

গীতিস্বরকার দ্বিজেন্দ্রলাল

(স্মৃতিচারণী)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমাদের যুগে বহু কবি ও গুণী পিতৃদেবের কবিতার ও গানের উচ্ছ্বসিত গুণগান করলেও ইদানীন্তনদের মধ্যে সে-উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়েছে। আমি অবশ্য একথা জানি যে, রুচির টেম্পারেচার অনেক ওঠানামা ক'রে তবে দাঁড়ায় যেখানে সে হয়ে ওঠে স্থায়ী তথা অচ্যুত। কীট্‌সের বিখ্যাত কবিতা Hyperion-কে তদানীন্তন উন্নাসিকেরা এমন কশাঘাত করেছিলেন যে, রোগদুর্বল কীট্‌সের অকালমৃত্যু হয় সে জন্যে। শেলি তাঁর বিখ্যাত Adonais কবিতায় এ নিন্দকদের পাল্টা কশাঘাত করেছিলেন "obsceme ravens clamorous o'er the dead" ব'লে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কীট্‌সের তর্পণ করেছিলেন গেয়ে :

"The one remains, the many change
and pass,
Heaven's light forever shines,
earth's shadows fly."

অর্থাৎ

একেশ্বর চিরঞ্জীবী, অসংখ্যেরা ক্ষণলীয়মান,
স্বর্গপ্রভা অমরণী, মর্ত্যছায়া উধাও চঞ্চলা।

উন্নাসিক ক্রিটিকেরা তবু মানেন নি, বলেছিলেন, কীট্‌স ব্যর্থ সাহিত্যিক, অকবি। কিন্তু অজহুরীরা জহরকে মেকি বললে হবে কি, তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই কীট্‌স ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রাপ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়েছিলেন কাব্যরসিকদের সৎসঙ্গে। ব্লেকের সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাঁর মৃত্যুর একশো বৎসর পরে তবে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি ব'লে মান পেয়েছিলেন। কে না জানে ?

দৃষ্টান্ত-বাহুল্য অনাবশ্যক, কারণ, একথা আজ সর্বস্বীকৃত যে, মহৎ সৃষ্টি সব সময়ে না হ'লেও অনেক সময়েই মহৎ ব'লে মান পায় না তখনি তখনি। চিরন্তন মহিমাকে কষতে হয় কালের নিকষে, উপায় নেই। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভা তাঁর মৃত্যুর পরে অনাদৃত হওয়ার জন্যে আমার ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখ হ'লেও, আমার মধ্যে যে-কবি গুণী সাহিত্যিক ও সমালোচক আছে সে মানে বৈকি বেনেদেত্তো ক্রোচের কথা যে, "জগতে যদি অসম্ভব ব'লে কিছু থাকে তবে সে এই যে প্রতিভাধর যথাকালেও সর্ববরেণ্য হ'ল না।" আমি যে মনে মনে নিশ্চিত জানি যে, ইদানীন্তন অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে সুরে ও কাব্যে যদি সাড়া নাও দেন তবে তাতে তাঁর দীপ্ত কবি-প্রতিভার বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না—যথাকালে তিনি তাঁর কবি-স্বত্তির প্রাপ্য প্রণামী পাবেনই পাবেন।

এ-বিশ্বাসকে কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন—পুত্রের পিতার প্রতি পক্ষপাত, কাজেই ক্ষমনীয়। বললে আমি রাগ করব না, কারণ আমি স্বীকার করি আমার পক্ষে এ পক্ষপাত থাকাই স্বাভাবিক। কেবল আমি একটি অভিযোগের সম্পর্কে "গিল্টি প্লীড" করতে নারাজ যে, এ পক্ষপাতের স্বপক্ষে বলবার কিছুই নেই। সবচেয়ে বড় বলবার কথা আমার এই যে, আমি তাঁকে দেখেছি দিনের পর দিন তেমনি অনায়াসে অপূর্ব কবিত্বময় গান বাঁধতে—যেমন অনায়াসে পাখী ওড়ে আকাশে, ফুল ফোটে কুঁড়িতে, মেঘে জাগে বিদ্যুৎ। ভাবুন—সে-যুগে মাত্র বারো বৎসর বয়সে তিনি বেঁধেছিলেন শুধু এই সুন্দর গানটি নয় (সমস্ত গানটি আর্যগাথা প্রথম ভাগে দ্রষ্টব্য)

গগনভূষণ তুমি জনগণমনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীলনভোবিহারী !

সেই সঙ্গে সুর দিয়ে এমন চমৎকার গেয়েছিলেন যে, আড়াল থেকে শুনে তাঁর বিখ্যাত ওস্তাদ পিতা চমৎকৃত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি বড় কবি ও গুণী হবেন। আর শুধু শৈশবে কবিতা লেখাই নয়, তাঁর মহাপ্রয়াণের আগের দিনেও (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) তিনি বেঁধেছিলেন তাঁর শেষ দু'টি অবিস্মরণীয় গান : "ভারত আমার" ও "যেদিন সুনীল জলধি হইতে।" তাই ত সব বুঝেও আমার মন ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে যখন দেখি যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এখনও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কবির ক্ষণায়ু কৃতিত্ব নিয়ে মেতে ওঠেন, অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের মতন প্রথম শ্রেণীর কবি ও গীতিস্বরকারকে হাসির গানের কবি বা চারণ কবি নাম দিয়ে মনে করেন যথেষ্ট তর্পণ হ'ল।

কিন্তু কবি নিজে জানতেন যে, তিনি স্বধর্মে সব আগে কবি এবং অবিস্মরণীয় কবি। স্মৃতিচারণের প্রথম খণ্ডে ২৫ পৃষ্ঠায় আমি তাঁর একটি ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছি—যেটি তিনি খুব জোর দিয়েই বলতেন। আমি সে-সময়ে ওস্তাদী গানের গোঁড়া হয়ে উঠেছিলাম। তিনি সস্নেহ হেসে বলতেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে (২৪ পৃষ্ঠা): বাঙালী হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত শিখবে বাংলা গানকেই বড় করতে—হিন্দুস্থানী ওস্তাদ বনতে নয়। কারণ বাঙালী হ'ল স্বভাবে কবি, স্রষ্টা ও ভাবপ্রবণ—কালোয়াতিকুশল নয়। আমি তার্কিক ভঙ্গিতে বলতাম: "কেন বাবা? সুরেন মামা?" (বিখ্যাত খেয়ালী।—আমার পিতামহ কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ও ছিলেন ধুরন্ধর খেয়ালী মনে রাখবেন!) তিনি হেসে বলতেন: "তিনি যত বড় গাইয়েই হোন্ না কেন রে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই লোকে তাঁকে ভুলে যাবে—দেখে নিস্।" আমি রোখালো সুরে বলতাম: "সে ত সবাইকেই যাবে।" তাতে তিনি আরো একগাল হেসে বলতেন: "না রে না, আমাকে কি রবিবাবুকে ভুলে যাবে না। আর কেন যাবে না জানিস্?—এই জন্যে যে, আমরা রেখে যাচ্ছি যা বাঙালীর প্রাণের জিনিস—সুরে বাঁধা গান। আমি যে কী সব গান বেঁধে গেলাম সেদিন তুইও বুঝবিই বুঝবি।"

এ শুধু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও উঠতে-বসতে বলতেন যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—তাঁর গান। একথা আজ বোধহয় কেউই অস্বীকার করবেন না যে, অন্ততঃ আমাদের দেশ সব আগে গানেরই দেশ, আর কোন দেশের মাটিকেই গানের গঙ্গা এমন উর্বর করে নি। "অন্তত: আমাদের দেশ" বলছি এইজন্যে যে, য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁরাই যাঁরা মহাকবি—যথা হোমর, শেক্সপীয়র, দান্তে, গেটে···ইত্যাদি। জর্মনিতে শুবর্ট-স্মান-ব্রাহ্ম-প্রমুখ, ইতালিতে স্কার্লাত্তি-লিও-কালদারা-প্রমুখ বা ইংলণ্ডে সালিতান-প্যারি-স্ট্যানফোর্ড-প্রমুখ কতিপয় গীতিসুরকার প্রতিষ্ঠা পেলেও তাঁদের গানের সঙ্গে শেক্সপীয়র দান্তে বা গেটের কাব্যমহিমার তুলনাই হয় না, কিন্তু বাংলা দেশের মাটিতে এখনও সব আগে ফসল ফলে গানের। পথ চলতে ঘাসের ফুলের মতনই আমাদের মাটিতে ফলে গীতিসুরকারের ফসল: বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শশিশেখর, জয়দেব-বর্গীয় বহু সাধক বৈষ্ণব কবির পদাবলী শুনে আজও আমাদের বুকে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে। অজস্র লোকসঙ্গীত আজও আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে ঝংকৃত। রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত, সারি, ভাটিয়ালি, আউল-বাউলের রকমারি সুরেলা গান শুনে আজও মুগ্ধ হয় আমাদের গুণী ভক্ত কবি। সর্বোপরি এযুগেও আমাদের সর্বসাধারণের বুকে দোলা দিয়েছে কোন্ জাতের কবি? না, গীতিসুরকার রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত। না, একথা বললে কোন কবির কাব্যমহিমাকেই ক্ষুণ্ণ করা হয় না, হ'তে পারে না, কারণ বলেছি—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এজাহারে—যে, কাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশে বাক্-এর ঝংকৃত মুহূর্তের পরিচয় মেলে এক সুরের সঙ্গে বাণীর মিলনবাসরে, তাই দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথ সব আগে গীতিসুরকার এ অঙ্গীকার করলে তাঁদের বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভার অমর্যাদা করা হয় না। ইংরেজীতে বলে: "let first things come first". নাট্য-সাহিত্য, কথা-সাহিত্য, দর্শনসাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য—এই সবই আদরণীয় বৈকি, কিন্তু "গানাৎ পরতরং নহি" এ বাণী শুধু আপ্তবাক্যের নজিরে নয়, আমাদের হৃদয়ের সাড়ার নজিরে অঙ্গীকৃত হয়ে এসেছে আবহমানকাল। রামায়ণ এককালে গীত হ'ত। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ জীবনবেদের নাম "গীতা"। শঙ্করাচার্যের স্তোত্র মন্দিরে মন্দিরে গাওয়া হয় আজো। মীরা, কবীর, দাদু, তুলসীদাস, রবিদাস, নামদেব, তুকারাম—আরো কত মরমিয়া তথা সাধক কবিরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের ভজন ও "অভঙ্গে"র প্রসাদেই। তুলসীদাসের রামচরিতমানস উত্তরভারতের পার্বণসঙ্গীত, গুরু নানকের গুরুগ্রন্থ ভারতের নানা প্রদেশের "গুরু-দ্বারে"-ই এখনো সুগায়কেরা গেয়ে থাকেন এবং হাজার হাজার নরনারী শোনেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—অক্লান্ত আগ্রহে। অপিচ, শুধু সংখ্যার সাক্ষ্যেই নয়—ভারতবর্ষের কবিগুণী যোগীযতিদের এজাহার উদ্ধৃত ক'রেও প্রমাণ করা যায়, গানকে বহু মনীষী ধর্মসাধনার একটি প্রধান অর্ঘ্য হিসাবেই বরণ ক'রে এসেছেন চিরকাল—বলেছেন, "গানাৎ পরতরং নহি"।

"দ্বিজেন্দ্রকাব্য সঞ্চয়ন" সংকলনটি আমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম খানিকটা এই গুণী ও কবিদের সাক্ষ্যের খবর দিতেই বলব। তাই আমি চেষ্টা করেছিলাম নানা কবি ও গুণীর সহযোগ পেতে। কিন্তু সময়াভাবে অনেককেই আবেদন জানাতে পারি নি, তাছাড়া চার-পাঁচজন মনীষী কথা দিয়েও কথা রাখেন নি। তাই সঞ্চয়নের ভূমিকায় আমি আপ্তকাম হই নি—যাঁদের

কাছে সাড়া পাব পাশা করেছিলাম তাঁরা সাড়া দেন নি ব'লে।

তাঁর শততম জন্মোৎসবের পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আমার প্রার্থনা—যেন আজ আমরা ওজস্ ভক্তি প্রেম ও হাসির কিছু পাথেয় অন্ততঃ আহরণ করতে শিখি তাঁর কাব্য গান সুর ছন্দ নাট্য হাস্যরস দেশভক্তি, ভজনকীর্তনাদির রস-লোক থেকে ও বুঝতে শিখি, মানুষ হিসেবেও তিনি মহাজন ছিলেন চরিত্রে বীর্যে সততায় নিষ্ঠায় ও অধ্যবসায়ে।

এবার ভূমিকায় সমাপ্তি টেনে তাঁর গানের ও সুরের কথা পাড়ি। আমার বাল্যকালে কলকাতায় পিতৃদেব "সুরধাম"-এ এসে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে এ-আনন্দনিলয়টি হ'য়ে ওঠে বাংলার কবি গুণী মনীষীদের একটি রসসভা। একথা আমি আমার "স্মৃতিচারণ" প্রথম পর্বে ফলিয়েই লিখেছি। তাতে এও লিখেছি যে, সুরধাম-এ আসার আগে যখন আমরা ৫ নম্বর সুকিয়া ষ্ট্রীটে থাকতাম তখন মোড়ের মাথায় ডাক্তার কৈলাস বসুর মনোরম হর্ম্যে প্রায়ই নানা ওস্তাদের গান শুনতে যেতাম। সেখানেই শুনি, প্রথম ভারত-বিখ্যাত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধ্রুপদী শ্রীঅঘোর চক্রবর্তী মহাশয়ের ধ্রুপদ ও কিন্নরকণ্ঠ রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অপরূপ খেয়াল—যাঁর গান শুনে অঘোরবাবু যে অঘোরবাবু তিনিও মুগ্ধ হয়ে তাঁর চিবুক ধ'রে আদর ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"এমন কণ্ঠ কোথায় পেলে বাবা?" গুণী গুণং বেত্তি, বটেই ত।

সে সময়ে এসব ঘটনা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই নি, তাই ভেবে দেখি নি যে, হিন্দুস্থানী কালোয়াতী গানের অনুরাগী বাংলার ঘরে ঘরে মেলে না। কিন্তু পিতৃদেব শুধু ওস্তাদী গানের অনুরাগী ছিলেন না, ছিলেন উপাসক। তাঁর কত বাংলা গানই যে এই সব ওস্তাদদের কাছে শোনা নানা রাগের প্রেরণালব্ধ তার মাত্র একটু খবর আমি রাখি। কিন্তু সে সব খবরের খুঁটিনাটি থাক্। কেবল একটি স্মৃতিকথা পরিবেশন করব আজ। কেন—ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সে যুগে গ্রামোফোনে পুরুষদের মধ্যে মৈজুদ্দিন খাঁ ও লালচাঁদ বড়াল ও বাইদের মধ্যে বিনোদিনী ও কৃষ্ণভামিনীর খুব নামডাক। লালচাঁদ বড়ালের একটি রেকর্ড আমি আজও শুনি—সুরটমল্লার—"এ হো রাজা।" আহা কি গান! বেশ মনে পড়ে প্রথম যেদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর উপহার একটি গ্রামোফোন ও হাজার রেকর্ড পিতৃদেবের কাছে আসে (তিনি ছয়টি হাসির গান গ্রামোফোনে দিয়েছিলেন তার দক্ষিণা) আমি মহোৎসাহে তাঁকে ডেকে আনি—"শুনুন শুনুন—কি গানই গেয়েছেন লালচাঁদ বড়াল!" পিতৃদেব হাসিমুখে লেখা ছেড়ে এসে গানটি শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে গ্রামোফোনের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে চোখ মুছে ফিরে গেলেন—ব্যস্, একটি কথাও না। এ বানিয়ে বলা নয়, আজো স্পষ্ট দেখতে পাই তাঁর গৌরবর্ণ মুখ রাঙা হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দণ্ডবৎ প্রণামে।

স্মৃতিচিত্রটি অবান্তর নয়। এক ইংরাজ কবি বলেছেন—পিতৃদেব প্রায়ই আবৃত্তি করতেন—"He best can paint them who shall feel them most." ঐ দেখুন, মনে প'ড়ে গেল তিনি আর একটি কবির চারটি চরণ উদ্ধৃত করতেন। কবির নাম মনে নেই কিন্তু চরণ চারটি মনে গেঁথে আছে (আমার স্মৃতিশক্তি ও কণ্ঠ এ দুই বাহনের কাছে আমি যে কত ঋণী!)—

For forms of government let fools contest
For whatever is best administered is best.
For modes of faith let graceless zealots fight,
For his cannot be wrong whose life is in the right.

ভালোই হ'ল এ শ্লোকটির অবতারণা ক'রে। কারণ এ থেকে দেখতে পাবেন—তিনি কি ধরণের কবিতা ভালোবাসতেন—ঋজু, সরস, তেজস্বী, আদর্শবাদী। আমরা রূপায়িত করতে পারি ত শুধু তাকেই, যার রূপ আমাদের ধ্যানলোকে পূজা পেয়েছে আমাদের প্রাণ-পূজারীর কাছ থেকে।

ফিরে আসি এবার তাঁর সুরের ও গানের প্রসঙ্গে।

আমার অনেক বারই মনে হয়েছে যে, তিনি সুর ও কাব্য এই দুই কবচকুণ্ডল নিয়েই জন্মেছিলেন—সংস্কৃতে যাকে বলা হয় "সহজাত"। তাই সুর শুনলেই তাঁর মনে অমনি গান জেগে উঠত। একদিনের ঘটনা আজো মনে পড়ে—স্পষ্ট। এক অন্ধ গায়কের গান হয় ঝামাপুকুরে হেম মিত্রের বাড়ী। গায়ক গেয়েছিলেন ঝিঁঝিট খাম্বাজে—"তারিণী গো মা, কেন সিন্নির সাথে এত আড়ি? মানুষ মারলে টেরটা পাবে ছুটতে হ'ত হরিণ বাড়ী।" (হরিণ বাড়ীর অর্থ যে জেলখানা সেদিন আমি প্রথম শিখি, তাই এ আস্থায়ীটি আরো মনে আছে।)

যা হোক্, গানটি শুনেই পিতৃদেব বললেন—"কি চমৎকার সুর রে—বল্ ত!" ব'লেই বাঁধলেন তাঁর বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত (সেটি পরে "পরপারে" নাটকে যুক্ত হয়)—

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এবার তোরে চিনেছি মা আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি ?
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ী।

আর একবার তদানীন্তন একজন বিখ্যাত গায়ক "কাণা শরৎ"-এর একটি টপ্পা—

"ছি ছি নিঠুর কপট তুমি প্রাণসখা"

শুনেই তিনি তৎক্ষণাৎ গান বাঁধলেন—

আমি রবো চিরদিন তব পথ চাহি'
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই।

রবীন্দ্রনাথও বিখ্যাত ধ্রুপদী শ্রীরাধিকা গোস্বামীর মুখে নানা গান শুনে সেই সেই সুরে বাংলা গান বাঁধতেন দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেতে থাকতেই রীতিমত নানা আইরিশ ও স্কচ গান গাইতে শিখেছিলেন ও বিলেতেই ঠিক সেই সব সুরে বাংলা গান বসাতেন। সে গানগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র পরে আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে ছাপানো হয়েছিল। গানগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল এমন কথা বলব না। কিন্তু তাঁর মুখে কোন কোন গানের ও সুরের বাংলা প্রতি-রূপ শুনে এত মজা লাগত আমাদের যে, মায়া ও

আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাইতে গাইতে হেসে গড়িয়ে পড়তাম। একটি গানের মাত্র নমুনা দেই। Some Folks গানের তিনি তর্জমা করেছিলেন একই ছন্দে ও সুরে—

কেউ কেউ করে হায়
কেউ কেউ করে কেউ কেউ করে কেউ কেউ মরতে চায়
আমি তুমি তার কেউ নই
বেঁচে থাক সে হাসিখুসি প্রাণ সব হাসে যারা দিন রাত
যেন মজার বাদশা—যে বলুক না খুসি যে বাত।

এ গানটি পড়লে নিশ্চয়ই আপনি মুগ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁর সুরে যদি এ গানটি গাই কোন আসরে—(আমাকে ধরলে গেয়ে দিতে পারি আজও)—তা হ'লে যে আপনি উৎফুল্ল হয়ে উঠবেনই উঠবেন এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। আর কেন উৎফুল্ল না হয়ে পারবেন না, বলব? কারণ, এ সুরে যে বিলিতি প্রাণশক্তি আছে তার ছোঁয়াচ আপনার প্রাণে লাগবেই লাগবে—এম্‌নি ছিল তাঁর বিদেশী সুরকে আত্মসাৎ করবার সহজ প্রতিভা! এ প্রতিভার মূলেও ছিল তাঁর সাড়া দেবার ক্ষমতা ওরফে শ্রদ্ধা করবার শক্তি। না, তিনি বিলিতি গানকে শুধু শ্রদ্ধা করাই নয়—মনে-প্রাণে ভালবেসেছিলেন। ওস্তাদ বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না, কিন্তু এমন উদাত্ত ও সুমিষ্ট কণ্ঠ আমি কমই শুনেছি। সে প্রবল পুরুষালি কণ্ঠে যে কোন গানই গাইতে না গাইতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তার উপরে বিলিতি প্রাণশক্তির অবদান। তিনি দেশে ফিরেছিলেনও সাড়ে ষোল আনা সাহেব হয়ে। পরে এই মানুষকেই খালি গায়ে, খালি পায়ে সুরধামে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে শুনেছি সংস্কৃত লঘুগুরুছন্দে বিশুদ্ধ ভৈরবীতে—

"পরিহরি ভবসুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে।
মা ভাগীরথি! জাহ্নবী! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে।"

তাঁর সম্বন্ধে আমি আমার নানা লেখায় লিখেছি খুব জোর দিয়েই যে, তাঁর ব্যক্তিরূপের বিকাশের ফলে নানা বিরুদ্ধ ভাবধারা তাঁর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী হয়ে বিরাজ করত—যাকে ইংরাজীতে বলে প্যারাডক্স। এর একটি উদাহরণ—তিনি একদিকে ছিলেন যেমন তর্কপ্রিয়, অন্যদিকে তেমনি প্রেমিক ও ভক্তিপ্রবণ। আর্যগাথা প্রথম ভাগে উনিশ বৎসর বয়সেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন সাতটি "ঈশ্বর-স্তুতি"। এ গানগুলির মধ্যে বালক-সম্ভব সরলতার রস ছাড়া কোনও সমৃদ্ধ রস উপচিত হয় নি। কিন্তু আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি প্রকাশ করেন কৃষ্ণমুরলীর একটি অপরূপ ভক্তিস্নিগ্ধ তথা কবিত্বময় গান, যেটি গাইতেন তিনি স্বকীয় প্রাণস্পর্শী সুরে— ভৈরোঁ রাগে (আমি এ গানটি আজও গাই মন্দিরে):

ঐ প্রণয় উচ্ছাসি' মধুর সম্ভাষি' যমুনায় বাঁশী বাজে!
ঐ কানন উছলি' "রাধে রাধে" বলি' যায় চলি'
বনমাঝে!
পড়ে ঘুমাইয়ে ওই তারাকুল সই, অধরে মিলায়ে হাসি,
ঐ যমুনায় এসে নায় এলোকেশে নিভৃতে জোছনা রাশি।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে, উছলে যমুনা বারি,
সখী, ত্বরা ক'রে আয় যাই যমুনায় হেরিতে মুরলীধারী।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি'রে উদিল পূরবে ভাতি
ঐ কুঞ্জে গীত ওঠে, কুঞ্জে ফুল ফোটে,
সখী রে পোহালো রাতি।

এই ভক্তিরস পরে ধীরে ধীরে তাঁর জীবনে রাতের রজনীগন্ধার মতনই ফুটে ওঠে—কিন্তু সে কথা যথাস্থানে। উপস্থিত বলি আরও কিছু যা বলবার আছে—তাঁর নানা গানে সুর দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে।

তিনি প্রায়ই সুরের সঙ্গে সঙ্গে গান বাঁধতেন—কোন্‌টা আগে আসত আর কোন্‌টা পরে—কে বলবে? এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত—তাঁর "বঙ্গ আমার জননী আমার" স্তোত্রটি। আমার স্মৃতিচারণ প্রথম খণ্ডের ২১ পৃষ্ঠায় আমি উদ্ধৃত করেছি তাঁর জীবনীকার ও প্রিয়-বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীর সাক্ষ্য। জীবনীতে দেব-কুমার বাবু লিখেছেন (দ্বিজেন্দ্রলাল—৪৭৭-৪৭৯ পৃষ্ঠা):

একদিন—বোধ হয় অষ্টমী পূজার দিন—দুপুরবেলায় আহারান্তে বসিয়া আছি, (সে সময়ে তিনি গয়াতে পিতৃদেবের অতিথি, আমার বয়স তখন দশ বৎসর হবে) কবিবর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন: "দেখ, মাথার মধ্যে কয়েকটা লাইন ভারি জ্বালাতন করছে, তুমি একটু বস ভাই, আমি সেগুলি গেঁথে নিয়ে আসি।" একটু পরে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "উঃ! কি চমৎকার গান বেঁধেছি! শোন"—এই বলিয়া গাইয়া উঠিলেন:

'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার,
আমার দেশ!'...

হাততালি দিতে দিতে ঘরময় নাচিয়া নাচিয়া আবার গাইতে লাগিলেন:

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ!

এর মন্তব্যে আমি লিখেছি স্মৃতিচারণে: "আমার

বয়স তখন নয় কি দশ, কঠিন সুরও গাইতে পারতাম বেশ স্বচ্ছন্দেই, 'বঙ্গ আমার'-এর সুর ত জলের মতন সহজ। মায়া ও আমি উভয়েই তাঁর সঙ্গে গানটি গাইতাম—যেমন গাইতাম তাঁর আরও অনেক গান। পিতৃদেব এ-গানটির শেষ চরণে প্রথমে লিখেছিলেন: 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ।' কিন্তু দেবকুমার বাবু, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও বরদাচরণ মিত্র তিনজনেই বললেন যে, সে ঘোর বোমা-বিপ্লবের যুগে এ লাইনটি ছাপলে রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি ডিশমিশ ত হবেনই, হয়ত পুলিপোলাও চালানও হ'তে পারেন। অগত্যা ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতৃদেব লেখেন: 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ।' এজন্যে তাঁর মনে চিরদিন খেদ ছিল।"

এখানে লক্ষণীয়: "বঙ্গ আমার" গানটি বাঁধতে না বাঁধতে সুর এসে গেল - আর কি সুর বলুন ত—যে ষাট বৎসরেও পুরাণো হয় না! মাস-খানেক আগেও পুণা রেডিওতে যখন গেয়ে এলাম: "আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য হৃদয়-রক্ত করিয়া শেষ"—তখন বুকে জেগেছিল কাঁপন। ওরা গানটি কলকাতায় পাঠিয়েছে। জানি না সেখানকার রেডিওর ভাণ্ডারী এটিকে আকাশমার্গে পরিবেশন করেছেন কি না। কিন্তু যা বলছিলাম।

সুর শুনতে না শুনতে তাঁর গান এসে যেত। একবার একটি মেঘমল্লার গান শোনেন—কোথায় মনে পড়ছে না—তবে গানটির প্রথম চরণও সুর আজও মনে আছে; "ঘনঘটা ঘেরি আই কারী কারী ঘনঘটা।" অমনি তিনি বাঁধলেন, যেটি পরে তাঁর "দুর্গাদাস" নাটকে গেয়ে অভিনেত্রী সুশীলা সুন্দরী খ্যাতনামা হয়ে উঠেছিলেন রাতারাতি—

ঘন ঘোর মেঘ আই ঘেরি গগন
বহে শীকর স্নিগ্ধ 'চ্ছুসিত পবন···

একবার সে যুগের এক খ্যাতনামা টপ্পাগায়ক বকু বাবুর মুখে একটি সিন্ধুয়া টপ্পা শুনলেন (এটি আমি আজও গাই)—

এসো যদি খেলবে হরি, নারীর সনে হোলীখেলা
সেদিন বড় পালিয়েছিলে শাস্তি পাবে নিঠুর কালা।

শুনেই তিনি বাঁধলেন কি যে সুন্দর গান, যেটি পরে তাঁর 'ভীষ্ম' নাটকে বিন্যস্ত হয়েছিল (লঘু গুরু ছন্দে কি সুন্দর যে লাগে এ গানটি—যদি গেয়ে শোনাই তা হ'লে বুঝবেন)—

আইল ঋতুরাজ সজনি, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনি
বিপিনে কলতান মুরলি উঠিল মধুর বাজি'।
মৃদুমন্দ সুগন্ধ পবন-শিহরিত তব কুঞ্জভবন
কুহু কুহু কুহু ললিত তান মুখরিত বনরাজি।

এ প্রসঙ্গে একটু বলি তাঁর লঘু গুরু ছন্দে রচিত গানগুলি সম্বন্ধে। এ যুগে দেখতে পাই বাঙালী কবিদের মধ্যে কেউই লঘু গুরু ছন্দের খবর রাখেন না। (এক কবি নিশিকান্ত ও আমি এ ছন্দে কবিতা লিখেছি ও গান বেঁধেছি। কিন্তু ভরতচন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে বহু কবিই এ সংস্কৃত ছন্দে কবিতা লিখে এসেছেন। এ নিয়ে আমার "ছান্দসিকী" গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি ব'লে এখানে শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে, এ-ছন্দে গানের সুর ছাড়া পায় সহজেই সংস্কৃত গুরুস্বরের (আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ) দ্বিমাত্রিক উচ্চারণে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এছন্দে অনেকগুলি চমৎকার গান বেঁধেছেন—রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "জনগণমন অধিনায়ক" জাতীয় সঙ্গীত এই ছন্দেই রচিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল আযৌবন এ ছন্দের অনুরাগী ছিলেন। আর্যগাথায় তাঁর "কি দিয়ে সাজাব মধুর মুরতি" গানটি তিনি—আশাবরী চৌতালে গাইতেন বহু গুরুস্বরকেই দ্বিমাত্রিক মর্যাদা দিয়ে, যদিও সর্বত্র নয়। কিন্তু তার পরে তিনি অনেক গানেই এ ছন্দকে মেনে চলেছেন আদ্যন্ত, যথা এ কি মধুর ছন্দ, নিখিল জগত সুন্দর, এস প্রাণসখা এস প্রাণে, এ কি শ্যামল সুষমা, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা, ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে ইত্যাদি। এ ছন্দ তিনি ভালোবাসতেন আরো এইজন্যে যে, এ ছন্দে হিন্দুস্থানী নানা সুরের উদাত্ত ধ্বনি সহজেই গুরুস্বরের মাধ্যমে ঝংকৃত করা সম্ভব। কিন্তু যে কবিরা গান আদৌ বাঁধেন নি তাঁদের কাছে এ ছন্দের ওকালতি করা বৃথা, তাঁরা পেশ করবেনই করবেন এই সস্তা যুক্তি যে এ-ছন্দ সংস্কৃতে হিন্দিতে বা গুজরাতীতে সুষ্ঠু হ'লেও বাংলা কাব্যে অচল। এ তর্ক নিষ্ফল—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এ ছন্দে অনেকগুলি অনবদ্য সর্বাভিনন্দিত গান লেখা সত্ত্বেও যাঁরা এ ছন্দকে নামঞ্জুর করতে দ্বিধা করেন না, আমার যুক্তি তাঁদের মন টলাতে পারবে, এ আশা দুরাশা। তবু আমি যে লঘু গুরুর ছন্দের গুণগান করলাম, সে শুধু এই কথাটি নিবেদন করতে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবে গুণী কবি গীতিকার ও সুরকার ছিলেন বলেই এ ছন্দকে সর্বান্তঃকরণে ভালবেসে এ ছন্দে অনেকগুলি রসোত্তীর্ণ গান বেঁধেছিলেন—সুরের নেশাকে ছন্দের রঙে আরও রঙিন ক'রে জমিয়ে তুলতে।*

* তাঁর লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা গানগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন শারদীয়া সংখ্যা কথাসাহিত্যে। সেটি দ্বিজেন্দ্র-দীপালীতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বস্তুতঃ সুর ও ছন্দে তাঁর প্রতিভা এমন স্বচ্ছন্দে বিপথেও পথ কেটে চলত যে, আমার মনে হ'ত সত্যিই যে সুরদেবী তাঁর সুরেলা মর্মকোষে তেমনি আনন্দেই তাঁর মধু জমা দিতেন যেমন আনন্দে কৃপণ তার আয় জমা দেয় ব্যাঙ্কের দুর্ভেদ্য কোষাগারে। সুর শুনতে না শুনতে তাঁর মনে জেগে উঠত ছন্দ, ছন্দের দোলা জাগতে না জাগতে আলো হয়ে উঠত সুর। সময়ে সময়ে তাঁকে সুর দিতে দেখতাম এতই সহজে যে মনে হ'ত কেবলই রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি: "যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।" আজ আমার শুধু এই খেদ হয় যে, এমন অসামান্য সুর-প্রতিভা পূর্ণবিকাশের মুখেই শুব্ধ হয়ে গেল পঞ্চাশও না পেরুতে। রবীন্দ্রনাথের সুর-প্রতিভা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যদি দ্বিজেন্দ্রলালের সুর-প্রতিভার তুলনা করতে চাই তবে মনে রাখতে হবে, দ্বিজেন্দ্রলাল আরো ত্রিশ বৎসর বাঁচলে আরো কত কি অপরূপ সুর রচনা করতে পারতেন।

তবে তুলনা শুধু অবান্তর নয়, নিষ্ফলও বটে। কারণ মানুষের কাছে খতিয়ে মূল্যবান্ কি বস্তু? না, যা সে পেয়েছে, যাকে সে খাটাতে পারে, যাকে নিয়ে ঐতিহ্য ব'লে গৌরব করতে পারে। তাই আনন্দের কথা এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের যুগে সুরকার হিসেবে সুরের এই অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য উৎকীর্ণ ক'রে রেখে গেছেন তাঁর বহু রসোত্তীর্ণ গানের মর্মকোষে। আর সে কত রকম সুর বলুন তো! —ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, বাউল, কীর্তন, বৈঠকী, হাসির গান, স্বদেশী উদ্দীপনার গান, বিরহের অশ্রু, বীর্যের চমক, উদাসীর গান········আরো কত রকমারি গান বিচিত্র সুরসম্পাতে তিনি সৃষ্টি করতেন, কি ক'রে বোঝাব গান না গেয়ে?

তবু কিছু বলা ত চাই। প্রবন্ধ লিখতে বসেছি যখন, যতটা পারি ফোটাবার ত চেষ্টা করতে হবে গানে সুরে কোথায় তিনি ফুটে উঠেছেন ভাবরূপের শিখর-মহিমায়।

আমার মনে হয়, তাঁর গানের সুরুকারুকৃতি প্রথম ফুটে ওঠে আর্যগাথায় বিদেশী গানের তর্জমায়। এ গান-গুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি ব'লেই কিন্তু ব্যর্থ নয়। যেমন বহু কণ্ঠ-সাধনার পরে তবে কণ্ঠে সুরের জৌলুষ খোলে, ঠিক তেমনি অনেক পরীক্ষার নিষ্ফলতার পরে তবে আসে সার্থক সফলতা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলা চলে: "Our splendid failures sum to victory."

দ্বিজেন্দ্রলাল আর্যগাথায় স্বদেশী সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধেন প্রধানতঃ প্রেম-সঙ্গীত ও প্রকৃতি-সঙ্গীত। তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতের প্রথম অধ্যায়ে ছিল শুধু কান্না দেশের দুর্দশায়:

"কেন মা তোমারি
সহাস বদন আজ মলিন নেহারি?"

তারপরেই এল ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস: পুণ্যভূমি ভারত—

"ছিল এ একদা দেবলীলাভূমি
কোরো না কোরো না তার অপমান।"

তারপরে তিনি প্রেরণার জন্যে হাত পাতলেন আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত বীরদের কাছে। লিখলেন:

জ্বালাও ভারত হৃদে উৎসাহ অনল
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।

স্মরণ করলেন প্রতাপ সিংহকে, গুরুগোবিন্দ সিংহকে, বুদ্ধকে—অর্থাৎ কিনা আর্য ইতিহাসকে। সব গানগুলির উদ্ধৃতি দেওয়ার স্থানাভাব। তার প্রয়োজনও নেই। শুধু একটি কথা বলবার আছে এ সম্পর্কে: যে, এ গানগুলি আজ পড়লে একটা কথা মনে না হয়েই পারে না: যে, আমাদের দেশমাতৃকাকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও আগে পুণ্যভূমি ব'লে চিনেছিলেন, নৈলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসরের যুবকের কণ্ঠে জেগে উঠত না: "ছিল এ-ভারত বসুধা-উদ্যান, জগতের তীর্থ পুণ্যময় স্থান।" এবং তারপরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ব'সে তাঁর Lyrics of Ind-এও তাঁর পূজারী-হৃদয় অঙ্গীকার করত না: "O my land! can I cease to adore thee?"

শুধু তাই নয়, তিনি আবাল্য বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি শুধু সুপ্ত বীর্যের পুনরুজ্জীবনে, এছাড়া আর পথ নেই। তাই ত তিনি গেয়েছিলেন উনিশ বৎসর বয়সেই:

এখনো আমরা সেই আর্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য শোণিত প্রবল,
সেই বেদ সে-পুরাণ আজো বর্তমান হে,
সে-দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।

স্বামীজি বলতেন: "আত্মবিশ্বাসেই মুক্তি।" দ্বিজেন্দ্রলালও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর প্রাণের বীর্যস্পন্দনে। আর এ-অনুভব তাঁর রক্তে দোলা দিত ব'লেই তাঁর কবি-প্রতিভার পরিণতির লগ্নে তাঁর নানা স্পন্দিত স্বদেশী গানে মূর্ত হয়ে উঠে সারা বাংলা-দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল, যার শেষ ডাক বেজে উঠেছিল: "আবার তোরা মানুষ হ।"

কিন্তু স্বদেশী যুগের আগেও তিনি অন্তরে গভীর বেদনা বোধ করতেন আমাদের তামসিকতার কথা ভেবে, লোকাচারের পায়ে আমরা নির্বিচারে বিবেককে বলি দিতে চাই দেখে। তাই হাসির গানে প্রথমে ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছিলেন আমাদের নানা ভান, কাপুরুষতা, স্তাবকতাকে নিশানা ক'রে। সাধে কি শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত হাসির গান "পাঁচশো বছর এমনি ক'রে আসছি স'য়ে সমুদায়, এইটে কি আর সইবে না কো দুঘা বেশি জুতোর ঘায়" শুনে বলেছিলেন: "এ ত হাসির গান নয় দ্বিজেন্দ্রবাবু, এ যে কান্নার গান!"

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর জাতীয় জীবনের অধোগতির দুঃখে তাঁর দেশভক্ত উদার প্রাণ নিত্য কেঁদে উঠত ব'লেই তিনি হাসির ব্যঙ্গের বিদ্রূপের আড়ালে গোপন করতে চাইতেন মনের জ্বালা, প্রাণের অবসাদ। আত্মধিক্কারের এ বেদনাকে সুরের ও ছন্দের কষাঘাতে তর্জমা ক'রে চাইতেন ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙাতে।

বটে, কিন্তু আমরা অনেক কিছুই করতে চাইলেও পারি কই? এ-পারবার একটি পথ—আলঙ্কারিকদের ভাষায়—"কাব্য-সম্পদ"। অর্থাৎ কবি তাঁর আন্তর ঐশ্বর্যের প্রসাদেই পারেন তাকে সম্ভব করতে যা সে-ঐশ্বর্য বিনা অসম্ভবই থেকে যায়। দণ্ডীর মতে এই কাব্য-সম্পদের তিনটি আনুষঙ্গিক বা "কারণ" আছে:

অলৌকিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্।
অমন্দশ্চাভিযোগশ্চ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥

অর্থাৎ প্রথম চাই প্রতিভার জাদু, দ্বিতীয় নির্মল শ্রুতি, তৃতীয় অমন্দ অভিযোগ অর্থাৎ নিষ্ঠা—অধ্যবসায়, application; এই তিনটি গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে ছিল ব'লেই দ্বিজেন্দ্রলাল পেরেছিলেন জাতিকে দেশভক্তিতে উদ্বোধিত করতে। তাঁর কাব্যে গানে ও সুরে তাঁর প্রাণশক্তির অধ্যবসায় আযৌবন চেয়েছিল আমাদের সচেতন করতে দু'টি উপায়ে: এক, আমরা কি হয়েছি তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে; দুই, কি হ'তে পারি তার আভাস তথা নির্দেশ দিয়ে আমাদের অতীত গৌরবকে পূজা করতে শিখিয়ে এবং প্রথমে দেশ ও তারপরে বিশ্বমানবকে ভালোবাসবার বাণী তাঁর কাব্যে গানে ও সুরে মূর্ত ক'রে তুলে। তাঁর বহুমুখী কবি-প্রতিভা ও সাহিত্যিক কীর্তি সম্বন্ধে "দ্বিজেন্দ্র-দীপালী"তে অন্য কবিরা নিশ্চয়ই আলচনা করবেন। তাই আমি শুধু এখানে তাঁর গান ও সুর সম্বন্ধে আরো কিছু বলব যা বলতে আমার প্রাণ চেয়েছে বহুবারই—বিশেষ ক'রে তাঁর গান গাইতে গাইতে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

—•—

অনুষ্টুপ্ ছন্দ

শ্রীকালিদাস রায়

শুভক্ষণে জন্ম তব বাল্মীকির কণ্ঠে অনুষ্টুপ্
ভারতী বীণায় তাঁর পাইলেন তপোলব্ধ সুর,
সে সুর খনিত্র হয়ে বিরচিল লক্ষ রসকূপ,
কণ্ঠের পারুষ্য যাহা হিল্লোলিয়া করি দিল দূর।
লৌকিক যা কিছু তার দিলে তুমি অলৌকিক রূপ।
শুষ্ক তত্ত্বে তথ্যে সত্যে করিলে সরস সুমধুর।
ভাণ্ডারে বিন্যস্ত হ'ল জ্ঞাতব্যের রাশীকৃত স্তূপ।
নিয়ে গেলে দেবলোকে সমবেত প্রার্থনা বহুর।
ঋষির তপস্যা হ'ল তব অঙ্গে কোটি কোটি ধূপ।
এ ভারত আমোদিত পরিমলে তোমার তনুর।
তোমার প্রসাদ তরে জ্ঞানী-গুণী কবিরা লোলুপ।
তোমার শাসনে বন্দী-সৃষ্টিধারা সকল মন্থর।
ভারত-গৌরব ধন যুগেযুগে তব অবদান,
সর্ববিদ্যা—রামায়ণ, চণ্ডী, গীতা, ভারত পুরাণ।

আড়ালে বয়ে যাও

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

যে দিকে যাও, দেখো — একই ইতিহাস—

বাগানে এত ফুল — শাখায় প্রশাখায়
বাতাস ঝিরঝির্ — ব্যাকুল লিপ্সায়
না-এলে এত ফুল — সকাল সন্ধ্যায়
কখন ফোটে তারা — গোপনে ঝরে যায়
কে তার খোঁজ রাখে — কে তার সাড়া পায়!

বসন খুলে খুলে — রক্তের বিন্যাস
বুকের পিপাসাকে — শব্দে ছুঁলো যদি
পৃথিবী খান্‌খান্ — চক্ষে ভরা নদী—
আড়ালে বয়ে যাও... — বুঝেছি শেষ অবধি
নিভৃতে ভাষা ভাষা··· — মুখচ্ছবিখানি
তোমার ব্যথা বোঝা — যাবে না কোনদিনই···

যদিও একই হাওয়া — দু'জনে শ্বাস টানি॥

কে তুমি?

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে
হঠাৎ রজনীগন্ধার ঝলক।
মনে হ'ল তোমার আসমানী শাড়ির আঁচল
বে-অফ-বেঙ্গলের বাতাসে উড়ছে।

কে আমি? ভাবলাম তোমার শাড়ির আঁচল ছোঁবার?

তারপর মনে পড়ল শেলির স্কাইলার্ক।
হোঁচট খাই। পূব দিকে কে ওঠে নির্বাক্?

অরণ্য যেমন কেঁদে গান হ'তে চায়
দু'-চোখ-ভরানো তার অবাক্ বিস্ময়।
স্মৃতির অরণ্য-ভরা মৌমাছিগুলি
আমরণ গুনগুন—কার কথা ভুলি?

হঠাৎ ঝলক রজনীগন্ধার
আর সেই শাড়িটির আসমানী পাড়।

বাইরে রাস্তা। চোখ-ঝল্‌সানো রোদ।
উজ্জ্বল আলোয়
মুখ মুছে যায়।
কে তুমি?
তাই ত বিস্ময়!

প্রণাম

সুনীতি দেবী

গগনচুম্বী তুষারশৃঙ্গে নমি আমি বারেবার,
অতলস্পর্শী মহসামুদ্রে জানাই নমস্কার।
বসুন্ধরার দীর্ণ বক্ষে বিশাল বৃক্ষ উঠে,
গরিমায় তার স্তম্ভিত হয়ে চরণেতে পড়ি লুটে।
ধূসর ধূলায় নম্রসুষমা দুর্বাদল যে শ্যাম,
তাহারও চরণে ভক্তি-বিনত প্রণতিটি রাখিলাম।
মহান্ মানব পৃথিবীতে যিনি স্বর্গদেবতা প্রায়,
সম্ভ্রমে মোর গর্বিতশির তাঁহারে নতি জানায়।
সকল সৃষ্টি নমিয়া, ফেরাই স্রষ্টার পানে আঁখি,
প্রণাম করি কি করি না জানি না। হতবাক্ থাকি।

বিশ্বামিত্র

শ্রীচাণক্য সেন

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিশেষ তাগাদা না থাকলে, পূজা ও প্রাতরাশের আগে খবরের কাগজ পড়েন না। মাঝে-মধ্যে পড়তে হয়, যখন প্রাদেশিক অথবা জাতীয় রাজনীতি অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। তখনও, সাধ্যমত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেডলাইন বা যোদ্দা খবরের চেয়ে বেশি আমদানী ক'রে প্রভাতী-মনের ক্ষণস্থায়ী স্থৈর্য নষ্ট করতে চান না। সারাজীবন রাজনীতি চর্চার ফলে এ নিয়ে আন্তরিক উত্তেজনা তাঁর কম; এজন্যে রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী, বন্ধু ও শত্রুরা তাঁকে বলে, "কোল্ডেষ্ট কাষ্টমার", সবচেয়ে ঠাণ্ডামাথা খদ্দের। মনের অনেকখানি জুড়ে একটি রসিক শিল্পী ব'সে আছেন, তাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে অনেক সময় দরিদ্র, নগ্ন ফাঁকি দেখতে পান, নিজের পতন সম্ভাবনাও সব সময়ে তাঁকে অস্থির করে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেন, "পতিতাবৃত্তির পর রাজনীতি মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন পেশা। আমাদের উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ-ফল-তৃপ্ত আদম সাহেবের থেকে বহুধারায় প্রবাহিত। এ রকম পুরাতন খেলা আর দ্বিতীয় নেই। এ খেলায় কোন নিশ্চিত পথ নেই, নির্ধারিত নিয়ম নেই। রোজকার পথ, নিয়ম, নীতিরীতি রোজ তৈরী করতে হয়। এ খেলায় যে সর্বদা হাসিমুখে হার খেতে তৈরী নয়, সে জিততে পারে না।"

বলেন বটে, কিন্তু হাসিমুখে হারতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রস্তুত নন। আজ যে রাজনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে তিনি যুধ্যমান, তার সমাধান করবার জন্যে যতখানি, যত রকমের সংগ্রাম দরকার তার বেশিই তিনি ক'রে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্তরের গভীরে তাঁর অন্যতর এক সত্তা পরাজয়ের সম্ভাবনা স্বীকার ক'রে চতুর্দিকের ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝে নেবার নিরুত্তেজক কাজে ব্যস্ত। হেরে গেলে, পরাজয় থেকেও কতখানি জয় আদায় করা যেতে পারে তারও হিসেব হচ্ছে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতর সত্তায়।

মন্ত্রীসভায় ভাঙন ধরার প্রথম দিনগুলিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভাতী সংবাদপত্রের জন্যে আগ্রহ বোধ করতেন। এখন সে আগ্রহ অনেকখানি স্তিমিত। এখন তিনি জানেন, কোন্ কাগজ কি খবর ছাপবে, কি মন্তব্য লিখবে। সহরে দুখানা ইংরেজী দৈনিক। একখানা তাঁর নিজের, অন্যখানা বাইরে থেকে অদলীয় হ'লেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন আসলে তার কর্ণধার মাধব দেশপাণ্ডে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ইংরেজী দৈনিক "মর্ণিং টাইমস্"; মাধব দেশপাণ্ডের দৈনিকের নাম "পিপ্ল্"। তা ছাড়া বিলাসপুরেই আটখানা হিন্দী অথবা মারাঠী দৈনিক আছে; সমস্ত উদয়াচলে দৈনিকের সংখ্যা ছাব্বিশ। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর প্রদেশ উদয়াচল। কোনও দৈনিকেরই বিক্রী খুব বেশি নয়। সবচেয়ে প্রভাবশীল হিন্দী পত্রিকা "উদয়াচল সমাচারের" কাটতি দশ হাজারের কাছাকাছি। অতএব, এদেশে বাইরের সংবাদপত্র এখনও অভিজাত্য দাবি করে। বোম্বাই থেকে, দিল্লী, এলাহাবাদ ও কলকাতা থেকে বিমানে কাগজ এসে পৌঁছয়; অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সে সব কাগজ পাঠ করে।

আপিস-বাড়ীতে মন্থর পদক্ষেপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর বেশ-বাসে, মুখের চেহারায়, চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ-অনিশ্চয়তার বিশেষ চিহ্ন নেই। ধবধবে খদ্দরের মিহি ধুতির সঙ্গে রং মেলান কুর্তা; পায়ে হরিণ-চামড়ার চটি। মাথায় গান্ধীটুপি। দাড়ি-কামান মুখে সযত্নে সজ্জিত নিশ্চিন্ত প্রশান্তি। চোখের দৃষ্টিতে বরং কিছু কৌতুকবোধ—জীবনের রহস্য না হোক্, জীবন-যাত্রার রহস্য বুঝতে পারার কৌতুক।

দপ্তর-ঘরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ফরাসে বসলেন। নজর পড়ল সুবিন্যস্ত পত্রিকারাশির ওপর। তাঁর ব্যক্তিগত বেয়ারা দীনদয়াল রোজকার মত সাজিয়ে রেখেছে। সেক্রেটারীদের মধ্যে যার সকালে আসবার কথা সে এখনও আসে নি। তিনি তাকে ন'টার সময় আসতে বলেছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাগজগুলি টেনে নিলেন।

প্রথমে দেখলেন "পিপ্ল্"। সবচেয়ে ফলাও ক'রে যে রাজনৈতিক "সংবাদ" পরিবেশিত হয়েছে তা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে বিশেষ রেখাপাত করল না। সংবাদ-পত্র যারা তৈরী করে তাদের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভালই জানেন। "পিপ্ল"-এর বিশেষ প্রতিনিধি গতকাল তাঁর কাছে এসেছিলেন। তিনি কিছু "খবর" দিতে পারেন নি। বিধানসভার কংগ্রেসী দল আগামী সপ্তাহে মিলিত হবেন নতুন দলাধিপতি নির্বাচনের জন্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "আমি আজীবন কংগ্রেসের দাস। দেশের সামান্য সেবক। আমরা গণতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী। দলের অধিকাংশ সদস্য যদি আমাকে চান তা হ'লেই আমি পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারি। তাঁরা চান কি না এ প্রশ্ন তাঁদের করুন, আমাকে নয়। আমার ধারণা? আমার ধারণা নয়, নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, তাঁরা আমাকে

চান। এ ধারণা ভুল না সত্যি আগামী সপ্তাহে প্রমাণিত হবে।"

এই উক্তিকে ভাঙিয়ে বিশেষ প্রতিনিধি দু' কলম নিবন্ধ রচনা করেছেন। "মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল আমাকে বলেছেন, কংগ্রেসী দলের অধিপতি হিসেবে তিনি যে পুনর্নির্বাচিত হবেন সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন, দলের অধিকাংশ সদস্য আমাকে চান, এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি, তা তিনি বলতে রাজী হন নি। তাঁর বিরুদ্ধ-পক্ষ অবশ্য বলেন, ভিত্তি একমাত্র শ্রীকোশলের রাজনৈতিক উচ্চাশা। মুখে তিনি যাই বলুন, গদী ছাড়তে তিনি রাজী নন; গদী যাতে ছাড়তে না হয় সেজন্যে যা-কিছু করবার তিনি করছেন। তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রীসভার সদস্য শ্রীনিরঞ্জন পরিহার রাজধানীতে গিয়ে হাই কমাণ্ডের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত। বিলাসপুরের তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্তমানে নেপথ্য-গোপন লেন-দেনের দর কষাকষিতে দূষিত হয়ে উঠেছে। ওয়াকিবহাল মহলে শোনা যাচ্ছে শ্রীকোশল মন্ত্রিত্ব, উপ-মন্ত্রিত্ব ও অন্যান্য দাক্ষিণ্যের লোভ দেখিয়ে দলের ওপর নিজের নেতৃত্ব কায়েম রাখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রতিপক্ষও, অবশ্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। এঁদের ধারণা, হাই কমাণ্ড যদি শ্রীকোশলের পক্ষে হস্তক্ষেপ না করেন, বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্যগণ যদি স্বাধীন ভাবে ভোট দিতে পারেন তা হ'লে শ্রীকোশলকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে রাজনৈতিক জঙ্গলে বনবাসী হ'তে হবে, যদি না দিল্লীর বড়কর্তারা উদয়াচলে দীর্ঘকালীন সুশাসনের পুরস্কার হিসাবে তাঁর জন্যে অন্য কোনও গদী তৈরী করেন।"

মৃদু হেসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্য খবরে চোখ রাখলেন। বিশেষ কিছু ঘটছে না কোথাও। প্রধান মন্ত্রী আসাম থেকে আজ দিল্লী ফিরবেন, তাঁর মনে পড়ল, নিরঞ্জন পরিহার নিশ্চয় আজ ট্রাংক কল করবে না। গতকাল তাঁর রিপোর্ট প'ড়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খুব নিরাশ হন নি।

"পিপ্‌ল"-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বেশ মজা লাগল। "আর কতদিন?" শিরোনামায় বিরোধী পত্রিকা তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়েছে তিনি যেন স'রে দাঁড়ান। "শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল সামান্য মানুষ নন; তিনি, এখনও, মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পরেও, উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘ ছয় বছর তিনি এ আসন অলঙ্কৃত অথবা কলঙ্কিত ক'রে আছেন। এ ছয় বছরে উদয়াচলের উন্নতি একেবারে কিছু হয় নি, এমন কথা আমরা কখনও বলব না; তবে উদয়াচলের আকাশে প্রভাতেই যে অন্ধকার জ'মে আছে তা নিশ্চয় শ্রীকোশল মেনে নেবেন। এ অন্ধকার নেতৃত্বের অভাব; এ অভাব শ্রীকোশল পূর্ণ করতে চেয়েছেন গোপন ষড়যন্ত্রে, দাক্ষিণ্য বিতরণে, এবং বিভিন্ন উপদলের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে। তার ফলে নিজে তিনি উন্নতি করেছেন, তাঁর সন্তান-সন্ততি আত্মীয়স্বজনদেরও খুব মন্দ দিন কাটে নি। কিন্তু উদয়াচলের বুকে প্রভাতেই অন্ধকার জ'মে উঠেছে। উদয়াচলের নরনারী কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করছে; আর কতদিন চলবে কে. ডি. কোশলের এই দুর্বিনীত, অনাকাঙ্ক্ষিত রাজত্ব? আর কতদিন?"

হাসি চেপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাগজখানা সরিয়ে রাখলেন। এবার কাছে টানলেন "মর্ণিং টাইম্‌স"। সবাই জানে, এ তাঁর নিজের কাগজ। এর মালিক তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অম্বিকাপ্রসাদ, সম্পাদক বর্তমানে, একটি বাঙ্গালী যুবক, সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজে এনেছেন কলকাতার প্রধান সংবাদপত্র থেকে। বছর পঁচিশেক বয়স, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ যুবক। এর আগে রাজনৈতিক চালাকি দেখিয়ে তিনি একজন মারাঠী সম্পাদক রেখেছিলেন বছর তিনেক। রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে বিদায় দিতে হয়েছে।

"মর্ণিং টাইমস"-এর রাজনৈতিক সংবাদ পাঠ ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খুশী হ'লেন। চ্যাটার্জি ছেলেটির বুদ্ধি আছে! রিপোর্টারদের দিয়ে কয়েকজন "সাধারণ মানুষে"র মুখে মুখ্যমন্ত্রীর অকুণ্ঠ প্রশস্তি সংগ্রহ করেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় যে ছবি ছেপেছে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জীবনে তা প্রকাণ্ড মূলধন। বহুদিন আগে একদা তিনি পুলিশের লাঠি মাথায় নিতে গিয়েছিলেন, মাথায় না লেগে হাতে লেগেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ কে যেন সে দৃশ্যের ফটো তুলে নিয়েছিল; জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে তা ছাপান হয়েছিল। চেষ্টাচরিত্র ক'রে চ্যাটার্জি সে ছবি খুঁজে বার করেছে, বোম্বাই-এ বড় ছাপাখানায় তার থেকে ব্লক তৈরী করিয়েছে। এ ছবি আজ বেশ বড় ক'রে ছাপিয়েছে সে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চোখের সবটুকু অলস দৃষ্টি দিয়ে ছবিটা দেখলেন। পুলিশের লাঠি যার দেহে পড়েছে, তাকিয়ে দেখলেন, সে প্রায় চল্লিশের মানুষকে। সে যেন অনেক দিনের, অনেক পুরাতন, অনেকখানি বিস্মৃত দিনের আধ-অজানা অন্য কোনও মানুষ!

—ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

চরম ব্যক্তি-স্বাধীনতা (?)

"চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয় তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্ত এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

উপরি উক্ত কথাগুলি আমাদের নহে। বাঙ্গলা দেশের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক লেখক ঐ কথাগুলি বলেন এমন এক সময়, যখন বাঙ্গলার অবস্থা, স্বাধীনতা এবং কোন প্রকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা না থাকা সত্ত্বেও, বর্ত্তমান অপেক্ষা হাজারগুণ ভাল ছিল। সেইকালে নেহাত দরিদ্র ব্যক্তিও দু-বেলা কিছু আহার পাইত, পরিতে একখণ্ড বস্ত্রও তাহার জুটিত এবং অত্যন্ত দরিদ্র গৃহস্থ বাড়ীতেও ভিখারী একমুঠা চাউল ভিক্ষা পাইয়া গৃহস্থের মঙ্গল-কামনা করিত। এই-কালে দেশে চোর যে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু ধরা পড়িলে তাহার যথাযথ শাস্তিবিধান সরকার এবং সমাজ হইতে করা হইত।

বর্ত্তমানে 'স্বাধীন' দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সনাতন চোরের সংখ্যা বাড়িয়াছে, অন্যদিকে তেমনি নূতন এক ভদ্রশ্রেণীর চোর-জুয়াচোরের সংখ্যা হইয়াছে অগণ্য, এবং ইহাদের বিচিত্র কার্য্য-কলাপের কল্যাণে লোকের ঘটিবাটি খোয়া না গেলেও, মানুষ ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছে। 'সনাতনী'-চোর অন্ধকারের আড়ালে তাহাদের পেশামত কাজ-কারবার চালায়, কিন্তু 'স্বাধীন'-দেশের শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, ভদ্র-বেশধারী নব্য-চোরেরা দিবালোকে, হাটেবাজারে, এমন কি সরকারী দপ্তরে বসিয়াই তাহাদের চোরাই কারবার এবং ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া যাইতেছে—'স্বাধীনভাবে' এবং নিশ্চিন্ত মনে। বিস্ময়ের কথা, এই নূতন শ্রেণীর মহাশয়-চোর এবং জুয়াচোরদের প্রকৃতি-পরিচয় শাসক-সম্প্রদায়, সম্পূর্ণ অবগত থাকা সত্ত্বেও ইহাদের 'পেশাগত স্বাধীনতায়' কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহারা ভরসা করেন না! হস্তক্ষেপ করা ত দূরের কথা 'মহাশয়-চোরদের' মাতার-ভগিনীর পুত্রগণ সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সম্পর্কিত এই 'তুতো'-ভ্রাতাদের পুণ্য-কর্ম্মে এবং 'সমাজ-সেবার' কাজে সর্ব্বপ্রকার সহায়তাই দান করিতেছেন।

চাল, চিনি, বস্ত্র, ঔষধ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া মহাশয়-ব্যক্তিদের যে বিষম কারবার চলিতেছে এবং যাহার ফলে আজ সাধারণ মানুষের জীবন নাসিকান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহা কর্তৃপক্ষের নিশ্চয় জানা আছে এবং এই জন-প্রাণঘাতী কারবারীদের পরিচয়ও কর্ত্তাদের অজানা থাকিবার কথা নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষকে অসহনীয় নির্য্যাতন অত্যাচার হইতে রক্ষাকল্পে কর্ত্তারা বড় বড় বাক্য ছাড়া অন্য কোন্ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবেন কি?

ভেজাল ঔষধ সেবনে, অখাদ্য-কুখাদ্য আহারে লক্ষ লক্ষ লোক বিচিত্র-এই-স্বাধীন-রাষ্ট্রে পরম স্বাধীনভাবে প্রতিদিন মহাপ্রস্থানের পথে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছে —কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটিও ভেজাল-ঔষধ প্রস্তুতকারক কিংবা ভেজাল খাদ্য-ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্তমূলক দণ্ডবিধান কর্ত্তারা করেন নাই। কোটি কোটি অসহায় মানুষের মৃত্যু যাহারা অহরহ ঘটাইতেছে,—তাহাদের একজনেরও আজ পর্য্যন্ত মৃত্যুদণ্ড দূরে থাক, কঠিন কোন শাস্তিও দেওয়া হয় নাই। সাধারণ খুনীর বিচারে যদি মৃত্যুদণ্ড বিহিত হইতে পারে, তাহা হইলে অসাধারণ খুনী, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যাকারী খুনীদের কি দণ্ড বিধান হওয়া উচিত, কর্ত্তারা তাহার জবাব দিবেন কি?

চাউল, ডাইল, চিনি, বস্ত্র, লেখাপড়ার জন্য কাগজ-পেন্সিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় ষ্টেশনারী সামগ্রী, প্রায় সবই আজ স্বল্পবিত্ত মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। চীনাদের

আক্রমণের সময় বহু ব্যবসায়ী বলেন যে, তাঁহারা দেশের এই অবস্থায় দ্রব্যমূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি অবশ্যই রাখিবেন। সতর্ক দৃষ্টি হয়ত তাঁহারা এখনও রাখিয়াছেন, কিন্তু ঐ বিষম-সতর্ক দৃষ্টির পশ্চাৎ দিয়া দ্রব্যমূল্য হু হু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আজ গগনস্পর্শী হইয়াছে এবং ক্রমশঃ এই দ্রব্যমূল্য আকাশকেও অতিক্রম করিবে, ইহাই সকলের আশঙ্কা হইতেছে!

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রীও সদম্ভে ঘোষণা করেন যে—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে সরকার কখনও দিবেন না, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে, সরকারী সকল সদম্ভ ঘোষণার মত, এ-ঘোষণাও অর্থহীন, ইহার বাস্তব মূল্য এক নয়া পয়সাও নয়। দেখা যাইতেছে—চোর, জুয়াচোর কালোবাজারী প্রভৃতি কারবারীদের দমন বা শায়েস্তা করিবার শক্তি সরকারের নাই, যদিও বা তাহা থাকে, লাল-ফিতার ফাইলেই তাহা চিরকাল আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু সরকারের মনে রাখিবেন :

পশ্চিম বঙ্গের উপনির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস যে সাফল্য লাভ করিয়াছে কেবল তাহার উপর ভরসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সাধারণ মানুষেরা বিক্ষোভ প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুধু পথ পাইতেছে না বলিয়াই এই বিক্ষোভ এখনও কোন বৃহৎ আন্দোলনের আকার ধারণ করে নাই। অতীতে যে সব বামপন্থী দল এই সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছে তাহাদের পক্ষে আজিকার অবস্থায় আর কার্য্যকর নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ চীনের হামলার পরবর্ত্তী ঘটনা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অন্যান্য বামপন্থী দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। অকম্যুনিষ্ট বামপন্থী দলগুলিও অপেক্ষাকৃতশক্তিহীন। সুতরাং জনসাধারণের অসন্তোষ কোন সংগঠিত রূপ পাইতেছে না। কিন্তু সাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি এই অসন্তোষ ভাষা না পায় তাহা হইলে অন্ধকার বিবরাশ্রয়ী সমাজবিরোধী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে তাহাতে ভুল নাই। অতএব সময় থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল। না হইলে কোথা দিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিবে কেহই বলিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ দেশের কারণে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য এবং কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে, আরো করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহারা যদি প্রতিনিয়ত বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখে যে, কষ্ট এবং কৃচ্ছ্রসাধন কেবল জনসাধারণের জন্যই, আর উপর মহলের চোর, বাটপাড়, জুয়াচোর, কালোবাজারীর দল শাসকগোষ্ঠীর সহিত পরম দহরম-মহরমে, কর্ত্তাব্যক্তিদের সহিত আঁতাত স্থাপন করিয়া—জনগণের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে তবে তাহার বিষময় ফল অচিরেই ফলিবে। এ-বিষয়ে পূর্ব্বেও আমরা সাবধান বাণী দিয়াছি, প্রয়োজনবোধে আবার দিতেছি।

এই কঠিন সময় গান্ধীজীর একটি কথা কংগ্রেসী সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে।

"....Submission, therefore, to a State wholly or largely unjust is an immoral bartar for liberty ....Civil resistance is a most powerful expression of a soul's anguish and an eloquent protest against the continuance of an evil stage."

গান্ধীজী, মার্কিন দার্শনিক Thoreau Civil Disobedience সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেন, তাহাতেও পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন :

"....All men recognise the right of revolution, that is, the right to refuse allegiance to, and to resist, the government, when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable."

জনমানসে আজ কেন্দ্রীয় ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকার সম্পর্কে কি ধারণা এবং ঘৃণা এবং বিশ্বাস দানা বাঁধিতেছে তাহা অনুসন্ধান করা উচিত কিনা শাসকমহল আত্মরক্ষার কারণে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

অনাহারে মৃত্যু হইতে পারে না!

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জিলার তিন-চারটি থানার অবস্থা প্রায়-দুর্ভিক্ষকালীন হইয়াছে—সংবাদপত্রের রিপোর্ট এবং এ-রাজ্যের শ্রী এন. সি চ্যাটার্জি, শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী প্রভৃতির পুরুলিয়া সফরান্তে বিবৃতি হইতে জানা গিয়াছে কিছুকাল পূর্ব্বে। সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ এবং অন্ততঃ তিন-চারজন বিশিষ্ট নেতা পুরুলিয়ার যে-চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত অঞ্চলের দুই-তিন লক্ষ মানুষের অন্নাভাবে ক্লিষ্ট একান্ত করুণ চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ-সবই বোধহয় মিথ্যা এবং সরকারকে বিব্রত করিবার হীন মতলবেই করা হইয়াছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের 'ত্রাণ'-মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষের বিষম অন্নাভাবের বিষয়টি এক কথায় উড়াইয়া দিয়াছেন—কিছুই নয় বলিয়া।

পুরুলিয়ায় অনাহারে মৃত্যু সংবাদ অস্বীকার করার জন্য, শ্রীমতী আভা মাইতিকে বিশিষ্টা ভদ্রমহিলা বলিয়াই, মিথ্যাবাদিনী বলিতে পারিলাম না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রীর নিজস্ব প্রখ্যাত দৈনিক-পত্রিকা বলিতেছেন :

"তিনটি থানাতেই অন্নাভাব প্রকট। ফ্যান ও পাতাসিদ্ধ খাইয়া সুস্থ মানুষগুলি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। গত তিনমাসে দুর্গত অঞ্চলে বার জন অনাহারে, তিলে তিলে শুকাইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। সরকার ইহা স্বীকার করেন না। কারণ তাঁহাদের

নীতি কাহাকেও অনাহারে মরিতে তাঁহারা দিবেন না। অনাহারজনিত রোগে যদি কোন হতভাগ্যের ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা আর কি করিতে পারেন? এই আশ্চর্য ব্যাখ্যা ব্রিটিশ আমল হইতে দেশবাসী শুনিতে অভ্যস্ত। কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর পথ রুদ্ধ হয় নাই। অসহায় মানুষের দুর্গতিরও উপশম হয় নাই। বরং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত এই ধরণের অকরুণ উক্তি ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে। বিহারের পুরুলিয়া উপেক্ষিতা ছিল। পশ্চিম বাংলায় আসিবার পরও এই অঞ্চল স্বস্তির মুখ দেখে নাই। অভাব, অনটন ও অন্নাভাব এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীর নিত্যসহচর।

পুরুলিয়ার দুর্গত ত্রাণে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ যে-প্রকার তাহাতে কোন মানুষের অনাহারে মরা এই আপৎকালে দেশদ্রোহিতার সামিল হইবে! সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে:

১৯৬২-৬৩ সালে সারা বছরে রাজ্য সরকার মাত্র ৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা খয়রাতি সাহায্য দিয়াছেন। অর্থাৎ এক লক্ষ মানুষের ভাগে মাথা-পিছু বার্ষিক মাত্র চার টাকা। ত্রাণকার্য্য বা রিলিফ বাবদ সরকার গত বৎসর ব্যয় করিয়াছেন ১১ লক্ষ টাকা। শ্রমের বিনিময়ে দুর্গত অঞ্চলের মানুষ বদান্য সরকারের নিকট হইতে বছরে মাত্র ১১৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। পরিসংখ্যানের খতিয়ান আওড়াইয়া তিলকে তাল প্রতিপন্ন করা সহজ। কিন্তু সরকারী কোষাগার হইতে পুরুলিয়ার দুর্গত অঞ্চলের নরনারী সামান্য খুদকুঁড়াও পায় নাই। খয়রাতি কিংবা রিলিফের টাকা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য, ক্ষুধার মরুভূমিতে ইহা মরীচিকা সৃষ্টি করিয়াছে, তৃষিতকে একবিন্দু জলও দিতে পারে নাই।

অনাহারে পীড়িত, অভাব এবং অনটনে জর্জ্জরিত মানুষের এই বিষম অবস্থার মধ্যেও এক শ্রেণীর সরকারী অফিসার এবং কর্মচারী কি প্রকার জনসেবা করিতেছে দেখুন:

নিদারুণ বঞ্চনার মধ্যে সরকারী অফিসাররা অসহায় মানুষগুলির সহিত দুর্ব্ব্যবহার ও প্রতারণা করিতেছেন বলিয়াও অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। কোন বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হইলে (স্বভাবতঃই অনাহারে) বি. ডি. ও এবং তাঁহার অনুচরগণ গিয়া মৃতের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে চাউল, গম দানের প্রতিশ্রুতিতে সাদা কাগজে টিপসই লইয়া যাইতেছেন……। সেই কাগজে মৃত্যুর কারহিসাবে কোনও একটা রোগের নাম লেখা হয় এবং তাহাই ফাইল হইয়া রাইটার্স বিল্ডিং পর্য্যন্ত আসে। এই ধরণের ছল-চাতুরীর দ্বারা কি ক্ষুধার্ত মানুষের মুখ চাপা দেওয়া যাইবে?

অনাহারে মৃত্যুকে সরকারী মন্ত্রী অস্বীকার করিতে পারেন, সরকারী প্রেসনোটও সেই ইংরেজ আমলের ধাঁচের হইতে পারে—কিন্তু ইহার দ্বারা সত্যকে ঢাকা দেওয়া যাইবে না। অবাক্ লাগে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী দেশের এই অবস্থাতেও আরও করবৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতে পারেন!

শ্যামাপ্রসাদ

বিগত ২৩শে জুন পশ্চিমবঙ্গের শেষ পুরুষ-সন্তান শ্যামাপ্রসাদের দশম মৃত্যুবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়। বলা বাহুল্য—পশ্চিমবঙ্গের কোন কংগ্রেসী (এবং কম্যুনিষ্ট) নেতাও বাংলার এই শেষ সুসন্তানের মৃত্যু-বার্ষিকীতে যোগদান করা কর্তব্য মনে করেন নাই, তাঁহারা সকলেই মোরারজী দেশাই মহাশয়ের চরণ-বন্দনায় ব্যস্ত ছিলেন! শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে নূতন কিছু বলিবার নাই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে শ্যামাপ্রসাদের পূজনীয়া মাতা স্বর্গতা যোগমায়া দেবী পুত্রের শোকাবহ মৃত্যুর পরেই বিশ্ব-পণ্ডিত নেহরুকে যে-সব পত্র লেখেন—তাহার দু'-একটি হইতে সামান্য কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা সমীচীন হইবে। শোকার্ত্তা মাতা লেখেন:

"........I am not writing to you to seek my consolation. But what I do demand is Justice. My son died in detention—a detention without trial........His death is shrouded in mystery ...." (4-7-53).

মাতার কাতর আবেদনে এবং বিচার প্রার্থনার জবাবে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা-বিশ্বপ্রেমিক প্রধান মন্ত্রী জবাব দেন:

"........I can only say to you that I arrived at the *clear* and *honest* conclusion that there is *no mystery* in this and that Dr. Mukherjee was given every consideration......" (5-7-53).

ইহার পর শোকার্ত্তা মাতা প্রধান মন্ত্রীকে লেখেন:

"....It is futile to address you further. You are afraid to face facts. I hold the Kashmir Government responsible for the death of my son. I accuse your Government of complicity in the matter. You might let loose your mighty resources to carry on a desperate propaganda, but Truth is sure to find its way out and one day you will have to answer for this to the people of India and to God in Heaven.......” (9-7-53).

জবরদস্তিমূলক গণতন্ত্র

কংগ্রেসী স্বাধীন ভারতের বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় 'স্বাধীন' অর্থমন্ত্রীর সব কিছুতেই একটা 'জবরদস্তির মনোভাব ক্রমশঃ মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিতেছে। দেশের কোটি কোটি মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা সম্যক্ জানা সত্ত্বেও এই ক্ষীণদেহ দাম্ভিক এবং

বাদশাহী-মেজাজী মোরারজী দেশাই—পাহাড়-প্রমাণ করের উপর আরও নূতন কর বসাইয়া দেশের মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে কোন সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করিতেছেন না। মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকারী বলিয়া কথিত জন-দরদী, মানব-প্রেমিক নেহরু নির্ব্বাক্ অসহায় দৃষ্টিতে মোরারজীর বিষম 'কর'-কীর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছেন।

দাম্ভিক মোরারজী স্বাধীন ভারতের নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপরেও হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই ব্যক্তির 'জবরদস্তিমূলক' সঞ্চয় পরিকল্পনা এবং ভারতীয় নাগরিকের উপর তাহার জবরদস্তি প্রয়োগই ইহার প্রমাণ। সরকার খাজনা ধার্য্য এবং নানা প্রকার অন্যায় কর বসাইতে পারেন এবং একবার এইসব লোক-সভায় পাশ হইয়া গেলে ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া মানুষকে হয় তাহা দিতে হইবে, অন্যথায় কারা-বরণ কিংবা অন্যবিধ দণ্ডভোগ অবশ্যই করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা কষ্টকর নহে। কিন্তু সরকারের খাজনা এবং ট্যাক্সের দাবি মিটাইয়া মানুষের হাতে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে, (থাকিবে কি না সন্দেহ) তাহা খরচ এবং বিলি-ব্যবস্থা কে কি ভাবে এবং কি হিসাবে করিবে, তাহাতে সরকারের মোড়লী বা কর্ত্তৃত্ব করিবার অবকাশ নাই বলিয়া বিশ্বাস করি।

আমার টাকা (চোরাই নহে) আমি কি ভাবে খরচ করিব, কতখানি সঞ্চয় কি ভাবে এবং কোথায় করিব এবং কোন সঞ্চয় করিব কি না, করিবার মত উদ্বৃত্ত কিছু আছে বা থাকিবে কি না, তাহা একান্তভাবে আমার অর্থাৎ সাধারণ মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বাধীন (?) দেশের 'স্বাধীন নাগরিকের ব্যক্তিগত কার্য্যকলাপে,—তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের বা অন্য নাগরিকের পক্ষে অন্যায় ভাবে ক্ষতি-কর না হইবে, পদচ্যুত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের, যিনি বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র ভারতে চীনা-আপদ্ অপেক্ষাও আপদ এবং অধিকতর ত্রাসের সৃষ্টি করিতেছেন—হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, থাকিতেও পারে না।

এই, একদা পদচ্যুত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীরূপে যাহা কিছু ঘোষণা করিতেছেন—সবই "আমি" বলিয়া। কিছুকাল পূর্ব্বে এই পরম মূর্খ দাম্ভিক এবং অনৃতভাষী, অভদ্র ব্যক্তিটি ঘোষণা করিয়াছেন "আগামী বৎসর হইতে আমি কমৃপাল্সারী বীমার হুকুমজারী করিতে পারি।" মোরারজী কি মনে করেন দেশটা তাঁহার পৈতৃক জমিদারী এবং সকল ভারতবাসী তাঁহার আশ্রিত প্রজা-মাত্র এবং এই জমিদারপুত্র যখন যেমন ইচ্ছা হুকুমজারী করিবেন এবং তাঁহার ভারতীয় প্রজাকুলকে তাহা বিনা প্রতিবাদে নতমস্তকে পালন করিতে হইবে? এই যদি তাঁহার ধারণা হইয়া থাকে—তবে তিনি ভুল করিতেছেন। মোরারজীর করের ধাক্কায় হঠাৎ সকল মানুষই প্রথমটায় একটু বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এই ভাবিয়া যে, এত কর দিয়া কি করিয়া সংসার চলিবে। এই চিন্তাতেই আজ মানুষ আকুল। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বিষম অবস্থাতেও প্রতিকার পন্থা খুঁজিবে এবং তাহাতে অবশ্যই সার্থকতা লাভ করিবে, আজ না হয় কাল। কংগ্রেসী শাসক এবং শাসনের অনাচার, অত্যাচার এবং ব্যভিচার আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়াছে। কংগ্রেসী নেতারা, বিশেষ করিয়া যে সকল কংগ্রেসী দেশের শাসকরূপে গদীয়ান হইয়াছেন, তাঁহারা আজ নিজেদের দেশের সেবক বলিয়া মনে করেন না, নিজেদের মনে করেন দেশের প্রভুরূপে। কংগ্রেস এবং কংগ্রেসীদের এই ভয়াবহ পরিণাম গান্ধীজীর কাছে উদ্ভাসিত হয় বহুদিন পূর্ব্বেই—এবং সেই কারণে এক ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

"My fear is that the freedom, we have won, we shall not know how to preserve....It took a great deal of selfless service and sacrifice for the Congress to win the confidence of the people, but if Congressmen betray the people and, instead of serving them, become their master then, whether I live or not, I can from my long experience warn them that the country will be aflame in revolt against the bearers of the *white cap* and a *third power* will seek to profit from it."

মেদবহুল, স্ফীত-উদর, বিকটবদন যে সব কংগ্রেসী শাসক এবং নেতা তাঁহাদের সকল অনাচারে, কদাচারে এবং বিবেকবিরুদ্ধ ক্রিয়াকর্ম্মে গান্ধীর নাম গ্রহণ করেন সেই তাঁহাদেরই আজ তাঁহাদের ইষ্টদেবতার সাবধান বাণী স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। অনাচার প্রতিরোধ না করিতে পারিলে 'চীনা-মারের' দোহাই দিয়া অদ্যকার শাসকগোষ্ঠী নিজেদের 'জন-মার' হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। দেওয়ালের লিখন ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতেছে।

মোরারজীকে দেশের লোকের 'পর'-কালের চিন্তা ত্যাগ করিয়া একবার ধীরভাবে তাহাদের বর্ত্তমানের অবস্থা ভাবিয়া দেখিতে বলিব। বর্ত্তমানে সাধারণ মানুষ যদি অনাহারে, অভাবের তাড়নায় মরিয়াই যায়, তবে তাহাদের পর-কালের জন্য 'জবরদস্তি' সঞ্চয় কাহার ভোগে লাগিবে?

প্রধান মন্ত্রীর 'নিশীথ' চিন্তা

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জবাহরলাল তাঁহার এক ভাষণে বলেন যে, কেবলমাত্র নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই কংগ্রেসের কাজ হইবে না। তাঁহার মতে কংগ্রেসের নাকি কি একটা বিরাট্ আদর্শ ও তাহার সঙ্গে উদ্দেশ্যও আছে। স্বাধীনতা (?) লাভের পর নূতন যে পরিস্থিতির (এ বাক্যের অর্থ কি?) উদ্ভব হইয়াছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসী কংগ্রেসের আদর্শ (অব্যক্ত) এবং উদ্দেশ্যকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। (কংগ্রেসী মন্ত্রী মহল এবং কংগ্রেসী নেতারা তাহাই ত করিতেছেন!)

বর্ত্তমান কংগ্রেসের বিরাট্ আদর্শ বলিতে কি বুঝায় তাহা জবাহরলাল বলেন নাই এবং সেই 'অব্যক্ত' এবং 'উহ্য' আদর্শ কংগ্রেসীরা অনুসরণ করিতেছেন কি না, তাহার বিচার নেহরুজী নিজেই করিয়া দেখিবেন, অবশ্য বিচার-ফল 'অপ্রকাশ' থাকিবে। কংগ্রেসের ঠিক উদ্দেশ্য কি, তাহার স্পষ্ট কোন ধারণা আমাদের না থাকিলেও আজকের কংগ্রেসীদের (মহা মহা মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কংগ্রেসী চাপরাসী পর্য্যন্ত) উদ্দেশ্য কি এবং এই উদ্দেশ্য যে কি বিষম ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে এবং তাহার জন্য দেশের সকল জনকে কি মূল্য দিতে হইতেছে তাহা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে হাড়ে হাড়ে আমরা অনুভব করিতেছি।

মহামন্ত্রীর ভাষণে জানিতে পারিলাম (এই লইয়া প্রায় বিশ লক্ষ বার) যে 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ গঠনের জন্য প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রীর কথায়—ইহা ভাবা অযৌক্তিক হইবে না যে দেশের অকংগ্রেসীদের 'সমাজতান্ত্রিক' দেশ গঠনের কাজে কোন দায়িত্ব আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। অকংগ্রেসী দেশবাসীর একমাত্র কাজ অনাহারে-অভাব-অনটনে মৃত্যুবরণ না করা পর্য্যন্ত কেবল কৃচ্ছ্রসাধন এবং কংগ্রেসীদের 'অব্যক্ত' আদর্শ সাধনে এবং 'উদ্দেশ্য'অনুসরণে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা, (ইচ্ছা না থাকিলেও,) দান করা—অর্থাৎ করিতে বাধ্য হইবে।

নেহরুর মতে ভারতে কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যাহা দেশে স্থায়ী সরকার রাখিতে সক্ষম। এই সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর একথাও বলা কর্ত্তব্য ছিল যে, এদেশে কংগ্রেসই যেমন স্থায়ী (কতকাল?) সরকার রাখিতে সক্ষম, তেমনি জবাহরলাল নামক এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি—এই কংগ্রেসকে চিরকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম। অতএব দেশের একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত—নেহরু এবং কংগ্রেস—উভয়কেই চিরকালের জন্য যেমন করিয়াই হোক বাঁচাইয়া দেশের শাসকরূপে সিংহাসনে (চিরকাল) অধিষ্ঠিত রাখা।

কংগ্রেস-নেতা কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া ক্ষমতায় চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য কংগ্রেসীদের অবশ্যই নির্দ্দেশ দিতে পারেন, কিন্তু ঐ নির্দ্দেশ দানকালে ভারতের অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টিকে নিছক গালাগাল করিবার চিরাচরিত বদভ্যাস কিছুতেই কি ত্যাগ করিবেন না? কংগ্রেসী-বিরোধী হইলেই কি পার্টি বিশেষ নেহরুর সাধের তথাকথিত সমাজতন্ত্র (বাস্তবপক্ষে কংগ্রেসতন্ত্র) বানচাল করিতে আদাজল খাইয়া লাগিবে? এ-বিশ্ব সংসারে একমাত্র নেহরুই কি চির-অভ্রান্ত, শুদ্ধচিত্ত, পক্ষপাত-অদৃষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার নেপোটিজম্-বিবর্জ্জিত নৈতিক এবং রাজনৈতিক নেতা?

পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে আজ লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে, দেশের প্রধান মন্ত্রী এবং অদ্বিতীয় কংগ্রেস নেতা হইয়াও তিনি পশ্চিমবঙ্গের এই অসহায় অনাহারী মানুষগুলির জন্য একটিও সমবেদনার কথা বলিবার সময় পাইলেন না কেন? পশ্চিমবঙ্গ 'অটোনমাস' রাজ্য বলিয়াই কি ইহার কোন ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না?

ভাষণ-প্রসঙ্গে নেহরুজী কংগ্রেসকে সর্ব্বপ্রকার গ্লানি-মুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান। আমরা ত মনে করিতাম কংগ্রেসে কোন প্রকার গ্লানি বা কলঙ্ক নাই! কংগ্রেসকে গ্লানিমুক্ত করার দায়িত্ব তাহা হইলে সাধারণ কংগ্রেসী কর্ম্মীদেরই দায়—এ বিষয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং উচ্চমহলের কংগ্রেসী নেতাদের কিছু করিবার নাই। তাঁহাদের বৃহত্তর এবং আখের গুছাইবার কাজে সদা ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া নীচ কর্ম্ম হইতে নেহরু'কংগ্রেসী-ব্রাহ্মণ-বৈদ্যদে'র ছাড় দিয়াছেন। নেহরু সত্যই দয়াময়!

এবার বেলগাছিয়া ভেটেরিনারী কলেজ ও পশু চিকিৎসালয় নিধনোৎসব!

প্রায় ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গত ডাঃ রায়ের আমলে কলিকাতা হইতে বেলগাছিয়ার প্রখ্যাত ভেটিরিনারী কলেজ এবং পশু হাসপাতালটিকে অন্যত্র সরাইবার উদ্যোগের প্রাথমিক পর্ব্ব সুরু হয়—আজ তাহা কার্য্যকরী হইতে চলিয়াছে। এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটিকে ডাঃ রায়ের বিধবা মানসকন্যা কল্যাণীতে চালান করিবার ব্যবস্থাদি নাকি চূড়ান্ত ভাবে স্থির করা হইয়াছে। এই

সংবাদ পশু-চিকিৎসার সহিত সংশ্লিষ্ট মহলে পরম দুঃখ-বিস্ময় এবং অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে।

কলিকাতার প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়াই প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই কলেজটি স্থাপন করা হয়। পশু-চিকিৎসা শিক্ষার পক্ষেও কলিকাতা আদর্শ স্থান। এখানে যেমনি পশু-দরদীদের অভাব নাই, তেমনি অভাব নাই বিভিন্ন জাতীয় পশুর। চিড়িয়াখানা ভেটেরিনারী কলেজের ছাত্রদের শিক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় কেন্দ্র। ইহা ছাড়া এই চিকিৎসার ব্যবস্থার সহিত কোন না কোন যোগ রহিয়াছে বহু প্রতিষ্ঠানের, যেমন—বিজ্ঞান কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, স্টাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি।

এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়া পশু-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ (চিন্তাবিদ নহে) ব্যক্তিরা বলেন, কলেজটি কল্যাণীতে লইয়া গেলে ভেটেরিনারী ছাত্র এবং সর্ব্বোপরি নগরীর পশু-চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

তাঁহারা আরও বলেন যে, কৃষির সহিত পশু-চিকিৎসা ব্যবস্থা মুখ্যতঃ জড়িত নয়। সুতরাং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা স্থানান্তরে বিশেষ হেতু থাকিতে পারে না। একমাত্র হরিণঘাটা দুগ্ধ-কেন্দ্রের গরু-মহিষের উপর ভিত্তি করিয়া সেখানে কলেজটি চালান করার কারণ হইতে পারে না।

বিশেষজ্ঞ কমিটিও নাকি প্রথমে কলেজটি স্থানান্তরের প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নাই। উক্ত বিশেষজ্ঞদের অভিমতে কল্যাণীতে একটি ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা থাকিলে সেখানে একটি নূতন কলেজ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য বেলগাছিয়ার পুরাণো শিক্ষায়তনটিকে ভাঙ্গিবার সিদ্ধান্ত তাঁহারা সমর্থন করিতে পারেন না।

গড়া জিনিষ ভাঙ্গিবার প্রতি আমাদের বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসকদের একটা প্রবল ঝোঁক প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রকট দেখা যাইতেছে। অবশ্য কাজের কাজ যাঁহারা করিতে পারেন না কিংবা করিতে জানেন না, অকর্ম্মকেই তাঁহারা জীবনের মহাকর্ম্ম বলিয়া ভাবিয়া থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন যে মন্ত্রীমহাশয়দের অধীনে রহিয়াছে সেই সব মন্ত্রীদের—দু'-একজন ছাড়া বাকী সকলের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং যোগ্যতার বহর জানা আছে। যোগ্যতার মূল্য হিসাবে—মাসে যাঁহাদের ৫০৲ টাকা স্বাধীনভাবে রোজগার করিবার ক্ষমতা নাই, সেই তাঁহারাই আজ দেশের শাসক, আমাদের ভাগ্যবিধাতা।

এই পরম অযোগ্যের দল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসবাস করিয়া এবং অভাব-অনটনমুক্ত স্বচ্ছল অবস্থায়, পরম আনন্দে সব কিছু ভাল গড়া জিনিষ ভাঙ্গার খেলায় মাতিয়াছেন।

বেলগাছিয়ার পশু-হাসপাতালটি মন্ত্রীমহাশয়দের কোন্ পাকা ধানের ক্ষেতে মই দিতেছিল?

কলিকাতার পথঘাট গিয়াছে, কার্জ্জন পার্কও প্রায় নাই, ডালহৌসী স্কোয়ার ট্রাম এবং লাল বাড়ীর কর্ত্তা মহাশয়দের গাড়ীর আশ্রয় স্থল, লেকও প্রায় যায় যায় অবস্থায়, বহু স্মৃতিধর পুরান সিনেট হল্ আজ স্মৃতিতেই পরিণত, গোল-দীঘি হকার নামক আক্রমণ-কারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ, অন্যান্য পার্কগুলিও প্রায় নাই, গিরীশপার্কে পাকা ইমারত মাথা তুলিয়াছে, আরো তুলিবে!

তবে আর বেলগাছিয়া বাদ যায় কেন?

আ মরি বাংলা ভাষা!

পশ্চিম বঙ্গ সরকারী দপ্তরে সর্ব্বপ্রকার, কিংবা যতদূর সম্ভব (সরকারী) কার্য্যাদি বাঙ্গলার মাধ্যমে চালাইবার নির্দ্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ যথাযথ এবং বাঙ্গালী মাত্রেই সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবে। কিন্তু বিপদ্ বাধিয়াছে সরকারী অফিসারদের, বিশেষ করিয়া উচ্চপদাধিকারীদের। পরিভাষা লইয়া তাঁহাদের 'ঘোল' নামক পানীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও আকণ্ঠ পান করিতে হইতেছে। 'সরকারী' পরিভাষার কয়েকটি নমুনা দেখুন:—

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক—অবরবর্গীয় করণিক। আপার ডিভিশন ক্লার্ক—উত্তর বর্গীয় করণিক। পার্টটাইম অফিসার—খণ্ডকাল আধিকারিক, অফিসার ইনচার্জ্জ—আযুক্ত আধিকারিক, চীফ্ হুইপ—মুখ্য প্রতোদক, করোনার—আশুমৃত পরীক্ষক, ডি আই জি সি আই ডি—উপমহা পরিদর্শক দুষ্কৃতি বিমর্শ বিভাগ, ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল—উপমহা প্রৈষাধিকারিক, ডেপুটি ডাইরেক্টর পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ—উপ প্রৈষতার অধি-কর্ত্তা।

এই প্রসঙ্গে জনৈক সরকারী কেরাণী একদিনের 'ক্যাজুয়াল' ছুটির জন্য বাঙ্গলা দরখাস্ত কি ভাবে করেন তাহার একটি নমুনা দিতেছি—

"ওলাওঠা তথা সান্নিপাতিক রোগের সূচী-প্রয়োগের ঔষধ গ্রহণে শরীর জর্জ্জরিত। একদিনের ছুটি মঞ্জুর করা হোক।"

ব্যাপারটা পাঠক বোধহয় ঠিক ধরিতে পারিলেন না। টি-এ-বি-সি ইনজেকৃসন লইয়া শরীর ঘায়েল হওয়াতেই উপরি উক্ত ছুটির দরখাস্ত!

আরো চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। Skeleton staff ইংরেজীর বাঙ্গলা হইয়াছে "কঙ্কালসার কর্ম্মচারী-বৃন্দ!" (আসলে কথাটা নির্ম্মম সত্য!) "Non-Technical"-এর বাঙ্গলা হইয়াছে "অযান্ত্রিক।"

বাঙ্গলা দরখাস্তের উপর অফিসারদের মন্তব্য কি প্রকার হইতেছে তাহার মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—ইংরেজিতে অফিসারের মন্তব্য যেখানে হইত :—"থ্রু প্রপার চ্যানেল" —অর্থাৎ দরখাস্ত "প্রপার চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠাও," জনৈক উৎসাহী অফিসার এই মন্তব্য বাঙ্গলাতে করিলেন : "ঠিক খাল বরাবর দরখাস্ত পাঠাও!"

এই প্রকার চমৎকার দৃষ্টান্ত আরো শত শত দেওয়া যাইতে পারে—তাহার প্রয়োজন নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আকাশবাণীর বিচিত্র বাঙ্গলা শব্দের বিষয় বহুকিছু বলা যায়। কিছুকাল হইতে এমন সকল বাঙ্গলা শব্দ প্রচারিত হইতেছে—যাহার অর্থ বুঝা কষ্টকর। যেমন "অনুদান"- অর্থ কি? "সম্প্রচারিত" কি অর্থে? শিক্ষণ কথার মানে বুঝি—'প্রশিক্ষণ' কি কারণে?

ভোজ কিংবা ভোজন—বুঝিতে পারি। "রাষ্ট্রীয় ভোজ" কি? "রাষ্ট্রীয় ভোজ" যদি চল্ হয়, তাহা হইলে 'গণ-ভোজ', 'জন-ভোজ', বাণিজ্য-ভোজ','কর্ম্মী-ভোজ', 'কর্ত্তা-ভোজ' প্রভৃতি শব্দ অচল হইবে কেন? আকাশবাণী "সমাজ-শিক্ষা" বলিতে কি বুঝিয়াছেন জানি না। (Social-education?) আকাশবাণীর পণ্ডিতগণ যদি এ-বিষয় কিছু প্রচার (অথবা 'সম্প্রচার') করেন—অপণ্ডিত শ্রোতাদের প্রতি অশেষ দয়া করা হইবে।

আরো কতকগুলি ইংরেজী শব্দের বাঙ্গলায় বিচিত্র বানান চল হইতেছে। যেমন Mail Train = "মেইল ট্রেইন।" Daily Paper = ডেইলী পেপার। Tailer = "টেইলার।" ইংরেজী যে কোন শব্দের বানানের মধ্যে যদি···ai···এই অক্ষর দুটি থাকে, তাহা বাঙ্গলায় "···এই···" হইবে। যেমন পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ডেলি পেপার—পরিণত হইয়াছে ডেইলি পেপারে। আজকাল সরকারী বিজ্ঞাপনে, ইস্তাহারে, এমন কি বেসরকারী সংস্থার বিজ্ঞাপন-ইস্তাহারেও বাঙ্গলায় এই অপূর্ব্ব এবং দুষ্ট-বানানের (ইংরেজী শব্দের) অতি প্রাবল্য দেখা যাইতেছে।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার সামাজিক, পারিবারিক, সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে, নৈতিক-রাজনৈতিক জীবনে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে একটা কথা চলিত ছিল—ছোট্ট একটি কথা, যাহাকে "শুদ্ধতা" নামে অভিহিত করা হইত। আমাদের বর্ত্তমান জীবন হইতে এবং সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যক্ষেত্র হইতেও এই 'শুদ্ধতা' নামক সামান্য জিনিষটি নির্ব্বাসিত হইয়াছে! আর কিছুকাল পরে হয়ত দেখা যাইবে—বিধান বা লোকসভায় আইন পাশ করিয়া ভারতীয় অভিধান হইতে—চরিত্র, পবিত্রতা, শুদ্ধতা, বিবেক, সততা, সত্যনিষ্ঠা এবং এই শ্রেণীর এবং জাতীয় শব্দগুলিকে—সমূলে উৎপাটিত করা হইবে। দেরী হইবে না - দিন (প্রায়) আগত ঐ!

আমাদের মতে :

কলিকাতা আকাশবানীর প্র-মূর্খ প্র-পণ্ডিতদের প্র-পৃষ্ঠে প্র উত্তম-প্র-মধ্যম প্র-ব্যবস্থা হইলে বাঙ্গলা শব্দাবলীর প্র-মৃত্যু হয়ত প্র-রোধ হইতে পারে। এই প্র-ব্যবস্থা ছাড়া বাঙ্গলা ভাষাকে প্র-রক্ষা করিবার প্র-বিকল্প প্র-উপায় নাই।

ইছাপুর গান্ এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর বুকে রঘুরামের শক্তিশেল!

রাজ্যসভায় শ্রীরঘু রামাইয়া (প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রী) ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ইছাপুরস্থিত অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ কারখানা হইতে ডিফেন্স মেটালার্জিক্যাল রিসার্চ্চ ল্যাবরেটরী দক্ষিণ ভারতের হায়দারাবাদে স্থানান্তরিত হইবে। এ সংবাদ পূর্ব্বেই আমরা একবার দিয়াছি। স্থানান্তরের কারণ: ইছাপুরে স্থানাভাব খুবই অনুভূত হইয়াছে (হঠাৎ!)। এই বীক্ষণাগারটির আয়তন বাড়াইয়া বৃহত্তর করিবার জায়গাজমি ইছাপুরে মিলিল না—এবং এই বিষম তথ্য আবিষ্কৃত হইল—চীনা আক্রমণের পরক্ষণেই। হায়দারাবাদে নাকি কেবল জমি নহে, 'পাওয়ার' এবং জলও প্রচুর—একান্ত সহজলভ্য!

ইছাপুরের কারখানায় এই ল্যাবরেটরী চালু আছে ১৯৩৯ সাল হইতে এবং মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বেই দশ-পনের লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ল্যাবোরেটারী ভবনটিকে বহু পরিমাণে প্রসারিত করা হয়—যাহাতে ভবিষ্যতে এখানে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় বর্দ্ধিত চাহিদা-মত সব কিছুর পরীক্ষা-কার্য্য সুষ্ঠু এবং অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে। অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদদের পরামর্শ মতই ইছাপুর কারখানার উল্লিখিত ল্যাবরেটরীর আয়তন বৃদ্ধি করিয়া—কর্ম্মীর সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

আজ হঠাৎ এমন কি ভীষণ অসুবিধা ঘটিল যাহার জন্য সেই-পরিকল্পনা-পণ্ডিতমণ্ডলীই এই বীক্ষণাগারটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সুদূর হায়দারাবাদে চালান

করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন, তাহা জানা নাই, তবে একটি বিশ্বস্ত সূত্র হইতে এইটুকু জানিতে পারা গেল যে, 'জমি-জল-আর-পাওয়ারের' অজুহাত কথার কথা মাত্র! আসল কথা—প্রাদেশিক এবং বিশেষ মহলের বিশেষজনদের স্বার্থের কারণেই পশ্চিমবঙ্গের বুকে কলি-যুগে রঘুরাম (রাবণ হইয়া) লক্ষ্মণরূপী বাঙ্গলার বুকে 'জমি-জল-শক্তির' অজুহাতে শক্তিশেল হানিলেন।

পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাত্রেই নিজেকে এক একজন স্বাধীন নৃপতি বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের তোগ্‌লকী আচরণে ইহাই প্রকট। যে-মন্ত্রী যে রাজ্যের লোক, তিনি সর্ব্বপ্রকারে সেই রাজ্যের এবং রাজ্যবাসী-দের (সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ মহলের জনকয়েক ব্যক্তি বিশেষেরও) স্বার্থ রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকেন। সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ এইসব মন্ত্রীর মনে হয় না, তাহার প্রয়োজনও ইঁহারা বুঝেন না। বুঝিবার মত শক্তিও ইঁহাদের বিবেক বুদ্ধি-হীন মস্তিষ্কে নাই।

একথা কি সত্য নহে যে: ইছাপুরের কারখানাটিকে কাণা করিবার পরিকল্পনা রাজ্য-বিশেষের কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ এবং শক্তিধর অফিসারদের মাথায় সর্ব্বপ্রথম উদয় হয়? এবং যথাসময়ে যথাস্থানে 'প্যাঁচ' নামক অদৃশ্য বিষম যন্ত্রের সাহায্যে ইছাপুর কারখানাকে বধ করিবার পরি-কল্পনাকে অচিরে কার্য্যকরী করাও ঠিক হইয়া গেল? পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য, এমন কি জীবন-মরণ লইয়া খেলা করিবার অধিকার মন্ত্রী-বিশেষকে কে দিল জানতে ইচ্ছা হয়।

জানা গেল যে ইছাপুরের কারখানার এই অমূল্য এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিভাগটিকে হায়দরাবাদে লইয়া গিয়া নিজাম বাহাদুরের একটি প্রাসাদে প্রথমে বসানে হইবে। প্রাসাদটিকে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য অবিলম্বে অন্ততঃ সত্তর হাজার টাকা খরচ করিতেই হইবে। ইহার উপর আছে মাসিক ভাড়া। নিজাম বাহাদুরের প্রাসাদ পরের খরচায় মেরামত ত হইবেই —মাসিক মাত্র ২৫০০ টাকা ভাড়াও তিনি দয়া করিয়া লইবেন। সুদূরকালে নূতন ল্যাবরেটরী ভবন নির্ম্মাণ হইলে, ইহা পুনরায় গৃহান্তরিত হইবে—হয়ত বা আজ হইতে ১০০ বছর পরে।

পশ্চিমবঙ্গ হইতে কারখানার ল্যাবরেটরী স্থানান্তরিত করা, হায়দারাবাদে বাড়ীভাড়া, বাড়ী মেরামত, যন্ত্রপাতি চুরি, হারানো, ভাঙাচোরা, কর্ম্মীদের বসবাস করিবার ব্যবস্থা —ইত্যাদি খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক খরচাই হইবে প্রায় দেড় কোটি টাকার মত! সব ঠিকঠাক হইয়া হায়দারাবাদে নূতন ল্যাবরেটরীর কাজ চালু হইতে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ-সাত বৎসর সময় লাগিবে —অর্থাৎ এই পাঁচ-সাত বৎসর প্রতিরক্ষা ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষামূলক কোন কাজই হইবে না। ইহার ফলে প্রতিরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র এবং যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ সর্ব্বভাবে ব্যাহত হইতে বাধ্য, একেবারে বন্ধও হইয়া থাকিতে পারে।

ল্যাবরেটরী স্থানান্তরের কারণে অভিজ্ঞ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এবং দক্ষ কর্ম্মীদের দুঃখকষ্টের কথা বলিয়া লাভ নাই। অনেকে হয়ত ২০।২২ বছরের পুরাণো কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে পারেন, এবং ইহা বাস্তবে ঘটিলে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। নূতন এক শ্রেণীর এবং রাজ্য বিশেষের লোকের কপাল খুলিবে, বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী কর্ম্মীদের কপাল পুড়িবার কল্যাণে।

চীনা আক্রমণের কারণে দেশের লোককে যখন ক্রমাগত খরচ কমাইবার বাণী অহরহ বিতরণ করা হইতেছে, ঠিক সেই আপদ্‌কালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই তোগ্‌লকী আচরণ প্রতিহত করিবার কোন উপায়ই কি নাই? বাণী-বিশারদ, পণ্ডিতপ্রবর, বিশ্ব-নীতি বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার নেহরু পৃথিবীর সকলকে বিনামূল্যে বহু নীতিগর্ভ উপদেশ বিতরণ করিয়া থাকেন কিন্তু নিজের 'সুখী পরিবারে' বেয়াড়া মন্ত্রীদের কোন উপদেশ দিবার সাহস কি তিনি আজ হারাইয়াছেন?

যে কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজ নিজ বিভাগ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন, বিচার-বিবেচনা না করিয়া (অবশ্য এই মূর্খদের নিকট বিচার-বুদ্ধি এবং কোন প্রকার নীতি-জ্ঞানের আশা কেহই আজ আর করে না) গরীব দেশ-বাসীর কোটি কোটি রক্ত-সিঞ্চিত টাকা অনাচারে অপব্যয় করিবেন মহানন্দে, ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার বা বাধা দিবার কেহ নাই। 'লোকসভা' বলিয়া নাকি দিল্লীতে একটি পরম গণতান্ত্রিক আড্ডা বা ক্লাব আছে। এই ক্লাবের প্রাধান্য আজ শাসকদলের করতলগত—অর্থাৎ এই কমন্-মাঠের জোড়া-জোড়া-বলদের দল পরমানন্দে সারা ভারতের 'ধান-গম' প্রভৃতি শস্যসম্পদ্ ধ্বংস করিয়া নিজে-দের অতল এবং অসীম উদর পূর্ত্তির চেষ্টা দিবারাত্র করিতেছে। গণতান্ত্রিক 'দিল্লী-ক্লাবের' তথাকথিত সভ্য-দের মধ্যে 'জোড়া-বলদ' ছাড়া আর যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা একেই অতি কম, তাহার উপর এই 'অপজিসন' বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত। তবে এবার আশার আলোক দেখা যাইতেছে। উপনির্ব্বাচনের

কল্যাণে দু-তিনজন বহু-খ্যাত, সৎ বিবেক এবং বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি দিল্লীর গণতান্ত্রিক ক্লাবে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছেন। এইবার এই ক্লাবের জোড়া-বলদদের 'ধাঁতাইবার' উপযুক্ত রাখাল অন্ততঃ তিন-জন পাওয়া গেল। আমরা, গরীব করদাতারা, বহু দিন পরে আবার নূতন করিয়া "প্রভুদের গুণের কথা" শ্রবণের পরমানন্দ লাভ হয়ত করিব। ইহার বেশী আর কোন বা কিছু লাভ, বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীদের কপালে, বর্ত্তমান নীতিহীন অনাচারী পাপদুষ্ট জোড়াবলদী শাসন ব্যবস্থায় আশা করিবার কোন কারণ নাই।

পাকা খেলোয়াড়

আসন্ন একবিংশতম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে সংগঠক কমিটির সভাপতি হিসাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন 'বলদ-ই-বঙ্গাল' সর্ব্ববিষয়ে সুপক্ক ঝানু খেলোয়াড় শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়। বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের যোগ্যতম ব্যক্তির এই সম্মান যথাযোগ্য হইয়াছে। শ্রীঘোষ মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির বর্ত্তমান নন্-প্লেইং কাপ্তান এবং দিল্লীর লোকসভায় বাঙ্গালী কংগ্রেসী সদস্যদের কর্ত্তব্যে-কঠোর রাখাল। এরাজ্যে আর একজন শ্রীঘোষ আছেন, যিনি জীবনে কোন দিন ডাণ্ডা-গুলি কিংবা মার্ব্বেলও খেলেন নাই—তিনি বাঙ্গলার ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের পরিচালক মহলের কর্ত্তাব্যক্তি।

ক্রীড়াক্ষেত্রে এই প্রকার নির্ব্বাচনে প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবনের কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পাকা খেলোয়াড়ী দেখাইতে সক্ষম হইলেই, তিনি বা তাঁহারা মাঠের ক্রীড়াক্ষেত্রেও পরম যোগ্যতা দেখাইতে অবশ্যই পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজনীতি-প্রাঙ্গণে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় "always playing cricket"—আশা করি ক্রীড়াক্ষেত্রেও ইহারই প্রকট পুনরাবৃত্তি ঘটিবে!

অদূর ভবিষ্যতে শ্রীঘোষ মহাশয় ভারতীয় কংগ্রেস মণ্ডলীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন। এবং এই নির্ব্বাচন হইয়া গেলেই শ্রীঘোষকে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েসনের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন কমিটির সভাপতি (one-man-committee) পদে বরণ করা অতীব সমীচীন হইবে।

—•—

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

১৬

সদানন্দ যে এমন করবে তা যেন দুলাল সা, নিতাই বসাক কারো জানা ছিল না। সদানন্দর নিরুদ্দেশের ঘটনাটা যেন তাই সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিল।

পুলিশের লোকজন সবাই সদানন্দর মৃতদেহটা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। পাশে নিতাই বসাক ছিল, দুলাল সা-ও ছিল।

সদানন্দর দিকে চেয়ে চেয়ে দুলাল সা জিব দিয়ে একটা চুক্ চুক্ আওয়াজ করলে। অর্থাৎ—আহা!

প্রতিদিন হাসপাতালে এই লোকটাকেই গিয়ে দেখে এসেছে, যতদিন সদানন্দ হাসপাতালে ততদিন দুলাল সা নিজে গিয়ে তাকে খাবার দিয়ে এসেছে।

দুলাল সা বললে—আহা, এত বড় সর্ব্বনাশ কে করলে এর?

কথাটা নৈর্ব্যক্তিক, সুতরাং এর উত্তরও কেউ দিলে না।

দুলাল সা আবার বললে—এর একটা বিহিত আপনাকে করতেই হবে দারোগাবাবু, পাপীর দণ্ড হওয়া চাই, নইলে লোকে যে কংগ্রেস গভর্মেণ্টকে গালাগালি দেবে, বলবে, ইংরেজরা চ'লে গেছে আর দেশে অরাজক এসে গেছে—

নিতাই বসাকও সেই একই কথা বললে। পুলিশের যা করণীয় তা তারা করবেই। শুধু সনাক্ত-করণের জন্য দু'জনকে ডেকে আনা। এতদিন লোকটা এদের গদিতেই চাকরি করত, এদের দয়াতেই মানুষ, এরা বললেই লোকটাকে চিনতে সুবিধে হবে, রিপোর্টও সেই রকম দেবে তারা।

—আপনার কাকে সন্দেহ হয়, সা' মশাই?

দুলাল সা বললে—ওই ত বিপদে ফেললেন বাবা আমাকে। আমি যে দুনিয়াতে সকলকেই বিশ্বাস ক'রে ফেলি, আমি আবার কাকে সন্দেহ করব?

—আপনি ওকে ঠিক মাসে মাসে মাইনে দিতেন ত?

—মাইনে আমি কারো ফেলে রাখিনে বাবা, আমি কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্তও করিনে, মাইনেও ফেলে রাখিনে—আমার কর্মচারীদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখবেন আপনি, আমার সে স্বভাব নয়।

—কারো সঙ্গে কি এর শত্রুতা ছিল, আপনি জানেন?

—কি ক'রে তা জানব বাবা আমি, আমি ত কারো মনের ভেতর ঢুকতে পারি নে?

—কারো কাছে কিছু টাকা-কড়ি ধার করেছিল?

—তাই বা বলব কি ক'রে বাবা? কেন ধার করবে? কিসের জন্যে? সদানন্দকে কি আমি কম মাইনে দিতাম যে পরের কাছে হাত পাততে যাবে? একটা ত পেট ওর, কে খাবে ওর টাকা?

—ওর টাকা কার কাছে রাখত?

—তা ওই জানে! আমার বাবা অত খবর রাখবার প্রবৃত্তিও নেই, সময়ও নেই, সেই জন্যেই ত কর্ত্তামশাইকে বলছিলাম আমি, এ সংসার থেকে মুক্তি পেলেই আমি বাঁচি, আমার আর সংসারে দরকার নেই—

নিতাই বসাককেও ওই একই প্রশ্ন করা হ'ল। নিতাই বসাকও ওই একই উত্তর দিলে। সেও কারো সাতে নেই, পাঁচে নেই। সে দুলাল সার ম্যানেজার। দুলাল সা'র যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম সেই দেখে। ওই পর্য্যন্ত। আর কিছু জানে না সে।

শেষ কালে দারোগাবাবু বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না সা' মশাই, সরকারী চাকরিতে আমাদের অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়, নইলে আপনাদের কষ্ট দিতাম না—

দুলাল সা বললে—আলবৎ বলবেন আপনি, হাজার বার বলবেন। আসামীকে খুঁজে বার করুন, নইলে কেষ্ট-গঞ্জের বদনাম হবে না? গভর্মেণ্টের বদনাম হবে না?

বাড়ীতে এসে দুলাল সা বেশিক্ষণ কাছারিতে বসল না। অনেক লোক এসে ব'সে ছিল সকলকে যেতে ব'লে নিতাইকে নিয়ে ঘরের ভেতরে গেল।

বললে—জানলা দরজা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দাও,

নিতাই বসাকও কথা বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। জানলা-দরজা ভালো করে এঁটে বন্ধ ক'রে দিলে।

দুলাল সা জিজ্ঞেস করল—কি রকম বুঝলে?

নিতাই বসাক বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কিসের কি?

—কর্ত্তামশাইয়ের ব্যাপারটা? খোঁজ নিয়েছিলে কলকাতায়?

—নিয়েছিলাম।

—তারপর?

নিতাই বসাক বললে—যত টাকা চায় কর্ত্তামশাই, তুমি দিয়ে যাও।

—সব খরচ-খরচা নিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ত দেওয়া হয়ে গিয়েছে—

—আরো চাইলে আরো দেবে, তোমার কোনও ভয় নেই, সব উসুল হয়ে আসবে, এখনও ত কর্ত্তামশাইয়ের তিন হাজার বিঘে জমি রয়েছে, তার পর বাস্তুভিটেটাও ত বড় কম নয়—

একটু থেমে বললে—আর সদানন্দর ব্যাপার নিয়ে তুমি ভেব না—

—সে আমি ভাবছি নে।

—যাকে যা টাকা দেবার আমি দিয়েছি, পেট ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছি তাদের। এমন খাইয়েছি যে, তাদের আর ঢেকুর তোলবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই।

—বড় শত্তুর চারদিকে যে! যদি কেউ টের পেয়ে যায় তখন যেন না বিপদে পড়তে হয়!

—বিপদেই যদি পড়ব তা হ'লে আর মিনিষ্টারকে এখানে এনে অত খরচ করতে গেলাম কেন? হাজার তিনেক টাকা ত খরচা হয়েছে তার জন্যে? সেটাও কি আমি পকেট থেকে দেব বলতে চাও? আমি সেই লোক? আমি একজন মন্ত্রীর সেক্রেটারীকে স্পষ্ট ব'লে এসেছি তার ভাইপোর নামে সুগার-মিলের যে শেয়ার দিয়েছি সেটাই যথেষ্ট তার বেশি আর আমি কিছু করতে পারব না—

—কিন্তু টাকাও দেব আবার কাজও হাঁসিল হবে না, এটা ত ভাল কথা নয়! আমার পাঁচ লাখ টাকার মেশিন্ আনতে যদি এক লাখ ঘুষ দিতে বেরিয়ে যায়, তা হ'লে লাভ থাকবে কি?

নিতাই বসাক বললে—লোকসানটাই বা কোথায়? আমি ত নিজের ঘর থেকে লোকসান দিচ্ছি না। দিল্লীতে গিয়ে এবার ত সেই কথাই হ'ল। সুগারের দাম বাড়াতে ত রাজি হয়েছে ওরা। এক লাখ টাকা তোমায় তখন এক দিনে উঠে আসবে—তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

কথাটা শুনে দুলাল সা যেন একটু শান্ত হ'ল। অনেক দিন থেকেই দুলাল সা'র মনে একটা অশান্তি চলছিল। মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছে নিতাই বসাক। আগে দু'পাঁচ শো টাকার কারবার করত সে। তার পর হাজারে দাঁড়াল, হাজার থেকে লাখ। এখন লিমিটেড কোম্পানী। বছর কয়েকের মধ্যে একেবারে ফুলে ফেঁপে একাকার। কেষ্টগঞ্জে মহাজনরা এলে দুলাল সা'র কারবারের বহরটা দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। যত তাজ্জব হয় ততই দুলাল সা কোম্পানী আরো লালে লাল হয়ে ওঠে। এই ক'টা মাত্র বছর। এই ক'টা বছরেই একেবারে কেষ্টগঞ্জে সুগার-মিল হয়ে অন্য রকম চেহারা হয়ে গেছে। পেঁপুলবেড়ের ওদিকে গেলে আর চেনা যায় না। সেই বাদা জমি আর হোগলা-বনের জায়গায় নতুন সহর গজিয়ে উঠেছে। নতুন-নতুন রাস্তা হয়েছে সেখানে। লাল খোয়া-বাঁধানো রাস্তা। পার্ক হয়েছে। নাম হয়েছে দুলাল পার্ক। ছোট ছোট কোয়ার্টার ক'রে দিয়েছে মিলের লোকজনদের থাকবার জন্যে। এলাহি কাণ্ড ক'রে দিয়েছে নিতাই বসাক। সাহেব-সুবো-গুজরাটি-মারোয়াড়ী ভদ্রলোকরা আসে, থাকে আবার চ'লে যায়। তাদের থাকবার জন্যে আবার গেষ্ট-হাউস্ আছে। সে সব সাহেবী কায়দার বাড়ী।

এত যে কাণ্ডকারখানা হয়েছে, তার জন্যে দুলাল সা কিন্তু এতটুকু বদলায় নি। সে এখনও সেই ঝাঁটা নিয়ে ভোর রাত্রে ঘাটে গিয়ে সিঁড়ি ধোয় নিজের হাতে। আবার ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ক'রে ফিরে আসে।

যারা দেখে, যারা হঠাৎ এক-আধদিন দেখতে পায়, তারা বলে—মানুষ নয় ত সা'মশাই, শিব—

দুলাল সা বলে—দূর গাধা, ওসব কথা বলিস্ নে, ওতে মনে অহঙ্কার হয়—

—অহঙ্কার নেই ব'লেই ত আপনাকে শিব বলি সা' মশাই—

দুলাল সা বলে—না, ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই রে, ওতে পাপ হয়—

বিরাট্-বিরাট্ গাড়ী আসে ন্যাশান্যাল হাই-ওয়ে দিয়ে, বড় বড় মহাজন-ইন্সপেক্টর আসে, এমন কি বি-ডি-ও সুকান্ত রায়ও অফিসের জিপ গাড়িটা নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে আসে। কিন্তু দুলাল সা বিরাট্ মটর গাড়িটার ভেতরে বসেও যে-ভিখিরি সেই ভিখিরি। সেই খালি গা, বড় জোর কাঁধে একটা চাদর। চটি

পায়ে। মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। সেই প্রথম যখন এই কেষ্টগঞ্জে এসেছিল তখনও যেমন, এখনও তেমনি। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হ'লে গাড়ি থামাতে বলে। কুশল প্রশ্ন করে, বাড়ীর খবরাখবর নেয়।

কেউ যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে—আচ্ছা সা'মশাই, চিনির দর বাড়ল কেন হঠাৎ?

—তাই না কি, বেড়েছে না কি?

বড় অবাক্ হয়ে যায় তুলাল সা।

—আজ্ঞে, শুধু চিনি কেন, তেল নুন চাল ডাল সব জিনিষেরই দাম বাড়ছে বাজারে, আর ত পারছি নে আমরা—

তুলাল সা বলে—কত বেড়েছে?

—এই দেখুন না আজ্ঞে, আগে চোদ্দ আনা সের কিনেছি চিনির, এখন একটাকা দশ আনা—

—য়্যাঁ? বলিস্ কি?

যেন ভয়ে আঁতকে ওঠে তুলাল সা। যে-মানুষ দিনরাত ভগবানের চিন্তায় বিভোর, তার পক্ষে ত এ-সব ছোট খাটো ব্যাপারে নজর রাখা সম্ভব নয়।

তুলাল সা বলে—হাজার হাজার টাকা মাইনে দিয়ে কেমিষ্ট আর ম্যানেজার সুপারভাইজার রেখে আমার ত ভারি লাভ। দেশের লোক যদি খেতেই না পেল ত কিসের দরকার আমার চিনির কলের? আমি কি টাকা উপায় করবার জন্যে মিল খুলেছি?

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলে—দাঁড়া, কিছু ভাবিস্ নে, আমি দেখছি, আমি সব বেটাকে শায়েস্তা করছি। হয়েছে কি, আমাকে ভাল মানুষ পেয়ে ঠকাচ্ছে আর কি! জানে ত আমি কেবল হরিনাম নিয়ে থাকি—

ব'লে গাড়ি চালিয়ে চ'লে যায় তুলাল সা।

তারপর আবার হঠাৎ একদিন সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হ'তেই গাড়ি থামিয়ে ডাকে—এই, এই কেদার, শোন্, শুনে যা ইদিকে—

কেদার মাঠে যাচ্ছিল। দৌড়ে গাড়ির কাছে এসে তুই হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলে।

—তুই সেদিন বলছিলি না, চিনির দাম বেড়েছে কেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সা'মশাই!

—তা তুই কিছু ভাবিস্ নে, আমি সেই দিনই ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি ওম্নি ছাড়ি নি। আমি ধমকে দিলাম। বললাম—আমার দেশের চাষা-ভুষোরা খেতে পাবে না এটা ত ভাল কথা নয়! ম্যানেজার বললে—আমি কি করব, গভর্ণমেণ্ট যে যন্তর-পাতির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে! আমি বললাম,—গভর্ণমেণ্টকে তা হ'লে যন্তর-পাতির দাম কমাতে বল—

কেদার ততক্ষণে কৃতার্থ হয়ে গেছে তুলাল সা'র কথায়।

—তা তুই কিছু ভাবিস্ নে বাবা, গভর্ণমেণ্টকে সেই দিনই চিঠি লিখে দিতে ব'লে দিয়েছি, যে জিনিষ-পত্তোর যন্তোর-পাতির দাম না-কমালে চিনির দাম কমাতে পারছি না। আমার দেশের গরীব চাষা-ভুষোরা খেতে পাচ্ছে না। সব কথা খুলে লিখে দিতে বলেছি, খুব কড়া ক'রে লিখতে বলেছি—তুই কিছু ভাবিস্ নে বাবা, বুঝলি? আরে, তোরা ত জানিস্ টাকার জন্যে আমি মিল করি নি—

গাড়ি আবার ছেড়ে দেয়। কেদার কথাটা বুঝল কি বুঝল না, তা আর দেখা গেল না।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর বেশি দিন তুলাল সা'কে আটকে রাখা গেল না। একদিন নতুন-বৌ-এর কাছে খুলেই সব বললে তুলাল সা।

বললে—নতুন-বৌমা, এ-হপ্তায় বিজয়ের চিঠি পেয়েছ?

নতুন-বৌ বললে—হ্যাঁ বাবা—

—কিছু লিখেছে কবে আসবে?

নতুন-বৌ বললে—পরীক্ষার ফলটা বেরোবে এই মাসে, বেরোলেই চ'লে আসচেন—

—কিন্তু আমি ত আর থাকতে পারছি নে মা, আমার যে এ শৃঙ্খল আর ভাল লাগছে না।

এ-কথা অনেক দিন থেকেই শুনে এসেছে নতুন-বৌ। বার বার কথাটা শুনে পুরোণোই হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। নতুন-বৌ সে-কথায় বিশেষ কান দিলে না।

বললে—আমি কর্ত্তামশাই-এর বাড়ীতে একবার যাচ্ছি বাবা—

—কেন মা?

—হরতনের অসুখ আবার বেড়েছে, জ্যাঠাইমা ভাবছেন খুব, আমার কাছে খবর পাঠিয়েছেন—

নতুন-বৌ চ'লে গেল। বাইরে গাড়ি তৈরিই ছিল। নতুন-বৌ গিয়ে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলে। গাড়ির শব্দটাও কানে এল তুলাল সা'র। হাতের মালাটা নিয়ে ঘন ঘন জপ্‌তে লাগল। এমন কখনও হয় না। মনটাকে বশে না রাখতে পারলে কোনও কাজই করা যায় না সংসারে। মনটাই হচ্ছে সব। এই মনটা বেঁধে ফেলতে পেরেছিল ব'লে তুলাল সা আজ তুলাল সা হ'তে পেরেছে কেষ্টগঞ্জে। একখানা কাপড় আর একটা গামছা সম্বল

ক'রে এই কেষ্টগঞ্জে এসে আজ এতগুলো কারবারের মালিক হতে পেরেছে। ছেলেকে বিলেতে পাঠাতে পেরেছে। আজ মিনিষ্টারের সঙ্গে পাশাপাশি তার ফটো ছাপা হয়ে কাগজে বেরিয়েছে। এ সবই হয়েছে মনের জোরের জন্যে! নতুন-বৌ ও-বাড়ীতে যাচ্ছে যাক। যাওয়াটা ভাল। কারোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে কিছু লাভ হয় না। মিষ্টি-কথায় ছুরি মারলেও রক্ত প'ড়ে না। এ শিক্ষা দুলাল সা'র নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাতেই লাভ হয়েছে।

হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল। দুলাল সা ডাকলে—কান্ত—

কান্ত খাতাপত্র দেখছিল পাশের ঘরে। ডাক শুনে কাছে এল।

দুলাল সা বললে—আচ্ছা, শোন কান্ত—তুমি খোকার বিয়ের সময়ে ত ছিলে?

—আজ্ঞে, ছিলাম আমি কর্ত্তা!

—তা হ'লে তুমি ত সবই জান! তোমার মনে আছে সেই ঘটকটার কথা? কি যেন নাম—

—সেই দোলগোবিন্দ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি তোমার মনে আছে ঠিক!

কান্ত বললে—আজ্ঞে, মনে থাকবে না! সব মনে আছে। সদানন্দ তখন গদিবাড়ীতে বস্তা গোণার কাজ করত—বিয়ের রাত্তিরে পাগল হয়ে গেল ঘটক মশাই, সব মনে আছে, পনের ভরি সোনা না কি যেন সদানন্দ তাকে দেয় নি—! অনেক দিনের কথা ত সে-সব, ভাল মনে নেই—

দুলাল সা বললে—আমারই মনে নেই, তা তুমি! ও সব বাজে কথা কখনও মনে থাকে? না ওই সব বাজে কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়!

কথাটা ব'লে দুলাল সা আবার মালা জপতে লাগল।

কান্ত তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পরে বললে—সেই দোলগোবিন্দকে কিছু করতে হবে?

—আরে না! হঠাৎ মনে পড়ল তাই তোমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম। তুমি তোমার নিজের কাজ কর গে বাবা! মনকেও বলিহারি, এত লোক থাকতে হঠাৎ কি না সেই দোলগোবিন্দর কথা মনে পড়ল·· হরি, হরি,—

কান্ত চ'লে গেল। কিন্তু কথাটা বার বার মনে পড়তে লাগল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেও মনে পড়ে, মালা জপ্‌তে জপ্‌তেও মনে পড়ে। নতুন-বৌ পুজোর জায়গা ক'রে দিয়ে ডাকতে আসে। অন্যমনস্কের মত মুখখানার দিকে চেয়ে দেখে। তারপর চোখ দুটো সরিয়ে নেয়।

নিতাই বসাক একসঙ্গে বেশিদিন থাকে না কেষ্টগঞ্জে। এই কেষ্টগঞ্জ, আবার এই কলকাতা। কলকাতা থেকে আবার কখন হঠাৎ দিল্লী চ'লে যায়। দিল্লীতে আজকাল ঘন-ঘন যেতে হয় নিতাই বসাককে। সে সারা ইণ্ডিয়াটা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

সেবার নিতাই বসাক কেষ্টগঞ্জে আসতেই ডেকে পাঠালে দুলাল সা।

—কি হ'ল! এত ব্যস্ত কেন? আমি যখন আছি তখন তোমার অত ভাবনার কি আছে?

—ব্যালেন্স-শীট্-এর ব্যাপারটা নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম, গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েই চ'লে এসেছি—

—তা এবার এত দেরি হ'ল আসতে?

—দেরি হবে না? এ্যাকাউন্‌টেণ্টদের সঙ্গে লেগে ছিলাম যে! ডিভিডেণ্ডের ব্যাপার আছে, সেলস্-ট্যাক্সের ব্যাপার আছে, ইনকাম-ট্যাক্স আছে, সব সেরে কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে এলাম যে।

দুলাল সা বলল—যাক্ গে, সে যা করেছ, করেছ। আমি ডেকেছিলাম অন্য ব্যাপারে—সেই ঘটক বেটার কথা মনে আছে তোমার?

—ঘটক কে? কীসের ঘটক?

—সেই যে দোলগোবিন্দ না কি যেন তার নাম?

—কেন? তার কথা হঠাৎ তোমার মনে পড়ল কেন আবার?

দুলাল সা বললে—অত হুড়োহুড়ি করে কাজ করা আমার ধাতে সয় না। এই হুড়োহুড়ি করতে গেলেই ঠিকে ভুল হয়—তা জান?

—আমার ঠিকে কখনও ভুল দেখেছ তুমি?

—হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? কথাটা তোমায় বুঝিয়ে বলি।

ব'লে দরজা-জানলার দিকে ভাল ক'রে দেখে নিয়ে দুলাল সা বললে—সদানন্দর সঙ্গে ওই ঘটক বেটাও ত ছিল। তা সদানন্দকে যখন সরালে তখন সেটার কথা কি কখনও ভেবেছ?

—সে কি করবে? সে ত আমার ষ্টাফ্ নয়!

দুলাল সা বললে—ওই ত, ওইখেনেই তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ নিতাই, আমি শত্তুরের জড় রাখি নে। শত্তুর হচ্ছে বটগাছের মত, ওর ডালপালা বেরোয়—

—তা কি করতে চাও তুমি?

দুলাল সা দরজা-জানালাগুলোর দিকে আবার চেয়ে দেখলে। ছিট্‌কিনি হুড়কো সব বন্ধ আছে ত?

হঠাৎ নজরে পড়ল পুবের জানলার মাথার ছিট্‌কিনিটা খোলা।

বললে—আরে, জান্‌লাটা খোলা যে, তোমারও হুঁশ হয় নি—

ব'লে নিজেই উঠে গিয়ে জানলার ছিট্‌কিনিটা বন্ধ ক'রে দিলে দুলাল সা। বাইরে থেকে আর কারও জানবার সুযোগ রইল না ভেতরে কি কথা হ'ল দু'জনের।

বঙ্কু ছেলেটা সত্যিই কাজের বটে। এই এখানে যাচ্ছে, এই সেখানে দৌড়চ্ছে। ওষুধ-ডাক্তার সব একলা সামলাচ্ছে। আবার একলাই সারা রাত জেগে হরতনের পাশে ব'সে মাথা টিপে দিচ্ছে। মাঝখানে যখন অবস্থাটা খুব খারাপ হয়েছিল হরতনের, তখন ছেলেটার দিন-রাত্রি জ্ঞান ছিল না একেবারে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে গিয়েছিল। বেটাছেলে যে এত কাঁদতে পারে তা আগে কখনও কেউ দেখে নি। তার কান্না দেখে কর্তামশাইও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

বড়গিন্নীকে সান্ত্বনা দেবার কথা। কিন্তু সে-ই সান্ত্বনা দিলে বঙ্কুকে।

বললে—কেঁদো না বাবা, দৈবের কৃপা যদি থাকে ত হরতন আমার বাঁচবেই—

তা সত্যিই হরতন আবার সেরে উঠল ক'দিনের মধ্যেই। আবার বঙ্কুর মুখে হাসি ফুটল। আবার হরতনের সামনে গিয়ে বললে—ক'দিন আগে তুমি আমায় যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে—

হরতন বললে—তুমি নাকি মেয়েমানুষের মত কেঁদেছিলে?

—কে বললে তোমায়?

—কেন, মা-মণি!

বঙ্কু যেন কেমন লজ্জায় পড়ল। বললে—তা তুমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির সেরে উঠলেই পার, তা হ'লে আর আমার কষ্ট হয় না—

হরতনও হাসে। বলে—কেন, মনে পড়ে না জোড়হাটে গিয়ে আমায় কি-রকম কষ্ট দিয়েছিলে? জ্বরের ঘোরে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে বমি করতে, আমার বুঝি কষ্ট হ'ত না? আমি অত ক'রে বলতাম, বিড়ি খেও না, বিড়ি খেও না, তখন শুনতে তুমি!

—এখন ত ছেড়ে দিয়েছি। আজ কতদিন একটাও বিড়ি চোখে দেখি নি—

—সত্যি?

হরতনের চোখে-মুখে যেন আনন্দের ঝলক্ খেলে গেল।

—সত্যি খাও না বিড়ি?

—সত্যি! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। যদ্দিন না তোমার অসুখ সারে তদ্দিন একটাও বিড়ি খাব না—করিয়াছি ধনুর্ভঙ্গ পণ!

হরতন আরও হেসে উঠল।

বললে—তোমার দেখছি এখনও পাট্ মুখস্থ আছে, এখনও ভোল নি—

বঙ্কু বললে—বাঃ, ভুলব কি ক'রে? তুমি ভুলে গেছ?

—কবে!

হরতন ঠোঁট ওল্টাল। বলল—আমি আর সে-সব কথা ভাবি না। আমি সব ভুলে গেছি। কিছু মনে নেই—

—তুমি দেখছি সব পার!

— তার মানে?

—তুমি দেখছি আমাকেও ভুলে যাবে কোন্‌দিন!

হরতন বললে—ভুলে যাবই ত। তা ব'লে তুমি আর আমি? তোমার সঙ্গে আমার তুলনা? আমি ত জমিদারের নাতনী, আর তুমি?

বঙ্কু বললে—আমি জমিদারের নাতনীর প্রতিহারী—

হরতন বললে—তোমার চাকরিটা যা-হোক্ খুব ভাল হয়েছে। ভাল-ভাল খাচ্ছ-দাচ্ছ, আরাম করছ, আর কাঁসি বাজাচ্ছ—

—কিন্তু মাইনে পাচ্ছি না—

—মাইনে পাচ্ছ না ব'লে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

—না!

হরতন হাসতে লাগল। বলল—এ রকম প্রতিহারীর চাকরি ত ভাল। বিনি-মাইনের চাকর কে কোথায় পায় আজকাল, বল? দেখছি ভাগ্যটা আমার খুবই ভাল—

বঙ্কু বললে—ভাগ্য ভাল না হ'লে কি আর জমিদারের নাতনী হ'তে পেরেছ? কোথায় ছিলে আর কি হয়েছ ভাব ত! তোমার জন্যে দাদু কত খরচ করছে জান? কত বড় বাড়ী হয়েছে, কত বড় বাগান হয়েছে, মটর কিনেছে ত তোমার জন্যেই। তুমি চড়বে ব'লে—

সত্যিই কর্তামশাই হরতনের জন্যে যেন মরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। দুটো গরু কিনেছিলেন হরতন দুধ খাবে ব'লে। কোথা থেকে সব ফল-ফুলরি আনাতেন হরতনের অসুখ ভাল হবে ব'লে। হরতন একটু খুশী হবে ব'লে ফুল-গাছ পুঁতেছিলেন বাগানে। চারদিকে যখন ফুল ফুটবে তখন হরতন বাগানে বেড়াবে। গাড়ি কিনেছিলেন

হরতন বেড়িয়ে হাওয়া খাবে ব'লে। জলের মত দু'হাতে টাকা খরচ করেছিলেন। টাকার দরকার হ'লেই নিবারণ যেত দুলাল সা'র কাছে। আর টাকা নিয়ে আসত। আজ দু'হাজার, কাল পাঁচ হাজার। দুলাল সা'র কাছে গেলে টাকার জন্যে কখনও দরবার করতে হয় নি। যাওয়া মাত্রই টাকা দিয়ে দিয়েছে। দুলাল সা বলত—তুমি দেখছি নিবারণ বড় লজ্জা-লজ্জা করছ, আমার কাছে তোমার আবার লজ্জা কিসের হে? কর্ত্তামশাই কি আমার পর?

নিবারণেরই একটু সঙ্কোচ হ'ত।

বলত—আজ্ঞে, অনেকগুলো টাকা হয়ে গেল ত

—তা হোক্, আমি ত বলেই দিয়েছি, হরতনের অসুখ না সারা পর্য্যন্ত আমি টাকা দিয়ে যাব! তুমি জমি বন্ধক দিচ্ছ দাও, আমিও নিচ্ছি, কিন্তু এটা ত জানি মরতে একদিন সবাইকেই হবে। তোমার টাকা থাক্ আর না-থাক্, মৃত্যু কাউকেই রেহাই দেবে না—

নিবারণ বলত—তা ত বটেই—

—তবে?

এর উত্তরে নিবারণ আর কিছু বলত না।

দুলাল সা তখন নিজেই বলত—এই যা-কিছু টাকা-কড়ি-বাড়ী-গাড়ি একদিন এ সবই ফেলে রেখে চ'লে যেতে হবে, জানলে নিবারণ? সব ফেলে রেখে যেতে হবে। থাকবে শুধু কর্ম্ম! এই যে তোমার বিপদে আমি দেখছি, আমার বিপদে তুমি দেখছ, এইটেই থাকবে শুধু, আর কিছুই থাকবে না হে, কিচ্ছু থাকবে না—এই তোমায় ব'লে রাখলাম—

তারপর এমনি ক'রে একটা জমির তমসুক লিখে দিয়ে যেত নিবারণ আর টাকা নিয়ে যেত। সেই টাকা দিয়ে গরু কেনা হ'ত, বাড়ী মেরামত হত, মটর-গাড়ি কেনা হ'ত। হরতনের সুখ-সুবিধে-আরামের জন্যে যা করা দরকার সমস্ত করতেন কর্ত্তামশাই।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ চণ্ডীবাবু এসে হাজির। চণ্ডীবাবু একলা নয়, দলের সবাই। ভাজনঘাট না কোথায় এসেছিল গান করতে। এতদূর এসেছে আর কেষ্টগঞ্জে এসে একবার মেয়েটাকে দেখে যাবে না?

কর্ত্তামশাইও অবাক্। বৈঠকখানার ঘরে ব'সে ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন। সামনে মটরটা থামতে ভেবেছিলেন বুঝি দুলাল সা। দুলাল সা'ই বুঝি নতুন-বৌকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু না, গাড়িখানা পুরোণো। ভাড়া করা গাড়ি। ভাঙা রং-চটা।

চণ্ডীবাবু বললে—তারপর আমার মেয়ে কেমন আছে বলুন?

কর্ত্তামশাই বললেন—চলুন, আপনি নিজের চোখেই দেখবেন চলুন—

চণ্ডীবাবু বললেন—সবই ঈশ্বরের কৃপা ভট্টাচার্য্যি মশাই, ভগবান্ আপনার সহায়, আপনার ক্ষতি কে করতে পারবে বলুন—

—চলুন চলুন—হরতন আপনাকে দেখলেও খুশী হবে—চলুন—

সবাই উঠলেন। সঙ্গে ফটিকও ছিল। দলের আরও সবাই ছিল। সবাই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। (ক্রমশঃ)

যযাতির আবেদন

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আমারে ফিরায়ে দাও যৌবনের দৃপ্ত মাদকতা,
—হে নির্মম কালের দেবতা!
ফিরে দাও মধুরাত্রি,—পুষ্পগন্ধি বাসরশয়ন,
ফিরে দাও সে রোমাঞ্চ,—সে অস্ফুট প্রণয়বচন,
ফিরে দাও বহ্নি-শিখা, রক্তস্রোতে সুতীব্রদাহন,
কামনার সিন্ধু-চঞ্চলতা!

আমারে ফিরায়ে দাও অতীতের বসন্ত-রাগিণী,
দাও রাত্রি স্বচ্ছন্দ-চারিণী!
শুক্লা মালঞ্চের রূপ লুপ্ত করি দিও না ক চোখে,
পরাগ-লোভীর মোহ এনে দাও মোর কল্পলোকে,
লালসার ইন্দ্রধনু-মায়া দাও বর্ণালু আলোকে,
মুক্ত কর রূপ-নির্ঝরিণী!

আমারে ফিরায়ে দাও তৃষ্ণাতুর দুরন্ত যৌবন,
জীর্ণ দেহে আনো শিহরণ!
রজনীগন্ধার বনে বহে যাক্ মদির নিঃশ্বাস,
অভিসার-সন্ধ্যা দিক্ ছড়াইয়া কৃষ্ণ কেশপাশ,
অসহ রাত্রির বুকে দৃঢ় হোক্ প্রিয়া-বাহুপাশ,
পূর্ণ হোক্ কামনা-স্বপন!

বিদ্রোহী যৌবন চায় শেষ অর্ঘ্য সায়াহ্ন বেলায়
জীবনের সুপ্ত বেদনায়!
কোন্ মায়াবিনী তৃষ্ণা নিত্য আসে অতন্দ্রপ্রহরে,
শুনি যে আকুতি তার স্পন্দহীন রাত্রির পঞ্জরে,
কবোষ্ণ বক্ষের স্পর্শ, সুখলিপ্সা আতপ্ত অধরে
পড়ে র'বে চির প্রতীক্ষায়?

দাও ফিরে অগ্নিবন্যা এ দেহের হিমার্ত সৈকতে,
দাও গতি স্থবির এ রথে!
ক্ষণিকের শ্যামস্বপ্ন দাও এনে দাবদগ্ধ বনে,
মরু-তৃষ্ণা কর দূর প্রাবৃটের অক্লান্ত বর্ষণে,
বাড়বাগ্নি ঢেকে দাও নীলসিন্ধু-তরঙ্গ নর্তনে,
খোল দ্বার নবারুণ-পথে!

অধীর যূথিকাগন্ধভারাতুরা বসন্তযামিনী,
চন্দ্রকলা দিগন্তগামিনী;
মদির চম্পকতন্দ্রা ভেঙে যায় প্রমত্ত বাতাসে,
শুকতারা হেসে ওঠে পূর্বাশার বাতায়ন পাশে,
কোন্ অভিসারিকার রহি নিত্য মিলন-আশ্বাসে,
শুনি কানে নূপুর শিঞ্জিনী!

চকিত-বিলোলনেত্রা রূপজীবা অপ্সরার মত
কে ভাঙিবে তপস্যার ব্রত?
কানন-মর্মর জাগে শুষ্কপত্রে বসন্ত-বিলাপে,
তাপদীর্ণ রুক্ষ মরু ধূ-ধূ করে কোন্ অভিশাপে.
স্পর্শলোভাতুর চিত্ত নিদ্রাহীন বিভাবরী যাপে,
মায়াস্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্ত নিয়ত!

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-রোলে ভুজবন্ধে মিলন-শয্যায়
মৃত্যু যাচি অসহ লজ্জায়!
ফিরে লও রাজ্যপাট, ফিরে লও রত্ন-সিংহাসন,
দাও ফিরে বজ্রদেহ, সে দুর্মদ দুর্বার যৌবন,
ফিরে লও যজ্ঞফল যাহা কিছু করেছি অর্জন
ধ্যানতৃপ্ত দেবতা-সেবায়!

সুপ্তোত্থিত কামনার নিত্য শুনি কঙ্কণ-মূর্চ্ছনা
ধ্বনি তার করে যে উন্মনা!
জরা-ক্লান্ত রক্তস্রোতে এ কী শিখা বহ্নি-লালসার?
রিক্ত শুষ্ক তরুশাখে এ কী জ্বালা কুসুম-তৃষ্ণার?
বাসনার অগ্নিকুণ্ডে কে জোগাবে হবি-অর্ঘ্যভার?
কে জাগাবে নিশ্চলে চেতনা?

আমারে ফিরায়ে দাও যৌবনের উগ্র মাদকতা,
প্রাণাবেগদীপ্ত চপলতা!
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—যাহা চাহ তা-ই অর্ঘ্য লহ,
অনন্ত নরকে রাখি করো মোরে পীড়ন-নিগ্রহ,
শুধু দাও জরা-দেহে শেষবার তব অনুগ্রহ,
হে বিধাতা,—নির্মম দেবতা!

ছবি

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

কত ছবি এঁকেছে সে,
এঁকেছে, ছিঁড়েছে।
আঁকবার মত মুখ খুঁজেও ফিরেছে।
কবে কোন্ ছবিটিতে ভাল-লাগা কোন্ মুখটির
পড়েছে একটু ছায়া, তা নিয়ে সে উৎসব করেছে।

তোমার ছবি সে আঁকবে না।

ছবি আঁকবার আগে ছবি ক'রে দেখে নিতে হয়।
তোমার চোখের দু'টি মণি সে দেখে নি।
তুমি সে মানুষ,
যাকে দেখে মনে হয়, সব দেখা বাকী থেকে গেল।
হয়ত বাকীই থেকে যাবে
যতদিন দেখবে না তোমার চোখের মণি দু'টি।

দিনে রেতে দেখেছে তোমার
কর্ম্ম-আভরণ-ভরা হাত দু'টি,
দেখেছে তোমার
শরৎ মেঘের মত ভেসে চ'লে যাওয়া,
নিশীথের নিশ্ছিদ্র নিদ্রায়
দেখেছে বিবশ রেখা মুখটির।
কি সহজ সেই ছবি আঁকা।
কেবল সে দেখেনি যে তোমার চোখের মণি দু'টি,
তাই সে তোমার ছবি আঁকবে না।

যখন শিশুটি ছিলে, তারপর বালিকা-বয়সী,
তরলা তরুণী ত্রয়োদশী,
অস্থির-যৌবনা অষ্টাদশী,
পঞ্চবিংশী, চত্বারিংশী,

জীবনের পথে পথে যত রূপে পা মেলেছ তুমি,
তোমার সে-সব রূপ চোখে তার ভিড় ক'রে আসে,
সে-ভিড়ে হারিয়ে যাও তুমি।
তোমাকে সে চিনে নেবে কোন্ পরিচয়ে,
তোমার চোখের দু'টি মণি যে দেখেনি।

তোমার ও রূপে
কোন্ প্রাণ-সমুদ্রের প্লাবনের ধারা যেন
কলরোলে এসে এসে মেশে।
সেই প্রাণ অতল গভীর।

নানামুখী বাতাসের জানা ও অজানা আনাগোনা
তাতে যে রূপের ঢেউ তোলে
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার কত রূপান্তর,
প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভোলা পরমুহূর্ত্তের প্রত্যাশায়।
সে রূপে সকল রূপ যেন মেশামেশি।
সে রূপের প্লাবনের মুখে
সব-কিছু ভেসে যায়,
নিজে তুমি কোথা ভেসে যাও।

নিজে তুমি কোথা থাক
যখন সে ভাবে,
আষাঢ়ের সায়াহ্ন-আকাশে
রোজ যে সোনার ছড়াছড়ি,
তাও তার দেখা হয়, অপলক চোখে
রুদ্ধদ্বার ঘরে ব'সে শুধু যদি তোমাকে দেখে সে।

ও রকম ক'রে
সকল-কিছুতে ধ'রে তোমাকে হবে না দেখা তার।
তার চোখে চোখ তুলে একটু তাকাও।
তোমার চোখের মণিদু'টি
একটু দেখতে দাও তাকে।
ও দু'টি মণির গভীরে যে
তোমাকে সে খুঁজে পেতে চায়,
যে তুমি শুধুই তুমি, আর-কিছু নও।
রূপের প্রতীক নও,
নও এই পৃথিবীর সব রূপসীর প্রতিনিধি,
নও সব ভাল-লাগা দিয়ে গড়া এই শেষ ভাল-লাগা তার।
কুণ্ঠা, ভয়, ঘৃণা, বিরূপতা
যা-কিছু সেখানে পাক,
সে হবে একান্ত ক'রে তার পাওয়া,
তোমাকেই পাওয়া।
যতই দুঃখের হও, সে দুঃখের ধন
কেবল তারই হবে, আর কারও নয়।

হয়ত সেদিনও
তোমার ছবি সে আঁকবে না।
থাকবে না আঁকবার সুখ।
হয়ত অপটু হাতে আঁকা পটে তোমার রূপের
অপমান হ'তে সে দেবে না।

সত্যেন্দ্রনাথের হাসির কবিতা— হসন্তিকা

শ্রীসুযশনিলয় ঘোষ

অনতিদীর্ঘ জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার ফসল মোটেই অল্প নয়। মৌলিক এবং অনুবাদ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি বহু রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় শুধু সংখ্যাগত প্রাচুর্য নয়, বিষয়গত ও মর্জিগত বৈচিত্র্যও লক্ষ্যণীয়। গম্ভীর মননধর্মী এবং লঘু খেয়ালী কল্পনাপূর্ণ কবিতার সঙ্গে তিনি হাস্য-পরিহাসমূলক কবিতাও কিছু লিখেছিলেন। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, তাঁর কাব্যের এই শাখাটি তুলনায় শীর্ণ হ'লেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ ক'রে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থের পাত্রে এই রস পরিবেশন ক'রে কবি একে একটু মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই হাসির কবিতার সঙ্কলনটির নাম হ'ল 'হসন্তিকা' এবং এই গ্রন্থটিই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যে হাসির কবিতা কিছু কিছু থাকলেও এক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতির জন্য 'হসন্তিকা'ই সবচেয়ে বেশি উপযোগী ; কারণ, এটি শুধুই হাসির কবিতায় ভরা।

হাস্যরসাত্মক কবিতা যখন আলোচ্য বিষয়, তখন সংক্ষেপে হাস্যরস সম্বন্ধে দু'চার কথা প্রথমে সেরে নেওয়া দরকার। এ-কথা সকলেরই জানা আছে যে, হাস্যরসের গোড়ার কথা হ'ল অসঙ্গতি। বস্তুজগতে এই অসঙ্গতির রূপের বৈচিত্র্য এবং রসিকের মানসিকতার বিশেষ প্রবণতার ফলে নানা শ্রেণীর হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। অসঙ্গতি যখন সাধারণ ভাবে মানব-জীবন-কেন্দ্রিক হয় এবং লেখকের মন যখন তার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ থাকে, তখন যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তার নাম পরিহাস বা humour। বাস্তবজীবনে অসঙ্গতি যখন সাধারণের স্বার্থে আঘাত করে এবং লেখকের মনে সে অসঙ্গতি সম্বন্ধে হীন ভাবের উদ্রেক হয়, তখন জন্ম নেয় ব্যঙ্গ বা satire। হাস্যরসের এই দু'টি শ্রেণী থেকে আরো দু'টি শ্রেণীবিভাগ করা যায়। Humour বা পরিহাস যখন লেখকের রুচিবিকারবশতঃ অশ্লীল হয়ে ওঠে তখন তাকে বলে ভাঁড়ামি ; ইংরেজিতে এর নাম buffoonery। আর ব্যঙ্গের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি যখন ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত করে এবং লেখকের আক্রোশ যখন কোন ব্যক্তির অভিমুখে ধাবিত হয় তখন দেখা দেয় sarcasm ; ভাষান্তরে যাকে ব্যক্তিগত গালাগালি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

এ-ছাড়া হাস্যতত্ত্বের জগতে আর একটি শ্রেণীর নাম শোনা যায় যাকে ইংরেজিতে wit এবং বাংলায় বাগ-বৈদগ্ধ্য নামে সাধারণতঃ অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রায় সমোচ্চারিত ও ভিন্নার্থক শব্দ বা পদদ্বয়ের একত্র সমাবেশে এর উদ্ভব। হাস্যজগতে এটি আঙ্গিকের শ্রেণীভুক্ত। কারণ সমগ্র বিষয়ের মধ্যে হাস্যরস না থাকলে শুধু শব্দকে নিয়ে বেশি টানাটানি করলে তা ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। যিনি যথার্থ রসিক তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যেমন অসঙ্গতি আবিষ্কার করতে সমর্থ, তেমনি শব্দ বা পদের মধ্যে আপাতঃসাম্য আবিষ্কারতায় অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিকে প্রকট ক'রে তুলতেও সিদ্ধহস্ত। এ-ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার এই যে, wit শুধুই হাস্যরস সৃষ্টির উপকরণ নয়, সাধারণ ভাবে রচনার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতেই এর স্বার্থকতা—রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের গদ্য এবং প্রমথ চৌধুরীর গদ্য-রচনা তার নিদর্শন। হাস্যরসের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হ'লে wit তাকে নিবিড় ক'রে তোলে ; এইখানেই হাস্যরসের সঙ্গে তার যোগ।

এখন পরিহাস বা ব্যঙ্গ যাই হোক্ না কেন উভয়েরই মূলে থাকবে গভীর জীবনবোধ। পরিহাসে ত জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতি থাকা চাই ; আর ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা জীবনপ্রীতিরই নামান্তর। জীবনের যে অংশের অসঙ্গতি সাধারণভাবে জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তার বিরুদ্ধে রসিকের লেখনী চালনারই নামান্তর হ'ল ব্যঙ্গ। কিন্তু পরিহসনীয় এবং ব্যঙ্গের যোগ্য এই দুই শ্রেণীর অসঙ্গতির জীবনবোধকে গৌণ ক'রে শুধু যদি তার কৌতুককর অংশটুকুর দিকে লেখকের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় তা হ'লে দেখা দেয় মত্যা বা fun. এতে সহানুভূতির স্নিগ্ধতা বা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা নেই, আছে শুধু বিষয়গত অসঙ্গতিটুকু নিয়ে একটু রসিকতার আলো জ্বালাবার চেষ্টা।

এবার সুরু করা যাক্ কাব্যালোচনা। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি মন দিতে হবে, প্রথমতঃ, হাস্যরসাত্মক কবিতা হিসেবে কবিতাগুলি কতখানি সার্থক

হয়েছে; অর্থাৎ কবিতাগুলি পাঠকমনে নিজগুণে উক্ত রস সঞ্চার করতে পারছে কি না। এইটাই আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে বিচার্য। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হাস্যরস প্রাচীনকালের ব্রহ্মাস্ত্রের মত; যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে, আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না, অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে'; হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে" (ছিন্ন পত্রাবলী পত্রসংখ্যা—৪৭)। দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় হ'ল তাঁর সৃষ্ট হাস্যরস কোন্ শ্রেণীভুক্ত; তৃতীয় এবং সব শেষ বিষয় হ'ল, কবির সাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যগুলি এখানে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

হাস্যরস নিয়ে নাড়াচাড়া করার যে বিপদের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, সুখের বিষয় সত্যেন্দ্রনাথ সে বিপদ্ ঘটান নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। হাস্যরসের প্রধান যে দু'টি শ্রেণীর কথা একটু আগে বলা হ'ল সত্যেন্দ্রনাথ সেই দুই শ্রেণীরই নমুনা রেখে গেছেন 'হসন্তিকা'য়। 'হসন্তিকা'র শেষে' হসন্তিকা নামক কবিতায় কবি তাঁর গ্রন্থের পরিচয় দান-প্রসঙ্গে এই কথাই বলেছেন, তাঁর মতে এই কাব্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটেছে,

রঙ্গে ব্যঙ্গে কোলাকুলি
আরামে আর আঁচে!

'হসন্তিকা'র কবিতাগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা যায়—প্যারডি, পুরাণকথার আধুনিক ব্যাখ্যা-মূলক কবিতা, আধুনিক জীবনে হাস্যরসের সন্ধানজাত কবিতা এবং ব্যঙ্গ কবিতা।

প্রথমে প্যারডি। প্যারডি যে মূল রচনার প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রসূত তা নয়। যে জাতীয় ছন্দ ও শব্দযোগে মূল কবিতা রচিত তার অনুসরণ ক'রে লঘু ভাবপূর্ণ বাগ্-বিন্যাস দ্বারা এক জাতীয় মজা সৃষ্টি করাই এই অনুকৃতির উদ্দেশ্য। মূল কবিতা তার ভাবগভীরতা নিয়ে পাঠক-মনে যে সংস্কারের বাসা বেঁধে থাকে তার ওপর যখন ঐ রূপকে অবলম্বন ক'রে লঘু ভাব আঘাত করে তখন হাসির সৃষ্টি হয়। শ্রেষ্ঠ প্যারডিকার শুধু যে ছন্দ অনুসরণ করবেন তা নয়, প্রায় প্রত্যেকটি শব্দেরও অনুকরণ ক'রে মূল কবিতার কথা তুলনায় মনে করিয়ে দেবেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, যে প্যারডিতে উল্লিখিত সব গুণ থাকলেও মূল কবিতার ভাবের প্রতি কটাক্ষ আছে—তা প্যারডি হিসেবে নিন্দনীয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্তিকা'য় আমরা কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্যারডির সাক্ষাৎ পাই। তার মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য হ'ল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতার অনুকরণে রচিত 'সর্বশী' কবিতাটি। এই কবিতাটির স্তবকসংখ্যা চারটি এবং সেগুলি মূল কবিতার প্রথম দু'টি ও শেষ দু'টি স্তবকের হুবহু অনুকরণ 'উর্বশী' কবিতার প্রথম স্তবকে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন যে, উর্বশী বাস্তব-জগতের নারীসমাজের কোন শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে না। 'উর্বশী'র প্রথম স্তবকে সত্যেন্দ্র-নাথ দেখিয়েছেন যে, খুলনার সর্বশী ছাগলের সঙ্গে বাস্তব-জগতের অন্যান্য হননযোগ্য পশুর অনেক তফাৎ। দ্বিতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ যথাক্রমে উর্বশী ও সর্বশীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনা করেছেন। সপ্তম স্তবকে রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। শেষ স্তবকে দু'জনেই যথাক্রমে উর্বশী ও সর্বশীর চিরবিদায়ের কথা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি সুপরিচিত; তাই তার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথের 'সর্বশী' থেকে কিছুটা উদ্ধার করা যাক। পাঠকেরা 'উর্বশী'র "ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি" ইত্যাদি সপ্তম স্তবকটি মনে করলেই নিম্নলিখিত অংশের রস-উপভোগ করতে পারবেন:

ওই দেখ, হারা হয়ে তোমা ধনে রাঁধে না রন্ধসী,
হে নিষ্ঠুরা—বধিরা সর্বশী!
ভোজনের সেই যুগ এ জগতে ফিরিবে কি আর?
বাসে-ভরা বাষ্পে-ভরা হাঁড়ি হতে উঠিবে আবার
কোমল সে মাংসগুলি দেখা দিবে পাতে কি থালাতে,
সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের দংশন-জ্বালাতে
তপ্ত ঝোল-পাতে!
অকস্মাৎ জঠরাগ্নি সুষুম্না সহিতে
রবে পাক দিতে।

এই রকম আর একটি উৎকৃষ্ট প্যারডি হ'ল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্যে'র প্রথমাংশের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরে 'ম্ব' এই যুক্ত ব্যঞ্জনের পুনঃ পুনঃ সমাবেশে অনুপ্রাস সৃষ্টি ক'রে রচিত উড়িষ্যানিবাসী শম্ভুমালী নামক জনৈক পাচক ব্রাহ্মণের অম্বলে সম্বরা প্রদান এবং স্বর্গে-মর্তে, অতীতে, বর্তমানে সর্বত্র তার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। কবিতাটির নাম 'অম্বল-সম্বরা কাব্য'। এখানেও আঙ্গিকের গাম্ভীর্য এবং ভাবের লঘুতায় যে অসঙ্গতি উৎকট হয়ে উঠেছে তার ফলেই হাসি অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেমন, অম্বলের গন্ধে ব্যাকুল জগতের বর্ণনার কিয়দংশ:

বোম্বায়ের আঁঠি ফেলি বিম্বোষ্ঠী দৌড়িলা!
সুদূর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে

হাসিল গ্রাম্ভারি যত জজ ? লম্বোদরী
হাঁচিলা হিড়িম্বা বলে ; শাম্ব দ্বারকায়।
গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈএ।
অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি !

এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হ'ল 'ছাগল-দাড়ি'। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত প্রণয়গীতি "বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল। সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না" ইত্যাদির প্যারডি। এই সুগভীর ভাবাবেশ থেকে প্যারডিতে যে পতন ঘটল তা প্রচণ্ড রকমের :

(বিধি) ছাগল-দাড়ি যারে দেছে তারে
(কেন) ছাগল-দড়ি দিয়ে বাঁধিব না ?

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্যারডির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বঙ্গ আমার জননী আমার", "মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়" এবং "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে" এই তিনটি গানের অনুকরণে রচিত যথাক্রম 'মদিরা মঙ্গল', 'গন্ধমাদন' এবং 'কেরাণীস্থানের জাতীয় সঙ্গীত' স্মরণীয়। বাহুল্য ভয়ে এগুলির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া গেল না।

'হসন্তিকা'র দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতায় দেখি কবি পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি অভিনব দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। আধুনিক যুগের হাস্য-রসিকদের অনেকেই রস সৃষ্টির উপায় হিসেবে মহাকাব্য-পুরাণাদিকে স্মরণ করেন; পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে সংস্কার আছে তার যুগোচিত পরিবর্তন সাধন করলে তা হাস্যরসের উৎসার ঘটায়। 'হসন্তিকা'র এ রকম একটি কবিতা হ'ল 'দশা-বেতর স্তোত্র'। জয়দেবের সুপরিচিত 'দশাবতার স্তোত্রে'র অনুকরণে রচিত হ'লেও সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের মূল কথা আলাদা ব'লে এর প্যারডি রসটি ঠিকমত উপভোগ্য হয় নি। দশ অবতারের অচিন্তনীয় ব্যাখ্যানই এর রসোৎস ব'লে কবিতাটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। একটি অবতারের ব্যাখ্যা শুনলেই সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পরশুরাম অবতার সম্বন্ধে কবির বক্তব্য হ'ল—

মায়ের মাথায় কুড়ুল মারিয়া অবতার হলে পুত্র !
অহো! লীলা হেন কবে কে দেখেছে ?—কুত্র ?
দেবতা বনিলে,—দেখিলে না জেল্ !
বলিহারি যাই তোমারি।

এই শ্রেণীর আর একটি কবিতা হ'ল 'সাফ্রাজেঠ-কৃত শ্যামাবিষয়'। শ্যামা নারী-জাতীয়া হয়েও যে স্বাধীনতা উপভোগ ক'রে আসছেন সে সম্বন্ধে কারও মনে কোন কম চিন্তা দেখা দেয় নি। তাই হঠাৎ যখন দেখি ঐ উপেক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কবি শ্যামা-মাকে সম্বোধন করে congratulate করছেন :

শ্যামা গো তোর ভাগ্যি ভালো
ভোলার ঘরে পর্দা নেই ;
(বুড়া) অবরোধের ধার ধারে না
Radical-এর হদ্দ সেই !

—তখন জগজ্জননীর নারীজনদুর্লভ সৌভাগ্যের গুরুত্বটা উপলব্ধি করি। সংস্কারের মর্চে-পড়া কবাটটা ঈষৎ ঠেলে দিয়ে যে আলোকরেখা তখন মনের অন্দরে প্রবেশ করে তা হ'ল হাস্যরসের উজ্জ্বল রশ্মি।

গরু যে সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা, এ সংবাদ হিন্দু-মাত্রেরই জানা। এর অতিরিক্ত তথ্য সম্বন্ধে কেউ কখনও উৎসাহবোধ করে নি। কিন্তু কবি যখন দেবীর গো-রূপ ধারণের কারণ আবিষ্কারে তৎপর হয়ে ওঠেন, তখন তা হাসির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ; তাঁর মতে,

দু'টি পায়ের পায়ের ধুলায়
কেমনে তিন লোকের কুলায়
তাই হলি তুই ভগবতী—
হলি গো চারপেয়ে ॥
—পিঁজরাপোল-ধৃত ভগবতী-বিষয়

এতেই কবির উৎসাহ নিবৃত্ত হয় নি। দেবীর সর্বাঙ্গীণ রূপান্তরণের বর্ণনা দিয়েছেন,

সিংহ তোমার শিং হয়েছে—
সদাই পাহারায় রয়েছে
বিনোদ বেণী ল্যাজ হয়েছে
লাজের মাথা খেয়ে।—ঐ

এইবার তৃতীয় শ্রেণীর কবিতার প্রসঙ্গে আসা যাক্। এইগুলিতে বর্তমান জীবনের মধ্যে হাস্যরসের সন্ধান করা হয়েছে। জীবনের পথে চলতে চলতে যে-সব নির্দোষ অসঙ্গতি চোখে পড়েছে তার থেকে হাস্যরস নিষ্কাশিত ক'রে কাব্যের পেয়ালা পূর্ণ করেছেন কবি। 'দ্বিতীয় পক্ষে', 'কাশ্মীরী কীর্তন', 'কাশ্মীর ভাষা,' 'ছুঁচো বাজির দর্শক', 'সিগার সঙ্গীত,' 'নাকডাকার গান' প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা হিসেবে বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে স্বামীর টাক প্রভৃতি কয়েকটি অস্বস্তিকর বস্তুর জন্য যে সাংসারিক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে তার প্রতি কবি রসিকতার খোঁচা দিতে ছাড়েন নি। 'দ্বিতীয় পক্ষে' কবিতাটিতে তাই দেখি বিড়ম্বিত স্বামী মহাশয় তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে ব্যাকুল ভাবে বলছেন,

হে মোর দ্বিতীয়-পক্ষ !
টাক প্রতি কেন লক্ষ্য ?
চুলে টাক ব'লে মনে টাক নেই,—
মনে মোর মউচাক !

'কাশ্মীরী কীর্তন' নামক কবিতায় দেখি যে,কাশ্মীরী-খানায় পাঁঠার মাংসের প্রাদুর্ভাব দেখে কবির মনে সংশয় জেগেছে,

এযে আদিতে মাংস অন্তে মাংস—
(এরা) পাঁটা খায় হয়ে মরিয়া,
ওগো ভায়নি তো এই জলের গেলাস
(পাঁটার) অশ্রুজলেতে ভরিয়া ?

'নাকডাকার গান' কবিতায় ব্যক্ত প্রচণ্ড নাসিকা-গর্জনকারী স্বামীর পার্শ্বশায়িতা নিদ্রাহারা পত্নীর বেদনাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়,

স্বামী নয়, ঘুমের শনি,
প্রাণ কাঁপে নাকের ডাকে :
বাপ্ মা যখন পাত্র দ্যাখেন
দ্যাখেন নি ঘুম পাড়িয়ে তাকে।

এই বিলাপ শুনে কন্যার পাত্রনির্বাচনকারী পিতা-মাতার একটি অবশ্যকরণীয় কার্যে বিস্মৃতি সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠি।

এই শ্রেণীর আরো অনেকগুলি কবিতা থাকলেও তাদের বিস্তৃত পরিচয় দানের সময় নেই। এবার ব্যঙ্গ কবিতার প্রসঙ্গে আসা যাক্। এই শ্রেণীর কবিতার হাস্যরসের উৎস হচ্ছে বিদ্রূপের বিষয়ের প্রতি কবির ছদ্ম সমর্থনের ভাব। বিশেষ ক'রে সেই বিষয়কে সমর্থন ক'রে তিনি যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন তাদের অসম্ভাব্যতা, আকস্মিকতা ও অসঙ্গতি তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক হয়েছে। সে যুগে রবীন্দ্রকাব্যে বাস্তবতার অভাব নিয়ে যখন এক দল সমালোচক খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তখন অন্যান্য রবীন্দ্রভক্তদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথও তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। 'হসন্তিকা'র 'কদলী-কুসুম', 'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসার : প্রভৃতি কবিতায় তার পরিচয় পাই। মোচাকে সম্বোধন ক'রে কবি তাঁর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে,

কদলী-কুসুম ! তোরে ভালবাসি, ভাই,
(তুমি) ওজনে ফুলের রাণী—ভোজনেও তাই !
সকল ফুলের আগে বাখানি তোমায়,—
(ওগো) সব আগে গণেশ যেমন পূজা পায়।

'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসার:' কবিতায় কাব্যে বস্তুসন্ধানীর ভূমিকা নিয়ে খুব ব্যস্ত ভাবে তিনি কাব্যে ও জীবনে কি ভাবে বস্তুতন্ত্রের চর্চা করা যায় তার এক নাতিদীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন। তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক্,

(দ্যাখ) কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি।
(ওগো) ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি ॥
(বস্তু) তন্ত্রমতে গোলাপ চামেলি চাঁপা ওঁচা !
(আহা) ফুল বটে ফুলকপি আর ওই মোচা ॥

বাংলা সাহিত্যের এক শ্রেণীর সমালোচকের এক সময়ে এই বিষম দুশ্চিন্তা দেখা দিল যে, এই সাহিত্যে মহৎ কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না,—হচ্ছে শুধু চুটকি। রবীন্দ্র-প্রতিভা তখন মধ্য-গগনে। এর উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন 'অ !'। চুটকি লেখা যে ঘোরতর দোষাবহ, এই কথা শোনাবার জন্য তিনি এমন সব যুক্তির অবতারণা করলেন, যা শুধু সমালোচনার উত্তর হিসেবেই নয়, রসিকতার দিক্ দিয়েও অপূর্ব ; যেমন,

ওগো চুটকি লিখিলে থেকে যাবে মনে
আরসোলা চাটা-ভয়,
হয় কীর্তি-লোপের সুবিধা বেজায়,
ছোট আর লেখা নয় !
লেখ এমন গ্রন্থ যাহা পাঁজাকোলা
করেও না যায় তোলা,
আর চারি যুগে চাটি ফুরাতে নারে যা
দুনিয়ার আরসোলা।

ঠিক একই পদ্ধতিতে তিনি টিকির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারীদের গবেষণার উত্তর দিয়েছেন 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল' কবিতায়। প্রবন্ধের আয়তনের দিকে দৃষ্টি রেখে উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে হ'ল।

'হসন্তিকা'য় শুধু যে হাস্যরসের ভাবগত বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা নয় ; তার আঙ্গিকের দিকেও কবি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন অনেক জায়গায়। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও শব্দক্রীড়ার নিদর্শন এ কাব্যে যথেষ্টই মেলে। যেমন,

সাগর ঢেউয়ের খেলা—তোমারি সে খেল্,
যে সাগর-পারে আহা রয়েছে নোবেল্ !
ও বেল পাকিলে, বল, কি বা আসে যায় ?
সিগারের ধোঁয়া ছাড়ি সাগর-বেলায় :—
'সিগার-সঙ্গীত।'

এ প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত দু'টি কবিতার অংশবিশেষ পুনরায় স্মরণীয়,

১। (বিধি) ছাগল-দাড়ি যারে দেছে তারে
(কেন) ছাগল-দড়ি দিয়ে বাঁধিব না ?

২। বিনোদ বেণী ল্যাজ হয়েছে
লাজের মাথা খেয়ে।

এবার রসসম্ভোগ ছেড়ে তত্ত্বালোচনা সুরু করা যাক্। প্রথমেই বিচার করা প্রয়োজন যে, হাস্যতত্ত্বের কোন্ বিভাগের অন্তর্গত 'হসন্তিকা'র কবিতাগুলি; অর্থাৎ অধিকাংশের সাক্ষ্যে এগুলিকে কোন্ থাকে ভর্তি ক'রে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। হাস্যতত্ত্বের পূর্বোক্ত সূত্রগুলি মনে রেখে বিচার করলে দেখি যে, হসন্তিকার অধিকাংশ কবিতাই fun বা মজা সৃষ্টি করেছে—পরিহাস বা ব্যঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই যে জীবনবোধের প্রকাশ আশা করা যায় তা প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। আলোচ্য কাব্যের ব্যঙ্গ কবিতাগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতায় মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেছে গৌণ, আর কবি মেতে উঠেছেন সেই বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি-জাত মজাটুকু নিয়ে। 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল', 'হুঃ', 'অ!' প্রভৃতি কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রথমোক্ত কবিতাটিতে যাঁরা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের আলোকে টিকির ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই সব স্বনামধন্য সূক্ষ্মদর্শীদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন কবি। কিন্তু যে পথে তিনি এই মহৎ ব্রতসাধনে যাত্রা করেছেন তা শেষ পর্যন্ত তাঁর সাধনার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে দ্যুলোকে, ভূলোকে, অতীতে, বর্তমানে, অধ্যাত্মজীবনে, কর্মজীবনে টিকির অস্তিত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা ক'রে এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ; এই বর্ণনাগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী; যেমন,

আর টিকি না রাখিলে প্রেমিকই হয় না
শাস্ত্রে রয়েছে লেখা,
যখন প্রেমে হাবুডুবু, লোকে বলে "আহা
টিকিও না যায় দেখা!"

দেবতাদের টিকি আবিষ্কারে কবির গবেষকধর্মী মনোভাবও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সব অংশ হাস্যরস-সৃষ্টিতে সমর্থ হ'লেও ঠিক ব্যঙ্গ কবিতা হয়ে উঠতে পারে নি। সব জায়গা থকে টিকির অস্তিত্ব আবিষ্কার ক'রে পাঠককে আনন্দ দেওয়াই যেন এই দীর্ঘ কবিতার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—কবির বক্রদৃষ্টি তার আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেছে।

'হুঁঃ' কবিতাটিতে অহিংসা নীতির বিপক্ষবাদীদের আক্রমণ করা হয়েছে পূর্বোক্ত উপায়ে। কবি এখানে হিংসাত্মক নীতির ছদ্ম সমর্থকের ভূমিকা নিয়ে হিংসার জয়গান করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে অহিংসার পরাজয়ের বাণীও শুনিয়েছেন। এখানেও উপরিউক্ত দু'টি মতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উদাহরণের তালিকা পাওয়া যায়, হাসবার যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না সেই তির্যক দৃষ্টির সাক্ষাৎ, যা ব্যঙ্গ কবিতার প্রাণস্বরূপ। আহৃত উদাহরণমালার মধ্যে মাঝে মাঝে কোন বিষয় সম্বন্ধে কবির বামপন্থী মনোভাব ফুটে উঠলেও মূল বিষয়ের সঙ্গে তা সমন্বিত হ'তে পারে নি। প্রসঙ্গক্রমে জমিদার দাবীদার প্রভৃতি কৃষক সমাজের উৎপীড়নকারীদের এবং সাহিত্য-সমালোচকদের প্রতি কবির তিক্ত মনোভাব স্মরণীয়। 'অ!' শীর্ষক কবিতাটিও কবির এই-জাতীয় লক্ষ্যচ্যুতির আর একটি নিদর্শন।

অবশ্য 'হসন্তিকা'র ব্যঙ্গ কবিতার এই সম্পূর্ণ রূপ নয়; অধিকাংশ কবিতা এই জাতীয় হ'লেও এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন, 'কদলীকুসুম' ও 'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসারঃ'; কবিতা দু'টিতে কাব্যে বস্তুসন্ধানীদের এমন ভাবে খোঁচা দেওয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি এ আঘাত লাগে না; কবির আক্রোশও এখানে ব্যক্তিগত নয়। এইভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেই এখানে উক্ত কাব্য-রসিকদের প্রতি কবির তিক্ত মনোভাব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবার কোথাও দেখি ব্যঙ্গের সুরে কড়িমধ্যম লাগিয়ে কবি তাকে ব্যক্তিগত গালাগালির পর্যায়ে এনে ফেলেছেন। 'মৌলিক ঝাঁকামুটে' ও 'কুক্কুটপাদমিশ্রের প্রশস্তি' কবিতা দু'টি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পরিহাসমূলক কবিতাগুলি বিচার করলে দেখি যে, তারও অধিকাংশই পরিহাসাত্মক বিষয়ের উপরি স্তরের অসঙ্গতি নিয়ে হাসায়। জীবনের গভীরতার কোন ইঙ্গিত দেয় না। দু'চারটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে এ ধারার প্রায় সব কবিতার বিষয় হচ্ছে কোন আন্দোলন বা মতামত বা মানবেতর কোন বস্তু। শ্রেষ্ঠ পরিহাসের জন্য জীবনের সাহচর্য অপরিহার্য। সত্যেন্দ্রনাথ যেন তাকে বার বার এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। তাঁর 'সাক্রাজেঠ-কৃত শ্যামা-বিষয়', পিঁজরাপোল-প্লুত ভগবতী-বিষয়', 'রাত্রি বর্ণনা', 'রামপাখী', 'কাশ্মীরী কীর্তন', 'সিগার সঙ্গীত', 'হরফ রিপাব্লিক', 'কাশ্মীরী ভাষা' প্রভৃতি কবিতা এই কথারই সমর্থন করে। হাস্যরস-সৃষ্টিতে এর কোন কোনটি সার্থক হ'লেও শ্রেণী-নির্ণয় করতে ব'সে বলতেই হয় যে, এগুলিতে জীবনের ক্ষীরটুকুকে বাদ দিয়ে নীরটুকুকে একটু রঙীন ক'রে দেখানো হয়েছে। এগুলি fun বা লঘু কৌতুকের সমগোত্রীয়। এই শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় কতকগুলি কবিতার বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধের সুরুতে করা হয়েছে—তাই বর্তমানে সে বিষয়ে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন কবিতায় মানুষ কাব্যের বিষয়ীভূত হ'লেও তা আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নি। কবির বালসুলভ চাপল্যই এর কারণ—একটু মজা করবার নেশাই এক্ষেত্রে তাঁর কতকগুলি সম্ভাবনাপূর্ণ কবিতার ভরাডুবি ঘটিয়েছে। 'দ্বিতীয় পক্ষে' কবিতাটিকেই ধরা যাক্। বিরূপ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি জনৈক প্রৌঢ় স্বামীর বেদনামূলক উক্তিগুলি খুবই উপভোগ্য হ'তে পারত, যদি না সেই হতভাগ্যের রসিকতার আবেগ দেখা দিত। যে অবস্থায় প'ড়ে সে বেদনার্ত হয়েছে, তা-ই যথেষ্ট হাস্যকর; তার অন্তর্নিহিত গাম্ভীর্যটুকু বজায় রাখলেই কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত। কিন্তু কবিতাটি খানিকদূর এগোবার পর দেখি যে, পাঠকদের হাসানোর ভার সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে,

শুনি নারীজাতি পান্তাভাতের
গোঁড়া নাকি খুব বেশি?
তবে কেন হায় পান্তা-ভর্তা
রোচে না?—এ কোন্ দেশী?

তার পরে দেখি,

হে মোর দ্বিতীয় পক্ষ!
—গরবে ফুলিছে বক্ষ,
(দ্যাখো) আজ আমি পাড়ি দিয়ে যেতে পারি
চাই কি—চাই কি—
চাই কি—যমের বাড়ী!

এই সব অংশে প্রকাশিত উক্ত ব্যক্তির স্বভাবের অসঙ্গতি হাসির বদলে বিরক্তির সৃষ্টি করে। এর কারণ কাব্যের বিষয়টির প্রতি ছিল তাঁর সহানুভূতির অভাব; কথা সাজিয়ে রসিকতা করার নেশাও ছিল তাঁর দুর্বার। আর কবিতার দিগন্তে হাসির স্নিগ্ধ তারাটি জ্ব'লে ওঠার জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করবার ধৈর্যেরও তাঁর অভাব ছিল। তাই অকালে, অসঙ্গতভাবে হাস্যরসের আবেগ ফুটে উঠেছে কবিতাটির মধ্যে। 'নাকডাকার গান'ও ঠিক একই কারণে ব্যর্থ হয়েছে।

লঘু কৌতুকসৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে 'হসন্তিকা'র 'প্যারডি'গুলি এবং পৌরাণিক কথার অভিনব ভাষ্যগুলি স্মরণীয়। সর্বশী ছাগলের জন্য দীর্ঘশ্বাস, গন্ধমাদনের জন্য গরিমাবোধ, ওড্রকুলোদ্ভব উড়িয়া-পাচক শম্ভুমালীর অম্বলে সম্বরা দানের বর্ণনা, দশাবতারের দশা-বেতরে পরিণতি, গো-মাতা ও জগন্মাতার অভেদ আবিষ্কার প্রভৃতির রসোত্তীর্ণতা প্রশ্নাতীত। এই দু'টি ক্ষেত্রেই সার্থকতার জন্য হৃদয়ানুভূতির চেয়ে বুদ্ধিচাতুর্যেরই বেশি দরকার। আর এই কবিতাগুলিতেই তাঁর অসাধারণ সাফল্য এবং পরিহাস ও ব্যঙ্গ কবিতায় আপেক্ষিক বিফলতার দ্বারা প্রমাণিত হয় তাঁর আবেগহীনতা এবং লঘু কৌতুকের দিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। হাস্যজগতের এই প্রদেশেই তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই পরিহাসমূলক ও ব্যঙ্গ কবিতাগুলিও প্রায়ই তাদের স্বরূপধর্ম রক্ষা করতে না পেরে লঘু কৌতুকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে।

এবার প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে দেখা যাক্ এর মধ্যে তাঁর সাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যগুলি কতটা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার আগে সংক্ষেপে জানা দরকার তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্যগুলি কি? এক কথায় অগভীরতা, আবেগহীনতা এবং পাণ্ডিত্যবিলাসস্পৃহা এই তিনটি হচ্ছে তাঁর রচনার সাধারণ লক্ষণ। বোধ হয় জীবনবোধের অভাবই তাঁর উক্ত তিন বৈশিষ্ট্যের উৎস। যে সৃষ্টিকর্ম ভাবের গভীরতম স্তর থেকে উৎসারিত তা স্বভাবতঃই স্রষ্টার আবেগ ও অনুভূতিরঞ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যথায় তা হয় বহির্দৃশ্যের চিত্রণ—ললিত ছন্দ ও ধ্বনি-হিল্লোলের সাহায্যে সে তার অগভীরতাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে। অর্জিত বিদ্যাপ্রদর্শনস্পৃহাও এই ভাবগত অগভীর-তার ফল।

যাই হোক্ সত্যেন্দ্রকাব্যের এই সাধারণ লক্ষণগুলি মনে রেখে 'হসন্তিকা'র কবিতাগুলি বিচার করতে গেলে দেখি যে, উক্ত লক্ষণগুলি তাঁর এই কাব্যেও বিদ্যমান; পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'হসন্তিকা'র হাস্যরস প্রধানতঃ লঘু কৌতুকধর্মী। এইখানেই তাঁর স্বভাবের অগভীর-তার সমর্থন আমরা প্রথমে পাই। যে প্রেরণার বশে তাঁর সৃষ্টিকর্মে গভীর কল্পনার লীলার পরিবর্তে লঘু কল্পনার চটুল নৃত্য দেখা যায়, সেই একই প্রেরণায় হাস্য-রসের লঘু দিকটা তাঁর হাসির কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ তাঁর কবি-স্বভাবের শিশুসুলভ মনোভাবের ফল।

দ্বিতীয় হ'ল আবেগহীনতা। ইতঃপূর্বেই সত্যেন্দ্র-নাথের রসিকতার স্বরূপ নির্ধারণ-প্রসঙ্গে তার সার্থকতম অংশের বিচারে দেখা গেছে যে, রসিকতার যে শ্রেণীতে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত, তার ভিত্তি আবেগ নয়—বুদ্ধি। এখানেই তাঁর কবি-স্বভাবের অন্যতম লক্ষণ আবেগহীন-তার প্রমাণ পাই। তা ছাড়া তাঁর অধিকাংশ হাসির কবিতা পড়লে এ কথা মনে হয় না যে, হাসবার অফুরন্ত আবেগে পাগলাঝোরার মত তা আপনি ঝ'রে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় এ যেন রসায়নের সূত্র অনুযায়ী তৈরী করা রস। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বিশদ

করা যাক্। 'পিঁজরাপোল ধৃত ভগবতী-বিষয়' কবিতাটি খুবই হাস্যরসাত্মক হ'লেও এর মধ্যে একটি চিন্তাগত শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়; ভগবতীর গোরূপধারণের কারণ নির্ণয়, তাঁর আনুষঙ্গিক বস্তুগুলির রূপান্তরণের বর্ণনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবি যুক্তিমার্গে তাঁর পদচারণার পরিচয় রেখে গেছেন। 'সাক্রাজেঠকৃত শ্যামবিষয়,' 'অ!' 'হুঁ:', 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল' প্রভৃতি কবিতা সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। আবেগের অল্পতার জন্যই শেষোক্ত তিনটি কবিতায় তালিকা সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়। এও তাঁর কবিস্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'তাজ,' 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরাই এ কথা জানেন। মোট কথা তাঁর সৃষ্ট হাস্যরস বুদ্ধিদীপ্ত, আবেগহীন ও সংহত। জীবনের পথে চলতে চলতে যে-সব অসঙ্গতি দেখা যায়, হাস্যরসিক নির্বিচারে তা গ্রহণ করেন—তার যুক্তিগত পারম্পর্য নিয়ে বিচার করেন না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ জীবনকে গৌণ করেছিলেন ব'লেই তাঁর হাসির কবিতায় এই সহজ দৃষ্টির পরিচয় পাই না—তাই যুক্তির সোপানাবলী অতিক্রম ক'রে তাঁর রসিকতাগুলি কাব্য-সৌধে প্রবেশ করেছে।

সত্যেন্দ্রকাব্যের শেষ প্রধান বৈশিষ্ট্য পাণ্ডিত্য প্রদর্শন-স্পৃহাও তাঁর 'হসন্তিকা' কাব্যে লক্ষিত হয়। ইতিহাস, পুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি থেকে ভাষাতত্ত্ব পর্যন্ত সব বিষয়ই তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। পুরাণ-ইতিহাসের উল্লেখ প্রধানত: 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল,' 'অ!' এবং 'হুঁ', কবিতায় পাওয়া যায়। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে ঐ উল্লেখগুলি রসাভাস ঘটায় নি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে হাসির এত খোরাক থাকতে শাস্ত্রপুরাণাদির দিকে কবির পুন: পুন: দৃষ্টিপাত তাঁর উক্ত বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় বহন করছে। 'কাশ্মীরী ভাষা' কবিতায় তাঁর ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাই। এখানে কতকগুলি বাংলা শব্দ কাশ্মীরীতে অন্য অর্থদ্যোতনা ক'রে এই জ্ঞানদান ক'রে কবি হাসাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কবিতাটি কবির কাশ্মীরী ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাঠককে শুধু সচেতন করে—অন্য কোন ভাব জাগায় না। 'জবান্ পঁচিশী' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবিতাটি 'কস্যচিৎ পঞ্চবাণপ্রপীড়িতস্য উক্তি' ব'লে বিজ্ঞাপিত হ'লেও আসলে এটি কস্যচিৎ ভাষাজ্ঞান প্রপীড়িতস্য উক্তি। কারণ, এতে পঁচিশটি ভাষায় প্রিয়তমাকে সম্ভাষণ করা হয়েছে; ভাষাজ্ঞান প্রদর্শনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থ-শেষে সেগুলির অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে দেখা গেল যে, বাংলা নিয়ে উনত্রিশটা ভাষা ব্যবহৃত হয়ে গেছে। কবির জ্ঞানচর্চায় তুষ্ট হয়ে জ্ঞানভারতী যেন আরো চারটি ভাষা অজান্তেই জুগিয়েছেন। কবি নিজেই তাই ব্যাখ্যান্তে আশ্চর্য হয়ে বলেছেন—

পঁচিশ ভাষার জবান্-পঁচিশী—গুণতে গিয়ে দেখি!—
বাংলা নিয়ে উনতিরিশটে—এ কি? আরে! এ কি!

আলোচনার শেষে এই কথাই বলতে হয় যে, নানা দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও 'হসন্তিকা' একটি উপাদেয় গ্রন্থ। কারণ, প্রথমত:, এ জগতে কোন কিছুই সম্পূর্ণ নিখুঁৎ হয় না। দ্বিতীয়ত: হাসির কবিতার কৃতিত্ব তার হাসাবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এ কাব্যের যে সে ক্ষমতা আছে, তা বর্তমান আলোচনার প্রথমাংশে দেখানো হয়েছে। আর হাস্যরসের নানা শ্রেণীর মধ্যে এগুলি যে লঘু কৌতুকের পংক্তিভুক্ত, এটা অগৌরবের কিছু নয়; কারণ, হাসি বলতে শুধুই গভীর সহানুভূতিজাত পরিহাস বা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বোঝায় না। জীবনের লঘু ও গম্ভীর দু'টি দিকই সাহিত্যে কমেডি এবং ট্র্যাজেডিরূপে প্রকাশিত হয়। হাস্যরসেরও তেমনই দু'টি দিক্ আছে এবং দু'টি দিকই সমান মূল্যবান্। রসিকের মর্জি অনুযায়ী তা কোন একটি শ্রেণীকে অবলম্বন করে। আমাদের শুধু দেখতে হবে লঘু বা গুরু যাই হোক্ না কেন, হাস্যরস হিসেবে তা সার্থক হয়েছে কি না। সে দিক্ দিয়ে বিচার করলে 'হসন্তিকা'র অধিকাংশ কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলবার থাকে না। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য পথে যাত্রীর ভিড় থাকলেও এ পথটিকে তার ব্যতিক্রম বললেই হয়। এই স্বল্পালোকিত পথে যে ক'জন যাত্রী দীপ জ্বালাবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের নাম অবশ্যই স্মরণীয়।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

"বিজ্ঞান তার প্রয়োজনে আলাদা একটা অভিধান তৈরি ক'রে নিয়েছে। যে ভাষাতেই চর্চা করি না, সহজ পরিচিত সীমার বাইরে তার একটা গণ্ডি টানা রয়েছে। সাধারণ ভাষার মধ্যেও আলাদা একটা ভাষা যেন—এই বিজ্ঞানের ভাষা। বিজ্ঞানের বিশেষ কলাকে বজায় রাখতে গিয়ে এভাবে ভাষার একটা আলাদা রূপ দিতে হয়েছে।" (—অশোককুমার দত্ত। পরিভাষা ও বিজ্ঞান, দেশ।) এই বিশেষ ভাষা-পদ্ধতির একটি প্রধান উপাদান পরিভাষা, যার লক্ষণই হ'ল অর্থবোধ পূর্বভাগে স্থির নির্দিষ্ট থাকা চাই, সাধারণ পথগুলির মত ক্ষেত্র-বিশেষে বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত করা চলবে না। পরিভাষার মানে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হবে, সুনিপুণ ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নির্দেশে তা স্পষ্ট থাকে।... "শিথিল অর্থ প্রয়োগ বিজ্ঞানের প্রখর যুক্তিধর্মিতার রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা। বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে সার্থকভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যেই বিশেষ অর্থপ্রযুক্ত শব্দের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে" (—ঐ)।

তা ব'লে "পরিভাষা সৃষ্টির বিজ্ঞান আলোচনা প্রধান সমস্যা নয়, ভাষার মাধ্যমে তা লোকের বোধগম্য ক'রে তোলাই হচ্ছে আসল কাজ। ...পরিভাষা যাদের পক্ষে সমস্যা নয়, সে সব ভাষাতেও এই বোঝানোর সমস্যা রয়েছে।...কনসেপ্শন জিনিষটা এককভাবে পরিভাষার উপর নির্ভর করছে না, শব্দের সঙ্গে শব্দ যোগ ক'রে লেখক যে মোট প্রতিফলটি রচনা করেন মূলত তাকেই তা আশ্রয় ক'রে থাকে।" (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৮ সংখ্যা।) "বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিভাষাই একমাত্র কথা নয়। সাধারণ পরিচিত কথাগুলিই রচনায় প্রধান স্থান অধিকার ক'রে থাকে। পরিভাষার পশ্চাতে পটভূমি যেন। তাদের ব্যবহারে অমনোযোগী হওয়ার কথা নেই। বরং তা যেন ফুটে ওঠে পরিভাষার মতই অপরিসীম যত্নে, সাহিত্য রচনার মত অপূর্ব রহস্যের সন্ধানে। মোটকথা, ভাষার শক্তিকে জাগিয়ে তোলা চাই। এখানেই মস্ত পরীক্ষা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন অভিধানে শব্দের ঘাটতি না থাকলেও রচনার সমস্যা অন্যভাবে দেখা দেয়, তেমনি পরিভাষা শেষ সম্পূর্ণ হলেই বিজ্ঞান আলোচনার সমস্ত দিকের পূরণ হয় না। পরিভাষা প্রথম ধাপ। রচনা পরে আসে।" (—ঐ, পরিভাষা ও বিজ্ঞান, দেশ ঐ)।

সরকারী দপ্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রস্তুতি হিসাবে ইতিপূর্বেই "পরিভাষা সংসদ" তৈরি হয়েছে, তার কিছু কিছু কাজ প্রকাশও হয়েছে। বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরিভাষারও চাহিদা বাড়বে। পরিভাষার প্রসঙ্গে বাংলার জ্ঞানী-গুণী মনীষীরা বিভিন্ন উপলক্ষে যা মন্তব্য করেছেন তার একটা সংকলন পাঠকদের সামনে হাজির করার ইচ্ছা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রইল।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা

প্রয়োজন সব কিছুই গ'ড়ে তোলে। যন্ত্রের যুগে আমাদের দেশে তাই ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় প্রসারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসবে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে ডঃ খোসলা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়েছেন। যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ একদিকে যেমন নিখুঁত হয়ে উঠছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অপর দিকে তেমনি শিক্ষা-ব্যবস্থা সঠিক পরিকল্পনার পথে প্রস্তুত করতে হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েছেন খুব। আশার কথা! যদি এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি দিকে দৃষ্টি দিতে চাই যা সাধারণ ভাবে অজ্ঞাত বা অবহেলিত রয়েছে—ইন্‌ষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ারিং (ইণ্ডিয়া) দেশব্যাপী নানা শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বীকৃত স্নাতক উপাধিগুলিই ভারত সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত উপাধি ব'লে গ্রহণ করেন, প্রতিষ্ঠানটির সম্মতি না পেলে নয়। এ হিসাবে ১৯৫৪ সালের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিদ্যার এম. এস-সি ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার স্নাতক উপাধির সমতুল্য ব'লে বিবেচিত হয় নি। পরে নূতন পাঠ্যক্রমে তা স্বীকৃত হয়েছে। ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারস্‌-এর নিজস্ব পরিচালনাধীনে স্নাতক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে—ভারত সরকার তা যথারীতি স্বীকারও করেন। কিন্তু কি অজ্ঞাত কারণে জানি না, এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকদের দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দেন না। শুনতে পাই তাঁরা নাকি এই ডিগ্রী স্বীকারই করেন না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এখানকার ডিগ্রীধারী কেউ যখন অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন, এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই তখন তাঁকে পরীক্ষক নিযুক্ত করতে শিক্ষার মান রসাতলে যাওয়ার আশঙ্কা করেন না। এই জটিল চক্র আমাদের বোধগম্য নয়। আগে ইনষ্টিটিউটের ছাত্রসংখ্যা কম ছিল, এখন প্রতি বছর হাজার খানেক ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে স্নাতকের যোগ্যতা অর্জন করছেন (উল্লেখযোগ্য, যে অভিজ্ঞতা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি, ইনষ্টিটিউটের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আগেভাগেই তা অর্জন ক'রে নিতে হয়)। এঁদের অনেকে আজকাল উচ্চতম (এম. ই. বা ডক্টরেট) পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহশীল আছেন—বিদেশের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিতে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনাও আছে। শুধু আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির দরজা তাঁদের জন্য বন্ধ থাকবে, তা একাধারে বিস্ময় ও বিভ্রান্তিকর। দেশের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ এই দারুণ অসঙ্গতি দূর করতে মনোযোগী হবেন এই একান্ত কামনা। ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স ব্যাঙ্গালোরে এ মাসে বার্ষিক অধিবেশনে ব্যস্ত, আশা করি তাঁরাও এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

অভিনব প্রস্তুতি

মহাকাশ যাত্রায় মানুষ আজ বারবার সফল হচ্ছে। এজন্য নানা যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সঙ্গে মানুষকেও নানা ভাবে তৈরি হয়ে নিতে হয়েছে। মহাকাশযাত্রার একটা প্রধান সমস্যা মানুষ নিজে, যে কি না মহাকাশের পথিক হবে। নানা প্রতিকূল অবস্থার একটি হ'ল ভারশূন্য অঙ্গ। পৃথিবীর সীমানার বাইরে এমন একটা বিচিত্র পরিবেশে মানুষের কি ন

মাছের পেটে মানুষ! অনেকটা তাই। মহাকাশযাত্রার প্রস্তুতি চৌবাচ্চার জলে আংশিক ভারহীনতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে।

অবস্থা হবে। এ নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা, কত আলোচনা। সমস্যা আরও বেড়েছে, কারণ পৃথিবীর বুকে কৃত্রিম উপায়ে এই ভারহীন অবস্থা সৃষ্টি হয় না। আংশিক যা হয় তা হ'ল জলে যেটুকু ওজন কমে তার প্রভাবে। বিজ্ঞানীরা এটুকুই কাজে লাগালেন। কাঁচের চৌবাচ্চা-ভর্তি জলে সম্ভাব্য মহাকাশচারীকে ছ' থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত রেখে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত টানার চেষ্টা চলছে। শেষ পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতা যে বিফলে যায় নি, সাম্প্রতিক মহাকাশ অভিযানগুলিই তার প্রমাণ।

আর একটি প্রস্তুতি। ভারশূন্য অবস্থায় সমস্তই যেন "ভাসমান"। মানুষ এবং যন্ত্রগুলির জন্য তাই "নোঙর" ফেলার ব্যবস্থা রাখা চাই। নূতন এক ধরণের জুতো তৈরী হয়েছে। দেখুন, দেওয়াল আর 'সিলিং' বেয়ে উঠতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এই অভিনব জুতোর তলায় রয়েছে ছোট ছোট অজস্র হুক। এই হুকের জন্যই সম্ভাব্য মহাকাশযাত্রী দেওয়ালের সঙ্গে বজ্র আঁটুনীতে বাঁধা রয়েছে।

দূর থেকে কাছে

১৯৭৬ সালের মধ্যে ভারতেও পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ সম্ভব হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরমাণুর শক্তি থেকেই গৃহীত হবে। সেক্ষেত্রে Aryres ১৯৫০ সালে মন্তব্য করছেন, কারিগরি বাধা অতিক্রম ক'রে যদি কোনদিন পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরিও হয় তার দাম হবে অনেক বেশি—কয়লা বা অন্যান্য প্রচলিত উপায়ে তৈরি বিদ্যুতের কয়েক গুণ।

গাছপালা ও আলোর প্রভাব

সূর্যের সাধারণ আলোর মধ্যে যে রামধনুর সাতটা রঙ মিশে থাকে তা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। ভুলি আর না ভুলি, আলোই হচ্ছে জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ ক'রেই গাছপালা তার জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে। আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে, মাটির

বিভিন্ন আলোয় গাছের বৃদ্ধি।

রস আর বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড সূর্যের আলোতে "পাক" হ'লে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি হয়। এরই নাম ফটোসিন্‌থেসিস্ বা আলোক-সংশ্লেষণ। মানুষ আজ আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেছে। কিন্তু খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে গাছপালার উপরই আমরা নির্ভর ক'রে আছি। ফটোসিনথেসিস্-ই তার কারণ। আলো থেকে খাদ্য তৈরির এই মৌলিক উপায় আজো আমাদের অজ্ঞাত। যেদিন তা মানুষের কাছে ধরা পড়বে—আঃ, কল্পনাই করা যায় মাত্র। যেদিন এই ফটোসিনথেসিস্-এর কলাকৌশল আয়ত্তে আসবে, সেদিন সঠিক অর্থেই কারখানা থেকে রেলগাড়ী মটরগাড়ী সিমেন্ট নাট-বোল্ট ইত্যাদির মত কারখানা থেকে সরাসরি প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি খাদ্যের উপাদানগুলিও তৈরি হবে। সেদিন চাষবাসের এই ক্ষেতখামার-গুলির আর প্রয়োজন হবে না। বোধ হয় তৈরি হবে নূতন ধরণের এক যাদুঘর। এ সমস্ত যাদুঘরের কয়েক একর জমিতে ধানের চাষ পাটের চাষ গমের চাষ ইত্যাদি হাতে-কলমে দেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। লোকে যেমন সিনেমায় যায়, প্লেনেটেরিয়াম, সাইন্স মিউজিয়াম দেখতে যায়, তেমনি এ সমস্ত শস্য তৈরির অদ্ভুত কৌশল দেখার জন্য হাজার হাজার দর্শক মুগ্ধ-চোখে এখানে এসে ভিড় করবে।

আলোর এই বিচিত্র সংশ্লেষণ-ক্রিয়া এভাবে জীবনের উৎসের মতই রহস্যময় থেকে তাবৎ জীবকুলকে ধারণ করছে। আর সবাই যেন রেলগাড়ির কামরা, গাছপালা থেকে বল সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছে। ইঞ্জিনে কয়লা না থাকলে যে অবস্থা, আলোর অভাবে গাছের অবস্থা তার থেকে কম শোচনীয় হবে না। আলোর অভাবে ফটোসিনথেসিস্ ক্রিয়াটাই যাবে বন্ধ হয়ে। ফলে, রইল মাটির রস আর বাতাসে অফুরন্ত কার্বণ-ডাই-অক্সাইড, গাছ না খেয়ে মারা পড়বে। আলোর পরিমাণের উপর নির্ভর করে ফটোসিনথেসিস্ কমে বা বাড়ে।

গাছের উপর আলোর প্রভাব আরো বিচিত্র ভাবে দেখা দেয়। সাদা আলোর মধ্যে সাতটা রঙ আমরা জানি। সূর্যের আলোতে সাতটা রঙই থাকে। এই সাত-মিশালী আলোর লাল বা নীল রঙ যদি আলাদা ক'রে গাছের উপর ফেলি—সে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার। গাছের আকারই যাবে পালটে। গাছটি অবশ্য চারাগাছ হওয়া চাই। ছবিতে দেখানো হয়েছে ছ'টি চারাগাছ। ডান-দিকের তিনটি নীল আলোতে এবং বাঁ-দিকের বাকি তিনটি লাল আলোতে রাখা হয়েছিল। একই গাছের চারা। অথচ বিভিন্ন রঙের আলোতে গাছের বাড়ন বিভিন্নভাবে দেখা দিয়েছে। লাল আলোতে গাছ খুব বাড়ে, তবে পাতা থাকে কম; নীল আলোতে গাছ অনেকটা ঝোপের আকার নেয়। পাতা ছাড়ে অনেক, কিন্তু বাড়ে স্তিমিত।

শুধু মাটি বা সার নয়, গাছের জীবনে আলোও এভাবে প্রভাব স্থাপন করে। অনেক পুষ্পক গাছে ফুল ফোটে না একমাত্র এই আলোর জন্য।

ভূগর্ভের বিদ্যুৎ

ভূগর্ভের যে অপর্য্যাপ্ত খনিজ সম্পদ, মানুষ বহুদিন থেকেই তা গ্রহণ করতে শিখেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ, ভূগর্ভে আবার বিদ্যুতের স্রোত কোথায়।

মানুষ আজ নিজের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ তৈরি ক'রে নিতে শিখেছে। মেঘের কোণে কোণে যে প্রাকৃতিক বিদ্যুৎ চমক খায় তা থেকে আমরা কোন সাহায্য পাই নি। বরং এই বিদ্যুৎ-বজ্রপাতে শহর-নগর-গ্রাম বিপর্য্যস্ত করেছে। এতদিন পরে মাটির তলায় এ কোন্ বিদ্যুতের উৎস।

মাটির তলায় বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু যা রয়েছে তা থেকে আমরা বিদ্যুৎ তৈরি ক'রে নিতে পারি।

তাপশক্তিকে বিদ্যুৎ হিসাবে রূপান্তরিত করা যায়। ভূগর্ভে উত্তাপ অফুরন্ত। পৃথিবীর মাটি ও পাথুরে স্তরের নীচে এই তাপ আবদ্ধ থাকে। কিন্তু বেলেমাটির কলসীর জল ফুরানোর মত তার বেশ কিছু বাইরে ছড়িয়ে যায়। কতটা,—সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে এটুকু নিশ্চিত, সূর্যের যে উত্তাপ পৃথিবীতে এসে পড়ে, পরিমাণ তাকেও ছাড়িয়ে যায়। আয়ের চেয়ে ব্যয় অধিক। তাপশক্তির ব্যাপারে মাতা বসুমতী হিসাবী বুদ্ধির পরিচয় দেন নি। সে যা হোক, আকাশজাত বিদ্যুতের মত এই অপরিসীম তাপশক্তিকে ধ'রে রাখার উপায় মানুষের কল্পনায় নেই।

তবু ভূগর্ভের 'বিদ্যুৎ' আজ সম্ভব হয়েছে। মাটির তলাকার যে অফুরন্ত তাপশক্তি—তাকে কাজে লাগিয়েই তা সম্ভব হয়েছে। কয়লা পুড়িয়ে যে বিদ্যুৎ সংগ্রহ হয় তার মূল কৌশলটি হ'ল এই যে, কয়লা পোড়ানর উত্তাপে বাষ্প তৈরি ক'রে সেই বাষ্পের ধাক্কায় যন্ত্রের চাকা ঘোরানর ব্যবস্থা করা। কিন্তু বাষ্প যদি আমরা সরাসরি পেয়েই থাকি, কি দরকার কয়লা যোগাড় ক'রে বয়লারের মধ্যে বাষ্প তৈরি করার।

কোন কোন জায়গায় এভাবে ভূগর্ভের উত্তাপ বাষ্প বা উষ্ণ প্রস্রবণের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে। সুবিধামত সেখানে সরাসরি বিদ্যুৎ তরির যন্ত্র বসালেই হ'ল। কয়লার ব্যয় এভাবে রক্ষা পাচ্ছে।

ভূ-গর্ভের উত্তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিউজীল্যাণ্ড অগ্রগামী। চিত্রে ওয়েইর‍্যাকি অঞ্চলের একটি ভূ-গর্ভজাত বাষ্পের উৎসমুখ দেখানো হয়েছে। এই প্রাকৃতিক বাষ্প টারবাইনের চাকাকে সক্রিয় ক'রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। নলপথে তাই বাষ্প সংগ্রহ করা হচ্ছে।

যে-সমস্ত দেশে এই স্বাভাবিক উৎসমুখ রয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান্। প্রথম নামটি হ'ল নিউজীল্যাণ্ড। তারপর আসে— আইসল্যাণ্ড, ইতালী, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, হাওয়াই, ফিলিপাইন, আটলান্টিকের পশ্চিম উপকূলের দেশগুলি। আফ্রিকার কঙ্গো টাঙ্গানাইকা কেনিয়া ইথিয়োপিয়া ইত্যাদি দেশ। ভারতবর্ষের নাম অনেক পরে। তবে ভূ-তাপের উৎস সঠিক কতগুলি রয়েছে আরো অনুসন্ধান ক'রে দেখা প্রয়োজন।

বিদ্যুতের চাহিদা আজ নানাভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে চাহিদার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে পৃথিবীর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় সত্তর শতনিক (বা শতাংশ) কয়লা পুড়িয়ে সংগ্রহ হয়। এদিকে কয়লার পরিমাণ পরিমিত। এজন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের নূতন নূতন উৎসের সন্ধান করতে হচ্ছে। মাটির তলার সঞ্চিত উত্তাপ তারই একটি প্রধান হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা জড় করার জন্য ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি দপ্তরের আহ্বানে রোমে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায়, নূতন চাহিদার আলোকে বিদ্যুৎ তৈরির এই নূতন সম্ভাবনাটি দেশে দেশে যাচাই ক'রে দেখা হবে।

গল্প হ'লেও বিজ্ঞান

গল্পেরও একটা সত্যভূমি থাকে। তার কল্পনা, উদ্ভট চিন্তা ও আজগুবী চরিত্র ব্যবহারের মধ্যে মূলে একটা সত্যের আশ্রয় থাকে। যে-কোন সার্থক গল্প সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। সত্যেরই একটা রূপ বিজ্ঞান। সে হিসাবে গল্পও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান। আলো যেমন মাঝে মাঝে রঙীন কিন্তু আলো-মাত্রই রঙীন নয়। গল্পও তেমনি মাঝে মাঝে বিজ্ঞান কিন্তু গল্পমাত্রই বিজ্ঞান নয়। গল্পের মধ্যে সত্যের একটা অংশ থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানের অংশ থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। গল্প হ'লেও তাই সত্যি, কিন্তু গল্প হলেই তা বিজ্ঞান নয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

জুল ভার্নের "বেগমের ভাগ্য" নামে একটি উপাখ্যানে আছে এক "পাগলা" বৈজ্ঞানিকের কথা যিনি শত্রুপক্ষের দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে এমন এক কামান তৈরি করলেন যা থেকে গোলা বেরিয়ে খোদ পৃথিবীকেই ঘুরপাক খেতে শুরু করল। স্পুৎনিকে যা সত্য, গল্পের কল্পনায় তা রূপ পেল। গল্পের মূলভূমি এখানে শুধু সত্য নয়, তা এখানে বিজ্ঞান। গল্পের আবরণে বিজ্ঞানের একটা তত্ত্বকথা এখানে পেলাম। মূল বর্ণনায় যার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় নি তা আমরা এখানে আলোচনা ক'রে দেখি না।
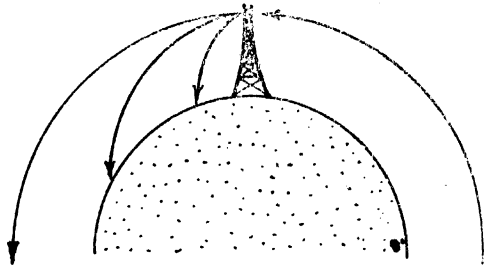
একই ঢিল বিভিন্ন গতিবেগে "ক" বা "খ"তে গিয়ে পড়ছে। বিশেষ একটি গতিবেগে তা আবার আকাশের বুকেই স্থায়ী হবে। উচ্চতার সঙ্গে এই গতিবেগটির একটা সম্পর্ক রয়েছে।

এতগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মানুষবাহী মহাকাশযান সফল হওয়ার পরও অনেকে আছেন, যাদের কাছে মূল একটা বিষয় পরিষ্কার হয় নি। প্রশ্নটি হ'ল, স্পুৎনিক কেন খ'সে পড়ে না, আকাশে কেন তারা "ভাসমান" থাকে। জুল ভার্ণে তারই উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহজ কথা দিয়ে

সুরু করা যা'ক্। মনে করুন, একটা উঁচু জায়গা থেকে একটা ঢিল ছোঁড়া হ'ল (চিত্র দেখুন)। ঢিল পৃথিবীর বুকে "ক"-এ গিয়ে লাগবে। আরও জোরে ছুঁড়তে পারলে তা আরো খানিকটা এগিয়ে "খ"-এ গিয়ে পড়বে। আরো জোরে যদি ছোঁড় সম্ভব হয়, এমন একটা সর্ত আছে যখন ঢিলটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না, তা চাঁদের মতই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে। গতিবেগ এই বিশেষ মানটি ছাড়িয়ে গেলে তখন হবে আর এক অবস্থা। পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার বদলে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে মহাকাশের পথে ধাবমান হবে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর আকাশে কোন-কিছুকে ঘোরাতে হ'লে নির্দিষ্ট এক গতিতে তা "ছুঁড়তে" হবে। এই গতিবেগ এতই বেশি যে, সাধারণ উপায়ে তা সম্ভব হয় না। রকেট সে সমস্যার সমাধান যুগিয়েছে। এ বিশেষ গতিবেগ আবার পৃথিবীর উপরে বিভিন্ন উচ্চতার জন্য বিভিন্ন। যদি কক্ষপথটি গোলাকার ধরা হয় (চাঁদ বা স্পুৎনিকগুলির কক্ষপথ বৃত্তাকার নয়) তা হ'লে বিভিন্ন উচ্চতায় কি গতিবেগে উপগ্রহটি ঘোরা উচিত তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :

পৃথিবী থেকে উচ্চতা (মাইল)	গতিবেগ	একবার ঘুরতে সময়
১00	১৭,৪৫০	১ ঘঃ ২৮ মিঃ
২00	১৭,২৫০	১ ঘঃ ৩0 মিঃ
৩00	১৭,০৬০	১ ঘঃ ৩৪ মিঃ
৪00	১৬,৮৫0	১ ঘঃ ৩৭ মিঃ
৫00	১৬,৬৬0	১ ঘঃ ৪১ মিঃ
১000	১৫,৭৮0	১ ঘঃ ৪৯ মিঃ
২,000	১৪,৪১৫	২ ঘঃ ৩৬ মিঃ
৫,000	১১,৭৫0	৪ ঘঃ ৪৫ মিঃ
১0,000	৯,৪১0	৯ ঘঃ ২0 মিঃ
২২,৩00	৬,৮৭২	২৩ ঘঃ ৫৬ মিঃ
২,৩৯,000	২,২৬৮	২৭'৩ দিন।

শেষের দু'টি দূরত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ২২,৩০০ মাইল উচ্চতায় কৃত্রিম উপগ্রহের একবার প্রদক্ষিণের সময় পৃথিবীর দিবারাত্রির সমান— অর্থাৎ পৃথিবী তার অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে যে সময় নেয় তার সমান। এমন একটা সচল উপগ্রহকে দূরবর্তী তারাগুলির মতই "স্থির" মনে হবে।

২,৩৯,০০ মাইল হ'ল পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব। যে বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই, চাঁদ এবং নকল স্পুৎনিক একই জাগতিক নিয়মে কার্যকরী হচ্ছে। জুল ভার্ণের উপন্যাস এই মূলটিকেই গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হয়েছে।

এ. কে. ডি.

—০—

সাহিত্য-সমীক্ষা : —গোপাল ভৌমিক। জ্ঞান তীর্থ। ১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলি—১২। মূল্য—চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটির মধ্যে কবি গোপাল ভৌমিকের সাহিত্য-চিন্তা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ের রচনা। লেখক আলোচনায় সাহিত্যের সমাজধর্মী স্বরূপের ওপরই জোর দিয়েছেন। এ বিষয়ে বেশ কিছুদিন পূর্বের লেখা 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি লেখকের মতবাদের স্পষ্টতম প্রকাশ এবং সুলিখিত। তা ভিন্ন 'অর্ধশতাব্দীর সাহিত্য,' 'সাহিত্য ও রাজনীতি', 'আধুনিক সাহিত্যের ভূমিকা,' 'আধুনিক বাংলা, কবিতার ক্রম-বিবর্তন,' 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' কবিতার ভবিষ্যৎ,' 'বাংলা অনুবাদ সাহিত্য' প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে মূল সুরটি রক্ষিত হয়েছে।

সাহিত্য বিচারে শ্রীভৌমিক মার্ক্সবাদী। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদের আলোকে তিনি সাহিত্যের মূল সূত্রগুলি অনুধাবন করেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং সুখের বিষয় যে, বিচারকালে প্রতিপক্ষকে তিনি কোথাও রূঢ় আঘাত করেন নি। এই রুচিস্নিগ্ধ মনোভাবটি গ্রন্থটির সর্বত্র।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের ওপর লেখা কয়টি একটু ভিন্ন স্বাদের। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য' নামক প্রবন্ধে। দু'টি চমৎকার প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ সম্পর্কে। সে দুটি নিবন্ধে জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তি-মানস ফুটে উঠেছে প্রবন্ধকারের দক্ষ তুলিকায়।

গোপালবাবুর আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করার মত। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি নৈরাশ্যবাদী নন। তাই গভীর আস্থার সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছেন যে "ভবিষ্যতের সাহিত্যের প্রাণ হবে সমষ্টিগত একতা—জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হবে—ফলে সাহিত্যের প্রাণশক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাবে; মৈত্রী, সম্প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের যে-সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আজকের বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার চাপে প'ড়ে হাঁস-ফাঁস করছে এবং কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা পড়েছে, তারা মুক্তি পাবে। ভবিষ্যৎ সাহিত্য ঝংকৃত হবে এদেরই বলিষ্ঠ অনুসরণে"।

তাঁর প্রবন্ধগুলি গুরুগম্ভীর চালের নয়। বেশ সহজ সুরে, আলোচনার মত ক'রে তিনি নিজের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। ফলে, প্রবন্ধগুলি পাঠকের কাছে গুরুভার হবে না কোথাও। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট পরিধির পরিকল্পনা না থাকায়, আলোচনাগুলিতে অতিকথনের দোষ স্পর্শ করেছে কয়েক ক্ষেত্রে। প্রবন্ধের বেলায় এ-ত্রুটি উপেক্ষণীয় নয় নিশ্চয়ই। উপরন্তু, একাধিক প্রবন্ধে যে বিতর্কের অবকাশ আছে, সে কথা লেখক স্বয়ং স্বীকার করেছেন। সাহিত্য বিচারে সে অবকাশ স্বাভাবিক। মত ও পথে ভিন্নতা আছে ব'লেই ত বিচারের আয়োজন সেদিক থেকে শ্রীভৌমিকের বইটি সাহিত্য আলোচনার একটি সংযোজন বলা চলতে পারে।

গ্রন্থটির মুদ্রণ সৌকর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে একটা কথাই মনে হ'ল শুধু যে আজও বাংলা বই মুদ্রাকর প্রমাদমুক্ত হ'ল না।

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী

মনোবিদ্যা : শ্রীইন্দ্রকুমার রায়। ওরিয়েন্ট লংম্যান্স্ লিমিটেড্ কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৪'২৫ নঃ পঃ।

'মনোবিদ্যা' পুস্তকখানি প্রধানতঃ সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত, শিক্ষার্থীর জন্য নয়। সম্প্রতিকালের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের চর্চা কিছু কিছু বিস্তারলাভ করেছে, ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি অন্যতম বিষয় বলে পরিগণিত হয়েছে। এর ফলে সাধারণ পাঠকের মনে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইদিক দিয়ে এই রকম একটি পুস্তকের যথেষ্ট সার্থকতা রয়েছে। পুস্তকটি সুখ-পাঠ্য। লেখক যে কয়েকটি ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন সব কয়েকটিই উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য। লেখক মনোবিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলি প্রচুর দৃষ্টান্ত ও চিত্র সহযোগে প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশন করেছেন, দৃষ্টান্তগুলি যথাসম্ভব বৈদেশিক ভাবমুক্ত করার চেষ্টা ক'রে তথ্যগুলি সহজবোধ্য করেছেন। তবে সাধারণ পাঠকের মনোযোগ ও উৎসাহ অটুট রাখার পক্ষে বইটি আয়তনে কিছু বড়, বিভিন্ন তথ্যগুলির শাখা-প্রশাখা নিয়ে যতখানি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে তাতে বইটিতে খানিকটা পাঠ্যপুস্তকের ধারা এসে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ "ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য" শীর্ষক পরিচ্ছেদটির কথা ধরা যেতে পারে। এই পরিচ্ছেদটির আয়তন প্রায় পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা। একটি পরিচ্ছেদেই "ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য", "বুদ্ধি" ও "ব্যক্তিত্ব" এই তিনটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি চিত্র রয়েছে এই পরিচ্ছেদে। তিনটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে এটিকে ভাগ ক'রে আরও একটু চিত্র সমৃদ্ধ করলে ভাল হ'ত মনে হয়। শিক্ষার্থীরা এই বইটি থেকে প্রচুর সাহায্য পাবেন। শেষের দিকে বাংলা পরিভাষা ও ইংরাজী প্রতি শব্দের তালিকা ও বর্ণানুক্রমিক সূচী-পত্র থাকায় পাঠকের যথেষ্ট সুবিধা হয়। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

শ্রীশক্তি বসু

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা : শ্রীতামসরঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১৩। মূল্য ৪'০০ টাকা। পৃষ্ঠা—১৭০।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর এই পুত্রই জগতে স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত। মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে এই অদ্ভুত-কর্মী মহাপুরুষ দেহরক্ষা করেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই এই মহাসাধক মহামানব মনুষ্য-চিন্তার গতি ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে

এক নূতন জাগরণের সঞ্চার করিয়াছেন। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ছিল বাংলা তথা ভারতের সংশয়ের যুগ। অথচ ইহাই ছিল বাংলার স্বর্ণযুগ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, যুগাবতার পরমহংস রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে, বিশেষভাবে পরমহংস দেবের নিকটতাহার আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এজন্য বিবেকানন্দকে জানিতে হইলে গুরু রামকৃষ্ণকে জানিতে হয়। শিষ্যের ভিতর দিয়াই গুরুর আদর্শ কাযকরী হইয়াছিল। ১৮৮৬ সালে পরমহংস দেব দেহরক্ষা করেন। বরানগর মঠে যে সন্ন্যাসীদল গঠিত হইল নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দ হইলেন তাহাদের নেতা। সেই সময় হইতে ১৮৯২ পর্য্যন্ত কি কঠোর সাধনা, বিবেকানন্দ আসমুদ্র হিমাচল ঘুরিয়া বেড়াইলেন। দেশের মাটি ও মানুষকে এরূপ কয়জন দেখিয়াছে, ভালবাসিয়াছে। সেবা করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছে? তারপর আমেরিকা, ইউরোপ ভ্রমণ—পাশ্চাত্ত্যে ভারতের বাণী প্রচার এবং সে দেশ হইতে ভারতে কর্ম্মের শক্তি আহরণ। কর্ম্মশক্তি দ্বারা বিচার করিলে বলিতে হয় ৩৯ বৎসরেই স্বামীজী শত বৎসরের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার জন্ম শতবার্ষিকীতে স্বতঃই মনে হয় যেন এযুগে আবার আচার্য্য শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে শিক্ষাব্রতী গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তাগুলি অতি সুন্দরভাবে পাঠককে উপহার দিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন যে 'গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে' করা হইল। অর্থাৎ এই মনীষীর চিন্তাগুলি লেখা, বক্তৃতা ও পত্রাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া অতি নিপুণভাবে আধুনিক পাঠকের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে সংক্ষিপ্ত জীবন কথা পরে শিক্ষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ (শিক্ষার সংজ্ঞা, শিক্ষা দর্শন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ইত্যাদি) বিবৃত হইয়াছে। মহাপুরুষের ধর্ম্মশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষা সম্পর্কীয় মত তিনটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। স্বামীজীর মতে মানুষগঠনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা—এই শিক্ষাকে পৃথক পৃথক ভাগ করা সম্ভব নহে। আর মানুষের সেবাই ধর্ম্ম ইহা ছাড়া আর কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। স্বামীজী স্ত্রীশিক্ষার উপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এবং এজন্য ভগিনী নিবেদিতাকে এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আজ ভারত স্বাধীন, শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার সার্থকতা দ্বারাই এই স্বাধীনতাকে সফল করিতে হইবে। বিবেকানন্দের শিক্ষার ও স্বদেশ প্রেমের আদর্শ আজ দেশের ধর্ম্ম ও চিন্তা নায়কগণের পথ-প্রদর্শক হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মানবী ও পৃথিবী ঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—তাপসকুমার ঘোষাল, ১৬৩ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা, মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই, চুয়াল্লিশটি কবিতার গ্রন্থন। পড়িবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম এগুলি হয় আধুনিক, নয় গতানুগতিক। কিন্তু পাঠ করিয়া দেখিলাম ঠিক সেরকমের নয়, বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। লেখক যে একজন সত্যিকারের কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কতকগুলি কবিতায় যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। ভাষা ও ছন্দে কবির চমৎকার দখল।

কবিকণ্ঠ—সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা কর্তৃক পরিবেশিত। দাম পাঁচ টাকা।

আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলা দেশ হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগীর সংখ্যা তাই দিন দিন বাড়িতেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, এমন কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গেও আন্তরিক যোগ ঘটিতেছে। রবীন্দ্ররচনার মধ্যে তাই সঙ্গীতাংশের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে সর্বাধিক।

কিঞ্চিদাধিক ষাট বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি যখন ডিস্ক্ রেকর্ড আবিষ্কার হয় নাই, সেই সুদূর অতীতে ফনোগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা টমাস আলভা এডিসনের নিকট হইতে ফনোগ্রাফ যন্ত্র আনাইয়া তাহাতেও রবীন্দ্রনাথের নিজকণ্ঠের সঙ্গীত ও আবৃত্তি রেকর্ড করা হইয়াছিল—সেই লুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করিয়া সে-সম্পর্কে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়া সন্তোষ কুমার দে রবিবাসরের দুইটি অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন, সে প্রবন্ধ দীর্ঘকাল আগে তাঁহার মুখেই আমরা শুনিয়াছি। দীর্ঘকালের চেষ্টায় সংগৃহীত 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থখানিতে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত যাবতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া আছে। বলা বাহুল্য তার মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরও অন্যান্য শিল্পীর নামের তালিকাও বাদ পড়ে নাই। ইহা ব্যতীত সতের খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র, পত্র ও দলিল প্রভৃতি গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এমন একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রেকর্ডে বিধৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানিতে পারিবেন এবং নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবেন।

কিন্তু কেবল রেকর্ডতালিকাই 'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থখানির একমাত্র পরিচয় নয়। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় গ্রন্থখানি সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া সন্তোষকুমার দে লিখিত সুচিন্তিত এবং তথ্যসমৃদ্ধ প্রথম খণ্ডটির (ইতিহাস অংশ) দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"...রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত তথা সাহিত্যকৃতির একটি মুখ্য অঙ্গ নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গবেষণায় পরোক্ষ অনুমান বা কল্পনার কোন স্থান নেই। আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে যুক্তিপ্রমাণ এবং দলিলাদি প্রত্যক্ষ নিদর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই প্রত্যক্ষ নিদর্শনের প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। এটাই এই গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আর যে বিষয়টির উপরে এই আদর্শ গবেষণাপদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে সে বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত এবং তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের সকলের পক্ষেই এই গ্রন্থ অপরিহার্য হয়ে থাকবে।"

রবীন্দ্রচর্চায় ব্রতী, এবং রবীন্দ্রানুরাগী সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই 'কবিকণ্ঠ' একখানি সত্যই অপরিহার্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশেষ করিয়া যাঁহারা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করেন তাঁহাদের পক্ষে এটি একটি আকর গ্রন্থস্বরূপ। সকল স্কুল, কলেজ এবং লাইব্রেরীর পক্ষেই 'কবিকণ্ঠ' সংগ্রহে রাখা বাঞ্ছনীয়, কারণ এই বিষয়ে এটি প্রথম এবং অদ্বিতীয় পুস্তক। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর, দামও আকারে পরিমাণে সুলভ। আমরা কবিকণ্ঠের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৭০

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৭০

— রঙীন চিত্র —

— শরৎ-শ্রী —

শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাসুং শ্রী

শিল্পী : শ্রী নন্দলাল বসু

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

৫ম সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৭০

কামরাজ প্রস্তাব ও বাঙালী মধ্যবিত্ত

অতীতে—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত—বাঙালীর সমাজ প্রধানতঃ চারিটি স্তরে বিভক্ত ছিল। এই বিভাগ জাতিবর্ণ অনুযায়ী ছিল না এবং সকল সময়ে, শিক্ষা-দীক্ষা বা জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ীও ছিল না। ইহা ছিল প্রধানতঃ অর্থসঙ্গতির অনুপাতে এবং সেই অনুসারে বিত্তবান্, সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সাধারণ এই চারিস্তরের মিলনে সমাজ স্থাপিত ছিল। ইহার মধ্যে সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানগণ প্রায় সকলেই এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদিগের মধ্যে উদ্যম ও অধ্যবসায়-যুক্ত অনেকে, উচ্চশিক্ষা ও উন্নতমানের চিন্তা ও চর্চ্চার অবকাশ পাইত। এবং বাংলার ও বাঙালীর গৌরবময় অতীতের প্রায় সব কিছুই এই দুই স্তরের কৃতী সন্তানদিগের কীর্ত্তি। ইহাদেরই জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা ও উন্নত শিক্ষা দীক্ষা ও চিন্তার শক্তিতে বাঙালী সারা ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল জাতি বলিয়া উচ্চাসন পায় এবং বাঙালীর জীবন-যাত্রার মান ও ভারতের অন্য প্রদেশীয়দের তুলনায় অনেক উন্নত ও অগ্রসর হয়। তবে চাষী গৃহস্থ ও কারিগর সম্প্রদায়গুলি ক্রমেই ঋণভার প্রপীড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতে থাকে। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিত্তবান্ পরিবারের সন্তান-গণের অধিকাংশই বিলাসব্যসনে আসক্ত হইয়া পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তির ক্ষয়ই করিতে থাকেন। ক্বচিৎ-কদাচিৎ দুই দশজন বুদ্ধিজীবি বা ব্যবহারজীব হিসাবে আয় ও সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে বণিক-সম্প্রদায়ের বাহিরে বাঙালীর অধিকার ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতে থাকে, শিল্পপতিরূপে বা "ঠিকাদার" হিসাবে, নিছক বাঙালী কারবারের মালিক বাংলাদেশেই মুষ্টিমেয় কয়জনমাত্র ছিলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বিত্তবান্ পরিবারের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট, কেননা যেমন একদিকে "বনিয়াদি" পরিবারের বিত্তক্ষয় চলিতেছিল, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে উত্থিত ঐশ্বর্যশালী পরিবারের সৃষ্টিও চলিতেছিল সমানে।

এই ছিল বাঙালী সমাজের অবস্থা প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত। প্রথম মহাযুদ্ধে এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বহু বাঙালী প্রতিষ্ঠানের উত্থান ও পতন হয় এবং শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাঙালীকে হটাইয়া ভিন্ন প্রদেশীয়েরা সে স্থান অধিকার করে। এবং বহু বিত্তশালী পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হয় পরিবারের কর্ত্তারা বাজারের ঠগেদের প্ররোচনায়, "কাঁচা টাকা" বা শেয়ার বাজার ও ফাটকা বাজারের জুয়ায়, ধনকুবের হওয়ার চেষ্টায়। এই শেয়ার বাজারের প্রলোভনে বহু বিত্তশালী পরিবার বিষমভাবে ঘায়েল হয় এবং মধ্যবিত্ত স্তরের বহু অবস্থাপন্ন পরিবার নিঃস্ব হইয়া পথে দাঁড়ায়। এই অবস্থা চরমে ওঠে ১৯৩৪-'৩৫ সালের মধ্যে।

সরকারি চাকরির বাজারে বাঙালীকে প্রথমে হটিতে হয় ব্রিটিশ শাসক ও শোষকদিগের প্রতিহিংসার কারণে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বাঙালীর দেশপ্রেমের প্রতিঘাতে ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু সেই দিন্ হইতেই বিদেশী শাসক ও বিদেশী বণিক্-শিল্পপতি খড়্গহস্ত হইল বাঙালীর উপর।

সরকারী ও বিদেশী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরিখালি বিজ্ঞাপনে "বাঙালীর আবেদন নিষ্প্রয়োজন" এই টিকা ত চতুর্দ্দিকেই দেখা গেল, উপরন্তু বাঙালী দালাল, মুৎসুদ্দির বিরুদ্ধে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের দ্বাররুদ্ধও হইতে থাকিল ক্রমাগত। বাঙালীর বিরুদ্ধে এই জেহাদে মহা উৎসাহে যোগদান করে ভিন্ন প্রদেশীয় ভাগ্যান্বেষীর দল এবং বাঙালী বিত্তশালী পরিবারের সর্ব্বনাশ ও মধ্যবিত্তের অন্নসংস্থানের বাধাদানে বিদেশী সরকারের প্রতিহিংসা স্পৃহার পূর্ণ সুযোগ ভিন্ন-প্রদেশীয়েরা লইয়াছিল। অবশ্য বাঙালী এই ব্যাপারে নির্দ্দোষ বা সম্পূর্ণ অসহায় ছিল একথা বলা চলে না। নিজের দোষও পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত এই দুইয়েতেই বাঙালীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে।

তারপর আসে মুস্লীম লীগের শাসন এবং দুর্নীতি ও অনাচারের প্লাবন। এবং সেই প্লাবনের অল্পপরেই আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর। বাঙালীর—বিশেষে হিন্দু বাঙালীর—সংসার ও সমাজের উপর যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এবং সুবিধা বুঝিয়া বিদেশী শাসক চণ্ডমূর্তি ধারণ করিয়া প্রচণ্ড দমননীতি চালাইল বাঙালীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে চিরকালের জন্য মুছিয়া ফেলিতে। কিন্তু শত-সহস্র পরিবার এই নিদারুণ অভাব অনটন ও বিদেশী শাসকের নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গে নাই। যে দেশাত্মবোধের অগ্নিশিখা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পূজারিগণ বিংশ শতকের প্রারম্ভেই জ্বালিয়া ছিলেন তাহার নির্ব্বাপণ বিদেশীর পক্ষে সম্ভব হইল না। বাঙালী টলিল না, হতাশ্বাস হইয়া আত্মসমর্পণ করিল না। স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়লাভ ও জয়লাভের পর ভাগ্য পরিবর্ত্তন এই দুইয়ের আশাপথ চাহিয়া সে সকল অত্যাচার অবিচার ও অভাব-অনটনের নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিল। এই ত বাঙালীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—যাহার পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হয় নাই এবং কোনওদিন লিখিত হইবে কিনা সন্দেহ, এমনই বাঙালীর কপাল। অথচ অন্য প্রদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হইবার বহুপূর্ব্বেই বাঙালীর আত্মাহুতি সমানে চলিতেছিল। বলা বাহুল্য বাঙালী বলিতে বাঙালী মধ্যবিত্তকেই বুঝায়। এই আত্মনিবেদন, স্বদেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ মধ্যবিত্ত স্তরেই প্রবল ছিল।

এত কথা লিখিলাম তাহার কারণ বর্ত্তমানে দেশের শাসন-তন্ত্র ও রাষ্ট্রচালনা যাঁহাদের হাতে তাঁহারা এ জাতির ঐতিহ্যকে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সব কিছু গড়িতে চাহেন। তাঁহারা ইতিহাসের শিক্ষা হয় ভুলিতে চাহেন অথবা সে শিক্ষা তাঁহারা অর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক ও অক্ষম। স্বাধীনতা লাভের পরও বাঙালী যে অধিকতর ভাবে বঞ্চিত অবহেলিত ও লুণ্ঠিত হইতেছে একথা ত তাঁহারা বুঝিতেই চাহেন না। তাঁহাদের এই অবুঝ ও বিমুখ ভাবের পূর্ণ সুযোগ লইয়া বিপক্ষদলগুলি অপপ্রচারের পরাকাষ্ঠা করিতেছে, ইহাও কি তাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ?

আমরা বাংলার উপর ঝোঁক দিয়ে লিখিতেছি তাহার প্রধান কারণ বাঙালী, বিশেষ পশ্চিমবাংলার বাঙালী, ক্রমে নিজ দেশেই বাস্তহারা হইতে চলিয়াছে। তাহার সহায় কেহ নাই তাহার পক্ষ সমর্থন করারও কেহ নাই। পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত সর্ব্বহারাদের পুনর্ব্বাসনের ভার কেন্দ্র লইয়াছেন—যদিও সে কাজে অশেষ ত্রুটি ও অসংখ্য গলদ হইয়াছে ও রহিয়াছে। পশ্চিমবাংলার সন্তানগণ যে সর্ব্বস্বান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়া দিশাহারা ও বাস্তহারা হইতে চলিয়াছে তাহাদের পুনর্ব্বাসন করিবে কে?

আমরা কিংবদন্তী শুনিয়াছি যে গণতন্ত্র অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রে দেশ শাসিত হয় জনসাধারণের জীবনযাত্রাপথ সহজ সরল ও প্রগতিমুখী করার জন্য। কিংবদন্তী শুনিয়াছি বলিতেছি এই কারণে যে আমাদের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ও দেখিতেছি—গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র ইত্যাদি শুধু গোষ্ঠীবাচক নাম মাত্র, কার্যতঃ "কর্তার ইচ্ছায় কর্মই" চলে সর্বত্র—কোথাও বা কঠোর একাধিপত্যের রূপে, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবে আবদ্ধ মন্ত্রীসভার দলগত নেতৃত্বের মাধ্যমে। সাধারণজনের জীবনযাত্রা সহজ সরল বা দুর্গম দুর্ব্বহ হইতেছে সে বিষয়ে দলের উচ্চতম অধিকারিবর্গের হুঁস হয় নির্ব্বাচনের যুদ্ধ আসন্ন হইলে কিম্বা উপনির্ব্বাচনে বিষম চোট্ লাগিলে—যেমন লাগিয়াছে রাজকোটে, আমরোহায় ও ফরক্কাবাদের লোকসভা উপনির্ব্বাচনে। ঐরূপ আঘাত লাগিলে তখন দলের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে এবং উচ্চতম অধিকারিবর্গের নীতি-জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান চাগিয়া উঠে—যেমন ঘটিয়াছে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৯ই ও ১০ই আগষ্টের দুই দিন ব্যাপি গোপন অধিবেশনে। সেখানে আলোচনার ধারা ও কর্ত্তা শ্রীনেহরু কথিত মতামত সম্পর্কিত রিপোর্টের চুম্বক এইরূপ:—

নয়াদিল্লী, ৯ই আগষ্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ ঘোষণা করেন যে, হালের কয়েকটি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের যে পরাজয় ঘটিয়াছে, তাহা দলের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচীর গুণাগুণের রায় নহে। বরং ঐ সব পরাজয়ের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। সব কয়টি বিরোধী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিয়াছে, তবে উহাদের মধ্যেও তলে তলে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলিতেছে।

সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনগুলিতে কংগ্রেসের যে মৌলিক সাংগঠনিক দুর্ব্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে, তাহার মূলোচ্ছেদের

উপায় উদ্ভাবনকল্পে এগারজন সদস্য লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য শ্রী এস. এন. মিশ্রের নেতৃত্বে ৮৪ জন সদস্য যৌথভাবে একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। আজ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির দুইদিন ব্যাপী গোপন অধিবেশনে এই বিষয়ে একটানা ছয় ঘণ্টা আলোচনার শেষ দিকে বিতর্কে যোগ দিয়া শ্রীনেহরু পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিলে তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হয়।

শ্রীনেহরু বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি শ্রী জি. এল. নন্দের সভাপতিত্বে ৭ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনগুলির কয়েকটিতে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের ব্যাপারে সাংগঠনিক দোষত্রুটি নির্ণয় করাই ঐ কমিটির তদন্তের উদ্দেশ্য। কাজেই কংগ্রেস সভাপতি কর্তৃক এই তদন্ত কমিটি নিয়োগের পর সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবটি অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি তলব সভা আহ্বানকারীদের মধ্য হইতে দুইজনকে কংগ্রেস সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিতে লওয়ার প্রস্তাব করেন।

শ্রীনেহরু বলেন যে, গণতান্ত্রিক সরকার সর্বোৎকৃষ্ট গভর্ণমেণ্ট না হইলেও প্রচলিত গভর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে উত্তম। গণতন্ত্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রতিভাস। কাজেই কংগ্রেসসেবীদিগকে পরিবর্তনশীল আধুনিক জগতের তাল রাখিয়া চলিতে হইবে।

শ্রীনেহরু স্বীকার করেন যে, প্রাক্‌স্বাধীনতা কালেও কংগ্রেসের মধ্যে দল উপদলের অস্তিত্ব ছিল। তবে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের মধ্যে দলাদলি ও তিক্ততা বাড়িয়াছে।

তিনি বলেন যে, কংগ্রেসকে হারাইবার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলগুলি একজোট হইয়াছে ; কংগ্রেসকে তাহারা 'দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা' বলিয়া অভিহিত করিতেছে। কিন্তু কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা দুর্নীতিপরায়ণ একথা বলা ভুল।

শ্রীনেহেরু ঐ পরাজয়গুলি জনমতের নির্দেশ বলিতে রাজী নহেন। তবে যাঁহারা এবিষয়ে তদন্ত করিতেছেন, তাঁহারা কি বলেন সে কথা পরে জানা যাইবে। তিনি বলেন যে, গণতন্ত্রে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রতিফলন দেখা যায় সুতরাং কংগ্রেস সেবীদের চলমান জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইবে। সেই সঙ্গে তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে দুর্নীতি ঢুকিয়াছে, তবে (তাঁহার মতে) অধিকাংশ নেতা দুর্নীতিপরায়ণ নহেন। একথা অবশ্য কেহ বলেন নাই যে কংগ্রেসে কাহারা প্রবল, দুর্নীতিপরায়ণ কেউটের দল বা নীতিজ্ঞানযুক্ত ঢোড়ার দল, সংখ্যায় লঘিষ্ঠ বা গরিষ্ঠ যেই হউক।

আমরা এইখানে বলি যে কংগ্রেস, নেতৃত্বের দোষে, জনকল্যাণের পথ ছাড়িয়া দলস্বার্থের দিকে যে এই ভাবে চলিয়াছে তাহাতে আমরা দুঃখিত ও সন্ত্রস্ত। সেই কারণে পণ্ডিত নেহেরুর মন্তব্যকে আমরা ভ্রান্ত ও অসমীচীন বলিতে বাধ্য।

সে যাহাই হউক নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে কামরাজ প্রস্তাব—যাহা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৮ই ও ৯ই আগষ্টের অধিবেশনে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়—আলোচিত ও গৃহীত হয়।

কামরাজ প্রস্তাবের মর্ম্ম সংক্ষেপে এইরূপ : দলের নির্দেশ সাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ব্যতীত অন্য সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে পুরা সময় আত্মনিয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জাতীয় স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীনেহেরুর থাকা প্রয়োজন।

রাজ্যসমূহে ও কেন্দ্রে কোন্ কোন্ মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে উপরক্ত মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহা স্থির করার চূড়ান্ত দায়িত্ব শ্রীনেহেরুর উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

প্রস্তাবের সমর্থনে প্রথম বক্তৃতা করেন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ। (তাঁহার পদবী নাদার, কিন্তু উহা ব্যবহারে তিনি অনিচ্ছুক)। তিনি তামিলে ভাষণ দেন। সেটি ইংরাজিতে তর্জমা করেন শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্।

শ্রীকামরাজ বলেন, নেতারা ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া "রাজনৈতিক সন্ন্যাসী" হোন, প্রস্তাবের উদ্দেশ্য তাহা নহে। স্বাধীন দেশে বৈষয়িক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারী দায়িত্ব বহন করিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য হইতেছে, যে সংগঠন সরকার পরিচালনা করেন, তাহা যদি শক্ত ও সমর্থ না হয়, তবে দ্রুত ও বাস্তব অগ্রগতি সম্ভব নহে।

শ্রীকামরাজ বলেন যে, তিনি মুখ্যমন্ত্রী বলিয়া তাঁহার পক্ষে সংগঠনের কাজে অধিক সময় দেওয়া সম্ভবপর নহে। অন্য প্রদেশেও সেই অবস্থা। যত প্রভাবশালীই হোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষে যুগপৎ সাংগঠনিক ও সরকারী কাজে সমানভাবে কাজ করা সম্ভবপর নহে।

তিনি বলেন, বিরোধী দল যতই বলুন, কংগ্রেস দল এখনও জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন। কিন্তু আমাদের নেতাদের অনেকেই মন্ত্রিত্ব বা ঐরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করায় দলের মধ্যে একটা বদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, কারণ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জনগণের সংযোগ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

শ্রীকামরাজ বলেন যে, প্রাক্-স্বাধীন কংগ্রেস একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন হিসাবে কাজ করিয়াছে। স্বাধীনতার পরে মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য কেহ কেহ দল ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক, ইহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণের সমর্থন করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা এইরূপ :—

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি বিবেচনার পর সমর্থন করিতেছেন। প্রস্তাবটি রূপায়ণের জন্য অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কমিটি ওয়ার্কিং কমিটিকে ক্ষমতা দিতেছেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। স্বাধীনতার পর দেশ শাসনের গুরুভার সে বহন করিয়াছে। দেশ দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিয়াছে। বৈদেশিক আক্রমণ ও দেশে বিভেদকামী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া দেওয়ায় দেশ এক গুরুতর সঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে কংগ্রেসের এক মহান্ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। কিন্তু দল কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী ও ঐক্যবদ্ধ না হইলে উহা পালন করা সম্ভব নহে। দুঃখের বিষয় কংগ্রেস সংগঠনে কেমন একটা ঢিলাভাব দেখা যাইতেছে, নানা দল উপদলের সৃষ্টি হইতেছে; অশুভকর এই প্রবণতা বন্ধ করিতেই হইবে। গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণ দ্বারাই মাত্র তাহা করা সম্ভবপর।

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকামরাজ প্রস্তাব করেন যে, নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কর্ম্মীদের উচিত মন্ত্রিত্ব ইত্যাদি পদ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করা। ওয়ার্কিং কমিটি উহা গ্রহণ করিয়া ঐ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন।

পদত্যাগের প্রথম প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু। ইহাই আশা করা গিয়াছিল। ওয়ার্কিং কমিটি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র বিবেচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, উহা জাতির স্বার্থের পরিপন্থী এবং উহা গ্রহণ করিলে প্রস্তাবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করার সময় দেখিতে হইবে যে দেশের প্রশাসন যেন কোনভাবে দুর্বল না হয়। তাই ওয়ার্কিং কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করিতেছেন যে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদত্যাগের জন্য যেন চাপ না দেন।

অনেক মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিয়া সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের পদত্যাগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়াছেন।

মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলে দেশে একটা নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে। ইহার পরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। উপরোক্ত প্রস্তাব সত্বর কার্যকর করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

বলা বাহুল্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই প্রস্তাবের পর কোনও কংগ্রেসী মন্ত্রীর পক্ষে পদত্যাগ না করা অসম্ভব তা তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভারই সদস্য হউন বা রাজ্যমন্ত্রীসভার। তাহার পর কে কোথায় থাকিবেন বা যাইবেন তাহার নির্দ্দেশ দিবেন শ্রীনেহরু। যাঁহারা মন্ত্রীসভা ছাড়িবেন তাঁহাদের আসনে কে বা কাহারা বসিবেন সে নির্দ্দেশ দিবে কে, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ সেখানেও পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার "সলাহকার" বর্গের নির্দ্দেশই চলিবে। যদি তাই হয় তবে সারা দেশব্যাপী একটা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে।

উদাহরণ স্বরূপে পশ্চিমবঙ্গের কথাই চিন্তা করা যাউক। এই প্রসঙ্গের আরম্ভে বাংলার ও বাঙালার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের যে চিত্র দিয়াছি তাহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা সংক্ষেপে দিয়াছি। এবং এই নিদারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কোনও উপশম না হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার বাঙালী কেন কংগ্রেস ছাড়ে নাই তাহার ইঙ্গিত দিয়াছি। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে হইলে বলিব, বাঙালী মধ্যবিত্তের সন্তানের দেশপ্রেম ও স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস দীর্ঘ দিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনলে পোড় খাইয়া ও বিদেশী শাসকের দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া এতই কঠিন ও সুদৃঢ় ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে সহজে তাহা ভাঙ্গিতে পারে না। কিন্তু আজ সেই বাঙালী মধ্যবিত্তের অস্তিত্বই মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। এবং সেটা কি ভাবে হইতেছে তাহা রাজ্যের মন্ত্রীগণই পূর্ণরূপে বুঝিতে ও তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম, পণ্ডিত নেহরু তাহা বুঝিবেন কি? তাঁহার মন্ত্রণাদাতা হইবেন কে কে তাহা আমাদের জানা নাই কিন্তু নয়া দিল্লীতে বাঙালীর—বিশেষ পশ্চিম বঙ্গের সন্তানদিগের মঙ্গলচিন্তা যে কেহ করেন তাহার কোনও আভাস আমরা দীর্ঘদিন পাই নাই।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী বাংলার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আধার। অতীতে বাংলা ও বাঙালী যা কিছু গৌরব-কৃতিত্ব ও যশ পাইয়াছিল তাহার প্রায় সব কিছুই এই মধ্যবিত্তের সন্তান অর্জ্জন করে। বর্ত্তমানে দেশের এই সংকটজনক অবস্থার প্রতিকার বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ধারে এবং ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে এই মধ্যবিত্তেরই উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত। যাহা বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলা হইল তাহা সারা ভারতেই প্রযোজ্য তবে বাংলার বাহিরে এক স্তরের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ এত বেশী নয়। তাহার প্রধান কারণ অন্য সকল প্রদেশে চাষী ও গ্রাম্য কারিগর এখানের মত অত দুর্দশাগ্রস্ত ও পরমুখাপেক্ষী নয় এবং তাহাদের জীবন যাত্রার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনপথের মান প্রায় একই প্রকার, বাংলার মত অতটা প্রভেদ বাংলার বাহিরে প্রায় কোথায়ও নাই। তবে শিক্ষা-দীক্ষা ও চিন্তার উৎকর্ষে, সকল প্রদেশেই—বলিতে কি সারা জগতে—এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সমগ্র দেশের ও জাতির ভরসা স্থল।

অথচ আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মহাপণ্ডিত নেতৃবর্গ এই মধ্যবিত্তের অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত পর্যন্ত করিতে চাহেন না। তাঁহাদের ধারণা যে যতদিন বিত্তবান্ ঠগ ও পিণ্ডারিবর্গ তাঁহাদের পার্টির ভাণ্ডারে টাকা ঢালিবে ততদিন তাঁহারা চাষী কর্মী ও দিনমজুর এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে ভুলাইয়া ভোট আদায় করিতে পারিবেন। অতএব মধ্যবিত্ত হতভাগ্যদিগের দুরবস্থার প্রতিকার করিতে কষ্ট করা কেন? এই মহাশয়গণের এটুকু জ্ঞানবুদ্ধি নাই যে তাঁহারা ইতিহাসের লিখন পড়িয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন। যদি তাঁহারা পারিতেন তবে বুঝিতেন যে সারা পৃথিবীর মনুষ্যসমাজে বিত্তবান্ ও শ্রমনির্ভর বা ভূমিনির্ভর এই দুই স্তরের লোক সাক্ষাৎ ও উপস্থিত বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বুঝে না। যে তাহাদের ঐ স্বার্থপূর্ত্তির পথ দেখাইবে উহারা ঐ দিকেই যাইবে। জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ বা দেশের ও দশের সমষ্টিগত কল্যাণের পথ, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য, এসকল বিষয়ে চিন্তা করার স্পৃহা বা অবকাশ উহাদের নাই। ভূত ভবিষ্যৎ লইয়া বিচার করার ক্ষমতা তাহাদের জন্মায় নাই কেননা তাহার জন্য প্রয়োজন যে শিক্ষা ও জ্ঞান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের নির্দ্দেশ, তাহার কোনটাই তাহাদের জোটে নাই। দেশাত্মবোধ, জনকল্যাণ ইত্যাদির জন্য সমষ্টিগত প্রেরণা ও চেতনা তাহাদের দিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত, শিক্ষিত এবং উৎসাহী মধ্যবিত্তের সন্তান অযুতের সংখ্যায়, লক্ষের গণনায়। তাহারাই অতীতে ধারক ও বাহক হইয়া, কঠোর অগ্নিপরীক্ষায়, দ্বিধাহীন দৃঢ় পদক্ষেপে, আত্মবলিদান দিয়া জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—এবং করিবার শক্তি রাখে। ইহা শুধু আমাদের দেশের ইতিহাস লিখন নয়, ইহাই সকল দেশের জাতিজাগরণের ইতিহাস, অতীতের ও বর্ত্তমানের।

আমরা প্রত্যক্ষভাবে ইহা দেখিয়াছি, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, এবং এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই।

আজ সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে দেশের কর্ত্তৃপক্ষের নির্বুদ্ধির ফলে। অন্যদিকে সারা দেশ চোরাকারবারী ও শুষ্কক মুনফাবাজের নির্ব্বিবাদ, অবিশ্রাম লুণ্ঠনের ফলে। কৃষক চাহিতেছে শস্যের মূল্যবৃদ্ধি কেননা সেখানে তাহার স্বার্থপূর্ত্তির সহজপথ, শ্রমিক চাহিতেছে মজুরীর বৃদ্ধি, 'কর্ম্মীদল' দলগতভাবে চাহিতেছে মাগ্‌গিভাতার বৃদ্ধি এবং যেখানেই স্বার্থপূর্ত্তি নাই সেখানেই শস্যে ভেজাল, কাজে ফাঁকি। ইহাদের বুঝাইবে কে? যেখানে সরকার অপারগ বলিয়া ওজর অজুহাত ও ফাঁকা উপদেশে দিনগত পাপক্ষয় করিতেছেন ও যেখানে শাসনতন্ত্র একদিকে সংবিধানের জটিল বেড়াজালে আবদ্ধ ও অন্যদিকে দুর্নীতি পরাজয় অধিকারীবর্গের চক্রান্তে ব্যাহত, সেখানে দেশকে উদ্ধার করিবে কে? কংগ্রেস? কংগ্রেসকে পাপমুক্ত করিবে কে?

এরূপ অবস্থায়, যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের শত্রুদল নানাভাবে ধ্বংসচেষ্টায় ব্যস্ত তখন ডাক আসিল শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গকে হাল ছাড়িয়া 'দলসংগঠন' মহাকাজে লাগিতে—অর্থাৎ দেশ জাহান্নমে যাউক, কংগ্রেসের ভোটধরা জালের আগে রিপুকর্ম্ম করা হউক। বলিহারি বুদ্ধি!

পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীকামরাজকে আমরা একটি মার্কিন প্রবাদ মনে করাইয়া দিতেছি "Don't swap horses in midstream"। দেশ দুর্নীতির বানে ভাসিয়া যাইতেছে আবার শত্রুর উদ্যতশক্তি জলোচ্ছ্বাসের মত দূরে দেখা যাইতেছে, সেই সময় নদীর মাঝে প্রবল স্রোতের মুখে, ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া সোয়ারী বদল। এ বুদ্ধি তাহাদেরই গজায় যাঁহারা স্বাধীনতা যুগের চরম মুহূর্ত্তে জেলের চার দেওয়াল ছাড়া কিছু দেখেন নাই এবং সেইকারণে দেশের সব কিছুই তাঁহারা দেখেন ও বুঝেন দলের দৃষ্টিতে এবং ভোটের গণনায়। উপনির্ব্বাচনে তাঁহাদের চেতনা আসিয়াছে যে দেশে কোথায় যেন কি একটা রোগ ধরিয়াছে। দেশ বলিতে তাঁহারা দল বুঝেন সুতরাং দল রোগমুক্ত হইলেই দেশোদ্ধার হইবেই। দল রোগমুক্ত হইবে কেমনে, না গল্পের কবিরাজের ব্যবস্থার অনুরূপ "হরিতকী" প্রয়োগে। অতএব দলের যত "হরিতকী", ঝুনো, পাকা, কাঁচা, সবকিছুই শাসনতন্ত্রের মাচা হইতে নামাইয়া দলের ধন্বন্তরী কবিরাজের সম্মুখে রাখা হউক, তিনি বাছিয়া লইয়া প্রয়োগ করিবেন।

বলা বাহুল্য এরূপে বন্যার স্রোতের মাঝে ঘোড়া বদলে ঘোড়াও লাগাম ছাড়া পাইয়া উদ্দাম গতিতে বন্যার স্রোতেই পড়িবে ও ডুবিবে এবং সোয়ারও ভাসিয়া যাইবেন—অর্থাৎ শাসনতন্ত্র ও কংগ্রেসীদল দুই-ই যাইবে এবং অধিকারীবর্গ অযথা হাবুডুবু খাইয়া কূল পাইবেন না। এখন সর্ব্বপ্রথমে

প্রয়োজন শাসনতন্ত্রের সংস্কার অর্থাৎ একদিকে তাহা দুর্নীতি-পরায়ণ অধিকারি ও রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিদিগের প্রভাব হইতে মুক্ত করা অন্য দিকে শাসনতন্ত্র যাহাতে প্রকৃতপক্ষে জনকল্যাণ ও দেশরক্ষার সহায়ক হয় সেইভাবে উহাকে নির্ম্মাণ করা। সংবিধান এখন দুষ্টের ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকের সহায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারও প্রতিকার প্রয়োজন। এইরূপ সংস্কার না হইলে জাতির সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য এবং সেই সর্ব্বনাশের পথ রুদ্ধ না হইলে শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের আসন ত্যাগ অতিশয় অবিবেচনার কাজ হইবে।

স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতির আহ্বান

আমাদের রাষ্ট্রপতি স্থিরপ্রজ্ঞ দার্শনিকের দৃষ্টিতে বহমান কালের জগতকে দেখেন সুতরাং তাঁহার ভাষণ ও মন্তব্যে ফেনিল অসার উচ্ছ্বাস থাকে না। জাতির উদ্দেশ্যে এই স্বাধীনতা দিবসে যে উদাত্ত আহ্বান তিনি প্রচারিত করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য সেই কারণে। বর্ত্তমানকালে আমাদের সম্মুখে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে তাহার প্রায় সব কিছুই আলোচিত হইয়াছে এই ভাষণে। ভাষণের মধ্যে যে কয়টি অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল :—

আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদিগকে এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের অবশেষ এখনও রহিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে মুষ্টিমেয়র নিকট এখনও ব্যষ্টিকে নতি স্বীকার করিতে হয়। যত দ্রুত সম্ভব এই ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করিতে হইবে, যদি আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সত্যই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি। ক্রমবর্দ্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপ্লবকে আমরা যদি সার্থক করিতে না পারি, তাহা হইলে হতাশ, নৈরাশ্যবোধ ও অবিশ্বাস দেখা দিবে। ইহা কোন সমাজের পক্ষেই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। তবে আমাদের মূল নীতির উদ্দেশ্য হইল, সমাজকে এমন করিয়া পুনর্গঠন করা যাহাতে এই সব অস্বাস্থ্যকর মনোভাব প্রকাশের কোনও সুযোগই না আসে। শিল্প ও কৃষিকার্যে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করিয়া আমরা কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সড়ক, বিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য এবং গৃহনির্ম্মাণ কর্ম্মসূচী ও চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি।

শিক্ষা বিকাশের—বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জন্য আমরা সচেষ্ট আছি। আধুনিক জগতের গতিচ্ছন্দের সহিত তাল রাখিয়া, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে যুক্তিসম্মত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। স্কুলে, কলেজে এবং স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমাদের আচরণে শালীনতা-বোধ আনা প্রয়োজন। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, দলগত ঝগড়া, ব্যক্তিগত রেষারেষি ক্ষমতার লড়াই ইত্যাদির জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্র ঠিকভাবে বিকশিত হইতেছে না। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, জাতির নৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করিবার জন্য সকলে ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

চীনের সহিত আমাদের সম্পর্ক এখনও স্বাভাবিক নয়, ইহা দুঃখের কথা, এইগুলি এবং পাকিস্তানের সহিত আমাদের মতানৈক্য যাহাতে শান্তিপূর্ণ, শুভেচ্ছামূলক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দূর হয়, ইহাই আমাদের কাম্য। আমাদের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে সত্য কিন্তু আমরা কখনও শান্তির পথ হইতে বিচলিত হইব না।

বলা বাহুল্য যে সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টের কথা রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রদ্বয়ে রহিয়াছে। সামন্ত রাজ্যগুলির ত আর কোনই ক্ষমতা বা আধিপত্য নাই।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার খ্যাতিমান সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে জুলাই পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

জয়নগর মজিলপুরের ফুটিগোদা গ্রামে ১৩১২ সালের ২রা মাঘ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতুলকৃষ্ণ ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কলিকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার ক্ষমতা ছিল বহুমুখী। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের তিনি একজন পথিকৃৎ। বিশেষ করিয়া শিশু-সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণের এই অকাল বিয়োগে বাংলা সাহিত্যেরই শুধু নয়, বাংলা চলচ্চিত্রেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশে বেতারের বর্ত্তমান জনপ্রিয়তার পিছনেও নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণের অশেষ দান রহিয়াছে। কলিকাতার বেতারের জন্মকাল হইতেই তিনি তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি অনেক শ্রোতার নিকটেই আজও 'গল্পদাদু' বলিয়া পরিচিত।

এই প্রিয়দর্শন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ কল্লোলযুগের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। তিনি ছিলেন গল্পভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। এমন বন্ধু-বৎসল সদালাপী পরোপকারী বর্ত্তমান যুগে বিরল। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদ্য ও মূল্য সমস্যা

খাদ্য ও মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা লইয়া দেশজোড়া যে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে বর্ত্তমানে সরকারী মহলেও অবশেষ বিশেষ উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যাইতেছে। কিন্তু খাদ্যপণ্যের ক্রমান্বয় মূল্যবৃদ্ধি আজিকার হঠাৎ গজাইয়-উঠা সমস্যা নহে। ইহার সূচনা দ্বিতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকালের শেষ ভাগ হইতে ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় জনৈক সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রনালয়ের তরফ হইতে যে লিখিত জবাব পেশ করা হইয়াছে তাহাতেই ইহার স্পষ্ট স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৯ সনে প্রবল বন্যা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ চাউলের গড়পড়তা খুচরা মূল্য ছিল কিলো-প্রতি ৫৬ নয়া পয়সা (প্রায় ২১ টাকা মণ), কিন্তু পর বৎসরের মধ্যেই প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া এই চাউলের দর দাঁড়ায় ৬৮ নয়া পয়সা কিলো (প্রায় ২৬৲ টাকা মণ)। ১৯৬১ সনে আবার পূর্ব্ব বৎসরের মূল্যমান ফিরিয়া আসে—এই বৎসর আশাতীত ভাল ফসল হইয়াছিল—কিন্তু ১৯৬২ সনের মাঝামাঝি হইতে আরও বেশী মূল্যবৃদ্ধি হইয়া এই দর ৮২ নয়া পয়সায় (প্রায় ৩১৲ মণ) দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি অনুযায়ী গত ৩রা জুন তারিখে যে তিন সপ্তাহ শেষ হয়, তাহার মধ্যে এই দর আরও ৮% বৃদ্ধি পাইয়া মণ-প্রতি প্রায় ৩৩।. টাকায় পৌঁছায়। তাহারও পরবর্ত্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও প্রভূত পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী স্বীকৃতি মতেই কলিকাতার কোন খুচরা বিক্রীর দোকানে ৩৭।৩৮ টাকা মণের নীচে সাধারণ মানের চাউল পাওয়া দুষ্কর।

গত ৩রা জুলাই তারিখে নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শ্রম ও পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করেন যে, গত বারোমাসে দেশের মোটামুটি পাইকারী মূল্যমান যে ৪.৭% পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার জন্য সম্পূর্ণভাবে একমাত্র খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধিই দায়ী। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, খাদ্য-ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী আংশিক (Marginal) ঘাটতির সুযোগে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিয়া এই অবস্থাটি ঘটাইয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, মূল্যবৃদ্ধি নিরোধকল্পে গত বৎসর যে সকল কমিটি গঠন করা হইয়াছিল তাঁহাদের সক্রিয় তৎপরতার ফলে মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ প্রয়াসে অন্ততঃ কিছুটা সফলতা সাধিত হইবে। কোন কোন স্থলে এই সকল কমিটির তৎপরতার ফলে মূল্যবৃদ্ধির ধারায় খানিকটা ভাঁটাও পড়িতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, এই সকল কমিটিগুলিকে সক্রিয় রাখিতে হইলে যে যৎসামান্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, সময়মত সরকার তাহা মঞ্জুর না করায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কমিটিগুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। চিনির প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এক বৎসর অতিরিক্ত চিনি উৎপাদনের ফলে ইক্ষু উৎপাদন কমাইয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহারই ফলে চিনি সরবরাহে বর্ত্তমান ঘাটতি ও তজ্জনিত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

গত ৪ঠা জুলাই তারিখের এক বিবৃতিতে দেখিতে পাই কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীপাতিল বলিতেছেন যে, গত এক মাসে দেশের সাধারণ পাইকারী মূল্যমান ১৩১.১ (১৯৫৫-৫৬ ১০০) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৪.৪ হয়। এক বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছিল ১২৫.২। তিনি বলেন এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ বর্ত্তমান বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশবাসীর উপর যে পরোক্ষ করের প্রচণ্ড বোঝা চাপানো হইয়াছে তাহাই দায়ী। অবশ্য খানিকটা পরিমাণে সরবরাহের ঘাটতিও যে এই মূল্যবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে—এ কথাও তিনি স্বীকার করেন। এইভাবে অনবরতঃ মূল্যবৃদ্ধি সফলভাবে নিরোধ করিতে না পারিলে যে অচিরেই দেশের শিল্প-শ্রমিকদের তরফ হইতে অনিবার্য্য ভাবে পরিপূরক ভাতাবৃদ্ধির দাবী প্রবল হইয়া উঠিবে, তিনি এমন আশঙ্কাও করেন। এই প্রসঙ্গে কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীডাঙ্গে বলেন যে, অনবরতঃ বর্দ্ধমান মূল্যপ্রসূত আয়ের মান কমিয়া যাইবার ফলে অনিবার্য্যভাবে ভাতাবৃদ্ধির দাবী উঠিতে এবং শিল্প-শান্তি বিঘ্নিত হইতে বাধ্য। একাধারে বর্ত্তমান ট্যাক্স ও মূল্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় সঞ্চয়ের ক্ষীণতম আশাটুকুকেও নষ্ট করিয়া দিয়াছে,—এই অবস্থায় শ্রমিকেরা কোথা হইতে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় করিবে?

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার খাদ্য-বিতর্ক উপলক্ষ্যে এই রাজ্যে মূল্য নিরোধকল্পে কি কি সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলেন যে আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণ বা modified rationing-এর দ্বারা

বর্ত্তমান অবস্থার উপশম ঘটাইবার প্রয়াস করা হইতেছে। চাউল, চিনি, গম ইত্যাদি অবশ্য-ভোগ্য খাদ্য-পণ্যাদি সরকারী ন্যায্য-মূল্য দোকানগুলিতে র‍্যাশন-কার্ডের হিসাব অনুযায়ী বিক্রয় করা হইতেছে। পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৬ লক্ষ র‍্যাশন কার্ডের সরবরাহ এই দোকানগুলিতে দেওয়া হইত। সম্প্রতি আরও ৭ লক্ষ বাড়িয়া ৬৩ লক্ষ হইয়াছে। সর্ব্বসাকুল্যে এই দোকানগুলির মারফৎ ১ কোটি পর্য্যন্ত লোকের চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতে পারে। ১৯৫৯ সনের বন্যার সময় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের চাহিদা এই দোকান-গুলি মিটাইয়াছে। একান্ত প্রয়োজনবোধে এখনও তাহা করা যায়। ইহা ছাড়া আরও ৫ লক্ষ লোক টেষ্ট রিলিফ মারফৎ খাদ্য-পণ্যের সরবরাহ পাইতেছেন। মাথা-পিছু দৈনিক ১৬.৫ আউন্স হিসাবে এই রাজ্যের ৩ কোটি ৭১ লক্ষ লোক-সংখ্যার চাহিদা মিটাইতে হইলে ৬২ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। উৎপাদনের পরিমাণ ৪০ লক্ষ টন মাত্র; চাষী যা উৎপাদন করেন তাহার দ্বারা তাঁহাদের দুই হইতে দশ মাস পর্য্যন্ত খাওয়া চলিতে পারে অর্থাৎ ইঁহারা গড়পড়তা নিজেদের ছয় মাসের প্রয়োজনমত শস্য উৎপাদন করিতে পারেন। অতএব মোটামুটি রাজ্যের ১ কোটি ১০ লক্ষ চাষী নিজেদের বৎসরের পুরা প্রয়োজন মিটাইবার মত উৎপাদন করিয়া থাকেন। রাজ্যে অতিরিক্ত অনধিকৃত চাষের জমি আর একেবারেই নাই। অতএব বিশেষ পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ ও আশাও নাই। পশ্চিমবঙ্গের মোট বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন উৎপাদনের মধ্যে ৩৪ লক্ষ টন গ্রামের চাহিদা মিটাইতেই ব্যয় হয়। অবশিষ্টের মধ্যে ৪ লক্ষ টন কলিকাতায় পৌঁছায়। সরকারী খাতে সর্ব্বোর্দ্ধ আরও ৫ লক্ষ টন শস্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন। এই অবস্থায় পূর্ণ র‍্যাশন বণ্টন প্রবর্ত্তন করা অসম্ভব, তাহা হইতে পারে কেবলমাত্র সকলে যদি মাথা-পিছু দৈনিক ৮ আউন্সমাত্র বরাদ্দ স্বীকার করিয়া লইতে রাজী হন।

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় পেশ-করা খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের হিসাব হইতে দেখা যায়, বীজধান ও অনিবার্য্য অপচয় বাদ দিয়া পশ্চিমবঙ্গে চাউলের নীট উৎপাদনের পরিমাণ ৩৯,৬২,২০০ টন। মাথা-পিছু দৈনিক ১৬·৫ আউন্স বরাদ্দ হিসাবেই রাজ্যের মোট চাহিদার পরিমাণ ৫৪, ৪৫, ৭০০টন (শ্রী প্রফুল্ল সেনের হিসাবে ইহা ৬২ লক্ষ টন)। ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সনে ঘাটতির পরিমাণ ছিল মোটামুটি ১১ লক্ষ টন, ১৯৬২ সনে ১০ লক্ষ টন এবং বর্ত্তমান বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে মোট ১৫ লক্ষ টন (শ্রীপ্রফুল্ল সেনের হিসাব অনুযায়ী ইহা ২২ লক্ষ টন)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই চাউলের ঘাটতির হিসাব সঠিক নয়, এই সমালোচনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সরকার রাজ্যের জনসংখ্যার মাথাপিছু ১৬৫ আউন্স দৈনিক বরাদ্দ হিসাবে এই ঘাটতির পরিমাণ ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু এই রাজ্যেও কিছু-সংখ্যক লোক একেবারেই চাউল খান না, কিছু-সংখ্যক আংশিক ভাবে চাউল ও গম মিলাইয়া তাঁহাদের খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিরাট্ সংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই বর্ত্তমানে ইহা করিয়া থাকেন)। ইঁহাদের কিছু আর দৈনিক ১৬·৫ আউন্স করিয়া চাউল লাগে না। তাহা ছাড়া স্ত্রী সম্প্রদায় সাধারণতঃ পুরুষ জাতি হইতে অনেকটা কম পরিমাণ ভাত খাইয়া থাকেন, এখানেও দৈনিক মাথাপিছু ১৬·৫ আউন্স লাগিবার কথা নহে। তাহা ছাড়া আছে শিশু, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ ও রোগী। ইঁহাদের আবশ্যিক কম পরিমাণ চাহিদার বাস্তব হিসাব ঠিক করিয়া ধরিলে অবশ্যই দেখা যাইবে যে, রাজ্যের মোট চাউলের ঘাটতির পরিমাণ যতটা বেশী করিয়া দেখান হইয়াছে, ততটা হইবে না।

কেবল যে মাত্র খাদ্যশস্য বা চাউলের দর বাড়িয়াছে শুধু তাহাই নহে, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ২৮শে জুলাই তারিখের সংখ্যায় নিজস্ব সংবাদদাতার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি সংবাদে দেখা যায় যে, গত ২৩শে জুলাই তারিখে সাধারণ চাউলের মিলের দর ছিল ৩৩-৭৫ নঃ পঃ হইতে ৩৪ টাকা মণ। ঐ দিন খুচরা দর ৩৮৲ হইতে দুই সপ্তাহে শতকরা ১২½% পরিমাণ কমিয়া ৩১-৪৬ নঃ পয়সা হয়। অপর পক্ষে মোটামুটি খাদ্যমূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দুই সপ্তাহে আলুর দাম বাড়ে শতকরা ২৫%, ডিমের দরবৃদ্ধি ৩৫%-এরও বেশী, ডালের দাম মোটামুটি ৩% এবং মাছের দাম ২৫% হইতে ৩৩⅓% বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে ষ্টেট্‌সম্যানের সংবাদ-দাতা বলেন যে, সরকারী ন্যায্যমূল্য দোকানগুলিতে কলিকাতা-বাসীদের মধ্যে অর্দ্ধেকসংখ্যক লোকের পূর্ণ চাহিদা মিটাইবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহা চাউলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই সকল দোকানগুলিতে যে পরিমাণ সরকারী চাউল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা রেজিষ্টার্ড র‍্যাশন কার্ড অনুযায়ী মোটা-মুটি মাত্র আন্দাজ এক তৃতীয়াংশ চাহিদা মিটিতে পারে। যেদিন চাউল আসে সেদিনই ২/৩ ঘণ্টার মধ্যে কিউতে অপেক্ষমান র‍্যাশন কার্ড হোল্ডারদের এক-তৃতীয়াংশের বরাদ্দ বণ্টন করিতেই চাউল ফুরাইয়া যায়, অবশিষ্ট সকলকেই পরবর্ত্তী সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় এবং ইতিমধ্যে খোলা বাজার হইতে বহুতর উচ্চ মূল্যে আপন প্রয়োজন সাধনের মত চাউল কিনিতে হয়। বাজার দরের এই অবস্থায়

মডিফায়েড র‍্যাশনিং বা আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণের প্রভাব যে কিছুমাত্র খোলা বাজার দরের উপরে পড়ে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতার জনৈক সংবাদপত্রে প্রকাশিত গত ৯ই জুলাই তারিখের একটি খুচরা বাজার দরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সবচেয়ে মোটা চাউলের দর ঐ দিন ছিল ৯৯ নঃ পঃ কিলো, অর্থাৎ প্রায় ৩৭৲ টাকা মণ এবং অন্যান্য সাধারণ চাউলের গড়পড়তা দর ছিল ১·০৪ নঃ পঃ কিলো, অর্থাৎ মণপ্রতি প্রায় ৩৮৷৷০ টাকা।

এই প্রসঙ্গে সরকার পক্ষ হইতে এই বিপুল সমস্যা নিরসনের কোন কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন বা অবলম্বনের কোন সত্যকার ব্যবস্থা আদৌ হইতেছে, এমন আভাস আজিও পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীপ্রফুল্ল সেন পশ্চিমবঙ্গে মাত্র মাথা-পিছু ৮ আউন্স চাউলের বরাদ্দ স্বীকার করিয়া লইলে পূর্ণ র‍্যাশনিংয়ের প্রবর্তন করা যাইতে পারে বলিয়াই রাজ্য সরকারের দায়িত্ব শেষ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। মূল্যবৃদ্ধি নিরোধকল্পে অন্যান্য সরকারী আয়োজন ও তাহার কার্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার কোন দায়িত্ব আছে এমন মনে হয় না। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত জুলাই মাসের শেষভাগে যখন কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মূল্যবৃদ্ধি নিরোধের প্রয়োজনে মুনাফা-খোরদের উপরে দেশরক্ষা আইনের জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করা হয়, তখন শ্রীপ্রফুল্ল সেন কি কি কারণে এরূপ জরুরী আইন প্রয়োগ সম্ভব নহে তাহার ফিরিস্তি দিয়াছিলেন। তিনি একথা বলেন যে, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে কি দরে তাঁহাদের মাল খরিদ করিতেছেন তাহার প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নহে এবং সেই কারণেই পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের উপরে ন্যায্য মুনাফা বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। অজুহাতটি আংশিক ভাবে সত্য, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এবং সেই কারণে পাইকার ও খুচরা দোকান-দারদের উপরে উচ্চতম মুনাফার অংশ বাঁধিয়া দিলে তাহা কার্যকরী হইবার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। অবশেষে এইটিই তিনি করিয়াছেন বটে এবং কত শতাংশ হিসাবে ন্যায্য মুনাফা করা যাইতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন প্রভাব এখন পর্য্যন্ত যে খোলা বাজার দরের উপরে পরে নাই তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্যপক্ষে কলিকাতায় মাছের বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অবলম্বিত হইয়াছে। ১৪ই আগষ্ট তারিখের দৈনিক সংবাদ-পত্রাদির রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতার মোট ৮১৪টি মাছের দোকানদারদের মধ্যে ইহার মধ্যে শতকরা ৯৯·৫% লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৭৪টি মাছের বাজারে সরকারী প্রতিনিধিরা ঘোরাফেরা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে পুলিশের সাময়িক হানার কালে মাছের দর কমিয়া গেলেও গড়পড়তা দর যে বিশেষ কিছু কমে নাই তাহাও দেখা যাইতেছে। হাওড়ার পাইকারী বাজারে ঐদিন বড় মাছের দর ৬৲ কিঃ, মাঝারি ৪৷৷০ টাকা কিঃ এবং ছোট ৩৲ হইতে ৩৷৷০ টাকা কিঃ ছিল; খুচরা বাজারে মাছের দর কিঞ্চিৎ কমিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে, কাটা পোনার দর মাছ হিসাবে ৪৷৷০ হইতে ৫৷৷০ কিঃ বিক্রী হইয়াছে এবং ইলিশ ৩৲-৩৷৷০ টাকা কিঃ দরে পাওয়া যাইতেছে। মাছের খুচরা বাজার-দর নির্দ্দেশ করিবার কোন উদ্দেশ্য সরকারের এখনও নাই বলিয়া জানা গিয়াছে, কেবল পাইকারী দরের উপর নির্দ্দিষ্ট মুনাফার অতিরিক্ত যাহাতে খুচরা দর না হয় তাহার দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

সব্জীর বাজারেও খাদ্যশস্য ও মাছের অনুরূপ অনুপাতে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে গত ২৮শে জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত আলুর দর সপ্তাহে দুইশতকরা ২৫% বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য সব্জীরও দর অনুরূপ ভাবে বাড়িতেছে। আলুর দর ইতিমধ্যে আরো প্রায় ১০% চড়িয়াছে। এইসব লইয়া মোটামুটি মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার মত খাদ্য সংগ্রহ করিতেও এক বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় অন্ততঃ ২৫% বেশী খরচ করিতে বাধ্য হইতেছে।

কিন্তু ইহাই শেষ নহে। মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব মানুষের অবশ্যভোগ্য সকল পণ্যের উপরেই বর্ত্তাইয়াছে দেখা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর পূর্ব্ব প্রস্তাব অনুযায়ী সকল প্রকার অবশ্যভোগ্য পণ্যের দোকানগুলিকে যদি দৈনন্দিন মূল্য-তালিকা প্রচার করিতে বাধ্য করা যাইত, তাহা হইলে এই বিষয়ে হয়ত খানিকটা সুফল ফলিতে পারিত। কিন্তু এই দিকে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন লক্ষণ আজিও দেখা যাইতেছে না। ফলে ঔষধ, বস্ত্র এবং অন্যান্য বহুবিধ অবশ্যভোগ্য বহু প্রকারের পণ্যের মূল্য বাধাহীন ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা সংযত করিবার কোন প্রয়াস বা আয়োজন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু ইহাই শেষ নহে। মূল্য ও ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য অনিবার্য্য ব্যয়বৃদ্ধির কারণে অন্যান্য দিক হইতেও নানা দাবি উঠিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতায় রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থা এই এই কারণে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির অনুমতি দাবি করিয়াছেন। প্রতি ষ্টেজে এই সংস্থা ৩ নঃ পঃ হিসাবে ভাড়া বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। অর্থাৎ ন্যূনতম ভাড়া বর্ত্তমানে নঃ পঃ ১০ নঃ পঃ হইবে এবং প্রত্যেক উচ্চতর ষ্টেজে ৩ নঃ পঃ করিয়া অতিরিক্ত ভাড়া ধার্য্য করা হইবে। বিষয়টি এক্ষণে

রাজ্য সরকারের বিচারাধীন রহিয়াছে, কিন্তু আভাসে মনে হয় তাঁহারা এই বৃদ্ধির অনুমতি মঞ্জুর করিবেন। বর্ত্তমানে একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের নীট, অর্থাৎ ট্যাক্স ও অন্যান্য সরকারী দাবি মিটাইবার পর, মাসিক আয় যদি ২৫০৲ টাকা হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়, তবে দেখা যাইবে যে, সংসারের কর্ত্তার স্বয়ং ও গৃহের গড়পড়তা তিনটি স্কুল ও কলেজে পাঠরত সন্তানের নিতান্ত আবশ্যিক পরিবহন ব্যয় মিটাইতেই পারিবারিক নীট আয়ের প্রায় গড়পড়তা ১৫% খরচ হইয়া যায়। ভাড়া বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা যদি মঞ্জুর হয় তবে এই খরচা আরো ২½% হইতে ৩% বৃদ্ধি পাইবে।

অন্যদিকে এই একই অজুহাতে বিদ্যালয়গুলির তরফ হইতে ছাত্রছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধির আয়োজন করা হইতেছে। ইহার অপঘাতও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিবে, সন্দেহের কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, আজিকালিকার শিক্ষার যে আয়োজন দেশে প্রচলিত আছে তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত গৃহশিক্ষক বা কোচিং ক্লাশের সহায়তা না হইলে একেবারেই চলে না। ইহার ব্যয় আরও অনেক বেশী। তাহার উপরে আছে সুদীর্ঘ পাঠ্যপুস্তক ও আনুসঙ্গিক খাতা, পেন্সিল, কাগজ ইত্যাদির বিরাট্ বোঝা। এ সকলও দুর্ম্মূল্য এবং ইহাদেরও মূল্যবৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণেই হইতেছে। অথচ সন্তানের অন্ততঃ উচ্চমাধ্যমিক মান পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আজিকালিকার দিনে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবিকার কোনই ব্যবস্থা হইবার উপায় নাই।

সরকার পক্ষ হইতে একমাত্র ধর্ম্মের বাণী ও উপদেশ প্রচার করা ব্যতীত কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন বোধ বা উপযুক্ত ও কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিবার শক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। নিরুপায় দেশবাসীর মতনই সরকারী নেতৃবৃন্দও নিরুপায় ভাবে চাহিয়া দেখিতেছেন মাত্র। খাদ্য-পণ্যের মুনাফাখোরদের সম্প্রতি শ্রীপাতিল হুমকি দিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি দেশের এই দুর্দ্দিনে মুনাফাখোরী বন্ধ না করেন তবে তাঁহাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, এমন কি বাধ্য হইয়া নিয়ন্ত্রণও পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইতে পারে। প্ল্যানিং কমিশন ঘন ঘন এই বিষয়ে নূতন নূতন মত প্রচার করিতেছেন। ১০ই জুলাই তারিখের অধিবেশনে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, আনুসঙ্গিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলি জোটবদ্ধ (co-ordinated) মূল্যবৃদ্ধি নিরোধাত্মক শাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সামগ্রিক খরিদ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণও প্রবর্ত্তন্ করিতে দ্বিধা করিবেন না। খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পাতিল ও প্ল্যানিং মন্ত্রী শ্রী নন্দ এই বিষয়ে একমত হন যে ব্যবসায়ীরা মুনাফাখোরীর লোভেই এই অবস্থা ঘটাইয়াছে, এবং তাহাদের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। গত ১০ই আগষ্ট তারিখের এক বিবৃতিতে প্ল্যানিং কমিশনের একটি সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, সর্ব্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ও র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নহে, তবে মূল্যনিরোধ-প্রবর্ত্তক কতকগুলি নিয়ম ও বিধি প্রবর্ত্তিত হইবে তাহাদের মধ্যে অন্যতম ডিলার বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উপরে লাইসেন্স প্রবর্ত্তন করা, কার্য্যকরী জরুরী মজুদ (buffer stocks), বিস্তৃত সরকারী খরিদ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা এবং পিএল ৪৮০-র অনুসরণে আমেরিকা হইতে খাদ্যশস্যের আমদানী ক্রমে হ্রাস করিয়া আনা। প্ল্যানিং কমিশন বলেন যে, কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির একযোগে প্রয়াসের দ্বারা ক্রমে ২০ লক্ষ টন পরিমাণ চাউলের জরুরী মজুদ গড়িয়া তুলিয়া ইহার সরবরাহের ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে এবং যথাসম্ভব দেশের অভ্যন্তর হইতে এই পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিতে হইবে। অতিরিক্ত চাউল ন্যায্যমূল্য দোকান ও সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইবে। এর জন্য কেবল মাত্র মিল-মালিকদের নিকট হইতেই নহে, চাষীদের নিকট হইতেও সরাসরি খরিদ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই ভাবে খরিদ-করা মজুদ চাউলের পরিমাণ বর্ত্তমান বৎসরে ১৫ লক্ষ টন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে সরবরাহে যে ঘাটতি ও তাহার সুযোগে মুনাফাখোরদিগের অতিরিক্ত মুনাফা করিবার প্রয়াসে মূল্যবৃদ্ধি শুধুমাত্র উপরোক্ত উপায়গুলির দ্বারা নিরোধ করা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে বুঝা মুস্কিল। প্রথমতঃ, যে সকল ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহা সার্থক ও কার্য্যকরী ভাবে সরকারী তরফ হইতে প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে কি না তাহাতে গভীর ও সত্যকার সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সরকারের তরফ হইতে যে ঘাটতির হিসাব দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন ও চাহিদার অন্তর্বর্ত্তী অন্ততঃ ১৫ লক্ষ টন চাউলের বার্ষিক ঘাটতি রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ লক্ষ টন পরিমাণ (বর্তমানে মাত্র ১৫ লক্ষ টন) জরুরী মজুদ হইতে দেশের সামগ্রিক ঘাটতি কি করিয়া পূরণ করা সম্ভব হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। বিশেষ করিয়া যখন সামগ্রিক সরকারী খরিদ (total procurement) এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিতে সরকার একান্তই নারাজ, তখন ত ইহা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সামগ্রিক খরিদ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ বা র‍্যাশনিং পুনরায় চালু করিলে এবং অবশ্য এসকল ব্যবস্থা যদি দৃঢ়তা ও একান্ত

সততার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়, তবেই বর্তমান আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির কার্যকরী নিরসন হওয়া সম্ভব, ইহাতে কোন সন্দেহের কারণ দেখি না। অন্যথায় কিছুই যে হইবার নয় তাহা নিঃসন্দেহ।

অথচ বিশেষ করিয়া বর্তমানে দেশের জরুরী ও আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে ইহা হওয়া যে একান্ত এবং আশু প্রয়োজন তাহাতেও সন্দেহ নাই। দেশবাসীর সক্রিয় ও স্বয়ং-প্রণোদিত সহায়তা ব্যতীত একমাত্র সরকারী আয়োজন ও প্রযোজনায় না দেশরক্ষা না উন্নয়ন কোনটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অথচ দেশবাসীর স্বয়ংপ্রণোদিত সঙ্কল্পের প্রায় সমগ্রটাই বর্তমানে একমাত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত হইতে চলিয়াছে। অস্তিত্ব মাত্র বজায় রাখিবার জন্য যে ন্যূনতম চাহিদা মানুষকে পূরণ করিতেই হয়, অনবরত এবং ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমানের চাপে সেটুকুই আয়ের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিবার কাজটি অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই নিরন্তর অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্যে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ, জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ও দেশবাসীর ভবিষ্যৎ পরিণতির ধারা, এসকল বড় বড় ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিবার অবসর তাহার কোথায় এবং তাহার জন্য আবশ্যকীয় উৎসাহ বা মনোবলই বা সে কোথা হইতে পাইবে?

অথচ সরকারের দাবী দেশবাসীকে তাহার যৎসামান্য আয় হইতে আরো অধিকতর অর্থ তাহাকে দেশরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সরকারের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে।—শ্রী মোরারজি দেশাই তাঁহার সম্প্রতি উদ্ভাবিত বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের জারজ আইনটি পুরাপুরি ভাবে প্রয়োগ করিবেনই। তাঁহার অজুহাত, দেশরক্ষা ও উন্নয়নের জরুরী দ্বিবিধ প্রয়োজনে এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের দ্বারা ভোগসঙ্কোচ করিতেই হইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমগ্র দেশবাসী ও তাঁহারই সরকারী সংযোগীরা মূল্যবৃদ্ধির পরিণতি লক্ষ্য করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেও, ইহা তাঁহার অনুভূতি বা চিন্তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দেশে অবশ্যভোগ্য পণ্যগুলি যদি দেশবাসীর আয়ের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারা যাইত, তাহা হইলে হয়তো অতিরিক্ত বা নির্দ্ধারিত আবশ্যিক সঞ্চয়ের দ্বারা ভোগসঙ্কোচের প্রয়োজন থাকিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে তাহার অবকাশ কোথায়? দেশবাসীর মাথাপিছু ব্যয়যোগ্য আয় (expendable income) বাড়ে নাই। প্রথম দুইটি উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নের ফলে যেটুকু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল (১৯৫০-৫১ সনে মাথাপিছু বার্ষিক ২২৫৲ টাকা হইতে ১৯৬০-৬১ সনে মাথাপিছু ২৮২৲) তাহার খানিকটা অংশ সরকারী ট্যাক্স বৃদ্ধিতে এবং অবশিষ্টাংশ মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণই কাটিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে ইহার পর অবশ্যভোগ্য সকল পণ্যেরই এবং বিশেষ করিয়া খাদ্যপণ্যের মূল্য কি পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার বিস্তৃত হিসাব এই প্রসঙ্গে পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে স্বয়ংপ্রণোদিতই হউক, আইনের বলে বাধ্যতামূলক ভাবেই হউক, সাধারণ দেশবাসীর সঞ্চয়ের অবকাশটুকু কোথায় অবশিষ্ট আছে? ভোগ কোথায় যে তাহা সঙ্কোচ করা হইবে?

এই প্রসঙ্গে গত ৫ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার কোন বিশিষ্ট সংবাদপত্রে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি যে আয়-ব্যয়ের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। একটি পরিবারের পোষ্যসংখ্যা, আয়কারী স্বয়ং, স্ত্রী ও দুইটি সন্তান। আয় মোট মাসিক ১৬৭=২০ নঃ পঃ; খরচ,—বাসাভাড়া ৩৫৲, চাউল (১ মণ) ৩৬৲, ডাইল ইত্যাদি ৩=৬০ নঃ পঃ, তেল ইত্যাদি ১০৲ চিনি (৫ কিঃ) ৬=২৫ নঃ পঃ, আটা ৪৲সাবান ইত্যাদি, ৫৲মশলা ইত্যাদি ৩৲চা ইত্যাদি (১ পাঃ) ৩৲, দুইটি সন্তানের জন্য খরচ (সম্ভবতঃ একটু দুধ, প্রয়োজন মত ঔষধ, ইত্যাদি) ১০৲, তাহাদের স্কুলের বেতন ও বাস ভাড়া ২০৲, মোট ১৩৫=৮৫নঃ পঃ। অবশিষ্ট থাকে মাত্র ৩১=৩৫ নঃ পঃ। ইহা হইতে আয়কারীর অফিস যাতায়াতের খরচা, ন্যূনতম জলযোগের খরচা, দৈনিক কাঁচা বাজার, লোক-লৌকিকতা, সন্তানদের পাঠ্যপুস্তক, সমগ্র সংসারের বস্ত্রের প্রয়োজন ইত্যাদির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের খরচা সঙ্কলান হয় না—হইতে পারে না। ইহার উপরে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের দায় কোথা হইতে মিটিবে? একটি নিম্নতম মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র পাওয়া গেল। এই মানের আয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা কলিকাতা শহরে লক্ষাধিক ত হইবেই, বেশীও হইতে পারে।

আমরা কয়েকটি ইহা হইতে সামান্য কিছু অধিকতর আয়ের পরিবারের আয় ব্যয়ের হিসাব লইয়া দেখিলাম অবস্থা

কিছুমাত্র স্বচ্ছলতর নহে। এইরূপ একটি পরিবারের চিত্রও দিতেছি। পরিবারটির কর্তা মাসে মোট ২৫০ৣ আয় করেন। পোষ্য স্বয়ং, স্ত্রী, তিনটি সন্তান (দুইজন কলেজে একজন স্কুলে), বিধবা পিসী। দুইটি ভায়ের ভিন্ন বাসা, আয় প্রায় একই রকম। একজন বিধবা মা ও অপর জন পিসীর দায়িত্ব লইয়াছেন। ছেলেমেয়ে বড় হইয়াছে, তাহাদের শিক্ষার খরচ বাড়িতেছে, অন্যদিকে মেয়ের বয়স হইতেছে, এককালে বিবাহ দিতে হইবে। তাই যদি পরিবারের আয় কিছুটা বাড়ান যায় এই আশায় স্ত্রী উষা সেলাইয়ের স্কুলে সেলাই শিক্ষা করিতে যান। ফলে একজন সেবকও রাখিতে হইয়াছে, তাহার খোরাকী দিতে হয়। ব্যয় নিম্ন প্রকারের:—বাসাভাড়া ৪০ৣ (১টি ঘর, রান্নার স্থান আর একটু বারান্দা, এটাই দরমা দিয়া ঘিরিয়া লইয়া পিসিমা থাকেন), চাউল (১৷৷০ মণ) ৫১, আটা ৭৷৷০, তেল ইঃ ৭৷৷০, ডাইল মশলা ইঃ ৮ৣ, ইলেকট্রিক বিল ৫ৣ, রুটীমাখন, ঘি ইঃ ১০ৣ, চা (১৷৷০পাঃ) ৪ৣ দুধ ১৫ৣ ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজের বেতন ৩২ৣ সাবান, মাজন, ঔষধাদি ইঃ ১০ৣ, স্ত্রী, স্বয়ং ও ছেলেমেয়েদের, বাসভাড়া ইঃ ৩৮ৣ; মোট ৩২৮ৣ। বাকী টাকা হইতে দৈনিক বাজার, কাপড়, জুতা ইত্যাদি নানাবিধ খরচ কোথা হইতে আসিবে। ভদ্রলোক প্রথম যৌবনে ৫ হাজার টাকার জীবন বীমাও করিয়াছিলেন কিন্তু রাখিতে পারেন নাই, কিছু দিন প্রিমিয়ম দিবার পর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক বলেন যে মাসের প্রথমে শোধ দিয়া দেন এবং মধ্যভাগ হইতেই ধার করিতে থাকেন। এই ভাবেই কায়ক্লেশে টিকিয়া আছেন। ইহার উপর আবার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু যমে ছাড়িলেও মোরারজী দেশাই ত ছাড়িবে না, যাহার নিকট চাকুরী করেন সে বেতন হইতে কাটিয়া লইবে। ইহার পর ধারেও আর কুলাইবে না। এইটি আমাদের কল্পনা করা চিত্র নহে, বাংলা দেশে ও ভারতের সকল শহরেই এই রকম অবস্থার লক্ষ লক্ষ পরিবার দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহারা শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়। ইহাদেরই চিন্তা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে দেশের শাসনব্যবস্থা, শিল্পের চাকা, বাণিজ্যের বিস্তৃতি রক্ষা পায় ও চালু থাকে। অথচ ইহারা যে কি শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কর্তারা কেহ ভাবিয়াও দেখেন না। দেশের শিল্পোন্নয়ন লইয়া তাঁহারা সদাই প্রমত্ত হইয়া আছেন, এসকল ছোট কথা ভাবিবার তাঁহাদের অবসর কোথায়? দেশে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। অথচ মানুষের সভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে ইহাদের ছাড়িয়া সভ্যতার ধারা কোনক্রমেই অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়।

আর্থিক উন্নয়নের গোড়ার কথা, আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত কৃষিজাত উৎপাদন, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত কাঁচামালের উৎপাদন এ কথা ধনবিজ্ঞানের নিতান্ত প্রাথমিক সত্য। ইহা না হইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কোনক্রমেই নিরোধ করা সম্ভব নহে। স্বাধীনতা লাভের পরেই প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য কৃষিজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধন এবং পরিকল্পনা কালের মধ্যেই ইহা করিতেই হইবে। সরকারী পরিকল্পনা এই বিষয়ে বিস্ময় বিফলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সরকারী লক্ষ ছিল এই পরিকল্পনাকালে অন্ততঃ খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধন। এখন খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপাতিল বলিতেছেন যে সম্ভবতঃ আগামী দশ বৎসর কালের মধ্যে ইহা সাধিত হইলেও হইতে পারে। অন্যদিকে গত ১৩ই তারিখে তিনি লোকসভার অধিবেশনে খোলা বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দায়িত্ব লইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে মার্কিন জাতির দয়ার দান পি এল ৪৮০ই আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র মুখ্য অবলম্বন। দেশবাসীকে মুনাফাখোরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার ইহাদের কোন ক্ষমতা নাই।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী
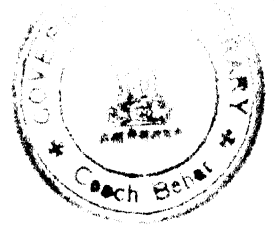
সোবিয়েত্ সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৪ আক্টোবর ১৯৬২, মস্কো।

সকালে যথারীতি স্নানাদি ক'রে তৈরি। দ্বিবেদীর ঘরে গেলাম। গতকাল তাঁর শরীর খারাপ ছিল ব'লে বের হন নি আমাদের সঙ্গে। ঘরে গিয়ে দেখি দুইজন ভারতীয় ব'সে। একজন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর অধ্যাপক, অপর জন ইলেকট্রনিক্‌সের ছাত্র। ছেলেটি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়তে এসেছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা (Defence) বিভাগ থেকে বৃত্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন, ইউনিভার্সিটির হস্টেলেই থাকে। রুশী ভাষা ভাল করেই শিখতে হয়েছে; এ দেশে বিদেশী ছাত্রদের রুশ শিখতেই হয়।

এ ভারতবর্ষ নয়—যেখানে ভারতীয় কোন ভাষা না শিখে বিদেশীরা জীবন কাটিয়ে দেয়—করেকটা পথ-চল্‌তি হিন্দী বাত্ শিখে। কিন্তু ভারতের কোন্ ভাষা বিদেশী শিখবে? মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে সে না হয় তামিল শিখল—কিন্তু পাঞ্জাবে গিয়ে সমস্যা—হিন্দী—নাগরী, পাঞ্জাবী—গুরুমুখী, কোন্‌টা শিখবে? এ সমস্যার সমাধান হয় নি। ইউরোপের প্রত্যেক পৃথক্ রাষ্ট্রে যেমন পৃথক ভাষা, আমাদের দেশেও সেই অবস্থা। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চলছে। মুশ্‌কিল হয়েছে, হিন্দী ভাষার মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক করতে গিয়ে ফল উল্টো হয়েছে; বিরোধ বেধেছে ভাষা নিয়ে, ভাষার সীমানা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের। সোবিয়েত্ দেশে রুশ ভাষা প্রায় আবশ্যিক ভাষা হয়ে উঠেছে—বল্‌টিক সাগরতীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। এমন কি মঙ্গোলীয় সোবিয়েত্ রাষ্ট্র তাদের পুরাতন জবড়জঙ্গ মঙ্গলীয় লিপি ত্যাগ ক'রে রুশী লিপি গ্রহণ করেছে। মোট কথা, এই বৃহৎ রাষ্ট্রে এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত এই রুশীয় লিপি ও রুশীয় ভাষা নানা জাতকে এক করেছে, তা সে বুরিয়াৎ হউক,আর উক্‌রেইনীয় হউক। প্রশ্ন ওঠে—গ্রীক্ ভাষা ত একদিন সমস্ত পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকাকে গ্রীক জগতের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছিল। আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। ইংরেজী ভাষা ইংরেজের সাম্রাজ্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের কাছে 'আয়ার' (Ireland) দেশ আজ তাকে ত্যাগ করেছে। ভারত, যে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ—সেখানেও 'ইংরেজী মুরদাবাদ'রব উঠেছে। আমেরিকায় তারা বলছে তাদের ভাষার নাম 'আমেরিকান'। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজী ডাচে মিলিয়ে এক সঙ্কর ভাষা হয়েছে। ভাষার ভূত তৃতীয় পুরুষে দেখা দিতে পারে? তা যদি, তবে উকরেইনী, কাজাকী, উজবেকী, জর্জিয়ান, এমন কি য়াকুৎ, বুরিয়াৎ, প্রভৃতি ভাষাও একদিন আওয়াজ দিতে পারে ত? কে জানে। জাতীয়তাবাদকে পোক্ত করবার জন্য ইস্‌রেলিরা ছত্রিশ দেশের ইহুদীদের এনে হীব্রু ভাষা শেখাচ্ছে; দ্বিতীয় পুরুষে এরা পুরাতন ভাষা ভুলে হীব্রু ভাষায় পাকা হবে। আমেরিকার নিগ্রোরা বহু শতাব্দী তাদের ভাষা হারিয়ে ইংরেজী নিয়েছে, কোথাও স্প্যানীশ। ভাষা সমস্যা যাক্।

পৃথিবীতে বাইরের দূরত্ব যত কমছে, মানুষের মন যেন ততই শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করছে। বাউলের গান মনে পড়ে—"ভিতরে রস না জমিলে, বাইরে কি গো রং ধরে।"

ভিতরের দেবতা না জাগলে বাইরের ভেদকে কি ভোলা যায়? অখণ্ড ভারতকে খণ্ড করেই স্বাধীন ভারতের জন্ম হয়েছিল, তারপর স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েও খণ্ড-করার নেশাটা ছুটল না!

১৪।১২।৬২ মস্কো,

আজ প্রাতরাশের পর বের হলাম বরিস-এর সঙ্গে ক্রেম্‌লীন দেখতে। বহুবার তাঁর পাশ দিয়ে রেড স্কোয়ার পেরিয়ে নানা স্থানে গিয়েছি এই কয় দিনের মধ্যে। দেখেছি তার লাল প্রাচীর, স্বর্ণচূড় শিখর। ক্রেম্‌লীন দেখবার ছাড়পত্র প্রভৃতি পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। ছাড়পত্র দরকার, বিশেষ করে Arms Museum দেখবার জন্য।

ক্রেম্‌লীন শব্দের অর্থ দুর্গ—আমাদের দিল্লী, আগ্রার

লালকিল্লার মতন, লাল পাথরের প্রাচীর-ঘেরা, বহু যুগ ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। প্রাচীরের উপর ২০টি তোরণ—তার মধ্যে চোখে পড়বার মত স্পাসস্কায়া তোরণ—লেনিন মসোলিয়মের পাশে তার স্বর্ণবরণ শিখর বহুদূর থেকে দেখা যায়। সেটি এখন মস্কোর প্রতীক হয়েছে, যেমন জাপানের ফুজি পর্বত-শিখর, লণ্ডনের পার্লামেণ্ট, নিউ-ইয়র্কের লিবার্টির মূর্তি। ক্রেমলিনের এই তোরণ (২২১ ফুট) ৬৭'৩ মিটার উচ্চ ; ১৮৫১ সনে এর শিখরে ঘড়িটি চড়ানো হয়—লণ্ডনের পার্লামেণ্টের ঘড়ি তৈরি হয়েছিল আরও কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৬ অব্দে। ১৯৩৭ সনে ক্রেমলীনের ৫টি তোরণশীর্ষে রুবি তারকা দিয়ে সাজানো হয়, বিশেষ রকমের বিজলি বাতির ব্যবস্থা করায় রাতেও বহুদূর থেকে দেখায় তারার মত আকাশের গায়ে।

১৯৫৫ সন থেকে ক্রেমলীন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ; এর আগে এখানে স্তালিন থাকতেন—সর্বদাই কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল। আমরা হেঁটে চলেছি—পাশেই পড়ল বলশোই ক্রেমনিওভেস্কি অর্থাৎ বড় দুর্গ—মস্কো নদীর তীরে নির্মিত —সামনে দিয়ে বড় রাস্তা। পাশে একটা বিরাট বাড়ি, শুনলাম নিখিল সোবিয়েত ও রুশীয় সোবিয়েতের দপ্তরখানা।

আমরা প্রথমে ঢুকলাম ব্লাগোবেশচেন্‌স্কি ক্যাথিড্রালে ; এটা সম্রাট্ ৩য় আইভানের সময়ে (১৪৮৪-৮৯) নির্মিত হয় পারিবারিক ব্যবহারের জন্য। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন দেখলাম এখানে। এরপরে গেলাম আর্খনগেলস্কি ক্যাথিড্রালে। এটা ষোড়শ শতকের গোড়ায় নির্মিত ; এখানে সম্রাট্ ও বড় বড় রাজকুটুম্বদের সমাধি আছে। মহাচণ্ড আইভান নিজ পুত্রকে একদিন রাগের মাথায় স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন ; সেই ছেলের কবর এখানে আছে। রুশীয় এক চিত্রকরের (Repin) বিখ্যাত ছবি আছে এই ঘটনা নিয়ে—সেটা দেখেছিলাম ত্রেতিয়াকোভ গ্যালারিতে। এখানকার চার্চগুলি বৈজয়ন্তীয়ম্ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আদর্শে নির্মিত হয়েছিল, কারণ রুশীয়রা কনস্টান্টিনোপলের গ্রীক চার্চ-এর ধর্মমত বিশ্বাস করত এবং সেখানকার পাত্রিয়ার্কই ছিলেন এদের ধর্মগুরু। এককালে এ সব চার্চগুলি ছিল বারাণসীর হিন্দুমন্দির বা আগ্রার চিস্তির কবরের ন্যায় জাঁক-জমক, অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারপূর্ণ! গ্রীকচার্চে খ্রীষ্ট, মেরি ও সাধুদের ছবি রাখা হয়, হিন্দুদের মন্দিরে থাকে মূর্তি বা প্রতীক—যেমন শিবলিঙ্গ। মুসলমানদের মস্‌জিদে কোন প্রতীক, মূর্তি কিছু থাকে না। তবে মানুষের সৌন্দর্য-বোধকে চেপে মারা যায় না ; তাই হিন্দু ও খ্রীষ্টানেরা দেবালয় সাজায় মূর্তি দিয়ে, ছবি দিয়ে—আর মুসলমানরা পাথরের জালি বা ইঁটের বিচিত্র টালি, খিলা, স্তম্ভ, গম্বুজ গড়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এখানকার চার্চে Icon আছে ছবি অথবা মোজাইক করা মূর্তি। এখন লোকে আসে মিউজিয়াম দেখবার উদ্দেশ্য। পূর্বে বলেছি, মাত্র ১৯৫৫ সনে এ সব স্থানে সাধারণের প্রবেশাধিকার হয়েছে।

ক্রেমলীন অন্তর্গত ঘন্টাঘর মহাচণ্ড আইভানই করিয়েছিলেন। কিন্তু মস্কোর বিখ্যাত ঘন্টা ঐ তোরণের উপর কখনও ওঠে নি ; ঘণ্টাধ্বনিও কখনও শোনা যায় নি। সে যুগের বিখ্যাত ঢালাইকার আইভান মাতোরিণ ও তার ছেলে মিখাইল এটা ঢালাই করেন। এর ওজন ২০০ টন, অর্থাৎ ৫,৪০০ মণ। বিরাট্ এক গর্তের মধ্যে ঘণ্টা গলন্ত কাঁসা ঢালাই হয়েছিল। ঘণ্টা ত তৈরী হ'ল কিন্তু তাকে ওঠাবে কি করে ? কত প্ল্যানই হয়েছিল। এমন সময়ে ক্রেমলীনে আগুন লাগে (১৭৩৭ মে)। সেই সময়ে জলন্ত কাঠ নাকি গর্তের মধ্যে পড়ে। তখন সেই আগুন নেবাবার জন্য জল ঢালার ফলে ঘণ্টা ফেটে যায়—১১ টনের টুকরো খ'সে গেল। একশ' বছর পর গর্ত থেকে ঘণ্টাটাকে তুলে শ্বেতপাথরের এক মঞ্চের উপর রাখা হয়েছে। আমরা তাকে সেইভাবে সেখানে দেখলাম। ভাঙা টুকরা রয়েছে পাশেই। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় ঘণ্টা আর নেই ; এর পরেই হচ্ছে বর্মার মিনডানোর ঘণ্টা। আমাদের মত কত দর্শক এসেছে এই ঘন্টা দেখতে। ইতিহাসটা রুশভাষায় লেখা আছে ; পড়ছে লোকে মন দিয়ে।

ঘণ্টার পাশেই আছে জার-ক্যানন বা কামান। ১৫৮৬ অব্দে নির্মিত হয়, এর ওজন ৪০ টন। পাশে গোলাও সাজানো। এসব এখন অতীতের 'কিউরিও'। মানুষ যেমন অতিকায় মাস্টাডিয়ন প্রভৃতির মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়—এসব অস্ত্রশস্ত্র এখন লোকে সেই চোখে দেখে, কৌতুক অনুভব করে, বর্তমান যুগের মারণ অস্ত্রের কথা ভেবে শিউরে ওঠে।

১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ক্রেমলীনের এলাকায়

দুইটি অট্টালিকা নির্মিত হয়; তার একটির গম্বুজ রেড্ স্কোয়ার থেকে দেখা যায়, সেটির শিখরে সোবিয়েত্ পতাকা উড়ছে। এই বাড়ী ১৯১৮ সনের এপ্রিল মাস থেকে সোবিয়েত সরকারের দপ্তর, তার আগে ১৯১৭ নবেম্বর থেকে পাচ মাস পেত্রোগ্রাদের স্মোলনি প্রাসাদে ছিল—সে কথা পরে আসবে। মস্কোর এই সিনেটে লেনিন বাস করতেন; তাঁর পড়বার ঘর ঠিক সেই রকম ক'রে রাখা আছে। স্তালিনের দপ্তর ও থাকার জায়গা এখানেই ছিল—কেউ ত তাঁর নাম উচ্চারণ করে না। আমরাও শুধোই নি।

একটা বাড়ী দেখানো হ'ল; এটাকে বলা হয় ক্রেমলীন থিয়েটার, বিদেশ থেকে যারা অভিনয় করতে আসে তারা এখানে থিয়েটার করতে পারে, এ সময়ে বুলগেরিয়া থেকে একটি অভিনেত্রীদল এসেছিল, অবশ্য আমাদের দেখবার সময় হয় নি।

ক্রেমলীন দেখতে কি ভিড়—পাচ বছরে ১৫ মিলিয়ন দর্শক প্রায় ৫০টি বিদেশ থেকে এসেছে।

এবার আমরা মিউজিয়াম চলেছি—এর নাম ওরুঝিনায়া পালাটা বা অস্ত্রাগার। আর্মারি কেন বলা হয় জানি না। এটা ১৮৫১ সনে নির্মিত হয়। মস্কোর সম্রাটরা যখন থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হলেন, তখন থেকেই বিদেশ থেকে উপঢৌকনাদি আসতে সুরু হয়। অতি মূল্যবান্ রত্নরাজি সোনা-রূপার বিচিত্র বাসন ও পানপাত্র, অলঙ্কার ও পূজাপার্বণের সরঞ্জাম। স্বর্ণকারের সূক্ষ্মকাজ কত! জার এর মুকুট যা ১৪৯৮ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত বংশপরম্পরায় তাঁরা পরেছিলেন উৎসবের সময়, সেটা রয়েছে; রাজমুকুট আছে, রাজার মুণ্ড নেই! বিদেশের দূতরা কত সামগ্রী আনতেন। সে সব স্তরে স্তরে সাজানো। পিটারের লৌহবর্ম, তাঁর বিশাল তরবারি; রাজারাণীদের ঘোড়ার গাড়ি, সম্রাজ্ঞীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাটি কত যে দেখলাম তার বর্ণনা করা ত সম্ভব নয়। সব থেকে মজা লাগল ঘোড়ার গাড়িগুলো দেখে। বড় বড় গাড়ি চার-ছয় ঘোড়ায় টানত। রাস্তা-ঘাট ভাল ছিল না, দীর্ঘ পথ এইসব প্রাচীন গাড়ি ক'রে কি আরামেই সব চলাফেরা করতেন। গাড়ি ঘোরাবার কল জানা ছিল না, তাই গাড়িটাকে উঁচু ক'রে তুলে ঘোরাতে হ'ত। গাড়িতে সোনালি কাজ, কাঁচের জানালা, সবই রয়েছে। ভাল ভাল গাড়ির কারিকর প্রায় দেখা যেত ইংরেজ। শিল্পকলার বেশীর ভাগ নিদর্শন ফরাসী, জার্মান অথবা ইতালীয়।

আমাদের গাইড একজন ইংরেজি-জানা মহিলাকে পাওয়া গিয়েছিল। বেচারা খুব রোগা, একই জিনিস দিনের পর দিন দেখছে ও দেখাচ্ছে, একই কথা ব'লে যাচ্ছে। এ সবের বিস্ময় তার চোখ থেকে সরে গিয়েছে। আমরা যে লোলুপ চোখ নিয়ে সমস্ত কিছুকে যেমন দেখছি—তার দৃষ্টির মধ্যে সে আবেগ থাকতে পারে না।

একটা কথা বলা হয় নি। এখানে প্রবেশের পূর্বে জুতোর উপর কাপড়ের জুতো পরতে হয়েছিল, কাঠের মেঝে, নাল-পরা জুতোর ঘসা পেলে তার মসৃণতা থাকতে পারে না ব'লে এ নিয়ম করা হয়েছে। আমার এক পায়ের উপরি জুতো কখন যে ভিড়ের চাপে খুলে গিয়েছিল টের পাই নি, চুপ-চাপ ঘুরে এলাম। ক্রেমলীন দেখা হল।

দূরে নূতন একটা বাড়ী—শুনলাম সোভিয়েত্ সদস্যদের সম্মেলনের জন্য আধুনিক ঢঙে তৈরী; কাঁচ ও লোহা, ক্ষণ-ভঙ্গুর ও কটুর মজবুত উপাদানে নির্মিত। ছয় হাজার ডেলিগেট বসতে পারে। ক্রেমলীনের স্থাপত্য ও আসবাব-পত্রের সঙ্গে এই মার্কিনী-ঢঙের ইমারতটা ভীষণ বেখাপ্পা ঠেকছে। কিন্তু বেখাপ্পা ঠেকলে কি হয়—ঝোঁক ত মার্কিনমুখী-বিলাস, ঐশ্বর্য। অবশ্য এরা বলে সে বিলাস, ঐশ্বর্য সকলের জন্য দেবে! সম্ভব এখনও হয় নি, কবে হবে তা মহাকাল ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

ক্রেমলীন থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে মৌসোলিয়মের দিকে আগাচ্ছি। পাতালপুরে লেনিনের মৃতদেহ রাখা আছে। বিরাট্ জনতার সারি, এখান দিয়ে যাবার সময়ে প্রতিদিনই দেখেছি। এবার সেই জনতার মধ্যেই পংক্তিবদ্ধ হলাম। আমাদের দোভাষী বন্ধু বরিস্ স্থানীয় পুলিশ গার্ডদের কি যেন বললেন, তখনই প্রবেশদ্বারের অল্প দূরেই পংক্তির মধ্যেই প্রবেশ করতে পেলাম। পংক্তির শেষে দাঁড়ালে ঘণ্টা-খানেক লাগ্‌ত। ধীরে ধীরে চলেছি—টুঁ শব্দ নেই। প্রবেশ মুখে দুইজন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে—দেখলে মনে হয় অচল প্রস্তরমূর্তি। নিচে সিঁড়ি বেয়ে নামছি—নামছি। একটু গলি পার হয়ে দেখলাম একটি কাঁচের শবাধারে লেনিন শায়িত, একটা কৃত্রিম আলো তাঁর দেহের উপর পড়েছে; অন্যত্র বিজলি বাতি স্তিমিত। দাঁড়াবার নিয়ম নেই।

কবরটি প্রদক্ষিণ করে অন্য পথে আমরা বের হয়ে এলাম রেড স্কোয়ারে। এই মৌসোলিয়মের কাছেই সরকারী মঞ্চ—যেখান থেকে সোভিয়েত্ কর্তারা উৎসবাদি দেখেন; তার ছবি প্রায়ই কাগজে দেখা যায়। কবর পূজো, মূর্তি পূজো, প্রতীক পূজো এক যায় আর আসে। খ্রীষ্টীয় আইকনের স্থান নিয়েছে লেনিনের ছবি!

শুনেছি ও পড়েছি স্তালিনের মৃতদেহ এই কবর-গৃহে ছিল লেনিনের পাশে। আজ স্তালিনের নাম শোনা যায় না—আমরাও কাউকে জিজ্ঞাসা করলাম না—স্তালিনের দেহ কোথায় কবরিত হয়ে আছে। ক্রেমলীনের কোথায় স্তালিন থাকতেন শুধিয়েছিলাম দোভাষী বন্ধুকে; তিনি খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন 'জানি না'। তাই তাঁর কবর কোথায়—সে প্রশ্ন করে তাঁকে বিব্রত করলাম না। বুঝলাম, এরা 'জানি কিন্তু বলব না'র পন্থাশ্রয়ী। স্তালিনের নাম আজ সোবিয়েত-রুশে কেউ উচ্চারণ করে না; অথচ ২৫ বৎসর সে-ই ছিল একচ্ছত্র সম্রাটতুল্য! আজ যাঁরা মৃতের উপর খড়্গ মারছেন, তাঁরা ত নীরবে তাঁর স্বৈরাচারকে মেনে নিয়ে চলেছিলেন বহু বৎসর। লেনিন তাঁর টেস্টামেণ্টে লিখে গিয়েছিলেন যে স্তালিনকে যেন সর্বকর্তা না করা হয়। কিন্তু এঁরাই ত তাঁকে বাড়িয়েছিলেন। এখন তাকে অপমান করলে সে কোন উত্তর দিতে পারবে না, কিন্তু তার জীবনকালে প্রতিবাদ করার সাহস ত হয় নি। মানুষ যত অপরাধই করুক, মৃত্যুর পর তার কবরিত দেহকে এ ভাবে লাঞ্ছনা করার কথা ভাবতে ভাল লাগে না। মনে পড়ছে অলিভার ক্রমওয়েলের কবরও বোধ হয় সরিয়ে দেওয়া হয়। সকল ডিক্টেটরেরই কি একই পরিণাম? আগে দ্বৈরথ যুদ্ধ হ'ত; মল্ল বা মুষ্টিযুদ্ধ সীমিত থাকত দু'জনের মধ্যে। এখন একই দেশের মধ্যে দলের সঙ্গে দলের লড়াই-মতভেদ দিয়ে সুরু হয়ে মস্তকচ্ছেদে অবসিত হয়। পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগ-সাজের সন্দেহে স্তালিন কত লোককে হত্যা করেছিলেন; ১৯৩৫-এর পার্জ বা বিতাড়নের ইতিহাস মনে পড়ছে—সেই সব পাপের একি প্রায়শ্চিত্ত? প্রকৃতির প্রতিশোধ?—

আজ স্তালিনের নাম কেউ করে না, যেমন বেরিয়ার নাম ভুলে গেছে; সরকারী ইতিহাস কাগজপত্র থেকে তাঁর নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। জর্জ ভি, চিচিরেন (Chicberin) ১৯৩৬ সনে অপমানের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; তার পূর্বে ১২ বৎসর তিনি ছিলেন সোবিয়েত বৈদেশিক সচিব। স্তালিনের কোপদৃষ্টিতে পড়ে তাঁর নাম মুছে যায়। পঁচিশ বৎসর পরে তাঁকে 'পুনর্জীবিত' করা হয়েছে কয়দিন আগে। নাগর দোলায় কখন কে উপরে চড়ে, আর কখন কে নিচে নেমে আসে, আখমাড়া কল থেকে ছিবড়ের মত বেরিয়ে যাবে—সে ভবিষ্যদ্বাণী বোধ হয় বিধাতাও করতে পারেন না। মলোটভ, ভোরসিলোভ, বুলগানিন—কোথায় তাঁরা?

ক্রেমলীন ও মৌসোলিয়ম দেখে ফিরছি। আজ রবিবার; Taxi পাওয়া শক্ত, কারণ আজ সরকারী ড্রাইভারদের ছুটি ভোগের দিন। তাই আমরা মেট্রোর পথে ফিরলাম; দ্বিবেদী মেট্রো দেখেন নি ব'লে ইচ্ছা করেই এই পথ নেওয়া, না হ'লে ট্রলিবাস ধরতাম। মেট্রো থেকে বের হয়ে বাস পেলাম। সেটা হোটেলের কাছ দিয়েই যাবে। বাস-এ এত দিন চড়ি নি, অর্থাৎ চড়বার প্রয়োজন হয় নি—আকাদেমির গাড়িতে ঘুরেছি। বাসে উঠে দেখি কনডাকটার নেই—সকলেই পাঁচ কোপেক স্লটে ভ'রে দিচ্ছে আর একখানা ক'রে টিকিট ছিঁড়ে নিচ্ছে। বিনা টিকিটে যাবার সাহস হয় না—কারণ অন্য আরোহী ত আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মানুষের দুষ্টবুদ্ধি হয়। ইনস্‌পেক্টর হঠাৎ এসে চেক করেন, তখন বিনা টিকিটওয়ালা বিপদে পড়ে। তার নাম-ধাম লিখে, সে যেখানে কাজ করে, সেই কারখানায় বা অফিসে ফোটো সুদ্ধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে হবে! দেশের কথা মনে হচ্ছিল। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া কমছে না ত। গান্ধীজি বলেছিলেন, বিনা টিকিটযাত্রীরা যতক্ষণ না ভাড়া দেবে, ততক্ষণ গাড়ি ছাড়া হবে না। জানি না ভারতে কবে মানুষের শুভবুদ্ধি হবে! যে লোক সরকারী টাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অপহরণ বা অপচয় করে, সে যে দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে শোষণ করছে, সে কথা দেশবাসী যেন বুঝতে পারে না অথবা বুঝেও ঝঞ্ঝাটের ভয়ে চুপ ক'রে থাকে। কোন রাজ্যের ছাত্ররা টিকিট কাটতে চায় না, টিকিট কাটলেও উপরের ক্লাসে ব'সে যাবে—শুধুলে বলে বিদ্যার্থী হ্যায়—অর্থাৎ ছাত্র ব'লে সরকারকে ফাঁকি দেবার অধিকার আছে!

লাঞ্চ খেয়ে উঠতেই প্রায় বেলা তিনটা হ'ল। বরিস বললেন—বিকালে আজ আকাডেমিশিয়ান ব্রাগিন্‌স্কি-র (Braginsky) বাড়ীতে চা-এর নিমন্ত্রণ। ইনি পার্শি

ও মধ্য এশিয়ার ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিত, Institute of Peoples of Asia-র সাহিত্যিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

পাঁচতলার উপর একটি ফ্ল্যাট-এ তিনি থাকেন। এই প্রথম মস্কোতে পণ্ডিতদের ঘরবাড়ী দেখলাম। যে ঘরে তিনি পড়াশুনা করেন, সেই ঘরেই আমাদের চা-এর ব্যবস্থা হয়েছে। নিজেই সব কাজ করছেন, চাকর দেখলাম না। অথচ খাদ্যবস্তুর প্রচুর আয়োজন করেছেন। দ্বিবেদীর সঙ্গে হিন্দী, পারসি, ছন্দ, মাত্রা প্রভৃতি নিয়ে কথাবার্তা চলল। কৃপালানী সাহিত্য আকাদামির কাজকর্মের কথা বললেন, আমি বিশ্বভারতীতে যে-সব গবেষণার কাজ চলছে সে সম্বন্ধে বললাম। পারসি কবিতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আমি শুধুলাম, প্রেমের কবিতা ইসলামী সাহিত্যে অজানা প্রেমিকের জন্য লিখিত হয়েছে; ওদের সমাজে নারী ছিল অদৃশ্য-হারেমে বন্ধ; তাই অজানা, অচেনার জন্য আকুতি-কাকুতি কবিতায় উছলে পড়েছে। পূর্ববঙ্গেও এই শ্রেণীর গান বাংলা ভাষায় আছে; এটা আরবদের প্রভাবে হ'তে পারে। আসলে স্প্যানীশ্-আরবদের মধ্যে থেকে অজানার জন্য প্রেমের কবিতা লেখা হ'ত; বাদশাহরা লিখতেন রাশি রাশি কবিতা। আরবদের কাছ থেকে এই ঢঙটা ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পেত্রার্ক প্রভৃতিরা য়ুরোপে প্রেমের নূতন কবিতার প্রবর্তক হন। আমার প্রশ্ন আরবদের উত্তর-স্বরীরূপে এদেশের মুসলমান কবিরা এই শ্রেণীর কবিতা ও গান লিখেছিলেন কিনা; কিন্তু প্রশ্নের জবাবটা চাপা পড়ল। অধ্যাপক বললেন, প্রেমের দুটো দিক ইসলামী কাব্যে রূপ নিয়েছে; একটাকে বলা হয়, 'আজারিয়া'—এটা না-পাওয়া প্রেমের জন্য আপশোষ, অপরটি 'ওমারিয়া' বা সম্ভোগের কবিতা। কিছু হ'ল না, কিছু পেলাম না ব'লে কবিরা সব দেশেই আকুলি-বিকুলি করে আসছেন; এটাই বিরহের কাব্য, সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, এই বিরহ-বেদনা। যাক্ এ নিয়ে অনেক কথা বলবার আছে, কিন্তু এখানে সেটা চলতে পারে না। Braginsky তাঁর একটা রচনা দিলেন পড়তে—রচনাটা রুশী ভাষায় তাঁদের পুস্তিকায় বের হয়েছিল; অনুবাদ করেছেন আমাদের জন্য। তার মধ্যে অনেক ভাববার কথা আছে।

ব্রাগিনস্কির বাসা থেকে বের হ'তে হ'তে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। চলেছি বল্‌শোই থিয়েটারে। টিকিট করা ছিল। কিন্তু লিডিয়ার দেখা নেই। ছুটতে ছুটতে এল সে; কিন্তু কয়েক মিনিট দেরি হওয়াতে আমাদের ঢুকতে দিল না। লিডিয়া বুঝিয়ে বলতে মহিলা দ্বারী বলল—অপেক্ষা কর। অন্য কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না—কারণ 'শো' আরম্ভ হলে কেউ দর্শকদের বিরক্ত ক'রে ঢুকতে পান না। লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি, কিছুক্ষণের মধ্যে একটা দিকে দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দিল। পিছনে একটা চেয়ারে স্থান পেলাম। একজন ভদ্রলোক ভাল জায়গা আমাকে ছেড়ে দিলেন। একটা দৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর, যখন আলো জ্বলল, তখন আমাদের জায়গায় যেতে পেলাম। ৩'৫০ রুবলের টিকেট—দ্বিতীয় পংক্তিতে জায়গা। সেখানে ব'সে ব'সে ঘরটা চোখে পড়ল। বিরাট্ মঞ্চ। এই থিয়েটার তৈরি হয় ১২৮৪ সনে; কিন্তু বছর ত্রিশ পরে আগুনে যায় পুড়ে, থাকে বাইরের প্রাচীরগুলো ও সামনেটা। ১৮৫৬ সনে নূতন ক'রে তৈরি হয়—সেটাই এখন আমরা দেখতে পাই। ঘরটি লম্বায় ২৫ মি প্রস্থে ২৬ মি উচ্চতায় ২১ মি। এত বড় স্টেজ দেখা যায় না—২৩'৫ মিঃ সামনেটা, গভীর ২৫ মিঃ। প্রায় হাজার লোক কাজ করে এই প্রতিষ্ঠানে। ব্যালে নাচিয়ে ২৫০-এর উপর। নাচের সময় পিল্‌পিলিয়ে আসতে লাগল—কত যে বলতে পারি নে।

চারদিকে বসবার 'বক্স' পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। মঞ্চের সামনে সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীদের বসবার সিংহাসনসদৃশ স্থান। সমস্ত বাড়ীটা যেন সোনা দিয়ে মোড়া। ছাদের উপর গ্রীক্ পুরাণের ছবি। এ সবই জারদের সময়ের তৈরি। সোবিয়েত্ যুগে পরিবর্তনের মধ্যে হয়েছে, এখন এটাতে যে ১'২০ রুবল খরচ করতে পারে সেই জায়গা থাকলে ঢুকতে পারে; পূর্বে ছিল বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের জন্য মাত্র। এখন সবসুদ্ধ প্রায় ৪ হাজার দর্শক বসতে পারে।

মস্কো আর্ট থিয়েটার সম্বন্ধে শুনলাম, এখন একটু পিছিয়ে পড়ছে তারা। এককালে এদের দল লণ্ডন, প্যারিস, টোকিও প্রভৃতি মহানগরীতে গিয়ে নাম ক'রে এসেছিল। এখন বলশোই থিয়েটারের চাহিদা বেশি। Don Quixote গল্পটাকে নিয়ে এরা ব্যালে তৈরি করেছে। রুশীয়রা বলে 'ডনকি ওঠ'। ব্যালে নাচ পূর্বে দেখি নি; মেয়েরা স্বল্প পরিচ্ছদে, পুরুষরাও তাই। কিন্তু

কি বলিষ্ঠ ও ছন্দোময়ভঙ্গি—তা না দেখলে বুঝা যায় না। মেয়েদের দেখে মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতা। সমস্ত কামুকতার ঊর্দ্ধে যেন উঠে তারা নৃত্যকলায় তন্ময় হয়ে আছে। একজন নাম-করা নৃত্যশীলা আসাতে দর্শকদের কি হাততালি। স্প্যানীশ গ্রামের দৃশ্য, ডন কুইক্‌সটের ঘোড়ায় চড়ে আসা, স্যাংকোর গাধায় চড়া, উইন্‌ডমিলের সঙ্গে লড়াই, এবং তার পর মিলের পাখায় ডন কুইক্‌সটের ঘুরপাক খাওয়া প্রভৃতি এমন ভাবে করেছে, যেন মনে হয়, সত্যই সপ্তদশ শতকের স্প্যানীশ গ্রামে আছি, সেখানকার বাজার, খাবার দোকান—সব দেখাচ্ছে। মেয়েদের নাচ—বুঝলাম সাধনা। পায়োনীয়ার প্যালেসে মেয়েদের শিক্ষানবীশী করতে দেখেছিলাম—কি কসরৎ করতে হয়। Menkus নামে সঙ্গীত-বিশারদ এটাকে ব্যালে রূপ দেন।

১৫ অক্টোবর ১৯৬২, মস্কো

সকালে ঘরে একাই আছি। বরিস এলেন, হাতে তাঁর বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, আর কমলাকান্তের দপ্তরের রুশ অনুবাদের প্রুফ। দুই-একটা জায়গা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন ; মুশ্‌কিল এই যে, আমরা বাংলা পড়ি চোখ বুজে—মাতৃভাষা বলে তাকে পড়ি, অধ্যয়ন করিনে মন দিয়ে। যে কয়টা দেখালেন, তা আমার পক্ষে ঠিক ভাবে বুঝান শক্ত হ'ল। বরিস বাংলা ভাষার ভিতর প্রবেশ করেছেন, ব্যাকরণের উপর একটা বইও লিখেছেন। ইনি বহুকাল মস্কো রেডিওতে কাজ করেছিলেন বাংলা বিভাগে, ভারতে এসেছিলেন রুশ সার্কাসের দোভাষী হয়ে। বাংলা ছাড়া হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষা জানেন। ভাষা ভাসাভাসা শেখেন নি, এবং রসবোধ আছে ব'লে কমলাকান্তের রসিকতার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ হয়েছে। গত কালকের 'আনন্দমঠ' নিয়ে যে তর্কটা উঠেছিল, আজ বরিস সেটা আবার ঝালাতে চাইলেন। আমি কালকের কথাই বললাম। যে-কালের কথা বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন—সেটা ভুললে চলবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ নিয়ে কথা উঠল। আমি বললাম, তিনি যে যুগের মানুষ তখন হিন্দু সমাজের শিক্ষিতেরা রাজনীতির চর্চা সুরু করেছেন—তার জাতীয়তা হিন্দুত্বমূলক। বরিসের 'আনন্দমঠ' খুব ভাল লাগে—বন্দেমাতরম্ বা জাতীয়তা-উদ্দীপক গান আছে বলে। আমি বললাম, সেটাই ত হিন্দু জাতীয়তার মূল কথা। কোন মুসলমানের পক্ষে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করা কঠিন, মাদার কন্‌সেপ্ট ইসলামে অজ্ঞাত। সুতরাং বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও গীত নিয়ে অনেক অশান্তি হয়ে গেছে বাংলা দেশে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল এটা। হিন্দুর পক্ষে 'বন্দেমাতরম্' আওয়াজ দেওয়াটা অত্যন্ত আবশ্যিক হয়ে ওঠে, প্রায় রাজনৈতিক ধর্মরক্ষার সামিল ; এবং মুসলমানের পক্ষে ঠিক ঐ কারণেই অশ্রাব্য মনে হয়—কারণ সেটা হিন্দুর শ্লোগান।

প্রাতরাশের জন্য নীচে নেমে এসে, নিজেদের টেবিলে ব'সে থাচ্ছি ; অন্য টেবিলে একজন ভারতীয় বসে—কালো চাপদাড়ি, দেখছেন আমাকে অনেকক্ষণ থেকে। এসে আলাপ করলেন। ইনি কেরালার লোক—সিরীয়ান খ্রীষ্টান, জেনেভাতে বিশ্ব খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের একটা সম্মেলন হবে। তাতে রোমান ক্যাথলিক ছাড়া প্রোটেস্ট্যান্ট, গ্রীক্ চার্চ, সিরীয়ান চার্চ সব সম্প্রদায় যোগদান করছে। ইনি সোবিয়েতে এসেছেন, এখানকার চার্চের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য। অনেকের ধারণা যে, সোবিয়েতে ধর্ম লোপ পেয়েছে। কথাটা আধাসত্য।

সত্যকথা, ধর্ম লোপ পেয়েছে সব দেশেই ; বুদ্ধিমানেরা মানে না ; চতুররা অন্যদের মানাবার জন্য ধর্ম নিয়ে আড়ম্বর করে। তবে তা ধর্ম নয়, ধার্মিকতা কতকগুলো কুসংস্কারের খোশা দিয়ে ধর্মের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার অপচেষ্টা মাত্র। আধুনিক কালে ছেলেমেয়েরা সব দেশেই যেমন, এখানেও তেমনি—কিছুই মানে না। আমাদের দেশে মানবার ভড়ং আছে। পাঁড় অব্রাহ্মণ কম্যুনিস্ট, অসবর্ণ বিয়ে করছে, অথচ বামুন ডেকে কুলাচার রক্ষা করছে। সোবিয়েত যুবকরা সেটা করে না। চার্চ অনেকগুলো আছে মস্কোতে; ক্রেমলীনের মধ্যে চার্চ-এর কথা ত আগেই বলেছি।

খ্রীষ্টান গ্রীক চার্চ ছাড়া আর্মেনিয়ান চার্চ, ইহুদীদের সাইনাগোগ, মুসলমানদের মস্‌জিদ সবই আছে। অবশ্য এ সব দেখবার অবকাশ হয় নি—দূর থেকে ইমারতগুলো দেখেছি। লেনিনগ্রাদের বিরাট্ মসজিদ দেখি পরে।

কেরালার সেই খ্রীষ্টান ভদ্রলোককে পরদিন আর দেখি নি, বোধ হয় নিজের কাজে বের হয়ে গেছেন। মুসাফির-খানায় দেখা—তার পর ?

এবার যেতে হ'ল বিশ্বসাহিত্য অনুবাদ পরিষদে। একটি

ঘরে আমরা বসলাম; এখানকার সাজসজ্জা আকাডেমি থেকে ভাল মনে হ'ল। এই পরিষদের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে রুশদের ওয়াকিবহাল করা। গ্রীক, লাতিন থেকে সুরু ক'রে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রুশ ভাষায় তর্জমার ব্যবস্থা করার আয়োজন হয়েছে। এঁরা 'বিশ্বসাহিত্য কোষ' বহু খণ্ডে প্রকাশ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। নামকরা সাহিত্যিকরা অনুবাদে হাত দিয়েছেন। এঁদের মত ভাব রক্ষা ক'রে অনুবাদ সার্থক করা কথাটা ভাবলাম। সত্যই ত। আজ বাঙালী কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারতই ত পড়ে; হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের রামায়ণের অনুবাদ বা কালী প্রসন্ন সিংহের অথবা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারত পণ্ডিতে পড়ে। তুলসীদাসের রামায়ণই ত উত্তর ভারতের হিন্দীভাষীদের কাছে বেদের সম্মান লাভ করেছে। এ সব ত খাঁটি অনুবাদ নয়। আমি বললাম, শুনেছি পান্তারনায়েক রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিছু অনুবাদ করেছেন; লোকে বলে তাকে চেনা যায় না, অর্থাৎ তিনি বাঙালী কবির ভাবটা নিজের মত ক'রে রুশী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এটা স্বাভাবিকই; তিনি ত আর বাংলা মূল দেখেন নি। আর বললাম—ফিট্‌জেরাল্‌ডের ওমরখায়েমের অনুবাদ—সেটা ইংরেজি কাব্য সাহিত্যে অমর স্থান লাভ করেছে। কিন্তু তা ওমরখায়েমকে প্রকাশ করে নি। রবীন্দ্রনাথের কবির অনুবাদও সেই গোত্রের অন্তর্গত ব'লেই আমি মনে করি। কবীরের কথা থেকে কবি-র বা ক্ষিতিমোহন সেনের ব্যাখ্যাটাই বড় হয়েছে; পণ্ডিতি ব'লে কবির কলমে কবীর আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। কথায় বলে 'তিনি নকলে আসল খাস্তা'; এখানে তিনি তর্জমায় আসল চাপা।

আলোচনা বেশ জমেছিল। প্রায় ২টার সময় পরিষদ থেকে বের হলাম। হোটেলে এসে লাঞ্চ খেয়ে উঠতে বেলা ৩টা বেজে গেল। নিচেই পোস্টাপিস আছে; কলকাতায় কাবেরী ও শান্তিনিকেতনে সুমন্ত্রকে পত্র লিখলাম—ছবি পোস্টকার্ডে।

লাঞ্চের পর চলেছি আকাদেমিতে। আজ সেখানে রোএরিখের স্মৃতিসভা। এ বাড়ীতে আগে দু'বার এসেছি কিন্তু যেখানে সভা হ'ল সেদিকটা দেখি নি। আমরা মঞ্চে বসলাম, সামনে ডক্টর জয়পাল ছিলেন—স্বাগত করলেন। ইনি এখন ভারতীয় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত—গত তেরোই রাষ্ট্রদূত সুবিমল দত্ত দিল্লী ফিরে গেছেন; তাঁর স্থানে মিঃ কাউল আসবেন।—জয়পালই এখন কাজ চালাচ্ছেন। এঁর সঙ্গে পরে দেখা হয় এমবেসিতে—দেশে ফেরবার আগে। সভায় রোএরিখ সম্বন্ধে অনেকে রুশ-ভাষায় প্রশস্তি পাঠ করলেন। বিদেশী অতিথি আমাদের নাম করা হ'ল—এইটুকু বুঝলাম। সভাশেষে রোএরিখের ভগ্নীর সঙ্গে দেখা হ'ল। সোভিয়েত্ ল্যান্ড্ কাগজে সেদিন হঠাৎ দেখি আমার ছবি—এই সভাশেষে কথা বলছি কার সঙ্গে।

এবার সহকারী ডিরেক্টর অ্যাকরমোভিচ্ আকাদেমি প্রকাশিত গ্রন্থরাশি দেখাতে লাগলেন। প্রাচ্যের সমস্ত ভাষা নিয়ে এঁরা চর্চা করছেন। দুনিয়াটাকে জানতে চায়। বিদেশের ভাষা না শিখে, তাদের সাহিত্য না পড়ে মানুষকে জানা যায় না। একথা সোবিয়েত্ রুশীয়রা ভাল করে বুঝেছে। ভারতীয় ভাষা যেমন শিখছে, প্রাচ্য সব ভাষাই শিখছে তেমনি করে। ভিয়েৎনাম, খ্‌মের, কাম্বোডীয়, জাপানী, কোরিয়ান, চীনা, জাভানী সব ভাষার চর্চা হচ্ছে।

বিকালে আমাদের যেতে হবে সুরেন্দ্র বালুপুরী নামে অনুবাদচক্রের এক সদস্যের বাসায়; সুরেন্দ্র শান্তিনিকেতনের ছাত্র। দ্বিবেদীর অনুরক্ত, তাই তাঁর বিশেষ অনুরোধে আমরা তাঁর বাসায় সন্ধ্যায় চা-এর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। অবশ্য আমাদের দোভাষীদের সঙ্গে নিয়ে চললাম। বাসা অনেক দূরে—অনেক ঘুরে বাসা পাওয়া গেল। চারতলার খাঁচার মধ্যে বাস। গিয়ে দেখি কয়েকজন হিন্দী, উর্দু অনুবাদক এসেছেন; শুভময়ও এল একটু পরে। বালুপুরী গৃহিণী সিঙাড়া, পকৌড়ি প্রভৃতি এবং আরও নানারকম খাদ্য বানিয়েছেন। লিডিয়া ভাবল, ভারতীয় সিঙাড়া খাবে। মুখে দিতেই তার চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেল। ঝাল! বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে, চোখে-মুখে জল দিয়ে নিষ্কৃতি পায়। ঝাঁঝাল ভোদকা ঢক ক'রে খায়—মুখে দিলে মাথা পর্যন্ত ঝাঁঝিয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের লঙ্কা-মরিচের ঝাল ও ঝাঁঝ হজম করা শক্ত!

এখান থেকে আমরা চললাম Friendship Hall-এ, বাড়ীটা বিরাট্ এক ধনী বণিকের সম্পত্তি ছিল। তারপর বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়ায় আবর্জনার মত উড়ে গেছে। সেই

বাড়ীতে স্টেজ, অডিটোরিয়াম, সভাগৃহ—কত। এখন এই অট্টালিকার ব্যবহার হচ্ছে মিলনমন্দির রূপে। সেই বাড়ীর এক অংশে এক মেক্সিকান শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে—প্রথমে সেটা দেখতে গেলাম। আমরা যেদিন এসেছি—সেদিন একটা রেলওয়ে ক্লাবের সদস্যদের বিচিত্র অনুষ্ঠান হবে। এরা রেলশ্রমিক—ইঞ্জিনিয়ার, টাইপিস্ট, ক্লার্ক, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। তাদের ক্লাবে সদস্যরা যা করে, যা শেখে, তাই তারা দেখাচ্ছে। কতরকম প্রাদেশিক নাচ গান, হ'ল। প্রাদেশিক পোশাকও কত বিচিত্র, হানগেরিয়ান, চেক, বেলরুশীয় ও মধ্যএশিয়ার নাচ। ছোট মেয়েদের মুরগীর নাচ, হাসের নাচ দেখাল। জিমনাস্টিক যা একটি মেয়ে করল—তা যে কোন সার্কাসে দেখান যেতে পারে। মাথার উপর একটা জলভরা গ্লাস রেখে কি কসরৎই না দেখাল! কয়েকটা কবিতা, আবৃত্তি, গানও হ'ল। একটা গানের কথা হচ্ছে—রাশিয়া কি যুদ্ধ চায়? রুশ ভাষায় ও পরে ইংরেজিতে গানটা করলে একটি যুবক। বাপ-মাকে জিজ্ঞাসা কর,—তারা কি যুদ্ধ চায়, ভাইবোনকে জিজ্ঞাসা ক'র,—তারা কি যুদ্ধ চায়, জিজ্ঞাসা ক'র তরুলতা, পশুপক্ষীকে—তারা কি যুদ্ধ চায়, ইত্যাদি। খুব আবেগ দিয়ে গাইল। অনুষ্ঠানের শেষে মস্কো সম্বন্ধে গান গাইল সকলে মিলে, শ্রোতা-দর্শকরা সে গানে যোগ দিল।

হল থেকে বের হয়ে আসছি এমন সময়ে একটি যুবক এসে প্রণাম করে বললে,—সে বাঙালী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সি পাশ করে Peoples Friendship University-তে (Lumumba) পড়ছে। সঙ্গে একটি মেয়ে, সিংহল দেশীয়—সে পড়ছে চিকিৎসাশাস্ত্র। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা শুনেছি—ছেলেটিকে দেখে ভাল লাগল, বললাম, লেনিনগ্রাদ থেকে ফিরে তোমাদের ওখানে যেতে চেষ্টা করব।

হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে উপরে আসতে ১০টা বেজে গেল। বরিস এলেন বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে। অনুবাদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলল এগারটা পর্যন্ত। এত রাত্রে বরিস ফিরবে বাসায়—সেও কাছে নয়। এদের শ্রমশক্তি দেখলে অবাক্ লাগে। (ক্রমশঃ)

—•—

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

১৮

পরের দিন প্রসাদ ফিরিল প্রবাস হইতে। মা-বাবা, ভাই-বোনেরা মায় দাসদাসী পর্য্যন্ত আনন্দে দিশাহারা। বংশের প্রথম বংশধর দূর দেশ হইতে আবাসে ফিরিয়াছে ইহাতেই সকলের উল্লাস। সকলের সহিত পরিবারের একমাত্র সরস্বতী কেবল যোগ দিতে পারিল না। বছর দুই পূর্ব্বে একটা তুচ্ছ বিষয় লইয়া ভাইবোনের কলহ হইয়াছিল; তাহার জের এখনও মিটিয়া যায় নাই। ছোট বোন 'দাদা' শব্দ উচ্চারণ করে না। সামনে বাহির হয় না। বিজয়ার প্রণাম পর্য্যন্ত করে না। দাদাও তেমনি ভ্রমেও বোনের নাম ধরে না, কাছে যায় না। বড় ঘরের বড় কথা, সামান্য বিষয়কে অসামান্য করিতে ইহারা অদ্বিতীয়।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিলে বিপদ্ উলুখড়ের। এ প্রবাদের মর্ম্ম বিনু মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। দাদার বিবাহে সরস্বতী যোগ দেয় নাই। নববধূর শুভাগমনের রাত্রে দরজা বন্ধ করিয়াছিল। কেহ সে বন্ধ দরজা খোলাইতে পারে নাই।

পরের দিন অবশ্য দ্বার খুলিতে হইয়াছিল, দূর হইতে আড়চোখে বধূর প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে হইয়াছিল। নিরুপায় হইয়া এক বাড়ীতে তাহাকে বাস করিতে হইতেছে বটে, কিন্তু মন তাহার তিক্ততায় ভরা। যাহার উপরে সরস্বতীর এত রাগ, আক্রোশ, তাহাকে নিকটে না পাইয়া সরস্বতী মনের ক্ষোভ মিটাইয়া ঝাল ঝাড়িতেছে তাহার প্রতিনিধির উপরে। জিনিসটা কাহারও অবিদিত নাই। তাই সরস্বতীর আড়ালে কেহ হাসে, কেহ মুখ বাঁকায়। তাহার অন্যায় আচরণে মনোরমা কিছু বলেন না, বলিতে পারেন না। হিতোপদেশ দিতে গেলে মেয়ে নয়নজলের বন্যায় পৃথিবী ভাসাইয়া অন্নজল পরিত্যাগ করে।

যাহা পল্লীগ্রামে মেলে না, মাতা-পিতার ফরমাইস অনুযায়ী প্রসাদকে তাহাই আনিতে হইয়াছে। পূজার সৌখিন জামা, কাপড়, পোশাক। ফলের ঝুড়ি, ছোটদের জাপানী খেলনা, ছবির বই। মা'র জবাকুসুম তৈল, তাম্বুলবিহার, চন্দনের সাবান, গোলাপ-জল, বাবার অম্বুরী তামাক, আতর। ঠাকুমায়ের পঞ্চমুখী শঙ্খ। ছোট ঠাকুমার রুদ্রাক্ষ মালা, ভানুমতী ও মধুমতীর গোলাপ ফুল-আঁকা ক্যাশ বাক্স। সরস্বতীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ইত্যাদি।

ছেলে ক্ষীরের পুলির পায়েস খাইতে ভালবাসে। মনোরমা নারায়ণের ভোগে ক্ষীরের পুলির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছোট ঠাকুমার ভোগশালায় বিনু ক্ষীরের ভিতরে ছানার পুর দিয়া পুলি তৈরী করিতেছিল।

নাতির আগমনে ছোট ঠাকুমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রান্না ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শূন্য গৃহ, বিনু পুলির পাত্র সামনে লইয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া একছলক্ বরকে দেখিয়া লইল। বিনুর বর সুদর্শন।

"সিংহজিনি মাজাখানি, নাভিসরোবর,
হাসিতে নলিনী ফুটে গুঞ্জে মধুকর" ইত্যাদি

না হইলেও সুন্দর বৈকি। দিব্য ভাসা-ভাসা চোখ, বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত ললাট, কোঁকড়ানো কাল চুল, সুঠাম বলিষ্ঠ গঠন। গায়ের বর্ণ গৌরের কাছে। তারুণ্যে, লাবণ্যে মনোহর। প্রসাদের চারিপাশের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। ছোটরা প্রাপ্তির পুলকে পুলকিত হইয়া দৌড়াইল বন্ধুমহলে বন্ধুদের ঈর্ষান্বিত করিতে। ঝি-চাকরদের মনে পড়িল ফেলিয়া-আসা কাজ। ছোট ঠাকুমার মনে পড়িল রান্নার কথা।

বেলা গত হইলে রাত্রি, রাত্রের পর প্রভাত। প্রভাতে ষষ্ঠী, চণ্ডীর ঘট স্থাপনান্তে সন্ধ্যায় বোধন। মনোরমা অনুষ্ঠানের নাগরদোলায় দুলিতেছেন। ছেলের কাছে বসিয়া বাক্যালাপের এতটুকু সময় তাঁহার হইতেছে না। কাজ, কাজ, কাজের মহাসমুদ্রে সবগুলি প্রাণী হাবুডুবু খাইতেছে।

এ সংসারে যাহার কোনই কর্ম্ম নাই, অখণ্ড অবকাশ, তিনি তাঁহার অতি আদরের, অতি স্নেহের ব্যক্তিটিকে লইয়া বসিলেন। তাঁহার অবগুণ্ঠন অনেকটা উন্মোচন

হইয়াছে। কোটরগত নিষ্প্রভ আঁখিযুগল স্নেহে সজল; পাণ্ডু অধরে আনন্দের দীপ্তি। কণ্ঠস্বর মমতায় বিগলিত।

ঠাকুমা শীর্ণবাহুর বন্ধনে তাঁহার পরম স্নেহাস্পদকে বাঁধিয়া অনর্গল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "আগে কিছু মুখে দে পেসাদ, মা জলখাবার আন্‌চে। আহা, ক্ষিধেয়-তেষ্টায় মুখ তোর শুকিয়ে গেচে। সারা রাত্তির জেগে আসা কি মুখের কথা? সেবার রথের মেলায় বন্দরে যেয়ে আমি ধুমোকলের নাও দেখে এইচি। কলের গাড়ি এখনো নজরে পড়ে নি। একটা চলে জলে আর একটা ডাঙ্গায়। তুই একরত্তি ছেলে হয়ে ক্যামনে এলি একলা একলা। একবার রেলগাড়িতে আবার ধুমোকলের নায়ে চ'ড়ে।"

প্রসাদ হাসিয়া অস্থির, "ঠাকুমা, তোমায় আমি রেল ষ্টীমারে চড়িয়ে শিগ্‌গির কলকাতায় নিয়ে যাব। সেখানে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কালিঘাটের কালী দর্শন করিয়ে গঙ্গাস্নান করাব।"

"না দাদা, অমন কর্ম্ম করাস্ নে, তোদের ধুমোকলের রেলগাড়ির গরজনে আমার পরাণ বেরিয়ে যাবে। ওই ফোঁস্ ফোঁসানি আমার সইবে না, ভাই! তোর ঠাকুরদার আমলে ওসব ছিল না। তেনারা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেরিয়েছিলেন নায়ে। এক এক তীর্থে যাবার কালে আমারে করতেন কত সাধ্য-সাধনা। আমিও কয়ে দিইচি পষ্ট কথা,—'মন ভাল না তীর্থ কর, মিছামিছি ঘুরে মর'। আমার তীর্থ ফল তুমি, শ্বশুরের ভিটে, তোমার পুণ্যে আমার পুণ্যি। তাতে কি থামে, জেদি মুনিষ্যি? খালি কইবে, 'চল, চল'। শেষ-মেশ আমিও কইতাম, আমারে যে নায়ে ভাসায়ে নিতে চাইছ, শুনেছি পথে ডাকাত ঠ্যাঙ্গারের ভয়। তুমি সাজোয়ান ব্যাটাছেলে, গতিক মন্দ দেখলে জলে ঝাঁপ দেবে, গাছে চ'ড়ে বসবে। আমি পালাব কোন্ চুলোয়। তোমার ইস্তিরি রায় বংশের কুলের বৌ, তাকে বদ্ লোক ছুঁলে সে লজ্জা তুমি রাখবে কোথায়? লোককে মুখ দেখাবে ক্যামনে? সাত-সমুদ্দর তেরোনদীর জলেও তেমোর সে কলঙ্ক ধুয়ে যাবে না। আমার এমনি ধারা চোপা পাড়ায় তবে না কর্ত্তা আমার আশা ছেড়ে দিইছিলেন।"

ঠাকুমা ক্ষণকাল বিরতি দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মনোরমা খাদ্যপূর্ণ রেকাবী, জলের গেলাস আনিয়া প্রসাদের সামনে নামাইয়া দিলেন। মাতৃহৃদয়ে সাধ জাগিতেছিল কাছে বসাইয়া খাওয়াইতে। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁহাকে দমন করিতে হইল। তিনি ভ্রমেও শাশুড়ীর নিকটস্থ হইতে চাহিতেন না। উভয়ের এক সহজ-সরল পথরেখা দুই প্রান্তে প্রসারিত হইয়াছে। শাশুড়ী-বধূর মধুর সম্পর্কে গরল মিশিয়াছে। সেই তিলে তিলে সঞ্চিত বিষ-বাষ্প শরতের মেঘের মত ক্ষণস্থায়ী নহে, তাহা অনন্ত সাগরের ন্যায় অপার অসীম।

কিয়ৎকাল পরে ঠাকুমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে পেসাদ, খাবার দেব্য সব তুলে দিলি কেনে? অতটুকুতে কি পেট ভরবে? বিদেশ বিভুঁয়ে থেকে না খেতে খেতে তোর পেটের খোল ছোট হ'য়ে গেইচে, চেহারা কাহিল হইচে?"

"আমি কাহিল হইনি ঠাকুমা, ওজনে বেড়ে গেছি। তোমাকেই বরং দুর্ব্বল লাগছে। তুমি ভাল ক'রে খাও না বুঝি?"

"শোন ছেলের কথা, খাই না আবার? দুই বেলা দুই মুঠো বাতাসা খাই, দুপুরে দই দুধ দিয়ে ভাত খাই। ভাগ্যি দিইছিল এক কৌটা বাতাসা, আগে তাতে এক কুড়ি দিন চলত। এবার খাবলা খাবলা খাইচি, তাই আধ কুড়ি দিনেই ফুরিয়ে গেল। লজ্জায় ফের চেয়ে নিতে পারলাম না। লোকে কইবে, বুড়ো মাগীর কি নোলা, মুরমুর ক'রে বাতাসা খায়। কেবল জল দিয়েই পেট ভরাতে লাগলাম। তোর বৌ টের পেয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, 'ঠাকুমা, বাতাসা খান না কেনে?' তার কানে কানে কইলাম, 'ফুরিয়ে গেইচে।' পুজোর বাতাসা এনে ওরা জালা ভ'রে রেখেচে, বৌ লুকিয়ে-চুরিয়ে ভাণ্ডার থেকে বড় বড় দুই কৌটা বাতাসা এনে দিইচে আমারে। আমি এক কৌটা বেতের ঝাঁপিতে লুকিয়ে রেখে আর এক কৌটা থেকে কুরমুর্ ক'রে পরাণ ভ'রে খাই। আর তোর বৌরে আশীর্ব্বাদ করি। মেয়েটারে আমি খুব ভালবাসি, সোহাগ ক'রে বুঁচি ব'লে ডাকি।"

"যার বোঁচা নাক তাকে বুঁচিই বলতে হয়। তোমার নামকরণের বাহাদুরি আছে, ঠাকুমা।"

ঠাকুমার চিরকালের অভ্যাস কথার পৃষ্ঠে কথার জবাব না দিয়ে অন্য কথার অবতারণা। এ ক্ষেত্রে তাহার অন্যথা হইল না। ঠাকুমা পুনরায় গুঞ্জন তুলিলেন, "বুঁচি আমার লক্ষ্মী সোনা, আমার মহেশ যারে ঘরে এনেচে, সেকি মন্দ হয়?"

"মহেশের বাবা আনলে মন্দ হয়, মহেশ আনলে হয় না?"

"তোর বৌয়ের দিব্যি ছিরিছটা আছে পেসাদ, মিঠেসিঠে দেখতে, গায়ের চামড়া ধলা না হ'লে মুস্তিবির কি আসে-যায়? 'আসলে হ'ল গুণের ধরি ছাতি, রূপের মারি লাথি'।"

"মা'র বেলায় তোমার এত জ্ঞান-বুদ্ধি কোথায় ছিল, ঠাকুমা?"

"শোনরে, তোর মা ভাল না, বৌরে খুব জ্বালা দেয়। খোঁটায় খোঁটায় দিবারাত দগ্ধ করে। যমুনা-পারের মেয়ে-গুলান ঝগড়া-ঝাঁটির ওস্তাদ। আমি শুনেচি তোর দিদিমারও নাকি চোপা ছিল সাপের বিষ। 'যেমন না তার তেমনি কি, তার বাড়া তার নাতনীটি।' তোর বোনগুলার কি মুখ, মুখের দাপটে গাছের পাতা ঝ'রে পড়ে, গাঙের জল শুকায়ে যায়। এক কৌটা তন্থি, তার কি বাক্যি। মুখের ধারে সকলেরে কেটে-কুটে ঝোল রাঁধে। হবে না, ওই মা'র সন্তান ত—'জাত গুণে তাঁত বয়, কপাল গুণে সুতা হয়'।"

"তোমার নাতনী যে তোমারি জাতের ঠাকুমা, মা'র জাত ত আলাদা। খোঁটা দিলে যদি অন্যায় হয় তা হ'লে তোমার পুত্রবধূকে তুমি কি তা দিচ্ছ না?"

"শোন্ পেসাদ, তোর পিসিমা এবার পুজোয় আসবে না, তোর বাপকে মানা ক'রে পত্র দিইচে। আমার মায়ের পরাণ, মানতে চায় না। আমি শক্তি সরকারকে চুপিসারে পাঠিয়েছিলাম। তোর পিসি তারে কইচে 'আমার ছেলেরা আসবে, আমি যেতে পারব না। মা যেন দুঃখু না করে। আমি পরে যাব।' তার বচনে মা যেন বর্তে গেল। মেয়ের জাত পরের ঘরে গেলে অমনিই হয়, 'খাই দাই পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি'।"

"যেমন তুমি ঠাকুমা, ন' বছর বয়েসে আমাদের বাড়ী এসে ভুলেও আর সেথানে পা দাও নি। আজকের মত থাকুক্ তোমার কবি গানের মহড়া। বাবার ফরমাস গাদা গাদা জিনিসপত্র আনতে হয়েছে, এখন আমি যাই তাঁকে সেই সব বুঝিয়ে দিতে।"

প্রসাদ উঠিয়া গেলে ঠাকুমা প্রসন্ন হৃদয়ে চলিলেন ভোগশালার তদ্বিরে।

বিদুর পুলি তৈরি তখনও শেষ হয় নাই। এতক্ষণ মন্থর গতিতে হাত চলিলেও কর্ণ সজাগ হইয়াছিল। ঘোমটার ফাঁক দিয়া সে হাতিমুখো সিঁড়ির বারান্দায় ঘনঘন চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাই হাতের কাজ তেমন আগাইয়া যায় নাই।

ঠাকুমা ভোগের ঘরের পৈঠার উপরে বসিয়া তাঁহার ডুগডুগিতে ঘা দিলেন, "ওলো পেসাদের বৌ, কত পুলি বানাচ্ছিস্? এক পাথর হইচে। আরো লাগবে গোটা-কতক, ঘেটের পাতা ঘোরা চাই। হাত চালা তড়্বড় ক'রে, আজ যে তোর আনন্দের দিন।

'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে,
আসিল পরাণ বঁধু পূজা দেখিবারে।'

দেখ্ লো বৌ, তোরে আমি আর বুঁচি কইব না, শুনে পেসাদ গোঁসা করবে, আজ থেকে তোর নাম রাখলাম মণিবালা। মণিবৌ, তোরে একটা ভাল কথা কয়ে রাখি। তুই নিত্যি নিত্যি ছোট ঠাকরোণের রান্নার যোগাড় দিবি। রাঁধার যোগাড় দিতে দিতেই নোকে রাঁধা শিখে পাকা রাঁধুনী হয়। ছোট ঠাকরোণের মতন রাঁধা কয় জন জানে, ও সাক্ষাৎ দেবপতি, ওই হাতের রাঁধা খেয়েই না তোর দাদাশ্বশুর"—

ছোট ঠাকুমা বিবর্ণ মুখে হাত জোড় করিলেন, "দোহাই দিদি, চুপ কর, তোমার পায়ে পড়ি। এখন আজে-বাজে ব'কে মাথা গরম কর কেনে? দুই দণ্ড ভগবানের নাম করলেও পরকালের কাজ হয়। পৈঠেয় রোদ ভ'রে গেচে। ঠাণ্ডায় উঠে যাও। ভোগের একটু দেরি আছে। রান্না নামিয়ে রেখে পেসাদের কাছে একটুখানি গিয়েছিলাম, তাই দেরি হ'ল।"

সত্যই দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে পৈঠা ভরিয়া গিয়াছিল, ঠাকুমার বসিয়া থাকা চলিল না। বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যার মরণ যেখানে নাও ভাড়া করে যায় সেখানে।"

১৯

নারায়ণের ভোগের পরে বাবুদের খাবারের জায়গা করা হইতেছিল, এমন সময় তরু আঁচল লুটাইয়া, কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছ নাচাইয়া ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, "মা, বড়দি, মেজদি, সেজদি, বৌদি, তোমরা শিগগির এসো, গোলবারান্দায় দাদা কলকাতা থেকে কলের গান এনেছে, এখন বাজান হবে। তোমাদের ডাকতে বল্লে। ঠাকুমা,

ছোট ঠাকুমা, কামিনীর মা, হারানি, সোহাগি, পসারী, তোমরা এস কলের গান শুনতে। আমি চল্লাম।"

এ অঞ্চলে এই প্রথম গ্রামোফোনের আবির্ভাব। ইতি-পূর্ব্বে এমন অদ্ভুত ব্যাপারের সহিত গ্রামবাসীদের তেমন পরিচয় ছিল না।

মধুমতী পাবনায় দূর হইতে কালার মোহন বাঁশী শুনিয়াছে বটে, কিন্তু দর্শন পায় নাই। ভানুমতী, মধুমতী কলের গান শোনামাত্র হাতের কাজ ফেলিয়া ঘরের বাহির হইল।

সরস্বতী ভ্রূ বাঁকাইয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল, "যতসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড! ভরা দুপুরে এখন সকলে খাবে-দাবে, এই সময় হুজুগ হ'ল কলের গানের। রাত পোহালে ষষ্ঠীর ঘট বসবে, কাজের আদি-অন্ত নেই, এখন সুরু হ'ল ধেই-ধেই নাচন। যাদের আক্কেল নেই, তারাই কর্ম্মনাশার ফন্দি আঁটে। আমি যাব না, ছাই-ভস্ম শুনতে। যাদের চিত্তে সুখ আছে, তারাই যাক্।"

মনোরমা মেয়েকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "নতুন কল আনা হয়েছে, ওরা বার বার ডাকা-ডাকি করছে একবার ওখানে যেয়ে দাঁড়ালে মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত না। তুমি যদি নাই যাবে, তা হ'লে ভোগের ঘরে ব'সে কাকীমাকে একবার পাঠিয়ে দাও গে, তিনি একটু দেখে যান।'

মায়ের এই কথাতেই সরস্বতীর নয়নে বর্ষা নামিল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়াই থাকে, সামান্য ছল-ছুতা পাইলেই হইল।

সানাইয়ের সকরুণ সুরলহরী শ্রবণ করিয়া ঠাকুমা তথায় হাজির হইয়াছিলেন। ছোট ঠাকুমা ও বিনুকে সঙ্গে লইয়া মনোরমা বাহিরের হলঘরে উপনীত হইলেন।

বৃহৎ গোলবারান্দার মধ্যস্থলে গালিচার উপরে চোঙ্গা-যুক্ত যন্ত্রটাকে বসান হইয়াছে। প্রসাদ রেকর্ড বাজাইতেছে, হেমন্ত ও ক্ষিতি রেকর্ড নির্ব্বাচন করিয়া দিতেছে। তাহাদের কাছে বসিয়া সুমন্ত সবিস্ময়ে তাকাইয়া আছে।

মহেশবাবু ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন।

বাতাসে বার্ত্তা পাইয়া মধুলোভী মৌমাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসিয়া গোলবারান্দার আঙ্গিনায় সমবেত হইয়াছে।

সানাই থামার পরে সঙ্গীতের অবতারণা হইল—

"কেন বাজাও কাঁকণ, কন কন কন কত ছল ভরে?
ওগো, ঘরে ফিরে চল, কনক কলসে জল ভরে।"

সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তিতে কিংবা শব্দের মধুর ঝঙ্কারে কি জানি কিসে যেন কি হইল; এক অজানা অনির্ব্বচনীয় পুলকে বিনুর সুপ্ত হৃদয় অকস্মাৎ উদ্বেলিত হইল। বাল্য বিদায় লইয়াছে, কৈশোর সমাগত, এই প্রথম কৈশোরের উন্মেষ। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। তাহার ন-ঠাকুরদাদা ছিলেন বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার পেশা হইয়াছিল কথকতা ও গান। কর্ম্মসূত্রে তিনি নগরে অবস্থান করিলেও নিজের জন্মভূমি গণ্ডগ্রামকে অবহেলা করেন নাই। অবকাশ পাইলেই গ্রামে আসিয়া পল্লীর স্তব্ধ শান্ত পরিবেশকে সুরে সুরে অমৃতময় করিয়া তুলিতেন।

ন-কর্ত্তার আগমন-সংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই চারি-দিকে সাড়া পড়িয়া যাইত। সুরু হইত সঙ্গীতের মহোৎসব—তাঁহার ভক্ত শিষ্যমণ্ডলীর দল সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে আসিয়া জুটিত যাত্রার দল, কবিওয়ালারা, কীর্ত্তনীয়া, ঝুমুর, চপ্, বাউল, খেমটা ইত্যাদি। ন-কর্ত্তাকে তাহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেই তাহারা কৃতার্থ। বাহিরের প্রশস্ত আঙ্গিনা ঢাকিয়া যে সামিয়ানা টাঙ্গান হইত ও বিরাট্ সতরঞ্চ বিছান হইত, তাহা গুটাইয়া রাখার অবকাশ হইত না। গায়কদের পারিশ্রমিক প্রশ্ন এখানে উঠিত না, পেট পুরিয়া খাইয়া কর্ত্তাকে তাহাদের শিক্ষার পরিচয় দিয়াই আনন্দ। কাহারও সঙ্গীতে কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইলে হাতের আংটি খুলিয়া পুরস্কৃত করিতেন, গায়ের শাল আলোয়ান একখানাও থাকিত না। হাতের সামনে আর কিছু না পাইলে গামছা পরিয়া পরিধানের থান বিতরণ করিতেন। তিনি ছিলেন খেয়ালী মেজাজের। সন্তানহীন, ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁহার ছিল না, বর্ত্তমানের ধারও ধারিতেন না। প্রবাস হইতে যাহা পরিশ্রম করিয়া আনিতেন, গ্রামের ইতর-ভদ্র ও গায়কদের প্রতিদিন ভূরি-ভোজন করাইয়া নিঃশেষ হইলে আবার যাইতেন প্রবাসে। যেমন স্বামী তেমনি সহধর্ম্মিণী সারদাসুন্দরী।

কিন্তু সেই সঙ্গীত-সাগরে বিনু আশৈশব ভাসিয়া বেড়াইলেও তাহা ছিল বাহিরের, অন্তর স্পর্শ করিতে পারে

নাই। কিন্তু আজ যেন এ স্বর-ঝঙ্কার তাহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গিয়া, আকুল করিল মন প্রাণ।"

এ তন্ময়তা তাহার জীবনের এক অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণ। বিদায়গামী বাল্যের সকাশে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ লইয়া কিশোর সমাগত। তাই বিনুর চির-পুরাতন বিশ্বভুবন সহসা নবীন শোভা-সম্পদে উদ্ভাসিত হইল। ঘুমন্ত চেতনাবোধ সহসা জাগ্রত হইয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে সে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবারিত অনন্ত নীলাকাশ কি অপরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি! খণ্ড-বিখণ্ড শুভ্র মেঘ নীলের তরী বাহিয়া আকাশ-গাঙ পাড়ি দিতেছে। নীলের গা ঘেঁষিয়া কলগুঞ্জনে সারি বাঁধিয়া উড়িয়া চলিয়াছে হংস বলাকা। রৌদ্রতপ্ত শ্যামল ধরণীর বক্ষে তাহাদের ছায়া পড়িতেছে। ঘন শাখা-পল্লবে লুকাইয়া "বৌ কথা কও" পাখী ডাকিতেছে। লতা বর্ষার ধারা স্নান করিয়া সবুজ বসনে সাজিয়া পুলকে ঝলমল করিতেছে। মধ্যাহ্নের নিবিড় অলসতার মধ্যে শরতের উতলা পবনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে,

"কেন বাজাও কাঁকণ কনকন কত ছলভ'রে?
ওগো, ঘরে ফিরে চল, কনক কলসে জল ভরে।"

ইহার পরে আরও কয়েকটা গান বাজান হইল। কিন্তু উন্মনা বিনুর মর্ম্মে তাহা প্রবেশ করিতে পারিল না। সেই প্রথম শোনা সঙ্গীত-সুধা পান করিয়া সে তাহার স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

মহেশবাবু বেলার দিকে তাকাইয়া ছেলেদের ও জামাতাকে তাড়া দিলেন, 'এখন গান বন্ধ কর, দুপুর গড়িয়ে গেল, তোমরা খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর গে।' সন্ধ্যেবেলায় আবার হবে। কাজকর্ম্ম সেরে তখন বাড়ীর মেয়েরাও শুনতে পাবে। পাড়ার লোকও আসবে।"

কলের গানের কল্যাণে ঢিমেতেতালার বাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। মনোরমা হইলেন দশভুজা, মেয়েরা অষ্টভুজা, ছোট ঠাকুমা চতুর্ভুজা। ঠাকুমা 'ঘুরণ চণ্ডী'। কলনাদিনী দাসী-মহলে পড়িল ঝন্‌ঝন্, খন্‌খন্ শব্দের সাড়া। অকেজো বিনু সেও চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার দ্বিভুজের এক ভুজ প্রসারিত হইল বটে, কিন্তু এক ভুজকে বিবশ করিয়া রাখিল সঙ্গীতের ক্ষীণ রেশ—

"কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা,
কেন চাহ ক্ষণে ক্ষণে চকিত নয়নে, কত ছল ভরে?
ওগো, ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভরে।"

বাহির মহল হইতে রায় পুরলক্ষ্মীদিগকে বারংবার তাগিদ দিতে দিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন মেয়েরা উপস্থিত হইলেন গানের আসরে।

"অমনি সুযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর,
অমনি অপ্সরা পায়ে বাজিল নূপুর।
পূরিল সুধার ঘ্রাণে, সভার ভবন
বহিল অমর-প্রিয় সুরভি পবন।"

বাহিরে হলের চেয়ার টেবিল সরাইয়া মেঝে জোড়া গালিচা পাতিয়া গ্রামের মেয়েদের বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। হলের পাঁচ দরজায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল রঙ্গীন চিক। চিকের অন্তরালে গ্রামোফোনের গান শুনিতে সমাগত হইয়াছিলেন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

গোলবারান্দার নীচে কোমল তৃণদলে আচ্ছাদিত অঙ্গনে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিবার জায়গা হইয়াছিল সর্ব্বসাধারণের। তাহাদের মাথার উপরে আচ্ছাদন হইয়াছিল পদ্মপাতা আঁকা সামিয়ানা। পূজা উপলক্ষ্যে এখানে প্রতি বছর যাত্রা, ভাসান, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও সারি গানের আসর বসিত। সপ্তমী পূজা হইতে লক্ষ্মী পূর্ণিমা অবধি চলিত যাত্রার ঢোলক, কাঁসি, বেহালা, খমটার রুণুঝুণু, ভাসানের উদাস স্বর, পাঁচালীর লীলা-কীর্ত্তন। লাঠিয়ালদের লাঠির ঠক্‌ঠক্, মুসলমানদের সারি গান ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ হইল কলের গান।

ঝি-রা গান শুনিবে বলিয়া পান সাজার ভার লয় নাই, আগন্তুকদের পানের ভার দেওয়া হইয়াছিল সরকার ও চাকরদের উপরে।

যথাসময়ে পান আসিল পিতলের কাণা-উঁচু প্রকাণ্ড থালায়। ভানুমতী সকলকে পান বিতরণ করিয়া বিনুকে লইয়া বসিলেন চিকের সামনে। রূপার গোলাপ পাশে ক্ষীত গোলাপজল ভরিয়া সকলকে পরিষিক্ত করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

বাহির মহল লোকের ভিড়ে গমগম করিতেছে। তিল-ধারণেরও স্থান নাই। দূর হইতে অহিরাবণ-মহীরাবণ বধের পালা শুনিয়া কেহ পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। সকলেরই লক্ষ্য গ্রামোফোনের চোঙ্গার প্রতি। যে যন্ত্র হাসে, কাঁদে, কথা বলে, বক্তৃতা দেয়, তাহা নিকটে গিয়া নাড়িয়াচাড়িয়া না দেখিলে দেখার মূল্য কি? কাজেই ভিড় মরি-পড়ি করিয়া গোলবারান্দার দিকেই ঠেলিয়া আসিতে লাগিল।

এখনও হেম ও প্রসাদ গ্রামোফোন লইয়া বসিয়াছিল। উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক্ আলোকিত করা হইয়াছিল। মহীরাবণ বধ হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। পালা-শেষে বিপুল জনতা মুহুর্মুহু হরিধ্বনি দিতে লাগিল। বিনু কিন্তু তেমনি মোহাচ্ছন্ন, অভিভূত। তাহার হৃদয়-বীণার তারে তারে সেই একই সুরের রণ্ রণি—

"হের যমুনা বেলায় অলস হেলায় গেল বেলা ;
হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি কত ছলভরে,
—ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জলভরে।"

২০

গান-বাজনা থামিবার পর রাত্রি দুইটায় রায় পরিবারের শয়ন করিবার সময় হইল। পঞ্চমী চাঁদ আকাশ-ভরা নক্ষত্রের সভায় মিট্ মিট্ করিতেছে। চরাচর গভীর সুপ্তিতে মগ্ন।

কামিনীর মা বিনুকে উঠান পার করিয়া শয়ন-গৃহে আগাইয়া দিয়া গেল। তখন বিনুর অবস্থা ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগল লোচন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

বিনু দরজায় খিল আঁটিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে আশা করিয়াছিল প্রসাদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে তাহার অগোচরে প্রদীপের শিখা কমাইয়া দিয়া নীরবে শয্যায় আশ্রয় লইবে। কিন্তু প্রসাদ ঘুমায় নাই, ছোট ঠাকুমার খাটখানা অধিকার করিয়া শিয়রে আলো রাখিয়া বই পড়িতেছে।

লজ্জায় সঙ্কোচে বিনুর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। ইতিপূর্বে তাহার তেমন লজ্জা বোধ ছিল না। যাহার কোন বোধের বালাই ছিল না তাহার আবার লজ্জা? আজ এক স্বল্প পরিচিত তরুণের সন্নিকটে উপনীত হইয়া এক অজানা নূতন উপদ্রবে সে বিব্রত হইল।

বই রাখিয়া বিছানায় বসিয়া প্রসাদ চোখ তুলিল বধূর পানে। যে ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, নড়ে না, কথা বলে না, সেকি মানুষ—না পাথর?

ক্ষণেক মৌন থাকিয়া প্রসাদ মুখর হইল, "দাঁড়িয়ে কেন, রাত শেষ হয়েছে, শুয়ে পড়।"

বধূ এবার নড়িল, মুখের ঘোমটা আরও দীর্ঘ করিয়া খাটের পায়ের দিকের অপ্রশস্ত স্থানটা অতিক্রম করিয়া একলাফে বসিল গিয়া নিজের বিছানায়।

তাহার লম্ফের অপরূপ ভঙ্গিমায় প্রসাদ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। প্রসাদ সহাস্যে কহিল, "খুব গান শুনলে আজ, কেমন শুনলে?"

ঘোমটার ভিতর হইতে সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, "ভাল"।

"কোন্ গানটা তোমার বেশি ভাল লেগেছে।"

"বাজাও কাঁকণ।"

"লাফ-ঝাঁপ দিলেও দেখছি রস-বোধ আছে। আচ্ছা, কাঁকণের মানে জানো?"

"ও আবার কে না জানে? হাতের গয়না।"

প্রসাদ বালিশের তলা হইতে কয়েকখানা বই ও দুইটি শিশির মোড়ক বাহির করিল। বধূর পাশে সরিয়া কহিল, "তুমি কলাবৌ হয়ে রয়েছ কেন? আমাকে তোমার লজ্জা কিসের, ভয়ইবা কিসের? এই নাও পূজোর উপহার, তোমার জন্যে এনেছি কুন্তলীন আর দেলখোস। বই ক'খানা তোমার পড়াশোনার জন্যে।"

প্রাপ্তির পুলকে বধূর আঁখিতারা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, অবগুণ্ঠন স্বল্প হইল। সে বাহু বাড়াইয়া উপহার গ্রহণ করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। তখনও কুন্তলীন তৈল ও প্রসাধনের দেলখোস পল্লীগ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। সবে দোকানে দেখা দিয়াছে। নাম দুইটির সঙ্গে তাহার পরিচয় না থাকিলেও স্বামীর প্রথম উপহার।

শিশি রাখিয়া বিনু চটি-আকৃতি পুস্তক ক'খানা হাতে লইয়া সচমকে চাহিয়া রহিল, নবীন বর নববধূর জন্য আনিয়াছে বোধোদয়, আখ্যান মঞ্জরী, নব ধারাপাত, [illegible] বুক।

সে সময় ইংরাজি শিক্ষা অত্যন্ত আদরণীয় হইয়াছিল, যে ব্যক্তি বিদেশী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহার শিক্ষার গৌরব ছিল না।

প্রসাদের পাঠ্যবস্তু ছিল ইংরাজি সাহিত্য। উক্ত ভাষার প্রতি তাহার অধিকার অসাধারণ। সেই কারণে সে মুগ্ধ বালিকা স্ত্রীকে অশিক্ষার অন্ধকার হইতে মাজ্জিত শিক্ষার আলোকে লইয়া যাইতে উৎসুক হইয়াছিল।

বই লইয়া বিনু স্তব্ধ হইয়া রহিল, মুহূর্তে মিলাইয়া গেল তাহার উল্লাসের দীপ্তি। ইহার নাম নাকি পূজার উপহার? ইহাতে না আছে ছবি, না আছে ছড়া। ইহাপেক্ষা তরুদের মতন অমনি পাতায় পাতায় ছবি, গল্প, কবিতা লেখা শিয়ালের বুদ্ধি, বাঘের চাতুরী টুনটুনি পাখীর টাকার

অহঙ্কারের গল্পওয়ালা বই পাইলে বিন্নুর খুসীর অন্ত থাকিত না। কুন্তলীন-দেলখোসের পরিবর্ত্তে সুমন্তর মত একটা জাপানী খেলনা পাইলেও তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সে সময় পাইলে নিভৃতে বসিয়া চাবি ঘুরাইয়া তুইটি সাহেব-মেমের ডিগ্‌বাজি খাওয়া দেখিত। ক্ষিতির ম্যাজিকের বাক্সের ন্যায় একটা ম্যাজিক বাক্স কি বিন্নুর জন্যে আনা উচিত ছিল না? নিজে যেন উনিশ-কুড়ি বছরের বুড়ো ধাড়ি হইয়াছেন। একটা পরীক্ষায় পাশ করিয়া আর একটা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছেন, সাধও নাই, আহ্লাদও নাই, পাকা ভারিক্কিভাব। উনি পাকিয়াছেন বলিয়া কি বিন্নু পাকিবে?

বিন্নুর বিমনা ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রসাদ বলিল, "ভাবছ কি, তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে! শিক্ষাহীন জীবন পশুর সমান। সময় পেলেই বইগুলো প'ড়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রো। খাতায় ধ'রে ধ'রে হাতের লেখা লিখবে। পরিষ্কার ক'রে লিখতে লিখতে লেখা ভাল হয়ে যাবে। কাকের ঠ্যাং, বকের পালক যা লেখো—ওর নাম লেখা নয়।"

হাঁ, ইতিপূর্ব্বে প্রসাদ বিন্নুকে কয়েকখানা চিঠি লিখিয়াছিল, বাধ্য হইয়া ভদ্রতার খাতিরে তাহাকে উত্তর দিতে হইয়াছিল। তাহাতেই প্রসাদ বিন্নুর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছে। কিন্তু বিন্নু কি পায় নাই, প্রসাদের হস্তাক্ষরের পরিচয়? নবীন বরের নূতন চিঠি সকলেরই গৌরবের বস্তু, বিন্নুরও। প্রসাদের হাতের লেখা ভাল নয়, জড়ানো, বোঝা যায় না। বোঝা না গেলেও বিন্নু চিঠি কয়েকখানা সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছে বাক্সের তলায় কাগজের ভাঁজে। যার নিজের লেখা হিজি-বিজি সে আবার অন্যের লেখার খোঁটা দিতে আসে! তাহার কি দোষ? সে ত স্কুলে পড়ে নাই, পাঠশালায় যায় নাই। ঠকুমা ও মা'র কাছে সামান্য যা একটু শিখিয়াছে।

ঘর নিস্তব্ধ, দেয়ালের গায়ের ঘড়িটা কেবল সময়ের সমতা রক্ষা করিয়া টিক্ টিক্ শব্দ করিতেছিল। মহেশবাবু নিত্য-নিয়মিত তুই বাটি ফুল সন্ধ্যাবেলা তুই খাটে রাখিয়া গিয়াছেন, একটাতে গন্ধরাজ, আর একবাটিতে কুন্দ কুঁড়ি। কুঁড়িগুলি ফোটো-ফোটো হইয়াছে, সৌরভে বিছানা ভরিয়া গিয়াছে।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রসাদ কহিল, "চুপ ক'রে রয়েছ কেন? আমার মনে হয় তুমি যুক্তাক্ষর পড় নি? পড়লে কি লেখায় এত বানান ভুল হয়? সেখানে তুমি কার কার কাছে পড়েছ? কি বই পড়েছ?"

বিন্নু মনে মনে মহাবিরক্ত, রাত তুপুরে এ আবার কি জ্বালা; উনি যেন মাষ্টারমশায় এসেছেন! এদের সবই বিকট্, এক কথা ধরলে ছাড়তে চায় না।

বিন্নুর চোখের পাতা ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল, চট্‌পট্ উত্তর দিয়া রেহাই পাইবার আশায় সে বলিল, "ঠাকুমা আর মা'র কাছে পড়েছি। আমার অনেক বই পড়া হয়ে গেছে।"

"সেখানকার ঠাকুমা কি লিখতে-পড়তে জানেন?"

"জানেন না আবার? বাবাকে নিজের হাতে চিঠি লিখে ডাকে দেন। এ বাড়ীর ঠাকুমার মতন কেবল ব'সে ব'সে ছড়া কাটেন না।"

প্রসাদ হাসিল, "তাই নাকি, তিনি যদি এত বড় বিদুষী তবে তার নাতনীকে এমন নিরেট ক'রে রেখেছেন কেন? তোমার অনেক বই পড়া হয়েছে? আচ্ছা, বানান করত ঈষৎ।"

বিন্নু সগর্ব্বে কহিল "ভারি ত বানান ও আবার কে না জানে? হসই, দন্তশ, ত, ইসত।"

"ছিঃ ছিঃ, তুমি কিচ্ছু শেখ নি। তোমাকে একখানা দ্বিতীয় ভাগ এনে দেব। গোড়া থেকে আবার পড়া সুরু করতে হবে।"

অপ্রতিভ বিন্নু নিরুত্তরে শুইয়া পড়িল। মোটা পাশ বালিসটা জড়াইয়া ধরিয়া মনে মনে বলিল, "যে তুচ্ছ বানান লইয়া আপনি আমাকে এত গঞ্জনা দিলেন, ইহা আমি ভুলিব না। একদিন সাদা কাগজের বুকে কালির আখরে ঈষতের মালা গাঁথিয়া আপনার গলায় পরাইয়া দিব। সেদিনের এখনও ঈষৎ বাকী রহিয়াছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিন্নু তাহার নিদ্রার স্বপ্নপুরীতে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই হীরাসাগর, যাহার তীরে-নীরে কাশের শ্রেণী রেখাকারে প্রাচীর রচনা করিয়া রাখিয়াছে। বর্ষার শ্যামল কাশগুচ্ছ শরতে শুভ্রবেশে সাজিয়া শারদ-লক্ষ্মীকে সযত্নে চামর বীজন করিতেছে। নদীর জলে হেলিয়া-পড়া প্রাচীন তেঁতুল গাছের কাণ্ডে বসিয়া বিন্নু রসেপূর্ণ পাকা কাশের ডাঁটা চিবাইতেছিল। এমন সময়

ঘোষেদের নিস্তারিণী কৌতুকহাস্যে তাহাকে জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, না!"

"না-না কেন? উঠবে না নাকি? ভোর হয়েছে, সকলে উঠেছেন।"

বিন্নু নিদ্রায় বিজড়িত চোখের পাতা মেলিল—কোথায় হীরাসাগর নদী; খেলার সাথী নিস্তারিণী। যে তাহাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইতেছে সে প্রসাদ, যাহার আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু, কুঞ্চিত কেশ, বলিষ্ঠ গঠন।

বিন্নু পাশ ফিরিয়া আবার ঘুমাইল।

ফের ঠেলা, "ওঠ ওঠ, আর ঘুমায় না।"

মুদ্রিতনয়নে বিন্নু বলিল, "রাত পোয়ায় নি, কেউ ওঠে নি। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আমি কোথায় যাব? আমার বুঝি ভয় করে না?"

"ঘরে রাত থাকলেও বাইরে ভোর হয়ে গেছে। মা'র গলা শোনা যাচ্ছে। তুমি মুখ ধুয়ে তাঁর কাছে যাও। তিনি যে কাজ করতে বলেন, তাই কর গে।"

দুই হাতে চোখ মুছিয়া সুখনিদ্রাকে বিতাড়িত করিয়া অবশেষে বিন্নুকে শয্যা ত্যাগ করিতে হইল। তখন বাহিরে গ্রামোফোন বাজিতেছিল,

"গা তোল গা তোল, বাঁধো মা কুন্তল;
এই এলো পাষাণি, তোর ঈশানী!"

২১

প্রসাদ মিছে বলে নাই, রায়বাড়ীতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। ভানুমতী দ্বিতল হইতে তখনও নামে নাই, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। মনোরমা স্নানের শাড়ী-গামছা গোছাইতে গোছাইতে মধুমতীকে চা তৈরির নির্দেশ দিতেছেন।

ঠাকুমা আজ স্নান-যাত্রায় পিছাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মেজাজ ভাল নাই। তেলশূন্য বাটি হাতে রাগে গজ্ গজ্ করিতেছেন, "আমি ভেউ ভেউ না করলে আমার তেলের খোরায় কেউ এক পলা তেল এনে রাখে না। তেল বিনে আজ আমার ডুব দিতে বেলা হ'ল। ছিন্নি বাটুনে গিন্নি হুকুম দিবে, 'তোরা ওরে তেল দিসনে, আতেলে নেয়ে আপদটা মাথা ঘুরে মরুক।' ওর শয়তানি বুদ্ধি আমি যেন টের পাইনে। 'ও হাঁটে ডালে ডালে আমি হাঁটি পাতায় পাতায়'। ওলো, সকলের সকল দিন সমান যায় না। দিনের পিছে দিন আসে—'যত দুঃখ দিলি তুই, রইলো আমার মনে, এই দিন নিয়ে যাব সেই দিনের সনে'।"

বিন্নু শাশুড়ীর পাছে উপস্থিত ছিল। তিনি বলিলেন, "কুলুঙ্গিতে ভাঁড়ে সরষের তেল রয়েছে, খানিকটা তেল ওঁর বাটিতে ঢেলে দিয়ে এসো বৌমা। এখন থেকে তুমি বাতাসার কৌটা, তেলের বাটি, জলের ঘটি রোজ দেখে রেখো। কোন ত্রুটি হ'লে আমার মাথায় পড়বে ধান-দুর্ব্বো। ষষ্ঠীর সকাল হ'তে না হ'তে যে শুভযাত্রা সুরু হয়ে গেল, বিজয়া অবধি এর জের না গেলেই বাঁচি।"

বিন্নু ঠাকুমাকে তেল দিতে গেলে তিনি ধরলেন ভিন্ন মূর্ত্তি। রাগ নাই, বিরক্তি নাই। এক গাল হাসিয়া কহিলেন, "তেল দিতে এইচিস, মণিবালা? এই খোরায় ঢেলে দে। আমি তোরে আশীর্ব্বাদ করি—মাথার ব্রহ্ম চাঁদিতে তেল দিলে যেমন ঠাণ্ডা হয়, তুই সারা জনম অমনি ঠাণ্ডা হয়ে থাকিস্। আজ যে রোদ্দুর চোখে লাগার আগে ঘুম ভাঙ্গলো তোর? পেসাদ তুলে দিইছে, আমি যেন জানি না, "বৃন্দাবনে নাবিক হ'য়ে করেছিলে পার, আমরা আবার কোন্ কথা না জানি তোমার'?"

বিন্নুর তখন দাঁড়াইবার সময় ছিল না। মনোরমা স্নান করিতে গিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া হাতে হাতে কাজ করিতে প্রসাদ উপদেশ দিয়াছে। এখনি সে চালক বিহীন গো-শকটের ন্যায় অপথে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। তাহার কবরী-বদ্ধ চুল খোলার উপদ্রব ছিল না। ঝুঁটি আকারে ছড়ানো রুক্ষ চুলে এক থাবলা তেল চাপড়াইয়া সে তৎক্ষণাৎ শাশুড়ীর অনুসরণ করিল।

বেলা হইতে না হইতে চণ্ডীর ঘট বসার সময় হইল। পুরোহিত গৌর বর্ণের উপরে সাদা গরদের যোড় পরিয়া দেখা দিলেন। সরস্বতী মণ্ডপে কুশাসন পাতিয়া গঙ্গাজল, কোশাকুশী সাজাইয়া পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। সজ নৈবেদ্য জলপানি গোছাইয়া মনোরমা বিন্নুর হাতে দিয়া মণ্ডপে উপনীত হইলেন।

বিন্নুর প্রথম দর্শন হইল রায়বাড়ীর দুর্গাপ্রতিমা। সে সাগ্রহে দেখিতে লাগিল দুর্গা আকারে ভানুমতীর সমান, লক্ষ্মী-সরস্বতী মধুমতীর ন্যায়। কার্ত্তিক-গণেশ প্রায় তরুর মতন। রাংতার সজ্জায় প্রতিমা ঝলমল্ করিতেছে।

তাহাদের পাথরকুচির প্রতিমা এত বড় না হইলেও তাহাদের মুখশ্রী যেন আরও সুন্দর; আরও হাসিমাখা। হঠাৎ বিনুর স্মরণ হইল দেবতার সহিত মানবের উপমা দিতে নাই। তাহাতে অপরাধ হইয়া থাকে। সে জিব্ কাটিয়া মনে মনে ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়া করজোড়ে প্রণাম করিল।

মণ্ডপের সামনে প্রশস্ত বারান্দা, বারান্দায় যাইবার প্রকাণ্ড সারি সারি দরজা। তিন দেয়ালে লম্বা লম্বা বাঁশের 'আরা' বাঁধা, আরায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে কাঁদি-কাঁদি কলা, নারিকেল, আখ। উহার ফাঁকে ফাঁকে পঁচিশটা রচনার হাঁড়ি ঝুলিবে। রচনা মানে ছোট ছোট মাটির হাঁড়িতে নিয়মের খই, মুড়কি, মুড়ি, চিড়া ও মোয়া, তাহার উপরে তিলের নাড়ু, বাতাসা ভরিয়া ছোট ছোট সরায় মুখ ঢাকিয়া দড়ি দিয়া চারিদিকে ঝুলান হইবে। এগুলি পাইবে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, বাজকর, ছুতার, ভুঁইমালি, গঙ্গাবহনের ও বেলপাতা-পদ্মফুলসংগ্রহকারীরা। ইহা ছাড়া তিনদিনের পূজার মাটির থালির বড় আমানী ও জলপানি ধুতি-চাদর তাহাদের প্রাপ্য। ইহা ভিন্ন দুইটা বড় মাটির হাঁড়ি বোঝাই হয় অনুরূপ দ্রব্যে। তাহার একটা পান পুরোহিত, অন্যটা দেউড়ি (প্রতিমা গঠনকারী)। নারিকেল, আখ ও কলা রচনার সঙ্গে সকলকে বন্টন করিয়া দিতে হয়। সিধাও পায় সকলে প্রচুরতম।

মণ্ডপ হইতে ফিরিয়া বিনু দেখিল নিকোনো তক্তকে আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে মাটির হাঁড়ি-কলসী, সরা, ধূপদান ও ধুনুচি, প্রদীপে। কুমোরদের নৌকা হইতে চাকররা ঝাঁকা ভরিয়া ভরিয়া আনিয়া নামাইতেছে। সরকার খাতা খুলিয়া মাটির পাত্রের হিসাব মিলাইয়া লইতেছে।

চণ্ডীপূজার যোগাড় দিয়া মনোরমা রচনা সাজাইতে বসিলেন। অভুক্ত অবস্থায় রচনা ভরিতে হয়। মেঝে জুড়িয়া উপরের তক্তা হইতে নানা আকারের হাঁড়ি-কলসী নামান হইল। প্রসাদ ব্রাহ্মণ ও জ্যেষ্ঠ, সমস্ত কাজের ভার তাহার। ক্ষিতি বিনুর সমবয়স্ক। গত বছর তাহার উপনয়ন ও হইয়া গিয়াছে। গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। দই ক্ষীর মিষ্টান্ন আনা হইয়াছিল ভারে ভারে। খাদা উনুনে রান্না চড়িয়াছিল গ্রামের যাবতীয় লোকের নিমিত্ত। মাছ আনা হইয়াছিল ছোট-খাট পাহাড়ের অনুরূপ। পুরোহিতরা অনুষ্ঠানে বসিয়াছেন। ক্ষিতি পিসির কোলে বসিয়া কেশ ছেদন করিতেছে। উলুধ্বনির সহিত ঢোল কাঁসি সানাই বাজিতেছে। এমন সময় গুরুগুরু করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। ঝরঝর্ শব্দে বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল। ক্ষিতির পৈতা বন্ধ হইয়া গেল। মেঘ ডাকিলে, বৃষ্টি পড়িলে পৈতা পণ্ড—তাহাই নিয়ম ছিল। গ্রামবাসীরা ভোজনে পরিতৃপ্ত হইল। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা হইতে কেহই বঞ্চিত হইল না। আধখানা মাথা কামানো ক্ষিতি লজ্জায় লুকাইয়া রহিল দ্বিতলে। সেই জন্য ক্ষিতি এখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে নাই। এবার শীতের সময় হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রসাদ স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া উঁচু টুলে উঠিয়া সারি সারি হাঁড়ি ঝুলাইতে লাগিল। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ছেলেরা আসিয়া যোগ দিল প্রসাদের সঙ্গে।

গোছানো কাজে সরস্বতীর জোড়া নাই। গত রাত্রে সকলে গান শুনিতে মত্ত হইয়াছিল, সেই সময় সে নিভৃতে অনেক কাজ সারিয়া রাখিয়াছে। বরণডালা, মহাস্নানের "বাইসকাণ্ডী", নৈবেদ্যের চিনির মঠ ইত্যাদি গোছাইয়া রাখা হইয়াছে।

এদিকের ব্যাপার হাল্কা হইলে মহেশবাবু স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তাঁহার শয়ন-গৃহে। কলিকাতা হইতে আনিত জামা কাপড়, পোশাক গতকাল দেখাইবার সুযোগ হয় নাই। আগামী কাল পূজার প্রথম দিনে সমস্ত কাপড়-জামা বিলি করিয়া দিতে হইবে। পাবনা জেলায় ষষ্ঠীতে নূতন কাপড় না পরিয়া সপ্তমীতে সকলে নূতন কাপড় পরিধান করিত। দুর্গাপূজার প্রধান দায় কাপড়।

কর্তার শয়ন-গৃহে লম্বা বেঞ্চি পাতিয়া তাহার উপরে দোকানের ন্যায় থাক দিয়া নূতন কাপড়ের বস্তা রক্ষিত হইয়াছে। কোন বেঞ্চিতে রাখা হইয়াছে চাদর ও শাড়ী। তখন পল্লীগ্রাম ধুতিচাদরের মান রক্ষা করিয়াছে। যে সমস্ত শাড়ী জামা-পোশাক বন্দরে পাওয়া যায় না, তাহা আনিয়াছে প্রসাদ কলিকাতা হইতে। দুই জামাতার জন্য আসিয়াছে জড়ি-পাড় শান্তিপুরী ধুতি-উড়ুনী, দুই ছেলেরও তাহাই, সুমন্তের শুধু জড়ির কাজ করা সাটিনের পোশাক। জামাতা ও ছেলেদের ধুতি-চাদরের সঙ্গে গরদের পাঞ্জাবী। তিন কন্যা ও বধূর জন্য আনা হইয়াছে ঘন নীল রং-এর রেশমের বোম্বাই শাড়ী। তাহার পাড় হলুদ রং-এর। বুটিদার ঢাকাই ও শান্তিপুরী কল্কাপেড়ে শাড়ী। পোশাকী

শাড়ীর সহিত সকলেরই জন্যে আনা হইয়াছে মিহি সূতার কলের শাড়ী এক জোড়া করিয়া। পাড়ে গান-লেখা শাড়ী এবার উঠিয়াছে। পাড়ের দুই পাশে টানার ভিতরে লেখা,

"যমুনা পুলিনে ব'সে কাঁদে রাধা বিনোদিনী,
বিনে সেই বাঁকা শ্যাম, বাঁকা শশী গুনমণি।
শুখাল কমল মালা বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা, বিনে শ্যাম গুণমণি।"

সেই শাড়ী বধূ ও কন্যাদের জন্য জোড়ায় জোড়ায় আনা হইয়াছে। দুই ঠাকুমার মটকার থান, সরস্বতীর চুলপেড়ে গরদ।

রায়বাড়ীর নিয়ম লাল কস্তাপাড় নূতন শাড়ী পরিধান করিয়া দুর্গাপূজার ভোগ রান্না করিতে হয়। এ শাড়ীগুলি অতিরিক্ত ভোগ রন্ধনকারিণীরাই পাইয়া থাকে।

সকলের শাড়ী স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিয়া মহেশবাবু একটা শাড়ীর বাক্স খুলিয়া বলিলেন, "এইটে হ'ল তোমার পূজোর শাড়ী, আর ওই গঙ্গা-যমুনা পাড়ের সুজানগরের জোড়া। বুটি ছাড়া ঢাকাইখানা।"

মনোরমা সবিস্ময়ে শাড়ীর বাক্স খুলিলেন। বাক্স হইতে আত্মপ্রকাশ করিল গাঢ় নীল রং-এর মূল্যবান্ বেনারসী। তাহার সর্ব্বাঙ্গে জড়ির বুটি ও চটক্‌দার আঁচলা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

মনোরমা সচমকে কহিলেন, "এ দিয়ে আমি কি ক'রব? এত বয়সে বৌ-ঝিদের সামনে এ শাড়ী আমি পড়তে পারব না।"

"বেনারসী ত বেশী বয়সের জন্যই। বিজয়ার দিন তুমি এখানা প'রে প্রতিমা বরণ ক'রো। তোমার অন্য শাড়ীগুলো বড্ড পুরণো হয়ে গেছে।"

"তা হোক্, রেশম-পশমের তোলা শাড়ী, তার আবার নতুন পুরোণো। শাড়ীই যদি আনলে তবে এমন রং-এর কেন?"

"আমার নীল রং পছন্দ, তাই সকলের জন্যেই নীল কেনা হয়েছে। এবারে তোমরা সবাই নীল বসনা হ'য়ো।"

স্বামীর পরিহাসে মনোরমার বাঁকা ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া গেল। মন চলিয়া গেল সুদূর অতীতে, তখন রায়-দম্পতি সংসারের রঙ্গমঞ্চে কর্ত্তা-গৃহিণীর পাঠ লয় নাই। উভয়ের বয়স কাঁচা। জমিদারী-সংক্রান্ত দরবারে মহেশবাবুকে যাইতে হইয়াছিল ঢাকায়।

বিদায়কালে তরুণ মহেশবাবু তরুণী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার জন্যে ঢাকা থেকে কি আনব?"

মনোরমা উত্তর দিয়াছিলেন "ঢাকাই নীলাম্বরী।"

মহেশবাবু হাসিয়াছিলেন, "নীলাম্বরী তোমাকে মানাবে না। পরলে লোকে হাসবে।"

এক নীলাম্বরী শাড়ীর পরিবর্ত্তে তিনি ঢাকা হইতে স্ত্রীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত আনিয়াছিলেন, চাঁপার রং-এর জংলা শাড়ী, সাদার উপরে লাল বুটিদার শাড়ী, আর গলার গোপহার, কানের চৌদানী।

সেকালের গ্রাম্য জমিদার বা সর্ব্বসাধারণ লোকের পাথরের গহনার মূল্য দিত না। তখন গিনি সোনার প্রচলন হয় নাই। তাহারা বুঝিত, হরিদ্রা বর্ণের পাকা সোনা।

নীলাম্বরীর পরিবর্ত্তে এত প্রাপ্তিতেও সেদিন মনোরমার চিত্তক্ষোভ বিদূরিত হয় নাই। তাঁহার কোমল অন্তরে কাঁটা হইয়া বিঁধিয়া রহিয়াছে, "নীলাম্বরী শাড়ী মানাইবে না। লোকে হাসিবে।" তাহার পরে কতকাল চলিয়া গিয়াছে। কত বর্ষ, মাস অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে; মনোরমার অঙ্গে উঠিয়াছে রং-বে-রং-এর বিচিত্র শাড়ী বালুচরী মেঘডম্বরী, পাটের শাড়ী; কিন্তু তিনি ভ্রমে কখনও নীলাম্বরী পরিধান করেন নাই।

বেনারসী নাম হইলেও আজ জীবনের মধ্যাহ্নে অপ্রত্যাশিত রূপে যাহা তাঁহার করতলগত হইল, ইহাই প্রকৃত নীলাম্বরী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেদিনের সেই সোনার শরত, মধুর বসন্ত গত হইয়াছে। এ অবেলায় সে প্রভাত আর ফিরিয়া আসিবে না।

"আর কেন, আর কেন, দলিত-কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ।"

জীবনের মতন ললিত-বিভাস থামিয়া গিয়াছে, এখন জাগিয়া আছে ভৈরবীর তান।

মনোরমার চিৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, "এত নীল-প্রীতি এতকাল তোমার কোথায় ছিল? যাদের জন্য নীলের সমারোহ করিয়াছ, তাদের সকলেই কি নীল-বসনা হইবার উপযুক্ত? ইহাদের কে গৌরাঙ্গিনী? যে শ্যামবর্ণের প্রতি তোমাদের ঘৃণা-তাচ্ছিল্যের সীমা ছিল না,

সেই শ্যামলাকেই ত নিজে পছন্দ করিয়া গৃহে আনিয়াছ। তখন দোষ হইয়াছিল, এখন দোষ হয় না?"

বুক হইতে কণ্ঠ অবধি যে তিক্ততা ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, মনোরমা কষ্টে তাহা দমন করিলেন। পূজা-বাড়ী। ছেলেমেয়ে, বউ-জামাতা, দাস-দাসী চতুর্দ্দিকে গমগম্ করিতেছে। কথা কহিলে কি উত্তর শুনিতে হইবে তাহা কে জানে? তিনি বাংলা দেশের মেয়ে, যাহাদের বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটাইতে নাই।

ক্রমশঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আমি পূর্বেই কিছু লিখেছি। তাঁর বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকের কোন কোন অংশ করুণ রসে পূর্ণ এবং কোন কোন অংশ গম্ভীর, তীব্র, ধিক্কার, ভৎর্সনার জ্বালাময়। বিধবা বিবাহ বিষয়ক তর্কবিতর্কে তাঁর অনাবিল ব্যঙ্গবিদ্রূপ-শ্লেষের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল যে প্রসিদ্ধ দার্শনিক লেখক ছিলেন তা নয়। তাঁর "স্বপ্নপ্রয়াণ" উৎকৃষ্ট কাব্য। তাঁর গুম্ফহরণ Pope-এর Rape of the Lockএর চেয়ে নিম্নস্তরের নয়। তাঁর অন্যান্য হাস্যোদ্দীপক কবিতাও আছে। তিনি বাংলা রেখাক্ষর লিপির (shorthand এর) অন্যতম উদ্ভাবক। হিন্দুমেলায় তাঁর গান—

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রিদিন বহিছে লোচন বারি"—

গীত হত।

—১৫, ১০, ১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।

অপরদিকে পুরুষোচিত হৃদয় বলের, সরলতার সহিত দৃঢ়তার, প্রকৃত মনুষ্যত্বের, ত্যাগ, শক্তি, যন্ত্রণা সহিবার বল, অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার প্রেরণা তাঁহার লেখনী হইতে বাঙালী সমাজের প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়াছিল। এই জিনিষটির তখন বড় অভাব ছিল। কারণ, তখন বাংলার জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বলিয়া একটা জিনিষ ছিল না। হেম ও বঙ্কিমের আহ্বান 'ভারতসঙ্গীত' ও 'বন্দেমাতরম্', স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষণিক প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। অবসাদ ও অবহেলায় সেই প্লাবনে ভাঁটা আসে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাতির হৃদয়ে শক্তি ও বল।

—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে সভাপতি
স্যার যদুনাথ সরকার।

গীতিসুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বলেছি—দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন আমাদের ওস্তাদী গানের অনুরাগী ছিলেন তেমনি অনুরাগী ছিলেন বিদেশী গানের। তিনি "ইংরেজী ও হিন্দু সঙ্গীত" নামে একটি নিবন্ধে এক স্থানে লিখেছেন যে, আমাদের "রাগ-রাগিণীগুলি যেন একটি আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকে···সে আশ্রয় বিচ্যুত হইতে চাহে না। ইংরেজী সঙ্গীতে প্রতি গানের সুর নিরাশ্রয়।··· তাহারা কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি হইতে উঠে না, বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে শেষ হয় না।···ধূমকেতুর মত কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই।" লিখে রাগ-সঙ্গীতের একটি বড় সুন্দর উপমা দিয়েছেন ইংরেজী সঙ্গীতের পাশাপাশি।

লিখেছেন যে, হিন্দু সঙ্গীতে "আগে যেন একটা স্বরের সমুদ্র রচনা করিয়া লইতে হয়, রাগরাগিণীগুলি যেন সেই সমুদ্রের বক্ষে ঊর্মিমালার ন্যায়—তাহা হইতেই উঠে, তাহাতেই মিলাইয়া যায়।" পক্ষান্তরে বিলিতি গানের সুরগুলি "যেন হাউয়ের মত একেবারে উর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যায় এবং সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যমার্গেই নিভিয়া যায়।"

এ উদ্ধৃতিটি মূল্যবান্ আরও ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাশাপাশি ঊর্মিমালার উপমার জন্যে। আমাদের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ যেন সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, গভীরতা, প্রশান্তি। সে জলতরঙ্গে উচ্ছল গতিও হয়ত পাই কোন কোন বলিষ্ঠ রাগে—যথা, ভূপালী, মালকোষ, হিন্দোল, দুর্গা। কিন্তু তাতে নেই এই "অগ্নিস্ফুলিঙ্গ"-ঝিলিক। দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সঙ্গীত থেকে আহরণ করেছিলেন এই দীপ্তির জৌলুষ ওরফে প্রাণশক্তি—সংস্কৃত পরিভাষায় যার নাম ওজস্। আমার মনে হয় যাঁরাই আমাদের ইদানীন্তন সুরকারদের সুর মন দিয়ে শুনেছেন তাঁদেরই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেছে দ্বিজেন্দ্রলালের সুরকারুর ওজঃসম্পদ যা তাঁর কাব্য-সম্পদের সঙ্গে জুড়ি হাঁকিয়েছে তাঁর সব বলিষ্ঠ গানেই, যথা:

ভূতনাথভব ভীম বিভোলা, বঙ্গ আমার ভারত আমার, সেথা গিয়াছেন তিনি, মেবার পাহাড়, ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, ঘন তমসাবৃত প্রভৃতি।

এই ওজঃশক্তি তাঁর অন্যগানেরও তল্পি বয়েছে কিন্তু খানিকটা ছদ্মবেশেই বলব, অর্থাৎ আমাদের বাউল কীর্তন রাগসঙ্গীতকে মেনেও তাঁর ওজস্বিনী প্রতিভা এনেছে অপর্যাপ্ত আবেগের পুরুষালি উদ্দীপনা। যথা, তাঁর প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, (জয়জয়ন্তী) পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে (ভৈরবী), মহাসিন্ধুর ওপার থেকে (দেশ), গালভরা মা ডাকে (বাউল), ওকে গান গেয়ে চ'লে যায় (কীর্তন), কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি (ধ্রুপদী আশাবরী চৌতাল), যাও হে সুখ পাও (ইমন কল্যাণ তেওরা)···আরও কত প্রাণস্পর্শী গানেই না স্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর আশ্চর্য অঘটনঘটন-পটীয়সী পৌরুষদীপ্তি! এক এক ক'রে এ সব গানের উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধের কায়াবিস্তার করার প্রয়োজন নেই। কেবল এই সূত্রে একটি কথা না ব'লে থাকতে পারছি না যে, তিনি তাঁর নানা স্বদেশী গানে করুণ রাগের সুরের মধ্যে দিয়েও বিকীর্ণ করেছেন ঐ বৈদেশিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যথা "সেথা গিয়াছেন তিনি"—ইমনে, বা "বঙ্গ আমার"—কল্যাণে, বা "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে" ভূপালী রাগে। আমাদের রাগে বলিষ্ঠতার আভাস আদৌ নেই বলি না—শঙ্করা, সিন্ধুড়া, সোহিনী ও আরও কয়েকটি রাগে আবেগের প্রবলতা নিজেকে জানান দিতে পারে। কিন্তু আমাদের রাগসঙ্গীতের প্রধান কৃতিত্ব—শান্তি, কারুণ্য, স্বপ্নাবেশ, প্রীতি, ভক্তির সাত্ত্বিক রস। তাই নিবিড়তা ওরফে intensity-রূপ রাজসিক ভাবকে পাশ কাটিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত (রাগালাপ, কীর্তন ও বাউল) চেয়েছে গভীরতা ওরফে depth-কে নিয়েই ঘর করতে। এই-ই ছিল আমাদের সঙ্গীতকারদের জানা পথ। দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে বৈদেশিক প্রাণশক্তির নিবিড়তার রসদ্যুতি আবাহন ক'রে ভারতীয় আত্মিক সুরের সঙ্গে বৈদেশিকী ওজঃশক্তির সমন্বয়ে এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছিলেন—যার ফলে শুধু যে তাঁর সুরের নানা বৈদেশিকী চলাফেরাকে অচেনা মনে হয় না তাই নয়, বিদেশীরাও তাঁর সুর শুনে বলতে বাধ্য হয়: "এ কী! এসব অচিন সুরও যে আমাদের কণ্ঠে সহজেই বসে!" এ-অত্যুক্তি নয়, আমি এদেশে ওদেশে নানা বিদেশীকেই তাঁর গান শিখিয়ে তাদের মনে চমক জাগিয়েছি। একটি মাত্র উদাহরণ দেই ১৯৫৩ সালে সানফ্রান্সিস্কোয় এশিয়ান

আকাদেমিতে রীতিমত গান শেখাতাম আমেরিকান ও আরও নানা জাতের ছাত্রছাত্রীকে। তারা তাঁর ধনধান্য পুষ্পেভরা গানটি গাইতে গাইতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। বলত: "কী সুন্দর সুর!" তাঁর "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" গানটি বাংলায় গেয়ে জর্মন ভাষায় গেয়েছি জর্মনিতেও উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছি গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্মন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। এ-কৃতিত্বের গৌরব আমার প্রাপ্য নয়—প্রাপ্য তাঁর, যিনি এ-সুর রচনা করেছিলেন ভারতীয় আত্মিক শক্তির সঙ্গে য়ুরোপীয় প্রাণশক্তির সমাহারে। তাই একথা বললে একটুও বেশি বলা হবে না যে, তাঁর ছিল সেই শ্রেণীর দুঃসাহসী প্রতিভা—যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে: হিন্দু সঙ্গীতের বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেমাবেশ ও শান্তির সঙ্গে মেলাতে পারে বিলিতি সঙ্গীতের প্রাণচাঞ্চল্য, ওজস্, আত্মবিশ্বাস ও গতিবেগ। তাই তাঁর গানে পদে পদে পাই ওদেশের উচ্ছলতার সঙ্গে আমাদের দেশের আত্মসমাহিতি।

একথা প্রমাণ করতে বহু উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু তা হ'লে প্রবন্ধের কায়া বিপুল হয়ে উঠবে। তাই শুধু দু'টি উদাহরণ দিয়েই ইতি করব।

ইংরাজিতে গতিশক্তিকে বলে movement; ওরা সেই সব গানই বেশি ভালবাসে যাদের মধ্যে movement বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। সুর বাজল এই এখানে—ঐ টপ্‌কে গেল পাঁচ-সাতটা সুর ডিঙিয়ে ওখানে! Movement-এর একটি প্রধান প্রকাশ এই উল্লম্ফনে বা লাফালাফিতে। আমাদের রাগসঙ্গীতে কোন বড় গুণীর আলাপ একটু শুনলেই দেখা যায় আমরা কি ভাবে রাগের বিস্তার করি: একটু একটু ক'রে সা রে গা, ফিরে এল রে গা পা, ফিরে এল রে সা। ক্রমশঃ এক এক পর্দা ক'রে ধীরে ধীরে উঠে অবশেষে আস্থায়ী পৌঁছয় অন্তরার প্রথম ধাপে—অর্থাৎ চড়া সা-তে। ওদের দেশের শ্রোতারা আমাদের এই ধীরগতি শুনতে পারে না বেশিক্ষণ। কান ওদের তেমন সূক্ষ্মশ্রুতি নয় ত, পারবে কোত্থেকে? বুঝবে কেমন ক'রে কত সূক্ষ্ম সুরকারুকৃতি আমাদের রাগসঙ্গীতে মর্যাদা পেয়েছে কি অশান্ত সুরের মিড়ের গমকের সুর-বিহারের (improvisation) তানাদির সাধনায়!

ওরা বলবে: দূর হোক্ গে, এস লাফিয়ে লাফিয়ে চলি। এই গাইছি মুদারার গা তো?—হু—শ্! দেখ, গলা পৌঁছল এক লাফে তারার রে-তে! এই গাইছি তারার গান্ধার, নেমে এলাম মুদারার ঋষভে। এরি নাম movement, স্বরগ্রামের বিস্তার (range) কথায় কথায়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই movement ভালবাসতেন এর মধ্যে প্রাণশক্তির চমক্ পেতেন ব'লে। তাই তাঁর নানা স্বদেশী গানেই তিনি এনেছিলেন এই সুরের টপ্‌কে টপ্‌কে চলা। যথা, সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির গানে শি—র এক লাফে মুদারার গা থেকে লাফ দিয়ে পৌঁছল তারা-র গা-তে। তেমনি সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি-তে জ—ন্ প্রথম বার মুদারার মা থেকে লাফ দিয়ে পৌঁছল ছটা সুর ডিঙিয়ে তারার রে-তে, দ্বিতীয় সে যে আমার জন্মভূমি-র জন্ম গাওয়া হ'ল মুদারার কোমল নি তে, কিন্তু তারপরেই ভূমি—মাটি ছিল রেখাবে ফিরে পাঁচটা পর্দা এক লাফে নেমে। আর এ বৈদেশিকী গতিলীলা তিনি শুধু যে তাঁর স্বদেশী গানেই প্রবর্তন করেছেন তা নয়—তাঁর অন্য অনেক গানেও এ-চাল পরিস্ফুট হয়েছে। অথচ মজা এই যে, শুনলে একবারও মনে হয় না শ্রুতিকটু কি জোর ক'রে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা।

আমি বলছি না একথা যে, আমাদের সব সঙ্গীতেই এ-গতিলীলার প্রবর্তন কাম্য বা শোভন। তবে কোথায় কোন্ চাল শোভন আর কোথায় অশোভন তার কোন বাঁধাধরা সূত্র নেই ব'লেই প্রতিভাধরের কাছে দিশা চাইতে হয় পথ চিনতে—কোন্ পথে চললে পদযাত্রার আনন্দ বাড়বে আর কোন্ পথে চললে খানায় প'ড়ে পা ভাঙবে।

আমাদের রাগসঙ্গীত সুরের বিকাশে মহিমময়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই যখন বিদেশীরা বলে এ-সঙ্গীত বড় বেশি plaintive বা কান্নাভরা, তখন তাদের পিঠ পিঠ বলা বলে: আমাদের রাগসঙ্গীতের গভীরতার মর্ম বুঝতে হ'লে সব আগে চাই অন্তঃশ্রুতির বিকাশ, নৈলে বোঝা যায় না যে আমাদের কারুণ্য কান্না নয়—সে পড়ে "unheard melody"-র পর্যায়েই—আমাদের বেহাগ'-বসন্ত পূরবী, সিন্ধু, কানাড়া, বাগেশ্রী আর কত গভীর গম্ভীর উদাস-মধুর প্রাণকাড়া রাগে।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথা না মানলে সত্যের অপলাপ হবে যে, আমাদের রাগসঙ্গীতে বীররস তেমন প্রাধান্য পায় নি, যেমন পেয়েছে শান্তরস। দ্বিজেন্দ্রলালই স্বদেশীযুগে প্রথম বীররসকে আবাহন করেন রাগসঙ্গীতের রাগভঙ্গ না ক'রে। তাই তাঁকে উপাধি দিতে হয় বীররসের ভগীরথ, যাঁর প্রতিভার প্রসাদে আমাদের গানে ও সুরে নামল বৈদেশিক ওজসের ধারা—রাগসঙ্গীতের যাদুতে ভাগীরথী হয়ে।

তাঁর গান ও সুরের সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলবার আছে—যা বলবার মতন। কেবল মুশকিল এই যে, গানের আলোচনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ব'লে বোঝানো—explanation—নয়, এতে ক্লান্তি আসে। চাই গেয়ে শোনানো demon-

stration, তাই তাঁর গান ও সুরের সম্পর্কে আর দু'একটি কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব'লেই এ পত্রের সমাপ্তি টানব।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে কবিশক্তির উন্মেষ হয়েছিল শৈশবেই। পরে প্রৌঢ় বয়সে তাঁর কবিপ্রতিভা ধীরে ধীরে নাটকের মধ্যে দিয়ে যেন নিজেকে নতুন ক'রেই খুঁজে পেয়েছিল রকমারি নাট্যসঙ্গীতে। তাঁর ইচ্ছা ছিল অপেরা রচনা করার। তাঁর "সোরাব-রুস্তম" নাটিকায় তিনি প্রথম এ-পরীক্ষায় আংশিক সাফল্যলাভ করার পরেই যদি তাঁকে কাল আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে না গেলে—ভারতীয় নাট্যকলা আজ বহুসমৃদ্ধ হ'য়ে উঠত নাট্যসঙ্গীতের এক নব-বিকাশে, যার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন বিদেশী সঙ্গীত থেকে। একথা মনে করার প্রধান কারণ—তাঁর নানা কোরাস গান রচনার পদ্ধতি বৈদিকযুগে আমাদের নানা মন্ত্র ও সূক্ত বহুকণ্ঠে গীত হ'ত—সামগানেরও উল্লেখ পাই নানা গ্রন্থে। কিন্তু তবু বলব—আমাদের রাগসঙ্গীত মূলতঃ একক সঙ্গীতই বটে, বহুর স্থান নেই তাতে। বস্তুতঃ, আমাদের জাতীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য বরাবরই চ'লে এসেছে একলার পথে—বহুর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে আমরা বেগ পাই। তাই organisation-এর কৃতিত্বে আমরা বিদেশকে একটু-আধটু অনুকরণ করতে শিখলেও ওদের বিরাট্ সংগঠন-নৈপুণ্যের তুলনায় আমরা এখনো নাবালকই বলব। আমাদের জাতীয় জীবনের নানা বিভাগে বড় বড় সঙ্ঘ গ'ড়ে তুলতে হ'লে আমাদের দীক্ষা নেওয়া দরকার পাশ্চাত্ত্যের কাছে—একথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একথা প্রতি সঙ্গীত-কারেরই মনে হয় ওদেশে যেতে না যেতে। আমাদের দেশে হাল-আমলে যে একতান বাদ্য—অর্কেস্ট্রার—সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলেও আছে বিদেশের প্রেরণা। অবশ্য এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গীতে হার্মনির কোন বিশিষ্ট বিকাশ হয় নি—ভবিষ্যতে হবে কি না জোর ক'রে বলা কঠিন। কিন্তু একটা নব বিকাশ এখনই হ'তে পারে: সমস্বরে (in unison) কোরাস গানের প্রবর্তনে। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল চেয়েছিলেন আমাদের রাগসঙ্গীতের স্বকীয়তাকে বজায় রেখে এই কোরাস গীতভঙ্গির আমদানী করতে আমাদের নানা গানে—বিশেষ ক'রে নাট্যসঙ্গীতে। এই নব সৃষ্টির ফল তিনি প্রথম পরীক্ষা করেন তাঁর হাসির গানে নানা নতুন সুরে কোরাস-ধুয়া এনে—যথা, সাধে কি বাবা বলি, গীতার মত নাই ত শাস্ত্র, ছেড়ে দিলাম পথটা···ইত্যাদি। পরে যখন দেখলেন এ-পদ্ধতিতে গাইলে শ্রোতারা সহজেই সাড়া দেয় তখন সুরু করলেন এই গীতরীতি: 'বঙ্গ আমার জননী আমার, ধনধান্য পুষ্প ভরা, আজি গো তোমার চরণে জননী, যখন সঘন গগন গরজে, আজি এসেছি এসেছি, যদি এসেছ এসেছ···প্রমুখ বহু নাট্য-সঙ্গীতে চালু করতে। এই নূতন সৃষ্টির কাজে তাঁর দ্রুত সাফল্য দেখে অন্য অনেক নাট্যকারও চেয়েছিলেন তাঁদের নাটকে এই ধরনের একতান গীতের প্রবর্তন করতে। কিন্তু এক আলিবাবার সস্তা সুরের কোরাসের আংশিক সাফল্য ছাড়া আর কোথাও কোন নাটকে কোরাস গান রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠতে পারত কিন্তু তাঁর নাটক তিনি ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ে এত চমৎকার জমিয়ে তুলতেন যে, তার পরে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আদৌ জমত না। এক "চিরকুমার সভা" ছাড়া তাঁর কোনও নাটকই বাঙালী-শ্রোতা গ্রহণ করে নি মনে-প্রাণে—দু'চার জন অনুশীলিত শ্রোতা ছাড়া।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল দেখতে দেখতে আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তাঁর নাটকের নানা কোরাস গানের প্রসাদে—যে জন্যে তাঁকে কেউ কেউ আজো "চারণ কবি" অভিধা দিয়ে থাকেন। আমি আজ পর্যন্ত এ-অদ্ভুত অভিধাটির তাৎপর্য খুঁজে পাই নি। কারণ কবি যদি কবি না হন তবে চারণ কবি কাণামামাও থাকেন না, হয়ে দাঁড়ান—নেই মামা। তবে হয়ত "চারণ কবি" বলতে এ চারণ পূজারীর দল মান দিতে চেয়েছিলেন তাঁকে দেশভক্ত সঙ্গীতকার ব'লে। কিন্তু মুশ্কিল কি জানেন? মুশ্কিল এই যে, দেশভক্তিই বলুন আর ভগবদ্ভক্তিই বলুন কাব্যে বা গানে সে উদ্দীপক হ'য়ে ওঠে তখনই যখন সে কাব্যে কাব্যরস ও গানে যুগপৎ গীত ও সুরের রস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। এর মামুলি দৃষ্টান্ত কে না জানে? ভালবাসতে পারে অনেকেই। কিন্তু যারাই ভালবাসতে পারে তারাই প্রেমের কবিতা লিখতে পারে না। বস্তুতঃ, যে-কোন গভীর অনুভবকে অপরের মনে-প্রাণে সঞ্চারিত করতে পারার পরম কৌশলের নামই আর্ট বা শিল্প-প্রতিভা। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের গান চারণ-সঙ্গীত ছিল কি না সে বিচার তাঁর গীত ও সুর সৃষ্টির মূল্যায়নে অবান্তর। দেখতে হবে—তাঁর গান বাঁধবার বা কবিতা রচনা করবার সহজ প্রতিভা ছিল কি না। এক কথায়, তিনি স্বভাব-কবি ও গীতি-সুরকার ছিলেন কি না। কারণ এ প্রতিভা নিয়ে যদি তিনি না জন্মাতেন তা হ'লে হাজার দেশভক্তি থাকলেও লিখতে পারতেন না এমন দেশান্তরের গান:

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় রঞ্জিত করি' কাণার তীর
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।

বা স্বদেশ মহিমার প্রাণকাড়া গান:

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি

আরও পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'লে বলা যায়: তাঁর গীতিপ্রতিভা ও স্বরপ্রতিভা ছিল ব'লেই তিনি প্রথম শ্রেণীর স্বদেশী গান, হাসির গান, প্রেমের গান, ভক্তির গান ও আরো নানা সুরের গান রচনা করতে পেরেছিলেন অবলীলাক্রমে। তাই তাঁর গান বা সুরের মূল্যায়নে এ-বিচার অবান্তর, তিনি "চারণ-কবি" ছিলেন কি না। দেখতে হবে তাঁর কবি-প্রাণের নানা অভীপ্সা ফুলের মতনই সহজিয়া ছন্দে ফুটে উঠেছিল কি না রসতরুর নিখুঁত আলোপদ্ম হয়ে।

কিন্তু পত্র-নিবন্ধ শনৈঃ শনৈঃ অতিকায় হ'তে চলেছে। তাই রাশ টানতেই হবে। বলব শুধু আর একটি কথা।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম মনোহর হয়ে উঠেছে এ হ'ল তাঁর গানের মাত্র একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর সব রসোত্তীর্ণ গানেই আরো অনেকগুলি রসের স্ফুরণ লক্ষ্যণীয়। এ-স্ফুরণের প্রভা বিচিত্র। তিনি আবাল্য শুধু যে গান বেঁধেছেন তাই নয়, গেয়ে আনন্দ পেয়েছেন ও বহু শ্রোতাকে আনন্দ পরিবেশন ক'রে এসেছেন—প্রথমে তাঁর অপূর্ব স্বদেশী ও হাসির গানে তার পরে প্রকৃতির ও প্রেমের গানে, সব শেষে তাঁর ভক্তির ও স্তবের গানে। তিনি এমন অনেক প্রেমের গান লিখেছেন যা শুধু মর্মস্পর্শী নয়, যার মধ্যে প্রেমের বেদনার আলো কবিত্বের মেঘে আনন্দের ইন্দ্রধনু রচনা করেছে। দ্বিজেন্দ্রকাব্য সঞ্চয়নে আমি তাঁর সীরিয়স গানকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছি: পূজা দেশ প্রেম প্রকৃতি ও বিবিধ। এ গানগুলির ছত্রে ছত্রে কবিত্ব ফুটে উঠেছে, কিন্তু সে কবিত্ব আলো হয়ে ওঠে শুধু তখনই, যখন সে ফুটে ওঠে সুরের কাঠামোয়।

তাঁর কবিপ্রতিভার বহুমুখা বিকাশ কি ভাবে হয়েছিল—রকমারি সুরে তালে ছন্দের সমন্বয়ে—তা নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্র দীপালিতে আলোচনা করবেন, তাই আমি আজ শেষে বলব তাঁর কবিশক্তির আর একটি বিকাশের কথা সম্বন্ধে এ নাস্তিক যুগে হয়ত আর কেউই কিছু বলবেন না।

ভাগবত আবির্ভাব হয়ে এসেছে যুগে যুগে অধর্মের অভ্যুত্থানের গর্ব থর্ব করতে। তাঁর লীলা এই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে—আসুরিক দাপাদাপির পরেই নব দৈবী অভ্যুদয়—কুরুক্ষেত্রের বুকেই ধর্মক্ষেত্রের নব স্ফুরণ। তবু মন্ত্রগুপ্তির পথেই ভগবান্ অসুরকে আস্কারা দিয়ে থাকেন—রটিয়েছেন আমাদের নানা পুরাণ ইতিহাস ও মহাকাব্যের প্রণেতা। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে বলেছেন এ মন্ত্রগুপ্তির কথা, লিখেছেন আকাশ-বাণীর উপদেশ: "Speak not my secret name to hostile Time."

কিন্তু হ'লে হবে কি, আমার মন মানা মানে না। কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে ভক্তির যে-বিকাশ আমি চাক্ষুষ করেছি ও তাঁর নানা ভক্তির গান গেয়ে আমার সাধকজীবনে যে প্রত্যক্ষ লাভ করেছি তার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত কিছু ব'লে তাঁকে তাঁর ভক্তি-সঙ্গীতে প্রণামী না দিলে আমি শান্তি পাব না। তবে এ বিষয়ে বলবার অনেক কিছু থাকলেও সাধ্যমত সংক্ষেপেই বলব—সংক্ষেপকথকতা আমার স্বধর্ম না হওয়া সত্ত্বেও।

দ্বিজেন্দ্র-কাব্য সঞ্চয়নের ভূমিকায় চিন্তাশীল সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন যে, ভক্তিবাসের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণে কোন "সহজ স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ ছিল না, বরং যুক্তিবাদের দ্বারা কষিত তাঁর সংশয়ী মনে ইহমুখিনতার টানটাই সমধিক প্রবল ছিল।"

আমার মনে হয় এ ধরনের বিচার বড় হাল্কা বিচার—যাকে ইংরেজিতে বলে Superficial। বহুদিন আগে গ্যেটে এ মহাসত্যটির উল্লেখ করেছিলেন যে, মানুষ যত উচ্চ-বিকশিত হয় ততই তার মধ্যে আত্মবিরোধ Self Contradiction বাড়ে। সমর্সেট মমও শুধু ব'লেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর নানা গল্পে দেখিয়েছেন একটি বিচিত্র সত্য: যে মানুষের চরিত্রে সুসঙ্গতির অভাব পদে পদেই প্রকট হয়—আমি আজ যা ভাবি কাল তার উল্টো পথে চলি, পরশু ফিরে আসি নিজের ঘরে, কিন্তু ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেও ফের হ'তে চাই উধাও বেদুইন। যুগে যুগে বহু মহাজনের মধ্যেই দেখা গেছে এ সত্যের অনস্বীকার্য এজাহার। বেশি দূরে যাবার দরকার কি? শ্রীঅরবিন্দকেই ধরুন না। তিনি ছিলেন প্রথমে নাস্তিক (একথা তিনি আমাকে স্বহস্তে লিখেছিলেন একাধিক পত্রে) পরে হলেন অজ্ঞেয়বাদী agnostic, পরে একেশ্বরবাদী, পরে বহু দেববাদী গুরুবাদী তথা সর্বাস্তিবাদী। তাই যে-মানুষ বাইরে যুক্তিপ্রিয় সে কেন অন্তরে ভক্তিবাদী হ'তে পারবে না? যে মানুষ নৈষ্কর্ম্যবাদী মায়াবাদী সে শঙ্করাচার্যের মতন অক্লান্ত কর্মী হয় নি কি? বিবেকানন্দ স্বাবলম্বী ও সংশয়ী হয়েও গুরুবাদের কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বলেন নি কি যে তিনি গুরুরই সৃষ্ট মানুষ—গুরুদাস ও গুরুপ্রণাম সম্বল? আমি নিজেই কি কম সংশয়ী ছিলাম, না আজও সব সংশয়কে এড়াতে পেরেছি? কিন্তু তাই ব'লে কি আমি ভগবৎ-কৃপায় অবিশ্বাসী বলবেন? যদি হতাম তা হ'লে আমার জীবন কি এমন পথ নিত যে-পথ আমার সাবেক-কালের বন্ধুদের প্রায় কারুরই অনুমোদিত নয়?

না, এ তর্কের কথা নয়, আমি পদে পদে উপলব্ধি করেছি

যে, নিজেকে চেনার মতন কঠিন কাজ খুব কমই আছে। এ-কথা যদি সত্য হয় তা হ'লে কি ক'রে জোর ক'রে বলব কোন্ মহাজনের স্বধর্ম কি?

না। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বভাবে উদাসী ও স্বধর্মে কবি গীতিকার সুরকার তথাভক্ত প্লাস আরও অনেক কিছু—যার খবর আমরা রাখি না। একথা আমি আমার স্মৃতিচারণে বলেছি নানা সুরেই ফলিয়ে। তাই এখানে শুধু এইটুকু বলব জোর দিয়েই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তরে প্রচ্ছন্নভক্ত ছিলেন। আমি যে দেখেছি পদে পদেই তাঁর কণ্ঠে ভক্তির আবেগ উৎসধারার মতনই উর্দ্ধায়িত হ'তে। কতবারই তাঁর চোখ চিক্ চিক্ ক'রে উঠতে দেখেছি গাইতে গাইতে (লঘুগুরু ছন্দে অপরূপ ভৈরবীতে):

নূপুর শিঞ্জিত নৃত্যবিমোহন কপট চপল চতুরালি।
প্রেমনিমীলিত নয়ন বিলোল কদম্বতলে বনমালী॥

স্মৃতিচারণে লিখেছি বৈষ্ণব সাধকের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন তাঁর গৌরকীর্তন শুনে:

ও কে যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে পথে পথে শুধু
প্রেম যেচে যেচে,
ও কে দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে দেখে যারে
তোরা দেখে যা।

গৌরাঙ্গের এ-দেবমানব-রূপের বর্ণনা এমন প্রাণস্পর্শী ছন্দে সুরে ভাবে—এ কি ভক্ত-কবি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব?

তাঁর মধ্যে আরও কত পৌরাণিকী ভাবধারাই যে উচ্ছল হয়ে উঠত!—যথা ভাগবতী গোপীর অহৈতুকী প্রেম। এ গানটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন যে, গোপীপ্রেমের প্রাণের কথাটি—রাগানুগাপ্রীতির মর্মবাণী—এ যুগে কাউকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি দেখেন নি। গানটির যেমন সুন্দর ভাব, তেমনি সুর:

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালবাসি
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা, তাই ত কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিও হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি
তুমি শুধু চেয়ে দেখ বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।

শেষে অহৈতুকী প্রীতিতে আত্মনিবেদন কি সুন্দর!

ভালবাস নাহি বাস নইক তারও অভিলাষী,
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

এরই নাম গোপীপ্রেম-সমর্থা ভক্তি—যে আত্মনিবেদনের পরম আবেগে ওঠে "প্রেমভক্তি"র তন্ময়তায়—মন্ময়টা কাটিয়ে।

কৃষ্ণ শিব শক্তি—ভারতের ভক্তিবিলাসের এই তিনটি মূলধারাতেই তিনি সাড়া দিতেন। শিবের শুধু নানা নাম বেঁধে লঘুগুরু ছন্দে ধ্রুপদী চালে তাঁর গম্ভীর উদাস ভাব ফুটিয়ে তোলা—এ কি ভক্ত-কবি ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব?

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গ ভৈরব বিষাণ ভীষণ প্রশান্ত শঙ্কর শ্মশানচারী।

এ গানটি ১৯৫৩ সালে আমি বিশ্বভ্রমণে সর্বত্রই গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছি—অল্ডাস হাক্সলি থেকে বার্টরাণ্ড রাসেল পর্যন্ত—"দেশে দেশে চলি উড়ে" দ্রষ্টব্য।

শ্যামা সঙ্গীতেও ভক্তি ভাব কত সহজেই না তাঁর কলকণ্ঠে উচ্ছল হয়ে উঠত:

একবার গালভরা মা ডাকে।
মা ব'লে ডাক মা ব'লে ডাক মা ব'লে ডাক মাকে।
ডাক এমনি ক'রে আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক ভ'রে
(আর) ভায়ে ভায়ে এক হয়ে থাক যেখানে যে থাকে।

কালীর করালীমূর্তির ভাবোচ্ছ্বাস পাই নানা সাধকের গানেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কবিত্ব, উপমা, আবাহন?

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা!
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।···
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা
মুখে হাহা অট্টহাসি অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা

কিন্তু এ রুদ্রাণীর মধ্যে দিয়ে কবি ডাক দিলেন করুণাময়ী শিবানী মা-কে কি মনোহর উপমায়:

আয় মা, এখন তারারূপে, স্মিতমুখে শুভ্রবাসে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে।
তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা! অভয়ে অভয় দে মা॥
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা!

কতদিনই না এ-গান গাইতে গাইতে শুধু যে আমার চোখে জল ভ'রে এসেছে তাই নয়, শ্রোতাদের চোখেও জল ঝরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আর এক আকুতি—জগন্মাতার সর্বব্যাপী রূপকে প্রণাম:

প্রতিমা দিয়ে পূজিব তোমারে এ বিশ্বনিখিল তোমারি
প্রতিমা।
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো? মন্দির যাহার দিগন্ত
নীলিমা!

প্রথমে রূপের তর্পণ বিগ্রহে, তার পর সারা বিশ্বে:

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা দেখি না আপনি দিয়েছ
মা ধরা!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে ডাকিছ নিয়ত
করুণাময়ী মা!

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে ভাবতে—এমন অত্যাধুনিক

বিলাত-ফেরৎ তর্কপ্রিয় তীক্ষ্ণধী মানুষের মনে কেমন ক'রে জেগে উঠল এমন ছবি আকাশগঙ্গার :

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !

নারদকীর্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জটি জটিল জটাপর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারা জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে
নামি ধরায় হিমাচল মূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে !

ভক্তিমান্ মনীষী শ্রীমদনমোহন মালব্য আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই চাইতেন এ-গানটি শুনতে আর বলতেন—শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তোত্র "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ! ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে"র পরে এমন উদাত্ত মধুর প্রাণকাড়া গঙ্গাস্তব আর কেউই লেখে নি আজ পর্যন্ত—প্রত্যেক হিন্দুর এটি গাওয়া চাই।

আরও উদাসীর গানেও ভক্তিরস :

পাগলকে যে পাগল ভাবে
(এখন) সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল একদিন
সেটা বোঝা যাবে।
নিমাই সন্ন্যাসী ছিল প্রেমের পাগল হয়ে শুনি
জ্ঞানের পাগল হয়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি।
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি, পরের জন্য পাগল হরি,
ভাবে পাগল শ্মশানভূমে বেড়ায় ভোলা উদাস ভাবে।

তাঁর শেষ জীবনের শেষ অধ্যায়ের একটি অপরূপ গান তিনি গাইতেন কী তন্ময় হয়ে ভুলব কি কোনদিন ?—

নীল আকাশের অসীম ছেড়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো ?

আলোর সমুদ্র যে উচ্ছল চারদিকে—কেন থাকব ঘরের মধ্যে ছোট প্রদীপ জেলে ? অমনি ডাক বেজে উঠল অসীমার :

সাঙ্গ আমার ধূলা খেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা,
এইছি ক'রে হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
এখন বড় শ্রান্ত আমি, ওমা, কোলে তুলে নে মা,
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো !

এমন পরম নির্বেদ, অসীমার চরণে ঠাঁই চাওয়ার আকুল ডাক কি ভক্ত-কবি ছাড়া আর কারুর গানে এমন ছবিখানি হয়ে ফুটে উঠতে পারে ?

মানুষ সংসারে হাবি-জাবি কত কি-ই না চায় ! দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর উদাসী প্রেরণায় "পাগলকে যে পাগল ভাবে" গানটির প্রথম অন্তরায় লিখেছিলেন :

নয় কে পাগল ভুবন 'পরে ? কেউ বা পাগল মানের তরে
কেউ বা পাগল রূপের লাগি' কেউ বা পাগল ধন লোভে।

কত সত্যি কথা ! আমরা মোহের ফেরে প'ড়ে নিত্যই ছায়াকে বুকে চেপে ধরতে চাই কায়াভ্রমে। এও তা অবান্তর ভোগের উপকরণ বাড়িয়ে আশা-কুহকিনীর কুহুধ্বনির পিছু নিয়ে শেষে নিরাশ হই যখন দেখি সে কথা দিয়ে কথা রাখে না, সুখ দেব ব'লে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু সুখের পরেই দেয় বহু দুঃখ, আসে স্বপ্নভঙ্গ। তখন সে দেখে :

"জীবনটা তো দেখা গেল, শুধুই কেবল কোলাহল···
প'ড়ে আছে অসীম পাথার সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার···
ডুব দিয়ে আজ দেখব নিচে কতখানি গভীর জল।"

কিন্তু এ-সন্ধানের পরে শোনা যায় আর একটি বিচিত্র আহ্বান—জীবনের কোলাহল যাকে ঢাকে সেই অশ্রুত সুর—জগন্মাতার ডাক—কানে ভেসে আসে। সে ডাক যে শুনতে পায় তারই তো নাম ভক্ত—যার কাছে এ-পরম আলোর ডাক শোনার পরে আর সবই হয়ে গেছে পাণ্ডুর অর্থহীন। তাই তখন সে গেয়ে ওঠে সোচ্ছ্বাসে :

"আর কেন মা ডাকছ আমায় ? এই যে এইছি
তোমার কাছে।
আমায় নাও মা কোলে, দাও মা চুমা, এখন
তোমার যত আছে।"

অন্বেষণের পরে সে যে খুঁজে পেয়েছে বিশ্ব-জননীকে, তাই বলে :

"সাঙ্গ হ'ল ধূলাখেলা, হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, শেষে তোমায় হারাই পাছে"

কিন্তু পাওয়ার পথেও এ হারাই-হারাই ভয় জাগে কার মনে ?—শুধু তার, যে জগতের মাকে ভালবেসে সেই প্রেমেরই আলোয় চিনতে পেরেছে নিজের মা ব'লে। কিন্তু না, তার আর ভয় কোথায়—যে পেল অভয়ার বরাভয় ? তাই সব শেষে সে শুধু গায় পরম নির্ভয়ে, গভীর স্নেহে :

"আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।"

সাহিত্যের নির্যাস ফুটে ওঠে কাব্যের রসে, কাব্যের নির্যাস ফুঠে ওঠে গানের গোলাপে, গানের গোলাপের প্রাণ-সৌরভ ফুটে ওঠে সুর ও মধুবাণীর সঙ্গমে, আর সব শেষে এ শুভদৃষ্টির উলুধ্বনি বেজে ওঠে বিন্দুর সঙ্গে সিন্ধুর অন্তিম মিলনবাসরে। যে গানে এই পরম সমাপ্তির আভাস দিতে পারে এমন প্রেমের বাঁশিসুরে তারই ত নাম কবি গুণী তথা অনির্বচনীয়ের পসারী।

চর্যাপদে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

(পূর্বাবৃত্তি)

সহজযানীরা যেভাবে অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ করতে চান, বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য কুক্কুরীপাদের একটি পদে তার সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে।

আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥২॥

সহজযানী সাধক এখানে অতীন্দ্রিয়-আনন্দ উপভোগের প্রয়াসী। তিনি তাই বিআতী বা নিরাত্মাদেবীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, নিরাত্মাদেবী যেন তাকে আঙ্গণ ঘরপণ বা উষ্ণীষকমলে যে আনন্দময় স্থান আছে সেখানে নিয়ে যান। যেখানে গেলে সাধক যোগবলে সুসুরাকে বা শ্বাসপ্রশ্বাসকে বন্ধ ক'রে দিতে সমর্থ হবেন, আর বহুড়ী বা নিরাত্মাদেবী জেগে থাকবেন অর্থাৎ সাধক অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ করবেন। সহজযানী সাধক এখানে তাঁর ইচ্ছামত নিরাত্মাদেবীকে বহুড়ী বা বধূরূপে গ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধকগণ তাঁদের সাধনার সুবিধার জন্য তাঁদের উপাস্য দেবতাকে যখন যেমন ইচ্ছা গ্রহণ করেছেন, এখানেও ঠিক সেই ভাবটি দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া শাক্ত-তান্ত্রিক সাধনার কুম্ভক যোগসমাধির প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। আবার আঙ্গণ ঘরপণ উষ্ণীষকমল তান্ত্রিক চিৎ-শতদলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিরাত্মাদেবীকে উপলব্ধি করা যায় না, পরন্তু তিনি অতীন্দ্রিয় লোকে থাকেন ব'লে বিরুব তাঁর একটি পদে নিরাত্মাদেবীকে শুণ্ডিনী বা অস্পৃশ্যা নারীরূপে কল্পনা করেছেন। এই শুণ্ডিনীদেবীর সঙ্গ লাভ করতে পারলে যোগীর চিত্ত শুদ্ধ হয়, আর এর ফলে সহজ-আনন্দ বা অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ হয়।

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ।
হে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ॥
দশমি দু আরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥৩॥

সিদ্ধাচার্য বিরুব তাঁর এই পদে ঠিক তন্ত্রোক্ত অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভের কথাই বলেছেন। তান্ত্রিক যোগী যোগবলে ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীর গতি রোধ ক'রে মূলাধার হ'তে সুষুম্না নাড়ীপথে আত্মাকে সহস্রার পদ্মে বা চিৎশতদলে অবস্থিত চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির কাছে প্রেরণ করেন। এর ফলে চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি সাধকের চিত্ত শতদলে জাগ্রত হন। এই মহাশক্তি জাগ্রত হ'লে পর সাধক মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হন। ইহাই তান্ত্রিকের অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ, বৈষ্ণবের অভীষ্ট দেবতার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন বা যোগীর ব্রহ্মানন্দ লাভ। বিরুব এই পদে বলেছেন—শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ। দোহার টীকাতে আছে—

"বামনাসাপুটে প্রজ্ঞাচন্দ্র-স্বভাবেন ললনা স্থিতা।
দক্ষিণ নাসাপুটে উপায় সূর্য স্বভাবেন রসনা স্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা।" ১২৫ পৃঃ।

তন্ত্রোক্ত ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না ইহারা বিরুবের 'দুই ঘর' অর্থাৎ ললনা ও রসনা এবং 'বারুণী' অর্থাৎ অবধূতী-নাড়ী। ললনা ও রসনার গতিরোধ ক'রে সহজযানী অবধূতিকারূপিণী নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সহজ-আনন্দ বা অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ করেন। এই অবস্থার নাম নির্বিকল্প-সমাধি। জাগতিক জ্ঞান রহিত হয়ে যায় এই সময়ে, আর যোগী শুধু আনন্দ-সায়রে ডুবে থাকেন।

গুণ্ডরীপাদের একটি পদে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন,—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমল কুলিশ ঘান্টি করহু বিআলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি॥
খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণিকুলে বহিআ ওড়িসাণে সমাঅ॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।

চান্দসুজ্জ বেণি পখা ফাল ॥
ভণই গুণ্ডরী অমহে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা ॥ ৪ ॥

বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের এই চর্যাপদগুলিতে বৌদ্ধ-বাঙালী-তান্ত্রিক সাধকগণ তাঁদের সাধনার মাধ্যমে যে অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ করেছিলেন, সেই আনন্দ অতি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের সহজ সাধনার তত্ত্বগুলিও আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছেন। যোগবলে যে সহজ-সুখ বা সহজ-আনন্দ লাভ হয়, সেই আনন্দের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে এই চর্যাপদগুলির মধ্যে। হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে যোগাভ্যাসের দ্বারা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মানন্দ লাভের কথা। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মানন্দ, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহাই মহাসুখ বা সহজ-সুখ বা সহজ-আনন্দ। আর এই সহজ-আনন্দই অতীন্দ্রিয়-আনন্দ। এই অতীন্দ্রিয়-আনন্দ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত। ইহা অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু অপরকে বোঝান যায় না। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এই অতীন্দ্রিয়-আনন্দকে কিছু প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—তন্ত্রোক্ত এই তিন নাড়ী হ'ল গুণ্ডরীপাদের "তিঅড্ডা" অর্থাৎ ললনা, রসনা ও অবধূতিকা-নাম্নী তিন নাড়ী। নিরাত্মাদেবীকে তিনি "জোইণি" নাম দিয়েছেন। আনন্দদান বুঝাতে "অঙ্কবালী" বলেছেন। "বিচিত্রাদি-লক্ষণযোগেন আনন্দাদি ক্রমং দদাতি।"—(দোহাটীকা—১২৫ পৃঃ)। "কমলকুলিশ ঘাণ্টি" অর্থে বজ্রপদ্মঘর্ষণ বা সংযোগজনিত আনন্দ বুঝিয়েছেন। "সম্যক্ কুলিশাব্জসংযোগবৃষ্টৌ আনন্দ-সন্দোহতয়া"—(দোহাটীকা—১২৫ পৃঃ)।

ধর্মকায় (তথতা বা শূন্যতা) হ'তে বোধিচিত্তের উদ্ভব—একথা সহজযানীরা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এই বোধি-চিত্ত সর্বদা পরিশুদ্ধ। তবে ইহা অবিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন থাকে। মোহাচ্ছন্ন হ'লেও ইহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয় না। মোহজাল ছিন্ন হ'লেই আবার অমলিন বজ্রপদ্মের মত ধর্মকায় (হিন্দু দর্শনের পরমাত্মা) প্রকটিত হয়। ঠিক এই কথাই Suzuki বলেছেন,—

"Being a reflex of the Dharmakaya, the Bodhichitta is practically the same as the original in all its characteristics."—

(Mahayana Buddhism—P. 299)

বোধিচিত্তের মোহজাল ছিন্ন হ'লেই নিরাত্মাদেবীকে (নির্বাণ) আলিঙ্গন ক'রে ধর্মকায়ে লীন হয়। বোধিচিত্তের ধর্মকায়ে লীন হওয়ার অবস্থাটি অতীন্দ্রিয়বাদের চরম কথা। নিরাত্মাদেবীকে লাভ ক'রে ধর্মকায়ে লীন হওয়ার জন্য বোধি-চিত্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ঠিক যেমন পরমাত্মাকে লাভ করবার জন্য জীবাত্মার আকাঙ্ক্ষা থাকে। নিরাত্মাদেবীর বাসস্থান হ'ল সহজযানীদের মতে মস্তকের মহাসুখচক্রে (শাক্ত তন্ত্রমতে সহস্রার পদ্মে), আর বোধিচিত্তের বাসস্থান হ'ল মণিকুলে। দোহাটীকার মতে মণিমূলে। "পুনস্তস্মিন্ ক্রীড়ারসমনুপূয় মণিমূলাৎ ঊর্দ্ধং গত্বা গত্বা মহাসুখচক্রে অন্তর্ভবতি।"—দোহাটীকা। মোহমুক্ত বোধিচিত্ত নিরাত্মাদেবীকে লাভ ক'রে ধর্মকায়ে লীন হবার জন্য মণিকুল থেকে ঊর্ধে উঠে মহাসুখচক্রে উপস্থিত হয়, আর এখানেই নিরাত্মাদেবীকে আলিঙ্গন ক'রে ধর্মকায়ে লীন হয়।

শাক্ততন্ত্রমতে মোহমুক্ত জীব মহাশক্তিতে লীন হয়ে যায়। এই মহাশক্তি চৈতন্যরূপিণী। তিনি মস্তকে সহস্রার পদ্মে অবস্থিত থাকেন। জীবরূপী আত্মা থাকে মূলাধারে। সেখান থেকে এই মুমুক্ষু আত্মা ঊর্ধে উত্থিত হয়ে সহস্রার পদ্মে অবস্থিতা চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হন। উপনিষদের পরমাত্মার সঙ্গে মুমুক্ষু জীবাত্মার ঠিক এই ভাবেই মিলন হয়।

প্রাচীন চর্যাপদগুলির মধ্যে যেভাবে অতীন্দ্রিয়-আনন্দের সমাবেশ হয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সাধকেরা আত্মার স্বরূপ বুঝতে পেরে, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে, মুক্তির পথে অগ্রসর হয়ে অথবা নির্বাণ লাভ করতে যেয়ে মহা-আনন্দ বা মহাসুখ লাভ করেছেন। এই মহা-আনন্দ বা মহাসুখের অধিকারী হয়ে তাঁরা জগতের লোককে তাঁদের লব্ধ আনন্দ বা সুখের অংশীদার করবার ইচ্ছুক হয়েছেন। আর এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তাঁরা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। যা প্রকাশের অতীত, যা শুধু অনুভববেদ্য সেই অতীন্দ্রিয় আনন্দকে তাঁরা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। যে পথে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ঐ আনন্দ লাভ করেছিলেন সেই পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন তাঁরা। সাহিত্যের মধ্যে তাঁরা তাঁদের ধ্যান-ধারণা, যোগ-সাধনার পরিচয় রেখে গেছেন। কিন্তু সর্বদাই গুরুর সহায়তা লাভের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কারণ ধর্মস্য তত্ত্বম্ নিহিত গুহায়াম্। ধর্মের তত্ত্ব ব'লে বুঝান যায় না, গুরু পথ দেখিয়ে দিতে পারেন।

পরবর্তী কালের শক্তিসাধক-কবির পদের সঙ্গে গুণ্ডরী-পাদের এই চর্যাপদটির অপূর্ব মিল আছে। সহস্রার পদ্মে অবস্থিতা চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে পারলে "প্রাণারাম" বা "আত্মারাম" অর্থাৎ প্রাণ বা আত্মার আরাম অর্থাৎ মহাসুখ বা মহা-আনন্দ লাভ হয়। এই মহা-আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত

করবার পন্থাটি অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে দেওয়ান নন্দকুমার রায়ের এই কবিতাটিতে ঃ

"কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহং-তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা-সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশতত্ত্ব,
সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ।
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে।
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শক্তি-আরাধনে।"

সাধক গুণ্ডরীপাদ তদীয় পদটিতে বোধিচিত্তের নিরাত্মা-দেবীর প্রতি যে প্রবল আকর্ষণের কথা বলেছেন তার সঙ্গে পরবর্তী কালের সাধক-কবি চণ্ডীদাসের একটি পদের আশ্চর্য মিল আছে। গুণ্ডরীপাদ বলেছেন ঃ

"জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি" ॥ ৪ ॥

সাধক নির্বাণ (তথতা বা শূন্যতা) লাভের প্রয়াসী। নিরাত্মাদেবীর মুখ-সুধা পান ক'রে তবে মহাসুখ বা মহা-আনন্দ অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। সুতরাং সাধক জোইনি অর্থাৎ নিরাত্মাদেবীকে না দেখে ক্ষণমাত্র জীবন-ধারণ করতে পারে না। চণ্ডীদাসও ঠিক তাঁর পদে এই ভাবই প্রকাশ করেছেন ঃ

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীবাত্মা পরমাত্মার এক খণ্ডাংশ—এইটুকু মাত্র প্রভেদ। কিন্তু কায়া ও ছায়া যেমন পৃথক্ থাকতে পারে না, জীবাত্মা ও পরমাত্মা তেমনি পৃথক্ থাকতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত। জীবাত্মা মায়াধীন আর পরমাত্মা সব কিছুর অতীত। তাই পরমাত্মা নির্গুণ, নির্বিকার এবং নিরাকার। উভয়ের সম্পর্ক কিন্তু লৌহ ও চুম্বকের মত। তাই রাধারূপী জীবাত্মা কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার জন্য ব্যাকুল। আবার কৃষ্ণরূপী পরমাত্মা রাধারূপী জীবাত্মাকে ছেড়েও যেতে পারেন না। রাধা মায়াধীন জীবাত্মা, তাই সবকিছুর অতীত যে কৃষ্ণরূপী পরমাত্মা, তাকে সে ধ'রে রাখতে পারে না। সে যে অধরা, তাই এই অধরাকে ধ'রে রাখতে পারবে না ব'লে রাধারূপী জীবাত্মার এত ব্যাকুলতা, এত ক্রন্দন। বৈষ্ণব সাধক-কবি এমনই ক'রে বিচ্ছেদের দুঃখকে অতীন্দ্রিয় আনন্দে রূপান্তরিত করেছেন। আর এই রূপান্তরের মধ্যে আছে মহাভাব বা মহা-আনন্দ অর্থাৎ প্রাণারাম বা আত্মারাম।

বৌদ্ধসিদ্ধা কৃষ্ণাচার্যের মতে সহজযানীরাই শুধু নির্বাণ (তথতা বা শূন্যতা) লাভের অধিকারী। সহজ পথই হ'ল নির্বাণ লাভের একমাত্র পথ। কৃষ্ণাচার্যের মতে ঐ নির্বাণই হ'ল সহজ-আনন্দ। আর এই সহজ-আনন্দই অতীন্দ্রিয়-আনন্দ। কৃষ্ণাচার্যের মতে নিরাত্মাদেবীই নির্বাণদেবী। সুতরাং তাঁর মতে নিরাত্মা ও নির্বাণ পৃথক্ নয়। নিরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এজন্য নিরাত্মাকে তিনি ডোম্বী অর্থাৎ ডুমনী নাম দিয়েছেন। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাই ত অতীন্দ্রিয়। সুতরাং নিরাত্মাদেবী অনুভববেদ্য অতীন্দ্রিয় আনন্দ। ইন্দ্রিয়াতীত নিরাত্মাদেবীর সঙ্গলাভে উৎসুক হয়ে কৃষ্ণাচার্য ঘৃণালজ্জাহীন নগ্ন যোগী হয়েছেন। যোগীরা যখন ঘৃণালজ্জার হাত থেকে মুক্ত হন তখনই তাঁর অন্তর নিষ্কলুষ হয় এবং তখনই তিনি নির্বাণ লাভের অধিকারী হন। সংসারের মোহ অর্থাৎ অবিদ্যার মোহ কাটাতে পারলে সাধক ঐ নগ্ন যোগীর ভাব পেতে পারেন। এমন অবস্থায় উপনীত হ'তে পারলে সাধকের মন মহাসুখ বা মহা-আনন্দ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আনন্দে পূর্ণ হয়। ইহাতেই নিরাত্মাদেবী বা নির্বাণদেবীর সঙ্গে সাধকের মিলন হয়। কৃষ্ণাচার্য এই মিলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেছেন যে, তিনি ৬৪ দলযুক্ত পদ্মের উপরে উঠে ডোম্বীর সঙ্গে মহানন্দে নৃত্য করেন। অবিদ্যার মোহ কাটাতে হ'লে অবিদ্যারূপিণী ডোম্বীকে ধ্বংস করতে হবে—এ কথাও কৃষ্ণাচার্য তাঁর পদে স্পষ্টভাবে বলেছেন। কৃষ্ণাচার্যের এই পদে তান্ত্রিক সাধনার সহজ পথ অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধক-কবির উদাত্ত কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে,

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোত্র সম করিব ম সাঙ্গ।
নিখিল কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ॥
এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসমি জামি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥

তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥
তুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী॥
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলান।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥১০॥

অতীন্দ্রিয়বাদী বৌদ্ধসিদ্ধা কৃষ্ণাচার্য সহজ সাধনার পথে নিরাত্মাদেবীর সাথে মিলিত হয়ে মিলনের পূর্ণানন্দ লাভ করতে পেরেছিলেন। অবশ্য অবিদ্যার মোহপাশ ছিন্ন ক'রে তিনি নিরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই মিলনের আনন্দই অতীন্দ্রিয়-আনন্দ।

তেইশ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের রচিত পঞ্চাশটি চর্যাপদের মধ্যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের পাঠ পাওয়া গেছে। এই পদগুলি অনুশীলন করলে দেখতে পাওয়া যাবে, প্রত্যেক সিদ্ধাচার্য মহাযানী সহজপথের সন্ধান দিয়েছেন। বোধিচিত্তের সহজাত ধর্ম কেমন ভাবে নির্বাণ (তথতা ব শূন্যতা) লাভের অধিকারী হয়েছে তাহাই ঐ পদগুলির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল নির্বাণ-লাভেই মহাসুখ বা মহা-আনন্দ লাভ। আর এই মহাসুখ বা মহা-আনন্দই উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ, বৈষ্ণব দর্শনের মহাভাব আর শাক্ত-তান্ত্রিকমতে সহস্রার পদ্মে অবস্থিতা চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির জাগরণের দ্বারা আত্মারাম লাভ। এ সবগুলিই এক কল্পনার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। আর এ সবগুলিই সার্বজনীনভাবে অতীন্দ্রিয়-আনন্দ।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মোপলব্ধি। এ বিষয়ে তাঁরা উপনিষদ ও গীতার তত্ত্বই অনুসরণ করেছেন। আর "নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" নিজেকে জানা, নিজেকে চেনাই হ'ল হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সার কথা। সব ধর্মেরই ঐ একই সার কথা। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

উদ্ধারেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥৬৫॥

আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে অবসন্ন করিবে না অর্থাৎ সংসার মায়াতে আবদ্ধ হইতে দিবে না। কারণ সংসারে আবদ্ধ হইতে দিলে আত্মার অবনতি আসে। আত্মাই বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।

গীতার ঐ শ্লোকে যে আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করার কথা বলা হয়েছে, উহা একটি রূপকমাত্র। ঐ রূপক বিশ্লেষণ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ "আত্মানং বিদ্ধি"—আত্মাকে জান, আত্মাকে চেন, সর্বদা আত্মস্বরূপ চিন্তা কর। এই চিন্তার দ্বারা আত্মার স্বরূপ জানতে পারা যায়। অভ্যাস-যোগের দ্বারাই ইহা সম্ভব। যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি সংযত ও সংহত হয়। চিত্ত সংহত হ'লেই আত্মোপলব্ধি ঘটে। ইহাই মহাসুখ বা মহা-আনন্দ। এই মহাসুখই ব্রহ্মানন্দ বা অতীন্দ্রিয়-আনন্দ।

নিজেকে জানলেই অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি ঘটলেই মনে হবে—সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাবান্।" এটি হ'ল জ্ঞানমার্গের কথা। কিন্তু ভক্তিমার্গে এভাবে আত্মোপলব্ধির কথা বলা হয় নি। জ্ঞানমার্গে বলা হ'ল—জীব নিত্যমুক্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই খণ্ডাংশ; যোগ-সাধনার দ্বারা সে নিজেকে ব্রহ্মে লীন ক'রে দিতে পারে। ভক্তিমার্গে বলা হ'ল:

পাপোঽহং পাপাকর্মাহং পাপাত্মা পাপ সম্ভবঃ।
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব পাপ হরো হরি॥

এই প্রার্থনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে—জীব মায়াধীন। এই মায়াধীন জীবকে ভগবান্ যন্ত্রের মত চালিয়ে চলেছেন। এমন অবস্থায় ঐ চলমান জীব তাঁর শরণ নিলে, অনন্যা ভক্তির দ্বারা তাঁর চিন্তা করলে, তাঁকে মনোমন্দিরে স্থাপনা করবার বাসনা করলে সে ভগবানকে পেতে পারে। বস্তুতঃ, গীতার জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ উভয়কেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা এক কল্পনার প্রকারভেদ মাত্র।

এই উভয় আলোচনার উপসংহারে পাওয়া গেল আত্মোপলব্ধি, যার ফলশ্রুতিতে সেই অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ। সুতরাং বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের আত্মোপলব্ধির ফলশ্রুতিতে যে মহাসুখ, হিন্দুধর্ম ও দর্শনের তাহাই "আত্মানং বিদ্ধি"। আর এ সবগুলিকে এক কথায় বলা যায়—অতীন্দ্রিয়-আনন্দ।

মহাসুখ লাভই যে বৌদ্ধ মহাযানী সহজিয়া-সাধক সম্প্রদায়ের সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য, একথা অনেকগুলি চর্যাপদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে, কিন্তু এই মহাসুখ লাভের পন্থা গুরুর নিকট থেকে জেনে নিবার উপদেশ পদকর্তারা সব সময় দিয়েছেন।

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥১॥

বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হ'তে মুক্ত না হ'লে মহাসুখ লাভ করা যায় না। সুতরাং কামনা-বাসনার নিবৃত্তিই মহাসুখ লাভের একমাত্র পথ। গুরুর নিকট থেকে ইহার উপায় জানিতে লুইপাদ উপদেশ দিচ্ছেন।

কম্বলাম্বরপাদের একটি পদে মহাসুখ ও তাহা লাভের উপায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। রূপকাশ্রয়ী এই পদটি বিশ্লেষণ করলে উহার অন্তর্নিহিত সত্যটি সাধক-কবির অমিত কল্পনা-শক্তির কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥

বাহতু কামলি গঅণ উবেষেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কই যেঁ॥
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ্‌।
কেড়ুআল নাহি কেঁকি বাহবকে পারঅ॥
বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ মাঙ্গা॥ ৮॥

চিত্ত শূন্যতায় পূর্ণ থাকে অর্থাৎ চিত্তে নির্বাণের প্রতি আসক্তি সব সময় থাকে। কিন্তু বস্তুজগতের অবিদ্যা নির্বাণ-আসক্তি দূরীভূত ক'রে দিয়ে তার স্থান অধিকার করতে সব সময় সচেষ্ট থাকে। তাই সাধককে সব সময়ে অতি সাবধানতার সঙ্গে নির্বাণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। গুরু-উপদেশ এই পথের একমাত্র সহায়। এই উপদেশমত চলতে পারলে নির্বাণ বা মহাসুখ লাভ করা যায়।

সিদ্ধাচার্য কাহ্নুপাদের একটি পদে মহাসুখ লাভের উপায় রূপকের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥ ৯॥

মদমত্ত হস্তী যেমন সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে কমল বনে প্রবেশ করে আর মনের আনন্দে ক্রীড়ারত হয়; কৃষ্ণাচার্যও ঠিক তেমনই জ্ঞানবলে নির্বাণ-পথের বিঘ্নস্বরূপ সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন ক'রে মহাসুখরূপ সহজ নলিনী বনে প্রবেশ ক'রে নির্বিকল্প সমাধিতে মহানন্দে আছেন।

করুণা ও নির্বাণকে (তথতা ও শূন্যতা) বৌদ্ধ সহজিয়া-সম্প্রদায় অভিন্নরূপেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং করুণা-লাভই মহাসুখ লাভ। কাহ্নুপাদের একটি পদে রূপকের মাধ্যমে এই করুণা লাভের পথটি অতি সুন্দররূপে বিশ্লিষ্ট হয়েছে:

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ ন অবল।
যদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন নি-অড় জিন উর॥
পাহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্ন অমহে ভাল দান দেহুঁ
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ॥ ১২॥

চিত্ত অবিদ্যাসংযোগে বহুদোষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চিত্ত দোষমুক্ত হ'লেই স্বরূপে স্থিতি লাভ করে। চিত্ত স্বরূপে স্থিতি লাভ করলেই ধর্মকারের স্বরূপ লাভ করে। ধর্মকারের সঙ্গে চিত্তের এই মিলনের ভাবটি হিন্দুদর্শনের পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের তুল্য। এই মিলনে যে 'নঅবল' লাভ হয় তাহা 'অবাঙ্‌মনস গোচর' মহাসুখ বা মহা-আনন্দ। এই মহা-আনন্দই ব্রহ্মানন্দ বা অতীন্দ্রিয়-আনন্দ। অবিদ্যাসংযোগে চিত্ত মোহাবিষ্ট হ'লে উহা বিষয়ে ডুবে থাকে। এমতাবস্থায় সদ্‌গুরুর উপদেশ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সদ্‌গুরুর উপদেশে চিত্তের বিষয়ানুরক্তি দূরীভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মোহবিমুক্ত চিত্ত অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভের অধিকারী হয়।

অষ্ট ঐশ্বর্য ধ্বংস হ'লে পর কায়-বাক-চিত্তে করুণা ও শূন্যের মিলন সাধিত হয়। এই মিলনই মহামিলন এবং এর দ্বারা মহাসুখ বা মহা-আনন্দ লাভ হয়। এই মহা-আনন্দই অতীন্দ্রিয়-আনন্দ। কাহ্নুবাদের একটি পদে রূপকের মাধ্যমে ইহা আভাসিত হয়েছে।

তিশরণ নাবী কি অঠক মারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল॥
গন্ধ পরসর-জইসোঁ তইসোঁ।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো॥
চিঅ কন্নহার সুনত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥১৩॥

'অঠক মারী' অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, দিশিতা, বশিতা, কামাবসায়িতা—এই আট প্রকার ঐশ্বর্য ধ্বংস হ'লে পর "তিশরণ ণাবী"তে অর্থাৎ কায়-বাক-চিত্ত "করুণা শূণমে হেরী" অর্থাৎ করুণা ও শূন্যের মিলন সংসাধিত হয়। এই মহামিলনে মহা-আনন্দ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ হয়।

সহজ-আনন্দ অনুভূতিগ্রাহ্য ও অনুভববেদ্য। এই সহজ-আনন্দই অতীন্দ্রিয়-আনন্দ। এই অতীন্দ্রিয়-আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। শান্তিপাদ একটি পদে এই অতীন্দ্রিয়-অনুভূতির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন।

সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরেঁ অলকথলকখণ জাই।
জে জে উপুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই॥
কুলেঁ কুল মা হোইরে মুঢ়া উপুবাট-সংসারা।

বাল ভিণ একু বাকুণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা ॥
মাআমোহ-সমুদায়ে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি না বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উপূবাট জাঅন্তে ॥
বামদাহিন দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট-ন-গুমা-খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥১৫॥

সঅ-সান্বঅণ-মরুঅ-বিআরেঁ অলকৃখলকৃখণ জাই অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হ'লে বিষয় বাসনা লোপ পায় আর তার ফলে সহজ-আনন্দ বা অতীন্দ্রিয়-আনন্দের অনুভূতি জন্মে। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হওয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত। কারণ ইহা অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য ব'লে ইহার স্বরূপ বুঝান যায় না। এমতাবস্থায় বস্তুজগতের রূপ চ'লে যায় আর স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়, আর তখনই অতীন্দ্রিয়-আনন্দের সঞ্চার হয়। এর ফলই নির্বাণ লাভ। অবশ্য সাধারণ লোকের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ লোক বস্তুজগতের রূপেই ভুলে থাকে, বস্তুজগতের স্বরূপে তাহার কথা তারা চিন্তা করতেই পারে না। যাদের কাছে অর্থই সার, পরমার্থ তাদের কাছ থেকে বহুদূরে থাকে।

সহজ-আনন্দ বা অতীন্দ্রিয়-আনন্দ কিরূপে লাভ হয় এবং তখন সাধকের মানসে কেমন ভাবের উদয় হয়—কাহ্নু-পাদের একটি পদে তাহা অতি সুন্দরভাবে আভাসিত হয়েছে।

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ-লীলেঁ ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরি আনী।
অন্তে কুলিণ জণ মাঝেঁ কাবালী ॥
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজণ কারণ সসহর চালিউ ॥
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই ॥
কাহ্নে গাইতু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী ॥১৮॥

চিত্ত অচিত্ততায় লীন না হ'লে সহজ-আনন্দ লাভ হয় না। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হ'লে বিষয় বাসনার লোপ পায়। বিষয় বাসনার লোপ হ'লে নিরাত্মাদেবী চিত্তে অধিষ্ঠাতা হন। নিরাত্মাদেবী চিত্তে অধিষ্ঠাতা হ'লেই সহজ-আনন্দ চিত্তে পূর্ণিত হয়ে যায়। নিরাত্মাদেবীই ত সহজ-আনন্দের মূর্ত প্রতীক। এঁর দুই মূর্তি। এক মূর্তিতে তিনি অবিদ্যা, যিনি মানুষকে বিষয়ে ডুবিয়ে রেখে দেন ও বিষয়সত্বা মানুষের যে ভোগ—সেই ভোগ তাকে দিয়ে থাকেন; অন্য মূর্তিতে তিনিই নিরাত্মাদেবী, যিনি সাধককে বিষয়-বিমুখ ক'রে সহজ-আনন্দের অধিকারী ক'রে দেন। এঁর কৃপাদৃষ্টির চাহনিতে সাধকের মনের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়, তার অর্থ ও পরমার্থ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়; আর তার ফলে সাধক সব সময় নিরাত্মাদেবীকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে রাখে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে শূন্যবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরমাত্মা ও জীবাত্মা, পুরুষ ও প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা, শিব ও শক্তি—এঁরা দুই হ'লেও এক। নির্বিকারের বিকার মাত্র। এই বিকারই লীলা। এই লীলার স্বরূপ শুধু সাধকই গ্রহণ করতে পারেন, কারণ এর মর্ম নিহিত আছে গুহার মধ্যে। শুধু সাধনার দ্বারাই সেই গুহার মধ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে। এই শিব ও শক্তি বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়। প্রজ্ঞা ও উপায়-এর অন্য নাম শূন্যতা ও করুণা। এই প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনে যে সহজ-আনন্দ লাভ হয়, রূপকের মাধ্যমে ভুসুকুপাদ সেই আনন্দের কথা অতি সুন্দরভাবে একটি পদে ফুটিয়ে তুলেছেন:

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইনী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ ॥
চালিঅ ষষহর মাগে অবধূই।
রঅণহু যহজে কহেই ॥
চালিঅ ষষহর গউ নিবাণে।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥
চিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ ॥ ২৭ ॥

শাক্ত-তন্ত্রে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। জীবরূপী আত্মা মূলাধার হ'তে বাহির হয়ে ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতির গতি রোধ ক'রে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে মস্তকে সহস্রার পদ্মে অবস্থিত চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে সাধক প্রাণারাম বা মহানন্দ বা সচ্চিদানন্দ লাভের অধিকারী হয়। পরমাত্মা ও আত্মাই হ'ল চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহা-শক্তি ও জীব। পরমাত্মা ও আত্মাই হ'ল শিব ও শক্তি, বৌদ্ধ সহজযানীদের প্রজ্ঞা ও উপায় (শূন্যতা ও করুণা)। ভুসুকুপাদ এখানে সহজ-আনন্দ লাভের পথের সন্ধান দিয়েছেন। মহাসুখকে তিনি কমলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শূন্যতা-সূর্যের কিরণে এই মহাসুখ-কমল প্রস্ফুটিত হয়। এই প্রস্ফুটিত কমলের উপর "বতিস জোইনী"

অর্থাৎ বত্রিশ নাড়ী (ললনা, রসনা, অবধূতিকা প্রভৃতি) ধারা বর্ষণ করে। ললনা, রসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে দোহাটীকাতে আছে :

ললনা প্রজ্ঞাস্বভাবেন, রসনোপায় সংস্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহক বর্জিতা॥

দোহাটীকা—১২৪ পৃঃ॥

ধারা বর্ষণের ফলে পরিশুদ্ধ চিত্ত অবধূতী পথে ঊর্ধ্বে উঠিয়া সহস্রারপদ্মে যেয়ে মহাসুখ বা মহা-আনন্দে নিমগ্ন হয়।

সাধনায় তন্ময়তা এলে সাধক বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হয়। তখন সাধক অন্তর-জগতের অধিবাসী হয়ে এক বিশেষ অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় এলে ইষ্টদেবতার সঙ্গে সাধকের মিলন ঘটে। এই মিলনে সাধকের মনে যে অপার আনন্দের উদয় হয়, তাহাই মহাসুখ বা সহজ-আনন্দ বা অতীন্দ্রিয়-আনন্দ। এই যে ভগবদ্ সম্মিলন, ইহাই বৈষ্ণব-দর্শনের ভাবসম্মিলন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মূলেই এই ভাব-সম্মিলন। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হলে তবে এই তন্ময়তা আসে। রূপকের মাধ্যমে শঙ্করপাদ একটি পদে অতি সুন্দর-ভাবে এই বিশেষ অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন :

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সোজ ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক্ পুচ্ছিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরমনিবাণে॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর—সিহর—সন্ধি পইথন্তে সবরো লোড়িব
কইসে॥ ২৮॥

নিরাত্মাদেবী এখানে অস্পৃশ্যা শবরীরূপে কল্পিতা হয়েছে। নিরাত্মাদেবীকে শবরী বলবার কারণ—নিরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। (তুলনীয়—নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ)। চিত্ত সাধারণতঃ বিষয়াসক্ত থাকে, কিন্তু যখন সাধক সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তখন ক্রমে তন্ময়তা আসে; বিষয়ানুরক্তি আস্তে আস্তে দূরে যায়। এর ফলে বিষয়-বিমুক্ত চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়, আর নিরাত্মাদেবীর সঙ্গে এই সময়ে সাধকচিত্তের মিলন ঘটে। এই মিলনেই যে মহাসুখ লাভ হয়, তাহাই অতীন্দ্রিয়-আনন্দ।

এই পদেও তান্ত্রিক সাধনার পন্থা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। "উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী" অর্থাৎ শবরীবালা উঁচু পাহাড়ে বাস করে। এই শবরী নিরাত্মা-দেবী। শাক্ত-তন্ত্রমতে ইনি চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি। উঁচু পাহাড় হ'ল নিরাত্মাদেবীর আবাসস্থল, মহাসুখচক্র। শাক্ত-তন্ত্রমতে মস্তকের ঊর্ধ্বদেশে স্থিত সহস্রার পদ্ম। এই সহস্রারপদ্মে চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির সঙ্গে জীবরূপী আত্মার মিলন ঘটলে সাধক সৎ-চিৎ-আনন্দ লাভের অধিকারী হয়। ইহাই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন বা নির্বাণ লাভ। শবরপাদ এই পদে জানিয়েছেন যে, নিরাত্মাদেবী যে বাহ্যিক সাজ-সজ্জা ধারণ ক'রে থাকেন তাতে সহজে তাঁকে চেনা যায় না। কিন্তু সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হ'লে তিনি নিজেই দয়া ক'রে তাকে পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন। নির্বাণের পথে সাধককে টেনে আনাই হ'ল নিরাত্মাদেবীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধককে ছেড়ে তিনি যেন থাকতে পারেন না। বিষয় থেকে সাধককে টেনে আনবার জন্য তাঁর যেন চেষ্টার অন্ত নাই। ঠিক এই রকম ভাবের চণ্ডীদাসের একটি পদ আছে।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজেছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু॥

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকাতে এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কবির ব্যাখ্যা, "ভগবান্ আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি

আমাদের ত্যাগ করেন না।" আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেও ঠিক অনুরূপ ভাবের উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে॥
(মধ্যলীলা, ।২২শ পরিচ্ছেদ)।

করুণার আবির্ভাবেই মহাসুখ বা মহা-আনন্দ লাভ হয়। এই মহা-আনন্দ লাভ হলে পর ত্রিলোকের সর্বত্র আনন্দ আছে, কোথাও নিরানন্দের স্থান নাই এই অনুভূতি জন্মে। সচ্চিদানন্দময় পরম-ব্রহ্ম যে সর্বব্যাপী, হিন্দু দর্শনের এই ভাবটিই সহজযানী বৌদ্ধ সাধকগণ গ্রহণ করেছেন। ভুসুকুপাদের একটি পদে এই ভাবটি সুপরিস্ফুট হয়েছে।

করুণা মেহ নিরন্তর করিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ॥
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ॥
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ॥
জাসু সুনন্তে তুটই ইন্দিআল।
নিহুরে ণিঅ মন দে উলাল॥
বিসঅ বিশুদ্ধে মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে॥
এ তৈলোত্র এত বিসারা।
জোই ভুসুকু ফেড়ই অন্ধকারা॥৩০॥

চিত্তে করুণার উদয় হ'লেই অবিদ্যা দূরে চ'লে যায়। অবিদ্যার প্রভাবমুক্ত হ'লেই চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়ে যায়। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হ'লেই করুণা-রূপ মহসুখ বা মহা-আনন্দ লাভ হয়। চিত্তে মহা-আনন্দের সঞ্চার হ'লে বিশ্বময় শুধু আনন্দেরই আধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্ব ছাড়িয়ে তার পর ত্রিলোকময় ঐ আনন্দের বিস্তার অনুভব করা যায়। এই আনন্দ ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দ, তাই তার অন্ত নাই; সে আনন্দ অনন্ত। বৌদ্ধ সহজযানীরা এই অতীন্দ্রিয়-আনন্দের স্বরূপ গ্রহণ করেছেন হিন্দুদর্শন থেকে। উপনিষদের সচ্চিদানন্দরূপী জ্যোতির্ময় পরম ব্রহ্মেরই প্রকাশ এই করুণাতে। গীতায় এই জ্যোতির্ময়রূপেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১১ ॥ ॥১২॥

আকাশে যদি যুগপৎ সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সহস্র সূর্যের প্রভা মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে।

বিশ্বরূপের এই জ্যোতির্ময় মূর্তিই হিরণ্ময় পুরুষরূপী জ্যোতির্ময় পরম ব্রহ্মেরই প্রকাশ। এই জ্যোতির্ময় প্রকাশ বচন মনের অতীত অর্থাৎ অবাঙ্মনসগোচর এবং ইহাকেই বলা হয় অতীন্দ্রিয়-আনন্দ। মহাযোগী যুগ যুগ ধ'রে কঠোর সাধনার বলে এই রূপসাগরে ডুব দিয়ে অপরূপরতন লাভ ক'রে থাকেন। এই রূপেই মহাযোগীর ব্রহ্মানন্দ বা অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ হয়। গীতায় ঐ আনন্দের স্বরূপও বর্ণিত হয়েছে।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ॥১১ ॥ ॥ ১৪ ॥

সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ব্রহ্মের স্বরূপ ভক্ত যখন হৃদয়ে ধারণ করেন তখন তিনি বিস্ময়ে ডুবেই যান, আর তাঁর শরীরে আসে রোমাঞ্চ। তিনি নির্বাক্ হয়ে শুধু আনন্দের সাগরেই ডুবে থাকেন বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে। আর তখনই তাঁর সেই অপরূপকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা যায়:

তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মানসে যে ভাবের বন্যা এসেছিল তাহাই রূপায়িত হয়েছে চর্যাপদগুলির মধ্যে। তাঁদের এই ভাবই তাঁদের ধর্ম। জ্ঞানের দ্বারা এই ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় দুঃসাধ্য, ইহা ভাবের বিষয়; অভাবীর কাছে ইহার স্বরূপ ধরা পড়ে না। এই ভাব চিত্তে সঞ্চারিত হ'লে অতীন্দ্রিয়-আনন্দ লাভ হয়। ইহারই আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে—

"My religion is a poet's religion. All that I ful about it is from vision and not from knowledge."—The religion of Myn, Chap-VI.

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ ১২ ॥

রামকিঙ্করের মনের উপর সব সময় যেন বিশ মণ পাথর চাপা। কাজ-কর্ম করে। বিনা প্রতিবাদেই করে। বাধা না পেলে কলেজও যায়। কিন্তু কিছুতেই যেন খুব স্পৃহা নেই। কাজ করতে হবে, করে। কলেজ যেতে হবে, যায়। তার বেশি নয়।

এমন কি বিশ্বনাথের সঙ্গেও বহুদিন দেখা নেই। তার বাবা চাকরি-বাকরির কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন কিনা খবর নিতেও যায় নি। গিয়ে কী হবে? ভদ্রলোক তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করবেন তাতে ভুল নেই। হলে বিশ্বনাথকে দিয়ে তিনিই খবর দেবেন। বার বার তাঁর সামনে গিয়ে তাগাদা দেওয়া নিরর্থক। ভদ্রলোক লজ্জা পাবেন। হয়ত মনে মনে বিরক্তও হবেন।

তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা সব সময় তার মনেও পড়ে না। কি যে তার মনের অবস্থা হয়েছে, কিছুই তার মনে পড়ে না। কিছুতেই উৎসাহ বোধ করে না।

এমন সময় গিন্নীমার কাছ থেকে তার ডাক এল।

অনেক দিন সেখানেও যায় নি। যাবার দরকারও হয় নি। সব দিকেই পাকা ব্যবস্থা তিনি ক'রে দিয়েছেন। নিয়মিত সময়ে টাকা সে পেয়ে যায়। একটি দিন দেরি হয় না।

তথাপি কৃতজ্ঞতার খাতিরে মাঝে মাঝে যাওয়া উচিত ছিল। তবু যে যায় নি সে এইজন্যে যে গিন্নীমাকে ইদানীং সে ভয় করতে আরম্ভ করেছে। তার সন্দেহ, হরেকৃষ্ণ অনেক কিছু তার বিরুদ্ধে সেখানে লাগিয়েছে যার ফলে রামকিঙ্করের উপর তিনি আর প্রসন্ন নয়। সেই ভয়েই আরও সে যায় না।

অযাচিত তলব আসতে প্রথমে সে হতচকিত হয়ে গেল। আবার কি ঘটল? এর মধ্যে কিছুই ত সে করে নি।

ভাবলে, চাকরিটা আর রইল না।

ভাবতেই কিন্তু তার মন একটা আকস্মিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

বাঁচা যায়। চাকরিটা গেলে বাঁচা যায়।

দেশে গিয়ে চাষ-বাস করবে। তার আর পাঁচটা বন্ধু যেমন আরামে ও আলস্যে দিন কাটায়, তাস খেলে আর গান গেয়ে আর তামাক খেয়ে, তেমনি ক'রে তারও চলবে।

ছাই দোকানের কাজ! ছাই পড়াশোনা!

সাহসে বুক বেঁধেই সে গিন্নীমার কাছে গেল। যদি তিনি কঠোর কিছু বলেন, নম্রভাবেই সে চাকরি ছেড়ে দেবে। ভেবে কোন লাভ নেই। দুর্ভাবনায় এমনি ক'রে গুরুভার দিন কাটানর চেয়ে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ানও ভাল।

কিন্তু গিন্নীমা তাকে প্রসন্ন ভাবেই গ্রহণ করলেন। পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করলেন: দেশের খবর, তার নিজের খবর, পড়াশোনার খবর।

রামকিঙ্কর একটি একটি ক'রে তার সদুত্তর দিলে। পড়ার প্রসঙ্গে একবারও অভিযোগ করলে না যে, হরেকৃষ্ণের অত্যাচারে তার পড়াশোনা প্রায় বন্ধ।

গিন্নীমার সঙ্গে সকলেই, এমন কি হরেকৃষ্ণ নিজেও, খুব সতর্কভাবে কথা বলে। সকলেই জানে, তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। বাবু কিছু নন। কর্তাবাবুও কিছুই ছিলেন না শেষ বয়সে। এই প্রকাণ্ড বিষয়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত ওই ঠাকুর-দালানে ব'সে ব'সে তিনি দীর্ঘকাল থেকে চালিয়ে আসছেন।

কর্মচারীদের উপর দয়া-মায়া আছে। আপদে-বিপদে তাদের সাহায্যও করেন। অত্যন্ত মিষ্টভাষী। সকলের সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলেন। কিন্তু তারই মধ্যে কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা জেনে নেন, কেউ জানে না।

জিজ্ঞাসা করলেন, দোকান চলছে কি রকম?

রামকিঙ্কর উত্তর দিলে, আমরাও ত ঠিক বলতে পারব না। তবে ভালই চলছে মনে হয়।

—তোমরা বলতে পারবে না কেন? দোকানে থাক না?

—আজ্ঞে আমার ত বাইরে বাইরে ঘোরা কাজ। দোকানে থাকি কম।

বাইরে কি কর?

—আজ্ঞে তাগাদা আছে। মাল আনা আছে।

—সমস্ত দিনই বাইরে থাক?

—প্রায়।

—কলেজ যাও কখন?

—সন্ধ্যেবেলা।

—বিকেলে ত তাগাদায় বেরোও। কলেজ যাবার আগে ফিরতে পার?

—আজ্ঞে যেদিন পারি, সেদিন যাই।

গিন্নীমা বুঝলেন, ছেলেটির বয়স অল্প হলেও খুব ধূর্ত। ইচ্ছা থাকলেও হরেকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে না, স্থির ক'রে এসেছে।

—পড় কখন?

—আজ্ঞে রাত্রে।

—রাত্রে ত বেশিক্ষণ আলো জ্বলে না।

—আজ্ঞে না, যতক্ষণ জ্বলে পড়ি।

—তোমার পরীক্ষার দেরি কত?

—মাসখানেক পরেই টেষ্ট। এপ্রিলে পরীক্ষা।

—পড়া তৈরি হ'ল কি রকম?

ভাল হয় নি। এখনও পর্যন্ত কিছু কিছু বই সে খুলতেই পারে নি। কিন্তু সে অভিযোগ করলে না। চুপ ক'রে রইল।

গিন্নীমা সব বুঝলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

ঠাকুরদালানের রক।

প্রত্যুষে স্নান ক'রে একখানি গরদের শাড়ি প'রে গিন্নীমা এইখানে এসে বসেন। এইটেই তাঁর সদর দপ্তরখানা। যেখানকার যত কর্মচারী, এইখানেই তাদের তলব করেন। এইখানেই কথা বলেন। এই তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস।

কথা রামকিঙ্করের সঙ্গেও অনেকক্ষণ কইলেন। কিন্তু ফেরবার পথে সমস্ত কথা রোমন্থন করতে করতেও সে ঠিক করে উঠতে পারলে না, এর মধ্যে গিন্নীমার জ্ঞাতব্য কাজের কথা কোন্‌টি।

চুলোয় যাক ও-সব বড় বড় ব্যাপার। একে মেয়েদের মন দেবতারাও জানেন না। তার উপর ধনী-গৃহের কর্ত্রীর মন! যা হবার হবে। বড় জোর চাকরিটা যাবে। তার বেশি ত কিছু নয়? মরার বাড়া গাল নেই!

ভাবলে, যখন এই উপলক্ষ্যে একটু ফুরসুৎ পাওয়া গেছে, তখন বিশ্বনাথের বাড়ী একবার ঘুরে আসা যাক। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা নেই।

সে এলে হরেকৃষ্ণ বিরক্ত হয়। সেজন্যে সেও বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে আসতে চায় না। রামকিঙ্করও আসতে নিষেধ করেছে। দোকানের কাজের চাপে সে নিজেও ও-বাড়ী যেতে পারে নি। আজ যখন সুযোগ পাওয়া গেছে, তখন একটু ঘুরেই যাবে।

কড়া নাড়তেই সবিতা এসে দরজা খুলে দিলে।

রামকিঙ্করকে দেখেই চীৎকার করে উঠল: ও রামদা, তোমার এমন চেহারা হয়েছে কেন? তুমি এতদিন আসনি কেন? অসুখের জন্যে? আমি এখনই তোমার কথা ভাবছিলাম।

উপরে উঠতে উঠতে সবিতা একনাগাড়ে বকে চলল। তাই ও করে। তাই ওর স্বভাব।

রামকিঙ্করের মনটা খারাপ ছিল। সবিতার কলকণ্ঠে আবার সহজ এবং প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলে, আমার কথা ভাবছিলে কেন? আমার কথা কেউ ভাবে, এ আমি ভাবতেই পারি না।

—আমি ভাবি। কখন জান? যখন অঙ্ক কষতে পারি না। মনে হয়, রামদা থাকলে এটা বুঝিয়ে নিতাম।

সবিতাও হাসতে লাগল। রামকিঙ্করও।

রামকিঙ্কর বললে, আমি এতদিন আসি নি কেন, জিগ্যেস করছিলে না?

—হ্যাঁ।

—কেন জান? তোমার অঙ্ক কষে দিতে হবে, সেই ভয়ে।

রামকিঙ্কর হো হো ক'রে হেসে উঠল।

—কে রে? কার সঙ্গে কথা কইছিস?—ভিতর থেকে সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন।

—দেখবে এস কে এসেছে।

সুলোচনা বেরিয়ে এসে বললেন, তোমার কি অসুখ করেছিল রাম? এতদিন আস নি কেন?

সবিতা বললে, আমাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার ভয়ে।

সুলোচনাকে প্রণাম ক'রে রামকিঙ্কর বললে, চেহারা দেখে মনে হয় অসুখ করেছিল। না, সে সব কিছু নয়। কাজের চাপ খুব বেড়েছে। সেই জন্যেই আসতে পারি নি। বিশু কোথায়?

—কোথায় বেরুল। এখনই ফিরবে। বোস। আমার রান্না পুড়ে যাচ্ছে।

সুলোচনা রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন।

পিছন থেকে রামকিঙ্কর বললে, সবিতাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। ও আমাকে বসতে দেবে না।

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ এসে গেল। রামকিঙ্কর রক্ষা পেল।

—কি খবর রাম? অনেক দিন পরে?

—সময় পাই না ভাই।

—তা তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। পেষণ খুব ভালই চলছে!

—ভীষণ ভাল।

—তারপরে? পড়া কি রকম চলছে?

—বই খোলার সময় নেই ভাই। খালি তাগাদা করি, আর ঘোষের গাড়ি-বোঝাই তেল আনি।

—পরীক্ষা?

—শিকের তুলে রেখেছি। পারি দোব, নয় ত দোব না।

বিশ্বনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

বললে, কাল বাবা তোমার কথা জিগ্যেস করছিলেন।

—তারপর?

—তিনি তোমার জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছেন। হবে কিনা ঠিক নেই। হয়ে যেতেও পারে।

ব্যাকুল ভাবে রামকিঙ্কর বললে, তাঁকে একটু চাপ দাও ভাই। লেখাপড়া চুলোয় যাক, এখানে থাকলে প্রাণটাও রাখতে পারব কিনা সন্দেহ।

—বল কি?

—হ্যাঁ। সেই রকমই অবস্থা।

রামকিঙ্কর তার অবস্থার কথা একটি একটি ক'রে বলতে লাগল। হরেকৃষ্ণের দৈনন্দিন অত্যাচারের কথা। আজ গিন্নীমার সঙ্গে যে কথা হ'ল, তাও বললে।

বিশ্বনাথ বললে, গিন্নীমা তোমাকে কিন্তু খুব স্নেহ করেন, নয়?

—খুব সম্ভবত। সব সময় ঠিক নিশ্চিত হতে পারি নি। কি জান? ওঁরা হলেন ধনী ব্যবসায়ী। আমাদের মত লোককে উদার মুহূর্তে কখনও কখনও অনুগ্রহ ক'রে থাকেন। কিন্তু ওঁদের আসল টান হ'ল লাভ-লোকসানের দিকে। তবে মানুষটি ভাল। দয়া-মায়া আছে। দান-খয়রাত করেন। ওই পর্যন্ত।

—কি জন্যে ডেকেছিলেন?

—বোঝা গেল না। ভালর জন্যেও হতে পারে, মন্দের জন্যে হওয়াও অসম্ভব নয়। মোট কথা, অন্য কোথাও স'রে যেতে না পারলে আমার রক্ষা নেই।

রক্ষা ত নেই। কিন্তু কোথায় চাকরি? এ দুর্দিনে কাজ পাওয়া ত সহজ নয়। সেই কথা দুই বন্ধুতে নিঃশব্দে ভাবতে লাগল।

দোকানে ফিরতেই হরেকৃষ্ণ খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে উঠল: কোন্ চুলোয় যাওয়া হয়েছিল?

রামকিঙ্কর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। বয়স অল্প হলেও দুঃখ পেয়ে পেয়ে বুদ্ধি কিছুটা স্থির হয়েছে।

তখনই নিজেকে সামলে নিলে। শান্তকণ্ঠে বললে, বাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম।

—সেখানে কি? ব্রাহ্মণ-ভোজনের নেমন্তন্ন?

—গিন্নীমা ডেকেছিলেন।

গিন্নীমার নামে হরেকৃষ্ণ থমকে গেল। জোঁকের মুখে নুন পড়ল। কণ্ঠস্বর দপ ক'রে নেমে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—বুঝতে পারলাম না।

রামকিঙ্কর আর দাঁড়াল না। স্নানাহার আছে। তারপরে কোথায় যেতে হবে কে জানে। সে ভিতরে চ'লে গেল।

হরেকৃষ্ণ চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে ওর যাওয়া দেখতে লাগল।

তারপর অন্যদের দিকে চেয়ে বললে:

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥

সবাই হাসতে লাগল। কবিতাটির জন্যে নয়, রামকিঙ্করের ভবিষ্যতের জন্যেও নয়। হাসলে, হরেকৃষ্ণকে খুশী করবার জন্যে।

কিছুদিন থেকে হরেকৃষ্ণকে ওরা ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। রামকিঙ্করের গিন্নীমার কাছে যাওয়া-আসা আছে। দরকার হলে তাঁর কাছে কেঁদে পড়তে পারে। তার উপর একটা পাস করেছে। দু'মাসে না হোক ছ'মাসেও কোথাও একটা কাজ যোগাড় ক'রে নিতে পারে।

কিন্তু হরেকৃষ্ণ যদি তাদের পিছনে লাগে, তারা কোথায় যাবে, করবেই বা কি?

সুতরাং প্রকাশ্যে তোয়াজ করতে হয়। হাসি তারই একটা অঙ্গ।

কিন্তু ওদের হাসি থামবার আগেই বাবুর বাড়ী থেকে সরকার এল। তার হাতে একটি রোকা।

হরেকৃষ্ণ পড়লে:

শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ, অত্র রোকায় আমার আশীর্বাদ জানিবা। অদ্য সন্ধ্যায় অতি অবশ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা। বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই রোকা অত্যন্ত জরুরী জানিবা। ইতি—

আঃ গিন্নিমা।

হরেকৃষ্ণের বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল।

কি ব্যাপার সরকারকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। সে পত্র-বাহক মাত্র। গিন্নিমার মনের কথা সে জানে না।

তাকে বিদায় ক'রে হরেকৃষ্ণ ভাবতে লাগল:

ছোঁড়াটা বড়ই উৎপাত সুরু করেছে। টুক টুক ক'রে গিন্নীমার কাছে যাচ্ছে, আর কি যে লাগিয়ে আসছে, সেই জানে। তিনি স্ত্রীলোক, আর রামকিঙ্করও পিতৃহীন বালক। কেঁদে-কেটে বললে, তার জন্যে মমতা হওয়া স্বাভাবিক।

বাবুর কাছে এ সব হওয়ার যো নেই। একবার এসে সবাইকে রীতিমত কড়কে গেছেন।

কিন্তু তিনি ত কিছুই দেখেন না। বাপ টাকা রেখে গেছেন, বিষয়-সম্পত্তি কারবার রেখে গেছেন, তিনি স্ফূর্তি করছেন!

আরে বাপু, যত টাকাই তিনি রেখে যান, এমন করলে ক'দিন চলবে? ঘটির জল গড়াতে গড়াতে শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু বাবুদের জন্যে দুঃখ করা নিষ্ফল। যেতে হবে গিন্নীমার কাছে। কি জন্যে ডেকেছেন জানতে হবে। ছোঁড়াটা যদি কিছু গোলমাল পাকিয়ে এসে থাকে, তার ও বিহিত করতে হবে। ইতিমধ্যে ছোঁড়াটাকে পাঠাতে হবে দূরে।

স্নানাহার সেরে রামকিঙ্কর নিচে আসতেই হরেকৃষ্ণ তাকে ডাকলে।

—আজ মালি-পাঁচঘরা যেতে হবে।

রামকিঙ্কর অবাক্। এই ক'মাসে রামকিঙ্কর এত জায়গায় গেছে, কিন্তু মালি-পাঁচঘরায় কখনও না।

জিজ্ঞাসা করলে, মালি-পাঁচঘরা! সেখানে কি?

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হরেকৃষ্ণ বললে, সেখানে কি জান না? তোমার বিয়ের কনে দেখতে।

সবাই হেসে উঠল। কিন্তু রামকিঙ্করের মুখ ক্রোধে আরক্ত, কঠিন। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

হরেকৃষ্ণ বললে, তাগাদায়।

প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে বললে, সেখানে ত তাগাদায় যেতে হয় না।

—হয় না? তুমি জান?

—জানি। তাছাড়া আমাকে আজ শ্যামবাজারে যেতে হবে। ওদের আজকে টাকা দেবার দিন।

রাগে হরেকৃষ্ণও জ্বলে উঠল। চীৎকার ক'রে বললে, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি যেখানে যেতে বলছি, তুমি সেখানে যাও।

—না।

—না!

তারও চেয়ে জোরে চীৎকার ক'রে রামকিঙ্কর বললে, না।

দোকানশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত। মুহূর্তে যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেল।

রামকিঙ্কর ভিতরে ভিতরে রাগে। কিন্তু কথা বলে না। রাগ সংযত করে। সহ্য করতে করতে সে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, বিস্ফোরণ হয়ে গেল।

কিন্তু সবাই বুঝলে যে, কাজটা ভাল করলে না। হরেকৃষ্ণ সাংঘাতিক লোক। এত বড় সুযোগ সে ছাড়বে না। এই অপমানের সে শোধ তুলবে।

বুঝলে রামকিঙ্করও। কিন্তু সে আর পারছে না। যা হবার হবে। শ্যামবাজারে তাগাদাতেও সে গেল না। গিয়ে কি হবে? চাকরিই যদি না থাকে ত তাগাদা কার জন্যে?

গিন্নীমা বিকেলের দিকে ঠাকুরদালানে বড় একটা বসেন না। বোধ হয় হরেকৃষ্ণের জন্যেই ব'সে ছিলেন।

হরেকৃষ্ণ এসে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিলে।

—আমাকে ডেকেছিলেন মা-জননী ?

—হ্যাঁ বাবা। তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। আমি একটা কথা ভাবছি।

গিন্নীমার কথার ভঙ্গীতে কথাটা খুব বাঁকা হবে ব'লে মনে হ'ল না। হরেকৃষ্ণ যেন একটু ভরসাই পেলে।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, রাম পড়াশোনা কি রকম করছে ?

হরেকৃষ্ণ হেসে বললে, পড়তে ত দেখি না। পড়াশোনায় খুব মন আছে বলেও মনে হয় না।

—পাস ত করে।

—সেইটেই আশ্চর্য ! কি করে ক'রে ওই জানে।

—ওর পরীক্ষা কবে ?

—তা ঠিক জানি না মা-জননী। তবে ওর চাল-চলন দেখে মনে হয় দেরি আছে।

—তার মানে পড়াশোনা করছে না। অথচ ওর পড়ার জন্যে আমি অনেক পয়সা ঢেলেছি।

—আপনার দয়ার শরীর, ঢেলেছেন। কিন্তু ওটা বোধ হয় জলেই ঢেলেছেন।

—তা বললে ত হবে না। অনেক কষ্টের পয়সা। যা ঢেলেছি তা নষ্ট করতে পারি না। আমি একটা কথা ভাবছি।

—আদেশ করুন।

—কাল সকালেই ওকে বই-পত্র নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিও। ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ খাবে, আর কর্মচারীদের মহলে একখানা খালি ঘরে থেকে পড়াশোনা করবে।

এ কী আদেশ !

অকস্মাৎ বজ্রপাত হলেও হরেকৃষ্ণ এমন চমকে উঠত না। দোকানের হাড়ভাঙা খাটুনি নেই। দিব্যি খাবে-দাবে আর পড়া করবে। হরেকৃষ্ণ মুখে যাই বলুক, মনে মনে তার সন্দেহ নেই যে, এমন সুযোগ পেলে রামকিঙ্কর অব্যর্থ পাস ক'রে যাবে। কেউ আটকাতে পারবে না।

গিন্নীমা আড়চোখে একবার হয়ত হরেকৃষ্ণের বিবর্ণ মুখের দিকে চাইলেন।

কিন্তু তখনই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আপন মনে বলতে লাগলেন, পয়সার অপব্যয় আমি সহ্য করতে পারি না। পাস ওকে করতেই হবে। যাও। কাল সকালেই ওকে পাঠিয়ে দেবে।

হরেকৃষ্ণ শেষ চেষ্টা করলে : কিন্তু দোকানের কাজ ?

—একজন লোক না থাকলে কি দোকান বন্ধ হয়ে যায় ? মাঝে মাঝে লোক ছুটিও ত নেয়। ক'টা মাস বই ত নয়।

গিন্নীমার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তির আভাস পেয়ে হরেকৃষ্ণ আর বেশি বলতে সাহস করলে না। চিন্তিত বিরস মুখে দোকানে ফিরে এল।

ক্রমশঃ

সমুদ্র-সৈকতে

শ্রীমিহির সিংহ

এণাক্ষী রায় নামটা শুনেই আমার ভাল লেগেছিল। সুবীর বলল, ভদ্রমহিলা বাংলা দেশের মেয়েদের তুলনায় সত্যিই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ওর অভ্যেস আছে গল্প-টল্প লেখার—খুঁজে-পেতে অনন্যসাধারণ মানুষদের সঙ্গে আলাপ করার বাতিকও আছে। তবে সাহিত্যিকোচিত রঙ চড়ানোর স্বভাবও যে তার আছে জানি, কাজেই মনে মনে উৎসুক হয়ে উঠলেও মুখে খুব বেশী ব্যগ্রতা দেখালাম না। তা ছাড়া ছোট্ট জায়গা, আলাপ পরিচয় প্রায় সকলের সঙ্গেই হবে—আগে থাকতে আগ্রহ দেখানোর দরকার কি?

মে মাসের মাঝামাঝি। বন্ধুবান্ধবের কাছে দীঘার গল্প শুনে শুনে আর কাগজে দীঘার বিজ্ঞাপন প'ড়ে প'ড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত খানিকটা অসময় হ'লেও সাত-আট দিনের ছুটি নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম দীঘা। নতুন জায়গা, শুনেছিলাম বড্ড ছোট—দলে ভারী হয়ে যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শেষ বেলায় কারুর হাতে পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ এল, কারুর ব্যাঙ্কে জরুরী কাজের চাপ হঠাৎ বেশী হয়ে উঠল। অগত্যা আমরা দু'জন আর সুবীরই রওনা হলাম। পুরী প্যাসেঞ্জারে যাত্রাটুকু মনোরম না হ'লেও বাস যখন দীঘা পৌছল তখন নতুন জায়গায় পৌছে খুব মন্দ লাগল না। উঠেছিলাম সমবায় সমিতির একটি বাড়ীতে। ভৃত্য যখন যোগাড়-যন্ত্র ক'রে নিয়ে রান্নায় লেগে গেল, আমরাও জামাকাপড় ছেড়ে পা বাড়ালাম জলের দিকে।

জলটা পুরীর মতন নয়—বেশ ঘোলা। তীরে যে ঢেউগুলো আসছে তাদের উচ্চতাও কম। তবে ধার দিয়ে ঝাউগাছের দিগন্ত-বিস্তৃত সারি চোখ জুড়িয়ে দিল। জলে নেমে ধারেই ব'সে পড়লাম, ক্লান্ত শরীর ব'লেই যেন জলের স্পর্শটুকু বেশী ক'রে উপভোগ্য ব'লে মনে হ'ল। আমরা যখন জলে নেমেছি তখন প্রায় ন'টা হবে। গোটা দশেকের সময় অনেক লোক, বেশ ভিড় হয়ে উঠল। আমরা খুব ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে চাইছিলাম না, লোকজনের আধিক্যও দূর থেকেই ভাল লাগবে ব'লে মনে হ'ল। একটু একটু ক'রে হেঁটে পুবে স'রে যেতে বেশ নিরিবিলি জায়গা, জলের মধ্যে গা এলিয়ে দিয়ে খুব বিলাসিতার ছোঁয়াচ পাওয়া গেল।

ভিড় আরম্ভ হয়েছে আমাদের থেকে প্রায় দুই-তিন ফার্লং দূরে। ঢেউ আসছে—অনেক লোকের মাথা উঠছে-নামছে—বাচ্চারা সরু গলায় চেঁচামেচি করতে করতে জলে ঝাঁপাচ্ছে। আর আমরা খানিকটা তফাতে। গোটা এগারোর সময়ে দেখি দু'টি ভদ্রলোক আর দু'টি মহিলা রাস্তা দিয়ে নেমে এসে এদিক্-ওদিক্ তাকাচ্ছেন, কোথায় নামা যায় জলে। তার পর আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন দেখে আমার গৃহিণী একটু চটেই গেলেন। বললেন, বেশ আছি আমরা একটু নিরিবিলিতে—ওদের এদিকে আসবার দরকার কি? আমি ঠাট্টা ক'রে বললাম, জায়গাটা ত আর আমার শ্বশুর মশায়ের কেনা নয়—ওদের যদি ইচ্ছে করে এদিকে আসতে ত বারণ করবার উপায় কি? কিন্তু তাঁরা দেখলাম আমাদের পেরিয়ে আরও পুবে গিয়ে তীরে জামা-কাপড় চটি রেখে জলে নামলেন। সুবীর বোধ হয় একটু মনঃক্ষুণ্ণই হ'ল, বলল, তা ওঁদেরও যখন ভিড় ভাল লাগছে না ব'লে মনে হচ্ছে তখন ত আমাদের এখানেই এলে পারতেন। গিন্নীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখে হেসে ফেলে বলল, আপনি চট্ছেন কেন, হয়ত দেখবেন আপনাদের কিংবা আমার চেনাই বেরোবে। গিন্নী বললেন, চেনা বেরোলে আপনারই চেনা বেরোবে। আমাদের অত চেনাজানা লোকের আধিক্য নেই।

সকালবেলা বাসে আসতে আসতে কাঁথিতে আর বাস থেকে নেমে দীঘার দোকান থেকে চা আর জলখাবার যা খেয়েছিলাম, তা যেন হঠাৎ আমাদের তিন জনেরই একসঙ্গে হজম হয়ে গেল। আমিই প্রথম বললাম, চল, এবার বাড়ী যাওয়া যাক্—একটু ভাত না খেলে আর পারা যাচ্ছে না। যখন উঠে আসছি তখন দেখি, আমার প্রতিবেশীরা জলের মধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন। লাল টুপী মাথায়

একজন ভদ্রমহিলা প্রথম ব্রেকারগুলো ছাড়িয়ে আরও ভিতরে, দুজন ভদ্রলোকই তাঁর সঙ্গে। আর একজন ভদ্রমহিলার মাথায় সবুজ টপী, তিনিও বেশ খানিকটা এগিয়ে। গিন্নীর বোধ হয় ঈর্ষা হ'ল, বললেন, আমিও যেতে পারি অতদুর। আমি বললাম, নিশ্চয়ই পার, তবে আমি পারি কি না জানি না।

বাড়ী এসে তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাত কদ্দুর? সে হেসে বলল, মুর্গী পেয়েছিলাম, কারী হয়ে গিয়েছে, ভাতও প্রায় হয়ে এল। আমরা চকিতে স্নান ক'রে টেবিলে বসতে বসতেই মনে হ'ল, খাবারের ঠোঙাগুলো খালি হয়ে উঠল—ভাতের পাত্রটা ত নিঃশেষই হয়ে গেল। আমরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে ভাবলাম, তেওয়ারী বেচারীরও ত ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, এখন ও ভাত চাপাবেই বা কখন, খাবেই বা কখন। গিন্নী একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বললেন, তেওয়ারী, তুমি আর একটু ভাত চাপিয়ে দাও, অল্প চাল এখুনি হয়ে যাবে। তেওয়ারী সবিনয়ে বলল, ভাত সে আগেই চাপিয়ে দিয়েছে। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসলাম।

আমার চুরুটের বাক্সটা খুলে সুবীরকে একটা দিতে যেতে সে বলল, সিগারেটই ভালো। আমি মানুষের রুচির সম্বন্ধে আঘাত করা উচিত নয় মনে ক'রে চুরুটটাকে ভালো ক'রে ধরিয়ে বললাম গিন্নীকে, দেখ বাম্নি, মেয়েদের এইটা ভয়ানক লোকসান—ক্লান্তির পরে সমুদ্র স্নান, তারপর আর একবার স্নান ক'রে মুর্গি দিয়ে ভাত খাওয়া—তারপরে যদি একটু ধূমপানই না করতে পারলে ত জীবনই বৃথা। গিন্নীর দিক থেকে সাড়া না পেয়ে দেখি তিনি একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফিরে দেখি সবুজ টুপী মাথায় আর লাল টুপী মাথায় দু'টি মহিলা তোয়ালে মাথায় দু'টি ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। আমি সুবীরকে বলতে যাব, ঐ আপনার বন্ধুরা যাচ্ছেন, এর মধ্যে সুবীরই আশ্চর্য্য হয়ে ব'লে উঠল, আরে, এ ত দেখছি এণাক্ষী রায়। গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন, কে এণাক্ষী রায়? সুবীর বলল, এণাক্ষী রায়ের নাম শোনেন নি? পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে গান গাইতেন, এখনও বোধহয় দুটো-একটা রেকর্ড পাওয়া যাবে বাজারে। গিন্নী আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে? ওর বয়স কত হবে এখন? সুবীর গম্ভীর ভাবে বলল, মহিলাদের বয়সের হিসেব করাটা কি উচিত হবে? ধরুন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে হয়ত ওঁর বয়স ছিল উনিশ-কুড়ি কি ওর কাছাকাছি। আমার এক নজর দেখে মনে হয়েছিল, ভদ্রমহিলারা দুজনেই তিরিশের কোঠায় হবেন, একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, কিন্তু কোন্‌জনের কথা আপনারা বলছেন তাই ত বুঝতে পারছি না। গিন্নী অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, ঐ ত লালটুপী মাথায়। আমি বললাম, কি ক'রে বুঝলে উনিই এণাক্ষী রায়, সুবীরবাবু নয় ওঁকে চেনেন, তুমি ত চেন না। গিন্নী বললেন, দেখলেই বোঝা যায় মানুষটা অন্যরকম, খুব চোখে পড়ে। আমি সর্ব্বজনবিদিত মহিলাসুলভ অন্তর্দৃষ্টির এরকম চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে আর কিছুই বলতে পারলাম না, শুধু বললাম, নামটা বেশ।

আমাদের বাড়ীটার সামনেই সেচবিভাগের চমৎকার একটি রেষ্ট-হাউস। একটা ছোট টিলার উপর। ভদ্রমহিলারা তাঁদের সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে রেষ্ট-হাউসে উঠে গেলেন। গিন্নী এতক্ষণ একদৃষ্টে তাঁদের দেখছিলেন ঘাড় ফিরিয়ে। একবার সোজা হয়ে ব'সে সুবীরের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকালেন। সুবীর তাঁর প্রশ্ন বুঝতে পেরেছিল, বলল, দিল্লীতে আমার পিসীমার বাড়ীতে যখন ছিলাম তখন আলাপ হয়েছিল, তখন দিল্লীতেই থাকতেন। আমি তিনপুরুষে কলকাতার লোক, দিল্লীর বাসিন্দাদের সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন বিরূপ মনোভাব একটা এসে পড়ে। মনটা দমে গেল, ভাবলাম, ওখানকার কোনও বড় সাহেব কিংবা মেজ সাহেবের স্ত্রী হবেন। কিন্তু সুবীর আমি কিছু মন্তব্য করার আগেই বলল, সব সিভিলিয়ানদের মেমসাহেবদের মধ্যে উনিই ছিলেন বোধহয় একমাত্র ওয়ার্কিং ওম্যান। আমি বললাম, বটে? ওয়ার্কিং ওম্যান মানে কি সমাজ-সেবা, না রেডক্রস? সুবীর বলল, না না, সখের কাজ নয়, দস্তুরমত খেটে-খাওয়া মানুষ। গিন্নী হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে বললেন, না সুবীরবাবু, এখন কিছু বলবেন না, আমাদের ত আলাপ হবেই হয়ত, আগে থেকে বললে সব আনন্দটা নষ্ট হয়ে যাবে। তার চাইতে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হোক, তার পরে আপনার কাছ থেকে সব শোনা যাবে।

আলাপ অবশ্য হ'ল আমারই সব চাইতে আগে। বিকেল বেলা হু হু হাওয়ার মধ্যে ঝাউবনের ধারে বড় আরামে কাটলেও রাত্রে হাওয়া প'ড়ে গেল, সমবায় সমিতির

বাড়ীগুলোতে পাখা নেই—থাকলেও লাভ হ'ত না, কারণ রাত্তির বেলা বিদ্যুৎ বন্ধ। ফলে গরমে খানিকটা কষ্ট হ'লই। আগের রাত্রের শ্রান্তি আর তার পরে আর একটা রাত ভাল ক'রে না ঘুম হওয়ায় ভোরবেলা যখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম তখন চোখ জ্বালা করছে, শরীরটাও খুব ভাল লাগছে না। তখনও আলো ফোটে নি ভাল ক'রে। ওরা ঘুমোচ্ছে, তেওয়ারীও বারান্দায় বিছানা ক'রে ঘুমোচ্ছে। ভাবলাম, আর না শুয়ে, যাই একটু চক্কর মেরে আসি।

দীঘার সমুদ্রতট পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত, ভাবলাম সূর্য্যোদয়ের চেহারা পূবদিকে এগোলেই ভাল। ভোরবেলায় ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে সে বড় সুন্দর অভিজ্ঞতা। ডানদিকে গৈরিক জল আছড়ে আছড়ে এসে পড়ছে, বাঁদিকে ঝাউবন যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর প্রসারিত, তাদের পায়ের তলায় বালির পাহাড় তৈরী হয়েছে প্রকৃতির নিয়মে। পৃথিবীতে যেন আমি একা—সমস্ত বেলাভূমিতে গতরাত্রের জোয়ারের চিহ্ন, সামনে সামনে শুধু আমার অগ্রবর্ত্তী একটা কুকুরের পায়ের ছাপ। আমি এক-একবার আকাশের লাল সোনালী মেঘ-গুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম, আবার এক-একবার নীচু হয়ে ঝিনুক কুড়োচ্ছিলাম। মধ্যে মধ্যে এক-একটা জেলি ফিশ কিংবা সামুদ্রিক মাছ। ঐরকম একবার হেঁট হয়ে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল একজোড়া পায়ের ছাপ। ততক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল এই বিশাল নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমিই একা—হঠাৎ স্বপ্ন-ভাঙ্গার মতন এপাশ-ওপাশ ফিরে দেখার চেষ্টা করলাম আমার পাশেই কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। পাশে অবশ্যই কেউ ছিল না তবে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, জলের কিনারা দিয়ে আর একটি মানুষের পায়ের ছাপ ঐ পূবদিকেই এগিয়ে গিয়েছে। বোধ হয় সেও নিচু হয়ে কুৎসিত-দর্শন মাছটাকে দেখেছিল তাই ঐখানে পায়ের ছাপটা অত স্পষ্ট।

বেলাভূমিটুকু শেষ হয়েছে মাইল-তিনেক দূরে একটা ছোট নদী বা খালের মতন জলের ধারায়। অপরিচ্ছন্ন কাদা-ভর্ত্তি জায়গাটাকে দেখে মনটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ঝাউবনও নেই, তার পরিবর্ত্তে ছোট ছোট গাছের স্যাঁতস্যাঁতে দেখতে জঙ্গলে-ঢাকা খালের ওপাড়। তার উপর দিয়ে সূর্য্যোদয়ে মন ভরল না। ফিরবার পথে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলাম, এমন সময়ে ডানদিকে দেখলাম বালিয়াড়ীর চেহারা, ঝাউবন ছাড়া, বেশ চোখে পড়ে। আসবার সময়ে দেখি নি, সূর্য্যোদয়ের দিকে মন ছিল ব'লে বোধ হয়। কেয়াগাছের সারি পেরিয়ে বালিয়াড়ীর উপর উঠে দেখি ভারি সুন্দর। একপাশে বালি পেরিয়ে সমুদ্রের জল আর একপাশে সবুজ কেয়াবন পেরিয়ে তার চাইতেও সবুজ মাঠ-বন-ক্ষেত। বালিয়াড়ীর উপর দিয়েই আসছি এমন সময়ে দেখা এণাক্ষী রায়ের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ আগে পায়ের ছাপ দেখে বুঝেছিলাম আমি ছাড়া আরও একজন কেউ এসেছে এদিকে। কিন্তু তিনি যে মহিলা বা আগের দিন দেখা সুবীরের পরিচিত এণাক্ষী রায়ই তা ভাববার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু তাঁর চশমার ফ্রেমটা দেখে আমি এক মুহূর্ত্তে চিনতে পারলাম যে, তিনি এণাক্ষী রায়ই। অবশ্য আমার নিজের মনে মনে আমি এটাও স্বীকার করি যে, চশমার ফ্রেম ছাড়াও তাঁর হাঁটা-চলার মধ্যেই এমন একটা কিছু ছিল যে, দেখেই চিনবার কথা এণাক্ষী রায় ব'লে।

এণাক্ষী দেবীও বোধ হয় বালিয়াড়ীর প্রান্তে গিয়ে ওপাশের সবুজ দেখছিলেন। আমার সঙ্গে একটা বালির ঢেউয়ের মোড় ফিরতে দেখা হয়ে যেতে আমিও চমকে গেলাম, তিনিও। এত কাছাকাছি যে, কিছু একটা কথা না বললে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায় আবহাওয়াটা। আমি বললাম, এপাশের সমুদ্র আর ওপাশের সবুজ মাঠের মধ্যে বেশ একটা বৈপরীত্য আছে বলতে হবে। তিনি একটু হাসলেন। সে বেশ সুন্দর হাসি। হাসিটা যেন সুরু হ'ল চোখ দুটোতে, তার পরে নাকের দু'টি পাশ একটু কাঁপল, ঠোঁট দু'টি একটু স্ফীত হয়ে ধবধবে সাদা দু'পাটি দাঁতের কিনারা দেখা দিল। ভাবলাম বোধ হয় বাঁধান দাঁত। এণাক্ষী দেবী খুব নিচু গলায় ধীর ভাবে বললেন, অনেক কেয়া গাছ, ফুলগুলো পাড়া বোধ হয় খুব মুশকিল।

বহু বৎসর নিরুদ্বেগ বিবাহিত জীবন-যাপনের পরে মহিলাদের সামনে বীরত্ব দেখানর প্রবণতাটা মরেই গিয়েছিল ভাবতাম। এণাক্ষী দেবীর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে, আমার সুপ্ত শৌর্য্য হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বললাম, কেয়া চান, দাঁড়ান দেখি তোলা যায় কি না। তোলা অবশ্য গেল তবে যথেষ্ট পরিশ্রম এবং সময়ের বিনিময়ে। লাভও হ'ল—আমার দুর্দ্দশার মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয়টা প্রথম বাধা দ্রুত কাটিয়ে উঠল—পোশাকী চায়ের

আসরে যা হ'তে সময়টা অনেকটা বেশী লাগত। গোটা তিনেক কেয়া-সমেত আমরা যখন আবার সহরে পৌছলাম তখন সূর্য্য অনেকটা ওপরে উঠেছে, রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে লোকজনের ভিড় সুরু হয়ে গিয়েছে।

এণাক্ষী দেবী তাঁর নাম আমায় বলেন নি, আমিও নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি। পুরীর সঙ্গে দীঘার তফাৎ, বরাবর ঝাউবনটা না থেকে বালিয়াড়ী হ'লে ভালো হ'ত কি খারাপ হ'ত এই সব ধরণের আলোচনাই হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসেন, মহিলাসুলভ জড়তা নেই ব্যবহারে, অকারণ কৌতুহলও নেই। মেয়েরা কি ভাবে তাঁকে নেবে তা বুঝতে পারছিলাম না, তবে ছেলেরা যে তাঁকে পছন্দই করবে তা স্পষ্ট বুঝেছিলাম। ব্যক্তিগত কথা আমিই প্রথম বললাম। বললাম, তিনি আগের দিন সকালে যে জলের মধ্যে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন তা আমাদের চোখে পড়েছিল। সলজ্জ হেসে বললেন, ছেচল্লিশ বছর বয়স হয়েছে, এখন ঐটুকু এগোতে পারাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। প্রশংসা কুড়োনোর জন্যে কথাটা তিনি বললেন না, তা আমি বুঝতে পারলেও প্রশংসাযোগ্য মনে হ'ল নিজের বয়সটা এভাবে স্বীকার করাটাকে। বললাম, আপনাকে দেখে পঁয়ত্রিশের চাইতে বেশী বয়স ব'লে মনে হয় না। হাসিতে তাঁর গালে টোল পড়ল, খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বললেন, সেটা ত আমার নিন্দেই হ'ল, মেয়েদের বয়স হ'লে খুকী সেজে থাকাটা ভাল কথা নয়। আমি প্রতিবাদ ক'রে বললাম, এটা কোনও কাজের প্রশ্ন নয়; এটা মানুষের মনের বয়সের প্রশ্ন; বুড়ো হয়েছি মনে করলেই মানুষ সত্যিকারের বুড়ো হয়। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে তিনি বললেন, বুড়ো বোধহয় সত্যিই হব না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা খুব অতি বুড়ো ভাব লুকিয়ে আছে, বয়স বেড়ে আর বুড়ো হব না। কথাটার মানে বোঝবার চেষ্টা করতে করতে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছিলাম। বললাম, আমরা এই বাড়ীটায় উঠেছি। এণাক্ষী দেবী বললেন, আমরা ঐ বাংলোটায় আছি—আসবেন না একসময়ে। আর ফুল-গুলোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ। তিনি এগিয়ে গেলেন, আমি আমাদের উঠোনে পা দিলাম।

বাড়ীতে ঢুকে দেখি ওরা নেই, তেওয়ারী বলল, বাজারে গিয়েছে কেনাকাটা করতে। ওরা বাড়ী ফিরতে চায়ের টেবিলে খুব সহজভাবে বললাম, এণাক্ষী দেবীর সঙ্গে আজ যখন বালিয়াড়ী থেকে ফিরছিলাম তখন দেখলাম একটা মরা হাঙর পড়ে আছে ঝাউবনের ধারে। গিন্নী ব'লে উঠলেন, এণাক্ষী দেবীর সঙ্গে? আর একই সঙ্গে সুবীর জিজ্ঞাসা করল, কোন্ বালিয়াড়ী? চটানোর জন্যে আগে সুবীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে সুরু করতে তিনি ভয়ানক বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, রাখ তোমার বালিয়াড়ী, এণাক্ষী দেবীর সঙ্গে কোথায় আলাপ হ'ল? যেন অনিচ্ছা সহকারে বর্ণনা করলাম সব ব্যাপারটা—অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি, কেয়াফুলের ব্যাপারটা গোপন রেখে। এণাক্ষী দেবীর সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁর সম্বন্ধে আমার কি মনে হয়েছে তাও বললাম। সুবীরের খুব মজা লেগেছিল—সে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, এবার তো বোঝা গেল ভদ্রমহিলা একটু অসাধারণ কি না? গিন্নী অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, হুঁ।

সেদিন কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। তবে অন্য আলাপীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। গিন্নীর এক দূর-সম্পর্কের দাদা আর তাঁর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ত বেশ জমেই গেল। অনেক হৈ হৈ ক'রে সারা দিন কাটল। বিকেল বেলা আবার সেই ঝাউবন, সন্ধ্যেবেলায় 'বে কাফে'র দোতলার ছাতে জলো কফি খাওয়া আর অবাঞ্ছিত ট্র্যান-জিষ্টার রেডিও মারফৎ কলকাতা বেতারের নাটকের সঙ্গে রেডিও সিলোনের ফিল্মী গানের সংমিশ্রণ সহ্য করা। রাত্রে হাওয়া ছিল তাই ঘুমটাও বেশ ভালই হ'ল। পরদিন সুরু হ'ল আমার গিন্নীর জল-অভিযান। কোনও মেয়ে ত বটেই, কোনও ছেলেই যেন তাঁর চাইতে আগে না এগোতে পারে এই যেন তাঁর পণ। আমি তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারব না জানতাম। তবু চেষ্টা করতে গিয়ে পরস্পর দুটো রোলারের মধ্যে এমন নাকানী-চোবানী খেলাম যে, সুবীর এবং অন্য সহৃদয় ব্যক্তিদের হাতে তাঁর দায়িত্ব অর্পণ ক'রে আমি তীরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। কখন এণাক্ষী দেবীরা এসেছেন লক্ষ্য করি নি, হঠাৎ আমার পাশ দিয়ে দু'-তিন জনের যাওয়ার শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি তিনি এবং তাঁর সঙ্গিনী ভদ্রমহিলা এবং একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সঙ্গিনীটি নিশ্চয়ই তাঁর চাইতে বয়সে ছোট কিন্তু তাঁর চাইতে অনেক কম চটপটে।

ভদ্রলোককে দেখে কিন্তু আমার কেমন একটা অস্বস্তি লাগল। বয়স হয়েছে, ভুঁড়ি আছে। মাথার চুল বেশীর ভাগ সাদা, কিন্তু চেহারায় বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে কেমন যেন অসংযত চপলতার ছাপ।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে এণাক্ষী দেবী আমাকে প্রতিনমস্কার ক'রে বললেন, ইনি আমার স্বামী নীলমাধব রায় আর ইনি আমাদের বন্ধু মিসেস দত্ত। আমি নিজের নাম বলতে এণাক্ষী দেবী বললেন, আপনার সঙ্গীরা দেখছি আজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, গিন্নীর আজ খুব সাহস বেশী, আমি সঙ্গে সঙ্গে যেতে গিয়ে নোনা জল খেয়ে ফিরে এসেছি। তাঁরা জলের মধ্যে এগিয়ে গেলেন। গিন্নীরাও বোধহয় একটু পিছিয়ে এলেন। দূরে ব'সে ব'সে মনে হ'ল, দুই দলের মধ্যে গল্প বেশ ঘনিয়ে এল। তীরে যখন ফিরলেন তখন দেখলাম আমার ধারণা মিথ্যা নয়—ফিরলেন সবাই একসঙ্গে পুরনো পরিচিতের মতন।

তার পরে দু'-তিন দিনের মধ্যে সমুদ্র-তীরে যেমন বন্ধুত্ব হঠাৎ হয় তেমনি তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। তাঁদের সঙ্গে অবশ্য বলা উচিত নয়। মিষ্টার রায় আর তাঁর বন্ধু মিষ্টার দত্ত বেশীর ভাগ সময়েই আলাদা ব'সে বোধ হয় কাজকর্ম্মের কথা আলোচনা করতেন। মিসেস দত্ত আর মিসেস রায়ই আমাদের সঙ্গে জলে কাটাতেন কয়েক ঘণ্টা ক'রে আর কয়েক ঘণ্টা কাটাতেন বে কাফের দোতলায় ব'সে। তৃতীয় দিন গিন্নী বললেন, এণাক্ষী দেবীরা সেদিনই চ'লে যাচ্ছেন—ট্রেণে নয়, গাড়িতে। আমি যে সব সময়ে তাঁর সঙ্গে খুব গল্প করতাম তা নয়, দূর থেকে দেখতাম, কিংবা অন্যমনস্ক হয়ে পাশে ব'সে শুনতাম তাঁরা দু'জনে আমার গিন্নী আর সুবীরের সঙ্গে পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন, বন্ধুত্বের বোধ হয় সেটা বড় লক্ষণ। তবু চ'লে যাবেন শুনে খারাপ লাগল। বললাম, তাই ত, আমার বড় ভুল হয়ে গেল। ওঁকে দেখে এত কৌতূহল হয়েছিল অথচ ভাল ক'রে আলাপই করা হ'ল না, কোনও পরিচয়ই পেলাম না। গিন্নী আর সুবীর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে হেসে বললেন, সব পরিচয় আমরা জোগাড় করেছি, তোমায় বলব—তোমার চুরুট খাওয়া আর কবির মতন আকাশ-পাতাল চিন্তা শেষ হোক্, তার পরে বলব। আমি প্রতিবাদ ক'রে বললাম, চুরুটই খাই আর যাই খাই না কেন, গল্প শুনতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত, তোমরা আমাকে বল না তাই।

ফলে সুবীর এবং আমার গিন্নীতে মিলে আমাকে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর বেলা সমুদ্রের ধারে ঝাউবনে ব'সে এণাক্ষী দেবীর গল্প বললেন। সুবীরই বলল, গিন্নী মধ্যে মধ্যে তাঁর নিজের সংগৃহীত একটি-দু'টি কথা যোগ করলেন। তবে গিন্নীও যেন শ্রোতার দলেও ছিলেন, এত তন্ময় হয়ে শুনছিলেন সুবীরের কথাগুলি, যদিও বুঝতে পারছিলাম যে, তাঁর আগেই শোনা হয়ে গিয়েছে একবার।

এণাক্ষী দেবীর বাবা কলকাতার খুব বনেদী পরিবারের মানুষ। বনেদীও বটে এবং আমরা যাকে বেণে বলি তাও বটে। ভবিষ্যৎ-স্বামীর সঙ্গে আলাপ হয় কোনও একটি বিয়েবাড়ীতে। প্রথম দর্শনে প্রেম হয় না, এটাই বিচক্ষণ মানুষের ধারণা। কিন্তু তাঁদের প্রেম সুরু হয়েছিল প্রথম দর্শনেই। ছেলেটি ছিল অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের। অনেক অনেক রঙীন কল্পনা আর আদর্শ ছাড়া আর কোনও পুঁজি তার ছিল না। কিন্তু এণাক্ষী তাকে পছন্দ করেছিল। বাবাকে যখন বলতে গেল তখন সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল ছেলেটির কচিৎ যাতায়াতের পথে। প্রথম দু' একদিন বিচলিত ভাব প্রকাশের পরে এণাক্ষীকে দেখে আর কেউ বুঝতে পারে নি যে, তার মনে কোনও দুঃখ আছে। কিন্তু একুশ বছর বয়সে বি. এ. পাশ করবার পরে তার মা যখন তার জন্যে আনা আর একটি বিয়ের সন্ধান নিয়ে তাকে পীড়াপীড়ি করতে গেলেন তখন সে বলল যে, বিয়ে করতে হলে পাত্রের জন্যে সে বাবা-মার উপরে নির্ভর করবে না।

এ রকম কথা সেই পুরণো বাড়ীতে কেউ কখনও শোনে নি। কিন্তু তার ধাক্কা কাটিয়ে উঠবার আগেই সেই রাত্রে এণাক্ষী নিরুদ্দেশ হ'ল বাড়ী থেকে। যখন তার সন্ধান পাওয়া গেল, তখন সে নিজের পরিচয় দিল সেই তিন বছর আগে-দেখা বাগ্‌দত্ত যুবকের স্ত্রী হিসাবে। পুলিস যথারীতি মেয়ের বাবার নালিশ অনুসারে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু আত্মীয়-স্থানীয় একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ত্তার হস্তক্ষেপে সেটা সেখানেই স্থগিত রইল। কিন্তু ক্রুদ্ধ পিতার হস্তক্ষেপে ছোট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যুবকটির সামান্য চাকরিটিও গেল চ'লে। পিতা ভেবেছিলেন, মেয়ে অপারগ হয়ে

তাঁর দাক্ষিণ্য-প্রত্যাশী হবে। তিনি জানতেন যে, যুবকটির না আছেন বাবা-মা বা আর কোনও সংস্থান। কিন্তু জেদী মেয়ের দেখা মিলল না। তার গানের সখ, গয়না পরার সখ—কিশোরীসুলভ সব কিছুকেই যেন সে নিজের জীবন থেকে বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু তাদের দু'জন মানুষের সংসারটাকে অবিচারী পৃথিবীর প্রতিকূল স্রোতে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করল।

মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ—তারও পরে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার ঢেউয়ের সামনে তারা শেষ পর্য্যন্ত চেনা-পরিচিত সকলের কাছ থেকেই দূরে স'রে গেল। শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার পরে সহসা একদিন বাংলা সাহিত্যের জগতে নতুন এক তারকার উদয় হ'ল—যাঁর বস্তিবাসের পটভূমিকায় লেখা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রাতারাতি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্য্যাদা নিয়ে এল। সেইদিন কৌতুহলীদের কাছে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেল সাহিত্যিকের জীবন-সঙ্গিনী সেই পুরণো এণাক্ষীই; হঠাৎ নামকরা সাহিত্যিকের স্ত্রী হ'লেও এখনও শহরের উপকণ্ঠের কোনও বস্তির বাসিন্দা। সাহিত্যিকের আরও বই বেরোল। ছোট গল্প, কবিতা এমন কি প্রবন্ধতেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

তাঁর নিকটতম ভক্তদের কাছে অবশ্য শোনা যেত যে, সাহিত্যিকের জীবনে যা কিছু ঘটেছে তার পিছনে আছেন স্বয়ংসিদ্ধ এণাক্ষী। লোকে বলত, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বামীর মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার উপরে তাঁর আস্থা অক্ষুন্ন ছিল। নিজে লোকের বাড়ীতে মেয়ে পড়িয়েছেন, পরে স্কুলে পড়িয়েছেন, চাকুরি গিয়েছে, তখন প্রসাধন-সামগ্রীর বিক্রেতা হিসেবে দরজায় দরজায় ঘুরেছেন। স্বামী দারিদ্র্যের মধ্যে প্লুরিসিতে আক্রান্ত হয়েছেন—চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাস্তুতে বাসা নিয়েছেন, আবার নতুন চাকুরিতে ঢুকেছেন। কিন্তু এর মধ্যে সমস্ত বাধা-সত্ত্বেও স্বামীকে ব'লে এসেছেন, তিনি বড় সাহিত্যিক হওয়ার জন্যেই জন্মেছেন। তা তাঁকে হ'তেই হবে। সাংবাদিকদের কাছে সাহিত্যিক ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, তাঁর প্রথম উপন্যাসটি লিখতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল।

গিন্নীও স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। বললেন, অথচ উনি নিজে নিজেকে এভাবে উৎসর্গ ক'রে না দিলে হয়ত বড় গাইয়ে হ'তে পারতেন। সুবীর বলল, তাতে প্রশ্ন এই যে, তিনি বড় গাইয়ে হ'লে সেটা বেশী বড় ব্যাপার হ'ত, না তাঁর স্বামী এত বড় সাহিত্যিক হয়েছেন ব'লে সেটা বেশী বড় ব্যাপার হয়েছে! তাঁর সৌন্দর্য্য এখনও যা রয়েছে, তাঁর যা ধরণ-ধারণ, তাতে এটা ত স্পষ্ট যে, অসুখী বা অতৃপ্ত তিনি নন। অনেকক্ষণ আমরা চুপ্‌চাপ্ ব'সে রইলাম। বিকেল হয়ে আসছে। চারিদিকে একটা প্রশান্ত অথচ বিষণ্ণ আবহাওয়া। ঝাউবনের তলায় আলোটা ম'রে আসছে। আমি ভাবছিলাম, ঐ মিষ্টভাষিণী, মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলার জীবনে এত দীর্ঘকালব্যাপী তিক্ততা গিয়েছে, একথা কে বলতে পারত? হঠাৎ আমার গিন্নী প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা সুবীরবাবু, ওঁর স্বামী কি নামে লেখেন? কার স্ত্রী উনি? নীলমাধব রায় নামে ত কোনও সাহিত্যিক নেই। আমার চকিতে মনে হ'ল অন্য একটি কথা—ঐ নীলমাধব রায়ের জন্যে ভদ্রমহিলা এত করেছেন? ঐ ভুঁড়িওয়ালা অহঙ্কারী চটুল-স্বভাব প্রৌঢ়ের জন্যে? সুবীর আমার ভাবনাটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সেই কথাটাই আমি বলি নি আপনাদের; বছর দুয়েক হ'ল ভদ্রমহিলা ওঁর সাহিত্যিক স্বামীকে ডিভোর্স করেছেন। নীলমাধব রায় সেচ বিভাগের বড় কর্ত্তা, ওঁর দ্বিতীয় স্বামী—বাংলা দেশে বোধ হয় বিশেষ নেই ঐ পদার্থটি! ঝাউগাছের উপরে কাকগুলো হা হা ক'রে হেসে উঠল।

পরিভাষা ঃ দু'চার কথা

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

নিচের ছত্র কয়টি পড়ুন—

সহসা সামনের পর্দাটি সরিয়া গেল। মঞ্চের মোহময় আলোকে দেখি বৃদ্ধ ওস্তাদ সেতারের তারে হাত বুলাইতেছেন, আর কি যেন এক আশ্চর্য সোহাগ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সভাগৃহে সমস্ত বিশৃঙ্খল শব্দ ততক্ষণে নিঃসাড় হইয়া গিয়াছে।

বর্ণনার মানে বেশ পরিষ্কার। পর্দা—তার—আলো—শব্দ, অর্থের কোন গোলমাল দেখি না। আর হবারই বা কি আছে? মঞ্চের পর্দা আমরা কতবার দেখলাম, সেতারের তার আমাদের স্পর্শে সঙ্গীতময় না হোক্, তার জিনিষটা অন্তত অজানা নয়। আঁধারের বিপরীতে আলোকে চিনেছি। আর শব্দ? এক বধির ছাড়া কে না তার অহরহ পরিচয় পাচ্ছে।

কোন কোন আলোচনার ক্ষেত্রে এসে আমাদের এই সহজ পরিচিত কথাগুলির মানে কেমন যেন মোচড় খায়। বিশেষ তাৎপর্যের যোগ পেয়ে তারা তখন এক নূতন রূপ নিয়ে ওঠে। অত্যধিক ঠাণ্ডায় পাতিলেবুর চেহারা যেমন বদল হয়,—কিন্তু এ শুধু উপমা হ'ল। আসলে জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক বিষয় আজকাল এমন সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছে যে, শুধু সাধারণ ধরাবাঁধা কথার মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয় না। পরিভাষার প্রয়োজন ঠিক এখানে। সাধারণ ঘরোয়া কথাগুলিতে যা বলা হ'ল না, তার অনেকটাই আবার বলা চলে যখন দেখি তার স্বাভাবিক অর্থকে কিছুটা গড়েপিটে বদলে নেওয়া হয়েছে। ভাষার মধ্যে শব্দের কিছু পরিবর্তন হ'ল, কিন্তু এই পরিবর্তন চিরকালই ত হয়ে আসছে। আজকের বিজ্ঞানের কারণে তাতে এখন নূতন ধারণা ও তাৎপর্য যোগ করা হ'ল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তার অর্থ-সীমানা পরিমিতও করা হচ্ছে। তবে এই পরিবর্তন যে দিকেই হোক্ না কেন, তা হওয়া চাই বিশেষরূপে নির্দিষ্ট। একবার যে ধারণা ও অর্থ আরোপ করা হ'ল সহজে তার পরিবর্তন চলবে না।

মেশিনের টুক্রো অংশগুলি যেমন। সাধারণ কোন কাজে হয়ত একখণ্ড লোহা হ'লেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে তা যখন ব্যবহার করতে চাই, আকারে-প্রকারে সেটি নির্দিষ্ট হ'তে হবে। যদি কিছু বড় হয়, যন্ত্রের মধ্যে তার সংস্থানই হবে না; ছোট হ'লে সেদিকে বোধ হয় অসুবিধা নেই—কিন্তু সমস্ত যন্ত্রটার ব্যাপারেই ঢিলেমি দেখা দেবে। পরিভাষার ধারণা নিয়েও ঠিক এই কথা। সাধারণ কথাগুলির মত স্থিতিস্থাপক নয়—পরিভাষার অর্থ একবার যা গৃহীত হয়েছে সামান্য কারণে তার পরিবর্তন চলবে না।

উল্লিখিত পরিভাষা কয়টির সামান্য ব্যাখ্যা আমাদের বক্তব্যকেই পরিপূরণ করবে—

পর্দা—সাধারণ অর্থ বাধা বা প্রতিবন্ধক। কিন্তু চুম্বকের প্রভাব বা শক্তি-নিয়ন্ত্রণের জন্য লোহার যে পাত ব্যবহার হয়, সাধারণ পর্দার সঙ্গে তার আপাত মিল না থাকলেও বিজ্ঞানের বইয়ে তা এক ধরণের পর্দা। স্পষ্টতই পর্দা কথাটির মানে এখানে প্রসারিত হচ্ছে।

সেতার বা যে কোন সঙ্গীত-যন্ত্রে তারের সংজ্ঞা—বিজ্ঞানী রেলের মতে—দু' বিন্দুতে দৃঢ়ভাবে বাঁধা নিখুঁত নমনীয় ধাতুর সূত্র, যার একক দৈর্ঘ্যে বস্তু-পরিমাণ সর্বত্রই সমান। নমনীয় বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে কোনরূপ বলপ্রয়োগ ছাড়াই যা বেঁকে যায়, অর্থাৎ এককথায় যা কিনা অসম্ভব। তবে সঙ্গীত-যন্ত্রের তার এই সংজ্ঞার খুব কাছাকাছি যথার্থ থাকে।

আলো—এক ধরণের শক্তি, যা গ্রহণ ক'রে আমাদের চোখে সমস্ত কিছু দর্শনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস যেমন নিজে না জ্বললেও দহন কাজে সহায়তা করে, আলোও তেমনি আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় হ'লেও নিজেকে কখনো দৃশ্যমান ক'রে তোলে না। অবশ্য বর্তমানে এমন অনেক আলোর খোঁজ পাওয়া গেছে যা আমাদের দেখার কাজে লাগে না। এক্স্-রে, গামা-রে, আলট্রাভায়োলেট-রে ইত্যাদি এই ধরণের আলো। বিজ্ঞানের ভাষায় আলো হচ্ছে তড়িৎ-চুম্বকের তরঙ্গ-বিশেষ। এই তরঙ্গের রকমারি দৈর্ঘ্য মানুষের ধারণায় বিচিত্র আলো হয়ে ধরা দিচ্ছে।

শব্দ—এক ধরণের শক্তি, আমাদের কানে প্রবেশ ক'রে শব্দানুভূতি জাগায়। সব আলোতে যেমন আমরা দেখি না, কোন কোন শব্দ তেমনি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নীরব। আলোর মত শব্দও তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে থাকে। তবে তার প্রকৃতি খুবই তফাৎ। শব্দ বায়ু বা অন্য কোন জিনিষের উপর ভর ক'রে আমাদের মনে সাড়া জাগিয়ে তোলে, আলোর জন্য অনুরূপ কোন বাহন প্রয়োজন হয় না।

সাধারণ ভাষা-চর্চার সময় দুরূহ কথাগুলির মানে যেমন আমরা বিশেষভাবে জেনে রাখি, বিজ্ঞান আলোচনার সময়ে তেমনি তার পরিভাষার তাৎপর্য বুঝে নিতে হবে। এই পরিভাষা সব সময়েই যে সাধারণ পরিচিত শব্দ থেকে তৈরি হবে এমন কথা নেই, বস্তুত তা সম্ভবও হয় না। কিন্তু কথা পরিচিত কিংবা অপরিচিত যাই হোক্ না কেন, উদ্দেশ্য সেই একই থাকে। নির্দিষ্ট আকারে বেঁধে আমাদের মনে এক বিশেষ ধারণার সঞ্চার করা। এই প্রকাশ-পর্বের কথা যখন ভাবি—প্রশ্ন জাগে, পরিভাষা কি ভাষার দুর্বল অংশ নয়? সাধারণ কথার মানে জীবন্তভাবে সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। সার্থক-সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় শব্দের চকমকি জ্বলে। পরিভাষার মানে সেদিক্ দিয়ে বড় স্থির। চারাগাছের চারিধারে বেড়া বেঁধে দেওয়া হয়, পরিভাষাগুলিও যেন তেমনি নির্দিষ্ট সীমারেখার বাঁধনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই যুক্তি আপাত-মাত্র। স্বর্গের সিঁড়ি, গোকুলের ষাঁড়, হরিঘোষের গোয়াল ইত্যাদি ধারা অনেক কথা আমাদের বাংলাতেই প্রচলিত আছে, যাদের তাৎপর্য সাধারণ শব্দকথাকে অতিক্রম ক'রে পুরাতন কোন প্রসঙ্গ বা কাহিনী থেকে গৃহীত। উপযোগী কোন বিষয়ে যখন তাদের উল্লেখ করি, আমাদের বক্তব্য তাতে যে শুধু প্রকাশিত হয় তা নয়, অনেক সুন্দর এবং তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। এদের আমরা বাক্যালঙ্কার হিসাবে গ্রহণ করেছি। পরিভাষা কিন্তু ভাষার শরীরে অলঙ্কার হ'তে চায় নি। বড় প্রয়োজনের চাপে তার অর্থবোধ গৃহীত হয়েছে।

পরিভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ যদি সাধারণ ভাষাতেই পুরোপুরি প্রকাশ করা চলত, এই বিশেষ শব্দগুলির তেমন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু পরিভাষার তাৎপর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাষা প্রকাশের মধ্যে আসে না। বিজ্ঞানের ব্যাপার—প্রত্যক্ষ অনুভূতির ব্যাপার। যা আমরা সাধারণ অবস্থায় ধরা-ছোঁয়া বা দর্শন করতে পারি না। যান্ত্রিক কলা-কৌশলের মাধ্যমে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হিসাবে তুলে ধরা চাই। বিদ্যুতের প্রবাহ আমরা দেখি নি, তার অনুভূতি পেতে পারি বটে, কিন্তু কোন জীবের পক্ষেই তা নিরাপদ্ নয়। যন্ত্রের কাঁটা একবার নড়ে উঠল, বুঝলাম বিদ্যুৎ রয়েছে। বিজ্ঞানের মধ্যে এমনি আকার-ইঙ্গিত অজস্র পরিমাণ। তার প্রকাশকলার মধ্যেও এই ইসারা আভাসের নিপুণ কটাক্ষ। বিশ্বপ্রকৃতির গভীর রহস্য অনন্তরূপে প্রসারিত রয়েছে। মানুষের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে তাকে ধ'রে রাখি আর কি উপায়ে। হিসাবটা নির্ভুল এবং সূক্ষ্ম হ'তে হবে। জটিলতা তাই এসেছে। নানা চিহ্ন, রেখাচিত্র এবং দুরূহ গণিত-চিন্তা বিজ্ঞানের প্রকাশ-কলাকে ভিন্ন রূপ দিয়েছে। পরিভাষার মধ্যে এই জটিল প্রকৃতিই খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রূপে প্রকাশশীল হয়েছে।

পরিভাষার মধ্যে বিজ্ঞানের ধারণা দানা বেঁধে থাকে। কিন্তু রচনার মধ্যে তা শুধু এককভাবে নেই, বরং সাধারণ ভাষাপদ্ধতির সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। যে রচনা সাধারণের জন্য লেখা, সেক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ ক'রে সত্য। পরিভাষা ভাষার দুর্বল দিক্ কি না, এ প্রশ্ন তুলেছিলাম। পুরো উত্তর এখনও দেওয়া হয় নি। সাধারণ কথাগুলির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে পরিভাষা বিজ্ঞানের যে বিষয়কে প্রকাশ করে, সাধারণ কথার সাহায্য নিয়েই তার সে উদ্দেশ্য সফল হয়। পরিভাষার খণ্ডবিচ্ছিন্ন ধারণা পরিচিত ভাষাপদ্ধতির মধ্যেই পূর্ণরূপ পায়। এ ভাবে হীরের টুকরোগুলি যেন মালা হয়ে গ'ড়ে উঠেছে। হীরে আর সংযোগসূত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দুর্বল বলি কাকে—দুয়ের কাজ দু' ভাবে ভাগ করা আছে। পরিভাষার কাজ পরিভাষা করছে।

—•—

হরির মা'র গল্প

শ্রীহেনা হালদার

হরির মার গল্প লিখতে ব'সে ভয় হচ্ছে, এতে সত্যিকারের কোনও গল্প আছে কি না কিংবা সে কাহিনী শ্রুতি-সুখকর হবে কি না। হরির মা তো আর ফরাসী-সুন্দরী 'মাতাহরি'র মতন লাস্যময়ী মদিরেক্ষণা যুবতী ছিল না। তার গল্পে না আছে নর্ত্তকীর রোমান্স, না আছে গুপ্তচরের রোমাঞ্চ। সে ছিল তুচ্ছ এক বুড়ী নাপ্‌তিনী। কিন্তু ঈশ্বরের সংসারে হয়ত কেউই তুচ্ছ নয়। নয় তাচ্ছিল্যের বস্তু। তাই বুঝি হরির মা-ও পেয়েছিল সেই পরম কারুণিকের করুণার স্পর্শ।

অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তবু কেন কে জানে ভারী স্পষ্ট ক'রে মনে পড়ে হরির মাকে। কুব্জ-পৃষ্ঠ ন্যুব্জ-দেহা বৃদ্ধা হরির মা প্রত্যেক রবিবারে দুপুরে আসত আলতা পরাতে। হাতে থাকত সাজির মতন একটা ঝাঁপি। ডান পাটা টেনে টেনে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটত সে। বয়স হয়েছিল হরির মা'র। চোখে ভাল ক'রে দেখতে পেত না। নখ কাটতে গিয়ে প্রায়ই রক্তপাত করত আমাদের নরুণের ঘায়ে।

সংসারে তার আপন জন বলতে বোধহয় কেউ ছিল না। তার হরি নামধারী ছেলেটি বহুদিন গত। শুনতাম, আমাদের জন্মের আগেই মৃত্যু হয়েছিল তার। কিন্তু হরি মরলেও তার নামটা বেঁচে ছিল বরাবর। শহরের শেষ সীমানায় যেখানে রবিবারের হাট বসত, তারই কাছা-কাছি একটা নীচু খোলার ঘরে থাকত হরির মা। একলা, কিন্তু নিঃসঙ্গ নয়। সেই কথাই বলব।

রবিবার দুপুরে একহাতে লাঠি অন্য হাতে ঝাঁপি নিয়ে ঠুকঠুক ক'রে পুবদিকের দালানে এসে উঠত হরির মা। তার জন্যে নির্দিষ্ট শান-বাঁধানো কোণটিতে ব'সে প'ড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ডাকত, 'কই গো দিদিমণিরা আলতা পরবে এস সব।' আর আমরা যে যেখানে থাকতাম ছুটতাম, তাকে ঘিরে জুটতাম দালানে। হরির মার ঝাঁপি আমাদের চোখে ছিল যেন ভানুমতীর পেটিকা। তেম্নি বিস্ময়কর, তেম্নি অদ্ভুত। তা থেকে বেরুত কাল রঙের ঝামা, লাল টুকটুকে আলতার গুটি, একটা হলুদে রঙের চৌখুপি কাটা ছোট্ট গামছা, তরল আলতার শিশি আর বাটি, একটা ভোঁতা-পানা নরুণ, এম্নি কত সব টুকিটাকি। সবশেষে বেরুত শাল-পাতায় মোড়া আখের গুড়ের মুড়কি। ওটা হরির মা যত্ন ক'রে আমাদের জন্যে নিজের হাতে তৈরী ক'রে আনত। জব্বলপুর শহরে তখন মুড়কি কিনতে পাওয়া যেত না। তাই ও বস্তু ছিল আমাদের কাছে পরম উপাদেয়।

কেক বিস্কুট কিংবা লাড্ডু বালুসাই-এর চেয়েও আমরা মুড়কি খেতে ভালবাসতাম ঢের বেশী। হরির মা নিজের হাতে আমাদের মুড়কি ভাগ ক'রে দিত। ভাগের তারতম্য হলে প্রচুর কলহ হত ভাগীদারদের মধ্যে। বুড়ীর ফোক্‌লা মুখ হাসির দমকে থরথরিয়ে কাঁপত। বলত 'ঝগড়া কোর না গো দিদিমণিরা, আসছে রোব্‌বারে বেশী ক'রে আনব।' তারপর সুরু হত আলতা পরানোর পালা। পিঁড়ির ওপর ব'সে একে একে পা বাড়িয়ে দিতেন পিসীমা, মা, দিদিরা, বৌদিরা আর সবশেষে আমরা। আর হরির মা, এক-এক জনের ধুলো-মলিন পা ঝামা দিয়ে ঘ'সে, ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে আয়নার মতন ঝকঝকে ক'রে তুলত। আলতা পরানোর সময় চোখে মুখে এমন সতৃপ্ত তন্ময়তা ফুটত যে মনে হত আর্টিষ্ট বুঝি ক্যানভাসে তুলি বুলোচ্ছে। এহেন হরির মার ছিল এক অভিনব সখ। সে সখ এমন অভাবনীয় যে প্রথম দিন শুনে চমকে উঠেছিলাম আমি। কিন্তু তার কাছে সেটা শুধুই সখ ছিল না, ছিল আবশ্যক। আলো-হাওয়ার মতই অপরিহার্য হয়ত।

একদিন আলতা পরানো শেষ হলে হরির মা যখন মা'র দেওয়া চাল ডালের সিধে আর পিসীমার দেওয়া পয়সা বেঁধে তুলছে আর আমি চুপচাপ ব'সে ব'সে দেখছি, তখন সে খুব নীচু গলায়, ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে, 'ছোটো দিদিমণি, তোমার একটু সময় হবে গো এখন—কটা লাইন লিখিয়ে নিতুম।' ভাবলাম হয়ত বা ওর নাতি বিন্নুকে চিঠি লেখাবে। অমন সে কালেভদ্রে আমাকে দিয়ে লেখায়। বললাম,'দাওনা পোষ্টকার্ড, লিখে দিচ্ছি এখুনি।' ও ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে। বললে, 'চিঠি নয়গো দিদিমণি, এই কটা পদ লিখতে হবে, গানের পদ।'

গানের পদ! কী বিপদ্! বুড়ীর এ আবার কোন্ সখ? তখন আমি সবে লুকিয়ে চুরিয়ে অঙ্কের খাতায় পত্ত মেলাচ্ছি। কবি ব'লে বেশ একটু আত্মশ্লাঘাও জন্মেছে মনে মনে। অবাক্ হয়ে বললাম, 'কার গান লিখব? কিসের গান?'

'কার আবার, ঐ ছেলেটার,' বুড়ী হাসি হাসি মুখে ঘোলাটে চোখে চাইলে: 'বড্ড জ্বালাতন করছে গো দিনরাত।' গলার স্বর রহস্যে নিবিড় ক'রে আনলে হরির মা।

'কোন্ ছেলেটা হরির মা?' আশ্চর্য হয়ে শুধোলাম, 'তোমার নাতি বুঝি আবার এসেছে?'

'না গো দিদিমণি, সে এখানে কোথায়?' বুড়ী মুচ্‌কে হাসতে হাসতে বললে, ঐ তোমাদের কালো মাণিক কেষ্ট ঠাকুর গো। উনিই দিনরাত্তির জ্বালাচ্ছেন। সঙ্গে আবার সেই রাধা ঠাকুরুণও আছেন যে—উনি বাঁশী বাজান, ইনি গান ধরেন। আর আমাকে দুজনে মিলে চোপর রাতে পীড়েপীড়ি করেন গানগুলো লিখে রাখতে, পরে আবার গুলিয়ে ফেলি পাছে। তা আমি তো আবার লিখতে পড়তেও জানিনে। তাই ভাবলাম যাই,ছোটুদিদিমণিকেই ধরিগে।' যেন ভারী এক গোপন ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করেছে এম্নি ভঙ্গীতে চেয়ে থাকে সে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই। বলে কি বুড়ী! স্বয়ং বংশীধর কৃষ্ণ শ্রীরাধা সহ এসে রোজ গান শুনিয়ে যান এই বুড়ীটাকে! আর সেই গান কিনা ও লেখাবে আমাকে দিয়ে! সত্যি বলতে কি, খুব একটা বিশ্বাস হল না ওর কথা। তবে একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারলাম না। কৌতুহলও দুর্নিবার। একটা ছেঁড়া খাতা আর পেন্সিল নিয়ে বস্‌লাম। 'আচ্ছা, ঐ ওঁরা রোজ আসেন নাকি তোমার কাছে?' কণ্ঠস্বরে হয়ত সংশয় প্রকাশ পেয়ে থাকবে। বুড়ী আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। 'রোজ গো রোজ। আর শুধু কি আসে? প্রত্যেক দিন বায়না ধরে বাতাসা চাই। তা' যেমন ক'রে পারি ফেলে রাখি দু'খানা। নইলে কি ছাড়ান আছে?' পরম প্রত্যয় আর সস্নেহ প্রশ্রয় ফুটল ওর স্বরে।

এত বড় দিন-দুনিয়ার মালিকের পক্ষে হরির মায়ের দেওয়া দু'খানা বাতাসার ওপর নিদারুণ আসক্তির সংবাদও অবিশ্বাস করার শক্তি রইল না আমার। কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি নিয়ে ব'সে রইলাম। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে আসছে। আমার সঙ্গী-সাথার দল বাইরের উঠোনে চোর চোর খেলছে মা আর পিসীমারা রান্নার দালানে রুটি বেলতে বেলতে গল্প করছেন। কাছে পিঠে কেউ নেই। হারর মা দিব্যি গড়্‌গড়্ ক'রে মুখস্থ পদ্যের মত কয়েকটা লাইন ব'লে গেল। সে লাইনগুলো স্মৃতির গুদাম থেকে উদ্ধার করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে মনে হয়, বালক কৃষ্ণের ধবলী চড়াতে গোষ্ঠে যাবার জন্য মা যশোদায় কাছে বায়না মূলক কিছু চূর্ণ পদাবলী। খুব একটা উচ্চাঙ্গের রচনা হয়ত ছিল না, কিন্তু আমার সহজাত কাব্যানুরাগ দিয়ে বুঝেছিলাম, মিল বা ছন্দের অভাব তাতে ছিল না। আমার কিশোর-মন চমৎকৃত হয়েছিল। গোটা দশেক পদের স্তবক আবৃত্তি ক'রে নিবৃত্ত হল হরির মা। বললে, 'আজ আর নয় দিদিমণি। রাত হয়ে গেছে। মেলাই পথ হাঁটতে হবে। চোখেও ঠিক ঠাওর করতে পারি না কিছু। আরেকদিন এসে লেখাব। তুমি খাতাটা লুকিয়ে রেখে দিও।' চলে গেল বুড়ী। কেন জানি না বুড়ীর কথা আমি রেখেছিলাম। কাউকে দেখাইনি খাতাটা। ওর গানের রস আর রহস্য যেন আমার একলার জন্যেই গোপন ক'রে রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল।

আমার বড়দির ছেলে আন্দু ছিল আমারই সমবয়সী। তাই মাসী হ'লেও ওর সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ও-ই কেমন ক'রে একদিন ঐ ছেঁড়া খাতাখানা আবিষ্কার ক'রে বসল। আর পদ্যগুলি আমার মনে ক'রে সারা বাড়ীতে চারিয়ে দিলে। আত্মরক্ষার্থে তখন আমাকে হরির মা'র কথা স্বীকার করতে হ'ল। আন্দু ত হেসেই অস্থির। বললে, 'তুমি যেমন আস্ত বোকা, ও বুড়ীর পেটে ডুবুরি নামালে 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না, ও কিনা নিজে এইসব গান বেঁধেছে। কেষ্টঠাকুর না হাতী। নিশ্চয় কোন ধড়িবাজ লোক বুজরুকি ক'রে গেছে। মুখস্থ পদ্য শুনিয়ে ঠকাচ্ছে বুড়ীকে।' প্রতিবাদ করা বৃথা ব'লে চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু আন্দুর কথায় মন সায় দিল না। আমার বড়পিসীমা তখনকার দিনেও বেশ শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। গানেরও সখ ছিল খুব। রামপ্রসাদের গান, নিধুবাবুর টপ্পা আর বৈষ্ণব পদাবলীর বইও দেখেছি তাঁর কাছে। তাঁকে গিয়ে ধরলাম চুপি-চুপি। 'দেখ ত পিসীমা, এ পদগুলো কার লেখা?'

চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা এঁটে নিবিষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন পিসীমা। আর আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওঁর রায় শোনবার জন্যে। যেন ওঁরই ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে। পড়া শেষ হ'লে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন পিসীমা। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'পেলি কোথায় এগুলো বল্ ত। চেনা-জানা কোনও পদকর্তার লেখা ব'লে ত মনে হচ্ছে না, কিন্তু সুন্দর সব ভাব রয়েছে পদগুলোয়। যে লিখেছে যেন প্রাণ ঢেলে লিখেছে।' ব্যস্, আর কিছু শোনার প্রয়োজন ছিল না আমার। স্ফূর্তিতে আকাশে ডানা মেললাম আমি। আন্দুর কথা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, পিসীমা যেন তার জলন্ত প্রমাণ।

এরপর প্রতি রবিবারেই বুড়ী আসতে লাগল নতুন-নতুন ধরণের পদ নিয়ে। সে যেন এক গোপন সম্পদ। শুধু বালক কৃষ্ণের কথাই নয়, প্রেমিক কৃষ্ণের-ও। আর আমার সদ্য-জাগা কিশোর মন যেন উন্মোচিত হ'তে লাগল ধীরে ধীরে। অপরূপ মাধুর্য্য বিস্তার করল ওরা রঙে-রসে আঁকা প্রাচীন প্রাচীর-চিত্রের মত আমার চোখে। তখন সবে লুকিয়ে শরৎচন্দ্রের পরিণীতা পড়েছি। দত্তা নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছি। চোখের বালি প'ড়েও বুঝতে পারছি না। সেই সব সোনারঙ কৈশোরের দিনে বুড়ীর কবিতাগুলো আমায় আকুল করত। মন কেমন করা ভাল লাগায় চোখে জল ভ'রে আসত।

তারপর একদিন বুড়ী এক দুঃসাহসিক প্রস্তাব ক'রে বসল। অনুচ্চভাষিণী হরির মা যে অনুচ্চাভিলাসিনী নয় দেখে রোমাঞ্চিত হলাম। পদগুলো সে ছাপতে চায় গ্রন্থাকারে। তার নাছোড়বান্দা কানুর নাকি এই আদেশ। শুধু পদ্য মিলিয়েই ক্ষান্তি নেই, বিলিয়ে দিতে হবে ঘরে ঘরে। প্রকাশের সঙ্গে চাই প্রচারও।

শঙ্কিত হয়ে বললাম, 'কিন্তু সে ত অনেক খরচের ব্যাপার হরির মা। তোমার কাছে অত টাকা ত নেই। কি ক'রে হবে?'

'তার আমি কি জানি বাপু,' ফোকলা দাঁতে বুড়ী ঝরঝরিয়ে হেসে ফেলল। 'যার সাধ হয়েছে সে-ই ঠেলাটা বুঝুক। দায়-ঝক্কি আমার নাকি? দিন-রাত্তির বলছে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার নাম ক'রে ভিক্ষে মাগ্ না। দ্যাখ্ না হয় কি না। তা ভাবলুম তা-ই গিয়ে দেখি।'

কানুর প্রস্তাবে আমি কিন্তু খুব একটা ভরসা পেলাম না। তবু বুড়ীর অনুরোধে ওরই জবানীতে টাকার জন্যে আবেদন ক'রে একটা বিজ্ঞপ্তি লিখে দিলাম। আর সেই কাগজ হাতে ক'রে বাড়ী বাড়ী ঘুরে টাকা তুলতে লাগল হরির মা। দারুণ গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে পুড়ে লাঠি হাতে ক'রে হেঁটে হেঁটে বেড়ানোয় একতিল বিরক্তি বা ক্লান্তি নেই। যেন তীর্থ করতে বেরিয়েছে মানসিক ক'রে। আর আশ্চর্য্যের কথা যে, টাকা সত্যিই উঠল। যে যাই বলুক মুখে, ওকে খালি হাতে কেউ ফেরাল না। সবচেয়ে বেশী টাকা দিলেন আমার বাবা আর পিসীমা।

তারপর চলল মুদ্রণের তোড়জোড়। ফুলস্ক্যাপ কাগজে আগাগোড়া কপি করলাম আমি। বাবা তাঁর পরিচিত কোনও প্রকাশকের কাছে ছাপতে পাঠিয়ে দিলেন এলাহাবাদে।

প্রায় তিনমাস গড়িয়ে গেল। বুড়ীরও দেখা নাই। শুনলাম অত ঘোরাঘুরি ক'রে বুড়ী নাকি শয্যা নিয়েছে।

তারপর হঠাৎ একদিন বুড়ী এসে উপস্থিত। খুব রোগা আর অসুস্থ মনে হ'ল। হেঁটে আসতে পারে নি, টাঙায় চ'ড়ে এসেছে। হাতে মুড়কির ঠোঙা আর একটা কাপড়ে বাঁধা বড় গোছের পুলিন্দা।

আমরা হৈ হৈ ক'রে সকলে ওকে ঘিরে ধরলাম। হাতে হাতে সকলকে মিষ্টিমুখ করবার জন্ম মুড়কি দিয়ে বুড়ী পুলিন্দাটা খুলে ফেললে। একরাশ পাতলা চটি বই। একখানা বই আমার হাতে তুলে দিয়ে হরির মা বললে, 'আমার বইটা তোমাকেই পেরথম দিচ্ছি গো দিদিমণি, ধর।'

হাতে নিয়ে দেখি নীলমলাটে কালো অক্ষরে লেখা 'বিরহবিলাস', শ্রীমতী গিরিবালা কৃষ্ণদাসী প্রণীত। অমন একটা বিদগ্ধ নাম বুড়ী যে কোথা থেকে পেয়েছিল কে জানে। কি যে আনন্দ হ'ল বুড়ীর ইচ্ছে পূরণ হয়েছে দেখে বলতে পারি না। খুশী হয়ে বললাম, 'কিন্তু দামের কথা ত লেখা নেই হরির মা। দাম কত রাখলে?'

'দাম আবার কি দিদিমণি!' লজ্জায় জিভ কাটলে হরির মা। চাঁদা ক'রে কি বারোয়ারী পুজো করে না কেউ? তাই ব'লে কি প্রসাদের দাম ধরে?' হরির মা'র দার্শনিক যুক্তিতে অভিভূত হলাম। বইখানা বহু সমাদরে নিলাম ওর কাছ থেকে। বুড়ী আবার তার পুলিন্দা বগলে নিয়ে টাঙায় চ'ড়ে বসল। বাড়ী-বাড়ী বই বিলি করার পরিক্রমায়।

মনে আছে তখনকার এই ছোট্ট শহরে, নাপতিনী হরির মা'র কাব্য প্রচেষ্টা বেশ একটা আলোড়ন জাগিয়েছিল বাঙ্গালী মহলে। কেউ সবিস্ময়ে প্রশংসা করেছিলেন, কেউ বা গরীবের এই ঘোড়া-রোগকে উপহাস করতে ছাড়েন নি বৈষয়িক বিচক্ষণতায়।

বইখানা আমার কাছে বেশ কিছুদিন ছিলও। তার পর কোথায় হারিয়ে ফেললাম কে জানে।

জীবনের ঘাটে ঘাটে অনেক ঘটনার ফেরী। হাটে হাটে বিস্তর বেচা-কেনা, লেন-দেন। তার মধ্যে হরির মা'র হৃদয়ের ভাবনির্মাল্য কোন্ আবর্জ্জনায় কখন চাপা প'ড়ে গেছে কে জানে।

একদিন বুড়ীর মৃত্যুসংবাদও কানে এসেছিল। দুঃখও পেয়েছিলাম হয়ত। তারপর ধীরে ধীরে বিস্মৃতির ধুলোয় ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে সব। হরির মা কিন্তু আমায় ভোলে নি। বহুযুগের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে দিয়ে কেমন চমৎকার স্মৃতি-তর্পণ করিয়ে নিলে।

ভুল-সংশোধন

আষাঢ়ের প্রবাসী

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪২	প্রথম	২৯	খিলাজ শরিফ	মিলাজ শরিফ
৩৪২	দ্বিতীয়	৩৪	সরাকার	সরাকার
৩৪৩	প্রথম	২	দপ্তরখান	দস্তরখান
৩৪১	দ্বিতীয়	৫	বিকু	চিকু

শ্রাবণের প্রবাসী

পৃষ্ঠা		ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭০	(শ্রীসুনীল নন্দীর কবিতায়)	৭	রক্তের বিন্যাস	রঙের বিন্যাস
৪৭০	(শ্রীসুনীতি দেবীর কবিতায়)	২	মহসামুদ্র	মহাসমুদ্র
৪৭০	"	১০	হতবাক্ থাকি	হতবাক্ হয়ে থাকি

যাবেই যদি

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যাবেই যদি ফোটাও, কেন ফুল,
বহাও হাওয়া, ছাপাও মনের কূল ?
অন্ধকার রাত্রি-ভরা তারার চোখের জল,
কোথায় যেন জোয়ার আসে স্রোতের ছলছল।
একটিবার তাকাও শুধু, চোখের ভাষায় পড়ি
আকাশ-ভরা অরণ্য এক বলছে মরি-মরি।
দেবার ছিল অনেক কিছু, নেবার কিছু নয়,
যাবার বেলায় হৃদয়-বেলায় অরূপ বিস্ময়।

পুরনো নাম ধ'রে

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

পুরনো নাম ধ'রে কে যেন ডাক দিলো—
কোথায় কেউ নেই··· মনের ভ্রম, আরে
এ-নামে ডাক দিত তারা তো গতপ্রায়,
যারাও আছে, দূরে··· কচিৎ দেখা হয়।

ও অব্যবহারে একদা ছিলো কিনা
মলিন স্মৃতি যত অনেক খুঁজে খুঁজে
তবেই পেতে হয়, অথচ ওই ছিলো
ভোরের পথে পথে আমার পরিচয়।

পথের নির্মম পথিক ধীরে, দেখ
শীতল চোখ তুলে তাকায়···হিজিবিজি···
বিগত ছেঁড়া ছবি আস্তে হানা দেয়,
ছড়িয়ে বোঝা হলো গুছিয়ে তুলে দাও···

মলিন স্মৃতি হোক তবুও তোলা আছে;
পথের ঢালু খাঁজে কত কী ঝ'রে যায়—
এখনো বহু পথ সামনে প্রসারিত,
ছড়ানো স্মৃতিটিকে গুছিয়ে পা বাড়াও।

দুর্য্যোধন

শ্রীকৃষ্ণধন দে

নিবিড় তিমির রাত্রি, স্পন্দহীন বিটপীবল্লরী,
বন্দিনী তারায় ঘিরে আকাশে সপ্তর্ষি জেগে রয়,
দূরে নভোপ্রান্তে দোলে কালপুরুষের কটি-অসি,
অভিজিৎ-নক্ষত্রের চোখে ফোটে আতঙ্ক বিস্ময়!
শোকমূর্চ্ছাতুরা পৃথ্বী, নিস্তরঙ্গ হ্রদ দ্বৈপায়ন,
তারি তীরে শ্রান্তদেহে দাঁড়াইল রাজা দুর্যোধন।

এখনো মুকুটে তার দ্যুতিমান্ নীল বজ্রমণি,
কণ্ঠে দোলে মুক্তাহার, রাজবেশ এখনো সুন্দর,
বাম হস্তে লৌহ-গদা, নেত্রদুটি ভ্রূকুটি-কুটিল,
দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপুটে কি প্রতিজ্ঞা জাগে ভয়ঙ্কর!
গভীরা হয়েছে রাত্রি, হ্রদতট নিঃশব্দ নির্জন,
একাকী উন্নত শিরে দাঁড়াইল রাজা দুর্যোধন।

জীবন তরঙ্গ স্তব্ধ, কুরুক্ষেত্র শবক্ষেত্র আজ,
চিতা-ধূমে সমাচ্ছন্ন শর্বরীর শেষ যাম কাটে,
নিবিড় নৈরাশ্যমাঝে অন্তর্দাহে বিক্ষত-হৃদয়,
ঘৃণায় দুর্জ্জয় ক্রোধে স্ফীতশিরা কাঁপিছে ললাটে!
বিভ্রান্ত স্মৃতির মাঝে অতীতেরে করি' বিশ্লেষণ
স্থাণুবৎ দাঁড়াইল হ্রদতীরে রাজা দুর্যোধন।

কোথা যেন আর্ত্তনাদ,—যেন কোন স্তিমিত ক্রন্দন
ক্ষণে ক্ষণে বায়ুস্তরে দূর হতে বহে দূরান্তরে,
দুঃসহ চিন্তার জ্বালা, পরিতাপ-ক্লিষ্ট সেই মন,—
একটি সান্ত্বনা-নীড় খোঁজে আজ হ্রদের ভিতরে!
লুপ্ত সে হস্তিনাপুর,-ভ্রষ্ট আজ রাজ-সিংহাসন,
—ধীরে ধীরে হ্রদতলে প্রবেশিল রাজা দুর্যোধন!

গল্প

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

এ যে কি গল্পের নেশা, তোমারও আমারও।
এত গল্প বানাতেও পারো!
যুগে যুগে দেশে দেশে কোটী কোটী মানুষকে নিয়ে
কত যে বিচিত্র গল্প চলেছ বানিয়ে।
গল্প চাও, আরো গল্প চাও,
কে যে পথে প'ড়ে মরে, কাকে যে বাঁচাও
তাতে কি কিছুই যায় আসে?
তুমি চাও গল্প হোক, তারপর যারা কাঁদে হাসে
হয়ত তাদের সঙ্গে কাঁদো হাসো ঠিকই।

আমি গল্প লিখি,
তার চেয়ে গল্প পড়ি বেশী।
আমি ক্লান্ত হয়ে যাই। কখনো গল্পের শেষাশেষি
হয়ত অনেক কান্না আছে ভেবে শেষটা পড়ি না,
ক্লান্ত হাতে কলম ধরি না।
তোমার ত কোনো ক্লান্তি নেই,
কোটী কোটী গল্প চাও প্রতিটি দিনেই।
সে গল্পের স্থির ধারা কখনো বা মৃদু শ্লথগতি,
কলোর্ম্মিমুখর কখনো বা। লাভক্ষতি,
হারজিত, ওঠাপড়া, মিলন-বিরহ,
রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার ব্রত সুদুঃসহ,
ব্যর্থতা ও কৃতার্থতা, আশাভঙ্গ, আশাতীত সুখ
গল্প হয়ে আসে সবই, এ জীবনে যাকিছু আসুক।

আমরা তোমার গল্পে যারা কাঁদি হাসি,
গড়েছ এমন ক'রে আমাদেরও,—গল্প ভালবাসি।
নিজেদেরও জীবনের গল্পের খাতায়
একটি পাতার পরে আর-এক পাতায়
কি অদম্য কৌতুহল নিয়ে যাই চ'লে,
কি লিখেছ, হেসে কেঁদে দেখব তা ব'লে।
জ্যোতিষীর ঘরে
গল্পের উৎসুক সব শ্রোতা ভিড় করে।

এই কৌতুহলে
জীবনের রসধারা দিন থেকে দিনে বয়ে চলে;
এ না হলে আর কোনো অন্ধকারে জ্বলত না বাতি,
পৃথিবীর নরনারী কিছুদিনে হ'ত আত্মঘাতী।
কিছুরই প্রতীক্ষা নেই, আশা নেই, নেই কোনো ভয়,
এমন মানুষ সব নিয়ে কোনো গল্প লেখা হয়?

আমার জীবনে আর যে ক'পাতা বাকী,
জানি না কি আছে তাতে, তবু আশা রাখি,
গল্পেরই মতন ক'রে শেষ হবে খাতা।
আমার বিধাতা!
হয়ত আমার কাছে তোমারও সেটুকু শুধু দাবী।
মিটে গেলে খুশী হবে।—আমি খুশী হব কি না ভাবি।

"বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা"

আভা পাকড়াশী

কৌশানীর ডাকবাংলোয় শেষ পর্যন্ত রমা এসে উঠেছে রমেশকে নিয়ে। ভুঁমায়ুর কোলে এই কৌশানি। ভারি সুন্দর পরিবেশ। চতুর্দিকে চীড় আর দেবদারুর ছায়ায় ঘেরা একটি সুষুপ্ত পাহাড়ী গ্রাম এই কৌশানী। উঁচু টিলার ওপর এই ডাকবাংলো। আকাশ পরিষ্কার থাকলে সামনের গোলবারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরে দেখা যায়, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোঠ, যুধিষ্ঠির—হিমালয়ের এই সব বরফেঢাকা চূড়াগুলি। অপূর্ব দৃশ্য।

এই রমা-রমেশ শরৎবাবুর পল্লীসমাজের কেউ নয় ব'লেই এদের এই ছায়া-সুনিবিড়, শান্তির নীড়, ছোট্ট গ্রামখানি হাতছানি দিয়েছে। ঐ সামনের ঘরটাই পেয়েছে ওরা। দোকান ব'লে কিছু নেই এখানে, তবে ক্ষেতীচাষাদের কাছ থেকে ডিম, আলু আর দুধটা পাওয়া যায়। কিছু আটকায় না ওদের। ওপাশের ঘরে দুজন ভদ্রলোক এসেছেন, সঙ্গে চাকর এবং একটি জিপ আছে। চাকরটা দারোয়ানের ঘরের পাশে রাঁধে। আর জিপটায় ক'রে বাগেশ্বর থেকে রাঁধবার জিনিষ নিয়ে আসে হপ্তায় দু'বার।

রমা ভাবে এই পরিবেশই তার পক্ষে উপযুক্ত। এখানে তাকে চিনবে না, জানবে না, কোন প্রশ্ন করবে না কেউ। যেখানে সে মাষ্টারি করে, সেই অখ্যাত বেহারী শহরেও অনুসন্ধিৎসু লোকের অভাব নেই।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের পর বড় অপটু হয়ে পড়েছে রমেশের শরীরটা। ঐ প্রচণ্ড লু থেকে ঠাণ্ডায় এসে কোথায় আরও তাজা, সুস্থ হয়ে উঠবে—তা নয়, জ্বর বাধিয়ে বসেছে। পথেই জ্বর হয়েছিল অল্প। রমা ভেবেছিল, গরমে। ঠাণ্ডা পেলেই সেরে যাবে। চ'লে এসেছে সোজা।

মস্ত বড় ঘর। ম্যাণ্টেলপিসের ওপর সেজ জ্বলছে। বিছানার ধারে ব'সে রমেশকে চামচে ক'রে হরলিক্স্ খাওয়াচ্ছে রমা। রমেশ একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। রমা বলে, কই—হাঁ করুন। আর এইটুকু আছে। খেয়ে নিন্।

রমেশ অল্প হেসে ব্যথার স্বরে বলে, আজ এতদিন পরেও তুমি আমাকে আপনি থেকে তুমি বলতে পারলে না, রমা?

বাঃ, আপনি বললেই কি কেউ পর হয়ে যায় নাকি? হেসে বলে রমা।

খানিকক্ষণ পর রমেশ দেখে, রমা দরজার পর্দাটা একপাশে সরিয়ে একদৃষ্টে বাইরের নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। এই রমাকে সে চিনতে পারে না। এর চেয়ে উচ্ছল রমা ভাল। মনে পড়ে সেই দুষ্টু ছাত্রীকে ···যে, পড়া ফেলে গল্প শুনতে চাইত পরীক্ষার ঠিক আগের দিন। আবার সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে যখন ওর জীবনটাকে ভ'রে তোলে—তখন মনে হয়, এতদিনের সাহচর্যে রমা তাকে এবার সত্যিই ভালবাসতে সুরু করেছে বোধহয়। কিন্তু ওর এমনি বৈরাগিণী মূর্তি ওর মনটাকে নৈরাশ্যে ভ'রে তোলে। মনে হয়, ঐ তন্বী, শ্যামা, যুবতী—তার রমা নয়, এ যেন কোন বিরহিনী যক্ষ বধূ, অনুশোচনায় উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলছে দাঁড়িয়ে।

সকালে ঘর গোছাতে গোছাতে রমা বলে, জানেন, এই ঘরে একদিন প্রবোধ সান্যাল এসে থেকে গেছেন। আর ঐ আপনার খাটে ব'সে দেবতাত্মা হিমালয় লিখেছেন।

তাই নাকি? কে এই মূল্যবান্ খবর দিলে তোমায়?

ঐ বুড়ো দারোয়ান। ওর কথাও নাকি সেই বইতে আছে। আমরাও বাঙ্গালী, তাই বলছে, যদিও তিন দিনের-বেশী এই ঘরে থাকার নিয়ম নেই তবুও আমাদের পনের-বিশ দিন অবধি থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে। এখন আপনি একটু তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন ত। আপনার জন্যই ত আসা।

দুধের কাপে চুমুক দিতে দিতে রমেশ বলে, না, তোমারও একটু পরিবর্তন দরকার ছিল বই কি। সব সময় তো নিজেকে কাজের চাপে ফেলে জাঁতায় পিষে চলেছ।

দুপুরবেলা, সোনালী রোদ-মাখা মেঘে ঝলমল্ করছে কৌশানী। দূরে ত্রিশূল আবছা দেখা যাচ্ছে। কি

রকম থোকা থোকা ফুলে ছেয়ে আছে ডাকবাংলোর বাগান আর পাশের P. W. D. রেষ্ট হাউস। ঐ বাড়ীটা কেমন ভাঙ্গা আর ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। এক থোকা বুনো গোলাপ তুলেছে রমা, কাচের গেলাসে সাজিয়ে রাখবে ঘরে। রেষ্ট হাউসের সামনে এখন আর জিপটা দাঁড়িয়ে নেই। দারোয়ানের ঘরের দরজা বন্ধ, ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখবে নাকি এ বাড়ীর ঘরের মধ্যে কি কি আছে? এগিয়ে যেতেই একটা কালো রংয়ের বিরাট্ পাহাড়ী কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে তেড়ে এল।

ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে রমা ডাকবাংলোর পেছনের একটা ঘরে ঢুকে প'ড়ে দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়াল। ভয়ে উদ্বেগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তখন তার। দুই থাবায় ভর ক'রে কুকুরটা এবার জানলা দিয়ে সমানে ওকে বকে চলেছে ঘেউ ঘেউ ক'রে। দ্রুত তালে ওঠানামা করছে ওর বুক; যদি জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ে ঐ কালান্তক যমদূতটা? গরাদগুলো যা ফাঁক ফাঁক ক'রে বসান! কি হ'বে তা হলে?

এমন সময় সেই ঘরের খাটের ওপর কম্বল সরিয়ে কে একজন উঠে ব'সে তাড়া লাগাল—জিমি! জিমি! Don't shout, shut up!

আবার বাংলায় স্বগতোক্তি করে, ব্যাটার গলার জোর দেখ না, মাথাটা আরও ধরিয়ে দিলে। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা, ব'লে উঠে দাঁড়াতেই ভয়ে প্রকম্পিতা রমাকে দেখতে পেল। বলল,—ও আপনিই ওর শিকার দেখছি। ভয় পেয়েছেন ত? তাই আরও ভয় দেখাচ্ছে মওকা পেয়ে। ওকে কেউ ভয় পায় না কি না।

বকুনি খেয়ে জিমি তখন চুপ করেছে। রমা এবার চ'লে আসবে ব'লে ঘুরে দাঁড়াতেই, সেই ভদ্রলোক বলেন, আপনারা বাঙ্গালী এসেছেন শুনে কালই ভেবেছিলাম আলাপ ক'রে আসব। বাংলা কথা ত বলতে পাই না এই জঙ্গলে, কিন্তু এমন কেঁপে জ্বর এল কাল যে —কথা বলছে আর জল খাবার আশায় পাশের টিপয়ে রাখা কুঁজোটা গেলাসের ওপর উপুড় ক'রে চলেছে, পুরোটা উপুড় করা সত্বেও যখন এক ফোঁটা জলও পড়ল না তখন সেটাকে একপাশে রেখে শুক্‌নো জিবটা চেটে বলে, দেখছেন ব্যাটা পাহাড়ী চাকরটার আক্কেল? একটু জলও রেখে যায় নি। আরে বাবা, তোমার গাঁদের আঠার মত বার্লি দেখে খিদে না হয় চম্পট দিয়েছে, তা ব'লে তেষ্টাও কি পাবে না?

এবার রমা বলে, দাঁড়ান, আমি জল এনে দিচ্ছি। ব'লে কুঁজোটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় কুকুরটির অস্তিত্ব জানবার জন্য, কোথাও আর পাত্তা নেই সেটার। নিজের ঘরে ঢুকে দেখে রমেশ তখনো ঘুমোচ্ছে। নিঃশব্দে জাগের জলটা কুঁজোয় ঢেলে নিয়ে আবার বেরিয়ে আসে। গেলাসে জল ভ'রে এগিয়ে দেয়, বলে, নিন, জল খান। জ্বরতপ্ত লাল চোখ খুলে, কোন রকমে আধশোয়া হয়ে এক নিঃশ্বাসে জলটুকু খেয়ে নিয়ে 'আঃ' ব'লে শুয়ে পড়েন ভদ্রলোক। ভারী মায়া হয় রমার। মনে হয় ভদ্রলোকের বেশ জ্বর। এমন অবস্থায় এঁকে একলা ফেলে সবাই চ'লে গেছে? কেমন বন্ধু? একদিন তার কাজে না গেলে কি হ'ত? চাকরটাকে সুদ্ধ নিয়ে গেছে।

আনচান করে ওর মনটা। ঘরে এসেও স্থির থাকতে পারে না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরেও যখন কারুর সাড়াশব্দ পায় না তখন একবার উঁকি দিয়ে দেখে, ভারী ছট্‌ফট্ করছেন ভদ্রলোক। বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছে। ফ্লাস্কে রাখা গরম জল দিয়ে একটু হরলিক ক'রে নিয়ে যায়। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, দুবার ডেকে সাড়া পায় না যখন, তখন ভাবে রুগী মানুষ ত, অত কিন্তু করলে চলবে কেন? একটা রুমাল পড়ে ছিল, সেটা ভিজিয়ে কপালে জলপটি দিতেই চোখ খুলে তাকাল; কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি, এবার আস্তে আস্তে হরলিক্সটুকু খাইয়ে দেয় রমা।

রমেশ ঘুম ভেঙ্গে উঠে রমাকে না দেখে ভাবে, বোধ হয় বাইরে কোথাও গেছে। রমা একটু পরেই এসে বলে সব রমেশকে। সে খুশী কি অখুশী হ'ল বুঝল না রমা। দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সব ব্যাপার জানা গেল। চাকর গেছে দুধ আনতে নীচের গাঁয়, আর দুসরা বাবু গেছে দাওয়াই আনতে বাগেশ্বরে।

দুদিন পর। রমেশের জ্বর ছেড়েছে। আজ রমা বিনা-মশলার খিচুড়ি করেছে। আর ডিমের অমলেট। এই দুদিন সমানে খবর নিয়েছে ওদিকের; চাকরের হাতে সাবু-বার্লি ক'রে পাঠিয়েছে, তবে নিজে বিশেষ যায় নি সঙ্কোচে। আর ঐ ভদ্রলোক কি খাচ্ছে কে জানে, তারও জ্বর ছেড়েছে কাল; এই নরম মন নিয়েই ত মেয়েদের মুশকিল। অসহায় অবস্থার পুরুষ দেখলেই বিগলিত হয়ে যায় নারী।

রমেশকে খাইয়ে চান করতে যাবে রমা। বাথরুম খালি নেই। কমন বাথরুম, সেই ভদ্রলোক স্নান করছেন। কি ভেবে খানিকটা খিচুড়ি প্লেটে তুলে একটা ডিমের অমলেট দিয়ে সাজিয়ে ও ঘরে রেখে আসতে যায়

রমা। ছোট টেবিলটা খাটের কাছে রেখে, জল গড়িয়ে, সব গুছিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে মনে হয় চাদরটা বড় নোংরা। ইস্, কি অগোছাল মানুষ! বন্ধুটি ত সারাদিন জিপ নিয়ে না জানি কোথায় ঘোরেন। চাকরটাকে ডেকে চাদর বার করিয়ে, বালিশের ওয়াড়-চাদর সব বদ্‌লে দিয়ে বলে, এখানে দাঁড়া, বাবুজী এলে খেতে বলবি।

চাকর বলে, বাবুজী ত খা চুকা।

কি খেয়েছে?

কেন, আমি রুটি বানিয়ে দিয়েছি, আলুর ঝোল দিয়ে খেয়েছে। পর আধিরোটি সে জাদা খেতে পারে নি, মির্চা বেশী হয়েছিল ঝোলে।

এবার বাথরুমের কল বন্ধ হ'তে চ'লে আসে রমা। খিচুড়ির প্লেটটা নিয়েই আসে। বাথরুমের সামনেটা পার হওয়ার আগেই দরজা খুলে যায় আর স্লিপিং সুট-পরা একমাথা উস্কোখুস্কো চুল, তোয়ালে গলায় অনিমেষ বলে, একি? আমার ঘর থেকে প্লেটে ক'রে কি নিয়ে যাচ্ছেন দেখি? ওপরের ঢাকা দেওয়া প্লেটটা তুলে নিয়ে খিচুড়ি দেখে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে ঘরে ঢুকে বলে, দোহাই আপনার, অকরুণ হবেন না। ঐ খিচুড়ি প্রসাদটুকু আমাকেই চড়িয়ে দিন।

ওর কাণ্ড দেখে আর কথা বলার ধরনে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে রমা। ওর হাসির শব্দে পাশের ঘরে সচকিত হয়ে উঠে রমেশ।

আপনার নাম কি?

আমার নাম অনিমেষ। খাটে ব'সে মুখ ভ'রে খিচুড়ি খেতে খেতে রমার প্রশ্নের উত্তর দেয় অনিমেষ।

কক্ষনো নয়। ছেলেমানুষের মত মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে বলে রমা, আপনার নাম "অমানিশা"

সশব্দে হেসে উঠে অনিমেষ বলে, তা যা বলেছেন। যা কালো, অমাবস্যে বলেন নি এই ঢের। তবে আপনার নামও ত রমা না হয়ে সন্ধ্যা হওয়া উচিত ছিল, কেননা লক্ষ্মী তো কাঞ্চনবর্ণা, আর আপনি—কথা শেষ না ক'রেই আবার হেসে ওঠে ও।

রমেশ আর থাকতে পারে না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাবে, এ আর বেশী কথা কি। উঠে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়ায়। রমাকে ওঘর থেকে বেরুতে দেখলেই বাথরুমে ঢুকে পড়বে।

রমা বলে, ও ত আমার পোশাকী নাম, আসলে ত আমার নাম কৃষ্ণা।

চম্‌কে ওঠে রমেশ। ঐ নাম ত তারা দুজনে মিলেই প্রাণপণে বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলেছে, তবে আজ আবার কেন? উৎকর্ণ হয় ওদের কথায়।

অনিমেষ বলে, সে ত গেল, কিন্তু আপনার ভাগেরটা ত আমি সব খেয়ে নিলাম, এখন আপনি উপোস দেবেন তো, তার চেয়ে বাহাদুরের রান্নার বাহাদুরিটা একটু খেয়ে পরখ করুন না, ওর তৈরী রুটি ঝোল, পারবেন কিনা জানি না. "ম্যান ইটার অব্ কুমাউন" ঐ জিনিষ খেলে কুমাউন ছেড়ে পালাবে।

রমা খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে হাসতে বলে, আপনি ভীষণ হাসাতে পারেন। অনেক দিন এমন হাসি নি আমি। রমেশের বুকটা ধ্বক্ ক'রে ওঠে। ভাবে, সত্যিই এমনি হাস্যময়ী রমাকে ও দেখেছিল আজ থেকে দশ বছর আগে। তখন ও ছিল পঞ্চদশী। তারপর কত হাঙ্গামা, রোগ, শোক, দারিদ্র্য সবে মিলে কেড়ে নিয়েছে রমার উচ্ছল হাসি। কিন্তু কই, ওকে হাসতে দেখে সে ত খুশী হচ্ছে না? মনে হচ্ছে, ঐ হাসির আড়ালে যেন কেউ তার স্বর্ণপ্রতিমাকে অপহরণ করার জন্য বাহু বিস্তার করছে।

আড়াল থেকেই ভাল ক'রে দেখে অনিমেষকে, রংটা খুবই কালো, কিন্তু মুখখানা যেন কেউ কষ্টি পাথরে কুঁদে তুলেছে মনে হয়, এমনি নিখুঁত। শরীরের গড়নও লম্বায়-চওড়ায় বেশ মানানসই। একমাথা কোঁকড়া চুল আচড়ান না থাকায় এলোমেলো হয়ে রয়েছে। এর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে রমেশ, বিরলকেশ, প্রায় টাক প'ড়ে এসেছে মাথায়, চল্লিশোত্তর বয়েস, ছোট ছোট গোল চোখ, আর পুরু কালো ঠোঁট। শুকনো ওষ্ঠ জিভ দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিয়ে ভাবে, তারও একদিন ঐ বয়েস ছিল কিন্তু কখন কোন রোমান্সের স্বাদ পায় নি সে। চিরকাল এই চেহারাটাই শত্রুতা করেছে ওর সঙ্গে, আর তার দারিদ্র্য হয়েছিল তার সহায়। একবার ভুল করেছিল একটি ছাত্রীকে ভালবেসে। সে নিষ্ঠুর ভাবে তার চেহারার কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাকে। একটুও কুণ্ঠিত হয় নি। সেই প্রথম সেই শেষ।

তারপর তার জীবনে এল এই পুষ্পিতা, ফলভার-নতা কৃষ্ণা, মানে রমা। যদিও ঐ ফলের বীজ তার দ্বারা উপ্ত হয় নি, তবু ত সে বিমুখ করতে পারে নি, ঐ অশ্রুমুখী, আশাহতা, প্রতারিতা, পঞ্চদশীকে! তার পিতার দেওয়া সব কলঙ্ক, সব অপমান, তিরস্কার নীরবে মাথা পেতে নিয়ে, অশ্রুমুখী রমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল এক বর্ষামুখর রাত্রে। ঐ ধনীর দুলালী

অকৃতজ্ঞতা করে নি। একটির পর একটি গায়ের গয়না বিক্রি ক'রে খেয়ে না খেয়ে, চাকরি ক'রে টাকা এনে সেবায় যত্নে তার জীবনকে ভরিয়ে রেখেছে সে। একটি নারীর সাহচর্য তার উষর জীবনে বারি সিঞ্চন করছে, এতদিন, এতেই সন্তুষ্ট ছিল সে। কিন্তু এখন যে শুধু এইটুকুতেই মন ভরে না। আরও যে আশা করে সে। মনে হয়, রমা এ ত শুধু কঠিন কর্তব্য ক'রে চলেছে, শুধুই কৃতজ্ঞতা। কিন্তু কি তার আছে? কি দিয়ে সে বাঁধবে ঐ উচ্ছলা তরুণীকে? প্রাণ ঢেলে ভালবাসলে কি হবে? ওকি তাকে ভালবাসে? একটি মৃত শিশুকে স্বীকৃতি দেবার কৃতজ্ঞতার ঋণ আর কতকাল ধ'রে শোধ করবে ঐ যুবতী নারী, কিন্তু সে যে চায় তাকে! তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকে আপন ক'রে নিতে চায়। শুধুই স্ত্রীর সম্মান দিয়েই সে ক্ষান্ত নয়, স্ত্রীর মতই পেতে চায় তাকে। কিন্তু ওদিকে সে-সাড়া কই? তেমনি দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। কই, তার সঙ্গে ত কখনো অমনি ক'রে হাসে না? সূচীমুখ ঈর্ষার কাঁটা বেঁধে ওর বুকের মধ্যে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে প্লেট নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে রমা বলে, আপনার কাছে গল্পের বই নেই?

অনিমেষ বলে, হ্যাঁ আছে। তবে সে-বই আপনার ভাল লাগবে কি? নাটক-নভেল্স ত নেই, আছে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অঙ্কের বই।

কেন? আপনি ইঞ্জিনিয়ার নাকি?

হ্যাঁ, তবে আমার পাঞ্জাবকেশরী বন্ধুটির মত রাস্তা-টাস্তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার কাজ সোমেশ্বরের মাইকা মাইনে। ছুটিতে এসেছি বন্ধুর কাছে। ও ছুটী পেলে একসঙ্গে কাপকোট হয়ে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার দেখতে যাব ঠিক করেছিলাম। তবে এখন যা কাবু হয়ে পড়েছি, ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। কিন্তু বরাত প্রসন্ন হলে, আর আরও দু একদিন আপনার শ্রীহস্তের সেবা পেলে চাঙ্গা হয়ে উঠতে দেরী লাগবে না। পরিষ্কার বিছানার চাদরটাতে হাত বুলোতে বুলোতে সুন্দর ক'রে হাসে অনিমেষ।

সোমেশ্বর জায়গাটা মনে পড়ে রমার, ওখানে আসার পথে বেশ কিছুক্ষণ বাসটা দাঁড়িয়েছিল ওখানে। কি সবুজ উপত্যকা, আর থাক থাক ক'রে বোনা গাজর, টম্যাটো, ধনেপাতার রংয়ের ছোঁয়া এই সারা কুমায়ুঁর বুকে। মনে হয় কোন ওস্তাদ শিল্পী তুলি বুলিয়েছে এই পাহাড়ের কোলে ব'সে। এই কোশির উপত্যকা যেমন উর্বরা তেমনি সৌন্দর্যময়ী। রমেশ একটু সুস্থ হ'লে বাগেশ্বরে গিয়ে অন্ততঃ সরযু আর গোমতীর সঙ্গম, আর পাণ্ডবদের সময়ের বাগেশ্বর শিবের মন্দিরটি দেখে আসবে সে। কিন্তু এখানে যা দেখবার জন্য অধীর অপেক্ষা করছে ওরা তাই দেখতে পাচ্ছে কই? সেই আড়াইশো মাইলব্যাপী স্নো রেঞ্জ?

বিকেলে রমেশকে হাত ধ'রে বাগানে নিয়ে যাচ্ছে রমা। জিপটা ঘুরে ঘুরে উঠছে। সামনে এসে থামতে অনিমেষের পাঞ্জাবী বন্ধু রমেশকে নমস্কার ক'রে কুশল জিজ্ঞেস করে।

রমেশ বলে, কই, একদিনও ত এর মধ্যে সেই তুষার কিরীট পরিষ্কার দেখতে পেলাম না; শুধু আভাসই পাচ্ছি।

দেখুন, যদি আপনাদের তগ্দিরে থাকে, খুলে যাবে। এই মে-জুন মাসে বড় ফগ হয়, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে একেবারে পরিষ্কার থাকে আকাশ, তখন ত্রিশূল ও অন্য সব চূড়া বেশ দেখা যায়। মনে হয় এত কাছে যে, একটা লাফ দিলেই পৌঁছে যাব। দেখুন তগ্দিরের বাত। এক পসলা বৃষ্টি হলেই বোধহয় খুলে যাবে। পাহাড়ের গায় মেঘ জমেছে খুব। একটু ওপরে উঠলেই নামবে বর্ষা।

বর্ষা নামল সেই সন্ধ্যা রাতেই। টালির ছাতে শব্দ হচ্ছে রিম্, ঝিম্। রমা বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কোটা-তরকারি ধোবে। অনিমেষ দুষ্টুমি ক'রে বেসিন আটকে রেখেছে, মুখ ধুচ্ছে অনেকক্ষণ ধ'রে। রমা তাড়া লাগায়, আর জল ঘাঁটতে হবে না, নিন, সরুন, আবার জ্বর ধরাবেন দেখছি। এবার স'রে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অনিমেষ বলে, জ্বর হলেই ত ভাল। রমা জিজ্ঞাসু-চোখে তাকাতেই বলে, আর ছল-ছুতো খুঁজতে হবে না একজনকে বেশীক্ষণ আটকে রাখার জন্য, সে আপনি এসে রুমাল ভিজিয়ে মাথায় জলপটি দেবে, চামচে ক'রে হরলিক্স খাওয়াবে।

রমা মুখ টিপে হেসে বলে, হুঁ, বড় সখ দেখছি। তা' পার্মানেন্টলী সে রকম একজন কাউকে নিয়ে এলেই ত হয়।

প্রায় লাফিয়ে উঠে অনিমেষ বলে, বাবাঃ! রক্ষে করুন। আমার ত মাত্র মাস গেলে ঐ চারশোটি টাকা ভরসা। ওতেকি আর হাতী পোষা যায়, ভাগ্যিস্ বাবা-মা আগেই গত হয়েছেন, না হ'লে দাদার মত আমারও ঘাড়ে সোহাগ ক'রে ঠিকই একটি বৌ চাপিয়ে দিতেন। জার্মান-ফেরত দাদা আমার সিন্ধ্রিতে বলে

হাজার টাকায় থই পাচ্ছে না, সেখানে আমি ত কোন্ ছার।

রাগতে গিয়েও হেসে ফেলে রমা। এবার ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, তাই বুঝি পরকীয়ায় মন দিয়েছেন, খরচ লাগবে না ব'লে? চলুন আমাদের ঘরে, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, দুটো জ্ঞানের কথা শুনলে ঘাড় থেকে এইসব ভূত নেমে যাবে।

দু'হাতে দুটো কান ধ'রে উত্তর দেয় অনিমেষ, এই কান মলা খেয়ে মাফ্ চাইছি, আমি ওসব কিছু ভেবে বলি নি। ও ঘরে যাব না, উনি কি রকম মাষ্টার মাষ্টার দেখতে, এক্ষুণি হয়ত ষ্ট্যাণ্ড আপ অন্ দি বেঞ্চ করিয়ে দেবেন।

কলটা বন্ধ ক'রে যাবার সময় রমা ব'লে যায়, মাষ্টারই ত;

অনিমেষ বলে, কার মাষ্টার?

আপনার, আমার, সকলের—

মানে?

মানেটা আর বলা হ'ল না, ওদিকে রমেশ ডাকছে।

এসে দেখে ষ্টোভের ওপর দুধটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলে তরকারি চড়ায় রমা।

প্রাইমাস ষ্টোভের শব্দে বৃষ্টির আওয়াজও ডুবে যায়। ঐ একটানা সোঁ সোঁ শব্দের কাছে ব'সে নিজেকে বড় একা, নিঃসঙ্গ মনে হয় রমার। রমেশ কি যেন একটা বলে, ঠিক যেন মনে হয় একটা সাপ হিস্ হিস্ ক'রে উঠল। ওদিকে না ফিরেও রমা অনুভব করতে পারে একটা বিশ্লেষণপূর্ণ সজাগ দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে সর্বদা। এতদিন ঐ মানুষটার আড়ালে নিজেকে রেখে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করত সে। যুবকদের ওপর একটা বিতৃষ্ণা ছিল তার। এখন সেই বিতৃষ্ণায় ভাঁটা পড়েছে। আর কিছুদিন থেকে রমেশকে সে সইতে পারছে না। নিজেকে যেন আর ঠিক নিরাপদ মনে হচ্ছে না ওঁর আড়ালে। গত রাত্রে যখন খাট থেকে মাটিতে ওর বিছানায় নেমে এসেছিল রমেশ, তখনো বার বার জিভ দিয়ে ওর ঠোঁট চাটা দেখে একটা ক্লেদাক্ত সরীসৃপই মনে হচ্ছিল ওকে। সভয়ে স'রে গিয়েছিল রমা। তরকারিটা চড় চড় করছে। ইস, আজ কি যেন হয়েছে তার। ঐ সময়টুকুতে আটাটা মেখে নেওয়া উচিত ছিল। এমন সময় বাহাদুর এসে বলে, 'মাজী, দো পিয়ালি চায় বানা দিজীয়ে।'

শ্লেষের সঙ্গে এবার বেশ জোর দিয়েই রমেশ বলে, তার চেয়ে এক কাজ কর না বাহাদুর? তোমার সব রান্নার ব্যবস্থাটা এখানেই ক'রে নাও না, তা হ'লে মাজীরও কষ্ট কমে, তোমার বাবুরও সুবিধে হয়; আর আমার ঘরের দুধ তরকারিগুলো না পুড়ে ঠিক ঠিকই হয়।

চম্‌কে উঠে রমা, বাহাদুরকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, দেখছ না আমার এখনো রান্না হয় নি? এখন চা করতে পারব না, যাও।

এবার সুর নামিয়ে একটু শ্লেষের হাসির সঙ্গে রমেশ বলে, ওটা বড় বেশী বিসদৃশ হবে নাকি? ও বেচারীর দোষ কি? ওকে বকছ কেন?

বিরক্ত মনে তখন দুকাপ চা করে রমা। চাকরটা বলে, তাদের রান্নাঘরে জল প'ড়ে ভেসে যাচ্ছে। রুটিটা কোন রকম হয়েছে, তরকারি করতে পারেনি। রমেশের মত তরকারি রেখে বাকিটা তরকারি ওর হাতে তুলে দিয়ে পরোটা ভেজে রমেশকে খেতে ডাকে।

ওর গম্ভীর মুখ ভারী দুঃখিত করে রমেশকে। ভাবে, ছিঃ, নিজেও কতটা ছোট হয়ে গেলাম ওর কাছে। তারপর ভাবে, আমার কর্তব্য ওকে সাবধান করা, তাই করেছি। এখন ত আর পনেরো বছরের কিশোরী নয়। একটু বুঝে চলা উচিত। ভেতরের মাষ্টারের মন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে উপদেশ বর্ষণ ক'রে ফেলে। কোন উত্তর না দিয়ে রমা বাসনগুলি নিয়ে উঠে যায় বেসিনে ধুতে। দশবছর পর এই প্রথম তিরস্কার পেল সে মাষ্টার-মশাই-এর কাছে। পড়া না পারার বকুনি এ নয়। এই দশবছরের কঠিন সংযমেও বিশ্বাস কিনতে পারে নি ওঁর কাছে।

হঠাৎ ডাকবাংলোর পাশের একটা দেবদারু গাছে কড় কড় ক'রে বাজ পড়ে। ঐ বিকট শব্দে ভয় পেয়ে বেসিনটা দুই হাতে চেপে ধ'রে চিৎকার ক'রে ওঠে রমা। পাশের ঘর থেকে তীরবেগে ছুটে এসে নিজের দুই বলিষ্ঠ বাহুপাশে বেঁধে ফেলে ওকে অনিমেষ। রমেশও খাওয়া ফেলে উঠে এসেছিল। কিন্তু রমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে দেখে ফিরে চ'লে গেল।

পরদিন ভোরে চোখ খুলতেই রমেশের শূন্য বিছানা চোখে পড়ে রমার। প্রথমে অবাক্ হয় একটু; তারপর ভাবে আশেপাশে কোথাও বেড়াতে গেছেন বোধহয়। ছাতা আর জুতো দুটোই ত নেই। কাল সকালেও ত একা গিয়েছিলেন, তেমনিই গেছেন হয়ত।

বাইরে এসে সামনের দিকে তাকিয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে ও। তুষারশুভ্র পর্বতমালায় একটি বিরাট

মিছিল একেবারে ওর চোখের সামনে যেন কেউ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। গিরিরাজের একি অপূর্ব প্রকাশ! সামনেই তুষার-ধবল ত্রিশূল। পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে ডাকে, মাষ্টার মশাই? শূন্যঘরে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে।

একা কি এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ উপভোগ করা যায়? আঁচলটা বেশ ক'রে গায়ে জড়িয়ে দৌড়ে চ'লে আসে পেছন দিকে। জানলা দিয়ে ছোট্ট একটি ঢিল অনিমেষের খাট লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দেয়।

গোল বারান্দায় দুটি কুয়াসা-ঢাকা মূর্তি। আজ কুয়াসা দিক্ বদল করেছে। প্রথম সূর্যের আলো-ঝলমল্ বরফাচ্ছাদিত চূড়াগুলিকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে ওদের ঘিরে ধরেছে। এই মহান্ প্রকাশকে দুহাত তুলে নমস্কার করে অনিমেষ। রমাও ওর অনুকরণ করে। অনিমেষ বলে, তিনি কোথায় গেলেন? কোথাও বেড়াতে গেছেন নাকি? চলুন, তবে আমরাও ঐ বৃষ্টি-ভেজা ঘাস মাড়িয়ে কালকের সেই বাজপড়া গাছটা দেখে আসি।

না, খালি পায় যাব না। ওখানে বড় জোঁক। রাত্রের সেই অনুভূতি ঘিরে ধরে ওকে।

জোঁক ওখানে কোথায়? এই ত সামনে, আমার বৌদি আমাকে বলে, জোঁকের মতন কালো। আসুন চ'লে আসুন, ব'লে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে, অনিমেষ ওর হাত ধ'রে টানতেই টাল সামলাতে না পেরে রমা একেবারে ওর বুকের ওপর এসে পড়ে।

অনিমেষ সবলে ওকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে ওষ্ঠে এঁকে দেয় একটি নিবিড় চুম্বন। কানের কাছে মুখ নিয়ে গভীর স্বরে ডাকে, কৃষ্ণা!

রমা জোর ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে বারান্দায় রাখা-চেয়ারে মুখ গুঁজে ব'সে শুধু অস্ফুটে বলতে থাকে, না না এ হয় না, অনিমেষ, আমি কুমারী নই।

প্রশ্রয়ের সুরে অনিমেষ বলে, ছিঃ কৃষ্ণা, কাঁদে না, আমি সব জানি। তোমাকে আমি ঠকাব না, আগে নিজের স্বীকৃতি-চিহ্ন তোমার কপালে সিঁথিতে এঁকে দেব তারপর—

না না, সে হয় না, তুমি জান না, কিছু জান না। বার বার মাথা নাড়তে থাকে রমা দু হাতে মুখ ঢেকে।

জোর গলায় অনিমেষ বলে, বলছি মা, সব জানি আমি। আমাকে যে বইটা পড়তে দিয়েছিলে তার ভাঁজে ছিল দশ বছর আগে মাষ্টার মশাইকে লেখা এক স্বাকারোক্তি পত্র। হাতের লেখাটা যে তোমার তা বুঝলাম বইতে লেখা নাম প'ড়ে। আর কিছু বলবে? এস, বল।

না, তুমি আমাকে ঘেন্না করবে। সে হয় না, হয় না।

হয় কৃষ্ণা, হয়। তুমি ত যেচে আমার কাছে যাও নি আমিই তোমাকে নিচ্ছি। সবাই সেই অরুণ নয়।

লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে থাকে রমা। অনিমেষ জোর ক'রে ওকে দাঁড় করিয়ে জড়িয়ে নিয়ে চলতে সুরু করে।

এবার খুব ধীরে ধীরে রমা বলে, মাষ্টারমশাই কিন্তু খুব দুঃখিত হবেন।

বেড়িয়ে ফিরে ঘরে ঢুকে মাষ্টার মশাইকে দেখতে পায় না ওরা। অনিমেষও এসেছিল তাঁর কাছে অনুমতি নিতে। স্টোভের কাছে এগিয়ে যায় রমা চা করতে, সেই টেবিলে পায় দুখানি চিঠি, একটির ওপরে লেখা 'মাণিক', অপরটির ওপর 'কৃষ্ণা'। অস্ফুটে রমা বলে মাণিক কে?

অনিমেষ তখন চিঠি পড়তে ব্যস্ত, কাল রাত্রে তবে ঠিকই চিনেছিল সে।

স্নেহের মাণিক,

কাল রাত্রে বজ্রমাণিকের আলোয় তোমায় চিনেছি। বহুকাল আগে তোমাদের বাড়ীতে আমি থাকতাম। তোমরা দু'ভাই বিশেষ ক'রে তুমি আমাকে খুব ভালবাসতে, একদণ্ড ছেড়ে থাকতে না আমায়। এতদিনে তোমার মধ্যে যে সাংঘাতিক একটা কিছু পরিবর্তন হয় নি এটাই মনে হয়। সেই আশায় আমার প্রিয়তমা ছাত্রী রমাকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। অমর্যাদা করোনা ওর। জীবনের পথে চলতে সকলেরই একটু-আধটু ভুল হয়। সেই ভুলের মাশুল কি ও সারা জীবন ধ'রে দেবে? আমি এই দশ বছরে দুঃখ-শোকের আঁচে-পোড়া ওর সংযমী সত্তাটিকে চিনে নিয়ে তোমাকে বলছি, তুমি ঠকবে না। ইতি—তোমার ভূতপূর্ব মাষ্টারমশাই

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

স্নেহের কৃষ্ণা,

আমাকে ক্ষমা করো তুমি। সত্যি আমার লোভ বড় বেশী বেড়ে গিয়েছিল, তাই সেই লোভীকে দূরে সরিয়ে নিলাম। তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ; যা দিতে পার নি তা কেড়ে নিতে যাওয়া পশুত্বেরই নামান্তর। আমি তখনই বুঝেছিলাম যে, তোমার শ্রদ্ধা হারাতে বসেছি। এ আমার সইবে না। তাই আজ ভোরের বাসে কৌশানী ছাড়লাম।

যদি কখনো অশক্ত হয়ে পড়ি আবার তোমাদের স্নেহচ্ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেব। আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

তোমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী মাষ্টারমশাই

ঝর ঝর ক'রে জল পড়ে রমার দুই চোখ বেয়ে। ঐ অসহায় মানুষটি কত ব্যথা বুকে নিয়ে চ'লে গেছে, এই ভেবে বেদনায় অনুতাপে জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে ও। অনিমেষের চোখও সজল হয়ে ওঠে দূর অতীতের কথা মনে ক'রে।

গুজরাতী সাধু আনন্দস্বামী হোম করছেন। অগ্নি সাক্ষী ক'রে বিবাহের মন্ত্রশক্তিতে বেঁধে দেন ওদের দুজনকে। সিঁদুরের রক্তরেখা, স্বীকৃতি-চিহ্ন এঁকে দিল অনিমেষ রমার সিঁথিতে।

পিণ্ডারীর পথে চলেছে দু'টি অশ্বারোহা। কখনো ঘোড়ার পিঠে আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা দু'টি মূর্ত্তি। কখনো চড়াই ওঠার সময় পরিশ্রান্ত হয়ে দুজন দুজনের হাত ধ'রে কষ্টে চড়াই ভাঙছে।

এরা অনিমেষ আর রুক্মা, চলেছে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার দেখতে।

—•—

বাংলা শব্দের অর্থান্তর

শ্রীসন্তোষ রায়চৌধুরী

তদ্ভব শব্দই হোক্ আর তৎসম শব্দই হোক্ বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দেরই চলিত ও আভিধানিক অর্থ প্রায় অভিন্ন থাকে। কিন্তু তারই মধ্যে এমন কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায় যার চলিত ও আভিধানিক অর্থ এক হওয়া সত্ত্বেও অভিধানেই সেই সঙ্গে অন্য এমন একটা অর্থ দেখা যায় যার সঙ্গে প্রচলিত অর্থের সঙ্গতি থাকে না। অধিকন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত অর্থবোধক হয়। একটা অত্যন্ত চলিত কথাই ধরা যাক্—যেমন রাগ। রাগ শব্দের অর্থ অনুরাগ ও ক্রোধ। রাগ শব্দের গোড়ার কথা যাই থাক, অনুরাগ ও ক্রোধ সমার্থক শব্দ নয়, বরঞ্চ বিপরীতার্থবোধক—এতে নিশ্চয় সে সংশয় থাকার কথা নয়। কিন্তু রাগান্বিতা শব্দের অর্থ আমরা ক্রুদ্ধাই বুঝে থাকি। ভুল করেও অনুরক্তা ভাবি না। এ অসঙ্গতি যে শুধু আভিধানিক অর্থেই থাকে তাই নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা শব্দ ব্যবহারে বিশেষ ভাবেই দেখা যায়। যদিও 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' কথাটা আমরা বলি অসার্থক প্রয়োগের সার্থক নমুনা হিসেবে। আমরা কিন্তু ছেলেমেয়েদের নাম-করণের ব্যাপারে সেই অসঙ্গতির বা অসার্থক প্রয়োগের চূড়ান্ত করে ফেলি, ফলে অনেক সময় ব্যাকরণসম্মত বানান, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সবই গুলিয়ে যায়। ফলে অনেক নামই হয়ে দাঁড়ায় কানা ছেলের পদ্মলোচন নামের মতই। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে তার স্বভাব কি হবে নিশ্চয় নামকরণের সময় তা জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু বর্ণ বা আকৃতির দিকে নজর রেখে নাম হয়ত রাখা যেতে পারে। সেটাও আমরা রাখি না। উল্টে, নিকষকালো মেয়ের নাম রাখি গৌরী, আর ফর্সা ধবধবে মেয়েকে ডাকি কৃষ্ণা বলে। ফলে সে নামটার শব্দার্থ সেই নামের অধিকারিণীর রূপ, গুণ বা আকৃতি কোনটাকেই প্রকট করে তোলে না।

অন্যদিকে কৃষ্ণকলি বা কৃষ্ণচূড়া বলতে যে ফুলকে আমরা বুঝি, তার সঙ্গে কৃষ্ণ নামটা যে কি ভাবে জুড়ে গেল বুঝা দায়। কৃষ্ণ কলি যায় সে কৃষ্ণকলি, বা কৃষ্ণের চূড়ায় স্থান বলে কৃষ্ণচূড়া,—এসব কথা ব্যাকরণেই মানায় ভালো। অমন সুন্দর ফুলগুলোকে কৃষ্ণ নামের সঙ্গে যুক্ত করতে মন সায় দেয় না। আবার কৃষ্ণ কন্দ বলি যাকে সে হ'ল রক্তকমল আর আগুনের অপর নাম কৃষ্ণগতি।

কৃষ্ণ নামের সঙ্গে শ্যাম নাম অভিন্ন। কালো বলতে দুটো শব্দই আমরা ব্যবহার করি। কৃষ্ণ চলিত অর্থে কালো বা নীল, শ্যাম চলিত অর্থে কালো বা সবুজ; ফলে নবদূর্বাদল ও নবজলধর—এই দুটো কথাকে আমরা শ্যাম নামের সঙ্গে যুক্ত করি তার রূপবর্ণনায়।

কালো মেয়ের জন্য বিয়ের বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে লিখি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। অর্থাৎ প্রকারান্তরে স্বীকার করি যে, এ মেয়ে ফর্সা বা গৌরবর্ণা নয়। গৌর বা গৌরী কোন রঙের নাম অবশ্যই নয়,—বরঞ্চ বলা চলে যে, গৌর বা গৌরীর গায়ের মত রঙ। আবার শ্যামা প্রতিমার গায়ের রঙ দিই কালো বা নীল, কিন্তু সবুজ নয়। সেইজন্যই হয়ত শ্যামাকে বলি কালী আর শ্রীকৃষ্ণকে বলি কালা।

অন্যদিকে 'তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্ব-বিম্বাধরোষ্ঠী' ······, ইত্যাদির অর্থ করতে গেলে নিশ্চয়ই আমরা শ্যামা বলতে কালো মেয়েকে বুঝি না। কারণ কালো মেয়ের তুষারধবল দন্ত-পংক্তি শুধু কাব্যে নয়, সবক্ষেত্রেই সহনীয়। কিন্তু কালো মেয়ের পক্কবিম্ব-সম অধর ও ওষ্ঠের কথা ভাবতেই যেন খারাপ লাগে। মহাকবি সম্ভবত সে রকম কিছু উদ্ভট কল্পনা ক'রে যক্ষপ্রিয়ার রূপবর্ণনায় শ্যামা কথাটা ব্যবহার করেন নি।

রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা'র মতে শ্যামার অন্য একটা অর্থ হ'ল—'তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা সুখস্পর্শাঙ্গী যুবতী', এখানে শ্যামার চলিত অর্থের সঙ্গে আর একটা অর্থ পাই—যেটা হ'ল গলিত সোনার রঙ বা কাঁচা সোনার রঙ। 'শব্দ-কল্পদ্রুমে' এই অর্থটাই আছে বিস্তৃতভাবে—"শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা, তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে।" আবার শ্যামা হচ্ছে একরকম ফুল—যার নাম প্রিয়ঙ্গু, রঙ হলদে। 'প্রিয়ঙ্গু কলিকা শ্যামং রূপেনা প্রতিমং বুধং···' (নবগ্রহ স্তোত্র

সর্তব্য) অন্ততঃ বুধকে কেউ কালো রঙের ব'লে কল্পনাও করেন নি।

শ্যাম অর্থে কালো বা সবুজের পরিবর্তে এখানে বলা হয়েছে কাঁচা সোনার রঙ। তা হ'লে কি মনে করব যে, শ্যাম (শ্রীকৃষ্ণ) বা শ্যামার (কালীর) দেহের রঙ কালো ছিল না? নবজলধর বা নবদূর্বাদল প্রভৃতি উপমা তা হ'লে কি প্রক্ষিপ্ত? কালীয়নাগকে দমন করেছিল ব'লেই কি শ্রীকৃষ্ণ কালিয়া বা কালা? অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এটাকে প্রক্ষিপ্ত ও রূপক বলেছেন। মহাকালের অঙ্কশায়িনী বলেই কি শ্যামাকে বলি কালী? আবার কালিকা পুরাণে পার্বতীর জন্মবৃত্তান্তে বলা হয়েছে 'নীলোৎপল দল সদৃশ শ্যামা' কন্যা, গিরিরাজ আদর ক'রে তাকে ডাকতেন কালী ব'লে।

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের দেহের রঙের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি (শব্দকল্পদ্রুম) তিনি যুগে যুগে রঙ পাল্টেছেন। সত্যযুগে ছিলেন শ্বেত, ত্রেতায় লাল, দ্বাপরে পীত আর কলিতে কৃষ্ণ বা চলিত অর্থে কালো।

শ্যামার রঙের ব্যাখ্যায় মহানির্বাণ-তন্ত্রেই লিখেছে—

'গুণক্রিয়ানুসারেন রূপং দেব্যা প্রকল্পিতম।'

গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পিত হয়েছে।

সেই সঙ্গে মহানির্বাণতন্ত্রেই আবার লিখেছে—

'শ্বেত পীতাদিকো বর্ণ যথা কৃষ্ণো বিলীয়তে।
প্রবিশ্যন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে॥
অতস্তস্যাঃ কাল শক্তের্নির্গুণয়া নিরাকৃতে।
হিতায়া প্রাপ্ত যোগানাং বর্ণ কৃষ্ণ নিরূপিতঃ॥'

(হে শৈলজে শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ সমুদায় যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেই মত সর্বভূতই কালীতে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে; সেই হেতু সেই নির্গুণা, নিরাকারা, যোগীগণের হিতকারিণী কাল শক্তির বর্ণ কৃষ্ণ ব'লে নিরূপিত হয়েছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণ বা শ্যাম—এইদুটো শব্দের অর্থ সম্যকরূপে পরিস্ফুট না হয়ে বরঞ্চ ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্যামার দেহের রঙের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ ক'রে শব্দ দুটোর প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

ওদিকে দ্রৌপদীর অপর নাম ছিল কৃষ্ণা। তাঁরও দেহের রঙ ছিল শ্যাম। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে কেউ কালো ছিলেন না—ছিলেন গৌরবর্ণ (চলিত অর্থে) ও দীর্ঘকায়। তা হ'লে দ্রৌপদীর এমন কি গুণ ছিল, যার জন্য নানা বিপদকে তুচ্ছ করে পাণ্ডবেরা তাঁর স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে লক্ষ্যভেদ করে তাঁকে লাভ করতে গিয়েছিলেন? সে কি শুধু অর্জুনের শস্ত্র-প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখাবার জন্য, না অন্য কিছু?

ব্যাসকৃত মূল মহাভারতে দ্রৌপদীর রূপবর্ণনায় বলা হয়েছে,—

"কুমারি চাপি পাঞ্চালী বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী স্বসিতায়ত লোচনা॥
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীল কুঞ্চিত মূর্দ্ধজা।
তাম্র-তুঙ্গ নখা সুভ্রূচারু পীনপয়োধরা॥"

৺হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁর অনুবাদে উপরোক্ত অংশের অর্থ বলেছেন,—"যজ্ঞবেদীর মধ্য হইতে একটি কন্যা উত্থিত হইল; তাহার নাম পাঞ্চালী, দেহের কান্তি মনোহর, অঙ্গসকল সুদৃশ, নয়ন যুগল সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ। শরীরের বর্ণ শ্যাম, নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায়, কেশকলাপ কুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ, নখসমূহ তাম্রবর্ণ ও উন্নত, ভ্রূযুগল মনোহর আর স্তন দুইটি সুন্দর ও স্থূল।"

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এখানে শ্যাম কথাটার অর্থ বিশদভাবে দেন নি, কাজেই অন্যান্য বর্ণনার সাহায্যে দ্রৌপদীর রঙ যাচাই করা যেতে পারে। উপরোক্ত অনুবাদে নীল কুঞ্চিত মূর্দ্ধজার তর্জমা আছে কেশ কলাপ কুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ; এখানে 'নীল' শব্দটার অর্থ ধরা হয়েছে 'কালো'। আবার "স্বসিতায়ত লোচনা"কে বলা হয়েছে 'কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ' নয়ন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানিয়েই বলা যায় যে, সু+অসিত+আয়ত=স্বসিতায়ত অর্থে সুদীর্ঘ কালো না ব'লে নীল বলাই বোধহয় সঙ্গত, সিত নয়, সুতরাং কালো, এটা সম্ভবতঃ ঠিক নয়। অসিত অর্থ নীলও হ'তে পারে। সেদিক হ'তে দেখলে নীল-নয়না, নীলকেশা দ্রৌপদী নিশ্চয় ভারতীয় আর্যদের কেউ ছিলেন না বলেই মনে হয়। আর সেই সঙ্গে স্বভাবতই মনে হয়, কৃষ্ণা নামের জন্য তাঁর দেহের রঙও দায়ী ছিল না। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের মধ্যে দ্রৌপদীর কৃষ্ণত্ব যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি অস্বাভাবিক যাদবদের মধ্যে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, যদুবংশ যে অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত ছিল সে কথার কোন প্রমাণ নেই; বরঞ্চ বলরামাদির রঙ যে ফর্সা ছিল তারই নিদর্শন আছে সর্বত্র।

হাজার তিনেক বছর পূর্বে মহাভারতের কালে গান্ধারীর পিতৃগৃহ ছিল কান্দাহারে, জয়দ্রথেরও বাড়ী ছিল সেখানে অর্থাৎ বর্তমান আফগানিস্থানে। অর্জুনের অপর নাম পার্থ। পার্থ কথাটার অর্থ পারস্যবাসীও

হ'তে পারে। ইংরেজি Parthian এবং ফরাসী Perse কথাটার সঙ্গে অনেকেই অল্পাধিক পরিচিত।

বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ড্রয়সেনের আলেকজান্দারের জীবনীতে (জার্মাণ সংস্করণ) দ্রিপেতিসের কথা আছে। দ্রিপেতিস পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুসের কন্যা। দ্রিপেতিসের গ্রীক উচ্চারণ দ্রুপেতিস। ড্রয়সেন গ্রীক বানানই রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ড্রয়সেনের পুস্তকে শুধু দ্রুপেতিস নয়, ঋতুকামা (Artakama) প্রভৃতি এমন সব নাম পাওয়া যায় যেগুলি মহাভারতেও সুন্দর খাপ খেয়ে যেত। অবশ্য এই যুক্তিতে দ্রৌপদীকে কোন প্রাকৃউরাল প্রদেশবাসিনী 'আনীল-লোচনা', 'আতাম্রকুন্তলা' মার্জারাক্ষী বলে কল্পনা করছি না, কিন্তু তাঁর আর্যগোষ্ঠী সম্ভবা না হওয়ারও কোন সঙ্গত কারণ নেই।

মহাভারতের যুগে আমরা দেখতে পাই যে, তার পূর্বেই ভারতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হয়েছে। স্বভাবতই একই নাম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চারণে ব্যবহৃত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। সেই কারণে ভারতের দ্রৌপদী পারস্যে দ্রুপেতিস নামে উচ্চারিত হ'ত হয়ত। তাছাড়া উচ্চারণের সামঞ্জস্য থাকলেই ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তিতে বিভিন্ন শব্দের অনন্যতা প্রতিপাদন করতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।

রাশিয়ান ভাষায় "ক্রাসনায়া" শব্দের অর্থ উজ্জ্বল লাল বর্ণ আর 'ক্রাসোতা' শব্দের অর্থ সৌন্দর্য। ভারতীয় ভাষা ও রাশিয়ান ভাষা একই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর শাখাভুক্ত। ক্রাস্‌নায়া যদি অন্-ইন্দোয়ুরোপীয় কোন শব্দ না হয় তবে এও অসম্ভব নয় যে এক সময় আর্যভাষী দেশেও কৃষ্ণ অর্থে উজ্জ্বল লাল আর কৃষ্ণত্ব অর্থে সৌন্দর্য বলে ধরা হ'ত। স-এর মূর্ধন্যতাপাদন ভারতীয় ব্যাপার।

এই সব নানা তথ্যের ধাঁধার মধ্য হ'তে একটা কথা বেশ মনে করা যায় যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, শ্যাম, শ্যামা এই সব শব্দ এক সময় যে অর্থে ব্যবহৃত হ'ত কালক্রমে সম-সাময়িক লৌকিক সংস্কারের চাপে সে অর্থ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে ও বর্তমান প্রচলিত অর্থে পরিণত হয়েছে। অভিধানের পাতায় বিপরীত অর্থবোধক দুটো অর্থই এখনও পাশাপাশি স্থান পাচ্ছে ও ভবিষ্যতেও পাবে, কিন্তু সংস্কারকে অতিক্রম ক'রে অপ্রচলিত অর্থটি আর হয়ত কোনদিন ব্যবহারিক মর্যাদা পাবে না।

—*—

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আরোগ্য" অভাব

"দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের, আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হয়ে ওঠে।

"আমরা অনেক সময় দোষ দেই বাহ্য কারণকে—কিন্তু রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস ক'রে গুরুতর কর্ত্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছায়..."

—রবীন্দ্রনাথ

এ-দেশের অবস্থা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, জ্বর-জ্বালা এবং অন্যবিধ শারীরিক রোগকে উদ্দেশ করিয়া উপরিউক্ত কথা লিখেন নাই। দেশের, সমাজের এবং মানুষের সর্ব্ববিধ এবং সর্ব্বাঙ্গীন শারীরিক, মানসিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি ব্যাধি আরোগ্যের অভাব দেখিয়াই হয়ত এই মত প্রকাশ করেন। দেশের, বিশেষ করিয়া নিহতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গে আজ ভীষণতম 'ব্যাধি' খাদ্যাভাব যাহার ফলে শতকরা নব্বই জন মানুষের প্রায় অনাহার জীবন যাপন। এবং এই অনাহারের কারণেই মানুষের দেহমন সবই অশক্ত, উদ্যম আশা-আনন্দহীন।

দেশের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার শতকরা নব্বই জনের যেখানে প্রাণশক্তি নাই, মানুষ যেখানে এক-পা চলিতে কষ্টবোধ করে, এমন কি, অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া ক্ষুধার তাড়নাতেও খাদ্যভাণ্ডার এবং খাদ্যের দোকান লুঠ করিতেও উৎসাহ বোধ করে না, সেই দেশের এই প্রায়-মৃত মানুষকে দিয়াই দেশের বর্ত্তমান শাসকসম্প্রদায় তাঁহাদের অবাস্তব বৃহৎ-পরিকল্পনা মত দেশকে নূতন করিয়া গঠন করিবার বৃথা প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন।

'মর্গ'কে (morgue) জলসা ঘরে রূপান্তরিত করিবার এ প্রয়াসকে উন্মাদের বিকৃতমনের বিলাস এবং পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়? মানুষকে দিনান্তে অন্তত আধপেটা আহার দিবার ক্ষমতাও যে-সকল পূর্ণ-উদর-বিকট-পুষ্টদেহ শাসকদের নাই, তাঁহারা কোন্ মুখে, অনাহারে-জীর্ণদেহ-ভগ্নমন মানুষকে দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পরিশ্রম করিতে পরামর্শ দেন?

অনাহারের শোচনীয় পরিণাম

মাত্র একটি দৃষ্টান্তেই আজ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজের বিষম শোচনীয় অবস্থার পরিচয় প্রকট হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় একটি আদালতে ভদ্র-ঘরের একটি ভদ্র এবং অল্প-শিক্ষিত মহিলার বিরুদ্ধে চারিত্রিক-অসংযম-অসদাচরণের একটি মামলা পুলিস দায়ের করে। হাকিমের প্রশ্নের জবাবে অভিযুক্তা মহিলা সাশ্রুনেত্রে বলেন—

"আমি অসহায়। আমি আমার নিজের ও আমার শিশুদের জন্য পেট ভরিয়া খাইবার মত আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিব না বলিয়া, আমার ইচ্ছা থাকিলেও, এই জঘন্য বৃত্তি ত্যাগ করিতে পারি না। প্রতি রাত্রিতে... ষ্ট্রীটস্থিত একটি খালি বাড়ীতে, তথায় আগত ব্যক্তিদের আপ্যায়নের জন্য আমি যাই। আমাকে এইভাবে অসদুপায়ে উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধাংশ সময় সময় প্রতি রাত্রিতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত, বাড়ীওলাকে দিতে হইত। .. আরও ১৫।১৬টি বালিকাও ঐ বাড়ীতে আসে।

"আমার আয় হইতে তাহাকে...একটি কক্ষের জন্য মাসিক ৬০৲ টাকা হিসাবে ভাড়া দিতে হয় এবং রাত্রিতে আমার অনুপস্থিতির সময় বিশেষভাবে আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুটির দেখাশুনা করিবার জন্য পুরা সময়ের একটি ঝি রাখিতে হয়।"

একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, কিন্তু এইপ্রকার শত শত দৃষ্টান্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে!

হাকিমের অন্তরে দয়া এবং বিবেচনা বলিয়া কিছু আছে বলিয়া তিনি অভিযুক্তা, সমাজ-নিগৃহীতা মহিলাকে কঠোর শাস্তি দেন নাই। আদালতের কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আটক রাখার লঘু দণ্ড মাত্র বিধান করেন।

এই মামলা সম্পর্কে হাকিম মহোদয় সহরের 'খালি' বাড়ীগুলির রক্ষকদের সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেন। হাকিম বলেন :

"পুলিশের নাকের ডগার উপর এই ধরনের খালি বাড়ীগুলিতে নিয়মিতভাবে অবাধে পাপ ব্যবসায় চলিতেছে এবং বাড়ীওয়ালাদের মত নরাকৃতি দানবগুলির মাধ্যমে শত শত তরুণী এই সব বাড়ীতে আসিয়া হাজির হয়।"

কেবল 'নাকের ডগার উপর' নহে, পুলিসের চোখের সামনে এবং জ্ঞাতসারেই কলিকাতা শহরে এই নারীমেধ যজ্ঞ বহুকাল হইতে চলিতেছে। দেশ বিভাগের পর হইতে এই পাপ-ব্যবসায় আজ সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

এই প্রকার খালি বাড়ীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া হাকিম মন্তব্য করেন যে, যত শীঘ্র এইসব বিচারবুদ্ধিহীন ও সমাজবিরোধী বাড়ীওয়ালা দণ্ডিত হয়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল।

বাড়ীওয়ালার কার্য্যকলাপ ও তাহার যে খালি বাড়ীতে "নারীদেহের রক্তমাংস লইয়া নিয়মিতভাবে মর্মান্তিক নাটক অভিনীত হইতেছে," তাহার প্রতি হাকিম কলিকাতা পুলিস কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হাকিম মনে করেন যে, এই ধরনের হতভাগিনী বালিকাদের রক্ষা ব্যবস্থা ও তাহাদের জীবনোপায়ের জন্য উপায় উদ্ভাবন করা একান্ত প্রয়োজন। (কে করিবে?)

হাকিমের মন্তব্য যথাযথ। কিন্তু পূর্ব্বেও এই জাতীয় বহু মামলার রায়ে বহু হাকিম সমপ্রকার মন্তব্য করেন, কিন্তু পুলিস দুই-একটা লোক-দেখানো হল্লা এবং মামলা দায়ের করা ছাড়া এই বিষম সামাজিক ব্যাধি আরোগ্যের যথার্থ কোন কার্য্যকর বিধি ব্যবস্থা করেন নাই।

কিন্তু এ-দায় কি কেবল পুলিসেরই?

এ-দায় একা পুলিসের নহে বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন আমরা পুলিসের সাফাই গাহিতেছি। পুলিস কলিকাতার এই প্রকার বিশেষ 'খালি-বাড়ী'র সন্ধান রাখে না, একথা বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু সত্যই যদি এ-সংবাদ পুলিসের না-জানা থাকে, তাহা হইলে পুলিসের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ববোধহীনতার এ-এক চরম অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন! শহরে যখন হাজার-হাজার লোক বাড়ীর সন্ধান করিয়া হতাশ হইতেছে, তখন, কেন, কি কারণে এবং কেমন করিয়া বহু 'খালি-বাড়ী' পড়িয়া থাকে—তাহা পুলিসের জানা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। অপরদিকে, যদি খালি-বাড়ীর রহস্য জানা সত্ত্বেও পুলিস কোন প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে খালি-বাড়ীর মালিকদের সঙ্গে পুলিসেরও আদালতে বিচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন, 'এডিং অ্যাণ্ড অ্যাবেটিং'-এর অপরাধে।

বিচারক তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়াছেন খালি-বাড়ী, খালি-বাড়ীর মালিক এবং এই সকল খালি-বাড়ীতে প্রত্যহ যে ভীষণ পাপ-ব্যবসায় চলিতেছে তাহার উচ্ছেদ-সাধন করিতে পুলিস অধিকর্ত্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া। কিন্তু মাত্র এই ব্যবস্থাতেই এই সমাজ-সর্ব্বনাশকর কলঙ্ক দূর হইবে না। যে-সকল সমাজ-বিরোধী ব্যক্তি সহায়-সম্বলহীনা নিরুপায় নারীদের লইয়া পাপ-ব্যবসায় দ্বারা নারীরক্ত কলঙ্কিত অর্থে তাহাদের পকেট পূর্ণ করিতেছে, তাহাদের সম্পূর্ণভাবে দমন করা সহজ কোন ব্যবস্থায় সম্ভব মনে করি না। কেবলমাত্র পুলিসের কঠোর সতর্কতা এবং আইন-বিহিত শাস্তির দ্বারা এই সমাজ-বিরোধী কার্য্য এবং সামাজিক ব্যাধির পূর্ণ প্রতিকার সম্ভব নহে। জঘন্যতম এই সমাজ-ব্যাধি নিবারণ করিতে হইলে সমাজ এবং রাষ্ট্রকে যুক্তভাবে সচেষ্ট সক্রিয় হইতে হইবে। অসহায় এবং আত্মীয়স্বজনহীনা নারীদের ভদ্র-ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিবার সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। একেবারে নিরুপায় না হইলে এবং সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জনের কোন পথ না পাইলেই নারী দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, নিজের এবং সন্তান থাকিলে তাহার প্রাণ রক্ষার তাগিদেই। কাজের ভাল-মন্দ বিচার শক্তি অবস্থার বিপাকে তাহার তিরোহিত হয়।

সমাজের দায়িত্ব কতখানি

বাঁচিবার সকল পথ (ভদ্র পথের কথা বলিতেছি) যখন রুদ্ধ হইয়া যায়—এমনি দিশাহারা অবস্থায় নারী জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করে দায়ে পড়িয়াই এবং তাহার এ-বৃত্তি গ্রহণ যতই গর্হিত ও নিন্দনীয় হোক, সে সমাজের নিকট অবশ্যই সামান্যতম করুণা এবং সুবিচার দাবি করিতে পারে।

হতভাগিনী রাণী ভট্টাচার্য্য আদালতের সম্মুখে বিচারার্থে আনীত হইয়াছিল। তাই তাহার কলঙ্কিত জীবনের করুণ কাহিনী সর্ব্বসাধারণের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইহা শুনিয়া কেহ হয়ত বেদনা অনুভব করিয়াছে, অনুকম্পার দীর্ঘশ্বাসও কেহ কেহ হয়তো ফেলিয়াছে। কিন্তু আদালত হইতে বাহির হইয়া সে কি খাইবে, কি করিয়া তাহার শিশু সন্তানদের পেট ভরাইবে তাহার ব্যবস্থা, সে যাহাতে সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে তাহার কোন উপায়, সরকার, সহৃদয় কোন ব্যক্তি বা সমাজহিতৈষী কোন

প্রতিষ্ঠান করিয়া দিয়াছেন কি? যদি না দিয়া থাকেন তাহা হইলে হতভাগিনী কি করিবে? পেটের জ্বালা মিটাইতে আর শিশুসন্তানদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন যোগাইতে আবার তাহাকে হীন পাপ-কলঙ্কের পথেই পা বাড়াইতে হইবে, সাশ্রুনয়নে একথা সে বিচারকের নিকট অকপটভাবেই স্বীকার করিয়াছে।

যে-সব ব্যক্তি নারীদের নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে, নানা কৌশলে তাহাদের বিপথে টানিয়া আনিয়া পাপ-পঙ্কে ডুবাইয়া দেয়, তাহারা অর্থশালী, কৌশলী এবং বিবেকহীন সমাজ-বিরোধী।

ইহাদের শায়েস্তা করিতে হইলে পুলিসকে যেমন কঠোর ও সন্ধানী হইতে হইবে—অভিযুক্ত হইলে আইনের সর্ব্বোচ্চ দণ্ডও যাহাতে ইহাদের প্রতি বিহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সমাজকে সদাসতর্ক থাকিতে হইবে এবং সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এই সব নরপশুর অস্তিত্ব সমাজ-জীবনে যেন কিছুতেই সম্ভব না হয়। এইরূপ সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই শুধু ইহাদের উচ্ছেদসাধন সম্ভব। অন্য কোনভাবে তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সহরের বহু অঞ্চলে বহু খালি-বাড়ীতে প্রত্যহ দিবা-রাত্র নারী লইয়া পাপ ব্যবসা চলিতেছে। এই সব অঞ্চলের বাসিন্দাদের এই প্রকার খালি-বাড়ীগুলির সংবাদ অজানা নহে। তাঁহারা যদি সমাজের (তথা নিজেদের পারিবারিক নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য, প্রকাশ্যে বা গোপনে এই প্রকার বাড়ীর সংবাদ পুলিসের গোচরে আনেন এবং পুলিস যদি সংবাদদাতা বা দাতাদের অযথা হয়রাণি বা বিপদগ্রস্ত না করিয়া, এই সব বাড়ী এবং বাড়ীওয়ালার বিরুদ্ধে আন্তরিকতার সহিত অভিযান চালান এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হন তাহা হইলে এই পাপ-ব্যবসায় এবং পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের উচ্ছেদ বহু পরিমাণে হইতে পারে।

পাপ-দমনে দেশের এবং সমাজের কল্যাণের জন্য পুলিস এবং সমাজের সংযুক্ত প্রচেষ্টার আশা, কতটা করিতে পারি জানি না।

পীড়িত-সমাজ

"দি জর্নাল অব্ দি অ্যামেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন", বহুকাল পূর্ব্বে মন্তব্য করেন যে:

"The old-time prostitute is sinking into second place. The new type is the young girl in her late teens or early twenties.... the carrier and disseminator of venereal disease is just one of us, so to speak......"

এই মন্তব্যের সত্যতা আজ আমাদের সমাজ-জীবনে অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে প্রত্যহ কি ঘটিতেছে, নৈতিক জীবনে আজ নর-নারীর অশুদ্ধ সম্পর্ক কি বিষম বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে, তাহার সামান্য সংবাদও যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই এ কথার যথার্থতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

একজন প্রখ্যাত মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানী বলেন:

Vice exists because there are great numbers of semidestitute girls: and because there are enormous profits reaped from the management of vice as a business.

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কথা আমার আলোচনার বাহিরে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, খড়্গপুর, আসান-সোল, দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বর্ত্তমানে সহায়-সম্বলহীনা, নিরুপায় নারীর সংখ্যা সুপ্রচুর এবং জীবনে বাঁচিবার সকল পথ রুদ্ধ হওয়ায় এই নারীরা অবশেষে দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে, এবং এই সকল উপায়-হীনা নারীদের দেহবিক্রয় ব্যবসায়ে নামাইয়া এক শ্রেণীর নররূপী পাষণ্ড বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া লইতেছে। এই সকল দালাল-শ্রেণীর লোকের সংখ্যাও বড় কম নহে এবং ইহাদের পরিচয়, গতিবিধি এবং কার্য্যক্রম সমাজের উপর তলার এক শ্রেণীর ধনীদের ভাল করিয়াই জানা আছে। পুলিস মহলের, সবাই না হইলেও অনেকেই, এই দালালদের চিনেন, জানেন।

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে 'নূতন' এক দেশ গঠনের পরিকল্পনা চলিতেছে। দেশে নূতন এক বিত্তশালী জন-সমাজ গঠনের বিষম দায়িত্বও আজ আমাদের শাসকবর্গ গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিয়া তাহাকে এক নূতন সুখী-জীবনে পুনর্ব্বাসন করাইবার প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত সাড়ম্বরে রেডিও, সংবাদপত্রে এবং মন্ত্রীদের শ্রীমুখে-মুখে প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু কোন কর্ত্তা কিংবা নেতার মুখে দেশকে, জাতিকে, নৈতিক আদর্শ-জীবনে পুনর্ব্বাসিত করিবার কোন কথাই শুনিতে পাই না। অথচ এই সামান্য কাজটি না হইলে কেবল বিত্ত-বৈভব এবং বড় বড় বহুতলা বিশিষ্ট কংক্রিটের ইমারতের উপরে জাতি, সমাজ এবং দেশের কোন সম্পদ্ই স্থায়িত্ব লাভ করিবে না। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করা দরকার যে, অসহায় এবং অনাথা নারীদের অর্থ নৈতিক নিশ্চয়তা দান না করিতে পারিলে, তাহাদের নিদারুণ

দারিদ্র্য হইতে মুক্তি করিতে না পারিলে, কেবলমাত্র নীতিকথা বলিয়া এবং দুই-চারিজন নারী-ব্যবসায়ী বা দালালকে আদালতে অভিযুক্ত করিয়া সমাজ-দেহের এ দুষ্টক্ষত নিরাময় করা অসম্ভব।

সোভিয়েট রাশিয়ায় যখন নারীদের নৈতিক দুর্নীতি দূর করিবার প্রচেষ্টা হয়, সেই সময় কয়েকজন 'পেশাদার' নারী বলেন,

"Give us respectable work with reasonable security, and we'll rehabilitate ourselves."

বলা বাহুল্য এই 'পেশাদার' নারীদের লইয়া যে 'বিপদ্‌জনক' পরীক্ষা সোভিয়েট সমাজ-বিজ্ঞানীরা করেন, তাহা সকল দিক্ হইতেই সাফল্য লাভ করিয়াছে।

নারীদের নৈতিক পুনর্বাসনের এই প্রাথমিক পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া—সোভিয়েট সরকার সমাজ-বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় পরীক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দেশ হইতে পাপের মূল উৎপাটনে মনযোগ দিলেন।

"On the Action of Militia in the struggle Against Prostitution" নামে একটি আইন যথা সময়ে বিধিবদ্ধ হইল। এই militia-র (অর্থাৎ পুলিস) প্রথম কাজই হইল :

"....to discover all disorderly houses, which were recognised as among the major factor perpetuating **vice** profits. Every person operating, renting, **or** owning such a house or in any way connected with securing customers or women for it, was to be arrested and sentenced according to provisions in the criminal Code. These house owners, landlords, landladies, procurers, madames, etc., were to be treated as **slavers** dealing in human merchandise."

দুর্নীতি দমন উদ্দেশ্যে সংগঠিত এই মিলিসিয়ার আর একটি দায়িত্ব হইল :

"......to pay closest attention to public places of amusement, restaurents, etc., specially after the well-known houses had been raided. In every case the owner of the establishment had to be traced, convicted, and sentenced, regardless of his or her professed ignorance as to the nature of the business being carried on within the premises. Every place in which evidence of vice was found must be closed until such time as all persons owning and operating it were dealt with."

সমপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আমাদের জাতীয় সরকার কখনও ভরসা করিবেন না, কারণ এখানে (বিশেষ করিয়া কলিকাতায়) :

"A house of prostitution is one of the best **real-estate** investments known; no matter how many times the police raid such a place its owner remains unknown and uninvolved"

এই প্রকার বাড়ীর মালিকদের মধ্যে বহু খ্যাতনামা ধনীর নাম সামান্য চেষ্টাতেই পাওয়া যাইবে এবং এই সব 'মালিক' সমাজের উপর মহলেই মাথা উঁচু করিয়া চলা-ফেরা করেন। এ বিষয়ে কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী নয়া-ডিমোক্র্যাসীর এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন স্বীকার করিব !

কলিকাতায় বহু খ্যাতনামা পুরুষ এবং মহিলা সমাজ কর্ম্মী বা সমাজ সেবক আছেন। বিশেষ করিয়া এক শ্রেণীর এমন মহিলা সমাজ-কর্ম্মী আছেন, যাঁহারা সমাজে বিত্ত-বৈভব এবং শিক্ষার জন্য সুখ্যাত এবং সম্মানিত। কিন্তু, এই সকল মহিলা সমাজ-কর্ম্মী নারীদের চরমতম দুর্দ্দশা এবং অবমাননা যে ক্ষেত্রে হইতেছে, সেখানে কখনও পদার্পণ করিবার চিন্তাও করেন না কেন? মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে একজন তথাকথিত প্রখ্যাতা মহিলা সমাজ-সেবিকাকে—একটি "বিশেষ বাড়ীতে" অনুসন্ধান করিবার জন্য পুলিস তাহাদের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করে, কিন্তু এই বিশিষ্টা সমাজ সেবিকা তাহাতে রাজী হইতে পারেন নাই কারণ-নোংরা বাড়ীতে নোংরা কাজে যাইতে তাঁহার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রুচিতে বাধে! অথচ পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রে মহিলা-কর্ম্মীরাই নারীত্বের কলঙ্ক মোচনে এবং নারীকে লইয়া কারবার বন্ধ করিতে সর্ব্বাগ্রে আছেন!

প্রকৃত সমাজ-সেবিকা বা সমাজ-কর্ম্মী (Social worker) হইতে হইলে যে নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, দায়িত্ববোধ এবং চরিত্রবল থাকা একান্ত প্রয়োজন, দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে প্রায় ক্ষেত্রেই তাহার একান্ত অভাব। এখানে 'সমাজ-সেবা' এক শ্রেণীর ধনী মহিলার একটা বিলাস, নাম-মাত্র কিছু স্কুল, মহিলা-আসর স্থাপন এবং রেডিও মারফৎ সমাজ-সেবার বিষয় গুরু-গম্ভীর বক্তৃতাদি দ্বারাই ইঁহারা

সমাজ-সেবা (?) করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে সমাজ-সেবার কার্য্যে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে বিপদের ঝুঁকি লইতে, এই শ্রেণীর সমাজ-সেবীরা রাজী নহেন। সমাজ-সেবার দ্বারা নাম কিনিবার মোহ ইঁহাদের চরম এবং পরম কাম্য। এই ভাবে দয়া করিয়া পরের উপকার ব্রত গ্রহণ কাহারো পক্ষে কল্যাণকর নহে।

শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রেই একথা সত্য যে, যে-সব নারী পাপ-ব্যবসায়ে আত্মবিক্রয় করে, তাহার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। এই সব নারীদের চরিত্র-বিকৃতি ঘটিলেও, প্রথমদিকে কোন প্রকার 'মনোবিকৃতি' ঘটে না, এবং জীবন যাপনের, অর্থোপার্জ্জনের ভদ্র উপায় পাইলে—শত শত 'হঠাৎ-'চরিত্র-দুষ্ট নারী আবার স্বাভাবিক ভদ্র জীবন আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করিবে। মহিলা সমাজ-কর্ম্মীরা যদি পতিতা নারীর চরিত্র শোধনে সমাজ বিজ্ঞান-বিহিত পন্থা গ্রহণ করেন—তাহা হইলেই সত্যকার কাজের কাজ কিছু আশা করা যাইতে পারে।

মূল্য-বৃদ্ধি হইতে দিব না—দিব না—দিব না!

পণ্যমূল্য, বিশেষ করিয়া চাউল এবং অন্যান্য সর্ব্ব-প্রকার খাদ্যসামগ্রীর বিষম মূল্যবৃদ্ধি আজ পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯০টি পরিবারকে ঘায়েল করিয়া মৃতপ্রায় করিয়াছে। গত দুইমাসে এই মূল্যবৃদ্ধি আরো তীব্র হইয়াছে। সাধারণ মানুষের এই অসহায় অবস্থায় প্রথমে মন্ত্রী পাতিল এবং তাহার পর কলির-বামনাবতার লালবাহাদুর শাস্ত্রী কৃপাপরবশ হইয়া ব্যবসায়ীদের করুণ আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবার রোধ করেন। এ করুণ আবেদনে যদি ব্যবসায়ীরা সাড়া না দেন, তাহা হইলে সরকার একটা ভয়ানক-কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন! শ্রীপাতিল ব্যবসায়ীদের তিনমাস সময় দিয়াছেন দয়া করিয়া, এবং এই তিনমাস পরে যদি দ্রব্যমূল্য না স্থিতিলাভ করে তাহা হইলে তিনিও নাকি একটা সাংঘাতিক কিছু করিয়া বসিবেন! বলা বাহুল্য, বাক্-সর্ব্বস্ব মন্ত্রী মহাশয়দের এ-হুমকি ব্যবসায়ীরা ফাঁক আওয়াজ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ এ-হুমকিকে আর একটা সরকারী পরিহাস মনে করিয়া, নিজেদের মধ্যে হয়ত বা হাসাহাসিও করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে বারবার দেখা গিয়াছে ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকারী হুমকি, পাকিস্তান এবং চীনের প্রতি ভারত সরকারের 'তীব্র প্রতিবাদের' সামিল। ভারত সরকারের 'তীব্র', 'তীব্রতর' এবং 'তীব্রতম'-প্রতিবাদকে পাকিস্তান এবং চীন যেমন অবহেলা অগ্রাহ্য করে, ভারতীয় ব্যবসায়ীমহলও ঠিক তেমনিই করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা এ-কথা বেশ ভাল করিয়াই জানেন যে, ভারত সরকারের সকল কেরামতি প্রতিবাদেই আবদ্ধ থাকিবে। প্রতিবাদ এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা ছাড়া ভারত সরকারের আর বেশী দূর অগ্রসর হইবার কোন ক্ষমতা নাই (আগ্রহও নাই!)। আমাদের শাসক-সম্প্রদায় কেবলমাত্র বাক্যবাণেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের দায় শেষ করিতে চাহেন। জানি না, জনসাধারণের জীবন লইয়া এই সরকারী পরিহাস আর কতকাল চলিবে. লোকেও আর কতকাল কংগ্রেসী শাসনের এ দুর্বিসহ অত্যাচার-অনাচার মুখ বুঝিয়া সহ্য করিবে। সর্ব্বসামগ্রীর অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের শতকরা ৯০জন লোকের যে অসহনীয় অবস্থার চিত্র আজ প্রকট, তাহাতে নির্য্যাতিত দরিদ্রের হাহাকার আর বঞ্চনা স্পষ্ট উদ্ঘাটিত। সাধারণ মানুষ আজ কোনোদিকে সামান্য আশার আলোকও দেখিতে পাইতেছে না! মোরারজীর 'কর'-আঘাত মানুষের জীবন আরো হাজারগুণ বিড়ম্বিত করিতেছে!

১২৫৲ টাকা আয়ভোগী ভদ্রলোক (পরিবারে ৩ জন লোক) ২ মাস পূর্ব্বেও কোনপ্রকারে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করিতেন আজ তাঁহারা থই পাইতেছেন না। মৌলিক প্রয়োজনের সর্ব্বস্তরে দ্রব্যমূল্য শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্যসঞ্চয় পরিকল্পনা হইয়াছে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা,…৩ মাস পূর্ব্বেও ১২৫৲ টাকা আয়ভোগী যে-সকল নিম্নবিত্ত পরিবারের যেনতেন প্রকারেণ কুলাইয়া যাইত, আজ তাঁহাদের পরিবারেও প্রতি মাসে ২০।২৫ টাকা ঘাটতি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

১২৫৲ টাকার চেয়ে মাসিক আয় কম, এমন পরিবারের সংখ্যা যথেষ্ট। পরিবারে পোষ্যের সংখ্যা পাঁচ বা ততোধিক এমন পরিবারের সংখ্যাও অসংখ্য। সমস্যার গভীরতা এবং দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টের তীব্রতা অনুধাবনের উদ্দেশ্যে আমরা ১২৫৲ টাকা আয়ভোগী স্বামী-স্ত্রী ও দুইটি সন্তানযুক্ত পরিবারের এক মডেল লইয়াছি।

ছয় মাস পূর্ব্বে উক্ত পরিবারের খাদ্যের জন্য ৭২৲ টাকা, বাসগৃহের জন্য ২০৲ টাকা, কাপড়চোপড়ের জন্য ৬৲ টাকা এবং চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিবিধ খাতে ২৭৲ টাকা খরচ হইত। আজ কিন্তু সেই পরিবারকেই খাদ্যের জন্য ৮৲ টাকা, বাসগৃহের জন্য তিন টাকা, কাপড়চোপড়ের জন্য দুই টাকা এবং চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিবিধ খাতে ১৲ টাকা বেশী খরচ করিতে হইতেছে। এইভাবে তাঁহাদের প্রতি মাসে ঘাটতি পড়িতেছে ১৫।২০ টাকা। এমনই এক পরিবারের কর্ত্তা বলেন যে, অবশ্য-সঞ্চয় পরিকল্পনা তাঁহাদের ক্ষেত্রে নির্ম্মম পরিহাসের ন্যায়—ইহা যেমন নিষ্ঠুরতা, তেমনই কৌতুকাবহ।

প্রত্যহ বর্দ্ধমান খাদ্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যমূল্য, কালোবাজারী, এবং মুনাফাশিকারীদের অবাধ অত্যাচার, হাড়ভাঙ্গা করভার এবং ইহার উপর জবরদস্তিমূলক সঞ্চয়ের' বিষম চাপ আজ দেশের কোটি কোটি লোকের জীবন দুর্ব্বিষহ করিয়াছে। শাসনের নামে এ বিষম নারকীয় কংগ্রেসী "অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র পথ গণ-আন্দোলন, এমন এক প্রচণ্ড আন্দোলন, যাহার 'সক্রিয়' ভাষা কংগ্রেসী শাসকদের সহজ বোধগম্য হইবে। দেশের শাসনব্যবস্থাকে কংগ্রেসী-Rogue-বীজাণু মুক্ত না করিতে পারিলে দেশের এবং তাহার সঙ্গে দেশবাসীর মৃত্যু অবধারিত।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সমস্যা

তীব্রতম হইয়া মাহুষের সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কংগ্রেসী শাসকসম্প্রদায়ের সুখ-নিদ্রা এবং আরাম-বিলাসের সামান্যতম ব্যাঘাতও ঘটায় নাই! অবশ্য একথা সত্য যে, উদর ঠাসিয়া উত্তম আহার এবং আহারের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম (তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে) এবং তাহার পর সরকারী খরচায় (অর্থাৎ করদাতাদের রক্তসিঞ্চিত অর্থে) ২৪,০০০৲।২৫,০০০৲ হাজার টাকা মূল্যের মোটর গাড়ি চড়িয়া কিছু 'রাজকার্য্য পরিচালনা এবং সুযোগমত সাধারণজনকে 'আরো' কৃচ্ছ্রতাসাধন এবং কোমরের বেল্ট 'আরো' টাইট করিবার অমৃতবাণী দান করাই যাঁহাদের একমাত্র পেশা, তাঁহাদের নিকট হইতে দরিদ্র ভদ্র মাহুষ আর কিছুই আশা করিতে পারে না, করেও না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেন আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান অতি সহজে অবলীলাক্রমে এক কথায় করিয়া দিয়াছেন—গম খাও বলিয়া (এই সঙ্গে মাছের বদলে 'মাছি' খাও বলাও ঠিক হইত) স্বর্গত ডাঃ রায়ও একবার এ রাজ্যের বিষম খাদ্যসমস্যার সমাধানকল্পে ইতরজনদের পেল, আঙ্গুর, আনারস, মর্ত্তমান কলা, কাশার পেয়ারা, কমলা লেবু, মাখন এবং সুবিধামত রাবড়ী, দধি ক্ষীর প্রভৃতি ভক্ষণ করিবার মূল্যবান পরামর্শ দান করেন। কারণ এইসব ফল ইত্যাদি কলিকাতায় এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াছড়ি যাইতেছে। ডাঃ রায়ের দোষ নাই, কারণ তাঁহার পক্ষে যাহা সুলভ এবং সহজলভ্য ছিল, সকলের পক্ষে তাহা অবশ্যই হইবে!

শ্রী প্রফুল্ল সেন, মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, তাই বোধহয় তিনি ডাঃ রায়ের স্বল্পমূল্য-খাদ্য-প্রেসক্রিপ্‌সন্‌ দিতে ভরসা করেন নাই, তাই কেবল গমের উপর দিয়াই সহজে কাজ সারিয়াছেন! কিন্তু এই সেন মহাশয় আজ কয়জন মাহুষের কতটুকু গম কিনিবার ক্ষমতা আছে তাহা জানিবার চেষ্টা বিন্দুমাত্রও করিয়াছেন কি? সীমাবদ্ধ সামান্য আয়ে (১০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা) যাহাদের পরিবার (গড়পড়তা ৭।৮ জন লোক) প্রতিপালন করিতে হয়,—তাহাদের, সরকারের প্রাণঘাতী কর, বাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় খরচায় দায় মিটাইয়া খাদ্য বাবদ খরচ করিবার মত কত পয়সা উদ্বৃত্ত থাকে তাহার একটা হিসাব শ্রীসেন লইবেন কি? ইহার উপর নূতন আপদ হইয়াছে জবরদস্তিমূলক সঞ্চয়ের বে-আইনি আদেশ। সরকারী (অর্থাৎ কংগ্রেসী) জন-পীড়নের শেষ এবং সীমা কোথায়—কেহ জানে না। নিতান্ত নির্লজ্জ এবং হায়াহীন না হইলে, কংগ্রেসী নেতারা জনগণকে সর্ব্বভাবে এবং সকল দিকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের দেশের জন্য আরো ত্যাগ স্বীকার করিতে চীনাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার অমৃত-উপদেশ দিতে লজ্জাবোধ করিতেন।

চীনাদের সহিত দেশবাসী মোকাবিলা করিতে সদা প্রস্তুত। কিন্তু কোটি কোটি কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত্ত লোক, কৌপীন-মাত্র পরিয়া চীনাদের সহিত লড়িবে, সরকার কি এই আশা করেন? শাসকের দল স্ফীত-উদর, এবং মেদবহুল দেহ এবং ভীরু কাপুরুষের মন লইয়া চীনাদের ত্রিসীমানায় যাইবেন না—ইহা কঠোর সত্য!

তবে চীনাদের ঠেকাইবার একটা নূতন যুদ্ধ পদ্ধতি কংগ্রেসী বীরপুরুষের দল ভাবিয়া দেখিতে পারেন। পদ্ধতিটা আরকিছুই নয়, ৫০।৬০ লক্ষ কৌপীনধারী কঙ্কালসার, প্রায়-ছায়া-ক্ষীণ দেহ লইয়া এবং প্রত্যেকে হাতে প্ল্যাকার্ডের উপর একটি করিয়া শাদা টুপি (White Cap) বসাইয়া হিমালয়ের উপর দিয়া চিঁ-চিঁ শব্দ করিতে করিতে যদি চীনা হামলাদারদের উপর কোনক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে তাহা হইলে এ 'ভৌতিক' আক্রমণের মুখে চীনেরা ত্রাহি ত্রাহি রব করিতে করিতে কেবল ম্যাকমোহন লাইন নহে, তিব্বত অবধি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে! এই কঙ্কাল হাড্ডিসার 'নব' সৈন্যবাহিনীকে, গান্ধীর উত্তরাধিকারী, বিশ্বের সেরা বাণীবিশারদ, নিষ্ঠাবান্‌ বিশ্বশান্তি উদ্গাতা এবং সকল শাস্ত্রে প্র-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নেহরু—অপরাজেয় এক ভৌতিক-আত্মশক্তিতে বলীয়ান্‌ করিতে পারেন! কম্যুনিষ্ট চীনাদের পরাভূত করিতে আজ ভৌতিক-শক্তি একমাত্র অস্ত্র।

বাণী-ঈশ্বর ভারত ভাগ্যবিধাতার নব-বাণী

প্রধানমন্ত্রী যেখানে যাহা কিছু বলেন—তাহা সকল ভারতবাসীকে উদ্দেশ করিয়াই—কাজেই অধম

পশ্চিমবঙ্গ নামক নব-কলোনীও তাহার মধ্যে পড়ে। বাণী-বিনোদ এক ভাষণ প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান্ কথা দেশের সাধারণ জনকে বলিতেছেন :

চীনারা আমাদের কিছু জমি দখল করিয়া আছে এবং যে-কোন সময় পুনরায় আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। এই সময় যাহারা কর ও মূল্য বৃদ্ধির প্রশ্নে আন্দোলন করার কথা বলিতেছে, তাহারা কার্যত: শত্রুকে সাহায্য করিতেছে। এখন দেশের ভিতরে গণ্ডগোল সৃষ্টির সময় নহে।

চীনারা যে কোন সময় পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে। প্রকৃত অবস্থা না বুঝিয়া এখন আন্দোলন ও বিক্ষোভের কথা বলিতেছে বিরোধী দলগুলি।

গোড়ায় জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সেই উদ্দীপনার মনোভাব ঝিমাইয়া গিয়াছে।

বাহিরের বিপদের মুখে জনসাধারণ সর্ব্বাপেক্ষা কম যাহা করিতে পারে, তাহা হইল করের বোঝা বহন। (এবং অনাহারে প্রাণদান)।

এখন আত্মোৎসর্গ প্রয়োজন (কর্ত্তাদের পক্ষে নহে), সেইজন্য আনন্দের সঙ্গে জনসাধারণের নূতন করের বোঝা বহন করা উচিত। (করিতে বাধ্য বলাই যথোচিত হইত।)

শত্রু যখন দুয়ারে কড়া নাড়িতেছে, তখন আন্দোলন আরম্ভ করিয়া কেহই দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতে পারে না। :

অর্থাৎ কি না চীনা-আপদ দূর করার সকল কষ্টকর দায়িত্ব এবং ত্যাগ স্বীকার সাধারণ জনগণকেই বহিতে হইবে, কারণ কংগ্রেসী নেতারা এবং শাসক-গুষ্টি এই আপৎকালে দেশ শাসনের বিষম দায়িত্বভার বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া বহন করিতেছেন।

অমৃতবাণী প্রদাতা জনগণকে সকল কষ্ট হাসিমুখে স্বীকার করিয়া এই সময় সামান্য কর বহনে আপত্তি করিতে নিষেধ করিতেছেন। অতি উত্তম কথা এবং অবশ্যপালনীয় নির্দ্দেশ। জনগণ যদি রাষ্ট্রের বিষম করভার বহন না করে, তাহা হইলে দিল্লীর নবাবদের নবাবা এবং গৌরী সেনের টাকার এমন বিরাট্ শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা কেমন করিয়া চলিবে?

প্রধানমন্ত্রীর কথায় মনে হয় :—টাকা যাহা চাহিব, তোমরা তাহাই দিবে এবং সেই টাকা কংগ্রেসী মন্ত্রী-উপমন্ত্রী এবং উচ্চপদাধিকারী কর্ম্মচারীরা অনাচারে, ব্যভিচারে, নির্ব্বিচারে আরাম-বিলাসে যেমন ইচ্ছা খরচ করিবে। এই সঙ্কটকালে টাকার শ্রাদ্ধ কেমন ভাবে কোন্ দিকে কে কি রকম করিতেছে তাহা লইয়া বা তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা তোলা বা বলা দেশদ্রোহিতার সামিল!

প্রধানমন্ত্রী পরকে বিনামূল্যে অমূল্য উপদেশ এবং বাণী বিতরণ করিতে চির-উদার। কিন্তু গরীব কর-দাতাদের কোটি কোটি টাকা সরকারী বেকুফী এবং অন্যায় অন্যায্য কারণে যে ভাবে অপচয় এবং 'পকেট' বদল হইতেছে তাহার বিষয় কোন কথা বলেন না কেন? মন্ত্রী মহাশয়গণ তাঁহাদের রাজকীয় বসবাস এবং বিলাস-ব্যসনের কারণে গরীব করদাতাদের প্রদত্ত টাকার শ্রাদ্ধ কেমন দরাজ হস্তে করিতেছেন সে দিকে তাঁহার চোখ পড়ে না কেন? এরোপ্লেন বিহার, অকাজে বিদেশ গমন, দিল্লীতে কথায় কথায় রাষ্ট্রীয় ভোজের হুল্লোড়—এই আপৎকালেও সমানে চলিতেছে। প্রধানমন্ত্রীর কাশ্মীর বিহার এখন কি না হইলেই চলিত না? ভারতের সকল স্থানে সকল কিছু উদ্বোধন করিতে পরের পয়সায় প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে গমন এমন কি অত্যাবশ্যকীয় রাজকার্য্য? সাধারণ মানুষ যখন অনাহারে জর্জ্জরিত, সেইসময় প্রধানমন্ত্রী তথা অন্যান্য সকল মন্ত্রী মহাশয়গণ তাঁহাদের প্রাত্যহিক ভোজের বিষম তালিকা বা পদের কতটুকু ত্যাগ করিতেছেন? গরীবকে অবশ্য-সঞ্চয় করিতেই হইবে, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়গণ এই নির্দ্দেশ কি ভাবে কতটুকু পালন করিতেছেন? তাঁহারা আয়কর কি হিসাবে দিতেছেন। মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীরূপ ক্ষুদে মহারাজরা যে-সকল প্রাসাদে বাস করেন (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) তাহার ভাড়া, ইলেক্ট্রিক, জল, এক হইতে দেড়-দুই ডজন ভৃত্যের বেতন এবং অন্যান্য বিলাস ব্যবস্থা (সবই সরকারী খরচে) তাহাদের আয়কর হিসাবের মধ্যে ধরা হয় কি? যদি না হয়, কেন হয় না? গরীব কর্ম্মচারী যে ৩৫০৲ টাকা মাসিক বেতন পায়, তাহার বাড়ীভাড়া-ভাতা প্রভৃতি আয়কর হইতে বাদ যায় না।

বিশ্ব-পণ্ডিত নেহরু দুঃখ করিতেছেন—চীনা হামলার প্রথম দিকে জনগণের মধ্যে একটা প্রচণ্ড জাগরণ এবং ঐক্যের ভাব প্রকাশ হয়, আজ তাহা নাই! কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে এবং কাহারা? নেহরুর বাসনা সাধারণ জনগণকে ঠেঙ্গাইয়া, তাঁহাদের মস্তকে অপক্ক কাঁটাল ভাঙ্গিয়া জোর-জবরদস্তি করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিবে তথাকথিত 'স্বাধীন'-রাষ্ট্রের 'আরো' স্বাধীন কর্ম্মকর্ত্তারা এবং অসহনীয় নারকীয় সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয়-

Cum কংগ্রেসী অত্যাচার, অনাচার নীরবে সর্ব্বকাল সহ্য করিবে জনগণ কোন প্রতিবাদ না করিয়া। ইডিওটিক বাসনা!

আমরা অন্য রাজ্যর কথা ভাবিতেছি না, ভাবিতেছি অনাথ-অসহায় পশ্চিমবঙ্গের জনগণের অবস্থার কথা। এ রাজ্যের চাউল, ডাইল, চিনি এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি এবং তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রাণ যায়-যায় অবস্থা দেখিয়া প্রধানমন্ত্রী খুবই দুঃখিত! (ধন্যবাদ!) তাঁদের মতে কম উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার গলদই ইহার কারণ! কিন্তু এই জনপ্রাণঘাতী বিষম গলদের জন্য দায়ী বা দোষী কাহারা? গত ১৫ ১৬ বৎসরে বড় বড় কথা এবং প্রচণ্ড জনকল্যাণকারী বিষম পরিকল্পনার বিষয় বহু কিছুই বিশ্ব-পণ্ডিতের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হীন হইতে হীনতর এবং আজ হীনতর হইতে হীনতম হইয়াছে! উর্ব্বর মস্তকে বাণী এবং পরিকল্পনার চাষ না করিয়া বাস্তবে কিছু প্রকৃত চাষের চেষ্টা কিছুই হয় নাই কেন? সরকার দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য যে-কোন ক্ষেত্রে মোড়লী করিতে নামিয়াছেন—সর্ব্বত্রই অর্জ্জন করিয়াছেন এক বিরাট্ প্রচণ্ড এবং 'গণমারী' অসাফল্য। কোথাও কোন সাফল্যের চিহ্ন (একমাত্র সরকারী মুখপাত্রদের বাণীতে ছাড়া) হাজার চেষ্টাতেও কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। প্রধানমন্ত্রীর চোখ কান এবং নাসিকা থাকিলে বারবার একই বাণীদানে জনচিত্তরূপী চিড়া ভিজাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেন না।

তরুণ মন্ত্রীর করুণ আবেদন

এ রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি এবং বাণিজ্য-সংস্থার কর্ত্তাদের উদ্দেশে এই মর্ম্মে এক করুণ আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া স্থানীয় যুবকদের কাজে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের বাঙ্গলার শিল্পায়নের কিছু ফল ভোগ করিবার অবকাশ দেন। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৯৮ অংশ আজ অবাঙ্গালীদের করতলগত। এই অবাঙ্গালী শিল্পপতি এবং বাণিজ্য-সংস্থার মালিকগণ তরুণ মন্ত্রীর করুণ আবেদনে কোন সাড়াই দিবেন না, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। ৺বিধান রায়ও এ বিষয় হতাশ হয়েন।

নতজানু হইয়া এবং হাতজোড় করিয়া ভিক্ষার দ্বারা ন্যায্য অধিকার আদায় বা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ-অধিকার আদায় করিবার একমাত্র পথ কঠোরতা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী বিহার, ওড়িষা এবং অন্যান্য রাজ্য কি ভাবে এবং কোন্ পথে স্থানীয় লোকদের দাবি এবং প্রাপ্য আদায় করিতে হয়, তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই দেখাইয়াছে। আমরা বুঝিতে পারি না, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সেই পথে পা বাড়াইতে এত লজ্জা, দ্বিধা বা ভয় কেন?

বাঙালীকে কাজ দিতে হইবে এই সর্ত্তে যদি কোন শিল্পপতি এ রাজ্যে তাঁহার কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে না চান তাহাতে বাঙালীর আর কি ক্ষতি হইবে? কেননা কথায় বলে মড়ার বাড়া গাল নাই। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি, এ দৃঢ়তা যদি রাজ্য সরকার দেখাইতে পারেন তাহা হইলে এ রাজ্যে শিল্প প্রসার আদৌ ব্যাহত হইবে না। তাহার কারণ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া কেহ এ রাজ্যে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে আসে না—এখানে যে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক সুবিধা আছে তাহার সুযোগ লইবার জন্যই দেশ-দেশান্তর হইতে শিল্পপতিরা এখানে ছুটিয়া আসেন। বাঙালীদের কাজ না দিলে যদি তাঁহারা কারখানা স্থাপন করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহারা ঘরে ফিরিয়া যাইবেন না—বাঙালীকে সরকারী নির্দ্দেশ মত আরও বেশী কাজ দিবেন।

নিজ বাসভূমে আমাদের কি চিরপরবাসী হইয়াই থাকিতে হইবে?

পশ্চিমবঙ্গে আজ ব্যবসা বাণিজ্যের যে বিরাট্ উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছে তাহার সামান্য প্রসাদও কি বাঙ্গালী পাইবে না? ভিক্ষার ঝুলি লইয়া তাহাকে কি সামান্য ক্ষুদ-কুঁড়া ভিক্ষার দ্বারাই দিন কাটাইতে হইবে? একদিকে বাঙ্গালীর এই অবস্থা, আর অন্যদিকে দেখিতেছি লক্ষ লক্ষ বিহারী, ওড়িয়া, উত্তর প্রদেশী, মাদ্রাজী প্রভৃতি কর্ম্মপ্রার্থী কলিকাতা, হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর, খড়্গপুরে আসর জমাইয়া বসিয়াছে। বাঙ্গালীর ঘরের পাশে চলিতেছে 'দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্—' বাঙ্গালী মলিন বিমর্ষ বদনে তাহাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া দেখিতেছে আর ক্লীব রাজ্যসরকার এবং মন্ত্রীগোষ্ঠী গদিতে বসিয়া নিজেদের লইয়াই সদাব্যস্ত! মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেনের নিকট বাঙ্গালী বহু কিছু আশা করিয়াছিল। তাঁহার শ্রীচরণে একমাত্র নিবেদন, দেশের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি দান করুন।

নূতন মেছো বাজার

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে এই মৎস্য-আকালের কালে প্রজাপালক কংগ্রেসী সরকার একটি নূতন মেছো-বাজার খুলিয়াছেন, এই সংবাদে আমাদের মৎস্যহীন-জীবনে এবং স্তিমিত-চিত্তে অভূতপূর্ব্ব হর্ষের সঞ্চার হইয়াছে। এই নূতন মেছো-বাজারে বোয়াল, রাঘব বোয়াল, রুই, কাৎলা, মৃগেল হইতে আরম্ভ করিয়া—অখাদ্য পচা-চিংড়ি এবং অন্যান্য মাছেরও প্রচুর সমাবেশ

দেখা যাইতেছে। পছন্দ ও রুচিমত যে-কেহ এই নব মেছো-বাজারে যে-কোন মাছের গন্ধ পাইবেন। রাজ্য-সরকারের এই নব-স্থাপিত মেছো-বাজার দেখিতে হইলে 'প্রবেশ পত্রের-ব্যবস্থা' আছে। পাছে মজুতদার, ফড়ে কিংবা কালোবাজারীরা এখানে প্রবেশ করিয়া আবার কিছু অনাসৃষ্টি করে—সেই কারণেই এই 'প্রবেশ-পত্র'।

এই মেছো-বাজারটি গঙ্গার ধারে এবং বিস্তৃত উদ্যান-পরিবেষ্টিত কম্পাউণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সব দেখিয়া মনে হয়—রাজ্য সরকারের রুচিবোধ প্রখর।

রাজ্য সরকারের এই নব-মেছো-বাজার বিধান সভা নামক শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত—বিরাট হলঘরের মধ্যে। জন-সাধারণ যাঁহারা নানা প্রকার মাছের নামই শুনিয়াছেন, তাঁহারা সেই সব কানে-শোনা-চোখে-না-দেখা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল মৎস্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন। অধম পুরানো মেছোবাজারের চলতি ভাষা'দ এবং আবহাওয়াও এখানে পাওয়া যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে নেশা-বন্দী (Prohibition)—

বহুকাল পূর্ব্বে, বোধহয় ১৯৫৪-৫৫ সালে, পশ্চিম-বঙ্গের এক সরকারী ঘোষণায় সরকারী কর্ম্মচারী এবং সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্ত্তাদের প্রকাশ্য স্থানে মদ্য-পান নিষিদ্ধ করা হয়। অতি উত্তম ঘোষণা। কিন্তু মদ্য-পান করিয়া ইঁহাদের সরকারী দপ্তর প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে সরকারী-কার্য্যে আলাপ-আলোচনায় যোগদান করা নিষিদ্ধ হয় কি না জানা নাই। কেহ জানাইলে বাধিত হইব। এ-জিজ্ঞাসা অ-কারণ নহে, কারণ-ঘটিত কারণেই এ-জিজ্ঞাসা!

অশিক্ষিত অসভ্যদের অযথা 'মৃত্যুর অভিনয়'

মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীপ্রফুল্ল সেন বিধান সভায় উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কেহ অনাহারে মরে নাই! বহু পূর্ব্বেই তিনি এবং এবং ত্রাণ-মন্ত্রী আভা-দি-মাইটি, 'অনাহারে কাহাকেও মরিতে দিবেন না,' এ-ঘোষণা করেন। কিন্তু তা সত্বেও সরকার-বিরোধী বামপন্থীদের কুচক্রে এবং হীন প্ররোচনায় পুরুলিয়া জেলায় বহু ব্যক্তি নাকি অনাহারে, অর্থাৎ "হাঙ্গার ষ্ট্রাইক" করিয়া অযথা বৈতরণী নদীর পরপারে সাঁতরাইয়া প্রয়াণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ! অন্ততঃ পক্ষে ৩৫।৪০ জন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক—হাতের কাছে প্রচুর ধান-চাউল-গম মজুত এবং সহজলভ্য থাকা সত্ত্বেও শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং শ্রীমতী আভাকে বেকুব এবং অনৃতভাষী প্রমাণ করিবার জন্যই "অনাহারের অছিলায়" বৈতরণী পারে গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বারোটি নাম (গ্রাম, থানা এবং বৈতরণী পারের তারিখ সহ) প্রকাশ করিতেছি:

	নাম	গ্রাম	থানা	মৃত্যুর তাং
১।	মোহন সর্দ্দার	বড়গ্রাম	ঐ	মার্চ্চের প্রথম দিকে
২।	মোহন সর্দ্দারের পুত্র (বয়স ৯ বৎসর)	ঐ	ঐ	ঐ
৩।	রতন বাউরী	পায়রাচালী	মানবাজার	১৪।১০ ৬২
৪।	ভাদু মাহাতো (৫০),	পুঞ্চা,	পুঞ্চা,	৭।৩।৬৩
৫।	শ্রীকান্ত মাহাতো (৪০)	কেন্দাডি	ঐ	১১।৩,৬৩
৬।	মেঝিয়া মাঝি (৬৫)	ঐ দমদহী টোলা	ঐ	৫।৪।৬৩
৭।	শ্রীমতী খঁড়ি শবর	ঐ	ঐ	এপ্রিলের প্রথম দিকে
৮।	ওঝা বাউরী	লোলাড়া	ঐ	ঐ
৯।	হাড়িরাম মুদীর মা	কুদলুং	হুড়া	২৭।৩,৬৩
১০।	জগৎ বাউরী (৬৮)	লাখরী	ঐ	২২।:।৬৩
১১।	রাখাল মাঝি (৭০)	পাকবিড়রাটোলা	ঐ	১৩।৩,৬৩
১২।	চৌধুরী শবর	লগদা খেড়িয়াপাড়া	ঐ	১৭।৩।৬৩

ইহা বিরোধী দলের বিদ্বেষমূলক প্রচারমাত্র কিন্তু ইহা যে মিথ্যা-প্রচার তাহার প্রমাণ আবশ্যক। সরে-জমিনে তদন্তের জন্য শ্রীমতী আভা মাইতিকে অবিলম্বে বৈতরণী পারে সরকারী খরচায় প্রেরণ করা প্রয়োজন। মাননীয়া, পরম-সত্য-প্রিয়া এবং গণকষ্ট-তারিণী মন্ত্রী মহাশয়া—বৈতরণী পারে তদন্ত শেষ করিয়া এপারে ফিরিয়া তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়া সরকার বিরোধীদের দন্ত ভাঙ্গিয়া দিন, এই নিবেদন।

আশা করি আমাদের বিনীত প্রস্তাবমত শ্রীপ্রফুল্ল সেন পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ-মন্ত্রীকে সত্বর বৈতরণী-পারে পাঠাইয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর অযথা বিষম চিন্তা-ত্রাণের ব্যবস্থা করিবেন। পশ্চিমবঙ্গবাসী একমাত্র মন্ত্রীমহাশয় এবং মহাশয়াদের সত্যবাদিতায় বিশ্বাস করে।

বোম্বাই (মহারাষ্ট্রের চোখে বাঙ্গালী!

বোম্বাই শহরে মাদার ইণ্ডিয়া নামে একখানি 'বিশ্ব'বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই 'বিশিষ্ট' এবং

ভদ্র পত্রিকার জুন সংখ্যায় 'ক্যালকাটা কলিং' শিরোনামায় এক প্রবন্ধে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিক বলিতেছেন :

In Calcutta even non-hooligans look like hooligans. In fact almost everyone in Calcutta—be he originally from Bengal or from neighbouring State of Bihar or from the Punjab or even from Dacca, looks a perfect hooligan.

অর্থাৎ লেখকের দিব্যদৃষ্টিতে কলিকাতার প্রত্যেক লোকই এক-একটি গুণ্ডা! আর ভারতের শতকরা ৬০ জন গুণ্ডাই কলিকাতা সহরে বসবাস করে, এই সকল গুণ্ডাদের মধ্যে লেখক বিহার, পাঞ্জাব এমন কি ঢাকার লোককেও খুঁজিয়া পাইয়াছেন কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ কিংবা উত্তর প্রদেশী কাহাকেও দেখিতে পান নাই!

প্রবন্ধ-লেখক কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার 'বিকৃত' প্রয়োজন এবং রুচিমত মাত্র ৯জন লোকের দেখা পান কিংবা ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই ৯জনের মধ্যে পাইলেন :

"......four were professional pimps who procured good women for bad men; three were pick-pokets who relieved the trusting ones of their cash; one was well established Communist and one managed the estate of a rich, young widow and fancied that his young mistress was in love with him......

বাঙ্গালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রবন্ধ-লেখক বলেন।

Sleeping in home, sleeping in buses, sleeping in trams, sleeping in trains, sleeping whilst trading, sleeping whilst eating, sleeping in walking, sleeping whilst sleeping is all that Bengalis seem to be doing round the clock these days.

প্রদীপের নিচেই অন্ধকার বলিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াও আমরা বাঙ্গালী-চরিত্র সম্পর্কে এত তথ্য জানিতে পারি নাই!

রুচি এবং ভদ্রতায় না বাধিলে বোম্বাই (মহারাষ্ট্র) সম্পর্কে আমরাও বলিতে পারিতাম যে :

"....professional pimps are not at all necessary in Bombay to procure bad women for good men.....

এবং বোম্বাই সহরে পকেটমার বলিয়া বিশেষ শ্রেণীর পেশাদার লোক নাই—এ-পেশা বা কারবার যাহার ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা চালাইতে পারে এবং তাহার কারবার শুধুমাত্র পকেটেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহাও বলিতে পারিতাম : বোম্বাই সহরে লোকের নেশা-বন্দী বিষয়ে সবিশেষ আকর্ষণ দেখা যায় বোম্বের লোক :

"....Drinking in home, drinking in buses, drinking in trains, drinking whilst working, trading, eating, drinking while walking, drinking while sleeping—this is all that Bombay people seem to be doing round the clock these days......"

এবং বোম্বাই শহরে গুণ্ডাদেরও ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বোম্বাই সম্পর্কে ইহা বলিব না।

"গান্ধীজীও ফাটিয়া যাইতেছেন!"

চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গান্ধীজীর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিতে আবার ফাটল দেখা দিয়াছে।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, মূর্ত্তি বসাইবার কাজে খুঁত থাকিয়া গিয়াছে। ব্রোঞ্জ ঢালাইর সময় ত্রুটি হওয়াও অসম্ভব নয়। এই মূর্ত্তির জন্য রাজ্য সরকার প্রায় ৬৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

আসল কারণ কর্ত্তৃপক্ষের মতে যাহা, আমাদের মতে তাহা নহে। দেশের বর্ত্তমান শাসক, কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষের অনাচার, ব্যভিচার অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষকে না খাইতে দিয়া অনাহারে তিল তিল করিয়া হত্যা করিবার পাকা এবং দুষ্ট পরিকল্পনা গান্ধীজীর মূর্ত্তির পক্ষেও অসহ হইয়াছে।

নিপীড়িত জনগণের অসহায় অবস্থা দেখিয়া দুঃখ বেদনায় গান্ধী মূর্ত্তি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না—মূর্ত্তির বুক ফাটিয়া যাইতেছে!

উঠিতে বসিতে, সকল পাপকর্ম্মে যাঁহারা গান্ধীর নাম করেন, সেই সব কংগ্রেসী ভক্তদের অত্যাচার, পাপ-কর্ম্ম, শাসন ব্যভিচার, দুর্জ্জয় লোভ এবং অন্যান্য হাজার রকম অনাচার অসদাচরণে গান্ধী মূর্ত্তি নিশ্চয়ই লজ্জায় ফাটিয়া যাইতেছে। গান্ধী মূর্ত্তির এ বিষম ফাটল সাধারণ সিমেণ্টে রোধ করা যাইবে না। বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসন এবং আত্মসর্ব্বস্ব কংগ্রেসী শাসকদের বিতাড়ন ছাড়া—ফাটল মেরামত হইবে না। কংগ্রেসী সরকারের পতন হইলেই মূর্ত্তির ফাটল আপনা হইতেই জোড়া লাগিবে।

নীতি ও পৃথিবী

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

চেয়ারে ব'সে উসখুস করছিল বরদাকান্ত। কখনও আগের দিনের সংবাদপত্রটা দেখছিল এক-আধটু—মাঝে মাঝে আইনের একটা মোটাগোছের বই-এর কোন পাতায় ডুব দিচ্ছিল এক-আধবার, কিন্তু পুরোপুরি দিতে পারছিল না মনটা। চোখদুটো তৃষিত চাতকের মত গিয়ে পড়ছিল সামনের রাস্তাটায়।...

শীতের সকাল। বেলা যেন মেল ট্রেন—এই আছে, এই নেই। রোদ উঠতে না উঠতেই ঘড়ির কাঁটায় দশটা হয়ে ব'সে আছে। মাঝে মাঝে বরদাকান্তই অবাক্ হয়। কি তরতর ক'রে কেটে যায় সময়টা—একটা মক্কেল এসে পড়লে ত আর কথাই নেই। তার নথিপত্রে চোখ বুলোতে বুলোতেই ঠিক কোর্টে হাজিরা দেওয়ার সময় এসে যাবে—।

আজকের দিনটা একদম কাণা। বরদাকান্ত ব'সে বসে ভাবল—মক্কেলের দেখা নেই কোন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় কত লোক—কিন্তু বরদাকান্তর চেয়ারে এসে বসার যেন ইচ্ছে নেই কারো। ঘুম থেকে আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল বরদাকান্ত? আরাধনার, না ছেলেমেয়েদের? কিছুতেই মনে করতে পারল না।

মফঃস্বল শহর—তারই একটা ছোট্ট গলিতে বরদাকান্তর চেম্বার। চেম্বার বলতে তেমন কিছু নয় একটা, বাড়ীরই সামনের ঘরটাকে চেম্বার করা হয়েছে। বড় বড় আলমারিতে রাশি রাশি আইনের বই। জানলা-দরজা খুব কম—কেমন যেন দমবন্ধকরা আবহাওয়া, ব্যবস্থাটা অবশ্য বরদাকান্তর নয়। চেম্বারটা করিয়েছিলেন সুধাকান্ত—ওঁর বাবা।

আইনের বইপত্র নিয়ে সবকিছুই বরদাকান্তর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া—এমনকি বেশ কিছু মক্কেলও। সুধাকান্তের প্র্যাকটিস মন্দ জমে নি—নামডাকও হয়েছিল এক-আধটু।—অবিশ্যি মারা যাওয়ার প্রথম চোটে ভাঙন ধরেছিল বেশ খানিকটা। অল্পবয়সী বরদাকান্তকে মামলা দিয়ে বিশ্বাস করতে চায় নি অনেকে—তবু রয়ে গিয়েছিল কেউ কেউ। অনেকে আবার এসেছিল ফিরে। বরদাকান্তের মক্কেল বলতে এরাই—নিজের জোগাড়-করা মক্কেল তার আঙুলের দাগে গোনা যায়।

মাঝে মাঝে আরাধনা এসে বসত চেম্বারে। পাঁচজনে বলে বরদাকান্তের স্ত্রীভাগ্য ভাল। ভাগ্য নিয়ে কারো কাছে কখনও যাচাই করতে যায় নি বরদাকান্ত। তবে মোটামুটি দেখতে ভালই আরাধনা। গায়ের রঙটা নিঃসন্দেহে গৌর—চোখ দু'টি বেশ ভাসা-ভাসা—টিকোলো নাক—মাথার পিছনে মস্ত একটা এলোখোঁপা। স্ত্রী এসে বসলে একটু ব্যস্ততার ভান ক'রে বরদাকান্ত ড্রয়ার থেকে একটা নথি বের করে—আলমারী থেকে একটা মোটা বই টেনে আনে—তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলে—"কি সৌভাগ্য আমার। সকালবেলাতেই তুমি এসে বসলে চেম্বারে—।" আরাধনা স্বামীকে জানে। তবু ব্যস্ততার ভান দেখে একটু বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলে,—তুমি কি ব্যস্ত ছিলে নাকি? তা হ'লে নাহয় আসি—ফিরে যাবার একটা সুন্দর ভঙ্গি করে আরাধনা।

বরদাকান্ত বই নামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, আরে না, না, বোসো বোসো। তেমন কিছু নয়। সন্ধ্যেয় একজন মক্কেলের আসবার কথা—তার একটা আর্জ্জির খসড়া ক'রে রাখতে হবে, তাই—

দু'জনে ব'সে গল্পগুজব করে। কোলকাতার মেয়ে আরাধনা—কিন্তু মফঃস্বলে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। এমনিতে সুখী পরিবারটা—সংসার বলতে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া ছেলে আর মেয়ে দু'টি।

স্ত্রীকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে বরদাকান্ত; কেমন পড়াশুনো করছে সমীরণ? তুমি ঠিক নজর রাখছ ত?'—

—কি জানি। পড়াশুনো ত করছে—কিন্তু আজকাল বড় দুষ্টু হয়েছে ছেলেটা খেলায় বড় নেশা। আর বন্ধুও হয়েছে অনেক। তুমি একটু দেখবে না?'—

কথার উত্তর দেয় না বরদাকান্ত—মুচ্‌কি একটু হাসে। প্র্যাকটিসের মর্ম্ম বুঝবে না আরাধনা। ওর বাপের বাড়ীতে সরকারী চাকরি করে সবাই দশটা-পাঁচটায় পর খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। চাকরি আর ব্যবসাতে যে অনেক তফাৎ—সেটা আরাধনা বুঝবে না। ওর কাছে দুটোই এক—অর্থোপার্জ্জনের পথমাত্র।

ওর বাবা সুধাকান্ত বলতেন—ভালো উকীল যদি হ'তে চাও বড়দা, আরো ভাল ক'রে পড়াশুনো কর। আইনের নির্ভুল জ্ঞান ভিন্ন কখনও নাম করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, সাধনা চাই। সংসার, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কারো দিকে তাকালে চলবে না।·· আরাধনার দিকে তাকিয়ে বাবার সেই কথাটাই একবার মনে পড়ল বরদাকান্তর।

বেশ কিছুদিন পর—শীত বেশ জেঁকে বসেছে শহরটায়। ডিসেম্বরের মাত্র মাঝামাঝি—অথচ এর মধ্যেই কি ঠাণ্ডা প'ড়ে গেছে,—জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে কি দশা হবে ভাবাই যায় না—

সকালে চাদরমুড়ি দিয়ে নথিপত্র দেখছিল বরদাকান্ত। সামনে দু-তিন জন মক্কেল ব'সে—হঠাৎ ভেতরের দরজার কড়াটা নড়ে উঠল কয়েকবার। বরদাকান্ত বুঝতে পারলে ভেতর থেকে ডাকছে কেউ। কিন্তু উঠে যেতেও চাইছিল না মনটা—মুন্সেফের রায়ের আর খানিকটা অংশ পড়তে বাকী, বিচারে বেশ খানিকটা ফাঁক রয়ে গেছে, বরদাকান্ত সেটুকু বুঝবার চেষ্টা করছিল।

তবু উঠতে হ'ল চেয়ার ছেড়ে। ডাকছিল আরাধনা স্বয়ং—তার মুখটা গম্ভীর, থমথমে। ছেলে সমীরণ মুখ গোঁজ ক'রে এককোনে ব'সে—

কিছুই বুঝতে পারলনা বরদাকান্ত। বলল,—কি ব্যাপার? এত ডাকাডাকি কেন? আজ ব্যস্ত ছিলাম যে বড়।—খানিকটা নিস্তব্ধতা—সকলেই চুপচাপ—বরদাকান্তও নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে।···তারপর আরাধনা যেন ফেটে পড়ল—

—সমীরণকে একটু দেখাশুনো করবে কিনা তুমি? কি হচ্ছে ও জানো—?

—কি হয়েছে ব্যাপারটা? তাই ত বলবে—

—ছাই হয়েছে;—আরাধনা থামল একটু। তারপর শান্তকণ্ঠে বলল—'একটি মিথ্যেবাদী হয়ে উঠেছে তোমার ছেলে।—

—মিথ্যেবাদী?—

—তা ছাড়া আর কি? কাল বিকেলে একটা টাকা নিল আমার কাছে, খাতা কিনবে ব'লে। আজ দেখি খাতাও কেনে নি—টাকারও হিসেব নেই।

—সেকি? সমীরণের দিকে তাকাল বরদাকান্ত। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই তার। বাইরে মক্কেলরা ব'সে। তবু একবার বলল বরদাকান্ত—মাকে সত্যিকথা ব'লে দিও সমীরণ। নইলে—পাকানো হাতের মুষ্টিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে। তারপরেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল সোজা চেম্বারে।

বিকেলে কথাটা আবার তুলল আরাধনা। বৈকালিক জলযোগ সেরে ঠাণ্ডা হয়ে বসেছে বরদাকান্ত। মনটা বেশ প্রফুল্ল তাজা আর ঝরঝরে। আরাধনা বলল—টাকা নিয়ে কি করেছিল সমীরণ জানো?

—কি? সাধারণভাবে কথাটা বলল বরদাকান্ত কৌতূহলের কোন তাপ-উত্তাপ নেই তাতে।

—'রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়েছিল ওর বন্ধুদের—সেখানেই খেয়েছে সবাই মিলে।—

বরদাকান্ত হাসল একটু। সমীরণকে শাসন করবার এতটুকু ইচ্ছে নেই তার। আজ একটা মামলায় জিতেছে সে। বন্ধুরা পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছে—মক্কেলরা খুব খুশী। কত প্রশংসা পেয়েছে আজ। একজন ত ওর বাবা সুধাকান্তের সঙ্গেই তুলনা ক'রে বসল তার। · না,—আজ কাউকে বকাঝকা করতে পারবে না সে। মনটা কেমন খুশীখুশী—বরদাকান্ত আরামে চোখদুটো বুজলে।··· ··

মাসখানেক পর। জানুয়ারীর শেষ—কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছে—শীতে হি-হি করছে মানুষজন—সন্ধ্যের পর থেকেই রাস্তাঘাট ফাঁকা। লোকজন নেই। জনবিরল পথটা চাঁদের আলোয় বৈরাগীর মত নিঃস্ব মনে হয়।

ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসেছিল বরদাকান্ত। জানলা কপাট বন্ধ ক'রে দিয়েছিল সন্তর্পণে। শীতের কন্‌কনে হাওয়া যেন না ঢুকতে পারে এতটুকু।

দরজায় কিসের শব্দ হ'ল—কে যেন কড়া নাড়ছে বাইরে। দরজা খুলল বরদাকান্ত। সর্ব্বাঙ্গে শীতবস্ত্র জড়িয়ে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। বরদাকান্ত ভিতরে এসে বসতে বলল তাকে।

—কেশপুরা থেকে আসছি আমি। ভদ্রলোক একটু থামলেন।—'ওখানের মুকুন্দবাবুকে ত চেনেন আপনি?

মুকুন্দবাবু বরদাকান্তের বাবার আমলের মক্কেল। বহুদিন থেকে জানাশোনা।—·

—হেসে বলল বরদাকান্ত—বিলক্ষণ চিনি। তারপর?

—তিনিই পাঠালেন আমাকে। একটা মামলা দেব আপনাকে। মুন্সেফ কোর্টে হার হয়েছে 'আমাদের। কিন্তু জজ কোর্টে জিততেই হবে।

— কতটা সম্পত্তি? বরদাকান্ত জিজ্ঞাসা করল।

—তা প্রায় বিঘে ত্রিশ হবে। তবে আমাদের সম্মানের কথাটাও একবার ভেবে দেখবেন। শ'পাঁচ খরচ করতেও পেছপা হব না আমরা লোকটি বলল।

কাগজপত্র দেখল বরদাকান্ত—কিন্তু মতামত দিল না

কোন। হেসে বলল তাকে—কলকাতায় এক বড় উকীলের কাছে একটু বুঝতে চাই আমি। খরচপত্র আছে ।

—কিরকম লাগবে ?

—এই শতখানেকের মত, বরদাকান্ত নিস্পৃহ নিরাসক্তের মত বলল।

টাকা গুণে দিয়ে চ'লে গেল লোকটি। বরদাকান্ত বইপত্র খুলে কাগজপত্র পরীক্ষা করতে লাগল।

রবিবার বিকেলে। কলকাতা থেকে ফিরছিল বরদাকান্ত। বেশ দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে গাড়ী। বরদাকান্ত নির্জ্জীবের মত ব'সে। কলকাতার উকীল তাকে নিরাশ করেছে খুব। মামলায় জেতা প্রায় অসম্ভব জানিয়ে দিয়েছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল বরদাকান্ত। ধান কেটে নেওয়া ন্যাড়া মাঠ—ঘর-ফিরতি গরুবাছুর—দূরের নীল দিগন্ত, কোন কিছুই তাকে আনন্দ দিতে পারল না।—

পরদিন সন্ধ্যায়, চেম্বারে বসেছিল বরদাকান্ত। কেশপুরার সেই ভদ্রলোকের আসবার কথা। নথিপত্র-গুলো আর রায়ের কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখছিল সে। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবছিল। পাঁচশ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করবেন ভদ্রলোক। একটা বড়-গোছের মামলা পাওয়া যেত। বরদাকান্ত চুলের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল কলমের সাহায্যে—।

হঠাৎ আরাধনা ঘরে এসে ঢুকল। কি যেন বলবার জন্যে ব্যস্ত সে। বরদাকান্ত বিস্মিত হয়ে তার দিকে চাইল।

—সমীরণ কি করেছে জান ?'

—কি ?

—কাল মাষ্টারমশাই-এর কাছে অঙ্ক করতে যাবে ব'লে দুপুরে বেরুল। আমিও অমত করি নি। আজ শুনলাম যে অঙ্ক কষতে যায় নি সে—বন্ধুদের সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিল ইষ্টিশনের মাঠে।

—তোমায় কে বলল ?

—ওদের ক্লাশের অরুণ প্রায়ই ত সে আসে এখানে।

দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল বরদাকান্তর মুখে—চোখ দুটি বড় বড়। আরাধনার দিকে তাকিয়ে বলল সে—

—কেন এত মিথ্যে কথা বলে ছেলেটা ?—কোথায় সে ? ডাকো দেখি তাকে।

—এখনও ফেরে নি।

বাইরে কড়া নড়ে উঠল। কেউ এসেছে নিশ্চয়ই—মক্কেল। জন কিংবা বরদাকান্তর বন্ধুবান্ধব কেউ, আরাধনা-ভেতরে চ'লে গেল।

কেশপুরার সেই ভদ্রলোক। বরদাকান্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। নিজের মনে দাঁড়িপাল্লার কি যেন ওজন করছিল সে।……জয়-পরাজয় ? সত্যমিথ্যা ? না, অন্য কিছু ?

লোকটি বলল—কিরকম বুঝলেন উকীলবাবু ? জেতার আশাটাশা আছে ত ?'—

এক মুহূর্ত্তে বদলে গেল বরদাকান্ত। চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল—ঠোঁটের কোনে মিষ্টি হাসি এল ভেসে।

বলল—জিতবেন না মানে ?—জেতার আশা ষোল আনা রয়েছে,—দেখুন না কেমন তৈরী করি মোকদ্দমা, মুন্সেফের রায় উল্টে যাবে দেখবেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এল বাড়ীর ভেতর থেকে। নিশ্চয়ই ফিরেছে সমীরণ। মিথ্যেবাদী ছেলেকে শাসন করছে ওর মা। হয়ত মারধোর করছে আরাধনা।···

টাকাকড়ি দিয়ে চ'লে গেল লোকটা। কিন্তু নোটগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বরদাকান্ত। সমীরণের কান্না শুনতে পাচ্ছে সে—কিন্তু পায়ে শক্তি কই তার ? ওকে সান্ত্বনা দেওয়া বা শাসন করার কোন সাধ্যই তার নেই।…………

আচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিগত ২৮শে জুলাই রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে আচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিষ্ণুপুরের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার তথা ভারতের বিশুদ্ধ ধ্রুপদ ও অন্যান্য শাস্ত্রসঙ্গত সঙ্গীতের ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের শেষ হইল। অবশ্য বিষ্ণুপুর বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে মহান ঐতিহ্য

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতাপুত্র ও গুরু-শিষ্যপরম্পরায় ধারণ ও বহন করিয়া আসিতেছে তাহার সমাপ্তি এখানে হয় নাই—অন্ততঃ আমাদের আশা আছে তাহা হইবেনা। কেন না আচার্য্য গোপেশ্বরের পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য-সন্ততিগণ যে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে ঐরূপ দুর্বিপাকের কারণ নাই। কিন্তু যে অনন্যসাধারণ ধ্যানধারণা ও সাধনার ফলে আচার্য্য গোপেশ্বর বিষ্ণুপুরের নির্ব্বাপিত-প্রায়-সঙ্গীত শিখাকে উজ্জ্বল রূপে প্রজ্জ্বলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গীত সাধনার ধারায় একটি ছেদ পড়িল। বর্ত্তমানে বাংলায় সঙ্গীত-সংস্কৃতি বিষয়ে যে নূতন অধ্যায় রচিত হইতেছে তাহার মধ্যে বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতধারা অবিমিশ্র ভাবে ও জাগ্রত ভাবে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে কি না, এ-প্রশ্নই আমাদের মনে জাগিয়াছে।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ধারার উৎস যদিচ তানসেন প্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদ সঙ্গীতের ব্যাকরণ ও প্রকরণ, কিন্তু দুই শত বৎসরের উত্থান পতন রাষ্ট্র বিপর্যয় ইত্যাদির মধ্যে সেই ধারা বিশুদ্ধ, অবিকৃত ও বলিষ্ঠ ভাবে রক্ষিত যে দুই-তিনটি কেন্দ্রে ছিল তাহার মধ্যে বিষ্ণুপুর অন্যতম। গোপেশ্বর বাবুর কাছে শুনিয়াছি যে, সুর-স্বর ইত্যাদি সঠিক হইবার পর তাঁহাকে প্রত্যেকটি গান ১০৮ বার শুদ্ধরূপে গাহিতে হইত তাহার পর গুরুর অনুমোদন আসিত। শ্রবণ-শক্তিরও প্রখর ভাবে বিকাশ ঐ শিক্ষার অঙ্গ ছিল। একজন গুণী লোকের নিকট শুনিয়াছি যে এক সঙ্গীতজ্ঞদিগের বৈঠকে গোপেশ্বরবাবু সুরবাহারে কোনও একটি মূল সুরের ১৮টি শ্রুতি বাঁধিয়া শ্রুতিপ্রভেদ দেখাইয়া উপস্থিত গুণীমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। পিতা-পুত্র ও গুরু-শিষ্য পরম্পরায় রক্ষিত ও প্রদত্ত এই শিক্ষা-দীক্ষাই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ধারায় এই বৈশিষ্ট্য দিয়াছে।

বিষ্ণুপুর ভারতের অন্যতম সঙ্গীত কেন্দ্র। বিষ্ণুপুরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুশীলন প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ সমানে চলিতেছে. তানসেন-বংশীয়, বাহাদুর সেন (খাঁ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আমন্ত্রণে বিষ্ণুপুরে আসেন, এবং রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার অবদানই বিষ্ণুপুরকে সঙ্গীত-ক্ষেত্রে মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছিল। বাহাদুর সেনের শিষ্যপরম্পরায় তানসেনের সঙ্গীতধারা বিষ্ণুপুর তথা বাঙ্গলায় অক্ষুণ্ণ থাকে। আলাপ ও ধ্রুপদের যথারীতি রক্ষণে, প্রচারে ও উন্নতিবিধানে বিষ্ণুপুর অগ্রগণ্য। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা ও কাব্যপ্রীতি বিশেষভাবে ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সেইজন্য যখন উত্তর-

পশ্চিম ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ধ্রুপদের অনুশীলন ম্লান হয় তখন বিষ্ণুপুর এই বাঙ্গলা-সঙ্গীতের মহান ঐতিহ্যকে রক্ষা করে এবং তাহার অনুশীলনে ব্রতী হয়। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতশিল্পীগণ ভারতের নানা সঙ্গীতকেন্দ্রে যাইয়া, নানা গুণী সঙ্গীত-বিদ্গণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং খেয়াল টপ্পা, ঠুংরি এবং যন্ত্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তনে, বিশেষ সহায়তা করেন। তাই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁহার নানাবিধ সংস্কার ও দেশহিতকর কার্য্যের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতকে তাহার পুর্ব গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে যখন যত্নবান হন এবং উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ খেয়ালের অনুরূপ সুর ও ছন্দে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা ও প্রবর্ত্তন দ্বারা দেশবাসীকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিতে প্রয়াসী হন, তখন রামমোহন বিষ্ণুপুরের গদাধর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতাচার্য্য-গণের নিকট বহু মূল ধ্রুপদ ও খেয়াল গান সংগ্রহ করেন, যেগুলি তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের সুর-সংযোজনায় বিশেষ সহায়তা করে।

শিল্পকলা ও পাণ্ডিত্যের একত্র সমাবেশ অতি অল্পই দেখা যায়। কিন্তু সঙ্গীতনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন একাধারে মহান্ শিল্পী ও পণ্ডিত। তাঁহার গভীর গবেষণামূলক তথ্যরাজি সঙ্গীতশাস্ত্রের মূল সূত্রকে সহজ ও সরল করে তুলে সর্বভারতীয় বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতি পাইয়াছিল। তিনি অসংখ্য মূল্যবান মার্গসঙ্গীত স্বরলিপি দ্বারা প্রচার করিয়া সঙ্গীত-জগতে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে গান আয়ত্ত করার জন্য অনেক অবাঙ্গালী ওস্তাদ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই সকল অমূল্য সঙ্গীতগুলি শিক্ষা করেন।

গোপেশ্বর অতি বাল্যকাল হইতেই পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৫ বৎসরকাল যাবৎ তাঁহার শিক্ষাধীনে ও সাধনায় সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পিতা অনন্তলালের মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতায় আসেন এবং তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভায় সঙ্গীত-সমাজকে মুগ্ধ করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে তিনি গান শুনাইয়া ধন্য হইয়া-ছিলেন। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতাগণের সঙ্গে পরিচিত হন। গোপেশ্বরবাবুর তখন বয়স ১৬।১৭ বৎসর—(১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) সেই সময় তিনি তৎকালীন ভারতশ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ও খেয়ালী শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র ও গোপাল চক্রবর্ত্তীর নিকট অসংখ্য ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী সংগ্রহ করেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বর্দ্ধমান রাজসভার সঙ্গীতাচার্য্য পদে নিযুক্ত হন এবং ২৯ বৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময় তিনি সঙ্গীত সাধনায়, সঙ্গীত-শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেন। ভারতের বিভিন্ন সঙ্গীতকেন্দ্রে যাইয়া তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় দিয়া যশস্বী হন এবং সঙ্গীতের নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সময় ভারতের সঙ্গীত-সমাজ এবং রাজন্যবর্গ তাঁহাকে নানারূপে সম্মানিত করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে প্রচারিত হয়। তাঁহার সাধনা ও গবেষণার ফলস্বরূপে আমরা পাই তাঁহার লেখনী-প্রসূত এই পুস্তকগুলি যথা :—

১। সঙ্গীত চন্দ্রিকা, ১ম ও ২য় ভাগ।
২। তান মালা
৩; গীত মালা
৪। সঙ্গীত লহরী
৫। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, ১ম ও ২য়
৬। গীত প্রবেশিকা
৭। বহুভাষা গীত, প্রভৃতি।
৮। গীতদর্পণ।

ইহা ভিন্ন তাঁহার সম্পাদনায় তাঁহার অগ্রজ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সঙ্গীত মঞ্জরী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিদ্যালয় "সংগীত সংঙ্ঘে" অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। পরে তিনি অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি সঙ্গীত শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করে। তৎকালীন অভিজাত সমাজে এবং রাজন্য সমাজে তিনি শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী সঙ্গীত-জগতে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। সঙ্গীতকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গরূপে স্বীকৃতিদান এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করায় তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। শিক্ষিত সমাজে জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠিত করায় তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনারসে তৃতীয় সঙ্গীত মহাসম্মেলনে তিনি বাংলার সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে

যোগদান করেন এবং তাঁর অনন্যসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন দ্বারা জয়মাল্য লাভ ক'রে বাঙ্গালীকে গৌরবান্বিত করেন। তারপর হইতে তিনি লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মির্জ্জাপুর, মজঃফরপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত মহাসম্মেলনের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও পণ্ডিতরূপে আমন্ত্রিত হইতেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কলিকাতায় নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় সম্মানিত হন।

তাঁর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল কলিকাতা, কিন্তু তিনি জন্মভূমি বিষ্ণুপুরের উন্নতিকল্পে সব সময়েই চিন্তা করিতেন। ১৯৪৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ জন্মভূমিতে বাস করেন এবং নূতন উদ্যমে স্বদেশের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বিষ্ণুপুর রামশরণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন তাঁর মহৎ কীর্ত্তি। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গীতের ও জন্মভূমির সেবায় ব্রতী ছিলেন।

১৯৫৪ সালে দিল্লী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর গান এখনও শ্রোতাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-ঐতিহ্যের সম্মানার্থে অল ইণ্ডিয়া রেডিও ১৯৫৫ সালে বিষ্ণুপুরে রেডিও সম্মেলন অনুষ্ঠান করেন। আচার্য্য গোপেশ্বর তাঁর সঙ্গীতদ্বারা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ত্তৃক তিনি সম্মানিত হন এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক (visiting professor) নিযুক্ত হন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কবিগুরু গোপেশ্বরের গানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। গোপেশ্বর রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন এবং শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনের বিবিধ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কবিগুরু স্বয়ং গোপেশ্বরবাবুকে স্বর-সরস্বতী উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে (১৯৬১) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "দেশিকোত্তম" উপাধিতে বিভূষিত করেন। ১৯৬১ সালে তিনি দিল্লী সঙ্গীত নাটক আকাডেমির ফেলো নির্ব্বাচিত হন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিজে দিল্লী যাইয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সে সম্মান গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের পরীক্ষক এবং নানাভাবে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গোপেশ্বরবাবু সর্ব্বভারতীয় বহু সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

১৮৭৮ সালে বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত নগর বিষ্ণুপুরে, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ নগরেই নিজের বাড়ীতে ২৮শে জুলাই ১৯৬৩ সালে, ৮৫ বৎসর বয়সকালে, তাঁহার তিরোধান হয়। শৈশবকালে যে সঙ্গীত-সংস্কৃতির অঙ্কে তিনি লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনে, একাগ্রচিত্তে ও অসীম অধ্যবসায়ের সহিত তাহার সাধনা করিয়া তিনি বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতীক রূপে সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, ভজন, বাংলা রাগসঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অসামান্য অধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। সুর-বাহার সেতার বীণ প্রভৃতি যন্ত্র-সঙ্গীতেও তিনি ছিলেন মহান্ শিল্পী। শতাব্দীর সঙ্গীত-সংস্কৃতির অন্যতম বাহক ও সাধকরূপে তিনি বহু সম্মানলাভ করিয়া গিয়াছেন। ১৯৬২ সালে কানপুর সঙ্গীত-সংস্থা তাঁহাকে "সঙ্গীত-মার্ত্তণ্ড" উপাধিতে ভূষিত করেন। এরূপ বিদগ্ধজন-সমাদৃত ও সম্মানিত এবং খ্যাতিমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিরহঙ্কারী, নিঃস্বার্থ সর্ব্বজনপ্রিয় সরল সজ্জন রূপেই সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এই অমায়িক পর-হিতৈষী শিক্ষক ও গুরুর আসন শূন্য হওয়ায় দেশের যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ কবে কি ভাবে হইবে জানি না। বাংলার তথা উত্তর ভারতের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। সেই যোগ্যতার সমাদর প্রথমে করেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাকে "সঙ্গীত নায়ক" উপাধি দানে এবং সেই যোগ্যতার পরিচিতি রূপে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত এক বৃত্ত-চিত্রে (documentary film) প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশে, প্রায় চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে।

আর্থিক

শ্রীচিন্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় কৃষি ও শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরু থেকে পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৬ নাগাদ আমাদের দেশে কি হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তার এক সংশোধিত হিসাব প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১-র আদমসুমারীর ফলাফল দেখবার পর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনায় যে হিসাব হয় তাতে অনুমান করা হয়েছিল যে, ১৯৭৬-এ জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৪৯.৯ কোটিতে; ১৯৫৯-এর হিসাবে সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়াল ৫৭.৮ কোটিতে আর ১৯৬১ র হিসাব অনুযায়ী ৬২.৫ কোটিতে। ১৯৫১-র আদমসুমারীর সময়ে মোট কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল ১৩.৯৫ কোটি, ১৯৬১-র আদমসুমারীর সময়ে ১৮.৮৪ কোটি, আর জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৫.৬৮ কোটি ও ৪৩.৮৩ কোটি। পনেরো বছরে বাড়তি যত কর্মক্ষম লোক কাজে নিযুক্ত হ'তে চাইবে তার সংখ্যা অনুমান করা হচ্ছে ৭ কোটি, তার মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ ১.৭ কোটি, চতুর্থ পরিকল্পনা-পর্বে ২.৩ কোটি এবং পঞ্চম পরিকল্পনা-পর্বে ৩ কোটি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরের মধ্যে ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে; তৃতীয় পরিকল্পনা-পর্বে অনুমান করা হচ্ছে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক কাজে নিযুক্ত হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কর্মহীন লোকের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছিল ৯০ লক্ষ; এ ছাড়াও যেসব লোক সুযোগের অভাবে তাদের সম্পূর্ণ কর্মশক্তি ব্যবহার করতে পারছে না, তাদের সংখ্যাও যা অনুমান করা হয়েছিল, তা হচ্ছে দেড় থেকে পৌনে দুই কোটি জন। অতএব দেখা যাচ্ছে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও কর্মহীন লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ জন, এ ছাড়াও থাকবে যারা প্রয়োজন ও শক্তির তুলনায় সামান্য কাজ ক'রে দিন কাটাচ্ছে (under employed)।

যারা কাজ পাচ্ছে না তাদের জন্য কর্মসংস্থান করা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর তারও সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি, অর্থের বণ্টন-বৈষম্য দূর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসা রইত্যাদি সবই আসে। কর্মসংস্থান প্রশ্নের সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন এমন ভাবে জড়িত যে, আমাদের হয়েছে উভয় সঙ্কট। নিছক কর্মসংস্থানের জন্যই যদি দেশের সব মূলধন ব্যবহার করা হয়, তা হ'লে দেখা যায় যে, দেশের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে না। শিল্প বিপ্লবের পর দেখা গেছে, কলের যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যে পরিমাণ কাজ করতে পারে তা খালিহাতে মানুষ যত কাজ করত তার বহুগুণ বেশি। কত কম পরিশ্রমে কত বেশি কাজ পাওয়া যায় এই হচ্ছে মানুষের চিরকালের চিন্তা এবং এরই মধ্যে রয়েছে মানুষের অগ্রগতির মূলকথা। আমরা প্রাচীন কালের লাঙল আর বলদ নিয়েই চাষ করছি; আমাদের তাই উৎপাদনও বাড়ে না, অভাবও কোনদিন মেটে না। অন্যান্য অনেক দেশ, বিশেষতঃ যারা আজ আমাদের যন্ত্রপাতি, অর্থ, ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, তারা যে আর্থিক সম্পদে বলীয়ান, তার কারণ হচ্ছে তাদের যন্ত্রশক্তির প্রাচুর্য। আমরা পড়েছি পিছিয়ে; আজ যখন আমরা দেশকে উন্নত করার জন্য তৎপর হয়েছি, দেখা যাচ্ছে একদিকে এগোতে গেলে আরেকদিকের সমস্যা যায় বেড়ে।—রপ্তানী-বাণিজ্যে যদি পিছিয়ে পড়ি আমাদের আমদানী বন্ধ হয়, আর রপ্তানী-বাণিজ্যে সফল হ'তে গেলে এমন উৎপাদন-প্রণালী দরকার, যা অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে যদি অল্প খরচে, আধুনিক পদ্ধতিতে না চ'লে অনেক লোক লাগিয়ে সামান্য হাতিয়ার নিয়ে কাজ করা হয় তা হ'লে উৎপাদনও বাড়ে না আর আখেরে, আয় কমে যাবার জন্যে, লোকেদের কর্মসংস্থানের সমস্যাও মেটে না। আমাদের নিজেদেরও প্রয়োজন বেড়েছে; এবং সেই সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য যান্ত্রিক উৎপাদনের ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছে। তাছাড়া এতকাল বিদেশ থেকে সস্তায় নানান পণ্য কিনেছি; আজ

কোনটিই আমরা বাদ দিতে পারি না। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাছে ভারতীয় তাঁতি হার মেনেছিল কিন্তু আজ ভারতীয় কলের কাপড়ের কাছে ল্যাঙ্কাশায়ার হার মেনেছে। পাটের বাজারে আমরা একচেটিয়া দখলে আনতে পেরেছিলাম, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পেরেছিলাম ব'লে।

আজ যখন পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করতে এগোচ্ছি, দেখা যাচ্ছে যন্ত্রর সাহায্যে উৎপাদন বাড়াতে না পারলেও উপায় নেই, আবার তাই করতে গেলে দেশের মধ্যে যারা কর্মহীন হয়ে ব'সে আছে তারাও আর যথেষ্ট পরিমাণে কাজ পায় না। এই উভয় সঙ্কট সামনে নিয়ে আমাদের নামতে হয়েছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজে।

বিদেশী বিশেষজ্ঞ যাঁরা আমাদের দেশের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাচ্ছেন, কিভাবে তাঁদের দেশ বিজ্ঞানের বহুমুখী প্রয়োগ ও যন্ত্রশক্তির সাহায্যে কৃষি উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদন বাড়িয়েছেন এবং কিভাবেই বা সে-সব জ্ঞান আমাদের দেশে প্রয়োগ করা যায়। গত পনেরো বছরে বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি প্রচুর, আরো সাহায্য পাব ব'লে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি এবং একথাও ঠিক যে, তাদের সাহায্য না পেলে আজ আমরা যতটুকু এগোতে পেরেছি ততটুকুও পারতাম না। কিন্তু আমাদের দেশে বিবিধ সমস্যার যে দুষ্টচক্র সৃষ্টি হয়েছে সেটা কি ভাবে ভাঙা যায় সেকথা কেউই সঠিক বলতে পারেন না। ইউরোপ-আমেরিকায় যেসময় শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এসে লাগে, তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল অল্প, আফ্রিকা এশিয়া হ'ল বিভিন্ন বিজয়ী দেশের শাসন ও শোষণের কেন্দ্র; ইউরোপ থেকে উদ্‌বৃত্ত লোকেদের দলে দলে জনশূন্য আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করার সুযোগও ছিল অব্যাহত। আর এত ক'রেও দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ শক্তিশালী দেশই তাঁদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন একমাত্র যুদ্ধের সময়েই। আমাদের দেশে জনসংখ্যার চাপ শিল্পোন্নয়নের আগে থেকেই এত বেশি যে, খাদ্য সমস্যার সমাধান করাই কঠিন কাজ হয়ে উঠেছে; তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে বাড়তি জমির স্বল্পতা, মূলধন সঞ্চয়ের বাধা ইত্যাদি। কোন কোন দেশ লড়াই বাধিয়ে জনসংখ্যার ভার লাঘব করার পথ বেছে নিয়েছিলেন, এখনো সুযোগ পেলে তাই করেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের স্পৃহা আমাদের নেই, অন্য দেশে উদ্‌বৃত্ত লোক পাঠাবার সুযোগও নেই, 'ম্যালথাস্'-এর মতবাদ আজ নিন্দিত ও বর্জিত। ইতি-মধ্যে পৃথিবীর সব অনুন্নত দেশই চেষ্টা করছে স্বাবলম্বী হবার; আমাদের যা-কিছু করতে হবে, নিজেদের দেশের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে; এবং এমন এক পথে আমরা এগোব স্থির করছি, যে পথে অন্যান্য কোন কোন দেশের মত ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব ক'রে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিতে যাওয়ার চেষ্টা আমরা করব না।

১৯৫১-র তুলনায় দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে সন্দেহ নেই, এবং যেভাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি তাতে অচিরে এই মূল সমস্যার অনেকাংশে হয়ত সমাধানও হবে। আজ দেশ জুড়ে যে আলোচনা চলেছে তার অন্যতম হচ্ছে: অতঃপর কোন্ পথে অগ্রসর হ'লে আখেরে আমরা একই সঙ্গে উৎপাদন-বৃদ্ধির সমস্যা, কর্মসংস্থানের সমস্যা, বর্ণ-বৈষম্যর সমস্যা, রপ্তানী-বাণিজ্যের সমস্যা সবই সমাধান করতে পারি। একদলের মতে এখনই আমাদের কর্ম-সংস্থান ও ধন বণ্টন এই উভয় সমস্যা মেটানো দরকার; আরেক দল বলেন আগে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হোক্, তারপর অন্যান্য সমস্যার কথা ভাবলেই চলবে। উভয় পন্থার সমন্বয় ক'রে প্ল্যানিং কমিশন উৎপাদন পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী একই সঙ্গে বৃহদাকার শিল্প প্রসার ও সেই সঙ্গে কুটির-শিল্পের প্রসার করছেন। কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের সাহায্যে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বহুবিধ চেষ্টা চলেছে।

আমাদের পল্লী-অঞ্চলের মূল সমস্যা হচ্ছে বছরের কয়মাস বাধ্যতামূলক বিশ্রাম বা কর্মবিরতির সমস্যা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকের ভিড়। সম্প্রতি কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অনেক চাষীর অবস্থা ফিরেছে। সেইসঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার মানও বদলাচ্ছে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে গ্রামীণ জীবনের গতি বদলায় নি। যাদের জমি বেশি আছে, তারা উদ্‌বৃত্ত অর্থ খরচ করছে পাকাবাড়ী, ট্র্যানজিষ্টার, হাতঘড়ি, আরো বেশি জমি খরিদ ইত্যাদি বাবদ; যাদের কিছুই উদ্‌বৃত্ত নেই তারা এখনও চাষের সময়টুকু কাটাবার পর বিনাকাজে দিন কাটাচ্ছে। চাষের সময়ে দীর্ঘ দিন ধ'রে অসম্ভব রকম খাটতে হয়; কিন্তু সে পরিশ্রম লাঘবের ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন বছরের বাকী কয়মাস, যাতে কিছু কাজ করা যায়—তার ব্যবস্থা করা। অতীতে এককালে কৃষি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ; বাণিজ্যিক কৃষির দিন ছিল অজানা। লোকের প্রয়োজন ছিল যৎ-সামান্য, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগই ছিল ক্ষীণ। সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিন এখন অতীতের স্মৃতি-মাত্র; সুদূর গ্রামাঞ্চলের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ আসছে

আমাদেরই দেশের শহরের বা বিদেশের কারখানা থেকে।

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভর গ্রামের কথা, বিনোবাজীও আজ সেই কথাই আরেক ভাষায় বলছেন। আমাদের সরকারও আজ সমবায় আন্দোলন, কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট, পঞ্চায়েৎ রাজ ইত্যাদি-মারফৎ গ্রামীণ জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে এক জটিল সমস্যা এসে যাচ্ছে। যান্ত্রিক যুগে যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে, অতীতের গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিনে ফিরে যাওয়া আজ আর সম্ভব নয়। আর আমাদের দেশের বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও প্রসার নির্ভর করছে গ্রামগুলির ক্রয়ক্ষমতা ও প্রয়োজন বৃদ্ধির উপরেই। কুটিরশিল্প প্রচলনের ক্ষীণ চেষ্টা আমাদের দেশে বেশ কিছুকাল ধ'রেই হচ্ছে। কিন্তু যে জিনিষ সস্তায় শহরে কিনতে পাওয়া যায়, বা শহরে থেকেই গাড়িতে ক'রে গাঁয়ের লোকের ঘরের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, সেই জিনিসই গাঁয়ের ঘরে ঘরে বা কারখানায় সামান্য হাতিয়ার দিয়ে কাঁচাহাতে তৈরী করতে বললে কেই বা সে কথা শুনবে? অনেকের মতে তাঁতের কাপড় বা খদ্দরের উপর অত্যধিক ঝোঁক ইদানীং দেওয়াতে আমাদের দেশের প্রয়োজনও মেটে নি, রপ্তানী-বাণিজ্যেও আমরা যতটা প্রসার লাভ করতে পারতাম তা পারি নি। কুটিরশিল্প পুনরুদ্ধারের নামে যে অর্থব্যয় হচ্ছে তা অনেকেরই মতে বেকারদের ভিক্ষা দেবারই নামান্তর। এতে দেশের ধান উৎপাদনও বাড়ে না আর শেষ পর্যন্ত কর্মহীনতারও স্থায়ী সমাধান হয় না) মানুষ চিরকাল অল্প পরিশ্রমে বেশী জিনিষ উৎপাদনের যন্ত্র তৈরী করেছে, আজ যদি আমরা প্রাচীনকালের স্বল্প প্রয়োজন মেটানর উপযোগী হাতিয়ার দিয়ে গ্রামের লোকদের কর্মসংস্থানের ও পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করি তা হ'লে আমরা প্রগতির মূলে আঘাত করব। আরেক দল বলেন, ইয়োরোপ-আমেরিকায় এত যন্ত্র আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও সেসব দেশে ত যুদ্ধের সময় ছাড়া বেকার সমস্যা ঘোচে না। তার জবাবে অপর পক্ষ বলেন যে, তার জন্য যন্ত্র বা বিজ্ঞান দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে সেসব দেশের কর্মকর্তাদের অর্থমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও লোভ। সেই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলে সব দেশই মূল সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আমাদের সরকার এই মধ্যপথ বেছে নিয়েছেন; যেসব শিল্পে প্রাচীন হাতিয়ার অচল এবং যন্ত্র ব্যবহার অপরিহার্য সেসব ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা ব্যয় ক'রে বিদেশ থেকে যন্ত্র আমদানী করা হচ্ছে, এবং যেসব কাজে কম যন্ত্র ব্যবহার করে বেশি পরিমাণে লোকবল নিয়োগ করলেও সমান ফল পাওয়া যায়, সেসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কর্মহীন লোকদের কাজে লাগানো হচ্ছে।(১)

কিন্তু যে-হারে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে কর্মহীন লোকের যে সংখ্যা দাঁড়াবে ব'লে হিসাব করা হচ্ছে তাতে এই কথাই মনে হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে। সরকার ইতিমধ্যে চেষ্টা করছেন যাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পায়,(২) কিন্তু বিশেষজ্ঞরা অনুমান

(১) পরিকল্পনা সংস্থা হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, ইস্পাতের কারখানায় প্রতি ১৬০,০০০ টাকা মূলধন নিয়োগ ক'রে একজন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা যায়। সার তৈরীর কারখানা প্রতি ৪০,০০০ টাকা মূলধনে একজন, বড় যন্ত্র তৈরীর কারখানায় একলাখ টাকা মূলধন-পিছু একজন ইত্যাদি (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পৃ ৭৫৭)।

কুটিরশিল্পেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনের পার্থক্য আছে। এই সূত্রে Techno. economic Survey of West Bengal রিপোর্টটির পৃ ২৬৯—২৭৭ দ্রষ্টব্য। এই রিপোর্টে ১৯৬১-১৯৭১ এর মধ্যে বাংলা দেশে বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কত মূলধন লাগবে এবং কতজন লোক নিয়োগ করা যাবে তার আনুমানিক হিসাব দেওয়া হয়েছে। বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের জন্য ২৩৮ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করতে হবে আর ৭৩৫০০ জন লোক নিয়োগ করা যাবে অর্থাৎ প্রতি কর্মী-পিছু ৩২৩০০ টাকা মূলধন নিয়োগ করতে হবে। এই রকম আরো ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্প প্রতিষ্ঠানের হিসাব আছে। সর্বসাকুল্যে ৬৬৩·৮১ কোটি টাকা মূলধন লাগিয়ে ১১৫৮০০ জন লোককে স্থায়ী কাজ দেওয়া যাবে, অর্থাৎ প্রতি কর্মী-পিছু ৫৭৩০০ টাকা মূলধন প্রয়োজন। এই সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীনিস্তারণ চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত A Design for Development of Village Industries in West Bengal বইটি দ্রষ্টব্য।

(২) এই শতাব্দীর সুরুতে জাপানে উন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেদেশের সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায় ও তারপর সেদেশের জনসংখ্যা অনুযায়ী দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ঘটানোর সমস্যা নতুন ক'রে ভাবতে হচ্ছে। এই সূত্রে *Commission for the Legislation on Town and Country Planning* -এর রিপোর্ট থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি:

"A dogmatic assertion that the oriental is too conservative or fatalistic to adopt restriction of child birth as a principle even when the benefit has been clearly explained is quite incorrect. The spectacular drop in birth rate in recent years in Japan (7 per thousand), due to a *realization on a natoinal scale* that the country has reached the maximum population it can support, should convince one that, what has been done in Japan may be repeated in India."

করছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য ভাবে এই বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে না। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, শিল্পোন্নয়ন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য উন্নত ও চিকিৎসাব্যবস্থার প্রসার হবার দরুণ এখন বেশ কিছুকাল এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে জনসংখ্যা দ্রুততর হারেই বৃদ্ধি পাবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিও হ্রাস পাবে না, উদ্বৃত্ত লোকবল অন্যদেশে গিয়ে বসতি করবে সে পথও বন্ধ, সেক্ষেত্রে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রের ব্যবহার ও লোকবলের সদ্ব্যবহার—এই দুই প্রশ্নের সমন্বয় কি ভাবে ঘটানো যায়?

সরকার যে নীতি অনুসরণ করতে মনস্থ করেছেন তারই পূর্ণতর ও ব্যাপকতর প্রয়োগ দরকার বা সম্ভব কি না, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে ভেবে দেখার দরকার আছে মনে হয়। কালভেদে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা বদলাচ্ছে আর সেই চাহিদা মেটাতে পারে নতুন নতুন কল-কারখানা; আরও অনেক ক্ষেত্রে ত কুটিরশিল্পের কোন স্থান হবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সে সব উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার অনেকটা আপাতঃ সময় সংক্ষেপের জন্যই করা হচ্ছে, অথচ আসলে উৎপাদন কোন অর্থেই বৃদ্ধি পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের সার্থকতা সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে। যন্ত্র আমদানী করতে এবং তাকে চালাতে বৈদেশিক মুদ্রাও যেমন ব্যয় হচ্ছে তেমনি আর একদিকে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সঙ্কীর্ণ হচ্ছে। এই পর্যায়ে প'ড়ে ধানভানা, গম পেষাই, তেল নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজ... যেগুলির ক্ষেত্রে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন কোনক্রমেই বাড়ছে না, কেবলমাত্র Processing-এর কাজটি করতে সময় সংক্ষেপ হচ্ছে। ঠিক যে কারণে আমরা কৃষির ক্ষেত্রেও ট্র্যাকটর, হারভেসটার, ইত্যাদি সময়-সংক্ষেপকারী যন্ত্র আমদানী না ক'রে জমি-পিছু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করছি এবং সংগঠনের ব্যবস্থায় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করছি, সেই যুক্তিতেই যেসব কাজে সামান্য হাতিয়ার নিয়ে অনেক লোকে কাজ ক'রে অল্পসংখ্যক যন্ত্রের সমানই কাজ করছে, সেসব ক্ষেত্রে যন্ত্র আমদানী আখেরে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। গত আট বছর পূর্বে 'কার্ভে' কমিটির সুস্পষ্ট অভিমত ছিল যে, পূর্ব থেকে যেসব কুটির-শিল্প চালু আছে, সেসব ক্ষেত্রে আপাত সুবিধা, এবং অনেকের সামান্য আয়ের বদলে কয়েকজনের অনেক বেশি মুনাফার জন্য যন্ত্র আমদানী করা ঠিক হবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশেই যদিও কর্মহীন লোকের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে, তবু অসংখ্য 'হাস্কিং মেসিন', আটা পেষাই যন্ত্র, চিঁড়ে কোটার যন্ত্র, সরিষার তেল নিষ্কাশনের যন্ত্র আমদানী হয়েছে। প্ল্যানিং কমিশনও এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে, সমস্ত প্রাদেশিক সরকার কমিশনের নির্দেশ ঠিকমত অনুসরণ করেন নি(৩)।

বিদ্যুৎ সরবরাহ যখন গ্রামাঞ্চলে ব্যাপ্ত হবে তখন কুটির-শিল্পের ও সেইসঙ্গে কর্মসংস্থানের প্রসার হবে, এই আশা করা হচ্ছে। কিন্তু এইখানেই স্থির করতে হয়, যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলি নতুন নতুন জিনিষ উৎপাদন করবে না, পুরাতন কোন পণ্যকেই স্থানচ্যুত করবে। নতুন ও পুরাতনের মধ্যে সীমারেখা টানা খুবই কঠিন কাজ; এ্যালুমিনিয়ম সস্তা হ'লে গ্রামের কুমোর বা কাঁসাপেতল যারা করে, তাদের কাজ যাবে, প্লাস্টিক-এর খেলনা তৈরীর ফলে গাঁয়ের খেলনা অদৃশ্য হবে, বিদ্যুৎচালিত কাঠ চেরাই যন্ত্রে সস্তায় সুন্দর ভাবে কাঠচেরা যখন হচ্ছে, গ্রামের যে লোক কাঠ চেরাই করত তার পেশা আর থাকবে না ইত্যাদি; এ ত জানা কথা, কিন্তু, এ ছাড়াও এমন অনেক কুটির-শিল্প ছিল যেগুলি নতুন যন্ত্রের আগমনে অদৃশ্য হয়ে গেলেও দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় নি। ১৯৫১র বাংলা দেশের আদমসুমারি রিপোর্টে দেখা যায়, শস্যাদি পেষাইয়ের কাজে ১৯০১ সালে ১২৫১০ জন পুরুষ, আর ১,৯০,২৭৮ জন স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল, ১৯৫১ সালে, যখন জনসংখ্যা অনেক গুণ এবং সেই সঙ্গে শস্য উৎপাদনও বেড়েছে, তখন ঐ কাজেই ২৩২৭০ জন পুরুষ এবং মাত্র ৮৮,১৪০ জন স্ত্রীলোক লিপ্ত ছিল। ১৯৬১তে বাংলা দেশে মোট স্ত্রীলোক কর্মীর হার ১৯৫১র তুলনায়ও কমে গেছে। যদি দেখা যেত যে, বৃহৎ শিল্প আসার ফলে লোকেদের কাজের ধারা-মাত্রই পালটাচ্ছে অর্থাৎ অন্য কোন কাজে তারা লিপ্ত হচ্ছে, তা হ'লে সান্ত্বনার কারণ থাকত। কিন্তু বাংলা দেশের বড় বড় শিল্পে দেখা যাচ্ছে ১৯০১ সালে যেখানে ৬১,০০০ জন স্ত্রীলোক কাজ করত, ১৯৫১তে সেখানে সেই সংখ্যা বেড়ে মাত্র ৮৫৪০০-তে দাঁড়ায়। ১৯৬১তে দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশে মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মরত পুরুষের সংখ্যা ১০ বছরে শতকরা ৫৪·২৩ ভাগ থেকে ৫৩·৯৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রীলোক কর্মীর সংখ্যা শতকরা ১১·৬৩ ভাগ থেকে ৯·৪৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

(৩) Third Five year plan : পৃ ৪৪০।

শিল্পপ্রধান বাংলা দেশে যে গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অন্যান্য প্রদেশও শিল্প-প্রধান হ'তে থাকলে মোটামুটি এই রকমই ধারা লক্ষ্য করা যাবে।

একদল বলবেন, গত শতাব্দীতে ইংলণ্ড বা ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ঠিক এই ভাবেই একদল লোক কর্মচ্যুত হয়েছিল, পরে শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি সংখ্যক লোকে কাজে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত, শিল্পোন্নয়নের সূচনায় জনসংখ্যার চাপ, উদ্বৃত্ত লোক অন্যত্র পাঠাবার সুবিধা এবং সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণের সুবিধা—এই সব দিক্ দিয়ে বিচার করলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার ইংলণ্ড এবং বর্তমানের ভারতবর্ষের সমস্যা ও পরিবেশ যে তুলনীয় নয়, সে কথা মেনে নিতে হয়।

যন্ত্রকে বাদ দেবার উপায় নেই এবং দেবার প্রস্তাবও করা হচ্ছে না। কিন্তু যেক্ষেত্রে যন্ত্র আমদানীর অর্থ হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, শুধু অনেকের আয়ের পরিবর্তে কয়েকজনের বেশি লাভ, সেক্ষেত্রে যন্ত্র আমদানীর সার্থকতা আছে কি না সেকথা দেশের সকলকেই ভেবে দেখতে হবে। যন্ত্রে উৎপাদিত পণ্য দেখতেও সুদৃশ্য, অনেক সময় আপাতভাবে সস্তাও হ'তে পারে (৪) কিন্তু তাতেই কি শেষ পর্যন্ত সকলের সুবিধা হচ্ছে? যে-কয়টি পণ্যদ্রব্য আমাদের রপ্তানী করতেই হবে সেসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হোক্; কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোই মূল উদ্দেশ্য বা যেসব শিল্পে কয়েকটি যন্ত্র ও মুষ্টিমেয় লোকের বদলে স্বল্প হাতিয়ার নিয়ে অনেকে কাজ করতে পারে এবং যেসব সামগ্রী পাঠিয়ে বহির্বাণিজ্যের বাজার দখল করার কোন সম্ভাবনা নেই সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের প্রসার সম্বন্ধে বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন না ঘটালে শেষ পর্যন্ত কর্মহীনতার সমস্যা মেটানো যাবে কি না সন্দেহ। বহির্বাণিজ্য প্রসারের যে চেষ্টা বর্তমানে চলেছে তারও সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, কেননা আমাদের মতই আর-সব দেশগুলিও স্বাবলম্বন বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার চেষ্টা করছে।

গ্রামীণ জীবনের প্রধান সমস্যা—বছরের মধ্যে বহু মাসের জন্য বাধ্যতামূলক কর্মবিরতি,—এটি দূর করতে হ'লে একাধারে বৃহৎ শিল্পকে অবাধে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার সুযোগ দেওয়া এবং কুটির-শিল্পকে তারই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে বলা, এই দুটি এক সঙ্গে চলতে থাকলে কুটির-শিল্পের অকালমৃত্যু নির্ধারিত। আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্পগুলি একসময় বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না ব'লে দীর্ঘদিনের "Protection" পেয়েছে, আজ যদি কুটির-শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে "Protection" দেওয়া না হয় তা হ'লে কি ক'রে ফল পাওয়া যাবে? প্রগতিবাদীরা বলবেন, এ হচ্ছে "Putting the clock back"; অবাধ প্রতিযোগিতায় যে শিল্প টিকতে অক্ষম তাকে এভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করলে সামগ্রিক ভাবে দেশের ক্ষতি। কিন্তু সেই যুক্তিতেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা "Law of Comparative Cost" অনুযায়ী যদি আমাদের চলতে হ'ত, তা হ'লে আমাদের দেশে এখন যে-সব বৃহৎ শিল্প দাঁড়িয়ে গেছে, সেসব কি দাঁড়াতে পারত? ইউরোপের ইস্পাত শিল্পের ইতিহাসও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বহু দেশেই "জাতীয় স্বার্থ" বিবেচনা ক'রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতির, তথাকথিত মূলনীতি 'আপেক্ষিক সুবিধা'র কথা উপেক্ষা ক'রেই সকলে অগ্রসর হয়েছে। আমাদের দেশের চিনির কল দাঁড়াতেই পারত না যদি কিউবা, জাভা থেকে বরাবর অবাধে চিনি আমদানী করা হ'ত। "জাতীয়" স্বার্থে আমরা যদি এইসব ক্ষেত্রে "Protection"-এর ব্যবস্থা ক'রে থাকি, তা হ'লে ভবিষ্যতে যে সমস্যা আরো উগ্র আকার ধারণ করবে ব'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেক্ষেত্রেই বা কেন "Protection"-এর ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না? আমাদের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যে বিপুল জনশক্তির অপচয় ঘটছে তার অবসান ঘটাতে হ'লে সমস্যাটির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। আমরা সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি, নানান উপায়ে গ্রামীণ জীবনকে আধুনিক ও আনন্দময় করার চেষ্টা করছি, কিন্তু মূল সমস্যাটির সম্বন্ধে সজাগ না হ'লে ঐসব প্রচেষ্টা কি সফল হবে?

যান্ত্রিকতা ও জনশক্তির সদ্ব্যবহার এবং উভয়ের সমন্বয় ঘটানো আজকের দিনে কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটিই ঘটিয়ে তুলতে হবে এবং সমস্যা আরো জটিল হবার আগে থেকেই আমাদের এই বিষয়ে চিন্তা, উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

---

(৪) প্রসঙ্গত বস্ত্রশিল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। খদ্দর বা তাঁতবস্ত্রের সার্থকতা আছে কি না, এযুগে তাই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে এবং একথাও মানতে হয় যে গান্ধীজী যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খদ্দরের ব্যবহার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়নি। একদলের অভিমত এই যে খদ্দর বা তাঁতের উপর অত্যধিক ঝোঁক দেবার ফলে কলগুলি আভ্যন্তরীণ চাহিদাও ভাল ক'রে মেটাতে পারেনি, বহির্বাণিজ্যেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে পারেনি। এই সূত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক অনুসন্ধানের ফলাফল উল্লেখযোগ্য (বুলেটিন মার্চ ১৯৬২): হিসাব ক'রে দেখা গেছে, এই শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ও অন্যান্য উপকরণ বিদেশ থেকে আনবার জন্য ইদানীং যত বিদেশী টাকা ব্যয় হয়েছে, রপ্তানী বাণিজ্যে সে তুলনায় বহু কম টাকা রোজগার করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই পরিস্থিতির ব্যাতিক্রম হবার সম্ভাবনা কম। সামগ্রিকভাবে দেখলে এর সুদূর প্রসারী ফলাফল কি দাঁড়ালো?

সাহিত্যসমালোচনায় নতুন নিরিখ*

শ্রীনিখিলকুমার নন্দী

এদেশের সাহিত্য আলোচনায় মাঝে মাঝে এমন দু'একটি বিরল নিদর্শন প্রস্তুত হয়ে উঠছে সংবাদ-সমীক্ষক গবেষণার বস্তুগৌরব ও সাহিত্য-সন্ধিৎসু সৎসমালোচনার লীলালাবণ্য যুগপৎ যেখানে সঞ্জীবনী বিতরণে অকৃপণ। ডঃ শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প' তেমন একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত। দুই খণ্ডে বিভক্ত এই একায়তন গ্রন্থের উৎস ও উদ্দেশ্য-পরিচয় গ্রন্থভুক্ত 'নিবেদন' অংশে ছাড়া লেখকের সুপ্রযুক্ত অভিধাসহ একাদশ অধ্যায় বিভাগেও স্পষ্ট। উৎসকথা-খণ্ডে আছে ছ'টি অধ্যায়, যথা, সূচনা: প্রথম নায়ক সূর্য; গল্পের উৎসভূমি: ভারতবর্ষ; আলিফ্ লয়লা ওয়া লওয়া: পারস্য উপন্যাস; ইয়োরোপ: রাত্রির অরোরা; তিন চূড়া: বোকাচ্চিয়ো, চসার, র‍্যাবলে; উনবিংশ শতাব্দী: আধুনিক ছোটগল্পের আবির্ভাব। রূপতত্ত্ব-খণ্ডে আছে পাঁচটি অধ্যায়, যথা, ছোট গল্পের সংজ্ঞা; উপাখ্যান: বৃত্তান্ত: ছোটগল্প; গল্প রূপে রূপে; একটি ছোটগল্প: বিশ্লেষণ; শেষ কথা।

এই সাধারণ পরিচয়কে ১ম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে লেখক সর্বজাগতিক গল্পকথার তুলনামূলক আলোচনায় একটি যে সাদৃশ্য ও সহযোগের সূত্র পেয়েছেন তারই সঙ্কেত করেছেন তিনি বিশ্বজনীন মূর্তি সূর্যের নায়কত্বে। এবং এই সাঙ্কেতিক রূপ ছাড়াও লৌকিকরূপে সূর্য গল্প সূত্রেই সর্বদেশে সমদেদীপ্যমান। ঋগ্বেদ, মহাভারত ব্যতিরিক্ত রেড ইণ্ডিয়ানদের গল্প, এসকিমো গল্প, প্রাচীন গ্রীসের গল্প প্রভৃতির সাক্ষ্যে সূর্যরূপকল্প কিভাবে রাজপুত্রের রূপকথায় ক্রমবিকশিত হ'তে চলল তারই বিশ্লেষণ আছে এই অধ্যায় জুড়ে। লেখক সেই প্রসঙ্গে বলছেন: "সৌর-প্রতিকতার সীমা ছাড়িয়ে রাজপুত্র মানুষের কামনা-কল্পনা এবং বিজয়-যাত্রার প্রতিনিধি হয়ে উঠল।" এবং ধারাবাহিকতায় রূপক-রূপকথা-রোমান্সের পাশে নীতিমূলক গল্পের গ্রন্থীবন্ধন ক'রে লেখক এই যুক্তবেণীতে আনুপূর্ব মানুষেরই চরিত্র নির্ণয় করলেন: মানুষের চরিত্রের দু'টি দিক্ আছে—একটি তার বহির্মুখীনতা, আর একটি তার পারিবারিকতা। একটি ধর্ম তার কেন্দ্রাতিগ আর একটি কেন্দ্রাভিগ; একটি তার উন্মত্ত গতিবেগ, একটি প্রশান্ত স্থিতিমুখীনতা। রূপকথা রোমান্সে গতিপ্রবণতার বার্তা, নীতিগল্পের (Fable) অন্তরে স্থিতিশীলতার তত্ত্ব।' তাই এই মানুষী চরিত্র-ভাষ্যে সমৃদ্ধ 'জাত পঞ্চতন্ত্র বৃহৎকথা দশকুমার চরিতের গৌরবিনী' জননীর প্রসঙ্গ সুবিস্তৃত ক'রে বলার প্রয়োজন হ'ল। সর্বোপরি অধ্যাপক বেন্‌ফির উক্তিমত গল্পের উৎসভূমি: ভারতবর্ষকে বিচিত্রিত করা ঐতিহাসিক দায়িত্বেও অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রসঙ্গবহুল। আয়োজনে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। 'জাতক' থেকে 'শুকবিলাস' পর্যন্ত বিশাল গল্পরাজ্য যেন আকাশের এপার-ওপার। সেখানে এক দিগন্তে আদর্শের উষালোক অন্যদিগন্তে সত্যের রক্তসন্ধ্যা।

প্রাসঙ্গিক এই দ্বৈধসন্ধানের পর লেখক এ-অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানছেন এভাবে: 'আদর্শ নয়—সত্য। কল্পনার কলহংস স্বপ্নের আকাশে ডানা মেলে স্বর্গ-মর্ত্য পরিক্রমা করছে না—নেমে আসছে পঙ্কভূমিতে, তীরবিদ্ধ তার বুক। সমাজমর্মের নগ্ন উদ্‌ঘাটন রয়েছে এদের মধ্যে —মনু-শাসিত লোকস্থিতি যে নিছক জ্যামিতিক পন্থা অনুসরণ করেই চলেছে না—এতে আছে তারই সঙ্কেত। পরে আধুনিক ছোটগল্পের আলোচনায় আমরা যে "Pointing finger"-এর কথা বলব, তার সূচনা এইখান থেকেই।" সজ্ঞান পাঠকেরও সচকিত হয়ে ওঠার মত অন্তর্ভেদী মন্তব্য। কিন্তু কেবল শিল্পসত্যের মর্মোদ্ধার নয়, ইতিহাসের ধূলিতাড়নাও কর্তব্য। তাই তৃতীয় অধ্যায়ে পারস্য প্রস্থানের পূর্ব সঙ্কেত নিম্নরূপে বিধৃত: গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ পার হয়ে···আমাদের পরিক্রমা করতে হবে আরব এবং মিশরে—'এক হাজার এক রাত্রির' মায়া-মালঞ্চ অতিক্রান্ত হয়ে তারপরে আমরা ইয়োরোপে প্রবেশ করব।' তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষাংশ এই সঙ্গে যুক্ত হোক: 'এইবারে নতুনভাবে পটোন্মোচন হল বাগদাদ কায়রো-আলেকজান্দ্রিয়া। নতুন গল্প এল ভ্রাম্যমান কথাকোবিদ

---

* সাহিত্যে ছোট গল্প: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরী। বারো টাকা।

রবি (Rawi)র কণ্ঠে—আরবের বেদুয়িনের তাঁবুতে, পিরামিডের ছায়াতলে। এক হাজার এক রাত্রির তিন বৎসরব্যাপী অচ্ছেদ গল্প কাহিনী: আরব্য উপন্যাস। প্রেম, লালসা, ধর্ম, ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, অ্যাডভেঞ্চার, জিন-মরিদ-ইফ্রিতের এক অপূর্ব জগৎ উদ্ভাসিত হল 'হাজার আফসানে'—'আলিফ লায়লা ওয়া লয়লায়।' এরপর আলিফ্ লয়লার কাহিনীচয় সংগ্রহে বার্টন সাহেবের রোমাঞ্চকর প্রয়াস প্রণালী লিপিবদ্ধ করে লেখক সুদূর প্রসারী গল্পের ইতিহাসে এর যে ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য: পণ্ডিতেরা আরবী ও মিশরী গল্পকে দুটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছেন।···কিন্তু আরবী-মিশরীর আগে আছে ফার্সী—তারও আগে ভারতীয় কথাসাহিত্য। ভারত থেকে পারস্যে এসে প্রথমে গড়ে উঠেছে 'হাজার আফসান'—তার থেকেই আরবের 'আলিফ লয়লা'।···এই গল্পগুলি আরব জীবন সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, মাত্র রূপান্তরিতই হয়নি—এরা জন্মান্তরিত হয়েছে। গঙ্গার তরঙ্গ এসে মিশে গেছে তাই গ্রীসের জল-কল্লোলে, নিশাপুরের আলোক মালায় বোগদাদের পথে পথে জলে উঠেছে রূপের দীপান্বিতা, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত খলিফা হারুন-অল্-রসিদ রূপে নবজন্ম লাভ করেছেন। তক্ষশীলার অভিমুখী স্বার্থবাহদল গতি পরিবর্তন করে ক্যারাভ্যান হয়ে যাত্রা করেছে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে।' এভাবে সারা পৃথিবীর রোমান্সের পটভূমিকায় আলিফ লয়লার কালনির্ণয় করে অতঃপর গ্রন্থকার এর কাহিনী বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং অবশেষে এই সূত্রে প্রাচ্য-প্রতীচ্য মানসীকতার ভেদ নির্ণয় করে তৃতীয় অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন দুইপৃষ্ঠাব্যাপী নাটকীয় যুগসন্ধি উন্মোচনে। অংশটি বর্তমান সংস্করণ ১১২-১১৪ পৃষ্ঠায় বিধৃত, আদ্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। উপস্থিত প্রয়োজনে কেবল মর্মোদ্ধার করা যাক্: ভারতবর্ষের ভূমিকা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, আরব শক্তির দিগ্বিজয়ী ইতিহাসও ক্রমে ম্লান হয়ে এল ক্রীশ্চান শক্তির ক্রুদ্ধ পুনরভ্যুদয়ে। স্পেন ও পর্তুগালের মিলিত আক্রমণে কিউটার দুর্গে ইসলামী মহিমার শেষ চূড়াটি ভেঙ্গে পড়ল ইয়োরোপে। সমুদ্রের বন্ধুর পথ বেয়ে বিশ্বজয়ে বেরুল ইয়োরোপ। ধীরে ধীরে এশিয়ার আলো নিবতে আরম্ভ করল।' প্রথমে প্রাচী পৃথিবীর বাণিজ্য চলে গেল প্রতীচ্যের হাতে। তারপর যন্ত্রের আবির্ভাবে দ্রুত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এল ইয়োরোপে। বাস্তবকে ভুলতে পূর্বযুগের গল্পউল্লাস নতুন যুগদায়িত্বে বাস্তব-উদ্ঘাটনে মনোযোগ দিল। সুতরাং গল্প বলার নতুন পালা এখন ইয়োরোপে। কিন্তু 'প্রাচী পৃথিবী কি আর গল্প লেখেনি?' লেখক সেই স্বকৃত প্রশ্নেরও সংক্ষিপ্ত সদুত্তর দিয়েছেন আপাততঃ এ অধ্যায়েরই শেষাংশে। চতুর্থ অধ্যায়ে গল্পগ্রন্থনের আরেক দিগন্তে নব-সূর্যোদয়ের চতুর্থ প্রাক্কাল বর্ণিত হয়েছে। হোমর, গ্রেকো-রোমান গল্প সাহিত্য ও বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট অবশ্য এখানে মূল উপজীব্য; কিন্তু তারপরই যে বিষয়টি বিন্যস্ত তাও গুরুত্বে অগৌণ। বিষয়টি দ্বিবিভক্ত: চীন সম্রাট কুবলাইয়ের মহিমচ্ছায়ায় সংঘটিত মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত; আর তারই প্রভাবজালের প্রথম সার্থক শিকার আদি ইউরোপীয় ত্রিচূড় কথাশিল্পীর একজন বোকাচ্চিয়ো। এই সূত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের গ্রন্থী ত্রিগুণিত: বোকাচ্চিয়ো, চসার ও র‍্যাবলের আবির্ভাব, সৃজনকাল ও সৃষ্টি উৎসারে মুখরিত ইউরোপীয় গল্পজয়যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। লেখক অনবদ্য অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলনে, মন্ত্র ভাষণে ও কুশলী গল্পগ্রন্থী মোচনে এ-অধ্যায়কে অবিস্মরণীয় করে তুলেছেন। উক্ত তিন মহাশিল্পীর একজন গল্পগঠনে, একজন চরিত্র রচনায়, একজন সংলাপবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গল্পধারাকে পথপ্রদর্শন করলেন। ফরাসী গল্পসাহিত্যের স্বর্ণযুগে,একে একে প্রদীপ্ত আবির্ভাব হল যে মহারথীদের, তাঁদের চিত্রচরিত্র পাঠান্তে লেখকের সুনিপুণ দৌত্যে আমরা অতঃপর রুশিয়ার মনোমন্দিরে প্রবেশ করলাম। সেখানে চেনা-অল্পচেনা লেখকদের গল্পবিচিত্রা-আস্বাদনের বিস্ময় নিঃশেষ না হতেই চলে এলাম স্বয়ং চসারের জন্মভূমিতে, তার নির্ণয়যোগ্য গল্পমন্দায়। লেখক তার সন্তোষজনক হেতু নির্ণয় করলেন, আর সেইসঙ্গে 'সামান্য হলেও' উনিশ শতকের গল্পে জার্মানীর ভূমিকাকে পুনর্জীবিত করলেন আমাদের কল্পনায়। তারপর মার্কিন ছোট গল্পের অগ্রদূত হথর্নকে দিয়ে সূচিত হল আরেক পর্যায়। আর ওহেনরিকে দিয়ে তার পরিমাণ ঘটিয়ে বিশ্বগল্প সাহিত্যের আলোচনায় বাংলা দেশের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার প্রকৃতি বিচারে লেখক অতঃপর প্রস্তুত হলেন। এবং সংক্ষেপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভূদেব-বঙ্কিমী নভেলা-পরিক্রমা সেরে আমাদের প্রথম ও প্রধান গল্পলেখকদের পরিপ্রেক্ষিত-বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। শতাব্দী শেষের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পট-ভূমিকায় বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ। তাৎক্ষণিক রাষ্ট্রীয় সামাজিক পরিস্থিতি ও চিরকালান বাংলাদেশের মানবেতিহাস সেকালে যে-সংঘাতে উন্মুখর হয়ে

উঠেছিল তারই অন্তঃশীল স্রোত যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে প্রবহমান করে দিলেন, একথা সুবিদিত করে লেখক পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় প্রমথ চৌধুরী, প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই ত্রিহেতুক স্মরণীয় ত্রয়ীর চরিত্রায়ণে শতকান্ত বঙ্গীয় গল্পরূপের আখ্যান সমাপ্ত করলেন: এবং বললেন: 'রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক মহিমায়, ত্রৈলোক্যনাথের রসের বৈঠকে এবং প্রভাতকুমারের স্নিগ্ধ ঘরোয়া আমেজে উনিশ শতকেই বাংলা গল্প একটি বিশিষ্ট গৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে উঠল।' অতঃপর বিংশ শতাব্দীতে পাঠকের কাছে ছোটগল্প যেহেতু স্বমহিমায় দীপ্যমান তাই লেখক আর পরবর্তী ইতিবৃত্ত সন্ধানে গেলেন না, ছোটগল্প-শিল্পরূপের তত্ত্ববিশ্লেষণে মন দিলেন।

২য় খণ্ডের সূচনা হল। ইতিবৃত্ত সন্ধানে বিংশ শতাব্দীর ছোটগল্প তাঁর ব্যাখ্যা যোগ্য হয়নি বটে, রূপতত্ত্বে গ্রন্থকার তার পরিপূরণ করেছেন অন্যভাবে ও বিচিত্র উপায়ে এবং আগাগোড়া অন্তর্সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রেখে। গল্প রূপে রূপে বহুরূপে পরিণতি থেকে নতুন পরিণতির সন্ধানে ও সাধনায় কী ভাবে কতদুর অগ্রসর হতে চেয়েছে, হয়ে এসেছে সে প্রসঙ্গে অবধারিত ভাবেই প্রাচীন ও নবীন নির্বিশেষে বহু ছোটগল্প ও গল্পলেখকের প্রকরণ প্রতীতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাঙালী পাঠকেরা এমন কি সেখানে তাঁদের অনেক প্রিয় নিকটাত্মীয় গল্পকার, প্রীতিস্নিগ্ধ গল্পের বিশ্লেষণ পর্যন্ত পাবেন। এখানে, বলা বাহুল্য, লেখকের গবেষণা বুদ্ধির চেয়েও তাঁর বিশিষ্ট প্রকৃতিধর্ম তাঁকে সত্যকার প্রেরিত করেছে। সহযোগিতাও করেছে। এ-অংশ পড়ে আমার বারবার মনে হয়েছে, ছোটগল্পের কর্ম ও ধর্মকে জানতে চেয়েছেন যিনি তিনি শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক, কিন্তু জেনেছেন ও জানিয়েছেন যিনি তিনি সুখ্যত বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী ছোটগল্পকার—তাঁর কর্ম ও ধর্মধ্যান ছোট গল্পের কর্ম ও ধর্মজ্ঞানে একাকার ও বলিষ্ঠ বাণীরূপ পেয়েছে। নইলে ছোট গল্পের সংজ্ঞাদানে নেমে বহু দেশের বহু বিচার, বহু লেখকের বহু লেখার মান উৎকীর্ণ করেই লেখক ক্ষান্ত হতেন, কখনো প্রাসঙ্গিক উপসংহার এমন আত্মপ্রত্যয়ঘন সুস্পষ্ট বাণীযোগ লাভ করত না: 'আর ছোট গল্প সম্পর্কে এক কথায় একটি ছোট সংজ্ঞা সবশেষে মনে রাখা যাক: সে একাগ্রী বাণ স্থির লক্ষ্যে. বিদ্যুৎগতিতে একটি ভাব পরিণামকে মর্মঘাতীরূপে বিদ্ধ করতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ···। অথবা বৃত্তান্ত, উপন্যাস, ছোট গল্পের 'প্রকৃতিভেদ নিরূপণে কখনোই কোন সচরাচর গ্রন্থকার ওয়াইডম্যানের একটি সুদুর্লভ গল্পের ঈর্ষাযোগ্য অন্তরাত্মা-বিশ্লেষণে তাঁর আপন বক্তব্যের মর্ম খুঁজতেন না। এখানকার সমস্ত বিশ্লেষণ-চাতুর্যকে যদি অনুধাবন করতে হয়, যদি গল্পটির তথা সমালোচকেরও বক্তব্যগত নির্গলিতার্থ অবিকল মাধুর্যে আত্মসাৎ করতে হয়, তবে বিশেষত অষ্টম অধ্যায়-টির শেষাংশের সর্বাঙ্গীন অধ্যয়ন, একা-একা, নির্জনে প্রায় কোন কবিতার মতো শ্রেয়তর। গল্প রূপে রূপে অধ্যায়টিকে লেখক বিতর্ক-উদ্দীপক বলেছেন ও নিজের আংশিক অ্যাপলজি লিখেছেন। আবশ্যক কী? সাহিত্যের যে কোন ক্রিটিক্যাল আলোচনাই বিতর্ক উদ্দীপক হতে পারে। আর গল্পের বিষয় বিচিত্রা সম্পর্কে তাঁর অভিমত যে সব সত্ত্বেও মূল্যবান সে তাঁর এতাবৎকাল-বাহিত স্বকর্মার্জিত পাঠকবৃন্দ জানেন। একটি ছোট গল্প 'এক রাত্রির' বিশ্লেষণে লেখকের এই স্বধর্মসাধনের আরেক পালা, অথবা স্বকর্মসাধনেরই আরেক পরিণতি। সৃজনশীল কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টি ভিতরে ভিতরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক সক্রিয় না থাকলে এই সার্থক গল্পের এমন সফল বিচারণা সম্ভব নয়। অধ্যায়টি জুড়ে গল্পের আবেগাত্মক অভিজ্ঞতার যথোচিত উপলব্ধি যে অন্তরঙ্গ ও প্রায়-অবিশ্বাস্য ভাষ্যলাভ করেছে শেষাংশের পুনরুল্লেখে তার কথঞ্চিৎ পরিচয় দান স্নিগ্ধতম কর্তব্যের মতই অপরিহার্য: দেহ-প্রেমের খণ্ড ক্ষুদ্রতাকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) চিরকালই 'অন্তর্ধান পটের' উপর ধ্যানের 'চিরন্তনতা'-তে (য়?) বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন—এ-ই তাঁর 'শেষের কবিতা'। তাই 'এক রাত্রির' নায়ক যখন বলে, 'এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল'—তখন লেখকের প্রেম-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে তার সর্বোত্তম প্রাপ্তিকেই পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক যুগের তুঙ্গ-শিখরে এই গল্পের অবস্থান: তাই অ-ধরা নায়িকা শাশ্বতীর স্বপ্নকমলে অধিষ্ঠিতা, তাই বাসনাবিহীন ক্ষণ-মিলন চির মিলনের মহিমায় ভাস্বর। লেখকের বিশেষ-ব্যক্তিত্বটি এই গল্পে অতি স্পষ্টভাবে উপস্থিত, সেইজন্য আমরা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি: "It is a special distillation of personality।" সমস্ত গল্পটি সনেটের মতো দৃঢ়নিবদ্ধ প্রতীতির সমগ্রতা নিপুণভাবে রক্ষিত। আর নাম? 'এক রাত্রি' ছাড়া এ গল্পের নামান্তর কল্পনাই করা চলে না—"Only one night—but the eternal night."। একাদশ অধ্যায় 'শেষ কথায়' লেখক বর্তমান কালের সময় চেতনা, জীবন সঙ্কট ও তার কলাফলের একটি অতুলনীয় আলেখ্য প্রণয়ন করেছেন।

অধ্যায়টি, বিশেষত বর্তমান যুগের বিবেকবান প্রপীড়িত পাঠকদের জন্য, লেখকদের তো বটেই, লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এবং এ-অধ্যায় রচনার প্ররোচনাও গ্রন্থকারের গবেষণা বুদ্ধির নয়, তাঁর চির স্রষ্টা-সত্তার মগ্নতা, উক্ত অস্তিত্বে দায়-দায়িত্ববোধের অনুশাসন ও ক্ষতবিক্ষত ক্ষণ শিল্পীত্বের মর্মদাহের।

বস্তুত এ-গ্রন্থ আমাদের গবেষণা ও সমালোচনা সাহিত্যের একটি নতুন নিরিখ। এক চিত্রে দুই সহজ রঙের মতো ইতিহাস চারিতার রূঢ় রৌদ্র ও রূপতাত্ত্বিকতার স্বর্ণ মেঘ। এ গ্রন্থের আদ্যন্ত সুবিন্যস্ত। আর কল্পনার যাদুস্পর্শে ঐতিহাসিক সত্যরঞ্জন যেহেতু এখানকার মূল উপজীব্য, মাঝে মাঝে তাই মনে হতে পারে, লেখকের বর্ণনায় যেন অলঙ্করণ একটু অতিরিক্ত, অতিশয়োক্তি প্রবণতাও একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়; আবেগ প্রায়ই উচ্ছ্বাস যুক্ত, ইতিহাস চারিতাও কচিৎ কখনো মন্ময় মন্তব্যে অপরোক্ষ্য।

এই সঙ্গে আরো দু'চারটি প্রশ্ন উত্থাপন যোগ্য। বিশ্বজোড়া গল্প সাহিত্যর সুবিস্তৃত পটভূমিকায় এ-গ্রন্থের পরিকল্পনাও প্রস্তুতি। স্বয়ং লেখকের নিবেদন মতো: ভারতীয় গল্প সাহিত্য এবং আরব্য উপন্যাসের উপর কিছু বিস্তৃত আলোচনা করেছি, কারণ ইয়োরপীয় কথাসাহিত্যের বিকাশে এদের দান সর্বজনস্বীকৃত। 'আর্য জাতির সর্ব প্রাচীন গল্পসংগ্রহ জাতক থেকেই যাত্রা আরম্ভ করেছি, তারপর পঞ্চতন্ত্রের গতিপথ অনুসরণে, আরব্য উপন্যাসের সহযাত্রী হয়ে ইয়োরোপে পৌঁছেছি। বোকাচ্চিয়ো, চসার এবং র‍্যাবলে—এই মহান্ ত্রয়ীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উনিশ শতকে আধুনিক ছোট গল্পে প্রবেশ করেছি।' এহেন ব্যাপকতাধর্মী রচনায় সাধারন ভাবে বিশেষ সাহিত্য ধারাটির উৎস সন্ধান ও গতিপ্রবণতার পরিণামই উপজীব্য হয়ে থাকে। বর্তমান লেখক তদুপরি যে তাঁর কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকপাতে বিভিন্ন দেশকাল পাত্রকে সমুজ্জ্বল ও নবমূল্যায়িত করেছেন এ তাঁর বিশিষ্ট গুণগ্রাহিতার নিদর্শন। এবং এ নিদর্শনে এশিয়া-ইউরোপ নির্বিশেষে সর্বত্র তাঁর যথাসম্ভব সমুচিত মনোযোগ দানের চিহ্ন সুবর্তমান। বিশেষত আধুনিক ছোট গল্পের বিবর্তনে মধ্যযুগীয় ইউরোপের কার্য্যধারা তথা সুনির্দিষ্ট ভাবে চসারের অবদানকে যে গৌরবময় ভূমিকা দিয়েছেন তাও তাঁর অবশ্য দেয়। কিন্তু পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় কাব্যধারায় তথা মঙ্গলকাব্য গীতিকাকাব্যের গল্পরসবস্তুতে ও মানবচরিত্রপাঠে যে একটি স্বতন্ত্র জীবন রসরসিকতার সন্ধান প্রচ্ছন্ন থেকেও অস্ফুট নয় আর তা যে স্বল্পভাষণেও অনুধাবন যোগ্য তা এই স্থিতধি লেখক কেন বিবেচ্য মনে করলেন না? সাহিত্যে ছোটগল্পের ইতিকথায় তার ঋজু-রৈখিক কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই বলে? অথবা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ছোটগল্প মুখ্যত ইউরোপীয় প্রেরণাসঞ্জাত বলে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের গল্পে যে বাঙালী চরিত্রের মূল ভাবপ্রবণতা, তার করুণ ও কৌতুকে সমানাগ্রহ, তার দুর্নিবার আসক্তি ও উদার ঔদাস্য বৃহৎ বাণীরূপ লাভ করেছে তা কি আমাদের মঙ্গল কাব্যগুলিতে ভক্তিধর্ম প্রচারের আড়ালে মনুষ্য-প্রকৃতির স্থূলসূক্ষ্ম বয়নে যথেষ্টই নেই? এবং ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক গীতিকাগুলিতে? বিশেষত মুকুন্দরামের সংবেদনশীল ধারায় ভাবের চরিত্রমূল্যায়নে, ভারতচন্দ্রের বিদগ্ধ-সামাজিক শ্লেষোচ্চারণে? সর্বোপরি উভয়ত্রই সমাজ-রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার কাপট্য উন্মোচনে? তাছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে-কথাসাহিত্যে নবজাগ্রত নারীমূল্যবোধের নেপথ্যে মধ্যযুগীয় কাব্যগীতিকায় বিধৃত নারীত্বের শক্তিস্ফূর্তি ও তার অপচয়বেদনা আমাদের সেই যুগোপোযোগী ভাবান্তরে কি কোন সহযোগিতাই করেনি? বাংলাগল্প উপন্যাসে সবসত্ত্বেও নারীর যে প্রাধান্য সুপরিস্ফুট তা কি আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিক ঘটনা নয়—মধ্যযুগের উক্ত কাব্য-গীতিকাগুলি সেদিকেও কি তাদের সাধ্যমত দায়িত্ব পালনে কোন কৃতিত্ব দেখায় নি? বলা বাহুল্য, চসারের ভূমিকা ও মুকুন্দরামের ভূমিকা এক ও অভিন্ন নয়, হতে পারে না—তা সত্ত্বেও উপরের প্রশ্নগুলি এ-প্রসঙ্গে সর্বসাকুল্যে অনালোচ্য না হতেও পারে। এই সূত্রে ২৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত স্বয়ং গ্রন্থকারের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। হয়ত সেখানে আমাদের এ বক্তব্যের অস্পষ্ট ও পরোক্ষ সমর্থন আছে। গ্রন্থকার বাংলা গল্পের ক্রমপর্য্যায় বিশ্লেষণে বলেছেন: "বাঙালির পারিবারিক জীবনের শিল্পী প্রভাতকুমার বিদেশী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, ফরাসী ইংরেজীর সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল, কিন্তু বিদেশী-প্রভাবমুক্ত সরল সকৌতুক গল্পেই তিনি বাঙালির অন্তরলোকে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছেন, সে-সৌভাগ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও ঘটেনি। অথচ, গল্পের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথেরই সাক্ষাৎ শিষ্য।' এই 'কিন্তু' ও 'অথচ' সূচিত অংশগুলি এখানে মূল্যবান। কথাসাহিত্যে যখন ও যেখানে অবিমিশ্র অশ্রুমুখ বাঙালির ঐতিহ্যলালিত শিরাস্রোত সলীল হয়ে

উঠেছে, অপ্রতিহত বঙ্কিমী প্রভাবযুগে যেমন রমেশ দত্ত, সঞ্জীবচন্দ্র, তারকনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখাৎ আরেকবার হয়েছিল, সব সত্ত্বেও সেখানেও তখন এমনিই ঘটেছে, 'সরল সকৌতুক গল্পে' 'বাঙালির অন্তর্লোকে' প্রবেশের অভিপ্সা ও প্রয়াস ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যক্ষ করেছি অনতি আলোকপ্রাপ্ত, অন্যপ্রভাবমুক্ত বাঙালী স্বভাবেরই নিহিত তাড়নায়, মধ্যযুগবাহিত সেই সহজিয়া রক্তনাড়ির সংস্কারে সংস্কারহীনতায়। সুতরাং আধুনিক ছোটগল্প যদিও উনবিংশ শতাব্দী-আনীত ইউরোপীয় কথা-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষ, কিন্তু পরোক্ষ পূর্বপুরুষের দাবিতে আমাদের সদ্য-উল্লিখিত সাহিত্য শাখার স্বীকার্যতা বোধহয় আজ পুনর্বিবেচ্য।"

এ ত গেল শিল্পরূপ ও রসমূল্যায়নের দিক। ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে গ্রন্থকার বাঙালির প্রথমযুগীয় গল্প ও গল্পকল্প রচনা প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম সঙ্গত কারণেই স্মরণ করেছেন, স্মরণ করেছেন সঞ্জীবচন্দ্রকেও, কিন্তু বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'শ্রীপূ' লিখিত 'মধুমতী' রচনাটির কোন উল্লেখ করেন নি। 'মধুমতীও' 'মধুমতী'র লেখক (বঙ্কিম-সঞ্জীব-সোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?) এ-সম্পর্কে লেখকের নিরীক্ষা-যোগ্য বিবেচিত হলে এই পর্যায়ী আলোচনা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হত।

আরেকটি কথা। বিদেশী শাসন ও স্বদেশী তোষণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-মানসিকতার বিশ্লেষণে লেখক বলছেন (২৭১-৭২পৃ) 'এই সময়ে অনুষ্ঠিত "শিবাজী-উৎসবে" যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর 'ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার' বাণীকে উদাত্ত করলেন বটে। লক্ষ্য করবার মতো, কোন সংকলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিবাজী উৎসব কবিতাটিকে স্থান দেন নি। কারণ সুস্পষ্ট। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে…' ইত্যাদি। এখানে একটি বাক্য অথবা বাক্যাংশ একসঙ্গে কতিপয় বিভ্রান্তির জনক হতে পারে; যেমন, রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর "ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার" বাণীকে যে 'উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন' তা কি তবে (যত 'উদাত্ত'ই হোক) নিষ্কুণ্ঠ ও নির্দ্বিধ নয়? কোন সংকলনে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে স্থান দেন নি ও তার 'কারণ সুস্পষ্ট' এ সমীক্ষাও হয়ত সমীচীন নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বৃহত্তম স্বকৃত কাব্যসংকলন, মহত্তমও বটে, 'সঞ্চয়িতায়' একে সুনির্দিষ্ট স্থান দিয়েছেন। ঘটনা একেও গৌণ করে দেখলে, সেখানে পাশাপাশি সন্নিবেশিত সুপ্রভাত (রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্ত) ও নমস্কার (অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার) কবিতা দুটিকেও অনুরূপভাবে দেখতে হয়, এরাও ত সাময়িক পত্র থেকে সরাসরি পুনরুদ্ধৃত। তাছাড়া 'এই সময় রবীন্দ্রনাথকে যেতে হ'ল শিলাইদহে'—প্রথম শিলাইদহ গমন ও রবীন্দ্র রচিত সেই অবিস্মরণীয় ছোটগল্প প্রবাহ এ-উক্তির নিশানা যথার্থ সমাক্রম-পরম্পর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা, শিবাজী উৎসবের রচনাকাল দেখা যাচ্ছে ১৩১১।

পরিশেষে বলব, বক্ষ্যমান গ্রন্থের মহত্ত্ব স্বয়ংসিদ্ধ। কোন বহুল কথন বা কোন তুচ্ছ ছিদ্রান্বেষণে যে তা আদৌ বিচলিত হবে না এ বিষয়ে নিঃসংশয় থেকেই আমাদের এই গ্রন্থপরিচিতি সমাপ্ত করছি। প্রথম দিককার প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন ও শেষ দিককার প্রশ্ন প্রণয়ন আমাদের সেই সানন্দ গ্রন্থ পরিচয় দানের অত্যাবশ্যক অবয়ব মাত্র। সেইসঙ্গে এখানেই, এ গ্রন্থ সাফল্যের নিহিত কারণ নির্ণয় পুনরায় কর্তব্য মনে করি। এই বিশাল বিচিত্রস্বাদী গ্রন্থ প্রণয়নের সাফল্যে সচরাচর অধ্যাপক রূপকে যে অতি সহজেই গৌণ করে দিয়েছে তাঁর দীর্ঘকাল বাহিত স্বজন শিল্পীর আত্মস্বরূপ, আর সেজন্যেই এ-গ্রন্থের গুরুত্বে অধিক বলয়িত হয়েছে শুষ্কক্লিষ্ট তথ্য সন্ধানের চেয়ে সহজ সরস ইতিহাস ধ্যান, ইতিহাস শিল্প তা আবার স্মরণ যোগ্য। এবং এই ইতিহাস শিল্প হয়েছে যে-গুণে তার লক্ষণ বিচার এখানে উপরের পরিচ্ছেদগুলিতে আভাসিত হলেও তা আবার স্পষ্টোচ্চারণে বর্ণনীয়: এ-গ্রন্থের বর্ণাঢ্য বর্ণনাগুণ (কচিৎ আলঙ্কারিক আতিশয্য ইত্যাদি ছাড়া) ভাষার তীক্ষ্ণ ঝংকার, ভাষণের তীব্র মাত্রা, কল্পময়তা, ছন্দোময়তাই সেই মূল লক্ষণ। এবং তারও পূর্বানুষঙ্গ হিসেবে অনুধাবনীয় এ-গ্রন্থের দুরন্ত ও দুঃসাহসী পটভূমি সন্ধান—উন্মাদক চিন্তা কল্পনাচারিতার সমুপযুক্ত নিখিল বিশ্বময় ঘটনার বিন্যাস, সুবিচিত্র গল্প কাহিনী প্রসঙ্গ উল্লেখ উপলক্ষে অসংখ্য বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী চরিত্র সমীক্ষা, একটা সামগ্রীক বিস্ময় রস। সেই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত লেখকের বহুদিনগত বলিষ্ঠ লেখনীর দুর্নিবার গতি, অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে প্রখর কোন নাট্যকারের মত যেন দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এক সাবলীলতায় তিনি সুদূরাগত মানুষী সত্য সৌন্দর্য বিক্ষণে তথা ইতিহাসের শিল্প সন্ধানে মুক্তপক্ষ। গবেষণা ও সৎ সমালোচনা একত্রে নীরক্ত রূপ না নিয়ে যে সংরক্ত সুষমায় সমন্বিত হয়েছে সেজন্য গ্রন্থকারের বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি, সৃষ্টিকল্পনা ও প্রজ্ঞা একত্র দায়ী। আর তাই ডি-ফিল প্রাপ্ত রচনা হয়েও এ সেই পর্যায়ের তত্ত্বাবিত রচনামাত্র নয়, এ এক স্বতন্ত্র-স্বাভাবিক, মৌলিক-চরিত্র প্রোজ্জ্বল সৃষ্টি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব

রণজিৎকুমার সেন

কি সাহিত্যে, কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্তকে সম্পূর্ণ বর্জন করা ইদানীন্তনকালের একটি বড় ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতীতের ইতিহাস অপরিজ্ঞাত থাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্রও অনুজ্জ্বলতায় পরিণত হয়ে পড়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাষায়—'ধ্বনি দ্বিগুণিত করার একরকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে, তাতে স্বাভাবিক গলার জোর না থাকলেও আওয়াজে আসর ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেইরকম উপায়েই অল্পজানাকে তুমুল ক'রে ঘোষণা করা এখন সহজ হয়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্‌কা হয়ে উঠল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল, সেইটের অভাব ঘ'টেছে।'—কথাটা প্রণিধানযোগ্য। এযুগে কর্মযোগী পণ্ডিতের বিরলতা স্বভাবতই লক্ষ্যণীয়। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় সাধক পণ্ডিত ব্যক্তির কথা স্বতস্ফূর্তভাবেই স্মরণে আসে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উল্লেখ ক'রে বলা যায় —'অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না ; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক্ করতে শেখেন নি ব'লেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধনা নেই এইটেই, আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই, অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।'

১৮৫৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর হরপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ পলাশী যুদ্ধের সমসাময়িককালে যশোহর হ'তে এসে নৈহাটিতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর আগমনবার্তা শুনে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৭ সালে মাণিক্যকে 'পরগণে হাবেলী সহর' নৈহাটিতে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর জমি দান করেছিলেন। মাণিক্যের পুত্র শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারও নব্যন্যায়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুত্র রামকমল ন্যায়রত্নও কমবড় পণ্ডিত ছিলেন না। হরপ্রসাদ এই রামকমলেরই পুত্র। নৈহাটিতে ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলে এই নৈয়ায়িক বংশ বাংলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ ক'রে দেন।

হরপ্রসাদ তাঁর পিতার পঞ্চম পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার কান্দী স্কুলে হেডপণ্ডিতের পদলাভ ক'রে ভ্রাতাদের সেইখানেই নিয়ে যান। এই স্কুলেই হরপ্রসাদের প্রথম এ-বি-সি পাঠ সুরু হয়। কিন্তু ১৮৬১ সালের ৪ঠা অক্টোবর পিতার মৃত্যু হ'লে ভ্রাতাদের নিয়ে নন্দকুমারকে পুনরায় নৈহাটিতে আসতে হয়। স্কুলে হরপ্রসাদের নাম ছিল শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য। একবার কঠিন অসুখ থেকে হরের অর্থাৎ শিবের প্রসাদে বেঁচে ওঠায় তাঁর নামকরণ হয় হরপ্রসাদ। বাল্যে ও কৈশোরে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তাঁকে বিদ্যালাভ ক'রতে হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠকালেই সমগ্র 'রঘুবংশ' তাঁর মুখস্ত হয়ে যায়। শিক্ষক রামনারায়ণ তর্করত্নের নিকট থেকে তিনি কাব্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করবার জ্ঞানলাভ করেন। শৈশব থেকেই তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছিলেন। ১৮৭৭ সালে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন।

বিদ্যালাভের পর সরকারী চাকরিতে প্রবেশ ক'রে ১৮৭৮ সালে তিনি কাটোয়ায় দেয়াসিন গ্রামের রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমন্তকুমারীকে বিয়ে করেন। হরপ্রসাদের পাঁচপুত্র ও তিন কন্যা। কিছুকাল হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে ট্রানস্লেষণ মাষ্টারের কাজ ক'রে সরকারী অনুবাদকের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানপদে নিযুক্ত হন। এ সময়ে জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড কফ্‌ট ছিলেন তাঁর উপরিওয়ালা। বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান হিসেবে হরপ্রসাদ যে যোগ্যতার পরিচয় দেন, তাতে স্যার ক্রফ্‌ট অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পরে ১৮৯৫ সালে তিনি

প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে এখানে সংস্কৃতে এম্.এ ক্লাস ছিল না। হরপ্রসাদের চেষ্টাতেই ১৮৯৬ সাল থেকে প্রেসিডেন্সীতে এই ক্লাসের প্রবর্তন হয়। ১৯০০ সালে তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আলেকজেণ্ডার পেডলারের সুপারিশে হরপ্রসাদ ৮ই ডিসেম্বর থেকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি একাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তাঁকে ছাড়া সরকারের চললোনা। তাঁরা হরপ্রসাদকে Bureau of Information for the benefit of civil officers in Bengal in History, Religion, Customs and Folklore of Bengal প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নিযুক্ত করলেন। এজন্য জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে মাসিক একশো টাকা বৃত্তি পেয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে তিন বছর (১৯২১-২৪) হরপ্রসাদ সেখানকার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকেই হরপ্রসাদের বাংলা রচনার সূত্রপাত ঘটে। বি. এ ক্লাসে উঠে ভারত মহিলা নামে একটি প্রবন্ধ রচনা ক'রে তিনি হোলকার পুরস্কার লাভ করেন। রচনাটি পরে ১২৮২ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই পুরস্কার সম্পর্কে হরপ্রসাদ 'নারায়ণ' পত্রিকায় বঙ্কিমপ্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে বলেন—'আঠার-শ' চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers" একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন: 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি. এ পাশ করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভালো ফল হইয়াছে। সুতরাং তখনকার বাঙ্গলার লেফটেনান্ট-গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেই দিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। স্যার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক্ দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।'

১২৮২ থেকে ১২৯০ সালের মধ্যে হরপ্রসাদের বহু রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন—'তিনি আমাকে লিখিতে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমাদের এরূপ টান যে, প্রতিমাসেই তাঁহাকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না। সেজন্য কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল হাত পাকাইব আর এক ইচ্ছা—বঙ্কিমবাবুকে খুশী করিব। তিনি যদি কখন কোন প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম।'

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হরপ্রসাদের কোন রচনাই গতানুগতিক ছিল না। স্বদেশ, সমাজ ও মাতৃভাষার উন্নতির জন্য তাঁর যেমন সেই বয়সেই চিন্তার অবধি ছিল না, তেমনি ভাষা দিয়ে সেই চিন্তাসূত্রকে গেঁথে তিনি এক অভিনব সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সে রচনাও তৎকালীন অন্যান্য বহু ব্যক্তির ন্যায় সংস্কৃতবহুল শব্দ-কণ্টকিত ছিল না, ছিল বহুলাংশেই সংস্কৃত শব্দমুক্ত বাংলা। সেই কালেই ১২৮৭-৮৮ সালে তিনি 'কলেজী শিক্ষা' ও 'বাংলা সাহিত্য'—'বর্তমান শতাব্দীর' ও 'বাংলা সাহিত্য' বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ক'রে একদিকে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক্ ও অপরদিকে শিক্ষার গলদ সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অন্যতম। তিনি বলেন: 'যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতিকঠিন অতিদূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি লিখিতে রোজ চারিঘণ্টা করিয়া অন্তত আট-দশ বৎসর লাগে। ভাষা-শিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিষ শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র, সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুওকি সে-ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি!

বাঙ্গলা হইলে এই কেতাবী জিনিষই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম।'

প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না যে, তাঁর নিজের অলক্ষ্যেই তাঁর ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছিল। তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য হিসেবে প্রকাশ করতে কোনরকম কুণ্ঠাবোধ করতেন না। উত্তরকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ বলেন: 'তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) জীবনে আমার friend, philosopher and guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পরে পরেই হরপ্রসাদ যে মনীষীর সংস্পর্শে এসে পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণাকার্যে ব্রতী হবার সুযোগ পান, তিনি প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। নেপাল থেকে আনীত সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধপুঁথির বিবরণমূলক তালিকা প্রস্তুতকালে রাজেন্দ্রলাল হরপ্রসাদকে গোপাল তাপনী উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করতে বলেন। একাজ হরপ্রসাদ যে কতখানি যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজেন্দ্রলাল লিখিত ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের ভূমিকায়। রাজেন্দ্রলাল লেখেন—

'It was originally intended that I should translate all the abstracts into English, but during a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babú Haraprasad Sastri, M.A., offered me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been attached to the names of those works in the table of contents. I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task; and he did his work to my entire satisfaction.'

১৮৮৫ সালে সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের যে অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাতেও হরপ্রসাদের অবদান কম ছিল না। গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র দত্ত লেখেন—এই প্রণালীতে অনুবাদ-কার্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তাপ্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃতভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য;—তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎকার্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরুকার্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।'

পুঁথির তালিকা প্রণয়ন-কার্যে হরপ্রসাদের প্রথম দীক্ষা রাজেন্দ্রলালের কাছেই। এশিয়াটিক সোসাইটির স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন তখন রাজেন্দ্রলাল। তাঁর সহায়তায় হরপ্রসাদ পরিষদের সাধারণ সদস্য ও ভাষাতত্ত্ব কমিটিরও সভ্য হন এবং বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার তত্ত্বাবধানকার্যে ডাঃ হর্ণলিকে তিনি সাহায্য করেন। ক্রমে হরপ্রসাদ সোসাইটির জয়েন্ট ফিলোলজিকাল সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়ে বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি এখানকার ফেলো, সভাপতি ও আজীবন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৯১ সালের ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্রলাল মারা যান। এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি সংগ্রহের ভার ছিল তাঁর উপর। তিনি যে Notices of Sanskrit Mss. প্রচার করেন, একাজেও হরপ্রসাদ তাঁর সহায়ক ছিলেন। রাজেন্দ্র-লালের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হরপ্রসাদ। পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে সর্বদাই ভারতের বিভিন্ন স্থান ও নেপাল পরিক্রমা করতে হয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য প্রাচ্যবিদ্ ম্যাকডোনেল সাহেব যখন অক্সফোর্ড থেকে এদেশে আসেন, তখন তাঁর সাহায্য-কল্পে সহযাত্রী হন হরপ্রসাদই। অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীকে পুঁথি সংগ্রহ করে পাঠাবার ব্যাপারে তাঁকে প্রশংসা ক'রে ১৯১০সালের ৫ই জানুয়ারী লর্ড কার্জন যে পত্র দেন, এখানে তা উল্লেখযোগ্য। লর্ড কার্জন লেখেন—

'I have heard from Oxford of the invaluable part that you have played in arranging for the purchase, the cataloguing and the despatch o England, of the wonderful collection of Sanskrit manuscripts, which Maharaja Sir Chandra Shumshere Jung of Nepal has so generously presented to the Bodleian Library; and I should like both as a former Viceroy and Chancellor of the University to send you a most sincere line

of thanks for the great service which your erudition, good will and indefatigable exertion have enabled you to render to us.'

এতদ্ব্যতীত রাজপুতানা ও গুজরাটের বিভিন্ন সহর জয়পুর, যোধপুর, বরোদা, বিকানীর, ভরতপুর, বুন্দি, উজ্জয়িনী, আজমীর প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরেও ভাট ও চারণ কবিদের পুঁথি সংগ্রহে তাঁর ধৈর্য ছিল অসীম। কিন্তু শুধু পুঁথি সংগ্রহ করেই যে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন, এমন নয়; তাঁর পরীক্ষিত নানা অঞ্চলের ও নেপাল দরবারের পুঁথিসমূহের বিবরণীসহ তালিকা প্রস্তুত-কার্যেও হরপ্রসাদ বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তিনি আহত হতেন—যখন একাজ থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হ'ত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়ে এরকম ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন:

My appointment to the Principalship of the Sanskrit College was rather unfortunate for my literary and scientific work.

তার ফলে কলেজের ছুটির দিনগুলিতে তাঁকে তাঁর অধীত কার্যে অধিকতর পরিশ্রম করতে হ'ত। ১৯০৮ সালে কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহে রক্ষিত পুঁথিসমূহের descriptive catalogue সংকলন-কার্যে বৃত হয়ে সোসাইটির কাউন্সিলের নিকট থেকে মাসিক দুইশত টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এসময়ে সোসাইটির সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা ছিল ১১,২৬৪ খানি। তার মধ্যে ৩১৫৬খানি রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক ও বাকী ৮১০৮ হরপ্রসাদ কর্তৃক ক্রীত। তিনি যে descriptive catalogue প্রণয়ন করেন, তা তাঁর জীবিতকালে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি; যে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়, তা হচ্ছে বৌদ্ধ ও বৈদিক সাহিত্য, স্মৃতি, ইতিবৃত্ত ও ভূগোল, পুরাণ এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার। বাকীর মধ্যে কাব্য, তন্ত্র, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য, জ্যোতিষ, দর্শন, জৈন-সাহিত্য বৈদ্যক ও বিবিধ। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডাঃ সুশীল কুমার দে বলেছেন: 'কেবল সংখ্যায় ও বিষয়-বৈচিত্র্যে নহে, বহু অজ্ঞাত ও দুর্লভ পুঁথির আবিষ্কারেও হরপ্রসাদের এই সংগ্রহ আজ পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ সংগ্রহের সমকক্ষ; এবং ইহাই হরপ্রসাদের পণ্ডিতোচিত জীবনের একটি বিরাট্ ও অবিনশ্বর কীর্তি। একটি জীবনের পক্ষে এই একটি বৃহৎ প্রচেষ্টাই যথেষ্ট। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলেন, 'He of all People, has been the real father of oriental Research in North India.'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও হরপ্রসাদ পুথি সংগ্রহ ও পুস্তক উপহার প্রদানের দিক থেকে স্মরণীয়। সংস্কৃত পুথির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রাচীন পুথি সংগ্রহ সম্পর্কেও তিনি বিশেষ ভাবে সচেতন হন। এ সম্পর্কে তিনি আক্ষেপে রসঙ্গে বলেন:

—'যখন প্রথম চারিদিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষায় যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণায় ছিল না। তার পর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য বাঙ্গালার অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষার তিন শত বৎসর পূর্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরও দুইচারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খ্রীষ্টাব্দের ৮০ কোঠায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া উহাতে নূতন বিষয় লেখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সেকালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা ত আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আসিয়া

দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; শুধু গানের বহি আর সঙ্কীর্তনের বহি নয়, অনেক জীবনচরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবনচরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ, বাঙ্গালায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে-সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলি ছাপা বহি, কলিকাতায়ই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন, "আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।" আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন,—"আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ম ১৮৯৪ সালে; এর আট বছর বাদে হরপ্রসাদ এই পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। পরিষদের ইতিহাসে তাঁর অসামান্য কর্মনৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধ'রে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ ক'রবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা ক'রেছিলেন, সাহিত্য পরিষদকে তারই পরিণতফল দিয়ে সতেজ ক'রে রেখেছিলেন।'

পরিষদের সভ্য হওয়া থেকে সুরু ক'রে ক্রমে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর পুথি সংগ্রহের ফলে এদেশে তখন মোটামুটি যে চতুর্বিধ উপকার সাধিত হয়, তা হ'চ্ছে—(ক) বাঙ্গলা দেশে যে বৌদ্ধধর্ম জীবিত আছে, তার প্রমাণ স্পষ্ট হ'ল, (খ) মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্বে যে বাংলা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তা জানা গেল, (গ) সেই বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু—দুই ধর্মেরই যে উন্নতি হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলল, এবং (ঘ) অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলার ইতিহাসে এই সমুদয় সাহিত্য যে অসাধারণ আলোকসম্পাত করে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটল। তবু দুঃখের সঙ্গেই হরপ্রসাদ উল্লেখ করেন: 'পুঁথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই। কতদিকে কত দেশে কত রকম পুঁথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। নিউটন বলিয়াছেন—আমারা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইতেছি মাত্র। আমরা এই পুঁথি-সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই... যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য একঘণ্টাকাল ইতিহাস আলোচনা করেন, অনেক নূতন নূতন পথ বাহির হইবে। নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্ববৃত্তান্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিব। যতদিন তাহা না বুঝিতে পারি, ততদিন আমাদের উন্নতির পথই দেখিতে পাইব না। আপনাকে জানিতে হইলে পুঁথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায়মনচিত্ত লাগাইয়া পুঁথি খুঁজিতে হইবে ও পুঁথি পড়িতে হইবে।'

তার 'বৌদ্ধগান ও দোহা', 'মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল', 'রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ,' 'হাজার বছরের পুরাণো বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রভৃতি মৌলিক ও সম্পাদিত রচনায় বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণের যে চর্যাপদগুলি স্থান পেয়েছে, তা কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় নয়, আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার আদিম রূপ। ভাষাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে হরপ্রসাদের সুচিন্তিত অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

—'অনেকের সংস্কার, বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠানদিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গালার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বলি। পাণিণির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম 'ছন্দস্'—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণো; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিণি কতদিনের লোক তাহা জানি না, তবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্পদিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেই তাঁহার চিতার ছাই কুড়াইয়া এক

পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্র ভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দু'রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেলদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মাগধীর ও ওড্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেকদিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা। ...ভাষাকে সোজাপথে চালানো উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যেভাবে বহুশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সেভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানাদেশ হইতে নানাভাব আসিয়া বাঙ্গলায় জুটিতেছে। যেসকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতনভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! ...ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না, ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিৎ; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভাবের, ভাষা অতলজলে ডুবিয়া যাইবে।'

১৯২১ সালে বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি 'অনারারি মেম্বর' পদে বরণ ক'রে হরপ্রসাদকে সম্মানিত করেন। ইতিপূর্বে তিনি 'Age of Consent Bill' সম্পর্কে যে Note দিয়েছিলেন, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে ১৮৯৮ সালে মহামহোপাধ্যায় উপাধি এবং ১৯১১ সালে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৯ সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁর এই মহাজীবনের অবসান ঘটে। প্রসঙ্গত; তাঁর গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা এখানে উল্লেখযোগ্য, যথা—ভারত মহিলা, বাল্মীকির জয়, সচিত্র রামায়ণ, মেঘদূত ব্যাখ্যা, কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে, প্রাচীন বাঙ্গলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম, বাঙ্গলা প্রথম ব্যাকরণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education, Discovery of Living Budhism in Bengal, Malavilkagnimitra, The Educative influence of Sanskrit, Bird'seye View of Sanskrit Literature, Magadhan Literature, Sanskrit Culture in Modern India প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গ্রন্থ ও বুলেটিন সম্পাদনা, বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা প্রণয়ন, সভাপতির অভিভাষণ রচনা প্রভৃতি কার্যেও হরপ্রসাদকে নানাভাবে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, অক্ষর পরিচয়, নাট্যকলা, ধর্মতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি এমন দিক নেই—যেদিকে তিনি লেখনী সঞ্চালন করে অসামান্য রচনা সৃষ্টি ক'রে না গেছেন।

বাঙালী জাতির প্রতি একটি আশীর্বাদপত্রে তাঁর যে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়, তা আজকের প্রতিটি বাঙালীকেই নূতন ক'রে স্মরণ ক'রে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। এই আশীর্বাদপত্রে হরপ্রসাদ বলেন—'যাহারা নিজের উন্নতি করিতে চায়, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা দেশের জন্য কাঁদে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা দেশের জন্য ভাবে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশকে সকলের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশের পুরাণো কথা লইয়া আলোচনা করে, তাহাদের আশীর্বাদ করি। যাহারা হিন্দুধর্মে শ্রদ্ধাবান, তাহাদের আশীর্বাদ করি। আর যাহারা ছেলেবেলা হইতে দল বাঁধিয়া দেশের কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগ করে, মনের সহিত তাহাদের আশীর্বাদ করি।'

একথা স্মরণে রাখলে বাঙালী আবার নতুন ক'রে বাঁচবার অবকাশ পাবে।

—০—
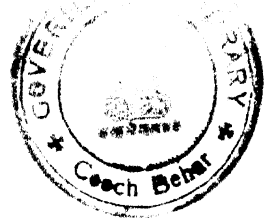
এই এরিষ্টোটল !

এরিষ্টোটল বিখ্যাত দার্শনিক, কিন্তু বিজ্ঞানী হিসাবেও তাঁর পরিচয়। বিজ্ঞানী বলতে অবশ্য তিনি বিজ্ঞানের একটিমাত্র বিষয়ে বিশিষ্ট হন নি। বৈজ্ঞানিক ভাবনা তখন সবে সুরু হয়েছে। গাছের ডালপালাগুলি তখনো পর্যন্ত আলাদা হয়ে ছড়াতে আরম্ভ করে নি, মূল কাণ্ডটিকে অবলম্বন ক'রেই সম্পূর্ণ রয়েছে। আজকাল যা রসায়ন, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি নামে আলাদা আলাদা হয়েছে, এরিষ্টোটল তাঁর প্রতিটি শাখাতেই বিচরণ করেছেন। এই জ্ঞানী পুরুষ তাঁর দার্শনিক ভাবনায় জগৎকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানী হিস'বে তাঁর যা বিবৃতি, প্রতিপদেই তা যাচাই ক'রে দেখতে হয়। অবশ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিটি তত্ত্ব মত সিদ্ধান্তই নূতন পরিস্থিতির আলোকে

এরিষ্টোটল। ইতালীয় ভাষায় অনূদিত এরিষ্টোটলের একটি বইয়ে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের ছবি। (বেটমান সংগ্রহশালা।)

বারবার পরীক্ষা ক'রে নেওয়াটাই সাধারণ বিধি, তবে এরিষ্টোটলের অনেক কথাই আজ ওলট্‌-পালট্‌ হয়ে গেছে। সে যুগের মানসিক আবহাওয়াই তার কারণ। বিজ্ঞানের সমস্ত কথাই পুরোপুরি ইন্দ্রিয়-নির্ভর, কিংবা যন্ত্র বা গাণিতিক যুক্তির সাহায্যে আরোপিত সত্যে নির্ভর। সে যুগের গ্রীক্ মানসিকতা এই মূল ভূমিকেই অস্বীকার করতে চেয়েছিল। পর্যবেক্ষণ করা তত্ত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অটুট নিয়মের খোঁজ পায়। ঈশ্বরের স্থান তবে কোথায়? এই দ্বন্দ্বে সক্রেটিস্‌ও বিব্রত হয়েছেন। বাইরের খোঁজ বন্ধ ক'রে তাঁরা মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান তাতে বিনষ্ট হয়েছে।

এরিষ্টোটলের বিজ্ঞানেও এই ত্রুটি। তবু আমরা তা সাগ্রহে পাঠ করি। কিছুটা সাবধান হওয়া চাই, আমাদের যুক্তিবোধকে যেন গুলিয়ে না ফেলে। একজন মহাজ্ঞানী দেড় হাজার বছর আগে যে-সব কথা ব্যক্ত করেছেন, তাতে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান-ধারণাগুলিই প্রখর, এবং পরিশাণিত হয়—আমাদের ভাবনাকে নূতন ভাবে দেখতে শিখি, নূতন রূপে গ্রহণ করি। পুরাণো পাঠের এই সার্থকতা। এরিষ্টোটলের মূল গ্রীক্ রচনার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক রিচার্ড হোপ। তা থেকে সামান্য কিছু আলোচনা আশা করি নিতান্ত নীরস মনে হবে না।

জীববিদ্যার চর্চায় এরিষ্টোটল উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদিও বাদ দেন নি। কিন্তু পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অন্য কথা। ঘটনার তাৎপর্য তিনি আমলে আনেন নি। দার্শনিক এরিষ্টোটল খুব সম্ভবত ঈশ্বরকে এড়িয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য খুঁজতে গিয়েছেন। তবে স্বর্গরাজ্যেও যে নিয়ম রয়েছে, এ কথা তিনি অস্বীকার করেন নি। যুক্তির অটুট জাল তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু ঘটনার সত্যের অভাবে বৈজ্ঞানিকতা রক্ষা পায় নি। সমস্তই আতসবাজীর মত প্রতিভার তাৎপর্যহীন প্রকাশে নিরর্থক হয়েছে। দু'-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। হালকা জিনিষের তুলনায় ভারী জিনিষ আগে মাটিতে পড়ে এ আমরা সবাই দেখেছি, কিন্তু এ যে আপাতমাত্র, এরিষ্টোটল তা বুঝতে চাইলেন না। তিনি যা তত্ত্ব গড়লেন তাতে মনে হয় শূন্যস্থান ভ্যাকমে জিনিষের গতি অনন্ত সীমায় দাঁড়াবে। এই অনন্ত যে সম্ভব নয় সে বিষয়েও তিনি সচেতন, তাই যুক্তি দেখানো হ'ল, শূন্য অর্থাৎ ভ্যাকম ব'লে নাকি কিছু নেই। এই অদ্ভুত যুক্তি পরে টেনে নেওয়া হয় পরমাণুর তত্ত্বে। পদার্থের মূলে পরমাণু রয়েছে, এ কথা যদি মেনে নিতে হয়, তবে এই পরমাণু শূন্যে গিয়েই থাকতে পারে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। নিরুপায় এরিষ্টোটল তাই সিদ্ধান্ত নিলেন, পরমাণু ব'লে কিছু নেই (যদিও আছে ব'লেই যেন তাঁর অস্পষ্ট বিশ্বাস)। আর এক উদাহরণ। ঐ পরমাণু তত্ত্বের সঙ্গেই তা জড়ানো। জিনিষের আয়তন কমে বা বাড়ে। এর ব্যাখ্যা হিসাবে একটা ধারণা ছিল, জিনিষের ভিতরকার পরমাণুগুলি ছাড়িয়ে পড়ছে তাই তা বাড়ছে। এরিষ্টোটল তা গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর মতে যে পরমাণু নাস্তি। জিনিষ বাড়ে, কারণ তা বাড়তে পারে। রোগা মানুষ যেমন ক'রে মোটা হয়, এ যেন অনেকটা তাই।

এরিষ্টোটলকে খাটো করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একজন অসামান্য পুরুষের 'পকেট এডিশন' যদি করতেই হয়, তার ত্রুটির দিক্‌টাই বড় হয়ে ওঠে না। বিজ্ঞান এক সময়ে কি অবস্থায় ছিল তার আমরা কিছু পরিচয় দিলাম। মানুষ সামান্য এই কয়েক শ' বছরে কত দূর এগিয়ে গেছে। সে যুগের একজন জ্ঞানীগুণী পুরুষের তুলনায় আজকের একজন ফেল-করা ছাত্রও বেশী জানে, এ কথায় বাহাদুরি কিছু নেই। জানা জিনিষটা একান্তভাবে আপেক্ষিক। পাঁচ শ' বছর পরের মানুষ বিংশ শতাব্দীকে কি চোখে দেখবে এটাই আসল বিচার নয়। আজকের একজন ছাত্র এ যুগের সমস্ত-কিছু নিয়েই একজন সাধারণ ছাত্র, এরিষ্টোটলও তেমনি তাঁর যুগের মানসিকতা ও ধারণাকে বহন করেই এরিষ্টোটল। জ্ঞানী এরিষ্টোটল—দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী এরিষ্টোটল।

বিংশ শতাব্দীর চোখে তিনিই আজ 'এই এরিষ্টোটল!'

শুকতারার খবর

শুকতারার কিছু খবর পাওয়া গেছে। পুবের আকাশে শুভ্র যে আলোর বিন্দু ভোরের বার্তা প্রচার করে, তা হ'ল এই শুকতারা বা শুক্রগ্রহ। জটিল যন্ত্রপাতি সমন্বিত মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বিতীয় মেরিনার শুকতারার কিছু খবর জানিয়েছে। পৃথিবী থেকে ছাড়ার ১০৯ দিন পরে এই বিচিত্র আকাশযানটি ১৮·০২ কোটি মাইল পথ চলার পর আলোকোজ্জ্বল শুক্রগ্রহের ২১,৫৯৪ মাইল উপর দিয়ে চ'লে যায়। রেডিও-সংকেতে যে বার্তা পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় শুক্র-গ্রহের চৌম্বকত্ব খুবই অল্প। পৃথিবীর যে চৌম্বকত্ব, তা নাকি তার ভিতরকার গলিত জিনিষগুলির আবর্তনে তৈরি হয়েছে। (এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।) শুক্রগ্রহে এই চুম্বকশক্তি খুবই ক্ষীণ, এ থেকে অনুমান হচ্ছে অক্ষের চারদিকে তার আবর্তনের বেগও খুব কম, পৃথিবীতে যা দিনে একবার শুক্রগ্রহে তা ২০০ দিনের কম হবে না।

দ্বিতীয় খবরটি হ'ল শুক্রের বহিরাকাশ সম্বন্ধে। ভূচুম্বকত্বের জন্য পৃথিবীর দিকে অনেক তেজসঞ্চারী কণার আকর্ষণ হয়। সেজন্য পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে কত বিচিত্র ব্যাপার। চৌম্বকত্ব দুর্বল হওয়ার জন্য শুক্রগ্রহের আকাশে এ ধরণের কণিকা খুবই কম। পৃথিবীর উপরে যেখানে সেকেণ্ডে কয়েক হাজার কণা ধরা পড়ে মেরিনারের সূক্ষ্ম যন্ত্রে, সেখানে শুক্রগ্রহের আকাশে সেকেণ্ডে একটির বেশি ধরা পড়ে নি।

তৃতীয় খবর, শুক্রের "ওজন" নিয়ে। আগে গণনা হয়েছিল শুক্রের ওজন পৃথিবীর ১·৮১৪৮ ভাগ। এবারে তা আরো সূক্ষ্মভাবে জানা গেল। ১·৮১৪৮ নয় পৃথিবীর ০·৮১৪৫ ভাগ (ভুলের পরিমাণ শতকরা ০·১৫ ভাগ হ'তে পারে)।

শুকতারা সম্বন্ধে এ কয়টি নূতন খবর। এতদিন শুকতারা দেখে রাত্রির শেষ এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, আজ তার গঠন এবং প্রকৃতি আমাদের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে! শুকতারা তবু আগেকার মত স্থির হয়ে জ্বলছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং : গবেষণা : পরিসংখ্যান

নামটা বড় হয়ে গেল। সামান্য একটা খবর দেব মাত্র। এই খবর আমেরিকার কোন ইনডেক্সি সোসাইটির প্রকাশিত ১৯৬২ সালের "ইঞ্জিনিয়ারিং ইনডেক্স" থেকে তোলা। খবরটি সংগ্রহের ব্যাপারে শিবপুর বি. ই. কলেজের একজন অধ্যাপকের (শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য) সহযোগিতা পেয়েছি।

জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অর্থানুকূল্যে দেশে আজ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-চর্চার মত ইঞ্জিনিয়ারিং-শাস্ত্রেও গবেষণা সুরু হয়েছে। এদিকে-ওদিকে কিছু কিছু ডক্টরেট পাওয়া লোক তৈরী হচ্ছেন। অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং যেহেতু প্রযুক্তিমূলক—বিজ্ঞানেরই এক ব্যবহারিক রূপ, তার গবেষণা সেজন্য আরো অধিকভাবে বাস্তব অবস্থার মুখাপেক্ষী। ইঞ্জিনিয়ার যা গবেষণা করবেন, মত তৈরী করবেন, কাজেই তার পরিচয়। বৈজ্ঞানিকদের মত তার দায় ও দায়িত্ব অপ্রত্যক্ষ নয়। সে বিচারে গৌরব করার মত বিশেষ কিছু এ পর্যন্ত আমরা পাই নি। কয়েকটি যুগ্ম বা সংকর ধাতু (ALLOY) ইঞ্জিনের 'হরি ট্রেন্‌স্‌মিশন' (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনার ইচ্ছা রইল), ইত্যাদি ছাড়া উল্লেখযোগ্য অবদান আমাদের ইঞ্জিনিয়ার-কুল এ পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি। তবে পরিকল্পনার আয়তনে বিষয়টি সবে সুরু হয়েছে। বাইরের চাকচিক্যের আড়ালে আমরা যদি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে প্রশ্রয় না দিই, নিরাশার কিছু নেই।

কিন্তু যেজন্য এই ভূমিকা। ছোট্ট একটি সংবাদ মাত্র। ১৯৬২ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য যত গবেষণামূলক প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাদের মোট সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। তার মধ্যে ভারতীয়দের রচনা শ' পাঁচেক মাত্র। অবশ্য পরিসংখ্যান যে খবর এনে দিচ্ছে, আমাদের অবস্থা তার থেকেও অনেক নিচুতে। ভারতীয়দের হাতে মৌলিক কাজ খুবই কম। এর মধ্যেও আনন্দ—ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীর রচনাই রয়েছে প্রায় ১৭০টি, শতকরা ত্রিশ ভাগ।

বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর

সুব্রহ্মণ্যম্ চন্দ্রশেখর এবার রয়েল সোসাইটির দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হলেন। গাণিতিক পদার্থবিদ্যা, বিশেষত চুম্বক ও চুম্বকহীন ক্ষেত্রে গ্যাসের গতি-সংক্রান্ত সমস্যায় তাঁর কাজ হাল বছরের রয়েল মেডেল পুরস্কার এনে দিয়েছে। অধ্যাপক চন্দ্রশেখর প্লাজমা ডাইনামিক্‌স্, ফ্লুইড মেকানিক্‌স্ এবং সৌর পদার্থবিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে পৃথিবীর একজন অগ্রণী বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন।

ভারতের সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও কৌতূহল তাঁর গবেষণার পরিধি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তবে মেডেল শিরোপা সম্মান সবাই বোঝে, গুণের স্বীকৃতিতে সবাই আনন্দিত হয়, একটি গৌরব দেশের মানুষের মধ্যে লক্ষ কোটি হয়ে আয়নায় আলোর প্রতিফলনেরই মতই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর জাতে ভারতীয় হ'লেও তাঁর এই সম্মানে আমাদের জাতীয়তা গর্বিত হয় না! ভারত তাঁর জন্মভূমি,

ভারত তাঁকে ধারণ করেছে, কিন্তু বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর যা পরিচয় তা অন্য দেশকে অবলম্বন ক'রে। কেম্ব্রিজে তাঁর শিক্ষা, আমেরিকা তাঁর কর্মভূমি। মাতৃভূমি নয়, বিজাতীয় এক দেশ তাঁকে বিজ্ঞানী করেছে। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর সম্মানে বিদেশী বিজাতি আনন্দোৎসব করে, আমাদের রত্নহীনা দীনা জননীর গৌরব তাতে বাড়ে না। এভাবে শুধু এক "চন্দ্র" নয়, শত শত কৃতী প্রবাসী সন্তান দেশকে দীপ্তিহীন করেছে। স্বদেশী যুগে স্বদেশী কবি আক্ষেপ করেছিলেন নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে হয়েছে ব'লে, আর আজ স্বাধীন ভারতে নিজ বাস ছেড়ে পরবাসে প্রবাসী সেজেছেন শত সহস্র ভারতীয় বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ্। অথচ দেশের পুনর্গঠনে জাতি আজ সবচেয়ে বেশি ক'রে তাঁদের কামনা করে।

অধ্যাপক সুব্রহ্মণ্যম্ চন্দ্রশেখর। এবারে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির বিশিষ্ট মেডেল পুরস্কার পেলেন।

চন্দ্রশেখরের প্রসঙ্গে যে কথা উঠল বিষয়বস্তু হিসাবে তা খুবই দুরূহ জটিল। মূল কয়েকটি সূত্রের এখানে আলোচনা চলতে পারে। দেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব, বিদেশে যাঁরা সব দিক্ থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেশে তাঁরা কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন? কিন্তু এখানে শুধু আর্থিক ক্ষতির কথা আসে না। বিজ্ঞানী—যিনি যন্ত্রকর্মী এবং কাজের আবহাওয়া সমস্ত নিয়েই যিনি বিজ্ঞানী, এদেশে এসে অপটু হয়ে পড়েন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশে ফিরে না আসার একটি কারণ যে দেশে উপযুক্ত অবস্থায় কাজ করার সুযোগের অভাব। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরও একথা সেদিন স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তবে একথার পরেও কথা থাকে, এই অবস্থা তৈরি করবেন কারা? জাতীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ এবং মূল একটি কর্মনীতি তুলে ধরতে পারেন মাত্র। আসল যা কাজ বিজ্ঞানীদের তা ক'রে নিতে হবে। দুনিয়ার উন্নতিশীল দেশগুলির বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া এভাবেই তৈরি হয়েছে। অল্প নিয়েই অনেক বড় জিনিষের শুরু হয়। আবার বড় থেকেও অনেক কিছু শূন্যে মিলিয়ে যায়। বাইরের বাধা ছাড়াও ভিতরেও একটা বাধা থাকে, এই বাধা যদি কাটিয়ে তুলতে পারি, বাইরের অনেক সমস্যারই সমাধান হবে। তবে সংগঠন নিয়ে যা কাজ, সব বিজ্ঞানী তাতে জড়িত হবেন না, চন্দ্রশেখরের মত সকল বিজ্ঞানী তো নিশ্চয়ই নয়। প্রত্যেক সমস্যারই দুটো দিক্ থাকে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ফিরে আসা উচিত। উচিত তাঁদের দেশের পরিবেশেই কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা। কিন্তু বিজ্ঞান আজ যে পর্য্যায়ে উন্নত হয়েছে তাতে প্রতিটি বিষয়েই গবেষণার ক্ষেত্র প্রসার করা সম্ভব হবে না। যতটুকু পারি তা নিয়েই আজ শুরু করলাম, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য যেন লক্ষ্য স্থির থাকে। বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ইয়ার্কাস্ মানমন্দিরে তাঁর গবেষণায় নিরত থাকুন, আমরা তাঁকে দেশে টেনে এনে অকেজো ক'রে তুলব না। বিজ্ঞানের খাতিরেই আমাদের এই ত্যাগ স্বীকার। কিন্তু সেই সঙ্গে আর এক অঙ্গীকার চাই—দেশের মাটিতেই নূতন চন্দ্রশেখর তৈরি করতে হবে। যিনি দেশের মাটিতে জন্মে দেশের মাটিতেই বিজ্ঞানী তৈরি হবেন। এক চন্দ্রশেখরের অভাব সেদিন যেন শত শত চন্দ্রশেখর পূর্ণ ক'রে তুলতে পারে। দেশ-জননীর সে হবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

প্রদর্শনী

পরমাণু লয় পাচ্ছে ঠুনকো মাটির পাত্রের মত। আঘাত এসে লাগল তো টুকরো হয়ে ছিটকিয়ে পড়ল। জলের ফোঁটার মত বললে আরো ভাল হয়। অসীম অনন্ত সমুদ্র ফোঁটা ফোঁটা জলকণাতেই তৈরি। পরমাণুর উপাদানে গড়েই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই পরমাণু যে আবার ভাঙা যায় একথা মানুষ এই সেদিনও জানত না। পরমাণুকে ভাঙতে শিখেই মানুষ শিখেছে 'চিচিং ফাঁক'। পরমাণুর দুয়ার আজ খোলা, যা চাও সংগ্রহ ক'রে নাও। অসীম অনন্ত জমা হয়ে রয়েছে, ধ্বংস করতে চাও সে ভয়ঙ্কর, সৃষ্টির কাজে চাও সে শান্ত শিব! শক্তির এই দুটি মেরু—'সুমেরু' আর 'কুমেরু'। পরমাণুকে ভেঙেই তা হচ্ছে। এই ভাঙা আবার যেমন-তেমন নয়। পরমাণুর ভাঙার নাম তাই ফিসন। কাচের গ্লাস ভাঙার মত পরমাণু ভাঙে না। ইউরেনিয়াম এদিক্ দিয়ে খুব বিশিষ্ট। ইউরেনিয়াম ধাতুর একটা টুকরো জোগাড় করা হ'ল। পরমাণুর কোন কণিকা তাতে এসে যদি লাগে। এ যেন বুলেট। এই বুলেটের নাম নিউট্রন। পরমাণুর পেটেই এই বুলেট বা নিউট্রন থাকে। নিউট্রনের আঘাতে ভিতরকার নিউট্রন পেলো ছাড়া। এই নিউট্রন আরো কয়েকটা পরমাণুর "ভুঁড়ি" দিল ফাঁসিয়ে। নিউট্রনের সংখ্যা এভাবে ক্রমশ বেড়ে চলছে। সে এক বিরাট হৈ-রৈ ব্যাপার। কালীপটকা, ভুঁইপটকা বাজীর তোড়াতে যেন পড়লো উটকো পটকা। পট্-পট্-পট্ তোড় শুরু হ'ল, নিমেষে সমস্ত বাজী নিশ্চিহ্ন। ইউরেনিয়ামের ভিতরেও চলে এমনি-ধারা ব্যাপার। পরমাণু যেন শেকলে বাঁধা থেকে একে অপরকে আক্রমণ করে। সাধারণত যা হয় না তা কল্পনা করা কঠিন। পরমাণু ভাঙনের যা ভিতরকার দৃশ্য তা নিয়ে অনেক ছবি বেরিয়েছে।

শিল্প প্রদর্শনীতে আলোর মালা সাজিয়ে তার একটা রূপ দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞান যিনি পড়েন নি, পরমাণুর ভঙ্গুর রূপটি যাঁর হৃদয়ঙ্গম

পরমা ণুর বিস্ফোরণ।
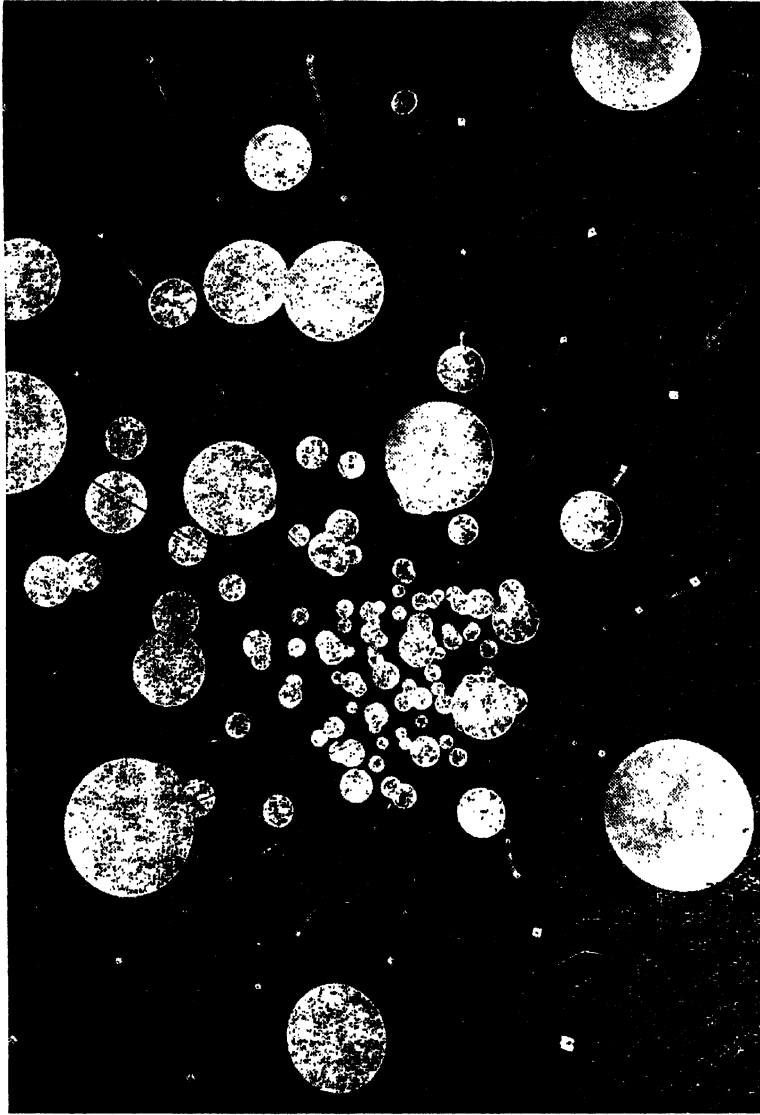
আসলে আলোকসজ্জা। লণ্ডনের এক কার্ণিচারের প্রদর্শনীতে আলোর এই অদ্ভুত রূপ দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। আলোর আবরণে পরমাণু বিস্ফোরণেরই এক চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।
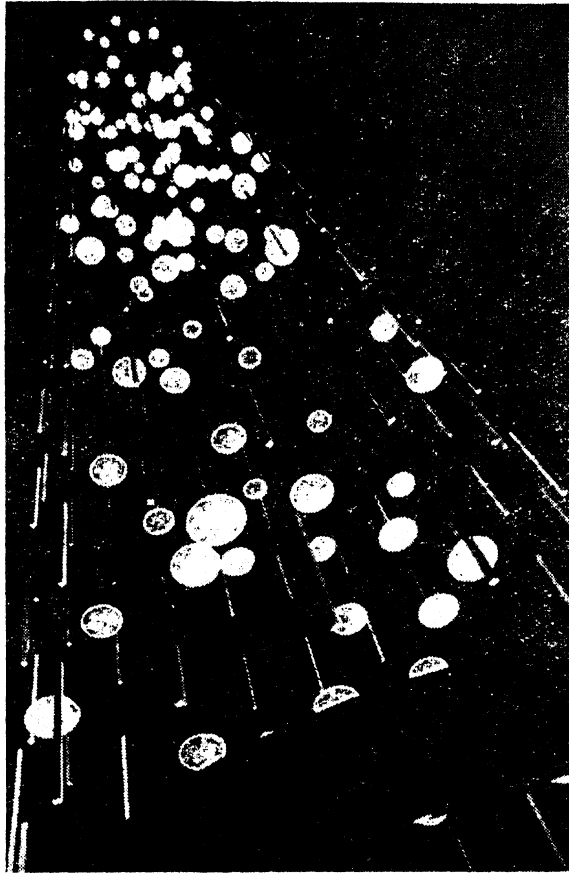
আলোর আর এক রূপ। পরমাণুর ভিতরে সূক্ষ্ম কণাগুলি একে অপরকে বিস্ফোরণের দিকে নিয়ে চলে। আলোর সাহায্যে সে রূপটিই যেন ফুটে উঠেছে। অন্ধকার পটভূমিতে আলোর এই সমাহার শৃঙ্খলাগত বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর রূপটিই সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে।

নয় তাঁর কাছেও এবার বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পরমাণুর ভিতরকার রূপ এখানে বাহির হয়ে ধরা পড়েছে। চিত্র এক, বিস্ফোরণ। চিত্র দুই, এই বিস্ফোরণ অখণ্ড ধারাবাহিকতায় কেমন এগিয়ে চলছে।

এ. কে. ডি.

স্যার হেনরী ডেল কে ছিলেন?

এই ব্রিটিশ চিকিৎসাব্যবসায়ীর নাম আপনারা সকলে হয়ত শোনেননি কিন্তু ইংরেজী এ্যালার্জি (allergy) কথাটা অর্থ প্রায় সবাই জানেন। এই এ্যালার্জি জিনিষটা মানুষের কেন হয়, কিসের থেকে হয়, স্যার হেনরী সেটা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম আমাদের গোচরে আনেন যে, আমাদের শরীরের হিষ্টামিন (histamine) নামক রাসায়নিক পদার্থটি সমস্ত এ্যালার্জি-ঘটিত গোলযোগের মূলে।

আমাদের শরীরের পেশীগুলিতে কোথাও কোন গলদ থাকার ফলে আমাদের শরীরে হিষ্টামিন নামক পদার্থটি, আমরা ব্যক্তিবিশেষে কোন কোন বিশেষ বস্তুর সংস্পর্শে এলে, একটু বেশী পরিমাণে

উপজাত হয়। তখন এই অতিরিক্ত হিষ্টামিন হাঁচি, কাশি, হাঁপ ধরা ইত্যাদির রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

তাঁর এই আবিষ্ক্রিয়ার জন্যে স্যার হেনরী ডেলকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

গভীর জলের মাছ

যখন বলেন 'গভীর জলের মাছ', কতটা গভীরতার কথা আপনি ভাবেন? বিশ হাত? ত্রিশ হাত? চল্লিশ হাত?

সমুদ্রের গভীরতা কোথাও কোথাও সাত মাইল পর্য্যন্ত হয়, এবং দেখা গেছে, সেই সাত মাইল গভীর জায়গাতেও মাছেরা পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে বহাল তবিয়তে বাস করে।

শিশুদের কি কাঁদতে দেওয়া উচিত?

অনেককে বলতে শোনা যায়; শিশুদের কাঁদতে দেওয়া ভাল, তাতে তাদের স্বরযন্ত্রের উপকার হয়, ফুসফুস সবল হয়। ভুল কথা। অনেকের ধারণা, শিশুদের কান্না নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে তারা প্রশ্রয় পায়, এবং কাঁদলেই যা চাই তা পাব মনে ক'রে তারা কাঁদুনে স্বভাবের হয়ে ওঠে। ভুল ধারণা। আজকালকার বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই মত প্রচার করছেন যে, কাঁদতে দিলে শিশুদের কোনো দিক্ দিয়ে কোন উপকারই করা হয় না, এবং যেটা খুব বেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা নয়, তাদের দিকে একটু বেশী নজর দিলে তারা কাঁদে কম, তাদের কাঁদুনে স্বভাবের হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও অনেক ক'মে যায়।

আপনার হয়ত অনেক সময় মনে হয়, আপনার শিশুটি অকারণেই কাঁদছে, কিংবা কারণটা আপনাকে ঘুমোতে না দেওয়া বা আপনাকে বিরক্ত করা। কিন্তু তা নয়। তার কচি গালে তখন চড় না মেরে, সে কেন কাঁদছে একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে সেটা বুঝবার চেষ্টা করবেন এবং কারণটা দূর করবেন। তাতে শিশুটি এবং আপনি দুজনেই লাভবান্ হবেন।

সাদা ভালুকদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

মেরুপ্রদেশের সাদা ভালুকরা কি ভাল সাঁতারু? সে-বিচার আপনারাই করুন। ঠিক একটানা না হলেও ভাসমান বরফের একটা চাই থেকে আর একটাতে, তারপর আর-একটাতে, এই রকম ক'রে তাদের অবিশ্রান্ত গতিতে ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে যেতে দেখা গেছে। বরফের উপরে ঘণ্টায় পচিশ মাইল পর্য্যন্ত হতে দেখা গেছে তাদের গতিবেগ। আর তাদের ঘ্রাণশক্তির কথা যদি শোনেন, ত বাতাস অনুকূলে বইলে তাদের প্রিয় খাদ্য সীল মাছের চর্ব্বির গন্ধ কুড়ি মাইল দূর থেকে তারা টের পায়।

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই অক্টোবর ইটালীতে কি ঘটেছিল?

কিছুই ঘটেনি। একেবারে কোন কিছুই ঘটেনি। তার কারণ, সে বৎসর ইটালীতে ৫ই অক্টোবর ব'লে কোন তারিখ ছিলই না। সে সময়কার পোপ, পোপ গ্রেগরী, বিধান দিয়েছিলেন যে, তারিখটাকে ৫ই অক্টোবর বলা চলবে না, বলতে হবে ১৫ই অক্টোবর। ইটালীর সঙ্গে সঙ্গে স্পেন, ফ্রান্স, পোর্টুগাল ও পোল্যাণ্ড পোপের এই বিধান শিরোধার্য্য ক'রে নেয় এবং তারপর ক্রমশঃ সমস্ত ইউরোপে এই গ্রেগরীয় পঞ্জিকা মতে সাল তারিখের হিসাব চলতে থাকে, যা এখনও চলছে। এই পঞ্জিকা মতে গণনা ইংলণ্ডে সুরু হয় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে, আর রুশিয়ায় এই সেদিন, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। আমাদের দেশের পোপরা পঞ্জিকা ত বদলেছেনই,—অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও বেতার বার্ত্তায় তারিখ শুনে বয়সটা হঠাৎ এত দ্রুতগতিতে কি ক'রে বাড়ছে ভেবে চমকে উঠি;—এছাড়া আরও অনেক কিছুই তাঁরা বদলেছেন এবং প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছেন। দশমিকের প্রতি তাঁদের অনুরাগ দেখে ভয় হয়, কবে হয়ত শুনব, সপ্তকাণ্ড রামায়ণটাকে দশ খণ্ডে ভাগ করতে হবে, অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতকে বিশ পর্ব্বে ঢেলে সাজতে হবে, কুড়ি তায়ে দিতে হবে, সপ্তাহ দশাহ হবে, বৎসর হবে দশ মাসে, ঋতুর সংখ্যা কমিয়ে করতে হবে পাঁচটি নয় বাড়িয়ে করতে হবে দশটি, অষ্টদিক্‌পালকে দুটি পার্টনার নিতে হবে, একেবারে যাকে বলে দশা দশা!

পোপ গ্রেগরীর সাহস এঁদের সাহসের দশভাগের এক ভাগও ছিল না তা মানতেই হবে।

স. চ.

—০—

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমান পরিস্থিতি

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ছাত্র সমাজের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা সহজেই স্বীকার করিবেন যে, আজিকার ছাত্র সমাজে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভুত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অনেকদিন হইতেই শিক্ষকগণ তাহা উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন এবং দেখিতেছেন যে, তাঁহাদের হিতোপদেশের মূল্য ক্ষয়মান হইয়া শূন্যতায় পর্যবসিত হইতেছে। এদিকে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সকল ত্রুটির বোঝা শিক্ষকের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে নিশ্চিন্ততা লাভ করিবার পথ খুঁজিতেছেন। ক্রমে অবস্থা অধিকতর অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং কিছুদিন পূর্ব্বে সমাজ দেহের বিস্ফোটকের মত, ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা স্থানে স্থানে ব্যাপক ও বিসদৃশ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং রাষ্ট্র কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে তাহা দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে তাঁহাদের দণ্ডনীতি ফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু এই উপায়ে ফল স্থায়ী হইবে এবং ছাত্র সমাজের কালিমা এত সহজেই মুছিয়া যাইবে ইহা অবিশ্বাস্য। শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্র সমাজের এই ব্যাধির অভিব্যক্তি যেরূপ বেদনা-দায়ক, তাহার যে চিকিৎসা হইয়া গিয়াছে তাহাও অনুরূপ বেদনা-দায়ক।

ভবিষ্যতে জাতিকে যাহারা কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিবে, যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা জাতির বাহ্যিক ও মানসিক সমৃদ্ধি রচনা করিবে, তাহারা এই আত্মঘাতী বিমূঢ়তায় নিমগ্ন হইলে, জাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে ম্লান হইয়া রহিবে। সুতরাং এই সমস্যাকে বৃহত্তর সমস্যাগুলির অন্যতম বলিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন; ইহার মূল কারণগুলি অকপট ও অপক্ষপাত ভাবে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধির পথের কণ্টকগুলি নির্ম্মূল করা প্রয়োজন।

গৃহে অভিভাবক ও শিক্ষালয়ে শিক্ষক ছাত্রের মনের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক। কারণ আর কাহারও সংস্পর্শ তাহার পক্ষে প্রতিনিয়তের নহে, আর কাহারও স্নেহদৃষ্টি প্রতি-নিয়ত তাহাকে অনুসরণ করে না। হইতে পারে শিক্ষক সেরূপ উপযুক্ত নহেন অথবা অভিভাবক তত দূরদর্শী নহেন। তাহা হইলে শিক্ষক ও অভিভাবকের গুণানুরূপই ছাত্রের মানসপট অঙ্কিত হইবে। ক্ষণিকের সংস্পর্শ দ্বারা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তি গঠন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। নিত্য নহে, নৈমিত্তিক ভাবে ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষক অথবা অভিভাবকের প্রতি শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ করিয়া দেওয়া সম্ভব; কিন্তু এইরূপে ছাত্রদের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব নহে। তাহা করিতে হইলে স্থায়ী ভাবে শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিতে হয়।

গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় শিক্ষক ও অভি-ভাবকের প্রতি, ছাত্রের শ্রদ্ধার মূলোচ্ছেদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। জননেতাগণ ছাত্রদিগকে শিক্ষালয় ত্যাগ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অহ্বান জানাইতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, শিক্ষক ও অভিভাবক স্বার্থান্ধ এবং দাস মনোভাব সম্পন্ন; তাই শিক্ষালয় ত্যাগ করিয়া দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে বাধা দিতেছেন। পূর্ব্বতন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে দেশ ব্যাপিয়া দেশপ্রেমের বন্যা বহিতেছিল। তাহার উপর মহাত্মা গান্ধীর বিরাট্ ব্যক্তিত্ব এই নূতন আহ্বানের পশ্চাতে ছিল। সুতরাং ছাত্রদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল। অভিভাবক ও শিক্ষক ব্যথিত চিত্তে উপলব্ধি করিলেন, ছাত্রগণ আর পূর্ব্বের মত তাঁহাদের অনুগত নহে। দেশবাসীর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র সক্রিয় ভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু ইহার মূল নীতিগুলির প্রতি অধিকাংশের পূর্ণ সমর্থন ছিল। দেশবাসীর ঐক্য মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ-গণ বিচলিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ছাত্র-আন্দোলন—তাহা জনসাধারণের চক্ষে যতই চমকপ্রদ হউক—ইংরাজদিগকে কতটুকু বিচলিত করিয়াছিল তাহা বলা যায় না। অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য ছাত্রদিগের পাঠ-বিরতির প্রয়োজন ছিল কি না, শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রতি ছাত্রের মন বিরূপ করিয়া দিবার প্রয়োজন ছিল কি না, তাহা বিচার সাপেক্ষ। আমাদের জাতীয় জীবনের এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। এখন এই অতীতের সমালোচনা দূষণীয় নহে। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ ব্যতীত কেবল অসহযোগ আন্দোলন দ্বারাই যে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিতাম ইহা স্থির করিয়া বলা যায় না। ঘটনার সমাবেশের উপরই যদি সাফল্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া

থাকে, তবে ছাত্রদিগের প্রতি আহ্বান যে সময়ে ঘোষিত হইয়াছিল তাহা কি সময়োচিত ছিল?

স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে, অল্পক্ষতি স্বীকার করিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত। ধরিয়া লওয়া যাউক, তখন ছাত্রের মন শিক্ষকের প্রতি বিমুখ করিয়া দিবার একান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর? স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্রদিগকে তাঁহাদের প্রভাব হইতে মুক্তি দেন নাই। তাহাদিগকে শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবার জন্য, বিপথ হইতে সুপথে ফিরিয়া আসিবার জন্য, প্রচার করা দূরে থাকুক বরং আপনাদের কুৎসিত দ্বন্দ্ব ছাত্রসমাজে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ, আমাদিগের জন-নেতাদিগের মধ্যে প্রভাবশালী অনেকেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে অথবা বাহিরে, সাহিত্য, নীতি, সমাজ কোন কিছু লইয়া গভীর চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহারা কি সত্যই শিক্ষার প্রয়োজন আন্তরিক ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন? তাঁহাদিগের নানাবিধ প্রচারের মধ্যে, তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে, শিক্ষা-সংক্রান্ত উক্তি বা প্রয়াস অল্পই দেখা যায়। এদিকে, ছাত্রগণ আজ শিক্ষকের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকেই গুরুর আসনে সমাসীন করিয়াছে। তাঁহাদের বক্তৃতা-ভঙ্গি তাহারা নকল করিয়া থাকে, অর্থ ও যশ লাভ করিবার জন্য তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়, তাঁহাদের পদ্ধতিই মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করে ও শিক্ষা করে। 'কলেজ ইউনিয়ন' সমূহে তাঁহাদের প্রক্রিয়ারই ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। কষ্টসাধ্য উপায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য আহরণ করিবার প্রয়োজন তাহারা বোধ করে না; অল্পায়াসে 'নেতা' হইয়া তাহারা অর্থ ও যশের অধিকারী হইতে চাহে। আজ যদি ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য তাহাদের মানস গুরুজন-নেতাগণ দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না।

শিক্ষকের মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে শিক্ষার মর্য্যাদার উপর নির্ভর করে। যেখানে শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবহারিক উপযোগিতা অধিক, সেখানে শিক্ষক উপযুক্ত সম্মান পাইয়া থাকেন, ছাত্রগণ উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার উপদেশের অপেক্ষায় থাকে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পূর্ব্বকালের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ প্রকারান্তরে অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু যেখানে শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ কম, সেখানে এরূপ হয় না। সাধারণ কলেজগুলিতে স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরে, বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে যে শিক্ষা পরিবেশিত হয়, তাহার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্র এখনও সঙ্কীর্ণ; এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার সামঞ্জস্যের কথা এখনও বিবেচিত হয় নাই। তাই অনেক সময় দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক হইয়া আইন ব্যবসার জন্য প্রস্তুত হইতেছে অথবা কারণিক (clerk) হইয়া চিঠি, রিপোর্ট প্রভৃতির মুসাবিদা করিতেছে। শিক্ষার এই অপচয় আমাদের দেশে যত বেশী, উন্নততর দেশে তত নহে। উন্নততর একটি দেশে দেখিয়াছি, ছাত্রেরা আগ্রহের সহিত অধ্যাপনাকালে মূল সূত্রগুলি লিখিয়া লইতেছে এবং অনুশীলন শ্রেণীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সমাধান সযত্নে রক্ষা করিতেছে। এই উভয় সংগ্রহ কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নহে; পরবর্ত্তী ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের জন্যও বটে। আমাদের দেশের ছাত্রেরা এই দুই উদ্দেশ্যের কোনটির জন্যই অধ্যাপনার উপর নির্ভর করে না। কারণ প্রথমতঃ, আমাদের দেশের পরীক্ষা অধ্যাপনার অনুযায়ী নহে; পরীক্ষা পাশ করিতে হইলে অধ্যাপনার সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা নির্ব্বাচিত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান স্মরণ করিয়া রাখা কম শ্রমসাপেক্ষ ও অধিকতর কার্য্যকরী। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারিক জীবনেও কলেজীয় শিক্ষার প্রয়োজন প্রত্যক্ষ নহে, কারণ—ব্যবহারিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচিত হয় নাই। এই জন্যই আমাদিগের ছাত্রদিগের জ্ঞান সাধারণ্যে অবজ্ঞাত; এই জন্যই সকল ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই শিক্ষানবিশীর (Apprenticeship) জন্য পুনরায় তাহাদিগকে অনেক সময়ক্ষেপ করিতে হয়।

শিক্ষার এই ব্যর্থতার জন্য অনেকে শিক্ষককেই দায়ী মনে করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, শিক্ষকের কর্ম্মনিষ্ঠা, নৈতিক মান ও পাণ্ডিত্য সকলই হ্রাস পাইয়াছে। আংশিক রূপে ইহা সত্য হইতে পারে; হইলেও, তাহা কার্য্যকারণের অমোঘ নিয়মেরই ক্রিয়া। তথাপি শিক্ষকের ভূমিকা প্রত্যক্ষ, সুতরাং অবশ্যই সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু শিক্ষালয় পরিচালকগণের পরোক্ষ ভূমিকা বিস্মৃত হইলে বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুস্পষ্ট পরিচয় মিলিবে না। আমাদের শিক্ষালয় পরিচালকগণ কেবলমাত্র শিক্ষা-প্রীতি দ্বারাই উদ্বুদ্ধ নহেন; শিক্ষার পরিপন্থী অনেক মনোবৃত্তিই তাঁহাদিগকে চালনা করিয়া থাকে। অনেক সময় তাঁহাদের স্বকীয় শিক্ষা উচ্চমানের নহে, অনেক সময় শিক্ষাক্ষেত্রের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বতন সম্বন্ধ সক্রিয় বা দীর্ঘস্থায়ী নহে। তাঁহারা যখন শিক্ষক নির্ব্বাচন করেন এবং তাঁহার

কর্ম্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন কি কেবল শিক্ষার উৎকর্ষের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন? প্রয়োজন মনে করিলে তাঁহারা শিক্ষকের স্বচ্ছন্দপ্রয়াস বাধা-সঙ্কুল করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষালয়ের অভ্যন্তরে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। সুতরাং শিক্ষকতায় আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া, শিক্ষণের পরিবর্ত্তে নানাজনের তোষণ শিক্ষকের কর্ম্মসূচীর প্রধান বিষয় হইয়া উঠে। অর্থের পরিমাণের সহিত তুলনা করিয়া শিক্ষা পরিবেশন করা শিক্ষকের ধর্ম্ম ছিল না। কিন্তু পুরাতন নীতি তাঁহার অন্নসংস্থান ও সামাজিক মর্য্যাদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অধোগামী করিয়াছে। এখন তিনি শিক্ষক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 'ইউনিয়ন' গঠন করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ এতদিনে তাঁহাদের উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কাল-প্রবাহ শিক্ষকের মহান্ আদর্শ পশ্চাতে ফলিয়া অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

স্মৃতিচারণ—দ্বিতীয় খণ্ড, দিলীপকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ ; ১৮৮৪ শকাব্দ ; পৃঃ ৩০৪। মূল্য সাড়ে ছয় টাকা।

ঘটন-অঘটন-বহুল দিলীপ রায়-জীবনের স্মৃতিচারণ প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠকের গভীর মনোনিবেশ দাবি করে। স্মৃতিচারণের প্রথম খণ্ড প্রবাসীতে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সে আলোচনায় আমি আহা-মরি সুখ্যাতি না ক'রে যতটা সম্ভব নিরুচ্ছ্বাস বাস্তবনিষ্ঠ হ'তে চেষ্টা করেছিলাম। বর্তমান খণ্ডের আলোচনা করতে গিয়ে সে মনোভাবই রাখতে চাই। কিন্তু ইতিমধ্যে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছে, এবং এই অসামান্য মানুষটিকে আমি কিঞ্চিৎ জানতে ও বুঝতে পেরেছি। বাল্যকাল থেকে যে অতৃপ্ত মহতী আকাঙ্ক্ষা দিলীপকুমারকে জীবনের পথে যাযাবর ক'রে রেখেছে সে আকাঙ্ক্ষায় পাহাড় টলে, কুঁড়ি ফুটে ফুল হয়, অঙ্কুর বীজ ; সে তৃষ্ণা তিনি নিবৃত্ত করেছেন ঈশ্বর-চিন্তায়, ধর্মচর্চায়। কিন্তু এখনও তাঁর পূর্ণ নিবৃত্তি হয় নি, তাই এখনও তিনি সর্বদিকে সমান সজাগ, এখনও সাহিত্য পড়েন ও লিখেন, গান গান, রসিকতায় উচ্ছল হয়ে উঠেন, সবাইকে সমাদরে ভালবাসেন। এখনও তাঁর মন নরম, সেণ্টিমেণ্টাল ; নিন্দায় ব্যথা পান, প্রশংসায় "উজিয়ে" উঠেন ; কোনও কিছু ভাল লাগলে সুখ্যাতিতে বহুমুখ হয়ে যান। এককথায় সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছেও দিলীপকুমার সজীব, সতেজ, সস্মিত, সানন্দ। তাঁর পরিণত জীবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দ সহজে অন্য হৃদয় স্পর্শ করে।

বর্তমান খণ্ডে দিলীপকুমার স্মৃতিচারণ করেছেন নিজের জীবনের নয়, কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির—যাঁদের তিনি নিকট থেকে দেখেছেন, জেনেছেন, যাঁদের প্রভাব পড়েছে তাঁর বহমান জীবনে। এঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, গোপীনাথ কবিরাজ, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, গুরুদাস ব্রহ্মচারী, কালীপদ গুহরায় এবং এস, ডোরাস্বামী।

এঁদের কথা লিখিতে গিয়ে দিলীপকুমার যে অনুভূতিশীল মনের, বিনীত শ্রদ্ধার ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্যচর্চায় বাংলা দেশে সচরাচর তাঁর অভাব লক্ষিত হয়। গত দশ-পনের বছরে বাংলা দেশে আত্মস্মৃতি যা রচিত হয়েছে তাতে পীড়াদায়ক অহমিকার দৌরাত্ম্য দেখা গেছে কম নয়। কিন্তু এই "স্মৃতিচারণে" দিলীপকুমার প্রায় অবলুপ্ত, এখানে তিনি অন্য ব্যক্তিদের মহিমান্বিত জীবনের শতদলের কয়েকটি দলের ওপর আলোকপাত করেছেন অসামান্য সংযম ও নিষ্ঠার সঙ্গে। ফলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য পাঠ না করলে এই দুই বিরাট মানুষের পরিচয় যেন সম্পূর্ণ হয় না। আচার্য প্রফুল্ল রায় সম্বন্ধে দিলীপকুমারের আলোকসম্পাত বাংলা ভাষার জীবনী-রচনায় দারিদ্র্যকে জয় করার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। গোপীনাথ কবিরাজ, বঙ্কিম সেন, কালীপদ গুহরায়—দিলীপকুমারের অনুভূতিশীল লেখনী এঁদের আমাদের বড় কাছে এনে দিয়েছে।

আধ্যাত্মিক পথের পথিক দিলীপকুমার ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে অধ্যাত্মবাদের ওপর জোর দিয়েছেন। যাঁরা আত্মিক চর্চায় আসক্ত, তাঁদের কাছে 'স্মৃতিচারণে'র মূল্য নিশ্চয় অনেক বেশী হবে। যাঁরা ধর্মপন্থী নন, তাঁরাও গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে এই পুস্তক পাঠ ক'রে যথেষ্ট লাভবান হবেন। ধর্মালোচনায় দিলীপকুমার এমন খোলা-মন আন্তরিকতায় মগ্ন হয়ে যান যে, তা প্রত্যেক পাঠকের অন্তর স্পর্শ করবে। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, দুরূহ বিষয়কে সহজ ক'রে বলার অসামান্য ক্ষমতা, ভাষায় তীক্ষ্ণতা ও লালিত্য, রচনা-শৈলীর তেজস্বী স্বকীয়তা 'স্মৃতিচারণের' দ্বিতীয় খণ্ডের পাঠককে বারবার অভিভূত করবে। এমন সুপাঠ্য অথচ ভাব-উদ্দীপক গ্রন্থ বহুদিন পড়ার সুযোগ হয় নি।

স্মৃতিচারণের সাহিত্যিক মূল্য অনেক। কেবল উত্তম পুরুষদের জীবন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনার জন্যে নয়, দিলীপকুমারের স্বকীয় সাহিত্যচিন্তার জন্যেও। রবীন্দ্র-কাব্যদর্শন দিয়ে তাঁর আলোচনা উচ্চমানের সাহিত্য-সমীক্ষা। তা ছাড়া, ঘটন-অঘটন-বহুল নানা অনুভূতি অভিব্যক্তি রঞ্জিত সত্যনিষ্ঠ জীবনের উপলব্ধি দিলীপকুমার সাহিত্যিক রসে সিঞ্চিত ক'রে পরিবেশন করেছেন।

স্মৃতিচারণের দ্বিতীয় খণ্ড পাঠককে যত্নের সঙ্গে পাঠ করবার অনুরোধ জানাতে আমার দ্বিধা নেই। আমি নিজে এই গ্রন্থপাঠে লাভবান হয়েছি—আমার দৃষ্টি ও অনুভূতি অনেক প্রসারিত ও প্রখর হয়েছে। আমার মত আরও অনেকে আগ্রহের সহিত তৃতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রয়েছেন।

বইয়ের মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়বস্তুর উপযুক্ত হয়েছে। বর্তমান বাজারে প্রকাশন ব্যয়সাপেক্ষ। সে তুলনায় বই-এর দাম কম বলতে হবে।

চাণক্য সেন।

বিষণ্ণ ঋতু—শ্রীরত্নেশ্বর হাজরা। কবিপত্র প্রকাশভবন, ১-সি, রাণী শংকরী লেন, কলিকাতা—২৬ ; মূল্য দেড় টাকা।

এইখানে রেখে যাই আমার স্বীকৃতি—শ্রীনমিতা চন্দ। কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ; মূল্য—দেড় টাকা।

আধুনিক কবিতা অনুভূতি-আশ্রয়ী নয়। এমন কথা বললে প্রমাদ ঘটবে। কাব্যের সাড়া জাগে অনুভূতি থেকে। পুলক, শিহরণ, আনন্দ বিহ্বলতা এরা কাব্যের অনুষঙ্গ। মহাকাব্য ও গীতিকাব্যকে ভিন্ন দিগন্ত-বলয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেও তাদের মৌন ধর্ম হ'ল আনন্দ দেওয়া। একে দার্শনিকেরা বলবেন 'নিল'ক্ষ্য উদ্দেশ্য' বা Purposiveness without a purpose ; কাব্য তা যদি রসোত্তীর্ণ হয় তবে তা রসিক-জনকে আনন্দ দান করে, এ কথা হ'ল যুগযুগান্তরের প্রত্যক্ষসিদ্ধ তত্ত্ব। আধুনিক কাব্য ঐতিহ্য-আশ্রয়ী নয়। নব নব শৈলীর পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক কাব্য দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে, এমন কথা এদেশে-ওদেশে শুনেছি। আধুনিক চিত্রকলা ও শৈলী বা আঙ্গিকের আস্ফালনে সহজ মানুষকে আপন রস থেকে বঞ্চিত করেছে। এমন অভিযোগও প্রায়ই আমরা শুনে থাকি। কিন্তু এর বিচারের ভার নেবার আগে শান্তচিত্তে আমাদের একথা স্মরণ করতে হবে যে, জীবনে সামান্যতম প্রাপ্তির প্রাক্-অবস্থা হিসেবে একটা মৌন সাধনার প্রয়োজন হয়। মৌলিক বা ব্যবহারগত জীবনে অনায়াসলভ্য কিছুই নয়। অথচ কাব্যের বা চিত্রের রসাস্বাদন ব্যাপারে আমরা এই মূল সত্যটিকে স্বীকৃতির মর্য্যাদা দান করি না। আমরা চোখ মেলেই কাব্য বা চিত্রের রসাস্বাদনে অগ্রসর হই। রস না পেলে বলি যে এটা রসোত্তীর্ণ হয় নি। একবারও ভাবি না যে, এই 'ঈস্‌থেটিক জাজমেণ্ট' যে সব পসচ্যুলেটকে স্বভাবতঃই গ্রহণ ক'রে থাকে সেগুলি অমর আছে কি জান? শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ এই ধরণের সমালোচকদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন তাঁর বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে। তাঁর মতকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রে বলব রসাস্বাদন করতে হ'লে প্রয়াসের দরকার। শিখতে হবে শৈলীর রহস্যটুকু, সেটুকু বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি-শৈলীর কঠিন আবরণে আবৃত রসটুকুকে অনাবৃত করবে, তারপরে অনুভূতির কাজ; অনুভবের নায়ে চড়ে রসিক তখন রসসমুদ্রের রাজা; তার আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। সে তখন স্রষ্টার কবির সমগোত্র তাই কবিকে বলা হয়েছে 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'।

বিষণ্ণ ঋতুর কবি সহৃদয় হৃদয় সংবাদী। যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন আধুনিক কাব্যের শৈলীতে তাঁদের কাছে বিষণ্ণ ঋতুর কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ বলেই মনে হবে। উনিশটি কবিতার গুচ্ছ বিধৃত হয়েছে সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট ও পশ্চাদপটের মধ্যে। নিঃসঙ্গ কবি-মন কর্ম-ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; সেই সব কথা বলেছে। স্বগতোক্তি করেছে 'অনন্যা' 'মানুষ' 'নটের শব' প্রমুখ কবিতায়। বিষণ্ণ মন যে ভাষায় কথা বলেছে সে ভাষা কান্না ভেজা। মনে হয়েছে কবির সবটুকু মনের পরিচয় বুঝি উদ্‌ঘাটিত হ'ল। কিন্তু যে মন সুন্দরকে পূজা করে তা ত বিষণ্ণতার আশ্রয় হ'তে পারে না; সে মনে আলো জ্বলে, আনন্দের আলো। বৈদুর্য্যের দ্যুতি। কবি স্বর্ণমারীচ ও কৃষ্ণসারের পদ পাতের প্রতীক্ষা করে' আছেন। সে প্রতীক্ষায় আশার সংকেত; অনাগত ভবিষ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কবি সুখকে অন্বেষণ করেছেন; সুখ ত বস্তুগত সত্য নয়; তা মননধর্ম প্রত্যয়ও নয়। তা হ'ল এক আশ্চর্য্য কল্পনা। কবির কথায় বলি:

"সুখী হ'তে চেয়েছিলাম হয়তো আমি একটুখানি সুখে
নড়বে পাতা, আকাঙ্ক্ষা ব্যঞ্জনা
কিন্তু কোন স্পষ্টতায় ছায়াপথ জানালো কৌতুকে
সুখ কি দৃশ্যেতে স্পষ্ট—সুখ এক আশ্চর্য কল্পনা।"

(অনুভব)

সুখ যদি আশ্চর্য কল্পনামাত্র হয় তবে ও সুখে কবির জন্মগত অধিকার। কবি হলেন কল্পনার যাদুকর। তাই 'ত' বলছিলাম যে বিষণ্ণ ঋতুর কবি আশাবাদী। আপাত-দৃশ্যমান নৈরাশ্যবাদ তাঁর কাব্যের মূল সুর নয়। আমরা এই নবাগত কবিকে স্বাগত জানাচ্ছি বঙ্গভারতীর বিস্তৃত উৎসব প্রাঙ্গণে। তাঁর বীণায় নতুন নতুন তার চড়ুক। নতুন কাব্য-সঙ্গীতের প্রবাহ ধারায় স্নাননাম ক'রে আমরা তৃপ্ত হই।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি শ্রীনমিতা চন্দের। নারী মনের গহনে কাব্য-রসের যে উদ্বেলতা তিনি অনুভব করেছেন তারই সহজ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যগ্রন্থটিতে। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা শান্তসহ যে কয়টি রসকে স্বীকার করেছেন তার মধ্যে করুণ রসটিই শ্রীমতি চন্দের কবিতায় অনবদ্য রূপ নিয়েছে। ব্যথা, বেদনায় কবিতা জন্মলাভ করে। আদি কবি পরম বেদনায় বিশ্বের প্রথম শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন। সে বেদনা মহৎ বেদনা; তাই ত মহাকাব্যের জন্ম সম্ভব হয়েছিল সেই বেদনা থেকে, সেই বেদনা, সেই দুঃখ হ'ল মহাকাব্যসম্ভবা। আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক সহজ অথচ অনন্যসাধারণ বিরহব্যথার আভাস পাই:

তুমি কি আজ সত্য সুখী?
তুমি কী পেয়েছ জীবনে?
জীবনের আস্বাদ তুমি কী লাভ করলে?
লোকপ্রীতি আমাকে টেনে নিয়েছে তোমার কাছ থেকে,
কেড়ে নিয়েছে দস্যুর মত।
তখন বুঝি নাই।
আমার জীবনটা এমনিতর ফাঁকা লাগবে কোনদিন।
সবটা মিলে এতবড় ফাঁকি।"

(শোক তৃপ্তি)

টুকরো টুকরো কথার আঁচড়ে কবি এমন একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরলেন যেটি ক্রমশঃই পাঠকের মনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দিকে নিরন্তর প্রসারিত হচ্ছে। চিত্রটি রঙে রেখায় সম্পূর্ণ নয়; ওয়ার্ডস্বার্থের বালক বয়সে দেখা কালো পাহাড়ের মতই নিরন্তর এটি বেড়ে চলেছে। এটি হ'ল সদ্‌কাব্যের প্রসাদ গুণ। রসিক-জন আপন মনের কল্পনায় কবির বেদনাটিকে আত্মবেদনারূপে প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীমতী চন্দ এই দুরূহ কার্যটি সম্পন্ন করেছেন। তিনি পাঠকের মনে যে নিঃসঙ্গতা, যে বেদনার ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছেন, তা পাঠকের অভিজ্ঞতায় কোনদিকে সত্য ছিল; তা কবিচিত্তের বেদনার কল্পিত প্রতি-

লিপি নয়। এইখানেই শ্রীমতী চন্দ কবি হিসেবে সার্থকতা লাভ করেছেন। তাঁর কাব্য সহৃদয় হৃদয় সংবাদী হয়ে উঠেছে। তিনি সহজ আঙ্গিক নৈপুণ্যটুকু দেখিয়েছেন কষ্টকল্পিত শব্দসম্ভার সজ্জার সাহায্য না নিয়েই। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সহজ কথা সহজ ভাবে শুনিয়ে দেবার সাহস যে সব সময় দেখান নি, এমন কথা সমালোচকেরা বলবেন। আধুনিক কবিরা অনেকেই এই দুঃসাহস দেখিয়েছেন। শ্রীমতী চন্দ এঁদের অন্যতমা।

আমরা বাঙ্গলা ভাবাভাষী রসিকজনের কাছে এই দুটী কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ঘোষণা করছি,। এঁদের কবিজীবনে মহত্তর কাব্যের ফসল ফলুক।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা—রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদিত, (প্রথম খণ্ড), মুন্সী হাউস, বরাহনগর। মূল্য ছয় টাকা।

গীতার বহু সংস্করণ আমাদের দেশে চলিত আছে। তথাপি এ সংস্করণের প্রয়োজন হইল কেন, গ্রন্থকার ভূমিকায় তাহা বলিয়াছেন। গীতাতত্ত্ব যাবতীয় শাস্ত্রের সারাংশ। একমাত্র গীতা পাঠ করিলেই, অন্যশাস্ত্র পাঠ করিবার আর প্রয়োজন হয় না। কারণ, শাস্ত্রানুশীলনের প্রয়োজন তো সেখানেই—যা আমার জীবন গঠনে সহায়ক হইবে। গীতায় সেই ধর্মাচরণের কথাই বলা হইয়াছে। অর্জ্জুন তো এখানে প্রতীক, ভগবান মনুষ্যমাত্রকেই এই উপদেশ দিয়াছেন—তুমি এইভাবে চরিত্র গঠন করিতে পারিলে দুঃখকে জয় করিতে পারিবে। আর দুঃখকে জয় করিতে পারিলেই আনন্দের অধিকারী হইবে। আনন্দই তো ব্রহ্ম।

হরেনবাবু এই গীতা-তত্ত্ব বুঝাইতে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। মূল, অন্বয়, টীকা ও অনুবাদ ছাড়াও, তিনি মধ্যে মধ্যে সে বিষয়ে অপরের মতামতও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন, শ্রীঅরবিন্দ, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি। এই মূল্যবান উদ্ধৃতিগুলি শ্লোকের তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে পরম সহায়ক হইয়াছে। হরেনবাবুর নূতন করিয়া গীতা লেখার সার্থকতা এইখানেই।

শ্রীগৌতম সেন

জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ—শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী। এম্‌. সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স্ প্রাঃ লিঃ, ১।১ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিশেষ ক'রে তাঁর শতবর্ষপূর্তিতে সে প্রবহমানতার বিপুল সম্ভার লক্ষ্য করা গিয়েছে। শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরীর 'জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ' এই গতিস্রোতের একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটির শিরোনাম দেখলে স্বভাবতই মনে হবে চিরসন্ধানী রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। কিন্তু 'জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ' ছাড়াও অন্য কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সেগুলির নাম 'জাতীয় কবি ও রবীন্দ্রনাথ', 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ', 'রোমাণ্টিক রবীন্দ্রনাথ' এবং 'হিউম্যানিষ্ট রবীন্দ্রনাথ।'

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত তাঁর নিজের ছবি দেখে লেখকের প্রথম মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ হলেন সত্যান্বেষী, চিরজিজ্ঞাসু। গ্রন্থটির অবতরণিকা নামক অধ্যায়ে শ্রীচৌধুরী বর্তমান গ্রন্থ রচনার উল্লিখিত কারণটি দেখিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসু মূর্তিটির সম্যক্ পরিচয় আঁকতে পারেন নি।

ঈশ্বরের ভজনায় যে জিজ্ঞাসু সাধক সম্প্রদায় রয়েছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর সাধক। এইরূপ একটি মতবাদ লেখক প্রথমেই ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সত্যান্বেষী দৃষ্টি সারাজীবন শুধু ভগবত সাধনায় সীমাবদ্ধ ছিল। এ রকম একটি তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয়ে লেখক বলেছেন—"ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেও রবীন্দ্রনাথ ধর্মের কবি।' তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিল্প কর্মের মধ্যে কবিতার ক্ষেত্রে নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য, গীতালি-র বাইরে রবীন্দ্রনাথকে সন্ধান করেন নি।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের অন্বেষণ তাঁর সারাজীবন ব্যাপী সাধনায় জড়িত রয়েছে। কি শিল্প ক্ষেত্রে, কি কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে চলেছেন। সেই অনলস সাধনার ইতিবৃত্ত রচনা করলে তবে জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে।

গীতাঞ্জলি পর্ব কবির অতীন্দ্রিয় লীলার যুগ। রবীন্দ্রনাথ সে যুগ অতিক্রম করে চলে গেছেন 'বলাকা' 'পরিশেষ' 'নবজাতক' 'সানাই' এর যুগে। সেখান থেকে 'প্রান্তিক' 'সেজুঁতি ' 'আরোগ্য' 'জন্মদিন এর যুগে। কিন্তু শ্রী চৌধুরী গীতাঞ্জলি পর্বেই আবদ্ধ থেকেছেন বিশেষ করে। তাই তিনি এ-যুগে লিখিত 'রাজা' (১৩১৭) নাটকটি গ্রহণ করেছেন তাঁর বক্তব্যের উপস্থাপনায়। বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের সাধনার শেষফল 'রাজা' নাটকখানি। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক রাজ্যের তিনি যা কিছু পেয়েছেন বা বুঝেছেন তা সমস্তই এই নাটকের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন"। নাটকটি সাঙ্কেতিক (লেখক বলেছেন রূপক) এর মধ্যে ভগবান ও মানুষের সম্পর্কই প্রধান উপজীব্য। আমাদের জিজ্ঞাস্য রবীন্দ্রনাথ কি শুধু ভগবৎ সন্ধানেই জীবন অতিবাহিত করেছিলেন?

পরবর্তী প্রবন্ধে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন। জাতির আশা-আকাঙ্খা আদর্শকে ফুটিয়ে তোলাই জাতীয় কবির কাজ। এই বক্তব্য শুনলে মনে প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের কি এ বিষয়ে অসদ্ভাব ছিল? বাংলার ঘরে ঘরে কবি সমাদর লাভ করেন নি। লেখক বোধহয় চারণ কবির সঙ্গে জাতীয় কবির তফাৎ গুলিয়ে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই মুকুন্দ দাস কিংবা কবিওয়ালা নন্। 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি হবার সময় এখনও আসে নি"। ভালই হয়েছে!

শ্রীচৌধুরী তাঁর দুর্বল চিন্তাগুলি ঠিকমত যুক্তি-পরম্পরায় সাজাতে পারেন নি। অনেক কথাই তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন। বহু তথ্যের অবতারণা করেছেন ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষা থেকে। কিন্তু আলোচনার কোথাও এমন কোন সুশৃঙ্খল যুক্তি বিশ্লেষণ আনতে পারেন নি, যা তাঁকে নিজের বক্তব্যের শেষ সীমায় নিয়ে যেতে পারে।

ভাষা ব্যবহারে, চলতি ভাষার মধ্যে নঞর্থক ক্রিয়াপদে 'দেখি নাই' 'পারি নাই' এবং তাহাকে, যাহা সর্বনামের উপস্থিতি দৃষ্টিকটু। এই প্রসঙ্গে বলা যায় গ্রন্থটির বহুস্থানে বিচিত্র মুদ্রাকর প্রমাদ অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা।

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৭০

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৭০

— রঙীন চীত্র —

— হরপার্বতী —

শিল্পী : শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ — ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১ম খণ্ড — আশ্বিন, ১৩৭০

ভারত ও পাকিস্তান

সম্প্রতি গুপ্তচরের চক্রান্ত চালনা করার অভিযোগে ভারতস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশনের তিন জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে ভারত হইতে সরাইবার জন্য ভারত সরকার পাক্ সরকারকে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের হাই কমিশনার ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন যে, এই সংবাদটি যেন ছয় দিন প্রকাশ না করা হয় এবং বলা বাহুল্য ভারত সরকার সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। উহার ফলে পাক্ সরকার ঐ ছয় দিনের মধ্যে এক সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করিয়া পাকিস্তানস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ঠিক ঐ পদের তিন জন কর্ম্মচারীর বহিষ্কার চাহিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম অনুসারে এ জাতীয় অনুরোধের—অর্থাৎ বিদেশী রাষ্ট্রদূতাবাসের কর্ম্মচারী বহিষ্কার-সংক্রান্ত অনুরোধ-বিষয়ে কোনও বিতর্ক বা বিবেচনার অবকাশ থাকে না। সুতরাং সক্রিয় ভাবে পাকিস্তানী গুপ্তচর-চক্রজাল ছড়াইবার ও চালনা করিবার কাজে প্রমাণ সাক্ষ্য সমেত ধরা পড়ার জন্য পাকিস্তানী হাই কমিশনের তিনটি কর্ম্মচারী দেশে ফিরিতে বাধ্য এবং কোন কিছু সেরূপ কাজ না করিয়াও শুধু মেকী অভিযোগের বশেই আমাদের হাই-কমিশনের লোককে ফিরিয়া আসিতে হইবে। অবশ্য অভিযোগ সম্পর্কে দুই পক্ষেরই চিঠি-চাপাটি পাঠাইবার অধিকার আছে।

আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপে "বোকা বনিবার" কারণে নাকি অত্যন্ত চটিয়াছেন এবং সেই কারণে পাকিস্তানের অভিযোগকে মিথ্যা বলিয়াছেন এবং সেই মর্ম্মে পাকিস্তানকে এক "শক্ত" চিঠিও দিয়াছেন।

এরূপ সহজে সারা জগতের সম্মুখে বেবাক বোকা বনিলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক, এ কথা আমরা বুঝি। কিন্তু যাহা আমাদের বোধগম্য একেবারেই হইতেছে না সেটা এইভাবে ঠকাইবার এত সহজ উপায় পাকিস্তান ক্রমাগত পাইতেছে কেমনে ও কেন? এই অতি আশ্চর্য্য অনুরোধ কাহার সম্মুখে বিচার ও বিবেচনার জন্য রাখা হয় এবং সে বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তি (বা ব্যক্তি-সমষ্টি) কি বিচারে ঐ অত্যন্ত অসমীচীন অনুরোধে সম্মতি দিলেন সে প্রশ্ন এখন পর্য্যন্ত কেহই করে নাই কেন, তাহাও আমরা বুঝিলাম না। পার্লামেণ্টে আমাদের প্রতিনিধিবর্গ কি এ বিষয়ে চিন্তারও অবসর পান না?

লাল চীনকে এই ভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা ত সারা দেশ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। পাকিস্তানকে কারণে-অকারণে "খুশী" করার চেষ্টাও পণ্ডিত নেহরু ত প্রায় দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করিয়া আজ অবধি সমানে চালাইয়া ভারতকে পদে পদে অপদস্থ—এমন কি বিপদগ্রস্ত—করিতেছেন। আজ ভারত অত্যন্ত দুরূহ পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, আজও কি সেই খামখেয়ালী একতরফা খোশামোদি চলিবে?

এইভাবে অকারণে ঘাড় পাতিয়া অপমান ও লোকসান মানিয়া লওয়ার ফলে আমাদের অবস্থা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে

দাঁড়াইয়াছে অতি বিপরীত। কাশ্মীর লইয়া ত এক প্রহসন চলিল কয়মাস ধরিয়া। সেখানে পাকিস্তান যাহা চাহিয়াছিল এবং যে ভাবে তাহা চাহিয়াছিল, সে সব কথা সারা জগতে জানে। অথচ যদিও পাকিস্তান তাহার মুরুব্বিদলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া লাল চীনের সহিত মিতালী করিয়াছে এবং সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া ভগ্নদূতের ভূমিকায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহকারী-সচিব জর্জ্জ বলকে বিশেষ দৌত্যের কাজে পাঠাইতেছে এই সংবাদ পাইবামাত্র চীনের সঙ্গে পাক্-চীন্ বিমান চলাচল সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে অথচ সেই পাকিস্তানের দরদী মুরুব্বিদ্বয়, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র, আবার অনুরোধ জানাইতেছেন যে ভারত যেন তাঁহাদের মধ্যস্থ মানিয়া কাশ্মীরের সম্পর্কে বোঝাপড়া তাঁহাদের হস্তে নিবেদন করে।

ঐ দুই জনকে মধ্যস্থ মানিলে কি হইবে সে বিষয়ে বিচার নিষ্প্রয়োজন, তবে আমাদের কোনও উপকার যে হইবে না এবং পাকিস্তানের হিংসা ও লালসা যে নিবৃত্ত হইবে না এই দুই সত্য বিনা যুক্তিতর্কে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। আশা করি পাকিস্তান সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে এতদিনে কিছু "আক্কেল" গজাইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অষ্টাদশ অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের নেত্রীরূপে নিউ ইয়র্ক গিয়াছেন। সেখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঐ প্রসঙ্গ উঠিতে তিনি বলেন:

"সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে এই আশায় ভারত নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া বছরের পর বছর পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া ক্রমাগত পূরণ করিয়াও আসিয়াছে। কিন্তু আমরা এমন জায়গায় গিয়া ঠেকিয়াছি যে, আজ তাহাদের দাবি পূরণ করিতে আমরা প্রস্তুত নই।"

যদি এই কথা শ্রী নেহরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নির্দ্দেশক হয় এবং যদি পূর্ব্বেকার মত তিনি মধুর বাক্যে গলিয়া সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম না করিয়া বসেন তবে বলিব মন্দের ভাল। তবে এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই যে, নয়াদিল্লীর সংসদে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় নূতন ধারার প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। সংসদের সভ্যগণ আর কতদিন শুধু নিজেদের স্বার্থের ও দলগত স্বার্থের চিন্তায় দিন কাটাইয়া এই অতি সাংঘাতিক বিষয়ের সবকিছু ছাড়িয়া দিবেন আমাদের একমাত্র পররাষ্ট্রনীতি-বিশারদের বিচার-বিবেচনার উপর?

শ্রীমতী পণ্ডিত নিউ ইয়র্কের ঐ সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের মধ্যেই আর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

"কম্যুনিষ্ট চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে আসন দেওয়া হউক, ভারত এখনও ইহা চায়। ইহার সহিত বর্ত্তমান ভারত-চীন সম্বন্ধের কোন সংস্রব নাই। দুই চীনই রাষ্ট্রসঙ্ঘে থাকুক, ভারত এই নীতি সমর্থন করে না। তবে সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে এত বেশী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, কিছুকাল পরে এই সমস্যার রূপ কি হইবে বলা যায় না। আমাদের কথা এই যে, আমরা দুই-চীন নীতি সমর্থন করি না এবং আপাততঃ ইহাও মনে করি না যে, তাইওয়ান সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘে থাকিলে গণচীন তাহার সদস্যপদ গ্রহণ করিবে।"

ভারত বলিতে অবশ্য শ্রীমতী পণ্ডিত এখনও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই বুঝেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও প্রধানতঃ তাহাই বুঝেন। কিন্তু লোকসভায় বা রাজ্যসভায় কি বিরোধী পক্ষের মধ্যেও কেহ নাই যে, প্রশ্ন করিতে পারে যে কি অধিকারে উক্ত শ্রীমতী সমস্ত ভারতকে এইভাবে হাস্যাস্পদ করিতেছেন।

বিক্ষোভ ও মিছিল

কলিকাতায় ত অতি সাধারণ অবস্থায় প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন মিছিল চলায় প্রধান রাজপথগুলিতে যান-বাহন চলাচল ব্যাহত বা বন্ধ হয়। যদি কোনও বিশেষ কারণ থাকে বা কোনও রাষ্ট্রনৈতিক দল বিশেষ প্রেরণা বা সুযোগ অনুভব করে তবে ত কথাই নাই দৈনিক কোন না কোন বিশেষ এলাকায় বা বিশেষ কোনও রাজপথে একদল লোক ঝাণ্ডা-পতাকা লইয়া শ্লোগানের চীৎকারে পথঘাট কাঁপাইয়া চলিতে থাকে। এই দলের আশেপাশে ও পিছনে নিষ্কর্ম্মার দল ভীড় করিয়া এক অসম্বদ্ধ মিছিল গঠন করিয়া চলে।

কলিকাতায় কিছু দিন যাবৎ নানা কারণে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের প্লাবন বহিতেছে এবং সেইগুলিকে কারণ রূপে লইয়া বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি চলিতেছে। প্রথমে স্বর্ণনিয়ন্ত্রণে যাহাদের অন্নসংস্থান গিয়াছে সেই স্বর্ণশিল্পীগণ তাহাদের দুরবস্থার দিকে সরকারের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য দলে দলে আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র মধ্যবিত্ত শিল্পী-শ্রেণীর লোক ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্র লইয়া একত্রে এক পরিবার ধরা দেয়। ইহাদের বিক্ষোভের কারণ অতি সুস্পষ্ট ছিল এবং সরকার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এই বিক্ষোভ কিছুটা শান্ত হয়। তবে মূল কারণ রহিয়াই গিয়াছে।

তার পর চলিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক দলের চালিত "জন-বিক্ষোভ" মিছিল। চালক প্রজা সোসালিষ্ট দল এবং উদ্দেশ্য সরকারী খাদ্য নীতি, শুল্ক ও ট্যাক্স নীতি, স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ নীতি

ইত্যাদির পরিবর্ত্তন ও সংশোধন—এক কথায় সরকারের সহিত শক্তি পরীক্ষা। কিছুদিন যাবৎ দৈনিক মিছিল চালন ও আইন অমান্য দ্বারা কারাবরণের চেষ্টা করার পর প্রজা সোসালিষ্ট দল উৎসাহিত হইয়া ২৪শে সেপ্টেম্বর দিনব্যাপী (বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত) হরতাল ঘোষণা করিয়াছেন ও জানাইয়াছেন যে, অন্য অকম্যুনিষ্ট সরকার-বিরোধী দলগুলির এই প্রস্তাবে সমর্থন আছে। এই হরতালের দ্বারা তাঁরা কি সুফল প্রাপ্তির আশা করেন তাহা অবশ্য তাঁহারাই জানেন। সাধারণতঃ ইহাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ে ও নানাভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অবশ্য সে সকল কথা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না, কেননা সাধারণের বিচারবুদ্ধি কম ও স্মৃতিশক্তি ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু এই অসন্তোষের দেশব্যাপী প্লাবনকে কেন্দ্র করিয়া বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর কম্যুনিষ্ট পার্টি নয়া দিল্লীতে যে বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে তাহার অনুরূপ কিছু ইতিপূর্ব্বে স্বাধীন ভারতের রাজধানীতে দেখা যায় নাই। ঐ মিছিলের সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি, অবশ্য সঞ্চয় ও করভার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষজ্ঞাপন করার জন্য "গণস্বাক্ষর"-যুক্ত "আবেদনপত্র" ছিল, যাহার ওজন ছিল প্রায় তিন টন। কম্যুনিষ্ট পার্টির ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এক কোটির উপর স্বাক্ষর উহাতে আছে। আবেদনপত্র লোকসভার অধ্যক্ষ সর্দ্দার হুকুম সিং-এর কাছে জমা দেওয়া হয়।

নয়া দিল্লী অন্য দিকেও বিশেষত্ব দেখাইয়াছে। ঐ গণবিক্ষোভ মিছিল—যাহাতে প্রায় ৫০ হাজার লোক ছিল যাহাদের অধিকাংশই দিল্লীর বাহিরের লোক—যখন রামলীলা ময়দান হইতে বাহির হইয়া কনট সার্কাসে পৌছায় তখন প্রায় এক হাজার লোক কালো পতাকা লইয়া কম্যুনিষ্টদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ধ্বনি দিতে থাকে। শহরের নানা স্থলে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রাচীরপত্রও দেখা যায়, যাহাতে ন্যাশনাল মার্কসিষ্ট এসোসিয়েশনের নাম ছিল।

ঐ দিনই লোকসভায় বিরোধী দলের কয়েকজন অকম্যুনিষ্ট সদস্য এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, তাহার পূর্ব্বদিনে নয়া দিল্লীর কয়েকটি প্রকাশ্য স্থানে যে কম্যুনিষ্ট পতাকা দেখা যায় তাহা স্থানীয় চীনা দূতাবাসের কর্ম্মচারীদিগের যোগসাজসে উত্তোলিত হয়।

এই "গণস্বাক্ষর" সম্বলিত আবেদনপত্র ও বিক্ষোভ মিছিল এইটুকু নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি নেহরু সরকারকে ঠিক ততটুকু সমর্থনই দিতে প্রস্তুত যতটায় তাহার নিজের স্বার্থসিদ্ধি হয়। আবেদনপত্র পরীক্ষা করিলে হয়ত এক কোটি বা ততোধিক স্বাক্ষর মিলিবে তবে উহা এক কোটি বিভিন্ন লোকের স্বাক্ষর কিনা তাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ১ কোটি স্বাক্ষর মানে যারা ভারতের লিখিতে সক্ষম লোকের এক-অষ্টমাংশ—যদি দেশের লোকের শতকরা ২১ জনকে লিখিতে সক্ষম ধরা যায়। এরূপ ব্যাপক ভাবে স্বাক্ষর লওয়া হইল অথচ তাহার কোনও বিশেষ প্রকাশ্য স্পন্দন আমাদের অনুভূতির মধ্যে আসিল না, ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

রামলীলা ময়দানে প্রথমে দেশের নানা অঞ্চল হইতে লোক আসিয়া মিছিলে যোগদান করে। অধিকাংশই পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীর লোক। ঐ সমাবেশে বক্তৃতা দিবার সময় কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে বলেন, সরকার যদি অবিলম্বে কম্যুনিষ্টদিগের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত "মহা আবেদন" বর্ণিত দাবিসমূহ পূরণ না করেন তবে ভারতের শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় আগামী নবেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ ব্যাপক ধর্ম্মঘট ও করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিবে। দাবির মধ্যে আছে অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রত্যাহার, ভূমিরাজস্ব সারচার্জ্জ রহিত, স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধি বাতিল, করহ্রাস এবং ব্যাঙ্ক, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য ও তৈল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করণ। কি কারণে কৃষি ও যন্ত্র-শিল্প ইত্যাদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করণের দাবি জানান হয় নাই আমরা জানি না, সেটা বোধ হয় দেশের বিপদ আরও ঘনীভূত হইলে করা হইবে। যাহা হউক, দাবির বহর যথেষ্ট তবে ইহার পিছনে "গণ সমর্থন" কতটা এবং নেহরু সরকারের পিছনে জনসাধারণের সমর্থন—যাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ—কতটা এবং তাহার আপেক্ষিক ওজন ও পরিমাপই বা কি, তাহার পরীক্ষার দিন বোধ হয় ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে।

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কি জনসাধারণের সহিত সংযোগ রাখার কোনও ব্যবস্থাই নাই? বহুকাল পূর্ব্বে কলিকাতায় ব্যাপক ট্রাম-বাস পোড়াইবার সময় এক সম্পাদক সম্মেলনে ডাঃ রায় স্বীকার করিয়াছিলেন কোন ব্যবস্থা নাই। এখনও কি তাই?

কলিকাতার দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও শিল্পীর অবস্থা

বিগত ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বরের মাঝের রাত্রে কলিকাতা ভবানীপুর হরিশ চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটের এক দোতলা বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ায় ছয়টি লোক, তার মধ্যে চারিটি শিশু জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। এই ছয় জন নিহত ছাড়া ১০ জন আহতের মধ্যে নয় জন হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়।

বাড়ীর দ্বিতলে ৫ জন থাকিত, তাহারা আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পায়।

স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, বাড়ীটি ভাঙিয়া ফেলার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। সেই ভাঙার আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়। পাড়ার লোকেদের মতে বাড়ীটির বয়স একশত বছরের কম নয়। এখানে "বাংলা স্কুল" ছিল।

এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে নানা মন্তব্য নানা স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ বিপদ মাথায় করিয়া কি কারণে লোকে ঐরূপ বাড়ীতে থাকে সে বিষয়ে আরও অনেক বেশী কঠোর মন্তব্য সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল!

যে দেশের সরকার দেশের জনসাধারণের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের যথাযথ সংস্থান করিতে অসমর্থ তাহাকে সাধারণ-তন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী সরকার কোন্ মুখে বলা হয় আমরা জানি না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের ভোটের জোরে ও বাঙালী গৃহস্থের সমর্থনে শাসনতন্ত্রের অধিকার পাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিদানে বাঙালী গৃহস্থ কলিকাতায় ঐ তথাকথিত সমাজতন্ত্রী সরকারের নিকট কি সহায় সমর্থন পাইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, মেদিনীপুর হইতে আগত রাজমিস্ত্রীর পরিবারের অবস্থা। ঐ রাজমিস্ত্রী যতীন্দ্রনাথ বেরা বিপজ্জনক অবস্থা জানিয়াও ওখানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল কেননা বাড়ী ছাড়িলে এই বর্ষায় পথে দাঁড়াইতে হইত। দেশের সরকার কলিকাতায় বাঙালী উচ্ছেদের পর্ব্ব এতদূরই অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

পরলোকে পি. আর. দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাংলা তথা ভারতের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রফুল্লরঞ্জন দাশ—যিনি পি. আর. দাশ নামে পরিচিত, তিনি গত ৩রা সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল। ১২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। এবং দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র শঙ্কররঞ্জন একটি মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান।

প্রফুল্লরঞ্জন ১৮৮১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গত ভুবনমোহন দাশের তিনি দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ১৯০৫ সনে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতবর্ষের আইনজগতের গত ৫৭ বৎসরের ইতিহাসে প্রফুল্লরঞ্জন বহু যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক মামলায় সওয়াল করিয়াছেন। ১৯১৫ সন পর্য্যন্ত প্রফুল্লরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টে ছিলেন। ১৯১৭ সনে তিনি পাটনা গমন করেন। তাহার অল্পকাল আগে পাটনায় পৃথক হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৮ সনে পাটনা হাইকোর্টে একটি মামলায় প্রফুল্লরঞ্জনের সওয়ালে এমন আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ভারত সরকারের তদানীন্তন আইন-সচিব তাঁহার সওয়াল শুনিবার জন্য পাটনা ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই আইনজ্ঞ হিসাবে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ইহার কয়েক বৎসর পরেই তিনি পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। যদিও পরে তিনি এই পদ ত্যাগ করিয়া আবার আইন-ব্যবসাই করিতে থাকেন। গত ৪০ বৎসরেরও বেশী কাল ধরিয়া এই জীবনে সারা ভারতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার মত বোধ হয় আর কেহ ফেডারেল কোর্ট, পরবর্ত্তী কালের সুপ্রীম-কোর্ট, হাইকোর্ট এবং জেলা কোর্টগুলিতে সমান ভাবে আইন ব্যবসা করিতেন না। তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের যে-কোন আদালতে প্রবেশ করিলে বিচারপতি বা জেলা বিচারকগণ সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইতেন।

আইনের বাহিরে তাঁহার আর এক জীবন ছিল, সে জীবনে তিনি সাহিত্য ও রাজনীতি ভালবাসিতেন। তিনি দেশবন্ধুর 'নারায়ণী' পত্রিকায় বহু কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি 'মথ অ্যাণ্ড দি ষ্টার' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

বদান্যতায় তিনি দাশ-পরিবারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় হইয়াছে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার্থে।

তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের আইন জগতে সর্ব্বাগ্রগণ্য নেতা ও দাশপরিবারের শেষ মহিমময় ব্যক্তিত্বের অবসান হইল।

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

ভারতের বিশিষ্ট প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ ও ঐতিহাসিক মনীষী ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় গত ৯ই সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

রাধাকুমুদ ১৮৮১ সনে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার আহমদপুর গ্রামে। তাঁহার পিতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৎকালে একজন কৃতী আইনজ্ঞ ছিলেন।

ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে বহু গ্রন্থের লেখক হিসাবে তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে 'হিষ্টরী অফ ইণ্ডিয়ান সিপিং', 'ন্যাশনালিজম্ ইন্ কালচার,' 'মেন এ্যাণ্ড থট ইন এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

ভারতবাসীর দারিদ্র্যের পরিমাপ

সম্প্রতি লোকসভায় সম্মিলিত বিরোধীদলসমূহের পক্ষ হইতে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বিতর্ক উপলক্ষ্যে সমাজবাদী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া দেশের উপবাস-সূচক (Starvation level) আয় মানের যে অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে সরকারী এবং বেসরকারী মহলে বিশেষ উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। এই বিতর্ক উপলক্ষ্যে দেশের সাধারণ লোকের প্রতি গভীর সরকারী ঔদাসীন্যের অভিযোগ করিয়া ডাঃ লোহিয়া বলেন যে, যেকালে দেশের বিরাট জনসংখ্যার দরিদ্রতম ৬০ শতাংশ ব্যক্তি মাথাপিছু মাত্র দৈনিক তিন আনা আয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন, সেই একই কালে মন্ত্রীমণ্ডলীর রাজকোষের উপরে ব্যক্তিগত ব্যয়ের চাপ অসম্ভব রকম অধিক বলিয়া দেখা যাইতেছে। বিতর্ককালে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এই অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, ডাঃ লোহিয়ার হিসাব সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তিকর। দেশের দরিদ্রতম মানের ব্যক্তিদেরও দৈনিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ডাঃ লোহিয়া-বর্ণিত সংখ্যার অন্ততঃ পাঁচ গুণ, অর্থাৎ প্রায় পনের আনা। ইহার প্রত্যুত্তরে ডাঃ লোহিয়া আবারও প্রত্যাভিযোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর হিসাব এই সম্পর্কে যে একেবারেই ভুল, তিনি তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই লইয়া যে প্রাথমিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে তৎকালীন পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ পরিকল্পনা কমিশনের দপ্তর হইতে দেশের বিভিন্ন স্তরের আয়ের জনসংখ্যার ভোগব্যয়ের যে নূতন হিসাব লোকসভায় দাখিল করেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নিম্নতম আয়-স্তরের জনসংখ্যার দৈনিক আয়ের হিসাব যেমন ভুল, তেমনি ডাঃ লোহিয়ার হিসাবও নির্ভুল নহে। এই নূতন তথ্য শ্রী নন্দ ১৯৬১ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৬২ সনের জুলাই পর্য্যন্ত প্রস্তুত জাতীয় আয়ের নমুনার পরিসংখ্যান (National sample survey) হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা নিম্নলিখিত রূপ :

মোট জনসংখ্যার শতাংশ	মাসিক ভোগ-ব্যয়		দৈনিক ভোগ-ব্যয়	
	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
	টাঃ নঃ পঃ	টাঃ নঃ পঃ	নঃ পঃ	নঃ পঃ
নিম্নতম আয়ের প্রথম ৫ শতাংশ	৮'৫৩	৭'০৯	২৮	২৪
তদূর্দ্ধ „ — ৫ „	১০'০৪	৭'০৯	৩৩	২৭
„ „ — ১০ „	১৩'৮৮	১০'৬৭	৪০	৩১
„ „ — ১০ „	১৬'৬১	১২'৮২	৪৫	৩৫
„ „ — ১০ „	১৯'৫৬	১৪'৬২	৫০	৩৯
„ „ — ১০ „	২১'৯৪	১৬'৪৭	৫৫	৪২
„ „ — ১০ „	২৫'৫০	১৮'৭৯	৬০	৪৫
নিম্নতম আয়ের ৬০ শতাংশ (গড়পড়তা)	৭'৪৬১/২	১৩'৪১	৪৬৩/৪	৩৬১/৪
তদূর্দ্ধ আয়ের ১০ শতাংশ	২৭'৬৮	২১'২৫	৬৪	৪৯
„ „ ১০ „	৩৫'৬৫	২৪'৭০	৭১	৫৩
„ „ ১০ „	৪৩'৮৬	২৯'৯৫	৮০	৫৮
„ „ ১০ „	৮৮'৭৬	৫১'১৬	১০১	৭০

উচ্চতম আয়ের ৪০ শতাংশ (গড়পড়তা)	৪৮'৯৪$\frac{3}{4}$	৩১'৭৬$\frac{1}{2}$	৭৯	৫৭$\frac{1}{2}$
মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু ভোগ-ব্যয় (গড়পড়তা)	৩৩'২২$\frac{1}{2}$	২২'৫৮$\frac{3}{4}$	৬২$\frac{7}{8}$	৪৬$\frac{7}{8}$

এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য এই যে, শহর ও গ্রামাঞ্চল-বাসী নিম্নতম আয়বিশিষ্ট ৬০ শতাংশ জনসংখ্যার ভোগ-ব্যয় দৈনিক গড়পড়তা (উপরোক্ত হিসাব মতে) ৪১$\frac{1}{2}$ নয়া পয়সা (নন্দ-বর্ণিত ৭$\frac{1}{2}$ আনা নহে) দাঁড়াইলেও এই হিসাব সঠিক নহে। কেননা দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোকসংখ্যা এখনও গ্রামবাসী। অতএব এই দৈনিক ভোগের গড় ৩ঃ১ হিসাবে দাঁড়াইবে গড়ে ৩৯$\frac{1}{2}$ নয়া পয়সা মাত্র, অর্থাৎ সাড়ে ছয় আনার কিঞ্চিৎ কম।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী যোজনার প্রথম দশ বৎসরে দেশের জাতীয় আয় ও গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের হিসাবটা প্রাসঙ্গিক হইবে। ১৯৫১-৫২ (প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের সুরু) হইতে ১৯৬১-৬২ (দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তিম বৎসর) সন পর্য্যন্ত সরকারী হিসাব মত ১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ নিম্নলিখিত হিসাবে দাখিল করা হইয়াছে: (Economic survey Govt. of India, 1962-63):—

বৎসর	জাতীয় আয় (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু আয় (টাকায়)	সূচক সংখ্যা জাতীয় আয়	সূচক সংখ্যা মাথাপিছু আয়
১৯৫১-৫২	৯,১০০	২৫০'৩	১০৫'২	১০০ ৩
১৯৫২-৫৩	৯,৪৬০	২৫৫'৭	১০৯'৪	১০২'৪
১৯৫৩-৫৪	১০,০৩০	২৬৬'২	১১৬'০	১০৬'৭
১৯৫৪-৫৫	১০,২৮০	২৬৭'৮	১১৮'৮	১০৭'১
১৯৫৫-৫৬	১০,৪৮০	২৬৭'৮	১২১'২	১০৭'১
১৯৫৭-৫৮	১০,৮৯০	২৬৭'৩	১২৫'৯	১০৭'১
১৯৫৮-৫৯	১১,৬৫০	২৮০'১	১৩৪'৭	১১২'২
১৯৫৯-৬০	১১,৮৬০	২৭৯'২	১৩৭'১	১১২'[illegible]
১৯৬০-৬১	১২,৭৫০	২৯৩'৭	১৪৭'৪	১১৭'৭
১৯৬১-৬২	১৩,০২০	২৯৩'৪	১৫০'৫	১১৭'৫

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রথম দশ বৎসরে গড় জাতীয় আয় এবং গড় মাথাপিছু আয় যথাক্রমে মোটামুটি ৪২ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে মাথাপিছু ভোগ্য আয়ের সঠিক নির্দ্দেশ পাওয়া সম্ভব নহে। কেননা রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারী ও আধা-সরকারী দাবি মিটাইয়া যে নীট আয় দাঁড়ায় তাহাই কেবল আয়কারীর আপন ভোগে লাগান সম্ভব। সরকারী পরিসংখ্যানে এইরূপ কোন হিসাবের নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু অন্য আর একদিক দিয়া বিচার করিলে এই নীট মাথাপিছু ভোগ্য আয়ের সঠিক এবং নির্ভুল হিসাব না পাওয়া গেলেও, একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রথমে ধরা যাউক সরকারী রাজস্বের দাবি। প্রথম পরিকল্পনা প্রযোজনের অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসরে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ দ্বারা দাখিল করা এক হিসাব মতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসরে এদেশে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য রাজস্বের মোট মাথাপিছু পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৮৲ টাকা। এই মোট রাজস্বের প্রায় ৯৩ শতাংশ আদায় হইত প্রত্যক্ষ করের দ্বারা, পরোক্ষ করের চাপ ছিল মোট করভারের মাত্র ৭ শতাংশ। ১৯৫৫-৫৬ সন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর পর্য্যন্ত) মাথাপিছু বার্ষিক কেন্দ্রীয় করভারের পরিমাণ দেড়-গুণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১২৲ টাকা ৭০ নয়া পয়সায়। ১৯৬০-৬১ সন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তিম বৎসর) ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় কেন্দ্রীয় করভার আরও আড়াই গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়া মোট ২০৲ টাকা ৭৫ নঃ পয়সায় ওঠে। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে বরাদ্দ অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় করভারের বোঝার ফলে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি মিটাইতেই মাথাপিছু মোটামুটি ৩১ টাকার মতন ব্যয় করিতে হইবে। রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের দাবি ইহার সহিত যোগ করিলে দেখা যাইবে যে মোটামুটি মাথাপিছু করভারের পরিমাণ দাঁড়াইবে মোট প্রায় ৩৭ টাকা। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ বিবেচ্য আছে। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর হিসাব মতন দেখা যাইতেছে যে ১৯৫০-৫১ সনে মোট করভারের মাত্র ৭ শতাংশ পরোক্ষ করের দ্বারা আদায় করা হইত। পরবর্ত্তী কালে এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ভারসাম্য ক্রমেই বদলাইতে সুরু করে এবং মোট করভারের তুলনায় পরোক্ষ করের শতাংশ পরিমাণ ক্রমিক গতিতে উর্দ্ধতর সংখ্যায় আরোহণ করিতে থাকে। বোম্বাই শহরের জনৈক খ্যাতনামা অর্থ-বৈজ্ঞানিকের হিসাব মত, বর্ত্তমান বৎসরে এই পরোক্ষ করের পরিমাণ মোট করভারের ৭৪ শতাংশ অধিকার করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বিশেষ বিবেচ্য এই যে, এই পরোক্ষ করের একটা মোটা অংশ (কেহ কেহ বলেন যে, ইহার পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ, তবে এই হিসাব নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না)

তেল, চিনি, কেরোসিন, দিয়াশলাই, বস্ত্র ইত্যাদি মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য ও অবশ্যভোগ্য পণ্যসমূহের উপরে আবগারী শুল্কের আকারে ধার্য্য করা হইয়াছে। এই সকল সরকারী দাবি মিটাইয়া দেশের মাথাপিছু ভোগ্য আয়ে যে পরিকল্পনার দশ বৎসর কালে বিশেষ প্রগতি লাভ করিয়াছে এই দাবি প্রমাণসহ নহে। বস্তুতঃ পরিকল্পনা প্রযোজনার সুরু হইতে আজ পর্য্যন্ত মাথাপিছু আয় যে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, অবশ্য-দেয় সরকারী দাবি মিটাইয়া দেখা যাইবে যে নীট ভোগ্য আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইবে দশ-বারো বৎসরে ৪ শতাংশেরও কম। কিন্তু ইহার দ্বারাও ভোগ্য আয়ের সঠিক পরিমাণের নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে না। পরোক্ষ করভারের অনিবার্য্য প্রকোপের ফলে এবং অংশতঃ মুনাফা-বাজদিগের সমাজবিরোধী (বস্তুতঃ জনদ্রোহী এবং ফলে দেশদ্রোহী) ও বিবেকহীন কার্য্যকলাপের কারণে গত বারো বৎসরে অবশ্যভোগ্য পণ্যসমূহের যে প্রচণ্ড পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার ফলে মানুষের প্রকৃত আয়ে (real income) অনিবার্য্যভাবে আরও অনুরূপ সঙ্কোচন ঘটিয়াছে। তাহার উপরেও নিম্নস্তরের আয়ের উপরে যে অবশ্য-সঞ্চয় আইনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহারও ফলে ভোগ্য আয়ের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। সরকারী পাইকারী মূল্যমানের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৫৫-৫৬ সনের মূল্যমানের তুলনায় জীবনধারণের জন্য অনিবার্য্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যগুলির মধ্যে চাউলের মূল্য বর্ত্তমানে ৪১ শতাংশ, গমের মূল্য ২৫ শতাংশ, চিনির মূল্য ৩৮·৪ শতাংশ, গুড়ের মূল্য ১৪৭·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্যভোগ্য খাদ্যপণ্যের এই প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত ভোগ্য আয়ের পরিমাণ (The measure of disposable real income) মাথাপিছু হিসাবে ১৯৫১-৫২ সনের তুলনায় কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই, বরং কিছুটা আরও নীচে নামিয়া গিয়াছে।

শ্রী নন্দ লোকসভায় এই প্রসঙ্গে যে, হিসাব দাখিল করিয়াছেন, তাহা মাথাপিছু আয়ের হিসাব নহে, ভোগ ব্যয়ের হিসাব (Consumption expenditure)। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যানে দেখা যাইতেছে যে, দেশের মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু গড় দৈনিক আয়ের পরিমাণ ৮১½ নয়া পয়সা। ভোগব্যয়ের যে হিসাব শ্রী নন্দ দাখিল করিয়াছেন সেই অনুযায়ী যদি দেশের নিম্নতম আয়ের ৬০ শতাংশের গড় আয় যদি উর্দ্ধতম ৪০ শতাংশ লোকের এক-তৃতীয়াংশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে ঐ ৬০ শতাংশ জনসংখ্যার দৈনিক গড় আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭½ নয়া পয়সা মাত্র। ইহা হইতে অবশ্যদেয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের রাজস্বের দাবি মিটাইয়া নীট ভোগ্য আয়ের পরিমাণ আরও অবশ্যই কম হইবে। অতএব বুঝিতে হইবে যে ভোগ-ব্যয়ের যে দৈনিক হিসাব শ্রী নন্দ দাখিল করিয়াছেন, তাহা নীট দৈনিক আয়ের তুলনায় দরিদ্রতম ৬০ শতাংশ জনসংখ্যার পক্ষে দৈনিক প্রায় ১০।১১ নয়া পয়সা বেশী। এই হিসাব অবশ্যই সঠিক বা নির্ভুল বলিয়া দাবি করা হইতেছে না, ইহা আনুমানিক হিসাব মাত্র। কিন্তু মোটামুটি ইহা যে বাস্তব চিত্রটি সূচিত করিতেছে, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

লোকসভায় এই বিষয়টির বিশেষ বিতর্কের উপলক্ষ্যে শ্রী নন্দ যাহা বলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। দেশের এই আর্থিক দুর্গতির কথা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার হিসাব মত যে দেশের দরিদ্রতম ৬০ শতাংশ জনসংখ্যার মাথাপিছু দৈনিক ভোগব্যয় লোহিয়া বর্ণিত ৩ আনা নহে, তাঁহার হিসাব মত সাড়ে সাত আনা, কিন্তু এই উচ্চতর সংখ্যাও তিনি স্বীকার করেন, জাহির করিয়া প্রচার করিবার মতন নহে। দেশের জনসাধারণের প্রচণ্ড দারিদ্র্য যে বাস্তব তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার জন্য লোক-সংখ্যার প্রভূত পরিমাণ সংখ্যাবৃদ্ধি প্রধানতঃ দায়ী বলিয়া তিনি বলেন। জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার যে ব্যাপক ও সর্ব্বাত্মক আয়োজন প্রয়োগ করিতে-ছেন, তেমন আর কোন দেশে আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু তবুও বার্ষিক সংখ্যাবৃদ্ধির হার ২·৬ শতাংশের নীচে বাঁধিয়া রাখা সম্ভব হইতেছে না। ইহার প্রধান কারণ প্রজনন বৃদ্ধি (birth rate) নহে, দেশের নানাদিক-প্রসারী যে অগ্রগতি সাধিত হইতেছে তাহার ফলে জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে। গত দশ বৎসরে এদেশে মানুষের পরমায়ু ৩২ বৎসর হইতে ৪২ বৎসরে উঠিয়াছে। এই প্রচণ্ড লোকসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান চাপের ফলে বেকার সংখ্যা-বৃদ্ধিও ঘটিতেছে। পরিকল্পনাজাত নূতন কর্ম্মসংস্থানের প্রভূত বিস্তৃতি সত্ত্বেও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক হিসাবে ধরা হইয়াছিল যে এই পরিকল্পনার অন্তিমে দেশে ১৭০ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যাইবে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ইহা আরও বেশী হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, শ্রী নন্দ বলেন, ইহাও অনস্বীকার্য্য যে গত দশ বৎসরে দেশের সাধারণ জীবনমান আশানুরূপ না হইলেও বেশ খানিকটা উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশের সাধারণ লোকের ভোগের

পরিমাণ, খাদ্যে, বস্ত্রে এবং অন্যান্য ভোগ্যে আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়াছে, শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—বর্ত্তমানে তিনি বলেন দেশের প্রায় ৮৬ শতাংশ বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে সুরু করিয়াছে। তিনি বলেন যে স্বাধীনতার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ দুইটি বিশেষ দিকে উন্নতির পথ প্রস্তুত হইতে সুরু করিয়াছে। প্রথমতঃ, বহু শতাব্দী হইতে চলিয়া-আসা আর্থিক নিষ্ক্রিয়তা হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া আনা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ, দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, আগামী ১০।১২ বৎসরের মধ্যে এমন একটা স্বয়ংক্রিয় (self-generating) সচলতার (dynamics) অবস্থায় দেশ উপনীত হইবে, যখন দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য আর বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হইবে না। সরকার দেশবাসীর দারিদ্র্য সম্বন্ধে সর্ব্বদাই অবহিত আছেন। বাসগৃহ, কর্ম্মসংস্থান ইত্যাদির অভাব প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে তিনি স্বীকার করেন, এ সকল সমস্যা অধিকতর লগ্নী দ্বারাই কেবল মাত্র সমাধান করা সম্ভব।

শ্রীগুলজারিলাল নন্দকে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একজন সৎ, বিবেকশাসিত ও ধীরবুদ্ধি ব্যক্তি বলিয়া জানি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কিন্তু পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁহার মত আশাবাদী হইবার আমরা আজিও কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। দারিদ্র্য, মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি, বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি ও এইগুলির কারণে ফলে আরও দারিদ্র্যবৃদ্ধি, এই দুষ্টচক্রের (Vicious circle) অস্তিত্ব তিনি নিজেও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে দেশের সাধারণ লোকের জীবনমান আশানুরূপ না হইলেও কিছুটা উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহাদের ভোগবৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার নিজের দাখিল করা ভোগ-ব্যয়ের তালিকার সহিত গত বার বৎসরে জাতীয় ও মাপাপিছু ভোগ্য-আয়ের তুলনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, কেবলমাত্র জীবনবহনের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার অনিবার্য্য তাগাদায় দেশের দরিদ্রতম জনসাধারণের ভোগ-ব্যয়, তাঁহাদিগের ভোগ্য আয়টুকুকে অনেকটা পরিমাণে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহাই যদি আজিকার দেশের দারিদ্র্যের সত্যকার পরিমাপ হয়, তবে উপরোক্ত দুষ্টচক্রের ব্যূহ ভেদ করিয়া দেশ কবে যে উন্নতির সহজ পথে (linear lines of progress) অগ্রসর হইতে সুরু করিবে তাহা নিতান্তই অনুমানের বিষয়, হিসাবের বাস্তব গণ্ডির বাহিরে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রী নন্দ অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার কেবল বিরুদ্ধ সমালোচনা ব্যতীত বর্তমান অবস্থা হইতে মুক্তির পথ কেহই বলিয়া দিতে সমর্থ হন নাই। শ্রী নন্দর দাবি অসমীচীন না হইলেও ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় যে, যে ধরনের প্রশাসনিক আয়োজন লইয়া সরকার চলিতেছেন, তাহার মধ্য হইতে পূর্ব্ব-বর্ণিত দুষ্টচক্রের ব্যূহ ভেদ করিয়া সত্যকার সহজ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ নহে। দেশে গত দশ-বারো বৎসরে অবশ্যভোগ্য বিশেষ করিয়া খাদ্যপণ্যাদির যে প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, এবং যাহার ফলে ভোগ্য আয়ের পরিমাণ অনুরূপ পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং ক্রমেই আরও হইতেছে, তাহা বিশেষ করিয়া এই প্রশাসনিক আয়োজনেরই বিফলতা সূচিত করিতেছে। অন্যদিকে সরকারী রাজস্বনীতিও যে প্রত্যক্ষ ভাবে এই ভোগব্যয়ের সঙ্কোচ ঘটাইয়া এক দিকে দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অন্য দিকে জাতীয় সঞ্চয় ব্যাহত করিতেছে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই দুই দিক দিয়া দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গিবার প্রয়াস করিলে যে উন্নয়নের পথ খানিকটা সুগম হইত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অন্য দিকে কি কৃষি, কি সরকারী মালিকানার শিল্পক্ষেত্রে লগ্নীর তুলনায় উৎপাদন যে বিশেষ পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা সরকার পক্ষ হইতেই সম্প্রতি স্বীকার করা হইয়াছে। এই সকল জাতীয় শক্তি ক্ষয়কারী অবস্থাসমূহের নিরসন কেবলমাত্র প্রশাসনিক আয়োজনের সার্থক প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ইহা সুনিশ্চিত যে, কেবলমাত্র আর্থিক লগ্নীর পরিমাণ বাড়াইয়া বা কতকগুলি নূতন নূতন কলকারখানা, সেচসংস্থা ইত্যাদি স্থাপন করিয়া এই দুষ্টচক্রের ব্যূহ ভেদ করিয়া সহজ পথে নির্গত হওয়া ও দেশের জনসাধারণের জীবনহানিকর দারিদ্র্যমোচনের পথ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। অন্যপক্ষে মূল্য স্থিরতা রক্ষা করিতে না পারিলেও ইহা ঘটা অসম্ভব। কেবলমাত্র লগ্নী বা আর্থিক আয়োজনের দ্বারা এই প্রয়োজন সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। চাই প্রশাসনিক সততা ও তাহার সার্থক প্রয়োগ। শ্রী নন্দকে আমরা এই কথা কয়টি ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন

পি এস্ পি দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ও নেতৃত্বে সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া কলিকাতায় যে খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন চালান হইতেছে, তাহার সম্যক্ তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য খাদ্যবস্তুর উচিৎ মূল্য নিরূপণ ও তাহার সার্থক

ও কার্য্যকরী প্রয়োগ যে ঠিক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন এ কথা বলা চলে না। রাজ্যের ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় চাউল ও চিনির সরবরাহের ঘাট্‌তিই যে এ সকল পণ্যের বর্ত্তমান কালোবাজারী মূল্যমানের জন্য দায়ী, একথা রাজ্যসরকার স্বয়ং একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন। আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা modified rationing-এ সকল পণ্যে কালোবাজারী মুনাফাবাজী খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে বলিয়া সরকার পক্ষ হইতে দাবি করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ও বিশেষ করিয়া কলিকাতা শহর ও তাহার উপকণ্ঠে এ ভাবে এক-তৃতীয়াংশ লোকসংখ্যার এ সকল পণ্যের চাহিদা পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। এভাবে পূর্ণবয়স্কদের মাথাপিছু সপ্তাহে ১ কিলো চাউল, ১ কিলো গম ও ৪০০ গ্রাম করিয়া চিনি দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ চাউল ও গম মিলাইয়া মাথাপিছু দৈনিক ২৮৫·৭ গ্রাম চাউল+গম দেওয়া হইতেছে। ইহা অবশ্যই সরকারী নির্দ্ধারিত দৈনিক ১৬·৫ আউন্সের অনেক কম। তাহা ছাড়া এই উপায়ে আপাততঃ রাজ্যের ৩,৭১,০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৬৩,০০,০০০ লোকের আংশিক চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত চাহিদা মেটান একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের মজুদ হইতে অতিরিক্ত সাহায্য পাইলেই সম্ভব হইতে পারে। এবং তাহা না করিতে পারিলে খোলা বাজারের অতিরিক্ত উচ্চ মূল্য কমিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তাহাও অবিসম্বাদী। চিনির ব্যাপারে রাজ্যসরকারের সিদ্ধান্ত মতন গত ২রা সেপ্টেম্বর হইতে সুরু করিয়া চিনির সম্পূর্ণ বণ্টন কেবলমাত্র র‍্যাশন কার্ড অনুযায়ীই করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। মফঃস্বলে কি অবস্থা আমাদের সম্পূর্ণ জানা নাই, তবে কলিকাতায় ও উপকণ্ঠেও সকলে এখনও র‍্যাশন কার্ড পান নাই। এবং চিনির কালোবাজারী কারবার যে এখনও বেশ পুরামাত্রায়ই চলিতেছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া কালোবাজারী মুনাফার নতুন নতুন পন্থাও উদ্ভাবিত হইতেছে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে র‍্যাশন কার্ড অনুযায়ী বণ্টন করা মোটা দানার চিনিতে প্রচুর জলের ভাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ওজনে নীট চিনির পরিমাণ আনুপাতিক ভাবে কিছু কম হইতে বাধ্য এবং উদ্‌বৃত্তাংশ হয় ত কালোবাজারে উপস্থিত হইয়া থাকে।

দেশের সাধারণ চরিত্রমানের বর্ত্তমান অবস্থায় এ সকল ব্যাপার যে খানিকটা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসন ব্যবস্থার প্রকট বিফলতাই যে এই ধরণের ব্যবসায়িক শঠতার অভাবের জন্য অন্ততঃ বিশেষ ভাবে এবং অংশতঃ দায়ী তাহাতেও সন্দেহের কারণ নাই। বিশেষ করিয়া সরকারী মূল্যনীতির (price policy) সম্পূর্ণ অভাবই যে ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী এ-কথাও স্বীকার করিতেই হইবে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার পর হইতে গত ১৬ বৎসরের মধ্যে ভারত সরকারের খাদ্য ও মূল্যনীতি বলিয়া যে কিছু একটা কখনও ছিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাস আজি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়াগুলিতে অবশ্যই খাদ্য ও মোটামুটি কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কল্পনা করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার প্রাক্কালে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ঐ পরিকল্পনাকালের মধ্যেই দেশকে অন্ততঃ খাদ্যপণ্যের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। সরকারী হিসাবমত প্রথম পরিকল্পনাকালের পাঁচ বৎসরে মোটামুটি কৃষি উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সনের তুলনায় ২২·২ শতাংশ ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তে সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে, ১৯৫৫-৫৬ সনের তুলনায়, ১৫·৪ শতাংশ ও খাদ্যশস্যে ১০·৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি সাধিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তে মোটামুটি কৃষি উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সনের তুলনায় আরও ৩০ শতাংশ ও খাদ্যশস্যে ৩২ শতাংশ বাড়িবে বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল, কিন্তু এই পরিকল্পনার আড়াই বৎসরে খাদ্য উৎপাদনে মোটামুটি ৪ শতাংশেরও কম উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ইহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যনীতি বলিয়া যদি কিছু থাকিয়া থাকে তাহা একদিকে আবার বেশী পরিমাণে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করা (শ্রী পাতিল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাবলিক ল' ৪৮০-র পুনঃপ্রবর্ত্তন করাইয়া এইটুকু করিয়া গিয়াছেন) এবং ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে মুনাফাবাজীর অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করা। খাদ্য বা সাধারণ অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্য সম্বন্ধে সরকারের কোন মূল্যনীতি নিরূপণের কোনই লক্ষণ আজি পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই।

গত দুই বৎসর হইতেই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ এই বিষয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার হিসাবমতন দ্বিতীয় পরিকল্পনাপ্রসূত উন্নয়নের একটা মোটা অংশ মূল্যবৃদ্ধির চাপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে (The achievements of the second plan have been substantially neutralized by the pressure of rising prices) এবং এই সাপক্ষে কার্য্যকরী প্রয়োগ রচিত না হইলে তৃতীয় পরিকল্পনার বাস্তব উন্নয়নও অবশ্যম্ভাবীরূপে আনুপাতিক ভাবে ব্যাহত হইবে। গত বৎসরের শেষ ভাগে চীনা আক্রমণজনিত জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার এই আশঙ্কা আরও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা বুঝা কঠিন নহে যে, খাদ্য ও অর্থ-

দপ্তরের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদ্বয় তাঁহার এই আশঙ্কায় সায় দিতে স্বীকৃত হন নাই। ফলে ধর্ম্মের বাণী ও নানাবিধ আধা-সরকারী ও বেসরকারী আয়োজনের দ্বারা যথাসম্ভব এই আশঙ্কার বাস্তব প্রকোপ নিয়মিত করিবার প্রয়াস করেন। কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ বিফলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে বর্ত্তমান মূল্যমানই তাহার অনস্বীকরণীয় প্রমাণ।

কিন্তু এ সকলই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের ক্ষমতা ও অধিকার বহির্ভূত বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকার যতক্ষণ না একটা উচিৎ, সার্থক ও বিচারসহ মূল্যনীতি রচনা ও তাহার সার্থক ও সফল প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন, ততক্ষণ রাজ্যসরকারের সাধ্য নাই এ বিষয়ে সত্যকার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহারা কিছু কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা খানিকটা উপকার সাধন হয়ত করিলেও করিতে-পারেন, কিন্তু তাহার দ্বারা মোটামুটি বিশেষ এবং সর্ব্বাত্মক (comprehensive) ফল যে বর্ত্তমানে সম্ভব নহে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সরকারী ঔদাসীন্যের উপরে প্রতিঘাত করিতে হইলে তাহা করা উচিৎ কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বা নীতির অভাবের উপরে, রাজ্যসরকারকে বিব্রত করিয়া কি ফললাভ হইতে পারে বুঝা কঠিন।

তবে পি এস পি দল একটা কাজ করিতে পারিতেন। এই আন্দোলন কেবলমাত্র রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করিয়া তাঁহারা যদি প্রধানতঃ কালোবাজারী, মুনাফাবাজ ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংহত দল-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন তাহা হইলে হয়ত মুনাফাবাজীর বিরুদ্ধে একটা উপযুক্ত দৃঢ় ও প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে পারিত। বর্ত্তমানে মুনাফাবাজীর অবাধ সুযোগের প্রধান কারণই এই যে, জনসাধারণ তাহাদের অন্যায় অত্যাচার বিনাপ্রতিবাদে সহ্য করিয়া চলিতেছেন। প্রতিবাদ সকলেরই অন্তরে বহুদিন হইতেই ধূমায়িত হইয়া চলিতেছে, তাহার শক্তিটুকুকে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহার প্রয়োগ সম্ভব করিতে পারিলে, কি ব্যবসায়ীগোষ্ঠী, কি তাহাদের অসৎ পৃষ্ঠপোষকগোষ্ঠী, (ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সরকারীমহলে, এমন কি মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যেও অন্যায় মুনাফা-বাজদিগের উচ্চপদাধিকারী পৃষ্ঠপোষকের অপ্রতুল নাই) কি কেন্দ্রীয় সরকার বুঝিতে পারিতেন বর্ত্তমান অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কতখানি ধ্বংসকারী হইতে পারে।

কলিকাতায় পানীয় জল

কলিকাতায় পানীয় জলের সরবরাহের অভাব বহুকালের চলিয়া আসা সমস্যা। ১৯৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্লানিং অর্গানাইজেশনের হিসাব মতে কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দের অন্ততঃ ৫০ শতাংশ শহরের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব ভোগ করিতেছেন। ইহাদের অধিকাংশই কিছুটা স্থানীয় নলকূপ হইতে, কিন্তু প্রধানতঃ অপরিশুদ্ধ জল দিয়াই তাঁহাদের দৈনন্দিন ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতে বাধ্য হন। কলিকাতা ও শহরতলীতে বৎসরভোর ধরিয়া যে কলেরা ও নানাবিধ হজম-বিঘ্নকারী (Gastro-intestinal) রোগসমূহের প্রকোপ চলিতে থাকে তাহার প্রধান কারণই এই পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রতি বৎসর ভারতে কলেরা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক রোগের অধিকাংশ অংশই কলিকাতা ও শহরতলীতেই জন্মিয়া থাকে এবং তথা হইতেই নানা দিকে ছড়াইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা কর্পোরেশনের বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহের সুবিধা পাইয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যেও এ প্রকার রোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে বলিয়া দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি একটি অনুসন্ধানের ফলে নির্ণিত হইয়াছে যে, ইহার প্রধান কারণ অধিকাংশ বাসগৃহের পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ঠিকমতন ও নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না বলিয়া। কলিকাতায় বহু বাসগৃহ আছে দেখা গিয়াছে যেখানে বৎসরান্তে একবারও এ সকল পানীয় জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা হয় না। ফলে এ সকল ট্যাঙ্কে নানাবিধ পানীয়জলবাহী রোগের বীজাণু প্রচুর সংখ্যায় জন্মিবার ও বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পাইয়া থাকে ফলে নানাবিধ পেটের রোগে শহরবাসী বহুলোক চিরকালই ভুগিতে থাকেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রীসুনীলবরণ রায় এ বিষয়ে আশু প্রতিকারের প্রয়োজন বোধ করেন এবং শুনা যায় যে এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের তরফ হইতে বিভিন্ন গৃহে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক নিয়মিত পরিষ্কার করিবার একটি কায়েমী আয়োজন গঠনের প্রস্তাব করেন। জানা যায় যে কর্পোরেশনের কোন কোন কাউন্সিলার এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে হইলে যে খরচ অবশ্যই করা প্রয়োজন হইবে তাহা মঞ্জুর করিতে বাধা দেন। নিজ নিজ গৃহের পানীয় জলের ট্যাঙ্ক নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করিবার দায়িত্ব অবশ্যই গৃহকর্ত্তা বা তাঁহাদের ভাড়াটিয়াদের নিজ দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব তাঁহারা নিজেরা পালন না করিলে, শহরের জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে কর্পোরেশনকেই ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে কিছু খরচ অবশ্যই অনিবার্য্য। আইনতঃ হয়ত কর্পোরেশনের এই খরচ বহন করিবার দায়িত্ব নাই। কিন্তু শহরবাসী কর্পোরেশনকে যে নিয়মিত ট্যাক্স দিয়া থাকেন তাহার

বদলে কর্পোরেশনের নিকট হইতে তাঁহাদেরও কিছু দাবি থাকিতে পারে, এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। কলিকাতার জঞ্জাল সাফের কাজটিতে আগেকার তুলনায় সম্প্রতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও শহরটি যে এখনও প্রভূত পরিমাণে জঞ্জালাকীর্ণ এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। বস্তুতঃ নিরেপক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীর মতে আজিকার দিনে কলিকাতার মতন এমন নোংরা শহর দেশে আর কোথাও নাই। তার পর পানীয় জল সরবরাহ। এখানে কর্পোরেশনের বিফলতা প্রচণ্ড। গত ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়াই কলিকাতা-বাসী উপযুক্ত পরিমাণে শোধিত পানীয় জলের অভাব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। গত ১৫।১৬ বৎসরে ইহা এত বেশী প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে যে শহরের প্রায় অর্দ্ধেকসংখ্যক অধিবাসী অপরিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং তাহার ফলে প্রতিবৎসর বহু লোক কলেরা ও অন্যান্য রোগের প্রকোপে মারা পড়িতেছেন। কলিকাতার এক-তৃতীয়াংশ লোক এমন সকল বস্তীতে বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন যাহা প্রকৃতই মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই সকল এবং অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা—যেগুলির সম্পর্কে কর্পোরেশনের সরাসরি দায়িত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই—নিরসনের কাজে কলিকাতা কর্পোরেশন বহু বৎসর ধরিয়া কিছুই করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ইহার খানিকটা যে অন্ততঃ তাঁহাদের অন্যায় ঔদাসীন্যপ্রসূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

পানীয় জলের ট্যাঙ্কগুলি নিয়মিত পরিষ্কার রাখিবার সামান্য ও প্রাথমিক দায়িত্ব যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তবে এই পৌরসংস্থাকে কেন বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে না তাহা বুঝা কঠিন। শ্রীসুনীলবরণ রায় কর্পোরেশনের কমিশনারের পদ গ্রহণ করিবার পর তিনি যে আপ্রাণ পরিশ্রমে খানিকটা উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পদে পদে কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগোষ্ঠীর নিকট হইতে তাঁহাকে যে বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে হইতেছে, তাহাতে কতদিন তিনি কাজ করিতে সমর্থ হইবেন তাহা অনিশ্চিত। পানীয় জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করিবার যে সামান্য খরচ তাহা যদি কর্পোরেশন নিতান্তই বহন করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে এই খরচাটুকু গৃহকর্ত্তাদের নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা অসম্ভব নহে। পরিষ্কার করিবার দায়িত্ব কর্পোরেশনেরই গ্রহণ করা প্রয়োজন—শহরের জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ইহা একান্ত জরুরী—তবে যদি ইহার খরচা নিতান্তই গৃহকর্ত্তাদের নিকট হইতে আদায় করিতেই হয়, তাহার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হওয়া উচিত নহে। ইতিমধ্যে পরিষ্কার করিবার কাজটুকু সুরু করিতে বা চালাইয়া যাইতে যাহাতে দেরি না হয় তাহার ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন।

কলিকাতার অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা

কলিকাতার অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা আজিকার সমস্যা নহে। বহুদিন হইতেই ক্রমে এই বৃহত্তম ভারতীয় নগরীটির জীবন বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা ও সঙ্কটের দ্বারা এমন ভাবে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছিল যে এককালের প্রধানতম এই জনপদ ও বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রটি ক্রমেই মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল।

স্বাধীনতা লাভ ও তৎসম্পর্কিত দেশের দ্বিধাবিভাগের ফলে এই খণ্ডিত প্রান্তটুকুর উপর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর হঠাৎ চাপ এই মুমূর্ষু-প্রায় মহানগরীর প্রায় নাভিঃশ্বাস ঘটাইয়া তুলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মহানগরী ও তৎসংলগ্ন শহরতলীসমূহেই এই পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থীদিগের ভিড় বেশী করিয়া ঘটে, ফলে এই শহরটিকে বাঁচাইবার আশু ও কার্য্যকরী ব্যবস্থা না হইলে যে ইহাকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না, এই আশঙ্কাটি অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৯৫৯ সনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা কমিটির মতে কলিকাতা শহরের জনস্বাস্থ্য ত্রিবিধ সমস্যার দ্বারা শঙ্কান্বিত হইয়াছিল, যথা পরিশুদ্ধ পানীয় জলের উপযুক্ত সরবরাহ, উপযুক্ত জল-নিষ্কাশন ও সিউয়ারেজ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি। ইহার আশু এবং সার্থক প্রতিকার না হইলে এই মহানগরীটিকে কায়েমী কলেরা রোগের প্রকোপ হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে। শহরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী পরিশোধিত পানীয় জল পান না; শহরের ৪০ শতাংশ লোকের মাত্র দৈনিক ময়লা পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা আছে; জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় ঘনবসতি অঞ্চলে প্রায়ই জল জমিয়া

থাকে এবং উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করে ও মাছির উপদ্রব ঘটায় এবং মোটামুটি সমগ্র শহরে এবং শহরতলীতে একটা অস্বাস্থ্যকর ও বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

উপরোক্ত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অভিমত ও পরবর্ত্তী কালে বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক সংস্থাসমূহের সুপারিশক্রমে কলিকাতার নানাবিধ ও বহুমুখী সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস সমাধানের উদ্দেশ্যেও স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ চেষ্টার ফলে ১৯৬১ সনের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্লানিং অর্গানাইজেশন নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতা মহানগরী ও সংশ্লিষ্ট এলাকা-সমূহের বহুবিধ সমস্যার সমাধান এবং এই মহানগরী ও সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির ভবিষ্যৎ প্রসার ও প্রগতি রক্ষাকল্পে পরিকল্পনা রচনা ও তাহার প্রয়োগের দায়িত্ব এই সংস্থাটির উপরে অর্পণ করা হয়। এই জটিল দায়িত্বপালনে সংস্থাটি ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, ইনষ্টিটিউট অব্ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন (নিউ ইয়র্ক) এবং অন্যান্য বহুবিধ আন্তর্জ্জাতিক সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। প্রাথমিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া কাজ শুরু করিতে ১৯৬২ সনের প্রথম ভাগে আসিয়া পড়ে। তাহার পর কাজ কিছুটা আগাইয়াছে এবং সম্প্রতি তাহার বিবরণসম্বলিত প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্থাটির প্রাথমিক দায়িত্ব কলিকাতাকে রক্ষা করিবার একটি উপযুক্ত কার্য্যক্রম রচনা করা। কাজটি সহজ নহে। বস্তুতঃ ইহা বহুবিধ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমস্যার দ্বারা কণ্টকিত ও তৎকারণে অসম্ভব জটিলতাপূর্ণ। সমস্যা কেবল জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পানীয় জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন, ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি মাত্র নহে। ইহার সঙ্গে জড়িত বস্তীসংস্কারের সমস্যা, বাসগৃহের সমস্যা, কর্ম্মসংস্থানের সমস্যা, পরিবহন সমস্যা ইত্যাদি আরও বহুতর জটিল বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে আছে হুগলী নদীর সংস্কার (কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাইতে হইলে ইহার প্রতি আশু মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন), কলিকাতা বন্দরের ও প্রস্তাবিত হলদিয়া বন্দর ইত্যাদির পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন।

রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এ সকল সম্বন্ধেই এই সংস্থাটি উপযুক্ত তথ্যানুসন্ধান ও প্রাথমিক পরিকল্পনা রচনার কাজে গত এক বৎসরে খানিকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা পৌরসংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগে সংস্থাটিকে কিছু কিছু আপাতঃ সমস্যার সমাধান-কল্পেও খানিকটা পরিমাণ মনোযোগ দিতে হইয়াছে।

সংস্থাটির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া যাইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতার শহর বা শহরতলী বর্ত্তমান অবস্থায় স্থাণু হইয়া বসিয়া নাই। শহর বা শহরতলীর কতকগুলি এলাকায় ঘনবসতির ঘনত্ব আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিতেছে। শিক্ষার, কর্ম্মসংস্থানের, বাসগৃহের সমস্যা দ্রুতলয়ে আরও অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বস্তী সংস্কারের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রচিত হইবার পূর্ব্বেই নূতন নূতন বস্তীর সৃষ্টি হইতেছে।

এই কারণে সংস্থাটি দুইভাবে এ সকল সমস্যার সমাধানের উপায় চিন্তা করিতেছেন। প্রথমতঃ পানীয় জল, বাসগৃহ ইত্যাদি কতকগুলি আপাতঃ সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রয়োগ করিয়া পরে সামগ্রিক সমাধানের দিকে মনঃসংযোগ করা হইবে। ইহা সদ্বিবেচনার কাজ। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় সমস্যার সমাধান, অর্থাৎ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রয়োগ করিবার মত উপযুক্ত পুঁজি সংগ্রহ করা, সম্ভব হইবে কিনা তাহা এখনও অনিশ্চিত। বিষয়টি বিরাট, সমস্যা অসম্ভব জটিল এবং সমাধান প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ। তবু যে এ বিষয়ে মনঃসংযোগের একান্ত জরুরী প্রয়োজন ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বিবরণীটি তথ্যবহুল ও কলিকাতার সমস্যাসমষ্টি লইয়া যাঁহারা চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট অনুশীলন-যোগ্য। স্থানাভাবে বিশদতর আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অসম্ভব বলিয়া আমরা দুঃখিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী বর্দ্ধিত আকারে বহু আকর্ষণীয় গল্প প্রবন্ধাদি সম্ভারে পরিপূর্ণ বিশেষ সংখ্যা হিসাবে বাহির হইবে। মূল্য একই থাকিবে।

বেদের সময় নির্ণয়

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সর্বপ্রথমে ম্যাক্সমূলর বেদের সময় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন।১ তিনি এই ভাবে গবেষণা করেন। বুদ্ধের পূর্বে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ, আরণ্যক এবং উপনিষদ সম্পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান ছিল। সূত্র-সাহিত্য তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহার তারিখ দেন খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২০০।২ বেদের ব্রাহ্মণ অংশ অবশ্য সূত্র-সাহিত্যের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তিনি অনুমান করেন যে, ব্রাহ্মণগুলি রচনা করিতে অন্ততঃ ২০০ বৎসর লাগিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, সকল ব্রাহ্মণ একই সময়ে রচিত হয় নাই, কতকগুলি ব্রাহ্মণ, অপর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীন। এইভাবে তিনি ব্রাহ্মণগুলির রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ বলিয়া নির্দেশ করেন। ব্রাহ্মণগুলির পূর্বে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা রচিত হইয়াছিল। এই মন্ত্রগুলির রচনার জন্য ২০০ বৎসর এবং সংগ্রহের জন্য ২০০ বৎসর তিনি অনুমান করেন। সংগ্রহ যদি খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হয়, তাহা হইলে বেদের মন্ত্র রচনা করিবার সময় খ্রীঃ পূঃ ১২০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ ধরা যায়। বলা বাহুল্য এই সকল কাল নির্ণয় কেবল অনুমান মাত্র। যেস্থলে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকার রচনার জন্য ম্যাক্সমূলর ২০০ বৎসর ধরিয়াছেন, সেস্থলে ডাঃ হগ (Dr. Haug) প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকার রচনার জন্য ৫০০ বৎসর ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে চীনদেশের সাহিত্যে ঐরূপ রচনা ৫০০ বৎসরে হইয়াছিল। অধ্যাপক উইলসনেরও মতে প্রত্যেক বিভিন্ন রচনার সময় ৫০০ বৎসরব্যাপী হওয়াই সম্ভব (Tilak's Orion, পৃঃ ৪)। ম্যাক্সমূলরের প্রণালী গ্রহণ করিয়া ডাঃ হগ বেদের প্রারম্ভ ২৪০০ হইতে ২০০০ (খ্রীঃ পূঃ) বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।৩ নির্ভুল সময় নির্দেশ করিবার জন্য ম্যাক্সমূলরের পদ্ধতির বিশেষ কোনও মূল্য নাই। ইহা তিনি নিজেই উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল ইহা প্রমাণ করা যে, বেদের রচনার প্রারম্ভ খ্রীঃ পূঃ ১২০০-র পরে হইতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "বৈদিক মন্ত্রগুলির রচনার সময় খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বা ১৫০০ বা ২০০০ ৩০০০ তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।"৪ কিন্তু কালক্রমে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এরূপ ধরিয়া লইলেন যে, ম্যাক্সমূলর প্রমাণ করিয়াছেন যে বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১২০০ হইতে ১০০০। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের এই ভ্রম হুইটনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন।৫ উইণ্টারনীজ-ও ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন।৬ কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই ভ্রম চলিতে লাগিল। কোনও কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত অতি সন্তর্পণে ইহা অপেক্ষা বেশী প্রাচীন সময়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন শ্রুডার বলিয়াছিলেন, বেদ বোধ হয় আরও প্রাচীন, তাহার সময় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বা ২০০০-ও হইতে পারে।

ম্যাক্সমূলরের কাল্পনিক পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া বেদে উল্লিখিত জ্যোতিষিক সংস্থান হইতে বেদের সময় নির্ণয় করিবার চেষ্টা একই সময়ে য়ুরোপে এবং ভারতে করা হইয়াছিল। য়ুরোপে এই চেষ্টা করেন অধ্যাপক হেরমান জ্যাকবি (Prof. Jacobi) এবং ভারতে এই চেষ্টা করেন, বালগঙ্গাধর তিলক। উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে

(১) Max Muller প্রণীত History of Ancient Sanskrit Literature.

(২) Winternitz প্রণীত History of Indian Literature Vol. I, পৃঃ ২৯২।

(৩) Introduction to Aitareya Brahmana, পৃঃ ৪৮ (তিলকের Orion গ্রন্থের উপক্রমণিকায় পৃঃ ৩ এই বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে।)

(৪) Gifford Lectures on Physical Religion by Max Muller in 1889.

(৫) Oriential and Linguistic Studies, First Series, New York, 1872 p. 278 (Reference quoted by Winternitz).

(৬) Winternitz, History of Indian Literature, Vol, I পৃঃ ২৯৩।

এই চেষ্টা করেন, এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে উভয়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে বহু পরিমাণে ঐক্য দেখিয়া এরূপ মনে করাই স্বাভাবিক যে, তাঁহাদের গণনা করিবার পদ্ধতি নির্ভুল ছিল। তিলক লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার গণনা য়ুরোপে Buhler, Barth এবং Winternitz এবং আমেরিকাতে Bloomfield অনুমোদন করিয়াছেন।[৭] তিলক এবং জ্যাকবির গণনা-প্রণালী বুঝিতে হইলে একটু জ্যোতিষের আলোচনা প্রয়োজন।

ইহা সুবিদিত যে পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন হেতু ইহা মনে হয় যে, নক্ষত্রমণ্ডলী পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাও সুবিদিত যে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সূর্যের স্থান পরিবর্তনশীল। প্রত্যহই সূর্য একটু করিয়া সরিয়া যান। এক বৎসরে সূর্য্য আকাশমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসেন। ইহার কারণ পৃথিবী এক বৎসরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেন। আকাশের মধ্যে সূর্যের প্রতীয়মান পরিভ্রমণ-পথ রাশিচক্র বা রবিমার্গ (Ecliptic) নামে পরিচিত। যে কল্পিত দণ্ডের চারিদিকে সূর্য পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা যেখানে আকাশকে স্পর্শ করে তাহা Pole of the Ecliptic নামে পরিচিত। ইহাকে রবিমার্গের মেরুবিন্দু বলা যায়। ইহা আকাশের একটি অচল বিন্দু। ইহার কখনও পরিবর্তন হয় না। ইহার অর্থ এই যে, পৃথিবী যে সমতল স্থানের উপরে থাকিয়া সূর্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে সেই সমতলের কোনও পরিবর্তন হয় না। পৃথিবী যে মেরুদণ্ডের চারিদিকে দৈনিক আবর্তন করে, যাহার ফলে সূর্যের দৈনিক উদয়াস্ত হয়, তাহাকে বিষুব দণ্ড বলা যায় (Pole of the Equator)। এই মেরুদণ্ড যেখানে আকাশকে স্পর্শ করে তাহা কিন্তু একটি অচল বিন্দু নহে। ইহাকে বিষুব বিন্দু বলা যায়। বিষুব বিন্দু (Pole of the Equator) রবিমার্গের মেরুবিন্দুর (Pole of the Ecliptic) চারিধারে ২৩½ ডিগ্রি দূরে থাকিয়া অতি ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, সম্পূর্ণ বৃত্ত সমাপ্ত করিয়া পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে প্রায় ২৬,০০০ বৎসর লাগে। একটি চিত্রে এই গতিটি
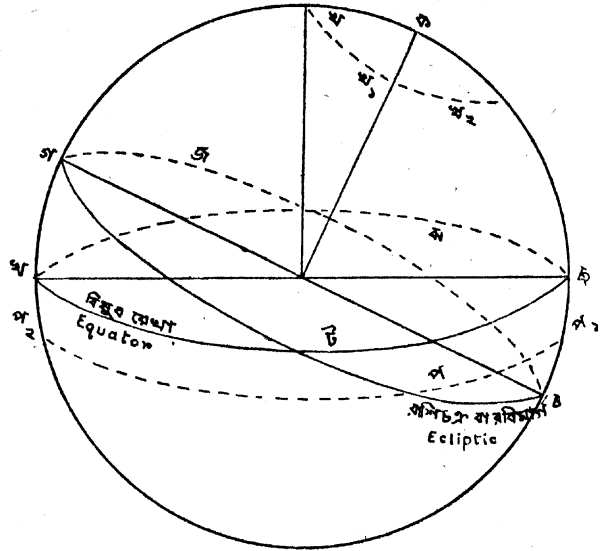
দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ক খ গ ঘ চ ছ —গোলাকাশ Celestial sphere :
গ ট চ জ — রাশিচক্র বা রবিমার্গ Ecliptic (নিশ্চল)।
ক রবিমার্গের মেরুবিন্দু Pole of the Ecliptic (নিশ্চল)।
ঘ ট ছ ঝ আকাশস্থ বিষুবরেখা Celestial Equator (সচল)।

খ বিষুববিন্দু Pole of the Equator (সচল)।

কখ = গঘ = চছ (২৩½ ডিগ্রি)

খ খ১, খ২ এই পথে বিষুববিন্দু অতি ধীরে চলে, ২৬০ ০ বৎসরে বৃত্ত সমাপ্ত করে।

সূর্য যখন ট বিন্দুতে থাকেন তখন দিন ও রাত্রি সমান হয়। ইহাকে আদিবিন্দু বলা যায় (1st point of Aries)। ট নিশ্চল নহে। খ-এর গতির সহিত ট-এর গতি হয়। খ-এর (বিষুববিন্দুর) গতির সহিত ঘছঝ বিষুবরেখা সরিয়া যায়, এজন্য ট আদিবিন্দুর গতি হয়। ট বিন্দু ২৬০০০ বৎসরে সমগ্র রবিমার্গ পরিভ্রমণ করিয়া পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে। ট বিন্দু

---

(৭) Vedic Chronology and Vedanga Jyotish by Tilak. পৃঃ ১৩।

২৬০০০ বৎসরে ৩৬০° ডিগ্রি (অংশ) পরিভ্রমণ করে, সুতরাং এক বৎসরে $\frac{৩৬০}{২৬০০০}$ ডিগ্রি $=\frac{৩৬০\times৬০\times৬০}{২৬০০০}$ সেকণ্ড (বিকলা) = প্রায় ৫০ বিকলা (50 seconds) পরিভ্রমণ করে। সুতরাং ট বিন্দু এক ডিগ্রি সরিতে $\frac{৬০\times৬০}{৫০}=৭২$ বৎসর লাগে। সমগ্র রাশিচক্র (৩৬০ ডিগ্রী) ২৭টি নক্ষত্রে বিভক্ত। সুতরাং এক নক্ষত্রে $\frac{৩৬০}{২৭}$ ডিগ্রি অর্থাৎ ১৩⅓ ডিগ্রি আছে। অতএব অয়নবিন্দু এক নক্ষত্র অতিক্রম করিতে ১৩⅓ × ৭২ বৎসর = ৯৬০ বৎসর লাগে। বেদের কোনও অংশ পড়িয়া যদি বোঝা যায় যে, সে সময় আদি-বিন্দু বর্ত্তমান অবস্থান হইতে পাঁচটি নক্ষত্রর ব্যবধানে ছিল তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সময় বর্তমান সময় হইতে ৯৬০ × ৫ = ৪৮০০ বৎসর পূর্ববর্তী অর্থাৎ খ্রী: পূ: ২৮০০-এর সমসাময়িক।

তিলক এবং জেকবি উভয়েই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণ" রচনার কালে আদিবিন্দু কৃত্তিকা নক্ষত্রে (Pleiades) অবস্থিত ছিল। বস্তুতঃ শতপথ ব্রাহ্মণের একটি বাক্য হইতে দেখা যায় যে, ঐ সময় আদিবিন্দু কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। তাহা হইতে পূর্বোক্ত প্রকারে হিসাব করিয়া পাওয়া যায় যে, শতপথ ব্রাহ্মণের রচনার সময় প্রায় খ্রী: পূ: ২১০০ বৎসর।

শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৩-এ বলা হইয়াছে "কৃত্তিকা ন প্রচ্যয়েত প্রাচ্যা:" অর্থাৎ কৃত্তিকা পূর্বদিক্ হইতে সরিয়া যায় না।[৯] সমগ্র রাশিচক্রের মধ্যে কেবলমাত্র আদিবিন্দু (এবং তাহার বিপরীত বিন্দু) সর্বদা ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয়, রাশিচক্রের অন্য সকল অংশ কিছু উত্তরে বা দক্ষিণে উদিত হয়। ট যে নক্ষত্রে আছে সূর্য্য যখন সেই নক্ষত্রে থাকেন তখন সেই নক্ষত্রের সহিত সূর্য্য ছ বিন্দুতে (ঠিক পূর্বদিকে) উদিত হন, ছ ট ঘ পথে আকাশ ভ্রমণ করেন, তখন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। সূর্য যখন রাশিচক্রের অন্য স্থানে (ধরুন প বিন্দুতে) থাকেন, তখন $প_১$ প $প_২$ পথে ভ্রমণ করেন, ঠিক পূর্বদিকে উদিত হন না, কিছু দক্ষিণে উদিত হন, দিন রাত্রি সমান হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণে যখন বলা হইয়াছে যে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে সর্ব্বদা পূর্বদিকে উদিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ সময় অয়নবিন্দু কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। উইন্টারনীজ বলিয়াছেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণে যে বলা হইয়াছে "পূর্বদিক্ হইতে সারিয়া যায় না," তাহার অর্থ বোধ হয় এরূপ নহে যে ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয়, বোধ হয় তাহার অর্থ এই যে প্রতি রাত্রে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পূর্বাঞ্চলে দেখা যায়।[১০] কিন্তু বাক্যটির স্পষ্ট সরল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এই ভাবে অন্য অর্থ গ্রহণ করা উচিত নহে।

রবিমার্গ বা রাশিচক্রকে দ্বাদশ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সূর্য এক-এক মাসে এক-এক রাশি অতিক্রমণ করেন, দ্বাদশ মাসে (এক বৎসরে) দ্বাদশ রাশি অতিক্রমণ করেন অর্থাৎ সমগ্র রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। এই দ্বাদশ রাশির নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। এক-একটি রাশিতে যে সকল নক্ষত্র আছে তাহাদের সম্মিলিত আকারের সহিত এই সকল বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে। সূর্য যে পথে আকাশ অতিক্রমণ করেন এবং চন্দ্র যে পথে আকাশ অতিক্রমণ করেন তাহা প্রায় একই পথ। চন্দ্র ২৭ দিনে সমগ্র আকাশ পরিভ্রমণ করেন। এজন্য এই পথটিকে ২৭ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, এক-একটি ভাগকে এক একটি 'নক্ষত্র' বলে। ২৭টি নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তর-ভাদ্রপদ ও রেবতী। ১২ রাশিতে ২৭টি নক্ষত্র আছে। সুতরাং এক এক রাশিতে ২¼ নক্ষত্র থাকে। অশ্বিনী, ভরণী এবং কৃত্তিকার এক পাদ লইয়া মেষরাশি। সুতরাং সূর্য মেষ রাশিতে আছেন বলিলে সূর্যের অবস্থান যে ভাবে জানা যায়, সূর্য অশ্বিনী নক্ষত্রে আছেন বলিলে আরও সঠিক ভাবে জানা যায়। বৈশাখ মাসে সূর্য মেষরাশিতে থাকেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিন চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে থাকেন বলিয়া এই মাসের নাম বৈশাখ। জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য বৃষরাশিতে

---

(৯) Winternitz, History of Indian Literature Vol I, p 298।

(১০) Winterintz, বলিয়াছেন যে এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে শতপথ ব্রাহ্মণের তারিখ খৃঃ পূঃ ১১০০ হয়। দেখা যাইতেছে যে আগে তারিখ ঠিক করিয়া তদনুসারে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

থাকেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন চন্দ্র জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে থাকেন, এজন্ত মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ। এই ভাবে নক্ষত্রের নামের সহিত মাসের নাম সংশ্লিষ্ট আছে।

গৃহ্যসূত্রে একটি বিবাহের প্রথার উল্লেখ আছে তাহা হইতে গৃহ্যসূত্রের রচনার সময় নির্ণয় করা যায়। বিবাহ করিয়া বর যখন বধূকে গৃহে আনে, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বর ও বধূ গৃহের বাহিরে একটি বৃষচর্মের উপর বসিয়া থাকিবে, সন্ধ্যার পর যখন নক্ষত্রের উদয় হয় তখন বর-বধূকে ধ্রুবতারা দেখাইয়া এই মন্ত্র পড়াইবে: "হে ধ্রুব নক্ষত্র, তুমি যেমন ধ্রুব হও, আমিও যেন সেইরূপ পতিকুলে ধ্রুব হই।"

"ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়া সম্"

গৃহ্যসূক্ত ২।৩।৯

আমরা পূর্বেবলিয়াছি যে, বিষুববিন্দুর (Pole of the Equator)-এর চারিদিকে আকাশের সমগ্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আবর্তন করে বলিয়া মনে হয়। ঐ বিষুববিন্দুতে কোনও নক্ষত্র থাকিলে তাহাকে ধ্রুব নক্ষত্র বলা যায়, কারণ তাহা এক স্থানে অবস্থান করে। কিন্তু বিষুববিন্দু একটি নিশ্চল বিন্দু নহে। রবিমার্গের মেরুবিন্দু (Pole of the Equator) একটি নিশ্চল বিন্দু, তাহা হইতে ২৩½ ডিগ্রি দূরে থাকিয়া বিষুববিন্দু (Pole of the Equator) ধীরে ধীরে সরিয়া যায় এবং ২৬০০০ বৎসরে বৃত্ত সম্পূর্ণ করিয়া পূর্বস্থলে ফিরিয়া আসে। এই বিষুববিন্দুতে বা তাহার অতিশয় নিকটে কোনও তারা থাকিলে তাহাকে ধ্রুব তারা, (Pole Star) বলা যায়। এক্ষণে যে তারাকে ধ্রুবতারা বলা হয় তাহা ২০০০ বৎসর পূর্বে বিষুববিন্দু হইতে কিছু দূরে ছিল তখন তাহাকে ধ্রুবতারা বলা যাইত না। তাহার পূর্বে খ্রীঃ পূঃ ২৭৮০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত বিষুববিন্দুর নিকটে দৃশ্যমান কোন তারাই ছিল না যাহাকে ধ্রুবতারা বলা যাইত। তাহার পূর্বে ৫০০ বৎসর ধরিয়া Alpha Draconis নামক তারা বিষুববিন্দুর অতিশয় সন্নিহিত ছিল এবং তাহাকে ধ্রুবতারা বলা যাইত।১১ ইহা হইতে বোধহয় যে গৃহ্যসূত্র খ্রীঃ পূঃ ২৭৮০ বৎসরের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু গৃহ্যসূত্রের এতদূর প্রাচীনতা উইণ্টারনীজের অভিমত নহে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ কোনও ক্ষুদ্র তারা, যাহা নগ্ন চক্ষুতে য়ুরোপে দেখা যায় না, তাহা ভারতের স্বচ্ছ আকাশে নগ্ন চক্ষুতে দেখা যাইত, এবং এই ভাবে গৃহ্যসূত্রের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ১২৫০ বা খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ নির্দ্ধারণ করেন।১২ আমাদের মনে হয় এই ভাবে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বেদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে প্রমাণগুলির গুরুত্ব খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সূর্য যেদিন আদিবিন্দুতে থাকেন সেদিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। তাহার পর তিনমাস ধরিয়া দিন বাড়িতে থাকে, রাত্রি ছোট হইতে থাকে। সূর্য যেদিন আদিবিন্দুতে থাকেন ঐ দিনকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বা Vernal Equinox বলা হয়। সাধারণতঃ এইদিন হইতে বৎসরের আরম্ভ হইত। ঋগ্বেদসংহিতা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে আদিবিন্দু যখন মৃগশিরা নক্ষত্রে (Orion) ছিল তখন বৎসর আরম্ভ হইত। ইহা হইতে তিলক ও জেকবি ঋগ্বেদের সময় খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের অন্য মন্ত্র হইতে তিলক খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর গণনা করিয়াছেন। এই সকল গণনা সম্বন্ধে আপত্তি হইয়াছে যে, সূর্য কোন্ নক্ষত্রের নিকট ছিল তাহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা হইত? কিন্তু এই আপত্তি সমীচীন নহে। কারণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বে যে সকল নক্ষত্র পূর্বদিক্‌প্রান্তে দেখা যায় তাহা হইতে সূর্য কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত ইহা জানিতে পারা যায়।১৩

---

(১১) Winternitz, History of Indian Literature Vol I p 297

(১২) Ditto p 299 Footnote

(১৩) বস্তুতঃ বেদের কোনও কোনও বাক্যে সূর্য কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন তাহার নির্দেশ পাওয়া যায়। যথা "মুখং বা এতৎ নক্ষত্রাণাং যৎ কৃত্তিকা" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।১।২।১,) অর্থাৎ কৃত্তিকাই নক্ষত্রের প্রথম। সূর্য যে নক্ষত্রে অবস্থানের সময় বৎসর আরম্ভ হয় তাহাকেই প্রথম বলা হইয়াছে। এই বাক্যে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সূর্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থানে সময় বৎসর আরম্ভ হয়, অর্থাৎ ইহাই আদিবিন্দুর স্থান। "বেদাঙ্গ জ্যোতিষ", গ্রন্থে নক্ষত্রের মধ্যে সূর্যের স্থান নির্ণয় করিবার উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। সূর্যোদয়ের পূর্বেই যে নক্ষত্র দেখা যায় তাহা হইতে সূর্য কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত তাহা জানিতে পারা যায় (তিলক প্রণীত Vedic Chronology and Vedanga Jyotish)।

জেন্দ আবেস্তার ভাষা এবং বৈদিক ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন পারস্য ভাষা জেন্দ আবেস্তার ভাষণ হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন পারস্য ভাষার তারিখ হইতে জেন্দ আবেস্তার তারিখ অনুমান করা যায়, তাহা হইতে বেদের তারিখ অনুমান করিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত বেদের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ১২০০ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। কিন্তু কোনও কোনও ভাষার শীঘ্র পরিবর্তন হয়, আবার কোনও কোনও ভাষার দেরিতে পরিবর্তন হয়। উলনার বলিয়াছেন যে, ভাষাগত প্রমাণ হইতে বেদের সময় খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বলিতে কোনও আপত্তি দেখা যায় না।১৪ উইণ্টারনাজ বলিয়াছেন যে, ইহা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে—বিশেষতঃ বুলারের দ্বারা—যে বেদের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ১২০০ বা খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতেই পারে না, বেদ তাহা অপেক্ষা বহু প্রাচীন। উইণ্টারনীজের মতে বেদের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০। কিন্তু তিলক ও জেকবি স্বতন্ত্র ভাবে জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা যে তারিখ পাইয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০, তাহা পরিত্যাগ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ইহার আর একটি সমর্থন পাওয়া যায়। অধ্যাপক পি সি সেনগুপ্ত তাঁহার প্রণীত Ancient Indian Chronology গ্রন্থে বেদে উল্লিখিত অন্য জ্যোতিষিক সংস্থান হইতে গণনা করিয়া খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, লণ্ডনের রাজকীয় জ্যোতির্বিদ্ (Royal Astronomer) তাঁহার গণনা নির্ভুল বলিয়াছেন।

এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত বোগাজখাই নামক স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মৃত্তিকা-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে—হিটাইটির রাজা ও মিটানির রাজার মধ্যে একটি সন্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সন্ধির সাক্ষীরূপে অন্য দেবগণের সহিত মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্যের (অশ্বিনাকুমারদ্বয়ের) উল্লেখ আছে। এই সন্ধির তারিখ খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ঐ সব দেশের লোক যদি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া থাকে তাহা হইলে বেদের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অপেক্ষা অনেক বেশী প্রাচীন বলিতে হয়। যাঁহারা বেদকে এত প্রাচীন বলিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন যে ভারতে আসিবার পূর্বে আর্যগণ যেস্থানে বাস করিতেন সেখানেই তাঁহারা এই সকল দেবতার উপাসনা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একদল এশিয়া মাইনরে আসেন, আর একদল ভারতে আসেন। বলা বাহুল্য এ সকল কল্পনা মাত্র। অন্য কোন দেশ হইতে কোন প্রাচীন আর্য জাতি এশিয়া মাইনরে আসিয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অপর পক্ষে মহেঞ্জদাড়োর কয়েকটি মুদ্রা মেসোপোটেমিয়ার অন্তর্গত উর এবং কিষ নামক স্থানে খ্রীঃ পূঃ ২৪০০ এর পূর্ববর্ত্তী ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যাওয়াতে ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, ঐ সময় ভারত হইতে মেসোপো-টেমিয়াতে অভিযান গিয়াছিল। ভারত হইতে মেসো-পোটেমিয়া অভিযানের আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহা Marshall তাঁহার প্রণীত Mohenjo Daro and Indus Civilization গ্রন্থে ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করিয়াছেন। মেসোপোটেমিয়া হইতে ভারতে আসিবার প্রমাণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় যে, বোগাজখাইতে যে সকল বৈদিক দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহারা ভারত-বর্ষের দেবতা। উইণ্টারনীজ, জেকবি, কনো এবং হিলি ব্র্যাণ্ড ইঁহারা সকলেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।১৫ ইহা হইতে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, বেদ খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের পূর্ববর্তী।

চৈত্র ১৩৬৯-এর প্রবাসীতে "মহেঞ্জদাড়োর সভ্যতা" নামক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে, বেদে উল্লেখ আছে যে, উরু এবং উরুক্ষিতি নামক স্থানে আর্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। 'উর' এবং 'কিষ' (যেখানে মহেঞ্জদাড়োর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে), 'উরু' এবং 'ক্ষিতি' শব্দের অপভ্রংশ। ইহার দ্বারাও বেদের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর পর্যন্ত প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু বেদ যে ইহা অপেক্ষাও বহু প্রাচীন তাহা পূর্বোল্লিখিত জ্যোতিষিক প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায়।

(১৪) Winternitz, History of Indian Literature, p 308.

(১৫) Winternitz, History of Indian Literature,

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

২২

অপরাহ্ন হইতে মহাদেবীর অধিবাস ও বোধনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল। মণ্ডপের দক্ষিণে বিল্ব বৃক্ষের বেদী লেপিয়া তকতকে করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রতিমার সামনে তিনটা বেলোয়ারী ঝাড়ে মোমবাতি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অসংখ্য গ্যাস জ্বালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সন্ধ্যা সমাগমে যাবতীয় আলো প্রজ্জ্বলিত হইল। বাজনাদারেরা আসিয়া ঢাক, ঢোল, কাঁসী বাজাইতে লাগিল। সানাই আগমনীর তান ধরিল। ঠাকুমা মুহুর্মুহু উলুধ্বনিতে পাড়া কাঁপাইয়া তুলিলেন। পুষ্পমাল্য ধুপ দীপ, নৈবেদ্য জলপানি নানা উপচারে মহামায়া ঘটে প্রবেশ করিলেন।

কর্মব্যস্ত ভানুমতী কহিল, "ও ঠাকুমা, আনাচে-কানাচে উলু দিতে দিতে যে গলা ফাটিয়ে ফেললে, বাবা যে তোমাকে মট্‌কার থান দিলেন সেইটে প'রে যাওনা বোধনের ওখানে?"

ঠাকুমা লজ্জায় জিব কাটিলেন, "তুই কি কইচিস্ ভানি? বারো মাস ঘর-বার করি ব'লে কি পুজো দিনে বা'র মহলে যাব? লোকে কইবে কি? আমি যে মহেশের মা, আমার জমিদার ছেলের কত মান খাতির। আমার কি হারানি-বাড়ানির মতন বেলতলায় যাওয়া চলে?"

"না চলে যদি, তা হ'লে আলানে-পালানেই ঘুরতে থাক, মট্‌কাখানা প'রে নাও।"

"না লো, আজ নয়, পরবো সেই বিজয়ার দিন। ছেলে আমারে দিয়েচে, আমি হাত পেতে গেরণ করেছি, একদিন পরলেই হ'ল। শুদ্ধ কাপড়ে আমার আবার গা কুট কুট করে। আমার হইচে, 'চাষার ছেলে কম্বলে বসে, গা চুলকায় মনে মনে হাসে'। আমারে যে সাজোন-গোজন করতে কইছিস ভানি, তোরা তেল-সিন্দুর-আলতা পরেছিস্ ত? ষষ্ঠীতে এয়োস্ত্রীদের মাথায় গন্ধ তেল দিয়ে চুলে 'চিরণ' দিয়ে সিঁথিজোড়া কপাল-জোড়া সিন্দুর পরতে হয়। পায়ে আলতা গোলা দিতে হয়। সপ্তমীতে আমাদের নব বস্ত্র পরার দিন।"

ভানুমতী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

পল্লীগ্রামে নাপিত বৌরা আলতার চুবড়ি লইয়া পাড়া প্রদক্ষিণ করিত না। সে রেওয়াজ ছিল না। পুরুষ নাপিতরাই বারোমাস সকলের নখ কাটিয়া দিত। পাল-পার্ব্বণে তাহাদের পাওনা ছিল প্রচুর। মাঙ্গলিক দ্রব্যের সহিত মেয়েদের জন্য থানভরা সিন্দুর ও বাণ্ডিল করা পাতা আলতা আসিত। বাড়ীর সর্বকনিষ্ঠা যে, তাহার উপরে ভার দেওয়া হইত বাটিতে আলতা গুলিয়া বয়ঃজ্যেষ্ঠাদের পদরঞ্জনের। শিশির তরল আলতা তখনও ছিল, কিন্তু তেমন প্রচলন হয় নাই।

সপ্তমীর পূজা ও ভোগের যোগাড় করিয়া রাখা হইতেছে। ঝাঁকা ঝাঁকা তরকারি আনিয়া ভাঁড়ার ঘরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। কর্মশালার বারান্দায় সপ্তমীর ভোগের তরকারি ঢালিয়া রাখা হইয়াছে। উঠানের এক পাশে কচুর শাকের গাদা। কচুর শাক নাকি মা দুর্গার প্রিয় বস্তু। তিন দিনের ভোগেই কচুর শাক চাই। ব্রাহ্মণী ভিন্ন অপর জাত পূজার তরকারি কুটিতে পারে না, কিন্তু কচুর শাকের বেলায় বিধান ভিন্ন। সাধারণতঃ ধীবর-কন্যারাই কচুর শাক কুটিয়া দেয়।

গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে ঠাকুমা ভূমিকা ফাঁদিলেন কচুর শাক লইয়া, "ও সোহাগি, ও পসারি, তোদের চোপা দেখছিনে কেনে? শাকগুলান ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ক'রে ফালা দেনা লো। রাত দুপুরে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে বঁটিতে কেটে মরবি নাকি?

"শোন, মণিরাম ঠাকুর এ বেলা পাক করবে কি? বাস্তুকয়েরা খাবে জনা সাতেক, তা ছাড়া উপরি লোক আছে। সকালে বাজার থেকে এক ঝাঁকা ইচে মাছ (চিংড়ি মাছ) এনেছিল। ঝাঁকাভরা হ'লে কি হবে, ও ও মাছে আয় দেয় না 'ইঁচে কুটলে মিছে, রাঁধলে ছাই,

কারো বরাতে কিছু নাই,। গোটা কতক লাউ দিয়ে ইঁচের ঘাঁটি রাঁধো, তা হ'লে পাতা ঘুরবে। আর এক কথা কইতে আমার ভুল হইচিল, পেসাদ আমার কই মাছ বড় ভালবাসে। মেটে গামলায় কই জিয়ানো রইচে, তা থেকে কুড়ি কতক কই কুটিয়ে নিয়ে 'কই মৌরি' রেঁধে দাও। কই মৌরিতে কাঁচা মরিচ কেটে দিতে হয়। তেল বেশি লাগে, তবে না স্বাদ। এ বেলা পেসাদকে ভাল ক'রে রে'ধে-বেড়ে খেতে দিও। কাল থেকে ত খাটুনি হাঁটুনিতে বাছার মুখে কিছুই রুচবে না।"

রান্নার তদারক করিয়া ঠাকুমা প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, "ওলো সরি, পঞ্চবরণীর গুঁড়ো করেছিস্ তো? যজ্ঞে পঞ্চবরণীর গুঁড়ো লাগবে। বলির পাঁঠার মাথায় দেবার নতুন কাপড়ের ঘি সল্‌তে দিতে হবে। কাল তিনটে বলি, একটা পদ্মা পূজোর, দুটো মায়ের। বলির মাটির সরা তিনটে আজকেই সাজিয়ে রাখিস। কলা, পানের খিলি, কর্পূর, ঘি, সরায় দিতে হ'বে। পদ্মা পূজোয় কাঁচা দুধ কলা লাগবে।

"হ্যাঁরে ভান্যি, কাল ভোগ রাঁধবে কে কে? সপ্তমীতে মা দুর্গার সাত ভোগ, সাত ভাজা, অষ্টমীতে আট ভোগ, আট ভাজা। নবমীতে নয় ভোগ, নয় ভাজা। তারপর দশমীতে নাল পান্তা। নবগ্রহের নয় ভোগ; পদ্মার ভোগ, নারায়ণের ভোগ, অসুরের ভোগ, চণ্ডীর ভোগ, ঠিক ঠিক মনে করে রাখবি। মোট এক কুড়ি ভোগ লাগবে কাল। কাল ভোগে কিসের অম্বল হবে? পয়লা দিন কামরাঙ্গা আর কাঁচা তেঁতুল দিতে হয়। যে কেউ ভোগ রাঁধিস নে কেনে, আগে-ভাগে কড়াই ভ'রে ভ'রে অম্বল রেঁধে খাদায় খাদায় ঢেলে রাখিস। পরে ভাজিস পোর, দিব্যি মুচমুচে থাকবে। কথাতেই আছে—আগে অম্বল পরে ভাজা, সেই হ'ল রাঁধুনার রাজা।"

ছোট ঠাকুমা ফলের খোসা বাহিরে ফেলিতে আসিয়াছিলেন ঠাকুমা তাঁহাকে কাছে পাইয়া গলা চড়াইয়া দিলেন, "ছোট্‌ঠাকরোণ এদিকে আয়না লো, আমি ত 'অথর্ব্বো বের্দ' হইচি। ছেলে-ছোকরার দরবারে তোরেই শক্ত হাতে হাল ধ'রে থাকতে হবে। পাঁচ কলাইয়ের জলপানিতে নুন লঙ্কা, আদার কুচি, ফুলবড়ি মনে ক'রে দিতে হবে। মার ভোগে যে যতুই নুচি-পুরী-জিলেপি, ছানা মাখন দাও না কেনে, কিন্তু তিন দিনেই কলার বড়া না দিলে ভোগ সিদ্ধি হয় না।"

ছোট ঠাকুমা কহিলেন, "তুমি থির হও দিদি, বকৃতে বকৃতে যে সারা হয়ে গেলে? যারা বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ করবে, তারা কিছুই ভুলবে না।"

খাটিতে খাটিতে সকলের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রায়, যে যাহার কাজে ব্যস্ত, তাহার উপরে ঠাকুমার অবিশ্রান্ত বকুনিতে ভানুমতী ক্ষেপিয়া গেল; ঠাকুমার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "তোমার ক্যান্ ক্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ আর শুনতে পারচি নে। ষষ্ঠীর প্রসাদ রেখে এসেছি তোমার ঘরে। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো গে, পাড়া জুড়োক। রাত পোহালে ফের রণে ডঙ্কা দিও।"

ঠাকুমা নাতনীর কথায় কান না দিয়া কহিলেন, "তখন দেখলাম হেমন্তের সর্দ্দি হইচে। তার ভাত খেয়ে কাজ নেই। কালজিরে আর হলুদের গুঁড়ো, নুন দিয়ে ময়দা মেখে তারে লুচি ক'রে দিক। গরম লুচির ভারি গুণ। কি খাব কি খাব পরাণ করে, লুচি চিনি দুধের সরে।"

ভানুমতী ঠাকুমার আশা পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল। জানকী সরকারকে আসিতে দেখিয়া ঠাকুমার সহসা স্মরণ হইল গুরুবাড়ীর কথা। হীরাসাগর নদীর পরপারে মথুরা গ্রামে রায়বংশের কুলগুরুর নিবাস। ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তাগৃহিণীর দীক্ষার পরে বর্ত্তমান কর্ত্তাগৃহিণী দীক্ষিত না হইলেও কুলপ্রথা বজায় রাখিয়াছেন। গুরু-গৃহে প্রতিবছর দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। ইঁহারা মহাষ্টমীর পূজার সমস্তভার বহন করিয়া থাকেন। নৌকা বোঝাই করিয়া চাল ডাল, শাড়ী ধুতি, মায় এক জোড়া পাঁঠা অবধি প্রেরণ করা হইত।

সেই কথাটা ঠাকুমার মনে ছিল না। সরকারকে কাছে ডাকিয়া ঠাকুমা প্রশ্ন করিলেন, "পুজোর দ্রব্য নিয়ে মথুরায় নাও গেইচিল তো জানকী? 'সকল কুটুম টাকা, ইষ্ট কুটুম বাবা,।"

"হাঁ, মাঠান 'দ্রব্যজাত' দিয়ে আজ নাও ফিরে আইচে।" ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হইলেন।

এবার বারান্দায় সারি সারি বঁটি পাড়া হইল। ছোট ঠাকুমা রাত্রে ভাল দেখিতে পান না। তিনি বঁটির দিকে না আগাইয়া বাটি বাটি চন্দন ঘষিতে লাগিলেন। গঙ্গাজলে চন্দন ঘষিলে পরদিন বাসি হয় না।

সরস্বতী ঘরের ভিতরে গোছানোর কাজে লাগিয়া রহিল। মনোরমা দুই কন্যা ও বধূকে লইয়া তরিকারি কুটিতে বসিলেন।

গ্রামের ইতর-ভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়াছে। তা ছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে মায়ের প্রসাদপ্রার্থীর দল আসিবে। নিরক্ষর চাষা-ভুষোদের মহামায়ার প্রসাদের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি।

ঝাঁকা ঝাঁকা তরকারি কোটার ফাঁকে ফাঁকে ভোজন পর্ব্ব মিটিল।

ধীরে ধীরে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইল। বিশ্বপ্রকৃতি মহাসুপ্তিমগ্ন হইয়া রহিল। ঠাকুমা অনেকক্ষণ আগে রসনাকে বিরাম দিয়া শয়ন করিয়াছেন।

হঠাৎ মধুমতী খিল খিল শব্দে হাসিয়া উঠিল, "ওমা, দেখো না কি কাণ্ড? তোমার বৌ এক্ষুণি কুমড়ো কাটা হ'তে গিয়েছিল। কাঁচকলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ঘুমে ঢুলছে কেমন!"

ভানুমতী ঝঙ্কার দিল, "চোখে-মুখে জল দিয়ে আসুক, ঘুম ছুটে যাবে। ষষ্ঠীর রাতেই এমন ঝিমুনি, আরদিন ত প'ড়েই রয়েছে।"

মনোরমা কহিলেন, "আজকের মতন কাটা কুটো একরকম হ'ল। বাকী যা রইল, কাল হবে। বৌমা এখন না হয় শুতে যাক্‌ কাকীমাও উঠুন, বুড়োমানুষ আর কত করবেন?"

সরস্বতী গর্জ্জিতে লাগিল, "এদিকে যেমন হাল্‌কা হ'ল, ওদিকে ভোগের ঘরে একটি প্রাণীও ঢোকে নি। চাকররা কাঠকুটো রেখেছে, কামিনীর মা বাসন-কোসন নিয়ে গেছে। ঠাকুররা জল তুলে ড্রাম ভরেছে কি না দেখা হয় নি। ঘরে গঙ্গাজল ছিটোনো বাকী। তেল-ঘি-মসলা-ফোঁড়ন আজ না নিয়ে রাখলে কাল সকাল বেলা ভোগ চড়বে কখন? সকলের যদি ঘুম পায়, সকলে যদি শুতে যায় তা হ'লে ওদিকের যোগাড় করবে কে?"

সরস্বতী মিথ্যা বলে নাই, মনোরমার ওদিকে খেয়াল ছিল না। তিনি বঁটি কাত করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

মধুমতী কহিল, "বৌকে তুমি সাথে নাও, মা। এঘর-ওঘর করলেই ওর ঘুম চ'টে যাবে।"

২৩

রায়বাড়ীর দুর্গাপূজার ভোগশালা কাঠা পাঁচেক জমি জুড়িয়া। দেয়াল ও মেঝে পাকা, চাল টিনের। মাঠের মত মস্ত ঘরের দুই দিকে চওড়া বারান্দা, সারি সারি বড় বড় জানালা। সামনের ঢাকা বারান্দায় লুচি-জিলিপি ভাজা হয়। পেছনের চালশূন্য বারান্দায় ভোগ রন্ধনকারিণীরা অবকাশ পাইলে হাওয়া খায়। বারান্দার গায়ে প্রাচীর, তাহার পরেই পুকুর। ঘরের দুই দিকে দশটা কাঠের উনুন। তখনও পল্লীগ্রামে পাথুরে কয়লা দেখা দেয় নাই। দিলেও ঠাকুরভোগের শুচিতায় তাহার ব্যবহার চলিত না।

সারিবদ্ধ উনুনের পাশে পর্ব্বত-প্রমাণ চেলা কাঠ ও পাটকাঠি স্তূপাকার করিয়া রাখা হইয়াছে। কামিনীর মা পুরাতন পাকা দাসী। ভোগের জোগান সে ভিন্ন আর কোন ঝি দিতে পারে না। বড় বড় ডেকচি, বকুনো, পিতলের ও লোহার কড়া হাতা খুন্তি ঝাঁঝড়া, ভাতের বাঁশের কাঠি, পাটের ন্যাতা, কড়া ধরার নেকড়া, উঁচু খুর্‌পি পিঁড়ে, মায় দেশলাইয়ের বাক্স দু'টি কামিনীর মা সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। দুই পাচক দুই ভাগে ড্রাম ভরিয়া জল তুলিয়া রাখিয়াছে। ভোগ ঢালার গামলা, পরাত, পিতলের বালতি, কাঁসার বিরাট্‌ বিরাট্‌ কাঁসী, পাথরের থালা বাটি খাদা ইত্যাদি থাকে থাকে গোছান রহিয়াছে।

মনোরমা প্রত্যেক দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাহার পরে তামার ঘটি হইতে কুশে করিয়া সবটায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন। তাহার পরে কর্ম্মশালা হইতে ভোগশালায় ভোগের উপকরণ আনা সুরু হইয়া গেল।

ভোগের ঘর ও মণ্ডপ মুখোমুখি। মাঝখানে মাঝারি এক উঠোন। দুর্গাপূজার ভোগশালা হইতে অনেকটা দূরে ইহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মশালা।

মধুমতী সত্যিই বলিয়াছিল—দুই ঘরে আনাগোনায় বিনুর নিদ্রা সভয়ে পলায়ন করিল।

মুশ্‌কিল হইল কোটা তরকারির ঝাঁকাগুলি লইয়া। ঝি-চাকর তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। পাচক ব্রাহ্মণদ্বয় আহারাদি মিটাইয়া শয়ন করিয়াছে। অথচ কোটা তরকারি বারান্দায় ফেলিয়া রাখিলে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সকলে ধরাধরি করিয়া ঝাঁকা-গুলি স্বস্থানে লইয়া গেল। এ নির্দ্দেশ শুচিবায়ুগ্রস্তা সরস্বতীর। যেখানে ধরিয়া আনিলে চলে সেখানে তাহার ইচ্ছা বাঁধিয়া আনা। বধূ ও বড়ভগিনী যে স্বামীর শয্যাভাগিনা হইবে ইহা তাহার অসহ্য। কাজের অজুহাতে বাকী রাতটুকু এইরূপে অতিবাহিত হইলেই তাহার শান্তি। সে যে সর্ব্বহারা বঞ্চিতা, সকলকে লইয়া কর্ম্মজালে জড়াইয়া তাহার দুঃখের রজনী ভোর করিতে চায়।

মোট বহিতে বহিতে ভানুমতী ক্লান্ত হইয়া কহিল, "যে কাজ ঠাকুরদের দিয়ে করান যায়, সেটা ইচ্ছে ক'রে নিজেদের ঘাড়ে নেয় কে? লোকজন না থাকত তাহলে বুঝতাম। এ বাড়ীর সবই যেন বেশি বেশি, চাপামির চূড়ান্ত। আস্‌ছেবার পূজোয় আমি আর আসছি না। দেখব কাকে দিয়ে কি ক'রে তোমরা পূজো নির্ব্বাহ দাও। বিনে মাইনের ঝিরা না এলে এত ফষ্টি-নষ্টি বেরিয়ে যাবে। এইবার দয়া ক'রে অব্যাহতি দাও, একটুখানি বিছানায় গড়িয়ে নেই গে।"

সরস্বতী মায়ের নীচেই এ বাড়ীর গৃহিণী, সময় বিশেষে মায়ের উপরে। সংসারের আবিলতা লইয়া মেয়েটা যদি ভুলিয়া থাকে সেইজন্য মনোরমা তাহার কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লন। সরস্বতী আপত্তি করিল, "গড়িয়ে নিতে গেলে চলবে কেন? এখনো ঢের কাজ বাকী রয়েছে যে। ভোগের চাল-ডাল মাপা হয় নি। জিলেপির রস ছেঁকে রাখতে হবে। গোকুল পিঠের গোলা ক'রে রাখলে অনেকটা এগিয়ে থাকত।"

"ভোগ রেঁধে রাখলে আরো এগিয়ে থাকত। আমি আর মা কালকে ভোগ রাঁধতে যাব কিনা, তাই আমাদের দিয়ে যত সেরেস্থুরে রাখা যায়, সেই চেষ্টা। কেন, তোমরা যে বাইরে থাকবে, ওগুলোও ত তোমাদেরই কাজ। তোমাদের যত খুসি ঘুট্ ঘুট্ ক'রে রাতটুকু কাবার কর, আমি শুতে চললাম। বৌ, তুমি হাত-পা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড় গে যাও।" বলিয়া ভানুমতী দুম্‌দাম্ পদক্ষেপে বাড়ী কাঁপাইয়া দোতলার সিঁড়ি ধরিল। ভানুমতী মনোরমার প্রথম সন্তান, এখনও সন্তানাদি হয় নাই। সে অতিশয় কর্ম্মিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্যসম্পন্না।

ভানুমতী চলিয়া গেলে মধুমতীও নিঃশব্দে কাটিয়া পড়িল। বধূও আর কাহারও দ্বিতীয় বার আদেশের অপেক্ষা করিল না।

মনোরমা বাধ্য হইয়া সরস্বতীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে চোখে আঁচল চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। সামান্য কারণে রোদন তাহার স্বভাবের বিশেষত্ব।

এ অঞ্চলে পূজাবাড়ীতে ভোর বাজে রাত্রি চারিটায়, দেবতা ও তাঁহার সেবক-সেবিকাকে জাগাইবার উদ্দেশ্যে।

রজনীর শান্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ঢাক ঢোল, কাড়া কাঁসী তুমুল শব্দে কান বধির করিতে লাগিল।

বিনু গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য। দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় ঢাকের বাজনা তাহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিলেও মর্ম্মে আঘাত করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু শরীরের নানা স্থানে কি যেন বিঁধিতেছিল। কিসের এক প্রচণ্ড খোঁচা।

অতিষ্ঠ বিনু আধখানা চোখ খুলিয়া অবাক্ হইল, প্রসাদ ঠেলিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে না পারিয়া তাল পাতার পাখার ডাঁটের সাহায্য লইয়াছে।

বিনু বিরক্ত হইয়া জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে মারছেন কেন? আমি কি করেছি?"

প্রসাদ কৌতুকের হাসি হাসিল, "ঘুমে অজ্ঞান হওয়া ছাড়া আর কিছু কর নি। ভোর বাজছে এখন উঠাতে হ'বে না?"

"বাজুক গে, এক্ষুণি শুয়েছি; উঠব কি?"

"যখুনি শোও না কেন, ভোর বাজা মাত্র বিছানা ছাড়তে হয়। বাড়ীতে পূজো, শুয়ে থাকলে কি চলে?"

"চলে না আবার, আপনি ত ঘুম দেবেন রোদ না ওঠা অবধি।"

"কে বললে তোমায়? কাজ যেন তোমাদেরই একচেটে, আমার কাজ নেই? আমি এই দণ্ডে উঠে

হাত-মুখ ধুয়ে স্নান করতে যাব। মণ্ডপের যা কিছু আমাকেই করতে হবে। এক ভাইএর পৈতে হয় নি, আরেকটি বাচ্চা। বাবার সব কাজ আমি মাথায় তুলে নিয়েছি, মায় খাঁড়াখানা পর্য্যন্ত।"

বিনু সচমকে প্রশ্ন করিল, "খাঁড়া কিসের? খাঁড়া?"

"বলির, আমাদের কুলপ্রথা, নিজেদের বংশধর ভিন্ন পুজোর অঙ্গে বলি দিতে পারে না। এতকাল বাবা বলি দিয়েছেন, বছর তিনেক হ'ল আমি নিয়েছি সে ভার।"

"পাঁঠা বলি দিতে আপনার কি কষ্ট হয় না?"

"জ্যান্ত কই মাগুর মাছ কাটতে তোমাদের কি কষ্ট হয় না?"

বিনু নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাই তো, এ এক মহা সমস্যা! পুরুষেরা পাঁঠা মহিষ বলি দেয়, মেয়েরা নিত্য-নৈমিত্তিক বলি দেয় সিঙ্গি মাগুর কই। এক জলচর, আর স্থলচর। কেহ দোষী নয়, হিংস্র নয়, তবু তাহাদের প্রতি কি নির্ম্মম অত্যাচার অবিচার? দুর্ব্বলের উপরে বলবানের এমনি হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা যুগ-যুগান্ত হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রতিবিধান নাই, খণ্ডন নাই। বিনু জীবনে মাংসের আস্বাদ জানে না বটে, কিন্তু মাছে তাহার অরুচি নাই। এক হত্যাকে নিষ্ঠুরতার পাপ মনে করিলে আর এক হত্যাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লইবে কোন্ হিসাবে? প্রাণ সকল প্রাণীরই সমান। সুখ-দুঃখের অনুভূতি এক।

সহসা বিনুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। বাজনা থামিতে না থামিতে ঠাকুমা উলু দিতে দিতে তাহাদের রুদ্ধ দ্বারে সজোরে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "পেসাদ, পেসাদ রে, তোরা উঠে আয়। আর ঘুমায় না। পুবে ফরসা হইচে, এখন নাওয়া-ধোয়ার তোড়-জোড় কর্, দাদা। তুই মণ্ডপে না গেলে এতবড় মহোচ্ছবে—আমার পরাণ থির হয় না। তোকেই যে সর্ব্বকর্ম্ম করতে হবে—আগে হাঁটা, পেসাদ বাঁটা, সল্‌তে বাড়ানো, পাঁঠা কাটা।"

ইহার পর প্রসাদ বিলম্ব করিতে পারিল না, বিনুও না।

তরু ফুলের ডালা হাতে ভিতরের বাগানে যাইতেছিল। ঠাকুমা কহিলেন, "তন্নি আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ঢাকের 'নাকৃতা-পাতার নাকৃতা-পাতার, ছাই কপালীর গবৃদা ভাতার' বয়ানেই ঘুম ছুটে গেইচে।"

তরু থমকিয়া দাঁড়াইল, "কি বিচ্ছিরি কথাই যে তুমি বলো ঠাকুমা, ঢাক আবার ওই ব'লে বাজে নাকি?"

"হ্যাঁলো, ঢাকের ওই বয়ান যে চিরকালের। তুই বড় হলে তোরও বয়ান হবে—'ছোড়দিদিলো, বড়দিদিলো পটোল ভাজা খাবি? অদল-বদল। বংশী বদল, সোয়ামী বদল দিবি'?"

"পুজো দিনে এসব বিচ্ছিরি কথা আমায় ব'লো না, ঠাকুমা, আমি তোমাকে বারণ ক'রে দিচ্ছি।" বলিয়া তরু দাঁড়াইল না।

২৪

স্নান সারিয়া সকলে জমায়েত হইল কর্ম্মশালায়, সেইটাই এ বাড়ীর কেন্দ্রস্থল। সেখান হইতে বড় বড় পুষ্পপাত্রে দেবীর পুষ্পসজ্জা রচনা করিয়া মণ্ডপে পাঠান হইল। রাত্রে দুই গামলায় নৈবদ্য-আমানীর চাল ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। ধোয়া মাটির থালিতে চলিল নৈবেদ্যের সমারোহ। আজ ছোটরাও কাজে লাগিয়াছে, স্নানান্তে নব বস্ত্র পরিয়া পূজার উপকরণ বহন করিতেছে।

উৎসবে নিয়ম নাস্তি, বারমাসের বিধি দুর্গোৎসবে অচল। এ কয়েকদিন ফুল সংগ্রহ করিবে ভৃত্য সম্প্রদায়। তাহারা সারারাত্রি জাগিয়া লণ্ঠন লইয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া সাজি সাজি ফুল আনিতেছে। আঁটি আঁটি দুর্ব্বার জোগান দিতেছে দুই সরকার বাড়ীর বৌ-ঝিরা। নাপিতগোষ্ঠীরা ছিদ্রশূন্য, চক্রশূন্য ঝাঁকা ঝাঁকা বেলের পাতা আনিতেছে। পূজা সকলেরই, সকলে এ কয়েকদিন প্রাণ ভরিয়া প্রসাদ খাইবে, জলপানি-নৈবেদ্য পাইবে। এই বাড়ীরই প্রদত্ত নূতন কাপড় তাহাদের অঙ্গে উঠিবে। কাজেই পূজা তাহাদেরও।

পূজায় বসিবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ভানুমতী বিনুকে বলিল, "চলো বৌ, আমরা এবার ভোগের ঘরে চলি, তুমি আমার কাছ থেকে রান্নার যোগাড় দেবে। এগিয়ে-জুগিয়ে দিতে দিতেই সকলে রান্না শেখে। না দেখে, না শুনে তফাতে স'রে থাকলে শেখা যায় না।

আমরাও রাঁধুনীদের সাথে থেকে তবে না রান্না শিখেছি।"

ভানুমতী কপালে সিন্দূরের টিপ দিয়া, নূতন শাড়ী পরিয়া মণ্ডপ প্রণাম করিয়া আসিল। তাহার আদেশে বিনুও শ্বশুরের দেওয়া গান-পেড়ে শাড়ী পরিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

ভানুমতী উনুনকেও প্রণাম করিয়া জ্বালাইয়া দিল পাঁচটা উনুন। তাহার পর বিনুকে কহিল, "তুমি আগে পেছনের বারান্দায় যেয়ে চুল খোঁপা ক'রে জড়িয়ে এস। এলো চুলে ভোগের কাছে থাকতে নেই, চুল পড়লে ভোগ নষ্ট হয়ে যায়। ঘোমটা কম ক'রে আঁচল কোমরে জড়িয়ে নাও। আঁটো-সাঁটো না হলে মেহনতের কাজ যুত হয় না। ভোগের ভেতরে ত তোমাকে আনলাম বৌ, ভোগ না সরা পর্যন্ত তুমি কি জল না খেয়ে থাকতে পারবে? কিছু খেলে ভোগ ছোঁয়া যায় না।"

বিনু ঘাড় কাত করিল, ভোগ না সরিলে সে খাদ্য গ্রহণ করিবে না। নিমেষে আনন্দে গৌরবে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিয়া গেল। অকর্মা, অকেজো অপবাদ দিয়া এতদিন যাহারা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ধিক্কারে মানুষ বলিয়া গণ্য করে নাই, এখন তাহারা আসিয়া দেখিয়া যাউক বিনু কত কাজের লোক হইয়াছে। ভানুমতী তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলেও এদিকে মন্দ নয়। ভাল না হইলে আনাড়িকে সম্মানের আসনে বসাইতে চাহিবে কেন?

ভানুমতী বিনুকে কোণের উনুনে বসাইয়া দিল কলার বড়া ভাজিতে। কলার বড়া ও সাত ভাজা আগে হইবে। পোর ভাজা ও অন্ন ভোগ সকলের শেষে।

ভানুমতী যেন মা দুর্গার অনুরূপ দশভুজা হইয়াছে। বিরাট্‌কায় ডেক্‌চি কড়া এই উঠিতেছে, এই নামিতেছে। দেখিতে দেখিতে কোটা তরকারির অর্দ্ধেক নিঃশেষ হইয়া উপাদেয় ব্যঞ্জনে পরিণত হইল, ভানুমতীর রান্না যেন রন্ধন নয় ভেল্কিবাজি। প্রশংসমান নেত্রে ননদিনীর ক্ষিপ্রতা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিনু বড়া ভাজিতে লাগিল।

ওদিকের যোগাড়-যন্ত্র খানিকটা হাল্কা করিয়া দিয়া মনোরমা আসিলেন এদিকে। তখন মেয়ের নিরামিষ রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে।

মা কর্ম্মরতা বধূর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "বৌমা-ও যে লেগে গেছে দেখচি! ও কি পারবে? হাত-পা পুড়িয়ে অনর্থ করবে না ত?"

"পারবে না কেন? হাত-পা পুড়বেই বা কেন? ও কি রায়বাড়ীর বৌ হয়ে আসে নি? দিব্যি ঝর্‌ঝরে খর্‌খরে, দেখ কি সুন্দর বড়া ভাজছে। সাথে থেকে খানিক এটা-ওটা করুক, যদি না পারে পরে বেরিয়ে যাবে। পায়েসের দুধ, মাছ-মাংস আসবার আগে আমি খানিকটে জিলেপি ভেজে রাখি, মা। ভোগের পরে ব্রাহ্মণদের খাবার সময় ফের গরম ভেজে দিলেই চলবে।"

মা নীরবে জিলেপি ভাজার সরঞ্জাম মেয়েকে আগাইয়া দিলেন।

ঠাকুমা আজ তাঁহার চিরন্তন স্থান পরিত্যাগ করিয়া মণ্ডপের অন্দরের দরজার সিঁড়িতে আশ্রয় লইয়াছেন। জনসমাগমে তাঁহার ঘোমটার বহর আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। যতবার শঙ্খ-ঘণ্টা কাঁজর বাজে ততবার তাঁহার উলু দেওয়া চাই। উলুধ্বনির নাকি তাহাই নিয়ম। ছড়া শোলোক বন্ধ হইলেও তাঁহার মুখ বন্ধ নাই।

মহামায়ার সহচরী হইয়া সর্পভূষণা পদ্মাদেবীও আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সপ্তমীতে তাঁহার বলি দেওয়া হয়, অন্য দুই দিন বলির পরিবর্ত্তে ভোগরাগ দুধ-কলাতেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকেন।

গ্রন্থকীট মহেশবাবু আজ তাঁহার গ্রন্থাগার রাখিয়া চতুর্দ্দিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ভোগশালার তদ্বিরে আসিয়া তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বৌমা এসেছে ভোগ রাধতে। বাঃ, বেশ ত। ছেলেমানুষ, তোমরা শিখিয়ে নেবে।"

ভানুমতী বাঁশের শলা দিয়া জিলেপি উল্টাইয়া দিতে দিতে কহিল, "সেই জন্যেই ওকে সাথে রেখেছি, বাবা। বাড়ীর বড় বৌ হয়ে এসেছে, পাল-পার্ব্বণ ওকেই বজায় রাখতে হবে। এখন থেকে না শিখলে তৈরি হতে পারবে না।"

"সে ত ঠিক কথা মা, সমস্তই ওদের। আমরা আর ক'দিন?" বলিতে বলিতে মহেশবাবু অন্য দিকে গেলেন।

ঠাকুমা পুত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া অস্থির হইলেন।

তাই ত, এতক্ষণ তিনি একবারও ভোগশালার সন্ধান লইতে পারেন নাই। গৃহিণীর পক্ষে ইহা লজ্জার বিষয়। ভূতপূর্ব্বা হইলেও একদিন তিনিই ছিলেন এখানকার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। কর্ত্তা না থাকিলে কর্ত্তৃত্ব খসিয়া যায়, তথাপি নামটা মুছিয়া যায় না।

ঠাকুমা গলা বাড়াইয়া পুরোহিতের পূজাপদ্ধতি নিরীক্ষণ করিলেন। না, এখানে কোন কিছু বেঠিক নাই। পুরোহিত পদ্মা পূজায় বসিয়াছেন। অন্য পুরোহিত দুর্গা পূজা করিতেছেন; হোতা পাশে, প্রসাদ স্বয়ং উপস্থিত। পুরোহিতদ্বয়ের ঘণ্টা নাড়া আপাততঃ বন্ধ। এহেন সুযোগ হেলায় হারানো উচিত নয়।

ঠাকুমা ভোগশালার বারান্দায় উপনীত হইয়া উঁকি দিয়া হাকিলেন, "ভান্যি, তুই মায়ে-ঝিয়ে ভোগ রাঁধছিস? মণিবালাকেও এনেছিস, শেখাতে ত হবে নতুন মুনিষ্যেকে। দেখতে দেখতেই সব পারবে। 'যে ঘরে যে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।' ও মণিবালা, আজ তোর মস্ত ভাগ্যি লো, মা দুর্গার ভোগ কি সকলে ছুঁতে পারে? আর তোর দুঃখু নেই—'কেষ্ট বলেন কদমতলে হলাম আমি কালী, কে আমারে কইবে মন্দ কেবা দিবে গালি?' শোন্ ভান্যি, মাছ-মাংস ঘরে ঢোকার আগে নারায়ণের ভোগরাগ মনে ক'রে সরিয়ে রাখিস, ঘোলে-অম্বলে এক করিস্ নে। ডাল হ'ল কিসের; কিসের—"

ঠাকুমা হিতোপদেশ শেষ করিতে পারিলেন না। রিণিরিণি শব্দে ঘণ্টাধ্বনি হইল, উলু দিতে দিতে তিনি ছুটিয়া গেলেন।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। দুই বন্দর ও স্থানীয় বাজার হইতে গাদাগাদা মাছ আনিয়া স্তূপ করা হইল। মাছ কোটা লইয়া ঝিদের মধ্যে বাধিয়া গেল তুমুল কলহ। এমন সময় তরু আসিয়া কহিল, "মা, বড়দি, তোমরা শীগ্‌গির চল। এখন বলি দেওয়া হবে। মেজদি, সেজদিদের ডেকে এনেছি।"

মা বলিলেন, "খালি ঘরে অর্দ্ধেক রান্না রেখে সবাই বেরিয়ে গেলে চলবে না। ওরা দুজনা যাক, আমি থাকি।"

"বৌদি ভোগ আগলে থাকবে, মা। ও বোষ্টম, বলি দেখতে পারবে না, মাংস খেতে পারে বড়দিকে নিয়ে এস, ওকে টানাটানি ক'রো না বাপু। ওর বাপের বাড়ীতেও পুজোয় বলি দেওয়া হয়, ও নাকি সে সময়ে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত।"

তরু রাঙ্গাশাড়ীর আঁচল উড়াইয়া দম্‌কা বাতাসের বেগে অদৃশ্য হইল।

বিনুকে ভোগের পাহারা রাখিয়া মা মেয়ে বাহির হইয়া গেলে সে চিকঢাকা দ্বারদেশে দাঁড়াইল। কাতারে কাতারে লোক বলি দেখিতে আসিতেছে। বলির বাজনা বাজিতেছে। জনতার মধ্য হইতে স্ত্রীলোকেরা ঘনঘন উলুধ্বনি করিতেছে।

বিনু শিহরিয়া কানে আঙ্গুল চাপিয়া ঘরের পিছনে সরিয়া গেল, তবু এক অসহায় নিরীহ জীবের হৃদয়-বিদারক অন্তিম আর্ত্তনাদ বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

একটি জীবের জীবননাশে জনতা হর্ষসূচক হরিধ্বনি দিল, বাজনা থামিল না, আবার উল্লাসধ্বনি—উলুধ্বনি। পর পর তিনটি প্রাণীর তাজা রক্তে ধরণী পরিষিক্ত হইল। বাজনা থামিয়া গেল। রন্ধনকারিণীরা সহাস্যে স্বস্থানে ফিরিলেন।

বিমনা বিনুর চোখ সহসা জলে ভরিয়া গেল। তাহার দুঃখ হইতেছিল, আর কেহ নয়, তাহারই স্বামী নবীন বয়সে এতবড় ঘাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। দয়া নাই, মায়া নাই, এতবড় হৃদয়হীন বর্ব্বরতা। মনে পড়িল তাহার ঠাকুরদাদাকে, এদিকে শক্তিহীন বৃদ্ধ, ওদিকে স্বহস্তে বলি দিবার কি উৎসাহ! যিনি পরদুঃখে বিগলিত, তিনিই বলির সময় কঠিন কঠোর। যাঁহার প্রীত্যর্থে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান, তিন কি দৈববাণী করিয়া এ প্রথা নিরোধ করিতে পারেন না? দৈববাণী না করিলেও স্বপ্নেও ত আদেশ করিতে পারেন? না পারিলে মা কিসে? দয়াময়ী জগৎজননী কিসে? বধূর চলাফেরার শিথিলতায় মনোরমা বলিলেন, "আগুনের তাতে তোমার তেষ্টা পেয়েছে বৌমা, তুমি এখন বেরিয়ে জল খাওগে, সাধুকে ব'লে দেই—সে তোমায় প্রসাদ দিক।"

বিনু সচমকে মাথা দুলাইয়া কর্ম্মপ্রবাহে ডুবিয়া গেল। অলস জীবনের অবসাদ সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে।

শ্বশুরের আনন্দ, শাশুড়ার স্নেহ, ননদিনীর প্রীতি এতদিন তাহার আলস্য জড়তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল, অন্তরালের পাষাণ-গুহার মুক্তধারায় সে আজ শুভক্ষণে স্বজনের স্নেহের তটে ফুলের মত ভাসিয়া আসিয়াছে। আর সে ভ্রমেও ফিরিয়া যাইতে চায় না তাহার সেই নিরানন্দ নির্জ্জন গৃহকোণ, পর্ব্বতপ্রমাণ ব্যবধানের মধ্যে।

ভানুমতা বলিল, "বৌ এতক্ষণই রইল না খেয়ে, আর একটু থাকুক না কেন, মা। তরুরা অঞ্জলি দেবে ব'লে এখনো খায় নি কিছু। ওরই বা এত তাড়াহুড়ো কিসের? হ'লই বা পুজোর ক'দিন কষ্ট। হিন্দুর মেয়েদের অভ্যাস রাখতে হয়। বছরকার দিনে মায়ের পায়ে দুটো ফুল ছিটিয়ে দিয়ে পরে ও জল খাবে। এস ত বৌ, বকনোতে চাল-জল দিয়ে নারায়ণের ভোগ চড়াও।"

২৫

কিয়ৎকাল পর ঝিয়েরা কোটা মাছের রাশি ধুইয়া আনিয়া ভোগশালার সিঁড়িতে নামাইতে লাগিল। সমস্ত ধীবরপাড়া ঝাঁটাইয়া মেয়েরা মাছ কুটিতে আসিয়াছে। মহামায়ার কাজে সকলে অগ্রসর হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে চায়।

মধুমতা ঘটি ঘটি জল মাছের চুপড়িতে ঢালিয়া শুদ্ধ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিতলের পরাতে ভাগে ভাগে ঢালিয়া রাখিতে লাগিল।

মনোরমা তখনই বধূকে বসাইয়া দিলেন মাছ ভাজিতে। মাছের পাহাড়ের মধ্যে যথাসময় তিন বৃহৎ গামলা মাংস আনিয়া জড়ো করা হইল।

পূজা ও বলির পরে মণ্ডপের অনুষ্ঠান ভোগ না 'সরা' পর্য্যন্ত অনেকটা হাল্‌কা হইয়া যায়, তেমন ব্যস্ততা থাকে না। এই অবকাশে প্রসাদ তাহার দলবল লইয়া বারান্দায় লুচি ভাজিতে বসিল। ইহারা রান্না হইয়া গেলে যাবতীয় রান্না মণ্ডপে টানিয়া লইবে। অভুক্ত হইয়া ভোগ ছুঁইবার নিয়ম। অজ্ঞাত কুলের পাচক ব্রাহ্মণদিগকে ভোগ না 'সরা' পর্য্যন্ত রান্না স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। পাচকেরা ময়দা মাখে, জল তুলিয়া দেয়, তরকারি ধুইয়া দেয়। ভোগ সরিয়া গেলে তখন পাচকদের অধিকারে আসে রান্না দ্রব্য।

রন্ধনশালায় যখন মাছ-মাংসের বিপুল সমারোহ চলিতেছে তখনই তরু পুনরায় তাড়া দিতে আসিল, "মা, বড়দি, বৌদি, তোমরা শীগগির এসো অঞ্জলি দিতে। এখন না দিলে বেলা গড়াস্তে ভোগের পরে দিতে হবে। পুজোর এখনো ঢের বাকী, এর পরে পুরোহিতেরা সময় পাবেন না।"

উনুন হইতে দুম্‌দাম্ হাঁড়ি-কড়া নামাইয়া তিন রাঁধুনী গেলেন পুকুর ঘাটে, সেখানে হাত-পা মুখ ধুইয়া অঞ্জলি দিতে যাইবেন মণ্ডপে। বারান্দায় প্রসাদেরা লুচি ভাজিতেছে সুতরাং পাহারার দরকার ছিল না।

তখনও সমবেত জনতাকে কাঁচা প্রসাদ বিতরণ করা শেষ হয় নাই। ছোট ঠাকুমা, সরস্বতী, মধুমতী ছোট ছোট কলার পাতায় কাটা ফল ও তক্তি নাড়ু বাঁটিয়া দিতেছিল। ক্ষিতি, তরু, পাড়ার কয়েকজন ছেলেমেয়ে সকলের হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করিতেছিল। ছোট বড় সকলে নূতন কাপড় পরিয়া পূজা দেখিতে আসিয়াছে। এ কয়েকদিন তাহারা পেট পুরিয়া প্রসাদ পাইবে। কান ভরিয়া গান শুনিবে। সকলের চোখ মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত।

প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া বিনু সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। পঞ্চঘটের সামনে কলার পাতার উপরে তিনটি ছাগমুণ্ড। রক্ত জমিয়া 'থানা থানা' হইয়া রহিয়াছে। জিভ অর্দ্ধেকটা বাহির হইয়াছে। খোলা দুই চোখ পট্ পট্ করিতেছে। মাথার ঘৃত সলিতা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তিনখানা নূতন মাটির সরায় চিনি কর্পূর কলা পানের খিলি রক্তে ডুবিয়া রহিয়াছে।

বিনু পুষ্প-বিল্বদল লইয়া দেবীর শ্রীচরণ উদ্দেশে অঞ্জলি দিল বটে, কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিল না। "রূপম্ দেহি, ধনং দেহি"র পরিবর্ত্তে তাহার কোমল করুণার্দ্র অন্তস্থল হইতে উচ্চারিত হইল, "মা, তুমি তোমার বলি বন্ধ ক'রে দাও। স্বপ্নে নিষেধ কর, দৈববাণীতে ব'লে দাও। জীবের দুঃখ আর সইতে পারি না। তুমি রক্ত খাওয়া বন্ধ করলে আমিও মাছ খাওয়া ছেড়ে দেব। তুমি না ছাড়লে আমার ছাড়ার বালাই। দোহাই, আমার কথা রাখ, মাথা খাও।"

ভোগ রান্না শেষ হইলে মণ্ডপে লইবার উদ্যোগ

হইতে লাগিল। বন্দুকের ফাঁকা শব্দ করিয়া বাড়ী হইতে কাক চিল, কুকুর বিড়াল তাড়াইয়া দেওয়া হইল। প্রাচীরের সবদিকের দরজা বন্ধ করিয়া ভোগশালা হইতে মণ্ডপ পর্য্যন্ত গোবর-জলের ছড়া পড়িল, গঙ্গাজলের ধারা বহিল। বাঁশের বড় বড় পাকা লাঠি লইয়া ভৃত্যবর্গ চারিদিকে পাহারা দিতে লাগিল।

প্রসাদ তাহার বন্ধুদের লইয়া এক ঘরবোঝাই ভোগ টানিয়া লইল মণ্ডপ বোঝাই করিতে। দই, ক্ষীর, জোড়া সন্দেশ, রসগোল্লা, জল, পানের বাটাভরা সমস্ত পানের মসলা সহকারে বোঁটা ছাড়ানো চেরা পান, কিছুরই ত্রুটি রহিল না।

ভোগ লওয়া হইলে ঘর ছাড়িয়া দেওয়া হইল কামিনীর মাকে। উনুনের আগুন কাটিয়া লেপিয়া-পুঁছিয়া ফের সাজাইয়া রাখিতে হইবে পরের দিনের জন্য। ভোগের ঘর পরিষ্কারের একটা পৃথক্ বৃত্তিও আছে, সেটা কামিনীর মায়ের প্রাপ্য।

ভোগ সরিয়া গেলে রাঁধুনীরা, বহনকারীরা গা ধুইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া জলযোগ করিলেন।

হরিণহাটি ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও গ্রামে আরও কয়েকখানা পূজা হয়। এক এক দিন এক-এক বাড়ীতে ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা সামাজিক প্রথা পালন করিয়া থাকেন।

পূজার আনন্দ সম্ভ্রান্ত ভদ্র-সম্প্রদায় হইতে নিম্ন-শ্রেণীদের মধ্যেই অধিক। বাধ্য-অনুগত জন ভিন্ন ধনীর আলয়ে তাহারা আমন্ত্রিত হইতে পারে না। সেই ইতর জনেরা সম্মান ও সমাদর লাভ করিত গ্রামের ভিতরে একমাত্র মহেশবাবুর নিকটে। দুর্গাপূজায় অন্ন-মহোৎসবে জাতিবিচার ছিল না। গ্রামবাসী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীদিগকে তিনি ভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। এক ভোগ, একই অন্নব্যঞ্জন, দধি মিষ্টান্ন সমপর্য্যায়ে পরিবেশন করা হইত।

বৃহৎ জমিদার ভবনে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত হইয়া সকলে আহারে বসিত।

পূর্ব্বে বাল্‌তি হাতা লইয়া জমিদার নিজেই সকলের সহিত পরিবেশন করিতেন। বর্তমানে ছেলেদের হাতে পরিবেশনের ভার দিয়া নিজে সঙ্গে থাকিয়া তদ্বির করিয়া দেখিতেন। একটি প্রাণীও অভুক্ত থাকিলে তাঁহার বিরাম বিশ্রাম থাকিত না।

আড়ালে-আবডালে কাঁসী খোরা হস্তে স্ত্রীলোকের দল ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া চাপা স্বরে মিনতি করিতেছিল, "মাঠান, আমার ম্যায়াডার দুই দিন হ'ল ছাওয়াল হইচে, তারে দুডা পরসাদ দাও। তারে দেইয়ে আস্তে আমি খাইতে বসি।"

কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কেহ জ্বরে আক্রান্ত, কেহ কুটুম্ববাড়ী গিয়াছে, এমনি ধরণের নানাপ্রকার অন্তরায়, কিন্তু সকলের জন্যই প্রসাদ ভিক্ষা।

সমস্ত বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইয়া ভোজনে বসিয়াছে। এদিকে মনোরমা প্রার্থীদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। পূজার তিন দিন কেহ যেন বিমুখ হইয়া শূন্য হাতে ফিরিয়া না যায়, সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি। এক্ষেত্রে স্বামীর অন্নদানব্রত স্ত্রী সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন।

নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত, আগত-অভ্যাগত, দাস-দাসীকে খাইতে দিয়া বাড়ীর মেয়েরা যখন আহারে বসিলেন তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

মণ্ডপের আঙ্গিনা জনসমাগমে ভরিয়া গিয়াছে। গ্রামোফোনের রেকর্ড অবিরাম বাজিতেছে। বাহির মহল হইতে ঘন ঘন তাগিদ আসিতেছিল মেয়েদের কাছে— আরতির সময় উত্তীর্ণ প্রায়। কুললক্ষ্মীদের অনুপস্থিতিতে আরতি আরম্ভ করা যাইতেছে না।

গুরুতর পরিশ্রমের পর দিনান্তে খাওয়া ত খাওয়াই! কতক গিলিয়া, কতক ফেলিয়া সকলকেই শশব্যস্তে উঠিয়া আসিতে হইল।

পূজার কয়েকদিন দিবাভাগে বিধবাদের খাওয়া নিষিদ্ধ, অন্ন নিষিদ্ধ। ছোট ভোগের ঘরে তাহাদের নিমিত্ত লুচি তরকারি ভাজা মোহনভোগ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে। দুই ঠাকুমা ও সরস্বতী খাইতে বসিয়াছে।

এ বেলা আরতি দর্শনকারীদের ধামা ধামা বাতাসা বিলানো হইতেছে।

কোনরূপে হাত-পা ধুইয়া মাথার সামনে চিরুণী চালাইয়া নূতন শাড়ী-জামা পরিয়া সকলে মণ্ডপে উপস্থিত হইল।

মণ্ডপের একপাশে গালিচা পাতিয়া মেয়েদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে, পাড়ার মেয়েরা দলে দলে আসিয়া আসন লইয়াছে। মনোরমা তাহাদের পিছনে বিনুকে বসাইয়া দিলেন ; সামনে বসিলে লোকে দেখিয়া নিন্দা করিবে। ভানুমতী, মধুমতী সামনে গেল। সরস্বতী কখনও আরতির সময় উপস্থিত থাকে না। সে সমস্ত উৎসব-আনন্দ হইতে নিজেকে সযত্নে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। ছোট ঠাকুমা আসিলেন, ঠাকুমার আসন মণ্ডপের অন্দরের সিঁড়িতে।

ঝাড়ের বাতি, গ্যাস্ ও হাজাকের আলোয় মণ্ডপ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। ফুল চন্দনের সঙ্গে ধুপ, গুগ্‌গুলের সুবাস মিশিয়া নন্দনের সুরভি বহিতেছে।

আজিকার দিনটা বিনুর কেমন যেন এক বিচিত্র স্বপ্নে কাটিয়া গিয়াছে। এতক্ষণে তাহার সেই স্বপ্নজড়িমা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। পূজায় বাবা তাহাকে যে শাড়ী সেমিজ জ্যাকেট পাঠাইয়াছেন শাশুড়ীর নির্দ্দেশে সে তাহাই পরিধান করিয়াছে। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের অবকাশ পায় নাই। অবকাশ মিলিল এতক্ষণে। কাঠগোলাপী রংএর পার্শীশাড়ী, জড়ির ফুলতোলা লেসের জামা। দুইটিরই কি বাহার! বিনু ধুপের ধূমজালে আবছা দেবীপ্রতিমার মুখ হইতে চোখ নামাইয়া সকলের অগোচরে শাড়ীর অঞ্চল, জামার লেস নিবিষ্ট মনে দেখিতে লাগিল। সহসা তাহার অনুভূতি জাগ্রত হইল মাতৃহস্তের সুকোমল স্পর্শে। শুধু স্পর্শ নহে, মায়ের গায়ের মিষ্টি গন্ধটুকু তাহার নাসাপথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উতলা করিয়া তুলিল।

বোকা বিনু ভুল করিয়াছিল, যাহাকে মায়ের গায়ের ঘ্রাণ বলিয়া অনুভব করিয়াছিল তাহা গন্ধরাজ ফুলের। শাড়ী বদলাইতে সে যখন ঘরে গিয়াছিল তখন তাহার চোখে পড়ে সদ্যচয়িত দুই বাটি গন্ধরাজ। তাহারই একটি সে খোঁপায় পরিয়া আসিয়াছিল। সে কথা মনে ছিল না। মানসনেত্রে ভাসিতে লাগিল সেই ছায়া সুরভিতে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামখানি। যাহার কোল এমনি প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে। বাঁশবনের মাথার উপরে চাঁদ হাসিতেছে, তারা হাসিতেছে। ঝোপে ঝাড়ে জোনাকি জ্বলিতেছে, নিভিতেছে। তরুপল্লবের মর্ম্মরধ্বনির সহিত ঝিল্লীস্বর মিশিয়া গিয়াছে। সেখানেও ঢাকঢোল কাঁসী বাজিতেছে। আরতি হইতেছে। পাড়ার মেয়েরা আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিনুর মা। মায়ের অপূর্ব্ব সুন্দর মুখশ্রী ঈষৎ ম্লান। আয়ত আঁখি দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত। মা মনে মনে ডাকিতেছেন, 'বিনু মা আমার'! বিনুর চোখের জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তুমুল বাদ্যধ্বনির মধ্যে কখন যে আরতি শেষ হইয়া গেল বিনু তাহা টের পাইল না।

২৬

আরতি-শেষে সারিগানের গায়করা অগ্রসর হইল। ইহারা আউল-বাউলের দল নয়। সারিগায়কের দল। ইহারা জাতিতে মুসলমান। পূজার সময় গ্রামান্তর হইতে আসিয়া পূজাবাড়ীতে নাচিয়া-গাহিয়া পার্ব্বণী আদায় করে। ইহারা সংখ্যায় সাত-আটটি লোক আসিয়াছে। সকলের পরিধানে কোরা বিলেতী ধুতি, গায়ে চাদর, পায়ে পিতলের নূপুর ও হাতে একতারা। বাঁ হাতে কোঁচার খুঁট ধরিয়া ডান হাত উর্দ্ধে তুলিয়া মাথার বাবার চুল ও বুক-সমান দাড়ি দোলাইয়া সকলে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল,

হে মা দুর্গে,
ধন্য ধন্য রাঢ়ের দেশে গুপ্ত ছিলেন কালী,
সত্যযুগে দিয়েছিল লোহার পাঁঠা বলি।
হে মা দুর্গে!
সপ্তমী অষ্টমী তিথি হইল সমাপন,
নবমীতে দুর্গা নিতে আইল ত্রিলোচন।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত স্বর্গপুরী হতে,
তত্ত্বশুনি গিরিরাণী দুর্গা নিল কোলে।
মৃত্তিকায় বসেন গিয়ে ভাসি নয়ন জলে।
হে মা দুর্গে!

নাই রে কাজ গিরিরাজ, বলগে যেয়ে শিবে,
নাই রে দিবে তারা,
তারার লেগে কেঁদে কেঁদে চক্ষু হইচি হারা।
হে মা দুর্গে!
কত দেশের মেয়ে দেয় বিয়ে থাকে পরম সুখে।
মোর ভবানী হরমোহিনী জনম গেল দুখে।
হে মা দুর্গে!

সারিগানের দল নাচিয়া গাহিয়া কর্ত্তার কাছে পারিতোষিক লইতে গেল।

ইহার পরে ধুপভাঙ্গার দলের পালা। বড় বড় মাটির ধুনুচিতে গনগনে আগুনে ধুপ পুড়িতেছে। তাহারই এক-একটি ধুনুচি হাতে লইয়া মূর্ত্তিমান্ পালোয়ানদের নৃত্য আরম্ভ হইয়া গেল। ইহার পরে সর্দ্দারেরা লাঠি খেলা দেখাইবে। সর্ব্বশেষে গোল বারান্দার আঙ্গিনায় যাত্রাগানের আসর বসিবে, অদ্যকার পালা "বৃত্র সংহার।" ইহাই লইয়া গ্রামবাসীরা জাগিয়া কাটাইবে সারাটা রজনী।

মনোরমা আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আগামীদিনের বিরাট্ আয়োজন আছে। মেয়েদের ডাকিয়া, বধূকে লইয়া ভিতরে আসিলেন।

আরতির উলু দিতে দিতে ঠাকুমা নিতান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, "তবু মরা হাতী লাখ টাকা।" এখনও শুইয়া পড়েন নাই। তাঁহার দিব্যাসন অধিকার করিয়া বচনে অমিয় ঢালিতেছিলেন, "ও সরি, কাল অষ্টমী লাগবে, সাথে সাথে যে ভরার বাতি জ্বালতে হবে, মনে আছে ত! পিতিমার পেছনে বড় মাটির পাতিলের মধ্যে বড় পিদিপে নতুন কাপড়ের মোটা সলতের পিদিপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। দশমীর সন্ধ্যে অবধি তেল-সলতে দিয়ে ওকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে, ভরার বাতি নেবা কিন্তু অকল্যাণ। কাল আবার সন্ধি পুজো আছে, এবার সন্ধ্যেয় সন্ধি পুজো প'ড়ে ভাল হইচে। নইলে পুরুত ঠাকুরের পরাণ যায় উপোস ক'রে। সন্ধি পুজোর বলির সরা গুছিয়ে রাখিস দুপুরের বলির সরার সাথে। পিতলের বড় থালায় সন্ধির একশো আটটা পিদিপ সাজিয়ে রাখিস। একশো আটটা যে নিখুঁত বেলপাতা লাগবে তা ফটিক নাপিতকে ব'লে দিইছিস ত? সন্ধি পুজোর ভোগের জন্যে পিঠে-পায়েস, লুচি পুরী আলাদা ক'রে রাখতে হবে। তখন মাছ কোটার কাছে যেয়ে দেখেছিলাম কয়েকটা ইলিস মাছ নরম। তা দিয়ে কি করেছিলি লো, ভান্যি? চিড়ে আর কাঁচা মরিচ আদা দিয়ে নরম ইলসের ঝুড়ি রাঁধলে খুব ভাল হয়। কথায় আছে 'সোন্দরের বোঁচা, ইলসের পচা'!"

মধুমতী পান খাইয়া ফিরিতেছিল, সে সিঁড়িতে পা দিয়া কহিল, "এখানে বকর বকর ক'রে কি বলচ, ঠাকুমা? দিনভোর গলা ফাটিয়েছ, এখন শুয়ে বিশ্রাম ক'রগে। আরও পুরো তিনটে দিন তোমার ব্যাঙের ঘ্যানঘ্যানানি আছে। না ঘুমুলে পারবে কেন?"

ঠাকুমা বিরক্ত হইলেন, "সৃষ্টি রসাতল তলাতল, এখন আমি শুতে যাই? কথা শুনে গা জ্ব'লে যায়—

"স্বামী-সোহাগী হলে তার অমনি ধারাই হয়। সকলেরই সোহাগ আছে, কেউ ফেলনা নয়। আমি সারাদিন বকর বকর করি, উনি হইচেন কামের কাঁঠাল।"

মধুমতী ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিল, "রাগ করলে, ঠাকুমা? আমি তোমায় ভাল কথাই বলছি। বাইরে যাত্রাগান হচ্ছে, যাও না; শুনে শুনে দুটো শিখে এস। তোমার ছড়া পাঁচালি বড্ড সেকেলে, প'চে গেছে।"

কর্ম্মশালার বারান্দায় একখানা লম্বা সরু বেঞ্চিতে সরস্বতী শুইয়া ছিল। সে সেইখান হইতেই চেঁচাইয়া বলিল, "ফষ্টি-নষ্টি রেখে এখন সকলে এসে কাজে হাত দাও। কাজ রেখে রঙ্গ রস আমার ভাল লাগে না।"

মধুমতী কহিল, "তোমরাই ত কাজের সভা সৌষ্ঠব ক'রে রয়েছ মেজদি। আমি বৌকে নিয়ে একটুখানি যাত্রা শুনে আসি। বড্ড ইচ্ছে করছে।"

তখন বাহিরে যাত্রার আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ঢোলকের সঙ্গে বেহালা বাজিতেছে, বৃত্রাসুর ভাঙ্গা গলায় গান ধরিয়াছে—"যাও যাও, ত্বরা যাও, বিলম্ব সহে না; বিনে শচী বিধুমুখী প্রাণ আর বাঁচে না।"

ভানুমতী বোনকে প্রচণ্ড ধমক দিল, "নে ন্যাকাপনা রেখে এখন এসে বঁটিতে বোস্। আজকেই গান ফুরিয়ে যাবে না। পরে শুনিস্ যত ইচ্ছে। দুখানা বঁটি খালি থাকলে রাত ভোর হয়ে যাবে।"

মধুমতী বিষণ্ণ হইয়া তরকারি কুটিতে বসিয়া গেল।

ঠাকুমা বচন ঝাড়িলেন, "কাজ থুয়ে মারে মাছ, অলক্ষ্মী লাগে পাছ।"

কুটনোর আসরে স্থির হইল আগামী দিনের কার্য্য-প্রণালী। বছরের তিন দিন প্রত্যেকের ইচ্ছা রান্না-বাড়া করিয়া মা দুর্গার ভোগ দেয়; হাতের রান্না ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের পাতে পড়ে। এই উৎসাহে সকলেই ভোগ রাঁধিতে উৎসুক। সরস্বতী বলিল, "কাল কিন্তু আমি

ভোগ রাঁধব, তোমাদের যার ইচ্ছা আমার সাথে থেক।"

মধুমতী বলিল, "আজ যারা রেঁধেছে কাল তারা বাইরে টহল দেবে। তোমার সাথে আমি থাকব, মেজদিদি। আজ ওরা ফাউ নিয়েছিল। কালও কিন্তু আমাদেরও ফাউ থাকবে, বৌ।"

সরস্বতী ভ্রূ বাঁকাইয়া তিক্তস্বরে কহিল, "আমার বাপু ফাউ লাগবে না, তোর যদি লাগে তা হ'লে তুই নবমীতে ভোগ রাঁধিস্।"

ঠাকুমার শ্রবণ-শক্তি তীক্ষ্ণ, তিনি তাহা স্বীকার না করিলেও এবাড়ীর সামান্য বাক্যালাপও তাঁহার কর্ণগোচর না হইয়া যায় না। ঠাকুমা আধ-ঘোমটার মধ্য হইতে অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, "যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।"

ভানুমতী একটা মিঠে কুমড়া ফালা দিতে দিতে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "বৌ ভোগ রাঁধার ভেতরে গেলে তুমি রাঁধবে না, সেটা স্পষ্ট করে বললেই হয়। ছাপাছাপি, ঢাকাঢাকি আমি ভালবাসিনে। কিন্তু এসব কি ভাল? এর পরিণাম নেই? বিষ গাছের বীচি বুনলে তাতে অমৃত ফল্ ধরে না।"

সরস্বতী স্বল্পভাষিণী, কাহারও কথার পৃষ্ঠে বিশেষ কথা বলে না। তার একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র অশ্রুজল। সে চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

মনোরমা প্রমাদ গণিলেন। যদিও ইহা নূতন নহে, দৈনন্দিন ঘটনা, তবু কাজের বাড়ী, চারিদিকে লোকজন।

মনোরমা উঠিয়া অশ্রুলোচনা কন্যাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। তুচ্ছ ব্যাপারটাকে আরও তুচ্ছতর করিবার প্রয়াসে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভানুর কথা আলদা ও একাই দশজনার সামিল, তোরা তেমন শক্ত নোস, অত রান্না পারবি না। আমিই থাকব তোদের সাথে।"

মায়ের মুখে সে একাই দশ শুনিয়া ভানুমতী মনে মনে খুশী হইল। তাহার রাগ-অভিমান বর্ষার মেঘ রৌদ্রের ন্যায় এই আছে, এই নাই। রাগ না থাকিলে তাহাকে মাটির মানুষ বলিলে অত্যুক্তি হইত না। ভানুমতী যেমন কাজ কর্ম্মে অসামান্য, তেমনি রোগীর সেবা-যত্নে। কিন্তু রাগিলে রক্ষা নাই, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহাকে যাহা মনে আসে অনর্গল বলিয়া যায়। বিষ ঝাড়ার পরে অপরাধীর অপরাধের গুরুত্ব তাহার মনে থাকে না। সে মহেশবাবুর প্রথমা আদরিণী কন্যা, তাহার প্রাধান্য সর্ব্ববিষয়ে। মেয়ের উগ্র স্বভাবের জন্য মনোরমার শান্তি নাই। তিনি সহজে বাঘিনীকে ঘাঁটাইতে চাহিতেন না।

বারান্দায় যখন পাঁচখানা বঁটিতে চলিতেছিল আনাজ নিধন যজ্ঞ, তখন উঠানেও চলিতেছিল কচুর শাকের বিনাশ সমারোহ। ঝি-এরা ঘাটের কাজ সারিয়া, হাতে-পায়ে তেল মাখিয়া গ্যাসের আলোতে শাক কুটিতে বসিয়াছে। সকলেই মনে মনে অপ্রসন্ন। অমন সুন্দর যাত্রা গান তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, শুনিতে পাইতেছে না। এবাড়ীর কাজ যেন সর্ব্বনেশে, ফুরাইতে চায় না। যাত্রা গানের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত, যত টানিবে ততই বাড়িবে। দুই ঝাঁকা কোটা শাক লক্ষ্য করিয়া ঠাকুমা কহিলেন, "ও হারাণ, আর কত শাক কুটছিস? ওতেই হয়ে যাবে। শাক কি কেউ বেশী খায়? ওতে পদার্থ নাই। 'মাংসে মাংস বৃদ্ধি, দুধে বৃদ্ধি বল, ঘি-এ রক্ত বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল'। যা তুলে-পেড়ে রেখে যাত্রা গান শোন্‌গে। ওলো পসারি, বৌকে আনলি? দিব্যি গুড়গুড়ে বৌটা ত! ঘোমটা তুলে বৌয়ের মুখখানা দেখা ত দেখি?"

"এ আমার ভাগ্নে বৌ মাঠান, যাত্রা শুনতে আইচে। ডাকে আনে বসায়ে দিচি শাক কুটতে। হাতে সাথে না করলে কি কাজ আগায়?" বলিয়া পসারী বৌ আনিয়া ঠাকুমাকে ঘোমটা তুলিয়া দেখাইয়া কহিল, "মাঠানকে গড় কর বৌ। আমাগরে ঘরের বৌ দেখানোর যুগ্যি লয় মাঠান, গায়ের বর্ণ কালা।" প্রণাম লইয়া ঠাকুমার মহা আনন্দ, হাসিয়া কহিলেন, "কিসের কালা? দিব্যি বৌ, সুখে থাক মা, আমি আশীর্ব্বাদ করি।। দেখ্ পসারি, ওরে কালা কোসনে, মনে দুখ পায়—কালা কালা করিসনে লো, গোয়ালেরি ঝি! বিধাতা করেছে কালো, আমি করব কি? এক কালো যমুনার জল, সর্ব্বলোকে খায়; কালো মেঘের ছায়ায় বসে শরীর জুড়ায়।"

বৌকে লইয়া পসারী হারাণীরা গান শুনিতে চলিয়া গেল। নূতন কাজের আর কোন সন্ধান না পাইয়া ঠাকুমাও উঠিলেন।

নিয়মের ঘরে যখন তালা দেওয়া হইল তখন রাত্রি-শেষের বিলম্ব ছিল না। যাত্রার আসর তখন পরিপূর্ণ! শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণী কয়েকটির তখন আর প্রবৃত্তি হইল না যাত্রার আসরে উঁকি দিতে।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে যে যাহার শয্যাতলে অঙ্গ ঢালিয়া দিল।

ক্রমশঃ

রীতি, শব্দ এবং ভাববৈচিত্র্যই ভাষার ঐশ্বর্য্য। অধিক বাঁধাবাঁধিতে ভাষা পঙ্গু হইয়া পড়ে। খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ বর্জ্জন করিয়া কেবল সংস্কৃত শব্দে ভাষার কলেবরবৃদ্ধি ও পুষ্ট করিলে তাহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে না।...প্রাচীন বটতলার গ্রন্থে ব্যবহৃত অথ, অথকিং, অলমিতি প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অভিধানে স্থান না পাইলে অভিধান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কারণ এ শব্দগুলির ব্যবহার আছে। ইংরাজীতে খাঁটি বাঙ্গলার মতন খাঁটি স্যাক্‌সন্‌ ব্যতীত অনেক লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মন অথবা আদি শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে দোষ হয় না। ইংরাজী সাহিত্যে তাহাদের বহুল প্রচলন আছে। বাঙ্গলা অভিধান সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। 'অবহিত্থ', 'অজিক্ষা', 'অর্জ্জুকা', 'অতিবেল', 'অবিতথ', 'এতাবান', 'জরী', 'এষিত', 'মিথ', 'নন্দথু', 'কিমু', 'কিমুত', 'কথমপি', 'কদা', 'এতর্হি', 'দোগ্ধা', 'দেহভৃৎ', 'বিধ্বক', 'সমন্তাৎ', 'রংহ', প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ বঙ্গভাষায় কস্মিন্‌কালেও ব্যবহৃত হয় না অথচ অভিধানে স্থান পাইয়াছে।—বঙ্গভাষা ও বাঙ্গলা অভিধান, প্রবাসী—১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, ১৩০৮, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সোবিয়েত সফর

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৬ অক্টোবর ১৯৬২, মস্কো

আজ সকালে বের হলাম ত্রেতিয়াকভ (Tretyakov) চিত্রশালা দেখতে। প্যাভেল ত্রেতিয়াকভ নামে শিল্পপতি ছিলেন উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ছবি সংগ্রহ ছিল তাঁর সৌখিনতা; বোদ্ধাও ছিলেন। ১৮৯২ সলে তিনি তাঁর সংগ্রহ মস্কো নগরকর্তাদের হাতে সমর্পণ ক'রে দেন। ১৯১৮ সালে যখন এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী আয়ত্তে আসে, তখন সেখানে ছিল মাত্র চার হাজার চিত্রাদি। আজ সেখানে বিবিধ কলা-নিদর্শনের সংখ্যা ৫০ হাজার। এই গ্যালারিতে ১১ শতক থেকে রুশীয় আর্ট বস্তুর নমুনা রয়েছে। রুশীয় চিত্রকরদের শ্রেষ্ঠ চিত্র সৃষ্টি এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। আর্ট নিদর্শনের প্রায় লক্ষাধিক ফোটানেগেটিভ ও ফোটোগ্রাফ আছে। প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ লোক এই চিত্রশালা দেখতে যায়। বিশেষ চিত্রশিল্পী সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দেন বিশেষজ্ঞরা।

আমরা ঘরের পর ঘর ছবি দেখে চলেছি; কি ভিড়! আমরা ভ্রমণ-বিলাসীর চোখ নিয়ে ছবির উপর চোখ বুলিয়ে চ'লে যাচ্ছি; কিন্তু এক-একটা ছবির সামনে না দাঁড়িয়ে পারছিনে। সেরকম ছবি শিল্পীর শোণিত ঢেলে আঁকা—অর্থাৎ তুলি ও রঙের স্পর্শে শিল্পীর সমস্ত ব্যক্তিত্বটা ফুটে উঠেছে; ছবিতে হর্ষ, বিষাদ যেন মূর্ত হয়ে বের হয়ে আসছে। ইতিহাসের পাতা থেকে যাদের নাম মুছে গেছে, তারা শিল্পীর তুলিতে অমর হয়ে বেঁচে রয়েছে। মোনা লিসা কে ছিল, তা জানবার কৌতূহল যার থাকে থাক্, কিন্তু তার মুখের চাপা হাসি দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে রসিকরা আসছে। তাকে দেখবার জন্য আমেরিকানরা তাকে নিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের ছবি আঁকা হয়েছে—যুদ্ধের বীভৎসতা দেখাবার জন্য। মানুষের বেদনা ফুটে উঠেছে, তার মধ্য দিয়ে। ত্রেতিয়াকভ চিত্রশিল্পী Repin-কে য়াসনা পোলিয়ানাতে পাঠিয়ে তলস্তয়ের যে প্রতিকৃতি করিয়ে আনেন—সেটা দেখলাম।

দুই ঘণ্টার উপর দেখলাম—কি দেখলাম তার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে আর একখানা বই লিখতে হয়। দেখতে দেখতে এই কথা মনে হচ্ছিল, আমাদের দেশে কি ত্রেতিয়াকভ হয় নি? হয়েছে বই কি—কিন্তু তারা যক্ষের ধন ক'রে আগ্‌লে রেখেছিল। অযোগ্য বংশধররা সুবিধা পেলেই বিক্রয় ক'রে দিয়েছে একে, ওকে, তাকে! পাটনার ইহুদী মানুক্ সাহেব যখন তাঁর বিরাট্ সংগ্রহ বিলাতে নিয়ে চ'লে গেলেন, তখন না পাবলিক, না গবর্ণমেণ্ট সেটা রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। জালানের সংগ্রহালয় কি সরকারী আওতায় এসেছে? জানি না। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পসংগ্রহ—একদিন অর্থাভাবে আমেদাবাদের ধনীর কাছে বিকিয়ে দিতে হয়—বাঙালী তাকে ঘরে রাখবার চেষ্টা করে নি; সে কথা ভুলতে পারিনে।

ত্রেতিয়াকভ গ্যালারিতে যে সব ছবি সংগৃহীত হয়েছে তা ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে আঁকা; অর্থাৎ আধুনিক কালের চিত্রবিকৃতির সংগ্রহ এখানে নেই। সোবিয়েতরা বাস্তববাদী—তারা সাহিত্যকে আর্টকে 'কাজে'র জন্য ব্যবহার করতে চায়। স্তালিনের সময় ত সাহিত্যিক শিল্পী আপন মনের রঙে ও রসে কিছু রচনা করতে পেতেন না। কম্যুনিষ্ট পার্টির মুরুব্বিরা এসবও নিয়ন্ত্রণ করতেন। তার ঢেউ বহুকাল চলে; তা না হলে পাস্তারনেকের বইখানা নিয়ে এত কাদা কেন ঘুলিয়ে উঠল। কিন্তু কালবদলের হাওয়ায় সোবিয়েত দেশের সাহিত্যে ও শিল্পে স্রষ্টার মনের কথা প্রকাশ পাচ্ছে—পার্টির নির্দেশ মেনে চলছে না নবীন ভাবুকরা। ক্রুশ্চেভের আর্টবোধ খুবই চাঁচাছোলা সাধারণ—তাই আধুনিক আর্টকে গাধার লেজের ঝাপটানি ব'লে ব্যঙ্গ করেছেন। উপমাটা ক্রুশ্চেভের

উপযুক্ত হয়েছে—কারণ, তিনি সোজা কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কথার চাতুরী তাঁর নেই। কিন্তু আজকাল যে সব ছবি আধুনিক আর্টের নামে বাজারে আসছে—সে-সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। মোট কথা সোবিয়েত রুশেও সে হাওয়া এসে গেছে—একথা ভুললে চলবে কেন—দুনিয়াটা এক হয়ে গেছে, the world is one। লৌহ-কপাট টেনে দিলে contagion বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু হাওয়ায়-চলা infection রুখতে পারা যায় না। ভাবের আনাগোনা আজকের দুনিয়ায় বন্ধ করতে যাওয়া বাতুলতা।

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েই বের হয়ে পড়লাম লেনিন গ্রন্থাগার দেখবার জন্য। এই লাইব্রেরী মস্কোর কেন, পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থাগার। ক্রেমলীনের সামনে এই অট্টালিকার পাশ দিয়ে বহুবার গিয়েছি—তার স্থাপত্য, তার সুন্দর কঠোর পরিবেশ মুগ্ধ করেছিল। ১৮৬২ সালে এর পত্তন হলেও সোবিয়েত রুশ পাকা হয়ে বসবার আগে পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে বই-এর সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ; তারপর বিপ্লবের পর গত কয় বছরের মধ্যে গ্রন্থাদির সংখ্যা হয়েছে ২ কোটি ২০ লক্ষ। এই বাড়ীতে ২২টি পড়বার ঘর, প্রায় আড়াই হাজার পাঠকের পড়বার জায়গা আছে। বই রাখা আছে ১৮ তলা বাড়ীতে। কলে বই আসছে ডেলিভারি টেবিলে। আমেরিকার লাইব্রেরী অব্ কন্‌গ্রেসের চলচ্চিত্রে এ সব দেখা। আজ চর্মচক্ষে সেটা দেখলাম এখানে। এই লাইব্রেরীতে ৮৯ সোবিয়েত ভাষার আর বিদেশী ৮৪ ভাষার বই পত্রিকা আসে। ১২ হাজার পত্রিকা, ১০০০ খবরের কাগজ। ১০ লক্ষ ক'রে বই জমা হচ্ছে প্রতি বৎসর। এই সব জিনিষ গোছানো, তালিকা করা, কার্ড করা প্রভৃতি কাজ করার জন্য বহুলোক নিয়োজিত। বিজ্ঞানী গবেষকদের অফুরন্ত প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। রেস্তরাঁতে ঢুকেই খানা চাই—রান্না ক'রে খাবার সময় কই? সময় নেই—তথ্য এখনি চাই। অসংখ্য প্রশ্ন আসছে, দ্রুত তার উত্তর পাঠাতে হবে। আমরা পৌঁছলে একজন মহিলা আমাদের নিয়ে চললেন ডিরেক্টরের ঘরে। প্রধান নেই, তাঁর সহকারী বা সহকারিণী আমাদের স্বাগত করলেন, লেনিন লাইব্রেরীর ব্যাজ জামায় এঁটে দিলেন। কয়েকখানা ক'রে বই উপহার দিলেন। তার মধ্যে ছিল বাংলায় তলস্তয়ের তর্জমা কসাক ও গল্পের বই। ভারত সরকার ও সাহিত্য আকাদামির পক্ষ থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিষ ও বই উপহার দেওয়া হ'ল। আমি বহুকাল গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ব'লে এঁদের বর্গীকরণ পদ্ধতি কি জানতে চাইলাম। বুঝলাম, ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ পুরাপুরি চলিত হয় নি; Cutter ও Brown-এর পদ্ধতি রুশীয় ক'রে নেওয়া হয়েছে।

প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ঘুরলাম, দেখলাম। পুঁথিবিভাগ, মাইক্রোফিল্‌ম বিভাগ প্রভৃতি দেখলাম। মাইক্রোফিল্‌মের বিরাট্ আয়োজন, বহু দুষ্প্রাপ্য বই ফিল্‌মে তুলে রাখা হচ্ছে। প্রেমচাঁদের একটা প্রথম ছাপা বই-এর ফিল্‌ম আমাদের দেখালেন। বইটার একটা কপি মাত্র আছে, টানাটানিতে দশম দশা যাতে প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য ফিল্‌মে তোলা হয়েছে। কলের তলায় ফেলে বড় বড় হরফ পড়তে খুবই সুবিধা। অন্ধকার ঘরে অনেকেই মাইক্রোফিল্‌ম নিয়ে কাজ করছেন দেখলাম।

হোটেলে ফিরলাম। আজ রাতে লেনিনগ্রাদ যাত্রা করতে হবে। জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলাম। হাতে সময় আছে। সন্ধ্যার পর একটা সিনেমায় যাওয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গল্প নিয়ে নাটক। একটি যুবক রুশ পাইলট্ যুদ্ধে যাবার আগে একটি মেয়েকে ভালবাসে। যুদ্ধ সুরু হ'ল; ট্রেণে ক'রে সৈনিকরা যাচ্ছে, স্টেশনে আত্মীয়স্বজন দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছে, উৎসাহ দিচ্ছে, প্রাণপণে চীৎকার করছে যদি শুনতে পায়। কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে, ট্রেণের পর ট্রেণ চ'লে যাচ্ছে। যুদ্ধের সময় খবর এল, সেই পাইলট্ মারা গেছে। এদিকে মেয়েটির একটি ছেলে হয়েছে। নিজের বাড়ীতে থাকে, যুদ্ধের জন্য ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। ইতিমধ্যে তার দিদি এল ঐ বাড়ীতে থাকতে স্বামীর সঙ্গে। স্বামীটি বর্বর। শ্যালীকে নির্যাতন করে, অপমান করে তাদের বিবাহ চার্চে সিদ্ধ হয়নি ব'লে। মেয়েটির কাছে আসে তার বাল্যবন্ধু—একসঙ্গে স্কুলে পড়েছিল তারা। সে এখনও মিলিটারিতে কাজ করে—থাকে আর্কটিক সাগরের দিকে।

সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সে পাইলটকে ভুলতে পারছে না। শিশু ছেলেটি বন্ধুকে দেখে 'বাবা' বলে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এটা অসহ্য হ'ল মায়ের, সে কিছুতেই সেটা শুনতে চায় না, ছেলেকে তার কোল থেকে কেড়ে নিল। বন্ধু চলে গেল উত্তর মহাসাগর তীরে। দিদির এক প্রেমাস্পদ ছিল, সে পড়াশুনা করে পণ্ডিত হয়েছে, বই লিখেছে। দিদি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর ঐ বর্বর লোকটিকে বিয়ে করেছিল টাকার লোভে। দিদিকে দেখতে পেয়ে সেই পণ্ডিত ছেলেটি বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। দিদি কাঁদে। পাইলট্ যুদ্ধশেষে ফিরে এসেছে। কিন্তু পার্টি তাকে নিচ্ছে না। সে জার্মানদের বন্দী ছিল; নিশ্চয়ই নাৎসী মতাবলম্বী হয়ে এসেছে। অত্যন্ত কষ্টে দিন যায়; মদ খেয়ে শরীর পাত করে। মেয়েটি তাকে খুঁজে বের ক'রে আনে। পার্টির কাছে গেল, কিন্তু পার্টিকর্তা কিছুতেই তাদের কথা শুনলেন না। এমন সময়ে কাগজে খবর বের হ'ল স্তালিনের মৃত্যু হয়েছে। কী যেন একটা আনন্দ সংবাদ। মেয়েটি বললে—'চল মস্কো। সেখানে পার্টির কার্তাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলব।' পার্টির লোকেরা সব বুঝে পাইলটকে সগৌরবে গ্রহণ করলে। এবং তাঁকে বিজয়ীর সম্মান দিল।

আসলে কাহিনাটি স্তালিন পর্বের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করার জন্য রচিত। ছবি হিসাবে সুন্দর—ফোটোগ্রাফী দেখবার মতো।

সিনেমা দেখে হোটেলে ফিরলাম। সেরব্রিকভ, বরিস্, লিডিয়া আমরা একসঙ্গে খেলাম। অনেকক্ষণ বসে গল্প হাসি তামাসায় সময় কাটল। আজ রাত্রেই লেনিনগ্রাদ চলেছি।

হোটেল থেকে বের হলাম ১১টার পর। অনেকেই সঙ্গে চললেন স্টেশনে। লম্বা প্ল্যাটফর্ম—অনেকখানি হেঁটে আমাদের এক্সপ্রেস্ ট্রেণ পেলাম। ছয় নং গাড়ি। রুশ রেলওয়েতে এই প্রথম উঠলাম। নিচে উপরে চারটা বার্থ। আমরা তিনজন—আর একজন রুশ—এস্থোনিয়ার তালিনিন শহরে যাবেন। জানালায় ডবল কাঁচ—বোধ হয় ঘর গরমের ব্যবস্থা আছে। কাঁচের ভিতর থেকে লিডিয়াদের দেখা গেল। ১১-৫০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল।

তালিনিন যাত্রী যুবকটিকে কৃপালনী সিগারেট দিলেন; ভারি খুশি। নির্বাক্ আমরা—কেউ কারো ভাষা বুঝি না। মনে পড়ছে অনেক কালের কথা, যখন প্রথম মহাযুদ্ধের পর বল্টিক সাগর তীরের লাতবিয়া, এসথোনিয়া, লিথুনিয়া প্রভৃতি দেশগুলি জারের সাম্রাজ্য ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, আবার বিশ বছর পরে স্তালিন তাদের সোবিয়েত অঙ্গরাজ্য করে নিলেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।

ভদ্রলোকটি আপনার মঞ্চে উঠে শুলেন। আমরাও শুয়ে পড়লাম। সুন্দর বিছানা, বালিশ, কম্বল। বাথরুমটা প্যাসেজের প্রান্তে—এই যা অসুবিধা, তবে আজকাল আমাদের দেশের কতকগুলি ফার্স্ট ক্লাসে এই রকম হয়েছে। কামরার মধ্যে রেডিও বাজছে—মাঝে একটা হিন্দী গানও কানে গেল। ট্রেণে চাপা শব্দ ছাড়া আর কিছু উপভোগ্য ছিল না; এক্সপ্রেস, থামছে না কোন স্টেশনে—কেবল অস্পষ্ট আলোকছটা কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা যাচ্ছে। তার পর ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৭ অক্টোবর ১৯৬৩, লেনিনগ্রাদ।

ট্রেণে চলেছি। ভোর হতেই লেবু-চা দিয়ে গেল এক মহিলা। ট্রেণেই ব্যবস্থা আছে। তিন কোপেক ক'রে দিতে হ'ল। আকাশ ফর্শা হ'তেই বাইরে চেয়ে দেখি তুষারে সব সাদা হয়ে আছে। এ দৃশ্য কখনও দেখি নি, বাড়ীর ঢালু ছাদ, গাছের পাতা, রাস্তা—সব যেন চুনকাম করা হয়েছে। জানলা দিয়ে দেখছি—জনহীন স্টেশন চ'লে যাচ্ছে—এক্সপ্রেস থামছে না কোথাও। প্রায় সাড়ে আটটায় লেনিনগ্রাদ স্টেশনে পৌঁছলাম।

আমরা যখন ছোটবেলায় স্কুলে পড়ি, তখন জানতাম, রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ। এটা রুশিয়ার রাজধানী ছিল ১৭১৩ থেকে ১৯১৮ অর্থাৎ পিটার (১৬৮৯-১৭২৫) থেকে শেষ সম্রাট্ নিকোলাসের সময় পর্যন্ত। যীশুখ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য সাধু পিটারের নামে শহর পত্তন করেন জার পিটার; সাধু পিটারের নামে উৎসর্গ করা চার্চ আছে। সম্রাট পিটার বর্তমান লেনিনগ্রাদ থেকে মাইল ১৬ দূরে পিটার হোফ্ (এখন

নাম Petrodvortes) নামে বিরাট্ এক প্রাসাদ নির্মাণ করেন—সেটা প্রায় বাল্টিক সাগরের শাখা ফিন্‌লন্‌ড উপসাগরের কাছে। সুইডেনকে হারিয়ে রুশিয়া তার ইজ্জত পায় যোদ্ধ য়ুরোপ মহলে। সেই ইজ্জত দেখাবার জন্য সুলভ দাস শ্রম দিয়ে এই প্রাসাদ নগরী নির্মিত হ'ল। তখনকার দিনে য়ুরোপের বুনিয়াদী রাজামহারাজারা রুশীয়দের সভ্যজাত ব'লেই মনে করতেন না। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। উনবিংশ শতকে কোন রুশ বড় লোকের বাড়ীতে অতিথি আসলে, তাঁকে শোবার জন্য বিছানা দেবার পূর্বে সার্ফ-(দাস)-দের সেই বিছানায় শুতে হ'ত। বিছানার ছারপোকারা পেট ভরে খেয়ে চলে গেলে, অতিথি শুতে আসতেন। এ কাহিনা তলস্তয়ের জীবনীতে পড়ি।—আমাদের দেশে 'খাটমল' বা ছারপোকাকে দেহের রক্তদান পুণ্য কর্ম !

পিটার রাজা হয়ে রুশদের সভ্য করবার জন্য অনেক মেহনত করেন ; সে ইতিহাস বলতে গেলে মহাভারত রচনা করতে হয়।—মোট কথা, সমুদ্রের দিকে একটু জানলা খোলবার জন্য বাল্টিকের উপসাগর তীরে রাজধানী পত্তন করেন। নেভা নদীর মোহনায় গ'ড়ে উঠল নগর—এখানে সেখানে। আজ সেই নেভা নদীর উপর প্রায় ৭০০ সেতু ; পাশ ফিরলেই নেভার শাখা—প্রধান সড়কের নাম নেভাস্কিয়া।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ শব্দের 'বার্গ' শব্দটা জার্মান ; তাই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান যখন 'দুষমন' হ'য়ে উঠল—তখন নগরের নাম পাল্‌টে পেত্রোগ্রাদ করা হ'ল ; পিটার হোফ্‌-এর হোফ্‌ শব্দটা জার্মান ; সেটা নাকচ করে হ'ল Petrodvortes, খাঁটি রুশ শব্দ। পেত্রোগাদ নাম চলে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। লেনিনের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে—তার পর মহানগরীর নাম হয় লেনিনগ্রাদ। তাঁর জীবনকালে কোনও শহরের নাম তাঁর নামে হয় নি। কিন্তু স্তালিনের নামের নেশা ও শক্তির নেশা সমান ছিল। উনিশটা শহর নাকি তাঁর নাম পেয়েছিল ; এমন কি উচ্চতম গিরিশৃঙ্গেরও নামকরণ হয়েছিল স্তালিন পিক্। এখন সারা সোবিয়েত দেশে স্তালিনের নাম কোথাও আর নাই ; এমন কি ইতিহাসবিখ্যাত স্তালিনগ্রাদ—তারও নাম বদল হয়েছে ভল্গোগ্রাদ।

লেনিনগ্রাদ স্টেশনে পৌছে দেখি দুইজন ভদ্রলোক আমাদের স্বাগত করতে এসেছেন। একজনের নাম বারানিকফ্‌ অপরের নাম কালিনিন—উভয়ে অ্যাকাডেমির কর্মী সদস্য। আমরা এখানে অ্যাকাদেমির অতিথি।

মস্কো থেকে এখানে বেশি ঠাণ্ডা। তুষার পড়েছে রাত্রে, এখনও ঝিরঝিরিয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বেগে। মোটরকারের মধ্যে উঠে বাঁচলাম। আমরা উঠলাম হোটেল আস্তোরিয়ায়—এই মহানগরের সেরা হোটেল। চার তলায় স্থান হ'ল সবারই। এমন সময়ে শুনলাম নিচে নোবিকোভা এসেছেন। দেখা করতে গেলাম। এঁকে ভাল ক'রে চিনি—শান্তিনিকেতনে এসেছেন, আমার বাড়ীতেও গিয়েছিলেন। গত বৎসর সাহিত্য অ্যাকাদেমির আয়োজিত রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আহূত সম্মেলনেও এসেছিলেন। পত্র বিনিময়ও হয়েছে। ভাল বাংলা জানেন এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে রুশ তর্জমা হচ্ছে, তার একজন বিশিষ্ট অনুবাদক কর্মী। দেখা হ'লে বললেন, আমাকে ভুল ট্রেণ-এর কথা বলা হয়েছিল, ষ্টেশনে গিয়ে আপনাদের দেখতে পেলাম না ; তাই এখানে দেখা করতে এলাম। স্থির হ'ল একদিন য়ুনিভার্সিটিতে তাঁদের বিভাগে যেতে হবে এবং একদিন তাঁর বাড়ীতে ভোজন করতে হবে। বেশীক্ষণ বসতে পারলেন না—অনেক দূরে বাড়ী ; তার পর আবার য়ুনিভার্সিটিতে যেতে হবে। নোবিকোভাকে ভুল সময় বলা হয়েছিল, কথাটা শুনে একটু খট্‌কা লাগল।

প্রাতরাশ সমাধা করে আমরা বের হলাম অ্যাকাদেমির গাড়িতে। সঙ্গে বারানিকফ্‌ ও একজন মহিলা ফটোগ্রাফার। বারানিকফ্‌ পার্টির সদস্য, অ্যাকাদেমির হিন্দী বিভাগের কর্মী। এঁর পিতা বারানিকফ্‌ নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন ; তুলসীদাসের রামায়ণের অনুবাদক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এছাড়া হিন্দী সম্পর্কে বহু কাজ করেছিলেন। তুলসীদাসের অনুবাদ রুশ ভাষায় হয়েছে শুনেই আজ আমরা যতটা বিস্ময় প্রকাশ করি, উনবিংশ শতকের আট দশকে

Growse যখন রামচরিতমানস ইংরেজিতে ভাষান্তরিত ক'রে প্রকাশ করেছিলেন, ততটা বিস্ময় প্রকাশ করি নি। কারণ, তখন ইংরেজ এদেশের প্রভু, তাদের পক্ষে ভারত সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখা স্বাভাবিক ব'লেই ভাবতাম। কিন্তু, রুশীয়দের? তাদের কী গরজ ভারতের সংস্কৃতি জানবার জন্য? রুশরা জানে, মিষ্টি কথায় যত কাজ হয়, ঠেঙ্গানি দিয়ে তা হয় না। বিদেশীর মুখে বাংলা, হিন্দী শুনলে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। তবে কুটিল লোক বলে, এ হচ্ছে প্রোপাগাণ্ডার একটা পথ, ওরা মন জয় করতে চায়। প্রোপাগাণ্ডার কথাটা বাদ দিলে হয় না? কেউ-বা গম ধার দিয়ে, কেউ-বা গুঁড়ো দুধ পাঠিয়ে আর কেউ বা বই পাঠিয়ে। বিদেশীর ভিক্ষা পাওয়া খাদ্য পেলে পেট ভরে; আবার বিদেশী বই পড়লে মনটা ভরে তাদেরই বুলিতে। পেটে খাওয়া গমটা হজম হয়; কিন্তু পরের ধার করা কথা হজম হয় না; রেকর্ড খুলে দিলে সেই সব বুলি ঝরঝরিয়ে এসে পড়ে। অন্যের কথা হজম করতে পারলে নিজের কথা বের হতে পারে। মুশকিল হয়েছে, আমাদের পেট যেমন দুর্বল—মনও তেমনি হালকা, তাই হালকা জায়গা ভরে ওঠে অন্যের ধার করা কথায়! শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ, 'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতিকরা চুরি, ভালো নয়, ভাল নয়, নকল সে সৌখীন মজদুরি।'

মোটরে চলেছি, লেনিনগ্রাদের ভিজে পথের উপর দিয়ে। বারানিকফ্ আমাদের নিয়ে চলছে Field of Mars-এ—সহরের একপ্রান্তে তুষার ঢাকা বিশাল সমাধি ক্ষেত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জারমেনীর ফুরার হিট্‌লার লেলিনগ্রাদ আক্রমণ করেন। রুশকে পরাভূত করবার স্বপ্ন নিয়ে নেপোলিয়ন একশো তিরিশ বৎসর পূর্বে মস্কো আক্রমণ করেছিলেন; আজ হিটলারও সেই ভুলটি করলেন রুশকে আক্রমণ করতে গিয়ে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, লেনিনগ্রাদকে ডাঙা থেকে গোলা দিয়ে ও আকাশ থেকে বোমা মেরে ধ্বংস ক'রে দেবেন। তারপর হোটেল আস্তোরিয়ায় বড়দিনের সময় এসে উৎসব করবেন; তার জন্য ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছিলেন সেনানায়কদের। হিট্‌লারের সৈন্যবাহিনী মহানগরীকে চারদিক্ থেকে বেড়াজালে ঘিরে ছিল দশ মাসের উপর—কোনো দিক্ থেকে খাদ্য রসদ কিছুই আসে না; অনাহারে ও ব্যাধিতে ৬ লক্ষ লোক মারা গেল। একটি মেয়ের হাতের লেখা খাতা পাওয়া গেছে; সে তাতে লিখেছে, তাদের বাড়ীর কে কবে মারা গেলেন একের পর একে। কিন্তু লেনিনগ্রাদবাসীরা দমলো না; ল্যাডোগা হ্রদ দিয়ে যে ক্ষীণ সংযোগ ছিল সেটা রক্ষা করে বাইরে থেকে রসদ পত্র আনতে থাকে। এই সহর কারিগরী কাজের জন্য বহুকাল বিখ্যাত। সমস্ত লোক দিনরাত খেটে গোলাগুলি প্রস্তুত ক'রে লড়তে লাগল। যুদ্ধেও লক্ষাধিক লোক মারা পড়ল। এত ত্যাগ, এত বেদনা বোধহয় কোনো নগরবাসীদের করতে হয় নি। লেনিনগ্রাদ রক্ষার সিনেমা আমাদের দেখানো হয়। শহরের মধ্যে বোমা পড়ে কত জায়গা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আজ তার চিহ্ন নেই, নূতন করে সব গড়া হয়েছে।

এই নরমেধ যজ্ঞের অগ্নি এখনো রুশীয়রা জ্বালিয়ে রেখেছে এই সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশ মুখে। একটি জায়গায় রাতদিন গ্যাসের আগুন জ্বলছে। আর সমস্ত সমাধিক্ষেত্র এখন তুষারাবৃত। বসন্তকালের ফুলের সৌন্দর্য এখানে দেখতে পেলাম না;—ছবিতে দেখছি সেটা।

নিকটেই একটা ম্যুজিয়াম। সেখানে গেলাম। যুদ্ধের ইতিহাস ও বীরদের আত্মকাহিনী শুনলাম। আমাদের সঙ্গে যে মহিলা আকাদেমির পক্ষ থেকে আছেন, তিনি অনেকগুলি ফোটো তুললেন, আমি কতকগুলি ছবি কার্ড কিনলাম যার মধ্যে এখানকার ইতিহাস ছাপা হয়ে আছে। বুঝলাম দুষমনরা জয়ী হয় না। নেপোলিয়ন ও হিট্‌লার এই শ্রেণীর পাপী—পরস্বাপহরণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁদের করতে হয়। তাই উপনিষদ বলেছেন 'মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম্'। গৃধ্নুতা বা acquisitiveness হচ্ছে ধনবান্‌দের ধর্ম; আর বণ্টন ক'রে ভোগ ক'রে নেওয়া হচ্ছে ধনহীনদের কর্ম। দুনিয়াভর এই টানাটানি চলছে সর্বহরা ও সর্বহারাদের মধ্যে। হারজিতের মীমাংসা কোনো কালে হয় নি—কেবলই দেখা যায়, কখনো 'না পরে ঘোড়া, কখনো ঘোড়া পরে না'; নাগরদোলায় ওঠাপড়া চলছে চিরকাল। যেদিন পৃথিবীটা 'সব পেয়েছির দেশ' হবে তখন এটা বাসের অনুপযুক্ত হবে।

সমাধিক্ষেত্র থেকে ফেরবার পথে বার্চবনের মধ্যে তুষারের উপর দাঁড়িয়ে ফটো নেওয়া হ'ল। তুষারের উপর হাঁটার অভিজ্ঞতা হ'ল—পায়ের তলায় মচর মচর করছে বরফ; ওভারকোটে, দাড়িতে জমে উঠছে তুষারকণা।

পথে নেভা নদীর ধারে গাড়ি থামল। নদীতে একটা ষ্টীমার। বারানিকফ্ বললেন—এই হচ্ছে 'অরোরা'—যে জাহাজ থেকে বিপ্লবের প্রথম গোলা ছোঁড়া হয়। জাহাজখানা সযত্নে রাখা আছে।

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়ে আবার বের হলাম। এবার চলেছি অ্যাকাদেমিতে—যার অতিথি হয়ে আমরা এসেছি এদেশে। লেনিনগ্রাদেই অ্যাকাদেমি আগে ছিল—এখন কাজের ভাগ হয়ে গেছে মস্কোর সঙ্গে।

নেভা নদীর তীরে বিরাট্ বাড়ী—জার নিকোলাসের কোন্ ভাইয়ের বাড়ী ছিল। বড় বড় ঘর। নাচঘরটা লাইব্রেরী হয়েছে। পুঁথির সংগ্রহ দেখলাম। বেশ যত্ন ক'রে সব রাখা আছে; তবে এবাড়ীতে আর সঙ্কুলান হচ্ছে না শুনলাম।

আমরা একটা ঘরে গিয়ে বসলাম; একজন যুবক সদস্য সেখানকার এই বিভাগের কাজের কথা বললেন,—কালিনিন নামে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রুশভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করছেন—একখণ্ড প্রকাশিত হয়ে গেছে। এক তরুণী বনপর্ব তর্জমা করছেন। কলকাতা, পুণার ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত মহাভারত নিয়ে কাজ হচ্ছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হরিদাস সিদ্ধান্তের মহাভারতের কথা এরা জানে না দেখলাম। আমি বললাম, নীলকণ্ঠ যে সব স্থলে আন্দাজে অর্থ করেছেন, হরিদাস সিদ্ধান্ত সে সব জায়গায় আলোকপাত করেছেন। আরও বললাম সোরেনসেনের মহাভারতের সূচীর কথা; এ বই-এর খবরও এঁদের জানা ছিল না। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারত সম্বন্ধে যে কাজ করেছেন তার কথাও জানিয়ে দিলাম। মস্কোতে যেমন দেখেছিলাম—এখানেও এক দল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন।

একটি তরুণী চতুরঙ্গের রুশ অনুবাদ করছেন, আমাকে উপহার দিলেন। দুঃখ করে তিনি বললেন, লেনিনগ্রাদে আমার লেখা রবীন্দ্রজীবনী পান নি, মস্কোয় যখন গিয়েছিলেন, তখন সেখানে লেনিন লাইব্রেরীতে বই দেখে আসেন ও নোট করে আনেন। এখানে নোবিকোভার নিজস্ব লাইব্রেরীতে 'রবীন্দ্রজীবনী' আছে।

অ্যাকাদেমি থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বারানিকফ বললেন, 'সাদি ঘর' দেখবেন? ব্যাপারটা কি? বললেন, এই সামনের বাড়ীতে বিবাহ হয়, চলুন দেখে আসি। বিশাল বাড়ী, মর্মর পাথরের সিঁড়ি; থামগুলিতে অশেষ কারুকার্য করা। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন। নেভা নদী সামনে প্রবাহিত। ওপারে দুর্গের চার্চ মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে। কোন্ ধনীর প্রাসাদ ছিল—এখন তারা নিশ্চিহ্ন। সোবিয়েত দেশে নূতন ধনী হয়ত হচ্ছে—তবে তারা সরকারী লোক। টাকা জমাতে পারে, ব্যাঙ্কেও রাখতে পারে, সুদও পায় সামান্য হলেও। টাকা জমিয়ে মোটর গাড়ি কিনতে পায় এবং বাড়ী বানাতে পারে শহরতলীতে। ভোগের স্পৃহা সকলেরই আছে, তবে তা পাঁচ জনের মধ্যে বণ্টন ক'রে ভোগ করতে হয় বলে লোভটাকে সংযত করতে হয়েছে। এই লোভটাকে দমন ক'রে রাখতে গিয়ে তারা দেখেছে, শুধু ধর্ম উপদেশে কাজ হয় না—বাস্তববোধ আছে ব'লে 'দণ্ডে'র ব্যবহার তারা করে, দণ্ডবিধির হাজার ফাঁক দিয়ে অপরাধী ফুকলে পালাতে পারে না।

বিবাহ ঘরে গেলাম দোতলায়। লেনিনের মূর্তি দেওয়ালে—তার উপরে কম্যুনিষ্ট প্রতাক আঁকা। একটা টেবিলের পাশে তিনজন মহিলা ব'সে। ঘরের দেওয়ালের ধারে ধারে চেয়ারে আমরা বসলাম। একজোড়া দম্পতি এলেন—সঙ্গে কয়েকজন ক'রে লোক, মনে হ'ল দুই পক্ষের বন্ধুবান্ধব। টেবিলের পাশে বসা মহিলাদের মধ্যে একজন রুশ ভাষায় কি বললেন, দম্পতিরা একটা খাতায় সই করল, সরকারী পক্ষ থেকে ফোটো তোলা হ'ল। অবশ্য আত্মীয়রাও ফোটো নিলেন। বিবাহ হয়ে গেল, সকলে বরকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল, আমরাও গেলাম ও করমর্দন করে আশীর্বাদ করলাম। রেজিষ্ট্রেশনের সঙ্গে বিবাহপর্ব শেষ—তারপর হোটেলে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে খানাপিনা, নাচগান হবে। এ বিবাহ

হ'ল খাঁটি সোবিয়েত মতানুসারে। তবে খ্রীষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে ধর্মসম্মত বিবাহ ব্যবস্থা আছে। কেউ যদি চার্চে গিয়ে বিবাহ করে, বা মোল্লা ডেকে শরিয়াৎ অনুসারে আরবী মন্ত্র প'ড়ে নিকা করে, তবেও কেউ আপত্তি করে না। ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্র, নিরপেক্ষ ও উদাসীন। তবে লেনিনগ্রাদের বিখ্যাত কাজান ক্যাথিড্রাল এখন সায়েন্স অ্যাকাডেমির নাস্তিক্য ও ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্পর্কীয় ম্যুজিয়াম। এই প্রাক্তন ধর্মগৃহে এখন আর ভক্ত আর ভণ্ডদের আনাগোনা চলে না, এখন নূতন যুগের মানুষ তৈরী করবার জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

সন্ধ্যার পর একটা কিছু করতে হবে বলেছিলাম বারানিকফকে। তাই সার্কাস দেখতে গেলাম। স্থায়ী গৃহ ও ব্যবস্থা আছে সার্কাসের জন্য। সার্কাসে ভাল জায়গা পেয়েছিলাম; এখানে আর ওভারকোট খুলতে হয় না, কারণ কেন্দ্রীয় তাপের ব্যবস্থা এখানে ত নেই। মানুষের দুর্জয় সাহস ও শক্তির পরিচয় পাই, যখনই সার্কাস দেখি। জন্তুর মধ্যে ছিল কুকুর, ঘোড়া ও ভালুক। কুকুরটাই সব থেকে বাহাদুর দেখলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব যে, ভারতের সার্কাস কোন অংশে বিদেশী সার্কাস থেকে ন্যূন নয়। অনেক ক্ষেত্রে এরা আগিয়েও আছে। অল্পদিন পূর্বে বোলপুরে ইণ্টারন্যাশনাল সার্কাস এসেছিল, আমার সঙ্গে রুশ মহিলা মিসেস্ বিকোভা দেখতে যান। তিনিও মুগ্ধ হয়ে বলেন যে, ভারতীয় সার্কাস কোন কোন ক্ষেত্রে রুশী সার্কাস থেকে ভাল। পাশ্চাত্ত্য সার্কাসের আলোকসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, যন্ত্রাদির সাহায্যে বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রভৃতি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

সার্কাসের মাঝখানে লাউঞ্জে গেলাম। সকলেই আইসক্রীম খাচ্ছে; সে আইসক্রীম কাগজে মোড়া নয়, রুটির মত পদার্থ দিয়ে ঢাকা। সেটা-সুদ্ধ খেতে হয়। আমাদের ভারতীয় অভ্যাসমতে এক টুকরা কাগজ মেঝের উপর ফেলেছিলাম। বন্ধু বারানিকফ্ দেখিয়ে দিলেন কোথায় ফালতু কাগজ ফেলতে হবে। অত্যন্ত লজ্জাবোধ করলাম; কারণ আমার স্বভাবের বিপরীতই করেছিলাম আধারটা চোখে পড়ে নি বলে। আমার সঙ্গীরা নিতান্ত আমার খাতিরে সার্কাস দেখতে এসেছিলেন—মনে হ'ল একজন ঘুমিয়েও নিলেন।

১৮ অক্টোবর। লেনিনগ্রাদ।

গতকাল সার্কাস দেখে ফিরে খেতে শুতে বেশ দেরি হয়ে যায়। তাই আজ সকালে উঠতে দেরি হ'ল। স্নান হয় নি গতকাল ট্রেণ থেকে নেমে। আজ খুব ভাল ক'রে স্নান করলাম। এখানেও বিরাট্ বাথটব, ঠাণ্ডা গরম দুই জলই পর্যাপ্ত। উপর থেকে ঝর্ণা নেই, তবে নল লাগানো স্প্রে আছে; চামড়ার উপর তীব্রবেগে ছুঁচের মত ফোটে। বেশ আরাম হ'ল। ঘরে বসবার ফার্ণিচার আরামের-চেয়ার, সোফা, লেখবার টেবিল, দোয়াত কলম, কাগজ সব রয়েছে। শোয়ার জায়গাটা একটু আড়ালে—পরদা আছে—টেনে দেওয়া যায়। যথারীতি টেবিলে বসে লেখাপড়া একটু করে নিলাম।

প্রাতরাশের সময় হ'ল। নিচে নেমে গেলাম। ব্রেক-ফাস্ট ক'রে উঠতেই দেখি বারানিকফ্ এসে হাজির হয়েছেন। আমরা এবার চলেছি একটা মধ্যস্কুল দেখতে। পথে আমাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে বারানিকফের স্ত্রীকে উঠিয়ে নেওয়া হ'ল। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, হিন্দী পড়ান। বারানিকফ্ ও তাঁর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন, উভয়ে হিন্দীর ছাত্রছাত্রী; তাই প্রণয় থেকে পরিণয় হয়। বারানি-কফের পিতা অ্যাকাডেমিশিয়ান বারানিকফ্ ছিলেন উক্রেইন-বাসী, অর্থাৎ দক্ষিণী লোক, কিন্তু তরুণ বারানিকফের স্ত্রী রুশীয়। শ্রীমতী বারানিকফ্ রুশীয় বলে বেশ তাঁর গর্ব। হেসে বললেন মেয়েদের কী খাটতে হয় দেখুন। সকালে উনি ত বের হয়ে এসেছেন, তার পর আমাকে সংসার সামলিয়ে, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, স্কুলের খাবার সঙ্গে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে তবে বের হ'তে হয়েছে। কথাটা খুবই সত্য, মেয়েদের ভীষণ খাটতে হয়। দ্বিবেদী হটবার মানুষ ন'ন, তিনি আমাদের পরিবারের কথা পাড়লেন, অর্থাৎ আমার স্ত্রী হেড্ মিষ্ট্রেস্‌গিরি ক'রে বিরাট স্কুল তৈরী করেছেন, ছেলেদের পড়িয়েছেন ইত্যাদি! আমি বললাম—ওসব কথা থাক্। ওদের কথা শুনতে আমরা এসেছি।

অমরা যেখানে এলাম—সেদিককার রাস্তা-ঘাট এখনও ভাল হয় নি, ট্রামগাড়ি যাচ্ছে বটে মাঝখান দিয়ে কোন রকমে। স্কুল-বাড়ি বেশ বড়—পাশেই বোর্ডিং হাউস। শুনলাম, ছেলেমেয়েরা সপ্তাহের ছয়টা দিন এখানে থাকে, ছুটির দিনে ও বড় ছুটিতে বাড়ী যায়। ছুটি পায় নভেম্বরে এক সপ্তাহ অর্থাৎ বিপ্লব দিনের স্মরণে উৎসবের সময়ে। জানুয়ারিতে এক সপ্তাহ ও গ্রীষ্মকালে এক মাস ছুটি। আমরা যখন স্কুলে ঢুকছি, তখন দেখি সিঁড়ি দিয়ে হুড়-হুড়িয়ে ছেলেমেয়েরা নামছে কলকোলাহল করতে করতে; আমাদের দেখে বলছে 'নমস্তে', 'নমস্তে'। এখানে হিন্দী পড়ান হয়—তাই এরা শিখেছে 'নমস্তে'। প্রধান শিক্ষিকার ঘরে গেলাম। সেখানে আরও কয়েক-জন শিক্ষিকা উপস্থিত। শুনলাম এই বিদ্যালয় হয়েছে মাত্র কয়েক বৎসর। এখানে রুশ ভাষা ছাড়া হিন্দী ভাষা শেখান হয়—দ্বিতীয় মান থেকে দশম মান পর্যন্ত। হিন্দীতে কথা বলতে ও হিন্দী লিখতেও শেখান হয়। শিক্ষিকা বললেন—তাঁরা হিন্দী পুস্তক ভারত থেকে সহজে আনাতে পারেন না। বুঝলাম না কেন—সবই ত সরকারী লেবেলে চলছে—তবে? যাই হোক—দ্বিবেদী বই পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আশা করি চণ্ডীগড়ে ফিরে গিয়ে এই শিক্ষার্থীদের কথা ভুলে যান নি। দ্বিতীয় ক্লাসের হিন্দী বই দেখলাম—হিন্দী রুশ শব্দ রঙীন চিত্র দিয়ে সুন্দর ক'রে ছাপা বাঁধাই। দেখলেই ছাত্রদের লোভ হয়। কিশলয়ের চেহারা মনে হ'ল, আর মনে পড়ল—কিশলয় কেনবার সময় দোকানদারের অর্থপুস্তক গতাবার ফিকির। আগে ত অজান্তে বাধ্যতামূলক ছিল—এখন উঠে গিয়েছে কি না জানি না।

এখানকার ছাত্রদের নানারকম বিজ্ঞান, হাতের কাজ শেখান হয়। স্কুলের সঙ্গে একটা optical factory-র যোগ আছে—সেখানে একদল বড় ছেলে যায় কাজ শিখতে। চলতে চলতে দেখলাম। একটা ঘরে physics পড়ান হ'চ্ছে। বিজ্ঞানের উপর জোর দিয়েছে স্কুলেই। ছেলেদের হাতের কাজের নমুনাও দেখলাম। ছোট ছেলেদের হিন্দী ক্লাসে গেলাম; ছাত্রছাত্রীরা উঠেই নমস্কার করল ভারতীয় রীতিতে। এই ঘরে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের ছবি দিয়ে একটা বোর্ড সাজিয়েছে—নিশ্চয়ই ভারতীয় অতিথিদের আগমনের জন্য এটা করা হয়েছে। একজন শিক্ষিকা তাদের হিন্দী পড়াচ্ছেন, প্রশ্ন হিন্দীতে, উত্তরও হিন্দীতে দিতে হয়। শিক্ষিকার হাতে সাইক্লোস্টাইল করা পাঠ। অর্থাৎ পাঠ তৈরী ক'রে আসতে হয়েছে। তারপর একটা ছাত্রসভা ঘরে আমাদের স্বাগত করা হ'ল। ছোট স্টেজ। বসবার চেয়ার সারি বাঁধা। সেই স্টেজে ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি করল, ও নানা রকমের গান গাইল। গান হিন্দী ফিল্মের 'মেরা জুতা হায় জাপানী', 'মসলা কিনো, মসলা কিনো' জাতীয় গান ছাত্ররাও শিখছে। এই সব নিকৃষ্ট গান তারা শিখল কোথা থেকে? বুঝলাম, যে সব রুশ যুবকরা ভারতে এসে এখানকার লোক-সংস্কৃতির নমুনা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যান, তাঁদের শিক্ষা বা রুচির পটভূমি খুব গভীর ও ব্যাপক নয়। দ্বিবেদীকে বললাম, এই কি হিন্দী সাহিত্যের ও সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নমুনা? আসলে ভালো জিনিষ পাঠাবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নি, প্রচার-কার্যে পরাভূত হয়েছি সর্বক্ষেত্রে। সমাজতন্ত্রবাদের নামে আহূত সম্মেলনে যে সব মজদুর শ্রমিক মিস্ত্রী ক্লাসকে জমায়েত হ'তে দেখেছি, রুশীয়রা তাদের সঙ্গে গলাগলি ক'রে এই সব গান শিখে আসেন। ভারতীয়রা গদগদ হয়, সাহেবের কণ্ঠে তাদের ফিল্মের গান শুনে। আর যারা শেখে, তারা মনে করে, এদের সঙ্গে মিশে গান শিখে ভাই-ব্রাদারীর বুনিয়াদ পত্তন ক'রে এলাম। এই তো লোক-সঙ্গীত!

সভাশেষে 'জনগণমন' গানটি গাইল; আমরা তিনজন দাঁড়ালাম।

এ সব হয়ে গেলে অন্যেরা চার তলায় গেলেন; আমি আর সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম না। ছেলেরা আমায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তির কাছে গেল এবং ফোটো ওঠাল। মোট কথা খুবই ভালো লাগল স্কুলটাকে দেখে। সোবিয়েত বুঝে নিয়েছে যে, ভারতে কাজ করতে হলে হিন্দী ও উর্দু ভালো ক'রে রপ্ত করতে হবে এবং তা' তারা করছে। ব্রিটিশ যুগে বিদেশী পাদ্রীরা ভারতীয় ভাষা শিখতেন খুব ভালো করেই। আমাদের বোলপুরে মেথডিস্ট মিশনের Meek সাহেব থাকতেন। তিনি আমেরিকান জার্মান। যেমন বিশাল দেহ তেমনি

মোটা গলা, মাথায় মস্ত টুপি প'য়ে ঘুরতেন। Anna Tweed ছদ্মনামে তাঁর লেখা মুরগী পালন সম্বন্ধে বই থ্যাকার স্পিঙ্ক্ ছাপিয়েছিল। তিনি বাংলা বলতেন একেবারে বীরভূমি উপভাষায়। পাশের ঘর থেকে কথা বললে কে বুঝবে যে গ্রাম্য চাষা কথা বলছে না। দুমকায় থাকতেন বোডিং সাহেব,—নরওয়েজিয়ান। সাঁওতালদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্য আসেন। তাঁর মতন সাঁওতালী ভাষাবিদ্ এ পর্যন্ত হয় নি। খাসি, নাগাদের নানা ভাষা সবই পাদ্রীরা আয়ত্ত করে। আজ সোবিয়েত রুশরা শুধু যে ভারতের ভাষাগুলি শিখছেন তা নয়; এশিয়া ও আফ্রিকার সকল ভাষা শিখতে সুরু করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এই ভাবে স্বাভাবিক জয়যাত্রা সফল হবে। মানুষের মন হরণ করতে হলে তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হয়।

একখানা আমেরিকান পত্রিকায় (The New Leader) পড়েছিলাম—মস্কো প্রবাসী ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত দপ্তরের স্যার উপাধি ভূষিত জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি মস্কো বিমান বন্দরে সেদিন গেছেন। দেখেন, ঘানা থেকে আগত এক সাংস্কৃতিক মিশনকে সোবিয়েত সরকারপক্ষীয় লোক স্বাগত করতে এসেছেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যখন শুনলেন যে, ঘানার ভাষায় রুশরা অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে তিনি লেখেন যে, ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদেশী ভাষাশিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম সোবিয়েতের তুলনায়। তিনি বলেন, এটা ভাববার কথা অ্যাংলো আমেরিকানদের ভাবী নিরাপত্তার দিক্ থেকে।

বিদেশীর ভাষা জানা থাকলে কত বড় বিপদ্ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। চীন দেশে বক্সার বিদ্রোহের পর্ব—সমস্ত য়ুরোপীয় দূতাবাস ধ্বংস হচ্ছে বিপ্লবীদের করস্পর্শে। পিকিঙের ফরাসী দূতাবাস আক্রান্ত। জনতা গেটের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য উন্মত্ত। এমন সময়ে একটি তরুণ ফরাসী ডাক্তার গেট্ খুলে বাইরে বের হয়ে চীনা জনতার সম্মুখে চীনা ভাষায় কথা বলতে সুরু করেন। বিদেশীর মুখে চীনা ভাষায় তাদের ডেকে কথা বলতে শুনে তারা থমকে দাঁড়াল, দূতাবাস রক্ষা পেল জনতার উন্মত্ত ক্রোধ থেকে। এই যুবকের নাম ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট সুপরিচিত, ইনি পল্ পেলিও।

মনের মধ্যে অনেক কথা জমে উঠছে এই ভাষা নিয়ে। রুশ ভাষা আজ বাল্টিক সাগরতীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরতীর পর্যন্ত, আর উত্তর মেরু থেকে কারাকোরাম পর্যন্ত ভূভাগে বিচিত্র জাতি-উপজাতির লোকে মেনে নিয়েছে রাষ্ট্রভাষা ব'লে। রুশীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য তাদের আকর্ষণ করছে—বুঝছে এই ভাষার জানলা দিয়ে জ্ঞানের আলো তারা পাবে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য যদি এটি করা হ'ত, তবে ফল উল্টোই হ'ত। পোল্দের ত রুশী করবার প্রচণ্ড চেষ্টা হয়েছিল; আইরিশদের ইংরেজি ভাষা গেলাবার জন্য কি নিষ্ঠুরতাই ইংরেজ করেছিল। কোরিয়াকে জাপানী-ভাষী করবার জন্য কি তাণ্ডবই রণকামী জাপানীরা করেছিল! ব্রিটিশ যুগের শেষপাদে ভারতের কয়েকটা প্রদেশে যখন কংগ্রেস সরকার শাসন ভার পান, তখন হিন্দীকে চালু করা নিয়ে কী হয়েছিল সেটা ভুলে গেছি আজ। রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে হিন্দী ভাষা চালু করার জন্য কম উপদ্রব করেছিলেন? সে কথা ভুললে চলবে কেন? আজ তারই ফলে সেখানে হিন্দী ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য, এমন কি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ঘরের কাছে বিহারে বাঙালীদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে বাস করবার ব্যবস্থা হয় এই সময়েই। আসামের 'বঙাল খেদা' আন্দোলন স্বাধীন ভারতেই ত হয়েছে। মোট কথা, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের আইডিয়া গ্রহণের ফলে ভারতময় ভাষা নিয়ে মাথা ভাঙাভাঙি সুরু হয়। ভাষা সমস্যার সমাধান রুশ করেছে। তার মূলে আছে রুশ সাহিত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে মূল্যবান্ গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ —ভারতের কোন্ ভাষা সে দাবী করতে পারে?

হিন্দীভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে, লোকে আপনিই সে ভাষা শিখত নিজের গরজে। গৌরীশঙ্কর আজও ভারতীয় লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ; যে কেউ এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন, তাঁকে হিন্দীতে ঐ বই পড়তেই হয়। তা নিয়ে আইন করতে হয় নি! হিন্দী স্কুল দেখে নেমে এলাম; অ্যাকাদেমির মোটর

এল ঠিক দু'টার সময়—যে সময়ে আসবার কথা ছিল। হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েই বের হলাম লেনিনগ্রাদ য়ুনিভার্সিটি দেখবার জন্য। সেই নেভা নদী কতবার পারাপার ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছলাম। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এর সাজসজ্জা সেকেলে। প্রথমেই ত দেখি লিফ্ট নেই। পুরাণো বাড়ী শ-দুই বছরের হবে। এখানেও মস্কোর ন্যায়ই প্রাচ্য বিভাগ ছাড়া ১৪টি বিভাগ আছে; এটা হচ্ছে সোবিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ প্যাটার্ণ। একটা ঘরে আমরা বসলাম—অধ্যক্ষ ও প্রাচ্যবিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এলেন; এঁদের মধ্যে ছিলেন নোবিকোভা ও অরুণা হালদার। অরুণাদেবী গোপাল হালদারের স্ত্রী; গোপালও এখানে আছেন আজকাল। অরুণা পাটনায় অধ্যাপিকা ছিলেন; সোবিয়েত থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন—বাংলা ও দর্শনশাস্ত্র পড়ান। অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই প্রাচ্যবিভাগ ও অ্যাকাদেমির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অধ্যক্ষ বললেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অ্যাকাদেমিতে গবেষণার কাজ হয়। এখানকার অধ্যাপকরা ওখানকার গবেষক। নোবিকোভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা এবং অ্যাকাদেমির কর্মী। কিন্তু বারানিকফের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ নেই, তিনি অ্যাকাদেমির লোক; অবশ্য পড়েছিলেন এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হিন্দী বিভাগে।"

প্রাচ্য বিভাগের লাইব্রেরী দেখলাম—অত্যন্ত স্থানাভাব। বইপত্র স্তূপীকৃত, তাকেও বই সুসজ্জিত নয়; ছিন্ন বই অনেক। মনে হ'ল, লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় সোবিয়েতের দুয়োরাণী; এককালে সে সোহাগে ছিল বলেই বোধ হয় মস্কো সুয়োরাণী হয়ে সমস্ত আদর ও মনোযোগ টেনে নিয়েছে। তবে দুয়োরাণী হ'লেও সে তার আভিজাত্য বজায় রেখেছে। লেনিনগ্রাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সৌধ ও হর্ম্যের মধ্যে আভিজাত্যের স্পর্শ এখনো লোপ পায় নি।

ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে গিয়ে বসলাম, সেখানে প্রাচ্যবিভাগের কর্মীরা জমায়েত হয়েছেন। বাংলা, হিন্দী, তামিল, উর্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা যাঁরা শিখেছেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। একজনের নাম শুনলাম, বগ্দানোভ; নামটা শুনেই শান্তিনিকেতনের বহুকালের পুরাণো কথা মনে পড়ল। যুবকটিকে বললাম, বিশ্বভারতীতে বগ্দানোভ নামে একজন রুশ অধ্যাপক ছিলেন ফারসী ভাষায় মহাপণ্ডিত।

লেনা নামে একটি মেয়ে দেখা করল। বেশ বাংলা বলে। সে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, শারদোৎসব, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী নিয়ে নাটকের এক তত্ত্ব-কথা লিখছে। কবির প্রথম নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কথা বললাম, সেই নাটকে কবি একটা বড় সমস্যার কথা তুলেছিলেন—সেটা হচ্ছে অচ্ছুৎ সমস্যা। আমি বললাম, কবি এই নাটকের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর জীবনস্মৃতিতে। কিন্তু অচ্ছুৎ সমস্যাটা যে ছিল, সে কথাটা চাপা পড়েছে। বিসর্জন সম্বন্ধে বললাম—এটা হচ্ছে হত্যার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে কবির জেহাদ। এই ধরণের আলোচনা হ'ল মেয়েটির সঙ্গে। আর একটি মেয়ে 'বাঁশরী' নিয়ে কাজ করছে। এ দুজনের সঙ্গে পরে দেখা হয় নোবিকোভার বাসায়। এদিন আমরা নোবিকোভাকে কিছু উপহার দিলাম। ভারত সরকার আমাদের আসবার সময়ে কৃপালানী মারফত কিছু উপহার পাঠিয়েছিলেন, অবশ্য সবই কৃপালানীকে করতে হয়েছিল—কেনাকাটা, প্যাকেট বাঁধা সবই। আমরা সোবিয়েত সরকারের অতিথি—সৌজন্যের জন্য এসব দেওয়া-থোওয়া। আমি এনেছিলাম বটপাতার উপর কবির মূর্তি; এটি ক'রে দিয়েছিলেন আমার ছোট বৌমা; তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ছাত্রী—অল্পকাল পূর্বে 'বটানী'তে এম. এ. পাশ করেছেন: পাতা ফুল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির সখ এখনও আছে।—বটপাতার উপর কবির মূর্তি ছাড়া, আমি দিলাম—রবীন্দ্র ক্রনিকল্ (যা সাহিত্য অ্যাকাদেমি থেকে প্রকাশিত শতবর্ষ পূর্তি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল—আমার ও শ্রীক্ষিতীশ রায়ের যৌথ নামে)। নোবিকোভা তাঁর ফ্ল্যাটে একদিন যাবার জন্য আবার অনুরোধ জানালেন। আমার নব-প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' একখণ্ড দিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে মার্কেটে চললাম। মস্কো থেকে ত কিছু কিনেছিলাম; লেনিনগ্রাদ থেকে কিছু কিনব বলেই সেখানে যাওয়া। বিরাট্ মার্কেট—

নানা রকমের সৌখীন জিনিষে দোকান বোঝাই—কি নেই? ছুঁচ থেকে মোটর গাড়ি সবই। কিছু খেলনা কেনা গেল—কৃপালানীরা ক্যামেরা কিনলেন। আমি কিনি পরে মস্কো গিয়ে। রুশের কাঠের খেলনা বিখ্যাত, বিশেষতঃ একটা পুতুলের মধ্যে পাঁচটা পুতুল—একটা খুলছে আর একটা বের হচ্ছে। এরকমের কৌটো দেখেছিলাম—কাশ্মীর তৈরী—বোধ হয় পঞ্চাশটা ছিল একটার মধ্যে একটা, শেষটা সরষের মত ক্ষুদে।

ঘুরতে ঘুরতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেতে হবে বারানিককের বাসায়। সেখানে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। পথ সংক্ষেপ করবার জন্য একটা অন্ধকার গলি ধরে, একটা বিরাট্ বাড়ীর কানাচ দিয়ে জলকাদা বাঁচিয়ে একটা ফ্ল্যাট বাড়ীর সামনে পৌঁছলাম। শুনলাম চারতলায় এঁদের ঘর। লিফ্‌ট নেই। ধীরে ধীরে উঠলাম। সিঁড়ি ও ল্যাণ্ডিং মাঝে মাঝে—খুব পরিচ্ছন্ন লাগল না। উপরে উঠে দেখি, মাদাম বারানিকফ্‌ ও তাঁর মেয়ে ও ছেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বাড়ীতে একটি maid বা ঝি পেয়েছেন। এটা পাওয়া খুব দুষ্কর; বাড়ীতে ঝি-গিরি করতে চায় না বড় কেউ। খান-চার ঘর, দেয়ালে র‍্যাক্—বই-এ বোঝাই। বারানিককের পিতার আমল থেকে বই জমছে। হিন্দী বহু বই, হিন্দী কোষগ্রন্থ কত রকমের; ভারতীয় সংস্কৃতির বহু বইও কম নয়। একজন সুধী ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করেছি বোঝা যায়। সুনীতি চাটুজ্জের বাড়ীতে ঢুকলে ঠিক এই ভাবটা মনে হয়। তবে এদের ঘর-বাড়ী সঙ্কুচিত। তাই বসবার ঘরকে খাওয়ার ঘরে পরিণত করতে হয়—বৈঠকখানা ঘর এদের নেই। খাওয়ার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী দিচ্ছে-থুচ্ছে; কাঁটা চামচে দিয়ে খাওয়া বলে দিতে অসুবিধা হয় না। রুশী খানা ছাড়াও বড়ি, মটরশুঁটি, কপি দিয়েও তরকারি রেঁধেছে। বড়ি, পাঁপর, আচার সব আনিয়েছে দিল্লী থেকে বন্ধুদের মারফত—হামেশাই ত যাওয়া-আসা চলছে। তাই খানাটা হ'ল ইণ্ডো-সোবিয়েত খানা—রুটি, চীজ, শিক্‌কাবাব, মাছ, সসেজ প্রভৃতি। মদ আজারবৈজানের বিশেষ ব্র্যাণ্ড। আমি ও দ্বিবেদী সামান্য খেলাম—স্পর্শমাত্র; ভদ্রতার জন্য খেতেই হয়। কৃপালানী, বারানিকফ ও মাদাম বেশই খেলেন। কৃপালানী ত মস্কো হোটেলে বেশ খেতেন। আমি শুধিয়েছিলাম, 'এটা কি দিল্লীর শিক্ষা নাকি?' বলেছিলেন, 'বের হলে খাই, অন্য সময়ে খাই নে; তবে পার্টি প্রভৃতিতে গেলে খেতেই হয়।' দিল্লীতে ভদ্র সমাজে অর্থাৎ উচ্চ অফিসী ও কারবারী মহলের সাহেব ও তাঁদের মেম অর্থাৎ ভারতীয় গিন্নীদের মহলে এটার চাল হয়েছে। ইংরেজ গিয়েছে—তাই ইংরেজিয়ানাটা আঁকড়ে ধরেছি। ইংরেজের সময়ে যে সব ক্লাবে ঢুকতে পেতাম না, সেখানে ত এখন রাম রাজত্ব হয়েছে। 'ড্রাই' বোম্বাইয়ের চেহারা দেখে এসেছি!

খাওয়ার পর বারানিকফ তাঁর টেপ রেকর্ড বের করে হিন্দী গান শোনালেন। দিনকর যোশী এসেছিলেন, তাঁর কবিতা আবৃত্তি ধ'রে রেখেছেন এই যন্ত্রে। সেটা শোনালেন। গত বৎসর সাহিত্য আকাদেমি-আহূত রবীন্দ্র উৎসবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অশেষ শ্রদ্ধা বহন ক'রে যে ভাষণটি দেন, সেটি সকলের ভালই লেগেছিল। বারানিকফ্‌ এবার দ্বিবেদীর কণ্ঠ টেপ রেকর্ডে উঠিয়ে নিলেন। সেটা আবার শুনলাম তখনই। কি অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

নেমে দেখি বৃষ্টি পড়ছে, হাঁটতে হাঁটতে এসে ট্রলিবাস পেলাম। দশটা বেজে গেছে—ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। বাসও হোটেলের রাস্তা পর্যন্ত গেল না। অবশিষ্ট পথটা হেঁটেই এলাম। রাত দশটার পর বৃষ্টি টিপটিপ পড়ছে, তার মধ্যে চলার অভিজ্ঞতা হ'ল।

বারানিককের ঘরে বসে থাকতে থাকতে কামানের আওয়াজ শুনলাম, জানলা দিয়ে দূরে হাউই-এর ঝলকানি দেখা গেল। নেভার ওপারে দুর্গ আছে—সেখান থেকে এসব হচ্ছে। টেলিভিশনে ক্রুশ্চেভকে দেখলাম; তিনি মস্কোতে ফিরছেন—ক্রেমলীন থিয়েটারে ভাষণ দিচ্ছেন। কয়দিন আগে মধ্য এশিয়ায় ছিলেন। আমরা যখন তাসকন্দে, তখন তিনি ঐ অঞ্চলে সফর করছিলেন। শুনলাম, আজ মস্কোতে বিরাট্ উৎসব হচ্ছে। দেড়শ' বৎসর পূর্বে ১৮১২ সালে এই সময়ে নেপোলিয়ন মস্কো আক্রমণ করেছিলেন; পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করেছিলেন,—ভেবেছিলেন, রুশ সম্রাট্ কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসবেন। অপেক্ষা করে

করে শেষকালে ১৯শে অক্টোবর ফিরতে স্থরু করেন। এই দিনে মস্কো পুড়ছে নিজেদের হাতের আগুনে শত্রুকে জব্দ করার জন্য। সেইজন্য উৎসব। মস্কোতে ফিরে গিয়ে যে 'প্যানোরোমা' দেখতে যাই তা এই ব্যাপার। সে কথা যথাস্থানে বলব।

১৯ অক্টোবর ১৯৬২, লেনিনগ্রাদ।

আজ সকালে চললাম স্মোলনীতে। সেখানে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯১৮ মার্চ পর্যন্ত লেনিন প্রতিষ্ঠিত নয়া সোবিয়েত গভর্ণমেন্টের কেন্দ্র ছিল। তারপর মস্কো হয় রাজধানী।

আমরা যে অট্টালিকার সম্মুখীন হলাম, এখন সেটা লেনিনগ্রাদ কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তর। বারানিকফ্ পার্টির সদস্য; তাই দেখলাম, সেখানে তাঁকে অনেকেই চেনে। এই বাড়ীটা ছিল সম্রাট্‌দের সময়ে রাজকুমারীদের বোর্ডিং হাউস ও বিদ্যালয়। সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন এ বাড়ী নির্মাণ করান। পীটারের পর ইনিই রুশীয়দের মধ্যে পশ্চিম য়ুরোপের শিক্ষা সংস্কৃতি প্রচারের আয়োজন করেন। সে সময়ে ফরাসী ভাষা শেখা ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। এই বিরাট্ বাড়ী বাজেয়াপ্ত হয়, জার শাসনের অবসানে; অবশ্য তখনো নিকোলাস সপরিবারে জীবিত; কিন্তু পলাতক হয়ে বন্দী অবস্থায় আছেন। বিপ্লব স্থরু হলে সপরিবারে নিকোলাসকে নজরবন্দী করে রাখা হয় Tsarskoe-Selo-র প্রাসাদে, পেত্রোগ্রাদ থেকে মাইল পনেরো দক্ষিণে অবস্থিত (বর্তমান পুশকিন)। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এই প্রাসাদে ১৮৮৭ সালে সব প্রথম বিজলি বাতি হয়—তখন য়ুরোপে কোন রাজবাড়ীতে বিজলি বাতি জ্বলে নি—গ্যাস জ্বলত। এই প্রাসাদ থেকে জারকে সপরিবারে নিয়ে যাওয়া হয় সাইবেরিয়ার তোবলস্কে ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে। সোবিয়েত সরকার নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হলে বন্দী রাজ-পরিবারকে নিয়ে যায় Ekateringburg শহরে, যার বর্তমান নাম Sverdlovsk, একেবারে উরাল পাহাড়ের পূর্ব দিকে। মস্কোতে লেনিন অধিষ্ঠিত হবার মাস তিন পরে ঐ স্থদূর মফস্বল শহরে নিকোলাসকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। এ সব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লেনিনের যোগ ছিল না, তখন বহুরাজকতা বা অরাজকতার পর্ব। স্থানীয় সোবিয়েত সর্দারের হুকুমে এঁদের মারা হয়।

য়ুরোপে ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে চার্লসের, এবং ফ্রান্সে লুই-এর মুণ্ডপাত হয়েছিল; কিন্তু শিরশ্ছেদের আগে বিচারের অভিনয়ও হয়েছিল। নিকোলাসের বেলায় সেটাও দেখা যায় নি। অবশ্য তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, স্তালিন-এর আমলে অবাঞ্ছিতরা অদৃশ্য হয়ে যেত।

বিরাট্ অট্টালিকার দোতলার এক প্রান্তের ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সেটা ছিল লেনিনের অফিস, তাঁর ঘরবাড়ী,—১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত এই চার মাস। সামনের ঘরে দুখানি চেয়ার, একটা টেবিল। এই ঘরে দেখা করতে আসত পার্টির লোক থেকে দীনতম সর্বহারা রুশ চাষী মজুরের প্রতিনিধিরা। পাশের ছোট্ট ঘরে দুখানা বিছানা, অত্যন্ত সাধারণ তৈজসপত্র। সেটাতে লেনিন ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন। লেনিনের স্ত্রীকে তিনি পান—যখন তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকতেন।

এই ঘরে যখন আছি, তখন দেখি একটি লোক কি সব যন্ত্রপাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল একটু পরেই; দুইজন রুশ ভদ্রলোক এসে বললেন, তাঁরা মস্কো রেডিওর প্রতিনিধি—আমাদের কথা কিছু তাঁরা শুনতে চান লেনিন সম্বন্ধে; বারানিকফ্ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। আমি বাংলায়, দ্বিবেদী হিন্দীতে বললেন কিছু, টেপরেকর্ডে উঠিয়ে নিল তারা। বললাম, লেনিনের ঘরে আসাটা প্রায় তীর্থ-দর্শনের মতো। লেনিন বিশ্বশান্তি চেয়েছিলেন—আর চেয়েছিলেন সর্বহারাদের সম্মান দিতে। আজ তাঁর সেই ঘরে বসে তাঁর কথা বলতে পেয়ে আমরা কৃতার্থ হলাম।

এই বাড়ীর একটা বড় হলে গেলাম, দরবার ঘরের মতো; সে যুগে সমাবর্তন প্রভৃতি হ'ত, মেয়েদের সভা-গৃহও বোধহয়। সেই ঘরে সোবিয়েত সভা বসত। প্রাচারগাত্রে সোবিয়েত প্রথম কনষ্টিটিউশন বা সংবিধান সোনার অক্ষরে খোদাই করে লেখা। অবশ্য এটা রুশীয় সোবিয়েতের সংবিধান, পরে নিখিল সোবিয়েতের জন্য কনষ্টিটিউশন গড়া হয়।

স্মোলনীতে এক সময় নৌকো গড়া হ'ত। স্মোলনী

নামে একরকম গাছের রস কাঠের নৌকার উপর লাগানো হ'ত, সেই জন্য এদিক্‌টার নাম স্মোলনস্কি। মনে পড়ল আমাদের দেশে গাব গাছের কথা—যার রস নৌকায় ব্যবহৃত হ'ত, জলসহা করবার জন্য। ক্যাথারিন এখানে এই সৌধ নির্মাণ করান, আর নিকটে একটা বড় ক্যাথিড্রালও বানান। সেটা দেখা যাচ্ছে—এখান থেকে; শুনেছি দেখবার মতো, কিন্তু সময় নেই, মাত্র চার দিনের মেয়াদ এই মহানগরীতে।

এবার চলেছি Razliv-এ; এখানকার বার্চবনে লেনিনকে আশ্রয় নিতে হয়, দেশ থেকে পালাবার পূর্বে। লেনিনের জীবনীর সঙ্গে এ স্থানটি জড়িত বলে, তা' আমাদের দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। লেনিনের জীবনী আলোচনার ক্ষেত্র এ প্রবন্ধ নয়, তবে দুই-একটা না বললেও তাঁর Razliv-এ বসবাসের কারণটা জানা যাবে না। রুশিয়ার বিপ্লব—একদিনে হয়নি এবং একটা লোকের দ্বারাও সংঘটিত হয় নি। বহুবৎসর ধরে বহু নরবলির পর মুক্তি এসেছে। লেনিনের বড়দাদা জার শাসন ধ্বংস করতে গিয়ে অত্যাচারীর রজ্জুতে ঝুলে প্রাণ দেন। এরকম অগণিত নরনারী প্রাণ দিয়েছিল। বহু সহস্রের প্রাণ যায় সাইবেরিয়ার নির্বাসনে। লেনিনকেও সে জীবনের স্বাদ পেতে হয়। সে ইতিহাস এখন থাক্‌। লেনিন বহুকাল থাকেন রাশিয়ার বাইরে। জেনেভা ছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্র। সেখান থেকে পত্রিকায় লিখে পাঠান প্রবন্ধ, পত্র লেখেন দলের সাকরেদদের। তারপর একদিন মতভেদ হ'ল প্লেকনভ ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে; তারা ধীর পদক্ষেপে ডাইনে-বামে চোখ রেখে চলতে চায়। সেই মডারেট বা স্থিরবুদ্ধি মেনসেভিকদের ত্যাগ করে জনতা বা বলশেভিক দল গড়লেন। ইতিমধ্যে সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে ১৯০৫ সালের শেষদিকে বিপ্লবের উৎসব সুরু হয়ে গেছে; চারদিকে হরতাল বিক্ষোভ। লেনিন জেনেভা ছেড়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গে এলেন। কিন্তু আত্মগোপন করে থাকতে হয় পুলিশের ভয়ে। সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে শ্রমিক হরতাল ও বিদ্রোহ নিষ্ঠুর ভাবে দলন করল জার-এর জল্লাদরা। লেনিন দেখলেন, নগরে থাকা নিরাপদ্ নয়। তাই তাঁকে নাম পাল্‌টে চেহারা বদ্‌লে ফিনল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে হয়।

ঘণ্টাখানেক মোটরে চলেছি—গ্রাম, ছোট শহর পেরিয়ে কত রকমের ঘর-বাড়ী, কত বিচিত্র মানুষ। ফিন্‌ল্যাণ্ড যাওয়ার রেলপথ পাশে পাশে আছে। একটা জায়গা লেভেলক্রসিং-এর কাছে এসে দেখি ট্রেণ আসবে বলে গেট বন্ধ। মোটর থেকে নেমে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগর তীরে। সমুদ্রের অংশ—ঢেউ আছে, তবে উত্তাল নয়। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, ভিজে বালিতে জুতা বসে যাচ্ছে। সাগরতীরে একটা বাড়ী—চাষীর ব'লেই মনে হ'ল। ছোট ক্ষেত আছে; হাঁস, শুয়োর পোষে। বারানিকফ দেখালেন দূরের দ্বীপ, একটা দুর্গ—এখানে জার্মানরা এসেছিল। ঘাটের কাছে ভাঙা লোহার কি সব জলের মধ্যে রয়েছে, সেগুলো জার্মানদের নৌকা ক'রে ডাঙায় নামতে বাধা দেবার জন্য রাখা হয়েছিল, সরানো হয় নি—স্মৃতিচিহ্নরূপে রাখা আছে।

আমরা এলাম রাজলিভএ, যেখানে লেনিন পেত্রোগ্রাদ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নাম বদ্‌লে, তাতারদের টুপি প'রে গোঁপদাড়ি কামিয়ে কাঠুরিয়া সেজে তিনি এই বনে বাস করেছিলেন কুঁড়েঘর বানিয়ে। ঘাসের তৈরী ঝুপড়ি যেমন আমাদের দেশে মাঠে দেখা যায়, ক্ষেত পাহারার জন্য চাষীরা বানায়। ঘরের মডেল করা আছে সেই ভাবেই, বছর দুই অন্তর নুতন ঘাস দিয়ে ছাওয়া হয়। যেখানে ঝুপড়িটা আসলে ছিল, সেখানে পাথর দিয়ে একটা অবিকল প্রতীক নির্মাণ করা হয়েছে। এ যেন খড়ের চালের শিবঠাকুরের ঘরটাকে ঠিক সেই ভাবেই ইঁট পাথরে তৈরী শিবমন্দির বানানোর মতো। ছেঁড়া কাপড় ভিক্ষা ক'রে চীবর তৈরী ক'রে নিতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা; এখন আস্ত রঙীন দামী কাপড় কিনে চিরে চিরে টুক্‌রো ক'রে জোড়া দিয়ে বৈরাগ্যের প্রতীক চিহ্ন চীবর তৈরী করা হয়। নিকটে একটা কাঠের ঘর—মুজিয়ম। সেখানে যে লোকটি ছিলেন, তিনি সব ইতিহাস শোনালেন। ছবি যা দেওয়ালে টাঙানো আছে, বুঝিয়ে দিলেন। লেনিন পালাচ্ছেন—পুলিশ খবর পেয়েছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডে যাবার রেলগাড়ির প্রত্যেকটি কামরা পুলিশে ও সৈন্যে খানাতল্লাসী করছে। লেনিনকে পাওয়া গেল না। ট্রেণের ইঞ্জিনের কুলি হয়ে লেনিন তখন আছেন ঐ

গাড়ির ইঞ্জিনে। ড্রাইভার সবই জানে, তাই সে ইঞ্জিনটাকে কেটে আগিয়ে নিয়ে গিয়েছে—জল খাওয়াবার জন্য। সেখান পর্যন্ত পুলিশের সন্দেহ পৌঁছায় নি—তাই ধরা পড়লেন না, পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন।

ম্যুজিয়ামের পরিদর্শককে বললাম—এখান থেকে কিছু স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাব—মার্গেরিটার দু'টি ফুল চাইলাম। তিনি তাঁর বাড়ী থেকে কয়েকখানা ছবি ও বাগান থেকে ফুল তুলে একটু বোকে (boquet) করে দিলেন। ইনি এই অরণ্যের মাঝে বাস করেন। বড় একটা ম্যুজিয়ম তৈরী হবে শুনলাম; অনেক কুলি কাজ করছে। তবে শীতের জন্য তাদের পায়ে রবারের হাঁটু পর্যন্ত বড় বুট জুতো, গায়ে ওভার-অল্ কোট। কাজের শেষে এসব ঝেড়ে ফেললেই আসল মানুষটির চেহারা বের হয়ে আসবে। তখন তাকে আর মাটিকাটা কুলি বলে চেনা যাবে না। আর আমাদের দেশে—তাদের ধুলোমাটি স্নান করলে যায়—কিন্তু কাপড়-চোপড়ের দৈন্য ঘোচে না।

ফেরবার সময় হ'ল। দেখি আরও গাড়ি—একটা বাসও এসেছে। বাসটাকে আমাদের হোটেলে দেখেছিলাম, মনে হ'ল এরাও টুরিস্ট।

শহরে ফিরলাম—বেলা আড়াইটে হয়ে গেছে। অরুণা হালদার আমাদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছেন। গোপাল হালদার এসেছেন, তা ত আগেই বলেছি। বেশ ভালো ফ্ল্যাট পেয়েছেন—পাঁচখানা ঘর, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বললেন। আরও মুশকিল এই—বাড়ী সাফ রাখারও সমস্যা। ঝি পাওয়া যায় না। একজন সপ্তাহে আসে, মেঝে দরজা-জানলা সাফ করে, সপ্তাহে ৩ রুব্ল্ নেয় এই কাজের জন্য অর্থাৎ আমাদের টাকায় ১৬ টাকা। বাজার হাট নিজেকেই করতে হয়। অরুণা দেবী নিরামিষাশী। আমাদের মধ্যে দিবেদা শাকান্নভোজী। আমরা সর্বগ্রাসী। বাছের বড়া, বিশেষ পক্ষীমাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচারই ছিল। খাওয়া আর গল্প চলছে বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী ভাষায়। মনে পড়ল নোবিকোভা য়ুনিভার্সিটিতে বলেছিলেন, তাঁর বাড়ীতে এক সন্ধ্যায় খাবার জন্য। তাই অরুণা দেবীর বাড়ী থেকে ফোনে কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। বললাম,—আগামী কাল সন্ধ্যায় যাব, কিন্তু চা ছাড়া যেন বেশী কিছু না করেন। বারানিকফের খুব ইচ্ছা নেই নোবিকোভার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি; তাঁর মনোভাব প্রসন্ন নয়; কেন বুঝলাম না। বরাবরই দেখছি একটু ঠেশ আছে। ভারত থেকে যাঁরা আসেন, নোবিকোভাকে সকলেই জানে, নোবিকোভাও বাঙালী লেখকদের অনেককেই চেনেন—সেইজন্য কি? বলতে পারি নে।

অরুণা দেবীর বাসা থেকে নামলাম; ফ্ল্যাটটা চার তলায়। নেমে একটা চত্বর পেলাম: সেই চত্বরের চারিদিকে বাড়ী এবং সবগুলিতে ফ্ল্যাট প্রথা।

এখান থেকে চললাম লেনিনগ্রাদের বিখ্যাত প্রাসাদ (Hermitage ও Winter Palace) দেখতে। বারানিকফের কাজ ছিল বলে তিনি পৌঁছিয়ে চলে গেলেন। একজন মহিলা আমাদের দেখানোর ভার নিলেন, তিনি ইংরেজি জানেন। পরে শুনলাম—বিদুষী, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী।

রুশ সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীদের বহুকালের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে—এখানকার আসবাবপত্র, ছবি, অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ট্যাপেস্ট্রি প্রভৃতির সঙ্গে। এই প্রাসাদ নির্মাণ করান ক্যাথারিন। প্রাসাদের নাম Winter Palace, একটা অংশ Hermitage, দুটো অংশের মধ্যে সেতু আছে ঘরের মতোই। আমরা ঘণ্টা ২।৩ ঘুরলাম। সমস্ত যদি হাঁটতাম, তবে ১৫ মাইল পথ চলতে হত। কত দেখব? করিডর, সিঁড়ি প্রভৃতি বাদ দিলেও ঘরের সংখ্যা হাজার দেড় হবে। তার মধ্যে চার শ' কামরায় প্রদর্শনী। পরে বন্ধুদের বলেছিলাম যে, যদি বৎসর খানিক থাকতে পারি, তবে কিছুটা দেখা হত। রেমব্রান্টের, রুবেন্সের কত ছবি। নানা যুগের ট্যাপেস্ট্রি—ছবির মতো ক'রে বোনা; আর কি বড়! সমস্ত প্রাচীর জুড়ে আছে। যেমন সূক্ষ্ম তেমনি জোরালো। একটা বিশাল ঘরের মেঝেটা রঙীন কাঠের তৈরী, ঠিক যেন সতরঞ্চ। এত মসৃণ—ভয় হয়, পা পিছলে যাবে। রত্নগৃহ দেখবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তবু বিদেশী অতিথি বলে দেখানোর ব্যবস্থা হ'ল। প্রাসাদের একটা ছোট ঘর দেখানো হ'ল—সেখানে সোবিয়েতের পূর্বের শেষ শাসকরা ধরা পড়েন বিপ্লবীদের হাতে।

সাড়ে পাঁচটার সময় বারানিকফ্ এলেন। হোটেলে ফিরলাম ছ'টা নাগাদ। বিশ্রামের সময় নেই, থিয়েটর দেখতে যেতে হবে—ডস্টয়ভেস্কির ক্রাইম্ এণ্ড পানিশমেণ্ট—অভিনয় হবে। পূর্বেই টিকিট কিনে রাখতে হয়—স্থান পাওয়া খুব মুশকিল। সোবিয়েতের সিনেমা, থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেলে কেউ ঢুকতে পায় না। আমরা খুব তাড়াতাড়ি চললাম। এই প্রেক্ষাগৃহ খুব বড় নয়; আর চেয়ারগুলো খুব আরামের নয়। মনে হচ্ছিল যেন ঘোড়ার পিঠের উলটো জিন্-এর উপর বসেছি। স্টেজটি বেশ বড় এবং ঘূর্ণায়মান; দৃশ্যপট সুন্দর অর্থাৎ স্বাভাবিক। এর তুলনায় আমাদের নামকরা অভিনয়-মঞ্চগুলি অত্যন্ত সেকেলে মনে হয়। আমার ত 'সেতু'র রেলইঞ্জিন দেখে হাসি পেল; আমাদের দেশের দর্শকদের শিশুমনের উপযোগী। ইণ্টারভেলে দেখা করতে এলেন শোভা সেন ও উৎপল দত্ত। এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয় বোলপুরে; লিট্‌ল্ থিয়েটারের দল 'নিচের মহল' ও 'ম্যাকবেথ' নাটক অভিনয় করতে এসেছিলেন। 'নিচের মহলে' গর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' নাটকের বাঙালী পরিবেশে বাংলায় রূপদানের চেষ্টা হয়েছে। আমাকেই সেদিনকার অভিনয় উদ্বোধন করে গর্কি সম্বন্ধে এবং তাঁর নাটক সম্বন্ধে বলতে হয়। সে সময় উৎপলদের সঙ্গে পরিচয় হয় ভালো ক'রে। তাই সোবিয়েত দেশে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁরা খুশী হন। উৎপল বললেন, তাঁরা এসেছেন সোবিয়েতের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় দেখবার জন্য।

আমরা প্রথম দৃশ্য দেখার পর চলে এলাম। তিনটা দৃশ্য আছে; শুনলাম ঘণ্টা চার লাগবে। দুবার ইণ্টারভেলে আধঘণ্টা গেলেও সাড়েতিন ঘণ্টা পূরো অভিনয়।

ক্রমশঃ

—

অতি-ঘরন্তা

শ্রীসীতা দেবী

নমিতাকে শেষে তার এতদিনের স্কুলের কাজ ছাড়তেই হ'ল। সেই কোন্ কালে সে এই স্কুলে এসেছিল, কম ক'রেও ত কুড়ি বছর হবে। তখন স্কুলটাই বা কত বড় ছিল? ভাড়াটে বাড়ীর চারখানা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। এদিক্ থেকে ওদিক্ যেতে হলে ধাক্কা খেতে হত দেওয়ালে। মেয়েগুলো টিফিনের ছুটির সময় এমন চীৎকার করত যে মাথা ধ'রে উঠত। একটু খোলা জায়গা ছিল না, যেখানে এগুলোকে তাড়িয়ে বার করা যায়।

আর এখন? মস্তবড় তিনতলা বাড়ী, বিরাট্ লন্। বড় বড় গারাজ, চাকর দরোয়ানের ঘর। বোর্ডিং-এর আলাদা দুতলা বাড়ী। মেয়েই ত হাজার দেড়েক হবে। নমিতা যখন প্রথম কাজে ঢুকল, তখন যেদিন ছাত্রীর সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে একশ এক হল, সেদিন প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর থেকে আরম্ভ ক'রে সকলের সে কি উল্লাস!

তারপর ত মেয়ে বেড়েছে ক্রমে ক্রমে, এখনও বাড়ছে। নিতান্ত বাসে জায়গা দিতে পারে না, ক্লাসও খুব বেশী বড় করা যায় না, নইলে এতদিনে দু-হাজার ছাড়িয়েই যেত। শিক্ষয়িত্রীও ত বেড়েই চলেছে, একটা common room-এ যেন ধরে না। ছুটির সময় বোর্ডিং-বাসিনী শিক্ষয়িত্রীদের ঘরে অনেক সময় অনেকে গিয়ে আড্ডা দেয়, চা জলখাবার খায়। নমিতা খুব বন্ধু-বৎসল, তার ঘর কোন সময়েই খালি থাকে না। বহু-দিন থেকে বাস করছে সে এখানে, বড় ঘরখানা নিজের পছন্দমত সাজিয়ে নিয়েছে। আসবাবপত্র যা দরকার তা ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই পেয়েছে, তা ছাড়া টুকিটাকি জিনিষ, যেমন কাশ্মীরী টেবিল, আরাম চেয়ার, দেয়ালে ছবি, জয়পুরী মিনা-করা ফুলদানি, এ সব তার নিজের যোগাড়। এটা যে তার নিজের ঘর নয়, সে যে মাইনে-করা ক্ষণিকের অতিথি মাত্র, তা যেন সে ভুলেই গিয়েছিল।

কত কাল কেটে গেছে তার আসার পর। প্রথম যখন কাজ করতে এল, তখনই বোর্ডিংবাসিনী হয়নি। দিনান্তে নিজের বাড়ী ফিরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। ভাল লাগত না তার স্কুলে। একটু মুখচোরা গোছের ছিল, সহজে মিশতে পারত না। অথচ চেহারায়, গলার স্বরে, ধরণ-ধারণে এমন একটা মাধুরী তার ছিল যে, সে না এগোলেও অন্যে তার দিকে এগোত। কাজেই ক্রমে সে জনপ্রিয় হয়ে উঠল, ভাবসাব হয়ে গেল সকলের সঙ্গে। স্কুলও একটু একটু ক'রে ভাল লাগতে লাগল।

তখন কতই বা নমিতার বয়স? বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে। পড়াশুনো শেষ করতে একটু দেরিই তার হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে ভর্ত্তি হতেই তার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আর কি? মা ছিলেন সেকেলে গোছের, মেয়েকে অত লেখাপড়া শিখিয়ে বিবি ক'রে তোলা সম্বন্ধে তাঁর একটু আপত্তিই ছিল। তাকে প্রাণপণে ঘরের কাজ শেখান, গান শেখান, শেলাই শেখান, এই সবেই ঝোঁক ছিল। কিন্তু তার বাবা কালের গতিক বুঝতেন, একমাত্র মেয়ে তাঁর মূর্খ হয়ে থাকবে, দশজনের দ্বারা অবজ্ঞাত হবে, এ তিনি স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। বড় ছেলেও ক্রমে তাঁর দলে যোগ দিল। সুতরাং নমিতা তের বছর বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হল। বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ ছিল, কুঁড়ে স্বভাবও ছিল না, কাজেই ঠেকতে তাকে কোথাও হল না। একেবারে এম্. এ. পাস ক'রে অতঃপর সে চারদিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ পেল।

সে যখন পনেরো পার হয়ে ষোলয় পা দিল, তখন থেকে তার মা বিয়ের জন্যে জেদাজিদি করতে লাগলেন। তবে বাপ এবং মেয়ের এক উত্তর ছিল, পড়াশুনো শেষ না হ'লে ও সব ভাবা চলবে না। তরুণী মানবীর মনে পড়াশুনো ছাড়া আর কিছুর ভাবনা কোনদিন আসেনি এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু পড়াশুনো যে শেষ করতে হবে এ দৃঢ়সংকল্প তার ছিল। তারপর? তারপর সাধারণ রক্তমাংসে গড়া মেয়ের মত প্রেম, ঘর-সংসার,

সন্তান-সন্ততির ভাবনা সে ভেবেছে বৈ কি? তবে অন্যথা রকম বেশী নয়।

বাঙালী সংসারে আর সমাজে মেয়েদের যে অবস্থা সে দেখত, তা তার কাছে একটুও লোভনীয় লাগত না। মেয়েরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে, তাদের কোন কিছুতে অধিকার নেই, কিছু তারা দাবী করতে পারে না। দয়াময় পুরুষ তাকে দয়া ক'রে কিছু দিলেন তবে সে পেল, না যদি দিলেন, তবে তার আর কিছু বলবার নেই। সে দেখত আর অবাক্ হ'ত। মেয়েরা সব সময় ছোট হয়ে থাকবে কেন? ছোট তারা ত নয়? সব মেয়ের চেয়েই কি সব পুরুষ উঁচুদরের? চারিদিকে চেয়ে যাদের সে দেখত, তাদের মধ্যে এ ধারণার কোন সমর্থন সে পেত না। এই ত তার বাবার মাসতুতো বোন নির্ম্মলা পিসী। তিনি কমটা কিসে পিসেমশাইয়ের চেয়ে? দেখতে সুন্দরী, পিসেমশায় ত রীতিমত কুৎসিত। বংশমর্য্যাদায় পিসীমা নিশ্চয়ই বড়, লেখাপড়ায় পিসেমশায়ের চেয়ে বিন্দুমাত্রও কম নয়। অথচ স্ত্রীলোক ব'লে তাঁকে সর্ব্বদা নীচু হতে হবে, প্রভুত্ব করবেন পিসেমশায়। তিনি বোকার মত কথা বললে বা মূর্খের মত কাজ করলে সেটাই মেনে নিতে হবে, কারণ তিনি কর্ত্তা, পুরুষ মানুষ। তাঁদের বাড়ী যখনই যেত নমিতা, এই কারণে বিরক্ত হয়ে ফিরে আসত। বাড়ীতেও ত এই-ই দেখত। মা অবশ্য লেখাপড়া বিশেষ জানেন না, তবু সাধারণ মত বুদ্ধিশুদ্ধি তাঁর আছে, কিন্তু বাবা এমন সুরে এবং এমন ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেন যেন একটা জড়বুদ্ধি মানুষকে বোঝাচ্ছেন।

ভাবত, এই ত সাধারণ বিবাহিত জীবনের ছবি। এর মধ্যে গিয়ে কোন লাভ আছে কি? বুদ্ধি বলত, কোন লাভই নেই, হৃদয় বলত লাভ আছে বৈ কি? সকলেরই কি কপাল একরকম হয়? সত্যিকারের ভালবাসা ব'লে কোন জিনিষ কি সংসারে নেই? উপন্যাসে, কাব্যে যা পাওয়া যায়, সবই কি ভুয়ো কল্পনা? হতে পারে খাঁটি জিনিষ দুর্লভ, কিন্তু কারো কারো ভাগ্যে ত জোটেই? সে দেখতে সুশ্রী, পড়াশুনো করেছে, ভালবংশের মেয়ে, তার কি সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্, সুবিবেচক মানুষের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না?

দাদাদের বন্ধুবান্ধব আসত মধ্যে মধ্যে। আলাপ-পরিচয়ও দু চারজনের সঙ্গে হয়েছিল, তবে তাদের মধ্যে কাউকেই তার বিশেষ পছন্দ হয়নি। মা এবার উঠে প'ড়ে লেগেছেন, হয়ত পছন্দমত কাউকে পাওয়া যেতেও পারে, এই মনে ক'রেই সে কাল কাটাচ্ছিল। ভাল বিয়ে হ'লে বিয়েতে তার আপত্তি ছিল না, কাজেই চাকরির কথা তেমন ভাবে ভাবছিল না সে। এতদিন ত পড়াশুনোর ঠেলায় সংসারের দিকে মন দিতে পারেনি, এখন মায়ের হাত থেকে কাজের ভার টেনে নিয়ে নিজেই করতে আরম্ভ করল। বাড়ীঘর ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠল, খাওয়া-দাওয়াও ঢের বেশী নিয়মিত হতে লাগল।

বড়দা হেসে একদিন বল্ল, "তুই যে দারুণ গিন্নী হয়ে উঠলি রে? পুরনো গিন্নীদের কান কেটে নিতে পারিস।"

মা কাছেই ছিলেন বললেন, "নিজের ঘরের গিন্নী হ'ত তবেই না? এ সংসার ত হবে তোমাদের বৌদের, তার পিছনে খেটে ওর হবেই বা কি?

নমিতা গাল ফুলিয়ে বলল, "আহা, আমি এবাড়ীর কেউ নয় বুঝি?"

মনটা কিন্তু তার স্বীকার করল যে মায়ের কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। এখনও না হয় দুই দাদাই অবিবাহিত, তাই মায়ের সংসারকে নিজের সংসার মনে ক'রে খাটতে নমিতার বাধে না, কিন্তু বৌরা এলে এটাকে এতখানি নিজের মনে করতে সে পারবে কি? বড়দার বিয়ের কথাবার্ত্তাও একটু একটু হচ্ছে বৈ কি? তবে মেয়ের বিয়ে না হয়ে গেলে ছেলের বিয়ের ভাবনা তাঁরা বেশী ভাবতে পারছেন না।

সম্বন্ধ দু-চারটে আসছিল। খুব পছন্দমত নয়, মায়ের পছন্দ হয় ত বাবার হয় না, দুজনেরও যদি হয় ত নমিতার হয় না। অতবড় এম্ এ পাস মেয়ে, তাকে ত জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় না? নমিতাকে যদি ছেড়ে দেওয়া যেত নিজের বর নিজে খুঁজে নেবার জন্যে, তা হলে একরকম হ'ত, কিন্তু মায়ের তাতে ঘোর আপত্তি, বাবাও অতখানি এগোতে ভরসা পান না।

হঠাৎ দৈব-দুর্বিপাকে সংসারের ধারা উল্টে গেল। রক্তের চাপ ভয়ানক বেড়ে নমিতার বাবা শয্যাগত, প্রায়

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, কোনদিন আর চাকরি ক'রে পরিবার প্রতিপালন করবেন এমন সম্ভাবনাই রইল না।

তিন ভাইবোন এবং তাদের মা এতবড় বিপদে প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কিন্তু ক'দিনের মধ্যে সে ভাবটা কেটে গেল। তিনটা কৃতবিদ্য ছেলেমেয়ে থাকতে সংসার ভালভাবে চলবে না কেন? বড় ছেলে চাকরি করছেই, সে তাড়াতাড়ি উন্নতি করবার জন্তে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। ছোট ছেলে কলকাতায় না হোক, মফঃস্বলে একটা মাঝারি গোছের কাজ জুটিয়ে নিল। এমন কি নমিতাও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল চাকরির জন্তে। মায়ের আপত্তিতে কানই দিল না। সেও লেখাপড়া শিখেছে, বাবা তার পিছনে কম অর্থব্যয় করেননি, সে কেন ব'সে ব'সে ভাইদের উপার্জ্জনে খাবে! বাবার ঋণশোধ করার চেষ্টা সেও কেন তাদের সঙ্গে সমান ভাবে করবে না?

কাজ একটা তার জুটেও গেল। খুব ভাল না হ'লেও নিতান্ত মন্দ নয়। পরে উন্নতি হতে পারবে। এখন যা মাইনে পাবে, তাতে তার নিজের সমস্ত খরচ চালিয়েও মায়ের হাতে কিছু কিছু দিতে পারবে।

মা অত্যন্ত অনিচ্ছায় মেয়েকে চাকরি করতে ছেড়ে দিলেন। এর চেয়ে যেমন-তেমন একটা বিয়ে দিতে পারলে তার তিনি বেশী নিশ্চিন্ত হতেন। কিন্তু বুঝলেন, মেয়ে তাঁর কথা শুনবে না, ছেলেরাও মায়ের পক্ষ সমর্থন করবে না।

নমিতার স্কুলের কাজ প্রথম প্রথম খুব বেশী ভাল লাগত না। অল্পদিনেই সয়ে গেল, ক্রমে ভালই লাগতে লাগল। সে কাজের মেয়ে, এখানেও কাজে লেগে গেল। না ডাকলেও নিজের থেকে এগিয়ে যেত। তার গলা ভাল, চেহারাটা ভাল, কাজেই কাজের অভাব হবে কেন? গান শেখাতে নমিতা, অভিনয় শেখাতে নমিতা, স্কুলের উৎসব অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে নমিতা। ব্যবস্থাদি করার জন্তে যখনই মিটিং ডাকা হ'ত, তখনি প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বলতেন "Receive করার লোক ত ঠিকই আছে, নমিতা আর শুভা। নমিতা কিন্তু সেবারের মত শাদা কাপড় পরবে না।" শুভানাম্নী শিক্ষয়িত্রীরও বয়স কম, রংটা খুব ফর্সা, এবং তাকে কোনদিন সাজপোশাক সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ দিতে হ'ত না।

দিন ত বেশ কাটল বছর দুই। এর মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাও দু-একটা ঘটল। নমিতার বড়দা হঠাৎ বিয়ে ঠিক ক'রে বসল তাঁর অফিসের এক বড়কর্ত্তার ভাইঝির সঙ্গে। মেয়েটি রূপে-গুণে বা বিদ্যায় অসাধারণ কিছুই নয়, তবু পাকা কথা দিয়ে তবে ছেলে এসে মাকে জানাল। মা একটু অবাক্ই হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "দেবে-থোবেও না বিশেষ কিছু, মেয়ে দেখতেও ভাল নয় বলছিস ত কিসের লোভে হট্ ক'রে কথা দিয়ে এলি? আমরা মেয়ে দেখলামও না!"

ছেলে বলল, "এখন কিছু না দিলেও অনেক কিছু পাবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে। কত জন্ম আর কেরাণীগিরি করব? বৌ যেমন হয় হবে এখন, সকলেরই কি খুব ভাল বৌ হয়? চাকরিতে বেশ খানিকটা উন্নতি হয়ে যাবে।"

মা সংসারী মানুষ, আর আপত্তি করলেন না। নমিতাই বেশী অসন্তুষ্ট হ'ল ব্যাপারটায়। বিয়েটাকে কেবলমাত্র চাকরিতে উন্নতির সিঁড়িস্বরূপ ব্যবহার করাটা তার একেবারে ভাল লাগল না। দাদা সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধাটাই যেন কমে গেল। মানুষের জীবনে রোমান্স্ বা ভালবাসার স্থান সত্যই কিছুই নেই নাকি?

মোটামুটি ধুমধাম ক'রেই বিয়ে হ'ল। বৌ দেখে নমিতার মনটা আরো যেন বিরূপ হয়ে গেল। বড় রাগী-চেহারা মেয়েটির, ভাল দেখতেও কোনমতে বলা যায় না।

আড়ালে মাকে বলল নমিতা, "খাণ্ডার বৌ হবে মা তোমার।" মা শুধু নীরবে কপালে হাত ঠেকালেন।

বৌ আসাতে বাড়ীতে জায়গার একটু টানাটানি প'ড়ে গেল। বড়দা যে ঘরে থাকত, সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট, সবচেয়ে বড় ঘরে মা-বাবা থাকতেন। বড়দা চায় নি যদিও, তবু অত জিনিষপত্র নিয়ে বৌ ওখানে কি ক'রে থাকবে ব'লে মা তাকে বড় ঘরটাই ছেড়ে দিলেন। নমিতা গরম পড়লেই সামনের বারান্দায় শুয়ে থাকত, শীতে বা বেশী বর্ষায় মায়ের ঘরে ঢুকত। এখন সে স্থির করল, ঐ ছোটঘরে গিয়ে আর ভিড় করবে না। তাঁড়ার ঘরটা ছিল মাঝারি গোছের, তার ছোট একটা কোণ

পার্টিশন দিয়ে ঘিরে সে নিজের জন্যে একটা খুপ্‌রি তৈরী ক'রে নিল।

বড়দা একটু যেন লজ্জিত হয়ে বলল, "নীচের ভাড়াটেদের ছোট কর্তা আর ছোট গিন্নী মাস দুই পরে বদ্‌লি হয়ে চ'লে যাচ্ছে, তখন আমি তাদের ঘরটা নিয়ে নীচে নেমে যাব, মা আবার নিজের ঘরে আসবেন, তুইও যথাস্থানে যেতে পারবি।"

নমিতা বলল, "কাজ নেই বাপু, বেশ আছি। আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। মাস দুই-তিন পরে ছোড়দাও হয়ত বৌ নিয়ে আসবে আর মা আবার ঘর পাল্‌টাবেন।"

বড়দা বলল, "তুই নিজেই যে একেবারে সংসার পাল্‌টাবি না, তাও কি কিউ বলতে পারে?"

তা সেরকম সম্ভাবনাও যে একেবারে হয় নি তা নয়। নমিতার মনটা অত আদর্শবাদী যদি না হ'ত, তা হ'লে সাংসারিক হিসাবে ভাল বিয়ে তারও হয়ে যেত। তারই এক সহকর্মিণীর মামা হঠাৎ বিপত্নীক হলেন। মামা ব'লেই যে তিনি ঠিক বাপের বয়সী তা নয়। বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বয়স হবে, মেয়ে আছে একটি। বড় চাকরে, কলকাতায় নিজের বাড়ী। মাস ছয়েক শোক ক'রেই তিনি আবার কনে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। নইলে সংসার দেখে কে, মেয়ের খবরদারি করে কে? মামার ভাগ্নীর হঠাৎ মনে হ'ল, নমিতাকে জোগাড় করতে পারলে বেশ হয়। দেখতে-শুনতে ভাল, রীতিমত শিক্ষিতা, স্বভাবটাও নরম আছে, গিয়েই সতীনের মেয়েকে পাঁশ পেড়ে কাটতে চাইবে না। মামা ত তার কাছে নমিতার বর্ণনা শুনে মহোৎসাহে রাজী হয়ে গেলেন।

নমিতা শুনে কিন্তু একেবারেই বেঁকে বসল। একে বিপত্নীক, তার উপর মেয়ে আছে। রক্ষে কর বাবা, তার বিয়ের কাজ নেই। ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের যে উজ্জ্বল ছবি ছিল তার মনে, তার উপর কে যেন একরাশ কালি ঢেলে দিল। সে আর একজন সহকর্মিণীকে দিয়ে জানাল যে সে রাজী নয়।

মামার ভাগ্নী একেবারে চটে টং হয়ে গেলেন। বন্ধুদের বললেন, "ইঃ, দেমাক দেখ না। দোজবরে ব'লে মনে ধরছে না। দেখা যাবে কত কুমার কার্ত্তিকের সঙ্গে বিয়ে হয়। ধুবড়ী হয়ে ত কবে থেকে ব'সে আছে, নিজেরই বয়স কম হ'ল নাকি? টাকার ছালার উপর ব'সে থাকত, কুটোটি ভেঙ্গে দুখান করতে হ'ত না, তা কপালে সইবে কেন? আমার মামার কি আর বৌ জুটবে না নাকি, উনি নাক সিঁটকোচ্ছেন ব'লে?"

মামার বিয়ে সত্যিই মাস দুই পরে হয়ে গেল। বৌ যে হ'ল সেও নিতান্ত যা-তা নয়। দেখতে চলনসই, বি. এ. পাস মেয়ে, বয়সে নমিতার চেয়ে কিছু বড়, এবং কত ধানে কত চাল হয় সে জ্ঞান টন্‌টনে। কিন্তু বৌয়ের গহনা কাপড় বা আসবাবপত্রের বর্ণনা শুনে নমিতার একটুও খেদ হ'ল না। দু-মুঠো ভাতের জন্যে তাকে কোনওদিন বিয়ে করতে হবে না, এ সে জানেই। আগে অত্যন্ত কুণো ছিল, বাইরের জগৎটাকে ভয় পেত, এখন যথেষ্ট চট্‌পটে হয়ে গেছে, চলতে ফিরতে বা মানুষজনের সঙ্গে মিশতে তার কোনই অসুবিধা হয় না। ভরণ-পোষণ বা যে কোনরকম একটা আশ্রয়ের জন্যে কেন সে এমন জায়গায় বিয়ে করতে যাবে, যেখানে তার মন সায় দেয় না? এমন মানুষের তাঁবেদারি কেন করতে যাবে, যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারবে না, যাকে সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারবে না?

কুমারী মেয়ে বিবাহযোগ্যা, লোকের নজর টানেই, যদি নিতান্ত তাড়কা রাক্ষসীর মত দেখতে না হয়, বা আকাট মুর্খ না হয়। আর-একজনের দৃষ্টি পড়ল নমিতার উপর কিছুদিন পরে। এক ধনীর গৃহিণী এসেছিলেন, স্কুলের প্রাইজ দিতে। টাকা-পয়সা ঢের, কিন্তু ছেলে-পিলে নেই। স্বামী ব্যারিস্টার, সমস্তক্ষণ নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। কাজেই চব্বিশটা ঘণ্টা মহিলার কাটে কিসে? তিনি অসংখ্য কমিটির মেম্বার, সভানেত্রীও বটে অনেক জায়গায়। বাপের বাড়ী ধনী নয়, তবে ভাইপো, বোনপো, অসংখ্য। সম্ভ্রান্ত, ধনিষ্ঠা আত্মীয়াকে তারা খুবই মান্য করে, এবং যথাসাধ্য তাঁর আদেশ পালন করে।

প্রাইজের দিন নমিতা অতিথি-অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করতে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সাজগোজটা একটু বেশীই হয়েছিল, না হ'লে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বড় অনুযোগ দেন। শ্রীমতী মল্লিক কয়েকবারই নমিতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, দু-চারটে কথাও তার সঙ্গে ব'লে ফেললেন, যদিও স্বভাবতঃ বেশী কথা তিনি বলেন না।

প্রাইজের শেষে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। ছোট মেয়েদের নমিতা গান ও অভিনয় শিখিয়েছিল। সেগুলি খুব সুন্দর হয়েছে ব'লে তাকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর নিজের বাড়ীতে মহিলাদের একটা বৈঠক হয় প্রতি শনিবারে, সেখানে যেতে এবং তাতে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ জানালেন। পাঁচ-জনের সঙ্গে একযোগে নিমন্ত্রণ হ'ল বলে নমিতা কিছু মনে করতেও পারল না। একবার তারা গিয়ে ঘুরেও এল। মহিলার নিজের সন্তানাদি নেই বটে, কিন্তু বাড়ীতে লোকের কোন অভাব দেখা গেল না। তরুণ-তরুণী এদিক্-ওদিকে অনেকগুলিই ঘুরছে। নমিতাকে সবাই তাকিয়ে দেখল, নমিতাও যে না দেখল তা নয়। একজন ছেলে মাসীমার আদেশে চা খাবার সময় চাকর-বেয়ারাদের নির্দেশ দিতে লাগল, তার সঙ্গে গৃহিণী সকলের আলাপ করিয়ে দিলেন। নাম জয়ন্ত, একটা নামজাদা বিলাতী কোম্পানীতে কাজে ঢুকেছে। খুব চটপটে, নাকে-মুখে কথা বলে, তবে যেন বড় বেশী হাল্কা স্বভাবের। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে যে গাম্ভীর্য্যের একটা দিক্‌ও থাকে, তার একেবারে কোন চিহ্নই নেই এর মধ্যে।

স্কুলে তার পরদিন মধ্যাহ্নের ছুটির সময় জয়ন্তকে নিয়ে খুব আলোচনা হয়ে গেল। কেউ বলল দেখতে খুব স্মার্ট, কেউ বা বলল "ঠিক মিচ্‌কে শয়তানের মত।" নমিতা ঠিক কোন দলেই ভিড়ল না। জয়ন্তকে বিশেষ সুদর্শন বলে তার মনে হয় নি, তবে অবশ্য মিচ্‌কে শয়তান বলতেও সে রাজী ছিল না। সাধারণ ফাজিল ছেলের মতই দেখতে, কথাবার্ত্তাও সেই ছাঁদের। আজকালকার ছেলেরা ত বেশীর ভাগই ঐরকম। আগেকার কালের মেয়েরা যে শিবের মত বরের জন্যে ব্রত করত, সে রকম মানুষ কি আজকাল জন্মগ্রহণ করে? স্বভাবে চরিত্রে বিদ্যাবত্তায় অতখানি উন্নত? কই দেখা ত যায় না কাউকে। ওটা কি চিরকাল আদর্শই থেকেছে, কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হয় নি? সে রকম কাউকে কি নমিতা কোনদিন দেখবে? দেখবেই না হয়ত। তবু তার মন বলল, পূজার ফুল বরং শুকিয়ে ঝ'রে যাওয়া ভাল, তবু দেবতার বদলে মাটির পুতুলের অর্ঘ্য হওয়া উচিত নয়।

হঠাৎ মিসেস্ মল্লিকের একখানা চিঠি এসে নমিতাকে বড় মুশকিলে ফেলে দিল। তিনি তাকে সামনের রবিবারে খেতে এবং সারাদিন তাঁর বাড়ী কাটাতে নিমন্ত্রণ করে-ছেন, সেই সঙ্গে লিখেছেন, একটা কথা তোমাকে বোধহয় জানিয়ে রাখা উচিত। জয়ন্তের সঙ্গে ত তোমার আলাপ হয়েছে, সে একটু তোমার সঙ্গে মেলামেশা ক'রে দেখতে চায়। এতে ত কোন দোষ নেই, আজকাল বাঙালী সমাজে এ জিনিষটা চালু হয়ে গেছে। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা নিজেদের জীবনের সঙ্গী নিজেরাই বেছে নেয়, এতে কোন দোষ ত নেই? বাবা-মাকে জানাতে চাও ত জানাতে পার, তবে তুমি ত সাবালিকা মেয়ে, না জানালেও কোন দোষ নেই। জয়ন্তকে ছেলে হিসাবে সকলে প্রশংসাই করে।

একেবারে সোজাসুজি বিবাহের প্রস্তাব! কি কাণ্ড! জয়ন্ত তাকে যতই পছন্দ করে থাক্, নমিতার কিন্তু তাকে পছন্দ হয় নি, এবং তার সঙ্গে মেলামেশা করার কোন তাগিদ সে মনের মধ্যে অনুভব করল না। এখন কি ক'রে ভদ্রমহিলাকে নিরস্ত করা যায়? ভাগ্যে চিঠিতে জানিয়েছেন, সোজাসুজি সামনে দাঁড়িয়ে বললে নমিতা ত ভেবেই পেত না কি উত্তর দেবে। মায়ের কাছে ত এ কথা তোলাই চলবে না, তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে। তিনি বিয়ে দেবার জন্যেই নেচে উঠবেন।

চিঠিটা স্কুলের ঠিকানায়ই এসেছিল, স্কুলের কমন-রুমে ব'সেই সে চিঠিখানা প'ড়ে নিজের হাতব্যাগের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখল। খানিক দূরে ব'সে শুভা যে তাকে লক্ষ্য করছিল, তা তার চোখে পড়ে নি। আর জন-তিন শিক্ষয়িত্রী ঘরে ছিলেন, একটা ঘণ্টা পড়াতে তাঁরা নিজের নিজের ক্লাসের উদ্দেশে প্রস্থান করলেন।

শুভা নমিতার কাছে এসে বলল, "কার চিঠি গো ঠাকরুণ? পড়তে পড়তে একবার শাদা একবার লাল হচ্ছিলে কেন?"

শুভা প্রায় সমবয়সী, তার সঙ্গে নমিতা অনেক সময়ই মন খুলে কথা বলত। চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বলল, "দেখ না কি কাণ্ড! এখন আমি ভদ্রমহিলাকে বলি কি?"

শুভা বলল, "নে না বিয়ে ক'রে? মোটামুটি ভালই ত?"

নমিতা বলল, "রাখ বাপু তোমার ভাল। অমন ফচ্‌কে ছেলে আমার একেবারে পছন্দ নয়। অমন মানুষকে কি শ্রদ্ধা করা যায়?"

শুভা বলল, "শ্রদ্ধা নাই বা করলে? ও ত তোমার গুরুঠাকুর হতে যাচ্ছে না? খানিকটা ভাল লাগতে ত বাধা নেই? বেশীর ভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর এর চেয়ে বেশী কি থাকে? অনেক জায়গায় ত তাও থাকে না।"

নমিতা বলল, "ওতে আমার চলবে না ভাই। ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি পরার সখ আমার নেই।"

শুভা বলল, "তা ত বুঝলাম, কিন্তু এইরকম একটা না একটা খুঁৎ বার ক'রে যদি সবাইকে বিদায় দাও ত বিয়ে কোনদিনই হবে না। এখন না-হয় মা-বাপের ঘরে আছ, এরপর কি বৌদিদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে?"

নমিতা একটু চুপ হয়ে গেল। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। বৌদি যিনি এসেছেন তিনি সুবিধার লোক মোটেই নন। আর একজন যিনি আসবেন, তিনি কেমন হবেন কে জানে? মোটকথা মা-বাবা যদি না থাকেন, তখন এদের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থাটা সুখপ্রদ হবে না। কিন্তু তাই ব'লে শুধু একটা ঘর-সংসারের লোভে নিজেকে বলি দিতে হবে নাকি?

শুভাকে বলল, "আমার মনটা ভাই একটু অদ্ভুত রকমের। আমি ভাইদের সঙ্গে না থাকতে পারি ত একলাই থাকব, তবু যা অপছন্দ করি, তেমন বিয়ে করব না। মেয়েদের বোর্ডিং ত সব উঠে যাচ্ছে না?"

শুভা হাত উল্টে বলল, "কে জানে বাপু, এ কেমন বুদ্ধি। মেয়েরা ঘর-সংসার করবে, ছেলে-পিলে মানুষ করবে—এই ত ভাল মনে হয়। বুড়ো হয়ে না পস্তাও।"

নমিতা চুপ ক'রে রইল। বাচ্চা-কাচ্চার লোভেও কি অবাঞ্ছিত বিয়ে করা উচিত? শিশুভক্ত সে আছে খানিকটা। তবু—

সেদিন বাড়ী গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের খুপরিতে খিল দিয়ে চিঠির উত্তর সে লিখে ফেলল। তার এখন সংসার করা চলবে না, এই কথাই লিখল। বাবা পীড়িত, মাও অক্ষম হয়ে পড়ছেন ক্রমে। তার উপার্জ্জনের উপর এখনও তাদের সংসারটা অনেকখানিই নির্ভর করে। নিমন্ত্রণটাও গ্রহণ করল না।

পরদিন রবিবার, ছুটি। একটু বেলা করে উঠল, চুল খুলে স্নান করতে যাবে ভাবছে, এমন সময় দাদার ঘর থেকে একটা কথা-কাটাকাটির শব্দ শোনা গেল। বৌদি একট নীচু গলায়ই কথা বলছে, কিন্তু স্বরটা বেশ তীব্র, দাদা ত প্রায় গর্জ্জন ক'রেই কথা বলছে। প্রেমালাপ নয় নিশ্চয়ই। নমিতার হাসি পেল, ক'টা দিনই বা কেটেছে বিয়ের পর, এরই মধ্যে সুরু হয়ে গেল কামড়াকামড়ি? এরি জন্যে কি মেয়েরা তপস্যা করে, আর ছেলেদের জিভে জল আসে?

দাদা দড়াম্ ক'রে ঘরের দরজাটা খুলে হন্‌হন্ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল। বৌদির ফোঁপানির শব্দ শুনে নমিতা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল। কি কাণ্ড! আশেপাশের বাড়ীর লোকেরা যদি শোনে? তারই যে লজ্জা করছে!

দাদা ফিরতে অনেক দেরি করল, কাজেই মা, বৌদি, নমিতা সকলেরই খেতে দেরি হয়ে গেল। বৌদির মুখ তখনও তোলো হাঁড়ির মত হয়ে আছে, দাদাও বেজায় গম্ভীর।

বিকেলে বাড়ীর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি বাপের বাড়ী বেড়াতে চলল। দাদা হঠাৎ নমিতার কাছে এসে বলল, "এই, ছ'টার শো'তে সিনেমা দেখতে যাবি?"

নমিতা বলল, "ওমা, সে কি? বৌদি যে বেরিয়ে গেল?"

বড়দা বলল "তা যাক্ না। ও যখন ছিল না, তখন কি আমরা কোথাও যাই নি?"

নমিত বলল, "তাই ব'লে এখন তাকে ফেলে গেলে কি ভাল দেখাবে? সে শুনলে কি ভাববে?"

দাদা ভুরু কুঁচকে বলল, "যা খুশি ভাবুক গিয়ে। সে যদি যা খুশি বলতে পারে ত আমি যা খুশি করতে পারি।"

নমিতা হেসে বলল, "কি বাপু ছেলেমানুষের মত ঝগড়া কর, বয়স ত কারো কম হয় নি?"

দাদা বলল, "বয়স যতই হোক্, সব কথাই সহ্য করা যায় নাকি? আমাকে কি বলেছে জানিস?"

নমিতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি?"

"বলল" আমার জ্যাঠামশয়ের দয়ায় একটা ভাল কাজ হয়েছে ব'লে খুব যে লম্বা লম্বা কথা বলছ। মুরোদ ত কত।"

নমিতা কি বলবে ভেবে পেল না। স্বামীর প্রতি টান থাকলে কি মেয়েটি এমন কথা বলত? অন্ততঃ এরই মধ্যে?

নমিতার দাদা বলল, "যাক্ গে, ওসব ভেবে মন খারাপ করিস্ নে। আমি সুবিধা পেলেই এ কাজ ছেড়ে দেব। কম মাইনে হলেও অন্য কাজ নেব। ঐ একটা অভদ্র মেয়ের কথা শুনব কেন? বোধহয় ও চায় যে, এই চাকরির জন্যে আমি চিরজীবন তার কাছে হাতজোড় ক'রে থাকি।"

নমিতা ব্যস্ত হয়ে বলল, "হট করে আবার কিছু ক'রে বোস না বাপু, দুদিক্ দিয়ে ফাঁকিতে পড়বে। মিটমাট্ হয়ে যাবে এখন।"

দাদা বলল, "হয় হবে, না-হয় না হবে। তুই চল্ ত এখন।" অগত্যা নমিতাকে সিনেমা দেখতে বেরুতেই হ'ল।

নমিতার এরপর মনে নানারকম সংশয় জাগতে আরম্ভ করল। সে কি সত্যিই পারবে এসংসারে টিঁকে থাকতে? ঝগড়াঝাঁটি তার স্বভাবে একেবারেই সহ্য হয় না। সে আদুরে মেয়ে, শক্ত কথা কখনও কারো কাছে শোনে নি। কিন্তু বৌদি কি আর তার মান রেখে চলবেন? স্বামীকেই যখন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন তখন ছোট ননদকে কথা শোনান আর কি আশ্চর্য্য? শাশুড়ী সম্বন্ধেও তিনি খুব উদারনৈতিক নয়, নিজের প্রভুত্বের ক্ষেত্র আস্তে আস্তে প্রসারিত ক'রে নিচ্ছেন।

সে নিজে একলা থাকতে খুবই পারে। কিন্তু মানুষের জীবনে উত্থান-পতন আছে, অসুখ-বিসুখ আছে। সে রকম হলে কিছুদিনের জন্য তাকে ভাইদের আশ্রয় হয়ত নিতে হতে পারে। কাজেই সম্পর্কটা ভাল থাকতে থাকতে স'রে পড়া ভাল। আরো দরকার আর্থিক সঞ্চয়ের। কোন অবস্থাতেই যেন এদিক্ দিয়ে ভাইদের গলগ্রহ না হতে হয়। সে এখন যা রোজগার করে সবই খরচ হয়ে যায়। এরকম করলে চলবে না। আয় বাড়াতে হবে, টাকা জমাতে হবে।

তাদের স্কুল এখন বেশ বড়। নিজেদের বাড়ী তৈরি হচ্ছে, মেয়েদের জন্যে একটা বোর্ডিং-এরও ব্যবস্থা হচ্ছে। বোর্ডিং-এর ভার নেবার জন্যে একজন কর্মী দরকার। সংসার চালানোর অভিজ্ঞতা আছে নমিতার, এবং ভালও লাগে এ-সব কাজ। সে কাজের জন্যে দরখাস্ত করল এবং অবিলম্বে পেয়েও গেল।

মা একটু খুঁৎ খুঁৎ করলেন, তবে যতটা আশঙ্কা নমিতা করেছিল ততটা নয়। বললেন, "তুই যেখানে ভাল থাকবি, সেখানেই থাক্। নিজের সংসার করলি না যখন, তখন কেন আর পরের ঝামেলা পোয়াবি?"

দাদা বলল, "যাচ্ছ যাও বাপু। তোমার বৌদি সারাদিন খালি কোঁদলের ছুতো খোঁজে, এবার সংসারের ঠেলা ঠেলবে, সে ভালই হবে।"

নমিতা মস্ত বড় ঘর পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাড়ীতে খুপরিতে বাস ক'রে ক'রে তার দম আটকে আসবার জো হয়েছিল। মনের মতন ক'রে ঘর সাজাল। যা যখন ইচ্ছে হয় কিনে নিয়ে আসে, হাতে এখন আর তার টাকার অভাব নেই, মাইনে অনেকটাই বেড়ে গেছে দুটো কাজ করার জন্যে। সাজ-পোশাকের সখ তার খুব উগ্ররকমের ছিল না, তবু সেদিকেও অনেক উন্নতি দেখা গেল।

শুভা টিফিনের সময় তার ঘরে ব'সেই আড্ডা দিতে আরম্ভ করল। একদিন বলল, "এত ঘরদোর সাজাতে ভালবাসিস্, নিজেও সাজতে ভালবাসিস্, তবু সংসার করলি না? সত্যিই যে দেখি 'অতি-ঘরন্তী না পায় ঘর'।"

নমিতা বলল, "ঘর যে একলা করা যায় না ভাই! যাঁর সঙ্গে ঘর করব, তাঁকে খুঁজেই পেলাম না। মনের মত লোক কই?"

শুভা বলল, "কবি বলেছেন, মনের মত সেই ত হবে, তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।"

নমিতা বলল, "দেখি সে শুভক্ষণ কখনও আসে কি না আমার জীবনে। তুমি আমাকে ত খুব ত বক্তৃতা দিচ্ছ, নিজের ব্যবস্থা কি করছ?"

"হবে, হবে, তোমার মত আমার কোন ধনুক-ভাঙা

পণ নেই। দিদিটা একবার লাইন-ক্লিয়ার দিলেই হয়।"

নমিতা মা-বাবাকে দেখতে বাড়ীতে প্রায়ই যেত। সংসারটা অনেকটাই হতশ্রী হয়ে গেছে যেন। বৌদি এ-সব দিকে মন দেয় না বেশী। মা যতটা পারেন করেন, তবে তাঁর ঘাড়ে রুগ্ন স্বামীর সেবার ভারও ত আছে। শাশুড়ীর সঙ্গে বৌ খুব কিছু একটা খারাপ ব্যবহার করে না, তবে তাঁকে সাহায্য করবার চেষ্টাও করে না! নমিতা একদিন বলল, "মা, তুমি বৌদির হাতে একটু দাওনা ছেড়ে সব, না হলে ও কি ক'রে শিখবে?"

মা বললেন, "ছাড়লেও ও শিখবে না, ওর মনই বসে নি এখানে। আর এখন ত বাচ্চা হতে চলেছে, জোর ত করা যায় না?"

নমিতা বলল, "বাচ্চাকাচ্চা হলে মন ব'সে যাবে এখন।"

মা বললেন, "হয়ত যাবে। মন্টুর উপর ওর কোন টান হয়নি বাপু, যা ঝগড়াটা করে। শ্বশুর-শাশুড়ী বাড়ীতে, তা কোন সমীহ করে না।"

নমিতা বলল "ছোড়দার একটা বিয়ে দাও না, নিজে দেখে শুনে?"

তার মা বললেন, "হ্যাঁ, তেমনি কপাল ক'রেই আমি এসেছি বটে। তোমার বিয়েই কত দিতে পারলাম, তা তোমার ছোড়দার। কোনদিন হট্ ক'রে কি একটা কিম্ভূতকিমাকার ধ'রে আনবে।"

মায়ের ভয়টা যে সত্যি, তা অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেল। নমিতার ছোড়দাও হঠাৎ বিয়ে ক'রে বসল, আগে কাউকে জানাল না। বৌ নিয়ে যখন কলকাতায় এল, তখন নমিতাদের স্বীকার করতে হ'ল যে ছোট বৌটি অন্ততঃ বড় বৌয়ের চেয়ে দেখ'তে অনেক সুন্দরী।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ছোড়দা চাঁদমুখ দেখেই ভুলেছেন, আর কোন খোঁজ করেন নি। বৌ লেখাপড়া বিশেষ জানে না, তার উপর দারুণ ফিট হয় থেকে থেকে। এটা বরের কাছ-থেকে লুকোনোই হয়েছিল।

মায়ের জীবনে আর কখনও শান্তি হবে না জেনেই নমিতা ফিরে গেল বিবাহের উৎসবের শেষে। তার নিজেরও ভাইদের সঙ্গে থাকার আশা দুরাশাই হবে শেষ পর্য্যন্ত, বুঝতেই পারল। চিরদিন একলা থাকবার জন্তেই তাকে পাকাপাকি তৈরী হতে হবে অতঃপর।

দাদার একটা সুন্দর খোকা হওয়াতে বাড়ীর আবহাওয়া কিছুদিন একটু হালকা হ'ল, তবে সেটাও স্থায়ী হ'ল না। বরং তার শিক্ষা-দীক্ষা, লালন-পালন নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ আরও বেড়ে গেল।

নমিতা ভাবল, সংসার-কুসুমে কণ্টক বড় বেশী। ফুল প্রায় চোখে পড়ে না।

স্কুলের সঙ্গিনীরাও বিয়ে ক'রে কয়েকজন চ'লে গেল। আবার নূতন মানুষ এল, তাদের সঙ্গেও ভাবসাব হ'ল।

দিন ত ব'সে থাকে না কারও জন্যে। কাটতেই লাগল। নমিতার প্রথম যৌবনের দিনগুলো ত কেটেই গেল, কিন্তু জীবনে বসন্ত এল না। পথ চলল ত অনেক দিন, মাঝে মাঝে এক-আধটা লোককে দেখে মনে হয়েছে, হয়ত এরকম মানুষ একজন যদি এগিয়ে আসত, তা হ'লে সে তাকে গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু এরা ত কেউ দাঁড়াল না তার জীবনে, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে। এমনি ক'রে দিন গেল, মাস গেল, পরপর অনেকগুলো বছরও পার হয়ে গেল।

নমিতার বাবা এই সময় মারা গেলেন। শেষের দিকে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই কাঁদল, কিন্তু তাঁর যন্ত্রণার অবসান হ'ল মনে ক'রে সান্ত্বনা পেল। শ্রাদ্ধ-শান্তির শেষে নমিতা ফিরে গেল তার কাজের মধ্যে। তার মাও উঠে সংসারের হাল ধরলেন, নইলে চলে না। বড়বৌয়ের এখন তিনটি ছেলে-মেয়ে কিন্তু অলস স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি। তবে নাতিনাতনীগুলো ঠাকুরমাকে খুব ভালবাসে, তারাই অবলম্বন তাঁর। ছোটবৌ জীবন্মৃত গোছের, তবু তারও দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে। ছোড়দা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে কলকাতায় আসবার, মায়ের আওতায় এসে পড়লে যদি তার ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হয়। প্রায় মাতৃহীনের মত তাদের দিন কাটছে।

নমিতার শরীরটাও বড় যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। খাটে বেশী, বিশ্রাম নেয় না। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজে সে ছুটি নিতে পারে কিন্তু তত্ত্বাবধায়িকার কাজে ছুটি পাওয়া শক্ত। তবু মায়ের কাছে গিয়ে দুদিন থেকে

আসতে ইচ্ছা হয় থেকে থেকে, কিন্তু কলহ কচকচির মধ্যে যেতে মন ওঠে না। ভিড় আরও বাড়ছে, ছোড়দাও কলকাতায় বদলি হচ্ছেন। ঐ বাড়ীতেই উঠবেন, নীচতলায় ঘর জোগাড় করেছেন।

নমিতা একদিন বেড়াতে এসে বলল, "মা, তুমি এবার নাতিনাতনীর ভারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।"

মা বললেন, "তা হোক বাছা, আমার ভালই লাগে। কারু কাজে লাগব না, এমন হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি?"

কথাটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল নমিতা। সত্যি, আত্মীয়-স্বজন কারো কাজে ত সে লাগল না? কাজ করে বটে, কিন্তু সে ত মাইনে নিয়ে কাজ। জীবনের ঋণ কি তার থেকেই গেল? কিছু শোধ হ'ল না? কাজ সে কতকাল করতে পারবে? তারপর কোথায় যাবে? এ সব কথা এখন মনে পড়ছে, আগে মনে পড়ে নি। যাই হোক, ভয় সে করে না। বিশ্বসংসারে তার একটা জায়গা হবেই।

কিন্তু ভগবান্ তার অপেক্ষায় ত ব'সে থাকেন নি। তার জন্যে জায়গা ঠিক হয়ে ছিল। হঠাৎ বড়দা এসে একদিন খবর দিলেন যে, তিনি বোম্বাই চ'লে যাচ্ছেন, অনেক বেশী মাইনের কাজ নিয়ে। বৌ ছেলেমেয়ে সঙ্গেই যাবে অবশ্য।

"মাকে কার জিম্মায় রেখে যাই বল্ ত? ছোট্‌কা ত অর্দ্ধেকদিন বাইরে ঘোরে, তার কাজই ঐ। তার ছেলেমেয়ে দেখা, সংসার দেখা, সব তাঁকে একলা করতে হ'লে তাঁর বড় কষ্ট হবে। তুই বোর্ডিং-এর কাজটা ছেড়ে বাড়ী এসে থাকতে পারিস না? বহুদিন ত সংসারের বাইরে কাটালি?"

নমিতা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, "তা পারি না যে এমন নয়। বোর্ডিং স্কুল সবই ছাড়া যায়। আমারও একটু বিশ্রাম দরকার হয়েছে। সেদিন আমাদের ডাক্তারবাবু বললেন, আমার ব্লাডপ্রেশার বড় বেড়ে গেছে। না-হয় এখন বাড়ীর বোর্ডিংই চালাই। দরকার হ'লে পরে আবার কাজ খুঁজে নেব। আমার কখনও কাজ পাবার অসুবিধা হবে না।"

দাদা বললেন, "দরকার আবার কি হবে? যা কিছু দরকার সংসারের জন্যে, সব আমি পাঠাব।"

নমিতা হেসে বলল, "তা পাঠিও। তবে আমার জন্য কিছু পাঠাতে হবে না। আমার নিজের দরকারের মত সব ব্যবস্থা আমার করাই আছে। আচ্ছা, তবে এদের নোটিস্ দিই।"

এতকালের বাসস্থান ছেড়ে যেতে কষ্ট হ'ল। তাদের সঙ্গে সর্ব্বদা যোগ রাখবে কথা দিয়ে, প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে নমিতা বাড়ী ফিরে এল। দু-একটা দিন মনটা ভার হয়ে রইল।

তারপর দাদা-বৌদি চ'লে গেল। নমিতা আবার সংসার গোছাতে বসল। সে সংসারকে এড়িয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু সংসার তাকে ছাড়ল কই? ভগবান্ তার জন্য এই কাজই যে মেপে রেখেছিলেন।

যা হোক, এর মধ্যে লাঞ্ছনা নেই কিছু, অপমানও নেই। ফুলের মালা তার জোটে নি, কিন্তু লোহার শিকলেও হাত-পা বাঁধা পড়ে নি। জীবনের ঋণ সবটা না হোক খানিকটা ত সে শোধ করে যাবেই।

কাব্যে আধুনিক রূপকল্প ও ভাবানুষঙ্গ প্রবক্তা টি. এস এলিয়ট

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বিশেষ কোন একজন কবির রচনা লঘু কি গুরু, তা বিচার ক'রতে গিয়ে রসজ্ঞ সমালোচকেরা এতদিন প্রধানতঃ দু'টি বস্তুর খোঁজ ক'রেছেন। প্রথমতঃ—আলোচ্য কবির বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপ, দ্বিতীয়তঃ—জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ মনন। এ দু'টির প্রকৃষ্ট সমন্বয়কেই তাঁরা ব'লেছেন মহৎ কাব্য। কিন্তু পৃথকৃভাবে এ দুইয়ের কোন একটির মাত্র প্রকৃষ্টতাকে তাঁরা কদর করেন নি। রূপ-নিরপেক্ষ জীবনদর্শন শত সূক্ষ্ম বা গভীর হ'লেও তার নাম রসজ্ঞরা দিয়েছেন নীরস পণ্ডিতি, ওদিকে জীবনকে না মেনে যে কাব্য শুধুই রূপকে আশ্রয় ক'রেছে, তাকে তাঁরা ব'লেছেন খেলো কারুনৈপুণ্য, Craftsmanship, এলিয়ট নিজেও একজন উঁচুদরের সমালোচক। কিন্তু কাব্যবিচারের সূত্রকে তিনি মানেন না। কাব্য কি, এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত—'It is never what a poem says that matters, but what it is'। কাব্য হচ্ছে উপভোগের সামগ্রী, তা উপদেশ বা কথকতা নয়, সুতরাং কাব্যের লঘু-গুরু যাচাই করাতে কেবল তার রূপটাই ধর্তব্য। এলিয়ট তাঁর নিজের রচনা নাকি কাব্যের এই রূপসর্বস্ব উপাদান নিয়েই গ'ড়েছেন, অন্ততঃ এ তাঁর নিজের মত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এটা সম্ভবতঃ কবির অতি-বিনয়-প্রসূত মন্তব্য অথবা আর্ট সম্বন্ধে তিনি যে চূড়ান্ত formalism-এর পৃষ্ঠপোষক, এ তারই প্রতিক্রিয়া। তাঁর অগণন অনুরাগীদের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যকরা কিন্তু এলিয়টের এই অভিমতকে স্বীকার ক'রতে গররাজী। তাঁরা বলেন, বলার ঠাট ত 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'-এর কবির অভাবনীয় এবং অনন্যই, অধিকন্তু তাঁর কাব্যের বক্তব্যও অসাধারণ। এবং সে বক্তব্য স্পষ্টোচ্চারিত ও সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু আপাতত এলিয়টের নিজের কথাটাকেই অকাট্য ব'লে ধ'রে নিয়ে তাঁর কাব্যরূপের আমরা একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রতে পারি।

কিন্তু Poetry is what it is—বা কাব্য সে যা তাই, কাব্যের পরিচয় নেবার পক্ষে এটুকু অত্যন্ত ধোঁয়াটে বিবরণ। তা হ'লে কাব্য ব'লতে এলিয়ট প্রকৃতপক্ষে কি বুঝেছেন? এ প্রশ্নের কোন স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব আমরা স্বয়ং কবির কাছে পাই নি। কিন্তু তাঁর অনুরাগীদের অন্যতম Herbert Read তাঁর 'Form in Modern Poetry' প্রবন্ধে এ জিজ্ঞাসার একটি সাদামাটা জবাব দিয়েছেন। তিনি ব'লেছেন: 'মানুষের সত্তার মধ্যে যে অনুভূতি-লোক আছে, তার একটা বিশেষ দশারই নাম কাব্য। অন্যান্য আর্টেরও এই একই সংজ্ঞা। কিন্তু শুধু অনুভূতিটাই আর্ট বা কাব্য নয়। প্রকাশের আগে সেই অনুভূতিকে আর্টিষ্টের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও একাত্ম হ'তে হবে। কেননা প্রত্যক্ষত বিষয়গ্রাহী (objective) হ'লেই তবে না অনুভূতি পুরোপুরিভাবে রূপান্বিত হ'তে পারল!—ফেটে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে রবারের বেলুনটার যে অবস্থা, জৈবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় রূপকামী অনুভূতির নিজের চেহারাটাও সেই রকম। কাব্যপ্রক্রিয়ার এটা আদি স্তর। এর দ্বিতীয় স্তর হ'ল অনুভূতির ভাষায় সঞ্চারিত হওয়া। সাধারণ ক্ষেত্রে, মানে, গদ্যের বেলায় আমরা জানি যে, ভাষার কাজ হ'ল শুধু চিত্তবৃত্তিকে অর্থে বিন্যস্ত করা, সেটি শেষ ক'রেই গদ্যের ভাষা দায়মুক্ত। কাব্যসৃষ্টির বেলায় কিন্তু এত সহজেই তার পার পাবার জো নেই। এ প্রক্রিয়ায় ভাষাকে সচেতন মনোভূমে হাজির হ'তে হয় ভাষাবেগ থেকে পৃথগাত্ম এক বিষয়মুখ (objective) সাজ প'রে, অথচ তাকে আবার রূপেগুণে হ'তে হয় কাঁটায় কাঁটায় ভাবাবেগেরই সধর্মী। কিন্তু এত ক'রেও খালাস পায় না কাব্যের ভাষা। এর পরেও যতক্ষণ না কবির মন থেকে কাব্যের ভূত নামল, প্রকাশের আগে ততক্ষণ তার সাজপাজদের নেপথ্যে দাঁড়াতে হ'ল—একের পর এক—সার বেঁধে ছন্দ আর অনুক্রমের বিভঙ্গে।...'

সাধারণ পাঠকের উপলব্ধির পক্ষে কাব্যের এ

ব্যাখ্যাও খুব সম্ভব স্বচ্ছ নয়। অতএব এ বিবৃতিটি সহজতর বিশ্লেষণে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। কাব্য হ'চ্ছে কোন ব্যক্তির একটা বিশেষ অনুভূতি, কিন্তু প্রকাশিত না হ'লে কোন অনুভূতিই শিল্পপদবাচ্য হয় না। কাব্যানুভূতি তা হ'লে প্রকাশিত হ'চ্ছে কি ভাবে? না ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু চিরাচরিত প্রথায় শুধু অর্থযুক্ত বা অলঙ্কৃত হ'লেও ভাষা কাব্য হ'ল না। প্রকাশের আগে কাব্যানুভূতি কবির মননের মধ্যে যে আবেগ ও যে সংরাগে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল, কাব্য-ভাষার মধ্যেও সেই আবেগ ও সংরাগের অবিকল প্রতিরূপ থাকা চাই। T. E. Hulme-এর ভাষায় বলা যায়, 'In short, the great aim of Poetry is accurate, precise and definite description of a unique feeling.' কবির অনুভূতিগুলি হয়ত তাঁর ভাবমানসে সাধারণ লৌকিক কথনরীতির চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয় নি, তারা হয়ত এসেছিল কতকগুলো অনির্বচনীয় ছবির মধ্য দিয়ে, কতকগুলো ভাষাতীত প্রতীককে ভর ক'রে, তাদের চলার ছাঁদও হয়ত ছিল কবিতার বাঁধাধরা ও তালগোণা ছন্দের মত নয়, তা হয়ত শুধু তালনিরপেক্ষ সতেজ সুরের মতো, এবং তাদের অর্থ-সঙ্কেত, অনুষঙ্গ—তারাও হয়ত কবির বহু গঠনের ফলে অত্যন্ত দূরাশ্রিত। কিন্তু যেমনই হ'ক, সেই ছবিগুলির, তাদের চলার সেই নিশ্ছন্দ সুরেলা ছাঁদ আর তাদের অনুষঙ্গের হুবহু প্রতিচ্ছবি আঁকাই সত্যকার কবিকর্ম, কাব্য। এলিয়ট কাব্য বলতে একেই বুঝেছিলেন। এই কারণেই আত্ম-প্রকাশের জন্য পূর্ববর্তী কবিরা যে বাচন, যে ছন্দ এবং যে অনুষঙ্গের আশ্রয় নিতেন, এলিয়ট সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে তাঁর কাব্যে একেবারে আনকোরাদের পদস্থ ক'রেছেন।

এবারে দৃষ্টান্তের আশ্রয় নেওয়া যাক।

প্রথম বাচনের দৃষ্টান্ত। বাহুল্য হ'লেও ব'লে নেওয়া দরকার যে, কাব্যের কথনভঙ্গি ঋজু নয়, বঙ্কিম। অনেক উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা আর পরোক্ষোক্তি দিয়ে কবি তাঁর আত্মলীন উপলব্ধিকে রূপায়িত করেন। এই পরোক্ষোক্তিই কাব্যের বাচন। এলিয়টের আগে ইংরেজ কবিদের এই বাঁকা বিবৃতির উৎস ছিল গ্রীক পুরাণ, বাইবেলের এলিগরি এবং নিসর্গ প্রকৃতি অথবা স্বপরিকল্পিত আকাশচারী স্বপ্ন-আলেখ্য। কাব্যকে এদিকে তাঁরা ব'লতেন জীবনের দর্পণ, অথচ জলজ্যান্ত যন্ত্রসভ্যতার পরিবেশের মধ্যে থেকেও ভিক্টোরিয় কবিরা, এমনকি বিংশ শতাব্দীর জর্জিয়ান কবিরা অবধি তাঁদের বাচনের মধ্যে নিজেদের কালকে প্রতিফলিত ক'রতে পারেন নি। এই প্রকট অসামঞ্জস্যকে এলিয়ট তাঁর কবিতায় ঘটতে দিলেন না। কবিতাকে তিনি চাইলেন সমসাময়িক বাচনে কথা কওয়াতে। 'Prufrock' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থেই সেই নতুন কথা ফুটল—

'Let us go you and I
When the evening is spread out
against the sky
Like a patient etherised upon a table.'

'The yellow fog that rubs its back upon
the windowpanes.'
[The Love Song of J. Alfred Prufrock.]

'The voice returns like the insistent
out of tune
Of a broken violin on an August
afternoon'.
[The Portait of a Lady.]

'The reminiscence comes
Of sunless dry geraniums
And dust in crevices
Smells of chestnuts in the streets
And female smells in the shuttered rooms
And cigarettes in corridors
And cocktails smells in bars.'
[Rhapsody on a Windy Night.]

ইংল্যাণ্ডের খোলামন পাঠকেরা এবং উচ্চাভিলাষী

নতুন কবিরা কবিতার এই আনকোরা বোল শুনে বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। নিষ্প্রাণ সন্ধ্যাকাশ যে ইথারবিবশ রোগীর সঙ্গে উপমিত হ'তে পারে, সন্ধ্যার কুয়াশা যে সার্সির গায়ে পিঠ রগ্‌ড়াতে পারে, অথবা অবাঞ্ছিত কণ্ঠস্বর যে পারে আগষ্ট-অপরাহ্নের ভাঙা বেহালার বেসুরো আওয়াজের প্রতিধ্বনি করতে, এ ছবির সম্ভাবনা তাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। তারপর-বাতাস-উদ্বেল রাতে কবির স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত নাগরিক জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলির সেই বিচিত্র গন্ধময় চিত্রালি। অপরূপ সঙ্কেতের মধ্যস্থতায় ছবিগুলি যেন শুধু পাঠকের চোখের উপরে এসেই থেমে থাকে না, অনুভূতির প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেও তারা যেন মিশে যায়। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হ'ল ছবিগুলির অপূর্ব আধুনিকতা। গ্রীক পুরাণ বা বাইবেলের উপাখ্যান নয়, বহুভোগ্যা নিসর্গও ঠাঁই পায় নি, স্বপ্নাদ্য রূপকও অপসৃত, ওরা সবাই যেন বিংশ শতকীয় মানবসমাজের প্রত্যহের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পরিবেশ থেকে জীবন্ত সত্তা নিয়ে উঠে এসেছে।

সেক্সপীয়রের পর তিনশো বছর ধ'রে একঘেয়ে ঢঙ ও প্রতীকে কথা ব'লতে ব'লতে ইংরেজী কবিতা—শুধু ইংরেজী কবিতাই বা কেন—সারা পৃথিবীরই কবিতার দশা হ'য়েছিল যেন কাটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো; তাতে সঙ্গীত আছে, তাল লয় আছে, কিন্তু বৈচিত্র্য নেই, একই তার কথা ও সুর। 'প্রুফ্রক' সেই কাটা রেকর্ডটি পাল্টে দিয়েছে। এর পর থেকে আধুনিক মানুষের কাব্য, বিশেষ ক'রে ইংরেজী কাব্য সেই নতুন রেকর্ডের সুরে গান গাইছে। 'প্রুফ্রক' বেরোবার পাঁচ বছর পর ১৯২২ সালে 'The Waste Land-এর আবির্ভাব। ১৯০৫ সাল থেকে অর্থাৎ মাত্র সতেরো বছর বয়স থেকে এলিয়ট প্রকাশ্যভাবে তাঁর কাব্যসাধনা সুরু করেছিলেন; 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' তাঁর এই সতেরো বছরের কাব্যসাধনার সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী সৃষ্টি। এবং শুধু তাঁর নিজের নয়, সমগ্র আধুনিক কাব্যেরই এক তাজমহল। কাব্যের যে নতুন বাচন, অপরূপ ছবি আর রূপকের পত্তন হয়েছিল 'প্রুফ্রকে', 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে', তা যেন পরম পরিণতি লাভ ক'রল। কিন্তু কেবল নতুন বাচনভঙ্গি এ কবিতার পুরো পরিচয় নয়। কাব্যের ঐতিহ্যাশ্রিত আর যে মুখ্য অঙ্গ দু'টি—ভাবানুষঙ্গ আর ছন্দ, এলিয়ট তাদেরও পূর্বরূপকে এবারে এক অচিন্ত্যপূর্ব সাজ পরিয়ে দিলেন। এটা মাত্র বিস্ময়েরই বিষয় নয়, সমালোচকেরা এবারে চমকে উঠলেন।

কাব্যের ভাবানুষঙ্গ ব'লতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে আমাদের পাঠকেরা অবশ্যই সম্যক্‌ভাবে অবহিত। পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে, অনুভূতিকে পাঠকের প্রাণে সংক্রামিত ক'রতে গিয়ে সোজা ভাষায় কথা বলা কবির স্বভাব নয়, তা তাঁর কর্তব্য নয়। কাব্যানুভূতি অনির্বচনীয়, কিন্তু তবু তাকে জানান দিতে হবে। তাই কবিতার প্রয়োজন ইঙ্গিতের, আভাসের এবং প্রকটকে ব্যক্ত ক'রে অপ্রকাশ্যের সঙ্কেত দেবার। রূপতত্ত্বের (Aesthetics) পরিভাষায় এই সঙ্কেত বাক্যেরই অভিধা হ'চ্ছে ভাবানুষঙ্গ (Association)। এই ভাবানুষঙ্গের পুরণো রূপকল্প কবিদের অনুভূতির আবেগকে সমবেগে সঞ্চারী ক'রতে পারত না। এলিয়ট 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে' তাই ভাবানুষঙ্গের নতুন প্যাটার্ণ গ'ড়লেন—

HURRY UP PLEASE IT'S TIME
HURRY UP PLEASE IT'S TIME
Goodnight Bill. Goodnight Lou.
Goodnight May. Goodnight.
Ta ta. Goodnight, Goodnight.
Goodnight, ladies, goodnight, sweet ladies,
goodnight, goodnight.

স্তবকটি 'The Game of Chess' অংশের সব শেষের কয়েকটি পংক্তি। এখানে কবির উদ্দেশ্য একটি মর্মন্তুদ বিদায়-দৃশ্যের আবহাওয়াকে রূপ দেওয়া। এখানে এই অনুষঙ্গের অবশ্য কোন মুন্সিয়ানা নেই, অভিনব হ'ল পঞ্চম পংক্তিটির প্রয়োগ। এটি সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের একটি আস্ত বচন, উদ্ধৃতির কোন চিহ্ন নেই, তবু অজান্তে এসে কখন্ প্রথম চার লাইনের অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে গেছে।

আরেকটি নমুনা—

'Ganga was sunken, and the limp leaves

Waited for rain, while the black clouds
Gathered far distant, over Himavant,
The jungle crouched, humped in silence,
Then spoke the thunder
Da
Datta : what have we given ?
[What the Thunder Said.]

এখানকার কাব্যাহুভূতিটা হ'চ্ছে—এক উষর পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ক'রে কবির জীবন-জিজ্ঞাসা। প্রাণদ বারির জন্য 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' অর্থাৎ অপচয়িত পাশ্চাত্য দেশের হৃদয় শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাথরে গড়া এই দেশে জল নেই, Here is no water but only rock,—প্রথম চার লাইনে কবির উদ্দিষ্ট ছবিটা এই। কিন্তু এ আলেখ্যকে সোজাসুজি না দেখিয়ে ইংরেজের উপলব্ধির পক্ষে দুরাশ্রিত এক অনুষঙ্গ দিয়ে এলিয়ট আঁকলেন সুদূর ভারতের একটি উষর প্রান্তর। গঙ্গা মজে গেছে, বিকলাঙ্গ পাতারা জলের জন্য যখন আকুল, কালো মেঘেরা কিন্তু তখন ভিড় ক'রে জ'মে আছে অনায়ত্ত হিমবন্তের শীর্ষে। কিন্তু ইংরেজী কাব্যে হঠাৎ ভারতকে আবার কেন টেনে নিয়ে এলেন কবি? এখানে পাব আমরা এলিয়টের অভিনবত্ব। কারণ, এই ছবিটির অব্যবহিত পরেই আরও একটি ভারতীয় অনুষঙ্গ আসছে, এবং উপস্থিত স্তবকের এইটেও প্রধান বক্তব্য। Then spoke the thunder : Da, Datta। এখানে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি কাহিনীর ইঙ্গিত পাই।—প্রজাপতির তিন পুত্র মানুষ, অসুর আর দেবতা, একদা সৃষ্টিকর্তার কাছে উপদেশ চাইল। সেই প্রার্থনার উত্তরে প্রজাপতি তাদের কাছে শুধু একটি মাত্র অক্ষর 'দ' উচ্চারণ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলেন : 'কি বুঝলে?' মানুষ বলল : 'দত্ত—মানে দান করো।' অসুর বলল : 'দয়াধর্ম—অর্থাৎ দয়া করো।' আর দেবতা বলল : 'দম্যত—মানে দমিত হও।' তিনজনের তিন রকম জবাব। প্রজাপতি তাদের প্রত্যেককেই, বললেন : 'ঠিকই বুঝেছ।'—সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত বজ্র-ধ্বনি নাকি সৃষ্টিকর্তার সেই সঙ্কেতময় উপদেশেরই প্রতি-ধ্বনি করে—'দ' 'দ' 'দ'। এলিয়ট এখানে সেই কাহিনী-কথিত মানুষের প্রসঙ্গটার উল্লেখ করেছেন। মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে জীবনের নির্দেশ পেয়েছে—দান করো। কিন্তু What have we given? আত্মসর্বস্ব পশ্চিমের মানুষ কাকে কি দিয়েছে?

উদ্ধৃত স্তবকের সারা কাব্যানুভূতিটাই একটি গভীর দর্শনের তত্ত্ব, প্রকাণ্ড একটা তার্কিক আলোচনা চলে এই তত্ত্বের উপরে। কিন্তু কি অপরূপ ইঙ্গিতময় আঙ্গিকে ছুটি মাত্র অনুষঙ্গে সেই দীর্ঘ প্রসঙ্গকে এলিয়ট পাঠকের কাছে জীবন্ত ক'রে তুললেন!

মাত্র ছোট ছুটি নমুনার সাহায্যে এলিয়টের আবিষ্কৃত কাব্য-আঙ্গিকের অভিনব অনুষঙ্গের সঙ্গে আমাদের পাঠক-দের পরিচিত করাবার চেষ্টা করা হ'ল। এবারে এ প্রসঙ্গে একটি কথা উঠতে পারে। কথাটা অনেকবারই কাব্যের সনাতনপন্থীরা বলেছেন। তাঁরা ঠোঁট উল্টে বক্রোক্তি করেছেন—না হয় মেনে নিলাম যে, এলিয়টের প্রযুক্ত উপরোক্ত অনুষঙ্গ ছুটি অভিনব, কাব্যরচনার এ এক অভূতপূর্ব ম্যাজিক; কিন্তু অবস্থাটা যদি এমন হয় যে, হ্যামলেটের সঙ্গে উদ্দিষ্ট পাঠকের কোন পরিচয় নেই, উপনিষদের কাহিনী তার কাছে অজ্ঞেয় বিদেশী ব'লে প্রতিভাত, তা হ'লে? তা হ'লেও কি এলিয়টের অনুষঙ্গকে কলাসম্মত বলা যাবে? তখন কি এদের মূল্য দুর্বোধ্য প্রলাপের চেয়ে বেশী হবে কিছু?—এ প্রশ্নের জবাবটা সমালোচক—Montgomery Belgion-এর কথা উদ্ধৃত ক'রেই দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন—'The suppositions afford no reason why a poet should not insert quotations or such allusions in his work for the benefit of those readers who will identify them. There is nothing new in a poet's making an allusion.' জবানীটা মেনে নিতে আমাদেরও আপত্তি হবার কথা নয়।

এলিয়টের যাদুস্পর্শে ইংরেজী ছন্দও এক অনাচরিতপূর্ব ঠাট পরিগ্রহ করেছে। রূপতত্ত্ব অনুযায়ী কবিতায় ছন্দের ভূমিকা হ'চ্ছে এই যে, তা কবির অনন্য অনুভূতির আবেগকে বেগময় করে। ধ্বনিকে এই বেগটার উপরে না চাপালে একের অন্তর-রহস্য অপরের অন্তরে পৌঁছায়

না। এ তত্ত্ব থেকে স্বভাবতঃই একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কবির অনুভূতির আবেগটা যখন তাঁর নিজের, তখন সেই আবেগের বেগটাও কবির নিজস্ব হওয়া উচিত। কিন্তু উচিত হলেও এলিয়টের আগে ইংরেজী কাব্যে সেটা ঘ'টে ওঠা সম্ভব হয় নি। কারণ সাধারণ ক্ষেত্রে ইংরেজী ছন্দের ধ্বনি ও বিন্যাসের নিয়মটা বাঁধাধরা, সিলেব্‌ল ও মিটার সাজানোর পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ—যে মানুষটা প্রাণের দুর্লঙ্ঘ্য আবেগে ছুটবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তাকে যেন ছুটবার আগেই চোখ রাঙিয়ে ব'লে দেওয়া হ'ল—সাবধান, নিয়মমত পা ফেলো, নইলেই কিন্তু ছন্দপতন। বিদ্রোহী এলিয়ট অনুষঙ্গের মত, বাচনের মত, ছন্দের এই অসামঞ্জস্যকেও বরদাস্ত করেন নি। সতেজ বেগকেই তিনি তাঁর অনুভূতিজাত আবেগদের বাহন ক'রে দিলেন। তার ফলেই এসেছে ইংরেজী কাব্যের এই নতুন বেগ—

> 'April is the cruelest month, breeding
> Lilacs out of the dead land, mixing
> Memory and desire, stirring
> Dull root with spring rain.'
>
> [The Waste Land-এর প্রথম পংক্তি।]

ইংরেজী ছন্দতত্ত্বের সঙ্গে যাঁরই কিছু পরিচয় আছে, তিনিই চিনতে পারবেন এই নতুন ছন্দের বৈশিষ্ট্য। ঠিক মিল যাকে বলে, উল্লেখিত পংক্তিটি তা অনুসরণ করে নি। অথচ এ বস্তু Blank Verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দও নয়, কারণ ইংরেজী তত্ত্ব অনুযায়ী অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও চলনটা বাঁধাধরা। তাকে ambic লয়ে অর্থাৎ প্রতি চরণে এক ফাঁক এক ঝোঁক এই তালে পা ফেলতে হয়, এবং পদক্ষেপের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু এলিয়টের এই স্তবকে আমরা দেখতে পাই ঝোঁক আর ফাঁকগুলি যেমন খুশি বিন্যস্ত, ধ্বনিগুলির চলন মুক্ত। অথচ এদিকে প্রথম তিন লাইনের প্রত্যেকটির শেষে ing-অন্ত তিনটি দীর্ঘ ধ্বনি আমদানি ক'রে নতুন একরকম ঝোঁকের সৃষ্টি করা হয়েছে —গড়িয়ে চলার সুর। ফলে সবসুদ্ধ মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে, গোটা স্তবকটা যেন এক মন্ত্রোচ্চারণের সুর আওড়াচ্ছে।

এই হচ্ছে এলিয়টের কাব্যের নতুন গতি—যে গতি কবির অন্তরবেগের সঙ্গে একাত্ম। কবির অনুভূতিলোকে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার পর আবেগের ধাক্কায় সে ছবিগুলিতে এসেছে বেগ, সবশেষে দুইয়ে মিলে নিজেকে প্রকাশ ক'রেছে এক অপরূপ প্রাণীন সুরে। এই সুরের আগুন এখন আধুনিক পৃথিবীতে প্রায় সব খাঁটি কবিরই প্রাণে প্রোজ্জ্বল।

আঙ্গিকের উক্ত ত্রিবিধ সংস্কার ছাড়া কাব্যের মাধ্যম নিয়ে আরও একটি পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন এলিয়ট, তা হচ্ছে নাট্যকাব্য। এই পরীক্ষায় তিনি চেষ্টা করেছিলেন, প্রাচীন গ্রীক মেলোড্রামার আধারে আধুনিক জীবনের আধেয়কে খাপ খাওয়াতে। এবং এই আঙ্গিকে লেখা দু'টি নাটক 'The Family Reunion' এবং 'Murder in the Cathedral' রসজ্ঞদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট করেছে খুব। তবু এলিয়টের এই নতুন পরীক্ষার মূল্য নিয়ে বড় বেশী মতদ্বন্দ্ব হয়েছে। তা হলেও এলিয়ট স্বয়ং তাঁর কীর্তির দাম কষতে গিয়ে এই সবিশেষ রূপটাকেই বলেছেন তাঁর কাব্যের সব। কারণ, তাঁর মতে কাব্য—কেবল তাঁর নিজের কাব্য নয়, সর্বদেশের সর্বকালেরই কাব্য, হচ্ছে পুরোপুরিভাবে শিল্পী। সে ছবি আঁকে, গান গায়, নাচে, কিন্তু সে কথক নয়। তবু পূর্বের কথা উল্লেখ ক'রে বলতে হয়—এলিয়টের অতিবড় ভক্তরাও কাব্য সম্বন্ধে গুরুর এই মতবাদকে মানেন নি। জীবন-নিরপেক্ষ রূপসর্বস্ব কাব্য যে খাঁটি কাব্যপদবাচ্য নয়, তা শুধু শব্দপ্রয়োগের নিকৃষ্ট কারুনৈপুণ্য—সনাতনীদের এই কথাটি তাঁরা মনে-প্রাণে স্বীকার করেন। কিন্তু তা বলে একথাও যেন না মনে করা হয় যে, এলিয়টের সৃষ্টিকেও তাঁরা খেলো ক্র্যাফ্‌ট্‌সম্যানশিপ ব'লে বরবাদ করছেন। 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর কবি নিজে না মানলেও জীবন সম্বন্ধে সত্যই তাঁর একটা সুস্পষ্ট বলার বিষয় আছে এবং সে বক্তব্য তাঁর মত মর্মস্পর্শী ক'রেও কেউ বলতে পারে নি।

সমাজতন্ত্রীদের ব্যাখ্যায় এলিয়ট হচ্ছেন আধুনিক ইতিহাসের ডেকাডেণ্ট পর্বের প্রতিভূ-কবি। এই পর্বের সূচনা ভিক্টোরিয় যুগের শেষ ক'টি বছর থেকে। শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভে ব্যবহারিক জীবনে নতুন উন্নয়নপথ উদ্ঘাটিত হওয়ায় ইউরোপের মানুষ ভেবেছিল—এবার

পৃথিবীতে এল মিলেনিয়ম, শান্তি ও প্রাচুর্যের দৈবরাজ্য, কিন্তু পুরো প্রায় একটি শতাব্দী কেটে গেল—শিল্পবিপ্লবের ফল ভিক্টোরিয় যুগে চরম রূপ নিয়ে দেখা দিল, ইউরোপ ছেয়ে গেল প্রাচুর্যে, কিন্তু কই শান্তি? প্রাচুর্যে বলীয়ান্ হয়ে ইউরোপ বরং পরস্পরের প্রতি জিঘাংসাবৃত্তিতেই মেতে উঠেছে। জীবনকে উন্নীত করবার পথের সন্ধান পেয়েছিল ইউরোপ, কিন্তু সে এগিয়ে চ'লেছে মৃত্যুরই দিকে। তা হ'লে কি জীবন মানেই মৃত্যু? তবে আসুক মৃত্যু!—এই যে অবিশ্বাসে ভরা জীবন-চৈতন্য বা অন্য ভাষায় মৃত্যুপ্রবণতা—এইটেই ডেকাডেণ্ট পর্বের জীবন-দর্শন। এই মৃত্যুপ্রবণ দর্শনের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ম্যাথু আর্নল্ড-এর লেখায়।

এরপর গড়িয়ে গেল আরও কিছু বছর, এল ১৯১৪ সালের প্রলয়। অকস্মাৎ কে জানে কেন ইউরোপের সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা ঘোষণা করলেন, মাভৈঃ, এবারে সত্যিই আসচে মিলেনিয়ম, উপস্থিত প্রলয়ের গর্ভে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইতিহাসের নাড়ীজ্ঞানটা যাঁদের যথার্থ ছিল, তাঁরা ঠিক বুঝলেন—রাষ্ট্রনায়কেরা ধাপ্পা দিচ্ছেন। তাঁরা টের পেয়েছিলেন—এপথে শান্তি আসবে না। জীবনও আসবে না, জীবন ও শান্তির লক্ষণ এ নয়, জীবনকে কখনও চিনতেই পারে নি পশ্চিমের মানুষ। এ প্রলয় ডেকাডেণ্ট ধ্বংসনাট্যেরই প্রথম অঙ্কের অভিনয় মাত্র। এলিয়ট হচ্ছেন মানব-ইতিহাসের এই যথার্থ নাড়ীজ্ঞদের অন্যতম। তাঁর কাব্যে এই নাড়ী-জ্ঞানটাই অপরূপ হয়ে ফুটেছে—

'What are the roots that clutch,
what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say or guess, for you know only
A heap of broken images, where the
sun beats
And the dead tree gives no shelter,
the cricket no relief
And the dry stone no sound of water.'
[The Waste Land.]

'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' জুড়ে এই কথাটিই নানা বিন্যাসে বিবৃত হয়েছে। তাঁর "The 'Hollow Men,'' 'The Waste Land'-এরই এক মুদ্রার অপর পিঠ। প্রস্তরী-ভূত অপচয়িত পশ্চিম দেশে যে জীব বাস করছে, বেঁচে থাকার নামে নিরর্থ কালক্ষেপণ করছে, তারাই হচ্ছে The Hollow Men, ফাঁপা শূন্যগর্ভ মানুষ।

'We are the hollow men,
We are the stuffed men.
Leaning together
Headpiece filled with straw......
... ...
Shape without form, shade without colour
Paralysed force, gesture without motion;
... ...
Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.'

কিন্তু সম্প্রতি বছর কয়েক হ'ল, সাধারণ মানুষ না হলেও ইউরোপের স্বর্ণসভ্যতাক্লান্ত এবং আশাহত কবি ও চিন্তাজীবীরা আবার যেন মনে হয় হৃত বিশ্বাসকে ফিরে পাচ্ছেন, পাচ্ছেন জীবনকে স্বীকার করার প্রেরণা। অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে ফিরে আসার এই যে তীর্থযাত্রা, এর সুরু মোটামুটি ১৯৩০ সাল থেকে। কিন্তু যাত্রার উদ্দেশ্য এক হলেও গন্তব্যটা সকলেরই এক নয়। তাঁদের মধ্যে কেউ ঝুঁকেছেন রাষ্ট্রহীন সাম্যসমাজের দিকে, কেউ ইউরোপেরই অবহেলিত ধর্ম ক্যাথলিসিজমের দিকে, কেউ বা আবার যাত্রা বদল ক'রে দৃষ্টি রেখেছেন পূবদেশের দিকে, প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক ধর্মে। এলিয়টও ১৯৩০ সালে এই তীর্থযাত্রায় এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি প্রধানতঃ মধ্যপথেরই পথিক, কিন্তু পূর্বাচলের দিকেও তাকান মাঝে মাঝে। 'Ash Wednesday' থেকে এই যাত্রারম্ভ; পথপরিক্রমণ এখনও চলছে। 'Ash Wednesday'তে তিনি যেমন বলেছেন—

'Blessed Sister, holy mother,
Spirit of the fountain,

Spirit of the garden off the margin,
Suffer us not to mock ourselves with
falsehood
Teach us to care not to care ;
Teach us to sit still
Even among these rocks.'

আবার একেবারে হাল-আমলের লেখা 'Dry Salvages'-এও তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের কথা স্মরণ করেছেন—

'I have said, take no thought of the
horvest,
But only of the proper sowing.'

মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, এলিয়ট প্রথমে যেমন জীবনের সার হিসেবে শুধু বুঝেছিলেন মৃত্যুকে, এখন বুঝেছেন যে, জীবন মৃত্যুর নামান্তর না হ'লেও মানুষের একার শক্তি নয় সার্থক জীবনকে সৃষ্টি করা। 'We build in vain unless the LORD builds with us. Can you keep the city that the LORD keeps not with you ?' অতএব ত্বং গতি পরমেশ্বর। তিনি আজ ঈশ্বরমুখী হয়েই বিশ্বমুখী এবং প্রাচীন ঐতিহ্য-বাহী হয়েই নবীন ও নবীনতর।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী "influenced him most" ("outside his family circle"), এই কথা কবির কৈশোর ও যৌবন সম্বন্ধে সত্য ; কিন্তু পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে সত্য নয়। এই সময়ে, অর্থাৎ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ে তিনি বিশেষ কোনো ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের প্রভাব বেশী অনুভব করেছিলেন, এরূপ বলা যায় না।

১৫. ১০. ১৯৪১ তারিখে ঘাটশিলা থেকে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।

পরিত্রাণ

আভা পাকড়াশী

মদনগড় ষ্টেট। যদিও তখন পতনোন্মুখ, তবুও ঐতিহ্য আছে। এখনো ঐ গড়ের আকারে তৈরী বাড়ীটাকে লোকে বলে কাস্‌ল্‌ বাড়ী। কিন্তু অনেকে বলে অভিশপ্ত বাড়ী। আর ঐ বুড়োবুড়ী যেন ঐ বাড়ীর যক।

এই বাড়ীর মেয়ে ও একমাত্র ওয়ারিশ মল্লিকা। সে কিন্তু এখানে থাকে না? টিঁকতে পারে না ঐ শূন্য পুরীতে। কলকাতায় দিদিমার কাছে থেকে ডায়সেসনে পড়ে। তিনিও মস্ত বড় লোক। অবশ্য নাতনীর খরচ নাতনী নিজেই বহন করে। ছুটিতে আসে ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কাছে। নিজেই ড্রাইভ করে চলে আসে কখনো কখনো। কলকাতা থেকে ত আর বেশী দূর নয়? মাইল চল্লিশেক হবে।

ভারী ফুর্তিবাজ আর চালাক চটপটে মেয়ে এই মল্লিকা। নাচতে, গাইতে, ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার দিতে ওর জুড়ি মেলা ভার। ওর দেহ-মন দুইই ঐ মল্লিকা ফুলের মতই শুভ্র আর সুন্দর।

এহেন মল্লিকা দেবী সেদিন মদনগড়ে সোফার-চালিত ষ্টেটকারে করে এসে কেষ্টবাবুর ষ্টেশনারী দোকানের সামনে নামলেন, ও দোকানের ভেতরে ঢুকে ভীতত্রস্ত ভাবে বার বার দোকানের বাইরে রাস্তার দিকে দেখছেন আর কেষ্টবাবুকে এটা-সেটা ফরমাশ করছেন, এবং ফরমাশ মত জিনিষ আনলেই বলছেন, না, না, ওরকম তো চাই নি, আমি তো বললাম অমুক ব্রাণ্ড—আবার চঞ্চল চক্ষের ত্রস্ত দৃষ্টি বাইরে চলে যাচ্ছে। কেষ্টবাবুও সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছেন না। এর আগে মল্লিকা কখনো তাঁর দোকানে আসে নি। কাস্‌ল্‌ বাড়ী থেকে ফর্দ্দ এসেছে, সেই সেই মোতাবেক জিনিষ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখন কেষ্টবাবু জিনিষ বার করা ছেড়ে উৎসুক ভাবে মল্লিকার সঙ্গে বাইরে দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ দেখলেন, একটা মোটর সাইকেল তীরবেগে কাস্‌ল্‌ বাড়ীর দিকে চলে গেল। আর মল্লিকার মুখখানা প্রথমে রক্তশূন্য হয়ে পরে ক্রোধে লাল হয়ে উঠল।

এবার সোফার এসে সেলাম করে বলল, দিদিরাণী, কাসলে চলুন জামাইরাজা এগুলো পাঠিয়েছেন। রাগে মুখ লাল করে মল্লিকা বলে, না, যাব না, যখন আমার খুশি হবে তখন ফিরব। আর জামাইরাজা বলছ যে এখন থেকেই? কে এই হুকুম দিয়েছে তোমাকে? ও, ভুলে গিয়েছিলাম তুমি যে ওঁরই সোফার। আচ্ছা, চল যাচ্ছি। এবার কেষ্টবাবুকে বলে, জিনিষগুলো গাড়িতে তুলে দিন না। দেখছেন কি হাঁ করে? গট গট করে এবার বসে গিয়ে গাড়িতে।

একটু পরেই একটি সুদর্শন যুবক এসে ঢোকে কেষ্টবাবুর দোকানে। তাকে দেখেই কেষ্টবাবু হর্ষোৎফুল্ল স্বরে বলে ওঠে, আরে মিহির যে? অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল ভাই! তারপর সেই যে কাসল বাড়ীর কেয়ার-টেকারের চাকরি ছাড়লে তারপর থেকে আর তোমার দেখাই নেই। শুনছি নাকি কমার্স পাশ করে কলকাতায় বেশ ভাল ফার্মে ঢুকেছ? তা বেশ বেশ, বাপ গোলামী, আরে ছোঃ, দেওয়ানী করেছে বলে যে ব্যাটাকেও করতে হবে তার কি মানে আছে? কিন্তু ওদিকের ব্যাপার যে বড় গড়বড়। দাদু ত নাতনীটিকে মেমসাহেব করে মানুষ করেছেন, কলকাতায় রেখে। এদিকে হবুজামাই ঠিক করেছেন একটি কন্দর্পকান্তি অকাল কুষ্মাণ্ডকে। আরে সেই সম্বলপুরের রাজকুমারের ভাই। এখন ওদের সম্বল বলতে ত আর বিশেষ কিছুই নেই। থাকার মধ্যে আছে ঐ বিরাট্ বাড়ীখানা, আর খান কয়েক গ্রাম। তবে ছেলেটা ব্যবসা বোঝে। লোহার ব্যবসা করে। অই বুদ্ধিটা আর স্বভাবটাও ঠিক অমনি লোহার মতই নিরেট। একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ। নিজের মতে অন্যকে চালিয়ে ছাড়বে, তার সেটা ভাল লাগুক আর না লাগুক। ওদিকে বুড়োর মেমসায়েব নাতনী ত রেগে ফায়ার হয়ে আছে। কিন্তু দাদুর হুকুম মানতেই হচ্ছে। ছোট থেকেই ত নাকি বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। সাত দিন পরেই ত পাকা দেখা। এঁদের প্রথামত হবুবরও ত কাসল বাড়ীতে হাজির। কিন্তু আজ যা একখানা নমুনা দেখলাম, তাতে বোধ হচ্ছে এই বিয়ে মোটেই সুখের হবে না।

এতক্ষণ মিহির চুপচাপ শুনছিল, এইবার একটু ফাঁক পেয়ে বলে, হ্যাঁ, আমার বাবার কাছেও নিমন্ত্রণ পত্র গেছে। দেখে এসেছি। তাঁর দেওয়ানী ছাড়ার মূলেও ত ঐ লক্ষ্মীছাড়া। থাক ভাই, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কি?

কাসল বাড়ীর সব ঘরগুলো ব্যবহার হয় না। সামনের দিক্‌টাই বলতে গেলে বেশীর ভাগ ব্যবহার হয়। লম্বা টানা বারান্দা আর তার কোল দিয়ে আর আর ঘর। প্রথমটা লাইব্রেরী ঘর। মল্লিকার দাদু সর্ব্বেশ্বর বাবুর সারাটা দিন বলতে গেলে সেই ঘরেই কাটে। তার পরের ঘরগুলো অফিস ঘর বা বাইরের ঘর বলা চলে। একেবারে শেষের ঘরটা চায়নিজ প্যাটার্ণের ফার্ণিচার দিয়ে সাজান। খাট, ঘড়ি, ড্রেসিং টেবিল, রাইটিং টেবিল সবই ঐ চায়নিজ ধরণের। মোটা মোটা ড্রাগনের পা দেওয়া খাট। যেন চারিদিক থেকে চারটে ড্রাগন খাটখানাকে ধরে আছে। ড্রেসিং টেবিলটাও একটু অদ্ভুত ধরণের। যদিও বেশ বড় মনে হয় কিন্তু আসলে খুব হালকা। আর সবচেয়ে অদ্ভুত ঘড়িটা। চায়নার লাফিং-গডের মত গড়ন। যেন মনে হয় মস্ত বড় একটা লাফিং গড তার ভূঁড়ি নিয়ে দেয়ালের ঐ কোণটায় বসে আছে। তার মুখটা হ'ল ঘড়ি। হাসির চোটে হাঁ-করা মুখটার ভেতর জিভের মত পেণ্ডুলামটা দুলছে। আর প্রতি সেকেণ্ডে চোখটা এদিক্ থেকে ওদিক্ যাচ্ছে। বিরাট্ কপালের ওপর কাঁটা দুটো। ঘড়িটার সামনেই ড্রেসিং টেবিল। যে ড্রেস করবে তাকে ঘড়ির দিকে পেছন ফিরে বসতে হবে।

হবুজামাই সম্বলপুরের রাজকুমার শ্রীবিলাস এখন এই কাসল বাড়ীর অতিথি। তাই মল্লিকার ইচ্ছাক্রমে বাড়ীর মধ্যে সেরা ঘর এই চায়না রুমে তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মল্লিকার ঘর হ'ল আবার এর পরেরটাই। আসলে এই ঘরদুটো ছিল মল্লিকার বাবা আর মার। ওর বাবা চায়না থেকে এইসব জিনিষ আনিয়ে ঘর সাজিয়েছিলেন।

শ্রীবিলাস লোকটা যে খুব খারাপ তা কিন্তু নয়। তবে স্পষ্ট বক্তা। সে যেটা পছন্দ করে না সেটা একেবারে মুখের ওপর বলে দেয়। ঠিক এই জন্যই মল্লিকা ওকে দেখতে পারে না। তাছাড়া একটা কারণ, ও চেয়েছিল ঐ দেওয়ান কাকার ছেলে, মিহিরকে বিয়ে করতে। কিন্তু দাদু তাতে রাজী নন। কারণ তার নাকি বংশগৌরব নেই। যদিও মিহিরের বাবা তাঁর আবাল্যবন্ধু, এবং পরে এই বাড়ীর দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু কি হবে ঐ বংশগৌরব দিয়ে? আসলে যেটা গৌরবের বস্তু হ'ল পুরুষের, মিহিরের তা সবই আছে। কর্ম্মক্ষমতা, বুদ্ধি—সবার ওপর অমন স্মার্ট চেহারা। কিন্তু তা হবে না, যদি বিয়েই করবে তবে এই কংস রাজার বংশধরকেই করতে হবে। আর কাউকে নয়।

রাত্রে খাবার টেবিলে সবাই খেতে বসেছে। মানে দাদু, দিদিমা, মল্লিকা আর শ্রীবিলাস। মল্লিকা বড় তাড়াতাড়ি খায়। খানিকক্ষণ ওর খাওয়া দেখার পর, হঠাৎ একটু রুক্ষস্বরে শ্রীবিলাস বলে, ছিঃ, মল্লিকা, অত তাড়াতাড়ি খেও না, মেয়েদের অত তাড়াতাড়ি খেলে মানায় না। মল্লিকা মাথা তোলে না, খাবার স্পিড্ও কমায় না। যেমন খাচ্ছিল তেমনি খেয়ে যায়। এবার শ্রীবিলাস তার দাদুকে বলে, আপনার নাতনীটি কিন্তু বড় একগুঁয়ে, ওকে শোধরাতে সময় লাগবে। দেখুন না, আমি ওকে ঐ ছোটলোকটার দোকানে যেতে বারণ করেছিলাম, তবুও সেখানে গিয়েছিল। ত্রস্ত হয়ে দাদু বলেন, মল্লিকা তো কক্ষণো ঐ দোকানে যায় না। তবে আজ কেন গেল? ছিঃ, মল্লিদিদি, তুমি ত এমন নও। সকলে তোমার কত সুখ্যাতি করে; আর সেই মেয়ে তুমি কি না আজ এই-রকম নিন্দে কিনছ? এতে যে আমারি লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে ভাই। মল্লিকা কোন উত্তর দেয় না, শুধু একবার শ্রীবিলাসের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে চলে যায়। দিদিমাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যান।

আড়ালে গিয়ে নাতনীকে বোঝান, কেন অমন করছিস দিদি? যখন একসঙ্গে ঘর করতে হবে তখন মেনে না নিয়ে উপায়ই বা কি বল? এবার ঝঙ্কার দিয়ে মল্লিকা বলে, এই যখন তোমাদের মনে ছিল তখন গৌরী দান কর নি কেন? তখন ত আর আমার কোন স্বাধীন মত তৈরী হত না? যা বলতে তাই মেনে নিতাম। দুমদুম করে ওপরে চলে যায় নিজের ঘরে।

পাশের ঘরের সামনে পায়চারি করছে শ্রীবিলাস, শুনতে পায় মল্লিকা। দুটো ঘরের মাঝখানের দেওয়ালটা কাঠের। মল্লিকার বাবা সখ করে চায়নিজ পেন্টিং আর উডওয়ার্কে ভরে দিয়েছিলেন ঘর দুটো, এবার নিঃশব্দ হয়ে যায় শ্রীবিলাসের ঘর। মনে হয় ঘুমিয়েছে।

তখন রাত কত জানে না শ্রীবিলাস হঠাৎ ঘুমটা, ভাঙ্গতেই নিজেকে যেন কেমন উল্টো উল্টো বলে মনে হল। মনে হ'ল সে যেন খাটের উল্টো দিকে মাথা করে শুয়েছে। ড্রেসিং টেবিলটা ত মাথার কাছে ছিল, ওটা পায়ের দিকে কি করে গেল? স্বপ্ন দেখছে নাকি? এবার ঐ লাফিং গড ঘড়িটার পেটের মধ্যে একটা খল খল শব্দ উঠল। আর বিকট জোরে রাত তিনটে বাজল। ওটার বাজার আগে ওরকম শব্দও হয়, আর কেমন যেন একটা অযান্ত্রিক শব্দ করে বাজেও ঘড়িটা। এই দুদিনেও কিন্তু এতে অভ্যস্ত হতে পারে নি শ্রীবিলাস। তাই দারুণ চমকে ওঠে। ভয়ের ভাবটা কাটাতে এবার টেবিল ল্যাম্পটা জালিয়েই শোয় শ্রীবিলাস। ঘুমোবার চেষ্টা দেখে।

খানিক বাদে ঐ ঘড়ির চারটে বাজার শব্দে আবারও উঠে বসে আর আশ্চর্য হয়ে দেখে জলন্ত টেবিল ল্যাম্পটা তার খাটের পাশ থেকে পায়ের দিকে চলে গেছে। দারুণ আতঙ্কে এবার আর তার ঘুম আসে না। সে উঠে গিয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে সুরু করে। ঘণ্টাখানেক বাদে প্রায় পাঁচটা নাগাদ নিজের ঘরে এসে দেখে কোথায় কি? টেবিল ল্যাম্প যেমন পাশের দিকে জলছিল তেমনি জলছে আর ড্রেসিং টেবিলটাও যথাস্থানেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ও ত ঘরের সামনেই পায়চারি করছিল। ঘরে ত কেউ ঢোকে নি? এবার খাটের তলা, ড্রেসিং টেবিলের পেছন সব ও ভাল করে খোঁজে। নাঃ, কোথাও কিচ্ছু নেই। নাঃ, ঘরটাই বিশ্রী। প্রথম থেকেই এই ঘরটা তার ভাল লাগে নি। কেমন যেন ভূতুড়ে ভূতুড়ে দেখতে ঘরটা। মল্লিকার বাবার রুচিকে সে মোটেই প্রশংসা করতে পারে না। মনে মনে ভাবে, একবার ঐ ধিঙ্গি মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলতে পারলে হয়, তখন এই সব দেব নিলামে বেচে। আসলে অনেক টাকা আছে মেয়েটার। সেই জন্যই বিয়ে করছে। না হলে সাধ করে আর অমন মেয়েকে গলায় তুলত কে? কালই বুড়োর কাছ থেকে একটা মোটা রকমের টাকা বাগাতে হবে, বিয়ের খরচ বাবদ। এদের যখন তাই নিয়ম তখন দেবে না কেন টাকা? আবার একটু শুয়ে পড়ে।

সকালে চায়ের টেবিলে চা খেতে ব'সে শ্রীবিলাসের দুজন নতুন অতিথির সঙ্গে পরিচয় হয়। একজন এবাড়ীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান আর দ্বিতীয়জন তাঁরই কন্যা রত্না। এই দেওয়ানটিকে শ্রীবিলাস কোনদিনই সহ্য করতে পারত না। কারণ ঐ বুড়ো দাদু সর্ব্বেশ্বর ঐ দেওয়ানের কথায় উঠত বসত। আর দুজনের ছিল অগাধ বন্ধুত্ব। এখন আবার তার আবির্ভাবে মোটেই খুশী হ'ল না শ্রীবিলাস।

দুই বন্ধু কথোপকথনে ব্যস্ত। সর্ব্বেশ্বর বলছেন, কি হে শিবপদ, তোমার বয়েসটা যেন কমে গেছে মনে হচ্ছে? বেশ তাড়াতাড়ি কাটলেটটা কায়দায় এনে ফেললে ত? দাঁতের জোর বেড়েছে নাকি? হেঁ হেঁ করে হেসে শিবপদ বলেন, সম্প্রতি বাঁধিয়েছি যে ভায়া।

রত্না একবার তার বাবার দিকে আর একবার সর্ব্বেশ্বর বাবুর দিকে চেয়ে দেখে হাসতে হাসতে বলে, জানেন জ্যাঠা-বাবু, বাবার যত বয়েস বাড়ছে তত ছেলেমানুষি বাড়ছে। এমন ছটফটে হয়েছেন আজকাল, যে চুপ করে এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসতেই পারেন না। আর খালি খাই খাই করবেন। এদিকে পেটে সহ্য হয় না। চল বাবা, এবার ওঠ, তোমার কবিরাজী ওষুধটা খাবার সময় হ'ল। থাক, ডিমটা আর খেও না, আবার হজমের কষ্ট হবে। বাড়ান হাতটা টেনে নিয়ে শিবপদ আবার হেঁ হেঁ করে হাসতে থাকেন। সর্ব্বেশ্বর বলেন, শিবু ঠিক তেমনিই আছে। মাঝখানে বৈষয়িক ব্যাপারের বাধাটা আর না থাকায় দুজনের বন্ধুত্বটা আবার অকৃত্রিম হয়ে উঠেছে। সকালে আর খাবার টেবিলে কোন অসন্তোষের সৃষ্টি হয় না। শুধু একবার শ্রীবিলাস মল্লিকাকে বলেছিল, আজ বিকালে তোমার ঘোড়ায় চড়ার নমুনাটা দেখতে চাই। আমার জন্যও একটা ঘোড়া তৈরী রাখতে বোলো তোমার সহিসকে। কোন উত্তর না দিয়ে মল্লিকা একটু মুখ টিপে হেসেছিল। সেটা শ্রীবিলাসের নজরে পড়ে নি এই রক্ষে। এইবার চায়ের টেবিল থেকে বাকি সবাই উঠে চলে গেল, শুধু রইলেন সর্ব্বেশ্বরবাবু আর শ্রীবিলাস। সুবিধেই হয় শ্রীবিলাসের, সে এই ফাঁকে বলে, এবার আমার যৌতুকের টাকাটা যদি দিয়ে দেন বড়ই উপকার হয়; এই সাত দিন এখানে বসে থাকার দরুন আমার কারবারে বড় লোকসান হয়ে যাচ্ছে। দাদু বলেন, হ্যাঁ,হ্যাঁ, বটেই ত, চল আমার লাইব্রেরী ঘরে চল, চেকটা দিয়ে দিই।

চেকটা নিয়ে প্রফুল্লমনে নিজের ঘরে আসে শ্রীবিলাস। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে বারবার উল্টেপাল্টে দেখে

বিনা অঙ্কের চেক। তার ইচ্ছেমত অঙ্ক বসিয়ে নিতে বলেছে বুড়োটা। কত সংখ্যা লিখবে সে? প্রথমে কি লিখবে? ১, ২, ৪, ৮ না ১০? পরে কটা শূন্য বসাবে? ১০,০০০ দশ হাজার? না কি ১০,০০০০০ দশলাখ না আরও? ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা ঘুরে ওঠে। তার এই আনন্দ বিহ্বল অবস্থা পাছে কেউ দেখে তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। ফিরে এবার সংখ্যাটা বসাতে গিয়ে আর চেকটা খুঁজে পায় না। এ কি কাণ্ড? এই ত এইমাত্র ড্রেসিং টেবিলের ওপর ছিল চেকটা! কোথায় উড়ে পড়ে গেল নাকি? সারাঘর আঁতিপাতি করে খুঁজতে লাগল, এমন সময় আবার বিকট শব্দ করে লাফিং গড ঘড়িটা বেজে উঠল। আঁতকে উঠল যেন শ্রীবিলাস। মনে ভাবল, না! এঘরে আর সে থাকবে না। আর কিছুর জন্য না হোক অন্ততঃ এই বিদ্ঘুটে ঘড়িটার জন্যই ঘরটা বদলাতে হবে তাকে। কিন্তু এখন এই চেকটা কোথায় উধাও হয়ে গেলরে বাবা? হারিয়ে গেছে একথা বললে কেইবা বিশ্বাস করবে? মনে করবে তার আবও টাকা চাই তাই এই ফন্দি বার করেছে। যাক, এখন চানটা ত সেরে আসি। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে আর একবার খুঁজব চেকটা। ঘড়িটার দিকে তাকালেই তার রাগ ধরে তবু চেয়ে দেখল দশটা বেজে পনের মিনিট হয়েছে। আর পনের মিনিট পরেই ঐ হাঁ-করা মুখটার ভেতর থেকে একটা কান-ফাটা ভেঁপুর মত শব্দ হবে।

চান করতে গেল শ্রীবিলাস। বাথরুমে গিয়ে ভাবল, নাঃ সে সত্যি কথাই বলবে বুড়োকে, তাতে সে যাই মনে করুক। কিন্তু আশ্চর্য্য, ঘর থেকে কি উড়ে গেল নাকি চেকটা? চান করে চুল আঁচড়াতে আয়নার সামনে যেতেই আঁতকে উঠল শ্রীবিলাস। একি ব্যাপার রে বাবা! চেক তো যেখানকার সেখানেই রয়েছে। আবার অঙ্ক বসান ৫,০০১ পাঁচ হাজার এক টাকা, কই সে নিজে অঙ্ক বসিয়েছে বলে ত মনে পড়ছে না? নাকি ভাবতে ভাবতে সে নিজেই বসিয়েছে অঙ্কটা? কিন্তু এত কম ত সে ভাবে নি? আরও অনেক বেশী ভেবেছিল যেন। বিকট শব্দ ওঠে পোঁ··· ···ও। ধুত্তোর নিকুচি করেছে ঘড়ির। ঢের ঢের ঘড়ি দেখেছি এমন ত কোথাও দেখি নি। আর চিন্তা করা হয় না। ঐ চেকটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভাঙ্গাতে। কে জানে যদি আবার এটাও হারায়।

বিকেল বেলা দুজনের জন্য দুটো ঘোড়া তৈরী। মল্লিকা ব্রিচেস পরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া দুটো অশান্ত ভাবে পা ঠুকছে। বড় দেরি করছে শ্রীবিলাস। হল কি ওর? খোঁজ নিতে পাঠায় মল্লিকা।

রাগের চোটে শ্রীবিলাস প্রায় তোতলা হবার জোগাড়, হঠাৎ ঝড়ের বেগে উপস্থিত হয়ে বলে, তোমার দাদু কোথায় বলতে পার মল্লিকা? চাকরদের যাকেই জিজ্ঞেস করছি বলছে, তিনি লাইব্রেরী ঘরে আছেন। অথচ আমি ত কমপক্ষে বার দশেক গিয়েও তাঁকে দেখতে পেলাম না? তোমাদের বাড়ীর এই চাকরগুলো সব একের নম্বর হারামজাদা। কি ভেবেছে আমাকে? মস্করা করছে নাকি আমার সঙ্গে? মল্লিকাও যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে, সে কি, আমি ত এই মাত্র দাদুকে দুধ খাইয়ে এলাম। ঐ ঘরেই তো আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন। এবার শ্রীবিলাস আরও বিরক্ত হয়ে বলে, জানো মল্লিকা, তোমাদের এই কাসল বাড়ীতে ভূত আছে। এটা ভুতুড়ে বাড়ী। মল্লিকা ভয়ানক অবাক্ হয়ে বলে, সে কি! আচ্ছা দাঁড়ান, আমি দেখছি দাদু গেলেন কোথায়? ছুটে ওপরে গিয়ে লাইব্রেরী ঘরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকে শ্রীবিলাসকে। ও ঘরে ঢুকতেই দাদু আরাম-কেদারায় উঠে বসে বলেন, কি ভায়া, এরই মধ্যে তোমাদের ঘোড়দৌড় হয়ে গেল? মল্লিকা বলে, তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় দাদু? ইনি তোমাকে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছেন। দাদু ত আকাশ থেকে পড়েন। বলেন, সে কি, দিদি! আমি ত সেই বিকেল থেকে এখানে বসে আছি। শ্রীবিলাসের মুখের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। সে আর কোন কথা না বলে নীচেয় আসে ঘোড়ায় চড়বার জন্য। এই একটা বিদ্যায় সে সত্যিই পারদর্শী। আর সেজন্য তার মনে একটা অহঙ্কারও আছে। তার লম্বা পাতলা চোখা চেহারায় ঐ চোকা পোশাকে ঘোড়ার ওপরে মানিয়েও ছিল ভাল। দুজনে একসঙ্গে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে রওনা দিল।

নিমেষের মধ্যে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়া দুটো। সূর্য্য তখন আবীর মেখেছে। সন্ধ্যে নেমে আসছে। বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা জলা মতন আছে, সেখানে পৌঁছে শ্রীবিলাসের কালো ঘোড়াটা যেন আর কিছুতেই এগুতে চায় না। কি যেন দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে। পিছিয়ে পড়ল সে।' ওদিকে মল্লিকার সাদা ঘোড়াটা তার

পাশ কাটিয়ে ধূলো উড়িয়ে তীরবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। কই, ওর ঘোড়াটা ত ভয় পেল না? বাধ্য হয়ে ফিরে এল শ্রীবিলাস। মল্লিকা জিতে যাওয়াতে মনটা তার বড়ই বিমর্ষ। স্ত্রী যদি সবেতেই স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় তবে তাতে সত্যিই কি আর স্বামী খুশী হয়? তার ওপর ঐ দাদু বিভ্রাটা। কেন যেন হঠাৎই তার মনে হয় সে নিজেই সুস্থ নেই। মানে তার ব্রেনটা ঠিক মত কাজ করছে না। না হলে সবাই দাদুকে দেখতে পাচ্ছে আর সেই পাচ্ছে না? আবার মল্লিকা যাওয়াতেই দেখতে পেল। আর তার ঘরে ত হামেশাই এরকম হচ্ছে। রাত্রে যা দেখে ভয় পেল, সেই ড্রেসিং টেবিল, টেবিল ল্যাম্প সব উল্টো দিকে, আবার সকাল না হতেই দেখল সব যেমনকার তেমনি ঠিক আছে। কিছুই ওলট-পালট হয় নি। আর তাছাড়া চেকের ব্যাপারটাই বা কি হ'ল? এবার তার নিজের ওপরেই কি রকম সন্দেহ জাগে।

খাওয়া দাওয়ার পর শুয়েছে শ্রীবিলাস। হঠাৎ পাশের ঘরের কথাবার্তা তার কানে আসে। রত্না আর মল্লিকা দুজনে কথা বলছে। কান পেতে শোনে শ্রীবিলাস।

মল্লিকা—আজ ঘোড়দৌড়টা বেশ মজার হয়েছে জানিস রত্না? ভদ্রলোক বেশ ভাল রাইডিং জানেন।

বেশ একটু গর্ব্ব হয় শ্রীবিলাসের। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পরের কথাগুলো শুনতে পায় না। আবার স্পষ্ট শোনে।

রত্না—তোর সেই গয়নাগুলো কি হ'ল? সেই হীরের সেটটা? ব্যাঙ্ক থেকে না আনালে আশীর্ব্বাদের দিন পরবি কি করে? তোদের ত আবার বিয়ের থেকে আশীর্ব্বাদে ঘটা হয় বেশী।

মল্লিকা—হ্যাঁ, দাদু আবার ব্যাঙ্কে রাখবে, তবেই হয়েছে। ঐ চায়না রুমের নীচের ঘরটা তয়খানা, ওখানেই থাকে সব।

রত্না—সে কি রে? যদি চুরি যায়? তাছাড় ওঘরটায় যাবার রাস্তাই বা কোথায়? ওখানে যে একটা ঘর আছে তাই ত বোঝা যায় না।

মল্লিকা—আছে রে বাবা আছে রাস্তা। না হলে আমরা ঢুকি কোথা দিয়ে? ঐ খাবার টেবিলটার নীচে মেঝেটা ফাঁপা। ওখানে ঐ গালচের তলায় একটা ছোট দরজা আছে। সেটা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেই নীচে তয়খানা।

এরপর আর কি কথাবার্তা হ'ল শোনা গেল না।

কিন্তু শ্রীবিলাসের ঘুম মাথায় উঠল। সে তখন ভাবছে, আজকালকার দিনে ঐ ভাবে কি কেউ সোনাদানা হীরে-মুক্তো রাখে? আচ্ছা বুদ্ধি ত বুড়োর? না হ'লে অমনধারা উইলই কি কেউ করে নাকি? "যে ওঁর নাতনীকে বিয়ে করবে তাকে এই কাসল বাড়ীতে বাস করতে হবে। আবার এবাড়ী ভাঙ্গা বা বিক্রী করা চলবে না। এবং পুরনো চাকরদের ছাড়াতে পারবে না।" ঐ একগুষ্টি চাকর পুষতে হবে। ঐ বেটা চাকরগুলো মোটেই ভাল না। একের নম্বরের আলসে। গোটাকতক ফার্ণিচারের ওপর ঝাড়ন বুলিয়েই পুরো মাইনে আদায় করবে। মুখে ত খুব জামাই-রাজা, জামাইরাজা করে। কিন্তু একটা চাকরও সহবৎ জানে না। চাবুক লাগালে তবে সোজা থাকে ছোট-লোকগুলো। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন তেতে ওঠে শ্রীবিলাসের। তাই মাথার দিকের জানলাটা খুলে দেবে মনে করে ওঠে। জানলাটা খুলে দিয়ে এবার ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে ভীষণ শীত করায় উঠে বসে। দেখে তার খুলে দেওয়া জানলাটা ভেতর থেকে ছিট্‌কিনি এঁটে বন্ধ করা আর পাখাটা ফুলফোর্সে মাথার ওপর ঘুরছে। আশ্চর্য্য হয়ে তখন ও মনে করার চেষ্টা করে, সে-ই কি জানলা খুলে পাখা চালিয়েছিল, না পাখা না চালিয়ে জানলা খুলেছিল? শেষেরটাই ত ঠিক মনে হচ্ছে, তবে?

এমন সময় শোনে নীচের তয়খানার মধ্যেই ভীষণ ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ শব্দ উঠছে। এই রে তবে নিশ্চয়ই তয়খানাতে কেউ ঢুকেছে। অত জোরে জোরে মল্লিকা কথা বলছিল রত্নার সঙ্গে, নিশ্চয় ব্যাটা চাকরগুলো শুনে নিয়েছে। আর রাতের অবসরে গিয়ে ঢুকেছে ওখানে। হায় হায়, সব মূল্যবান্ জিনিষগুলোই যদি চোরে লুটে নেয় তবে থামকা আর সে ঐ ধিঙ্গি মেয়েটাকে বিয়ে করতে যায় কেন?

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা পর্দ্দার ষ্ট্যাণ্ড নিয়েই রওনা দেয় নীচে, খাবার ঘরে। খাবার টেবিলের তলাটা হাতড়ে দেখে, সত্যিই সেখানে একটা কাঠের দরজা রয়েছে। টান দিয়ে খুলতেই একটা ভ্যাপসা

গন্ধ-বেরোল তার মধ্যে থেকে। তবু চোখ-কান বুজে হাতড়ে হাতড়ে নামতে লাগল নীচে। একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে যেন নীচে। এবার হঠাৎই হুড়মুড় করে পা ফসকে একেবারে নীচে পড়ে গেল। তারপর কে যেন তাকে খুব কষে ঠেঙিয়ে দিল। আর বলল, ওঃ, বড্ড সাধ হয়েছে এবাড়ীর জামাই সাজার, তাই না? আর না পাকতেই এক কাঁদি, তাই না? নিজের জিনিষ না হতেই টাকার ভাবনায় আর ঘুম হচ্ছে না, তাই না? তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেখল, নিজের বিছানাতেই বহাল তবিয়তে শুয়ে রয়েছে। আর মাথার কাছের জানলাটা খোলা। ভোরের আলো আসছে জানলা দিয়ে। আশ্চর্য, জানলাটা ত সে খোলে নি, তবে? আর কাল রাত্রে কি তবে সে নীচের তয়খানায় যায় নি? তবে কি সেটা স্বপ্ন? নাঃ, তা হ'লে গায়ে এত ব্যথাই বা হ'ল কি করে? এবার তাড়াতাড়ি উঠে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে একবার নীচে খাবার ঘরে যায় আর মনে ভাবে, প্রত্যেক কথার শেষে 'তাই না' বলে কে? এবার খাবার টেবিলের তলা থেকে গালচে সরিয়ে দেখে মোটেই সেখানে কোন কাঠের দরজা নেই। সে জায়গাটা অন্যখানের মত লাল রং-এর সিমেন্ট-করা মেঝে। উত্তরোত্তর বিস্ময়ে সে আবারও নিজেরই বোধশক্তির ওপর আস্থা হারাতে থাকে।

ওপরে আসবার সময় তার চোখ পড়ে ম্যাগাজিন রুমে। দেখে সার সার অনেক রকমের বন্দুক পিস্তল সাজানো রয়েছে। একটা চাকর সেগুলোকে তেল দিচ্ছে আর একটা চাকর নলের মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে পুঁছছে। ও বলে, দেখি ঐ বার বোরের বন্দুকটা? এমন সময় পেছনে দেওয়ান শিবপদ এসে দাঁড়িয়ে বলে, কি বাবা বিলাস, বন্দুক দেখে হাত নিস্‌পিস্‌ করছে নাকি? শিকারের সখ আছে বুঝি? শ্রীবিলাস এবার কটমট ক'রে তার দিকে তাকিয়ে বলে, আপাততঃ শিকারে যাবার ইচ্ছে নেই, কারণ উপস্থিত আপনাদেরই শিকার হয়ে রয়েছি। তবে হাঁা, নিশানটা একটু ঝালিয়ে নিতে পারলে ভাল হ'ত। শিবপদ বলেন, বেশ তা চল না, বাগানে যাওয়া যাক। দাঁড়াও এক মিনিট, আমিও আমার বন্দুকটা নিয়ে আসি। বৃদ্ধের ক্ষিপ্রগতি শ্রীবিলাসকে একটু বিস্মিতই করে।

দুজনে বাগানে এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। একজন বৃদ্ধ, অপরজন যুবক। দুজনেরই টারগেট হ'ল বটগাছের ঝুরির ধারে বসা একজোড়া ঘুঘু। বন্দুক ছুটল, দুটো ঘুঘুই পড়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন একটি মেয়েছেলে করুণ আর্ত্তনাদ করে উঠে ধপাস ক'রে পড়ে গেল। শ্রীবিলাস চমকে উঠে বলল, ওকি হ'ল? যেন কোন মেয়েছেলের গায়ে গুলী লেগেছে মনে হ'ল? দৌড়ে গেল বটগাছটার দিকে। নাঃ, কোথাও কিছু নেই, শুধু দুটো মরা ঘুঘু পড়ে আছে। ফিরে এসে দেওয়ানকে জিজ্ঞেস করতে তিনি অবাক্ হয়ে বললেন, কই, পড়ে যাবার শব্দ বা চীৎকার আমি ত কিছুই শুনি নি। এমন সময় মল্লিকা ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার? হঠাৎ সকাল বেলা এত বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি কেন? তাকেও জিজ্ঞেস করল শ্রীবিলাস, সেও বলল কিছুই শোনেনি। অথচ সে ঐ বাগানের দিকের ঘরেই বসে সেতারে সুর তুলছিল। মল্লিকা আবার বলল, যে জখম হয়েছে সে পড়েই যদি গেল, ত তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় গেল সে? সত্যিই ত এই পরিষ্কার দিনের আলোয় তাদের চোখের সামনে দিয়ে ত আর একটা জখমি মানুষ উধাও হয়ে যেতে পারে না? এবার তার মনে হয় যে, সত্যিই তার মাথাটা ঠিক নেই। কিছুদিন আগে তার যখন টাইফয়েড হয়েছিল তখন ডাক্তাররা বলেছিলেন, কোন একটা অঙ্গহানি হবে, তবে কি মাথাটাই তার বিগড়ে গেল? না হ'লে এমন ভাবে সবকিছু উল্টোপাল্টা হচ্ছে কেন? আজই আবার আশীর্ব্বাদ। ভোর থেকেই তোড়জোড় হচ্ছে। কাসলের গেটের মাথায় নহবত বসেছে।

শ্রীবিলাস চান করতে যাবার আগে যা যা পরবে সব, মানে গরদের পাঞ্জাবী, চাকরের দিয়ে-যাওয়া নতুন কোঁচান ধুতি, সব খাটের ওপর গুছিয়ে বের ক'রে রাখল। দিদিমা এসে আবার জামাইকে এক সেট হীরের বোতাম আর একটা হীরের আংটি দিয়ে গেলেন। বললেন, অনেক গণ্যমান্য অতিথি আসবে ভাই, এইসব পরে বেশ সেজেগুজে তৈরী থাক, সময় হলেই ডেকে পাঠাব। এবার সে নিজে যেটি কনেকে দেবে, তার মায়ের গলার হার, সেইটি বের করে কেসশুদ্ধ ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল।

এবার চান করতে গেল। চান করতে করতে শুনতে পেল লাফিংগড্ ঘড়িটায় ঢং ঢং করে নটা বাজল। চান সেরে বেরিয়ে এসে দেখল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের ওপর রাখা

হারের কেসে হারটা নেই। আশ্চর্য্য, অথচ দরজাটা ত ভেতর থেকে ছিট্‌কিনি লাগান। নাঃ, তার আবার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হীরের বোতাম আর আংটিটা ঠিক আছে তো? দেখতে গিয়ে দেখে, গলার বোতামটা, যা তার বেশ মনে আছে, কেস থেকে বারই করে নি, সেটা কি ক'রে বা পাঞ্জাবীর বোতাম ঘরে বেমালুম ঢুকে পড়েছে, আর আংটির কেসে অবশ্য আংটিটা ঠিকই রয়েছে। তাড়াতাড়ি ক'রে সেটা বার ক'রে এবার আঙুলে পড়ল আর পাঞ্জাবীটা গায় গলিয়ে নিলে। কে জানে বাবা, আবার এগুলোও যদি গায়েব হয়ে যায়? কিন্তু হারটা কোথায় গেল? আলমারিতে তোলেনি ত ভুল ক'রে? বা বাথরুমে নিয়ে যায় নি ত? গেল আবার বাথরুমে। নাঃ, নেই। ফিরে এসে দেখে হার ত কেসের মধ্যে ঠিকই রয়েছে। অথচ এক্ষুণি কিন্তু ছিল না। কে এমন করছে? কিন্তু ঘরেও ত কেউ আসে নি? কোথা দিয়েই বা আসবে? মাছি ত আর নয় যে জানলা গলে আসবে? তবে কি সে-ই ভুল দেখছে? তারই কি মাথাটা ঠিক নেই? নাঃ, এই অবস্থায় বিয়ে ক'রে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়ার চাইতে, যা পাওয়া গেছে, ঐ পাঁচ হাজার টাকা আর এই হীরের বোতাম আর আংটি এই সব নিয়ে কেটে পড়াই মঙ্গল। নিঃশব্দে স্যুটকেশটি গুছিয়ে নিয়ে বাথরুমের ভেতর দিয়ে পেছনের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় শ্রীবিলাস। এমন সময় বিকট শব্দে ঘড়িটায় সাড়ে নটা বাজে। শেষবারের মত অলক্ষুণে ঘড়িটাকে গালাগাল দিয়ে রওনা দেয় ও। সামনের দরজা বন্ধই রইল।

বড় বড় গাড়ি ক'রে অনেক বড়লোক আত্মীয় স্বজনেরা এসেছেন। বাড়ী ভ'রে গেছে লোকে। শুভ সময় সমাগত। মল্লিকার দাদু সর্ব্বেশ্বরবাবু সমানে চেঁচামেচি করছেন আর ছুটোছুটি করছেন। আসলে মানুষটা ভীষণ ব্যস্তবাগীশ। একবার বলেন, তাড়াতাড়ি মল্লিকা আর শ্রীবিলাসকে ডাকো, পুরুতমশাই বলছেন। লাইব্রেরী ঘরের পাশের ঘরে মস্তবড় ফরাস পাতা হয়েছে। মাঝখানে বর-কন্যার আসন। ডেকরেটর এসেছে কলকাতা থেকে। তারা সুন্দর করে ফুলের তোড়া আর মালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে ঘরখানা। সমস্ত কাসল বাড়ীটারই যেন রূপ পাল্টে গেছে। অতিথিদের দেওয়া সব মূল্যবান্ উপহারও সেই ঘরের এক-ধারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরখানি যেন ফুলের সাজ পরে হাসছে।

মল্লিকাকে নিয়ে রত্না ঘরে ঢুকল। চমৎকার দেখাচ্ছে মল্লিকাকে। সাদা জমির ওপর রূপোলি জরীর বুটিতোলা বেনারসী আর সাদা ফুল আর মুক্তোর গয়নায় যেন তাকে মনে হচ্ছে জীবন্ত সরস্বতী প্রতিমা। আর তার পাশে শ্যামবর্ণা ক্ষীণা সুন্দরী রত্নাকে লাল কাঞ্জিভরমে দেখাচ্ছে যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণটি। দিদিমা শাঁখ বাজালেন। কিন্তু বর কই? শ্রীবিলাস? সে কেন আসছে না এখনো?

এমন সময় দেওয়ান শিবপদ নামলেন একটা মোটর থেকে। তাঁকে দেখেই সর্ব্বেশ্বরবাবু বললেন, ওহে শিবপদ, তুমি আবার সকাল বেলা কোথায় গিয়েছিলে ভায়া যে, গাড়ি থেকে নামছ? ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শিবপদ অবাক্ হয়ে বলেন, যাব আবার কোথায়? মল্লিমার আশীর্ব্বাদ, আমি কি আর না এসে পারি? তাই পায়ের বাত নিয়েই শেষ পর্য্যন্ত সোজা মেটারে চলে এলাম কলকাতা থেকে। আমি এই এলাম, আর তুমি কিনা জিজ্ঞেস করছিলে কোথায় গিয়েছিলে? রসিকতা করার অভ্যাসটা তোমার তেমনিই আছে দেখছি।

পুরুতমশাই-এর তাড়ায় সর্ব্বেশ্বরের আর উত্তরটা দেওয়া হয়ে উঠল না। শ্রীবিলাসকে ডাকার জন্য লোক পাঠালেন। বলেন, ওরে ডাক তাকে, ভটচাজ বলছে আর মাত্তর পনের মিনিট আছে শুভলগ্ন।

আবার শিবপদ বলেন, কার কথা বলছ সর্ব্বেশ্বর? শ্রীবিলাসকে ত আমি দেখলাম একটা ট্যাক্সি করে আমার গাড়ির পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল সাঁ সাঁ করে।

অ্যাঁ—সে কি কথা? কোথায় গেল এমন সময়? তা হ'লে মল্লিদিদি ত মিথ্যে বলে নি, ছোকরার মাথাটা ত সত্যিই একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে? ওরে যা যা চায়না রুমে দেখ্ গিয়ে, কি ব্যাপার। ও গিন্নী শুনছ? সর্ব্বেশ্বর এবার চীৎকার করতে করতে অন্দরে গেলেন। এবং পরক্ষণেই সেই সভা ঘরে ঢুকে মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ মল্লিদিদি, তুমি কি কিছু জান? শ্রীবিলাস নাকি চ'লে গেছে? মল্লিকা মুখ হেঁট ক'রে বসেছিল, সলজ্জে মাথা নাড়ে, নাঃ, সে:কিছুই জানে না। তারপর উঠে ভেতরে চ'লে যায়। দিদিমা বলেন, সে কি কথা? এই ত সকাল বেলাই বাগানে দেওয়ানমশাই-এর সঙ্গে বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল। তারপর আমি গিয়ে তাকে হীরের বোতাম আংটি দিয়ে এলাম!

দেওয়ান শিবপদর ত চক্ষু ছানাবড়া। বলেন, সে কি কর্ত্তঠাকরুণ, আমি ত এই মাত্তর এলাম কলকাতা থেকে। আরও যেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর মেয়ে রত্না এসে তাঁর হাত ধ'রে টানতে টানতে বলে, বাবা! তুমি একটিবার ভেতরে চল, মল্লিকা তোমাকে ডাকছে।

ভেতরের একটা ছোট ঘরে নিয়ে যায় তাঁকে রত্না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ের ওপর একরাশ মল্লিকা ফুলের মত ভেঙ্গে পড়ে মল্লিকা। ছিঃ মা, আমার বুকে এস, পায় পড়ছ কেন? বলে তাকে সস্নেহে তুলে ধরেন শিবপদ। এবার মল্লিকা বলে, আগে বলুন আপনি রাগ করবেন না, আর আমাকে সাহায্য করবেন কথা দিন, তবে উঠব। আচ্ছা রে বেটি, নে কথা দিলাম, এখন চোখ পোঁছ ত। এই শুভ-দিনে কেউ চোখের জল ফেলে? বলে শিবপদ নিজেই রুমাল দিয়ে চোখ পোঁছান। ওদিকে বাইরে দাদুর গলা শোনা যায়, টেলিগ্রাম! কার আবার টেলিগ্রাম এল। আজই সব ঝঞ্ঝাট যেন একসঙ্গে সুরু হয়েছে। না হলে একটা শুভদিনে কেউ ঘুম থেকে উঠে বন্দুক ছোটায়? তারপর ছেলেটা ঘরে আছে না চলে গেছে বুঝতেও ত পারছি না— এরা ত বলছে ভেতর থেকে দোর বন্ধ, তবে! দেখি কার টেলিগ্রাম! আঁা, শ্রীবিলাসের! কি লিখেছে দেখি!

আপনার নাতনীকে আমি বিবাহ করিতে অপারগ, কারণ আমি সুস্থ নই।

শ্রীবিলাস।

ছিঃ ছিঃ, এই শেষ মুহূর্ত্তে কি না তার চৈতন্য উদয় হ'ল? এখন আমি কি করি, কোথায় উপযুক্ত পাত্তর পাই? আর আজ এই লগ্নে আশীর্ব্বাদ না হলে যে মেয়েটার একটা মস্ত ফাঁড়া আছে।

ওদিকে ঘরের মধ্যে দেওয়ান শিবপদ হাসি হাসি মুখে বলছেন, বেটি তোর দুষ্টু বুদ্ধি তো খুব আছে, ওকে একেবারে তাড়িয়ে ছাড়লি, অ্যাঁ? ওদিকে আবার দাদুর চিৎকার শোনা যায়, ওহে শিবপদ! তুমি আবার কোথায় ডুব মারলে? যদি এসেইছ ত একটা বিলিব্যবস্থা কর, আমারও যে মাথাটা খারাপ হবার জোগাড়। ও মল্লিকা! কোথায় গেলি তুই? এখন কি করি আমি?

ওদিকে ভেতর-বাড়ীতেও মেয়েমহলে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিরাট আলোচনা-সমালোচনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছেন, এমন সুন্দরী বৌ আর এত টাকা পেত, তা ছোঁড়ার সইল না। আবার তার সঙ্গে কেউ ফোড়ন কাটছেন, কে জানে, যা ধিঙ্গি মেয়ে, কি বা না কি বলেছে হয়ত ওকে, তাই পালিয়েছে।

এমন সময় সেখানে মিহির এসে দিদিমাকে প্রণাম ক'রে বলে, এই যে দিদিমা কেমন আছেন? বাবা অনেক ক'রে বলে এলেন আসতে, তাই ছুটি নিয়ে চলে এলাম। দিদিমা তার চিবুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে চুমু খেয়ে বলেন, বেশ করেছ বাবা বেশ করেছ। কিন্তু এদিকে যে আমার বড় বিপদ্ বাবা, একেবারে এই মোক্ষম সময় শ্রীবিলাস আমাদের বড় বিপদে ফেলে চ'লে গেছে। এখন তোমাদের দাদু বড়ই চিন্তায় পড়েছেন। অথচ এই লগ্নেই মেয়েটার আশীর্ব্বাদ হ'তেও হ'বে। মেয়েদের মধ্যে থেকেই যেন কেউ বলে ওঠেন, তা মিহিরকেই বসিয়ে দিন না। এমন সুপাত্র হাতের কাছে আর পাবেন কোথায়? তাছাড়া আপনাদের পাল্টি ঘরও ত। চমকে ওঠেন দিদিমা, তাইত বটে? কিন্তু মিহির আর তার বাবা শিবপদ কি রাজী হবেন? একবার এই বিয়ের কথা উঠতে যা অপমানিত হয়েছিলেন! কিন্তু উপায়ই বা কি? মিহিরকে বলেন, তুমি এখন বাইরে যেও না, এখানে বস। আমি এক্ষুণি আসছি।

বাইরে গিয়ে দাদুকে পাকড়াও ক'রে বলেন, বলি শুনছ? খালি ষাঁড়ের মত চেঁচালেই কি আর সব সমস্যা মিটে যাবে? ব'লে এবার গলাটা একটু নামিয়ে মিহিরের কথাটা পেশ করেন। আর কথাটা কি ভাবে বিনয় সহকারে শিবপদবাবুর কাছে তুলবেন তাও বুঝিয়ে বলেন।

শিবপদবাবু এই প্রস্তাবে প্রথমটা একটু আপত্তি করলেও পরে ছেলেটা যে এল না বলে আফশোষ করেন। বলেন, কি আর বলব ভায়া, আজ সাতদিন হল ছেলেটা বাড়ী ছাড়া। সাঁতারের রেস দিতে কলকাতার বাইরে গেছে। তাই ত আমিই চলে এলাম শেষ পর্য্যন্ত, অথচ পই পই করে ব্যাটাকে বলে দিয়েছিলাম যেন এই দিনটায় ফেরে। তা আজকালকার ছেলেরা কি আর বাপের কথা শোনে?

এবার দাদু বলেন, তোমারও দেখছি বাপু আমার মত রোগে ধরেছে। একবার মুখ খুললে আর বন্ধ হয় না। আরে বাপু মিহির এখানেই রয়েছে। এইমাত্র এসেছে।

শিবপদবাবু তখন বলেন, তবে আর কি ভায়া লাগিয়ে দাও আশীর্ব্বাদ।

আশীর্ব্বাদের পর চায়না রুমে জটলা বসেছে। মল্লিকা, রত্না আর শিবপদ আছেন, ঘরে আর কেউ নেই। শিবপদবাবু এই মা হারা মেয়ে মল্লিকাকে ছোট্ট থেকেই স্নেহ করেন। ওঁর স্ত্রীও ওকে বড় ভালবাসতেন। আজ তিনি থাকলে কত খুশী হতেন এই নতুন সম্পর্কে। তিনি থাকতেই ত কথা তুলেছিলেন। যাক আজ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল। মল্লিকা তাঁকে খাওয়াচ্ছে, আর কদিনের ঘটনা বলে যাচ্ছে। বলে আপনি ত জানেনই আমি কোনদিনই শ্রীবিলাসকে পছন্দ করতাম না। এখন দেখি সে আমাকে বিয়ে করবার জন্য নাছোড়বান্দা। অবশ্য বিয়েটা আমাকে নয়, আমার টাকাকে করতে চায়। তাই আমিও ইচ্ছে ক'রে তাকে এই ঘরটায় থাকতে দিলাম, এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিং গড ঘড়িটায় বারটা বাজল। আর তার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মিহির। সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল। আর শিবপদ বল্লেন, এই যে ব্যাটা, এই বুঝি তোর সাঁতারের কম্পিটিশন দেওয়া? তা বেশ বেশ, খাসা রুই-কাতলাশুদ্ধ শুদ্ধ ডাঙ্গায় উঠেছিস দেখছি। মা-হারা ছেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুর মতই। এবার রত্না বলে, জানো বাবা, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে তুমি আসতে পারবে না। তাই দাদা, তুমি সেজে বেশ থেকে গিয়েছিল। খালি যা খাবার সময়টা আমাকে সামলাতে হ'ত নাহলেই ধরা পড়ে যেত। বলে হেসে লুটোতে থাকে, সেই কাটলেট খাওয়ার কথা মনে করে।

এবার মিহির বলে, আমিও কি কম বিপদে পড়েছিলাম? টেলিগ্রামটা শ্রীবিলাসের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে পোষ্ট অফিস থেকে বেরুচ্ছি, দেখি, তোমার গাড়ি আসছে। শেষ পর্যন্ত কেষ্টর দোকানে ব'সে রইলাম। তখন দেখি গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার গেছে জিনিষের ফর্দ্দসমেত—তার মধ্যে আমার নামে চিঠি। রত্না লিখেছে,—'বাবাকে সব বলেছি, নিজের পোশাকে এসে সোজা অন্দরে চ'লে যেও দিদিমার কাছে।' তাই করলাম। এবার রত্না বলে শুধু কি তাই, তারপর আমিই ত রাঙাপিসীকে বলে এলাম তোমার কথাটা তুলতে।

শিবপদ বলেন, আচ্ছা সে ত নয় হ'ল, এখন শ্রীবিলাস পয়ে-আকার দিলে কি ক'রে সেটাই বল্ না তোরা? রত্না বলে, আহা, সেটা যেন ন আর বুঝছ না? ঐ যে দাদা যেখান দিয়ে বেরিয়ে এলো, মল্লিকা ওখান দিয়ে এসে যত সব উল্টো পাল্টা ক'রে আবার ওখান দিয়েই ফিরে যেত। ঘড়িটা বাজার কিছুক্ষণ আগে ওখান দিয়ে বেরুনো যায়। মাত্র পাঁচমিনিট সময় দেয় ঘড়িটা, তার মধ্যেই আবার ঢুকে পড়তে হয়। তারপর বাজে ঘড়িটা। তাই শ্রীবিলাস উল্টোপাল্টা দেখেই ঘড়ির আওয়াজে আঁৎকে উঠত। তা ছাড়া এই ডেসিং টেবিলটা দেখতেই যত বড় আর ভারী মনে হয়; আসলে ভীষণ হাল্কা আর তলায় লুকন রবারের চাকা আছে। অবার ঐ ঘড়ির ভেতরে সুইচ্ আছে, সেই সুইচ টিপে এই ঘরের প্রায় সব জিনিষই ইচ্ছেমত এখানে-ওখানে সরান যায়। ড্রেসিং টেবিলটা এমন ভাবেই বসান থাকে যাতে ঘড়ির ব্যাপারটা কিছুই না দেখা যায়। আর জানো বাবা, মল্লিকা এমন দুষ্টু, ওর দাদু শ্রীবিলাসকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিলেন, সেইটে পেয়ে ওর যা আনন্দ সে যদি দেখতে? কতটা অঙ্ক যে বসাবে ভেবেই পাচ্ছিল না। আমরা ঐ লাফিং গডের হাঁ-করা মুখটার ভেতর দিয়ে দেখছিলাম ওবর থেকে। মল্লি করল কি পেণ্ডুলামটা খুলে ঐখান দিয়ে হাত বাড়িয়ে চেকটা তুলে নিল। তখন ভদ্রলোক দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে চেকটা নেই। তখন যদি তুমি তার মুখের অবস্থাটা দেখতে বাবা! দুহাতে মাথার চুল ছিঁড়ছে, কপাল চাপ্ড়াচ্ছে আর পাগলের মত এদিক্-সেদিক্ খুঁজছে। তারপর আবার মল্লি ওর মধ্যে পাঁচহাজারের অঙ্ক বসিয়ে হাত বাড়িয়ে রেখে দিল চেকটা। তখন যেন হাতে স্বর্গ পেল ভদ্রলোক। ভীষণ ভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ও নিজেই অঙ্কটা লিখেছে বলে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না। পরে অবশ্য তাই নিয়েই চলে গেল ব্যাঙ্কে জমা দিতে।

এবার মল্লিকা বলে, জানেন, কাকাবাবু, সেদিন ত খুব বাবু ঠাট দেখিয়ে ঘোড়ার রেস লাগাতে সুরু করলেন, কিন্তু জলার ধারে গিয়ে যখন ঘোড়াটা আর এগুল না, এদিকে আমার হেলেন যখন ওকে পাশ কাটিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল তখন ওর বা অবস্থা হয়েছিল! শিবপদ বলেন, তার মানে? এগুল না কেন? এবার মল্লিকা মিহিরের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে। মিহির বলে, আমি যে আগে থেকেই

ঘোড়াকে ঐ জলার ধারে নিয়ে গিয়ে পায়ে আগুনের ছেঁকা দিয়েছিলাম। তাই আর ওটা এগুতে চায় নি। আবার ছেঁকা লাগবে ব'লে ভয় পাচ্ছিল।

রত্না এবার মল্লিকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, লাইব্রেরী ঘর থেকে দাদুকে কি করে গায়েব করলি সেটা কিন্তু আমিও বুঝতে পারলাম না। মল্লিকা হেসে বলে, দাদু আদপেই লাইব্রেরী ঘরে ছিল না। তয়খানায় গিয়েছিল দিদিমার সঙ্গে। চাকরদের বলা হয়েছিল লাইব্রেরী ঘরে আছেন। তাই তারা সবাই যা জানে তাই বলেছে শ্রীবিলাসকে, আর সে যতবার গেছে ওঁকে একবারও দেখতে না পেয়ে ক্ষেপে গেছে। আর তার পর তোমার ঐ ফ্যান্সি ড্রেসে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া দাদাটিকে জিজ্ঞেস কর না। রত্না বলে, আচ্ছা, এর মানে তবে দাদাই দাদু সেজেছিল? মিহির বলে, হ্যাঁ। তারপর কি মনে পড়তে হাসতে হাসতে বলে, জানিস রত্না, সব চাইতে লোকটা জব্দ হয়েছিল ফায়ার করার পর। তুই যা একখানা আর্ত্তনাদ ছেড়ে ধপাস ক'রে পড়ে গিয়ে বটগাছের ফোকরে লুকোলি, ও ত আর খুঁজেই পেল না কিছু। অথচ শব্দটা আর চেঁচানটা হয়েছিল যাকে বলে যুগপৎ। আমার দেওয়া ডাইরেক্শনের চেয়েও ভাল করেছিলি তুই। রত্না বলে, তোমার গাছের ছাল আঁকা ক্যানভাসটা আমি ভেতর থেকে চেপে ধরেছিলাম তাই বোঝেনি। হাওয়ায় ওটা উড়লেই হয়েছিল আর কি! মিহির বলে, ঠিক অমনি জব্দ হয়েছিল তয়খানার সিঁড়ি খুঁজতে গিয়ে। মারটার খেয়ে ঘুম ভাঙ্গল বাবুর নিজের বিছানায়। তারপর রাত্রের কথা মনে হতে খাবার টেবিলের নীচে সিঁড়ি খুঁজতে গিয়ে দেখে সিমেণ্ট করা। আমি আগের রাত্রে ঐ লাল প্লাষ্টিক স্ল্যাবটা সরিয়ে রেখেছিলাম, পর দিন ভোরেই বসিয়ে দিয়েছি। মোটে টের পায় নি। বুদ্ধিটা একেবারে লোহার মতই নিরেট। তা মল্লিকাকেও একেবারে ইস্পাত বানিয়ে ছাড়ত। মল্লিকা চোখের ইশারায় শিবপদকে দেখিয়ে দিয়ে বলে, থাক্, আর কাঙ্গালামো করতে হবে না, তবে হ্যাঁ, পরিত্রাণ পেয়েছি ঐ লৌহ-দানবের হাত থেকে।

এমন সময় দরজায় দুমদুম্ ধাক্কা পড়ে। দাদুর গলা শোনা যায়, ওহে শিবপদ, বলি বিয়ে না হ'তেই কি আমার নাতনীটির ওপর দখলি-স্বত্ব চ'লে গেল নাকি হে? আমাকে যে একেবারে বয়কট করলে দেখছি? দরজাটা খুলে দিতেই একরাশ মেয়ের দলও দাদুর সঙ্গে ঢুকে পড়ল। দিদিমাও ছিলেন তাদের মধ্যে, তিনি হঠাৎ শাঁখ বাজালেন পোঁ……ও।

বানান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বাংলা বানানে ভুল প্রায় সার্বজনীন। এর প্রধান কারণ যাঁরা ভুল ক'রে থাকেন, তাঁরা সব সময় বানান সম্পর্কে অবহিত নন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এই দলীয় নন। তবু যে তাঁর বানান ভুল একেবারে হ'ত না তা নয়। তাঁর অতিসাধারণ বানান ভুল মূল রচনায় না থাকাই উচিত। কিন্তু গ্রন্থপরিচয়-অংশে এগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজনীয়। কেননা রবীন্দ্রনাথের সকল ভুল বানানই অগ্রাহ্য নয়। কতকগুলি বানান ভুলের ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। যেমন—অজাগর ('এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে'—৭।১২১।১০)।[১] ভুল হ'লেও 'অজাগর'-এর দিকেই বাংলার ঝোঁক বেশি, এই তত্ত্বের পোষক প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টান্ত। আবার কতকগুলি বানান ভুল হ'লেও তিনি স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন ব'লে মনে হয়; যেমন—কাঁচ, সেঁচ, হাঁসপাতাল। এই বানান ক'টি রবীন্দ্ররচনায় নিতান্ত বিরল নয়। অবশ্য মুদ্রিত রচনার উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে এ সম্পর্কে জোর ক'রে বলার অসুবিধা আছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় কিছু শব্দের দুই বানান পাওয়া যায়, যেগুলি সংস্কৃত অভিধানেও আছে। এইগুলি হ'ল—অন্তরিক্ষ—অন্তরীক্ষ, অপমান—অবমান, অর্ঘ—অর্ঘ্য, ঈর্ষা—ঈর্ষ্যা, কণ্ঠি—কণ্ঠী, কশা—কষা, কিশলয়—কিসলয়, কেশর—কেসর, কৃমি—ক্রিমি, ক্ষুর—খুর, নাড়ি—নাড়ী, পরিবেশ—পরিবেষ, পল্লি—পল্লী, পাশ্চাত্য—পাশ্চাত্ত্য, বন্দি—বন্দী, বিকিরণ—বিকীরণ, বেদি—বেদী, ব্যবহারিক—ব্যাবহারিক, ভঙ্গি—ভঙ্গী, ভেরি—ভেরী, মঞ্জরি—মঞ্জরী, মর্ত—মর্ত্য, যাচঞা—যাচনা, লক্ষ—লক্ষ্য, সমুদয়—সমুদায়, সূচি—সূচী, সূত্রধর—সূত্রধার, স্বয়ভু—স্বয়ম্ভূ। এগুলির মধ্যে অর্ঘ—অর্ঘ্য, ক্ষুর—খুর, লক্ষ—লক্ষ্য—শব্দকল্পদ্রুমে কোন অর্থ-পার্থক্য নেই। কণ্ঠি (৩।১১২।১৬; ৫।১৪৮।১২; ২১।২৬৩।১৯)—কণ্ঠী (২০।২০৩।২) শব্দকল্পদ্রুমে অর্থ-পার্থক্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তা মানেন নি। ভুল ব'লে গণ্য পাশ্চাত্য, বিকীরণ ও ব্যাবহারিক শব্দকল্পদ্রুমে স্বীকৃত। অর্ঘ-অর্ঘ্য, লক্ষ-লক্ষ্য সমার্থক শুদ্ধ বানান ব'লেই মহার্ঘ—মহার্ঘ্য, উপলক্ষ—উপলক্ষ্যও শুদ্ধ ব'লে স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথে ঈর্ষা বানান খুবই বেশি। দুটি জায়গায় ঈর্ষ্যা বানান চোখে পড়েছে। গল্পগুচ্ছ, ২১।১৯৫।১৯ (বৈশাখ ১৩০৫); বীথিকা, ১৯।৭৭।২৩ (৫ ভাদ্র ১৩৪২)। ১৩০৫ সালের পর আবার ১৩৪২ সালে কেন পুরোনো বানানের পুনরাবৃত্তি হ'ল বলতে পারি নে।

ঘূর্ণমান (১।৩৩৫।১৭; ৩৭৬.১০; ১৬।৩৫৫।২৯)—ঘূর্ণ্যমান (৪.৩৬৮।২; ৯।৫৪০।৭); পরিবর্তমান (৫।৪৬৫।১৮)—পরিবর্ত্যমান (২।৫৫৯।১৫)—রবীন্দ্রনাথে কোন অর্থ-পার্থক্য নেই।

এ ছাড়া আর কিছু শব্দের দুই বা তিন রূপ ও বানান পাই, যার সবগুলিই অভিধান-স্বীকৃত নয়। কেননা এগুলির অনেকগুলিই ভুল ব'লে তিরস্কৃত। উদ্গিরণ—উদ্গীরণ, উদ্গিরিত—উদ্গীরিত, চিৎকার—চীৎকার, দুর্লজ্ঘ—দুর্লজ্ঘ্য, নিশ্বাস—নিঃশ্বাস, পরিবেশক—পরিবেষক, পরিবেশন—পরিবেষণ, পৈতৃক—পৈত্রিক, বিকশিত—বিকসিত, বিকিরিত—বিকীরিত, সংবৎসর—সম্বৎসর, সংস্রব—সংশ্রব, সৌভ্রাত্র—সৌভ্রাত্র্য, সৌহার্দ—সৌহার্দ্য—সৌহৃদ্য, সজাতি—স্বজাতি। এই তালিকায় উদ্গীরণ, উদ্গীরিত, বিকীরিত, সম্বৎসর ভুল হ'লেও ভূরিপ্রয়োগের দোহাইয়ে স্বীকৃতি পাবে হয়ত। পরিবেশক, পরিবেশন ও বিকশিত ভুল হয়েও কীভাবে প্রচলিত হ'ল তা গবেষণার বিষয়। শব্দকল্পদ্রুমে পরিবেশ ও পরিবেষ

১। এই প্রবন্ধে আকর নির্দেশক এই জাতীয় সংখ্যা যথাক্রমে রবীন্দ্র রচনাবলীর (বিশ্বভারতী সংস্করণ) খণ্ড পৃষ্ঠা ও পংক্তিজ্ঞাপক।

একই অর্থে আছে। মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র দেবশর্মার 'সাহিত্যপ্রবেশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে' (অনুচ্ছেদ ৭৪২) পৈত্রিককে পিতৃ+ষ্ণিকরূপে সমর্থন করা হয়েছে। সংশ্রব ও সংস্রব দুই বানানই শুদ্ধ, তবে অর্থ বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথে সংস্পর্শ অর্থে দুইই দেখা গেলেও সংস্রবই বেশি। সংস্রব পাই—ইতিহাস, ৫৮।১৩; ছিন্নপত্রাবলী, ১৩১।২১; ১৬৭।১৪; ২২৯।১৯; ৩১০।৩; ৩৬৬।৮।

সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধান না মানায় অনেক সমস্ত পদের ভুল ও শুদ্ধ দুই রূপই রবীন্দ্রনাথে দেখা যায়। এগুলির দু'একটি হ'ল—ছন্দভঙ্গ—ছন্দোভঙ্গ, ধনুশর—ধনুঃশর, সঙ্গীহীন—সঙ্গিহীন।

অতৎসম শব্দের বানানে সংস্কার পন্থী২ হওয়াতেও রবীন্দ্রনাথে অনেক শব্দের দুই বা তিন বানান মেলে। প্রধানত ই-ঈ, উ-ঊ, ণ-ন, জ-য, শ-ষ-স ভেদেই এগুলি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘকালের; তাই আগের ও পরের রচনায় নতুন-পুরানো দুরকম বানানই চোখে পড়ে। এজন্যে চাষি—চাষী, ভিতু—ভীতু, রাখি—রাখী, ক্ষণ—খন, ক্ষেত—খেত, ধুলা—ধূলা—ধুলো, বীণকার—বীনকার, সন্ধে—সন্ধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ভিতু, ধুলো, সন্ধে উচ্চারণ বিচারে তদ্ভব। বীনকার শব্দটি সম্ভবত হিন্দি। হিন্দি বানানে দন্ত্যন স্বীকৃত। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পাদিত অভিধান দ্রষ্টব্য।

প্রচলিত বানান থেকে গরমিল দু'-একটা বানানও দেখা যায়। এগুলি ঠিক ভুল নয়। অংশিদার (৯।৩৩০।১১), অজবুগ (১৪।২১২।২৭), আপসোস (১।৪৫২।৬), আপোষ (৩।২১১।১৮; ৫।৪৫১।৭; ১০।৪৯০।১৭; ২৯৯।২১; ৩৩১।৪, ৩৬৫।৯; ১৯।৩৬৬।২৮; ৩৯।১৮; ৪৪১।১২), আপোস (৩।৫৫৩।৪৮; ৫৭২।১৬; ৮।৪০১।১৬; ১৬।৯।২৬), আল্মারি (৭।৩৪৭।২৪), আসাবরী (৯।২৭২।১৫), উঁচোট (১৪।৪১৬।১৬), উপোষ (২৩।১৭১।৪; ২৪।১৫৭।২), এসিয়া (২২।৪৪২।১২, ২২।৪৪৩।১৬; ৪৪৪।৮,১৮,২১,২২; ২৬।৫৩৭।২১), কোপি (ফুল কোপি ১১।৪৪০।২৩), ক্ষাপা (মহাক্ষাপা—১।৫৩৬।১০; ২।৪৭৬।১৫; ক্ষাপা হইয়া উঠিয়া—১০।৬২৫।১৯), খরগোষ (২৬।২৫৪।২২,২৮,২৯), খাকড়ার কলম (২।৫০৮।২০), খাতাঞ্জিখানা (২৬।১৭০।২), খিধে (১৭।১০৭।৩,৫), খোটা সহ্য হয় না (১৯।২৪০।২৯), খোলষ (১।২৬১।১২), খোলোস (২৩।১৬৮।৮) গণ্ডী (১। অবতরণিকা ৶০। ২; ১২। ৫।২৪), গলাবন্দ (২৬।৫১১।২০), ঘুস (১৯।৪৩৪।১৯), চখাচখী (৭।১৩০।২১), চালাকাঠ (৪।৩২৭।২৪; ৭।৮।২২)। ডারি (শত শির দেয় ডারি—৭।৫৭।২৪), তলপ (২৬।৩৪৮।২১), দুরবিন (১।৬০৬।৪), ধাঁদা (১০।১৯৩।৮), ধোনে (৭।৪৭৮।১০,১২), পাৎকুয়া (৩।৫৯৩।১১), পারৎপক্ষে (১৯।৪৫৮।২৮), পেল্লায় (২৬।৩১২।১৫), ফর্মাশ (২।৫৪৬।১০), ফুকোর (১৬।২২৪।৪), ফুঁষা (২।২২০।২৩), ভারি (৩।৩১৭।২০; ৬।৪২১।১২,১৭; ৮।১৯৭।২৭; ৩২৬।২৫; ১১।৩১৬।৭; ৩১৭।১৮; ৩।০।২৫ ইত্যাদি), মৎলব (২।৫২০।১৩; ৩।৫৫৭।২,৬,৮; ৬।৪৬৩।১৭), মরীয়া (১৯।৪৭৮।১৫; ২৩।২৭০।৮), মুখোষ (১৯।৪৭৭।১২; ২৩।১৮৭।১০; ২৬।৩৭৮।২), মোতাইন (১০।৩৯২।২৬), মোন (সাড়ে তিন মোন—২৬।২১১।১৫), যেরোপ্লেন (১৯।৪৬২।১৬), লোকশান (৬।৪১৯।৫), শেয়ালা (৫।৪৯০।২১), শেলাই (২৬।৪২৬।১৯), শ্যাকরা গাড়ি (৫।৪৮৭।৪), সওগাদ (৫।২৪২।২৭, ৮।৩৭৯।১১), সিন্দুক (৮।৪৭।২০), সিন্ধু (৫।২৮৯।১২; ৭।৪৭৮।৪,১১), সিন্ধু (২।১৫১।১১), হাবাসা (৭।১৩৩।১৫), হোরিখেলা (৮।২৬২।৪)। এই তালিকায় অংশিদার সংকরশব্দ হ'লে অংশি

২। "সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে, যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্বইকারকে মানব। 'ইংরাজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচে হ্রস্ব-ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্ ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক 'মুসলমানিনী' কায়দা 'বা ইংরেজিনী' রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা থেকে যায়।" "বাংলাভাষা পরিচয়", ২৩।৫২৭ পৃ।

হ্রস্ব ইকারান্ত। অজযুগ বঙ্গীয় শব্দকোষে আছে। অন্ত শব্দগুলি অতৎসম ব'লে অনেক ক্ষেত্রে খুশিমত বা উচ্চারণানুগ বানান লেখার চেষ্টা করেছেন। কারণী থাকা থেকে যদি থাপা বা খাপ্‌পা এসে থাকে, তবে বোধহয় ক্ষাপা বানানসমর্থন করা যায় না। তাছাড়া আমরা যখন ক্ষণ বা ক্ষেত না লিখে খন, খেত লিখছি, তখন আবার ক্ষাপা কেন, যদি বা ক্ষিপ্ত-র অপভ্রংশই হয়? ভারি ও হোরি হিন্দির মূলানুগ বানান। ভারি আর ভারী-তে নিচ ও নীচ-এর মত কোন অর্থপার্থক্য রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত কি না তা বলা যায় না। কেননা একই অর্থে দুই বানানই দেখা যায়। 'ভারি গোলমাল' (৮।৫২৬।২৫), 'ভারি তো কাজ' (১১।৩১৬।৭), 'ভারি ভালোবাসিত' (১৪।২৮।৬) ; আবার 'ভারী উৎফুল্ল ও স্ফীত' (২।৪৫৮।২৭), 'ভারী অভদ্র' (৭।৪২৯।২২), 'ভারী ভারী মজার' (৭।৪৭২।১০), 'ভারী গোলমাল'-ও (৭।৪৮৪।৩), দেখা যায়। তবে বিশেষ সময়ের পর থেকে এ নীতির অনুসরণ করেছেন কি না তা নির্ণয়ের বিষয়।

একটা জিনিস এবিষয়ে লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ অনেক তৎসম শব্দে বানানের অর্থ-পার্থক্য মানেন নি অথচ তদ্ভব শব্দে কোথাও কোথাও সেই নিয়মের অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন বানানের নিজেই প্রবর্তক।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় যে একই শব্দের দুই বা তিন রকমের বানান মেলে তার কারণ কবির বৈচিত্র্যপ্রিয়তা। সে যাই হোক, একই বাক্যে বা রচনায় এই বৈচিত্র্য-প্রিয়তা দূষণীয়। একই বাক্যে দুই বানান—'যে তোমারে অবমানে তারি অপমান' (৫।৮৩।১৪), লক্ষ—লক্ষ্য (৫।৫২৯।২২)। একই রচনায় দুই বানান—এশিয়া (২৩।৪১৭।১২)—এসিয়া (২৩।৪১৭।১২) ; বিকশিত—বিকসিত ('ঘাটের কথা', ১৪।২৫২ পৃঃ) ; ব্যবহারিক (২৩।৪৩৫।২৬)—ব্যবহারিক (২৩।৪৪৫।২৫) ; লক্ষগোচর (৬।১৬৭।২৮)—লক্ষ্য মাত্রই (৬।১৮৭।৬) ; সংশ্রব—সংস্রব (ছিন্নপত্রাবলী ; ৭৯ সংখ্যক চিঠি)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিন্দুর ছেলে"র আমি 'Modern Review'-এ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলাম। অন্য কিছুও পড়েছি ; কিন্তু "চরিত্রহীন" প্রভৃতি বই আমার এখনও পড়া হয়নি। সুতরাং তাঁর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা হবে। তবে তাঁর "পরিণীতা" প'ড়ে, "বিজয়া"র অভিনয় দেখে. এবং "গৃহদাহ"র এক নায়িকার বিষয় শুনে আমার ধারণা হয়েছে যে, ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে এবং সাধারণতঃ শিক্ষিতা নারীদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুব অযথেষ্ট এবং বিরুদ্ধ সংস্কার (bias) অধিক। সেইজন্যে তিনি ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাদের ও শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধে artist-এর সমদর্শিতা রক্ষা করতে পারেননি।

—১৫. ১০. ১৯৪১ তারিখে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে লেখা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রাংশ।

বধির প্রতিষ্ঠাপন

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

. . . deafness is merely a physical deprivation. The soul remains unscathed. His life is rich in many things of life, through day after day he hears nothing.

—Dr. C. A. Amesur, M.S. (Lond.)

'বধির' শব্দটির আভিধানিক অর্থ যা-ই হোক না কেন, আধুনিক সূত্রে,—যারা শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতার জন্য সাধারণ ও স্বাভাবিক শ্রবণযুক্ত শিশুর মত বিভিন্ন ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ অচেতন ভাবে কথা ও ভাষা শিখতে পারে না; এবং কথার সাহায্যে নিজের মনের ভাব অপরকে বোঝাতে বা অন্যের মনের ভাব নিজে বুঝতে পারে না,—তারাই বধির।

'শ্রুতি-ক্ষীণ' (hard of hearing)-রা কিন্তু বধির নয়। সাধারণের তুলনায় এরা কম শুনতে পেলেও, শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র (hearing aid) ব্যবহার করলে শুনতে পায়। বধির ও 'শ্রুতি-ক্ষীণ'দের মধ্যে মনস্তত্ত্বগত সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে এবং উভয়ের শিক্ষা-পদ্ধতিও আলাদা, যদিও ভারতে শ্রুতি-ক্ষীণদের আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নি।

১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে অবিভক্ত ভারতে বধিরদের সংখ্যা ছিল ২,৫০,০০০। সংখ্যাটি আনুমানিক, পৃথক্‌ভাবে বধিরদের কোন পরিসংখ্যান আজ পর্যন্ত হয় নি। Dr. C. A. Amesur ১৯৫১ খ্রীঃ স্বাধীন ভারতে শ্রুতিক্ষীণদের সংখ্যা ৮,০০০,০০০-এরও উপরে ব'লে নির্দেশ করেছিলেন।

১৯৩১-এর পর আদমসুমারীর রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। ইতিমধ্যে ভারত বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু বিবেচ্য যে, অন্তর্বর্তী সময়ে বিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে ও তারপরে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ, আর্থিক দৈন্য ও জীবনধারণের নিম্নমানের কারণে রোগজাত এবং অপুষ্টিজনিত বধির ও শ্রুতি-ক্ষীণদের সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত সরকারের ১৯৬২ সালের ব্যাঙ্গালোর সেমিনারের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারতে বর্তমানে বধিরদের সংখ্যা ৭ থেকে ৮ লক্ষের মধ্যে।

ভারতে বর্তমানে বধির বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৭টির মত, এর মধ্যে যে ক'টি বিদ্যালয়ে সঠিক মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে তার সংখ্যা একক অঙ্কে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির নিম্নমানের কারণ আর্থিক অসচ্ছলতা ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব। পশ্চিম বাংলায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা চারটি। কলকাতায় দু'টি, সিউড়ি ও বীরভূমে এক-একটি। বাংলা দেশের বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রগ্রহণ-ক্ষমতা পাঁচশ'-এরও কম। কিন্তু শিক্ষা নেবার উপযুক্ত ছাত্রের আনুমানিক সংখ্যা অন্ততঃ দশগুণ, কলকাতায় ইদানীং আরো দু'টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যক্রম এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য নয়।

বধির ও শ্রুতিক্ষীণেরা অন্যান্য প্রতিবন্ধিতদের (handicapped-দের) ন্যায় সমাজের অগ্রগতির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শুধু ভারতে নয়, সব দেশেই এ সমস্যা আছে এবং তা সমাধানের কার্যকরী ব্যাপক প্রচেষ্টাও আছে। ভারতে এ প্রচেষ্টা দীর্ঘসূত্রীয়, সেজন্যই ভারতীয় সমাজে প্রতিবন্ধিতদের প্রতিষ্ঠা (Rehabiltation) সম্পর্কীয় আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আলোচনার সূত্রপাত

আমরা জানি সমাজের যে কোন অংশের অসুস্থতা বা অক্ষমতা সুস্থ ও বলিষ্ঠ সমাজগঠন এবং তার অগ্রগতির পরিপন্থী। সুতরাং কি বধির, কি অন্ধ, কি বিকলাঙ্গ, যে কোন প্রতিবন্ধিতকেই প্রতিষ্ঠাপন পরিকল্পনার (Rehabilitation Scheme-এর) মধ্য দিয়া সমাজের উপযুক্ত ক'রে তুলতে হবে। এই পরিকল্পনার ধারায় রয়েছে যথাক্রমে নৈরুজ্যগত (medical), মনস্তত্ত্বগত,

শিক্ষাগত, বৃত্তিগত এবং সব মিলিয়ে সমাজগত প্রতিষ্ঠাপন। কিন্তু এর কোনটিই অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সুতরাং কোন একটির অসম্পূর্ণতায় সমস্ত পরিকল্পনাটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নৈরুজ্যগত প্রতিষ্ঠা (Medical Rehabiliitation)

সুপ্রাচীনকালে বধিরতার কারণ কি বা তা' প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি না, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ছিল না। আধিদৈবিক চেতনাশীল তখনকার মানুষ বধিরতাকে দেবতার অভিশাপ ব'লে মেনে নিয়েছিল। প্রতিকারের প্রচেষ্টাকে তারা মনে করত পাপ। তারপর মানুষ যত সভ্য ও সমাজবদ্ধ হ'তে লাগল ততই তার চিন্তাধারাও বিবর্তিত হ'তে থাকল। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিনুজনের বধির বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, "সিংহের ডান কান কেটে বধিরের কানের উপর রেখে যদি বলা হয়, 'Hear Adimacus, by the living God and the keen virtue of a lion's hearing,' এবং 'বেজির হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে কানের মধ্যে দিলে', বধিরতা আরোগ্য হবে।" শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও হয়েছে বিকাশ। 'ভেল্কি' বা আধিদৈবিক চেতনার যুগ অতিক্রান্ত এবং অস্বীকৃত হয়ে বিশ শতকের প্রারম্ভিক সময়ে এসেছে নিউইয়র্কের বিশিষ্ট Otologist, Ir. M. Joseph Lobel-এর 'Anatola' সূত্র। সূত্রে বলা হয়েছে যে, 'ভিটামিন-এ'-র অভাবে শ্রবণ-পথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুতরাং ঐ জিনিষটি বেশী পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করাতে পারলে ক্ষতিগ্রস্ত কান ভাল হ'তে পারে। Anatola একটি প্রসিদ্ধ মিশ্রণ (Compound), যা শরীরকে খুব তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণে 'ভিটামিন-এ' যোগান দিতে পারে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিজ্ঞান দিয়েছে যুগান্তকারী শ্রবণ-সহায়ক বৈদ্যুতিক যন্ত্র। ইতিমধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা এবং অন্যান্য চিকিৎসায়ও এসেছে বিবর্তন।

পরিকল্পনাটির প্রসঙ্গে ভারতের অনগ্রসরতা দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছি। প্রতিবন্ধিতদের নৈরুজ্যগত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা বিদেশে কত সুপরিকল্পিত, ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। আজ সেখানে শুধু বধিরতার চিকিৎসাই নয়, যাতে বধিরতার আবির্ভাব না ঘটে সে বিষয়েও প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সেখানে বধিরদের সংখ্যা কমে কমে আসছে। সেখানে বধিরদের জন্য বহু ক্লিনিক (Auditory Clinic) আছে, যেখানে চিকিৎসা ও শিক্ষা দুইই এক সঙ্গে চলতে পারে। সেখানে (সম্ভাব্য বধির সন্তানের ক্ষেত্রে) প্রসূতিরও চিকিৎসা হয়ে থাকে। এতে একদিকে যেমন গবেষণার সুবিধা, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমেরও সুবিধা হচ্ছে। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায়নি। গবেষণা বিষয়ক সুযোগ সুবিধাও বিশেষ কিছু নেই।

বধিরদের নৈরুজ্যগত প্রতিষ্ঠা কথাটির অর্থ তাদের যে কোন অঙ্গ-বৈকল্য (deformity) জাত বাধাকে অতিক্রম করতে ও প্রতিরোধ করতে সাহায্য করা। ১৯৫২ খ্রীঃ-এর ১০ই অক্টোবর ভারত সরকার নিয়োজিত 'বধির বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র কাছে এ বিষয়ে Dr. Amesur যে প্রস্তাবগুলি রেখেছিলেন তার মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'Auditory Clinic' স্থাপনের উপরে। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতির নকসা কমিটির সামনে রেখেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাটিকে যে কোন দিক্ দিয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো যেতে পারে।

মনস্তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠা :

মনস্তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নৈরুজ্যগত প্রতিষ্ঠার ভূমিকা অনেকখানি, কারণ সাধারণভাবে বলা যায় যে, শরীরের অসুস্থতা মনেরও অসুস্থতার কারণ, এর সঙ্গে কার্য-কারণ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা প্রতিবন্ধিত বধিরদের মনস্তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে।

মানুষের মনের চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা তিনটি—গ্রহণ, বহন ও সঞ্চালন। এদিক্ থেকে ভাষাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) গ্রাহক ভাষা (Receptive Language), (২) বাহক ভাষা (Inner Language) এবং (৩) সঞ্চালক বা প্রকাশক ভাষা (Expressive Language)। গ্রাহক ভাষার মাধ্যমে মানুষ অপরের ভাব ও চিন্তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে; গ্রাহক ভাষা মনের মধ্যে অবস্থিত ও কথিত

হয়ে বাহক ভাষায় রূপান্তরিত হয়; এবং সঞ্চালক ভাষার সাহায্যে মানুষ-বহন ও কর্ষণের ফলে সৃষ্ট চিন্তা ও ভাবকে অন্যের কাছে প্রকাশ করে। কিন্তু এই গ্রহণ, বহন ও সঞ্চালনের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতার প্রয়োজন; যদি সে ক্ষমতা না থাকে তবে সম্পূর্ণ ধারাটি বিপর্যস্ত হয়ে মানসিক বিকাশকে ব্যাহত করে। কারণ মানসিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষার অপরিহার্য ভূমিকা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা স্বীকৃত।

বধিরেরা কানে শুনতে পায় না, সেজন্য তাদের গ্রাহক ভাষা গ্রহণ ক্ষমতা প্রতিবন্ধিত। গ্রাহক ভাষার অনুপস্থিতিতে বাহক ও সঞ্চালক ভাষার অস্তিত্ব থাকে না। ফলে মানসিক চিন্তা ও ভাবের দিক্‌ থেকে বধিরেরা প্রতিবন্ধিত হয়।

আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে কথ্য ভাষারই প্রাধান্য। সেজন্য শিক্ষার মাধ্যমে মানসিকতার যে বিকাশ সম্ভব, বধিরদের ক্ষেত্রে তাও ব্যাহত। এ জন্যই বধিরদের মধ্যে জড়বুদ্ধি ও কমবুদ্ধির সংখ্যা বেশি।

মনস্তাত্ত্বিকদের মতে বধিরদের মধ্যে জড়বুদ্ধি ও কমবুদ্ধি বেশি হ'লেও সাধারণতঃ বধিরদের mean I. Q. স্বাভাবিকদের সমান। কারো কারো মতে বধিরদের ১০ পয়েন্ট নীচে। Pinter, Eisenson এবং Stanton বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে মন্তব্য করেছেন যে, "বধিরদের I. Q. ৮৬ থেকে ৯২-এর মধ্যে পাওয়া গেছে (মধ্য সংখ্যা ৮৯) এবং স্বাভাবিকদের ক্ষেত্রে ৯১ থেকে ৯৫-এর মধ্যে (মধ্য সংখ্যা ৯৩)।১

বধিরদের এই প্রতিবন্ধকতা কেবল যে মানসিকতাকে ব্যাহতই করে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতিও প্রদান করে। জীবনের যেখানে প্রকাশ আছে, গতিশীলতা আছে, সেখানেই জীবন স্বাভাবিক, জড়তা জীবনের বিপরীত। বধিরেরা যেহেতু অন্যের ভাব বা চিন্তা নিজে বুঝতে পারে না, তেমনি নিজেকেও সে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিকতার ক্রম-আবির্ভাব ঘটতে থাকে। (অবশ্য এর পিছনে অনেক সময় সামাজিক কারণও থাকে।) প্রায়ই দেখা যায় যে, স্বার্থপরতা, হিংসা বা ঈর্ষা, ক্রোধ, নিজের সম্বন্ধে অনাস্থা ও হতাশা বধিরদের মধ্যে খুব বেশি। ব্যক্তিত্বের বিকাশও তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ব্যাহত।

অতএব বধিরদের মনস্তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। এ বিষয়ে নৈরুজ্যগত প্রতিষ্ঠার পাশে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্তব্য। ভারতের গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে প্রায় হতাশাব্যঞ্জক। ইদানীং এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজ আরো দায়িত্বশীল ভাবে নিজের নিজের কাজ না করলে এ প্রচেষ্টা কোনক্রমেই কার্যকরী হতে পারে না। অভিভাবক ও সমাজের দিক্‌ থেকে এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় নি। মনস্তত্ত্বগত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিক্ষার গুরুত্ব সাধারণ শিশুর ন্যায় বধিরদের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য।

শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠা:

প্রাক্‌-খ্রীষ্ট সময়ে বধিরদের শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠাপন সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার ইতিহাস পাওয়া যায়। সে সময় বধিরদের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।—

Plato এবং Aristotle বধিরদের শিক্ষা গ্রহণের অযোগ্য ব'লে মত প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্ট জন্মের প্রথম শতকে Archigeneus এবং St. Augustine বধিরদের শিক্ষা সম্ভব, এ আশা প্রকাশ করেছেন। ৬৯১ খ্রীঃ ইয়র্কের বিশপ John যখন একটি বধিরকে ওষ্ঠপাঠ শেখালেন তখন সাধারণের কাছে তা অলৌকিক কাণ্ড ব'লে মনে হয়েছিল। এর পরে ইতালীর Dr. Cardo, 'Manual Alphabet' পদ্ধতিতে শিক্ষণের প্রচেষ্টা করেন। ১৫৫৫ খ্রীঃ-এ Pedro Ponch De Leon ওষ্ঠপাঠ শেখান। ১৫৬৩ খ্রীঃ Eustachius বধিরদের শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র হিসাবে বিখ্যাত Auditory tube-এর আবিষ্কার করেন। কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য সে বিষয়ে প্রাচীন কাল থেকে চিন্তা ও আলোচনা চলছিল। এ চিন্তা ও আলোচনার ফলে উদ্ভূত পদ্ধতিগুলি হচ্ছে,—

(১) The manual method: পদ্ধতিটিতে অক্ষর (Letter)-গুলিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এর সঙ্গে লেখ্য-অক্ষরের আকৃতিগত যোগ লক্ষ্য করা

যায়। Dr. Helen Keller এ পদ্ধতিতে শিক্ষা পেয়েছিলেন।

(২) Sign Language বা French Method: ইশারা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ভাবভঙ্গির মাধ্যমে এ শিক্ষা-পদ্ধতিটি বর্তমানে অস্বীকৃত।

(৩) Oral Method (মৌখিক পদ্ধতি): পদ্ধতিটি ওষ্ঠপাঠ বা কথাপাঠ শিক্ষণের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। ১৮৭৭ খ্রীঃ-এ পদ্ধতিটির প্রবর্তন। বধির শিশু কানে শুনতে পায় না, সেজন্য অপরের কথা যাতে সে বুঝতে পারে, সেজন্য তাকে এই পদ্ধতিতে কথাপাঠ শেখান হয়।

(৪) মিশ্রিত Manual এবং Oral Method: মিশ্রিত এই পদ্ধতিটিতে একটি অপরটির পরিপন্থী বিবেচনায়, পদ্ধতিটি বর্তমানে খুব কম ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৫) Aural method (শ্রুতি-সহায়ক পদ্ধতি): যুগান্তকারী এ পদ্ধতিটির উদ্ভব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র হিসাবে তখন পাখার মত দেখতে সুতো বাঁধা vulcanised rubber বা অন্য কোন ধাতুর তৈরী সুন্দর একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হ'ত। পাখাটির একটি মাথা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলে শব্দ-তরঙ্গ auditory nerve-এ পৌঁছাতে পারত। ১৮৮৬ খ্রীঃ-এ বৈজ্ঞানিকেরা পদ্ধতিটি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন ফলে পদ্ধতিটির ক্রম-উৎকর্ষ লক্ষিত হ'তে থাকে। ১৯৩৮ খ্রীঃ-এ বৈদ্যুতিক শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রের আবিষ্কার সেই গবেষণার ক্রম-বিকশিত যুগান্তকারী ফল। ইতিমধ্যে 'শ্রবণ ক্ষমতা পরিমাপক যন্ত্র' (Audiometer)-এর ব্যবহারও আরম্ভ হয়।

(৬) ১৯৩০-৩৮ খ্রীঃ-এ 'দৃষ্টি-সহায়ক' (Visual Aid) শিক্ষা পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে। এতে চলচ্চিত্র এবং স্থিরচিত্রের ব্যবহার হয়। শব্দ সঙ্কেতকে ছবির মাধ্যমে শিক্ষণের ফলে শব্দ এবং তার প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যে সামঞ্জস্য নির্ধারণ সহজে সম্ভব হয়।

আধুনিক বধির শিক্ষাপদ্ধতি (ইংলণ্ডে, আমেরিকায় ও ভারতে) মৌখিক, শ্রুতি-সহায়ক ও দৃষ্টি-সহায়ক এই তিনটির মিশ্রণে সৃষ্ট। কিন্তু কথাশিক্ষাই মূল লক্ষ্য থাকায় একে মৌখিক পদ্ধতি (Oral Method) ব'লেই উল্লেখ করা হয়। French Method অস্বীকৃত হয়েছে এবং Manual Method-এর কার্যকারিতা কোন কোন ক্ষেত্রে আশাপ্রদ বিবেচিত হ'লেও পদ্ধতিটি কথ্য-ভাষা শিক্ষার পরিপন্থী বিবেচনায় ব্যবহার করা হচ্ছে না।

বধিরেরা শিক্ষা গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এ বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহই নেই, তাদের শিক্ষণ-বিষয়ক কার্যক্রম বর্তমানে কি ভাবে চলছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

বধির শিশুদের তিনবছর বয়স থেকে প্রাক্-বিদ্যালয়কালীন শিক্ষা সুরু হয়। প্রাক্-বিদ্যালয়-কালীন শিক্ষায় ডাঃ মন্তেসরীর শিশু শিক্ষা পদ্ধতিকে মৌখিক, শ্রুতি-সহায়ক ও দৃষ্টি-সহায়ক বিশিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। এ সময়ে শিশুরা ওষ্ঠপাঠ বা কথাপাঠ শেখে এবং কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণও অনুকরণ করতে সমর্থ হয়। ভারতে বধির শিশুদের প্রাক্-বিদ্যালয়কালীন শিক্ষণের কোন বিশেষ ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয় নি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ করবার বয়স ৫ বা ৬ বছর। বিদ্যালয়ের প্রথমতঃ কথা ও ভাষা শিখিয়ে পরে সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু পদ্ধতি বিশিষ্ট।

ভারতীয় বধির বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার মান এখন পর্যন্ত খুব উন্নত নয়। কারণ আর্থিক দৈন্য, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, অভিভাবক ও সমাজের অসহযোগ ইত্যাদি। বিদেশে বধিরেরা সাধারণ ছাত্রের মত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। ভারতের প্রায় সব বধির বিদ্যালয়ে বধিরদের শিক্ষার মান সাধারণ শিক্ষামানের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর তুল্য। আলাদাভাবে উচ্চ বিদ্যালয়ে বা কলেজে বধিরদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই।

বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠা:

বর্তমান শিক্ষা পরিকল্পনায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিগত শিক্ষার সমান গুরুত্ব। অর্থনৈতিক কাঠামোতে তৈরী বর্তমান সমাজে শিক্ষার মোটামুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষ কারিগর তৈরী করা, যারা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করবে। এ জন্য বৃত্তি-শিক্ষণ-সহায়তা (Vocational guidance) প্রয়োজন। এই শিক্ষণ-সহায়তার সর্বাধুনিক এবং জনপ্রিয় সূত্রটিতে বলা হয়েছে, "এই শিক্ষণ ধারায় ব্যক্তিকে তার পারকতা (Capabilities) ও সুযোগ-সুবিধা বুঝতে, সঠিক বৃত্তি নির্ধারণ করতে এবং তাতে অনুপ্রবেশ করতে, উন্নতি করতে এবং কৃতকার্য হ'তে সাহায্য করা।" সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এটি এককালীন অনুষ্ঠিতব্য বিষয় নয়, একটি ক্রম-বাহিত ধারা বিশেষ।

বধির শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যখন বলা হয়, 'To assist the deaf person to achieve the optimum degree of integration into the com-

munity,'—তখন তাদের বৃত্তিগত শিক্ষার দাবি চূড়ান্ত ভাবে স্বীকার করা হয়েছে ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। কারণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা না থাকলে সমাজগত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আরো বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠাগত সমগ্র পরিকল্পনাটির মূল লক্ষ্য এই অর্থগত প্রতিষ্ঠা। সুতরাং বধিরদের বৃত্তি শিক্ষায় সুবন্দোবস্ত করা কর্তব্য।

একজন মানুষের কি নেই তা নিয়ে চিন্তা না ক'রে, যা আছে, তাকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানই বর্তমান সভ্যতার বিশেষত্ব। বধিরেরা সাধারণ ভাবে প্রতিবন্ধিত হ'লেও বৃত্তিগত শিক্ষার দিক্ থেকে তারা প্রতিবন্ধিত নয়। কোন কোন বৃত্তি (বিশেষতঃ যেগুলিতে শ্রুতি ও কথার বিশেষ প্রয়োজন হয় না) শিক্ষণে তারা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এখানে একটি প্রশ্ন আসা সম্ভব যে, বৃত্তিগত শিক্ষার দিক্ থেকে তারা প্রতিবন্ধিত নয় ব'লে আবার কোন কোন বৃত্তির উপযুক্ত কথার অর্থ কি? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের কার্যক্রম একটি বা কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। সব কাজে সমান পারঙ্গমতা কখনই সম্ভব নয়। বধিরেরা প্রতিবন্ধিত অর্থে তারা কোন নির্দিষ্ট অঙ্গকে কাজে ব্যবহার বিষয়ে প্রতিবন্ধিত, অন্য কোন অস্বাভাবিকতা তাদের ক্ষেত্রে নেই। সুতরাং তাদের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচন এবং তা শিক্ষণের সুবন্দোবস্ত করতে পারলে তারাও নিপুণ কারিগর হ'তে পারে। বিদেশে এটি পরীক্ষিত সত্য, আমাদের দেশেও অজস্র প্রমাণ আছে।

বৃত্তি নির্বাচন ও শিক্ষণ বিষয়ে বধিরদের বুদ্ধি, শ্রবণ-ক্ষমতা ও কথন-ক্ষমতা ইত্যাদির বিচারে তাদের চার ভাগে ভাগ করা হয়,—উৎকৃষ্ট, সাধারণ, নিম্ন-সাধারণ এবং প্রান্তিক। এদের প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট এবং আলাদা আলাদা বৃত্তি নির্বাচন ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বধিরদের বৃত্তিগত শিক্ষার জন্য বিদেশে পৃথক্ ব্যবস্থা আছে, এবং তার পরিধিও বিস্তৃত। বিদ্যালয়ে অবস্থান-কালীন সময়ে তারা বিদ্যালয়ের বৃত্তি-শিক্ষা বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা নেয়, পরে বৃত্তি-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। ভারতে বধিরদের বৃত্তি-শিক্ষার আলাদা বন্দোবস্ত কয়েক বছর আগে পর্যন্তও ছিল না। বিদ্যালয়গুলি তাদের সীমাবদ্ধ প্রয়াস দ্বারা ছোট ছোট শিল্প বিভাগে কিছু কিছু বৃত্তি শেখাত এবং এখনো তা শেখাচ্ছে। কিন্তু অর্থাভাব ও বৃত্তি শিক্ষার বিষয়ে চিন্তার অভাবে সে শিক্ষা ছাত্রদের বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠায় প্রতিযোগিতায় খুব কমই সাহায্য করছে। তবে প্রাথমিক প্রস্তুতির দায়িত্ব বিদ্যালয়গুলি পালন করছে। বিদ্যালয়গুলিতে শিশুর কোন্ বৃত্তির দিকে ঝোঁক বেশি তা অনুধাবন ক'রে তাকে সেই বৃত্তি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনায় ভারত সরকার প্রতিবন্ধিত শিশুদের সাধারণ ও বৃত্তিগত শিক্ষায় বিশেষ জোর দিয়েছেন। ফলে ভারতে ইতিমধ্যে প্রতিবন্ধিতদের জন্য কয়েকটি বৃত্তিগত শিক্ষাকেন্দ্র এবং বয়স্ক শিক্ষণ-কেন্দ্র (Adult Training Centre) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুব সামান্য। বিদ্যালয়ে বধিরদের জন্য যে সব বৃত্তি-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে পুতুল তৈরী, মূর্তি তৈরী, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, ছাপাখানার কাজ, বই ও ফটো বাঁধাইয়ের কাজ, হোসিয়ারী অন্যতম। কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে মেসিন-শপ্-এর কাজও শেখান হচ্ছে। হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষণ সম্বন্ধে তৃতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং প্রচেষ্টাও ইতিমধ্যে সুরু হয়েছে। ফটোগ্রাফীর কাজও তারা শিখছে।

শিক্ষার সমাপ্তিতে জীবিকোপার্জনের জন্য উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ না হ'লে বৃত্তিগত প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এ বিষয়েই সমস্যা বেশি। বিশেষতঃ ভারতে, যেখানে বৃহত্তর সাধারণ সুস্থ ও শিক্ষিত মানুষের বেকার-সমস্যা সমাধানে সরকার ব্যতিব্যস্ত। প্রতিবন্ধিত বধিরদের কর্ম নিয়োগ সমস্যার পিছনে অন্যান্য যে সব কারণ আছে, সেগুলি হচ্ছে,—(১) কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা, (২) যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অক্ষমতা, (৩) মালিকপক্ষ এদের সঙ্গে যোগাযোগের শ্রম স্বীকার করতে নারাজ। তাঁদের দিক্ থেকে একজন বধির শ্রমিক পরিচালনা অপেক্ষা একজন বধির-নয় এমন শ্রমিককে পরিচালনা আরামপ্রদ, (৪) সমাজের অজ্ঞতার জন্য বধিরদের সম্বন্ধে মালিক-পক্ষের কতকগুলি উদ্ভট ধারণা।

সুতরাং এ বিষয়ে মালিকশ্রেণী ও সরকারের পক্ষ থেকে সহানুভূতি কাম্য। কিন্তু সহানুভূতির অর্থ 'দয়া' নয়। শিল্প-পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধিত বধিরের যোগ্যতা বিবেচনায় তাকে কর্মে নিয়োগ-বিষয়ক সহায়তাই এখানে বক্তব্য বিষয়। ব্যাঙ্গালোর সেমিনারে ডাঃ কে. এল. শ্রীমালী বলেছেন, "......the physically handicapped are an asset and not a liability. What they want is not a sanctuary but a place in industry. The earlier concept of

rehabilitation which aims at the total integration of the handicapped individual into the community. The shift of emphasis from charity to rehabilitation." তাঁর এই বক্তব্যের দিকে শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অবশ্য এ কথা উঠতে পারে যে, সাধারণ এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যেদেশে অজস্র সেখানে প্রতিবন্ধিতদের নিয়োগ বিষয়ে চিন্তা কতদূর সম্ভব! যুক্তিটি অস্বীকার না ক'রেও বলা যায়, সুদিনের অপেক্ষায় শ্রম-সম্পদকে ব্যবহার না করা উন্নত অর্থনৈতিক চিন্তার বিরোধী। সুতরাং মালিকপক্ষ, সরকার এবং সমাজের সহযোগিতাই যুক্তিসঙ্গত।

ব্যাঙ্গালোর সেমিনারে এই নিয়োগ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যে ক'টি প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সেগুলির অকুণ্ঠ সমর্থন কর্তব্য। সেমিনারের সুপারিশ অনুযায়ী, (১) যে সব শিল্পে ভিড় কম, প্রতিবন্ধিতদের সেই সব বৃত্তি-শিক্ষণ ব্যবস্থা, (২) প্রতিবন্ধিতদের জন্য আলাদা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, (৩) বৃত্তি-বিষয়ক সহায়তা ও উপদেশের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, (৪) শিক্ষা ও নিয়োগের মধ্যে যোগাযোগকারী সংস্থা গঠন।

দৈহিক প্রতিবন্ধিতদের জন্য প্রথম নিয়োগ সংস্থা (employment office) ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে বম্বেতে কাজ সুরু করেছে। দ্বিতীয় সংস্থার উদ্বোধন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ২৯-এ এপ্রিল, ১৯৬১ সালে দিল্লীতে। তৃতীয়টি মাদ্রাজে কাজ আরম্ভ করবে ব'লে সরকারী পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

বাংলা দেশে নিয়োগের সমস্যাটি খুবই জটিল। এখানে কোন নিয়োগ সংস্থা নেই। বিদ্যালয়গুলি এবং স্থানীয় বধির সম্মেলন তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে এ বিষয়ে সাহায্য করছে।

সমাজগত প্রতিষ্ঠা :

উপরের প্রতিষ্ঠাগত ধারাটির সম্পূর্ণতার উপরে সমাজগত প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, সমাজের বোঝা না হয়ে সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করতে পারলেই সমাজগত প্রতিষ্ঠা প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে সমাজের পক্ষ থেকে বিশেষ সহযোগিতার প্রয়োজন। সমাজ যদি অনমনীয় মনোভাব নিয়ে প্রতিবন্ধিতদের ঘৃণা বা অবহেলা দেখান, তা হ'লে সমাজগত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় না। আর এ অসম্পূর্ণতায় সমাজের নিজেরই ক্ষতি।

ভারতীয় সমাজের প্রতিবন্ধিতদের সম্বন্ধে ধারণা আজ পরিবর্তিত হ'তে আরম্ভ করেছে। ভারতীয়েরা আজ Henry Kesler-এর প্রতিষ্ঠাপন বিষয়ক ঐতিহাসিক উক্তিকে সমর্থন করেছেন। Kesler প্রতিষ্ঠাপন-সহায়তা সম্বন্ধে বলেছেন, "The object to help is to make help superfluous. This is the ideal and the motivating power behind rehabilitation. No nation can afford the luxury of wasted manpower."

আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে এই সব অসহায় বধিরেরা সাধারণের সঙ্গে সমান প্রতিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে চলবে। কিন্তু সেদিনও প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনার ধারার শেষ হবে না নিশ্চয়।

---

(১) Pinter, Eisenson & Stanton : Psychology of the Physically Handicapped,

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

২২শে শ্রাবণ

২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের চিতায় সকালে প্রণাম করিতে গিয়া কি দেখিলাম? মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। অবশ্য বৃষ্টি হইতেছিল। তাহা হইলেও এটা কেহ প্রত্যাশা করে নাই। রবীন্দ্র-ভারতীর উপাচার্য নিজে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মাল্যদান করিলেন একজন শিল্পপতি। বিশ্বভারতীর বড় কাহাকেও দেখিলাম না। সাহিত্যিক একজন দু'জন। মন্ত্রিমণ্ডলী বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে কি মালা আসিয়াছিল? কোন উপমন্ত্রী? দেখি নাই।···আকাশ বোধহয় ওই জন্যেই সকালে এত কাঁদিয়াছিল। তবে সাধারণ মানুষ দলে দলে আসিয়াছিল।···এ কি সেই বাঙ্গলা দেশ?

বাঙ্গলা 'দেশ' হয়ত ঠিকই আছে। সাধারণ বাঙ্গালীও হয়ত সেই-ই আছে—তবে আজ যাঁহারা কপালগুণে এবং 'স্বাধীনতা'র কল্যাণে মাটি ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছেন, সেই সব বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসী কর্ত্তা, যাঁহারা 'স্বাধীনতা' বলিতে নিজেদের অনাচার, ব্যভিচার, এবং আত্ম-ও-আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থ-সাধন এবং সাংসারিক উন্নতি বিধানের সর্ব্ব-স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই বুঝেন না, দেশ এবং জাতির সামগ্রিক কল্যাণ-চিন্তা যাঁহাদের গব্য-সম্পদ্-পূর্ণ মস্তিষ্কে নাই, থাকিতে পারে না, তাঁহারা আজ 'বাঙ্গালী' নামে অভিহিত হইলেও—শ্মশান-বৃক্ষ-বাসী, শবদেহ-লোভী বৃহদাকার পক্ষী-বিশেষে পরিণত হইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশটাকেও আজ প্রায়-মৃত মানুষের দেশ বা এক মহা-শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন এই চরম-স্বাধীনতাভোগী শাসকের দল। এই 'শকুনি-গৃধিনী'দের নিকট হইতে মনুষ্যোচিত, বিশেষ করিয়া ভদ্র মানুষের, কৃতজ্ঞ মানুষের, শিক্ষিত মানুষের আচার-ব্যবহার আশা করা বেকুবি ছাড়া আর কি হইতে পারে?

কবি বলিয়াছিলেন—"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে···" কিন্তু সে তখনকার কথা, যখন বাঙ্গলা দেশে প্রফুল্ল-অতুল্য-শঙ্করদাস-শ্যামাদাস-বিজয়-অজয়-আভা-মায়া প্রভৃতির মত এত মহৎ এবং এত সর্বত্যাগী, মহাপণ্ডিত এবং নিঃস্বার্থ দেশসেবক-সেবিকাতে পূর্ণ ছিল না। সেই সময়কার বাঙ্গলা দেশে (অখণ্ডিত) ছিলেন মাত্র কয়েকজন সামান্য শিক্ষিত ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তি—যেমন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, অরবিন্দ, ভূদেবচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, গুরুদাস, কৃষ্ণকুমার, জগদীশ-চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রামানন্দ, ব্রজেন শীল, সুভাষচন্দ্র, শাসমল, যতীন্দ্রমোহন এবং এই শ্রেণীর আরো কয়েকজন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর, প্রায় অশিক্ষিত-অনুদার এবং অ-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহিত অদ্যকার খণ্ডিত বাঙ্গলার মহামানব এবং মহাশিক্ষিত নেতাদের (বিশেষ করিয়া কংগ্রেসী) কোন তুলনা করাই যায় না। যে এই চেষ্টা করিবে সে মহা-বাতুল বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বর্গত শেষোক্ত সামান্য ব্যক্তিদের নিকট আজ বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞ থাকিবার, তাঁহাদের স্মরণ করিবার, তাঁহাদের আবির্ভাব এবং তিরোধান দিবস শ্রদ্ধার সহিত পালন করিবার কি এমন হেতু আছে আমরা ভাবিয়া পাই না! মহা-মহা রাজ-কর্ম এবং বিষম দায়িত্বভার অবহেলা করিয়া—রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রভৃতির সমাধিক্ষেত্রে বিশেষ দিনে হাজিরা দেওয়া আজকার বিরাট্ ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য নহে, উচিতও নহে (বিশেষ করিয়া যখন নিমতলা এবং কলিকাতার অন্যান্য শ্মশান ঘাটে—করদাতাদের অর্থ-শ্রাদ্ধ করিয়া ক্রীত কর্ত্তাদের 'আরো-বিরাট্' বহুমূল্য গাড়িগুলি রাখিবার উপযুক্ত গারাজ বা অন্য ব্যবস্থা নাই)!

এ-সব কাজে মহামান্যা রাজ্যপালিকার হাজির হইবার সময় কোথায়? তাঁহার প্রাসাদের অতি নিকটেই কার্জ্জন-পার্কে সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি অবস্থিত। সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি-দিবসে রাজ্যপালিকা তাঁহার পুণ্য-দর্শন দানে সুরেন্দ্রনাথমূর্ত্তিকে কৃতার্থ করিবার সময় পাইলেন না, অথচ এই সুরেন্দ্রনাথকেই, রাজ্যপালিকার স্বর্গতা মাতা বহুবার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম এবং ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিয়াছি! আমাদের রাজ্য-পালিকার অনেক মহত্তর কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, যেমন শ্বেত-ব্যাঘ্রের (ভুল) নামকরণ, চিড়িয়াখানায় গিয়া পীড়িত' শ্বেত-ব্যাঘ্রের খোঁজ খবর লওয়া, বিশেষ

বিশেষ সভা-সমিতিতেও তাঁহাকে হাজিরা দিতে হয়, কাজেই তাঁহাকে কোন দোষ দিব না। বিশেষ করিয়া রাজ্যপাল এবং পালিকারা দল-ও-ব্যক্তি নিরপেক্ষ!

কিন্তু ২রা অক্টোবর, ৩০শে জানুয়ারী—??

মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারী ও কংগ্রেসী নেতাদের শত শত সারিবন্দী গাড়ি বারাকপুরে যায়। এই বিচিত্র শ্রদ্ধা-শোভাযাত্রায় রাজ্যপালিকাও থাকেন। এ মহাকর্ত্তব্য পালন না করিয়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। দিল্লীর আদেশ। উক্ত দুইটি দিনে বারাকপুরে হাজিরার উপর বর্ত্তমান কর্ত্তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। খুব সম্ভবত ২রা অক্টোবর এবং ৩০শে জানুয়ারীর 'হাজিরা-রেজিষ্টার' দিল্লীর মোগল-এ-আজমের নিকট নিয়মিত এবং যথাকালে পাঠাইতে হয়!

আর বাঙ্গলার সাহিত্যিক? রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন ইঁহাদের পক্ষে আজ বৃথা সময় নষ্ট। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা তথা সমগ্র ভারতের সাহিত্যিকদের প্রধান এবং একমাত্র কর্ত্তব্য কবীরের কুবের ভাণ্ডারের উপর সদা এবং স-লোভ দৃষ্টি রাখা। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা রবীন্দ্র-পুরস্কারের উপরেই ইঁহাদের লোলুপ-'শ্রদ্ধা' প্রকট। 'ইমান অপেক্ষা ইনাম' বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের নিকট আজ অধিকতর কাম্য এবং ধ্যানের বস্তু।

গুণীর আদর

দেশে আজ প্রকৃত গুণীর আদর নাই, একথা একমাত্র অতি-নিন্দুক ছাড়া অন্য কেহ বলিবে না। গত দুই-চার বৎসর যাবৎ—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের একটি মহাপুণ্য কার্য্য হইয়াছে ১৫ই আগষ্ট সপ্তাহে "গুণী" সম্বর্দ্ধনা। এই গুণীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া সিনেমা-থিয়েটারের নট-নটীদেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে বিদেশে (রাশিয়াতে) 'শ্রেষ্ঠ'-অভিনেত্রীর মর্য্যাদা-প্রাপ্তা এক নটীর বিষম সম্বর্দ্ধনার পৌরোহিত্য করিতে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে (প্রজাদের) পয়সা ব্যয় করিয়া আকাশযানে দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিতে হয়। এই পুরোহিতের ভাষণেই আমরা জানিতে পারিলাম: "৫০ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ (নামক এক ব্যক্তি!) নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আবার ৫০ বৎসর পরে আপনাদের (আমাদেরও কম নয়) প্রিয় নটী 'আন্তর্জ্জাতিক' (কথাটা ঠিক হইল কি? 'রাশিয়াটিক' বলিলে বোধহয় ঠিক হইত!) সম্মান লাভ করিলেন। এই সম্মান তাঁহার প্রতিভার স্বীকৃতি। ইহা প্রকৃতই (মহান্‌) আনন্দের বিষয়।"

এ বিষয় পত্রিকান্তরে মন্তব্য করা হইয়াছে:

"প্রায় স্যাণ্ডোগেঞ্জী পরিহিতা '...' সেন মেডিড্ডি মহাশয়ের নিকট হইতে অভিনন্দন-পত্র লইতেছেন, তাহার চিত্র, আপাতদৃষ্টিতে যতই মনোরম (এবং লোভনীয়) হউক, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির সহিত ইহার অনেকখানি ফারাক। এ ফারাক শুধু আজ নহে, চিরদিনই থাকিবে। মাড়োয়ারী মাদ্রাজীতে সমগ্র বাঙ্গলা দেশকে ধ্বংস করিয়া দিলেও বিদ্যাসাগর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিতে '—' সেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্র্যাকেটায়িত হইয়াছেন—নির্ব্বংশ রবীন্দ্রনাথের (বুকে?) ইহা অপেক্ষা নিদারুণ আঘাত আর কিছু নাই। বাঁধা অবস্থায় মার খাইতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, কিন্তু এই সাত পাকে বাঁধিয়া যাহারা আমাদের মারিল, তাহারা ওস্তাদের মার মারিয়াছে।" '...' সেন সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ এ-মারকে কিন্তু প্রসন্নবদনে অবাঙ্গালীর তরফ হইতে বাঙ্গালীকে প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করেন। মার খাইয়া হাততালি দান—ইতিহাসে এই প্রথম!

গুণীর সমাদর ভাল, কিন্তু গুণীকে সম্মান-সম্বর্দ্ধনা জানাইবার সময়—তাঁহার বিবিধ গুণাবলীর কিছু পরিচয় সভাস্থ জনগণকে জানানো কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। সোভিয়েট রাশিয়া (যেখানে 'পথের পাঁচালী'র মত বিশ্ব-প্রশংসিত চিত্র অবহেলিত হইয়া 'আওয়ারা'র মত একটা বাজে হিন্দী চিত্র জনসম্বর্দ্ধনা পায় এবং যে দেশে পণ্ডিত নেহরু অপেক্ষা অধিকতর জনসমাদর লাভ করে রাজ কাপুর নামক জনৈক অতি সাধারণ নট) কর্ত্তৃক প্রদত্ত সম্মান, বিশেষ করিয়া আর্টের ক্ষেত্রে, এমন কিছু অলৌকিক-অসাধারণ নহে, যাহা লইয়া এত হৈ চৈ করা যায়।

রাজ্য কংগ্রেস এবং বিশেষ এক শ্রেণীর ফড়ের দল গুণীর আদর করিতে নূতন শিক্ষালাভ করিয়াছেন—এবং এই গুণী-নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী নেতা এবং কর্ম্মকর্ত্তাদের নিজেদের বিষম বিদ্যাবুদ্ধিও প্রকট হইতেছে। (৯-ক্যারেট' ব্যক্তির নিকট '১৪-ক্যারেট' অবশ্যই বহু মূল্য বিবেচিত হইবে।) সারাদিন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া যে সব মধ্যবিত্ত ঘরের প্রবীণা গৃহিণী কন্যা-নাতনীর সঙ্গে ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পাশ করেন—তাঁহারা বোধহয় গুণী-পদবাচ্য নহেন! গুণীর আদর-অভ্যর্থনা হইতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না মধ্যবিত্ত ঘরের কোন গৃহিণীর, যিনি নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব করিয়া, সন্তানদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, নিজেকে সর্ব্ববিধ আরাম

বিলাস হইতে বঞ্চিত করিয়া, গুণী-বিলাসী মহলে তাঁহার কোন সমাদর বা সামান্য একটু প্রশংসাও লাভ হইল। দিনের পর দিন, স্বামীর সামান্য আয়ে (মাসিক ২০০৲ টাকার বেশী নহে) পরিবারের ৭।৮ জন লোকের আহার সংস্থান করিতেছেন নিজে না খাইয়া, অবিশ্রাম কঠোর পরিশ্রম করিয়া, সংসারের তথা দেশের জন্য, প্রাণপাত করিতেছেন, বিত্তহীন কিন্তু চিত্তসম্পদে মহীয়সী এমন নারীর সংখ্যা একটু চেষ্টা করিলেই অনেক পাওয়া যাইবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে। কিন্তু এ চেষ্টা করিবে কে এবং কেনই বা করিবে? সংবাদপত্রে এই শ্রেণীর নারীর সচিত্র বিবরণ বর্ত্তমান পাঠক সমাজ চোখেও দেখিবেন না, পড়া ত দূরের কথা এবং ইহাতে একখানা বেশী কাগজও বিক্রয় হইবে না।

বিগত কালে সংবাদপত্র দেশের জনমত গঠন এবং পরিচালনা করিত—বর্ত্তমানে সবই উল্টা হইয়াছে। রথও স্বাভাবিক সোজা চলে না—কিন্তু উল্টাইয়া দিলে সেই রথের চাকা পাঠক-সমাজের ঘাড়ের উপর দিয়া সবেগে চলিবে। প্রসঙ্গত ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, যে-সব বিখ্যাত পত্রপত্রিকা বড় বড় নীতিবাক্য এবং আদর্শ বুলি ছাপেন, সেই সব পত্রপত্রিকাই 'কৌলার' কাহিনী এবং অর্দ্ধ এবং তিনপোয়া নগ্ন বিলাসিনী-নারীর এবং নটীর চিত্র প্রকাশে প্রতিযোগিতা করিতে লজ্জা অনুভব করেন না।

ঝড়ের সঙ্কেত

গত কিছুকাল হইতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিতা অল্পবয়স্কা মহিলাদের মধ্যে নূতন একটা বিপদের সঙ্কেত দেখা দিয়াছে। প্রায়ই শুনা যাইতেছে—শিক্ষিতা (?) সুন্দরী যুবতী মহিলা—পারিবারিক গণ্ডির বাহিরে সিনেমা-শিল্পী জীবনের প্রতি সবিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিতেছেন, অনেকে এই আকর্ষণের টানে পেশা হিসাবে সিনেমা-অভিনেত্রী বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ, শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রেই অত্যধিক অর্থলোভ। সংসারে যাঁহাদের অভাব নাই, স্বামী যেখানে বেশ ভাল আয় করেন, এবং সেই আয়ে সংসারের সকল খরচাই সহজ ভাবে মিটিয়া যায়, তাঁহাদের পক্ষে হঠাৎ সিনেমা অভিনেত্রীর পেশা গ্রহণের কারণ অর্থলোভ ছাড়া আর কি হইতে পারে? সাক্ষাৎ ভাবে এমন কতকগুলি ঘটনার কথা জানি, যেখানে নারী একবার সিনেমার 'টানে' সাড়া দিয়াছেন, পরিবারের গণ্ডির বাহির গিয়াছেন, ভবিষ্যতে ইচ্ছা হইলেও তাঁহাদের আর ফিরিবার পথ থাকে না। স্বামী পরিবার সন্তানদের প্রতি প্রেম, ভালবাসা স্নেহ কর্ত্তব্যও ইঁহাদের নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়! গত তিন-চার বছরের মধ্যে এই প্রকার কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে, আরো কয়েকটি ঘটিবার অপেক্ষায়। কথাটা সাধারণ ভাবেই বলিলাম—কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

বিশেষ কয়েকজন চিত্র-পরিচালক তাঁহাদের নূতন চিত্রের জন্য প্রতিনিয়ত নূতন মুখ খোঁজেন, কারণ, দর্শকদের কাছে 'নূতন' মুখের 'আকর্ষণ' নাকি ভয়ানক। বলা বাহুল্য ইঁহারা নূতন মুখ সন্ধান করেন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের অল্পবুদ্ধি এবং অভাবগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভদ্রবেশধারী এক শ্রেণীর দালালও আছে। সিনেমার মোহ এবং অর্থলোভ অপরিণত-বুদ্ধি অল্পবয়স্কা মেয়েদের পক্ষে প্রায়ই দুর্ব্বার হইয়া ওঠে এবং যথাসময়ে অভিভাবকের বাধা না পড়িলে সিনেমার জালে অনেক নারীই পড়িতে বাধ্য হয়। এবং এই সিনেমার 'ঘাট' হইতে অগাধ-জল বেশী দূর নহে! অথচ, যে-সব পরিচালক শিক্ষিতা, সুন্দরী, যুবতী নারীর সন্ধান করেন, তাঁহাদের ছবির জৌলুষ তথা আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য, তাঁহাদের নিজেদের পরিবারে সিনেমা-অভিনেত্রী হইবার মত সুযোগ্যা কন্যা, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতৃবধূ, এমন কি নিজের স্ত্রী থাকিতেও—সে-দিকে ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না কেন? অভিনেত্রী-জীবনের চোরাবালির সব সন্ধান তাঁহাদের জানা আছে বলিয়াই তাঁহারা 'স্বকীয়া'দের তফাতে রাখিয়া 'পরকীয়া'-দের প্রতি দৃষ্টি দেন। এই শ্রেণীর চিত্র-পরিচালক 'নিজেরা আচরি' ধর্ম্ম' পরকে শিখাইবার পথ সযত্নে পরিহার করেন।

সিনেমার নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সিনেমা যেখানে সমাজ-দেহে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে, সে-দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রচেষ্টা আশা করি অন্যায় বিবেচিত হইবে না।

একদা অ-কুল হইতে যে-সব নারী অভিনেত্রী-জীবন গ্রহণ করিত, তাহাদের অনেকে এখন 'কুলে' প্রবেশ করিয়া ভদ্র পারিবারিক জীবন গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভের প্রয়াস করিতেছে এবং অনেকের জীবনধারা বিপরীতমুখী হইয়াছে। আবার অন্যদিকে 'কুল'-নারী—অর্থলোভ এবং সিনেমার মোহে অ-'কুলে' পাড়ি দিতে ব্যগ্র হইয়াছে! ফলে অনেকে দু-কুল হারাইয়া অকুলে পড়িয়াছে। বলিতে লজ্জা হয়—বিবিধ পত্রপত্রিকা এই প্রকার পথভ্রষ্ট মহিলাদের সচিত্র জীবনকথা সবিস্তারে

প্রকাশ করিয়া এক শ্রেণীর যুবতীর মনে সিনেমার নটী-জীবনকে একটা 'গৌরবময়' আদর্শরূপে প্রতিফলিত করিতেছে। বহু নারীর চিত্ত-বিভ্রান্তিও ঘটাইতেছে।

এ-বিষয় বর্ত্তমান নিবন্ধে সূচনামাত্র করিলাম। প্রয়োজন হইলে আরো বিশদ আলোচনা ভবিষ্যতে করিব। আর একটা কথা, যে-দেশে সিনেমার জন্ম, সেই দেশের রাষ্ট্রকর্ত্তা, পদস্থ সরকারী ব্যক্তি, রাজনৈতিক পার্টির লোক এবং ভদ্রসমাজ সিনেমা-নটীদের লইয়া এত হৈ-চৈ, এত ঢাক-ঢোল বাজায় না। নট-নটী-সমাজের সহিত ঐ সব দেশের সাধারণ ভদ্র-সমাজের একটা সীমারেখা আছে, যাহা কোন পক্ষই ভঙ্গ করে না। আমাদের পোড়া বাঙ্গলায় সবই বিচিত্র, বিসদৃশ, বিচিত্র।

আপৎকালে সরকারের দারুণ ব্যয়সঙ্কোচ!

দেশের জনগণকে যখন শাসনকর্ত্তারা—সর্ব্ববিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া প্রতিরক্ষা জোরদার করিবার অমূল্য বাণী প্রতিনিয়ত দান করিতেছেন—ঠিক সেই সময়েই, সেই আপৎকালেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি ভীষণ ভাবে কি নিদারুণ ব্যয়সঙ্কোচ করিতেছেন তাহার নমুনা সামান্য কিছু দিতেছি :

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে "দার্জ্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্সিয়াঙে মন্ত্রিসভা এবং কয়েকটি সরকারী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য মোট ৪৫ হাজার ৪৮১ টাকা ১৬ নঃ পঃ ব্যয় হইয়াছে"। বিধান সভার একজন সদস্য প্রশ্ন করেন : জরুরী অবস্থায় এই খরচ কি দেশপ্রেমিকদের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে? প্রশ্নের জবাব দেন পশ্চিমবঙ্গের হঠাৎ-দেশপ্রেমিক এবং সহসা-কংগ্রেসী-নেতা অর্থমন্ত্রী সর্ব্বত্যাগী এবং দেশকল্যাণে নিয়োজিত দেহমন শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জ্জী। অর্থমন্ত্রী বলেন : "জরুরী অবস্থায় জরুরী কাজের জন্যই দার্জ্জিলিঙ্ যাওয়া হয়।" জবাব অতি যথার্থ হইয়াছে, কারণ এই আপৎকালে কলিকাতার পচা-গরমে (তাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষেও) পশ্চিমবঙ্গের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক মন্ত্রিমণ্ডলী দেশরক্ষার পরিকল্পনা বিষয়ে চিন্তা-পরামর্শ কখনই করিতে পারিতেন না। একমাত্র এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মহাশয়গণ সর্ব্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া দেশের জন্য, দেশের জনগণের স্বার্থেই দার্জ্জিলিং যাইতে বাধ্য হন। যে সকল মন্ত্রী দার্জ্জিলিং গমন করেন, তাঁহাদের সকলেই গ্রীষ্মকালে হিমালয়বাসে চির-অভ্যস্ত এবং এই হিমালয় গমন তাঁহাদের দেহ এবং মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন। চিরকাল তাঁহারা নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়াই বছরের একটা বিশেষ সময়ে দার্জ্জিলিং, মুশৌরী, কাশ্মীর, উটি এমন কি সুইজারল্যাণ্ড্ পর্য্যন্ত সপরিবারে বিমানযানে গিয়া থাকেন ইহা কে'না জানে? কাজেই আজ যাঁহারা আমাদের অর্থাৎ গরীব প্রজাকুলের জন্য নিজেদের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া এত মানসিক এবং দৈহিক শ্রম স্বীকার করিতেছেন, তাঁহাদের দার্জ্জিলিং, কার্সিয়াং এবং কালিম্পং ভ্রমণের কারণে মাত্র ৪৬ হাজার টাকা ব্যয় লইয়া এত হৈ-চৈ করা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম এবং প্রজাকুলের পক্ষে একান্ত অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি।

জনকল্যাণ কাজে টেলিফোন

বিধান সভায় প্রশ্নোত্তরকালে বিশেষ একজন আধপোয়া মন্ত্রীর এক বছরে মাত্র ৬৪৫৮টাকার টেলিফোন বিল হইয়াছে—অবশ্যই এ-টাকা করদাতাদের প্রদত্ত অর্থ হইতে পরিশোধ করা হইয়াছে কিংবা হইবে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে এই রাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রত্যহ কম-সে-কম ৯ ঘণ্টা ৫১ মিনিট কেবল মাত্র টেলিফোনেই বাক্যালাপ করিয়া কাটাইতে হইয়াছে! কি বিষম কষ্টকর দুর্ব্বিষহ জীবন দেখুন! আমরা ৫।৭ মিনিট টেলিফোনে কথা বলিতে হাঁপাইয়া উঠি কিন্তু অক্লান্তকর্মী এই বিশেষ মন্ত্রী মহাশয় নিজের সকল কষ্ট তুচ্ছ করিয়া, 'বে-হঁশি' হইয়াও রাজকার্য্য চালাইবার জন্য একাদিক্রমে প্রত্যহ প্রায় দশ ঘণ্টা টেলিফোন রিসিভার কানে লাগাইয়া বিরামহীন বক্ বক্ করিয়াছেন ৩৬৫ দিন ধরিয়া! এ-কাজটা যাঁহারা খুব সহজ কিংবা বিলাস বলিয়া মনে করেন—তাঁহারা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব মাত্র, সামান্য চাউল-ডাইল, চিনি, গম, মশলা, বস্ত্রাদি, তরি-তরকারি প্রভৃতির ঘাটতি এবং নাগালহীন মূল্যবৃদ্ধির অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া অযথা চিন্তায় কালক্ষেপ করেন। কিন্তু রাষ্ট্র-শাসনভার যাঁহাদের যোগ্যহস্তে, তাঁহাদের উপরি-উক্ত বিষয় লইয়া চিন্তা করিবার সময় কোথায়—প্রয়োজনই বা বা কি? তাঁহারা টেলিফোন এবং মোটর গাড়ির জন্য পেট্রল খরচা করিতেই দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকেন। (বলা বাহুল্য—সবই সরকারী অর্থাৎ, করদাতাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া!')

"অন্যান্য মন্ত্রীরাও ৩ হইতে ৫।৫॥ হাজার টাকা টেলিফোন বাবদ খরচ করিয়াছেন।" স্বীকার করি,—টেলিফোনগুলি যে 'জনস্বার্থের খাতিরেই' করা হইয়াছে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ পূর্ত্তমন্ত্রী সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে, আশুবাবুর ফোনালাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য 'জনস্বার্থের খাতিরে' প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

(আশুবাবু কি রাওয়ালপিণ্ডির আয়ুব খাঁ এবং পিকিং-এর চৌ এন লাই-এর সঙ্গেই সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতেছিলেন ?) গত অক্টোবর মাসে চীনা আক্রমণের সময়ই তাঁর ট্রাঙ্ক কলের বিলের পরিমাণ উঠিয়াছিল ৬৩৯৲ টাকা—ইহা নিশ্চয়ই কূটনৈতিক দিক্‌ হইতে তাৎপর্য্যপূর্ণ ! কিন্তু মুশ্‌কিল বাধিয়াছে এই যে, আশুবাবু যখন এই সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ টেলিফোনে সারিতেছেন, তখন ফোনের মাপে অন্যান্য মন্ত্রী এমন কি মুখ্যমন্ত্রী পর্য্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁর কাছে খাটো হইয়া পড়িয়াছেন।

"কিন্তু পরিহাসের কথা থাকুক। এই ফোনালাপ-প্রমত্ত মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরকালে বিধান পরিষদে একেবারে নির্ব্বাক্‌ ছিলেন। তথাপি তাঁর সম্বন্ধে জনসাধারণের কতকগুলি জিজ্ঞাস্য আছে। এক নম্বর হইতেছে যে, কলিকাতায় বহু ডাক্তার কিম্বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা যেখানে একটি টেলিফোন আদায় করিতে নাজেহাল হইয়া যান, সেখানে তাঁর নামে ৪টি ব্যক্তিগত টেলিফোন এবং ১টি সরকারী টেলিফোন কিভাবে বরাদ্দ হয় ? দুই নম্বর, স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে, তাঁর বাড়ীতে সরকারী টেলিফোনটি যদৃচ্ছভাবে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতেও অবিরাম ব্যবহার করা হইয়াছে। সরকারী অর্থের অপচয়ের কথা বাদ দিলেও, মন্ত্রীর নাম লইয়া অনভিপ্রেত উদ্দেশ্যে এই টেলিফোন ব্যবহার করা হয় নাই, এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি ? এ সম্বন্ধে যদি আইন সভায় তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নাও হয়, মুখ্যমন্ত্রী কি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিবেন যে, এ বিষয়ে নিরপেক্ষ এবং দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তির দ্বারা তিনি তদন্ত অনুষ্ঠান করিবেন ? যেমন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে ডি মালব্যের ব্যাপারে বিচারপতি শ্রী এস কে দাশকে তদন্তের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

"যাই হোক্‌, আমরা এই প্রশ্নটি তুলিতেছি কারণ ঘটনাটি প্রথম শ্রেণীর কেলেঙ্কারীর পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে। বিশেষত জনসাধারণ যখন কৃচ্ছ্রতা এবং কঠিন আত্মত্যাগের জন্য বাধ্য হইতেছেন তখন এই সন্দেহজনক ফোনালাপের দৃষ্টান্ত ধামাচাপা দেওয়ার বিষয় হইতে পারে না।"

(প্রায় ৭ হাজার টাকার টেলিফোন খরুচে মন্ত্রী বলেন যে, তিনি ৩ হাজার টাকার বাড়তি টেলিফোন বিল নিজের ট্যাঁক হইতে শোধ করিয়া দিবেন—করিয়াছেন কি ?)

তদন্ত ব্যবস্থা যদি হয় (হইবে না ইহা নিশ্চয়) তাহা হইলে সেই তদন্তে মন্ত্রী মহাশয়দের বছরে ৩ হইতে প্রায় ৭ হাজার গ্যালন পেট্রোল খরচার রহস্যও সমাধান হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রীদের মাসিক ৭৫ গ্যালন পেট্রোল বরাদ্দ—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিশেষ একজন মন্ত্রী এক বছরে প্রায় ৭ হাজার গ্যালন পেট্রোল খরচ করিলেন কেন এবং সরকার হইতে তাহার মূল্যই বা কেন দেওয়া হইল ? অর্থমন্ত্রী শঙ্করদাস বিধান সভায় নিজমুখে বলেন যে, প্রত্যেক মন্ত্রী একটি গাড়ি এবং ৭৫ গ্যালন পেট্রোল অথবা ইহার পরিবর্ত্তে মাসে ৩৫০৲ টাকা গাড়ি-ভাড়া পাইবার অধিকারী। মাসে ৭৫ গ্যালনের বেশী পেট্রল খরচ করিলে অতিরিক্ত পেট্রলের ব্যয় মন্ত্রীদের নিজদিগকে দিতে হয়। এই ৭৫ গ্যালন পেট্রল খরচ করিয়া মন্ত্রীরা সরকারী-বেসরকারী কাজে যেখানে যেমন খুশি যাইতে পারেন বলিয়া অর্থমন্ত্রী জানান

মাসে ৭৫ গ্যালন অর্থাৎ বছরে ৯০০ গ্যালন—কিন্তু এই পেট্রল কেন এবং কি হিসাবে বছরে ৩ হইতে ৭ হাজার গ্যালনে দাঁড়ায় ?

অর্থমন্ত্রীর সবিনয় এবং ভদ্র 'উত্তর দান' অতি চমৎকার ! তাঁহার শ্রীমুখের উত্তর শুনিলে মনে হয় যেন তিনি আদালতে বিরুদ্ধপক্ষের সাক্ষী বা উকিলকে সওয়াল জবাবে ঘায়েল করিতেছেন। অর্থমন্ত্রী ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউন, তাঁহার মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিধান সভার সদস্যগণ তাঁহার জমিদারীর কৃপাপ্রার্থী দরিদ্র প্রজা নহে। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় মন্ত্রীদের মুখের মত জবাব দিবার মত সদস্য নাই দেখা যাইতেছে।

অলৌকিক শুভ-সংবাদ

কলিকাতা, ২৭শে আগষ্ট—"পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতা ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ আগামীকাল ৫৯ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিতেছেন !

শ্রীঘোষ কলিকাতায় আছেন। তাহার উনষষ্টিতম জন্মদিবস আগামীকাল তাঁর কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের বাসভবনে অনাড়ম্বরে পালন করা হইবে।" ৫৯ বৎসরে জন্মদিবস পালন অতি শুভ এবং এই উপলক্ষ্যে আমরাও অতুল্যবাবুকে শুভ ইচ্ছা জানাইলাম। এই শুভদিনটি (দেশের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে)—অনাড়ম্বরেই (?) প্রতিপালন করা হয়।

"কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের বাড়ীতে দোতলার ঘরে বসেছিলেন শ্রীঘোষ। ভোর পাঁচটা থেকে সুরু হয়েছে অনুগামীদের আগমন। হাতে ফুলের তোড়া অথবা মালা; অনেকের সঙ্গে তার ওপরও মিষ্টির ঠোঙ্গা বা উপহারের প্যাকেট।

"জিজ্ঞেস করলেন একজন, শুভদিনে আবার কি ভাবছেন?

"হেসে উত্তর দিলেন, বয়স হয়েছে, ভাবছি এবার রাজনীতি থেকে অবসরই নেব। সরকারী কর্ম্মচারীদের যদি ৫৮ বছরে অবসর নিতে হয়, তবে সরকার যাঁরা চালান তাঁরা বুড়ো বয়সেও কাজে বহাল থাকবেন কেন? (এর জবাব নেহরু-প্রফুল্ল দিতে পারেন।)

"কিন্তু সত্যিই কি অবসর নেবার মত বার্দ্ধক্য নেমে এসেছে শ্রীঘোষের দেহে বা মনে? মনে হয় না; বুধবারও মনে হ'ল না। প্রাণখোলা হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন অতিথিদের, সারাদিন ধরে।

"মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন এলেন দুপুর, দেড়টা নাগাদ। জন্মদিনে অনুজ সহকর্ম্মীর জন্য উপহার: একখানা মাদুর, একজোড়া তাকিয়া, খদ্দরের ধুতি এবং পানিক্করের লেখা 'দি ফাউণ্ডেশন অফ নিউ ইণ্ডিয়া'। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা 'অতুল্যর জন্মদিনে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন। ২৮শে আগাষ্ট, ১৯৬৩।'—"

সংবাদে প্রকাশ যে অতুল্যবাবুর কারবালা ট্যাঙ্কের বাসভবনে জনসমাগমে তিল ধারণের স্থান ছিল না!

শ্রীঘোষের জন্মদিনে কয়েকটি দৈনিকপত্রে তাঁহার উর্দ্ধবাহু (নাতনী স্কন্ধে) কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত হয়। ঘরোয়া পরিবেশে অতুল্যবাবুর এই 'পরম স্নেহময় দাদু-চিত্র' সত্যই অপূর্ব্ব এবং অতি সময়োপযোগী হইয়াছে।

অতুল্যবাবুর জন্মদিনে প্রকাশিত চিত্রগুলি দেখিয়া আমাদের বারবার কেবল হতভাগিনী 'ফুলমালার' কথা মনে হইতেছিল। কেন জানি না।

—কিন্তু—

শুভ-জন্মদিনে অতুল্যবাবু রাজনীতি হইতে বিদায় গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন কেন? অতুল্যবাবু ঘোষণা করেন—"বয়স হয়েছে, ভাবছি এবার রাজনীতি থেকে অবসর নেব"! পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশার কথা, বাঙ্গালী জনগণের ভবিষ্যতের কথা এবং সর্ব্বোপরি প্রাদেশিক 'সুখী-পরিবার' কংগ্রেসের কথা চিন্তা করিয়া অতুল্যবাবুকে করজোড়ে নিবেদন জানাই—তিনি যেন আমাদের অকূলে ভাসাইয়া হঠাৎ কারবালা ট্যাঙ্কের অতলজলে আত্মগোপন না করেন! 'ওঁদের' নেহরু যদি ৭৪ বছর বয়সেও যুবক সাজিয়া চাচাগিরি করিতে পারেন, তাহা হইলে 'আমাদের' শ্রীঅতুল্য ঘোষও কেন—এই সামান্য ৫৯ বৎসর বয়সে কিশোর বা বালক বলিয়া ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করিবেন না? কেন্দ্রের 'মধ্যমণি' নেহরু, বাঙ্গলার 'কোহিনুর' শ্রীঅতুল্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার জীবন আরো অন্তত ৫৯ বছর অটুট থাকুক এই কামনা করি। প্রফুল্লহীন বাঙ্গলা এবং অতুল্যহীন বাঙ্গলা কংগ্রেস? এ-কখনই হইতে পারে না! আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

কামরাজ-"জোলাপ"

শ্রীকামরাজের প্রস্তাব এ-আই-সি-সিতে বহুত বহুত আলোচনা-সমালোচনার পর গৃহীত হইবামাত্র কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীদের মধ্যে পদত্যাগের এপিডেমিক লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ৬ জন পাকা খুঁটি ইতিমধ্যেই আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গদি ছাড়িয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহিত পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য জড়িত—কাজেই এ-বিষয় সামান্য দু-চার কথা মাত্র বলিব, বিশদ আলোচনা যোগ্যতর-ব্যক্তি অন্যত্র করিবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাঁহারা গদি ছাড়িয়াছেন, কংগ্রেসের কাজে আত্মদান করিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় করিতে, তাঁহারা কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক বৃন্দাবন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া "পাদমেকং ন গচ্ছামি"!

কামরাজ প্ল্যানে মন্ত্রী সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাবও আছে এবং সেই প্রস্তাব মত কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বর্ত্তমান মন্ত্রী সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। এতদিন প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রীদের শ্রীমুখ হইতে বারবার শুনা গিয়াছে যে, দেশের এই আপৎকালে মন্ত্রী সংখ্যা কিছুতেই কমান যাইতে পারে না। মন্ত্রী সংখ্যা কমাইলে নাকি বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় দেশের প্রতিরক্ষা এবং স্বার্থ বিঘ্নিত হইবে। অর্থাৎ দেশের প্রত্যেকটি মন্ত্রী দেশের বৃহত্তর স্বার্থ এবং কল্যাণের পক্ষে অপরিত্যাজ্য—অপরিহার্য্য! মন্ত্রী মাত্রেই নাকি এ সময় আমাদের স্বার্থেই এক একজন MUST!

কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, কমসংখ্যক মন্ত্রী দ্বারাও কাজ চলে এবং চলিবে!

যদি অল্পসংখ্যক মন্ত্রী লইয়াও কাজ চলে তবে প্রশ্ন—সেই কথাটা কি টের পাওয়া গেল, ভারতীয় গণতন্ত্রের 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে' সালে? এত মন্ত্রী-প্রায়মন্ত্রী-উপমন্ত্রী এতকাল ধরিয়া পুষিয়া রাখা হইয়াছিল কেন? তাঁহাদের বিহনেও কাজ যদি না আটকায়, তবে লোকে ধরিয়া লইবে, ফাইলের কোণে টেঁড়াসই বই মন্ত্রীদের প্রকৃত কাজ বলিয়া কিছু নাই। কাজ চালায় আমলায় অথবা অন্যে—যে ক্যাবিনেট প্রথা লইয়া এত বড়াই তাহা একটা ফাঁপানো ঠাট! মন্ত্রিত্বের দায়-দায়িত্ব তেমন কিছু দুর্বহ যে নহে, তাহার সাক্ষী শ্রীনেহরু নিজে। বরাবর তিনি প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এক সময় উপরন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রীও ছিলেন। স্বরাষ্ট্র ইত্যাদি যখন যেমন প্রয়োজন তখনই তেমন একটার পর একটা ফাউ দপ্তরের ভার

লইয়াছেন— আকাদেমি প্রভৃতির সভাপতিত্বের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে অবান্তর। তাহা ছাড়া এত কথায় প্রয়োজন কি! নিত্যই ত দেখিতে পাই, কাজের বোঝা টানিয়াও সভায় সভায় বক্তৃতা আর ঘা রাদ্ঘাটনের ফুরসুত মন্ত্রীদের দিব্য জোটে। মূল কাজ অতি গুরুভার হইলে জুটিত কি?

প্রশাসনিক জমির মাটি কাটিয়া পার্টির পুকুর ভরাট হইতেছে, হউক। তবু একটা খটকা থাকে। এখনই স্থানীয় এম্‌-পি, এম-এল-এ, মণ্ডল-নেতাদের দাপটে আমলা-অফিসারেরা, শোনা যায়, তটস্থ। পার্টির প্রতাপ বাড়িলে (যেরূপ চূড়ামণিযোগ ঘটিতেছে, তাহাতে বাড়িবেই) মাঝে মাঝে অচল অবস্থার উদ্ভব হইবে না ত? পার্টি ক্রমশ একটা সমান্তর (বিকল্প?) সরকারের চেহারা লইলে পদে পদে অন্তরায় সৃষ্টি হইবে কিনা, কায়কল্প দাওয়াইয়ের প্রশস্তিতে যাঁহারা গদগদ তাঁহারা সম্ভাবনাটা যেন বিবেচনা করিয়া দেখেন। যখন ঘরে শত্রু পরে শত্রু, তখন প্রশাসনে দ্বৈত দুর্বলতার অনুপ্রবেশের সুযোগ করিয়া দেওয়া মৃত্যুতুল্য হইবে।

কিন্তু এতখানি চিন্তা করিবার বা উতলা হইবার কোন কারণ নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ যে-সব মন্ত্রী বিদায় লইয়াছেন এবং লইবেন তাঁহাদের 'ক্ষমতা' না কমিয়া বৃদ্ধিই পাইবে! বর্ত্তমানে ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে—এ-ঘর হইতে ও-ঘরে গিয়া বসার মত। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববিদ্যা-সুন্দর নেহরু এবার যে ব্যবস্থাটা লইলেন তাহাতে পার্টি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে আর কোন পার্থক্য হয়ত থাকিবে না।

আর একটা বিষয় কয়জন লক্ষ্য করিয়াছেন জানি না—ব্যাপারটা এই যে,—এত বড় একটা ব্যাপারের সঙ্গে রাষ্ট্রের বা দেশের যে কোন সম্পর্ক আছে—সে বিষয় কেহ কোন কথাই বলার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এত বড় একটা ব্যাপার—কর্ত্তাদের মতে যাহা বৈপ্লবিক এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম—রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনের সম্পর্ক নাই—যা কিছু পরিবর্ত্তন তাহা এক এবং কেবলমাত্র কংগ্রেসের স্বার্থেই এবং কংগ্রেসী শাসন চিরকায়েম করার উদ্দেশ্য লইয়াই সংঘটিত হইল। দেশ, দেশের মানুষ, বাঁচুক মরুক—কাহারও কোন চিন্তা নাই, চিন্তা পার্টি অর্থাৎ কংগ্রেসকে বাঁচাইতেই হইবে তা যেমন করিয়া যে ভাবেই হোক্‌। কামরাজ দাওয়াই প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, কংগ্রেসী নেতাদের ক্ষমতার মোহ নাই—এবং তাঁহারা যে কোন সময় বৃহত্তর স্বার্থের (দেশের নহে, পার্টির) কারণে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না! এত বড় 'স্বার্থ' ত্যাগ নাকি দেশের লোককেও নব-ত্যাগীদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিবে! যথাকালে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি—দেশের এবং জাতির এই আপৎকালে সরকার এবং মন্ত্রীদের মধ্যে যে কাহারো কোন অযোগ্যতা বা ত্রুটি আছে, এ বিষয় প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন বড়কর্ত্তা ভাবিবার অবকাশ বা দেশকে বলিবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

কংগ্রেসী তথা বর্ত্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসনে জনগণ এবং দেশ নাকি খুশী আছে, তাহাদের কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট নাই, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে এই বিষম জরুরী অবস্থায় মাঝ-নদীতে হঠাৎ মাঝি বদলের কি প্রয়োজন ঘটিল? দেশের প্রশাসনিক কার্য্য যদি বর্ত্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা যথাযথ এযাবৎ চলিয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বারে যখন শত্রু সমাগত তখন শাসন ব্যাপারে এত ওলট-পালট করিবার কি দরকার ছিল—তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা অসম্ভব। অধুকার শাসকগুষ্টি একটা সামান্য নীতিকথা হয় ত জানেন না, আর না হয় ভুলিয়া গিয়াছেন—দুর্ব্বলতা স্বীকার করা বিপদ্‌জনক নহে, বিপদ্ তখনই ঘটে যখন দুর্ব্বলতা দূর করার চেষ্টা না করিয়া দুর্ব্বলতাকে গোপন করার চেষ্টাই প্রবলতর হয়।

জোড়া-বলদকে যে ঘোড়ারোগে ধরিয়াছে—তাহার চিকিৎসা-বিধানে বিলম্ব হইয়াছে। এখন বলদ যত শীঘ্র পঞ্চত্ব পায়, তাহার পক্ষে এবং গোয়ালের পক্ষেও ততই মঙ্গল।

অনাহার V. S. মৃত্যু—অনাহার মৃত্যু ঃ

গত কয়েক মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জিলায় অনাহারে বহু হতভাগ্যের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমরা ইহা লইয়া অন্য সকলের সঙ্গে অযথা বহু হৈ-চৈ করিয়াছি—কিন্তু এখন সরকারের সহিত প্রায় একমত হইয়াছি যে—পশ্চিমবঙ্গে কাহারও অনাহারে মৃত্যু ঘটে নাই। কারণ কি? কারণটা আর কিছুই নহে!

"অনাহার বস্তুটা গাড়ি চাপা পড়া, মাথায় ডাণ্ডা খাওয়া বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মত প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যু-সংঘটক ব্যাপার নয়। অনাহার হয়ত পাকস্থলীকে নিদারুণভাবে আলোড়িত করিয়া দেয়, নয় জলীয়াংশের আধিক্যে গোটা দেহটাকেই ঢ্যাবঢেবে করিয়া তোলে। অথবা নিঃশব্দে ক্ষয়জনিত শুষ্কতায় জীবনী শক্তি শোষণ করে। তারপর অনিবার্য্যভাবেই যা ঘটে, মানুষের ভাষায় তাহাকে মৃত্যু বলে। সুতরাং সরাসরি অনাহারে মৃত্যু কখনোই হয় না। বরাবরই তা হয় অনাহারজনিত একটা ব্যাধির প্রকোপে। কাজেই পাশ কাটাইব মনে করিলে তা কাটানোর সুযোগ আছে যথেষ্টই। কিন্তু

পাশ কাটানোর বুদ্ধিটা ঘাড়ে চাপে কেন? চাপে অনাহারে মানুষ মারা কোন দেশে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট থাকার পরিচায়ক নয় বলিয়া! এই জন্যই সরকারী বিবৃতির একটা ছক বাঁধা আছে, প্রয়োজন হইলেই সেটা বাজারে ছাড়িয়া অনাহার মৃত্যুকে নস্যাৎ করা হয়!"

(তথাকথিত 'শয়তান' ইংরেজ আমলেও যাহা করা হইত।)

কংগ্রেসী শাসনে আজ সাধারণ লোকের আয় খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যসূচীর সহিত তুলনা করিলে, কংগ্রেসী শাসক ছাড়া আর সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের শস্য-শ্যামলা জন্মভূমিতে শতকরা প্রায় ৮০ জন লোকের প্রাণ রক্ষা (আহার দিয়া) সরকারী ব্যবস্থার আওতায় নহে। একথা অবশ্য সত্য যে, দেশের কিছু সংখ্যক লোক চিরদিনই পেটে গোবর এবং গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করিত। এই হতভাগ্যের দল ভাবিত, এই ভাবে গঙ্গাযাত্রাই তাহাদের ভাগ্য এবং কপালের লিখন! কাজেই তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কোন কারণ ঘটিত না!

কিছুদিন হইতে কোন কোন 'রাষ্ট্রবিরোধী' এবং স্বার্থপর লোক এই হতভাগ্যদের বুঝাইয়াছে যে—আহার পাইলে ইহারা বাঁচিতে পারিত এবং এখনও পারে। কিন্তু করুণাহীন মুনাফাকামী সমাজ ও অসমান বণ্টন ব্যবস্থা ইহাদের খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সেই জন্যই এত অশান্তি! কাজেই আশঙ্কা করিতেছি, লোহিয়াজীর অন্যান্য বিস্ফোরক উক্তির মত এই অনাহার ব্যাখ্যানও আমাদের কর্তৃপক্ষকে বিষম কুপিত করিবে।

বর্তমান জরুরী অবস্থায় সরকারকে বিব্রত করিবার জন্য যাহারা ক্ষুধার্ত্ত মানুষকে 'আহার' দাবি করিতে প্ররোচনা দিতেছে—তাহারা অবশ্যই রাষ্ট্রবিরোধী! এবং এই সকল রাষ্ট্রবিরোধীদের ভারতরক্ষা আইনে আটক করা উচিত এবং কারাগারে ইহাদের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর পর্য্যায়ে রাখাও একান্ত প্রয়োজন!

ভারত-আবিষ্কারকের "নব-আবিষ্কার" !!

দিল্লীতে এক ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন—"বিলম্ব বা দীর্ঘসূত্রিতা দুর্নীতির কারণ। বিলম্ব ও দেরি করার বিরুদ্ধে একবার যদি আন্দোলন আরম্ভ করা যায়—তাহা হইলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিবে।"

পণ্ডিতপ্রবর বাণীসম্রাট্ আরো বলেন—"পুরাতন প্রথা ও রীতি পরিহার করিয়া নূতন চিন্তাধারা অবলম্বন করিলে ব্যয়ভার কতকটা লাঘব হইতে পারে।...আমরা চিরাচরিত পদ্ধতির ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি—ইহা ভারতের অগ্রগতির অন্যতম অন্তরায়"...ইত্যাদি—ইত্যাদি।

নেহরুর নববাণীতে এইটুকু মাত্র বুঝিলাম যে—কিছুই বুঝিলাম না! ১৬ বৎসর গদিতে পরম আরামে উপবেশন করিবার পর হঠাৎ তাঁহার এত সব সৎ চিন্তার উদয় হইল কেন? 'বিলম্বের' বিষয় চিন্তাটাও কি একটু বেশী বিলম্বিত হইয়া যায় নাই? আমাদের একমাত্র বক্তব্য—'হে মহারাজ, নিজে আচরি' ধর্ম্ম—পরকে শিখাও।'

পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন হঠাৎ বেশ কয়েকজন উপ- এবং-রাষ্ট্রমন্ত্রীকে বরখাস্ত করিয়া এই আপৎকালে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সংখ্যা হঠাৎ কেন বৃদ্ধি করিলেন বুঝিলাম না। কর্ম্মরত ব্যক্তিকে এই প্রকার বিনা-নোটিশে কর্ম্মচ্যুত করা শ্রম-আইনে পড়ে কি না বিবেচ্য!

পদচ্যুত উপ- এবং রাষ্ট্র-মন্ত্রীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কালবিলম্ব না করিয়া কর্ম্ম-সংস্থান কেন্দ্রে তাঁহাদের নাম রেজিস্ট্রী করিবার পরামর্শ মাত্র দিতে পারি। বলা বাহুল্য—ইহাদের অগ্রাধিকার বেকার স্বর্ণশিল্পীদের উপরে থাকিবে।

বারান্তরে মন্ত্রী-বিতাড়ন পর্ব্ব বিষয়ে বিশদভাবে কিছু আলোচনা করিব।

জনতা এক্সপ্রেস

স্নেহ শোভনা রক্ষিত

ইউনিভার্সিটির মিটিং সারিয়া ফিরিতেছিলাম। গতকল্য রাতে রওয়ানা হইয়া ভোরে আসিয়া পৌছিয়াছি, সারাদিন যথেষ্ট পরিশ্রম গিয়াছে। রাতে ট্রেনে ত ঘুম একেবারেই হয় নাই, আজও সকাল হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এখানে-ওখানে ছুটাছুটি ও মিটিংএ ঝাড়া তিন ঘণ্টা বসিয়া কাটাইবার পর এতক্ষণে অবসর পাইয়াছি। এখন আমার কাছে দুটি পথ খোলা আছে, একটি হইতেছে রাতটা এখানেই কাটাইয়া ভোরের ট্রেন ধরা, অন্যটি সন্ধ্যায় জনতা এক্সপ্রেস ধরিয়া রাত বারটায় স্বস্থানে পৌছানো। দ্বিতীয়টাই সুবিধাজনক মনে হইল। প্রথমতঃ জনতা এক্সপ্রেসে চড়িলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া ইউনিভার্সিটির নিকট হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেটের দাম আদায় করিতে বিবেকের দংশন অনুভব করিতে হইবে না, কারণ তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া আর কোন শ্রেণীই এই গাড়ীতে নাই, অতএব যে বাড়তি দামটুকু পকেটে আসিবে তাহাই লাভ। এই একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার, রেজিষ্ট্রার, এমন কি কোন কোন মন্ত্রী পর্য্যন্ত জনতা এক্সপ্রেসে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য উচ্চ শ্রেণীর ভাড়া আদায় করিয়াছিলেন, আমাদের মত চুনোপুঁটি ত কোন্ ছার। এই হইল প্রথম সুবিধা, দ্বিতীয় সুবিধা যে, আর ৪।৫ ঘন্টা পরেই 'নিজের বাড়ীতে নিজের বিছানার উপর আরামে লম্বা হইয়া পড়িব, পরদিন বেলা আটটার আগে আমাকে জাগায় কাহার সাধ্য ?

ষ্টেশনে আসিয়া দেখি যে, ট্রেন আসিয়া পড়িয়াছে। তা হোক, বড় ষ্টেশন, এখানে এঞ্জিন জল লইবে, ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়াইবে। গাড়ী খুঁজিবার প্রয়োজন নাই, এখানে মুড়ি মিছরির একদর। কিন্তু ভাবি, এত লোকেরও ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন পড়িয়া গিয়াছে ? ট্রেনটি দেখিয়া মনে হইল যে, গোটা ভারতবর্ষের একটি বেশ বড় অংশ বুঝি এই গাড়ীটিকে আশ্রয় করিয়া বেশ কায়েমী হইয়া গাড়ীর ভিতরেই বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া দেখি যে, গাড়ীর মেজের উপরে পর্য্যন্ত তিল ধারণের স্থানটুকুও নাই। বেঞ্চিগুলিতে অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান্, যাহারা পূর্ব্বে গাড়ীতে উঠিতে পারিয়াছে তাহারা অনেকে বিছানা করিয়া, কেহ বা শুইয়া, কেহ বা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আরাম ভোগ করিতেছে। যাহারা পরে উঠিয়াছে তাহারা ঝগড়া বিবাদ করিয়া যেটুকু জায়গা অধিকার করিতে পারিয়াছে, সেখানেই কূর্ম্মাবতার হইয়া কোনমতে হাত পা গুটাইয়া বসিয়াছে। বাকী সকলে ঝগড়া অশান্তির মধ্যে না গিয়া মেঝের উপরেই ঘরসংসার গুছাইয়া লইয়া বসিয়াছে।

আজকাল মেয়েরা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ীতে বড় ভ্রমণ করেন না, বিশেষতঃ যাঁহারা পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে ভ্রমণ করেন। দেখিলাম যে গাড়ীতে পুরুষ যাত্রীর চেয়ে বোধ হয় মেয়ে যাত্রীই বেশী। যা হোক্, গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী একটু সরিয়া বসিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "এই যে বাবুজী, এখানে বসুন।" যে জায়গাটুকু তিনি দিলেন সেখানে বসিতে হইলে আমাকে আমার বর্ত্তমান শরীরের বেশ কিছুটা অংশ বাদ দিতে হয়, তাই মুখের হাসিতেই তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভদ্রলোকের আবার কি মনে হইল, একটি ছোট পোঁট্‌লা নীচে নামাইয়া দিয়া আবার আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। এবারে সেই জায়গাতেই কোনমতে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া বসিলাম। সহযাত্রী মাড়োয়ারী বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুজীর কতদূর যাওয়া হইবে ?" আমি বলিলাম, বেশীদূর নয়, আর কয়েক ঘন্টা পরেই নামিয়া যাইব, বেশীক্ষণ তাঁহাদের কষ্ট দিব না। ভদ্রলোক উত্তরে বলিলেন, "হায় হায় বাবুজী, আপনি আর কি কষ্ট দিবেন ? যা কষ্ট সেই হাওড়া ষ্টেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে. আপনি একটু পাশে বসিয়াছেন বলিয়া আর বেশী কি কষ্ট পাইব ?" বুঝিলাম জনতার জনতা হাওড়া ষ্টেশন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, আর একেবারে কাল মাদ্রাজে গিয়া শেষ হইবে। গতকাল হাওড়া ষ্টেশন হইতে 'ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তসীমা পার হইয়া, উড়িষ্যার বুকের উপর দিয়া জনতা এক্সপ্রেস্ এখন অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, আগামীকাল সকালে তামিলনাদে প্রবেশ করিয়া তবে তাহার যাত্রা শেষ হইবে।

অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিয়াছে। এতক্ষণে কামরার ভিতরের অবস্থা ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইলাম। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সব রকমই আছে, তাহাদের দেখিয়া মনে

হইতেছে যেন এই গাড়ীর কামরার মধ্যেই সকলে স্থায়ীভাবে সংসার পাতিয়াছে। মেয়েরা বেশ নিশ্চিন্তভাবে শিশুদের ঘুম পাড়াইতেছেন, স্তন্যপান করাইতেছেন। কয়েক ঘণ্টার পরিচিতা সঙ্গিনীদের কাছে নিজেদের ঘরের নানা খবর এবং সুখদুঃখের কথা বলিতেছেন। মনেই হয় না যে, আর কয় ঘণ্টা পরে কেহ কাহাকেও মনে রাখিবেন না। পুরুষ যাত্রীরা কেহ বা বসিয়া ঢুলিতেছেন, কেহ বা রাজনীতি বা ধর্ম্ম আলোচনা করিতেছেন। একটি কিশোর বালক বহু কুখ্যাত একটি সিনেমার গান বেসুরে গাহিতেছে। আমার পাশের বৃদ্ধ সহযাত্রীটি বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, একবার আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুজী কি এ দেশে কোন কার্য্য উপলক্ষে আসিয়াছেন?" আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, এদেশে আমি অধ্যাপনা কাজের জন্য বহুদিন বাস করিতেছি। কতদিন আছি তাহা শুনিয়া বলিলেন "আরে বাস বাবুজী, আপনি খুব মানুষ যা হোক্! এই ভাষা আপনি কি করিয়া শিখিলেন?" আমি কিছু না বলিয়া নীরবে হাসিলাম।

একটি ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। ভাবিলাম যে এ গাড়ীর যা অবস্থা, আশাকরি এ কামরা কেহ আক্রমণ করিবে না। দেখিলাম যে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ভিতরের বাধা-নিষেধ কিছুই না মানিয়া একটি মস্ত দল বলিতে গেলে একরূপ মরিয়া হইয়া গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথমে একটি বয়স্ক পুরুষ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, কপালে তিলক, হাতে মোটা লাঠি, ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিয়া গাড়ীর ভিতরের অবস্থাটা একনজর দেখিয়া লইলেন। মনে একটু আশা হইল যে, হয় ত অবস্থা দেখিয়া ফিরিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু না, তিনি এক এক করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাঁহার দলের সকলকে গাড়ীতে উঠিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। গাড়ীর মধ্যে আপত্তির মৃদুগুঞ্জন শুনিয়াও শুনিলেন না। যাঁহারা মেজেতে ঘর-সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা একটু গুছাইয়া সংযত হইয়া বসিলেন, না হইলে নিজেদেরই বিপদ্। কিছুক্ষণের জন্য যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। প্রথমে একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা উঠিলেন। হাতে একটি চিত্র-বিচিত্র করা হাঁড়ী সন্তর্পণে ধরিয়া আছেন। এরূপ চিত্রিত হাঁড়ী অন্ধ্রদেশের বিবাহ অথবা কোন শুভকাজ উপলক্ষে ব্যবহার করা হয়। হলুদরঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডে হাঁড়ীটির মুখ বাঁধা দেখিয়া বুঝিলাম যে, এই দলটি কোথাও বিবাহ উপলক্ষে যাইতেছেন। মহিলাটির অনাবৃত মস্তক, একটি খয়েরী রংএর রেশমী শাড়ী এদেশের বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ মহিলাদের ধরণে কাছা দিয়া পরা, হাতে একহাত সোনার চুড়ি, নাকে নাকছাবি, পায়ে মোটা রূপার মল। মহিলাটি ভিতরে উঠিয়া বেশ উচ্চ-কণ্ঠে ডাক দিলেন, "ওরে রুক্মিণী, ও সাবিত্রী, তোরা শীঘ্র ওঠ্, গাড়ী ছেড়ে দেবে।" সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম যে, দুটি শিশুক্রোড়ে তরুণী ও তাঁহাদের পশ্চাতে একটি ঘাঘরাপরা বালিকা ভিতরে ঢুকিলেন। এবার গাড়ীর ভিতরে আপত্তির গুঞ্জন প্রবল হইয়া উঠিল। "কি মশায়, এত তুলছেন, কোথায় বসবেন?" "মা, আপনারা অন্য গাড়ীতে যান না, এথানে অবস্থা দেখছেন ত" ইত্যাদি নানা প্রকার অনুযোগ, অনুরোধ নানা দিক্ হইতে আসিতে লাগিল। প্রথমে নবাগত যাত্রীরা কেহ ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। শেষে যখন অনুযোগ ক্রমশঃ কলহে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে,—যথা "আপনারা কি রকম মানুষ, এই ভিড় দেখেও উঠছেন, আক্কেলটা কি রকম?" এই ধরনের কথাবার্ত্তা শুনা যাইতে লাগিল, তখন সেই গৃহিণী বলিলেন, "কি করব বাবা, সকলকে যেতে হবে ত, অন্য গাড়ীতে জায়গা থাকলে কি আর ভিড়ের মধ্যে উঠি? আক্কেল আছে বলেই অন্য গাড়ীতে উঠিনি, কারণ সে সব গাড়ীতে উঠ্‌বারও যো নেই। এর মধ্যেই সকলকে গুছিয়ে নিয়ে বসতে হবে।" কথাগুলি মিষ্টভাবেই বলিলেন বটে কিন্তু তাহার মধ্যে বেশ দৃঢ়তাও আছে। মহিলাটি কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিলেন যে, একটি ১০।১২ বৎসরের মেয়ে বেঞ্চের উপর শুইয়া আছে। মেয়েটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "একবার ওঠ ত বাছা, এবারে একটু বসে যাও, অনেকক্ষণ ত শুয়েছ। মেয়েটির মা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, "কি রকম? ঐটুকু মেয়েকে উঠিয়ে বসতে হবে না কি? ওতে আর কতটুকু জায়গা হবে? নারে সুশীলা, উঠিস্ নে।" গৃহিণীটি বলিলেন, "একটু না হয় বসবেই, একেবারে শিশু ত নয়। ওঠ ত মা," বলিয়া মেয়েটিকে উঠাইয়া বসাইয়া দিলেন। সুশীলার মা আর কিছু না বলিয়া গজর গজর করিতে লাগিলেন। সুশীলাও মুখখানা হাঁড়ীপানা করিয়া বসিয়া রহিল। মহিলাটি এবার নিজের হাতের চিত্রিত ভাণ্ডটি কোলের উপর রাখিয়া বসিলেন ও তাঁহার পাশে শিশুক্রোড়ে তরুণী দুইটিকে বসিতে বলিলেন। ওদিকে দরজার দিকে তখনও আরোহণপর্ব্ব চলিতেছে। কর্ত্তা দুইটি হাফ্‌প্যাণ্ট পরা বালককে উঠিতে সাহায্য করিলেন, আর কেহ উঠিবার আগে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কর্ত্তা পাশের গাড়ীর দিকে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সব উঠেছে কি?" বুঝিলাম, দলটির কতক অংশ পাশের গাড়ীতেও উঠিয়াছে। সেদিক্ হইতে উত্তর আসিল, "আমরা উঠেছি, কিন্তু কনেকে নিয়ে মাসীমা পিছিয়ে পড়েছিলেন, তিনি এ গাড়ীতে ওঠেন নি।" বলা বাহুল্য, কথাবার্ত্তা সব খাঁটি তেলেগু ভাষায় হইতেছিল। ভাবিলাম, সর্ব্বনাশ, বিবাহের দল যাইতেছে, অথচ কনে উঠিল কি না তাহার খোঁজ নাই? এদের ব্যাপার কি? কিন্তু কর্ত্তা

দেখিলাম বেশ নির্ব্বিকার। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাদের সঙ্গে প্রসাদরাও আছে ত?" উত্তর হইল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "তবে আর কি, ঠিক পিছনের কোন গাড়ীতে উঠেছে, না উঠতে পারলেও এর পরে প্যাসেঞ্জারে আসবে" বলিয়া গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো, মীনাক্ষী ত এ গাড়ীতে ওঠে নি, ও গাড়ীতেও ওঠে নি; তবে বোধ হয় পিছনের গাড়ীতে তার মাসীর সঙ্গে উঠেছে।" এদেশে মীনাক্ষী উচ্চারণ করা হয় মীনাক্ষী। গৃহিণী—খুব সম্ভব তিনি মীনাক্ষীর মা—জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? হয় ত উঠেছে বলছ, যদি অন্য গাড়ীতে না উঠে থাকে?" বেশ নিশ্চিন্ত জবাব আসিল—"আরে প্রসাদরাও সঙ্গে আছে, ভাবনা কিসের? একা ত নয়। এ গাড়ীতে না এলেও পরের প্যাসেঞ্জারে ঠিক এসে পড়বে। বিয়ের লগ্ন ত কাল রাতে, তাড়া কিসের?" গৃহিণীও দেখিলাম আর কিছু বলিলেন না। বিবাহের প্রধান পাত্রী কনে, সেই হয়ত দলের সঙ্গে আসে নাই, সেজন্য ইহাদের দেখিলাম কোনই চিন্তা নাই।

ওদিকে বিবাহের গন্ধ পাইয়া গাড়ীর ভিতরে তাবৎ মহিলা-সমাজ দেখিলাম উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। সুশীলার মা যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই কোমর বাঁধিয়া কোন্দলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেকথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মীনাক্ষীর মায়ের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন। অন্য মহিলারাও যতটা সম্ভব সেই গল্প শুনিবার অথবা তাহাতে যোগ দিবারর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গাড়ীর শব্দের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা যা কানে আসিতেছিল তাহা হইতে বুঝিলাম যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবারটি এদিকে কোথাও গ্রামে থাকেন। জমিজমা আছে, অবস্থা যে ভাল তাহা পূর্ব্বেই গৃহিণী ও তাঁহার কন্যাদের অলঙ্কারাদি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তরুণী দুইটি গৃহিণীর বিবাহিতা কন্যাদ্বয়। অবিবাহিতা কিশোরীটি তাঁহার বিধবা ভগিনীর (যে মাসীমা কনের চার্জ্জে আছেন) কন্যা। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মীনাক্ষীর বিবাহের জন্য তাঁহারা গ্রামে যাইতেছেন। গ্রামেই তাঁহারা থাকেন, তবে পূজা দিবার জন্য অন্যত্র শ্রীভেঙ্কটস্বামীর মন্দিরে আসিয়াছিলেন। পুত্র বা কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে এই পূজা দেওয়া তাঁহাদের পরিবারের প্রথা, তাই সদলবলে সকলে আসিয়াছিলেন, এখন পূজা শেষ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। আগামীকাল রাত একটায় বিবাহের লগ্ন। এবার সুশীলার মা বলিলেন, "তা মেয়ের কাল বিয়ে, সে মেয়ে কোথায় উঠল একটু খোঁজ নিলেন না?" মেয়ের মা বলিলেন, "কি করি বল ভাই, এই লম্বা গাড়ীতে কে কোথায় উঠল এই অল্প সময়ের মধ্যে কি ক'রে দেখব? আমার সঙ্গে কচিকাচা নিয়ে এই মেয়ে দুটি রয়েছে, অন্য একটি মেয়েও রয়েছে। তা ছাড়া তার মাসী আর আমার মেজ ছেলে সঙ্গে আছে, মেয়েও চালাক, চটপটে, ভয়ের কিছু নেই।"

গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীর ঝাঁকনিতে মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসিতেছিল। একবার হঠাৎ গাড়ী থামিয়া যাওয়াতে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি গাড়ী একটা ষ্টেশনে থামিয়াছে। একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম কেহ এখানে গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে কি না! কিন্তু দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, উঠিবার প্রার্থী বেশী কেহ নাই। বরং অন্য কোন কোন কামরা হইতে বেশ কয়েকজন যাত্রী নামিয়া গেল। যাক্, আপাততঃ আর কোন আশঙ্কা নাই। এর পরের ষ্টেশনেই আমাকে নামিতে হইবে। এমন সময় বাহিরে প্ল্যাটফরমের উপর ঘুঙুর গাঁথা মলের ঝম ঝম শব্দ শুনিতে পাইলাম, এবং পরমুহূর্ত্তেই কামরার দরজা খুলিয়া গেল ও "মা, এ গাড়ীতে নাকি?" বালিকা-কণ্ঠে শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুশ্রী কিশোরী সকলকে ঠেলিয়া গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। মেয়েটির পরণে একখানা কোরা তাঁতের শাড়ী, তাহার স্থানে স্থানে হরিদ্রারঞ্জিত। ঘন রুক্ষ বেণীবদ্ধ চুলগুলি প্রচুর বেলফুলের মালায় সজ্জিত। পায়ে রূপার তোড়া, টানাটানা চোখে কাজল, নাকে হীরার নাকছাবি, কানে কানফুল, গলায় সোনার হারের সঙ্গে একটি কর্পূরের মালা, হাতে কয়েক গাছি সোনার চুড়ির সঙ্গে একহাত কাঁচের চুড়ি, বুঝিলাম এই কনে। আমাদের বাংলাদেশে বিয়ের কনের পক্ষে যেমন শাঁখা অরিহার্য্য, অন্ধ্রে তেমনি বিয়ের কনের হাতে কাঁচের চুড়ি অপরিহার্য্য। তবে এ প্রথাটি বোধহয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কপালে একটি কুঙ্কুমের টিপ। বেশ সুশ্রী মেয়েটি। তাহার পিছনে একটি বিধবা মহিলা ও একটি যুবক উঠিল। কনে প্রথমেই মাকে দেখিয়া "মা, বেশ ত তোমরা, আমাকে ফেলে চলে এলে" বলিয়া উঠিল এবং এদিকে কনের মা ও দিদিরা সকলে প্রায় সমস্বরে "আরে মীনাক্ষী, তুই ত আচ্ছা দস্যি মেয়ে, এই ছোট ষ্টেশনে নেমেছিল, গাড়ী যদি ছেড়ে দিত" ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে স্নেহের অনুযোগ দিতে লাগিলেন। বিধবা মহিলাটি মাথার কাপড় * ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বলিলেন, "দস্যি মেয়েই বটে, ওকে নিয়ে পিছিয়ে প'ড়ে তোমাদের খুঁজে পেলাম না, ওই এগিয়ে গিয়ে একটা গাড়ীর দরজা খুলে ঝগড়াঝাঁটি করে নিজেও উঠল, আমাদেরও তুলল।" "ওমা, সে কি? ঝগড়া

* অন্ধ্রদেশে কেবল ব্রাহ্মণ বিধবারা থান পরেন ও মাথায় কাপড় দেন, অন্য কোন জাতের সধবা বিধবা কুমারী এবং ব্রাহ্মণ ও কুমারীরাও কখনও মাথায় অবগুণ্ঠন দেন না।

করল কার সঙ্গে? প্রসাদরাও কি করছিল?" এবার যুবকটি মৃদু হাসিয়া বলিল, "মা, আজকাল কি আর আমাদের কিছু করবার আছে? ওরাই সব করে নেয়, আমাদের আর সঙ্গে থাকা কি জন্য?" মীনাক্ষী বলিল, "না মা, দাদার কোন দোষ নেই। দাদাই আগে উঠে দরজা খুলেছিল, এমন সময় ভিতর থেকে দাদারই বয়সী একটি ছেলে দরজা আগলে দাঁড়াল, কিছুতেই উঠতে দেবে না। তখন দাদাকে নামতে ব'লে আমি নিজে উঠে তাকে দু'কথা বলতেই ভিতর থেকে আর একটি ছেলে তাকে টেনে নিলে, তখন আমি মাসীমা ও দাদাকে ভিতরে আসতে বললাম।" মীনাক্ষীর মা বলিলেন, "আচ্ছা দজ্জাল মেয়ে ত তুই! আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, এ মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে যে কি গতি হবে জানি না! ঝগড়া তা ব'লে করলি কি জন্যে?" মেয়ে বলিল, "বা রে, নিজেরা আমায় ফেলে এলেন, আমি জোর ক'রে গাড়ীতে চড়েছি ব'লে আমার দোষ হ'ল? কিছুতেই গাড়ীতে উঠতে দেবে না, তখন আমি বললাম যে, আমিও দেখে নেব। তারপর ত অন্য ছেলেটি তাকে টেনে সরিয়েই নিল।" মীনাক্ষীর মাসীমা বলিলেন, "দিদি, তুমি মেয়েকে ফেলে এসে এখন বকছ, তুমিও ত মেয়ে পিছনে ফেলে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ীতে চড়লে!" সহযাত্রিণী সুশীলার মা হাসিয়া বলিলেন, "আপনার মত মাসীমার তত্ত্বাবধানে আছে বলেই মা আর কোন চিন্তা করেন নি।" কনের মা নিজের দলে একজনকে পাইয়া খুশী হইয়া বলিলেন, "বল ত ভাই, আমিই কি একা মেয়েকে ফেলে এসেছিলাম? সবাই মিলে আমাকে দোষ দিচ্ছে, কর্ত্তাটিকে ত কেউ কিছু বলছে না।" কনের ভাই প্রসাদ রাও এবার বলিল "মা, বিয়ের কনে তোমার সঙ্গে রয়েছে, তাকে তুমি দেখবে না বাবা দেখবেন? বাবা ত আর সমস্ত কিছুই দেখছেন।" উক্ত বাবা তখন একটি ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, কনের হঠাৎ নাটকীয়ভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সময় তিনি একবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া আবার ঢুলিতে লাগিলেন! মীনাক্ষীর মা তাঁহার নিদ্রাবিষ্ট কর্ত্তাটিকে দেখাইয়া বলিলেন "হ্যাঁ, ঐ যে সব দেখছেন বসে বসে, সবাই এখানে সাক্ষী আছে।" আশে-পাশে যাহারা ছিল সকলে হাসিয়া উঠিল। একেই বিবাহ-যাত্রী গাড়ীতে ওঠাতে এত ভীড়ের মধ্যেও সকলেই বেশ উৎসুক ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল, পরে হঠাৎ কনে স্বয়ং এইরূপ বিচিত্রভাবে গাড়ীতে পদার্পণ করাতে, সকলে, বিশেষতঃ মেয়েরা আরও যেন উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের এই ঘরোয়া কথা কাটাকাটি ও তর্ক সকলেই বেশ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এখন আর কেহ জোর করিয়া এই কামরায় প্রবেশ করার জন্য এই দলটিকে দোষ দিতেছেন না। সকলেই উৎসুক ও কৌতূহলী হইয়া কনেকে এক নজর দেখিয়া লইতেছেন এবং কনের মা বিবাহ উপলক্ষে কি কি দিতে হইবে ইত্যাদি যে সব মেয়েলী গল্প করিতেছেন তাহা মন দিয়া শুনিতেছেন। বলিতে বাধা নাই এই বিবাহযাত্রীরা গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ীর একঘেয়ে আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। মনে হইল, এ দেশের মায়েরাও যেমন নিশ্চিন্ত, মেয়েরাও তেমনি শক্ত। ভাবিলাম, গৃহে ফিরিলে গৃহিণীকে এই গল্পটি শুনাইয়া শেষকালে উপদেশ দিব যে, তিনি তাঁহার কন্যাটি এক নজর চোখের অন্তরাল হইলে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন, অথচ এই ত আর একজন মা, রাত দুপুরে তাঁহার বিবাহযোগ্যা কন্যা—(শুধু বিবাহ-যোগ্যা নয়, আগামী কাল তার বিবাহ—) ট্রেনে উঠিতে পারিল না জানিয়াও দিব্য নিশ্চিন্ত আছেন। অবশ্য কি উত্তর পাইব তাহা আমার জানা আছে।

গাড়ীর গতি মন্দ হইয়া আসিল, এবারে আমার নামিবার পালা। তখনও মীনাক্ষীর বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা মহোৎসাহে চলিতেছিল। গাড়ী থামিলে পাশের মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিয়া আমার স্বল্প জিনিষপত্র নিজের হাতে লইয়াই নামিয়া পড়িলাম। ওধারের প্ল্যাটফর্ম্মে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে, গাড়ী ছাড়িবার আর বেশী দেরীও নাই। আর আধ ঘন্টা পরেই স্বগৃহে পৌছাইয়া বিশ্রাম করিতে পারিব মনে করিয়া বেশ খুশী হইয়া উঠিয়াছি। ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া দেখি ভিড়ও বেশী নাই, ভাবিলাম যে, এতক্ষণ বসিয়া কাটাইতে হইল, একটু গড়াইয়া লইলে মন্দ হয় না। কিন্তু আবার ভাবিলাম, তাহাতে ষ্টেশন ছাড়াইয়া যাওয়ায় সম্ভাবনা আছে। তাই আর সে চেষ্টা না করিয়া গাড়ীর একটি কোণে ঠেস দিয়া আরাম করিয়া বসিলাম। গাড়ীতে আরও দু'চার জন যাত্রী আছেন, কিন্তু কেহই কাহারও সহিত আলাপ করিতে উৎসুক নন। বোধ হয় রাত বেশী হইয়াছে বলিয়াও এবং সকলেই জায়গা পাইয়াছেন সে জন্যও, কেহ কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক নন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে বসিয়া ঢুলিতেছেন অথবা বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতেছেন।

এমন সময় গাড়ীর দরজা খুলিয়া দুইটি যুবক প্রবেশ করিল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলাম, তাহাদের মুখ দেখিতে না পাইলেও কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। শুনিলাম একটি ছেলে বলিতেছে, "বাপ্‌স, এতক্ষণে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচা গেল। যা নরকযন্ত্রণা ও গাড়ীতে

পেয়েছি।" অপর ছেলেটি বলিল, "হ্যাঁ, জনতা এক্সপ্রেসে বড় ভিড় হয়, কিন্তু তা ব'লে একেবারে নরকযন্ত্রণা ?"

"তা না ত কি ? শুধু ভিড় হ'লে ত ছিল ভাল, শেষকালে কিনা মেয়েটার কাছে হার মানতে হ'ল? তুইই ত শিভ্যালরি দেখিয়ে আমায় টেনে আনলি, না হ'লে আমিও দেখে নিতাম। আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে যা হোক্, কটু কটু ক'রে কথা শুনিয়ে দিলে !"

দ্বিতীয় যুবকটি একটু হাসিয়া বলিল, "তা তুমি যে দরজা আগ্‌লে দাঁড়ালে, উঠতে দেবে না ; সেই বা কি করে? তাদেরও ত উঠতে হবে?" একটু থামিয়া আবার বলিল, "কে জানে কাদের মেয়ে, সাজসজ্জায় বিয়ের কনে মনে হ'ল।"

বন্ধুটি হাসিয়া বলিল, "ও, তাই বুঝি তোমার এত দরদ ? কে জানে, তোমারি ভাবী বধূ নয় ত ? তা হ'লে দেখো মজা টের পাবে। মুখের তোড়ে উড়িয়ে দেবে। উকিল মশাইকে সর্ব্বদা গিন্নীর কাছে সন্ত্রস্ত থাকতে হবে। যা হোক্, তা যদি হয়ে থাকে তা হ'লে ত ঝগড়া ক'রে ভাল কাজ করি নি।"

"থাক্, খুব হয়েছে। কাল তার বিয়ে আর আজ তারা ওদিকে কোথায় যাবে ? বিয়ে কাল একমাত্র আমারই হচ্ছে নাকি? মেয়েটি দলছাড়া হয়ে পড়েছিল, ওদের কথায় বুঝলাম এই গাড়ীতে উঠতেই হবে, তুমিও উঠতে দেবে না। ঝগড়া না ক'রে কি করে বল ?"

ছেলে দুটির কথা শুনিয়া আমি একবার মুখ ফিরাইলাম। বুঝিলাম যে, মীনাক্ষীর সঙ্গে এই ছেলে দুটির—দুটির নয়—এদের মধ্যে একটির, ও গাড়ীতে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। আমি মুখ ফিরাইতেই আমাকে দেখিয়া দ্বিতীয় যুবকটি আমার সম্মুখে আসিয়া "এই যে মাষ্টার মশায়, নমস্কার। কোথা থেকে আসছেন ?" বলিয়া অভিবাদন করিল। আমি হঠাৎ প্রথমে চিনিতে পারিলাম না, তারপর চিনিলাম, আমারই পুরাতন ছাত্র, তীক্ষ্ণধী ছেলেটি দু'বৎসর আগে বি. এ. পাস করিয়া এখন আইন পড়িতেছে। আমি বলিলাম, "তুমিই বা কোথা থেকে আসছ ? তোমাদের ল কলেজ এরই মধ্যে ছুটি হয়ে গেল ?" ছেলেটি একটু লজ্জিত হাস্যে বলিল, "আজ্ঞে না, কলেজ ছুটি হয় নি এখনও। তবে বাবা আমার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সব ঠিক ক'রে হঠাৎ টেলিগ্রাম করেছেন আসবার জন্য। কালই বিয়ে, হাতে আর সময় নেই, তাই এই ট্রেণে সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়েছি।" বুঝিলাম যে, আমরা একই জায়গা হইতে একই সময়ে জনতা এক্সপ্রেসে চাপিয়াছি, যদিও কেহ কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিয়ে কোথায় ঠিক হ'ল ? মেয়ে কেমন ?" যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "মেয়ে আমি নিজে দেখি নি, মায়েরা দেখেছেন, তাঁরা ত ভালই বলেছেন। এবারে স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছে।" মেয়ের গ্রামের নাম বলিতেই হঠাৎ আমার মনে হইল সেই মীনাক্ষী নয় ত ? জিজ্ঞাসা করিলাম, "কনের নামটা জান ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি, নাম মীনাক্ষী।"

আর আমার কোনই সন্দেহ রহিল না। তখনি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল ছিপ্‌ছিপে সুন্দরী সপ্রতিভ মেয়েটি ; দীর্ঘবেণী পুষ্পস্তবকে সজ্জিত, টিকোলো নাকে হীরার নাকছাবি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, কাজলপরা চোখ ও পায়ে রূপার তোড়া। বাঃ, দিব্য রোমান্সটি ত জমিয়া উঠিয়াছে ! একই গাড়ীতে বর-কনে দুইজনেই এতটা পথ একত্র আসিল কিন্তু কেহ কাহাকেও চেনে না, জানিতেও পারে নাই। তার উপরে পথে কনের সঙ্গে বরের বন্ধুর ঝগড়াও একচোট হইয়া গেল, যে জন্য কনে বেচারী নিজের মায়ের কাছ হইতে 'দজ্জাল' ও বরের বন্ধুর কাছ হইতে 'জাঁহাবাজ' বিশেষণ দুইটি লাভ করিল। কে বলে আমাদের জীবনে রোমান্স নাই ? ছেলেটিকে আর বলিলাম না যে, তাহার ভাবী বধূর সঙ্গে আমার পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া বসিতে বলিলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, ওদিকের লাইনে জনতা এক্সপ্রেসও ছাড়িয়া দিল। এর পরের ষ্টেশনে মীনাক্ষীরা নামিবে।

মেঘ

শ্রীকালিদাস রায়

মেঘের মতন জীবন্ত বল কে বা,
জড় পৃথিবীতে সেই ত জীবন ঢালে।
দূর থেকে করে নিখিল জীবের সেবা,
তরুলতা তৃণ গুল্ম সবারে পালে।
সেও গান গায়, শোনে পাখী গাছে গাছে।
শোননি আকাশে গুরু গুরু গুরু তান ?
সে গান শুনিয়া ময়ূর-ময়ূরী নাচে,
সে গানে মোদের উড়ু উড়ু করে প্রাণ।
সেও খেলা করে, দেখনি সাগর তীরে
উর্মির সাথে দিগন্ত করে খেলা ?
চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি ঘুরে ফিরে
দেখনি সে খেলা শারদ সন্ধ্যা বেলা ?
সেও প্রেম করে নব অনুরাগ ভরে,
জলকণা ছুঁড়ে চাতকীর প্রেম যাচে,
ইন্দ্রধনুতে শৃঙ্গার বেশ ধ'রে
ধায় অম্বরে বলাকার পাছে পাছে।
হাসা-কাঁদা তার ছড়ায় ভুবনময়,
ব্যথা পেলে করে গরজি' আর্তনাদ।
শিল্পীরে তোষে করি' কত অভিনয়,
মেঘই শুধু জানে চন্দ্রামৃতের স্বাদ।
তার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা,—
ভূলোক থেকে সে দ্যুলোকে বার্তা বয়।
বহন করে সে কবির গহন ব্যথা
কল্পলোকেও, প্রিয়া তার যেথা রয়।

দুই তীর

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

মধ্যে প্রবাহিত বিপুল জলরাশি—

তুমি যে কথা বলো ঢেউয়ের কোলাহল
ডুবায়, কান পাতা এখন নিষ্ফল।

বৃক্ষ শাখে শাখে যখন ফোটে ফুল,
বন্য জ্যোৎস্নায় রাতের এলোচুল

গভীরে খাঁ খাঁ করে একই অনুভব—
দু'জনে কান পাতি বুকের কলরব

পুরনো ফুলশাখা পুরনো জ্যোৎস্নাই,
দীর্ণ অনুভবে দু'জনে মিশে যাই।

ব্যবধি একাকার নীরবে কাছে আসি—
একই অনুভব দু'জনে ভালোবাসি।

ওরা কারা ?

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ওরা নাচে।
দেখেছি ওদের তাই জানি, ওরা আছে,
ওরা নাচে।
কেবল জানি না ওরা আছে কেন,
নাচে কেন,
কেন যে যখনই দেখি, দেখি ওরা নাচে।

গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডের উপরে
রাত ঠিক দুপুরের পরে,
ফর্টিসেভেন্থ্ মাইল লেভেল-ক্রসিংটার কাছে,
দু'তিনটি সারি
ক্ষুদে ক্ষুদে পুরুষ ও নারী,
প্রথমেতে মুখোমুখি
বুকে বুকে ঠুকোঠুকি,
তারপর গোল হয়ে,
কখনো পাগল হয়ে
এলোমেলো নাচে।

হর্ণ দাও, সরবে না।
গাড়িটা চালিয়ে চল, চাপা প'ড়ে মরবে না।
সট্ ক'রে স'রে গিয়ে বেঁটে বেঁটে খেজুরের গাছে
ভিড়-করা মাঠটাতে নেমে
একটি মিনিট শুধু থেমে
নাচবে যেমন ওরা নাচে।

যদি রাম রাম ব'লে দেবতাকে ডাকো,
কিংবা ক্রুশের চিহ্ন বুকে কেউ আঁকো,
তখনই মিলিয়ে যাবে হাওয়া হয়ে।—ভয় পেয়ে নয়।
তোমরা পেয়েছ ভয়,
এই কথা ভেবে।

আমাকে কে ব'লে দেবে
ওদের একটু পরিচয়।
দেখেছি ওদের আমি বার পাঁচ-ছয়,
রাত দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে
গাড়ি নিয়ে কলকাতা ছেড়ে
আসানসোলের পথে যেতে।
ফর্টিসেভেন্থ্ মাইল পেতে
বারোটা রাতের বেশী হ'লে,
দেখেছি যে দলে দলে
পথ জুড়ে ওরা সব নাচে।

কি খেয়ে যে বাঁচে,
সারাদিন কি করে যে, কোথা ওরা থাকে,
কি হবে তা জেনে? শুধু চাই যে আমাকে
ব'লে দিক যদি কেউ জানে,
কি যে এর মানে,
যখনই ওদের দেখি, দেখি ওরা নাচে।

ওরা যে ঝাপ্সা বড় বেশী,
আলোয়-আঁধারে মেশামেশি,
যদি তা না হ'ত,
হয়ত বা দেখতাম, অবিকল আমারই মত
আর-একটি ক্ষুদে আমি ওদের নাচের দলে আছে।
সেই দলে মুখোমুখি
বুকে বুকে ঠুকোঠুকি,
কখনো বা গোল হয়ে,
কখনো পাগল হয়ে
এলোমেলো নাচে।

তোমার আমার মনে একজন আছে,
মুখ ফুটে বলে না যে
কিছু ভয়ে, কিছু লাজে,
কিন্তু যার বড় সাধ, দু'পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচে।

তোমার দুঃখের কথা বলবে ত ?
আমার দুঃখের চেয়ে বেশী সে কি এত।
তাছাড়া দুঃখের নাচ, সে যে তাও জানে।
দুঃখের সুর ত লাগে গানে ?
সেইমত নাচেও লাগে সে।
আমরা যে বুড়ো হই, আমরা যে নানা পরিবেশে
নানাখানা অজুহাতে নাচ ভুলে থাকি,
আমাদের সেই ফাঁকি
চেতনার ফাঁকে ফাঁকে এইসব স্বপ্নজাল বোনে।
আমাদের মনে
যে-নাচ শুকিয়ে যায় ম'রে,
তারাই কি ক্ষুদে ক্ষুদে পুরুষ-নারীর রূপ ধ'রে
কখনো বা মুখোমুখি
বুকে বুকে ঠুকোঠুকি,
কখনো বা গোল হয়ে,
কখনো পাগল হয়ে
এলোমেলো নাচে ?

ওরা যে ঝাপ্‌সা বড় বেশী,
আলোর-আঁধারে মেশামেশি,
নয়ত বা দেখতাম, যেসব শিশুরা জন্ম থেকে
শুধু নাচ ভুলে যেতে শেখে,
আধিব্যাধি অনাহার আর অনাদরে
নিজেরা মরার আগে তাদের যে নাচগুলো মরে,
হয়ত সে-সব নাচও ভূত হয়ে আছে,
ফটিসেভেন্থ্‌ মাইল লেভেল-ক্রসিংটার কাছে।

শেষ বেলায়

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যাবার বেলা কথা আমার বেশী কিছু নয়,
অনেক আলো-অন্ধকারের আছে সমন্বয়।
যে-সব কথা বলা হ'ল, হ'ল না যেই কথা,
কোথায় গিয়ে পৌছবে, তার কোথায় সার্থকতা ?
ভাবনা যদি প্রজাপতি, হৃদয় যদি মাঠ,
কেমন ক'রে পেরিয়ে যাবে মনের চৌকাঠ ?
তোমার চোখে আষাঢ় মেঘে স্বপ্ন টলটল,
বোবা ভাষার কাঁপন দোলে হৃদয় উচ্ছল।
যাবার বেলা নতুন জোয়ার, নোঙর বুঝি কাটে.
তোমার কথা-বোঝাই নৌকো পৌছবে কোন্ ঘাটে ?

অতিজীবন

শ্রীইন্দ্রনাল চট্টোপাধ্যায়

যখন আমার চুল ছাঁটা ছিল সোজাসুজি কপাল অবধি,
খেলতাম দরজার সামনে, ছিঁড়তাম ফুল,
বাঁশের ঘোড়ায় তুমি রাজা, হাতে রাংতা ধুধুল—
দু'জন ছিলাম বেশ, না দুঃখ, না সন্দেহ, না ভুল।

যখন আমার চুল ছাঁটা হ'ল সিঁথে বরাবর
ধুলোয় যেতাম না, মনে মনে অনেক কোঁদল
করতাম তোমার সঙ্গে, তুমি স্কুলে মহা মাতব্বর
শুনে গা জলত যদি বলত সব—'পাকা মেয়ে,
চোখে কেন জল ?'

এখন আমার চুল নেমে গেছে কোমর ছাড়িয়ে,
আর তুমি ?
বিশ্বাস করে না কেউ, রাজা, হাতে রাংতা ধুধুল—
অতিনাগরিক তুমি, আমি অতিনাগরিকা, ফুল
ছিঁড়ি না আর, যাই না দরজায়, শুধু দুঃখ, সন্দেহ আর ভুল।

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি

সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের সবগুলি প্রদেশ বা রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী, দ্বিতীয় হচ্ছে মহারাষ্ট্র; আর বিহার হচ্ছে দরিদ্রতম। ঐ অনুসন্ধানের ফলেই আরও জানা যায় যে, কলকাতা ও বোম্বাই শহরের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের 'জাতীয় আয়' খুব স্ফীত; আর দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও যেমন 'মাথাপিছু আয়'-এর প্রচুর তারতম্য আছে তেমনি একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও 'মাথাপিছু' আয়ের ব্যবধান প্রচুর।

'গড়' আয়ের তাৎপর্য যাই হোক্ না কেন, এই তালিকায় সর্বোচ্চ স্থানলাভের সৌভাগ্য অবিভক্ত বাংলা দেশও বহুকাল পূর্বেই অর্জন করেছিল; গত ষোল বছরের বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে বিচিত্র সমস্যা-জর্জরিত, দ্বিখণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গও সেই গৌরবস্থল অধিকার করেছে, এই সংবাদ আমাদের সকলের কাছেই আনন্দদায়ক।

ধন উৎপাদনের উৎসস্থল থেকে কত পরিমাণ মূলধন অন্যত্র রপ্তানী হয়ে গেল আর অবশিষ্ট ধনের কতটুকু স্থানীয় বাসিন্দাদের কতজন লোকের মধ্যে কি হারে বন্টিত হ'ল, এই জটিল হিসাব আমাদের এই বিরাট্ দেশের কোন বিশেষ রাজ্যের 'গড়' আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হয়ত প্রয়োগ করা সম্ভব নয়; তবে বর্তমান পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত 'গড়' আয়ের সঙ্গে এই হিসাবটিও যদি করা সম্ভব হ'ত, তা হ'লে সম্ভবতঃ বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক 'গড়' আয়ের অঙ্কটি আরও অর্থপূর্ণ হ'ত।

মুষ্টিমেয় শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা ও পুঞ্জীভূত ধনসম্পদের সঙ্গে, গ্রামাঞ্চলে উদ্ভূত কৃষিজ সম্পদের যে বৈষম্য স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমন্বয়ের প্রতিবন্ধকরূপে পরিগণিত হ'ত, সেই বৈষম্য সম্বন্ধে আমাদের দেশের তদানীন্তন মনীষীরা বহু আলোচনা ক'রে গেছেন। সমাধানের পথ যদিবা তাঁরা দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, সে পন্থায় সমাধান আনবার গুরুদায়িত্ব দেশবাসীর হাতে ছিল না। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে দেখা গেছে, প্রধানতঃ বহির্বাণিজ্যমুখী কলকাতা শহরের সমৃদ্ধির সঙ্গেই চলেছে অন্যান্য অঞ্চলের জীবনযাত্রার ও অর্থ নৈতিক অবস্থার ক্রমিক রূপান্তর এবং অধোগতি।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সুরু হবার পূর্বে, ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর সময়ে, একদিকে অতিস্ফীত কলকাতা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল, অপরদিকে কৃষিনির্ভর অন্যান্য অঞ্চলের বিশদ বিবরণ আমরা পাই সে বছরের আদমসুমারী রিপোর্টে। উক্ত রিপোর্টের থেকে সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

". . . if the industrial cities and towns of Burdwan, Hooghly, Howrah and 24-Parganas, and the city of Calcutta were taken away, West Bengal would be very much reduced to the status of a State like Orissa with the difference that Orissa has a thin density compared to West Bengal and more agricultural land and actual area than the latter. . ."

গত আদমসুমারীতেই দেখা গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের যে হার তাতে শুধু চাষের উপর নির্ভর ক'রে বর্গমাইল-পিছু পাঁচশ'র বেশি লোক স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে না। ১৯৫১-তে বর্গমাইল-পিছু লোক-বসতির ঘনত্ব ছিল ৭৯৯; ১৯৬১-তে সেই অঙ্ক পড়িতেছে ১০৩০-এ; দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে ৪·৩%, লোকসংখ্যা বেড়েছে ৩২·৮%। ভারতের মোট এলাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে আছে মাত্র ২·৮৭ ভাগ, আর ১৯৫১-তে ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ৭·৩৭ ভাগ, ১৯৬১-তে ৭·৯৬ ভাগ।

কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে কলকারখানা গ'ড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কাজের সন্ধানে লোক এসে জমা হয়েছে: ১৯০১ এ বাংলা দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে অন্য প্রদেশাগত লোকের পরিমাণ ছিল ৬·৬ ভাগ, ১৯৪১-এ ৯·৫ ভাগ আর ১৯৫১-তে উদ্বাস্তদের নিয়ে, এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮·৫ ভাগে। ঐ বছরে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ছিল শহরবাসী, বাকীরা গ্রামবাসী;

অপর দিকে অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত লোকেদের মধ্যে শতকরা ৭২ জনই শহরে বসবাস করত। বাংলা দেশের যাবতীয় কলকারখানার কাজে যত লোক লিপ্ত ছিল তার মধ্যে ১৮·৩ ভাগ ছিল অন্য প্রদেশের লোকেদের হাতে; ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লিপ্ত লোকসংখ্যা ১৪·৪ ভাগ, যানবাহনের কাজে ৩০·১ ভাগ, আর অন্যান্য পেশা ও চাকুরিতে ১১·৫ ভাগ। আর যদি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলির হিসাব নেওয়া যায় (বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, ২৪ পরগণা) তা হ'লে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২, ১৭·২, ৩২·১ এবং ১৪·৫ ভাগ। শুধু কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিসাব থেকে দেখা যায়, শিল্পবাণিজ্য ও আনুষঙ্গিক যাবতীয় পেশার শতকরা ৬৩ ভাগ অপর প্রদেশের লোকের হাতে।

গত আদমসুমারীর সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত লোকের সংখ্যা নিম্নোক্ত তালিকায় পাওয়া যায়।

	মোট লোকসংখ্যা (০০০)	অন্যান্য প্রদেশাগত লোকসংখ্যা (০০০)	কৃষি ছাড়া অন্যান্য কাজে লিপ্ত (০০০) মোট জনসংখ্যা	অন্যান্য প্রদেশাগত
শিল্পাঞ্চল (বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা ও কলকাতা)	১২৫১৫	১৪৭৬	৭২৪১	১৩৯২
বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর (কৃষি অঞ্চল)	৫৭৪৫	১৩৯	১০৫২	৮৫
নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার (কৃষি অঞ্চল)	৫১৯০	১০৩	১৫৫০	৬৩
জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং (চা বাগান)	১৩৬০	১৬৩	৭৭২	১৪৪
	২৪৮১০	১৮৮১	১০,৬১৫	১৬৮৪

অন্যান্য প্রদেশ থেকে যারা কাজের সন্ধানে এসেছে তার মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে (৭৯%) ১৫-৫৪ বছরের মধ্যে; অপর দিকে সারা বাংলা দেশে এই বয়সের মধ্যে যত লোক আছে তার হার হচ্ছে মাত্র ৫৭·৪ ভাগ; অতএব রোজগারী লোকেদের সংখ্যাও অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত লোকেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি। ১৯৫০-এ পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৪১৪টি ফ্যাক্টরীতে কাজ করত ৬৪১,৬৯৪ জন লোক; সেই সংখ্যা ১৯৫৯-এ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯০০ এবং ৬৯১, ৪৬৯। ১৯৫০-এ এইসব ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা রোজগার করেছিল ৫৩,৫৩,৬১,০০০ টাকা, ১৯৫৯-এ এই অঙ্ক দাঁড়ায় ৬৫,৬৬,৫৯,০০০ টাকায়। কয়লার খনির শ্রমিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯১,৬৫৮ ও ১১১,৮৩৪, চা বাগানে ৩২৯,১১৪ ও ২১৫,১০৯। বছর দশেক আগেকার হিসাব থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল থেকেই শ্রমিকদের রোজগার থেকে বছরে ৪৮ কোটি টাকা অন্যান্য প্রদেশে পাঠান হ'ত।

দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে আমরা পেরিয়ে এসেছি; আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে এসেছে আমূল পরিবর্তন। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট ইত্যাদির সামগ্রিক উন্নতির জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে; ১৯৪৮-৪৯-এ পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব ছিল ৩২ কোটি টাকা, ১৯৬২-৬৩-তে সেই অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১০৪ কোটি টাকায়।(১) ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬-র মধ্যে সারা ভারতের মোট 'জাতীয় আয়' দাঁড়ায় ৪৯,৮৯০ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়ায় ৩৫৯১·৬২ কোটি টাকা (অর্থাৎ সারা দেশের তুলনায় ৭·২০ শতাংশ)। মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে কৃষির থেকে উৎপন্ন আয়ের অংশ সারা ভারতের ক্ষেত্রে ৪৮·১৩ শতাংশ, বাংলা দেশে ৩৫·২৬ শতাংশ; খনি, শিল্প ইত্যাদিতে যথাক্রমে ১৭·৬৪% ও ২৪·৫৮%, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ১৮·১৬% ও ২২·২১% এবং অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে ১৬·০৭% ও ১৭·৯৫%। সারা দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর স্বতন্ত্রতা এই তথ্য থেকেই অনুমান করা যায়।

বাংলা দেশের 'জাতীয় আয়' সারা ভারতের গড়ের তুলনায় বরাবরই বেশি আছে; নিম্নলিখিত তালিকা থেকে সেকথা স্পষ্ট হয়:

(১) এই সময়ের মধ্যেই আসামের রাজস্ব দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি থেকে ৪৪ কোটিতে, উড়িষ্যার ৬ কোটি থেকে ৬২ কোটিতে, বিহারে ২৩ কোটি থেকে ৮৩ কোটিতে। ১৯৬১তে ভারতের মোট এলাকা ও জনসংখ্যার ভাগ বিভিন্ন প্রদেশে যথাক্রমে নিম্নরূপ ছিল; পশ্চিমবঙ্গ, ২·৮৭% ও ৭·৯৬%; আসাম ৪% ও ২·৭১%; উড়িষ্যা ১১·২২% ও ৪·৬৩%; বিহার ৫·৭১% ও ১০·৫৯%।

গড় মাথাপিছু আয় (টাকা)

	ভারতবর্ষ	পশ্চিমবঙ্গ
১৯৫১-৫২	২৭৪.২	২৮৭
১৯৫২-৫৩	২৬৫.৪	২৬৯
১৯৫৩-৫৪	২৭৮.১	২৬৮
১৯৫৪-৫৫	২৫০.৩	২৪৯
১৯৫৫-৫৬	২৫৫.০	২৬২
১৯৬১-৬২	৩২৯.৭	—

সম্প্রতি কলিকাতা পুনর্গঠন সংস্থা (C. M. P. O.) হিসাব ক'রে দেখেছেন কলকাতা, হাওড়া, হুগলী এবং নদীয়া থেকেই ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়ের প্রায় ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ এসেছিল; মাথাপিছু আয় কলকাতাবাসীদের বছরে ৫৫০ টাকা, অন্যান্য চারটি জেলার হচ্ছে ৪০০ টাকা। এর অর্থ হচ্ছে এই পাঁচটি অঞ্চলের মোট ১ কোটি ৫২ লক্ষ লোকের (অর্থাৎ বাংলা দেশের মোট ৪৩.৫ শতাংশ লোকের) গড় মাথাপিছু আয় ৪২৯ টাকা, আর বাকী ৫৬.৫ শতাংশ লোকের মাথাপিছু গড় আয় আনুমানিক মাত্র ২৮০ টাকা।

বাংলা দেশের শিল্পাঞ্চলে ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর সময় অন্যান্য প্রদেশাগত কতজন লোক ছিল তার বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি, ১৯৬১র আদমসুমারীর বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ সাপেক্ষে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত যে, নানান কারণের সমন্বয়ে এই জনস্রোত উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। শিল্পাঞ্চলে ইতিমধ্যেই সবরকম দৈহিক পরিশ্রমের কাজে যেমন অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বহু সংখ্যায় লিপ্ত আছে, তেমনি অন্যান্য অঞ্চলেও, যেখানেই শহর বৃদ্ধি হচ্ছে, সেখানেই যাবতীয় কাজে দেখা যাচ্ছে অন্য প্রদেশের লোকের প্রাধান্য বেড়ে চলেছে। অপর দিকে পাট, চা ও অন্যান্য যেসব শিল্পের কেন্দ্র হচ্ছে বাংলা দেশ, সে সব শিল্পের বাৎসরিক মুনাফা কত পরিমাণে বাংলা দেশের বা ভারতের বাইরে পাঠানো হচ্ছে, সেই বিষয়েও বিশদ তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

এই সূত্রেই বাংলা দেশের সমৃদ্ধির কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণ উল্লেখ করা যেতে পারে; ১৯৬০-এ ভারতবর্ষের মোট ৮,৯০, ৮৮৭ জন লোক ও প্রতিষ্ঠান যারা আয়কর দিয়েছিল, তার মধ্যে বাংলা দেশেরই আয়করদাতার সংখ্যা ১৪১,০০০ জন (১৫.৮ শতাংশ) আর মোট যত টাকার ওপর কর ধার্য হয়েছিল (১১৯২ কোটি টাকা) তার ২০.৭% ভাগ টাকা (২৪৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা) বাংলা দেশের মধ্যে অর্জিত। ১৯৫০-৫১তে আয়কর ধার্য হয়েছিল মোট ৮১,৯৭৯ জনের উপর, তাদের আয় ছিল ১৩২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলি যত টাকা ব্যবসায়ে খাটায় তার এক-চতুর্থাংশের বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলা দেশে; মোট যত টাকার চেক ক্লিয়ারিং হাউসের মারফৎ লেনদেন হচ্ছে তার এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে কলকাতা শহরে। ১৯৫৮-৫৯-এ দেশের যত মোটর গাড়ি (৫৫৯৫৩২) ছিল তার মধ্যে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১০৪২৪৮) ছিল বাংলা দেশে। ১৯৪৯-৫০-এ বাংলা দেশে রেডিওর সংখ্যা ছিল ৬৯৯২২টি, ১৯৫৮-৫৯এ ছিল ১৯৮২০৪টি। আমাদের দেশের অগ্রগতি ও উন্নতির নিদর্শন হিসাবে এই রকম আরো অনেক কিছুই উল্লেখ করা যেতে পারে।

আরেক দিকে, চাষের দিক্ দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে তার কিছু আভাষ নিম্নলিখিত তথ্যাদি থেকে পাওয়া যায়।

	খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিযুক্ত ১০০ একর পিছু জনসংখ্যা		মোট চাষের জমির ১০০ একর পিছু জনসংখ্যা	
	১৯৫১	১০৬১	১৯৫১	১৯৬১
পশ্চিমবঙ্গ	২০৭	২৬৪	১৮৭	২৩২
উড়িষ্যা	১৩৯	১৪৪	৯৫	১১৭
আসাম	২০৩	২৬৭	১৩৮	১৯৮
বিহার	১৪৮	১৯৩	১৩৮	১৭০
ভারতবর্ষ	১৪৭	১৫৬	১১২	১১৮

কৃষির উন্নতি গত দশ বছরে প্রচুর হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে না। দশ বছরে বাংলা দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৩%, জনসংখ্যা বেড়েছে ৩২.৮% ভাগ, উড়িষ্যার ক্ষেত্রে এই অঙ্ক যথাক্রমে ৮১.৮% ও ১৯.৮%; বিহারে ১০% ও ১৯.৮% ভাগ। সারা ভারতের গড় যথাক্রমে ৩৮.৩% ও ২১.৫ ভাগ।

১৯৫১-র তুলনায় ১৯৬১-তে পশ্চিমবঙ্গে মোট কর্মরত লোকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ, তার মধ্যে চাষের কাজে লিপ্ত লোকের সংখ্যাই বেড়েছে ১৬ লক্ষের বেশি। অপর দিকে মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মরত লোকের হার কি হারে বদলাচ্ছে তার হদিশ পাই নিম্নলিখিত তালিকা থেকে:

মোট জনসংখ্যা (১০০)র তুলনায় কর্মরত লোকের হার

মোট

	১৯৫১	১৯৬১
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪·৪৭	৩৩·১৬
আসাম	৪২·৫৩	৪৩·২৮
বিহার	৩৪·৯৬	৪১·৪০
উড়িষ্যা	৩৭·৩৭	৪৩·৬৬
ভারতবর্ষ	৩৯·১০	৪২·৯৮

	পুরুষ		স্ত্রীলোক	
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১
পশ্চিমবঙ্গ	৫৪·২৩	৫৩·৯৮	১১·৬৩	৯·৪৩
আসাম	৫৩·৫৭	৫৪·১০	২৯·৯৮	৩৯·৯১
বিহার	৪৯·১২	৫৫·৬০	২০·৬৬	২৭·১২
উড়িষ্যা	৫৬·৪০	৬০·৭৫	১৮·৭৬	২৬·৫৮
ভারতবর্ষ	৫৪·০৫	৫৭·১২	২৩·৩০	২৭·৯৬

সারা ভারতবর্ষে এবং পূর্ব ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেখানে কর্মরত লোকের হার দশ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তার স্থলে সেই অঙ্ক কমেছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই এই নিম্নগতির কারণ কি? এত সমৃদ্ধি আমরা চারিদিকে দেখছি, আরো সমৃদ্ধির জন্য উত্তরোত্তর ট্যাক্স বৃদ্ধি ও ঋণগ্রহণ করছি, তা সত্ত্বেও কর্মরত লোকের হার যে কমছে তার থেকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়?

একদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি, অপরদিকে অন্য প্রদেশাগত লোকের কর্মসংস্থান—এই বিপরীত ধারা রোধ করার দায়িত্ব যদি সরকার না নেন তা হ'লে 'পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে ধনী প্রদেশ' এই তথ্যের পুনরাবিষ্কার ও ঘোষণা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন উঠবে, ভারতেরই অপর প্রদেশ থেকে আগত লোকেদের আরেক প্রদেশে রোজগারের পথে আমরা বাধা দিই কি ক'রে? আরেকটি পুরাতন কথা উঠতে পারে যে, দৈহিক পরিশ্রমের কাজে বাঙালী বিমুখ বা অক্ষম, তা নাহলে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও অন্য প্রদেশের লোক এসে সুদূর পল্লীগ্রামে বা ছোট ছোট শহরে স্থানীয় লোকদের হটিয়ে যাবতীয় কাজ হস্তগত করছে কি ক'রে? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রথমটির সূত্রে, Commission for Legislation on Town and Country Planningএর রিপোর্টে উল্লিখিত কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি:

Presiding at a sub-committee set up by the Working Committee of the Indian National Congress in 1939 to consider the claims of the people of any particular province for a larger scale in the public services and other facilities within the province he (Dr. Rajendra Prasad) said in his Report that, "it is neither possible nor wise to ignore these demands and it must be recognised that in regard to services and like matters the people of a province have a certain claim which cannot be overlooked. This found expression in Clause (3) of Art. 16 which enabled Parliament to prescribe prior residence for an undefined period as a condition of eligibility to appointment under the State or local authority or under any authority, and in Clause (4) which enabled the State (not, be it noted, the Parliament) to reserve appointments and posts in favour of any backward classes of citizens which, **in the opinion of the State,** are not adequately represented in the services under the State . . . By an irony of circumstances, the discrimination here is not in favour of the people of the State by the administration but against them by a combination of capital and labour both of which have their geographical roots elsewhere."

ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী প্রদেশের কর্মকর্তারা এই মূল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা কি ভাবে করছেন বা করবার কথা বিবেচনা করছেন তা এখনও দেশবাসী সম্যকরূপে বুঝতে পারেন নি।

মেয়েদের হোষ্টেলে দিনকয়েক

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

মধ্যপ্রদেশের কোন এক শহরে পাহাড়ের উপর নিরিবিলি এক জায়গায় মেয়েদের হোষ্টেলটি। দুদিক দুটি লম্বা ব্যারাক চলে গেছে, তাতে সারি সারি বহু কামরা, মাঝখানে প্রশস্ত অঙ্গন, পেছনে রান্নাঘর, খাবার ঘর, আর চারদিকে উঁচু দেয়াল। সামনে প্রশস্ত লোহার গেট, দুদিকে মাধবী লতা বেয়ে উঠে সুন্দর শ্রী দিয়েছে। এক-পাশে চৌকিদারের ছোট্ট একটি কুঠরী, সারাদিন সে টহল মারে, কোনো পুরুষ লোকের অনধিকার প্রবেশে বাধা দিতে। এমনি সুরক্ষিত মাঝারী ধরণের হোষ্টেলটি বহু কিশোরী ও তরুণীতে পূর্ণ। তাদের মধ্যে দুচারজন বিবাহিতা তরুণীও আছে।

এই শহরটি ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার সেন্টার থাকায় এপ্রিল ও মে মাসে এই মেয়ে হোষ্টেলটিতে স্থানাভাব ঘটে যায়। বহুস্থান থেকে এখানে এসে ভিড় ক'রে তোলে কত কিশোরী, তরুণী, যুবতী ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা সমুদ্র পার হবার জন্য। আর তখনই এই হোষ্টেলটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে তরুণী কিশোরীদের নানা রং-এর নানা ঢং-এর পোশাকে, নানা ছাঁদে চুল বাঁধায়, তাদের নানা সুরের কথায়। কারো কথায় মধু ঝরে পড়ে। কারো গলা খ্যান খ্যান করে ওঠে। কারো বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর, কারো বা পৌরুষব্যঞ্জক, কেউবা মধুমতী, কেউবা স্বরসিকা, কেউবা আদুরে মোমের পুতুল, কেউবা বীরবালা। সেই তরুণীর রাজ্যটি হঠাৎ রঙে রসে কলরবে পূর্ণ হয়ে বিচিত্ররূপ ধারণ করে।

ব্যারাকের ঘরগুলোর সামনে প্রশস্ত বারান্দায় থামে থামে বেলী ফুলের লতা জড়ানো। হাজার হাজার সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রস্ফুট ও অর্দ্ধস্ফুট বেলকলি লতাগুলিকে অপরূপশ্রীতে মণ্ডিত করেছে। সকাল সন্ধ্যায় বেলীর গন্ধে হোষ্টেলের কক্ষগুলি আমোদিত থাকে। তরুণীরা ভোরে উঠে পুষ্পচয়ন করে, নানা ছাঁদে মালা গেঁথে খোঁপায় জড়ায়, কেউবা খাটের পাশে টিপয়ে বাটি ভরে ফুল রেখে দেয়, মলয় বাতাসে বেলীর মধুর গন্ধ উতলা ক'রে তোলে তরুণীদের হৃদয়।

পরীক্ষার সময় সন্ধ্যা সাতটায় রাত্রির আহার পর্ব্ব শেষ হয়ে যায়। ছাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প গুজবের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম করে নেয়। তারপর যে যার খাতা ত্র বই গুছিয়ে পড়তে বসে যায়। রাত্রি দশটা থেকে তাদের সুরু হয় পাঠের জন্য বিশেষ রকম কঠোর সাধনা। গ্রীষ্মের রাত, ঘরে কেউ শুতে পারে না। তাই বারান্দায় সারি সারি খাটিয়া পড়ে যায় ছাত্রীদের জন্য। প্রত্যেক থামের মাঝে মাঝে দুটি খাট। আর মধ্যভাগে টিপয়ে একটা বেডল্যাম্প। এভাবে দুটি বিস্তৃত বারান্দায় লতানো বেলীকুঞ্জের মধ্যে মধ্যে বেডল্যাম্পের তীব্র আলো বিকিরণ করছে, আর সেই আলোতে কিশোরী ও তরুণীদের পাঠরত মূর্ত্তি মনোরম হয়ে ওঠে।

এসব ছাত্রীদের মধ্যে বিভা আর লীনা দুটি তরুণী হোষ্টেলেরই বোর্ডার। তারা রিসার্চ স্টুডেন্ট। সে হিসেবে সিনিয়র এবং একারণে তাদের প্রতিপত্তিও খুব বেশী। নবাগত ষ্টুডেন্টরা তাদের সমীহ করে চলে। কেউ কেউবা তাদের তোয়াজও করে। এই তরুণী দুটির চেহারা কিন্তু কোন তরুণের হৃদয়ে শিহরণ জাগিয়ে তুলবে না। বিভা তো খুবই মোটা, পিঠের দুপাশে এখনই ভাঁজ পড়ে গেছে। লীনাও ফেলা যায় না, তবে দেহবর্ণ হিসেবে বিভা ফর্শা, লীনা শ্যামা এই যা তফাৎ। দুটি তরুণী দুই প্রদেশের। কিন্তু কয়েক বৎসর একত্র থেকে তাদের হৃদয় একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে, দুজনে অভিন্নহৃদয়া বন্ধু।

রাত দশটার পর ওরা ঘুমাতে আসে। দুজনে গড়াতে গড়াতে মন্থর গতিতে এসেই পাশাপাশি খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। বুকের নীচে বালিশটা রেখে দু-হাত দিয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরে, পা দুটো উপরে উঠিয়ে দোলাতে দোলাতে দুজনে বহু কথা বলে। নিজেদের মনের কথা। মাঝে মাঝে দুজনে জোরে হিহি করে হেসে ওঠে, পাঠরতা অন্য মেয়েদের চমক লাগিয়ে। এভাবে প্রায় রাতই দুজনে বহুক্ষণ মুখরোচক গল্প ক'রে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিন মিনিট পাঁচেক চুপচাপ থাকতে না থাকতেই হঠাৎ লীনা চেঁচিয়ে উঠল এই বিভা, কেলে খাওগী ?

লীনা চটে বলে, ঘুমুতে দিবি না নাকি ? তোর মত

আমার উৎকট ক্ষিদে নেই যে রাত বারোটাতে কলা খাব।

হাঁ, হাঁ, জরুর খাওগী, কেলেমে বহুত ফস্‌ফরাস হ্যায়, রিসার্চ্চকে লিয়ে তেরা দিমাগ খুল জায়গা।

চুপ কর্‌ দিকি, কেলে খেয়ে তোরই দেমাক খুলুক, আমার কি সুন্দর ঘুমের আমেজ আসছিল, ভেঙ্গে দিলি।

বিভা ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, ওহো, সুরেনের জন্য বুঝি দিল স্বপ্নে ঘুরছে?

তোর মাথা। শোন্‌ কাজের কথা, কালের জন্য দই পেতেছিস কি?

হাঁ জী, হাঁ জী, ঘাবড়াও মৎ, সব কুছ ঠিক হ্যায়।

নিস্তব্ধ রাতে দুই সখীর এই উদ্ভট আলোচনায় হোষ্টেল প্রাঙ্গণ সচকিত হয়ে ওঠে। দুজনে দুই ভাষাভাষী হলেও দু'ভাষাতেই উভয়ের দখল আছে। তাই তাদের এই বিচিত্র কথোপকথন চলে। ফোর্থ-ইয়ারের ছাত্রী বীণা, লতা, প্রকাশ ওরা চটে ওঠে এই দুটির অশিষ্ট ব্যবহারে। হোক্‌ না তারা সিনিয়র ষ্টুডেণ্ট, হোক্‌ না অভিন্নহৃদয়া, কিন্তু তাদের কি অধিকার আছে অন্যদের পাঠের ব্যাঘাত করবে? ছাত্রীদের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, কিন্তু কেউ সাহস পায় না প্রতিবাদ করবার। শুধু দুচারজন প্ল্যান করে, কি ক'রে ওই দুটি আদুরে অহঙ্কারী রিসার্চ্চ স্টুডেণ্টকে শিক্ষা দেওয়া যায়। মেট্রন তো আবার গলে পড়েন বিভা বহেনজী আর লীলা বহেনজীর জন্য, তাই তো এত আবদার ওদের।

প্রায় অধিকাংশ ছাত্রীরাই রাত দশটা থেকে দেড়টা দুটা অবধি ধ্যানমগ্না হয়ে সরস্বতীর আরাধনা করে। রাত যত গভীর হতে থাকে, তাদের চোখের পাতাও তত ভারী হয়ে আসে। কেউ কেউ বই দুখানা হাতে নিয়ে ঢুলতে থাকে। কেউ পড়ার বই সরিয়ে উঠে পড়ে। তখন এদিক্‌-ওদিক্‌ ষ্টোভে পাম্প করবার আওয়াজ পাওয়া যায়। কেট্‌লীতে জল চাপিয়ে মেয়েরা একে দুয়ে কফি বানিয়ে খেতে সুরু করে। কফি খেতে খেতে চোখের ঘুম তাড়ায়, ক্লান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্ক তাজা করে আবার পড়তে বসে। ওরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সারা-বৎসরের অবহেলা এই দুই তিন সপ্তাহের অধ্যয়নেই পূরো মাত্রায় শুধরে নেবে। কিছু পর একটা সময় আসে যখন সবাই ঘুমে অচেতন হয়ে যায়, দেখে মনে হয় যেন রূপকথার বন্দিনী রাজকন্যারা পালঙ্কে বেঁহুস হয়ে পড়ে পড়ে আছে। ভোরের মিঠে বাতাস ঘুম গাঢ় করে তোলে, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যদের কলরবে ওদের ঘুম ভেঙে যায়।

একঘেয়ে খাবার খেতে খেতে মেয়েদের অরুচি ধরে আসে, মালতী আর লিলি গিয়ে বলে, ও বামুন ঠাকরুণ, একটু ভাল রান্না করে খাওয়াও না, তোমার ঐ লাউ-এর ঝোল আর তেলাকুচের রসা খেয়ে ত আর পেরে উঠছি নে। বামুন ঠাকরুণ একগাল হেসে বলে, বাছারা, তোমরা বাঙালী, এ হোষ্টেলে তোমাদের মাছ ত পাবে না।

মাধুরী, লীলা, শীলা এরা মাঝে মাঝে চাপরাশীদের দিয়ে ডিম কিনিয়ে আনে। শনি রবিবারে বসে ষ্টোভে অমলেট ভেজে খায়। অমলেটের ঘ্রাণে হোষ্টেল আমোদিত হয়ে ওঠে। কেউ বা নাকে কাপড় চাপা দেয়, কেউ বা ভাবে খেলে মন্দ হ'ত না।

মাঝে মাঝে কোন কোন মেয়ের বাবা, কাকা বা দাদা আসেন দেখা করতে। সঙ্গে নিয়ে আসেন তাদের মায়েদের সযত্নে দেওয়া ঘি, নেবুর আচার, আমের আচার, বেশমের নাড়ু, চিওড়া ইত্যাদি। তাদের বন্ধুমহলে সাড়া পড়ে যায়। আর যে মেয়েটির জন্য এসব জিনিষ আসে সে আহ্লাদে অস্থির হয়ে ওঠে, যেন সাতরাজার ধন মাণিক পেয়েছে। খেতে বসবার সময় সেগুলো যত্ন করে খুলে বন্ধু-বান্ধবের পাতে একটু একটু করে পরিবেশন করে। আনন্দে তাদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অন্য মেয়েরা বলে, আহা, এদের ভাগ্য ভাল। বাড়ী নিকটে, তাই মা বাবার কাছ থেকে কত কিছু পায়। আর আমাদের কোন্‌ মুলুকে বাড়ী। আজ এক মাস ধরে সেখানকার একটা লোকেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, বলতে বলতে তাদের মুখ ম্লান হয়ে ওঠে।

একে একে পরীক্ষা সুরু হ'ল, মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া ভুলে তা নিয়েই ব্যস্ত। এক-একদিন এক-এক পেপার দিয়ে এসে বলে, বাঁচা গেছে। ভাগ্যিস ভাল প্রশ্ন এসেছিল। কেউ খুশী, ভাল উত্তর লিখেছে। কেউ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, যাচ্ছেতা পেপার। আমি নির্ঘাত ফেল হব। সন্ধ্যেয় সারাটা হোষ্টেল মুখরিত হয়ে ওঠে। তরুণী ও কিশোরীদের দেখে মনে হয়, যেন এই পরীক্ষার পেপারের উপরই তাদের জীবনে সব ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

সেদিন মাধুরী, প্রকাশ, ইলা আর শোভা চারজন মন দিয়ে পড়ছিল। গভীর রাতে, এমন সময় হঠাৎ কি রকম অস্বাভাবিক ভাবে ছুটে এসে শশিকলা মাধুরীর বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। চারজনেই চমকে উঠে একসঙ্গে বলে

উঠল, শশি, শশি, কি হয়েছে? শশিকলার মুখ ততক্ষণে পাংশু হয়ে উঠেছে, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শোভা বলে, ফিট্ হয়েছে শীগগির মাথায় জল দে। প্রকাশ বললে, হাওয়া কর, জলদি হাওয়া কর, ফিট ত নেই হোয়া, লেকিন ঘাবড় গয়ী। আরও একে দুয়ে মেয়েরা এসে জড়ো হতে লাগল। নানারকম শুশ্রূষায় বহু ক্ষণে শশিকলা সুস্থ হল। প্রথমেই চোখ খুলে বলল, মাধুরী বহিন, জলদি বেলীফুল ফেক দো, ফেক দো।

সবাই ত অবাক্, মেয়েটা বলে কি? শশিকলা তখন তার নিজ ভাষায় বলতে লাগল যে, সে তার ঘরে বসে নিরিবিলি পড়ছিল, পড়তে পড়তে তার চোখ ঘুমে ঢুলে এল। খাটের কাছে বাটি ভর্ত্তি বেলী ফুল, তার মিষ্টি গন্ধ একটা আমেজ এনে দিল, কিন্তু কিছু পরই হঠাৎ তার মনে হ'ল, কে যেন তার গলা চেপে ধরছে, আর বলছে, বেলীফুল পেড়েছিস কেন? রাত্তিরে বেলী ফুল কখনো পাড়বি নে। শীগ্‌গির ফুল ফেলে দে, নইলে ভাল হবে না। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। বহু কষ্টে ভগবানের নাম নিতে নিতে আমার হুঁস ফিরে এল। আমি জোর করে ছুটে তোদের এখানে পালিয়ে এলাম। নইলে নির্ঘাত আজ আমার প্রাণ যেত। বলতে বলতে শশির গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল।

বামুন ঠাকুরুণ রান্নাঘরের বারান্দায় শুয়ে ছিল, সেও গোলমাল শুনে উঠে এসেছে। শশিকলার কথা শুনে বললে, ওগো মেয়েরা, তোমরা ত আমার কথা শুনতে চাও না। সেদিনই বলেছিলাম, রাত্তিরে ফুল, বিশেষ করে বেলীফুল, পাড়তে নেই। তাতে ওঁরা ভর করে।

মেয়েরা উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কারা?

—রাত্তিরে নাম নিতে নেই যাদের, তারা।

মেয়েদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠল। তারপর মাঝে মাঝে নানা রোমাঞ্চকর কথা শোনা যেতে লাগল। একেই ত পরীক্ষার সময় মেয়েদের মাথা গরম। তারপর এসব নানা ধরণের কাহিনী কেউ শোনে, কেউ উঠেযায়। সবার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। দিন কয়েক পরের কথা। রাত্তিরে হঠাৎ প্রভা চীৎকার করে উঠল। সবাই বললে, কি হয়েছে? প্রভা উঠে বসল। তার শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বললে, ঘুমের মধ্যে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, কে এসে আমার খাটের চারদিকে ঘুরছে। তাকে দেখতে পাই নি, তবে অনুভব করছিলাম, সে এসে আমার খাটে বসল। মনে হ'ল যেন একটা হিমশীতল হাত আমার হাত চেপে ধরল, আর যন্ত্রণায় আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। বহু কষ্টে ভগবানের নাম জপ করবার পর সেটা দূরে চলে গেল, আর আমিও জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

প্রভা বললে, আমার মা আমাকে একটা মাদুলী দিয়েছিলেন। এবার ভুলে আমি সেটা আনি নি। মাদুলী থাকলে এসবের ভয় থাকে না।

কিছুদিন পর অপরদিকের ব্যারাকের আর একটি মেয়েও আচমকা ভয় পেল। সেও নাকি কার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনতে পেয়েছে। মেয়েরা বলতে লাগল, বাপ রে, পরীক্ষাটা শেষ হ'লে এখান থেকে পালিয়ে বাঁচি। বামন ঠাকুরুণ খাবার পরিবেশন করতে করতে বললে, এই হোষ্টেলটা ভাল জায়গা নয়। এক'শ বছর আগে এক সময় না কি এখানে লড়াই হয়েছিল। বহু লোক মারা পড়েছিল। তাই তাদের অতৃপ্ত আত্মা এখানে ঘুরে বেড়ায় আজও।

এক-একটা পরীক্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে আর মেয়ের দল চলে যাচ্ছে যে যার বাড়ী হাসিমুখে। সেও আর এক দর্শনীয় ব্যাপার। মেয়েদের মধ্যে হৈ চৈ, যে যার বাক্স পেঁটরা গোছাচ্ছে। বিছানা বাঁধছে। কেউ এক মাসের, কেউবা তার চেয়েও বেশী দিনের পাতানো সংসার গুটাচ্ছে। কেউ কেউ আচার আর ঘি-র শিশি বোতল বামুন ঠাকুরুণকে দান করে দিচ্ছে। প্রত্যেকের এই এক-দেড়মাসের হোষ্টেলের জীবনে কত সখী জুটে গেছে। যাবার পূর্বে তাদের ঠিকানা লিখে নেওয়া, পত্রলেখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এসব ধরণের কত কাজ। তাই মেয়েরা বাড়ী যাবার মুখে হিমসিম খাচ্ছে। যাদের আবার একটু রাঁধবার সখ, তারা বাড়ী যাবার আগে নিজ হাতে কিছু খাবার তৈরী করে বন্ধু-বান্ধবকে খাইয়ে দেবার বন্দোবস্ত করছে। চাপরাশীকে দিয়ে ঘি ময়দা সুজি চিনি আনিয়ে ষ্টোভ ধরিয়ে আনন্দে নোনতা ও মিষ্টি বানাচ্ছে, আর বন্ধুদের খাওয়াচ্ছে আদর করে। তার পর একে দুয়ে বিদায় নিচ্ছে। হয়ত কারও সঙ্গে দেখা হবে, কারও সঙ্গে দেখা হবে না আর কোনও দিন। শুধু জীবনের পাতায় রয়ে যাবে একটা মধুর স্মৃতি।

পাঞ্জাবী মেয়ে ইন্দ্রার এম. এ. পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন চিঠি এল, দুদিন পর তার স্বামী আসবে এ শহরে। তার এক আত্মীয়ের বাড়ী উঠবে, তবে একদিন হোষ্টেলে এসে তাকে নিয়ে চলে যাবে।

ইন্দ্রার সবে মাত্র এক বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু

এম. এ. পরীক্ষার ফাইন্যাল ইয়ার ছিল বলে এতদিন তাকে হোষ্টেলে থেকে পড়তে হয়েছে। স্বামী আসছে এ খবর পড়েই ইন্দ্রা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সব্জীওয়ালার কাছ থেকে পাকা দেখে ভাল টমেটো দুই সের কিনল।

অন্য মেয়েরা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এত টমেটো কিনছিস কেন রে? সে সলজ্জভাবে বললে, আমার স্বামী টমেটো খুব ভালবাসে। বলতে বলতে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরিচিতা ছাত্রী যাদেরই দেখছে তাদেরই ডেকে বলছে, জানিস, পরশু আমার বর আমাকে নিতে আসবে। সবাই ইন্দ্রার রকম-সকম দেখে হাসতে লাগল।

দেখতে দেখতে পরশু এসে গেল, সকাল থেকে ইন্দ্রার কি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। দোকান থেকে নিমকি ও মিষ্টি কিনে আনিয়েছে। পাহাড়ের উপর এই হোষ্টেল। নতুন শহরে ইন্দ্রার বর রাস্তা-ঘাট চেনে না, তাই চাপরাশীকে ডেকে বললে তার স্বামীকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসতে।

উনকো পয়চানে ক্যায়সা, বলে চাপরাশী হাসিমুখে চেয়ে রইল। ইন্দ্রা আরক্ত হয়ে উঠল বরের পরিচয় দিতে গিয়ে। তখন বেলা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে, ইন্দ্রা বহিনকা দুলহার ইয়া মোছ হ্যায়, লম্বা চওড়া জবরদস্ত আদমী। শ্যাওল রং, নাম মালহোত্রা সাহেব। চাপরাশী একগাল হেসে ষ্টেশনে চলে গেল। আর ইন্দ্রার কি উৎকণ্ঠা, শুধু ঘর-বার করছে স্বামীর গাড়ি আসছে কি না দেখতে। ঘণ্টা দুয়েক পর যখন চাপরাশী বললে, বহেনজী, মালহোত্রা সাহেব ত নেহি আয়ে হ্যায়, তখন আর যায় কোথা? টপ্‌টপ্ করে তার দু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তারপর টমেটোর টুকরি কোলের কাছে নিয়ে কান্না সুরু করে দিল। বেলা, মাধুরী এরা বুঝিয়ে বললে, হয়ত আজ কোন কারণে আসতে পারে নি। কাল এসে যাবে, এত কান্না কেন? কিন্তু ছেলেমানুষের মত ইন্দ্রা শুধু চোখ মোছে আর বলে, my husband has not come! সে দুপুরে ভাল করে খেতেও পারল না।

পরদিন সকাল বেলা দরজার গোড়ায় একটা ট্যাক্সি এসে থামল। গাড়ীর আওয়াজ পেয়েই কয়েকজন মেয়ে ছুটে গিয়ে দেয়ালের পাশ থেকে উকিঝুকি মারতে লাগল। দেখতে পেল, এক গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক নেমে এদিক্-ওদিক্ তাকাচ্ছে। খানিক বাদে চাপরাশী ছুটতে ছুটতে এসে বললে, ইন্দ্রা বহেনজী, মালহোত্রা সাহেব আগয়ে। ইন্দ্রা পড়ি কি মরি ছুটে ভিজিটার্স রুমে গেল, খানিক পর এসে ষ্টোভ ধরিয়ে হালুয়া বানাতে বসে গেল। আর যাকে পাচ্ছে তাকেই বলছে, my husband has come.

ইন্দ্রা সুন্দরী না হলেও তার বড় বড় চোখদুটির নির্মল দৃষ্টি আর সরলতা মাখানো মুখ স্বামী সন্দর্শনে যেন ঝলমল করছিল। ইন্দ্রা যেন হরিণী, একবার ভিজিটার্স রুমে যাচ্ছে, আবার আসছে নিজের ঘরে। তার স্বামী যতই বলছে, ইন্দ্রা বসো, কোথায় যাচ্ছ, আমি খেয়ে এসেছি, কিছু করতে হবে না। কিন্তু ইন্দ্রা কি শোনে সে সব কথা? তার ঘরে স্বামী অতিথি হয়ে এসেছে, হোক না হোষ্টেল, সে তার প্রিয় অতিথির সেবা করবে না? সে প্লেটে হালুয়া, নোনতা, মিষ্টি সব সাজিয়ে নিয়ে ভিজিটার্স রুমে বসে স্বামীকে খাইয়ে এল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ছুটি নিয়ে সেদিনের মত বেড়াতে গেল। সিনেমা দেখে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল। পরদিন বিছানাপত্র বেঁধে স্বামীর সঙ্গে নিজের দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু স্বামীপ্রীতির সৌরভ ছড়িয়ে গেল সারা হোষ্টেলে।

বি. এ. পরীক্ষাও শেষ হল। এবার মাধুরী, শীলা, সরমা, লক্ষ্মী, বীণা ওদেরও পাট তোলবার কথা। জিনিষপত্র গুছাতে গুছাতে এদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। বীণা বললে, এবার যদি আমরা পরীক্ষায় পাস হই তবে কে কি করবে?

মাধুরী বললে, আমি এম. এ. পড়ব। পরীক্ষা পাস ক'রে একটা স্কলারশিপ জুটিয়ে এমেরিকা যাব রিসার্চ করতে, ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে ফিরব।

শীলা বললে, তাই নাকি? কার তরে উদাসী এ প্রাণ? মাধুরী বললে, উদাসী টুদাসী নয়। আমার জীবনে কোন রোমান্সই নেই। শীলা মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, সে হতেই পারে না। মেয়েদের ষোলবছর হলেই মনে রং ধরে, আর উনিশ বিশ বছরে চোখের সামনে রোমান্স খেলে যায়, মন রঙ্গে রসে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়। তুই 'না' বললেই তোর কথা বিশ্বাস করব?

মাধুরী উত্তর দিলে, ঠিকই বলেছিস শীলা, আমাদের এই বয়সটাই রঙ্গে রসে ভরা, কিন্তু আমি রসটাকে ছিপি আটকে রেখেছি, উপচে পড়তে দিচ্ছি না, কারণ আমার ছেলেবেলা থেকেই সাধ যে আমি এম্. এ. ভাল করে পাস করে বিদেশে যাব, বড় ডিগ্রী নিয়ে ফিরব, প্রফেসার হব। তাই আমার লেখাপড়ার চাপে অন্য ভাবনা চিন্তা বেশী

মাথা তুলতে পারে নি। তবে হ্যাঁ, যদি নেহাতই মনের মানুষ এসে উঁকি দেয় তবে পা পিছলাতে কতক্ষণ?

শীলা, সরমা বলে উঠল, তাই নাকি? আচ্ছা বীণা, তুই এবার তোর মনের কথা বল্।

বীণা হল রাজপুতকন্যা, মধ্যপ্রদেশের অতি পর্দানশীন ঘরের মেয়ে। সে দিব্যি সপ্রতিভ ভাবে বললে, দেখ্, তোদের রোমান্সের কথাগুলো শুনলে সত্যি মনের ভিতরটা কেমন করে। ভাবি, আমার দিকেও কেউ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখুক, কেউ মিষ্টিসুরে আমার নাম ধরে ডাকুক, যা শুনে আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠবে। কিন্তু সে সব রোমান্সের সুযোগ কোথায়? একদিন দেখবি, তোদের কাছে হলদে কাগজে লাল কালিতে ছাপা চিঠি আসবে—"মেরী সুপুত্রী বীণাকে সাথ অমুকস্য পুত্র চিরঞ্জীব অমুকস্য শুভবিবাহ হোগা।"

তিনজনেই চীৎকার করে উঠল, সেই অমুকস্য পুত্র কে বল্ না? বীণা বললে, তা তো জানিনে সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিটি কে, তবে জানি এক সকালে সানাই বাজবে, আর সাতবার ভাওরের (প্রদক্ষিণের) পর তার গলায় মালা দেব, আর তাকেই স্বামী বলে মেনে নেব। তারপর যখন তার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে ঘুঙট (অবগুণ্ঠন) তুলে ধরবে, তখন শুভদৃষ্টির সময় দেখব হয়ত একটি গোঁফওয়ালা ভুঁড়িওয়ালা লোক, অথবা ভাগ্যের জোর থাকলে দেখবে সুন্দর সুশ্রী এক যুবক। যা হোক, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, যখন রোমান্সের সুযোগই পাব না, তখন সে সব কথা ভেবে কি হবে, যার যা নসীব।

বীণা বললে, এবার শীলা তোর কথা বল্ দিকি, তোর ভাব স্বভাবে মনে হয়, তোর একটা কিছু ব্যাপার আছে। শীলা মৃদু হেসে মুখ নুইয়ে বললে, তার বিয়ে ঠিক, এবার গরমের ছুটিতেই হবে। সব মেয়েরা ছেঁকে ধরল, বাব্বা, তুই তো কম সেয়ানা মেয়ে নস, তোর বিয়ে ঠিক, আর দু'মাস রইলি আমাদের সঙ্গে, একবারটি পেট থেকে একথা বের হল না? সরমা বললে, তোর বরকে কি আমরা কেড়ে নিতাম নাকি? সবাই হি হি করে হেসে ভেঙ্গে পড়ল, যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল। বীণা বললে, তোর বরের কি নাম বল্। ও কি করে, দেখেছিস কখনও? প্রশ্নে প্রশ্নে ওরা তাকে বিব্রত করে তুলল। তখন বাধ্য হয়ে শীলাকে উঠতে হল, সুটকেস খুলে অতি সযত্নে রক্ষিত একখানা ফটো বের করে তাদের সামনে তুলে ধরল। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান্ এক যুবক। শীলা উজ্জ্বল মুখে বললে, সে খুব বিদ্বান্ বিলেতের ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। সবাই হৈ হৈ করে উঠল, বললে, শীলা, তোর অনারে আজ আমরা পার্টি দেব। শীলার ফর্সা গাল দুটো আপেলের মত হয়ে উঠল।

এবার সরমাকে বাকী তিনজন ধরে বসল, বললে, তোর জীবনের রোমান্স এবার বল্ দিকি।

সরমা ম্লানমুখে বললে, আমার আবার জীবনে রোমান্স কি? সবাই বললে, ফাঁকি দিলে চলবে না। যা আছে তাই বলে ফেল্। সরমা মহারাষ্ট্রীয় তরুণী, সে ঠিক সুন্দরী নয় তবে ধারাল নাক চোখ, মুখের গড়ন লম্বা, ছিপছিপে তন্বী। যদিও মুখে তেমন লাবণ্য নেই কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় উজ্জ্বল। যাকে বলে ব্রাইট চেহারা। সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, আমি যে স্কুলে পড়তাম, সেটি ছিল কো-এডুকেশনেল। তখন আমার বয়স চোদ্দ পনের। একটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। সে আমার বছর খানেকের বড়। স্কুল ছাড়বার আগে দুজনে শপথ করলাম, দুজনেই দুজনের জন্য অপেক্ষা করব। সে এখন পুনায় এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। আর আমি এবার বি. এ. দিলাম। কৈশোরের বন্ধুত্ব এখন গভীর ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হ'ল, আমাদের জাতপাত নিয়ে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। আর ওরা হল কায়স্থ। আমার বাবা মা কিছুতেই রাজী নন। ওঁরা বলেন, ব্রাহ্মণে কায়স্থে বিয়ে হতেই পারে না।

তা হলে তুই কি করবি? শীলা জিজ্ঞাসা করে। ব্যথিত ভাবে সরমা বললে, বল্ না তোরা, আমার কি করা উচিত? ওকে ছেড়ে অন্যকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কঠিন। আর সেও বলছে, আমাকে না পেলে সে সংসারী হবে না। আমি শুধু ভেবে সারা হচ্ছি, কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি নে।

মাধুরী বললে, রেজেষ্ট্রী বিয়ে ক'রে ফেল্ না। যদি তোরা দুজনেই দুজনকে সত্যিকারের ভালবেসে থাকিস, তাহলে এভাবে দুজনের জীবন ব্যর্থ হবার কোন মানে হয় না।

সরমা ধীর স্বরে বললে, দেখ্, ভাঙ্গতে বেশী সময় লাগে না, গড়তে সময় লাগে। আমি বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। কত স্নেহে আদরে আমাকে মানুষ করেছেন, এখন নিজের স্বার্থের জন্য তাঁদের মনে আঘাত দিতে কিছুতেই মন উঠছে না। আমাকে তোরা সেকেলে মনে করবি। কিন্তু সত্যি আমি বিশ্বাস করি, জীবনে এসব শুভকাজে বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদ চাই, তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না।

লক্ষ্মী বললে, তাহলে তুই কি করবি ?

ভাবছি যদি বি. এ. পাস করতে পারি তবে বি. টি. পাস করে মেয়েদের স্কুলে মাষ্টারী করব। এর পর যদি কোন দিন বাপ-মায়ের অনুমতি পাই তবে তাকে বিয়ে করব। নয়ত ওই নিয়েই জীবন কাটবে। সরমার কথায় ছোট ঘরখানা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। শীলা পরিস্থিতিটা হাল্কা করবার জন্য বললে, লক্ষ্মী, তুই তোর মনের কথা বলে আসর শেষ করে দে।

লক্ষ্মী বললে, আমার কথা কেন জিজ্ঞেস করছ ভাই, আমার জীবনে কোন রোমান্স টোমান্স নেই। আমি হলাম মাদ্রাজের ব্রাহ্মণকন্যা, আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ করতে হ'লে প্রথমেই কোষ্ঠী মিলাতে হয়। তার পর পাত্রের কথা। তোরা কনে দেখা কাকে বলে জানিস ত ? একবার ঘটক এক বৃদ্ধকে নিয়ে এল। বৃদ্ধ তার পুত্রের জন্য আমাকে দেখে পছন্দ করলেন। কিন্তু কোষ্ঠী মিলল না। আর একবার এক প্রৌঢ় ও তরুণী এলেন। কিন্তু তাদের দাবী-দাওয়ার খাই বড় বেশী। তৃতীয়বার এলেন স্বয়ং পাত্র তাঁর বন্ধুসহ।

বীণা বললে, পাত্র নিশ্চয়ই তোকে পছন্দ করেছে ?

—তা কি করে বলব ? তবে শুনেছি ওরা কোষ্ঠি মিলাচ্ছেন, ফলাফল আমি দেশে গেলে জানতে পারব।

শীলা জিজ্ঞেস করলে, তোর পাত্রকে পছন্দ হয়েছে ? লক্ষ্মী উত্তর না দিয়ে টিপি টিপি হাসতে লাগল।

মাধুরী কৌতূহলী হয়ে বললে, বল্ না কি ব্যাপার, হাসছিস কেন ?

লক্ষ্মী উত্তর দিলে, আমার কিন্তু পছন্দ হয়েছে পাত্রের বন্ধুকে।

বীণা বললে, বলিস কি রে, তুই ত সাংঘাতিক মেয়ে। বন্ধুটি বুঝি খুবই সুন্দর ?

লক্ষ্মী বললে, না, সে রকম কিছু নয়, তবে ওর মুখের ভাবে আর চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাতে এক নজরেই তাকে আমার ভাল লেগে গেল।

—তা এখন কি করবি ?

—কি করব ? এ কথাটাই প্রশ্নচিহ্ন হয়ে চোখে ভাসছে।

এভাবে গল্পগুজবের, হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়ে তাদের আসর ভাঙ্গল। সে রাতে তারা নিজেরা ষ্টোভ ধরিয়ে রান্না করে খেল। পরদিন বিছানা পত্র-বেঁধে যে যার পথে পা বাড়াল। প্রত্যেকের কাছে সজল চোখে বিদায় নিল এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে, যে যেখানেই থাকে তার সব খবর দিয়ে চিঠিপত্র দেবে। বামুন ঠাকুরুণের আঁচল আর চাপরাশীর পকেট বকশিষে বেশ ভারী হয়ে উঠল। আড়াই মাসের জন্য সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিতে হোষ্টেল বন্ধ করা হ'ল। একে একে লম্বা ব্যারাক ছুটির প্রতি কক্ষে তালা পড়ল।

পাঠরতা কন্যার দল চলে গেল প্রাণের আনন্দে হোষ্টেল ছেড়ে। কৃষ্ণচূড়ার শাখা, মাধবীলতা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তাদের বিদায় দিল। ঘরে ঘরে বন্দী হয়ে রইল তাদের অজস্র মনের কথা। সুদীর্ঘ কেশের সুগন্ধি তেলের সুরভি, পাউডার এসেন্সের মিষ্টি গন্ধ। বারান্দায় অজস্র বেলকলি ঝরে পড়তে লাগল মনের দুঃখে। কোন তরুণী বা কিশোরী আর বেলকলি তুলে সযত্নে মালা গেঁথে খোঁপায় জড়ায় না।

রান্নাঘরের চিমনী থেকে আর ধোঁয়া বের হয় না। বামুন ঠাকুরুণের ঠুংঠাং হাতাবেড়ির শব্দ হয় না। নেড়ী কুকুর তিনটে হোষ্টেলের খাওয়া খেয়ে বেঁচে ছিল। তরুণীরা কিশোরীরা তাদের খাবার থেকে বিস্কুট, রুটি, মিঠাই ভেঙ্গে দিত, আর ওগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে তা পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেত। তাদের ভাগ্যে আর কিছু জোটে না। হোষ্টেলের চারদিক্ ঘুরে ঘুরে তারাও হোষ্টেল ছেড়ে দিল। যে হোষ্টেলটি এতদিন নানাস্থানের কিশোরী ও তরুণীদের কলকণ্ঠে হাস্যে লাস্যে মুখরিত থাকত তা নীরব হয়ে গেল। মেয়ে হোষ্টেলকে তরুণীরা দু'মাসের জন্য নিরাভরণা রিক্তা করে তাদের সঙ্গে তার সমস্ত শ্রী ও সৌন্দর্য্য নিয়ে চলে গেছে।

—

রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতা

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত জীবনদেবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের চিন্তা ও মন্তব্য ধূম্রাচ্ছন্ন অস্পষ্টতায় পরিপূর্ণ। কোন সঙ্গত ও সুষম ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নি। বিহারীলালের মত কবির পক্ষে সুলভ অর্ধচিন্তা বারবার রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার রূপ দিয়েছে সংশয় ও অনুমানের কুয়াসায় ঢেকে। একই সঙ্গে মন্ময়তার প্রাবল্য আর জীবনদেবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বোধ—এই দু'টির পারস্পরিক সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর জীবনদেবতা সম্বন্ধে লিখেছেন :—

"জীবনদেবতা মেটাফিজিক্যাল জীবনদেবতা। আমার জীবনটিকে অবলম্বন ক'রে যে অন্তর্যামী শক্তি আপনাকে অভিব্যক্ত ক'রে তুলছেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি : আমাকে আশ্রয় ক'রে হে স্বামিন্! তুমি কি চরিতার্থতা লাভ করেছ?...ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে, তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই ; যিনি বিশেষরূপে আমার, অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎসংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আমি যাঁহার, যিনি আমার অন্তরে এবং যাঁহার অন্তরে আমি, যাঁহাকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালবাসিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, আমি তাঁহারই কাছে আবেদন করিয়াছি।"

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ অনাদি অনন্তকাল মানবের সঙ্গী হ'তে পারেন না ; জীবনদেবতা মেটাফিজিক্যাল হ'লে এবং কবির সমস্ত জগৎসংসার সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন ক'রে অবস্থান করলে তাঁকে ঈশ্বর ব'লে না মেনে নিয়ে কোন উপায় থাকে না। সর্বধারণপূরণক্ষম পরিব্যাপক ব্রহ্ম ছাড়া ঐ সামর্থ্যের পদবী অন্য কোন সত্তায় আরোপ করা সঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে কবি এত বেশি মন্ময় যে, তাঁর কোন ভাগ্যনিয়ন্তার অস্তিত্ব যে তিনি দু-একটি কবিতায় কল্পনা ক'রে নেওয়া ছাড়া বাস্তবিক উপলব্ধি করতেন, তা মনে করা যায় না। আবার, ঐ ভাগ্যনিয়ন্তাকে তিনি নারীরূপেও কল্পনা করছেন, যার ফলে মানসী-কল্পনার সঙ্গে, কবিমনের প্রেরণাদাত্রী শক্তির সঙ্গে জীবনদেবতার বিশৃঙ্খল যোগাযোগ বারবার সাধিত হয়েছে। কবি জীবনদেবতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্ম বা ভগবানের সম্পর্কিত ভাষাই ব্যবহার করেছেন অথচ তাঁকে "একমাত্র আমার" ব'লে দাবি করেছেন।

"The life Divine" গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন এক বিশেষ নিয়ন্ত্রীশক্তির কথা : "In fact we must accept the ancient idea that man has within him not only the physical soul or Purusha with its appropriate nature, but a vital, a mental, a psychic, a supramental. a supreme spiritual being." এই প্রাচীন ধারণাটি তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকে গৃহীত। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কি শ্রীঅরবিন্দের তথা যৌগিক পরিভাষায় Psychic Being বা অন্তঃপুরুষ? তিনি কি জীবাত্মা বা চৈত্যপুরুষ? শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষায়, জীবাত্মা Central Being বা মূলপুরুষ, "যাহা জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া সর্বদা বর্তমান থাকে, তাহাকেই বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।" চৈত্যপুরুষ বা অন্তঃপুরুষ বা Psychic Being ঐ জীবাত্মার নিম্নরূপ, ইহজন্মের মন-প্রাণ-দেহের পশ্চাতে বর্তমান নিয়ন্তা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "জীবন লইয়া যে অভিব্যক্তি, জীবাত্মা তাহার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্তমান ; চৈত্য-পুরুষ ঐ অভিব্যক্তির পিছনে রহিয়া উহাকে ধারণ করিয়া আছে।"

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা অনাদি-অনন্ত-কালব্যাপী সাহচর্যের জন্যে কবির জীবাত্মা ছাড়া আর

কিছু নন। ব্যক্তি-জীবনের প্রস্তরখণ্ডে বিশ্বজীবনের প্রাসাদ গাঁথা হচ্ছে; সমগ্র বিশ্বজীবনের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করছেন বিশ্বদেবতা; বিশ্বজীবনের যে প্রকাশ ব্যক্তি-কেন্দ্রে, সেই প্রকাশের নিয়ন্তার নাম রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় জীবনদেবতা—যিনি বিশেষ একটি ব্যক্তি-জীবনের অধিদেবতা। বিশ্বদেবতা এই জীবনদেবতার নিয়ন্তা। বিশ্বজীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত একটি ব্যক্তি-জীবনের অধিপতিই জীবনদেবতা। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্র-নাথের "মানুষের ধর্ম" রচনাটি দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি-মন স্বয়ং ব্যক্তিকেন্দ্রের নিয়ন্তা নয়; বিক্ষিপ্ত চিন্তায় পরিপূর্ণ মন ব্যক্তিসত্তার ভাগ্যনিয়ন্তা হ'তে পারে না। তার অন্তরালের অন্য এক শক্তিও তাকে কতক পরিমাণে গঠন ও পরিচালনা করছে। এই শক্তি বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রেখে ব্যক্তির বিশিষ্ট জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই শক্তির নাম জীবনদেবতা। জীবনদেবতা তা হ'লে মানুষের দেহ-মন-প্রাণের অন্তরালে অবস্থিত এক নিয়ন্ত্রীশক্তি; ইনি সর্বদা ব্যক্তিজীবনের মধ্য দিয়ে বিশ্বজীবনের ইতিহাস রচনায় সাহায্য ক'রে চলেছেন। এই দেবতা ব্যক্তির জীবনরাজ্যে বিশ্বদেবতার রাজপ্রতিনিধি।

জীবনদেবতাকে নারীরূপে কল্পনা করাও নিতান্ত অভিনব নয়; এ-ধারণাটিও উপনিষদ থেকে গৃহীত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে (শ্রীঅরবিন্দের নিজের অনুবাদে), "Two Unborn, the Knower and one who knows not, the Lord and one who has not mastery: one unborn and in her are the object of enjoyment and the enjoyer." এই ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর জীবনদেবতার সম্পর্কে: "আমি তোমার মালঞ্চের মালাকর হইব। আমি তোমার নিভৃত সৌন্দর্যরাজ্যে যথাসাধ্য আনন্দের আয়োজন করিতে পারিব।"

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা,
প্রতি দিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্য নব।

তবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অযোগ্য গুরু কবি বিহারী-লালের প্রভাবে সুসংলগ্নভাবে চিন্তা করতে অনেক সময়ে পারতেন না ব'লে এই জীবনদেবতাকে একই রচনায় পুরুষ ও নারী, দুই রূপেই এলোমেলো ভাবে বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় "হে জীবননাথ" সম্বোধনের পরেই সিংহাসনে সমাসীন রাজাকে অঞ্চলে মানসকুসুম চয়ন ক'রে মালা গেঁথে গলায় প'রে কবির যৌবনবনে ভ্রমণ করতে দেখা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ-বর্ণিত চৈত্যপুরুষ যেমন সাক্ষীস্বরূপ দেহ-মন-প্রাণের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাও কবির জীবনলীলা অবলোকন করেন:—

কী দেখিছ বঁধু, মরমমাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি?

এই "বঁধু" কি সেই তিনি, যাঁর সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে?—

"One Godhead, occult in all beings, the inner Self of all beings, the all-pervading, absolute without qualities, the overseer of all actions, the witness, the knower."

প্রজ্ঞা-উজ্জ্বল ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ যত সহজে তাঁর মূল-পুরুষ ও চৈত্যপুরুষের রূপ বুঝিয়ে দিয়েছেন, দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার দ্বারাও তা পারেন নি। পক্ষান্তরে, মানস-সুন্দরী, অন্তর্যামী ও জীবনদেবতার মধ্যে অস্পষ্ট চিন্তার রঙিন কুয়াশা রচিত, যা পাঠককে দিগ্‌ভ্রান্ত করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অনায়াসে দেখানো যায় যে, কবির কাব্যে প্রতি-বেশিনীর মেয়ে প্রথমে মানসী ও পরে জীবনদেবতায় পরিণত হয়েছে। এই পরিণতি বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে আসে নি। এই পরিবর্তন এসেছে কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে আশ্রয় ক'রে। যুক্তি-তর্ক বা বিচার-বুদ্ধির পথে এ-ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অসঙ্গত। যত-দূর জানা যায়, এ-কাণ্ড বিশ্বসাহিত্যের অন্য কোন কবির কল্পনাতীত। দান্তে-র রোমান্টিক কল্পনায় দৃষ্টান্ত বেআত্রিচে-চরিত্র ও তার দিব্য পরিণতিরও এ-ব্যাপারের

সঙ্গে কোন্ তুলনা চলে না। একমাত্র বিহারীলালে এর কিছু পূর্বাভাষ আছে। সুতরাং নিজের নিতান্ত মন্ময় উপলব্ধির দ্বারা মানসী ও জীবনদেবতার এ-হেন সমীকরণে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যে তুলনারহিত। বুদ্ধির প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় নি ব'লে কবির চিন্তা-ধারা তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের মত ঋষি-দার্শনিক না ক'রে কবি-রোমান্টিক করেছে। কিন্তু চিন্তার বিকাশের অস্বচ্ছতার জন্যে তিনি বিশ্বসাহিত্যে দান্তে ও গ্যেটের মত স্থায়ী মর্যাদা পাবেন না, এটা একরকম অবধারিত। দান্তে ও গ্যেটে, দুজনেই রোমান্টিক প্রেরণাময়ী রমণী-সত্তার কল্পনা করেছেন; কিন্তু তাঁদের বক্তব্য বিশুদ্ধ রোমান্টিক চৈতন্যকে আশ্রয় ক'রে ব্যক্ত, নারীকে কোন অমানবিক অলক্ষ্য নিয়ন্তার মর্যাদা তাঁরা দিতে যান নি। রবীন্দ্রনাথ নারীরূপকে উপলক্ষ্য ক'রে জীবনদেবতার যে-ভাবরস সৃষ্টি করেছেন, তা দুই অর্থেই "বিশেষরূপে তাঁর, একমাত্র তাঁর": তিনি জীবনদেবতার একেশ্বর উপভোক্তা এবং তিনি ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই যে, ঐ জীবনদেবতার প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করে। তা করতে পারলে আর "বিশেষরূপে" ও "একমাত্র" বিশেষণ দু'টির সার্থকতা কি রইল?

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ও আঁরি ব্যার্গ্সঁ-র দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, Bergson বলেছেন Ever-widening personality আর অবাধ জীবনপ্রবাহের কথা। রবীন্দ্রনাথ আরো-বেশি কিছু বলেছেন: এই জীবনপ্রবাহ শুধু চলা নয়, ব্যক্তিজীবনের আড়ালে মহত্তর সত্য রয়েছে। তাঁর Teleology বা উদ্দেশ্যবাদ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথ ব্যার্গ্সঁ-কে অতিক্রম করার পর নতুন কথা বলেছেন। Bergson বলেছেন: "What is to-day? It is all the yesterdays hurdled together." রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের সারনির্যাস: কোন এক সত্তা আজ ব্যক্তিজীবনকে এই ভাবে গ'ড়ে তুলছেন যাতে সমগ্র জীবনে বিশ্বজীবনের সঙ্গে সুসমঞ্জস এক মহত্তর সত্য ও সৌন্দর্যের বিকাশ হয়। জীবনদেবতা মানুষের মধ্য দিয়ে নানা ভাবে সেই মহত্তর সত্যের বিকাশ সাধন করছেন।

কিন্তু নিজের কবিতার ব্যাখ্যা রচনার সময় রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধির পাকা বাঁধা সড়কে পা ফেলে সাবধানে চলতে চান। সেই জন্যে তাঁর দেওয়া ব্যাখ্যা সব সময় তাঁর নিজের কবিতার ক্ষেত্রেও ঠিক নয়। বুদ্ধি প্রাণের কথার সবটুকু ধরতে পারে না। Dogma বা theory বা তাত্ত্বিক পরিভাষা দিয়ে সব সময় সব কাব্যের বিচার করা চলে না। যদি বিশেষ কোন তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে নাও পারা যায়, তা হলেও রবীন্দ্রনাথের বা অন্য যে কোন কবির কাব্য সুখপাঠ্য বা রসসম্পৃক্ত হতে বাধা নেই। কবি যে একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে বসেছেন, পাঠক এটা মনে করার সুযোগ পেলেই মুশকিল।

বহিঃসর্বস্ব বস্তুবাদী মন নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের রসবিচার করা ঠিক হবে না, যেহেতু তাঁর কাব্য রসধর্মী রোমান্টিক। চিত্রা কাব্যে আবেদন কবিতায় কবি বলেছেন, জীবনের জৈব প্রয়োজনগুলির চরিতার্থতার পর কাব্যের আবির্ভাব। এই কবিতার রানি হচ্ছেন জীবনলক্ষ্মী, জীবনকে তথা কাব্যসাধনাকে যে শক্তি সর্বোত্তম সাফল্যে মণ্ডিত করে। এই শক্তির কাছে পুরস্কার লাভের অর্থ, জীবনমহিমার মায়াসুন্দর রূপরচনায় সাফল্য। জীবনের ফুল ফোটা অর্থে, জীবনের বহুমুখী বিকাশ; সে-বিকাশ সুখ ও দুঃখ, উভয়েরই হ'তে পারে। জীবনের মহিমা যেখানে প্রকাশিত, সেখানেই কবির কাব্যের ফুল ফুটেছে। কবির কাজ, ঐ মহিমার সাহিত্য-রসময় রূপ-রচনা। তাঁর কাজ জীবনমহিমার রূপায়ণ, তত্ত্বব্যাখ্যাও নয়, অন্য বিষয়ে কৃতীদের মতো নব নব কীর্তির অনুসন্ধানও নয়। যে নিজেকে সংবৃত ক'রে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার রস-উৎসুক মনোভাব অর্জন করেছে, জীবনের জালে নিতান্ত জড়িয়ে পড়ে নি, জীবনমহিমা কেবল তার অধিগম্য। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিচেতনার আড়ালে একজন নির্লিপ্ত দ্রষ্টার অধ্যাত্মদৃষ্টি আছে, তাঁর রোমান্টিক ভাবুকতা সত্ত্বেও।

"দিনশেষে" কবিতায় যে নত-মুখে-চ'লে-যাওয়া তরুণীর বর্ণনা পাই, সে "সিন্ধুপারে" কবিতার মায়াবিনীও বটে। এর মধ্যে কোন দার্শনিক বা মেটাফিজিক্যাল তত্ত্ব খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক কবিতায় ঐ রহস্যময়ী কবির লীলাসঙ্গিনী, অনেক ক্ষেত্রে তিনি লীলাসঙ্গিনী ও জীবনদেবতার মিশ্রণ। সোনার তরী কাব্যের "মানসসুন্দরী" কবিতাটি ঐ ধরণের মিশ্রণের নমুনা। "লীলাসঙ্গিনী" কবিতাটি রোমান্টিক, আর "জীবনদেবতা" মিস্টিক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঐ দু'টি মনোভঙ্গি স্বতন্ত্র নয়, তারা এক মূল ভাবের দুই দিক্, তাদের মধ্যে প্রভেদ প্রকারগত নয়, পরিমাণগত।

পঞ্চশস্য

টেলষ্টারের পর

টেলষ্টারের পর 'রীলে', টেলষ্টারের পর 'সিনকম'। টেলষ্টার একটি সংযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহ, ইতিপূর্বে প্রবাসীর কোন এক সংখ্যায় এই

সিনকম উপগ্রহে যন্ত্রপাতি সমাবেশ

বিচিত্র উপগ্রহটি সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রকাশ হয়েছিল (দ্রষ্টব্য: প্রবাসী, কার্তিক ১৩৬৯ সংখ্যা)। পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে বাতাসের যে বলয় রয়েছে তা হ'ল নানা পর্যায়ে বিভক্ত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭ মাইল পর্যন্ত ট্রপোস্ফার, ৭ থেকে ২২ মাইল পর্যন্ত ষ্ট্রাটোস্ফার, ২২—৫০ মাইল মেসোস্ফার, ৫০—১৫০ মাইল থারমোস্ফার, এবং থারমোস্ফারের ঊর্ধ্বে বহিরাকাশ পর্যন্ত প্রসারিত এক্সোস্ফার। এ বিভাগগুলি ছাড়াও রয়েছে আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফার—বায়ুমণ্ডলের যে সীমায় বিদ্যুৎবাহী কণা বা আয়নগুলি ইতস্তত সঞ্চারিত থাকে, ভূপৃষ্ঠের ৬০ মাইল থেকে ২২০ মাইল পর্যন্ত তিনটি স্তর বিভাগে তা চিহ্নিত। এই আয়নোস্ফার হ'ল পৃথিবীর "রেডিও ছাদ"। আমরা জানি, রেডিও রশ্মি সাধারণ আলোক রশ্মির মতই বিভিন্ন তরঙ্গবিস্তারে ধাবমান হয়। তা সত্ত্বেও যে বেতার সঙ্কেত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়ায় তার কারণই হ'ল এই "রেডিও ছাদ", আয়নোস্ফারের স্তরে স্তরে প্রতিফলিত হয়ে বেতার তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠের বক্রতার বাধা ডিঙিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু মুশকিল বাধে টেলিভিশনের তরঙ্গ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে। টেলিভিশনের জন্য প্রয়োজনীয় তরঙ্গ সাধারণ বেতার তরঙ্গের তুলনায় অনেক ছোট। পৃথিবীর "রেডিও ছাদে" তা প্রতিহত হয় না, ফলে টেলিভিশনের প্রসার বড় সীমিত, ফ্লাড লাইটের আলোর মতই তার ছবি সামান্য পরিধি জুড়ে ছড়ায় মাত্র। টেলিভিশনের কেন্দ্র তাই উঁচু উঁচু টাওয়ারের উপর বসানো, ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পর পর এক একটি "রীলে" করার ব্যবস্থা করে টেলিভিশনের চিত্র দূর থেকে দূরান্তে সঞ্চারিত করা হয়। সারা ইউরোপ জুড়ে লণ্ডন থেকে মস্কোর মধ্যে এমন একটা বিধি-ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

অনেক দিন ধরে বিজ্ঞানীরা যা ভাবছিলেন, টেলিভিশনের ছোট ছোট তরঙ্গগুলি যদি কোন উপায়ে আবার পৃথিবীতেই ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে 'আকাশবাণী' রেডিও যন্ত্রের মত টেলিভিশনও সত্যিকার 'আকাশচিত্র' হিসাবে সার্থক হবে। আকাশের স্তরে যদি কোন প্রতিফলক

ব্যবস্থা কার্যকারী করা যায় তবেই তা সম্ভব হয়। চাঁদ নিয়ে এই চেষ্টা হতে পারে, আমরা জানি তা করেও দেখা হয়েছে। কিন্তু চাঁদের যা অসুবিধা—প্রথমে তার দূরত্ব, এবং দ্বিতীয়, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সব সময় তার দর্শন না মেলা ; সমস্ত ঝোঁক তাই কৃত্রিম উপগ্রহের উপর এসে পড়েছে।

আকাশের বুকে ধাবমান কৃত্রিম উপগ্রহ রেডিও-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে "আয়না"র মতই কাজ করে, আমরা জানি এ ব্যাপারে সবচেয়ে সার্থক টেলষ্টার। টেলষ্টার কেবলমাত্র সাধারণ আয়নার মতই টেলিভিশনের তরঙ্গ শুধু প্রতিফলন করে নি, টেলিভিশনের চিত্রবাহী বিভিন্ন তরঙ্গ তা গ্রহণ করেছে, তাকে জোরদার করেছে, এবং পৃথিবীর বিজ্ঞানীর নির্দেশমত তা আবার দূরতম স্থানে ছড়িয়েও দিয়েছে। এ ব্যবস্থার ফলেই ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে টেলিভিশনের ছবি বিনিময় সম্ভব হয়েছিল। "রীলে" এ জাতীয়ই আর একটি উপগ্রহ।

'সিনকম' টেলষ্টারের পথেই আর এক ধাপ। পৃথিবীব্যাপী টেলিভিশনের চিত্র সঞ্চার করার জন্য উচ্চতা ভেদে দশ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে হয়। এর বিকল্প উপায় হচ্ছে মাত্র তিনটি উপগ্রহ স্থাপন করা, তবে এজন্য পৃথিবী থেকে দূরত্ব সঠিক ২২৩০০ মাইল হওয়া প্রয়োজন (শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথের জন্য এই হিসাব)। এভাবে টেলিভিশনের বেতার রশ্মি পৃথিবীর প্রতিটি স্থানেই কোন না কোন একটি উপগ্রহ থেকে সর্বদা বর্ষিত হবে। এ পর্যায়ে পৃথিবীব্যাপী টেলিভিশন ব্যবস্থা চালু করার যে দু'টি চেষ্টা হয়েছে তাতে আশা করার মত যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসাবে ১৯৬৫ সালের মধ্যেই তা সম্ভব হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কথা স্বভাবতই মনে আসে। এদেশে টেলিভিশনের যুগ এখনো এসে পৌঁছয় নি। দিল্লী বোম্বাই, কখনো কখনো বা কলিকাতা মঞ্চোজে টেলিভিশনের খণ্ড চিত্র দেখানের ব্যবস্থা থাকে। অর্থনৈতিক কারণই এখানে প্রধান বাধা। আশা করা যায়, ধীরে ধীরে সময় অনুকূলে হবে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে ব্যাপক টেলিভিশন "চিত্র প্রদর্শনী"র আয়োজন চলছে ভারত সেখানে একটা স্থান করে নেবে।

মানুষ নানাভাবে মানুষের কাছে ধরা দিতে চায়। টেলিভিশনের ছবি ঠিক এখানে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙে রঙীন হয়ে উঠছে।

আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎসভা

বিজ্ঞানের একটি সার্বজনীন রূপ রয়েছে। এ কথা আমরা চিরকাল শুনে এসেছি, এবং বিনা চিন্তায় তা মেনেও থাকি। কিন্তু একটি সংখ্যা যে অর্থে সার্বজনীন, বিজ্ঞান ঠিক সেই হিসাবে আন্তর্জাতিক নয়। দশকে দশ-ই বলি কি 'টেন' বলি কিংবা 'ডেসি'-ই বলি, দশের মান যেমন প্রতিটি ভাষাভেদে সেই দশ-দশই থাকে, বিজ্ঞানের বিচার সে ভাবে অটুট থাকে না। আসল কথা, বিজ্ঞান কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সংখ্যা-নির্ভর নয়। সংখ্যাকে বাদ দিয়ে তার অস্তিত্ব নেই সত্য, কিন্তু এই সংখ্যা বিভিন্ন পরিমাপের একক (UNIT) হিসাবে অঙ্কের নিরাবয়ব রূপটি আর বজায় রাখে নি, বস্তুগত পরিমাণের ধারণাবাহী হয়ে জটিল এক প্রকৃতি গ্রহণ করেছে।

এখানেই যত সমস্যা। বিশ্বজনীন হলেও বিজ্ঞানের এক ভেদ প্রকৃতি দেখা দিয়েছে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। এককালে ক্রোশ গুণে আমরা পথে চলতে শিখেছিলাম, বিলিতী ট্রেণের গতি সেখানে ঘণ্টায় মাইলের হিসাবে। বর্তমানে আবার এসেছে মেট্রিক পদ্ধতির কিলোমিটার। আমাদের ধারণার ক্ষেত্রে তাই আলোড়ন এসেছে, মনের মাপকাটিতে নূতন করে আবার দাগ বসাতে হচ্ছে। কত মাইল মানে কত কিলোমিটার তা আমরা খাতায়-কলমে বেশ বুঝি, কিন্তু সেই যে কোন্ বয়সে স্কুলবাড়ী থেকে মনসাতলার দূরত্বটা জেনে মাইলের ধারণা মনে গেঁথেছিলাম তার সঙ্গে এই মিটার-কিলোমিটারের কোন থই পাই না। ওজন সম্বন্ধে মণ-সের-কিলোগ্রাম নিয়ে সেই একই গণ্ডগোল। মনের পাতায় একটা ধারণা আঁকা আছে, রবারের চাদরে আঁকা আলপনার মত, এই ধারণায় যেন টান পড়েছে, মনের ছবিটা তাই বিকৃত, কোথাও বা অর্থহীন। হিসাবের মোটা বই খুলে বারবার মিলিয়ে নিতে হচ্ছে। একটা পরিমাণ আর একটি পরিমাণের কত গুণ বা কত ভগ্নাংশ, গণিতের মতে তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে লেখা থাকে ; মানুষের ধারণায় তা এতটা সহজে অর্থময় হয়ে ওঠে না।

অথচ এই পরিমাণগত ধারণা মানুষকে চেষ্টা করেই আয়ত্তে আনতে হয়। বিজ্ঞান বিষয়কে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে চায়। সংখ্যা ও পরিমাপ কৌশলের মধ্যে কোন তত্ত্ব প্রমাণ করতে পারলেই তা খুশী। এজন্য শিল্প বা সাহিত্যকলার মত ধারণাতীতের মধ্যে ধারণাকে জাগিয়ে তোলার আগ্রহ তার এত নেই। তত্ত্ববিচার, তথ্যবিচার—এবং সেই কারণে পরিমাণ বিচার এ সব জেনেই যেন বিজ্ঞান সন্তুষ্ট। গণ্ডীটা এভাবে ছোট করে টানা হলেও যতটুকু তার জগৎ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপ কৌশলের কারণে তা দিবালোকের মতই স্পষ্ট। গভীরতা নিশ্চয়ই রয়েছে, তার একটা দার্শনিকতাও আছে, তবু দর্শনসুলভ অস্পষ্টতা আবছায়াভাব এতটা নেই। পরিমাণ ও পরিমাপ কৌশল এখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। এই পরিমাপ যদি নানা মুনির নানা মতের মত দেশী-বিলিতি মেট্রিক ইত্যাদি নানা পদ্ধতিতে থাকে, সমস্ত সূক্ষ্মতাকে ছাপিয়ে একটা অবশ্যম্ভাবী অরাজক বিশৃঙ্খলতা সমস্ত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্যকে পণ্ড করবে। এক সূত্রে তাই বেঁধে রাখা চাই। সেই সঙ্গে কারিগরি শাস্ত্রের অভাবনীয় উন্নতিতে যে বিচিত্র যন্ত্রের জগৎ তৈরি হয়েছে তাঁদের কার্যবিধি (RATING) উপাদান অংশ ইত্যাদির মধ্যে যাতে একটি সামঞ্জস্যকে ধরে রাখা যায় সেজন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা। তারের মধ্য দিয়া এতটা কারেন্ট বহানো চাই, মেশিনের ঘূর্ণন গতি এতবার হবে, ঘরের বাতির আলোটা একটু ঝিমিয়ে পড়েছে কারণ ভোল্টেজ ঠিক মত দেওয়া হয় নি—হাজারো টুকরো সমস্যা ছড়িয়ে রয়েছে। এ সমস্ত সমস্যাকে এক সূত্রে গেঁথে একই ভাবে সমাধানের জন্য প্রস্তুত হওয়া। বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত বিষয়ে একাজে যাঁরা দায়িত্ব দিলেন ইণ্টারন্যাশনাল

ইলেকট্রোকমিশন হ'ল তাঁদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ২৮ বার আন্তর্জাতিক সমাবেশ বসিয়ে এই বিদ্যুৎসভা বৈদ্যুতিক বিষয়ে অসংখ্য মান (Standard) নির্ধারণ করেছে। পৃথিবীর ৩৩টি দেশে এর জাতীয় সমিতি। সম্প্রতি ২৯শে মে থেকে ৮ই জুন পর্যন্ত ১১ দিন এই আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎসভা ইতালী, ভেনিসে মিলিত হয়ে নানা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রসঙ্গের আলোচনা করেছিল। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আট শ' কি নয় শ' জন বিশেষজ্ঞ এই সম্মেলনে যোগ দেন। ৫৫টি টেকনিক্যাল কমিটিতে গঠিত এই বিদ্যুৎসভায় ভারত থেকে তিন জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, আলিপুর গভর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসের ডাইরেক্টর শ্রী এস. এন. মুখার্জি মহাশয় বৈদ্যুতিক পাখা-সংক্রান্ত বিশেষ উপ-সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে সভার কাজ পরিচালনা করেছিলেন, আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎসভায় অনুরূপ সম্মানলাভ একজন ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রথম। ১৯৬১ সালে এই গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের ২৫তম সাধারণ সভা ভারতের রাজধানী দিল্লীতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎসভায় উদ্দেশ্য এবং কার্যবিবরণ সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

সাদা বাঘ

১৯৫১ সালে ডাঃ থিয়োডোর রীড নামে আমেরিকার একজন প্রাণতত্ত্ববিদ্ রেওয়ার মহারাজার প্রাসাদে অতিথি হয়েছিলেন। পালে বাঘ ধরা পড়েছে, এ হ'ল আবার সাদা বাঘ। সাদা বাঘ পৃথিবীর বিরল-দর্শন জিনিষ। রেওয়ার বনজঙ্গল সেদিক্ দিয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের মক্কা মেদিনা হরিদ্বার। সেখানেও যে একেবারে সুলভ্য তা নয়; শোনা যায়, গত পঞ্চাশ বছরে মাত্র ন'বার সাদা বাঘের শ্বেত মুখ দেখা গিয়েছিল। এহেন যে সাদা বাঘ তা-ই একবার রেওয়ার মহারাজের জালে ধরা পড়ল। ন' মাসের সেই শিশুশাবকটি পুরাদস্তুর ভদ্রলোক বলে আজ 'মোহন' নামে বিখ্যাত। রেওয়ার এই সাদা বাঘের বংশলতিকা মিঃ রীডের সাহায্যে মঞ্জরিত হয়ে—মোট ন'টি "উপযুক্ত" অর্থাৎ শ্বেতকায় সন্তানের জন্ম দিয়েছে, এদের দু'টির-ই ১৯৬০ সালে জন্ম। বর্তমানে কলকাতার নাগরিকদের দর্শন দান করছে। নজরানা মাথাপিছু পঁচিশ নয়া পয়সা।

সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রপ্রকল্পে তাদের স্থায়ী আস্তানা হবে।

আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎসভা।
ডানদিক্ থেকে দ্বিতীয়, বৈদ্যুতিক-পাখা-সংক্রান্ত উপসমিতির চেয়ারম্যান শ্রী এস্ এন্ মুখার্জি

সাদা বাঘ বিরলশ্রেণীর পশু। পৃথিবীর নির্দিষ্ট কয়টি স্থানে মাত্র এ জাতের বাঘ দেখা যায়। বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষজ্ঞদের হিসাব : গত শতকে অনাদরে-অবহেলায় সত্তরটি জাতের প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এ শতকের গত পঞ্চাশ বছরে লোপ পেয়েছে আরো চল্লিশটি শ্রেণী। সম্প্রতি আরো ছয় শ জাতের জীব বিলুপ্তির পথে যেতে বসেছে। এমন অবস্থায় সাদা বাঘের সংরক্ষণের জন্য সরকারী প্রযত্ন খুবই সময়োচিত হয়েছে।

নূতন একটি শিল্পবিপ্লব

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নূতন এক পরিস্থিতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়েলেবর্গের মতে তা হ'ল নূতন একটি শিল্পবিপ্লব। প্রথম শিল্পবিপ্লবের প্রভাব এশিয়ায় আফ্রিকায় অসংখ্য শহরতলীর বস্তি আর শহর ছেড়ে দূরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার ঢের আগেই নূতন এই বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়েছে। প্রথমটির তুলনায় অনেক গভীর, অনেক তাৎপর্যময় এই নূতন শিল্পবিপ্লব।

দু-দুটো শতাব্দী আগে ইঞ্জিনের অশ্বশক্তির মধ্যে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব জন্ম নিয়েছিল। জেমস্ ওয়াটের ষ্টীম ইঞ্জিন চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত (জেমস্ ওয়াট কি প্রথম ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন?) মানুষ সমস্ত কাজে নিজের পেশীর ক্ষমতাকেই একমাত্র সার বলে জেনেছে, সে সঙ্গে কয়েক জাতের পশুকে বশে এনে তাদের শক্তি "জোয়ালে" লাগিয়েছে। এরই স্বীকৃতি হিসাবেই বোধ হয় বিজ্ঞান শক্তির পরিমাপের নাম দিয়েছে অশ্বশক্তি বা হর্সপাওয়ার। সে যা হোক, শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত মানুষের সভ্যতায় এই অতিকায় যানটি কেবলমাত্র পেশীর শক্তির উপর নির্ভর করেই এগিয়ে চলছিল। ইঞ্জিনের মধ্যে যন্ত্রের শক্তির প্রথম প্রকাশ হল। ফলে যা ছিল এতকাল প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে অফুরন্ত, তা এবার যন্ত্রের বিবর্তনের পথে মানুষের হাতে ধরা দিল। সভ্যতার গতি তাই দ্রুত হ'ল। প্রথম শিল্পবিপ্লবের মূল কথাই এই শক্তি। শক্তির ব্যাপারে মানুষের হাজার হাজার বছরকার "দুর্ভিক্ষ" যেই ঘুচল অমনি আসর জেঁকে বসল নানা ধরণের কলকারখানা—শিল্পজগতের বিচিত্র সব উপকরণ। এ সমস্তই সম্ভব হ'ল, কারণ যন্ত্র আমাদের শুধু যে অফুরন্ত শক্তিই এনে দিল তা নয়, মানুষের কাজ মানুষের থেকেও সুন্দর করে নিখুঁত করে করতে শিখল। আরো বড় কথা, খুব তাড়াতাড়ি এক সঙ্গে অনেকগুলি করাও সম্ভব হল।

এ সব মিলে প্রথম শিল্পবিপ্লব। গত দু শ বছরে এই শিল্পবিপ্লব ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। সে সঙ্গে মানুষের অনির্বাণ লোভ যন্ত্রের সমর্থনে শক্তিশালী হয়ে জঠরের ক্ষুধা আর দীনের দারিদ্র্যকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। শিল্পবিপ্লব তাই কালে অর্থনৈতিক বিপ্লবে সঞ্চারিত হয়েছে। দুটো কাঠামোয় গড়া পৃথিবী নানান্ রাজনৈতিক সংকেতে ঘন ঘন উত্তপ্ত হচ্ছে, তারই মধ্যে এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, স্বয়ংচালিত মিসাইল ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মনকেও ভারাক্রান্ত এবং উদ্বেগ করে তুলছে। আধুনিক সময় যেন এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থে পরিণত হয়েছে।

তারই মধ্যে বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতির পথে দ্বিতীয় এক শিল্পবিপ্লব সূচিত হচ্ছে। প্রথম শিল্পবিপ্লব মানুষের হাতে শক্তি জাগিয়েছে, এই শক্তি নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু উপায়ও তা উদ্ভাবন করেছে। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের স্থান আরো গভীরে, হাতের বদলে আমাদের মস্তিষ্ককে তা প্রভাবিত করবে। বর্তমান যুগ হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়তা—কমপুটেশনের যুগ, দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব এই স্বয়ংক্রিয়তা ও কমপুটেশন থেকেই আসছে। আমাদের মস্তিষ্ক বিচিত্রভাবে কার্যশীল এ কথা সত্য, কিন্তু বিশেষ একটি বিষয়ে তার কর্মক্ষমতার একটি সীমা আছে। বহু প্রকারের গুণ-ভাগ-বর্গমূল-ঘনমূল-দশমিক কণ্টকিত অঙ্কে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিই কণ্টকিত হয়, আধুনিক কমপুটার তা যে শুধু নির্ভুল ক'রে কষে দেবে তা নয়, কয়েক নিমেষেই তা সম্পন্ন করবে। এমন একটা প্রত্যুৎপন্নমতি যন্ত্রকে আমরা কত ধরণের সমস্যায় না নিয়োগ করতে পারি। বিশেষ কয়েকটি সমস্যার জন্য কমপুটারকে "বাঁধা" হ'ল, প্রাথমিক নিয়োগ পর্বটি মিটে গেলে একেবারে নিশ্চিন্ত : প্রাক্‌নির্দেশিত যে কোন কাজ তা মানুষের থেকেও ভাল করে নিষ্পন্ন করবে। যন্ত্র মানুষকেই ছাড়িয়ে উঠবে। মানুষের এই পরাজয়ের মধ্যে মানুষের জয় সূচিত রয়েছে। নানা জটিল সমস্যা ও শিল্পের উৎপাদন কৌশলের মধ্যে এই জয় ক্রমে সঞ্চারিত হবে।

দ্বিতীয় আর একটি শিল্পবিপ্লব এভাবে সার্থক হবে।

পরলোকে অধ্যাপক শিশিরকুমার

এক আশ্চর্য বিরোধমূলক অবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি। বিজ্ঞানের যুগে লালিত-পালিত হয়েও আমরা বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কত কমই না জেনে থাকি,—যে সমস্ত বিজ্ঞানীর জীবনব্যাপী সাধনায় আজ পৃথিবীর এই অভাবনীয় রূপ তাঁদের সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখার আমরা চেষ্টা করি? অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনে এ কথাই সর্বপ্রথমে মনে আসছে। ৭৩ বছর বয়সে হিন্দুস্থান রোডের স্বগৃহে দেহরক্ষা করে (মৃত্যু তিথি ১৩ই আগষ্ট, বেলা ১১টা ২০ মিনিট)। অধ্যাপক মিত্র তাঁর যথোচিত ধামেই প্রস্থান করেছেন, আর পিছনে রেখে গেলেন যোগ্য একদল বিজ্ঞানকর্মী যাঁরা তাঁর কাজকে আরো দূরে এগিয়ে নিয়ে চলবেন।

১৮৯০ সালে কলকাতায় শিশিরকুমার মিত্র জন্মলাভ করেন। শিক্ষাস্থান ভাগলপুরে টি-এন-জে কলেজে, তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৯১২ সালে পদার্থবিদ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এসসি ডিগ্রী (গোল্ড মেডেল সহ) লাভ করে তিনি তৎকালীন বাংলা ও বিহারের নানা কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন প্রবর্তিত স্নাতকোত্তর বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হন। এখানে অধ্যাপক সি. ভি. রামনের নেতৃত্বে গঠিত গবেষক-কর্মীদের দলে যোগ দিলেন, এবং এই দলের মধ্যে কাজ করে ১৯১৯ সালে ডি-এসসি ডিগ্রীতে ভূষিত হন। এরপরের অধ্যায় ফ্রান্সে। সেখানে

অধ্যাপক ফ্যাব্রির (FABRY) অধীনে তিন বছর সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে তিনি ১৯২৩ সালে পুনরায় ডি-এসসি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর ম্যাডাম কুরীর বিখ্যাত রেডিয়াম লেবরেটরীতে কিছুকাল কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে শিশিরকুমার ন্যাঁসির (NANCY) পদার্থবিদ্যার গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। এখানেই অধ্যাপক গাটনের (GUTTON) অধীনে কাজ করার সময় রেডিওর ভাল্‌ব ইত্যাদির আশ্চর্য কার্যকারিতার দিকে তাঁর সমস্ত মন আকৃষ্ট হয়। ১৯২৩ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় খয়রা অধ্যাপকের পদ যখন লাভ করেন তখন অধ্যাপক মিত্র তাঁর সেই একান্ত আগ্রহকে কাজে রূপ দেওয়ার পথ খুঁজে পান। অধ্যাপক মিত্র আমাদের দেশে (তথা সারা
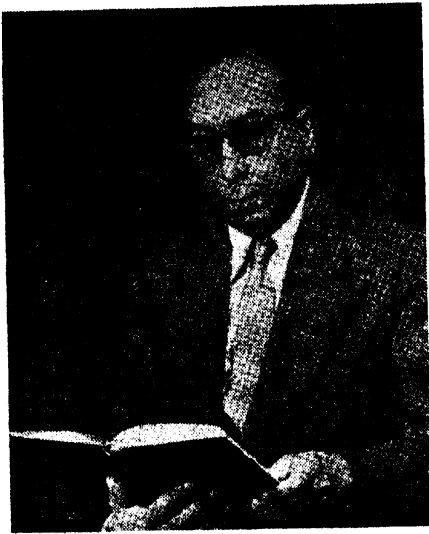
অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

এশিয়ায়) রেডিও গবেষণা এবং ইলেকট্রনিকস্ বিদ্যা প্রচারের একজন প্রধান পথপ্রদর্শক। তাঁরই দূরদৃষ্টির বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম এম-এসসির পাঠক্রমে বেতারবিদ্যার প্রবর্তন করে। বর্তমানে ভারত সরকারের অধীনে যে রেডিও গবেষণা সমিতি রয়েছে অধ্যাপক মিত্রের উদ্যোগেই তা সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক যুগে রেডিও ইলেকট্রনিকস্-এর গুরুত্ব—যা রাডার টেলিভিশন বিভিন্ন ধরণের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে প্রতিফলিত—তা বহু আগেই অনুভব করতে পেরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও-ফিজিক্স্ বিভাগ প্রতিষ্ঠার কারণস্বরূপ হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদলাভের আগে এবং পরে এখনো পর্যন্ত কলকাতার ঊর্ধ্ব আকাশ তাঁর হাতে তৈরী গবেষক-কর্মীদের রশ্মি নিক্ষেপে বারবার আলোড়িত হয়েছে। আকাশের নিচে আমরা সাধারণ মানুষ কোনদিন তার খোঁজ রাখি নি। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে খুব সংক্ষেপে এখানে অধ্যাপক মিত্রের গবেষণার কথা উল্লেখ করব।

অধ্যাপক মিত্র মোটমাট চারটি বিষয়ে তাঁর গবেষণার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। প্রথম, বর্ণালী বিশ্লেষণ। বিশেষ মাত্রার ছোট ছোট বেতার তরঙ্গ ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মধ্যে কিভাবে বিবর্তিত, বিবর্ধিত এবং সাংকেতিক ভাবে বিধিবদ্ধ হয়, প্রথম জীবনে এই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। তাঁর দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল সক্রিয় নাইট্রোজেন। গবেষণা নাইট্রোজেন আকাশের ঊর্ধ্ব স্তরে উঠে কি ভাবে বিশেষ হয়ে উঠে তা নিয়েই এই তত্ত্ব। মেরুজ্যোতি বা অরোরা এবং এয়ার-গ্লো (AIR GLOW) তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর একটি বিষয়। মেরুজ্যোতি বা অরোরা সবারই পরিচিত। মেরু অঞ্চলে আকাশের ঊর্ধ্ব সীমায় তেজসম্পন্ন রশ্মির সংঘাতে আলোর "শিখা" উদ্গত হয়। আর এয়ার-গ্লো? রাত্রির আকাশে সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে একটি সূক্ষ্ম আলোর স্তর বিরাজ করে। এই আলো তারার নয়, দূরাগত কোন আলোকরশ্মির নয়, এই আলোই হ'ল এয়ার-গ্লো। সমস্ত বায়ুমণ্ডল অস্পষ্ট আলোতে তেতে রয়েছে। পৃথিবীর ৬০ থেকে ৬০০ মাইলের মধ্যে অক্সিজেন এবং সোডিয়ামের পরমাণু সূর্যের তীব্র রোদে উত্তেজিত হয়ে রাত্রিতে আবার এই তেজ বিকিরণ করে। সাধারণ চোখে তা ধরা পড়ে না, কিন্তু যন্ত্র নির্ভুল বার্তা এনে দেয়। অধ্যাপক মিত্র এ সম্বন্ধেও ব্যাখ্যা নির্দেশ করেছেন।

ডঃ মিত্রের যে জন্য বিশ্বখ্যাতি, তা হ'ল তাঁর আয়নোস্ফার সম্বন্ধে গবেষণা। ভূপৃষ্ঠের ৬০ থেকে ২২০ মাইলের মধ্যে পৃথিবীর 'রেডিও ছাদ' D, E এবং F এই তিনটি স্তর-বিভাগে আয়নোস্ফার বিভক্ত। দিবাভাগে F স্তর আবার F_1 ও F_2 এ দু'টি স্তরে বিচ্ছিন্ন থাকে। ঊর্ধ্ব আকাশের D স্তরের অস্তিত্ব অধ্যাপক মিত্রের গবেষণার ফলেই অনেকাংশে পরীক্ষার সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রধানত এই আয়নোস্ফার সম্বন্ধেই তাঁর গ্রন্থ "আপার অ্যাটমোস্ফার"—বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত, তা দেশে-বিদেশে আশ্চর্য সমাদৃত হয়েছে।

১৯৫৬ সালে অধ্যাপক শিশিরকুমার অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করে পশ্চিম বাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটের কর্মভার গ্রহণ করেন। অবশ্য এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তখনো বজায় ছিল। ১৯৫৫ সালে ডঃ মিত্র ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি। ১৯৫১-৫৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই জড়িত, ১৯৫৯ সালে তার সভাপতি। ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। ১৯৬২ সালে ভারত সরকারের জাতীয় গবেষণা-অধ্যাপক। জীবনে অনেক সম্মানই তিনি লাভ করেছিলেন, অবশেষে মৃত্যুকালে দেশবাসীর হাতেই তা তুলে দিয়ে গেলেন।

তাঁর আত্মার শান্তি হোক। ওঁ।

এ. কে. ডি.

আয় ঘুম, আয়

একজন বৈজ্ঞানিক বলছেন, আমরা যে ঘুমোই এটার মধ্যে রহস্য কিছু নেই। এক হিসেবে ঘুমিয়ে থাকাটাই জৈব-প্রবৃত্তির বিশেষত্ব। জেগে ওঠাটাই একটা প্রাকৃতিক ব্যতিক্রম এবং আমরা যে জেগে উঠি এবং কতকটা সময় যে জেগে থাকি, এইটেই আসল রহস্য। ভাবা যেতে পারে, আমরা জেগে উঠি এবং জেগে থাকি, জীবনধারণের পক্ষে সেটা নিতান্তই প্রয়োজন ব'লে, যাতে সে প্রয়োজনটা মিটিয়ে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারি। ঐ প্রয়োজনটা যদি না থাকত ত আমরা হয়ত সারাজীবন ঘুমিয়েই কাটাতাম।

অনেকেই স্বীকার করবেন, সৃষ্টিব্যবস্থাটা ঐ রকমের হ'লে মন্দ কিছু হ'ত না; বিশেষতঃ তাঁরা, যাঁদের জীবনধারণের জন্যে যথাকর্তব্য সব করা হয়ে যাবার পর নানা অপ্রয়োজনীয় কাজে আরও অনেক সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না।

ঘুম কেন আসছে না, ঘুম হয়ত আসবে না এই দুর্ভাবনায় তাঁদের আরোই ঘুম আসে না।

কিন্তু দুর্ভাবনার কারণ সত্যই কিছু আছে কি?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রাণীদের বিশ্রাম দরকার। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে না পেলে ক্লান্তিতে প্রাণশক্তি ক্ষয় হতে হতে একেবারেই নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। নিদ্রা এই বিশ্রামকেই সহায়তা করে এবং একে সহজতর করে।

এইজন্যে আজকের দিনের অনেক চিকিৎসক বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন যে, মানুষকে যে ঘুমোতেই হবে এমন কোন কথা নেই। ঘুম কেন আসছে না এই দুর্ভাবনার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে আপনি যদি প্রতি রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেন, জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে তাই আপনার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে।

আবার আজকের দিনে এমনও অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা একেবারে ভিন্নমতাবলম্বী। তাঁরা বলেন, না, মানুষের ঘুমের প্রয়োজন আর কোন উপায়ে মেটানো সম্ভব নয়। তার একটা প্রধান কারণ, মানুষ ঘুমের মধ্যে, বিশেষতঃ ঘুম আসবার এবং ছেড়ে যাবার মুখে মুখে, স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্ন দেখা, যার মধ্যে তার মনের অতৃপ্ত বাসনা-কামনা তৃপ্ত হয়, তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

যে মানুষ ভাল ঘুমোতে পারে সেও যতটা সময় ঘুমোয় তার শতকরা কুড়িভাগ সময় স্বপ্ন দেখে। এই সময়টুকু তার ঘুমোনো একান্ত দরকার। যদি কোন কারণে কিছুদিন ধ'রে এই সময়টায় তার ঘুম ভেঙে যায় আর তার স্বপ্ন দেখা ব্যাহত হয় ত সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বহুকাল এই রকম চলতে থাকলে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই চিড় ধরে। সে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়।

এই দুই মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা ক'রে বলছি, আপনি ঘুমোতে চেষ্টা করবেন, তবে ঘুম যদি না আসে তা নিয়ে খুব বেশী অস্থির হবেন না। আর যদি পারেন, আমাদের মত আরও অনেকে যা ক'রে থাকেন, একটু দিবাস্বপ্ন দেখার অভ্যাস করবেন। এ ছাড়া, সব ডাক্তারই যে-বিষয়ে একমত,—কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঘুমের ওষুধ খেতে না বললে খাবেন না।

অনিদ্রা যত না আপনার ক্ষতি করবে, ওষুধ তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করতে পারে। মনে রাখবেন, চিকিৎসার সমগ্র ইতিহাসে এমন কোন রোগীর কথা কোথাও লেখা নেই, অনিদ্রার জন্যে যাঁর মৃত্যু ঘটেছে, বা অনিদ্রা থেকে যাঁর গুরুতর রকম স্বাস্থ্যহানি হয়েছে।

টাইটানিক-ডুবির থেকে আমরা কি শিখেছি

১৯১২ সালে ১৫ই এপ্রিল সমুদ্রে ভাসমান বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লেগে, কিছুতেই ডুবতে পারে না ব'লে যে জাহাজের নির্মাতারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন, সেই প্রাসাদোপম বিশালাকার জাহাজ টাইটানিক অলক্ষণের মধ্যেই ডুবে যায়। কত সামান্য কারণে তাতে যে কত শত লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল, সে এক মর্মন্তুদ কাহিনী।

কিন্তু এই নিদারুণ শোকাবহ দুর্ঘটনা থেকে সুফলও কিছু ফলেছে বলা যেতে পারে।

১৯১৩ সালে লণ্ডনে সমুদ্রে নিরাপত্তা বিষয়টি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের বৈঠক বসে। টাইটানিক-ডুবির মত দুর্ঘটনা যাতে সহজে আর না ঘটতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কতগুলি আইন-কানুন প্রণীত হয় এই কনভেনশনে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে দেখবেন, এই সব আইন-কানুন অনুসারে স্থির হয় যে, প্রত্যেক জাহাজে যতজন আরোহী থাকবে, তাদের সকলের স্থান-সঙ্কুলান হয়, অন্ততঃ ততগুলি জীবনরক্ষী নৌকা বা লাইফ-বোট রাখতে হবে। টাইটানিক জাহাজের যাত্রীসংখ্যা ছিল ২২২৪, কিন্তু লাইফ-বোটগুলিতে স্থান ছিল মাত্র ১১৭৮ জনের। অনেক জাহাজে এতটা সুব্যবস্থাও থাকত না। আরও নিয়ম করা হ'ল, যে প্রতিবারের সমুদ্রযাত্রায় এক বা একাধিকবার লাইফ-বোট ড্রিল, অর্থাৎ কি না বিপদের সময় কি ক'রে ঐগুলোতে আরোহীদের চড়াতে হবে, কি ক'রেই বা সেগুলোকে তারপর জাহাজ থেকে নামাতে হবে, এই সমস্তর একটা অভিনয় অবশ্য করণীয় ব'লে করতে হবে। টাইটানিকে এরকম কোন ড্রিলের ব্যবস্থা ছিল না ব'লে এত রকমের এত গোলযোগ হ'ল যার ফলে সেই কাল-রাত্রিতে এমন বহুলোকের মৃত্যু হয়েছিল যারা সহজেই বেঁচে যেতে পারত। এই কনভেনশন থেকে আর একটা নিয়ম করা হ'ল, যে, প্রত্যেক জাহাজে যথেষ্ট-সংখ্যক রেডিও অপারেটার রাখতে হবে যাতে অহোরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রেই রেডিও সিগ্‌ন্যাল বা বেতার-বার্তার সঙ্কেতবাণীর প্রত্যেকটি শোনা যায় এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবিলম্বে করা যায়। টাইটানিক জাহাজটি যখন

সবেমাত্র ডুবতে আরম্ভ করেছে তখন তার থেকে কুড়ি মাইলের চেয়েও কম দূর দিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়ান নামক একটি জাহাজ চ'লে যাচ্ছিল। ক্যালিফোর্ণিয়ান জাহাজে রেডিও-অপারেটার ছিল মাত্র একটি এবং সে-বেচারী সে-সময় মহা তোয়াজে ঘুমোচ্ছিল। এ-সমস্ত ছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল এই কনভেন্‌শনে। এই ব্যবস্থা অনুসারে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়, যাদের কর্তব্য হ'ল, উত্তর আটলান্টিক চষে বেড়ানো এবং বরফের ভাসমান পাহাড়গুলি সম্বন্ধে আশেপাশের সমস্ত জাহাজকে সতর্ক ক'রে দেওয়া। কনভেন্‌শনের সেই বিধিবিধানগুলিই অদ্যাবধি বলবৎ রয়েছে।

জিপ্‌সীরা কি ইজিপ্সিয়ান ?

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর যাযাবর জাতি ঘুরে বেড়ায়, ইংরেজীতে যাদের বলা হয় জিপ্‌সী। বহুকাল ইংলণ্ডের জনসাধারণের ধারণা ছিল, এরা মিশর বা ইজিপ্ট দেশের লোক, তাই ইজিপ্সিয়ান কথাটাকে একটু সংক্ষিপ্ত ক'রে এদের নামকরণ হয়েছিল জিপ্‌সী। বলা যায় না, হয়ত ইজিপ্টে বহুকাল বসবাস ক'রে তারপর এরা ইউরোপে এসে জুটেছিল, কিন্তু বর্তমানে একথা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত যে, ইউরোপের এই জিপ্‌সীরা মূলতঃ ভারতীয়। অবশ্য জিপ্‌সীরা নিজেরা তা জানে না।

এরা নিজেদের রোমানী ব'লে পরিচয় দেয়। যদিও ইউরোপের যে যে দেশে এরা বাস করে, সেই সেই দেশের ভাষা বহু-পরিমাণে আত্মসাৎ ক'রে নিয়েই এরা কথা বলে, তবু এদের প্রাচীন রোমানী ভাষার অনেক শব্দের ব্যবহার এরা ছাড়তে পারে নি। এই শব্দগুলির সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় ভাষাগুলির কোনো কোনো শব্দের সাদৃশ্য এতই বেশী যে, এরা যে বহু শতাব্দী আগে উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না। কিছু নমুনা দেখুন :

রোমানী ভাষার শব্দ	সমার্থক উত্তরভারতীয় ভাষার শব্দ
আপরে	উপরে
আত্রাশ, ত্রাশ	ত্রাস (ভয়)
বাওল	বায়ু
বেশ	বস
বিকেন	বিক্রি, বিকি
বরি	বড়
বরি লোন পানি	বড় লোনা পানি (সমুদ্র)
ছিন	ছিন্ন করা, কাটা
চোর	চুরি করা
চুরী	ছুরী
দেল	দেওয়া
লেল	লওয়া
দিক	দেখা
দিব্বাস	দিবস, দিন
দুই	দুই
গাও	সহর, গাঁও
গ্রোআ	ঘোড়া
যাউল	যাওয়া
জিন	জানা
জিব্‌বেন	জীবন
কাকো	কাকা
লোলি	লাল
মাচ্‌কি	মাছ
মুই	মুখ
পিব	পান করা
পুরো	পুরণো
রার্ত্তি	রাত্রি
রত	রক্ত
শেরী	শির, মাথা
[illegible]	শশক, খরগোস
তান	স্থান
ভাচ	সত্য, সাচ্চা, সাচ
তুলি	তলে, নীচে
ত্রিন	তিন
ওয়াস্ত	হস্ত, হাত
অঙ্গার	অঙ্গার, কয়লা
য়ক	অক্ষি, চোখ
য়গ	আগ, আগুন

আমরা ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশতে গিয়ে নিজেদের গাত্রবর্ণ নিয়ে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। জিপ্‌সীরা তা হয় না, যদিও তাদের গায়ের রঙ আমাদেরই মত। তারা বলে, ভগবান্ মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে একটা লেবু ঝল্‌সে নিতে গেলেন আগুনে, সেটা পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গেল, সৃষ্টি হ'ল কাফ্রি জাতির। ওরকমটা যাতে আর না হয় সেজন্যে পরের বারে লেবুটা একটু বেশী তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন আগুন থেকে, ফলে লেবুটার গায়ে কোনো রঙই ধরল না, সৃষ্টি হ'ল শ্বেতাঙ্গ জাতির। দুবার দুরকম ভুল ক'রে ভগবানের খুব শিক্ষা হ'ল, তখন তিনি আর-একটা লেবুকে আগুনের উপর ধ'রে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যখন দেখলেন, সেটা বেশ সুন্দর বাদামী রঙের হয়ে এসেছে, তখন সেটাকে আগুনের আঁচ থেকে সরিয়ে নিলেন, রোমানী অর্থাৎ জিপ্‌সী জাতির সৃষ্টি হ'ল।

বৃহত্তম অর্ণবপোত

আণব-শক্তি-পরিচালিত এই এরোপ্লেন-বাহী মার্কিন জাহাজটির নাম এণ্টারপ্রাইজ। এর পরিচালনার কাজ যাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, তাদের সংখ্যা ৪,৬০০। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ মাইল; খোলের নীচ থেকে মাস্তুলের ডগা পর্যন্ত এর উচ্চতা একটি তেইশ-তলা বাড়ীর সমান। লম্বায় জাহাজটি এক মাইলের সিকি ভাগ। যে ডেক্ থেকে এরোপ্লেনগুলি
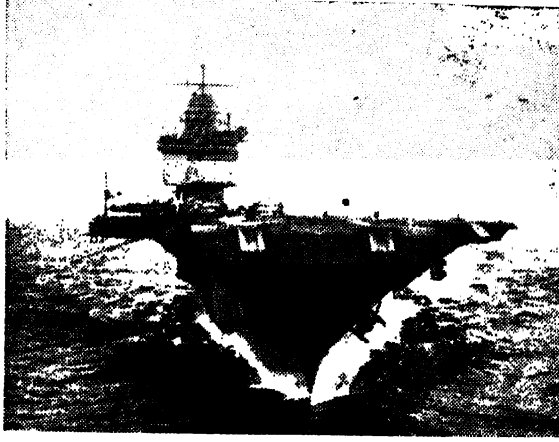
পৃথিবীর বৃহত্তম অর্ণবপোত

ওড়ে তার বিস্তৃতি সাড়ে চার একর। ১০০টি এরোপ্লেন সেখানে ওঠা-নামা করতে পারে। যতটা আণব-শক্তি একবারে সে সঞ্চয় ক'রে নিতে পারে, তার সহায়তায় বাইশ বার এই ভূমণ্ডল সে প্রদক্ষিণ করতে পারে। এর খাবার জায়গায় সারাদিনে ১৩৮০০টি পাত পড়ে, আর জুতো মেরামতের দোকান থেকে সুরু ক'রে টেলিভিশন ষ্টুডিও পর্যন্ত একটি আধুনিক শহরে যা থাকে তার এমন-কিছু নেই যা এই জাহাজটিতে আপনি পাবেন না।

স. চ.

এণ্টারপ্রাইজ জাহাজে হ্যাঙ্গার বা এরোপ্লেন রাখার ঘর

নিসর্গাচারই পূর্ণ স্বাস্থ্য—সুরেশচন্দ্র (স্বাস্থ্যাভিজ্ঞ) প্রণীত। প্রকাশিকা—শ্রীমতী রাজবালা দাস। ১৫২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য—সাত টাকা। সবুজ রেক্সিনে বাঁধাই। ৪০৮ পৃষ্ঠা।

নিসর্গ মানে প্রকৃতি; এবং আচার হ'ল—আচরণ, চালচলন, রীতি, সংস্কার, নিষ্ঠা ইত্যাদি। এই দুটি শব্দের সন্ধি করে লেখক তাঁর পুস্তকের নামাকরণ করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রাকৃতিক সব বিধি মেনে চললেই মানুষ পূর্ণস্বাস্থ্য পেতে পারে। অন্যথায় কখনও তা সম্ভব নয়।

কিন্তু এই প্রাকৃতিক বিধিটি কি?

এই বিধিটি বোঝাতে লেখককে কেন যে এত বড় একটি বই লিখতে হল তা বোঝা গেল না। ষোল পাতার যে ভূমিকাটি তিনি লিখেছেন তাতেই ত তাঁর মতামত সব স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। এই জিনিষ বোঝাতে শরীরের কাঠামো, আন্তর যন্ত্র, শারীর তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে অত গবেষণার কোন প্রয়োজন ছিল না।

লেখক গান্ধীজীর জীবনী ও শিক্ষা থেকে নাকি বুঝেছেন যে ব্রহ্মচারীর স্বাস্থ্য কখনও ভাঙে না। দেহে কোন রোগ থাকে না। (পৃঃ ।/০) কিন্তু গান্ধীজী কোন্ গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন লেখক আমাদের কিছুই তা জানান নি।

লেখকের মতে নিসর্গাচার অর্থাৎ "নেচার কিওর" একটি দার্শনিক বিজ্ঞান (পৃঃ ।৵০)। অথচ আমরা জানি দর্শন হ'ল, Philosophy বা তত্ত্ববিদ্যা। আর বিজ্ঞান হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ণীত শৃঙ্খলিত জ্ঞান। কাজেই দার্শনিক-বিজ্ঞানটি যে আসলে কি বস্তু তা কিছুই বোঝা গেল না এই বৃহৎ পুস্তকটি পাঠ করে।

লেখক বিশ্বাস করেন যে, বিশুদ্ধ জলে ডুস্ ও তৎসঙ্গে সুনির্বাচিত ফলমূলের নিয়মিত পথ্য যে কোন রোগ প্রশমিত করতে সমর্থ। অবশ্য পূর্ণ অনশনই রোগের দ্রুততর ও নিশ্চিততর প্রতিকার। (পৃঃ ।৶০)।

আঠারো শতকের ইউরোপেও এমনি উদ্ভট সব থিওরী গজিয়েছিল। তখনকার জার্মানী হঠাৎ একটি থিওরী আবিষ্কার করত। আর ফরাসী দেশ করত তার লালন-পালন।

এমনি এক থিওরী বেরিয়েছিল, যার নাম, "ডকট্রিন অব্ ইনকরেক্টাম"। হামবুর্গের জোআন ক্যামক্ একদিন দেখলেন যে কোষ্ঠবদ্ধ হলেই দেহে অস্বস্তি হয়। অমনি তাঁর ধারণা হ'ল যে, সব রোগেরই উৎপত্তি এই কোষ্ঠকাঠিন্যে।

থিওরী যেমন সহজ তার চিকিৎসাও তেমনি সরল। রোগ থেকে বাঁচতে চাও ত কোষ্ঠ পরিষ্কার কর। এনিমা নাও। ঘরে ঘরে এনিমা সিরিঞ্জ চালু হ'ল, বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে। সেই সময়কার এক ব্যঙ্গ কার্টুনে দেখা যায় যে, একটি বাচ্চা ছেলে হঠাৎ বেশী খেয়ে ফেলেছে দেখে ডাক্তার নিজেই তাকে এনিমা দিচ্ছেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখে। বিশ শতকের বাংলা দেশেও দেখা যাচ্ছে যে ঐ থিওরীতে বিশ্বাসী একজন অন্ততঃ আছেন।

রোগ প্রতিরোধের প্রকৃত কৌশল কি তা নাকি লেখক স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ববিধ রোগের প্রতিকারের সঠিক উপায় অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন (পৃঃ ।৶০)।

কিন্তু এই কৌশলটি কি?

লেখকের মতে এই কৌশলটি হ'ল, যদি সবুজ শাকপাতা, টমাটো, গাজর, পাকা কলা, খেজুর এবং সয়াবিনের দধি ও আলু (অপর কোন খাদ্য নয়) সারাদিনের আহারে ব্যবহৃত হয় এবং অতি প্রত্যূষে ৬।৮ মাইল পথ প্রত্যহ সবেগে হাঁটা যায় তবেই মানুষ সম্পূর্ণ নীরোগ জীবন যাপন করতে পারে (পৃঃ ৸৵০)।

সন্ত বিনোবাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখক প্রত্যহ ৮।১০ মাইল পথ খুব বেগে হাঁটেন। ২ ঘণ্টা বা ২-১০ মিনিটের মধ্যে ঐ হাঁটা শেষ করেন। বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণের জন্য ও একাগ্রতা সহকারে শ্রীভগবানের নাম স্মরণের উদ্দেশ্যে রাত্রি ১টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত গড়ের মাঠে বেড়ান। (পৃঃ ৸৶০)।

সেইজন্যই লেখকের বিশ্বাস যে তিনি কোন রোগে ভোগেন না। কখনও নাকি ভুগবেন না। তাই এখন তিনি এমন অবস্থায় এসেছেন যে অনায়াসে এবং নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করতে পারেন, যে-কেউ তাঁর আচরিত এই সব বিধি মেনে চলবে সে-ই নীরোগ দেহ লাভ করবে। (পৃঃ ।৶০ ৸০)।

তাঁর মতে যে লোক দুর্বলচিত্ত, ভোগপরায়ণ, লোভী ও অসংযমী—সেই সাধারণতঃ কঠিন দুরারোগ্য ও বাপ্য ব্যাধিতে কষ্ট পায়; যেমন অজীর্ণতা, আমাশয়, বহুমূত্র, পেটে ঘা কিংবা পাথুরী, শ্বাসরুদ্ধ বা হাঁপানী, হৃদ্শূল (angina), হৃদ্গত্যাবরোধ (thrombosis), রক্তচাপ, ক্যান্সার ইত্যাদি (পৃঃ—৸০)।

মনুষ্যদেহের বিচিত্র সব ব্যাধির কারণ এত সহজে আবিষ্কার করতে পৃথিবীর আর কোথাও-বোধ হয় দেখা যায় নি।

যদিও এই বৃহৎ গ্রন্থটির নাম "নিসর্গাচারই পূর্ণ স্বাস্থ্য" তবু আশ্চর্য এই যে ৪০৮ পৃষ্ঠার এত বড় গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ন' (৯) পৃষ্ঠার মধ্যেই নিসর্গাচারের পরিচ্ছেদটির শেষ হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন—গ্রন্থকার নিজে একজন সত্যিকারের আচারনিষ্ঠ নিসর্গাচারী (পৃঃ ১০)। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন সকল অসুখের মূল এবং প্রাকৃতিক অভ্যাস বা নিয়মে প্রত্যাবর্তনই স্বাস্থ্যলাভের একমাত্র উপায়। ত্যাগই জীবন, ভোগই মৃত্যু। দেহকে তাঁর স্বাভাবিক জীবন যাপন পদ্ধতিতে পুনঃস্থাপিত করিলেই প্রাকৃতিক অনাক্রম্যতা (ইমিউনিটি) ফিরিয়া পাইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রাকৃতিক খাদ্যের (ফলমূল) উপরই জীবন ধারণ করিতে হইবে, কোন কৃত্রিম খাদ্যের উপর নয়। এইরূপ আদর্শস্থানীয় অবস্থায় একমাত্র সূর্য-তাপই আমাদের পাচক হইবে। (পৃঃ ১৭) খাঁটি ব্রহ্মচারী ব্যতীত নিসর্গাচারনিষ্ঠ হওয়া যায় না (পৃঃ ১৮)।

এই খাঁটি ব্রহ্মচারী গ্রন্থকারের ৬০-বৎসর বয়সের একটি ফটো বইএর

প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে গ্রন্থকারের মাথার চুল আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মতই ছাঁটা। মিহি করে ছাঁটা জুলফি। চোখে সেল ফ্রেমের চশমা। গায়ে সার্ট। ভেতরে গেঞ্জি অথবা ফতুয়া।

প্রকৃতির কোন্ নিয়ম মেনে এবং কি ত্যাগ করে এই পোশাক পরা যায় তা অবশ্য গ্রন্থে কোথাও নেই। এবং একমাত্র সূর্যতাপেই তাঁর খাবার প্রস্তুত হয় কি না তাও ঠিক বোঝা গেল না।

লেখকের মতে "গো-দুগ্ধ কখনই মানবজাতির পক্ষে প্রাকৃতিক খাদ্য হইতে পারে না। গো-দুগ্ধ শুধু বাছুরেরই প্রাকৃতিক খাদ্য।·· পশুর দুধের সঙ্গে পাশবিক বৃত্তি আচরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, যেরূপ মাছ মাংস ও ডিম খাইলে অপরিহার্য রূপে পাশবিক বা তামসিক গুণ বৃদ্ধির সাহায্য হয়" (পৃঃ ৮)।

লেখক অনেক জায়গায় গান্ধীজীর বাণী তুলে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই দুগ্ধ পান সম্বন্ধে কিছু তোলেন নি। আমরা যতটুকু জানি তাতে গান্ধীজী ছাগদুগ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। ছাগদুগ্ধ কি পশু-দুগ্ধ নয়? তা হ'লে কি গান্ধীজীর মধ্যেও যথেষ্ট পাশবিক বৃত্তি ছিল?

লেখক "প্রাথমিক জীবনের ৪০ বৎসর মিশ্রিত ও রন্ধিত খাদ্য খাইয়া এখন ২৯ বৎসর স্বাভাবিক খাদ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া সে 'পূর্ণ' স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে।" (পৃঃ ৩১)।

তাঁর মতে "স্বাস্থ্যরক্ষার্থে লবণ, মসলা, মাছ, মাংস, ডিম, ঝাল, তৈল, ঘি ও চিনি অথবা মিষ্ট দ্রব্য না খাইলে আমাদের উপকার ছাড়া অপকার হইবে না" (পৃঃ ১২)। এই উক্তি আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর খুবই কাজে লাগবে মনে হয়: তা ছাড়া চিকিৎসকদের ওপর লেখকের বেশ রাগ ও ঘৃণা আছে দেখা গেল। তিনি লিখেছেন, "চিকিৎসা ও হাসপাতাল উভয়েই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাভিচারী দালালের কাজ করে" (পৃঃ ১২)।

"···রঞ্জন-রশ্মি প্লেট এবং রক্ত, থুথু, মুত্র এবং মল পরীক্ষার কোন অর্থ নাই, কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, শুধু বেকারের সংস্থান হয়" (পৃঃ ২৪৪)।

মানুষের দেহে বীজাণু-নাশক ওষুধের ব্যবহারকে লেখক নরহত্যারই নামান্তর বলেছে (পৃঃ ২৩৪)।

কিন্তু টিকা সম্বন্ধে লেখকের যা মত তা যে বিশ শতকের শিক্ষিত কোন ব্যক্তির এখনও থাকতে পারে আমাদের তা জানা ছিল না।

"চিকিৎসকগণের মন ও আচরণ দুর্বল, সুতরাং তাহারা রোগীকে ভুল পথে চালনা করিয়া অর্থের বিনিময়ে বিষ ক্রয় করিবার পরামর্শ দিতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ টিকা দিবার পদ্ধতির কথা বিবেচনা করা যাউক। উহা দেহাভ্যন্তরে বিষ ঢুকাইয়া দেহকে দূষিত করা ব্যতীত অন্য কিছু নয়" (পৃঃ ২৩৪)।

অতএব "গ্রন্থকার একজন বিবেকসম্পন্ন স্বাস্থ্যবিশারদ হিসাবে আজ সকলকে, সকল জগদ্বাসীকে, সকল ভ্রাতৃবৃন্দকে ও ভগ্নীবৃন্দাকে সানুনয় এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা এই গর্হিত ও অনিষ্টকর টিকা লইবার প্রথা সমাজ হইতে আজই বিদূরিত করুন। ইহার পরিবর্ত হিসাবে সুনিশ্চিতরূপে স্বাস্থ্যকর ও ফলপ্রদ পন্থা ডুস্ লওয়া অভ্যাস করুন (পৃঃ ২৩৪)।

২৫৭ পৃষ্ঠার পাশে লেখকের শুধুমাত্র একটি কৌপীন পরা প্রায়-নগ্ন চিত্র আছে। নীচে লেখা আছে, পূর্ণ স্বাস্থ্যর আদর্শ ৭২ বৎসরে গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের বাহাত্তুরে ধরেছে এ-বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ আর নাই।

ডাঃ অতুলানন্দ দাশগুপ্ত

আচার্য প্রমথনাথ বসু—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য এক টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ভূতত্ত্ববিদ্ আচার্য প্রমথনাথ বসুর জীবন-আলেখ্য। যিনি পি. এন. বোস নামে নিজের অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের দ্বারা পৃথিবী-খ্যাত 'টাটা'র লৌহ-কারখানা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—একথাও লোকের মুখে মুখে প্রচারিত। শুধু জামশেদপুরেই নয়, ভারতের নানা অংশে—ব্রহ্মদেশেও তিনি বিবিধ খনিজের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁহারই আবিষ্কৃত লৌহ-আকরগুলি হইতে আজ দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেলার কারখানাগুলিতে কাঁচা-মালের যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছে। যে-যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, সেই একই যুগে একই সঙ্গে অতগুলি বিজ্ঞান-সাধকের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর। তাঁহাদের কথা—আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের কথা, গ্রন্থকার তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তাঁহার জীবনে একটি দিক্ বড় স্পষ্ট ছিল—সেটি, চারিত্রিক দৃঢ়তা। এ বিষয়ে লেখকের বক্তব্যই উদ্ধৃত করিতেছি: "···প্রমথনাথ বিবাহের সময় হিন্দুধর্ম ছাড়েন নি। রাঁচীতে রামকৃষ্ণ সমিতির নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন।···তাঁর প্রায় সকল কন্যাদের বিবাহই ব্রাহ্মমতে হয়েছিল, পুত্রদেরও তাই। আবার দেখা যায় বাড়ীতে বাবর্চিও ছিল, কিন্তু তাঁহার রান্না পৃথক্ পাচকে করিত। বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াও তিনি খাঁটি ভারতীয় ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, যাহা গ্রন্থকার দু'টি কথায় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন: ···"পাশ্চাত্যের নিয়মানুবর্তিতা, গৈপুরের বাল্যে-দেখা কৃষি-নির্ভর স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং ভারতীয় কৃষ্টির ভগবৎ-নির্ভরতা।"

তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, যাহা জগতে বিরল, সেকথা না বলিলে, তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা হইবে না। জামশেদপুরে লৌহ-খনি আবিষ্কার—প্রমথনাথের একটি বিশেষ দান। টাটা কোম্পানী সেকথা ভোলে নাই। কোম্পানী প্রমথনাথকে ইহার একটা মোটা অংশ লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই তাঁহার জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের তালিকা সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকারকে অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। সংক্ষেপিত হইলেও, মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী লেখার প্রয়োজনীয়তা আজ অনেকখানি। সেদিক্ দিয়া তিনি বড় কাজ করিতেছেন।

শ্রীগৌতম সেন

সবুজ সন্ধ্যা—কুমারলাল দাশগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীশচীন চক্রবর্তী। সাহিত্য-ভবন, ৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দু টাকা।

কুমারবাবু "প্রবাসীর" নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমালোচ্য উপন্যাস-খানিও প্রবাসীতেই একসময় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গল্পের নায়ক ও নায়িকা লালধন ও ফুলি। পার্শ্বচরিত্রে আছে বন্ধু মাঝি, উকুম, মিতাম, ছোটু, আরও অনেকে।

লেখকের ভাষায় "লালধন বিশ বছরের যুবক। অরণ্যের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাশ করা ছেলে, ধনুক তীর দিয়া বাঘ হইতে হরিণ পর্য্যন্ত শিকার করিতে পারে।"

এদের পেশা এবং নেশা ছিল শিকার করা আর হাড়িয়া পান করিয়া মাদল বাজাইয়া নাচ-গান করা। জীবন ধারণের প্রয়োজন উহাদের খুবই সামান্য। কিন্তু সভ্য সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় উহাদের এই সামান্যতম প্রয়োজনও আর মিটিতেছে না। যে অরণ্য যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের প্রয়োজন মিটাইয়া আসিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহা দূরে অতি দূরে সরিয়া যাইতেছে। সরকারী প্রয়োজনে ঠিকাদার আসিয়াছে জঙ্গল কাটিতে, বি.এ. পাশ করিয়া প্রভাত রায় ছোটনাগপুরের জঙ্গল কাটিবার ঠিকাদারী লইয়া এই অঞ্চলে আসিয়াছে। ইতিমধ্যেই বাঘাপাহাড়ীর জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া ফেলিয়াছে।

সাঁওতাল পুরুষদের মধ্যে একটা অসহায় ক্ষোভ জমা হইয়া উঠিয়াছে। এই জঙ্গল তাদের পূর্ব্বপুরুষদের কত বীরত্বপূর্ণ উদ্দীপনাময় স্মৃতি ব[হন] করিতেছে অথচ সেই জঙ্গলের অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। কিছুদিনের মা[ঝে] সকলকেই একে একে চলিয়া যাইতে হইবে। বলিবার কিছু নাই, করিবার কিছু নাই। দেবতার দুয়ারে মাথা কুটিয়া মুরগী বলি দিয়া তাদের নালিশ জানাইয়া তাহারা ক্ষান্ত হয়। কিন্তু পেট কথা শোনে না। পেটের জ্বালায় উহারা দূরের জঙ্গলে ধাওয়া করে, কিন্তু প্রয়োজনীয় শীকার মেলে না। তাড়া খাইয়া জীবজন্তু আরও গভীর অরণ্যে চলিয়া গিয়াছে।

এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও লালধন আর ফুলির প্রেম অবাধ গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল কিন্তু অকস্মাৎ ওদের গতিপথে প্রভাতের আবির্ভাব লালধনকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল। তাহাদের সহজ সচ্ছন্দ জীবনপথে ঝড় উঠিল, সেই ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে দুজন দুদিকে ছিটকাইয়া গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভালবাসার জয় হইল। মোটামুটি গল্পটি এইরূপ।

ছোটনাগপুরের সাঁওতাল চরিত্রই পুস্তকের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। এদের বন্য জীবনের বিচিত্র কাহিনীই আখ্যায়িকার মূল উপজীব্য।

গল্পটি যেমন মিষ্টি তেমনি উপভোগ্য। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এ[ক] দুর্নিবার বেগে টানিয়া লইয়া যায়।

গল্পের মধ্য দিয়া লেখক অরণ্য-জীবনের যে বাস্তব আর নিখুঁৎ ছ[বি] আঁকিয়াছেন তাহা মনকে অভিভূত করিয়া তোলে।

ছোট একখানি ক্যানভাসের উপরে মাত্র আট-দশটি পরিবারের আ[ট]-দশখানি ঘরকে বিচ্ছিন্ন ভাবে সাজাইয়া এই আট-দশটি পরিবারের আ[শা]-আকাঙ্ক্ষা, হাসি, কান্না, উত্থান আর পতনের চিত্রগুলি তিনি রং[-] রসের তুলিতে যে ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন তাহা এককথায় অপূর্ব্ব।

এই বন্য অসভ্য আর অর্দ্ধসভ্য মানুষগুলিকে তিনি শুধু চোখেই [দেখেন] নাই, উহাদের সহিত যে লেখকের কত নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে এ ক[থা] প্রত্যেকটি চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সহজ সাবলীল ভাষায় লিখিত এই ছোট উপন্যাসটি পাঠক[-সমাজে] সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রচ্ছদপট নয়নানন্দকর।

শ্রীবিভূতি ভূষণ

সম্পাদক—কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি[কাতা]